শতবর্ষের সেরা

রহস্য উপন্যাস

সম্পাদনা অনীশ দেব



শতবর্ষের সেরা

রহস্য উপন্যাস

২

সম্পাদনা

অনীশ দেব

পত্র ভারতী

৩/১ কলেজ রো, কলকাতা ৭০০ ০০৯

SHATABARSHER SERA RAHASYA UPANYAS 2

Edited by

Anish Deb

প্রচ্ছদ

অমিত চক্রবর্তী

অলংকরণ

সত্যজিৎ রায়, শৈল চক্রবর্তী ও বিজন কর্মকার

নামাঙ্কন

সৌরীশ মিত্র

Publisher

PATRA BHARATI

3/1 College Row, Kolkata 700 009

'পত্র ভারতী'র পক্ষে ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত ও হেমপ্রভা প্রিন্টিং হাউস,
১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে মুদ্রিত।

"I cannot live without brainwork. What else is there to live for ?"

—Mr. Sherlock Holmes
The sign of four (chapter I)
Sir Arthur Conan Doyle

"মাথার কাজ ছাড়া আমি থাকতে পারি না। এ ছাড়া বেঁচে থেকে কী লাভ?"

—মি. শার্লক হোম্‌স
দ্য সাইন অফ ফোর (প্রথম অধ্যায়)
স্যার আর্থার কোনান ডয়েল

কয়েকটি কথা, দ্বিতীয়বার

'শতবর্ষের সেরা রহস্য উপন্যাস'-এর দ্বিতীয় খণ্ড চারবছর পর প্রকাশিত হল। এই খণ্ডে রয়েছে বারোটি উপন্যাস। লেখক নীহাররঞ্জন গুপ্ত শুরু করে বিমল সাহা পর্যন্ত। অর্থাৎ, অতি পরিচিত নাম দিয়ে শুরু করে অচেনা নাম দিয়ে শেষ।

দ্বিতীয় খণ্ডটি যে চারবছর পর প্রকাশিত হল তার জন্য দায়ী আমি নিজে। কারণ, উপন্যাস নির্বাচন, তার পাঠ সংশোধন (কোনও-কোনও ক্ষেত্রে), টাইপ সেটিং, প্রুফ রিডিং—ইত্যাদি কাজ অনেক সময় দাবী করেছে। তবুও দেরির জন্য দ্বিতীয় খণ্ডের জন্য অপেক্ষামাণ পাঠকের কাজে মার্জনা চাইছি।

কেন এই 'শতবর্ষের সেরা রহস্য উপন্যাস' প্রকল্পে হাত দিয়েছিলাম সে-কথা প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় জানিয়েছি—নতুন করে আব বলব না। শুধু এটুকু জানাই, রহস্য-গোয়েন্দা জাতীয় কাহিনির প্রতি আমার যে-টান ছোটবেলা থেকেই টের পেয়েছিলাম সেটা বয়েসের সঙ্গে-সঙ্গে মোটেই কমেনি—বরং বেড়েছে। সেই ভালোবাসা আর আগ্রহ থেকেই এই সংকলন। আজকের ইন্টারনেট আর টিভিব যুগেও যাঁরা রহস্য গল্প-উপনাাস পড়তে ভালোবাসেন এই বই তাঁদের জন্য। যদি এই বই তাঁদের ভালো লাগে তা হলে জানব আমার চেষ্টা কিছুটা মূল্য পেল। কৌতূহলী পাঠকের জন্য এবারেও রয়েছে 'পরিশিষ্ট'—সেখানে লেখক এবং লেখা নিয়ে কিছু তথ্য পেশ করেছি। আর উপন্যাসগুলো মোটামুটিভাবে লেখকদের জন্মসাল অনুসারে সাজাতে চেষ্টা করেছি।

এই বই প্রকাশে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সুবন্ধু ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়ের। আমাকে এই প্রকল্পে সবসময় উৎসাহ এবং আশকারা দিয়েছেন। এ ছাড়া যাঁদের সাহায্যের হাত এই বইয়ের প্রযোজনায় নানানভাবে জড়িয়ে আছে তাঁরা হলেন মৈত্রেয়ী গুহ, বরুণ রায়, শাশ্বত সেন, মানস চক্রবর্তী, শান্তিপ্রিয় বন্দোপাধ্যায়, মানস ভাণ্ডারী, শুভাশিস ঘোষ, সায়ক দেব এবং প্রচ্ছদশিল্পী অমিত চক্রবর্তী। এঁদের সবাইকে আমার ভালোবাসা জানাই। ইতি—

অনীশ দেব



নীহাররঞ্জন গুপ্ত	ঘুম নেই	১১
প্রণব রায়	ভানু গোয়েন্দা জহর অ্যাসিস্ট্যান্ট	১০৫
বিমল কর	হ্রদ	১৬৩
সত্যজিৎ রায়	বাদশাহী আংটি	২৫৭
সমরেশ বসু	দু-মুখো সাপ	৩২১
নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	ভোর রাতের আর্তনাদ	৪০৫
নারায়ণ সান্যাল	সোনার কাঁটা	৪৯৩
সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ	কিছু অলৌকিক	৫৫৯
কবিতা সিংহ	রাত্রি ছিল পিশাচের	৬৩১
অদ্রীশ বর্ধন	রুপোর টাকা	৬৮৯
সুখময় মুখোপাধ্যায়	তির্যক রেখা	৭৫৫
বিমল সাহা	আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়	৮২৩
পরিশিষ্ট		৮৫৩

ঘুম নেই



নীহাররঞ্জন গুপ্ত

এক

কাল রাতেও আবার তুমি কাঁদছিলে, দাদা!

চায়ের টেবিলে এসে টি-পট থেকে কাপে চা ঢালতে-ঢালতে মিতা বললে।

দ্বিতীয় কাপে চিনি মেশাতে-মেশাতে আমি মিতার মুখের দিকে তাকালাম।

আজ কয়েকদিন থেকেই বোন মিতা আমাকে ওই কথাটা বলছে। প্রথম দিন হেসে ওর বক্তব্য থামিয়ে দিয়েছি, দ্বিতীয় দিনও স্বপ্ন দেখেছে বলে কথাটা উড়িয়ে দিয়েছি। কিন্তু আজ আর কেন যেন কোনও প্রতিবাদই আমার কণ্ঠ থেকে বের হল না।

অন্যমনস্কভাবে চায়ের কাপে চামচটা ডুবিয়ে নাড়তে লাগলাম নিঃশব্দে।

চাযের কাপে একটা মৃদু চুমুক দিয়ে মিতা বোধহয় আমাকে চুপ করে থাকতে দেখেই এবারে বললে, তুমি নিজেই একজন বিলেত-ফেরত ডাক্তার, দাদা, তবু বলছি, একবার তুমি কলকাতায় গিয়ে কাউকে কনসাল্ট করে এলে পারতে!

হ্যাঁ, তাই যাব না হয়, কিন্তু সত্যি তুই মিতা, আমাকে রাত্রে কাঁদতে শুনেছিস?

এক-আধদিন নয়, পর-পর কয়েক রাত্রিই তো শুনছি, তুমি ঘুমের মধ্যে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদ।

তোর শোনাটা ভুলও তো হতে পারে, মিতা! কণ্ঠে জোর দিয়েই কথাটা এবারে বলি।

না, ভুল নয়। স্পষ্ট আমি শুনেছি কান্নার শব্দ। প্রথম রাতে কান্নার শব্দ শুনে আমার ঘুম ভেঙে যেতে ব্যাপারটা ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি। কিন্তু দ্বিতীয় রাতে শোনার পর তোমাকে তো বলেছি, কেমন কৌতূহল হল। বিছানা থেকে উঠে পড়লাম। তোমার আর আমার শোওয়ার ঘরের মাঝখানের দরজাটা সেদিন খোলাই ছিল। মনে হল, স্পষ্ট যেন তোমার ঘরের ভেতর থেকেই চাপা কান্নার শব্দটা আসছে। প্রথম তো ভেবেই পাই না, তোমার ঘরের থেকে কান্নার শব্দ আসছে কী করে! তারপর এগিয়ে গিয়ে তোমার বিছানার সামনে দাঁড়াতেই চমকে উঠলাম। দেখি, তুমিই ঘুমের মধ্যে কাঁদছ। ভাবলাম তখন, হয়তো কোনও স্বপ্ন দেখে কাঁদছ। কিন্তু তার পরের এবং তার পরের রাতেও যখন তোমাকে কাঁদতে শুনলাম, তখনই সর্বপ্রথম তোমাকে আমি কথাটা না বলে পারিনি। কিন্তু কথাটা শুনে তুমি আমাকে হেসেই উড়িয়ে দিলে। পরের দিনও বলতে বললে, আমি স্বপ্ন দেখেছি!

মিতার কথায় আর আমি কোনও জবাব দিলাম না। চায়ের টেবিল থেকে নিঃশব্দে উঠে পড়লাম।

বেলা আটটা প্রায় বাজে।

ডিসপেনসারিতে রোগীর ভিড় জমতে শুরু করেছে।

নিজের শয়নঘরে এসে জামা গায়ে দিয়ে ডিসপেনসারিতে যাওয়ার জন্য ড্রাইভারকে গাড়ি বের করতে বললাম।

বাড়ি থেকে সামান্যই দূরে বড় রাস্তার ওপরে আমার ডিসপেনসারি।

দীর্ঘদিন ধরে রাঁচি শহরে আছি আমরা।

বাবা প্রথম যৌবনে কন্ট্রাকটারির কাজ নিয়ে এসেছিলেন রাঁচি শহরে। তারপর এ-শহরের মায়া কাটিয়ে উঠতে পারেননি।

এখানেই একটু নির্জনে শহরের প্রান্তে মনের মতো একটি বাড়ি তৈরি করে বসবাস শুরু করে দেন। সে-ও আজ খুব কম করে ত্রিশ বছর আগেকার কথা।

ভাই-বোন আমরা মাত্র দুটিই, আমি আর মিতা।

মিতা আমার চাইতে প্রায় চোদ্দো বছরের ছোট বয়েসে।

আমার যখন ষোলো বছর ও মিতার মাত্র দু-বছর বয়েস সেই সময় মা মারা যান।

চিরদিন বিহারে মানুষ, বাবাও বিহারেই বলতে গেলে জীবনের দীর্ঘদিন কাটিয়ে বিহারেই ডোমিসাইলড হয়ে গিয়েছিলেন।

মেডিকেল কলেজ থেকে এম. বি. পাস করার পর বিলেতে এম. আর. সি. পি. পরীক্ষা দেওয়ার জন্য যখন প্রস্তুত হচ্ছি সেই সময় বাবার মৃত্যু হয়।

তারপর বিলেত থেকে ফিরে এসে রাঁচি শহরেই প্র্যাকটিস শুরু করলাম, কারণ, বাবার একান্ত ইচ্ছে ছিল ওইখানেই প্র্যাকটিস কবি।

এবং প্র্যাকটিস করতে বসে দেখলাম ভুল করিনি। পিছনে একটা মোটারকমের বিলিতি খেতাব থাকাব দরুন অল্পদিনেই প্র্যাকটিস জমে উঠল।

বাবার আকস্মিক মৃত্যুতে বিলেতে পড়বাব সময় ছাত্রাবস্থায় অর্থের অভাব বেশই হয়েছিল। কারণ, সারাজীবনে বাবা যেমন প্রচুব উপায় করেছিলেন তেমনি খরচও করে গিয়েছিলেন দু-হাতে।

সম্বলের মধ্যে ছিল কেবল রাঁচির ওই বসতবাটিটি ও মার কিছু অলংকার।

বিলেত থেকে ফিরে এসে প্র্যাকটিস কবতে বসে ও প্র্যাকটিসটা না জমে ওঠা পর্যন্ত অর্থের অভাবটা বেশ তীব্রই ছিল। সেসব দিনের কথা ভুলব না।

ইদানীং আর অবিশ্যি সে-অভাবটা নেই।

সংসারও আমাদের ছোট্ট। আমি আর একটিমাত্র ছোট বোন মিতা।

আমিও বিয়ে করিনি, মিতাও করেনি।

বি এ. পাস করে মিতা এখানেই গার্লস স্কুলে চাকবি করছে বছরতিনেক হল।

একই মা-বাপের সন্তান হলেও মিতা ও আমি—আমাদের দুজনের মধ্যে চেহারায ও চরিত্রে একেবারেই কিন্তু মিল নেই।

আমার বং কালো, লম্বা-চওড়া চেহারা, আর এ-ও আমি জানি দেখতে আমি কুৎসিতই। অথচ মিতা আমার নিজের সহোদরা, রোগাটে পাতলা চেহারা, টকটকে গৌর গাত্রবর্ণ এবং চোখ-মুখ অতীব সুশ্রী। ঠিক বিপরীত।

অপরিচিতেরা প্রথমটায় তো বিশ্বাসই করতে চায় না যে আমরা আপন সহোদর ভাই-বোন।

মিতার গলার স্বরটি মিষ্টি।

আমার গলার স্বর কর্কশ, তা-ও আমি জানি।

চট করে আমি মেজাজ খাবাপ করি না। অতি বড় শত্রুর সঙ্গেও খারাপ ব্যবহাব কবি না।

উচিত জেনেও নিষ্ঠুর সত্যি কথাটা বলতে লজ্জা পাই।

অথচ মিতা চট করে মেজাজ খারাপ করে, শত্রুকে দু-চোখে দেখতে পারে না এবং কোনওরূপ দ্বিধা বা সংকোচ না করে স্পষ্ট কথা মুখের ওপর বলে দেয়।

স্থানীয় ডাক্তার হলেও আমার হৃদ্যতা বলে কারও সঙ্গেই বড় একটা কিছু নেই। অর্থাৎ এক কথায় আমি আদৌ মিশুকে নই।

কিন্তু মিতার সঙ্গে শহরের অনেকেরই একটা মধুর হৃদ্যতা তো আছে দেখি।

মিতার বন্ধু ও বান্ধবীর অভাব নেই, আমার সত্যিকারের বন্ধু বলতে এ-শহরে কেউই নেই।

ডিসপেনসারিতে এসে দেখি সেদিন দু-তিনটির বেশি রোগী নেই।

তাদের দেখে ঔষধপত্রের ব্যবস্থা করে দিতে ঘণ্টাখানেকও লাগল না।

পার্টিশন দেওয়া চেম্বারের মধ্যে বসে একটা সিগারেট ধরালাম।

রাঁচি শহরে এবারে পৌষের গোড়াতেই দেখছি শীতটা বেশ জাঁকিয়ে এসেছে। খোলা

জানলাপথে রাস্তার প্রবহমান জনস্রোতের দিকে তাকিয়ে অন্যমনস্কভাবে সিগারেটটা টানতে-টানতে আবার মিতার কথাগুলোই মনের মধ্যে ভেসে ওঠে।

সত্যিই কি আমি রাত্রে বিছানায় শুয়ে ঘুমের ঘোরে কাঁদি।

কিন্তু কেন?

ঘুমের ঘোরে আমি কাঁদতেই বা যাব কেন?

মনের কোথায়ও কোনও দুঃখই তো আমার নেই।

কোনও দুশ্চিন্তাই নেই মনের কোথাও আমার।

অথচ দিন পনেরো থেকে নাকি মিতা রাত্রে আমাকে ঘুমের ঘোরে কাঁদতে শুনেছে।

সুইংডোরের ওপাশে সহসা কিরীটী রায়ের কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

ডাক্তার সেন আছেন নাকি?

কে? মিস্টার রায়। আসুন-আসুন।

কিরীটী রায় এসে ঘরের মধ্যে ঢুকলেন সুইংডোর ঠেলে।

এত সকালে? কী খবর, বসুন-বসুন।

কিরীটী রায় সামনের একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন।

চমৎকার দেহ-সৌষ্ঠব ভদ্রলোকের। প্রথম পরিচয়ের দিন যেমন দেখেছিলাম, আজও তেমন দেখলাম। পরিধানে গেরুয়া পাঞ্জাবি ও সাদা পায়জামা, গায়ে একটা সাদা শাল, পায়ে চপ্পল।

মুখে বর্মা-চুরুট।

কথা বললাম আবার আমিই, তারপর আরও কিছুদিন এখানে আছেন তো?

হ্যাঁ।

সকালে বেড়াতে বের হয়েছিলেন বুঝি?

হ্যাঁ, বেশ লাগে সকাল বেলাটা ঘুরতে এখানে। বলেই একটু থেমে বললেন, একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করব ভাবছিলাম, ডাক্তার সেন। আচ্ছা, এখানকার এক ভদ্রলোকের মুখে শুনেছিলাম পুলকের দাদা জগৎজীবনবাবুও নাকি টি. বি. হয়েই মারা গিয়েছিলেন?

প্রশ্নটা করে কিরীটী রায় আমার মুখের দিকে তাকালেন।

কার মুখে শুনলেন?

ওই যে আমি যে-বাড়িটায় আছি সেই বাড়িরই পাশের বাড়িতে নির্মল চৌধুরী—।

হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছেন। আমার চিকিৎসাতে তো তিনি কিছুদিন ছিলেনও। ওঁদের এক বোনও নাকি টি. বি.-তে মারা গিয়েছিলেন। ইনফেকশনটা বোধহয় ওঁদের দু-ভাইয়ের সেখান থেকেই হয়েছিল। —বললাম আমি।

স্বাভাবিক। তারপর একটু থেমে কিরীটী রায় বললেন, পুলকের দাদাও টি. বি.-তেই তা হলে মারা গেছেন। পুলকের যে টি. বি. হয়েছে সে-কথাটা অবিশ্যি আমি বছর পাঁচেক আগে তারই এক চিঠিতে জেনেছিলাম।

আপনি জানতেন?

হ্যাঁ, এককালে পুলকের সঙ্গে প্রেসিডেন্সিতে বছর দুই একত্রে পড়েছিলাম। সেই সময়েই আমাদের মধ্যে হৃদ্যতার সূত্রপাত। কিন্তু তারপর ওর চিঠিতেই জেনেছিলাম, ও নাকি একেবারে সুস্থ হয়ে গিয়েছে।

হ্যাঁ, হয়েছিলেন।

মাঝখানে বছরখানেক আগে ওর সঙ্গে একবার কলকাতায় দেখা হয়েছিল, তখনও দেখেছিলাম চমৎকার চেহারা। হাসতে-হাসতে আমাকে বললে, রোগ নাকি তার শরীর থেকে পালিয়ে বেঁচেছে।

আমি নিজেও কম আশ্চর্য হইনি, মিস্টার রায়, পুলকবাবুর রোগটা হঠাৎ flare-up করায়। শেষে মাসখানেক তো আমিই চিকিৎসা করেছিলাম। কোনও ঔষধই যেন আর ধরল না।

কিরীটী রায়কে যেন কেমন অন্যমনস্ক মনে হল।

মনে হল, খোলা জানলাপথে বাইরের দিকে অলস দৃষ্টিতে তাকিয়ে যেন কী ভাবছেন।

এককাপ চা হবে নাকি, মিস্টার রায়?

চা! না, ধন্যবাদ—বলেই উঠে পড়লেন মিস্টার রায়।

এবং যেমন ক্ষণপূর্বে হঠাৎ ঘরে ঢুকেছিলেন, তেমনি হঠাৎই যেন আবার ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন।

দুই

কিরীটী রায়ের সঙ্গে আলাপ আমার মাত্র দিন পাঁচেক হবে।

আর আলাপটাও হয়েছিল আমার বোন মিতার মধ্যস্থতায়।

আমাদের বাড়ি 'বিরাম কুটির'-এর পাশ দিয়ে যে অপ্রশস্ত, কাঁচা, পায়ে-চলার রাস্তাটা চলে গিয়েছে তারই সাত-আটখানা পরের বাংলো প্যাটার্নের একতলা বাড়ি 'সানি লজে' উনি দিন দশেক হল এসে উঠেছেন।

ইতিমধ্যে একদিন ওঁকে স্থানীয় তরুণ-তরুণীদের ক্লাব 'সান্ধ্যবাসরে' ওঁরই এখানকার পাশের বাড়ির ভদ্রলোক নির্মল চৌধুরী নিয়ে গিয়েছিলেন। সেখানেই আমার বোন মিতার সঙ্গে নাকি ওঁর আলাপ হয়।

তারপর মিতাই ওঁকে পরের দিন আমাদের বাড়িতে চায়ের আমন্ত্রণ করে এনেছিল। এবং আমার আলাপ ওঁর সঙ্গে সেইদিনই হয়।

মিতার মুখেই শুনেছি উনি একজন বিখ্যাত বেসরকারি সত্যসন্ধানী। অর্থাৎ ইংরেজিতে যাকে বলে প্রাইভেট ডিটেকটিভ।

আমাদের দেশে কোনও প্রাইভেট ডিটেকটিভ আছেন বলে তো কই কখনও শুনিনি। তবে ওঁর নাকি খুব নাম।

ভদ্রলোকটির চোখমুখের দিকে তাকালেই অবিশ্যি বোঝা যায়, সেখানে একটা তীক্ষ্ণ বুদ্ধির ছাপ রয়েছে।

তবে লোকটিকে যেন কেমন একটু গম্ভীর ও দাম্ভিক প্রকৃতির বলেই মনে হয়।

কিরীটীবাবুর ক্ষণপূর্বের কথাগুলো আবার মনে পড়ল। আশ্চর্য, পুলকজীবন তাহলে কিরীটী রায়ের এককালে সহপাঠী ছিলেন এবং হৃদ্যতাও হয়েছিল!

পুলকজীবনের দাদা জগৎজীবনবাবুর সঙ্গে অবিশ্যি আমার অনেকদিন থেকেই আলাপ ছিল, এবং আলাপটা আমি বিলেত থেকে ফিরে এসে এখানে প্র্যাকটিস শুরু করার পর থেকে রীতিমতো হৃদ্যতাতেই পরিণত হয়েছিল।

সন্ধ্যার পর ডিসপেনসারির কাজ শেষ করে বাড়ি ফেরার পথে প্রায়ই জগৎজীবনের ওখানে ঘণ্টাখানেক আড্ডা দিয়ে যাওয়াটা তো রীতিমতো একটা আমার অভ্যাসেই দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।

চমৎকার মিশুকে লোক ছিলেন জগৎজীবনবাবু।

বিয়ে-থা করেননি। আপনার জন বলতে সংসারে ছিল ওই একটিমাত্র ভাই—পুলকজীবন। কলকাতায় পাটের দালালি করতেন জগৎজীবন।

এবং শোনা যায় দালালি করে রীতিমতো দু-পয়সা উপার্জনও করেছিলেন। কিন্তু হঠাৎ

টি. বি. হওয়ায় কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে এখানে চলে এসেছিলেন কিছুদিন থাকবেন বলে। শেষটায় পুলকেরই মুখে শুনেছিলাম, রাঁচি জায়গাটা নাকি ভারী পছন্দ হয়ে যাওয়ায় এখানেই একটা বাড়ি কিনে স্থায়ীভাবে থেকে যান।

সে-ও আজ বছর দশেক আগেকার কথা। তারপর সুস্থ হওয়ার পর স্টেশন রোডেই একটা অর্ডার সাপ্লাইয়ের অফিস খোলেন। কাজকর্ম ভালোই হত। ছোট ভাই পুলকজীবন প্রায় আট বছরের ছোট জগৎজীবনবাবুর থেকে। ভাইকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন জগৎজীবন। পুলকজীবন ইংরেজি সাহিত্যে এম. এ. পাশ করে বোম্বাইয়ে অধ্যাপনার কাজ করছিলেন একটি কলেজে।

বছর দুই আগে হঠাৎ জগৎজীবনবাবুর পুরাতন টি. বি. রোগটা নতুন করে দেখা দিল এবং মাসতিনেক ভুগে তিনি মারা গেলেন। জগৎজীবনের অসুখটার যখন বাড়াবাড়ি চলেছে, ছোট ভাই তার পেয়ে এখানে চলে আসেন। তারপর আর তিনিও বোম্বাইয়ে ফিরে যাননি। চাকরি ছেড়ে দিয়ে দাদার অফিসটাই দেখাশোনা করছিলেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত মাসতিনেক আগে তাঁকেও ধরল ওই রোগে এবং মাত্র দিন পনেরো হল পুলকজীবন মারা গিয়েছেন।

জগৎজীবন ও তাঁর ভাই পুলকজীবনের কথাই ভাবছিলাম। কমপাউন্ডার সতীশ এসে ঘরে ঢুকল, স্যার।

হ্যাঁ—।

সূর্যপ্রসাদবাবু সকালে ফোন করেছিলেন, তিনি—।

স্যার সূর্যপ্রসাদ ফোন করেছিলেন?

হ্যাঁ, বললেন সকালে চার-পাঁচবার নাকি আপনার বাড়িতে ট্রাই করেছিলেন তিনি—।

তা হবে। কাল রাত থেকেই বাসার ফোনটা আউট-অফ-অর্ডার হয়ে আছে! তা কিছু বলেছেন?

হ্যাঁ বলেছেন, পারেন যদি আজ একবার তাঁর ওখান হয়ে যাবেন।

ঠিক আছে।

সতীশ চলে গেল ঘর থেকে।

হাতের সিগারেটটা নিভে গিয়েছিল, আর একটা সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করলাম।

সূর্যপ্রসাদ হঠাৎ যেতে বলেছেন কেন? কারও অসুখ-বিসুখ নয় তো? বয়েস হলেও সূর্যপ্রসাদের আমি গত দেড় বৎসরের মধ্যে সামান্য সর্দি-জ্বরও হতে দেখিনি।

চমৎকার স্বাস্থ্য ভদ্রলোকের। এ-বয়েসে ওরকম স্বাস্থ্য বড় একটা দেখাও যায় না।

সূর্যপ্রসাদ গুপ্ত রাঁচি শহরে বসবাস করছেন তা প্রায় বছর ষোলো হল।

পুরাতন বাসিন্দা এ-শহরের।

ভদ্রলোকের শোনা যায় নাকি প্রচুর ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্স। এবং তাঁর ব্যাঙ্কে মজুত টাকার অঙ্ক সম্পর্কে এ-শহরের অনেকেই অনেক কথা বলে। কেউ বলে বিশ, কেউ বলে দশ লাখ।

আমাদের বাড়ি থেকে আধমাইলটাক দূরের বিরাট বাড়িটিই তাঁর। বাড়িটা এককালে পূর্ববঙ্গের এক জমিদারের ছিল। এবং খালিই পড়ে থাকত বেশিরভাগ সময়।

সূর্যপ্রসাদ এসে বাড়িটা কিনে প্রচুর অর্থব্যয় করে নিজের পছন্দমতো সেটাকে চমৎকার বাসোপযোগী করে নেন।

সূর্যপ্রসাদ সম্পর্কে একটা গুজব শোনা যায়, কোথাকার কোন এক নেটিভ স্টেটের নাকি তিনি দেওয়ান বাহাদুর ছিলেন। কী কারণে স্টেটের মহারাজার সঙ্গে বিবাদ হওয়ায় রাতারাতি চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে আসেন। এবং কলকাতায় কিছুদিন বসবাস করে মন না বসায় শেষপর্যন্ত এখানে এসে রাঁচি শহরটি পছন্দ হওয়ায় এখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে দেন।

ভদ্রলোকের বর্তমান বয়েস ষাট-পঁয়ষট্টির বেশি হবে না। আগেই স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে। একটি মাত্রই সন্তান—ছেলে সমর।

একটিমাত্র ছেলে হলেও সূর্যপ্রসাদের সংসারটি কিন্তু ছোট নয়।

ছোট ভাই রাধিকাপ্রসাদ এককালে খুলনায় ওকালতি করতেন। কিন্তু বড় সংসার ও পসারও তেমন কিছু না হওয়ায় বৎসর দুই হল তিনিও সপরিবারে এসে রাঁচিতে ভাইয়ের আশ্রয়েই ডেরা বেঁধেছেন কায়েমিভাবে।

সূর্যপ্রসাদের চাইতে বয়েসে রাধিকাপ্রসাদ আট-নয় বৎসরের ছোট হলেও, দেখায় কিন্তু তাঁকে তাঁর দাদার চেহারার তুলনায় অনেক বেশি বৃদ্ধ। বোধহয় দারিদ্র্য ও অভাবেই শরীরটা তাঁর অকালে বুড়িয়ে গিয়েছে।

রাধিকাপ্রসাদের স্ত্রী গত বৎসর এখানেই মারা গিয়েছেন। চার ছেলে ও চার মেয়ে। তার মধ্যে চার মেয়ের বিয়ে হয়ে গিয়েছে। বড় দুটি ছেলে অমল ও কমল কোথায় যেন রেলে চাকরি করে। তাদের বাপের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই। তৃতীয় ছেলে বিমল গত বৎসর বি. এ. পাস করেছে। এখানেই থেকে চাকরি-বাকরির চেষ্টায় আছে। সর্বকনিষ্ঠ সুবল লেখাপড়ার ধার দিয়েও যায়নি, শরীরচর্চা, ডন, বারবেল ইত্যাদি নিয়েই সর্বদা ব্যস্ত। বিমল শান্ত স্বভাবের ও সুবল চঞ্চল ও অস্থির প্রকৃতির।

সূর্যপ্রসাদের একমাত্র ছেলে সমর।

বিরাট ধনী বাপের একমাত্র আদুরে ছেলে হওয়ায় এবং অল্প বয়েসে মা মারা যাওয়ায সমর লেখাপড়ায় স্কুলের চৌকাঠও ডিঙোতে পারেনি। তবে গানবাজনার নেশা ছাড়াও সেতারবাদ্যে কিন্তু সে ইতিমধ্যে যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করেছে। এবং গানবাজনার নেশা ছাড়া আরও একটা নেশা তার মধ্যে দেখা দিয়েছে—জুয়া খেলার। জুয়ার নেশা থেকে ছেলেকে নিবৃত্ত করবার জন্য চেষ্টা করেছিলেন সূর্যপ্রসাদ, কিন্তু সক্ষম হননি। এবং ওই জুয়ার নেশার জন্য সমরের যে প্রায়ই টাকার প্রয়োজন হত সেটা আমি জানতাম। যার ফলে প্রায়ই এর ওর কাছে সমরকে ধার করতে হত। আমিও অনেক সময় তাকে ধার দিয়েছি। লেখাপড়া বিশেষ না হলেও এবং জুয়ার নেশা থাকলেও মানুষ হিসেবে কিন্তু সমর এখানকার সকলেরই প্রিয়। তার মিষ্টি-মধুর ব্যবহারের জন্যে তাকে ভালোবাসে না এ-শহরে এমন কেউ নেই। বিশেষ করে মেয়েদের মহলে সমরের যে একটা বিশেষ প্রিয় স্থান আছে—সেটার মূলে হচ্ছে গানবাজনার খ্যাতি ও তার চমৎকার সুশ্রী দেহ-সৌষ্ঠব। অমন চমৎকার দেহশ্রী চট করে বড় একটা কারও নজরে পড়ে না। আমাদের বাড়িতে সমরের যথেষ্ট যাতায়াত এবং তার মূলে যে আমার বোন মিতা সে-সংবাদটা আমার অজ্ঞাত নয়। মিতারও যে সমরের ওপর বিশেষ দুর্বলতা আছে সেটাও বহুদিন বহু ব্যাপারেই আমি টের পেয়েছি। সূর্যপ্রসাদ আমাকে বিশেষ করে দেখা করতে বলেছেন—সতীশের মুখে কথাটা শোনা অবধি একটা কথা বিশেষ করে আমার মনে হচ্ছিল।

তবে কি সমরের ব্যাপারেই সূর্যপ্রসাদ আমাকে দেখা করতে বলেছেন।

দিন কুড়ি হবে সমর নিরুদ্দিষ্ট। তার কোনও পাত্তাই পাওয়া যাচ্ছে না। কানাঘুষায় শুনেছি, সমর নাকি সূর্যপ্রসাদের সই জাল করে হাজার পাঁচেক টাকা তার বাপের ব্যাঙ্ক থেকে তুলে নিয়ে গা-ঢাকা দিয়েছে। ইদানীং সমরের জুয়া খেলার জন্যে কিছু ধার হয়ে গিয়েছিল জানতাম কিন্তু তাই বলে বাপের সই জাল করে সে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলবে এমন প্রকৃতির ছেলে তো সে নয়।

তবু সূর্যপ্রসাদ যখন ডেকে পাঠিয়েছেন, একবার যেতে হবে তাঁর ওখানে।

সমরের কথাই ভাবতে-ভাবতে ডিসপেনসারি থেকে বের হলাম।

গাড়িতে উঠতে যাব, ড্রাইভার রামরূপ বললে, গাড়ি স্টার্ট নিতে আবার গোলমাল করছে, স্যার—।

তা হলে কী করবে! নন্দ মিস্ত্রির ওখানে নিয়ে যাও না হয় গাড়িটা, বললাম।

ও তো এই নিয়ে তিনবার সারিয়ে দিল। আমাকে যদি একদিনের ছুটি দেন তো হাজারিবাগে একজন ভালো মিস্ত্রি আছে, নিজে আমি তাকে গিয়ে একেবারে সঙ্গে করে নিয়ে আসি।

বেশ, তাই না হয় যাও।

এক্ষুনি তা হলে সাড়ে ন'টার বাসে চলে যাই, স্যার?

তাই যাও।

ড্রাইভারকে বিদায় দিয়ে হেঁটেই বাজারের দিকে চললাম।

কিছুদূর এগুতেই পরিচিত কণ্ঠস্বরের ডাকে চমকে তাকালাম।—ডাক্তার সেন?

এই যে মিস্টার গুপ্ত—আপনি আমাকে ফোন করেছিলেন শুনলাম?

হ্যাঁ, ডাক্তার।

সমরের কোনও খোঁজখবর পেলেন? নিজেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে প্রশ্নটা করলাম।

না। সে যাক, তোমার সঙ্গে আমার কিছু জরুরি কথা ছিল, ডাক্তার।

বেশ তো, আমি বিকেলের দিকে যাব'খন।

বিকেলে নয়। একটু নিরিবিলিতে সময় নিয়ে কথাটা বলতে চাই। বরং আজ রাত্রে তুমি আমার ওখানেই ডিনার খাবে। ডিনারের পরই কথাবার্তা হবে'খন। বলদেববাবু, মেজর কৃষ্ণস্বামীকেও বলেছি ডিনার খেতে—।

বেশ, যাব।

হ্যাঁ, এসো।

বলে আর দাঁড়ালেন না সূর্যপ্রসাদ।

সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন।

দীর্ঘ বলিষ্ঠ চওড়া চেহারা সূর্যপ্রসাদের। সত্তরের কাছাকাছি বয়েস হয়েছে তবু হাঁটেন এখনও সোজা হয়ে।

উঃ, হাড়কৃপণ লোকটা! এত টাকা—ইচ্ছা করলে আট-দশটা গাড়ি রাখতে পারেন, তবু পায়ে হেঁটে সব জায়গায় যাবেন।

ভগবানের বিচার বলব অদ্ভুত!

কাউকে দেবেন তো একেবারে দু-হাতে ঢেলে দেবেন।

আর যাকে দেবেন না তো একেবারেই দেবেন না।

তিন

বাড়ি ফিরতে-ফিরতে বেলা প্রায় সাড়ে এগারোটা হয়ে গেল।

রবিবার বলে মিতার স্কুল নেই।

মিতা বাইরের ঘরেই একটা সোফার ওপরে বসে উলের কী একটা যেন বুনছিল। আমার পদশব্দ পেয়ে মুখ তুলে তাকাল।—দাদা, একটা ভালো সংবাদ আছে।

মিতার মুখের দিকে চেয়ে কোনও কথা না বলে মৃদু হেসে ভিতরের দিকে এগিয়ে যেতেই পিছন থেকে মিতা বলে ওঠে, চলে যাচ্ছ যে। সত্যি বলছি, গুড নিউজ।

কালা তো নই, শুনতে পাচ্ছি।—বলে দু-পা এগিয়ে গেলাম।

মিতা এবার সোফা থেকে উঠে আমার পিছনে এসে দাঁড়ায়। আমি এসে আমার ঘরে প্রবেশ করলাম, মিতাও পিছনে-পিছনে এসে সেই ঘরে ঢুকল।

গেস করতে পার, গুড নিউজটা কী, দাদা?

গা থেকে জামাটা খুলতে-খুলতে বললাম, তুই না হয় ইদানীং একজন হবু গণৎকার হয়ে উঠেছিস, কিন্তু আমার পেশা হচ্ছে ডাক্তারি!

সত্যি, তুমি একেবারে হোপলেস, অ্যাবসলুটলি হোপলেস!

তবু আমি নিরুত্তর।

জানি, আন্দাজও করতে পারবে না। সমর এই রাঁচি শহরেই আছে—।

সমর!

জানতাম, তোমার কাছে সারপ্রাইজই মনে হবে নিউজটা।

কী আবোল-তাবোল বকছিস, মিতা।

একেবারেই আবোল-তাবোল নয়। সত্যিই সমর রাঁচি শহরেই বর্তমানে আছে।

রাঁচি শহরে আছে?

হ্যাঁ, আজ সকালবেলা তুমি বের হয়ে যাওয়ার পরই কয়েকটা জিনিস কিনতে আমি বাজারের দিকে গিয়েছিলাম, মতি স্টোর্স থেকে জিনিসগুলো কিনে বের হচ্ছি, রাস্তার উলটোদিকে যে-রেস্টুরেন্টটা আছে তারই পাশের পান-সিগারেটের দোকানের সামনে আমি তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেই তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাই।

তারপর?

কিন্তু হঠাৎ ওই সময় উলটোদিক থেকে একটা গাড়ি এসে পড়ায় তাকে আর দেখতে পেলাম না। চট করে সে যে কোনদিকে চলে গেল—।

যেমন তুই, কাকে না কাকে দেখেছিস! অমনি ভাবলি সে বুঝি সমর।

কী বলছ তুমি, দাদা, সমরকে চিনতে আমি ভুল করব?

নিশ্চয়ই ভুল করেছিস। নইলে—।

না দাদা, ভুল আমি করিনি। তারপরই কতকটা যেন আত্মগতভাবে মিতা মৃদুকণ্ঠে বলে, পুয়োর সমর! ঝোঁকের মাথায় একটা অন্যায় কাজ করে ফেলে এখন হয়তো রিপেনটেড। কে জানে হয়তো হাতের টাকা-পয়সা সব ফুরিয়ে গিয়েছে। যেরকম ময়লা জামাকাপড় গায়ে দেখলাম—।

আমি আর সেখানে দাঁড়ালাম না।

স্নান করবার জন্যে বাথরুমের দিকে অগ্রসর হলাম।

কিন্তু স্নান করতে-করতেও মিতার মুখে শোনা ক্ষণপূর্বের কথাগুলোই ভাবছিলাম।

আশ্চর্য।

সত্যিই কি তা হলে সমর রাঁচি শহরের মধ্যেই কোথাও-না-কোথাও গা-ঢাকা দিয়ে আছে? কিন্তু তারই বা কী প্রয়োজন ছিল? সূর্যপ্রসাদ যতই কঠোর প্রকৃতির লোক হোন না, হাজার হলেও সমর তাঁর আত্মজ তো। মাতৃহারা একমাত্র সন্তান।

সূর্যপ্রসাদ কথাটা শুনলে হয়তো আশ্চর্যই হবেন। কারণ, তিনি নিশ্চয়ই এ-কথা জানেন না। আর যদি জানতেনই, আমাকে কি কথাটা বলতেন না?

সত্যিই বেচারি সমর।

কিন্তু মিতা দেখতে ভুল করেনি তো?

ভুলও তো সে দেখে থাকতে পারে। নিশ্চয়ই তাই। নইলে সূর্যপ্রসাদ কি এই ক'দিন ধরে সমরকে কম খুঁজছেন।

না, না—মিতা নিশ্চয়ই দেখতে ভুলই করেছে।

কিন্তু সূর্যপ্রসাদ আমার সঙ্গে কী এমন প্রয়োজনীয় আলোচনা করতে চান?

বলবেন আবার নিরিবিলিতে, সময় লাগবে আলোচনাটা করতে।

কী জানি কী আলোচনা আমার সঙ্গে তিনি করতে চান?

*

রাত সাড়ে সাতটা নাগাদ ডিসপেনসারি থেকেই সূর্যপ্রসাদের গৃহে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে বের হলাম।

একে প্রচণ্ড শীত পড়েছে, তার ওপরে আবার চলছে হাওয়া। চোখে-মুখে যেন ছুঁচ বিঁধছে। গায়ের গরম লংকোটের কলারটা উলটে দিলাম। মাথার টুপিটাও একটু নীচের দিকে টেনে দিলাম।

ডিসপেনসারি থেকে সূর্যপ্রসাদ গুপ্তর বাড়ি প্রায় আধমাইলটাক তো হবেই।

গাড়িটা বিগড়েছে, হেঁটে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই।

বড় রাস্তার ঠিক ওপরে সূর্যপ্রসাদের 'লিলি কটেজ' নয়। খানিকটা ভেতরের দিকে। জায়গাটাও নির্জন।

দুপুরের দিক থেকেই আকাশটা মেঘাচ্ছন্ন ছিল। কিছুদূর এগুতেই টিপ-টিপ করে বৃষ্টি শুরু হল।

বেশ দ্রুতই পা চালালাম।

শীত, বৃষ্টি ও হাওয়া সব মিলে যেন ঠান্ডাটা আরও তীব্র করে তোলে।

টিপ-টিপ বৃষ্টি এবারে বড়-বড় ফোঁটায় শুরু হল।

আরও দ্রুত পা চালালাম।

একটা উঁচু জমির উপরে সূর্যপ্রসাদ গুপ্তর 'লিলি কটেজ'।

গেট পার হয়েই বাড়ির সামনে একটি চমৎকার ফুলের বাগান। নানাজাতীয় রং-বেরঙের মরশুমি ফুলের সমারোহ, বৈচিত্র্য।

আমি আদৌ কবিপ্রকৃতির নই, একান্ত বাস্তববাদী। তবু যখনই সূর্যপ্রসাদের গেট দিয়ে বাগানে প্রবেশ করেছি, দু-চোখ যেন জুড়িয়ে গিয়েছে।

বাড়ির গেটটা খোলাই ছিল।

কাঁকর-বিছানো পায়ে-চলা-পথটা সামনের ঝুল-বারান্দার নীচে গিয়ে মিশেছে। সামনেই দু-দিকে ঘোরানো বারান্দা। সেখানেও সব ফুলের টব দিয়ে সাজানো।

বাইরে থেকে বাড়িটার দিকে দৃষ্টিপাত করলেই যেন পরিচ্ছন্ন একটা রুচির আভিজাত্য সর্বত্র চোখে পড়ে।

বারান্দায় একটা অল্পশক্তির বিদ্যুৎবাতি জ্বলছিল। সেখানে কোনও মানুষজন দেখতে পেলাম না।

সামনেই পার্লার।

পার্লারের দরজাটা ভেজানোই ছিল। দরজা ঠেলে ভেতরে প্রবেশ করেই কিন্তু থমকে দাঁড়ালাম।

পার্লারের আলোটা নেভানো। ঘরটা অন্ধকার। কিন্তু বাঁ-পাশে যে মাঝারি আকারের ঘরটা তারই দরজার ঘষা কাচের ভেতর দিয়ে ওপাশের ঘরের মধ্যে একটা আলোর আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

কয়েক মুহূর্ত সেই অন্ধকার ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে রইলাম।

সহসা একটা কথা মনে হতে নিঃশব্দে সেই পাশের ঘরের বন্ধ দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম।

ল্যাচ-কিটা ঘোরাতেই কাচের দরজাটা খুলে গেল।

এ-বাড়ির সব কিছুই আমার অত্যন্ত পরিচিত, কারণ বহুবার এ-বাড়িতে আমি আসা-যাওয়া করেছি।

ঘরের আলোটা জ্বলছে। কিন্তু ঘরের মধ্যে জনপ্রাণীও নেই।

ঘরের মেঝেতে দামি কার্পেট বিছানো এবং চারপাশের আলমারিতে ইংরেজি বাংলা নানা ধরনের বই সাজানো।

ঘরের মধ্যস্থলে খান-দুই সোফা ও একটি সেন্টার টেবিল।

বই পড়া সূর্যপ্রসাদের প্রচণ্ড নেশা। এটা তাঁর লাইব্রেরি ঘর। লাইব্রেরি ঘরেরই সংলগ্ন পশ্চিমদিকে আর-একটি ছোট ঘর আছে। এবং দুই ঘরের মধ্যবর্তী দরজাপথে কোনও কপাট নেই, আছে কেবল একটি পরদা ঝোলানো।

পার্লার সংলগ্ন পশ্চিম দিককার ওই ঘরটি জানি আকারে ছোট। এবং ঘরটিকে একটি মিউজিয়াম বললেও অত্যুক্তি হয় না। কারণ, সূর্যপ্রসাদের যেমন বই পড়ার নেশা তেমনি আর-একটি নেশা হচ্ছে তাঁর নানাধরনের দুষ্প্রাপ্য জিনিস—কিউরিও সংগ্রহ করা। ওই ঘরটির মধ্যে সেই সব কিউরিওগুলিই সযত্নে সাজানো আছে।

আর এ-ও আমি জানতাম, সূর্যপ্রসাদের অবসরজীবনের বেশিরভাগ সময়ই কাটে হয় এই লাইব্রেরি ঘরে, না হয় ওই পাশেরই মিউজিয়াম ঘরে।

তবে কি সূর্যপ্রসাদ ওই ঘরেই আছেন? নচেৎ এ-ঘরে এসময় আলো জ্বলছে কেন?

পাশের ঘরটার দিকে এগুতে যাব, হঠাৎ ওইসময় খুট করে একটা শব্দ এল সেই ঘর থেকে এবং পরক্ষণেই দুই ঘরের মধ্যবর্তী দরজার পরদাটা সরিয়ে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল রাধিকাপ্রসাদের ছোট ছেলে সুবল।

এবং এ-ঘরে পা দিয়েই ঘরের মধ্যে আমাকে নিঃশব্দে দণ্ডায়মান দেখে যেন থমকে দাঁড়িয়ে গেল।

ডাক্তার সেন, আপনি! গলার স্বরে সুবলের কেমন যেন একটু দ্বিধা।

মৃদুকণ্ঠে সুবলের দিকে তাকিয়ে বললাম, হ্যাঁ, আজ যে এখানে রাত্রে আমার ডিনারের নিমন্ত্রণ—।

হ্যাঁ, তাই আবদুলের কাছে শুনেছিলাম বটে। তা ওপরে যান। বলদেববাবু ও মেজব কৃষ্ণস্বামী এসেছেন। সকলে বসে জেঠামণির ঘরেই একটু আগে দেখেছি গল্প করছেন।

একটানা সুবল কথাগুলো যেন ছেদহীনভাবে বলে গেল।

এবং কেমন যেন আমার মনে হল সুবল আমাকে ওপরে পাঠাবার জন্যে বেশ একটু ব্যস্ত হয়ে উঠেছে আর তার কথাবার্তায় ও হাবভাবে যেন সেই ব্যস্ততাটাই প্রকাশ পাচ্ছে।

সুবলের চোখের দৃষ্টিটাও যেন মনে হল একটু চঞ্চল, অস্থির।

আচ্ছা আমি আসি—বলে আর দ্বিরুক্তি না করে একটু যেন দ্রুতই সুবল আমার পাশ কাটিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেল পরক্ষণেই।

আমি কিন্তু ঘরের মধ্যে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম তারপরও।

সহসা সুবল ঘর ছেড়ে চলে যেতেই একটা কথা আমার মনে হল, এই ঘরে পরদা তুলে প্রবেশের ঠিক পূর্বমুহূর্তে কীসের যেন ঠুক করে একটা শব্দ শুনতে পেয়েছিলাম। এবং শব্দটা যেন মনে হয়েছিল একটা ছোট বাক্সের ডালা বা ওই ধরনের কিছু বন্ধ করবার মতোই একটা শব্দ, আর ঘরে প্রবেশের সঙ্গে-সঙ্গে আমাকে দেখে সুবল যেন একটু থতমত খেয়ে গিয়েছিল বলেই মনে হল। তারপর তার অস্থিরতা এবং তাড়াতাড়ি ঘর ছেড়ে একটা কৈফিয়ত দিয়ে চলে যাওয়া, সব কিছু জড়িয়ে মনে হল সুবল যেন এই সময় আমাকে ঠিক ওই ঘরের মধ্যে আশা করেনি।

কিন্তু কেন?

সত্যি, মানুষের মন কী সন্দিগ্ধ!

শেষপর্যন্ত কৌতূহলটা যেন কিছুতেই আমি এড়িয়ে যেতে পারলাম না। পরদা তুলে নিঃশব্দে আমি পশ্চিমের ঘরটায় গিয়ে প্রবেশ করলাম।

ঘরটার মধ্যে কেমন যেন একটা সোঁদা-সোঁদা গন্ধ।

বলা বাহুল্য, ঘরের মধ্যে তখনও আলোটা জ্বলছিল।

ঘরের চারদিকে একবার তাকালাম। কেন তাকালাম তা অবিশ্যি বলতে পারি না। কোনও

সন্দেহ? না, তাই বা কীসের?

পূর্বেই বলেছি, ওটা সূর্যপ্রসাদের মিউজিয়াম।

ঘরের দেওয়ালের চারপাশে কাচের শো-কেস ও র‍্যাকে পুরাতন দিনের সব বিচিত্র কিউরিও সাজানো।

ভাঙাচোরা পাথরের মূর্তি, শিলালিপি, ধাতুপাত্র, অস্ত্র, মুদ্রা, পুঁথি ইত্যাদি বিভিন্ন দ্রব্যসম্ভার।

মাঝখানে ছোট একটি গোল টেবিল ও খান-দুই নিচু ধরনের আরামকেদারা।

এই ঘরে পূর্বে আরও বহুবার আমি এসেছি।

ঘরের চারদিকে একবার চোখ বুলালাম। এবং মনে হল যেখানকার যা সবই যেন তেমনই আছে। ওই যে ভাঙা পাথরের নৃসিংহ মূর্তিটি, তার পাশে আলিঙ্গনাবদ্ধ কৃষ্ণ-রাধা, ডানপাশের সেলফে হরগৌরীর মূর্তি, তারই পাশে অর্ধনারীশ্বর—কিন্তু এ-ঘরের পশ্চাতের বাগানের দিককার জানলার ওই কপাট দুটো খোলা কেন?

এই সময় ঘরের ওই গরাদহীন জানলার কপাট দুটো হা-হা করছে খোলা। আশ্চর্য!

এ-ঘর সম্পর্কে, যতদূর আমি জানি, সূর্যপ্রসাদ অত্যন্ত সতর্ক। বাড়ির কাউকেই বড় একটা এ-ঘরে কখনও প্রবেশ করতে দেন না, এ-ও আমি জানি।

তবে! তা ছাড়া সুবলই বা এই সময় একাকী আলো জ্বেলে এই ঘরের মধ্যে কী করছিল একটু আগে?

আর কেনই বা এ-সময়ে এ-ঘরে এসেছিল?

চার

সুবল!

সত্যি, সুবলের এ-ঘরে কী এমন দরকার পড়েছিল এ-সময়?

আর ওই জানলাটাই বা খোলা কেন? সুবলই কি তবে জানলাটা খুলেছিল? এবং ওই জানলাপথেই একটু আগে ঘরে প্রবেশ করেছিল, যার শব্দই আমি ক্ষণপূর্বে শুনেছিলাম? না, না—তাই বা হতে যাবে কেন?

এই বাড়িরই ছেলে সুবল, এ-ঘরে যদি কোনও কাজ তার থাকবেই, সে জানলাপথেই বা এ-ঘরে প্রবেশ করতে যাবে কেন?

অকস্মাৎই যেন ওই সময় একটা কথা মনে পড়ে। সুবল একটু আগে এ-ঘরে যখন এসে ঢুকেছিল, ওর চোখে, মুখে ও চুলে বৃষ্টির জল লেগেছিল দেখেছিলাম।

তবে কি—?

সঙ্গে-সঙ্গে ঘরের মধ্যে আরও একটা জিনিস আমায় আকর্ষণ করল।

দক্ষিণ দিককার দেওয়াল ঘেঁষে স্ট্যান্ডের ওপরে বসানো ভাঙা শ্বেতপাথরের বুদ্ধমূর্তিটার ঠিক পাশেই একটা স্ট্যান্ডের ওপরে রক্ষিত চন্দনকাঠের বাক্সটা যেন আমার দৃষ্টিকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করে।

বাক্সের ডালাটা ঠিক ভালো করে মুখে-মুখে বন্ধ হয়নি। খানিকটা ফাঁক হয়ে আছে যেন।

কী ভেবে নিঃশব্দে এগিয়ে গেলাম বাক্সটার কাছে।

ক্ষণপূর্বের কৌতূহলটা মনের মধ্যে তখন যেন আবার দানা বেঁধে উঠছে।

ওই বাক্সটার মধ্যে হাতির দাঁতের বাঁটওয়ালা চামড়ার খাপে ভরা ধারালো একটা ছুঁচলো মেক্সিকান ছোরা আছে আমি জানি।

ছোরাটা একদিন সূর্যপ্রসাদ আমাকে দেখিয়েছিলেনও।

ওঁর বন্ধু মেজর কৃষ্ণস্বামী, বর্তমানে তিনি এই শহরেই একটা বাড়ি কিনে তাঁর বাঙালি স্ত্রীসহ রিটায়ার্ড লাইফ অতিবাহিত করছেন সূর্যপ্রসাদেরই অনুরোধে। বহুদিনের বন্ধুত্ব উভয়ের মধ্যে। গত মহাযুদ্ধের সময় এককালে মেজর কৃষ্ণস্বামী যখন যুদ্ধের চাকরি-ব্যাপদেশে মেক্সিকোতে ছিলেন, তখন ওই ছোরাটা কিনে উপহার পাঠিয়ে দিয়েছিলেন বন্ধু সূর্যপ্রসাদকে। এবং চন্দনকাঠের সুন্দর কাজ করা বাক্সটাও তিনিই একবার মহীশূরে বেড়াতে গিয়ে কিনে এনে ওঁকে দিয়েছিলেন। সযত্নে তাই সূর্যপ্রসাদ ওই বাক্সের মধ্যেই ছোরাটা রেখে দিয়েছেন।

এগিয়ে গিয়ে বাক্সের ডালাটা ধীরে-ধীরে তুললাম।

কিন্তু এ কী! চমকে উঠলাম। বাক্সের মধ্যে ছোরাটা তো নেই!

ছোরাটা কি তবে সূর্যপ্রসাদ অন্যত্র কোথাও রেখে দিয়েছেন?

ভাবতে-ভাবতেই অন্যমনস্ক ভাবে বাক্সের ডালাটা বোধহয় বন্ধ করেছিলাম। খুট করে একটা মৃদু শব্দ হতেই যেন চমকে উঠি।

হঠাৎ মনে হল, সুবল পার্লারে ঢোকবার পূর্বমুহূর্তে ঠিক যেন এইরকমই শব্দ একটা আমার কানে এসেছিল।

কী খেয়াল হল, অন্যমনস্ক ভাবে দু-তিনবার ডালাটা খুলে আবার বন্ধ করে শব্দটা পরীক্ষা করলাম।

আবার ঘরের চারিদিকে একবার তাকালাম।

না, কেউ কোথাও নেই।

বাইরের অন্ধকার বাগান থেকে ঝিঁঝির একটা একঘেয়ে ঝিঁঝি শব্দ শোনা যাচ্ছে!

ধীরে-ধীরে চন্দনকাঠের বাক্সের ডালাটা বন্ধ করে ঘরের আলোটা নিবিয়ে দিয়ে বের হয়ে এলাম ঘর থেকে।

অন্ধকারেই পার্লারটা অতিক্রম করে দোতলায় ওঠবার সিঁড়ির মুখে এসে দাঁড়ালাম। সহসা ওই সময় পদশব্দ পেয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে দেখি, সূর্যপ্রসাদের খাসভৃত্য আবদুল সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে।

প্রায় দীর্ঘ পনেরো বৎসর আবদুল সূর্যপ্রসাদের এখানে কাজ করছে শুনেছি। বয়েস হয়েছে। পাকা চুল-দাড়ি। লম্বা রোগাটে চেহারা।

অত্যন্ত বিশ্বস্ত নাকি লোকটা। এবং একাধারে ভৃত্য ও বাবুর্চি। সূর্যপ্রসাদ, বলাই বাহুল্য, চিরদিনই একটু সাহেবিভাবাপন্ন।

যাই হোক, এ-বাড়িতে আবদুলের বিশেষ একটা স্থান আছে।

ডক্টরসাব! কখন এলেন? আবদুল প্রশ্ন করল।

এই আসছি। তোমার সাহেব কোন ঘরে?

ওপরে তাঁর ঘরে। মেজর সাব, বলদেববাবু সবাই আছেন—।

আমি আর দ্বিরুক্তি না করে সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠতে লাগলাম।

আবদুল নীচে নেমে গেল।

সিঁড়ি দিয়ে উঠে দোতলার সামনেই একটা বারান্দা। বলদেববাবুর প্রাণখোলা হাসির শব্দ কানে এল।

আশ্চর্য প্রাণখোলা হাসি হাসতে পারেন ভদ্রলোক!

বলদেব সিংহ বিহারেই ডোমিসাইলড।

বেঁটে-খাটো, হাসি-খুশি রসিক মানুষটি। বয়েস প্রায় ষাটের কোঠা ছাড়াতে চলেছে।

সিং অ্যান্ড সনস-এর মোটরবাস সার্ভিস কোম্পানির মালিক।

পনেরো-কুড়িটা বাস আছে; রাঁচি, হাজারিবাগ, চাঁইবাসার প্যাসেঞ্জার নিয়ে যাতায়াত করে।

রীতিমতো ধনী ব্যক্তি বলেই বলদেব সিংহকে এ-তল্লাটে সকলে জানে। বর্তমানে কাজকর্মের ভার দুই ছেলের হাতে তুলে দিয়ে আনন্দে অবসরজীবন যাপন করছেন।

সূর্যপ্রসাদ গুপ্তর বিশেষ বন্ধু তিনি।

প্রতি সন্ধ্যায়ই লিলি কটেজে এসে ঘণ্টা দুই-তিন কাটিয়ে যান বন্ধুর সঙ্গে।

আমি পরদা তুলে সূর্যপ্রসাদের ঘরে প্রবেশ করতেই বলদেববাবু বলে উঠলেন, এই যে ডাক্তার, ব্যাপার কী বলো তো? খাবারগুলো সব যে এদিকে ঠান্ডা হয়ে যাওয়ার জোগাড়।

একটু দেরি হয়ে গেল—একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসতে-বসতে বললাম।

তাহলে আর দেরি কেন গুপ্ত, আবদুলকে বলো টেবিলে খাওয়ার দিতে। জানোই তো ডিসপেপসিয়ার ভিকটিম, হজম না হলে আবার সারাটা রাত ছটফট করতে হবে।

হ্যাঁ-হ্যাঁ—আবদুল—, চিৎকার করে ডাকলেন সূর্যপ্রসাদ।

একটু পরেই আবদুল এসে ঘরে ঢুকল।

ডিনার-টেবিল রেডি করো।

ডিনার শেষ হওয়ার পর ডিনার-টেবিলেই পরিষ্কার কবে একটা টেবিল ক্লথ বিছিয়ে বলদেববাবু ও মেজর কৃষ্ণস্বামী দাবার ছক নিয়ে বসলেন।

সূর্যপ্রসাদ ওঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমরা ততক্ষণ একদান খেলো সিংহ, ডাক্তাবের সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে। চলো ডাক্তার—।

সূর্যপ্রসাদ তাঁর শয়নঘরের দিকে এগিয়ে গেলেন। আমি তাঁকে অনুসরণ করলাম।

শয়নঘর অতিক্রম করে সূর্যপ্রসাদ সেই ঘরেরই সংলগ্ন নিরিবিলি যে ছোট ঘরটি, তার মধ্যে আমাকে নিয়ে প্রবেশ করলেন।

শয়নঘরের অনুপাতে ওই ঘরটি ছোট হলেও একেবারে খুব ছোট নয়।

ঘরের দুটি দরজা।

একটি দরজা, সংলগ্ন কক্ষ ও ওই ঘরের মধ্যবর্তী। যাতে করে শয়নঘর থেকেই ইচ্ছে হলে ওই ঘরে যাতায়াত করা যায়।

অন্য দরজাটি বাইরের দিকে। এবং দুটি জানলা পাশাপাশি। একটি জানলার কপাট খোলা ছিল।

মেঝেতে পুরু দামি কার্পেট বিছানো।

আসবাবপত্রের মধ্যে একটি বড় হাইব্যাক আরামকেদারা ও তার পাশে দুটি গদিআঁটা চেয়ার। একটি গোল টেবিল।

টেবিলের ওপরে ফ্লাওয়ার-ভাসে রক্ষিত একরাশ মরশুমি ফুল।

হাইব্যাক আরামকেদারাটার ওপরে নিজে বসে আমার দিকে তাকিয়ে সূর্যপ্রসাদ মৃদুকণ্ঠে বললেন, বোসো, ডাক্তার।

আমি নিঃশব্দে সামনেরই একটা চেয়ারে বসলাম।

ঘরের এক কোণে ফায়ার-প্লেসে আগুন জ্বলছিল। তাতেই ঘরটা বেশ গরম। কিন্তু খোলা জানলাপথে শীতরাত্রের হিমকণাবাহী হাওয়া আসছে।

ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড, ওই জানলাটা বন্ধ করে দিই, মিস্টার গুপ্ত।

সূর্যপ্রসাদ অন্যমনস্ক ভাবে যেন কী ভাবছিলেন। আমার কথায় হঠাৎ যেন চমকে উঠে বললেন, অ্যাঁ?

বলছিলাম, ওই জানলাটা—।

হ্যাঁ, বন্ধ করে দাও।

উঠে গিয়ে জানলাটা বন্ধ করে দিলাম। এবং জানলাটা বন্ধ করে ঘুরে দাঁড়াতেই সূর্যপ্রসাদ বললেন, বেডরুমের ওই দরজাটাও বন্ধ করে দাও, ডাক্তার।

অন্য দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধই ছিল, দ্বিতীয় দরজাটাও তাঁর নির্দেশমতো বন্ধ করে আবার এসে চেয়ারে বসলাম।

সূর্যপ্রসাদের মুখের দিকে তাকালাম। অন্যমনস্ক। কী যেন ভাবছেন।

কয়েকটা মুহূর্ত স্তব্ধতার মধ্যে কেটে গেল।

দুজনেই চুপচাপ বসে আছি।

ঘরের কোণে ফায়ার-প্লেসের প্রজ্বলিত আগুনের রক্তাভা সূর্যপ্রসাদের মুখের ওপর পড়ে যেন মনে হচ্ছিল—ব্রোঞ্জের তৈরি মুখটা, নিষ্প্রাণ।

ধীরে-ধীরে একসময় কিমোনোর পকেট থেকে পাইপ ও টোবাকো-পাউচটা বের করে পাইপে তামাক ভরে তাতে অগ্নিসংযোগ করলেন সূর্যপ্রসাদ।

তীব্র কটু তামাকের গন্ধটা ঘরের বাতাসে ছড়িয়ে যাচ্ছিল।

সহসা একসময় পাইপটা হাতে নিয়ে সূর্যপ্রসাদ বললেন, যে-আলোচনা করবার জন্যে তোমাকে ডেকে এনেছি সেটা জরুরি এবং গোপনীয়।

আমি কোনও জবাব না দিয়ে নিঃশব্দে সূর্যপ্রসাদের মুখের দিকে তাকালাম।

সত্যি কথা বলতে কী, কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ করছিলাম। ঠিক ওইভাবে যেন কোনওদিন সূর্যপ্রসাদকে কথা বলতে শুনিনি।

ব্যাপারটা যদিও এখনও পর্যন্ত আমি বিশ্বাস করতে পারিনি, ডাক্তার, আর বিশ্বাস করবার মতোও নয়, তবু নিজেদের মধ্যে একটা ওপেন ডিসকাসন করে আমার মনে হয় ব্যাপারটার একটা মীমাংসা করে নেওয়াই ভালো, কী বলো? সূর্যপ্রসাদ বললেন।

নিশ্চয়ই, কিন্তু—।

বলছি। পরশু বিকেলের ডাকে একটা চিঠি পেয়েছি—।

চিঠি!

হ্যাঁ। কে লিখেছে জানো?

কে?

চিঠিটা লিখেছে মৃত জগৎজীবনের ভাই মৃত পুলকজীবন—।

পুলকবাবু! তিনি তো—।

হ্যাঁ, পনেরো দিন আগেই সে মারা গিয়েছে। মরার ঠিক দিন দুই আগেই চিঠিটা সে তার এক বন্ধুকে লিখেছিল।

বন্ধুকে? কে তিনি?

তাঁকে অবশ্যই তুমি চেনো না। সে এখানে থাকেও না। কিন্তু তাঁকে আমি খুব ভালো করেই চিনি। সেই ভদ্রলোকটিই চিঠিটা ডাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

তা আপনার কাছে—।

হ্যাঁ, কারণ সেই চিঠির মধ্যে এমন কতকগুলো কথা আছে, যার সঙ্গে আমারও পারিবারিক সম্পর্ক জড়িয়ে আছে।

দেখুন মিস্টার গুপ্ত, সে-চিঠির ব্যাপার আমি যে কীভাবে—।

শোনো ডাক্তার, তুমি জানো, জগৎ আমার বিশেষ বন্ধু ছিল। আর তার ভাইকেও আমি যথেষ্টই স্নেহ করতাম—সে-ও তুমি জানো।

কিন্তু—।

লেট মি ফিনিশ, ডাক্তার! সে-চিঠিটার মধ্যে তাদের ও আমার ফ্যামিলি সংক্রান্ত অনেক কথা আছে তো বটেই, বিশেষ যে-ব্যাপারটার জন্যে তোমার সঙ্গে আলোচনা করতে চাই, সেটা হচ্ছে জগৎ ও পুলকের মৃত্যু সম্পর্কে অনেক কথাই আছে।

ক্ষমা করবেন আমাকে, মিস্টার গুপ্ত, আমি কিন্তু এখনও ব্যাপারটা ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না!

শোনো, চিঠিটা আমি পড়ছি আগাগোড়া, তা হলেই তুমি বুঝতে পারবে। বলতে-বলতে সূর্যপ্রসাদ তাঁর কিমোনোর পকেটে হাত চালিয়ে একটা মুখ-ছেঁড়া 'ব্লু' রঙের এনভেলাপ বের করলেন।

কিন্তু আমার মনে হয় মিস্টার গুপ্ত, ও-চিঠি আমার বোধহয় না শোনাই ভালো। আপনাদের ফ্যামিলি সংক্রান্ত ব্যাপার, আমি একজন তৃতীয় ব্যক্তি—।

না-না, ডাক্তার—চিঠিটা আমি পড়ি, তুমি শোনো—।

খাম থেকে চিঠিটা বের করে সূর্যপ্রসাদ চিঠিটা পড়তে শুরু করলেন ঃ

প্রিয় বঙ্কিম,

আমি বুঝতে পারছি ভাই, আমার শেষের মুহূর্ত ঘনিয়ে এসেছে। কারণ স্পষ্টই বুঝতে পারছি এ-মৃত্যুকে কিছুতেই ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। মরতে আমাকে হবেই, যেহেতু চরম নির্বুদ্ধিতায় এই মৃত্যুকে যে আমিই ডেকে এনেছি। জানি না কেন এমন ভুল করলাম! কিন্তু আর যখন উপায় নেই, তখন যে আমাকে এমনি করে অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে তার আসল রূপটাও আমি সকলের সামনে প্রকাশ করে দিতে চাই। আর সেই কারণেই তোমাকে চিঠিটা শেষ বিদায়ের আগে লিখে যাচ্ছি, ভাই। আর একজনকে এ-কথাগুলো জানিয়ে যাব ভেবেছিলাম—সে হচ্ছে একসময়কার সহপাঠী ও বিশেষ পরিচিত কিরীটী রায়। কিন্তু তাকে জানাতে শেষপর্যন্ত আমার সাহস হল না। কারণ, তাতে আমার প্রতি সহানুভূতির চাইতে তার ঘৃণাটাই বেশি হবে। যাক, যে-কথা বলতে চাই, তোমরা জানো, আমি আর দাদা জগৎজীবন আপন সহোদর ভাই ছিলাম। কিন্তু তা নয়। দাদা আমার বৈমাত্রেয় ভাই ছিলেন। এবং বাবার মৃত্যুর পরই সেই কথাটা প্রথম জানতে পারি। শুধু তাই নয়, সেইসঙ্গে এ-ও জানতে পারি, বাবার যাবতীয় সম্পত্তি তিনি দাদার নামেই লিখে দিয়ে গিয়েছেন। আমাকে একটি কপর্দকও দেননি। কারণ আমি জুয়াড়ি। জুয়ার নেশা আমার ছিল। দাদা আমার বৈমাত্রেয় ভাই হলেও তিনি যে আমাকে কী গভীরভাবে ভালোবাসতেন তা তোমরা জানো না। তবু বাবার উইলের সব সংবাদ জানার পর আক্রোশে আমি হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য হয়ে উঠেছিলাম। কিন্তু যখন দেখলাম কিছুই করবার নেই, তখন একান্ত বাধ্য হয়েই দূরে চলে গিয়েছিলাম। কিন্তু অর্থ এমন অনর্থ যে, শেষ পর্যন্ত দূরে গিয়েও সেই অর্থের প্রলোভনেই জঘন্য চক্রান্ত করে দেবতার মতো অমন দাদাকেও আমার হত্যা করতে হাত এতটুকু কাঁপেনি। এমনি নরাধম, এমনি পিশাচ আমি। দাদাকে আমি বিষ দিয়ে হত্যা করেছিলাম, জানো? কিন্তু সে-বিষ কে জুগিয়েছিল আমাকে জানো? তোমারই পিসতুতো ভাই, সূর্যপ্রসাদবাবুর ছেলে সমর—।

*

ওই পর্যন্ত চিঠিটা পড়তেই আমি এবারে অত্যন্ত জোরের সঙ্গে বাধা দিয়ে বলে উঠলাম, এক্সকিউজ মি, মিস্টার গুপ্ত, আপনার ও-চিঠি আমি আর শুনতে চাই না।

না-না, ডাক্তার, শোনো, তোমাকে শেষটুকু শুনতেই হবে। বললেন সূর্যপ্রসাদ।

চেয়ার ছেড়ে আমি ততক্ষণে উঠে পড়েছি। দৃঢ়কণ্ঠে বললাম, না, ক্ষমা করবেন, মিস্টার গুপ্ত—ও-চিঠি শুনতে পারব না।

বোসো-বোসো, ডাক্তার, শরীরটা আমার ভালো নয়, কাল সুবিধে হবে কি না জানি না। বোসো, আজকেই—।

বুঝলাম সূর্যপ্রসাদ কিছুতেই ছাড়বেন না, তাই শেষপর্যন্ত বললাম, বেশ, আজ নয়—আজ আমারও শরীরটা ভালো নেই। কাল, না হয় পরশু, বা অন্য একসময় এসে বাকি চিঠিটা আপনার শুনব।

কথাগুলো বলে আর আমি এক মুহূর্ত দাঁড়ালাম না। বাইরের দরজাটা খুলে সঙ্গে-সঙ্গে ঘর থেকে বের হয়ে এলাম।

কিন্তু দরজাটা খুলে বাইরের বারান্দায় পা দিতেই আবদুলের সঙ্গে আমার মুখোমুখি হয়ে গেল।

দেখি ট্রেতে করে গরম কফি নিয়ে দরজার একেবারে গোড়াতেই দাঁড়িয়ে আছে আবদুল।

আবদুল আমাকে সহসা ওইভাবে দ্রুত ঘর থেকে বের হয়ে আসতে দেখে যেন কেমন একটু থতমত খেয়ে থেমে গেল।

আবদুল, এখানে কী করছিলি রে দাঁড়িয়ে?

আজ্ঞে, সাহেবের জন্যে কফি নিয়ে—।

কফি আজ রাত্রে আর তিনি খাবেন না। নিয়ে যা। আমাকে বলে দিলেন শরীরটা তাঁর ভালো নেই। তাঁকে যেন রাত্রে কেউ আর না বিরক্ত করে।

কী হয়েছে সাহেবের, ডক্টরসাব? উদ্বিগ্ন কণ্ঠে আবদুল প্রশ্ন করে।

সেই হার্টের ব্যথাটা বোধহয়—।

আবদুল আর দাঁড়াল না। ট্রে নিয়ে চলে গেল।

বারান্দাপথে আবদুল অদৃশ্য হয়ে গেলে আমিও ধীরে-ধীরে অন্যমনস্কভাবে সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হলাম।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে-নামতে সিঁড়ির আলোতেই হাতঘড়িটার দিকে একবার তাকালাম, সময়টা কত দেখবার জন্য।

ঠিক রাত সাড়ে দশটা।

কেমন একটু অন্যমনস্ক হয়েই সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলাম। সূর্যপ্রসাদ অত করে বারবার চিঠিটা শোনবার জন্য বলছিলেন, চিঠিটা শুনলেই হত!

কিন্তু কে ওই বঙ্কিম?

পুলকজীবনের বিশেষ পরিচিত বলেই মনে হল। শুধু পুলকজীবন কেন, সূর্যপ্রসাদেরও তিনি বিশেষ পরিচিত বোঝা যাচ্ছে।

কিন্তু কই, কখনও পুলকজীবনের মুখে ওই নামটা শুনেছি বলে তো আগে মনে পড়ে না! আর কী সব আবোল-তাবোল চিঠিতে লিখেছে পুলক! তার দাদা জগৎজীবনের মৃত্যুর জন্য নাকি সে-ই দায়ী!

সহসা একটা কথা মনে পড়ে গেল, কিরীটী রায়ের সঙ্গেও পুলকের বিশেষ পরিচয় ছিল চিঠিতে সে লিখেছে। কোন কিরীটী রায়? যে কিরীটী রায় বর্তমানে রাঁচিতে স্বাস্থ্যান্বেষণে এসেছেন—

তিনিই? সম্ভবত তাই। একই ব্যক্তি। আর সেই কারণেই বোধহয় পুলক সম্পর্কে আমাকে এত কথা তিনি জিজ্ঞাসা করছিলেন।

সঙ্গে-সঙ্গে আরও একটা কথা মনে হল।

তবে কি কিরীটী রায়ের এ-সময় রাঁচিতে আসাটা একটা অজুহাত মাত্র? নিশ্চয় তাই। নচেৎ এই দুর্দান্ত শীতে কেউ রাঁচিতে আসে নাকি?

পাঁচ

উঃ! রাত মাত্র সাড়ে দশটা, এর মধ্যে শীত যেন ছুঁচ ফোটাচ্ছে।

বাগান পার হয়ে অন্ধকারে গেট অতিক্রম করে এসে রাস্তায় নামতেই অন্ধকারে যেন কার সঙ্গে ধাক্কা লাগল আমার অতর্কিতে।

মনটা এমনিতেই বিক্ষিপ্ত হয়ে ছিল। একটু বিরক্তির সঙ্গেই বললাম, দেখে রাস্তা চলেন না?

সঙ্গে-সঙ্গে যেন অনুতপ্ত পুরুষকণ্ঠে জবাব এল, স্যরি, অন্ধকারে দেখতে পাইনি।

আমি আর কোনও জবাব না দিয়ে এগুতে যাব, সেই সময় আবার পশ্চাৎ থেকে পূর্বকণ্ঠে প্রশ্ন এল, মশাই, শুনছেন?

কী বলছেন?

সূর্যপ্রসাদ গুপ্তর বাড়িটা কোথায় বলতে পারেন?

সামনেই। ওই যে গেট দেখা যাচ্ছে।

ধন্যবাদ।

আমি আবার আমার গন্তব্যপথে অগ্রসর হলাম।

ঢং-ঢং-ঢং—অদূরবর্তী গির্জার পেটা ঘড়িতে রাত্রি এগারোটা ঘোষিত হল।

রাস্তাটা একেবারে নির্জন বললেও চলে।

লংকোটের পকেটে হাত দুটো ঢুকিয়ে হাঁটতে লাগলাম।

একটু আগে বৃষ্টি হওয়ায় শীতটা যেন আরও কনকনে হয়ে উঠেছে।

নির্জন রাস্তায় শুধু নিজের পায়ের জুতোর শব্দটাই কানে আসছে।

ঠান্ডায় নাকের ডগাটা চিনচিন করছে একটা বিশ্রী যন্ত্রণায়।

অন্যমনস্কতায় চলার গতিটা একসময় শ্লথ হয়ে এসেছিল। গতিবেগ বাড়িয়ে দিলাম।

বাড়ি ফিরে দেখি মিতার ঘরে তখনও আলো জ্বলছে।

পাশাপাশি দুটো ঘরে ভাই-বোন দুজনে আমরা শুই। মাঝখানে একটা দরজা আছে। কী ভেবে মিতার ঘরে আলো জ্বলতে দেখে তার ঘরেই ঢুকলাম।

একটা কম্বলে সর্বাঙ্গ ঢেকে সোফার উপর বসে মিতা কী একটা বই পড়ছিল। আমার পদশব্দে মুখ তুলে তাকাল, এত রাত পর্যন্ত কী করছিলে, দাদা?

সত্যিই ঘরের ওয়াল-ক্লকে দেখি, রাত প্রায় পৌনে বারোটা বাজে।

ঘরের মধ্যে ফায়ার-প্লেসে আগুন জ্বলছিল, তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। ফায়ার-প্লেসের আগুনের জন্য ঘরের হাওয়াটা বেশ গরম।

কী ব্যাপার, হঠাৎ সূর্যপ্রসাদ তোমাকে ডিনারে নিমন্ত্রণ করেছিলেন?

মিতার প্রশ্নে ফিরে না তাকিয়েই জবাব দিলাম, কেন, নিমন্ত্রণ করতে নেই নাকি?

তা কেন, সমরের বাবার মতো একের নম্বরের কিপটে হঠাৎ নিমন্ত্রণ করে বসলেন তাই বলছি।

শুধু আমিই নই—।

তবে?

বলদেব সিং ও মেজর কৃষ্ণস্বামীও ছিলেন।

তা হলে রীতিমতো ডিনার বলো।

তাই।

কী খাওয়াল?

স্যুপ, ফিশফ্রাই, স্টু—।

ইস, বুড়োর দেখছি রাতটা ঘুম হবে না।

মিতার কথার আর কোনও জবাব দিলাম না। ফায়ার-প্লেসের আগুনটা নিভে আসছিল, নিবন্ত ফায়ার-প্লেসের রক্তাভার দিকে তাকিয়ে রইলাম অন্যমনস্কভাবে।

এমনসময় পাশের ঘরে ফোন বেজে উঠল, ক্রিং, ক্রিং, ক্রিং...।

এত রাত্রে আবার কে রে বাবা।

মিতা উঠতে যাচ্ছিল, কিন্তু তাকে বাধা দিয়ে বললাম, বোস তুই, আমিই দেখছি।

আমার ঘরে ফোন।

ঘরে ঢুকে রিসিভারটা তুলে নিলাম হ্যালো, কে? হ্যাঁ, হ্যাঁ—ডাক্তার সেন স্পিকিং! অ্যাঁ, কী বললে, সূর্যপ্রসাদ খুন হয়েছেন? না, না—অ্যাবসার্ড! হাউ ইমপসিবল!...ও শিওর! নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই—এখুনি আমি আসছি—।

ইতিমধ্যে ফোনে আমার কথা শুনে মিতা আমার পাশেই এসে দাঁড়িয়েছিল। অবশ হাতে রিসিভারটা নামিয়ে রাখার সঙ্গে-সঙ্গে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে মিতা জিজ্ঞাসা করল, কী ব্যাপার, দাদা? কে খুন হয়েছে?

সূর্যপ্রসাদ।

সূর্যপ্রসাদ!

হ্যাঁ। কী ব্যাপার কিছুই তো বুঝতে পারছি না, মিতা। এই তো সেখান থেকে ডিনার খেয়ে আমি আসছি। একটু আগেও লোকটাকে কোয়াইট হেলদি, হার্ডি অ্যান্ড স্ট্রং দেখে আসছি। হাউ অ্যাবসার্ড—।

কিন্তু কে—কে তোমাকে ফোন করছিল?

আবদুল বলেই মনে হল—।

মিতা বোবার মতোই আমার মুখের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। আমি নিজেও যেন কেমন বোবা বনে গিয়েছি।

শুনতে ভুল করলাম না তো কথাটা?

সূর্যপ্রসাদ কেমন করে খুন হবেন? না, না—নিশ্চয়ই আমি শুনতে ভুল করেছি। মিতার মুখের দিকে তাকালাম।

পাথরের মতোই নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে আছে মিতা।

আমি—আমি একবার লিলি কটেজ থেকে ঘুরে আসি, মিতা—।

অ্যাঁ?

আমি একবার সেখান থেকে ঘুরে আসি—।

যাবে?

যাব না? যাওয়া কি উচিত নয়, এমন একটা সংবাদ পাওয়ার পর?

বেশ, যাও।

আমি এগিয়ে গিয়ে ঘরের এক কোণে রক্ষিত টেবিলের ওপর থেকে ডাক্তারির কালো ব্যাগটা তুলে নিয়ে আবার মিতার দিকে ফিরে তাকিয়ে বললাম, দরজাটা তা হলে তুই আটকে দে, মিতা।

রাস্তায় হাঁটতে-হাঁটতে কেবলই মনে হচ্ছিল, নিশ্চয়ই ভুল শুনেছি।

হনহন করে হেঁটে চলেছি।

মাথার মধ্যে কেমন যেন সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

কেবলই মনকে স্তোক দিতে লাগলাম, গিয়ে হয়তো দেখব, সূর্যপ্রসাদ সুস্থই আছেন। তাই যেন হয়। কৃপণ হোক আর যাই হোক, লোকটি সত্যিই ভালো।

লিলি কটেজের গেট দিয়ে ঢুকে এগিয়ে দেখি সদর বন্ধ। কলিংবেলের বোতামটা টিপলাম।

চার-পাঁচবার বেল বাজাবার পর দরজা খুলে গেল। খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আবদুল। বেচারি বোধহয় একটুক্ষণ আগে ঘুমিয়ে ছিল। চোখ ডলতে-ডলতে এসে দরজা খুলে দিয়েছে। আবদুল তো আমাকে দেখে অবাক!

ডক্টরসাব!

আবদুল, কী হয়েছে তোমার সাহেবের?

সাহেবের! কেন, কী হবে? সাহেব তো তাঁর ঘরে ঘুমুচ্ছেন!

ঘুমুচ্ছেন?

আঃ, একটা যেন স্বস্তির নিশ্বাস নিই।

তবে তুমি একটু আগে আমাকে ফোন করেছিলে কেন?

আমি আপনাকে ফোন করেছি! কী বলছেন, ডক্টরসাব?

হ্যাঁ-হ্যাঁ—তুমিই ফোন করেছ। আমি স্পষ্ট তোমাব গলা শুনেছি।

আমি তো ঘুমুচ্ছিলাম। আপনার কলিংবেলের শব্দে উঠে আসছি।

আশ্চর্য! অথচ ফোনে নাম বললে আবদুল। সত্যি বলছ, তুমি আমাকে ফোন করোনি?

নিশ্চয়ই না।

হাউ ফানি! —তারপর একটু থেমে বললাম, তোমার সাহেব সত্যিই ঘুমুচ্ছেন, জানো তো?

নিশ্চয়ই। এত রাত্রে—।

ঠিক আছে। এতদূর যখন এসেছিই, চলো একবার, ভালো করে খোঁজ নিয়ে যাই।

কিন্তু সত্যি-সত্যিই যদি সাহেব ঘুমিয়ে থাকেন, ডক্টরসাব—।

ঘুমিয়েই যদি থাকেন তো ভালোই। সুস্থ থাকলেই হল। চলো—।

আসুন।

দরজা বন্ধ করে আবদুল এগিয়ে চলল, আমি তার পিছনে-পিছনে চললাম। সমস্ত বাড়িটা যেন ঘুমের মধ্যে তলিয়ে গিয়েছে।

নিস্তব্ধ, নিঝুম সব।

সিঁড়ি অতিক্রম করে আবদুলের সঙ্গে-সঙ্গে দোতলায় সূর্যপ্রসাদের শয়নঘরের দরজার সামনে এসে দুজনে দাঁড়ালাম।

দরজা ভেতর থেকে বন্ধ।

কিন্তু বারান্দা দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখলাম, জানলাপথে আলো দেখা যাচ্ছে ঘরের মধ্যে।

ঘরে আলো জ্বলছে দেখছি! তোমার সাহেব কি রাত্রে ঘরের আলো জ্বেলে রেখেই ঘুমোন নাকি, আবদুল?

না তো! রাত্রে ঘুমের আগে তিনি তো বরাবর আলো নিভিয়েই শোন জানি।

তা হলে?

বন্ধ দরজার গায়ে কান পেতে কিছু শোনাবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু ভেতর থেকে কোনও সাড়া-শব্দই পেলাম না।

আবদুল ওই সময় বললে, মধ্যে-মধ্যে সাহেব রাত জেগে পড়াশুনো করেন।

ছয়

দরজায় নক করে দেখব? আবদুলকেই শুধোলাম।

একটু যেন ইতস্তত করেই সে বলল, দেখুন।

বন্ধ দবজার কপাটের গায়ে মৃদু নক করলাম।

কিন্তু ভেতর থেকে কোনও সাড়া বা শব্দই পাওয়া গেল না।

এবারে কী ভেবে পুনরায় দরজার গায়ে নক করবার সঙ্গে-সঙ্গে মৃদুকণ্ঠে ডাকলাম, মিস্টার গুপ্ত আছেন কি?

না, কোনও সাড়া-শব্দই নেই।

আবদুল এবারে বললে, সাহেব বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছেন, ডক্টরসাব!

আবদুলের কথায় কোনও কান না দিয়ে আবার আমি দরজার গায়ে নক করার সঙ্গে-সঙ্গে কণ্ঠের পরদা একটু বেশ উঁচুতে তুলেই ডাকলাম, মিস্টাব গুপ্ত, জেগে আছেন কি?

মিস্টার গুপ্ত! আবার ডাকলাম পূর্ববৎ উচ্চকণ্ঠে।—আমি ডাক্তার সেন!

তবু কোনও সাড়া নেই।

দরজার কপাটে এবারে ধাক্কা দিলাম।

পূর্ববৎ। কোনও সাড়া-শব্দই নেই।

এবারে হঠাৎ খেয়াল হতেই দরজার 'কি হোল' দিয়ে নিচু হয়ে ঘরের মধ্যে দৃষ্টিপাত করলাম। টেবিলের ওপর টেবিল-ল্যাম্পটা জ্বলছে দেখলাম।

আবদুল?

বলুন।

টেবিলের উপর টেবিল-ল্যাম্পটা জ্বলছে দেখছি। আমার যেন কেমন ভালো মনে হচ্ছে না।

কী বলছেন?

হ্যাঁ, মিস্টার গুপ্তর ঘুম আমি যতদূর জানি পাতলা। সামান্য শব্দেও তাঁর ঘুম ভেঙে যায় শুনেছি। দরজায় নক করলাম, নাম ধরে ডাকলাম, দরজায় ধাক্কা দিলাম—তবু কোনও সাড়া নেই কেন?

আর একবার দরজায় জোরে ধাক্কা দিয়ে দেখুন তো, ডক্টরসাব! আবদুল বললে।

আবদুলের কথামতো এবারে সশব্দেই দরজার গায়ে ধাক্কা দিয়ে বেশ জোরেই ডাকলাম, মিস্টার গুপ্ত, আমি ডাক্তার সেন—দরজাটা খুলুন!

এবারেও পূর্ববৎ কোনও সাড়া-শব্দই পাওয়া গেল না।

সত্যি-সত্যি এবারে মনটা যেন আমার রীতিমতো সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল। এত জোরে দরজায় ধাক্কা দিলাম, চেঁচিয়ে ডাকলাম, তবু সাড়া নেই সূর্যপ্রসাদের। পাতলা ঘুম ভদ্রলোকের, ঘুম না ভাঙারও তো কথা নয়!

কী করি বলো তো, আবদুল! আমার কিন্তু ব্যাপারটা আদপেই ভালো ঠেকছে না!

আবদুলও যেন কেমন বিহ্বল হয়ে গিয়েছে।

ইতিমধ্যে আমার উচ্চকণ্ঠের ডাকাডাকিতে রাধিকাপ্রসাদ ও তাঁর ছেলে বিমল সেখানে এসে

হাজির হল।

কী ব্যাপার? উদ্বিগ্ন কণ্ঠে রাধিকাপ্রসাদ আমাকে প্রশ্ন করলেন, আপনি ডাক্তার সেন, এসময়ে?

এই যে রাধিকাপ্রসাদবাবু, কী ব্যাপার ঠিক বুঝতে পারছি না—বলে সংক্ষেপে আমি আমার ওই রাত্রে লিলি কটেজে আসবার কারণটা বললাম।

কিন্তু দাদার ঘুম তো এত গাঢ় নয় যে এত ডাকাডাকিতে ঘুম ভাঙবে না। বললেন রাধিকাপ্রসাদ।

তাই তো আমার কীরকম যেন সন্দেহ হচ্ছে, রাধিকাপ্রসাদবাবু।

এমনসময় দেখি মেজর কৃষ্ণস্বামী ও বলদেব সিংও আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন।

কী ব্যাপার? এ কী ডাক্তার, এত গোলমাল কীসের? তুমি বাড়ি যাওনি? মেজর কৃষ্ণস্বামীই প্রশ্নটা করলেন।

কিন্তু আপনারা? আপনারা রাত্রে বাড়ি যাননি? প্রশ্ন করলাম আমি।

জবাব দিলেন রাধিকাপ্রসাদই, না, এখান থেকে তো ওঁদের বাড়ি অনেকটা দূরের পথ—সেই কাঁকেতে। তাই আর রাত্রে এই ঠান্ডার মধ্যে বুড়োমানুষ ওঁদের যেতে দিইনি আমি।

হ্যাঁ, দাবা খেলতে-খেলতে অনেক রাত হয়ে গেল—তাই এখানেই দুজনে থেকে গিয়েছি। বললেন বলদেব সিং।

আমি তখন সংক্ষেপে সব কথা খুলে বললাম ওঁদের।

কিন্তু ব্যাপারটা যে কীরকম সন্দেহজনক মনে হচ্ছে, ডাক্তার সেন। বললেন এবারে মেজর কৃষ্ণস্বামীই আমার মুখের দিকে তাকিয়ে।

ওসব কোনও কাজের কথা নয়। দরজাটা ভেঙে ফেলা যাক। রাধিকাপ্রসাদ বললেন।

শেষপর্যন্ত রাধিকাপ্রসাদের কথাতেই সকলে সায় দিলেন।

আবদুল, আমি ও বিমল অতঃপর ধাক্কা দিয়ে ঘরের দরজা খুলে ফেললাম।

সর্বপ্রথমে আমিই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলাম।

অন্যান্য সকলে আমার পশ্চাতে ঘরে প্রবেশ করলেন একে-একে।

কিন্তু এ কী। সূর্যপ্রসাদের শয়নকক্ষ তো শূন্য।

ঘরে কেউ নেই।

খাটের ওপর নিভাঁজ শয্যা। দেখলেই বোঝা যায়, কেউ স্পর্শও করেনি শয্যাটা তখনও পর্যন্ত।

টেবিলের ওপর ঘরের মধ্যস্থলে ইলেকট্রিক টেবিল-ল্যাম্পটা জ্বলছে।

সাহেব কি আজ রাত্রে তা হলে শুতেই আসেননি? বললে আবদুলই।

সকলেই আমরা নিঃশব্দে পরস্পর-পরস্পরের মুখের দিকে তাকালাম।

চলো তো দেখি ওঁর প্রাইভেট রুমে। ওই ঘরেই আছেন হয়তো। বলে এবারেও সর্বাগ্রে আমি দুই ঘরের মধ্যবর্তী খোলা দরজাপথে প্রাইভেট রুমের দিকে পা বাড়ালাম।

সে-ঘরেও একটি আলো জ্বলছিল।

কিন্তু ঘরের মধ্যে পা দেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই, কেন জানি না, মনটা যেন আমার হঠাৎ কেমন করে উঠল। সামনের দিকে তাকাতেই দেখলাম, সেই উঁচু ব্যাকওয়ালা বড় আরামকেদারাটায়, আজ রাত্রে বিদায়ের পূর্বে ঠিক যেমনটি সূর্যপ্রসাদকে এই দরজার দিকে পিছন করে উপবিষ্ট দেখে গিয়েছিলাম, তেমনই বসে আছেন তখনও।

তবে কি ওই চেয়ারে বসে-বসেই সূর্যপ্রসাদ ঘুমিয়ে পড়েছেন?

মাথার মাঝখানের টাকটা দেখা যাচ্ছে, আলোয় চকচক করছে।

অন্যান্য সকলেই ইতিমধ্যে আমার পিছনে-পিছনে ওই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করেছিলেন।

জমাট একটা হিম-স্তব্ধতা যেন ঘরটার মধ্যে।

দু-পা আরও আমি এগিয়ে গেলাম।

এবং এগোবার সঙ্গে-সঙ্গেই থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম।

ভয়বিহ্বল দৃষ্টি তখন আমার সামনের দিকেই স্থিরনিবদ্ধ। সূর্যপ্রসাদের ঘাড়ের কাছে ওটা কী চকচক করছে সাদামতো?

কী—কী ওটা?

নিজের অজ্ঞাতেই বোধহয় সামনের দিকে একটু ঝুঁকে তাকিয়েছিলাম। এবং সেই মুহূর্তেই একটা অর্ধস্ফুট চিৎকার আমার গলা দিয়ে বের হয়ে এল বুঝি নিজের অজ্ঞাতেই।

সকলেই তখন আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন।

সূর্যপ্রসাদের ঘাড়ে একটা ছোবা বিদ্ধ হয়ে আছে। এবং বাঁটটুকু ছাড়া সম্পূর্ণ ছোরার ফলাটাই বিদ্ধ হয়ে আছে তাঁর মাংসল ঘাড়ে।

এ কী, দাদা—কী সর্বনাশ! অর্ধস্ফুট কণ্ঠে চিৎকার করে রাধিকাপ্রসাদ দু-হাতে চোখ ঢাকলেন।

হাউ হরিব্‌ল। মেজর কৃষ্ণস্বামীর কণ্ঠে শোনা গেল, মার্ডার!

তারপরই যেন একটা মৃত্যুশীতল জমাট স্তব্ধতা ঘরের মধ্যে নেমে এল। কারও মুখেই আর কোনও কথা নেই।

কয়েকটি নির্বাক, মুহূর্ত।

তারপরই একটা শব্দ হতে দেখি, বলদেববাবু বোধহয় ওই ভয়াবহ দৃশ্য সহ্য করতে না পেরে ফেইন্ট হয়ে পড়ে যাচ্ছিলেন, মেজর কৃষ্ণস্বামী তাঁকে তাড়াতাড়ি ধরে সামনেব খালি চেয়ারটার ওপব বসিয়ে দিলেন।

সাত

বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি আমি।

কী ভয়াবহ, কী বীভৎস দৃশ্য!

এমনি করে সূর্যপ্রসাদকে কে হত্যা করল? এ যে শুধু আকস্মিকই নয়, অভাবনীয়ও। চিন্তারও অগোচর।

না, না—এ আমি দেখতে পারছি না আর, সহ্য করতে পারছি না। বলতে-বলতে স্খলিতপদে রাধিকাপ্রসাদ পূর্ব দ্বারপথেই ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন।

বলদেববাবু তখনও চেয়ারটার ওপরে চোখ বুজে হেলান দিয়ে বসে আছেন। মেজরই বললেন, বিমল, সিংকে অন্য ঘরে নিযে যাও।

বিমল বলদেব সিংহকে হাত ধরে সযত্নে তুলে নিঃশব্দে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

ঘরের মধ্যে এবারে রইলাম কেবল আমি, মেজর কৃষ্ণস্বামী ও ভৃত্য আবদুল। এবং চেয়ারের ওপরে উপবিষ্টাবস্থায় সূর্যপ্রসাদের ঘাড়ে ছোরাবিদ্ধ নিষ্প্রাণ দেহটা।

অখণ্ড একটা স্তব্ধতা ঘরটার মধ্যে থমথম করছে।

সে যে কী একটা অসহনীয় পরিস্থিতি ভাষায় তা প্রকাশ করা যায় না। কিন্তু আশ্চর্য নার্ভ দেখলাম প্রৌঢ় মেজর কৃষ্ণস্বামীর।

ঘরের মধ্যে ঢুকে সূর্যপ্রসাদের ছোরাবিদ্ধ মৃতদেহটা আবিষ্কৃত হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই যে-বিহ্বলতা মেজর কৃষ্ণস্বামীর মধ্যে দেখেছিলাম, তার যেন কিছুই আর অবশিষ্ট নেই তখন তাঁর কথায়-বার্তায়।

অদ্ভুত শান্ত ও দৃঢ় কণ্ঠে মেজর ডাকলেন, ডাক্তার সেন?

চমকে সে-ডাকে তাঁর দিকে তাকালাম।

উই মাস্ট ডু সামথিং নাও।

কী বললেন, মেজর?

বলছিলাম, পুলিশে একটা এক্ষুনি সংবাদ পাঠানো আমাদের কর্তব্য নয় কি?

পুলিশে।

হ্যাঁ। আপনি এখানে অপেক্ষা করুন, আমি পুলিশে একটা ফোন করে আসি। বলে আর দাঁড়ালেন না মেজর, ঘর থেকে শান্তপদে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন।

ফোনটা নীচের তলায়।

আবদুলও মেজরের পিছনে-পিছনে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

ঘরের মধ্যে এবারে আমি একা।

সামনেই চেয়ারের ওপরে উপবিষ্ট সূর্যপ্রসাদের ছোরাবিদ্ধ মৃতদেহ ও আমি।

নিজের অজ্ঞাতেই বোধহয় একসময় পায়ে-পায়ে কেদারাটার খুব কাছে এগিয়ে গিয়েছিলাম। এবং এবারে আরও কাছ থেকে ছোরার বাঁটটার উপর নজর পড়তেই যেন চমকে উঠলাম। সর্বনাশ। এ যে সূর্যপ্রসাদের মিউজিয়াম ঘরে চন্দনকাঠের বাক্সের মধ্যে মেজর কৃষ্ণস্বামীরই উপহার দেওয়া সুদৃশ্য হাতির দাঁতের বাঁটওয়ালা সেই মেক্সিকান ছোরাটা।

কী ভয়ানক। সেই ছোরা বিঁধিয়েই তাঁকে হত্যা করা হয়েছে?

কিন্তু কে এমন নিষ্ঠুর কাজটা করল? আর কখনই বা করল? রাত সাড়ে দশটায় যখন এ-ঘর ছেড়ে আমি যাই, তখনও তো উনি বেঁচেছিলেন। তারপরই নিশ্চয়ই কেউ এসে ওঁকে হত্যা করেছে।

কিন্তু কেন—কেন হত্যা করল?

এ শুধু চিন্তারই অতীত নয়, অবিশ্বাস্য।

সত্যই কি সূর্যপ্রসাদ নিহত হয়েছেন, না জেগে-জেগে আমি দুঃস্বপ্ন দেখছি মাত্র।

এগিয়ে গেলাম পায়ে-পায়ে সূর্যপ্রসাদের সামনের দিকে আবার।

চক্ষু দুটি মুদ্রিত।

মুখে একটা যন্ত্রণার যেন সুস্পষ্ট চিহ্ন।

হাত দুটি শ্লথ ভঙ্গিতে কোলের দু-পাশে ঝুলছে।

হঠাৎ যেন গা-টা কেমন আমার ছমছম করে উঠল। এদিক-ওদিক তাকালাম। মনে হল বায়বীয় কিছুর একটা উপস্থিতি যেন আমার একেবারে পাশটিতেই। কে যেন চাপা গলায় কথা বলে উঠল। আমার নাম ধরে যেন ডাকল, ডাক্তার সেন।

কে?

কী আশ্চর্য, জেগে-জেগেই আমি স্বপ্ন দেখছি নাকি।

কিন্তু পরক্ষণেই আবার যেন স্পষ্ট শুনতে পেলাম অবিকল সূর্যপ্রসাদের কণ্ঠস্বর, ডাক্তার সেন।

চমকে সামনের দিকে তাকালাম।

দেখি ঘরে প্রবেশ করছেন মেজর কৃষ্ণস্বামী ও তাঁর পশ্চাতে বিভ্রান্তের মতো অমলেন্দু।

অমলেন্দু চক্রবর্তী।

লিলি কটেজে বছরখানেক হবে এসেছে। বছর তেইশ-চব্বিশ বয়েস হবে। রোগাটে চেহারা। সূর্যপ্রসাদের দেশে একই গ্রামে বাড়ি অমলেন্দুর।

গরিব বিধবার ছেলে। মামাদের আশ্রয়েই মানুষ। কোনওমতে আই. এ. পর্যন্ত পড়ে আর লেখাপড়া চালাতে পারেনি। চাকরি-বাকরির কোনও সুবিধা করতে না পেরে শেষপর্যন্ত রাঁচিতে এসে সূর্যপ্রসাদকেই ধরেছিল একটা কিছু করে দেওয়ার জন্যে। সূর্যপ্রসাদ অমলেন্দুর কোনও একটা ব্যবস্থা

না করে দিতে পারলেও তাকে যেতে দেননি অন্যত্র। মনে পড়ে, কথায়-কথায় আমাকেই একদিন বলেছিলেন সূর্যপ্রসাদ, ছেলেটি বড় ভালো হে, ডাক্তার। যেমন অনেস্ট, তেমনি পরিশ্রমী। তাই ওকে নিজের কাছেই রেখে দিয়েছি।

বৌদ্ধ যুগের উপর একটা প্রবন্ধ লিখছিলেন সূর্যপ্রসাদ। অমলেন্দু তাঁকে সেই লেখার ব্যাপারেই ইদানীং সাহায্য করত।

গুছিয়ে সব কপি করে দেওয়া, নোট করা ইত্যাদি ব্যাপারগুলোই অমলেন্দু করত।

একশত টাকা করে মাস-মাস দিতেন অমলেন্দুকে সূর্যপ্রসাদ।

মেজরের পিছনে-পিছনে অমলেন্দুও এসে ঘরে ঢুকল।

অমলেন্দুর মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝলাম, ইতিমধ্যেই সে মেজরের মুখে সব শুনেছে।

ওদের পশ্চাতে দেখি, আবদুলও এসে দরজার গোড়াতে নিঃশব্দে দাঁড়াল আবার।

সহসা মেজরের প্রশ্নে আমি চমকে উঠলাম।

কতক্ষণ আগে ব্যাপারটা ঘটেছে বলে তোমার মনে হয়, ডাক্তার?

কিছুই বুঝতে পারছি না আমি, মেজর। সাড়ে দশটা নাগাদ এ-ঘর থেকে আজ রাত্রে যখন আমি বের হয়ে যাই, দরজার সামনেই আবদুলের সঙ্গে আমার দেখা। আবদুল সেসময় ট্রেতে করে মিস্টার গুপ্তের জন্যে কফি নিয়ে এই ঘরেই আসছিল। মিস্টার গুপ্ত আমাকে বাড়ির লোকদের বলতে বলে দিয়েছিলেন, রাত্রে যেন তাঁকে কেউ না বিরক্ত করে।

কেন?

তা জানি না। বোধহয় শরীর বা মন তেমন ভালো ছিল না।

সহসা ওই সময় আবদুল বললে, আপনার কথা শুনেই তো আমি চলে গিয়েছিলাম, ডক্টরসাব।

কিন্তু ব্যাপার দেখে মনে হচ্ছে, মেজরই আবার বললেন, নিশ্চয় তারপর কেউ-না-কেউ এ-ঘরে এসেছিল।

সে তো বোঝাই যাচ্ছে। কিন্তু কে এসেছিল তারপর এ-ঘরে? বললাম আমি।

অকস্মাৎ ওই সময় দরজার গোড়ায় বিমলের কণ্ঠস্বর শুনে যুগপৎ সকলেই আমরা চমকে দরজার দিকে তাকালাম।

বিমলই ইতিমধ্যে কখন যে আবার দরজার গোড়ায় আবদুলের পশ্চাতে এসে নিঃশব্দে দাঁড়িয়েছে, কেউ আমরা জানতেও পারিনি।

বিমল বললে, আমি একবার আজ রাত সাড়ে দশটার পর এ-ঘরে জেঠামণির সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম।

আপনি এসেছিলেন? প্রশ্ন করলেন মেজরই।

হ্যাঁ।

কেন?

একটা জরুরি কথা ছিল জেঠামণির সঙ্গে আমার।

জরুরি কথা।

হ্যাঁ।

ও। তা রাত তখন ক'টা আন্দাজ হবে বলতে পারেন?

হ্যাঁ, রাত সোয়া এগারোটা হবে তখন। আর আমি তাঁর সঙ্গে কথা বলে ফিরে যাওয়ার সময় আমাকেও তিনি বলেছিলেন, রাত্রে যেন তাঁকে কেউ আর না বিরক্ত করে।

আর কিছু বলেননি? প্রশ্ন করলাম এবারে আমি।

হ্যাঁ, আরও জিজ্ঞাসা করেছিলেন, মেজর কৃষ্ণস্বামী ও বলদেববাবু চলে গিয়েছেন কি না।

আমি তখন বললাম যে, তাঁরা যাননি, তখনও দাবা খেলছেন। সে কথা শুনে বললেন, এই ঠান্ডার মধ্যে যেন তাঁরা এত রাত্রে আর না ফিরে যান। তাঁদের এখানে রাত্রিবাসের ব্যবস্থা করে দিতে বলেছিলেন।

ও। তা হলে দেখা যাচ্ছে রাত সোয়া এগারোটা পর্যন্ত মিস্টার গুপ্ত জীবিতই ছিলেন, মেজর! বললাম আমিই কথাটা।

রাত সোয়া এগারোটা তো বটেই। রাত সাড়ে এগারোটা পর্যন্তও তিনি বোধহয় জীবিতই ছিলেন। কথাটা বললেন এবারে আবার মেজর কৃষ্ণস্বামীই—আমার মুখের দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত শান্তকণ্ঠে।

কীরকম? তাকালাম সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে মেজরের মুখের দিকে।

রাত সাড়ে এগারোটা নাগাদই হবে, আমি বাথরুমে যাচ্ছিলাম, সেই সময়ই সামনের ও-বারান্দা দিয়ে যাওয়ার সময় স্পষ্ট আমি মিস্টার গুপ্তর কণ্ঠস্বর শুনেছিলাম।

আপনি তাঁর গলার স্বর শুনেছিলেন?

হ্যাঁ। কাকে যেন তিনি বেশ চড়া গলায় কী সব বলছিলেন। কথাগুলো অবিশ্যি স্পষ্ট আমি শুনতে পাইনি, তবে বাথরুমের জানলা-পথে ক্ষীণ চাঁদের আলোয় কে একজন লোককে আমি খুব দ্রুত এ-বাড়ির পিছনের বাগানে যে-আউট-হাউসটা আছে, সেই দিকে যেতে দেখেছি—।

কী বলছেন আপনি, মেজর?—প্রশ্নটা না করে আমি পারি না।

হ্যাঁ, তখন ব্যাপারটা বিশেষ কিছু মনে হয়নি, কিন্তু এখন—।

আশ্চর্য! অত রাত্রে কে বাড়ির পিছনের বাগানে গিয়েছিল আর কেনই বা সেই বাগানের মধ্যেকার আউট-হাউসের দিকে গিয়েছিল?

ব্যাপারটা আমার কাছে কেমন যেন বিশ্রী গোলমেলে মনে হয়।

বললাম, কিন্তু এই প্রচণ্ড শীতে কে আবার আউট-হাউসে যাবে আর কেনই বা যাবে—এটাই তো আমি বুঝে উঠতে পারছি না, মেজর!

কিন্তু কেউ যে গিয়েছিল সে-বিষয়ে তো কোনও সন্দেহই থাকতে পারে না, ডাক্তার!

তা পারে না। তবে—, বলে আমি আবদুলের মুখের দিকে তাকালাম, আবদুল!

ডক্টরসাব—।

আমি চলে যাওয়ার পর কেউ কি তোমার সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল? বা কারও আজ রাত্রে আসবার কোনও কথা ছিল?

কেউ তো আসেনি। আবদুল বললে।

অমলেন্দুবাবু, আপনি কিছু জানেন?

না।

হুঁ। তা হলে কেউ আসেনি তুমি ঠিক জানো, আবদুল?

কী বলছেন, ডক্টরসাব, কেউ এ-বাড়িতে এলে আমি জানতে পারতাম না? তা ছাড়া, আপনি তো জানেন, সদর দরজার পাশের ছোট ঘরটাতেই আমি থাকি। আপনি চলে যাওয়ার পর থেকে তো আমার ঘরেই আমি ছিলাম।

সত্যিই তো, কেউ এসে থাকলে আবদুল নিশ্চয়ই জানত। মেজর বললেন।

কথাটা ঠিক তা নয়, মেজর। বলে আমি আজ রাত্রে এ-বাড়ি থেকে চলে যাওয়ার সময় যে অপরিচিত এক ব্যক্তির সঙ্গে আমার ধাক্কা লেগেছিল, সেই ঘটনাটা সংক্ষেপে বর্ণনা করলাম।

আই সি—তা হলে—।

কিন্তু মেজরের কথা শেষ হল না।

বাইরে ওই সময় গাড়ির আওয়াজ পাওয়া গেল।

এবং সকলেই আমরা সেই শব্দে যেন সহসা উৎকর্ণ হয়ে উঠলাম।

আট

আমিই সর্বপ্রথম বললাম, একটা গাড়ির আওয়াজ পাওয়া গেল যেন।

বোধহয় থানার ও. সি. ব্রিজনন্দন পান্ডে এলেন। মেজর বললেন।

মিস্টার চক্রবর্তী, যান, দেখুন গিয়ে। বললাম আমি।

অমলেন্দু ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

আমাদের ধারণা ভ্রান্ত নয়। একটু পরেই জুতোর মচ-মচ শব্দ তুলে অমলেন্দুর সঙ্গে থানা-অফিসার পান্ডে এসে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলেন।

লোকটির সঙ্গে আমার কিছুটা পূর্ব-পরিচয় ছিল।

যেমন বেঁটে তেমনি ঘোর কৃষ্ণবর্ণ লোকটার গায়ের রং। তার ওপরে আবার সরু প্যাঁকাটির মতো চেহারা। চুপসে যাওয়া গাল। ওষ্ঠের উপর একজোড়া কাঁচায় পাকায় মেশানো বিরাট গোঁফ। উলের একটা মাঙ্কি-ক্যাপ মাথায় থাকার দরুন গোঁফ জোড়াটা একটু যেন বেশিই উদ্ধত দেখাচ্ছিল। পায়ে ভারী বুট, গায়ে কালো গরম গ্রেট কোট।

লোকটার চেহারাটা যেমন কুৎসিত, তেমনি আচরণে দাম্ভিক এবং মেজাজটাও রুক্ষ-কর্কশ।

কথাবার্তার মধ্যে একটা মুদ্রাদোষ আছে। অজস্রবার 'মারো গোলি' কথাটি ব্যবহার করেন।

ঘরে ঢুকবার সঙ্গে-সঙ্গেই কক্ষ-কর্কশ কণ্ঠে বলে উঠলেন, এই ঠান্ডার রাত্রে এসব কী ব্যাপার? মারো গোলি! আরে কিঁউ, ডক্টরসাব—।

হ্যাঁ, মিস্টার পান্ডে—।

মাবো গোলি! লেকিন সাচমুচ কেয়া—।

হ্যাঁ দেখুন না, এই যে—বলে ইঙ্গিতে মৃত সূর্যপ্রসাদকে দেখালাম।

এগিয়ে এসে এবাবে স্বচক্ষে মৃতদেহ দেখে পান্ডে বলে উঠলেন, মারো গোলি! এ যে দেখছি সত্যি-সত্যিই—।

হ্যাঁ-—।

কিন্তু কী করে এ হল? পান্ডেই আবাব প্রশ্ন করলেন।

সংক্ষেপে আমিই তখন ব্যাপারটা বলে গেলাম।

শুনতে-শুনতে পান্ডে তাঁর বিরাট গোঁফে তা দিচ্ছিলেন। আমার বক্তব্য শেষ হতেই বললেন, কিন্তু সে যাই হোক, মারো গোলি, কেউ ঘরের মধ্যে আজ রাত্রে এখান থেকে আপনারা চলে যাবার পর কোনও এক সময়ে সকলের অজ্ঞাতে ঢুকেছিল নিশ্চয়ই। এবং সে-ই ওঁকে মার্ডার করে গিয়েছে।

সেটা তো স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।—বললেন মেজর।

মারো গোলি। কিন্তু আপনারা তো বলছেন দবজা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল, আপনারা দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকেছেন! তবে হত্যাকারী এ-ঘরে ঢুকল কোন পথে?

কথাটা বলে এদিক-ওদিক তাকাতে-তাকাতে পান্ডের চোখের তারা দুটো যেন সহসা আনন্দে নেচে উঠল। তিনি বললেন, মারো গোলি! সমঝ গিয়া, ওই খিড়কিপথে নিশ্চয়ই সে ঘরে ঢুকেছিল। বলে বাগানের দিক্কার খোলা জানলাটার প্রতি আমাদের সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন।

সত্যিই তো। জানলাটা যে খোলা, এতক্ষণ তা কারওরই নজরে পড়েনি। ওই জানলাপথেই তো অনায়াসে কোনও আততায়ী এই ঘরে ঢুকে সূর্যপ্রসাদকে হত্যা করে যেতে পারে।

সহসা ওই সময় সেই খোলা জানলাপথে একঝলক শীতের মধ্যরাত্রির হিমকণাবাহী বাতাস ঘরের মধ্যে এসে যেন একটা ঝাপটা দিয়ে গেল আমার সর্বদেহে।

মারো গোলি! চলেন, চলেন—পাশের ঘরে চলেন, ডক্টরসাব। পান্ডে হঠাৎ বললেন।

অতঃপর সকলে আমরা পাশের ঘরে এলাম।

*

সূর্যপ্রসাদের শয়নঘর।

মিস্টার পান্ডের আগমনের সঙ্গে-সঙ্গেই বাড়ির মধ্যে যে যেখানে ছিল সকলেই এসে সূর্যপ্রসাদের শয়নঘরের আশেপাশে ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল। ভৃত্যদের মধ্যে একমাত্র আবদুল ব্যতীত অন্যান্য সকলেই ছিল বাইরের বারান্দায় ওই ভিড়ের মধ্যে। এবং ঘরের মধ্যে রইলেন রাধিকাপ্রসাদ, মেজর কৃষ্ণস্বামী। বলদেব সিংহও তখন নিজেকে অনেকটা সামলে নিয়েছেন বলে তিনিও এলেন। এবং সুবল-বিমল তারাও ঘরের মধ্যে রইল। আমি তো ছিলামই।

মিস্টার পান্ডে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে ঘরের মাঝখানে বসলেন পুলিশি মর্যাদায় ও গাম্ভীর্য নিয়ে।

বাকি অন্যান্য সকলে আমরা তাঁর চারপাশে দাঁড়িয়েই রইলাম।

কথা বললেন প্রথমে মিস্টার পান্ডেই, কেউ এসেছিল ঘরের মধ্যে ওই জানলাপথেই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। আর সেই লোকই মিস্টার গুপ্তকে হত্যা করে গিয়েছে নিঃসন্দেহে।

আমরা সকলেই নিঃশব্দে মিস্টার পান্ডের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

পান্ডে আবার বলতে লাগলেন, আচ্ছা একটা কথা, এই ঘর বা ঘরের মধ্যে থেকে কোনও কিছু চুরি বা খোয়া গিয়েছে বলে আপনাদের মনে হয়? রাধিকাবাবু, অমলেন্দুবাবু, একবারটি সব পরীক্ষা করে দেখুন তো। আবদুল, তুমিও দেখো।

পান্ডের নির্দেশ মতো রাধিকাবাবু, আব্দুল ও অমলেন্দু অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হলেন।

মেজর ওই সময় পান্ডেকে উদ্দেশ করে বললেন, মিস্টার পান্ডে, আপনি কি মনে করেন ব্যাপারটা চুরি-ডাকাতির মতো কিছু?

মারো গোলি! তা ছাড়া আর কী হতে পারে? এভাবে ঘাড়ের পিছনদিকে নিজের হাতে ছোরা বিঁধিয়ে নিশ্চয়ই কেউ আত্মহত্যা করতে পারেন না! মিস্টার গুপ্তকে হত্যা করেছে কেউ, আপনি কী বলেন, ডক্টরসাব?

কথাগুলো বলে পান্ডে আমার মুখের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালেন।

আমি কোনও জবাবই দিলাম না।

মারো গোলি! ইট ইজ মার্ডার, রাইট এনাফ! মাথাটা দুলিয়ে গোঁফে তা দিয়ে পান্ডে আবার কথাটা বললেন।

ওই সময় রাধিকাপ্রসাদ ও আবদুল ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলে। রাধিকাপ্রসাদ বললেন, না মিস্টার পান্ডে, ঘরের থেকে কিছু চুরি বা খোয়া গিয়েছে বলে মনে হচ্ছে না। যেখানকার যেটি তেমনিই আছে।

সব ঠিক আছে?

হ্যাঁ।

তা হলে তো দেখা যাচ্ছে স্রেফ সূর্যকে হত্যা করবার জন্যেই কেউ এ-ঘরে এসেছিল আজ রাত্রে। মিস্টার গুপ্তকে হত্যা করা ছাড়া তার কোনও উদ্দেশ্যই ছিল না। কথাটা বললেন মেজর কৃষ্ণস্বামী।

তাই যদি হয় তো এ খুনের উদ্দেশ্য কী? বললাম আমি।

মারো গোলি! রাইট ইউ আর, ডক্টর সেন—তা হলে কেন মিস্টার গুপ্তকে হত্যা করা হল? বললেন পান্ডে।

ওই সময় অমলেন্দু এসে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল। তার হাতে খানকয়েক চিঠি।

ওগুলো কী অমলেন্দুবাবু? প্রশ্নটা করলেন মেজর।

এই চিঠিগুলো মিস্টার গুপ্তর চেয়ারের নীচে পড়েছিল।

মারো গোলি, দেখি, দেখি—হাত বাড়িয়ে চিঠিগুলো নিলেন পাণ্ডে।

চিঠিগুলোর ওপর নজর পড়তেই দেখলাম, আজ রাত্রে বিশেষ করে যে ব্লু রঙের এনভেলাপ থেকে ব্লু রঙের লেটার কাগজে লেখা চিঠিটা বের করে সূর্যপ্রসাদ কিছুটা আমাকে পড়ে শুনিয়েছিলেন, চিঠিগুলোর মধ্যে সেই বিশেষ চিঠিটি কিন্তু নেই।

মুখ দিয়ে সেই চিঠির কথাটা প্রায় আমার বের হয়েই যাচ্ছিল, কিন্তু কী ভেবে আমি আপাতত কথাটা চেপেই গেলাম। কারণ, সে-চিঠির কথা উঠলেই হয়তো আরও অনেক কথা এসে পড়বে। কাজ কি আর সূর্যপ্রসাদের পারিবারিক কলঙ্ককে ঘাঁটিয়ে! তার চাইতে চুপ করে থাকাই ভালো। বিশেষ করে বোবার শত্রু নেই।

পাণ্ডে চিঠিগুলোতে একবার চোখ বুলিয়ে সেগুলো নিজের পকেটেই রেখে দিলেন।

একটা কথা, মিস্টার পাণ্ডে—।

মেজরের কথায় পাণ্ডে মুখ তুলে তাঁর দিকে তাকালেন, হ্যাঁ, বলুন!

আপনি বলছেন, হত্যাকারী ওই ঘরের জানলাপথেই ও-ঘরে প্রবেশ করেছিল, কিন্তু হাউ? দোতলায় ঘরের জানলাপথে এসে সেই আততায়ী কী করে তা হলে ঘরে ঢুকল?

হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন, জানলাটা আমাদের একবার পরীক্ষা করে দেখা উচিত ছিল। বলতে-বলতে পাণ্ডে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন ও পাশের ঘরের দিকে অগ্রসব হলেন।

বলা বাহুল্য আমরাও সকলে তাঁকে অনুসরণ করলাম।

আবার সেই ঘর।

জানলাটার পাল্লা দুটো বাইরের দিকে খোলা থাকলেও পরদাটা টানা ছিল। হাত দিয়ে পরদাটা সরিয়ে জানলাপথে পাণ্ডে বাইরের দিকে ঝুঁকে, পকেট থেকে একটা টর্চবাতি বের করে তার আলোয় পরীক্ষা করে দেখতে লাগলেন।

দেখা গেল জানলাটার ঠিক নীচেই গ্যারেজটা।

এবং ঢালু অ্যাসবেসটাসের ছাদ।

অতএব অনায়াসেই সেই ছাদ থেকে জানলার ঠিক নীচেই চওড়া কারনিসের ওপর উঠে এই ঘরে জানলাপথে প্রবেশ করাটা কারও পক্ষে এমন কিছুই কষ্টসাধ্য ব্যাপার একটা নয়।

পাণ্ডের হাতের টর্চের আলোয় আরও একটা অকাট্য প্রমাণও আমাদের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করল। কতকগুলো কাদামাখা রবার-সোল জুতোর ছাপ সেই গ্যারেজের ছাদে ও জানলার নীচে কারনিসে তখনও সুস্পষ্ট রয়েছে।

ইউ সি ডক্টর সেন, জুতোর ওই ছাপগুলো!

হ্যাঁ—।

তা হলেই বুঝতে পারছেন, ধারণা আমার মিথ্যা নয়? সামবডি এই জানলাপথেই এ-ঘরে আজ রাত্রে এসে মিঃ গুপ্তকে ব্রুটালি মার্ডার করে গিয়েছে! পাণ্ডে বললেন।

হুঁ।

আর আমার মনে হয়, আজ এখান থেকে ফেরবার পথে গেটের সামনে যে-লোকটির সঙ্গে আপনার ধাক্কা লেগেছিল, যে আপনাকে লিলি কটেজের কথা জিজ্ঞাসা করেছিল, এ নিশ্চয়ই সেই। এ তারই কাজ। পাণ্ডে বললেন।

আমি কোনও জবাব দিলাম না পাণ্ডের কথায়।

আবার আমরা সকলে পাশের ঘরে এসে ঢুকলাম।

রাধিকাপ্রসাদ ওই সময়ে বললেন, কিন্তু একটা কথা আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না, দারোগা সাহেব—।

কী?

দাদার তো কেউ শত্রু ছিল বলে আমি জানি না। তা ছাড়া, ঘরের কোনও কিছু চুরিও যায়নি, তবে সেক্ষেত্রে কে এমনি করে দাদাকে হত্যা করে গেল?

মারো গোলি! সেসব কথা পরে চিন্তা করলেও চলবে। আপাতত আমরা বুঝতে পারছি, ওই জানলাপথে এসেই কেউ মিস্টার গুপ্তকে হত্যা করে গিয়েছে। আর হত্যা করেছে এ-ও বুঝতে পারছি সেই লোকটিই, যার সঙ্গে আজ রাতে গেটের সামনে ডাক্তার সেনের ধাক্কা লেগেছিল। তাকে ধরতে পারলেই সব ফয়সালা হয়ে যাবে। আমি তাকে ধরবই। কিন্তু রাত প্রায় দুটো হল। আজ চলি। আমি আবার কাল সকালে আসব।

পান্ডে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত হলেন। এবং যে-ঘরে মৃতদেহ ছিল সেই ঘরের দরজায় তালা দিয়ে দুজন পুলিশ-প্রহরী লিলি কটেজে মোতায়েন রেখে আমি ও মিস্টার পান্ডে সে-রাতের মতো লিলি কটেজ থেকে বের হয়ে এলাম।

চলুন, ডাক্তার সেন, আপনাকে আপনার বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে যাব'খন।

না, ধন্যবাদ—এ-পথটুকু আমি হেঁটেই যেতে পারব।

হাতের কালো ডাক্তারি ব্যাগটা নিয়ে আমি হাঁটা শুরু করলাম।

ড্রাইভার গাড়িতে স্টার্ট দিল। পান্ডের গাড়ি চলে গেল আমার পাশ দিয়ে।

নয়

শয্যায় শোওয়ার পর সে-রাত্রে ক্লান্ত দু-চোখের পাতায় কখন যে ঘুম নেমে এসেছিল টের পাইনি।

ঘুম ভাঙল মিতার ডাকে।

চোখ মেলে দেখি, হাতে এককাপ চা নিয়ে শয্যার সামনে দাঁড়িয়ে আছে মিতা। সদ্য স্নানের শেষে ভিজে চুলের রাশ পিঠের উপর ছড়ানো।

মিতার প্রিয় কেশতৈল কালিফোর্নিয়ান পপির মিষ্টি গন্ধ নাকে এসে লাগল।

উঃ, অনেক বেলা হয়ে গিয়েছে! ডাকিসনি কেন রে?

চায়ের কাপটা আমার হাতে তুলে দিতে-দিতে মিতা বললে, বিমলবাবু সেই কখন থেকে এসে তোমার জন্যে যে বাইরের ঘরে বসে আছেন!

বিমলবাবু! হঠাৎ?

তা জানি না, দেখো গিয়ে।

চায়ের কাপটা নিঃশেষ করে গায়ে একটা চাদর জড়িয়ে তাড়াতাড়ি বাইরের ঘরে এসে ঢুকলাম।

বিমলবাবু, কী খবর, এই সকালে?

একটা চেয়ারের ওপরে কেমন যেন নিঝুম হয়ে বসেছিলেন বিমলবাবু। চোখেমুখে একটা বেদনার বিষণ্ণ ক্লান্ত ছায়া।

আমার ডাকে চমকে মুখ তুলে তাকালেন।

টিকতে পারলাম না বাড়িতে, ডাক্তার সেন। ব্যাপারটা যেন সত্যিই বিশ্বাস করতে এখনও পারছি না। জেঠামণি নেই এ যেন ভাবতেও পারছি না এখনও। বলতে-বলতে চোখ দুটো বিমলবাবুর ছলছল করে উঠল। গলার স্বরটা যেন কেমন রুদ্ধ হয়ে এল।

চা খেয়েছেন?

না।

বসুন, মিতাকে চা দিতে বলি।

না-না—চায়ের কোনও দরকার নেই, ডাক্তার সেন। আমি একটা কথা ভাবছিলাম—।

বলুন?

মিতা দেবী বলছিলেন—।

মিতা! কী বলছিল সে?

বিখ্যাত কে এক প্রাইভেট ডিটেকটিভ নাকি এখানে আছেন ওই 'সানি ভিলায়'—।

কিরীটীবাবুর কথা বলছেন?

হ্যাঁ-হ্যাঁ—উনি বলছিলেন, তাঁর সাহায্য নিলে নাকি অনায়াসেই তিনি জেঠামণির হত্যাকারীকে ধরিয়ে দিতে পারবেন।

তা পারবেন কি না জানি না। তবে ভদ্রলোক শুনেছি খুব নামকরা একজন ডিটেকটিভ। এবং অনেক বড়-বড় জটিল হত্যারহস্যের মীমাংসাও করেছেন। কিন্তু—।

না, এর মধ্যে আর কোনও কিন্তুই থাকতে পারে না, ডাক্তার সেন। জেঠামণির এইভাবে মৃত্যু, মিস্টার পান্ডের দ্বারা কতদূর কী সম্ভব হবে জানি না। কিন্তু সমর যখন নিরুদ্দিষ্ট তখন আমাদেরও তো একটা কর্তব্য বলে জিনিস আছে তাঁব প্রতি।

তা নিশ্চয় আছে। তবে—।

একটা কথা গতরাত থেকেই কি আমার মনে হচ্ছে, জানেন, ডাক্তার সেন?

কী?

শেষপর্যন্ত আমিই জেঠামণিকে শেষ জীবিতাবস্থায় দেখেছিলাম! এক্ষেত্রে কেউ মুখে না বললেও বা প্রকাশ না করলেও, আমার ওপরে একটা সন্দেহ হওয়াটা তো অস্বাভাবিক নয়!

কী বলছেন আপনি, বিমলবাবু?

হ্যাঁ, ডাক্তার সেন, আপনি কাল রাত্রে লক্ষ করেছিলেন কি না জানি না, কিন্তু সোয়া বা সাড়ে এগারোটার সময় আমি জেঠামণির ঘরে গিয়েছিলাম কথাটা শোনার পরই মেজর কৃষ্ণস্বামীর চোখেমুখে ও মিস্টার পান্ডের চোখে যে-ভাবটা আমি ফুটে উঠতে দেখেছিলাম, সেই কথাটাই আমি বাকি রাতটুকু শুয়ে-শুয়ে ভেবেছি। শেষপর্যন্ত ভোর হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই আর থাকতে না পেরে বাড়ি থেকে বের হয়ে পড়েছি। রাস্তা দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে মনে হচ্ছিল, আপনি, আপনিও কি তাঁদেরই মতো—।

ছিঃ, আপনি দেখছি একেবারে ছেলেমানুষ, বিমলবাবু!

না-না—ডাক্তার সেন। ভগবান জানেন, জেঠামণিব দেহ কাল রাত্রে আমি স্পর্শও কবিনি। কিন্তু এ-সন্দেহের হাত থেকে তো আমি রেহাই পাব না, যতক্ষণ না পর্যন্ত প্রমাণিত হচ্ছে যে সত্যি-সত্যি অন্য কেউ—।

কথাটা অবিশ্যি আপনি একেবারে মিথ্যে বলেননি, বিমলবাবু, তবু আমার কী মনে হয় জানেন?

কী?

পুলিশ এ-ব্যাপারে যেমন অনুসন্ধান করতে চায় করুক। কিরীটীবাবুকে এ-ব্যাপারের মধ্যে টেনে আনাটা বোধহয় বিবেচনার কাজ হবে না।

কেন? কেন আপনি এ-কথা বলছেন, ডাক্তার সেন?

ধরুন কিরীটী রায় অনুসন্ধানের ব্যাপারে হাত দিলে যদি এমন কোনও আপনাদের পারিবারিক কলঙ্কই শেষপর্যন্ত বের হয়ে পড়ে, তখন আপনারা সকলেই কি—।

তা হোক। তবু—তবু এর একটা মীমাংসা আমার দিক থেকে আমি চাই-ই। আর সেটা না হওয়া পর্যন্ত আমি কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছি না, ডাক্তার সেন।

তবে আর কী বলব বলুন।

আপনার তো শুনলাম কিরীটী রায়ের সঙ্গে আলাপ হয়েছে, চলুন না, একবার তাঁর কাছে যাই—।

বেশ। কিন্তু আপনার বাবার একটা মতামতের তো প্রয়োজন আছে।

তা আছে অবশ্যই। তবে আমি জানি, বাবা নিশ্চয়ই এতে অমত করবেন না।

তবু আপনি কিরীটীবাবুর কাছে যাওয়ার আগে রাধিকাবাবুকে একটা ফোন করে নিলে পারতেন—।

বেশ তাই করছি।

অতঃপর আমার বাড়ি থেকেই ফোনে বিমলবাবু তাঁর বাবার সঙ্গে কথাবার্তা বলে আমাকে বললেন, চলুন ডাক্তার সেন, বাবা মত দিয়েছেন।

এখুনি যাবেন?

হ্যাঁ, এখুনি যাব, চলুন।

বেশ চলুন।

আমাদেব বাড়ি থেকে 'সানি ভিলা'র দূরত্ব সামান্যই।

কিরীটীবাবু বাইরের বারান্দায় রোদের মধ্যে একটা বেতের চেয়ারে বসে কী একটা বই পড়ছিলেন। আমাদের দেখে উঠে দাঁড়িয়ে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন, আসুন-আসুন, ডাক্তার সেন। তারপর সকালবেলাতেই, কী খবর?

বিমলবাবুর পরিচয় দিয়ে সংক্ষেপে তখন আমাদের আসবার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করতেই সহসা মনে হল যেন কিরীটীবাবুর চোখের তারা দুটো সূর্যপ্রসাদের মৃত্যুসংবাদে ক্ষণেকের জন্য কী এক অস্বাভাবিক দ্যুতিতে চকচক করে উঠল।

এবং পরক্ষণেই সে-ভাবটা সামলে নিয়ে কিরীটীবাবু চাপা উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, সে কী!

হ্যাঁ, আর বিমলবাবু তাই আপনাকে অনুরোধ করতে এসেছেন যদি আপনি অনুগ্রহ করে ওঁর জেঠামশায়ের মৃত্যুর ব্যাপারটার মীমাংসা করে দেওয়ার ভারটা নেন!

আমার কথা শুনে কিরীটীবাবু কয়েক মুহূর্ত কোনও কথাই বললেন না। নিঃশব্দে বসে রইলেন যেমন ছিলেন।

তারপর একসময় মৃদুকণ্ঠে কিরীটীবাবু কথা বললেন, কিন্তু একমাত্র যে-কারণটি বললেন মিস্টার গুপ্ত, সেই কারণেই কি আপনি আমার সাহায্যের জন্যে ডাক্তাব সেনকে নিয়ে আমার কাছে এসেছেন? না, আপনার মতে জেঠামণির একমাত্র পুত্র, নিরুদ্দিষ্ট সমরবাবুর ওপরেও পুলিশের সন্দেহ পড়তে পারে সেইজন্যেই—।

আশ্চর্য, আশ্চর্য! আপনি ঠিক-ঠিক ধরেছেন, মিস্টার রায়। বিমলবাবু বললেন, সমর আমার সমবয়েসি এবং জেঠতুতো ভাই-ই কেবল নয়, সে আমার সত্যিকারের বন্ধু ও সুহৃদ। আর ডাক্তার সেনের চাইতে তাকে আমি ঢের বেশি চিনি।

এ-কথা কেন বলছেন? আমিই বিমলবাবুকে প্রশ্নটা করলাম।

কেন যে কথাটা বলছি আপনার বোঝা উচিত ছিল, ডাক্তার সেন! তীক্ষ্ণকণ্ঠে বিমলবাবু প্রত্যুত্তর দিলেন।

না, বিমলবাবু, আপনি ভুল করেছেন। সমরবাবুর কথা মুহূর্তের জন্যেও আমার মনে হয়নি।

তাই যদি না হবে তো কেন আপনি কাল অত রাত্রে আমাদের বাড়ি থেকে ফেরবার পথে 'তাজ' হোটেলে গিয়েছিলেন, ডাক্তার সেন?

বিমলবাবুর কথায় মুহূর্তকাল আমি স্তব্ধ হয়ে থাকি। চেয়ে দেখলাম কিরীটীও নির্বাক বসে আমাদেরই মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন।

আপনি তা হলে গতরাত্রে আমাকে অনুসরণ করেছিলেন, বিমলবাবু?

না।

তবে আপনি জানলেন কী করে যে, কাল রাত্রে আমি 'তাজ' হোটেলে গিয়েছিলাম?

আজ সকালে আমি সেখানে গিয়েছিলাম।

কেন বলুন তো?

কথাটা তা হলে আপনাকে খুলেই বলি, মিস্টার রায়। কাল সন্ধেবেলাতেই বাজার থেকে ফেরবার পথে আমার যেন মনে হয়েছিল সমরকে 'তাজ' হোটেলে ঢুকতে দেখেছিলাম। কিন্তু বাড়িতে কাজ থাকায় তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে হয়েছিল বলে ব্যাপারটার অনুসন্ধান করতে পারিনি সেসময়। কিন্তু গতরাত্রের ব্যাপারের পর আজ ভোরে উঠেই 'তাজ' হোটেলে না গিয়েও আমি পারিনি।

সহসা ওই সময় কিরীটী রায় প্রশ্ন করলেন, সমরবাবুর সঙ্গে দেখা হল?

না, মিস্টার রায়। তবে দেখা তার না পেলেও সমর যে গত দু-দিন 'তাজ' হোটেলেই ঘরভাড়া করে ছিল সে-সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হতে পেরেছি।

কীসে নিঃসন্দেহ হলেন, বিমলবাবু? প্রশ্ন করলেন আবার কিরীটীই।

হোটেলের রেজিস্টারে তার নাম রয়েছে। আর সেইখানকাব চাকরদেব মুখেই শুনলাম, কাল রাত্রে ডাক্তার সেন সেখানে গিয়েছিলেন।

বাধা দিলেন এবারে কিরীটীই। বললেন, ডাক্তার সেনেব কথা থাক। সমরবাবুর কথাটাই আগে শেষ করুন, বিমলবাবু।

কাল রাত ন'টার পর সমর হোটেল থেকে সেই যে কোথায চলে গিযেছে আর সে ফিবে আসেনি।

হুঁ। তার জিনিসপত্র কিছু ছিল না হোটেলে?

হ্যাঁ, একটা স্যুটকেস ও একপ্রস্থ জামাকাপড় সে হোটেলেই ফেলে রেখে গিয়েছে।

হুঁ। বলে কিরীটী এবারে আমার দিকে তাকিযে বললেন, ডাক্তার সেন, আপনি তা হলে কাল রাত্রে 'তাজ' হোটেলে গিয়েছিলেন?

হ্যাঁ।

কিন্তু কেন, অফকোর্স ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড—।

নিশ্চয় না। বিমলবাবু ঠিকই ধরেছেন। সমরকে আমি খুব ভালো করেই জানি, মিস্টার রায়। এবং সে জুয়া খেললেও এবং বাপের নাম জাল করে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে নিলেও আমি কিছুতেই বিশ্বাস করি না, সে তার বাপকে ওইভাবে নিষ্ঠুরের মতো হত্যা করতে পারে। তবে এটা ঠিকই, সমরের ওপরে পুলিশের সন্দেহ জাগতে পারে ভেবেই আমি গিয়েছিলাম তাকে আপাতত কিছুদিন গা-ঢাকা দিয়ে থাকবার জন্যে বলতে।

আই সি। তা হলে আপনি জানতেন যে সমরবাবু 'তাজ' হোটেলেই ছিলেন?

হ্যাঁ। মিতার মুখে কথাটা শুনে আমি খোঁজ নিয়ে জানতে পেরেছিলাম যে সে 'তাজ' হোটেলেই আত্মগোপন করে আছে।

কিন্তু ডাক্তার সেন, আমি যদি বলি ঠিক ওই কারণেই কাল অত রাত্রে আপনি 'তাজ' হোটেলে যাননি?

কী বলছেন আপনি, মিস্টার রায়? তবে আমি কী জন্য গিয়েছিলাম বলে আপনার ধারণা?

আপনি মনে-মনে চেয়েছিলেন যে সমর যেন কাল সারারাত হোটেলেই থাকে। আর সেইজন্যেই আপনি গিয়েছিলেন কাল অত রাত্রে হোটেলে। হ্যাঁ, তবে এ-ও ঠিক, সমরবাবু এইভাবে নিরুদ্দেশ হওয়ায় স্বভাবতই পুলিশ তাঁকে তাঁর পিতার হত্যার ব্যাপারে সন্দেহ করবেই। এবং বর্তমানে তার খোঁজ না পাওয়া পর্যন্ত তাঁর পোজিশন যে অত্যন্ত সন্দেহজনক সেটাও স্বাভাবিক। কিন্তু যাক সে-কথা। বিমলবাবু, আমি আপনার জেঠামণির হত্যারহস্যের ব্যাপারে সত্যিই

একটু ইন্টারেস্টেড ফিল করছি।

আপনি তা হলে কেসটা হাতে নিন, মিস্টার রায়। বিমলবাবু বললেন।

নিয়েছি। চলুন, একবার অকুস্থানটা দেখে আসি।

চলুন।

সকলে তখুনি আমরা 'লিলি কটেজে'র উদ্দেশে বের হয়ে পড়লাম।

দশ

আমরা সকলে গিয়ে যখন 'লিলি কটেজে' উপস্থিত হলাম, মিস্টার পান্ডে তার আগেই সেখানে এসে উপস্থিত হয়ে মৃতদেহ মর্গে পাঠাবার ব্যাপারে ব্যস্ত ছিলেন।

আমিই কিরীটী রায়ের সঙ্গে মিস্টার পান্ডের পরিচয় করিয়ে দিলাম ও তাঁর আসার উদ্দেশ্যটাও ব্যক্ত করলাম।

কিন্তু পান্ডের চোখমুখের ভাব দেখে বুঝতে কষ্ট হল না, ব্যাপারটা তাঁর বিশেষ মনঃপূত হয়নি। তবে কথায় সেরকম কিছু প্রকাশ না করে কেবল বললেন, বেশ তো, বেশ তো, অত্যন্ত আনন্দের কথা।

কিরীটীও জবাব দিলেন, বর্তমান কেসের ইনভেসটিগেশনের ব্যাপারে আমি অংশগ্রহণ করলেও আমি কিন্তু আপনার পিছনেই থাকতে চাই, মিস্টার পান্ডে। আপনিই আসল, আমি শুধু আপনার সঙ্গে কাজ করব।

বুঝলাম সুচতুর কিরীটী রায় একটি চালেই পান্ডেকে মাত করে দিলেন। পান্ডে কিরীটীর কথায় বিশেষ খুশি হয়ে বললেন, বিলক্ষণ, আপনার নাম যে আমার অজানা তা তো নয়, মিস্টার রায়। জানি বইকী, আপনিও গুণী ব্যক্তি।

না-না—আপনাদের বাদ দিয়ে আমাদের কতটুকুই বা ক্ষমতা! আপনারা নেহাত সাহায্য করেন বলেই না—।

মারো গোলি!

সকলে হেসে উঠলেন।

কিরীটী অতঃপর বললেন, ডাক্তার সেন ও বিমলবাবুর মুখে অবিশ্যি ইতিপূর্বেই কিছুটা শুনেছি, তা হলেও বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে আপনার মতামতটাই সর্বাগ্রে আমি জানতে চাই, মিস্টার পান্ডে!

নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই—বলে পান্ডে সোৎসাহে তাঁর মতামত ব্যক্ত করে গেলেন।

সব শোনার পর কিরীটী বললেন, ডাক্তার সেনের কথায় ও আপনার কথায় তা হলে বোঝা যাচ্ছে, মিস্টার পান্ডে, কাল রাত্রে আবদুলের মুভমেন্ট সত্যিই একটু সন্দেহজনক ছিল, কী বলেন?

আপনিই বলুন না, মিস্টার রায়, তাই নয় কি?

কিরীটী তাঁর কথার কোনও জবাব না দিয়ে দ্বিতীয় প্রশ্ন করলেন, ভালো কথা, সমরবাবু সম্পর্কে আপনার কী ওপিনিয়ন, মিস্টার পান্ডে?

কিরীটীর দ্বিতীয় প্রশ্নে এবারে দেখলাম মিস্টার পান্ডে যেন অত্যন্ত খুশি হয়ে উঠলেন। এবং বেশ আনন্দের সঙ্গেই বললেন, ম্যায় দেখতা হুঁ কি আপ সাচ্চা জহুরি হ্যায়। ইয়ে ভি বহুৎ খুশিকি বাত হ্যায় কি আপকো মাফিক হুঁশিয়ার ব্যক্তিকে সাথ মুঝে কাম করনেকো মৌকা মিলা। সত্যিই বলেছেন, মিস্টার রায়, সবার আগে আমাদের সমরেরই খোঁজ করতে হবে।

কিন্তু মিস্টার পান্ডে, হঠাৎ বিমলবাবু বলে উঠলেন বাধা দিয়ে, আপনার একটু ভুল হচ্ছে না কি?

ভুল।

হ্যাঁ, আমি হলপ করে বলতে পারি, সমর এ-কাজ করতে পারে না।

কে যে কী পারে আর কে যে কী পারে না আপনি যদি জানতেন, বিমলবাবু—হাসতে-হাসতে পান্ডে জবাব দিলেন।

এবারে কথা বললাম আমিই, কিন্তু সমরকে সন্দেহ করার ব্যাপারে আপনার নিশ্চয় যুক্তি আছে কিছু, মিস্টার পান্ডে!

যুক্তি! নিশ্চয়ই। যুক্তি আছে বইকী। হুটপাট করে আমরা পুলিশ অফিসাররা কখনও কোনও কাজ করি না, ডাক্তারসাব!

তা তো নিশ্চয়ই! কিন্তু—।

প্রথমত, ধরুন, আমরা সকলেই জেনেছি তার স্বভাবচরিত্র আদৌ ভালো ছিল না। জুয়োতে সে অভ্যস্ত ছিল। এবং মাত্র কিছুদিন আগে সে তার বাবার সই জাল করে ব্যাঙ্ক থেকে টাকাও তুলেছিল। যার ফলে সে কিছুদিন থেকে অ্যাবসকন্ড করে বেড়াচ্ছিল। দ্বিতীয়ত, বদ অভ্যাসের জন্যে বরাবরই তার একটা অর্থাভাব ছিল। তৃতীয়ত, সে কাল রাত্রে 'তাজ' হোটেলে ছিল। ফোর্থ পয়েন্ট হচ্ছে, যতদিন তার বাপ সূর্যপ্রসাদবাবু বেঁচে থাকতেন তার কাছে এ-বাড়ির দরজা ততদিন বন্ধই থাকত।

কিন্তু—, বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলেন আবার বিমলবাবু।

শুনুন, লেট মি ফিনিশ! সই জাল করার ব্যাপারেই আলাপপ্রসঙ্গে মাত্র কয়েক দিন পূর্বেই আমি সূর্যপ্রসাদবাবুর মুখেই শুনেছিলাম, ছেলের ওপরে তিনি এতখানি বিরক্ত হয়েছিলেন যে তার আর মুখদর্শনও করবেন না কোনওদিন বলেছিলেন। শুধু তাই নয়, এ-কথাও বলেছিলেন তিনি, তাঁর সম্পত্তির একটি কপর্দকও ছেলেকে দেবেন না। তারপর আমার ষষ্ঠ যুক্তি হচ্ছে, গতরাত্রে সাড়ে ন'টার পরে সেই যে সে 'তাজ' হোটেল থেকে বের হয়ে যায়, তারপর আর সে এখনও পর্যন্ত সেখানে ফেরেনি। সপ্তম পয়েন্ট, আমাদেরই একজন কনেস্টবল তাকে গতরাত্রে সাড়ে দশটা থেকে এগারোটার মধ্যে স্টেশন রোডে ঘুরতে দেখেছে। শুধু তাই নয়, আমার সর্বশেষ যুক্তি—যেটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, সেটা হচ্ছে কনেস্টবলটির মুখে সমরের সংবাদ পাওয়ার পর আজ নিজে আমি সকালে 'তাজ' হোটেলে তার অনুসন্ধানে গিয়ে তার ঘরে কী পেয়েছি জানেন, বিমলবাবু?

কী?

রবার সোল দেওয়া একজোড়া নয়, দু-জোড়া একই প্যাটার্নের জুতো...।

জুতো?

হ্যাঁ, আর সেই জুতোর একজোড়ার সোলে এখনও কাদা লেগে আছে। এবং যে-জুতোর ছাপের সঙ্গে লিলি কটেজের ঘরের জানলার কারনিসের ও গ্যারেজের ছাদের জুতোর ছাপের হুবহু মিলও পেয়েছি।

ঝড়ের মতো একটানা একটার পর একটা একগাদা যুক্তি এমনভাবে কণ্ঠে জোর দিয়ে পান্ডে বলে গেলেন যে, আমরা সকলেই যেন কয়েকটা মুহূর্ত নির্বাক হয়ে থাকি।

এরপরও কি, বিমলবাবু, আপনি বলবেন, সমরবাবু সন্দেহের বাইরে? নো-নো—আই অ্যাম ডেফিনিট—এ আর কারও কাজ নয়। সমরবাবুই—'

না-না—তবু, তবু বলব, মিস্টার পান্ডে, এ হতে পারে না। এ অসম্ভব।

বেশ তো। তার জন্যে আপনি ব্যস্তই বা হচ্ছেন কেন, বিমলবাবু? আদালত বিনা প্রমাণে তো আর কিছু তাকে শাস্তি দেবে না। ব্যাপারটা আদালতই বিচার করে দেখবে। কিন্তু যাক ওসব কথা। আমি এখুনি গিয়ে থানা থেকে ঠেলাগাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছি, মৃতদেহ মর্গে নিয়ে যাওয়ার জন্যে।

পাণ্ডে দরজার দিকে অগ্রসর হলেন।

আপনি চলে যাচ্ছেন, মিস্টার পাণ্ডে? প্রশ্ন করলেন কিরীটী।

হ্যাঁ, মিস্টার রায়। কেসটার একটা রিপোর্ট লিখতে হবে।

সন্ধের দিকে যদি আপনার ওদিকে যাই তো দেখা হবে?

নিশ্চয়ই আসবেন।

মিস্টার পাণ্ডে অতঃপর ঘর ছেড়ে চলে গেলেন।

পাণ্ডের প্রস্থানের সঙ্গে-সঙ্গে ঘরের মধ্যে যেন কয়েক মুহূর্তের জন্যে একটা পাষাণস্তব্ধতা নেমে এল।

সকলেই বোবার মতো দাঁড়িয়ে।

নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে কথা বললেন প্রথম কিরীটীবাবুই।

ডাকলেন মৃদুকণ্ঠে, ডাক্তার সেন।

বলুন।

মৃতদেহ যে-ঘরে আছে একবার চলুন সেই ঘরটা দেখব।

আসুন—।

অনেকগুলো যুক্তি সহযোগে মিস্টার পাণ্ডে বেশ জোর গলায় সমরই যে তার পিতার মৃত্যুর ব্যাপারে সুনিশ্চিত সন্দেহে চিহ্নিত, কথাটা বলে যাওয়ার পর থেকে মনটা সত্যিই যেন কেন আমার বিষণ্ণ হয়ে পড়েছিল। বাড়ির অন্যান্য সকলেও যেন মনে হল কেমন নিস্তব্ধ হয়ে গেছে।

কিন্তু লক্ষ করলাম, মিস্টার পাণ্ডের কথাগুলো যেন কিরীটী রায়ের মনে এতটুকু দাগও কাটতে পারেনি। কোনও পরিবর্তন, কোনও ভাববৈলক্ষণ্যই যেন কিরীটীর চোখেমুখে দেখতে পেলাম না।

তিনি যেন একান্ত নির্বিকার।

নিঃশব্দে কিরীটীবাবুকে নিয়ে আমি ও বিমলবাবু মৃতদেহ যে-ঘরে ছিল সেই ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করলাম।

লক্ষ করলাম, কিরীটী দরজার গোড়াতে দাঁড়িয়েই একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ঘরের যাবতীয় সব কিছুর ওপরই চোখ বুলিয়ে নিলেন।

শুধু তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বললেই ভুল হবে, যেন ছুরির ফলার মতোই দুটি চোখের তারা তাঁর ঝকঝক করছিল সেসময়।

তারপর ধীরে-ধীরে এগিয়ে গিয়ে কিরীটী একসময় মৃতদেহের একেবারে সামনাসামনি এসে দাঁড়ালেন।

মৃতদেহের এতটুকু বিকৃতিও হয়নি।

ঠিক যেমনটি দেখে গিয়েছিলাম কাল রাত্রে যেন তেমনটিই আছে।

মনে হল সূর্যপ্রসাদ যেন তখনও জীবিত। চেয়ারের ওপরে তাঁর চিরাচরিত অভ্যস্ত ভঙ্গিতেই বসে আছেন যেন চোখ দুটি বুজে।

ডাক্তার সেন।

হঠাৎ কিরীটীর ডাকে চমকে তাঁর মুখের দিকে তাকালাম।

একবার ভালো করে সব দিকে চেয়ে দেখুন তো, কাল রাত্রে এ-ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে ঠিক যে-যে জিনিস যেমনটি দেখেছিলেন ঠিক তেমনটিই আছে তো?

কিরীটীর নির্দেশে চারদিকে একটিবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বললাম, তাই তো মনে হচ্ছে।

খুব ভালো করে দেখে বলুন। বিমলবাবু, আপনিও দেখে বলুন। কিরীটী আবার বললেন।

হ্যাঁ, অ্যাজ ইট ইজ আছে বলেই তো মনে হচ্ছে, মিস্টার রায়! আমিও বললাম এবাবে।

বিমলবাবু?

আমারও তো তাই মনে হচ্ছে।

আবদুলকে একবারটি ডাকুন তো, বিমলবাবু!

তখনি আবদুলকে ডেকে আনা হল। এবং আবদুলকেও কিরীটী একই প্রশ্ন করলেন।

আবদুল কিন্তু চারদিকে একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললে, আজ্ঞে বাবু, ওই বড় চেয়ারটা, মানে যেটার ওপর এখনও বাবু বসে আছেন, ওটা যেন ঠিক ওই জায়গায় ছিল না বলেই মনে হচ্ছে!

কীরকম?

আজ্ঞে, মনে হচ্ছে চেয়ারটা যেন সেসময় দেখেছিলাম ওই দেওয়ালের দিকে আর একটু ঘেঁষে ছিল।

কীরকম ছিল দেখাও তো?

আবদুল তখন মৃতদেহ সমেতই চেয়ারটা সামান্য ঠেলে দিল এবং তার নীচে চাকা বসানো থাকায় নিঃশব্দে কার্পেটের ওপর দিয়ে চেয়ারটা সরে গিয়ে প্রায় দু-ফুট দেওয়াল বরাবর দাঁড়াল, যাতে করে চেয়ারটা সেই ঘরের বন্ধ দরজার ঠিক মুখোমুখি একই লাইনে হয়ে গেল।

কাল রাত্রে চেয়ারটা এইখানেই ছিল প্রথমে যখন এ-ঘরে এসে ঢুকেছিলাম! আবদুল বললে।

আই সি! চেয়ারটা তা হলে সরাল কে? চেয়ারটার পোজিশন দেখেই অবিশ্যি আমারও মনে হয়েছিল, কেউ নিশ্চয় চেয়ারটা সরিয়েছে।

কী বলছেন, মিস্টার রায়? প্রশ্নটা আমিই করলাম।

এই কথাটাই বলতে চাইছিলাম ডাক্তার সেন যে, চেয়ারটা একটু আগে যেভাবে ছিল, সাধারণত কেউ সেভাবে ঘরের দিকে পিছন করে দরজার মুখোমুখি বসবে না। কিন্তু কথা হচ্ছে, তা হলে কে চেয়ারটাকে ওইভাবে সরিয়ে রাখল? আবদুল, তুমি?

আজ্ঞে না তো, বাবু।

আপনি, ডাক্তার সেন?

না।

একটা কথা বলব, বাবু—আবদুল কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়ে কথাটা বলল।

বলো।

আজ্ঞে আমার মনে পড়ছে, পুলিশের সঙ্গে গতরাত্রে দ্বিতীয়বার যখন এই ঘরে এসে ঢুকি তখনই যেন চেয়ারটা একটু আগে যেমন ছিল তেমনি সরানো দেখেছিলাম। কিন্তু তখন কিছুই নয় ভেবে অতটা নজর দিইনি।

কিন্তু সামান্যতম ওই ব্যাপারের এমন কোনও গুরুত্ব আছে কি, মিস্টার রায়? বললাম আমি।

কিরীটী মৃদু হেসে আমার মুখের দিকে তাকালেন।

ডাক্তার সেন, আপনি একজন বিচক্ষণ ডাক্তার। রোগীর দেহের কোনও রোগকে আবিষ্কার করবার জন্য যখন ইনভেসটিগেশন করেন, তখন যেমন সামান্যতম ব্যাপারের মধ্যেও বিশেষত্ব থাকে বলে আপনাদের ধারণা, আমাদের ক্রাইমের ইনভেসটিগেশনের ব্যাপারেও ঠিক তেমনি আমরা তুচ্ছ হতে তুচ্ছতম কিছুই যাতে দৃষ্টি এড়িয়ে না যায় সেদিকে সতর্ক থাকি। থাকতে হয় সর্বদা।

আবদুল যে মিথ্যা বলবে, মিস্টার রায়, তা আমি অবিশ্যি বলছি না। তবে ওর ধারণা বা দেখবার ভুলও তো হতে পারে। বললাম আমি।

কিন্তু ডাক্তারবাবু, আমি ভুল দেখিনি। আবদুল প্রতিবাদ জানাল।

অদ্ভুত দৃঢ়, শান্ত কণ্ঠে কিরীটী সঙ্গে-সঙ্গে তাকে সমর্থন করলেন, না আবদুল, আমি বুঝতে

পারছি তুমি ভুল করোনি। মিথ্যাও বলোনি। আচ্ছা, এবারে তুমি যেতে পার। তারপর আমাদের দিকে ফিরে তাকিয়ে কিরীটী বললেন, চলুন, ডাক্তার সেন, পাশের ঘরে গিয়েই কথাবার্তা বলা যাক। আপাতত এ-ঘরে যা দেখবার ছিল আমার দেখা হয়ে গিয়েছে।

এগারো

সকলে আমরা আবার সূর্যপ্রসাদের শয়নঘরে এসে প্রবেশ করলাম।

বসুন, ডাক্তার সেন—বলে কিরীটী নিজেই একটা চেয়ার টেনে নিয়ে সর্বাগ্রে উপবেশন করলেন। পকেট থেকে একটা সিগার-কেস বের করে একটা সিগার নিয়ে তাতে অগ্নিসংযোগ করতে-করতে মৃদুকণ্ঠে বললেন, চেয়ারটার ব্যাপারটা আপনি সামান্য ও তুচ্ছ বলে ইগনোর করতে চাইলেন, ডাক্তার সেন। কিন্তু কী জানেন, ওই ধরনের ঘটনার আগে বা পরে যা-কিছু অকুস্থানে থাকে বা যাঁরা সেখানে থাকেন তা—সে জড়বস্তুই কিছু হোক বা জীবিত কোনও প্রাণীই হোক, সেই জড়বস্তুর বা জীবিত প্রাণীর প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু গোপনীয় থাকে বা সেই সব জড়বস্তু কিছু না কিছু indicate করে, এ-ধরনের ব্যাপারে আমি বরাবরই লক্ষ করেছি।

তা হলে তো আমারও কিছু গোপনীয় আছে বলুন এ-ব্যাপারে, মিস্টার রায়?

কিরীটী হেসে ফেললেন এবং হাসতে-হাসতেই বললেন, তা আছে বইকী, না থাকাটাই তো অস্বাভাবিক।

তা হলে সেটা অনুমানও নিশ্চয়ই আপনি করেছেন, মিস্টার রায়?

তা করিনি বললে মিথ্যাই বলা হবে, ডাক্তার সেন।

যদি কিছু মনে না করেন তো কথাটা—।

এই ধরুন না কেন, সূর্যপ্রসাদবাবুর একমাত্র ছেলে সম্পর্কে আমার ধারণা, অনেক কিছুই আপনি হয়তো জানেন যা সব আমাকে এখনও বলেননি বা বলতে চান না বলে গোপন করে যাচ্ছেন।

কিরীটী রায়ের শেষের কথায় সহসা বুঝতে পারি, আমার চোখেমুখে একটা বিব্রত ভাব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কিন্তু কিরীটি সেটা বোধহয় লক্ষ করেই বলে ওঠেন, না-না, ডাক্তার সেন, আমার কথায় আপনার লজ্জিত বা বিব্রত হওয়ার কিছু নেই।

মিস্টার রায়।

হ্যাঁ, যতটুকু আপনি আমাকে বলেছেন তার বেশি কিছুই আমি জানতে চাই না। ইউ নিড নট বি ওরিড, যা জানবার আমি ঠিকই জেনে নেব। যাক সে-কথা। আচ্ছা আবদুল, কয়েকটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই!

আবদুল একসময় এ-ঘরে এসে দাঁড়িয়েছে, সে বলল, বলুন?

কাল রাত্রে প্রথম যখন তুমি তোমার বাবুর ঘরে ঢোকো, ঘরের ইলেকট্রিক বাতিটা তখনও জ্বলছিল, তাই না?

হ্যাঁ।

আর ফায়ার-প্লেস মানে ঘরের চুল্লিটা—সেটা তখনও বেশ ভালোভাবেই জ্বলছিল, না নিভু-নিভু হয়ে এসেছিল, মনে আছে তোমার?

আজ্ঞে ঠিক মনে নেই, বাবু।

হুঁ।

কিরীটী অতঃপর কিছুক্ষণের জন্য যেন নিশ্চুপ হয়ে কী ভাবেন। তারপর আবার একসময় বলেন, ডাক্তার, আপনি আবার হয়তো মৃদু হেসে বলবেন, এটাও তুচ্ছ ব্যাপার একটা।

না-না—সে কী?

ঘরের ওই চেয়ারটার মতো ফায়ার-প্লেসের ব্যাপারটাও কেন আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল জানেন?

কেন?

মনে আছে বোধহয় আপনার, রাত সাড়ে দশটার সময় যখন আপনি ওই ঘর থেকে চলে যান, আপনার জবানবন্দিতে বলেছেন, ওই ঘরের বাগানের দিককার জানলাটা ছিল বন্ধ এবং ঘরের দ্বিতীয় দরজাটা ছিল খোলা। কারণ, ওই দরজাপথেই ঘব থেকে আপনি বের হয়ে গিয়েছিলেন। তাই নয় কি, ডাক্তাব?

হ্যাঁ।

কিন্তু দ্বিতীয়বাব আপনারা সকলে এ-ঘরের দরজা ভেঙে যখন আবার গিয়ে পাশের ঘরে প্রবেশ করলেন তখন কিন্তু ছিল ঠিক উলটোটি...।

তার মানে?

মানে দরজাটা ছিল বন্ধ এবং জানলাটা ছিল খোলা। তাই তো?

হুঁ।

তা হলেই দেখুন, স্বভাবত একটা কথা মনে জাগতে পারে আমাদেব, এমনটি কেন হল? দরজাটাই বা বন্ধ কেন এবং জানলাটাই বা খোলা কেন?

তা—।

তা হলেই দেখুন, নিশ্চয়ই কেউ জানলাটা খুলে দিয়েছিল ও দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছিল, রাত সাড়ে দশটার পর থেকে রাত বারোটায় মৃতদেহ আবিষ্কৃত হওয়ার এই সময়টুকুব মধ্যেই কোনও এক সময়। অবিশ্যি সেটা সূর্যপ্রসাদ নিজেও করতে পারেন।

সূর্যপ্রসাদ!

হ্যাঁ, সূর্যপ্রসাদ ঘরের মধ্যে একা ছিলেন। এবং তাঁর পক্ষে জানলাটা কোনও এক সময় খুলে দেওয়াটা আদৌ আশ্চর্যের কিছু নয়। তা ছাড়া, দুটো কাবণে জানলাটা তিনি খুলতে পারেন। প্রথমত, চুল্লির আগুনে ঘরটা হয়তো খুব গরম হয়ে উঠেছিল, তাই তাঁকে জানলাটা খুলতে হয়েছিল। কিন্তু সে-সম্ভাবনা এক্ষেত্রে থাকতে পারে না বলেই আমার ধারণা—।

কেন? প্রশ্ন করলাম আমিই।

কারণ, কাল রাত্রে সন্ধ্যার দিকে বৃষ্টি হওয়ায় ও হাওয়া থাকায় শীতটা একটু বেশিই পড়েছিল। সেক্ষেত্রে তাঁর মতো একজন বৃদ্ধ জানলা খুলেছেন বলে মনে হয় না। আর দ্বিতীয়ত, জানলা খুলে সকলের অলক্ষ্যে হয়তো তিনি এমন কোনও আগন্তুককে ওই ঘরে ঢুকিয়েছিলেন, যে হয়তো তাঁর খুবই পবিচিত ছিল। এবং পরে সেই আগন্তুক ঘর থেকে চলে যাওযার পর হয়তো জানলাটা আর বন্ধ করবার অবকাশই ঘটেনি।

সত্যি, এ-দিকটা তো একটিবারও আমার মনে আসেনি, মিস্টার রায়! অথচ হাউ সিমপল ইট ওয়াজ!

তাই তো বলছিলাম, ডাক্তার সেন, যত কঠিন মিস্ট্রিই হোক, তার আগের ও পরের ঘটনাগুলোকে যদি পরপর ঠিকমতো সাজানো যায়, সে-মিস্ট্রিকেও আয়ত্তের মধ্যে আনা যেতে পারে। কিন্তু এখন দেখা যাক, কাল রাত্রে সাড়ে এগারোটার সময় মেজর কৃষ্ণস্বামী যে শুনেছিলেন, ঘরের মধ্যে কার সঙ্গে সূর্যপ্রসাদ বেশ উচ্চকণ্ঠে কথা বলছিলেন, সে কার সঙ্গে? তবে কি এ সেই ব্যক্তি, যে ওই জানলাপথে ঘরে ঢুকেছিল? তারপর একটু যেন থেমেই আবার কিরীটী বলতে লাগলেন, যদিচ রাত সাড়ে দশটার পর অর্থাৎ ডাক্তার সেন সূর্যপ্রসাদকে জীবিত দেখে যাওয়ার পরও বিমলবাবু তাঁর জেঠামণির ঘরে গিয়ে তাঁকে জীবিতই দেখেছিলেন, তথাপি যতক্ষণ না পর্যন্ত আমরা গতরাত্রির বিশেষ সেই মিস্টিরিয়াস আগন্তুক সম্পর্কে সব কিছু জানতে পারছি ততক্ষণ এ-রহস্যের মীমাংসা

অবিশ্যিই হতে পারে না। কেননা এমনও তো হতে পারে যে, সেই মিস্টিরিয়াস আগন্তুক সূর্যপ্রসাদেরই পূর্ব অ্যাপয়েন্টমেন্ট মতো তাঁর সঙ্গে ওই জানলাপথেই গোপনে অত রাত্রে দেখা করতে এসেছিল। এবং সে-কারণেই হয়তো সূর্যপ্রসাদ গতরাত্রে কেউ যাতে আর না তাঁকে বিরক্ত করে সে-কথা একবার ডাক্তার সেন ও একবার বিমলবাবুকে বলেছিলেন, পাছে সেই আগন্তুকের আইডেনটিটি প্রকাশ হয়ে যায় সেই ভয়ে। তারপর হয়তো সেই আগন্তুক এসে সূর্যপ্রসাদের সঙ্গে দেখা করে চলে যাওয়ার পর কোনও এক সময় খুনি, যে সম্পূর্ণ অন্য কোনও তৃতীয় ব্যক্তি, ওই জানলাপথে এসে ঘরে ঢুকে তার কাজ হাসিল করে চলে গিয়েছে।

কিন্তু—, আমি বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলাম কিরীটী রায়কে।

রায় আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, হ্যাঁ, হয়তো খুনি পূর্বাহ্ণেই জানত, সূর্যপ্রসাদের সঙ্গে রাত্রে ওইরকম কারও দেখা করবার অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে এবং সে সেই সুযোগটুকুই গ্রহণ করেছে। অথবা এ-ও হতে পারে, সেই প্রথম ব্যক্তিই হয়তো দ্বিতীয়বার সেই জানলাপথে ঘরে প্রবেশ করে সূর্যপ্রসাদকে ঘুমন্ত অবস্থায় মার্ডার করে গিয়েছে!

সকলে আমরা নির্বাক হয়ে কিরীটীর যুক্তিপূর্ণ বিশ্লেষণ শুনছিলাম।

কিরীটী এবারে অমলেন্দুকে ডেকে বললেন, অমলেন্দুবাবু, দুটো খবরের যে আমার বিশেষ প্রয়োজন!

বলুন?

টেলিফোন অফিসে খোঁজ নিয়ে জানুন, কাল রাত্রে ডাক্তার সেনের কলটা কোথা থেকে হয়েছিল? আর—।

বলুন—।

আর ওই সঙ্গে মুরি জংশনের স্টেশনমাস্টারকেও ফোন করে জানুন, রাত বারোটার পর আপ বা ডাউন কোনও ট্রেন আছে কি না?

অমলেন্দু নিঃশব্দে ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন।

ওই সময় একজন পুলিশ এসে ঘরে ঢুকল। বললে, মৃতদেহ মর্গে নিয়ে যাওয়ার জন্যে নাকি ঠেলাগাড়ি এসে গিয়েছে।

মৃতদেহ মর্গে নিয়ে যাওয়ার পর একসময় কিরীটী বিমলবাবুকে সম্বোধন করে বললেন, মিস্টার গুপ্ত, চলুন, এবার বাড়িটা ঘুরে দেখি।

চলুন!

আমাকে ছেড়ে দিলে হত না এবারে, মিস্টার রায়? একবার ডিসপেনসারিতে না গেলে—।

হ্যাঁ-হ্যাঁ—নিশ্চয়ই, ডাক্তার মানুষ আপনি। আপনাকে এতক্ষণ আটকে রেখেছি সেটাই তো অন্যায়। আমিও যাব, বাড়িটা একবার ঘুরে দেখে নিয়ে আপনার সঙ্গেই যাব, আর কয়েক মিনিট।

মৃদু হেসে বললাম, বেশ, তাই চলুন।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে-নামতে হঠাৎ আবার কিরীটী প্রশ্ন করলেন, ভালো কথা, ডাক্তার সেন, ঘরের মধ্যে একমাত্র আপনাকে যে নীল রঙের লেটার পেপারে লেখা চিঠিটা সূর্যপ্রসাদ গতরাত্রে পড়ে শোনাচ্ছিলেন, সেটি ছাড়া আর কিছুই তা হলে খোয়া যায়নি, তাই তো?

হুঁ, সেইরকমই তো মনে হল।

মাঝামাঝি সিঁড়ি অতিক্রম করতেই দেখা গেল অমলেন্দুবাবু ফিরে আসছেন।

কী খবর, মিস্টার চক্রবর্তী? জানতে পারলেন কিছু? কিরীটীই প্রশ্ন করলেন।

হ্যাঁ। বাজারের কাছাকাছি একটা ড্রাগ ও কেমিস্ট শপ থেকে নাকি কলটা করা হয়েছিল। আর বারোটা কুড়ি মিনিটে নাগপুর প্যাসেঞ্জার কলকাতার দিকে গেছে।

ধন্যবাদ, মিস্টার চক্রবর্তী।

কিরীটী সিঁড়ি দিয়ে আবার নামতে লাগলেন।

কিন্তু মিস্টার রায়, হঠাৎ অমলেন্দুই আবার কথা বললেন, কে যে ড্রাগ হাউস থেকে ডাক্তার সেনকে ফোন করলেন সেটা তো কিছু বোঝা গেল না! আর কেনই বা ওই ধরনের একটা নিউজ ফোনে দিয়েছিল?

সত্যি, টেলিফোনের ব্যাপারটা মাথামুণ্ডু কিছু আমিও বুঝে উঠতে পারছি না, মিস্টার রায়! বললাম আমিও।

কিরীটী পূর্ববৎ সিঁড়ি দিয়ে নামতে-নামতেই বললেন, অফকোর্স টেলিফোন কলটার একটা উদ্দেশ্য ছিল বইকী।

উদ্দেশ্য!

বিস্মিত দৃষ্টিতে আমি কিরীটীর মুখের দিকে তাকালাম।

কিরীটী এবারে মৃদু হেসে বললেন, হ্যাঁ।

কিন্তু—।

সেটা জানতে পারলে তো সব কিছুই ক্লিয়ার হয়ে যেত এতক্ষণ, ডাক্তার সেন!

এবং এ-কথা শেষ করার সঙ্গে-সঙ্গেই কিরীটী সহসা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, ভালো কথা, ডাক্তার সেন, রাত্রি তো তখন ঠিক এগারোটা, যেসময় কাল রাত্রে আপনার সঙ্গে সেই লোকটার গেটের সামনে ধাক্কা লেগেছিল?

হ্যাঁ। সময়টা আমার মনে আছে, কারণ ওই সময় পেটা ঘড়িতে ঢং-ঢং করে রাত এগারোটা ঘোষণা করছিল।

হুঁ, তাই তো বলছিলাম। আচ্ছা ডাক্তার সেন, দোতলায় সূর্যপ্রসাদের প্রাইভেট রুম থেকে অর্থাৎ যে-ঘরে গতরাত্রে বসে আপনাদের কথাবার্তা হচ্ছিল, সে-ঘর থেকে বাইরের গেট পর্যন্ত যেতে কতক্ষণ লাগতে পারে বলে আপনার মনে হয়?

তা সোজা অন্য কোথাও না থেমে চলে গেলে দু-তিন মিনিটের বেশি লাগবে কেন? বড় জোর মিনিট চার-পাঁচ—।

একজ্যাক্টলি! আচ্ছা, আর একটা কথা, অমলেন্দুবাবু, গত সপ্তাহের কোনও দিন কোনও অপরিচিত লোক কি মিস্টার সূর্যপ্রসাদ গুপ্তের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল?

অমলেন্দুবাবু এবারে যেন ক্ষণকাল চিন্তা করে বললেন, হ্যাঁ।

এসেছিল? কে সে?

ট্রেডার্স বুরো থেকে একজন সেল্‌সম্যান গত শনিবার—মানে পাঁচদিন আগে বড়বাবুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। তবে তাঁকে ঠিক অপরিচিত তো বলা যায় না, মিস্টার রায়!

কেন বলুন তো?

কেননা গত মাস দুয়েক থেকেই মিস্টার গুপ্ত একটা ডিকটাফোন কিনবেন-কিনবেন করছিলেন, সেই সংক্রান্ত ব্যাপারেই ট্রেডার্স বুরোর এজেন্ট মহেন্দ্রবাবু যাতায়াত করছিলেন।

ডিকটাফোন!

হ্যাঁ।

ডিকটাফোন! কিরীটী আবার কথাটা যেন কতকটা আত্মগতভাবেই উচ্চারণ করলেন। তারপরই পুনরায় প্রশ্ন করলেন, তা তিনি কিনেছিলেন সেটা?

না।

হুঁ। আচ্ছা, আপনাদের সেই মহেন্দ্রবাবু ভদ্রলোকটির চেহারার একটা বর্ণনা দিতে পারেন আমাকে, মিস্টার চক্রবর্তী?

বেঁটে, বেশ সুশ্রী চেহারা।

পরক্ষণেই কিরীটী আমার দিকে ফিরে প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা ডাক্তার সেন, আপনি গতরাত্রে গেটের সামনে যে-লোকটিকে দেখেছিলেন, তার চেহারার সঙ্গে ওই মহেন্দ্রবাবুর চেহারার কোনও মিল আছে বলে আপনার মনে হয়?

না। সে-লোকটি বেশ লম্বা ছিল।

হুঁ।

অতঃপর কিরীটী একপ্রকার চুপচাপই সমস্ত বাড়িটা ঘুরে-ঘুরে দেখতে লাগলেন। এবং বাড়ি দেখবার পর আমরা বিদায় নিতে যাব ওই সময় আবদুল অমলেন্দুবাবুকে এসে বলল, বাবুর সলিসিটার মিস্টার দাস এসেছেন। আপনাকে আর বিমলবাবুকে ছোটবাবু ডাকছেন ওপরে।

বিমলবাবু আর অমলেন্দু আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

বারো

আমরাও যাওয়ার জন্যে পা বাড়াতেই হঠাৎ কিরীটী ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, ভালো কথা—সব দেখা হল এ বাড়ির, ডাক্তার সেন, কিন্তু সূর্যপ্রসাদবাবুর মিউজিয়াম ঘর, যে-ঘরে চন্দনকাঠের বাক্সের মধ্যে সেই মেক্সিকান ছোরাটা ছিল সেটা তো একবার দেখা হল না।

হ্যাঁ-হ্যাঁ, চলুন না, এই তো পার্লারের সঙ্গে অ্যাটাচড ছোট ঘরটাই!

মিউজিয়াম ঘরের মধ্যে কিরীটীকে নিয়ে গেলাম।

কিরীটী অনেকক্ষণ ধরে ঘরের যাবতীয় বস্তু ও বিশেষ করে চন্দনকাঠের বাক্সটা খুলে ও বন্ধ করে দেখে বললেন, চলুন, এবারে ফেরা যাক।

রাস্তায় নেমে কিরীটী আবার প্রশ্ন করলেন, এখন ডিসপেনসারিতেই তো যাবেন, ডাক্তার সেন?

হ্যাঁ।

চলুন, একবার আমিও থানাটা ঘুরে যাই।

দুজনে নিঃশব্দে পাশাপাশি চলতে লাগলাম।

বেলা প্রায় সাড়ে দশটা হবে। কিন্তু শীতকাল হলেও রৌদ্রের তীব্রতা বেশ অনুভূত হয়।

কিরীটীর পাশাপাশি আমি চলেছি।

সত্য কথা বলতে কী, কিরীটীর স্তব্ধতা যেন আমার কেমন বিশ্রী লাগছিল। তাই নিজেই একসময় কথা বললাম, সত্যি মিস্টার রায়, আমার একটা কথা কী মনে হচ্ছে জানেন?

কী?

যদি ঘরের দেওয়ালগুলোও অন্তত মানুষের মতো কথা বলতে পারত, তবে এতক্ষণে আমরা অনায়াসেই কি জানতে পারতাম না যে সূর্যপ্রসাদের হত্যাকারী কে?

তা বটে। তবে কথা বলার ব্যাপারে একটা মুখ ও সেই সঙ্গে জিহ্বা থাকাটাই তো বড় কথা নয়, ডাক্তার সেন।

আমি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে কিরীটীর মুখের দিকে তাকালাম।

কিরীটী মৃদু হেসে বললেন, হ্যাঁ, সিমেন্ট ও ইট দিয়ে গাঁথা ঘরের বোবা দেওয়ালগুলোর ভাষা প্রকাশের জন্য জিহ্বা না থাকলেও দেখবার ও শোনবার ক্ষমতা তো আছে। আর সেটা প্রকাশের ভাষাও তাদের আছে বইকী।

কী বললেন?

হ্যাঁ, তাই। শুধু ঘরের দেওয়ালই নয়, ঘরের মধ্যে অবস্থিত টেবিল-চেয়ার মায় প্রতিটি জড়বস্তুই সেই ভাষাতেই আমাকে অনেক সংবাদ পৌঁছে দেয়।

তাই বুঝি? তা কী খবর আজ পেলেন সূর্যপ্রসাদের ঘরের দেওয়াল আর ফার্নিচারগুলোর কাছ থেকে, মিস্টার রায়?

কথার মধ্যে আমার যে একটি সূক্ষ্ম ব্যঙ্গের হুল ছিল সেটা যেন আদপেই গায়ে না নিয়ে চলতে-চলতে পূর্ববৎ মৃদু কণ্ঠেই কিরীটী বললেন, ঘরের একটি খোলা জানলা, একটি বন্ধ দরজা ও একটি উঁচু ব্যাকরেস্ট দেওয়া চেয়ার, যেটা স্থানচ্যুত হয়েছিল—ঘরের ওই বিশেষ তিনটি জড়পদার্থ তাদের নিজস্ব ভাষায় কেবলই আমাকে কী বলছিল আজ জানেন, ডাক্তার সেন?

কী?

তারা যেন বলছিল, ভেবে দেখো, কেন— কেন এমনটা হল? কেন জানলা আমি খোলা রইলাম, আর কেনই বা দরজা রইল বন্ধ, আর কেন চেয়ারই না আমি স্থানচ্যুত হলাম?

মনে-মনে না হেসে পারি না। লোকটা হয় পাগল, না হয় একের নম্বর বুজ্রুক!

এত নাম শুনেছি লোকটার, সব কি তা হলে গল্পকথা?

কিন্তু কিরীটীকে থানা পর্যন্ত যেতে হল না,

সহসা ওই সময় মোটর-বাইকের প্রচণ্ড ফটফট শব্দে সামনের দিকে তাকিয়ে দেখি, আমাদের দারোগা সাহেব মিস্টার পাণ্ডে তাঁর চিরপরিচিত মোটর বাইকে চেপে ধুলোর একটা ঘূর্ণি উড়িয়ে এইদিকেই আসছেন।

মিস্টার পাণ্ডে।

কই?

ওই যে এইদিকেই মোটর বাইকে চেপে আসছেন। বললাম আমি।

থামতে বলুন ওঁকে। কিরীটী বললেন।

কিন্তু থামতে বলতে হল না। পাণ্ডে এসে আমাদের কাছ বরাবরই গাড়ি থামালেন।

এই যে মিস্টার রায়, আপনার খোঁজেই আমি যাচ্ছিলাম।

কী ব্যাপার? কিরীটী প্রশ্ন করেন।

খুনের একপ্রকার কিনারা করে ফেলেছি মিস্টার রায়।

বটে!

হ্যাঁ হ্যাঁ, একেবারে জলের মতোই পরিষ্কার।

বেশ বেশ- চলুন, ডাক্তার সেনের চেম্বারে বসেই শোনা যাবেখন।

বেশ তো, তাই চলুন।

মিস্টার পাণ্ডের চোখেমুখে একটা খুশির আনন্দ যেন উপচে পড়ছিল।

আমরা তিনজনে এসে আমার ডিসপেনসারির চেম্বারেই বসলাম।

চায়ের জন্যে বলি, মিস্টার রায়?

হ্যাঁ হ্যাঁ, বলুন।

একটু পরে চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে কিরীটী বললেন, বলুন মিস্টার পাণ্ডে।

বললে হয়তো বলবেন দম্ভ বা বড়াই করছি, কিরীটীবাবু, সোৎসাহে বলতে লাগলেন পাণ্ডে, কিন্তু এই এগারো বছরের চাকরির জীবনে এ ধরনের খুনজখম তো কম দেখলাম না! হুঁ-হুঁ বাবা, ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ দেখনি—।

তা ধরতে পারলেন নাকি খুনিকে? সহসা বাধা দিয়ে বললেন কিরীটী।

মারো গোলি, নিশ্চয়ই। আরে মশাই, বড়লোকের একমাত্র ছেলে, অতিরিক্ত আদরে গোল্লায় গেলে যা হয়—।

তার মানে, বলতে চান সমরই?

নিশ্চয়ই।

কিন্তু কীসে স্থিরনিশ্চিত হলেন মিস্টার পান্ডে যে সমরই তার বাপের হত্যাকারী?

মারো গোলি, আরে মশাই, এ হচ্ছে ডিটেকশনের মেথড, বুঝলেন?

কীরকম?

বলছি, বলছি—আচ্ছা, সূর্যপ্রসাদবাবুকে কাল সোয়া এগারোটা পর্যন্ত জীবিত দেখা গিয়েছে—অর্থাৎ তাঁর ভাইপো বিমলবাবু ওই সময় তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলেন, কেমন কি না?

হ্যাঁ, সেইরকমই তো আপাতত শোনা যাচ্ছে। কিরীটী মৃদুকণ্ঠে প্রত্যুত্তর দেন।

মারো গোলি, বেশ। অ্যান্ড দ্যাট ইজ মাই ফার্স্ট পয়েন্ট। সেকেন্ড পয়েন্ট হচ্ছে, ডাক্তার সেন রাত বারোটা নাগাদ 'লিলি কটেজে' যাওয়ার পর সকলে মিলে ঘরে ঢুকে দেখলেন মিস্টার গুপ্ত মার্ডারড, কেমন কি না?

তা—।

হুঁ।

আচ্ছা ডাক্তার সেন, আপনারা যখন মৃতদেহ আবিষ্কার করলেন, তার কতক্ষণ আগে সূর্যপ্রসাদকে হত্যা করা হয়েছে বলে আপনার মনে হয়েছিল? কিরীটী সহসা আমার মুখের দিকে চেয়ে প্রশ্নটা করলেন।

তা আধঘণ্টাটাক আগে তো হবেই। মৃদুকণ্ঠে জবাব দিলাম আমি।

মারো গোলি। তাই যদি হয়ে থাকে বা দু-দশ মিনিট আগে-পিছেও যদি তাঁকে হত্যা করা হয়ে থাকে, এইটাই বোঝা যাচ্ছে যে সাড়ে এগারোটা থেকে পৌনে বারোটার মধ্যে নিশ্চয়ই কোনও এক সময় মিস্টার গুপ্তকে হত্যাকারী হত্যা করেছে—এটা আমরা মেনে নিতে পারি কি না?

বেশ বলুন—কিরীটী বললেন।

মারো গোলি। নাউ 'লিলি কটেজে' গতরাত্রে যাঁরা-যাঁরা ওই সময়ে উপস্থিত ছিলেন তাঁদের প্রত্যেকেরই মুভমেন্টস সম্পর্কে আমি একটা মোটামুটি খসড়া করেছি। এই দেখুন—বলে পকেট থেকে মিস্টার পান্ডে একটা সাদা কাগজের শিট টেনে বের করে কিরীটীর দিকে এগিয়ে দিলেন।

কিরীটী নিঃশব্দে কাগজটা হাতে নিয়ে দৃষ্টির সামনে মেলে ধরলেন।

ইংরেজিতে টাইপ করা কাগজটা।

কাগজটায় যা টাইপ করা ছিল ঃ

১। মেজর কৃষ্ণস্বামী। ডাইনিং রুমে বসে সাড়ে ন'টা থেকে রাত সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত বলদেব সিংহের সঙ্গে দাবা খেলেছেন। এবং রাত দশটা থেকে অমলেন্দুবাবুও ওঁদের পাশেই বসে দাবা খেলা শেষপর্যন্ত দেখেছেন। অমলেন্দুবাবু ও ওঁরা দুজনেই পরস্পর-পরস্পরকে সমর্থন করেছেন তাঁদের জবানবন্দিতে।

২। বলদেব সিংহ। ডাইনিং রুমে দাবা খেলছিলেন প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে।

৩। রাধিকাপ্রসাদবাবু। তিনি তারপরে ঘরে বসে প্রাত্যহিক নিয়মিত সাড়ে দশটা থেকে এগারোটা পর্যন্ত গীতাপাঠ করে শুতে যান। আবদুলের সাক্ষ্যে তা প্রমাণিত হয়েছে।

৪। সুবলবাবু। রাত সাড়ে দশটা নাগাদ শরীরটা ভালো না থাকায় ঘুমোতে যান। বিমলবাবু, রাধিকাবাবু ও অন্যান্য ভৃত্যেরা সাক্ষ্য দিয়েছে।

৫। বিমলবাবু রাত সোয়া এগারোটায় তাঁর জেঠামশাইয়ের সঙ্গে দেখা করে সোজা নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়েন। আবদুল ও অন্য একজন সাক্ষ্য দিয়েছে।

৬। অমলেন্দুবাবু। ডাইনিং রুমেই ছিলেন প্রমাণিত হয়েছে পূর্বেই।

৭। আবদুল। রাত সোয়া এগারটায় নীচে তার ঘরে শুতে যায়। অন্যান্য ভৃত্যদের সাক্ষ্য থেকেই প্রমাণিত হয়েছে।

ভৃত্য, বাবুর্চি ও রাঁধুনি—আবদুলকে বাদ দিয়ে বাচ্চা, পণ্টু, গোমেশ ও লছমন। এদের মধ্যে বাচ্চা ও পণ্টু, একজন পাঁচ বছর ও একজন তিন বছর ওই বাড়িতে কাজ করছে। গোমেশ বছর দুই ও লছমন সাত বছর কাজ করছে। বাড়ির সকলেরই মতে ওরা যেমন নিরীহ, তেমনি বিশ্বাসী। এবং ওদের কারও সম্পর্কে কারও কোনও নালিশই নেই।

পড়লেন মিস্টার রায়? পাণ্ডে প্রশ্ন করলেন।

হুঁ। বলে কাগজটা নিঃশব্দে আবার কিরীটী পাণ্ডের হাতে তুলে দিলেন।

অবিশ্যি একমাত্র ওদের মধ্যে আবদুল সম্পর্কে সামান্য একটু যে সন্দেহ জাগে না তা নয়। বাকি সকলে সন্দেহের একেবারে বাইরে। বললেন পাণ্ডে।

অ্যানালিসিসটা আপনার ভালোই হয়েছে বলব, মিস্টার পাণ্ডে, কিরীটী বললেন, তবে—।

তবে কী?

আবদুল যে মিস্টার গুপ্তকে খুন করেনি সে-সম্পর্কে আমি কিন্তু স্থিরনিশ্চিত।

মারো গোলি। আমিও তো তাই বলছি। তা হলেই বুঝছেন মিস্টার রায়, ব্যাপারটা গিয়ে কোথায় দাঁড়াচ্ছে। সোৎসাহে আবার বলতে লাগলেন পাণ্ডে, বাড়ির মধ্যে যাঁরা কাল ওই সময় উপস্থিত ছিল তারা যখন কেউই আমাদের সন্দেহের তালিকায় পড়ছে না, তখন নিশ্চয়ই আমাদের বাড়ির বাইরেই নজর দিতে হবে, কেমন কি না?

তা দিতে হবে বইকী। কিরীটীই বললেন।

পূর্ববৎ উৎফুল্লভাবে মিস্টার পাণ্ডে বলতে লাগলেন, মারো গোলি। এখন দেখা যাক, বাড়ির মধ্যে গতরাত্রে যারা উপস্থিত ছিল তারা যদি কেউ এ-কাজ না করে থাকে তো বাড়ির বাইরে থেকে সর্বাপেক্ষা কার বেশি সম্ভাবনা ছিল ওইভাবে এসে সূর্যপ্রসাদকে হত্যা করে যাওয়া সে-রাত্রে!

কার? প্রশ্নটা এবারে করলাম আমিই।

মারো গোলি। এখনও বুঝতে পারছেন না, ডাক্তার সেন? সমর। হাঁ, হি ইজ দ্য পার্সন! চাপা গর্বিত কণ্ঠে বললেন পাণ্ডে।

সমর?

মারো গোলি, আই অ্যাম শিওর। সূর্যপ্রসাদের ওই ছেলে সমর, বাপের সই জাল করে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে গা-ঢাকা দিয়ে এতদিন বেড়ালেও ওই ঘটনার দিন পূর্ব থেকেই সে যে এই শহরেই 'তাজ' হোটেলে অবস্থান করছিল সে-কথা তো নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে। এবং গতকাল রাত সাড়ে ন'টার পর থেকে খোঁজ নিয়ে জানা গিয়েছে, সে হোটেলে আর ছিল না। অথচ রাত সাড়ে এগারোটায় তাকে আমাদেরই একজন কনেস্টবল মহাবীর সিং স্টেশন রোডে দেখেছে।

বেশ তো। তাতে করে সে-ই যে তার পিতার হত্যাকারী—কথাটা প্রমাণিত হচ্ছে কী করে, মিস্টার পাণ্ডে? বললাম আবার আমি।

পাণ্ডে যেন আমার কথায় কানই দিলেন না। যেমন বলে যাচ্ছিলেন তেমনিই বলে যেতে লাগলেন।

মারো গোলি। এখনও বুঝতে পারছেন না, সূর্যপ্রসাদবাবুর সেই পলাতক ছেলে সমরই নিশ্চয় এই দুষ্কর্মের হোতা? রাত সাড়ে এগারোটা নাগাদ মেজর সাহেব সূর্যপ্রসাদের ঘরে তাঁকে উত্তেজিত ভাবে কারও সঙ্গে কথা বলতে শুনেছিলেন, আমার মতে নিশ্চয়ই তিনি তখন তাঁর ছেলের সঙ্গে কথা বলছিলেন। সমর তাদের বাড়ির সব অন্ধিসন্ধি জানত, তাই তার পক্ষে বাগানের গ্যারেজের ছাদ দিয়ে তার বাবার ঘরে প্রবেশ করা সহজই ছিল। এবং বাপের সঙ্গে তার পূর্ব মনোমালিন্যের

দরুন সে-ই হয়তো একটা হঠাৎ অন্ধ আক্রোশের বশে কাল রাত্রে বাপের সঙ্গে বচসা করতে-করতে তাঁকে খুন করেছে। তারপর হয়তো ঘটনার পরিস্থিতিতে বিহ্বল হয়ে পালিয়েছে, হঠাৎ বাপকে ওইভাবে হত্যা করে ফেলে।

বুঝলাম, তা হলে ডাক্তার সেনকে ফোনে সংবাদটা দিল কে? সহসা কিরীটী প্রশ্ন করলেন ওই সময়।

মারো গোলি। সমরই! জবাব দিলেন পান্ডে।

সমর?

হ্যাঁ।

কিন্তু কেন? যদি সে, আপনি যেমন বলছেন মিস্টার পান্ডে, পূর্বেকার মনোমালিন্যের দরুনই একটা আক্রোশের ফলে হত্যা করেই থাকে, সে-সংবাদটা ডাক্তার সেনকে সে দিতে যাবেই বা কেন হঠাৎ গায়ে-পড়া হয়ে?

মারো গোলি। অবিশ্যি সহসা আপনার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন, মিস্টার রায়, তবে কী জানেন, এ-লাইনে দীর্ঘ এগারো বছরের অভিজ্ঞতায় তো হামেশাই দেখছি, হত্যাকারীরা হত্যা করবার পর এক-এক সময় এমন এক-একটা উদ্ভট কাজ করে বসে হুট করে সেই সময়কার মানসিক আনব্যালেন্সের মধ্যে যে, সবসময় তার কোনও যুক্তিই হয়তো খুঁজে পাবেন না। তা ছাড়া, আমার ওই যুক্তি ছাড়াও আর একটি মারাত্মক প্রমাণের কথা আপনারা ভুলে যাচ্ছেন, মিস্টার রায়!

মারাত্মক প্রমাণ?

হ্যাঁ, ঘরের জানলার কারনিসে ও গ্যারেজের ছাদে জুতোর ছাপটা ও 'তাজ' হোটেলে সমরের ঘরে যে কাদামাখা জুতো পাওয়া গিয়েছে হুবহু একেবারে একই জুতোর ছাপ।

কিন্তু একই প্যাটার্ন বা একই মেকের জুতো তো অনেক লোকই ব্যবহার করতে পারে, মিস্টার পান্ডে' কিরীটী আবার বললেন।

মারো গোলি। নিশ্চয়ই পারে, অস্বীকার করছি না। কিন্তু কাদামাখা জুতো ও সমরের গা ঢাকা দেওয়াটা?

সত্যিই অন্যায় হয়েছে।

বুঝুন, এখন তা হলে আগাগোড়া সব কিছু বুঝে দেখুন। মোটিভ, পসিবিলিটি সব কিছুই একমাত্র সমরের পক্ষেই প্রমাণিত হচ্ছে না কি? তাই বলছিলাম, আই অ্যাম ডেফিনিট—এ তারই কাজ। সে-ই তার বাপকে হত্যা করেছে।

তা হলে এখন কী করছেন, মিস্টার পান্ডে?

তাকে সর্বাগ্রে খুঁজে বের করতে হবে। আর তা করবও। যাবে কোথায় সে আমার চোখে ধুলো দিয়ে? আচ্ছা, এবার তা হলে উঠি মিস্টার রায়!

পান্ডে উঠে দাঁড়ালেন যাওয়ার জন্যে।

কিরীটী শুধু মৃদুকণ্ঠে বললেন, আসুন।

জুতোর মচ-মচ শব্দ তুলে নিজের আবিষ্কারের সাফল্যে, আনন্দে উচ্ছ্বসিত পান্ডে ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন যেন বিজয়গর্বে।

তেরো

মুখে যতই আস্ফালন করুন মিস্টার পান্ডে, সমরের কোনও সন্ধানই কিন্তু দীর্ঘ সাত দিন ধরে বহু পরিশ্রম করা সত্ত্বেও করতে পারলেন না।

সমর যেন কর্পূরের মতোই সহসা কোথায় মিলিয়ে গিয়েছে হত্যার রাত্রি থেকেই।

ইতিমধ্যে দিন-দুই মিস্টার পান্ডের সঙ্গে পথে দেখা হয়েছিল এবং তাঁর মুখেই সব শুনেছিলাম।

ইচ্ছে থাকলেও এই সাত দিন কিরীটীর সঙ্গে কিন্তু দেখা করে উঠতে পারিনি। কারণ গত সাত দিন গোটা-দুই কঠিন রোগী নিয়ে আমাকে প্রায় সর্বক্ষণ ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল।

মোট কথা, ইতিমধ্যে সূর্যপ্রসাদের আকস্মিক রহস্যপূর্ণ হত্যার ব্যাপারের উত্তেজনাটা যেন কতকটা ঝিমিয়েই এসেছিল ক্রমশ। কিন্তু তৎসত্ত্বেও আমি কিন্তু একসময়ের জন্যেও ব্যাপারটা ভুলতে পারিনি।

অদৃশ্য একটা কাঁটার মতোই যেন সর্বক্ষণ আমার মনের মধ্যে কটকট করে বিঁধছিল ব্যাপারটা।

তার অবিশ্যি অন্য একটা কারণও ছিল।

সমরের প্রতি আমার ছোট বোন মিতার যে একটা দুর্বলতা ছিল সেটা অবিশ্যি আমার অজ্ঞাত ছিল না। কিন্তু অজ্ঞাত ছিল এইটাই যে, সমরের প্রতি মিতার যেটা আমি সামান্য দুর্বলতা বলে মনে মনে জেনেছিলাম, সেটা ঠিক দুর্বলতাই কেবল নয়—তাই চাইতেও বেশি কিছু, অর্থাৎ সমরের প্রতি মিতার গভীর ভালোবাসা। মিতা সত্যিই সমরকে ভালোবেসেছিল।

এবং ওই সত্যি কথা জানার সঙ্গে-সঙ্গে যেন আমি একেবারে কাঠ হয়ে গেলাম।

সমর। সমরের মতো একটা জুয়াড়ি, ধনীর খেয়ালি, মূর্খ ছেলেকে মিতার মতো শিক্ষিত একটি মেয়ে ভালোবাসতে পারে এ যেন সত্যিই আমার কল্পনারও অতীত ছিল বুঝি।

এবং রহস্যটা দৈবক্রমেই যেন আমার কাছে সেদিন উদ্ঘাটিত হয়ে গেল।

কয়েক দিনের একটু বেশি পরিশ্রমে সত্যিই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। সেদিন দ্বিপ্রহরে বিছানায় শুয়ে নিদ্রাটাও বোধহয় তাই একটু গভীরই এসেছিল.

এবং ঘুম ভাঙার সঙ্গে-সঙ্গেই পাশের ঘর থেকে কিরীটীর কণ্ঠস্বর শুনে সহসা নিজের অজ্ঞাতেই উৎকর্ণ হয়ে উঠি।

বুঝলাম কিরীটী আর মিতা পাশের ঘরে বসে কথা বলছে।

কী ভেবে সাড়া না দিয়ে চুপ করে শয্যায় শুয়ে কান পেতে রইলাম।

কানে এল মিতা বলছে, সে যাই হোক, মিস্টার রায়, আমি হলফ করে বলতে পারি, এ তার কাজ নয়। আমি তো জানি তাকে। এতখানি নিষ্ঠুরতা কখনও তার মধ্যে আমি কল্পনা করতেই পারি না।

কিন্তু সে যদি সত্যি-সত্যি নির্দোষই, তবে এমন করে গা-ঢাকা দিয়েই বা আছে কেন মিস সেন? কিরীটী প্রশ্ন করেন।

আমার মনে হয়, মিস্টার রায়, ভয়ে।

ভয়ে?

হ্যাঁ, সে যে কী ভয়ানক ভীরু সে তো আমার অজানা নয়। কিন্তু সে-কথা থাক, আপনিও কি পুলিশের মতোই মনে করেন যে সে-ই তার বাপকে হত্যা করেছে?

একটা কথা বলব, মিস সেন?

বলুন।

সমরবাবুকে যে আপনি ভালোবাসেন তা কি আপনার দাদা জানেন?

দাদা?

হ্যাঁ।

না, দাদার কাছে বলতে আমি সাহস পাইনি। একটু যেন দ্বিধাগ্রস্তভাবেই জবাব দিল মিতা, শুনলাম।

কেন?

কারণ জানি, দাদা কিছুতেই আমাদের এ ভালোবাসাকে মেনে নেবে না।

কিন্তু আমার মনে হয়, ফলটা তাঁর জানা থাকলে বোধহয় ভালোই হত।

কী বলছেন আপনি, মিস্টার রায়?

যাক সে-কথা, হাতের তীর যখন একবার নিক্ষিপ্ত হয়েছে তখন আর উপায় নেই। তবে এইটুকুই আপনাকে আমি বলতে পারি, মিস সেন, সত্যিকারের ভালোবাসা মৃত্যুকেও জয় করে।

আর চুপ করে থাকা উচিত হবে না। তাই এবারে ডাকলাম, মিতা!

ওই দাদা বোধহয় ঘুম থেকে উঠল। আপনি বসুন, মিস্টার রায়, আমি আসছি।

চোখেমুখে জল দিয়ে মিতাকে চা দিতে বলে পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকলাম, তারপর মিস্টার রায়, কতক্ষণ?

এই আধঘণ্টাটাক হবে।

কিন্তু ডাকেননি কেন?

ঘুমুচ্ছেন, বিরক্ত করিনি তাই।

না-না, তাতে কি—ডাকলেই পারতেন। তা কেসের কতদূর কী হল?

আমার সে-প্রশ্নের জবাব না দিয়ে কিরীটী বললেন, চলুন না, মিস্টার গুপ্তের 'লিলি কটেজ'টা একবার ঘুরে আসি!

বেশ তো, চলুন।

মিতা ট্রেতে চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে ঘরে এসে ঢুকল।

মিতার মুখের দিকে তাকালাম।

নিজের কর্মব্যস্ততায় এ ক'দিন মিতার মুখের দিকে ভালো করে নজর পড়েনি। আর ওর মুখের দিকে তাকাতেই যেন মনে হল, চাপা একটা বেদনার বিষণ্ণ ক্লান্তি ওর মুখের ওপর ছড়িয়ে আছে।

নিঃশব্দে ট্রে-টা ত্রিপয়ের ওপরে রেখে মিতা আমাদের দুজনকে দু-কাপ চা করে দিল।

এলোমেলো চিন্তায় কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে আমি চায়ের কাপে চুমুক দিতে লাগলাম।

বাপ-মা মরা ছোট বোন ওই মিতা, আপনার বলতে তো ও-ই আমার একজন।

এ-পৃথিবীতে আর তো আমার কোনও ভালোবাসারই বন্ধন নেই।

বিয়ে-থা করিনি, আর করবও না জানি।

কে আর তবে আছে আমার এ-সংসারে? কিন্তু মিতা এ কী করল? ওই ধনীর অপদার্থ, অশিক্ষিত, জুয়াড়ি ছেলেটাকে এমনি করে কেন ভালোবাসল?

ইতিমধ্যে কিরীটীবাবুর চা-পান হয়ে গিয়েছিল। উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, চলুন ডাক্তার সেন!

চলুন।

উঠে দাঁড়ালাম।

বৈকালের বিষণ্ণ আলোয় চারিদিক তখন যেন কেমন ম্রিয়মাণ মনে হয়।

নিঃশব্দে দুজনে হেঁটে চলেছি পাশাপাশি।

কিরীটী রায়কে যেন কেমন চিন্তাক্লিষ্ট মনে হয়।

কী ভাবছেন ওই মুহূর্তে মিস্টার রায় কে জানে।

সূর্যপ্রসাদের কথা বা তাঁর হত্যাকারীর কথাই কি? না সমরের কথা? না মিতার কথা?

মিস্টার রায়!

আমার ডাকে সহসা মিস্টার রায় আমার দিকে চোখ তুলে তাকালেন।

কিছু বলছিলেন?

মিস্টার পান্ডের মতো আপনিও কি মনে করেন—।

কী?

সত্যি সমরই তার বাপকে হত্যা করেছে!

আপনার কী মনে হয়, ডাক্তার সেন?

অতর্কিতে কিরীটীর প্রশ্নে যেন কেমন থতমত খেয়ে গেলাম। এবং কয়েকটা মুহূর্ত কোনও জবাবই দিতে পারলাম না।

নিঃশব্দে হেঁটেই চলি।

কিরীটী আবার প্রশ্ন করলেন, কই, আমার প্রশ্নের জবাব দিলেন না, ডাক্তার?

সত্যি কথা বলতে কী মিস্টার রায়—।

কী, থামলেন কেন, বলুন?

সমর এভাবে সহসা গা-ঢাকা না দিলে—।

কিন্তু একটা কথা আপনার বুঝতে পারছি না, ডাক্তার, বাপকে হত্যা করেই যে সে গা-ঢাকা দিয়েছে এ-কথাটাই বা বারবার আপনারা সকলে ভাবছেন কেন? সম্পূর্ণ অন্য কারণেও সে গা-ঢাকা দিতে পারে! বা কারও প্ররোচনায় হয়তো গা-ঢাকা দিতে বাধ্য হয়েছে, এমনও তো হতে পারে!

কী বলছেন, মিস্টার রায়?

মানুষের এক-এক সময়ের কার্যকারণ এমন বিচিত্র হয় ডাক্তার যে তার হদিশ মেলাই ভার হয়।

আপনার কথাটা আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না, মিস্টার রায়!

সময় হলে সবই বুঝতে পারবেন। ব্যস্ত হবেন না।

'লিলি কটেজে' পৌঁছতেই গেটের মুখে আবদুলের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

ছোটবাবুকে ডেকে দেব, ডক্টরসাব? আবদুল বললে।

না আবদুল, আমি আর ডাক্তারবাবু বাগানটা একটু ঘুরে দেখতে চাই। জবাব দিলেন কিরীটী রায়।

আমি সঙ্গে যাব? আবদুল বিনীতভাবে শুধায়।

না-না, ডাক্তারবাবুরই তো এখানকার সব জানা—ওঁকে নিয়েই আমি বাগানটা ঘুরে দেখতে পারব'খন। তোমাকে ব্যস্ত হতে হবে না।

আবদুল বাড়ির ভেতরে চলে গেল।

আমি আর মিস্টার রায় দুজনে 'লিলি কটেজে'র পশ্চাতে বাগানের দিকে অগ্রসর হলাম। পূর্বেই বলেছি, প্রায় দশ-বারো কাঠা জায়গা নিয়ে বাড়ির পশ্চাতের বাগানটা। নানা প্রকারের ফল ও ফুলের গাছ বাগানে।

কিছুক্ষণ অনির্দিষ্টভাবে বাগানের মধ্যে ঘোরাফেরা করে বাগানের একেবারে দক্ষিণপ্রান্তে যে পাশাপাশি করোগেটের শেড তোলা দুখানি ঘর সেই দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে মিস্টার রায় আমাকে প্রশ্ন করলেন, ওই দুটো ঘর কীসের, ডাক্তার সেন, জানেন?

একটাতে মালি থাকে, অন্যটা যতদূর জানি খালিই পড়ে আছে।

চলুন, ঘর দুটো একবার ঘুরে দেখে আসি।

চলুন।

মালি কোথায়, তাকে দেখছি না তো?

হয়তো কোথাও আছে।

মালির ঘরটায় বাইরে থেকে তালাবন্ধ ছিল। পাশের ঘরটার দরজায় কোনও তালা ছিল না। ভেজানো দরজা ঠেলে দুজনে ঘরটার মধ্যে প্রবেশ করলাম।

বন্ধ থাকার দরুন ঘরের মধ্যে পা দিতেই একটা ভ্যাপসা গন্ধ নাকে এসে লাগল। কিরীটীই এগিয়ে গিয়ে ঘরের একটা জানলা খুলে দিলেন।

খানিকটা হাওয়া ও দিনশেষের ম্লান আলোর একটা ঝাপটা এসে জানলাপথে ঘবের মধ্যে প্রবেশ করে ঘরটি মৃদু আলোকিত করে তুলল।

বহুদিনের অব্যবহারে ঘবেব মেঝেতে এক পরদা ধুলো জমে আছে।

একটা চামচিকে ডানা ফড়ফড় করে উড়তে লাগল ঘবময়।

মিস্টার রায় ঘরের চতুর্দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকাতে লাগলেন। এবং একসময় সহসা আমাব দিকে তাকিয়ে বললেন, দু-দশ দিনেব মধ্যে নিশ্চয়ই কেউ এ-ঘরে এসেছিল, ডাক্তার সেন।

এ-ঘরে আবার কে আসবে? আর কেনই বা আসতে যাবে?

কেন এসেছিল তা বলতে পাবি না, তবে এসেছিল যে কেউ না-কেউ এ-ঘরে সেটা নিশ্চিত।

কী করে বুঝলেন?

চেয়ে দেখুন ওই মেঝেব ধুলোতে- ।

কিরীটী রায়েব নির্দেশে তাকালাম মেঝেব দিকে।

সত্যি, ঘরের মেঝেব ধুলোব ওপরে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কতকগুলো জুতোর ছাপ তখনও স্পষ্ট বোঝা যায়।

হুঁ, তাই তো দেখছি, জুতোর ছাপ রয়েছে।

শুধু জুতোর ছাপই নয়, আর-একটা ছাপ লক্ষ করুন।

কী বলুন তো?

ওই জুতোর ছাপের পাশে-পাশে কতকগুলো ছোট-ছোট গোলাকার দাগ দেখতে পাচ্ছেন না, ডাক্তার সেন?

হুঁ তাই তো, কিন্তু—।

কীসের দাগ ওগুলো বলে আপনার মনে হয়, ডাক্তার সেন?

ঠিক বুঝতে পারছি না, মিস্টার রায়!

সহসা ওইসময় কিরীটী দু-পা এগিয়ে গিয়ে ধূলিকীর্ণ মেঝে থেকে নিচু হয়ে কী যেন একটা তুলে নিলেন হাতে।

কী মিস্টার রায়?

দেখুন—।

কিরীটী আমার দৃষ্টির সামনে হস্তটি প্রসারিত করে ধরতেই ঘরের মৃদু আলোয় আমার নজর পড়ল জিনিসটার ওপরে।

কিরীটীর হাতের পাতায় রয়েছে একটি ছোট কালো মোষের শিংয়ের নস্যির কৌটো।

নস্যির কৌটো বলে মনে হচ্ছে!

হ্যাঁ।

কথাটা বলে পরক্ষণেই আমার দিকে তাকিয়ে মিস্টার রায় ডাকলেন, ডাক্তার সেন?

বলুন।

আচ্ছা, এই ঘর থেকে সূর্যপ্রসাদের শয়নকক্ষ সংলগ্ন প্রাইভেট রুমের জানলার নীচে পৌঁছতে কোনও মানুষের ঠিক কতক্ষণ সময় লাগতে পারে বলে আপনার মনে হয়, ডাক্তার সেন?

তা—তা কত আর সময় লাগবে, মিনিট দুই-তিন!

হ্যাঁ, বড় জোর চার মিনিট লাগতে পারে, তার বেশি নয়—কী বলেন?

কিন্তু হঠাৎ ও-কথা কেন, মিস্টার রায়?

কিছু না, এমনি একটা কথা মনে পড়ল তাই। যাক চলুন, এসেছি যখন একবার রাধিকাপ্রসাদবাবুর সঙ্গে দেখা করে যাই, কী বলেন?

চলুন।

চোদ্দো

আবদুলের মুখেই শুনলাম রাধিকাপ্রসাদবাবু দোতলায় তাঁর ঘরেই আছেন। মৃত সূর্যপ্রসাদবাবুর আইন-উপদেষ্টা সলিসিটার এসেছেন, তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন।

আমি আর মিস্টার রায় রাধিকাপ্রসাদের ঘরে গিয়ে প্রবেশ করলাম।

রাধিকাপ্রসাদবাবু, তাঁর ছেলে বিমলবাবু ও সূর্যপ্রসাদের সলিসিটার ঘরের মধ্যে বসে কথাবার্তা বলছিলেন।

আমাদের ঘরে প্রবেশ করতে দেখে বিমলবাবুই সাদর আহ্বান জানালেন, ডাক্তার সেন, কিরীটীবাবু আসুন!

সলিসিটার আমাদের ঘরে প্রবেশ করার সঙ্গে-সঙ্গে চোখ তুলে আমাদের দিকে তাকিয়েছিলেন।

বিমলবাবুই পরিচয় করিয়ে দিলেন।

মহিমবাবু, ডাক্তার সেন—আর উনি হচ্ছেন মিস্টার কিরীটী রায়।

সলিসিটার মহিমবাবু হাত তুলে কিরীটী ও আমাকে নমস্কার জানালেন, নমস্কার।

বিমলবাবুই অতঃপর সংক্ষেপে কিরীটী রায়ের পরিচয়টা দিলেন মহিমবাবুকে।

আপনি যখন মৃত সূর্যপ্রসাদবাবুর আইন-পরামর্শদাতা ছিলেন, তাঁর উইল সম্পর্কে নিশ্চয়ই জানেন সব কথা! —কিরীটী মহিমবাবুকেই প্রশ্নটা করলেন অতঃপর।

হ্যাঁ, জানি। আর সেই উইলের ব্যাপারেই ওঁদের বলতে এসেছিলাম। মহিমবাবু বললেন।

ও, তা রাধিকাবাবু, আপনাদের যদি আপত্তি না থাকে তো সূর্যপ্রসাদবাবুর উইলের মোটামুটি ব্যাপারটা জানতে পারি কি?

রাধিকাপ্রসাদের মুখের দিকে তাকিয়ে কিরীটী রায় প্রশ্নটা করলেন।

নিশ্চয়ই। মহিমবাবু, ওঁকে বলুন না। রাধিকাপ্রসাদ বললেন।

উইলে মোটামুটি যা লেখা আছে তা হচ্ছে, মহিমবাবু বলতে লাগলেন, ব্যাঙ্কের নগদ টাকার মধ্যে পঞ্চাশ হাজার টাকা পাবেন তাঁর একমাত্র ছেলে সমরবাবু, ভাইপো বিমলবাবু ও সুবলবাবু পাবেন দশ হাজার করে, রাধিকাবাবু পাবেন দশ হাজার। অমলেন্দুবাবু পাবেন পাঁচ হাজার ও চাকরবাকরেরা প্রত্যেকে এক হাজার করে টাকা পাবে। বাদবাকি অনুমান পঞ্চাশ হাজার টাকা মূল্যের এই বাড়ি যতদিন সমরবাবু জীবিত থাকবেন ভোগ করতে পারবেন। তাঁর মৃত্যুর পর এটা একটি দাতব্য চিকিৎসালয়ে পরিণত হবে।

বলেন কী! অনেক টাকার সম্পত্তি তো! কথাটা বললেন মিস্টার রায়।

হুঁ, সূর্যপ্রসাদ সত্যিকারের ধনী ব্যক্তিই ছিলেন। নিম্নকণ্ঠে আমি বললাম।

একটা কথা, মহিমবাবু, হঠাৎ কিরীটী রায় প্রশ্ন করলেন, উইলটা কবে লেখা হয়েছিল?

আজ থেকে মাস-দুই আগে।

ওই বোধহয় প্রথম ও শেষ উইল?

হ্যাঁ।

আচ্ছা, এবার তা হলে উঠি, নমস্কার। কিরীটী উঠে দাঁড়ালেন।

আমিও সঙ্গে-সঙ্গে উঠে দাঁড়ালাম।

গেট অতিক্রম করে রাস্তায় এসে যখন নামলাম, চারিদিকে সন্ধ্যার তরল অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে।

পরের দিন রাত্রে।

রাত বেশি হয়নি। মাত্র সাড়ে আটটা।

শীতের প্রকোপটা যেন আজ একটু বেশিই। সন্ধ্যা সাতটার মধ্যেই রোগী দেখবার পাট চুকে গিয়েছিল।

ডিসপেনসারিতে নিজের চেম্বারে বসে ডায়েরি লিখছিলাম।

কী বিচিত্র খেয়াল জানি না, প্রথম থেকেই সূর্যপ্রসাদ গুপ্তর রহস্যপূর্ণ ব্যাপারটা ও তৎসংক্রান্ত তদন্তের ব্যাপারটা যেমন-যেমন ঘটেছে, নিজের মতামত সহকারে ডায়েরির মধ্যে লিখে রাখছি সেই গোড়া থেকেই।

সত্যি, ব্যাপারটা আগাগোড়া যেন একটা জোরালো রহস্য-কাহিনি।

এখনও মধ্যে-মধ্যে অতর্কিতে যেন মানসপটে ভেসে ওঠে সেই রাত্রের ছোরাবিদ্ধ সূর্যপ্রসাদের মৃতদেহটা।

সত্যিই আশ্চর্য!

কে যে লোকটাকে অমন নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করল?

আর কেনই বা হত্যা করল কে জানে?

প্রশ্নগুলো বারবার মনের মধ্যে ইদানীং খুব বেশিই যেন আনাগোনা করে।

কিছুতেই যেন কথাটা ভুলতে পারি না।

কম্পাউন্ডারবাবু এসে ঘরে ঢুকলেন, স্যার!

কী?

একজন লোক কিরীটীবাবুর কাছ থেকে এইমাত্র চিঠিটা দিয়ে গেল আপনাকে দেওয়ার জন্যে। বলে গেল খুব জরুরি।

মুখ-আঁটা খামের একটা চিঠি এগিয়ে দিলেন কম্পাউন্ডারবাবু আমার দিকে।

চিঠিটা হাতে নিয়ে বললাম, লোকটা চলে গেছে?

হ্যাঁ।

ঠিক আছে, আপনি যান।

চিঠিটা খুলে আলোর সামনে মেলে ধরলাম।

প্রিয় ডাক্তার সেন,

কাল রাত্রে ন'টা নাগাদ সূর্যপ্রসাদ গুপ্তর 'লিলি কটেজে' একবার যেতে হবে, বিশেষ প্রয়োজন। সূর্যপ্রসাদের হত্যার ব্যাপার সম্পর্কে সকলে মিলে একটা খোলাখুলি আলোচনা করব স্থির করেছি। দুর্ঘটনার রাত্রে যাঁরা-যাঁরা 'লিলি কটেজে' উপস্থিত ছিলেন তাঁরা প্রত্যেকেই যাতে ওই সময়ে সেখানে উপস্থিত হন তার ব্যবস্থা

আপনাকেই করতে হবে। কাল রাত আটটায় আপনার ওখানে যাব। ওখান থেকে একসঙ্গেই আমরা 'লিলি কটেজে' যাব। নমস্কার। ভবদীয়।

কিরীটী রায়

পরের দিন রাত্রে।

চেম্বারেই বসে কিরীটী রায়ের অপেক্ষা করছিলাম। সব ব্যবস্থাই করেছি।

কিন্তু হঠাৎ কিরীটীর এইভাবে সকলকে 'লিলি কটেজে' একত্রিত করে আলোচনা করবার উদ্দেশ্যটা যে কী, সেটাই বুঝে উঠতে পারছিলাম না।

নিশ্চয় তাঁর একটা কোনও উদ্দেশ্য আছে এ-ব্যাপারে।

কিন্তু সে উদ্দেশ্যটা কী?

কী তিনি খোলাখুলি সকলের সঙ্গে আমাদের আলোচনা করতে চান?

তবে কি কিরীটী রায় আমাদের মধ্যেই কাউকে সূর্যপ্রসাদের হত্যার ব্যাপারে সন্দেহ করছেন?

কিন্তু কাকে?

কাকে তিনি সন্দেহ করছেন?

ভেতরে আসতে পারি?

দরজার বাইরে কিরীটী রায়ের পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনে চমকে উঠি।

আসুন-আসুন, মিস্টার রায়।

কালো রঙের একটা গ্রেট কোট গায়ে কিরীটী এসে ঘরে ঢুকলেন, গুড ইভনিং, ডক্টর সেন।

গুড ইভনিং। বসুন।

কিবীটী একটা চেয়ার টেনে নিযে বসলেন।

এখনও ঘণ্টাখানেক দেরি আছে ন'টা বাজতে, চা দিতে বলি?

আপত্তি নেই।

কম্পাউন্ডারবাবুকে ডেকে চা দিতে বললাম।

পকেট থেকে পাইপ ও টোব্যাকো পাউচটা বের করে পাইপের মুখে তামাক ভরতে-ভরতে মৃদুকণ্ঠে কিরীটী হঠাৎ বললেন, চেয়ারটা সম্পর্কে কারও কাছেই কোনও মনোমতো বা ডেফিনিট জবাব পাওয়া গেল না, ডাক্তার সেন।

চেয়ার?

হ্যাঁ, ওই যে-চেয়ারটায় সূর্যপ্রসাদের মৃতদেহ ছিল!

ও।

মেজর স্বামী, বলদেবাবু, বিমলবাবু, সুবলবাবু, রাধিকাপ্রসাদ, অমলেন্দু, আবদুল ও আপনি সকলেরই এক জবাব, চেয়ারটা কেউ সরায়নি।

সামান্য ওই চেয়ারের ব্যাপারটা নিয়ে এতই বা চিন্তিত হয়ে পড়লেন কেন, মিস্টার রায়, বলুন তো?

মৃদু হেসে এবারে আমি বললাম।

প্রত্যুত্তরে মৃদুকণ্ঠে কিরীটী বললেন, সামান্য ব্যাপার আদপেই নয়, ডাক্তার সেন।

ওই সময় কম্পাউন্ডারবাবু গরম-গরম দু-কাপ চা নিয়ে এসে আমাদের সামনে টেবিলের ওপরে রাখলেন।

নিন, চা নিন।

মিস্টার রায় একটা কাপ তুলে নিলেন।

আমিও একটা কাপ তুলে নিয়ে বললাম, মিস্টার রায়, আপনি হয়তো কথাটা শুনে হাসবেন,

তবে আমি এই হত্যার ব্যাপারটা গোড়া থেকে আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিমতো পর্যালোচনা করে, বিশেষ-বিশেষ কতকগুলো পয়েন্টস আমার যা মনে হয়েছে—।

বেশ তো, বলুন না, শোনা যাক। এমনও তো হতে পারে যে, কোনও কিছু আমার দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছে! কিন্তু আপনি—।

না-না, সেরকম হয়তো কিছু না, তবে—।

বলুন, বলুন?

প্রথম পয়েন্ট হচ্ছে ঃ সূর্যপ্রসাদ রাত সাড়ে এগারোটার সময় তাঁর ঘরের মধ্যে কারও সঙ্গে যে কথা বলছিলেন সে-কথা প্রমাণিত হয়েছে?

তা হয়েছে।

দ্বিতীয় পয়েন্ট ঃ ওই রাত্রেই দশটা থেকে সাড়ে এগারোটার মধ্যে কেউ-না-কেউ সূর্যপ্রসাদের সঙ্গে আমার তাঁর ঘর থেকে চলে আসবার পর যে দেখা করতে গিয়েছিল ওই কথাবার্তা শোনা থেকেই সেটা বোঝা যায়, তাই না মিস্টার রায়?

তা যায়।

তা হলে কার পক্ষে ওই সময় সূর্যপ্রসাদের সঙ্গে সকলের অজ্ঞাতে দেখা করা সম্ভব ছিল বলে আপনার মনে হয় বলুন, একমাত্র ওই সমর ছাড়া?

কিন্তু—

না-না, ভেবে দেখুন, জানলার কারনিসে ও হোটেলের ঘরের মেঝেতে যে জুতোর ছাপ পাওয়া গিয়েছে সেটা যে সমরেরই, সেটা কি আমরা বুঝতে পারছি না? তারপর ধরুন তৃতীয় পয়েন্ট, ওই রাত্রেই সাড়ে দশটা থেকে এগারোটার মধ্যে সমরকে স্টেশন রোডে ঘুরে বেড়াতে দেখা গিয়েছিল!

হুঁ। কিন্তু—

কিন্তু নয়, মিস্টার রায়, একটু ভালো করে ভেবে দেখলেই আমার যুক্তির সারবত্তাটা গ্রহণ করতে পারবেন। আমরা জানি, ইদানীং সমরের রীতিমতো অর্থকষ্ট চলছিল। এবং সে-সম্পর্কে ইতিমধ্যে সে বাপকে সাহায্যের জন্যে বলা সত্ত্বেও সূর্যপ্রসাদ তার সে-কথায় কান দেননি। তাই হয়তো সে আবার তার বাপের সঙ্গে দেখা করতে বাধ্য হয়েছিল—।

সহসা ওই সময় কিরীটী আমার মুখের দিকে চেয়ে বললেন, একটা কথা ভুলে যাচ্ছেন, ডাক্তার সেন!

কী?

রাত সোয়া এগারোটায় বিমলবাবু সূর্যপ্রসাদের ঘরে ঢুকেছিলেন এবং তখনও তিনি জীবিতই ছিলেন।

না, কথাটা আমি ভুলে যাইনি, মিস্টার রায়! আমার ধারণা—

কী?

আপনার সেদিনকার যুক্তিটাই ঠিক।

কী বলুন তো?

সেই আগন্তুকই হয়তো রাত সাড়ে এগারোটার পর অর্থাৎ বিমলবাবু তার জেঠামণির সঙ্গে দেখা করে চলে আসবার পরই দ্বিতীয়বার আবার জানলা-পথেই ঘরে ঢুকে সূর্যপ্রসাদকে হত্যা করে আবার জানলা-পথেই বের হয়ে গিয়েছে।

অতর্কিতে যেন সঙ্গে-সঙ্গে কিরীটী প্রশ্ন করলেন, তা হলে আপনার মতে সূর্যপ্রসাদের হত্যাকারী কে ডাক্তার সেন?

সে-রাত্রের সেই অচেনা আগন্তুক, যার সঙ্গে গেটের কাছে আমার ধাক্কা লেগেছিল।

ও। তারপর যেন একটু হেসে বললেন, তা সেই ছোরাটা? যার সাহায্যে সূর্যপ্রসাদকে হত্যা করা হয়েছে? সেই ছোরাটা সেই আগন্তুক জোগাড় করল কী করে?

সে আর এমন কী শক্ত ব্যাপার! হয়তো ওই আবদুলের সঙ্গেই পূর্ব হতে তার একটা যোগাযোগ ছিল এবং আবদুলই তাকে ছোরাটা সাপ্লাই করেছিল!

তা হলে বলতে চান, সে-রাত্রের হত্যার ব্যাপারে একটা পূর্ব ষড়যন্ত্র ছিল, ডাক্তার?

অস্বাভাবিক নয় থাকাটা।

তা অবিশ্যি নয়, তবে—।

তবে?

টেলিফোনে আপনাকে সংবাদ দেওয়াটা আর ঘরের ওই চেয়ারটা—।

সত্যি, চেয়ারটার ব্যাপারটায় আপনি যেন অত্যন্ত বিচলিত মনে হচ্ছে!

হঠাৎ কিরীটী চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে মৃদু হেসে বললেন, কিন্তু ন'টা বাজতে আর মাত্র আধঘণ্টা সময় আছে। আমাদের এবারে বেরিয়ে পড়া দরকার। সকলেই হয়তো আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন, ডাক্তার সেন!

হ্যাঁ-হ্যাঁ, চলুন।

উঠে দাঁড়ালাম আমিও।

পনেরো

আমারই গাড়িতে করে আমরা 'লিলি কটেজে' এসে পৌঁছলাম।

পথে উভয়ের মধ্যে আমাদের আর কোনও কথাই হল না।

আমাদের আলোচনার জন্যে সে-রাত্রে কিরীটীর পূর্ব পরামর্শমতোই যে-ঘরে সূর্যপ্রসাদ নিহত হয়েছিলেন সেই ঘরটিই নির্দিষ্ট হয়েছিল।

কিরীটীর অনুমানই ঠিক।

ঘরের মধ্যে সকলেই আমাদের জন্যে তখন অপেক্ষা করছিলেন।

এবং ঘরের মধ্যে সব কিছু যেমন পূর্বে ছিল, ঠিক তেমনিই যেন রয়েছে দেখলাম। কেবল কিরীটীর পূর্ব পরামর্শমতো ডাইনিং হল থেকে বড় টেবিলটা এনে ঘরের মধ্যে পাতা হয়েছিল ও খানকতক চেয়ার সকলের বসবার জন্য টেবিলটার দু-পাশে পেতে দেওয়া হয়েছিল।

সে-রাত্রেও বাইরে প্রচণ্ড শীত পড়ায় ঘরের ফায়ার-প্লেসটা জ্বেলে দেওয়া হয়েছিল। টেবিলটার চারপাশে চেয়ারে সকলেই বসে আছে, সামনের দিকে তাকাতেই দেখতে পেলাম।

আমাকে ও মিস্টার রায়কে নিয়ে উপস্থিত আমরা তখন ঘরের মধ্যে আটজন।

মেজর কৃষ্ণস্বামী, বলদেব সিংহ, রাধিকাপ্রসাদ, বিমল, সুবল, অমলেন্দু, আমি ও মিস্টার কিরীটী রায়।

ঘরের সিলিংয়ের বিদ্যুৎবাতি নিভিয়ে টেবিলের ওপরে একটি নীল ডোমে ঢাকা টেবিল-ল্যাম্পটি জ্বেলে দেওয়া হয়েছে।

নীলাভ আলোর অস্পষ্টতায় সমগ্র ঘরটি জুড়ে যেন একটি বিচিত্র রহস্য ঘনীভূত হয়ে উঠেছে।

ফায়ার প্লেসের উর্ধ্বে ও পার্শ্বসীমানায় অগ্নির একটা চক্রাকার রক্তাভা যেন ছড়িয়ে গিয়েছে।

আটটি প্রাণী আমরা ঘরের মধ্যে উপস্থিত, কিন্তু কারও মুখেই টুঁ শব্দটি পর্যন্ত নেই। বোবা সকলে।

প্রথমে কিরীটী ও তাঁর পশ্চাতে আমি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করার সঙ্গে-সঙ্গে একসঙ্গে ছ'জোড়া চক্ষুর নীরব দৃষ্টি যুগপৎ কিরীটীর মুখের ওপর বারেকের জন্যে স্থিরনিবদ্ধ হল।

খোলা জানলা-পথে একঝলক ঠান্ডা হাওয়া সহসা যেন ঘরের মধ্যে একটা প্রেতের দীর্ঘশ্বাস ছড়িয়ে গেল।

চকিতে সঙ্গে-সঙ্গে আমার দৃষ্টিটা গিয়ে পড়ল ঘরের কোণে রক্ষিত সেই হাইব্যাক চেয়ারটির ওপর।

সেই চেয়ার! মাত্র কয়েক রাত্রি আগে ওই চেয়ারের ওপরেই সকলে মিলে আমরা এই ঘরেই আবিষ্কার করেছিলাম ছুরিকাবিদ্ধ সূর্যপ্রসাদ গুপ্তর হিমশীতল প্রাণহীন দেহটা।

আজ আবার রাত্রে সেই নৃশংস হত্যার হত্যাকারীকে খুঁজে বের করবার জন্যেই আমরা একত্রে এই ঘরে এসে মিলিত হয়েছি।

কয়েকটা স্তব্ধ মুহূর্ত।

শ্বাসরোধকারী একটা মৃত্যুশীতল স্তব্ধতা যেন।

মৃত্যু—মৃত্যু এসেছিল সবার অলক্ষ্যে সে-রাত্রে এই কক্ষে।

পা টিপে-টিপে এসেছিল। হাতে ছিল তীক্ষ্ণ ছোরা।

কেমন করে—কেমন করে হত্যা করেছিল হত্যাকারী?

ঢং ঢং ঢং—রাত্রি ন'টার সংকেতধ্বনি শোনা গেল ওই সময় সহসা। এবং সঙ্গে-সঙ্গে কিরীটীই ঘরের সেই মুহূর্তের জমাট স্তব্ধতা ভঙ্গ করে বললেন, সকলেই তা হলে আপনারা এসেছেন। এই শীতের রাত্রে এভাবে আপনাদের এখানে টেনে এনে কষ্ট দিতে হল বলে আমি দুঃখিত। কিন্তু সূর্যপ্রসাদবাবুর নৃশংস হত্যা ব্যাপারটারও একটা মীমাংসা হওয়া দরকার আপনাদের সকলের দিক থেকেই, তাই নয় কি?

কিরীটী উপবিষ্ট সকলের মুখের প্রতিই তাঁর সপ্রশ্ন দৃষ্টিটা বুলিয়ে নিলেন।

বলা বাহুল্য, কেউ কোনও শব্দ পর্যন্ত করলেন না।

যে যেমন বসেছিলেন তেমনি বসে রইলেন, নির্বাক, নিস্পন্দ।

দুটি চেয়ার তখনও খালি ছিল।

একটিতে আমাকে চোখের ইঙ্গিতে বসতে বলে অন্যটা টেনে নিয়ে বসলেন মিস্টার রায়। পকেট থেকে সিগার-কেসটা বের করে তা থেকে একটা সিগার নিয়ে অগ্নিসংযোগ করলেন।

কয়েকটা স্তব্ধ মুহূর্ত আবার গড়িয়ে গেল।

তারপর কিরীটীই আবার কথা শুরু করলেন।

বললেন, শুধু খোলাখুলি আলোচনাই নয়, আরও একটা বিশেষ উদ্দেশ্য আছে আমার এই রাত্রে এখানে আপনাদের সকলকে এভাবে একত্রিত করবার। কিন্তু সেটা বলবার আগে—বিমলবাবু, আপনার কাছে আমার একটা বিশেষ অনুরোধ আছে।

বিমলবাবু সঙ্গে-সঙ্গে কিরীটীর মুখের দিকে নিঃশব্দে তাকালেন।

বিমলবাবু! কিরীটী অতঃপর চাপা অথচ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলতে লাগলেন, জানি আপনি সমরবাবুর শুধু ভাই নন, তাঁর সমবয়েসি বন্ধু, সমরকে সত্যিই আপনি ভালোবাসেন। তাই আপনার কাছে আমার অনুরোধ, আপনি যদি সত্যিই সমরবাবুর বর্তমান গতিবিধি সম্পর্কে কিছু জানেন—কোথায় তিনি আছেন বা থাকতে পারেন, তাঁকে আপনি অবিলম্বে ফিরে আসতে বলুন।

বোবার মতোই যেন চেয়ে আছেন দেখলাম বিমলবাবু কিরীটীর মুখের দিকে।

মিস্টার রায় আবার বলতে লাগলেন, নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, এভাবে আত্মগোপন করে থাকার সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর অবস্থা বিপজ্জনক হয়ে উঠছে ক্রমশ। এখনও তিনি ফিরে এলে হয়তো আত্মরক্ষার একটা উপায় খুঁজে পেতেন। নিজেকে defend করবার একটা যুক্তি পেতেন। কিন্তু এরপর হয়তো সে-সুযোগটুকুও আর তাঁর থাকবে না।

কিন্তু আমি কিছুতেই বিশ্বাস করি না, মিস্টার রায়, ওই নৃশংস ব্যাপারে সমরের এতটুকুও হাত আছে! বললেন বিমলবাবু।

তাই তো বলছি, বিমলবাবু, এখনও তাঁকে আত্মপ্রকাশ করতে বলুন। এখনও বাঁচবার সময় আছে।

চেয়ে দেখলাম কিরীটীর শেষের কথায় সহসা যেন বিমলবাবুর মুখটা কেমন ফ্যাকাসে হয়ে গেল।

শুষ্ককণ্ঠে কোনওমতে বিমলবাবু কতকটা যেন আত্মগতভাবেই বললেন, এখনও সময় আছে!

হ্যাঁ, এখনও সময় আছে। আমি কিরীটী রায় আপনাকে কথা দিচ্ছি, কোনও ক্ষতিই আপনার হবে না। যদি জানেন তো এখনও বলুন, কোথায় সমরবাবু আত্মগোপন করে আছেন?

বিশ্বাস করুন, মিস্টার রায়, রুদ্ধকণ্ঠে বিমলবাবু বললেন, সত্যিই সমরের কোনও সন্ধানই আমি জানি না।

জানেন না?

না, না।

এবারে রাধিকাবাবু কথা বললেন, যদি জানো তো কেন বলছ না, বিমল?

বিশ্বাস করুন, বাবা, সত্যিই আমি জানি না সমরের কোনও সংবাদ। জেঠামণির মৃত্যুর রাত্রে বা তারপর একটিবারের জন্যেও তার সঙ্গে আমার দেখা হয়নি।

বেশ। বলে কিরীটী রায় ঘরের মধ্যে উপস্থিত আমাদের সকলের ওপরেই নিঃশব্দে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে ধীর শান্তকণ্ঠে বললেন, আজ এ-ঘরে যাঁরা উপস্থিত রয়েছেন তাঁদের প্রত্যেককেই আমি অনুরোধ করছি, যদি কেউ আপনাদের মধ্যে সমরবাবুর সংবাদ জানেন তো অনুগ্রহ করে বলুন আমাকে এখনও।

কিন্তু সকলেই নির্বাক।

কারও মুখে টুঁ-শব্দটি পর্যন্ত নেই।

অদ্ভুত একটা স্তব্ধতা ঘরের মধ্যে যেন থমথম করছে।

সহসা সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে রাধিকাপ্রসাদই আবার বিমলবাবুকে সম্বোধন করে বললেন, কেন বোকামি করছ, বিমল, জানো যদি তো বলো না সমর কোথায়? সে যদি অন্যায় করেই থাকে তো—।

কিন্তু শেষ হল না রাধিকাপ্রসাদের কথা, আর্তকণ্ঠে প্রতিবাদ জানান বিমলবাবু, এ আপনি কী বলছেন বাবা? আপনিও কি মনে করেন সমরই জেঠামণিকে খুন করেছে? তাকে কি আপনি চেনেন না?

তীক্ষ্ণকণ্ঠে পালটা প্রতিবাদ জানালেন রাধিকাপ্রসাদ, থামো, কতটুকু তুমি এ-সংসারের জানো? সমর যে ইদানীং গোল্লায় গিয়েছিল, জুয়ো-নেশা কোনও কিছুই তার যে বাদ ছিল না তা কে না জানে। তা ছাড়া, আমি নিজে তো জানি, দাদাকে সে অর্থের জন্যে জানিয়েছিল।

সহসা বিমলবাবু এবারে কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়ে ভগ্ন, করুণকণ্ঠে বলে উঠলেন, মিস্টার রায়, আপনি কি একটি কথাও বলতে পারছেন না? কেন—কেন আপনি চুপ করে আছেন?

উনি আর কী বলবেন, বিমলবাবু! বললেন মেজর স্বামী।

বিমলবাবু, শান্ত হোন। কিরীটী আবার মুখ খুললেন, ব্যস্ত হবেন না।

তারপর ক্ষণকাল স্তব্ধ থেকে মিস্টার রায় আবার আমাদের সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে শান্ত দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, আমি যখন এ-ব্যাপারে হাত দিয়েছি, যেমন করে যে-উপায়েই হোক এ-রহস্যের কিনারা আমি করবই। চাই কি এ-ব্যাপারে আপনারা কেউ আমাকে সাহায্য করুন বা না করুন।

সহসা মেজর কৃষ্ণস্বামী প্রতিবাদ জানালেন, আপনি এ-কথা বলছেন কেন, মিস্টার রায়? আমরা কি আপনাকে সূর্যপ্রসাদের হত্যারহস্য উদ্‌ঘাটনের ব্যাপারে কোনও সাহায্য করিনি বলতে চান?

না, করেননি—।

মানে?

মানেটা তো বোঝা তেমন কঠিন নয়, মেজর স্বামী! এখানে আপনারা আজ যাঁরা উপস্থিত আছেন এই মুহূর্তে, যদি বলি তাঁরা সকলেই তাঁদের জবানবন্দিতে কিছু না কিছু গোপন করেছেন, কথাটা কি মিথ্যে বলা হবে?

নিশ্চয়ই। বললেন আবার মেজর স্বামী।

না, মিথ্যে নয়। আমি বলছি, আপনাদের প্রত্যেকেই কিছু না কিছু আমার কাছে গোপন করেছেন। আপনাদের মধ্যে প্রত্যেকেই যে যতটুকু জানেন ওই ব্যাপারে আমাকে অকপটে সব খুলে বলেননি!

এবারে সবাই চুপ।

বলুন ঈশ্বরের নামে, আপনাদের প্রত্যেকের বিবেকের নামে শপথ করে বলুন তো, আমার কথা মিথ্যে?

চুপ। সবাই চুপ। সবাই যেন একেবারে বোবা।

আপনাদের প্রত্যেকের নীরবতাই আমার কথার সত্যতা প্রমাণ করছে। যাক, আমার আর কিছু বলার নেই। যা আমার আজ বলবার ছিল সব বলা হয়েছে।

কিরীটী আর দাঁড়ালেন না।

ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন।

ষোলো

পরের দিন প্রত্যুষে ডিসপেনসারির চেম্বারে রোগী দেখা নিয়ে ব্যস্ত আছি, হঠাৎ ফোনটা বেজে উঠল, ক্রিং ক্রিং ক্রিং...

রিসিভারটা তুলে নিলাম, হ্যালো, ডাক্তার সেন স্পিকিং।

ফোনে থানা-অফিসার মিস্টার পান্ডের গলা শোনা গেল।

কে, ডাক্তার সেন? আমি পান্ডে কথা বলছি। মিস্টার রায়কে সঙ্গে নিয়ে এখুনি একবার 'লিলি কটেজে' যদি আসেন—।

কী ব্যাপার, মিস্টার পান্ডে?

আসুন না। এলেই সব জানতে পারবেন। দেরি করবেন না।

যাচ্ছি।

ফোনটা রেখে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত হলাম।

কিরীটী তাঁর বাসাতেই ছিলেন।

আমার মুখে সব শুনে বললেন, বেশ, চলুন।

আমারই গাড়িতে দুজনে 'লিলি কটেজে'র দিকে রওনা হলাম।

গেটের কাছে একজন কনস্টেবল আমাদের অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছিল। সে-ই আমাদের বললে, সোজা ওপরে একেবারে সূর্যপ্রসাদের শয়নঘর-সংলগ্ন বসবার ঘরে চলে যাওয়ার জন্যে। মিস্টার পান্ডে নাকি সেই ঘরেই আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন।

সূর্যপ্রসাদের বসবার ঘরে ঢুকতেই পান্ডে আমাদের আহ্বান জানালেন, আসুন মিস্টার রায়, ডাক্তার সেন।

ব্যাপার কী মিস্টার পান্ডে! এত জরুরি তলব একেবারে! কিরীটীই প্রশ্নটা করলেন।

বিশেষ কিছু না। পরশুদিন থানায় আপনি আমাকে বলেছিলেন না মিস্টার রায়, মিস্টার গুপ্তর শয়নঘরটা আর একবার ভালো করে মাইনিউটলি সার্চ করে দেখবার জন্যে—।

হ্যাঁ।

গতকাল একটা ডাকাতি কেসে অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলাম, সময় করে উঠতে পারিনি। তাই আজ যখন এলাম সার্চ করে দেখবার জন্যে, ভাবলাম আপনারাও উপস্থিত থাকুন, তাই ডেকেছি। পান্ডে বললেন।

বেশ চলুন, দেখা যাক।

কিরীটীর পূর্ব নির্দেশমতোই সূর্যপ্রসাদের শয়নঘরটা তাঁর নিহত হওয়ার পরদিন খানাতল্লাশি করবার পর থেকেই পুলিশের জিম্মায় তালাবন্ধ ছিল। এবং চাবি ছিল পান্ডের কাছেই। এ ক'দিন আর ঘরটা খোলা হয়নি।

আজ সকলের উপস্থিতি ও সাক্ষাতেই তালা খুলে আমরা সকলে পুনরায় সূর্যপ্রসাদের শয়নঘরে প্রবেশ করলাম।

জানলা-দরজা সব বন্ধ থাকায় ঘরটা ছিল দিনের বেলাতেও অন্ধকার।

ঘরে পা দেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই যেন মনে হল কার দীর্ঘশ্বাস একটা শুনতে পেলাম। সেদিন প্রত্যুষে যেমন দেখেছিলাম আজও ঠিক তেমনটিই রয়েছে সব ঘরের মধ্যে।

কিরীটীই এগিয়ে গিয়ে ঘরের জানলা দুটো খুলে দিলেন।

দিনের প্রথম প্রসন্ন আলো খোলা জানলা-পথে ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করল।

সিঙ্গল পালঙ্কে শয্যাটি তেমনি পাতা আছে।

পালঙ্কের শিয়রের কাছে একটি আয়রন চেস্ট গডরেজের। ঘরের এক কোণে ছোট একটি সেক্রেটারিয়েট টেবিল। একটি গদিমোড়া বিভলভিং চেয়ার।

শয্যার তলাতেই সিন্দুকের চাবি ছিল।

পান্ডে চাবির সাহায্যে সিন্দুকটা খুললেন। সিন্দুকের মধ্যে পাওয়া গেল একটা দামি কাসকেটের মধ্যে সূর্যপ্রসাদের মৃত স্ত্রীর গহনাগুলো, কিছু পুরাতন চিঠিপত্র। বেশিরভাগই সেগুলো সূর্যপ্রসাদের প্রথম জীবনের, স্ত্রীর লেখা।

এবং পাওয়া গেল একটা আইভরির কৌটোর মধ্যে গোটাপাঁচেক বাদশাহি মোহর।

অতঃপর পান্ডে সেক্রেটারিয়েট টেবিলের টানা চাবি দিয়ে খুললেন। প্রথম টানা থেকেই কিছু কাগজপত্রের সঙ্গে লাল সুতোয় বাঁধা দশ টাকার নোটের একটা মোটা তাড়া পাওয়া গেল। নোটের তাড়াটা হাতে নিযে বিস্মিত কণ্ঠে পান্ডে বললেন, আশ্চর্য, ড্রয়ারের মধ্যে মিস্টার গুপ্ত এতগুলো নগদ টাকা এভাবে রেখে দিয়েছিলেন?

পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন অমলেন্দু। তিনি বললেন, হ্যাঁ, বরাবর তো ওইভাবে ড্রয়ারেব মধ্যেই টাকা রাখতেন মিস্টার গুপ্ত।

তাই নাকি! মারো গোলি, তা এ যা চাবি দেখছি, এ-ড্রয়ার তো অনায়াসেই ভেঙে খোলা যায়। পান্ডে আবার বললেন।

অমলেন্দু আবার বললেন, চাকরবাকরদের তিনি অত্যন্ত বিশ্বাস করতেন। তবে ও-টাকাটা মনে হচ্ছে—যে-রাত্রে দুর্ঘটনা ঘটে সেই দিনই দ্বিপ্রহরে ব্যাঙ্ক থেকে হাজার টাকা আমি তাঁরই নির্দেশে তুলে এনে দিয়েছিলাম, বোধহয় সেই টাকাটাই।

হাজার টাকা তুলে এনে দিয়েছিলেন? প্রশ্ন করলেন আবার পান্ডে।

হ্যাঁ। সব দশ টাকার নোট ছিল।

এবারে বিনা বাক্যব্যয়ে লক্ষ করলাম, পান্ডে নোটের তাড়াটা গুনছেন। বার দুই গুনে অমলেন্দুর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, মারো গোলি, কিন্তু এতে তো দেখছি হাজার নেই। পঞ্চাশখানা দশ টাকার নোট কম।

পঞ্চাশখানা মানে পাঁচশত টাকা কম। অমলেন্দু বললেন।

তাই তো শুনে দেখছি। হয়তো পাঁচশত টাকা কাউকে তিনি দিয়েছিলেন এর মধ্যে থেকে। বললেন পান্ডে।

টাকাকড়ি যখন যাকে দেওয়া হত ইদানীং, বরাবর আমার কাছেই হিসেব থাকত। কাউকে পাঁচশত টাকা সেদিন দিলে নিশ্চয়ই আমি জানতাম। তা ছাড়া টাকাগুলো তো আমি তাঁকে সেদিন রাত্রে ডিনারের অল্প আগে দিয়েছিলাম। এবং আমারই সামনে তিনি টাকাগুলো ড্রয়ারে রেখেছিলেন।

কিরীটী এবারে বললেন, ডিনারের পর হয়তো কাউকে টাকাটা তিনি দিয়েছেন।

না, তা হতে পারে না, কারণ, আমাকেই তিনি বলেছিলেন টাকাটা পরের দিন সকালে তাঁর প্রয়োজন আছে। কণ্ঠে বেশ কিছুটা জোর দিয়েই কথাগুলো বললেন অমলেন্দু।

কিন্তু পাঁচশত টাকা যখন বান্ডিলের মধ্যে কম তখন তিনি সেই রাত্রেই টাকাটা কাউকে দিয়েছিলেন কিংবা কেউ সেই রাত্রে তাঁর অজান্তেই ঘরে ঢুকে টাকাটা—আই মাস্ট সে—চুরি করেছে।

মারো গোলি, ইয়েস, ইউ আর রাইট, মিস্টার রায়। কিরীটীর মন্তব্যকে সমর্থন করলেন পান্ডে।

আচ্ছা, আপনাদের মধ্যে কে-কে সে-রাত্রে ডিনারের পর এ-ঘরে এসেছিলেন? হঠাৎ কিরীটী প্রশ্ন করে।

জবাব দিলেন অমলেন্দুই, তা তো ঠিক বলতে পারি না, তবে ডিনারের পর বিছানা ঠিক করে দিতে রোজকার মতো আবদুল এসেছিল এ-ঘরে, আমি জানি।

আবদুলকে তখুনি ডাকানো হল পান্ডের নির্দেশে।

আবদুল?

আজ্ঞে—।

সে-রাত্রে সাহেবের বিছানা ঠিক করবার জন্যে তুমি এ-ঘরে এসেছিলে তো, না? প্রশ্ন করেন পান্ডেই।

হ্যাঁ।

তোমার সাহেবের ওই ড্রয়ারে হাজার টাকার নোট ছিল, কিন্তু এখন পাঁচশত টাকা কম দেখা যাচ্ছে।

আল্লার কসম হুজুর, টাকার কথা কিছুই আমি জানি না।

প্রায় কেঁদে ফেলে আবদুল।

পান্ডে কিন্তু চিৎকার করে ধমকে উঠলেন আবদুলকে, মারো গোলি, আবার মিথ্যে বলছিস! চোর বদমাশ—ডাকু কাঁহেকা! গোলি মারকে একদম জান নিকাল দেগা, সাচমুচ বাতাও।

দোহাই হুজুরের, টাকা আমি নিইনি, বিশ্বাস করুন।

জরুর তুম লিয়া হ্যায়! গর্জন করে উঠলেন পুনরায় পান্ডে।

না হুজুর, সত্যিই আমি নিইনি—।

মারো গোলি। ব্রিজনন্দন?

হোজুর!

সিপাই ব্রিজনন্দন এসে ঘরে ঢুকল। খট করে সেলাম দিল।

আবদুলের শপথ বা কান্নায় কোনও কানই দিলেন না পান্ডে। তখুনি ব্রিজনন্দনের জিম্মায় হাতকড়া লাগিয়ে আবদুলকে থানায় পাঠিয়ে দিলেন।

কাঁদতে-কাঁদতে আবদুল চলে গেল।

এবং অনুসন্ধানের ব্যাপারেও আপাতত ওইখানেই ইতি পড়ল। মিস্টার পান্ডের সঙ্গে-সঙ্গে আমি ও মিস্টার রায়ও বের হয়ে এলাম 'লিলি কটেজ' থেকে।

আমারই গাড়িতে সবাই ফিরে চললেন।

এখন আমার কী মনে হচ্ছে জানেন, মিস্টার রায়?

পাণ্ডের কথায় কিরীটী তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, কী?

ওই বেটা আবদুলই বোধহয় মিস্টার গুপ্তকে মার্ডার করেছে!

তাই আপনার মনে হচ্ছে?

মারো গোলি, জরুর!

সতেরো

কিন্তু একজনের বিরুদ্ধে মার্ডার-চার্জ আনলেই তো হবে না। সেক্ষেত্রে যুক্তি ও প্রমাণের দ্বারা—।

কিরীটীব কথাটা যেন কতকটা দম্ভভরে পাণ্ডে একটা থাবা দিয়েই সহসা অর্ধপথে থামিয়ে দিয়ে বললেন, মারো গোলি, একশোবার। যুক্তি ও প্রমাণ এক্ষেত্রে অত্যন্ত স্ট্রং আছে বইকী। বলে নিজেই কথাগুলো উৎসাহের সঙ্গে তাঁর প্রমাণ ও যুক্তি দিয়ে বলে যেতে লাগলেন, প্রথমত, ধরুন, ডাক্তার সেন সে-রাত্রে যখন সূর্যপ্রসাদের ঘর থেকে বের হয়ে আসেন, দরজার গোড়াতেই তাঁর আবদুলের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, কেমন কি না?

তা হয়েছিল।

এবং ডাক্তার সেনের জবানবন্দি থেকেই আমরা জানি, আবদুল সে-রাত্রে হঠাৎ এভাবে দরজার গোড়ায় ডাক্তার সেনের সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়ায় কেমন যেন থতমত খেয়ে গিয়েছিল।

ডাক্তার সেন তাই বলেছেন বটে। মৃদুকণ্ঠে কিরীটী বললেন।

মারো গোলি! লেকেন হামারা বাত এহি হ্যায়, কেন সে ডাক্তারকে দেখে এরকম থতমত খেয়ে গিয়েছিল?

কী আপনার ধারণা?

সম্ভবত সূর্যপ্রসাদকে হত্যা করবার সুযোগের অন্বেষণেই এসময় আবদুল সেখানে পরিস্থিতিটা বুঝে নিতে এসেছিল গোপনে। এবং পাছে কেউ দেখে ফেললে তার movements সন্দেহ করে তাই সঙ্গে করে এনেছিল কফির ট্রে-টা।

লক্ষ করলাম এবারে কিরীটী প্রত্যুত্তরে কিছু বললেন না বটে, তবে তাঁর ওষ্ঠপ্রান্তে মৃদু একটা হাসির রেখা চকিতে দেখা দিয়েই যেন মিলিয়ে গেল।

আবার মিস্টার পাণ্ডে তাঁর বক্তব্য শুরু করলেন, তা হলে দেখা যাচ্ছে যে, সেসময় প্রথমবার ও দ্বিতীয়বার আবদুল সুযোগের অন্বেষণেই সূর্যপ্রসাদের ঘরের দিকে গিয়েছিল, যেসময় তার বিমলবাবুর সঙ্গে অতর্কিতে দেখা হয়ে যায়, কেমন কি না?

হুঁ।

মারো গোলি, তা হলেই দেখুন, রাত সোয়া এগারোটার পর সে যখন নীচে তার ঘরে শুতে যায়, তার পূর্বে দু-দুবার সে তার মনিবের ঘরের দিকে গিয়েছিল। So-কী conclusion-এ এর থেকে আমরা পৌঁছতে পারি বলুন, মিস্টার রায়? আর কী-ই বা আপনার মনে হয়?

দেখুন, মিস্টার পাণ্ডে—।

ইয়েস!

আপনার এ-যুক্তি থেকে আবদুল সম্পর্কে অনেক কিছুই যেমন মনে করে নেওয়া যেতে পারে আবার তেমনি অনেক কিছুই মনে না-ও করা যেতে পারে।

মৃদুকণ্ঠে কিরীটী কথাগুলো বললেন।

মারো গোলি।

মানে আবদুল সে-রাত্রে তার মনিবকে হত্যা করতেও পারে, আবার নাও করতে পারে।

মারো গোলি—You think so?

আমার তো তাই মনে হয় সাধারণ বিচারবুদ্ধিতে!

মারো গোলি, কিন্তু—।

তা ছাড়া, এ-হত্যার ব্যাপারে, মানে আবদুলই যদি ধরে নেওয়া যায় আপনার কথামতো, তার মনিবকে হত্যাই করেছে, সে-ক্ষেত্রে তার হত্যার কোনও মোটিভই তো খুঁজে পাচ্ছি না, সত্যি কথা বলতে কি!

মারো গোলি, মোটিভ? কিন্তু এ-জগতে সব ব্যাপারেই সব কিছুর মোটিভই কি খুঁজে পাওয়া যায় মিস্টার রায়?

তা হয়তো যায় না, তবে প্রত্যেক হত্যার ব্যাপারেই সেই আবহমান কাল থেকেই একটা কিছু মোটিভ খুঁজে এসেছি বইকী আমরা!

মারো গোলি, আবদুলের কথা না হয় ছেড়েই দিন, এই সমরবাবুর কথাই ধরুন না—।

সমর!

হ্যাঁ, তাঁর এভাবে আত্মগোপন করে থাকবার এখনও কী উদ্দেশ্য বলুন তো?

হয়তো আছে একটা কিছু।

মারো গোলি, হয়তো আছে? কিন্তু কী? বলে নিজেই বললেন মিস্টার পান্ডে, তার টাকার প্রয়োজন অতএব এই সময় যে-কোনও উপায়ে তার বাপকে সরাতে পারলে এতগুলো টাকা পেয়ে যাবে এবং অভাবটাও মিটবে, এই বোধহয়!

একেবারে না-ই বা বলি কী করে? কিরীটী পুনরায় মৃদু হেসে শান্তকণ্ঠে বলেন।

মারো গোলি। ননসেন্স! ঝুটমুট সে তার বাপকে হত্যা করতে যাবে কেন বলুন তো? সে ভালো করেই জানত, তার প্রতি তার বাপের রীতিমতো দুর্বলতা আছে!

দুর্বলতা?

নিশ্চয়ই। নইলে ওইভাবে চেক জালের ব্যাপারের পরও সূর্যপ্রসাদ কখনও ব্যাপারটা চাপা দিয়ে দিতেন?

সেটা তাঁর পুত্রের প্রতি স্নেহ না হয়ে, নিজের পারিবারিক কলঙ্ককে চাপা দেওয়ার জন্যেও তো হতে পারে, মিস্টার পান্ডে! কিরীটী বললেন।

মারো গোলি, মোটেই তা নয়।

নয়?

নিশ্চয়ই না। হিউম্যান ক্যারেক্টার আমার মতো যদি study করতেন তো বুঝতে পারতেন, মিস্টার রায়, ওই সমরই নিশ্চয় আবদুলকে হাত করে তাকে দিয়ে বাপকে সরিয়েছে!

কিরীটী আবার মৃদু হাসলেন।

হাসছেন যে, মিস্টার রায়?

অন্য একটা সম্ভাবনার কথা এক্ষেত্রে কিন্তু আপনি ভুলে যাচ্ছেন, মিস্টার পান্ডে!

কীরকম?

ডাক্তার সেনের জবানবন্দিতে একটা কথা আমরা শুনেছিলাম—।

কী?

সেই ব্লু রঙের খাম ও লেটার-পেপারে লেখা সূর্যপ্রসাদের কাছে তাঁর বন্ধুর চিঠিটা—।

চিঠি।

হ্যাঁ, যেটা সূর্যপ্রসাদ পড়ে শোনাবার জন্য ডাক্তার সেন বারবার পীড়াপীড়ি করা সত্ত্বেও—বলতে-বলতে মিস্টার রায় একবার আড়চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, কিছুতেই শেষপর্যন্ত শোনেননি বা শুনতে চাননি উনি। তাই না, ডাক্তার সেন?

হ্যাঁ, কিন্তু—।

কিন্তু বলছিলাম কী, সেই চিঠিটার মধ্যে সমরের উল্লেখ ছিল। তাই না ডাক্তার?

মৃদুকণ্ঠে আমি সমর্থন জানালাম, হ্যাঁ।

তা হলে এমনও তো হতে পারে, ওই চিঠির মধ্যে সূর্যপ্রসাদের কোনও পারিবারিক কলঙ্কের কথা সত্যিই ছিল?

পারিবারিক কলঙ্ক!

ডাক্তারও তো তাই সমর্থন করবেন। তাই না ডাক্তার সেন? কিরীটী আবার আমার মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্নটা করলেন।

হ্যাঁ, মানে—।

যাক সে-কথা। বলছিলাম এমনও তো হতে পারে, সমরই কোনও-না-কোনও উপায়ে জগৎজীবনবাবুর মৃত্যু ঘটিয়ে পুলকজীবনবাবু তাঁর ছোট ভাইয়ের ঘাড়ে দোষটা চাপাবার ভয় দেখিয়ে, তার কাছ থেকে টাকা দোহন করছিল! অর্থাৎ সাদা কথায় পুলকজীবনকে blackmailing করছিল! আর সেই কথাটারই হয়তো উল্লেখ ছিল সেই ব্লু রঙের চিঠিতে!

আশ্চর্য! Poor সমর। ক্রমেই দেখছি তার বিরুদ্ধে অপরাধের প্রমাণগুলো ঘোরালো হয়ে উঠছে একের-পর-এক। কথাটা বললাম আমিই এবার।

চকিতে কিরীটী রায় আমার দিকে তাকিয়ে শান্তকণ্ঠে বললেন, হচ্ছে নাকি?

তাই তো দেখছি, মিস্টার রায়! জবাব দিলাম।

কিন্তু ওইখানেই, ডাক্তার সেন আপনার ও মিস্টার পান্ডের সঙ্গে মতভেদ ঘটছে!

মারো গোলি, কিঁউ? প্রশ্ন করলেন পান্ডে।

কারণ, যদিও তাঁর বর্তমান দুরবস্থার জন্যে নিদারুণ অর্থাভাব, জুয়ার প্রতি তাঁর নেশা ও উচ্ছৃঙ্খল স্বভাব এবং শেষোক্ত দুটি জোরালো কারণ প্রভৃতি তার মোটিভই প্রমাণ করছে, তথাপি—।

তথাপি কী, মিস্টার রায়? প্রশ্নটা করলাম আমিই।

ধীর শান্ত মৃদু কণ্ঠে প্রত্যুত্তর দিলেন এবাবে মিস্টার রায়, তথাপি কোনওমতেই এখনও আমি বিশ্বাস করতে পারছি না যে সমরবাবুই তাঁর পিতার হত্যাকারী!

মারো গোলি, কিঁউ? প্রশ্ন করলেন পান্ডে আবার।

সহজ ও স্বাভাবিক বিচারবুদ্ধিতে। যাকে বলেন আপনারা common sense!

মারো গোলি!

ইতিমধ্যে কথা বলতে-বলতে তিনজনে আমরা যে ঘোরাপথে হাঁটতে-হাঁটতে কিরীটীর বাসাবাড়ি 'সানি ভিলা'র গেটের সামনে এসে গিয়েছি, আমি বা পান্ডে টের পাইনি। কিরীটী রায়ের পরবর্তী কথাতেই চমক ভাঙার সঙ্গে-সঙ্গে ব্যাপারটা খেয়াল হল।

আসুন ডাক্তার সেন, মিস্টার পান্ডে—গরিবের বাড়িতে এককাপ করে চা খেয়ে যান।

না-না, চা—, বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলাম আমিই।

কিন্তু কিরীটী কানই দিলেন না যেন সে-কথায়।

বললেন, আরে আসুন-আসুন!

কিন্তু তখন স্বপ্নেও ভাবিনি কত বড় একটা বিস্ময় পরমুহূর্তেই কিরীটীর 'সানি ভিলা'য় আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে।

'সানি ভিলা'র গেট দিয়ে প্রবেশ করে, বাইরের ঘরের পরদা তুলে ভিতরে পা দেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই যেন থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম।

ঘরের মধ্যে একাকী একটা সোফায় দু-হাতের মধ্যে মাথা গুঁজে নিস্তব্ধ হয়ে বসে আছেন বিমলবাবু।

কে, বিমলবাবু?

কিরীটীর সচকিত প্রশ্নে চমকে মাথা তুলে তাকালেন বিমলবাবু আমাদের দিকে।

সমস্ত মুখখানার মধ্যে তখন যেন তাঁর মনে হল, লজ্জা, অপমান ও নিদারুণ একটা হতাশা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

বিমলবাবু! আবার নিরুত্তর বিমলবাবুর দিকেই তাকিয়ে ডাকলেন মিস্টার রায়।

মারো গোলি, আপ কেইসে হিঁয়া আ গেই, বিমলবাবু?

বিমলবাবু তবু নিরুত্তর।

বসুন-বসুন মিস্টার পাণ্ডে, বসুন ডাক্তার সেন।—কিরীটীই আবার বললেন।

আমরা উভয়েই অতঃপর দুটো সোফায় উপবেশন করলাম।

লেকেন বাত কেয়া, বিমলবাবু, আপ হিঁয়া কিঁউ?

বিমলবাবু তথাপি নিরুত্তর।

কী হয়েছে বিমলবাবু? কতক্ষণ এসেছেন?

কিরীটীর স্নেহভরা কণ্ঠস্বরে এবারে মুখ খুললেন বিমলবাবু।

মিনিট দশেক হবে এসেছি, মিস্টার রায়।

মৃদুকণ্ঠে জবাব দিলেন বিমলবাবু, আপনারা আমাদের বাড়ি থেকে বের হয়ে আসার সঙ্গে-সঙ্গেই সাইকেলে চেপে এখানে চলে এসেছি সোজা, মিস্টার রায়।

মৃদু হেসে এবারে কিরীটী হঠাৎ বললেন, কিন্তু যা আপনার আমাকে বলার ছিল সেটা গতরাত্রেই আমাকে বলতে পারতেন?

মিস্টার রায়—।

হ্যাঁ, আপনাকে তো আমি আশ্বাস দিয়েছিলামই। সেক্ষেত্রে সত্যটুকু বলবার মতো সৎসাহস আপনাদের সকলের কাছেই কিন্তু আমি আশা করেছিলাম—।

কিন্তু কিরীটীর কথা শেষ হল না, বাইরে সাইকেলের ঘণ্টি শোনা গেল।

কে এল?

উঠে দাঁড়ালেন মিস্টার রায় সঙ্গে-সঙ্গেই প্রায়।

খোলা দরজাপথে উঁকি দিয়ে দেখি, মিস্টার পাণ্ডের অধীনস্থ পুলিশ কর্মচারী সতীনাথবাবু সাইকেল থেকে নামছেন।

সতীনাথ সাইকেলটা একপাশে ঠেসান দিয়ে রেখে সোজা একেবারে এসে ঘরে ঢুকলেন।

মিস্টার পাণ্ডেই সর্বপ্রথম সতীনাথকে প্রশ্ন করলেন।

কেয়া বাত হায়, সতীনাথ?

সতীনাথ তখনও রীতিমতো হাঁপাচ্ছেন।—হাঁপাতে-হাঁপাতেই বললেন, সেই লোকটিকে পাওয়া গিয়েছে স্যার।

কে? কাকে পেয়েছেন? প্রশ্ন করলেন এবারে মিস্টার রায়।

সেই যে যার সঙ্গে সে-রাত্রে, মানে মিস্টার গুপ্তর হত্যার রাত্রে 'লিলি কটেজ'র গেটের সামনে ডাক্তার সেনের ধাক্কা লেগেছিল।

মারো গোলি, মিল গিয়া! সাবাস সতীনাথ! জিন্দা রহো বেটা! তুম তো তব সব কামাল কর দিয়া, মেরে লাল!

আনন্দে একেবারে যেন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন মিস্টার পান্ডে।

আঠেরো

সত্যি কথা বলতে কী, আমি তো তখন একেবারে থ।

কিন্তু পান্ডে তখনও সোৎসাহে বলে চলেছেন, মারো গোলি—হুঁ-হুঁ বাবা, ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ দেখনি! Long eleven years,' experience in this line! মিস্টার রায়, হাম আপকো বোলা নেই—ও শালাকো জরুর হাম পাকড় লেঙ্গে?

মিস্টার পান্ডে গোঁফে তা দিতে লাগলেন।

কিরীটী রায় ধীরপদে সোফা থেকে উঠে গিয়ে টিপয়ের ওপরে রক্ষিত একটি সুদৃশ্য রৌপ্যাধার থেকে একটি চুরোট তুলে নিয়ে তাতে অগ্নিসংযোগ করে পুনরায় নিঃশব্দে এসে সোফার ওপরে বসলেন।

ব্যাপারটার মধ্যে যেন কোনও গুরুত্বই নেই।

নিতান্ত স্বাভাবিক দৈনন্দিনের একটি ঘটনা মাত্র।

সতীনাথবাবু! সহসা কিরীটী কথা বললেন।

বলুন?

লোকটিকে কি গ্রেপ্তার করা হয়েছে?

না। তবে আপাতত তাকে পুলিশের নজরবন্দি করে রাখা হয়েছে সন্দেহের বশে।

জবাব দিলেন সতীনাথবাবু।

ও। তা লোকটার কোনও জবানবন্দি নেওয়া হয়েছে?

একের নম্বরের ঝানু আর বদমাশ লোকটা, মিস্টার রায়! কোনও কথা বলতেই চায় না।

হুঁ। কোথায় নজরবন্দি করে রেখেছেন তাকে?

মুরি পুলিশ স্টেশনে।

মারো গোলি! তা হলে তো এখুনি আমাদের একবার সেখানে যাওয়া দরকার। কী বলেন, মিস্টার রায়?

তা দরকার বইকী। কারণ যে ধরা পড়েছে সে-ই যে সেই রাত্রের অচেনা লোকটা, সেটা তো এখনও প্রমাণিত হয়নি। সেক্ষেত্রে তার শনাক্তকরণেরও তো একটা দরকার আছে। বললেন মিস্টার রায়।

শনাক্তকরণ! ও তো জরুর হো যায়গা। যব পাকড়া গিয়া ভাগেগা কিধার?

তা সত্যি। তা হলে, ডাক্তার সেন—।

বলুন?

তাকালাম আমি মিস্টার রায়ের মুখের দিকে।

বর্তমান ক্ষেত্রে আপনার সাহায্যেরই তো সবচাইতে বেশি প্রয়োজন আমাদের।

আমার?

হ্যাঁ। কারণ, it was you—যাঁর সঙ্গে সে-রাত্রে ওই লোকটির 'লিলি কটেজে'র সামনে ধাক্কা লেগেছিল। মিস্টার রায় বললেন।

হ্যাঁ, হ্যাঁ—রায়সাব বিলকুল ঠিক বোলা। সমর্থন করলেন মিস্টার পান্ডে।

তাই বলছিলাম, আপনি identify করলেই তো ব্যাপারটা চুকে গেল।

জরুর। চলিয়ে, ডক্টর সেন।

বেশ, চলুন।

পুলিশ ভ্যানে চেপেই আমরা অতঃপর থানা থেকে মুরি পুলিশ স্টেশনের দিকে রওনা হলাম সকলে।

বলা বাহুল্য, পূর্বেই বিমলবাবুকে তখনকার মতো বিদায় দেওয়া হয়েছিল।

বেলা তখন গোটা-বারো হবে।

প্রচণ্ড রৌদ্রতাপে আকাশটা যেন একেবারে পুড়ে ঝাঁ-ঝাঁ করছিল।

পুলিশ ট্রাকটা গন্তব্যস্থানের দিকে চল্লিশ মাইল স্পিডে ছুটছিল।

সকলেই চুপচাপ ভ্যানের মধ্যে বসে। একমাত্র অনর্গল বক্তা মিস্টার পাণ্ডে ব্যতীত। মিস্টার পাণ্ডে সতীনাথকে বাহবা দিয়ে বলছিলেন, তুমহে জরুর প্রমোশন মিলনা চাইয়ে, সতীনাথ। আজই রাতকো হাম পাটনা মে রিপোর্ট ভেজ দুঙ্গা। তুম এস আই. বন যায়গে বেটা।

সতীনাথ কিন্তু চুপ।

কারণ, বাকসর্বস্ব মিস্টার পাণ্ডেকে তিনি বোধহয় ভালো করেই চিনতেন। মিস্টাব পাণ্ডে যে ঠিক উলটোটিই করবেন তা হয়তো তাঁর জানা ছিল।

সমস্ত বাহাদুরি নিজে পকেটস্থ করেই তিনি রিপোর্ট দেবেন।

আমার মাথাব মধ্যে তখন কিন্তু একটিমাত্র চিন্তাই পাক খাচ্ছিল। বিমলবাবু কী বলতে এসেছিলেন মিস্টার রায়কে!

কী এমন কথা যা পূর্বে তিনি গোপন করেছিলেন এবং যা শেষ পর্যন্ত বলতে প্রস্তুত হয়েছিলেন।

বেলা প্রায় দেড়টা নাগাদ ভ্যানটা মুরি আউটপোস্টের সামনে এসে দাঁড়াল। কাঁটাতার ও রাংচিতার বেড়া দেওয়া ছোট কম্পাউন্ড ও তার মধ্যস্থলে ছোট একতলা একটা বাড়ি।

ভ্যান থেকে নেমে সকলে আমরা এগিয়ে চললাম।

সর্বাগ্রে মিস্টার পাণ্ডেই ভারী অ্যামুনিশান বুটের মচমচ শব্দ তুলে এগিয়ে গেলেন, তাঁর পশ্চাতে আমি, মিস্টার রায় ও সতীনাথ।

ঘরে ঢুকতেই থানা-ইনচার্জ মিস্টার চৌবে তাঁর বিরাট ভুঁড়িটা নিয়ে কোনওমতে হাঁসফাঁস করতে-করতে উঠে দাঁড়ালেন, বোধহয় সকলকে অভ্যর্থনা জানাতেই।

মিস্টার পাণ্ডে কাউকে থানা ইনচার্জের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার ধার দিয়েও গেলেন না। একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসতে-বসতে বললেন, কিধার হ্যায় উ আদমি? ইধার বুলাইয়ে—।

তখুনি দরোয়ানকে ডেকে চৌবে লোকটাকে অফিসঘরে আনতে বললেন কয়েদঘর থেকে।

একটু পরেই দরোয়ানের সঙ্গে-সঙ্গে লোকটি এসে ঘরে ঢুকল।

বয়েসে যুবক। বাইশ-তেইশের বেশি বয়েস হবে না যুবকটির। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালাম আমি তার দিকে।

বেশ ঢ্যাঙা, রোগাটে এবং পাকানো চেহারা।

রসকষহীন দীর্ঘ অত্যাচার-স্বাক্ষরিত রুক্ষ একটা ভাব চেহারার মধ্যে সুস্পষ্ট।

রোগা এবং ঢ্যাঙা হলেও দেহের প্রতিটি পেশি যেন দেহের শক্তিরই স্বাক্ষর দেয়।

মাথাভরতি তেলহীন রুক্ষ বিপর্যস্ত কেশ।

মুখের রং কিছুটা রোদে পোড়া, তামাটে এবং এককালে যে গায়ের রং পরিষ্কারই ছিল, আজও তা বুঝতে কষ্ট হয় না।

পরিধানে একটা মলিন চকোলেট কালারের লংস ও গায়ে একটা কালো রঙের পুরাতন লংকোট।

কোটের কলার উলটানো।

মুখটা ভেঙে গিয়েছে, ছোট-ছোট দাড়িতে ভরতি মুখটা।

চোখের দৃষ্টিতে যেন একসঙ্গে ঘৃণা ও আক্রোশ ফুটে বের হচ্ছিল।

কেয়া নাম হ্যায় তুমহারা?—প্রশ্ন করলেন পাণ্ডেই সর্বপ্রথম লোকটিকে।

রুক্ষ বিরক্তভরা কণ্ঠে সঙ্গে-সঙ্গে জবাব এল, কেন, কতবার বলতে হবে? কমল—।

কমল কী? আপনার পদবী কী? জিজ্ঞাসা করলেন এবারে কিরীটী।

পূর্ববৎ রুক্ষ কর্কশ বিরক্তিভরা কণ্ঠে জবাব এল, কেন বলুন তো নাম, গোত্র পদবী ঠিকুজি সব চাইছেন? কী করেছি আমি?

কঠোর কণ্ঠে এবারে জবাব দিলেন মিস্টার পাণ্ডে, দেখিয়ে বাবুজি, ভালোভাবে কথার জবাব না দেন তো ঠাণ্ডি গারদে আটকে রাখব। কুছ খানাপানি ভি নেহি মিলেগা।

কেন? আমি চুরি করেছি না খুন করেছি?

হঠাৎ কিরীটী রায়ের কণ্ঠে চমকে উঠলাম, ডাক্তার সেন।

বলুন?

কী, লোকটাকে চেনা-চেনা বলে মনে হচ্ছে?

হুঁ, লম্বা লোকটা অনেকটা এইরকমই বটে—তবে অন্ধকারে একটুক্ষণের জন্যে দেখেছিলাম—

কিরীটী আমার কথার জবাব দিলেন না।

লোকটির দিকে আবার কী যেন তাকিয়ে দেখতে লাগলেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নিঃশব্দে।

তারপরই আবার সেই প্রথম প্রশ্নের পুনরুক্তি করলেন, কই কমলবাবু, আপনার পদবীটা তো বললেন না?

এবারে যেন সহসা পিঞ্জরাবদ্ধ হিংস্র ব্যাঘ্রের মতোই গর্জন করে উঠল কমল, বলব না—শুনছেন, বলব না!

বলবেন না?

না—না—না। তারপরই পার্শ্বে দণ্ডায়মান চৌবের দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে পূর্ববৎ তীক্ষ্ণ আক্রোশভরা কণ্ঠে, আমাকে ছেড়ে দেবেন কি না বলুন?

কঠোর কণ্ঠে এবারে প্রত্যুত্তর দিলেন মিস্টার পাণ্ডে, না, ছাড়া হবে না।

হবে না? কিন্তু কেন শুনতে পারি কি? কীসের জন্যে এভাবে আমাকে আটকে রেখেছেন?

জবাব দিলেন এবারে সতীনাথবাবু, আজ ভোররাত্রের দিকে আপনি 'লিলি কটেজে'র পেছনের বাগানের আশেপাশে ঘোরাফেরা করছিলেন কেন?

আমার খুশি—

বেশ খুশিই না হয়, কিন্তু আমাদের একজন পুলিশ-প্রহরী আপনাকে দেখতে পেয়ে যখন ডেকেছিল, আপনি তখন সাড়া না দিয়ে পালিয়ে এলেন কেন?

কে বললে পালিয়ে এসেছি? মিথ্যে কথা!

আমি একাগ্রচিত্তে কমলের বাদানুবাদ শুনছিলাম।

এবং এতক্ষণে আমি বুঝতে পারি, ওই লোকের সঙ্গেই সেরাত্রে 'লিলি কটেজে'র সামনে আমার ধাক্কা লেগেছিল, ওর কণ্ঠস্বরও আমি চিনতে পারি।

সঙ্গে-সঙ্গে মিস্টার রায়ের মুখের দিকে চেয়ে চাপা-কণ্ঠে বললাম, মিস্টার রায়, চিনেছি! এই লোকের সঙ্গেই সে-রাত্রে আমার ধাক্কা লেগেছিল।

চিনতে পেরেছেন?

হ্যাঁ।

কমলবাবু!

গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কমল। কিরীটীর ডাকে কোনও সাড়াই দিল না।

শুধু গতকাল রাত্রেই নয়, কিছুদিন আগেও এক রাত্রে আপনি এগারোটা নাগাদ 'লিলি কটেজে'র সামনে গিয়েছিলেন—।

তাই নাকি!

হ্যাঁ, আর যে-লোকের সঙ্গে সে-রাত্রে আপনার ধাক্কা লেগেছিল ও যাকে আপনি 'লিলি কটেজে'ব কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তিনি এখানেই উপস্থিত। আপনাকে তিনি চিনতে পেরেছেন।

বেশ করেছেন।

কিন্তু গিয়েছিলেন কেন?

আমার খুশি আমি গিয়েছিলাম। আমি কোথায় যাব-না-যাব তা-ও কি অন্যাকে জিজ্ঞাসা করে যেতে হবে নাকি? ঝাঁঝালো কণ্ঠে জবাব দিল কমল।

তা হলে আপনি স্বীকার করছেন যে, সে-রাত্রে আপনি 'লিলি কটেজে'র সামনে গিয়েছিলেন? কিরীটী মৃদুকণ্ঠে বললেন।

গিয়ে থাকি গিয়েছি, না গিয়ে থাকি না গিয়েছি! কিন্তু মশাই, জিজ্ঞাসা করতে পারি, এসব অবান্তর জেরা কেন আমাকে করছেন আপনারা?

আপনি কি সংবাদপত্রে 'লিলি কটেজে'র মালিক সূর্যপ্রসাদ গুপ্তর রহস্যজনক হত্যার কথা পড়েননি, কমলবাবু?

প্রশ্নটা করে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন মিস্টার রায় কমলের দিকে।

বলিহারি বাবা! কী বুদ্ধি আপনাদের! সত্যি, আপনাদের বুদ্ধির বালাই নিয়ে আমার জলে ডুবে মরতে ইচ্ছা করছে! অ্যাঁ, শেষপর্যন্ত আমাকেই তবে সূর্যপ্রসাদের হত্যাকারী ঠাওরে নিয়েছেন আপনারা? ব্রেভো!

কিন্তু সে-রাত্রে আপনি রাত এগারোটার সময় 'লিলি কটেজে'র গেটের সামনে উপস্থিত ছিলেন—এ-কথাটা তো অস্বীকার করতে পারেন না, কমলবাবু?

কিরীটী আবার বললেন পূর্ববৎ দৃঢ় অথচ মৃদুকণ্ঠে।

কিন্তু আমি যদি বলি, না, যাইনি?

যাননি?

না।

যাননি?

না, না।

কিন্তু আমি বলছি আপনি গিয়েছিলেন।

গায়ের জোরে প্রমাণ করতে চান নাকি কথাটা?

না, গায়ের জোরে নয়। প্রমাণ আছে আমার।

প্রমাণ? কি, ফটো তুলে রেখেছিলেন বুঝি সেসময় আমার একটা?

না, ফটো নয়। কিন্তু দেখুন তো—, বলতে-বলতে চকিতে পকেটে হাত চালিয়ে কিরীটী সূর্যপ্রসাদের বাগানে মালির ঘরের পাশের ঘরে কুড়িয়ে পাওয়া সেই নস্যির ডিবেটা বের করে কমলের সামনে ধরে বললে, চিনতে পারছেন এটা?

কিন্তু আশ্চর্য, জোঁকের মুখে নুন ছিটিয়ে দিলে মুহূর্তে যেমন জোঁকের অবস্থা হয়, ঠিক তেমনি যেন ছোট্ট হয়ে গেল সহসা কমলের মুখখানা কিরীটীর হাতে কালো রঙের সেই নস্যির কৌটোটা

দেখে। এবং ক্ষণপূর্বের তার সেই ঔদ্ধত্য ও আক্রোশ যেন দপ করে ফুঁ দিয়ে বাতি নেভাবার মতো নিবে গেল।

কিন্তু সেও মুহূর্তের জন্যে।

পরক্ষণেই কমলের মুখের ভাব ও চেহারা পরিবর্তিত হল।

এবং ক্ষণপূর্বের দম্ভ ও ঔদ্ধত্যের সঙ্গে বললে, চমৎকার, একটা অতি সাধারণ কালো রঙের নস্যির কৌটো প্রমাণ কবে দিল যে, সে-রাত্রে 'লিলি কটেজে' আমি গিয়েছিলাম!

অদ্ভুত একটা কাঠিন্য যেন চকিতে কিরীটী রায়ের সমস্ত চোখেমুখে ফুটে ওঠে। তিনি ঋজু কঠিন কণ্ঠে এবারে বলেন, কমলবাবু, কিরীটী রায়ের সঙ্গে আপনার পরিচয় নেই, নয়তো বুঝতে পারতেন সে যখন কোনও ব্যাপারে স্থিরনিশ্চিত হয় তখন তার যুক্তি ও প্রমাণের সাহায্যেই হয়। কিন্তু এই তো বয়েস আপনার, কোকেন অভ্যাস কতদিন হল করেছেন?

কোকেন?

অর্ধস্ফুট কণ্ঠে কমল কথাটা উচ্চারণ করলে।

হ্যাঁ, কোকেন। এবং পরক্ষণেই পূর্ববৎ কঠিন স্বরেই বললেন, আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে, জীবনে যেন ও বস্তুটির নামও আপনি শোনেননি। শুনুন কমলবাবু, কোকেনে যারা অভ্যস্ত তাদের লক্ষণগুলো আমার অজানা নয়। আপনার দাঁত, ঠোঁট ও চোখের তারারন্ধ্র তার সাক্ষী দিচ্ছে। তা ছাড়া, নস্যির সঙ্গে কোকেন মেশানো থাকায় কেমিক্যাল অ্যানালিসিসে সেটা আমার কাছে ধরা পড়েছে।

কমল এবারে একেবারে নিথর স্তব্ধ।

কী কমলবাবু, এবারে বোধহয় স্বীকৃতি দিতে আপত্তি হবে না আপনার?

মিস্টার পাণ্ডে এবারে বললেন, মারো গোলি, কিঁউ আভি বোলো ও রোজ রাতকো 'লিলি কটেজমে' তুম গিয়া কি নেহি?

মৃদু শান্তকণ্ঠে এবার কমল জবাব দিলে, হ্যাঁ, সে-রাত্রে সেখানে আমি গিয়েছিলাম। কিন্তু—।

বলুন?

সোয়া এগারোটার সময়েই সেখান থেকে আমি চলে আসি। সেখানকার লোকেরাই তার সাক্ষী দেবে।

বেশ, এনকোয়ারি করে যদি তাই প্রমাণ হয় তো আপনি যে নির্দোষ মেনে নেব আমরা। কিন্তু আপনার নির্দোষিতা প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত আপনাকে পুলিশের নজরবন্দি হয়ে থাকতে হবে, কমলবাবু। কিরীটী বললেন।

বেশ।

কিন্তু সে-রাত্রে ওইসময় কেন 'লিলি কটেজে' গিয়েছিলেন? পুনরায় প্রশ্ন করলেন কিরীটী।

দরকার ছিল আমার।

কী দরকার ছিল?

একজনের সঙ্গে সেখানে আমি—।

বলুন?

একজনের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম।

অত রাত্রে?

হ্যাঁ।

কার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন?

বলতে পারব না।

বলবেন না?

না।

কেন?

কারণ, কথাটা একান্তই আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। তা ছাড়া, রাত সোয়া এগারোটায় যদি সেখান থেকে চলেই এসে থাকি, তা হলেই তো আমার নির্দোষিতা প্রমাণ হয়ে যায়। তবে কেন আবাব এসব প্রশ্ন?

প্রশ্ন করছি এই জন্যে যে, রাত্রি সোয়া এগারোটায় সেখান থেকে চলে আসবার পর যে আবার আপনি রাত বারোটার মধ্যে কোনও এক সময় সেখানে যাননি, সেটা তো ওর দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে না, কমলবাবু!

আমি বলছি আপনাকে, সূর্যপ্রসাদকে আমি হত্যা করিনি।

সেটা তো প্রমাণসাপেক্ষ।

কেন?

কাবণ, যতক্ষণ না সে-রাত্রে সোয়া এগারোটা থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত এই পঁয়তাল্লিশ মিনিট সময়ের মুভমেন্টস আপনার আমরা সঠিকভাবে জানতে পারছি, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরাই বা আপনাব কথাটা সত্যি বলে একেবারে মেনে নিই কেমন করে বলুন?

বেশ, মানতে হয় মানবেন, না মানতে হয় না-মানবেন। আমার যা বলবার ছিল বলেছি, এবারে আপনাদের যেমন খুশি করুন।

যা হোক, শেষপর্যন্ত কমলবাবুকে আপাতত নজরবন্দি অবস্থায় রেখে এসে সকলে ভ্যানে চেপে বসলাম।

ভ্যান আবার রাঁচি শহরের দিকে ছুটে চলল ফিরতিপথে।

উনিশ

একপাশে বসে কিরীটী রায় নিঃশব্দে ধূমপান করছিলেন।

সহসা নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে মিস্টার পান্ডে প্রশ্ন করলেন কিরীটীকে, মিস্টার রায়!

বলুন?

লোকটা যা বললে, তা আপনি বিশ্বাস করেন?

হুঁ।

করেন?

হুঁ, করি।

আমি শুধু নির্বাক বিস্ময়ে মিস্টার রায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

সমগ্র ফিরতিপথে কেউ আর একটি কথাও বললেন না।

প্রায় থানার কাছাকাছি এসে মিস্টার পান্ডেই আবার কতকটা যেন আত্মগতভাবেই বললেন মৃদুকণ্ঠে, আশ্চর্য, লোকটা কিছুতেই স্বীকার করল না।

কী, মিস্টার পান্ডে? প্রশ্নটা করলাম আমি।

লোকটা যে কেন সে-রাত্রে 'লিলি কটেজে' গিয়েছিল সেই কথাটা?

দু-চোখ বুজে একান্ত নির্লিপ্ত ভাবেই যেন অলস ভঙ্গিতে কিরীটী এতক্ষণ গাড়ির সিটে হেলান

দিয়ে বসেছিলেন, হঠাৎ চোখ না খুলেই মৃদু শান্তকণ্ঠে বললেন, স্বীকার না করলেও আমি জানি কেন কমলবাবু সে-রাত্রে 'লিলি কটেজে' গিয়েছিলেন।

প্রশ্নটা করলাম এবারে আমিই সবিস্ময়ে, আপনি জানেন সে কেন গিয়েছিল?

হ্যাঁ।

কিন্তু—।

লোকটা কেন গিয়েছিল জানেন, ডাক্তার সেন?

অবাক বিস্ময়ে কিরীটী রায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলাম, কেন?

কিন্তু তাঁর জবাবটা আর শোনা হল না, কারণ ঠিক সেই মুহূর্তে ক্যাঁচ করে ব্রেক কষে থানার সামনে এসে আমাদের ভ্যানটা দাঁড়াল।

কিরীটী সহসা চোখ খুলে বললেন, চলুন, নামা যাক।

এবং নামতে-নামতে বললেন, মিস্টার পাণ্ডে, বড্ড চায়ের পিপাসা পেয়েছে যে।

মারো গোলি—চলুন চলুন, নিশ্চয়ই—।

সোৎসাহে আহ্বান জানালেন মিস্টার পাণ্ডে।

কিন্তু থানায় যে আমাদের জন্যে আরও একটি নতুন বিস্ময় অপেক্ষা করছিল, সেটা যেন ভাবতেই পারিনি।

অফিসঘরে বসেই মিস্টার পাণ্ডে চায়ের হুকুম দিলেন।

কিরীটী একটা সিগারে নতুন করে অগ্নিসংযোগ করলেন। আমি বসে-বসে কমলবাবুর কথাই চিন্তা করতে লাগলাম।

মিস্টার পাণ্ডে সেদিনকার ডাকে আগত চিঠিপত্রগুলো খুলে একে-একে দেখতে লাগলেন। এবং হঠাৎ বেলে-রঙের একটা টাইপ করা সরকারি কাগজ দেখতে-দেখতে বলে উঠলেন, মারো গোলি, বড়ি তাজ্জব কি বাত।

কী হল? প্রশ্ন করলাম আমিই।

কিরীটীও তাকালেন মিস্টার পাণ্ডের মুখের দিকে।

যেসব ভিসেরা ও বড়ির পার্টস কলকাতায় কেমিক্যাল অ্যানালিসিসের জন্যে পাঠানো হয়েছিল, তার মধ্যে সূর্যপ্রসাদের বড়ির সব কিছুতেই arsenic পাওয়া গিয়েছে।

Arsenic? কথাটা একই সঙ্গে আমি ও মিস্টার রায় বললাম।

হ্যাঁ, arsenic।

মৃত্যুর কারণটা তাহলে কী দাঁড়াল মিস্টার পাণ্ডে? প্রশ্ন করলাম আমিই।

আপনার কী মনে হয়, ডাক্তার সেন? কিরীটী আমার মুখের দিকে সহসা যেন স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে প্রশ্নটা করলেন।

আমার?

হ্যাঁ, আপনি তো একজন উচ্চশিক্ষিত ডাক্তার—আপনিই বলুন না, মৃত্যুর কারণটা এক্ষেত্রে আসলে কী হতে পারে?

আমার—আমার মনে হয় stabbing-ই মৃত্যুর কারণ।

তাই, আপনার অনুমানই সত্য, ডাক্তার সেন। তবে এ-ও ঠিক—।

কী, মিস্টার রায়?

হতভাগ্য সূর্যপ্রসাদকে মোক্ষম বা চরম মৃত্যু আঘাত দেওয়ার পূর্বে আর্সেনিক সেঁকো বিষ দিয়ে slow poisoning নিশ্চয় করা হচ্ছিল—।

মারো গোলি—এ আপ কেয়া কহেতে হ্যায়, রায়সাব? মিস্টার পান্ডে বলে উঠলেন।

কেন, আপনার হাতের রিপোর্টই তো তাই প্রমাণ করছে, মিস্টার পান্ডে। তা যদি না হত, মৃতের ভিসেরা এবং চুলে ও নখে নিশ্চয়ই আর্সেনিক পাওয়া যেত না। কেমিক্যাল ইনভেস্টিগেশানে আর্সেনিকের trace বডি-টিস্যু ও ভিসেরায় পাওয়া গিয়েছে, অথচ অ্যাকিউট আর্সেনিক poisoning-এর কোনও সিম্পটমস পাওয়া যায়নি মৃত্যুর পূর্বে, তাতেই কি মনে হয় না যে, ছোরার সাহায্যে সূর্যপ্রসাদকে হত্যা করার পূর্বে, নিশ্চয়ই আর্সেনিকের সাহায্যে নিঃশব্দে, সবার অলক্ষ্যে, হতভাগ্যকে এ-দুনিয়া থেকে সরাবার জন্যে slow poisoning চলছিল। এবং এতে করে এই সিদ্ধান্তেই আমরা অনায়াসেই পৌঁছতে পারি যে—।

কী?

সূর্যপ্রসাদের হত্যার ব্যাপারটা সর্বতোভাবেই পূর্বপরিকল্পিত!

মারো গোলি।

হ্যাঁ, মিস্টাব পান্ডে, pre-arranged and pre-meditated। বেচারির মৃত্যুব দিন সত্যিই ঘনিয়ে এসেছিল!

সহসা মিস্টার পান্ডে কিরীটীর শেষের কথায় যেন বিশেষ উৎফুল্ল হয়ে উঠে বললেন, মারো গোলি, আপ ঠিক-ঠিক বোলা! তব তো জরুর ওহি বদমাশ হোগা! হ্যাঁ, অব ম্যায়নে সমঝ লিয়া।

মিস্টার পান্ডে!

কিরীটীর ডাকে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে এবারে পান্ডে জবাব দিলেন, এবাব তো বুঝতে পেরেছেন, মিস্টার রায়—।

কী?

ওহি আবদুলই উনকো খুন কিয়া হোগা জরুর!

আবদুল?

নিশ্চয়ই। সে-ই যখন সূর্যপ্রসাদকে সর্বদা খাবার ও পানীয় সরবরাহ করত, তখন সেক্ষেত্রে আবদুল ছাড়া আর কাব পক্ষে ওইভাবে মিস্টার গুপ্তকে arsenic-এব সাহায্যে slow poisoning করার সুবিধে ছিল বলুন? হ্যাঁ, জরুর ওহি হোগা।

কিন্তু একটা কথা ভুলে যাচ্ছেন, মিস্টার পান্ডে!

কী?

সূর্যপ্রসাদকে arsenic দিয়ে slow poisoning করা হলেও, তাঁর মৃত্যুর কারণটা শেষ পর্যন্ত কিন্তু stabbing-ই—arsenic নয়!

মৃদু শান্তকণ্ঠে কিরীটী কথাগুলো বললেন।

ধ্যুৎ তেরি শালা, মাবো গোলি!

একটা হতাশা ও ব্যর্থতা ফুটে ওঠে মিস্টার পান্ডের কণ্ঠস্বরে পরক্ষণেই।

পরের দিন।

বেলা তখন প্রায় গোটা-দশেক হবে।

চেম্বারে রোগীর তেমন বিশেষ ভিড় না থাকায় সাড়ে ন'টা নাগাদই হাতের কাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল।

ডায়েরিটা খুলে বসেছি গত ক'দিনের ঘটনাগুলো টুকব বলে, দরজার বাইরে পদশব্দ পাওয়া গেল।

ভেতরে আসতে পারি, ডাক্তার সেন?

কে, মিস্টার রায়? আসুন, আসুন।

কিরীটী এসে ঘরের মধ্যে ঢুকলেন।

পরিধানে একটা পাতলা ট্রপিক্যাল ট্রাউজার ও গায়ে তদ্রূপ হাফশার্ট।

চা দিতে বলি, মিস্টার রায়?

অমৃতে অরুচি কবে আমাব বলুন!

চায়ের কথা বলে বসলাম এসে আবার।

দু-চারটে মামুলি কথাবার্তার পর হঠাৎ একসময় আমি প্রশ্ন করলাম, আচ্ছা মিস্টার রায়, গতকাল মুরি আউটপোস্ট থেকে ফেরবার পথে—কমলবাবু কেন সে-রাত্রে 'লিলি কটেজে' এসেছিলেন, কথাটা যে বলতে-বলতে থেমে গেলেন—।

হ্যাঁ, তিনি এসেছিলেন—।

কিন্তু এবারেও কিরীটী রায়ের কথাটা শেষ হল না।

বাইরে ফট-ফট-ফট পরিচিত মোটর-বাইকের গর্জন শোনা গেল।

কী ব্যাপার? মিস্টার পান্ডে হঠাৎ এসময় এদিকে? বলতে-বলতে উঠে দাঁড়ালেন মিস্টার বায়।

মিস্টার রায়ের অনুমান মিথ্যা নয়।

মিস্টার পান্ডেই এসে পরক্ষণে কক্ষে প্রবেশ করলেন, মারো গোলি—আপনি এখানে, মিস্টার রায়, আর সারাটা শহর আপনাকে আমি ঢুঁড়ে বেড়াচ্ছি!

হাঁপাতে-হাঁপাতে পান্ডে বললেন।

কী ব্যাপার, মিস্টার পান্ডে? বসুন, বসুন।

মারো গোলি, আপ ঠিক কহেথে।

কী ঠিক বলেছি?

হ্যাঁ, কমল গুপ্ত লোকটা—।

কমল গুপ্ত! কিবীটী যেন চমকে ওঠে।

হ্যাঁ, লোকটার পদবিও জানা গিযেছে।

হুঁ, তা কী বলছিলেন?

সে সম্পূর্ণ নির্দোষ।

নির্দোষ?

হ্যাঁ, হ্যাঁ।

প্রমাণ পেয়েছেন তা হলে?

বিনা প্রমাণে পান্ডে এক পা-ও এগোয় না।

কিন্তু কী প্রমাণ পেলেন?

খোঁজ নিয়ে জানা গেল শহরে বাঙালিদের যে-ক্লাবটা আছে, তারই পিছনে যে-রেস্টুরেন্ট ও হোটেলটা আছে—ওই যে যার নাম ম্যানিলা হোটেল, সেখানেই বাত সাড়ে এগারোটা থেকে রাত সাড়ে বারোটা পর্যন্ত সে জুয়োর আড্ডায় ছিল—অর্থাৎ ফ্লাশ খেলছিল।

বটে।

হ্যাঁ। তা হলে রাত সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত যখন মিস্টার গুপ্ত সে-রাত্রে বেঁচেছিলেন, সেক্ষেত্রে কমলবাবু নিশ্চয়ই তাঁকে কোনওমতেই মার্ডার করতে পারেন না।

তা বটে।

তা হলে আর ভদ্রলোককে খুনের ব্যাপারে জড়ানো চলে না, কী বলেন?

তা আর চলে কী করে? মৃদুকণ্ঠে কিরীটী জবাব দেন।

কুড়ি

কয়েকটি স্তব্ধ মুহূর্ত।

তারপরই কিরীটী পান্ডের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, কমল গুপ্তকে তা হলে মুক্তি দিচ্ছেন, বলুন?

অগত্যা।

একান্ত যেন হতাশার সঙ্গেই কথাটা বললেন মিস্টার পান্ডে।

কিন্তু আমি যদি আপনি হতাম মিস্টার পান্ডে, তাহলে কমল গুপ্তকে এখনই ছেড়ে দিতাম না!

মারো গোলি, কিঁউ?

দিতাম না, তাই বললাম।

হস্তধৃত সিগারে একটা শিথিল টান দিয়ে কথার শেষে কিরীটী খানিকটা ধোঁয়া ছাড়লেন।

মারো গোলি—লেকিন সাব, ওহি তো হাম পুছতে হ্যায়, কিঁউ?

কেন?

হাঁ-হাঁ, বলে একটু থেমে আবার বললেন, মিস্টার সূর্যপ্রসাদের হত্যার ব্যাপারে কমলবাবু যে জড়িত নন, এটা তো আপনি নিশ্চয়ই বিশ্বাস করেন, মিস্টার রায়?

বোধহয় কমলবাবু খুনের ব্যাপারে জড়িত নন। কিন্তু তাই বলে স্থিরনিশ্চিত করেও তো কিছু এখুনি বলা যাচ্ছে না যে সত্যিই তিনি সম্পূর্ণ নির্দোষ।

মারো গোলি—এটা তো ঠিকই যে, রাত সাড়ে এগোরোটা থেকে রাত সাড়ে বারোটা পর্যন্ত সে ম্যানিলা হোটেলে ছিল? অতএব উড়ে এসে নিশ্চয়ই সে সকলের অলক্ষ্যে ওই সময়ের মধ্যে মিস্টার গুপ্তকে হত্যা করে যায়নি?

মিস্টার পান্ডে, আমি কালাও নই—বুদ্ধি-বিবেচনাও যৎসামান্য আমার আছে। আপনার যুক্তি আমি শুনেছিও। কিন্তু ব্যাপারটা আগাগোড়াই আপনি ভুলপথে বা ভুল দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করছেন।

ভুলপথে বিচার করছি।

হ্যাঁ?

লেকিন—।

শুনুন, মিস্টার পান্ডে, আমরা জানি, সে-রাত্রে মিস্টার সূর্যপ্রসাদ গুপ্ত সোয়া এগারোটা পর্যন্ত বেঁচেছিলেন, কেমন কি না?

হ্যাঁ।

অথচ কমলবাবু ম্যানিলা হোটেলে ছিলেন রাত সাড়ে এগারোটা থেকে রাত সাড়ে বারোটা পর্যন্ত, তা ছাড়া—।

তা ছাড়া?

যে-ঘটনা সুনিশ্চিত ভাবে এখনও প্রমাণিত হয়নি—এমন কোনও ঘটনাই আমি বিশ্বাস করি না।

মারো গোলি! এ-কথা তো বিমলবাবুর জবানবন্দি থেকেই প্রমাণিত হয়েছে আগেই যে, রাত সোয়া এগারোটার সময় মিস্টার গুপ্তর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল? অর্থাৎ তখনও তিনি বেঁচেছিলেন?

হ্যাঁ, কিন্তু তবু কথাটা কী জানেন, মিস্টার পান্ডে?

কী?

আজকালকার একজন যুবকের সব কথাই আমি বিশ্বাস করি না—যা তারা বলে, বিশেষ করে বিমলবাবুর মতো লোকের কথা।

মারো গোলি, কিন্তু আবদুলও তো তার জবানবন্দিতে বলেছে—।

কী বলেছে?

ঠিক ওই সময়েই মিস্টার গুপ্তর প্রাইভেট রুম থেকে সে বিমলবাবুকে বের হতে দেখেছে।

সহসা যেন বজ্রকঠিন কণ্ঠে কিরীটী বলে উঠলেন, না, সে দেখেনি।

আমরা দুজনেই চমকে যুগপৎ কিরীটী রায়ের মুখের দিকে তাকালাম।

তারপর মৃদুকণ্ঠে আমিই প্রশ্ন করলাম, দেখেনি?

না।

লেকিন—, কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন মিস্টার পাণ্ডে, কিন্তু তাঁকে বাধা দিলেন মিস্টার রায়, না ডাক্তার সেন, আসলে আবদুল বিমলবাবুকে আদপেই মিস্টার গুপ্তর প্রাইভেট ঘর থেকে বের হতে দেখেনি সে-রাত্রে ওই সময়।

তবে? প্রশ্ন করলাম আবার আমিই।

সে বিমলবাবুকে দেখেছে দরজার সামনে। ঘর থেকে ঠিক বের হতে দেখেনি।

কিন্তু মিস্টার রায়, এবারে বললাম আমিই, ঘর থেকে যদি ওইসময় বিমলবাবু বের না হয়ে থাকবেন তো তাঁকে দরজার সামনেই বা আবদুল দেখতে পেল কেমন করে? কোথায়ই বা তবে সেসময় তিনি ছিলেন?

হয়তো নীচে নামবার সিঁড়ির ঠিক ওপরেই।

জবাব দিলেন কিরীটী।

সিঁড়ির ওপরে?

হ্যাঁ, আমার অনুমান তাই।

কিন্তু তা-ও যদি হয়, সেই সিঁড়ির ঠিক সামনেই তো সূর্যপ্রসাদের শয়নঘরের দরজাটা?

তাই বটে।

তা ছাড়া, আরও একটা কথা—।

বলুন?

এক্ষেত্রে মিথ্যা বলবারই বা বিমলবাবুর কী কারণ থাকতে পারে?

হ্যাঁ-হ্যাঁ, ডক্টরসাব তো সাচ বাত বোলা। সায় দিলেন মিস্টার পাণ্ডে।

কিন্তু সেটাই তো এক্ষেত্রে আমাদের সামনে প্রশ্ন, মিস্টার পাণ্ডে? মৃদুকণ্ঠে জবাব দিলেন রায়।

কিরীটী রায়ের শেষের কথায় চকিতে একটা সম্ভাবনা আমার মনে উদয় হয়। এবং যে-প্রশ্নটা ওই মুহূর্তে আমার ওষ্ঠপ্রান্তে এসে হাজির হয়, সেটা না উচ্চারণ করে আমি পারি না।

আমি তাই বলেই ফেলি, তার মানে আপনি কি এই বলতে চান মিস্টার রায়—।

কী? বাধা দিয়ে বলে উঠলেন মিস্টার রায়।

যে বিমলবাবুই সেই পাঁচশত টাকাটা সে-রাত্রে তাঁর জেঠামশাইয়ের শয়নঘরের ড্রয়ার থেকে চুরি করেছিলেন?

স্পষ্ট করে আপাতত কারও সম্পর্কেই কিছুই আমি বলতে চাই না, ডাক্তার সেন। তবে—।

তবে?

বিমলবাবু সম্পর্কে আপনারা কতটা এখনও পর্যন্ত কী জানেন আমি জানি না, তবে গোপনে তাঁর সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে যেটুকু আমি জানতে পেরেছি, ইদানীং ভদ্রলোকের রীতিমতো একটা আর্থিক অনটন চলেছিল।

বিমলবাবুর?

হ্যাঁ, বলতে পারেন বিশ্রীভাবেই আর্থিক অনটনের ব্যাপারে ইদানীং কিছুকাল যাবৎ তিনি জড়িত হয়ে পড়েছিলেন।

ইয়ে আপ ঠিক কহেতে হ্যায়, রায়সাব?

জি। জেঠা সূর্যপ্রসাদবাবুর কাছ থেকে বিমলবাবু প্রতি মাসে যে-হাতখরচা বাবদ মাসোহারা পেতেন, তাতে করে তাঁর কুলোচ্ছিল না—তাঁর বিলাসী ও উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির জন্যেই। আর ওইখানেই ছিল তাঁর সঙ্গে সমরবাবুর হৃদ্যতা। কিন্তু যাক সে-কথা, যা বলছিলাম, পরিচিত ও বন্ধুবান্ধবদের কাছে ওই কারণেই তাঁর বেশ কিছু ধার-কর্জ হয়ে যায়। ইদানীং তারা তাগাদা দিয়ে বিমলবাবুকে বেশ অস্থির করে তুলেছিল। তার ওপরে ওই দুর্ঘটনার মাত্র হপ্তাখানেক আগে এখানকার এক বেনের কাছ থেকে হ্যান্ডনোট দিয়ে শ'তিনেক টাকা বিমলবাবু কর্জ নিয়েছিলেন সাতদিনের মেয়াদে। এবারে তা হলে ভেবে দেখুন, টাকার তাগাদায় অস্থির হয়েই যদি অন্য কোনও পথ না পেয়ে সে-রাত্রে তাঁর জেঠার শয়নঘরের ড্রয়ার থেকে পাঁচশত টাকা চুরি করেই থাকেন—।

হাঁ-হাঁ, জরুর হো সকতা।

তাই বলছিলাম, হয়তো ড্রয়ার থেকে টাকা নিয়ে যেমন বিমলবাবু ঘর থেকে বের হয়ে সিঁড়ির মুখে এসেছেন, সিঁড়িতে আবদুলের পায়ের শব্দে চমকে তাকে দেখতে পেয়েছেন। এবং পাছে আবদুল তাঁকে এসময় শয়নঘরের দরজার সামনে দেখে কোনওরূপ সন্দেহ করে, তাই হয়তো পরক্ষণেই দু-পা এগিয়ে গিয়ে তাড়াতাড়ি আবার সূর্যপ্রসাদের প্রাইভেট রুমের দরজার সামনে দাঁড়িয়েছিলেন, যাতে করে আবদুল তাঁকে ওইখানে ওইসময় ওই অবস্থায় দেখতে পেলেও কোনওরূপ সন্দেহ তো করবেই না, বরং মনে করবে হয়তো তখনি তিনি তাঁর জেঠামশাইয়ের প্রাইভেট ঘর থেকে বেব হয়ে এলেন। এবং পরমুহূর্তেই যেমনি তাঁর আবদুলের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তাড়াতাড়ি নিজের পোজিশন বাঁচাবার জন্য আবদুলকে একটা মিথ্যে কথা বলে ভাঁওতা দিয়ে সরে পড়েছিলেন। আশা করি, ডাক্তার সেন ও মিস্টার পান্ডে, আমি কী বলতে চাইছি তা আপনারা বুঝতে পারছেন!

জবাব দিলাম আমিই, হ্যাঁ, তারপর?

তারপর তিনি যখন বুঝতে পারলেন যে, তাঁর কথার সত্যতার ওপরেই বর্তমান সূর্যপ্রসাদের জটিল হত্যারহস্যের অনেকখানিই নির্ভর করছে, তখন তাঁর ওইভাবে মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া ছাড়া আর কী উপায় থাকতে পারে বলুন! কাজেই নিজেকে বাঁচাবার জন্যে একবার যখন মিথ্যে কথা বলে ফেলেছেন, তখন যে টাকা চুরির ব্যাপারটা শেষপর্যন্ত পুলিশের গোচরীভূত হয়ে গিয়েছে!

হঠাৎ ওই সময় মিস্টার পান্ডে বলে উঠলেন, মাবো গোলি, এ যা বলছেন আপনি একেবারে simply absurd! অসম্ভব। নেহি-নেহি, এ কভি নেহি হো সকতা।

কিরীটী প্রত্যুত্তরে কোনও জবাব দিলেন না, মৃদু একটু হাসির আভাস তাঁর ওষ্ঠপ্রান্তে জেগে উঠল মাত্র।

কিন্তু সেই মুহূর্তেই তাঁর ওষ্ঠপ্রান্তে সেই হাসির আভাসটুকু দেখেই আমি বুঝেছিলাম, কতখানি প্রত্যয়ের উপর নির্ভর করলে তবে মানুষ ওইভাবে সুনিশ্চিত বিশ্বাসে ওই ধরনের যুক্তিপূর্ণ কথা বলতে পারেন।

তাই আমিও প্রশ্ন করলাম।

বললাম, এইমাত্র যা বললেন—এ-কথাটা কি আগে থাকতেই আপনি ভেবে ছিলেন মিস্টার রায়?

ধীর সংযত এবং দৃঢ় কণ্ঠে প্রত্যুত্তর দিলেন কিরীটী রায়, হ্যাঁ, ওই সম্ভাবনাই প্রথম থেকে আমার মনে উদয় হয়েছিল, ডাক্তার সেন।

সত্যি বলছেন।

হ্যাঁ। আমি বরাবরই জানতাম, বিমলবাবু সুনিশ্চিতভাবে আমার কাছে লুকোচ্ছেন। আর সেই কারণেই গত পরশু সন্ধ্যার দিকে বিমলবাবুকে নিয়ে ছোট্ট একটা এক্সপেরিমেন্ট করেছিলাম আমি।

হ্যাঁ। বলে একটু থেমে যেন নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে পুনরায় বলতে লাগলেন মিস্টার রায়।

একুশ

আমি আর মিস্টার পাণ্ডে নিঃশব্দে কিরীটীর কথা শুনতে লাগলাম।

শুনুন মিস্টাব পাণ্ডে ও ডাক্তার সেন, কিরীটী বলতে লাগলেন, পরশু সন্ধ্যায় আমি 'লিলি কটেজে' গিয়ে বিমলবাবুর সঙ্গে নিভৃতে দেখা করে তাঁকে অনুরোধ করি, সেই দুর্ঘটনার রাত্রে ঠিক যেভাবে সূর্যপ্রসাদের ঘরের সামনে দুজনের দেখা হয়েছিল ও পরস্পরের মধ্যে কথাবার্তা হয়েছিল, সেটা যতটা সম্ভব তাঁদের মনে আছে—আবদুলকে সঙ্গে নিয়ে পুনরভিনয় করে আমাকে একটিবার দেখানোর জন্যে।

মারো গোলি—আচ্ছা, সাবাস রায়সাব! বোলিয়ে-বোলিয়ে, উসকা বাদ কেয়া হুয়া? পাণ্ডে বললেন।

আবদুলকে ডেকে নিয়ে তক্ষুনি আমরা উপরে গেলাম, কিরীটী বলতে লাগলেন, এবং ব্যাপারটা যেমন-যেমন ঘটেছিল, পুনরাবৃত্তি করবার সময় ওরা যা বলেছিল তা হচ্ছে এই ঃ

বিমল। আবদুল, জেঠামণি বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছেন।

আবদুল। ঘুমিয়ে পড়েছেন?

বিমল। হ্যাঁ, আজ বাত্রে যেন আর তাঁকে বিবক্ত করা না হয়।

আবদুল। আপনি এতক্ষণ সাহেবেব ঘরেই ছিলেন নাকি?

বিমল। হ্যাঁ, প্রায মিনিট পনেরো ছিলাম।

কিন্তু আসলে ঠিক তা তো নয়, কিবীটী বলতে লাগলেন, বিমলবাবুব মুভমেন্টস সম্পর্কে ভালো করে অনুসন্ধান নিতে গিযে অমলেন্দুবাবুব মুখেই শুনেছিলাম, এগারোটা বেজে পনেরো মিনিট অর্থাৎ সোয়া এগাবোটায় নাকি বিমলবাবু বাগান থেকে বাড়িতে গিয়ে প্রবেশ করেন।

ইয়ে আপ কেয়া কহেতে হ্যায়, রায়সাব! হঠাৎ বাধা দিয়ে বলে উঠলেন মিস্টাব পাণ্ডে।

ঠিকই বলছি, মিস্টার পাণ্ডে।

এবারে আমিই বললাম, সত্যিই সে-রাত্রে বিমলবাবু বাগানে গিয়েছিলেন নাকি?

হ্যাঁ। এবং যেসময় বাগান থেকে বাড়িতে ঢুকেছিলেন, সেই সময় অমলেন্দুবাবু চাকবদের থাকবার জন্যে নীচের তলায় যে সিঁড়ির মুখের কাছের ঘরটা—সেখানেই ওপর থেকে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে সরে দাঁড়িয়েছেন। ওই সময়েই দুজনের দেখা হয়। আর ঠিক সেই সময়, সিঁড়ির সামনেই নীচের তলায় যে-ওয়াল-ক্লকটা দেওযালে বসানো আছে সেটায় তখন ঠিক রাত এগারোটা বেজে পাঁচ মিনিট—অসতর্ক মুহূর্তে বিমলবাবুব মুখ দিয়ে পরশু সত্য কথাটা বের হয়ে গিয়েছে। অথচ তিনি সেসময় ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারেননি যে, আমার কাছে সেই মুহূর্তেই সব দিনের আলোর মতোই পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে, তাঁর সেই সময়ের কয়েকটা কথায়।

তব তো বিমলবাবুকো ফির সব পুছনা জরুরি হ্যায়! মিস্টার পাণ্ডে বললেন।

বেশ তো, চলুন না এখুনি সেখানে?

হাঁ-হাঁ, চলিয়ে চলিয়ে।

চলুন, ডাক্তার সেন।

চলুন।

বেলা তখন বোধকরি পৌনে এগারোটা হবে।

আমারই গাড়িতে চেপে আমরা 'লিলি কটেজে'র দিকে রওনা হলাম।

'লিলি কটেজে' যখন গিয়ে আমরা পৌঁছলাম, বিমলবাবু ওইসময় বাইরের ঘরেই ছিলেন।

একাকী একটা সোফায় বসে বিমলবাবু ওই দিনকার সংবাদপত্রটা পড়ছিলেন।

আমাদের পদশব্দে তাড়াতাড়ি সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন, কী ব্যাপার, এসময় আপনারা?

কিন্তু স্পষ্ট যেন মনে হল, বিমলবাবুর কণ্ঠে একটা আশঙ্কা ও সংশয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

হ্যাঁ, আপনার কাছে এসেছি আমরা, বিমলবাবু। কথাটা বললেন মিস্টার রায়ই।

আমার কাছে?

হ্যাঁ। মিস্টার পাণ্ডে আপনাকে কয়েকটি প্রশ্ন করতে চান।

প্রশ্ন?

হাঁ-হাঁ, বৈঠিয়ে—বৈঠিয়ে না, বিমলবাবু। বলতে-বলতে মিস্টার পাণ্ডে একটা সোফায় বসে পড়লেন আরাম করে।

আমরাও দুজনে দুটো সোফায় বসলাম।

বিমলবাবু! পাণ্ডে ডাকলেন।

বলুন?

দেখুন, আপনি আপনার যে-জবানবন্দি পুলিশকে দিয়েছেন তাতে বলেছেন যে, রাত ঠিক সোয়া এগারোটার সময় দুর্ঘটনার রাত্রে আপনি আপনার জেঠার সঙ্গে কথা বলে তাঁর ঘর থেকে যখন বেরুচ্ছিলেন, ঠিক সেই সময়ই নাকি আবদুলের সঙ্গে আপনার সেই ঘরের দরজার সামনে দেখা হয়।

হ্যাঁ, বলেছিলাম তো।

স্পষ্ট মনে হল, বিমলবাবুর মধ্যে যেন একটা বিচলিত ভাব।

লেকিন বাত এহি হ্যায়, রায়সাব আপকো ও বাত বিশ্বোয়াস নেহি করতে হ্যায়!

বিশ্বাস করছেন না? শঙ্কাকুল দৃষ্টি যেন বিমলবাবুর দুই চোখে।

না, উনি বলছেন—।

আমাকে বলতে দিন, মিস্টার পাণ্ডে, বাধা দিলেন মিস্টার রায় এবং বললেন বিমলবাবুর দিকে এবারে চেয়েই, আমার ধারণা বিমলবাবু, আপনি আদপেই আপনার জেঠামণির প্রাইভেট ঘরে সে-রাত্রে প্রবেশ করেননি।

প্রবেশ করিনি?

না।

তবে—তবে আমি কোথায় গিয়েছিলাম?

আপনি সে-রাত্রে ঢুকেছিলেন তাঁর শয়নঘরে। এবং আমার অনুমান যদি মিথ্যে না হয় তো শয়নঘর ও প্রাইভেট ঘরের মধ্যবর্তী দরজাটা সেসময় প্রাইভেট ঘরের দিক থেকে বন্ধই ছিল। এখন বলুন, আমার কথা সত্যি না মিথ্যে?

বিমলবাবু একেবারে চুপ।

কী, চুপ করে রইলেন যে—বলুন, জবাব দিন, বিমলবাবু?

সহসা মনে হল যেন কিরীটীর শেষের কথায় ঘরের মধ্যে একটা নিদারুণ নাটকীয় মুহূর্ত ঘনিয়ে উঠেছে অকস্মাৎ।

এবং সেটা ক্ষণেকের জন্যেই। কেননা পরমুহূর্তেই নাটকের গতি পরিবর্তিত হল। বিমলবাবু সহসা যেন একেবারে ভেঙে পড়লেন, বিষণ্ণ কণ্ঠে বলে উঠলেন, হ্যাঁ মিস্টার রায়, আপনার—আপনার কথাই ঠিক, আমি চোর—সত্যিই আমি চোর। আমিই সে-রাত্রে জেঠামণির শয়নঘরের ড্রয়ার থেকে পাঁচশত টাকা চুরি করেছি। বলতে-বলতে দু-হাতে মুখ ঢেকে ঘটনার আকস্মিকতায় এবং লজ্জা ও গ্লানিতে সোফাটার ওপরে পুনরায় বসে পড়লেন।

কয়েকটা স্তব্ধ মুহূর্ত।

তারপর পূর্ববৎ ভগ্নকণ্ঠে দু-হাতের মধ্যে মুখ ঢেকেই বিমলবাবু বলতে লাগলেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ—আমি চোর, আমি চুরি করেছি। দিনের-পর-দিন পাওনাদারদের তাগাদায়-তাগাদায় আমি একেবারে হাঁপিয়ে উঠেছিলাম। তাই—তাই শেষপর্যন্ত আমাকে চুরিই করতে হয়েছে।

ইতিমধ্যে কখন একসময় যে রাধিকাপ্রসাদবাবু ওই ঘরে এসে ঢুকেছেন, কেউই আমরা টের পাইনি। এবং টের পাইনি যে রাধিকাপ্রসাদবাবু তাঁর ছেলের শেষের কথাগুলো সব শুনেছেন।

হঠাৎ তাঁব কণ্ঠস্বরে সকলে আমরা চমকে যুগপৎ দরজার দিকে তাকালাম।

বিমল! বিমল!

কে, বাবা? হ্যাঁ-হ্যাঁ, আমিই সে-রাত্রে জেঠামণির ড্রয়ার থেকে টাকা চুরি করেছি, বাবা।

তুমি—তুমি চুরি করেছ?

হ্যাঁ-হ্যাঁ—বিশ্বাস কবতে পারছেন না, বাবা, যে আমি চুরি করেছি, না? কিন্তু আমি এখন মুক্ত, আমি নিশ্চিন্ত। আর মিথ্যার পর মিথ্যা দিয়ে সব কিছু আমাকে গোপন করতে হবে না।

রাধিকাপ্রসাদ যেন পাথরের মতোই অসহায় বিহ্বল দৃষ্টি নিয়ে পুত্রের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে বইলেন।

অমন কবে আমার দিকে চেয়ে আছেন কি বাবা, সত্যিই আমি চুরি করেছি। সে-রাত্রে ডিনারের পর একবারও আমার জেঠামণির সঙ্গে দেখা হয়নি—মিস্টার রায়ের ধারণা ঠিকই। আমি—আমি আপনাদের কাছে মিথ্যে বলেছি মিস্টার পান্ডে, ইচ্ছা করলে আমাকে এবারে জেলে দিতে পারেন।

বিমল?

না-বাবা-না—আমি চোর, আমি চোর—, বলতে-বলতে ঝড়ের মতোই যেন ছুটে বিমলবাবু ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন অকস্মাৎ।

ঘরের মধ্যে সবাই নির্বাক, বিহ্বল।

শুধু প্রৌঢ় রাধিকাপ্রসাদের দুই চোখেব কোল বেয়ে নিঃশব্দে অশ্রুর ধারা গড়িয়ে পড়ছে।

সহসা ঘবের স্তব্ধতা ভঙ্গ করে মিস্টাব পান্ডে বললেন, না, সব—সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে মিস্টার রায়, সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে—মারো গোলি!

মৃদুকণ্ঠে আবার মিস্টার রায় কথা বললেন, এখন বোধহয় বুঝতে পারছেন মিস্টার পান্ডে, সূর্যপ্রসাদ সোয়া এগারোটা পর্যন্ত জীবিত ছিলেন না—তার আগেই তিনি নিহত হয়েছেন।

তার আগেই?

হ্যাঁ। ডাক্তার সেন তাঁর ঘর থেকে বের হয়ে আসবার পরই অর্থাৎ রাত সাড়ে দশটা থেকে পৌনে এগারোটার মধ্যে কেউ তাঁকে হত্যা করেছে।

কী বলছেন, মিস্টার রায়? বললাম এবারে আমিই।

হ্যাঁ, ডাক্তাব সেন, ওই পনেরো মিনিট সময়েব মধ্যেই তিনি নিহত হয়েছেন।

তা হলে? বললেন মিস্টার পান্ডে।

তা হলে এবারে ভেবে দেখুন, মিস্টার পান্ডে—আর একবার আমাদের কমলবাবুর কথাটা ভেবে দেখুন। তিনি যে কেন সে-রাত্রে এ-বাড়িতে এসেছিলেন এবং কী করতে এসেছিলেন, কী তাঁর প্রয়োজন ছিল তার কোনও জবাবই এখনও পর্যন্ত তিনি দেননি।

এবারে আমিই বললাম মিস্টার রায়ের দিকে তাকিয়ে, আপনি তো সেদিন বলেছিলেন, আপনি জানেন মিস্টার রায়, কেন তিনি সে-রাত্রে এখানে এসেছিলেন?

ঘুরে আমার দিকে তাকালেন কিরীটী রায় এবং বললেন, হ্যাঁ, ডাক্তার সেন, আমি জানি কেন সে-রাত্রে কমলবাবু এই 'লিলি কটেজে' এসেছিলেন।

কেন?

কেন যে তিনি এসেছিলেন সে-কথা বলবার আগে একটা কথা সুনিশ্চিতভাবে আপনাদের বলতে পারি, মিস্টার পান্ডে—।

কী?

তিনি সূর্যপ্রসাদকে হত্যা করা তো দূরের কথা, তাঁর মাথার একটি কেশ পর্যন্ত স্পর্শ করেননি। এমনকী সূর্যপ্রসাদ যে-ঘরের মধ্যে নিহত হয়েছেন সে-ঘরের কুড়ি হাতের মধ্যেও যাননি।

কিন্তু—।

কোনও কিন্তু নেই এর মধ্যে, মিস্টাব পান্ডে। আমি কিরীটী রায় এ-কথা বলছি। বলেই সঙ্গে-সঙ্গে অদূরে তখনও বিহ্বলভাবে নিঃশব্দে দণ্ডায়মান রাধিকাপ্রসাদের দিকে তাকিয়ে তাঁকে সম্বোধন করে কঠিন ঋজুকণ্ঠে বললেন কিরীটী, রাধিকাবাবু, আপনার মেজো ছেলে সুবলবাবু কোথায়?

সুবল!

বিহ্বলের মতোই যেন কথাটা উচ্চারণ করলেন রাধিকাপ্রসাদ।

হ্যাঁ, হ্যাঁ—বলুন বিমলবাবু, সুবলবাবু ও কমলবাবু একই মায়ের সন্তান কি না? বলুন, আমার কাছে আর গোপন করে কোনও লাভ নেই কথাটা।

ইয়ে আপ কেয়া বোলতে হ্যায়, রায়সাব। বললেন পান্ডে।

ঠিকই বলছি, মিস্টার পান্ডে। সেদিন কমলবাবুর মুখের দিকে যদি একটু নজর দিয়ে তাকাতেন তা হলে আপনারও ভুল হত না। তিনটি ভাইয়ের মুখ চোখ নাক কপাল একেবারে এক ছাঁচে ঢালা। কোথায়ও এতটুকু পার্থক্য বা এতটুকু গরমিলও নেই। আর সেই কারণেই সেদিন মুনি আউটপোস্টে কমলবাবুকে প্রথম দেখেই আমি চমকে উঠেছিলাম। এমনকী ওঁদেব তিন ভাইয়ের গলার স্বরে মধ্যে অদ্ভুত একটা মিল আছে।

আপনার—হ্যাঁ, আপনার কথাই ঠিক, মিস্টার রায়, বিমল সুবল ও কমল ওরা আমাব ছেলে, একই মায়ের গর্ভে ওদের জন্ম। কিন্তু বিশ্বাস করুন আপনি আমার কথা—কমল সত্যিই নির্দোষ। সে এ-কাজ করেনি। এ-কাজ সে করতে পারে না।

আমি বিশ্বাস করি রাধিকাবাবু যে, অন্তত কমলবাবু সূর্যপ্রসাদকে হত্যা করেননি। কিন্তু তা হলেও যতক্ষণ না পর্যন্ত আমরা জানতে পারছি যে, কী প্রয়োজনে এবং কার সঙ্গে দেখা করতে সে-রাত্রে কমলবাবু এখানে এসেছিলেন, ততক্ষণ তাঁর নির্দোষিতা তো প্রমাণ হবে না। ভুলে যাবেন না, এটা আইনের ব্যাপার। আর হত্যার ব্যাপারে তিনি পুলিশের সন্দেহের তালিকাভুক্ত।

বাইশ

বলব, বলব—সবই আপনাকে আমি বলব, মিস্টার রায়, বলে উঠলেন রাধিকাপ্রসাদ।

হ্যাঁ, বলুন।—কোনও কথাই গোপন করবেন না, কারণ তাতে জটিলতারই সৃষ্টি হবে মাত্র।

না, না—গোপন করব না।

কমল এসেছিল সে-রাত্রে আপনারই সঙ্গে দেখা করতে, তাই না? বললেন মিস্টার রায়।

হ্যাঁ, কিন্তু আপনি—।

কেমন করে জানলাম সে-কথা, তাই না? আমি জেনেছি—কিন্তু কী করে জানেন, চলার সময় আপনি ওই যে লাঠিটি আপনার হাতে ব্যবহার করেন—বলে কিরীটী ইঙ্গিতে রাধিকাবাবুর হাতের লাঠিটি নির্দেশ করলেন।

আমরা সকলেই নির্বাক।

কিরীটী বলতে লাগলেন, বাগানের মালির ঘরের পাশে অব্যবহৃত ঘরটির মধ্যেই বোধহয় আপনি গোপনে আপনার পুত্রের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন সে-রাত্রে।

হ্যাঁ, আমি আর সুবল গিয়েছিলাম।

সেটা বুঝতে পেরেছি। কারণ সেই ঘরের মেঝের ধুলোয় আপনার ওই লাঠির গোল দাগ পড়েছিল—যা এখনও সেখানে রয়েছে, কিন্তু বলুন এবারে, কেন দেখা করতে গিয়েছিলেন সে-রাত্রে ওই ঘরে কমলবাবুর সঙ্গে?

অতঃপর রাধিকাপ্রসাদ তাঁর বক্তব্য বলতে শুরু করলেন।

কমলের যখন মাত্র বারো কি তেরো বছর বয়েস, তখনই সে এমন দুর্দান্ত ও চঞ্চল প্রকৃতির হয়ে উঠেছিল যে তাকে কোনওরকমেই বাগ মানানোই যেত না। লেখাপড়ার দিকে এতটুকু মন ছিল না। দিনরাত বাইরে-বাইরেই কেবল হইহই করে বেড়াত। ওই সময় খুলনার একদল বিদেশি সার্কাস পার্টি এসে মাঠে খেলা দেখাবার তাঁবু ফেলল।

বলুন!

কমল ওই বয়েসেই নানাপ্রকার খেলায়, বিশেষ করে বার, ট্রাপিজ ও রিংয়ের কসরতে দক্ষ হয়ে উঠেছিল। যা হোক, ওই সার্কাস পার্টির সঙ্গেই একরাত্রে কমল আমাকে কিছু না জানিয়ে পালিয়ে যায় চাকরি নিয়ে। এবং ওই সার্কাসের দলে থাকতেই কুসংসর্গে ক্রমশ কমল অধঃপাতের পথে নেমে যায়। নানাপ্রকার নেশা ভাঙ—এমনকী কোকেনেও অভ্যস্ত হয়ে পড়ে।

আমি তা জানি। বলুন, তারপব? কিবীটী বললেন।

অবশেষে একদিন সার্কাস পার্টির ম্যানেজারের ক্যাশ ভেঙে হাজার দুই টাকা নিয়ে গা-ঢাকা দেয়।

তারপর?

ম্যানেজার এদিকে সব জানতে পেবে কমলের নামে পুলিশে ডায়েরি করে। পুলিশ কমলের নামে ওয়ারেন্ট বের করে সর্বত্র তার অনুসন্ধানে ফিরতে লাগল। সেই থেকেই দীর্ঘ পাঁচ বছর কমল পুলিশের ভয়ে আত্মগোপন করে বেড়াচ্ছে। দাদা যে-রাত্রে নিহত হন, তারই দিন দশেক আগে কলকাতা থেকে কমলের একটা চিঠি পাই আমি। সেই চিঠিতেই সব কথা সর্বপ্রথম ও আমাকে জানায় এবং ইদানীং অত্যন্ত অর্থকষ্টে পড়েছে বলে আমার কাছে কিছু অর্থসাহায্য চেয়ে পাঠায়। কিন্তু আমার কাছে টাকা কোথায়? অগত্যা তাই দাদার কাছেই আমি কিছু টাকা চাই।

তিনি দিয়েছিলেন টাকা?

না। বরং সব কথা শুনে বলেছিলেন, আমার নাকি কর্তব্য তাকে পুলিশের হাতেই ধরিয়ে দেওয়া। কিন্তু বাপ হয়ে তা পারিনি, মিস্টার রায়। তাই নিজের সোনার ঘড়ি ও চেন বিক্রি করে কিছু টাকা সংগ্রহ করি তাকে দেওয়ার জন্যে। পাছে দাদা জানতে পারেন সেই ভয়ে গোপনে টাকাটা দাদার মিউজিয়াম ঘরে যে চন্দনকাঠের বাক্সটার মধ্যে সেই ছোরাটা ছিল তারই মধ্যে রেখে দিই এবং কমলকে নির্দিষ্ট দিনে ও নির্দিষ্ট সময়ে এসে টাকা নিয়ে যাওয়ার জন্যে চিঠি দিই। ও দেখা করতে আসে, এবং আমি ও সুবল গিয়ে ওর সঙ্গে বাগানের সেই ঘরে দেখা করে টাকাটা তাকে দিয়ে দিই।

রাত ক'টার সময় সে-রাত্রে আপনাদের দেখা হয়েছিল?

রাত আটটায়।

ও। ঘরে ফিবেছিলেন কখন?

রাত সাড়ে আটটা নাগাদ হবে।

কোন পথে ফিরেছিলেন?

পাছে কেউ জানতে পারে বলে গোপনে আমি আর সুবল—তারই পরামর্শমতো ওই

মিউজিয়াম ঘরের জানলাপথেই বাগানে গিয়েছিলাম ও ফিরেও এসেছিলাম।

আপনাদের মধ্যে কে আগে ফিরেছিলেন?

সুবল।

হুঁ। তা হলে সে-রাত্রে আপনিই চন্দনকাঠের বাক্সের ডালাটা খুলে রেখেছিলেন, রাধিকাবাবু?

বোধহয় তাড়াতাড়িতে ভুলে খুলেই রেখে গিয়েছিলাম।

আচ্ছা একটা কথা, রাধিকাবাবু—।

বলুন?

যখন টাকাটা বের করে নিয়ে যান বাক্স থেকে, আপনার মনে আছে কি, ছোরাটা তার মধ্যে ছিল কি না?

হ্যাঁ, মনে আছে বইকী—ছিল...

আচ্ছা, ফিবে আসবার পর লক্ষ করেছিলেন কি বাক্সটা?

হ্যাঁ, লক্ষ কবেছিলাম। কিন্তু কেন বলুন তো? ডালাটা খোলা আছে দেখে বন্ধ করতে গিয়েছিলাম!

ও। তখন তার মধ্যে ছোরাটা দেখেছিলেন?

না।

দেখেননি?

না।

ঠিক মনে আছে আপনার?

আছে। কিন্তু আমার ছেলে কমল আর বিমল এদের কী হবে, মিস্টার রায়?

সে-কথার জবাব আপনাকে উনি, মিস্টার পান্ডে, একমাত্র দিতে পারেন, রাধিকাবাবু। কিন্তু বেলা অনেক হল, মিস্টার পান্ডে। এবারে চলুন, ফেরা যাক।

বলতে-বলতে কিরীটী একেবারে উঠে দাঁড়ালেন।

থানায় মিস্টার পান্ডেকে ও 'সানি ভিলা'য় কিরীটী রায়কে নামিয়ে দিয়ে যখন বাড়িতে ফিরে এলাম তখন বেলা প্রায় দেড়টা।

নানা এলোমেলো চিন্তা মাথার মধ্যে ধোঁয়ার মতোই পাক খেয়ে-খেয়ে ফিরছিল। মনটা সত্যিই গত কিছুদিন ধরে বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে।

কোনও কিছুতেই যেন মন বসাতে পারছি না।

সব কেমন যেন ফাঁকা-ফাঁকা মনে হয়। যে অন্ধ দুরাশা এতদিন দিবারাত্র আমাকে সামনের দিকে ঠেলে নিয়ে চলেছিল, সেটা যেন আর অনুভব করি না।

মনে হয়, সব পুরুষকার মিথ্যা। নিষ্ঠুর নিয়তিই সব।

আরও মনে হয়, এই তো মানুষের জীবন। এই তো বিশ্বাসের ভিত্তিটা—যেটা আজ এত শক্ত ও দৃঢ় মনে হচ্ছে, কাল সেটা মনে হয় বুঝি যেমনি পলকা তেমনি অর্থহীন।

জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কেবলই যেন একটা মিথ্যে মরীচিকার পিছনে ছুটে-ছুটে হয়রান হওয়া। জীবনে আকাঙ্ক্ষারও যেমন অন্ত নেই, তেমনি সত্যিকারের তৃপ্তিও বুঝি কোথায়ও নেই।

বাইরের ঘরে ঢুকতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালাম।

মিতা একাকী নিঃশব্দে বসে বাইরের ঘরে একটা সোফার ওপরে। আর চোখের কোণে তার দুটি প্রবহমান অশ্রুধারা।

মিতা।

আমার ডাকে মিতা নিঃশব্দে সেই অশ্রুভেজা দৃষ্টি তুলে আমার দিকে তাকাল।

এগিয়ে গেলাম ওর কাছে।

মৃদুকণ্ঠে শুধালাম, কী হয়েছে রে, মিতা?

হাতের পাতায় ভেজা চোখ মুছে নিয়ে মিতা তাড়াতাড়ি বলল, কিছু না তো!

না, তুই আমার কাছে লুকোচ্ছিস, বল কী হয়েছে?

কী আবার হবে!

মিতার পাশে সোফার ওপরে গিয়ে বসলাম।

কিছুই যদি হয়নি তো চোখে জল কেন তোর?

চোখে কী যেন একটা পড়েছিল।

বুঝতে পারি মিতা মিথ্যা বলছে, কিন্তু মিতা তো কোনওদিনই এমনটি ছিল না।

হাসি, আনন্দ ও সরলতায় চিরদিন মনটি ওর দেখে এসেছি শিশুর মতো। কিন্তু হঠাৎ যেন কিছুদিন থেকেই মনে হয়, সেই হাসি ও আনন্দের মধ্যে কোথায় অদৃশ্য একটি চিড় ধরেছে।

মিতা যেন ঠিক সেই মিতা আর নেই।

এ যেন চিরদিনের সেই চেনা মিতা আর নেই।

নারী-মন নিয়ে কখনও কোনও কারবার করিনি। তাদের সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনার কোমল অথচ তীব্র অনুভূতিগুলোর সঙ্গে কখনও পরিচয় ঘটেনি। ঘটবার অবকাশও হয়নি।

তাই মনে হয়, বোন হলেও এবং চিরটাকাল পাশাপাশি থাকলেও হয়তো তার সত্য পরিচয়টা কোনওদিনই পাইনি।

তাই হয়তো আজ মনে হচ্ছে, মিতা অনেক—অনেক দূরের।

সহসা মিতার ডাকে যেন চমকে উঠি।

দাদা!

কী রে?

কী হয়েছে তোমার সত্যি করে বলো তো।

অবাক হয়ে মিতার মুখের দিকে তাকালাম, কেন?

কেন? নিজের চেহারাটা একবার আয়নায় দেখো তো! ভালো করে খাও না, রাত্রে ঘুমোও না—ভালো করে একটা কথা পর্যন্ত বলো না!

মৃদু হাসি প্রত্যুত্তরে।

হাসছ? কিন্তু সত্যিই দাদা, তুমি যেন আর সেই তুমি নেই!

ও তোর ভুল ধারণা।

হতে পারে হয়তো। কিন্তু কী যে তুমি সর্বক্ষণ চিন্তা করো বুঝি না—সত্যি, কীসেরই বা তোমার এত চিন্তা! দিবারাত্র আজকাল দেখি বাইরে-বাইরে থাক।

কাজের চাপ পড়েছে—।

কাজ? কী এত কাজ? এদিকে তো শুনি আজকাল রোগীদেরও তেমন ভালো করে মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করো না।

হঠাৎ মুখ দিয়ে বের হয়ে গেল, ভালো লাগে না।

ভালো লাগে না?

না, না—ঠিক তা নয়। মানে ওই আর কী—, কী বলব ঠিক বুঝতে না পেরে থেমে যাই।

মিতা যা বলছে তা তো মিথ্যা নয়।

কিন্তু কেন—কেন?

আজ এত দেরি হল, কোথায় গিয়েছিলে?

লিলি কটেজে।

লিলি কটেজে। হঠাৎ আবার সেখানে কেন?

না, ওই কিরীটীবাবু আর মিস্টার পান্ডে টেনে নিয়ে গেলেন।

একটা কথার জবাব দেবে, দাদা?

কী?

সূর্যপ্রসাদের হত্যার ব্যাপার নিয়ে তোমারই বা এত মাথা ঘামানো কেন?

এ তুই কী বলছিস, মিতা? ভদ্রলোক আমাদের পরিচিত ছিলেন!

কিন্তু বড়লোক বলে বরাবর তো তাঁকে দেখেছি ঘৃণাই করে এসেছ।

হ্যাঁ, তা ঠিক। তবে—।

না, সত্যি নিজের ওপরই যেন নিজের রাগ হয়। কী যে হয়েছে? ভালো করে একটা কথা পর্যন্ত যেন গুছিয়ে বলতে পারি না।

তবে মিতাও মিথ্যা বলেনি। সত্যিই তো, সূর্যপ্রসাদেব মৃত্যুর ব্যাপার নিয়ে আমার এত মাথা ঘামানোই বা কেন?

সূর্যপ্রসাদ মরলেন কি বাঁচলেন, তাতে করে আমার কী-ই বা এসে গেল?

চিন্তাটাকে ঠেলে দিয়ে উঠে পড়লাম।

না, কী এসব চিন্তা করছি? পাগল হয়ে যাব নাকি?

কিন্তু মিতা কাঁদছিল।

কথাটা কিছুতেই যেন ভুলতে পারি না।

দ্বিপ্রহরে আহারদির পর শয্যায় চোখ বুজে শুয়ে-শুয়ে মিতার কথা ভাবতে-ভাবতে একসময় কখন যে সমরের কথা ভাবতে শুরু করেছি খেয়ালই নেই।

তবে কি সমরের কথা ভেবেই চোখ দিয়ে মিতার জল পড়ছিল?

বেচারি মিতা! সমরকে যে বাঁচানো যাবে না, এই সত্যি কথাটা ওকে কেমন করে বলি?

থাক গিয়ে, বলে কী হবে?

নিষ্ঠুর সত্যকে তো একদিন ও জানতে পারবেই।

হঠাৎ টেলিফোনটা বেজে উঠল—ক্রিং-ক্রিং—।

তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে ফোনটা ধরলাম, হ্যালো! কে, মিস্টার রায়, কী খবর? থানা থেকে বলছেন?

আজ আবার রাত্রে সকলের সঙ্গে 'লিলি কটেজে' মিলিত হয়ে আলোচনা করতে চান? বেশ তো। আপনিই মিস্টার পান্ডের সাহায্যে সব ব্যবস্থা করেছেন? নিশ্চয়ই-নিশ্চয়ই যাব। হ্যাঁ, হ্যাঁ।

রেখে দিলাম ফোনটা।

তেইশ

আবার ওইদিন রাত্রে কিরীটীর ইচ্ছামতো 'লিলি কটেজে' সকলে আমরা একত্রিত হয়েছি।

আমি, রাধিকাপ্রসাদবাবু, তাঁর দুই ছেলে বিমলবাবু ও সুবলবাবু, বলদেব সিংহ, মেজর কৃষ্ণস্বামী অমলেন্দুবাবুর ঘরের মধ্যে বসেছি। বাইরে দাঁড়িয়ে আবদুল।

একমাত্র কিরীটীই এখনও এসে পৌঁছননি 'লিলি কটেজে'।

সকলেই চুপচাপ বসে, কারও মুখেই কোনও কথা নেই।

কিন্তু কেউই যে একটা স্বস্তিবোধ করছি না, পরস্পর-পরস্পরের মুখের দিকে তাকালেই বোঝা যায়।

সকলেই যেন কী চিন্তা করছেন?

আজও শীতটা বেশ জাঁকিয়ে এসেছে। ঘরের কোণে ফায়ার-প্লেস জ্বলছে।

অদ্ভুত একটা স্তব্ধতা ঘরের মধ্যে যেন।

সহসা মৃদু একটা পদশব্দে সাতজোড়া ব্যগ্র চোখের দৃষ্টি যেন দরজার ওপর গিয়ে পড়ল একই সময়ে।

দরজাব পরদা সরিয়ে ঘরে প্রবেশ করলেন কিরীটী রায়।

Good evening!

কিরীটী এগিয়ে এসে তাঁর জন্যে বক্ষিত শূন্য চেয়ারটি অধিকার করে বসলেন।

কেউ কোনও কথা বলেন না।

সবাই যেন আমবা বোবা।

একসময় স্তব্ধতা ভঙ্গ কবে কিরীটীই সর্বপ্রথম কথা বললেন, আজ ইচ্ছা করেই আমাদের এই ঘরোয়া আলোচনার মধ্যে মিস্টার পান্ডেকে ডাকিনি, কারণ—।

কিরীটী বলতে-বলতে থামলেন।

সাতজোড়া চোখের দৃষ্টি শুধু নিঃশব্দে কিরীটীর প্রতি স্থির হয়ে আছে একটিমাত্র জিজ্ঞাসায় যেন, বলো, বলো, থামলে কেন?

মিস্টার রায় আবার বলতে শুরু করেন, আজ যাঁরা এখানে উপস্থিত, তাঁরা প্রত্যেকেই সূর্যপ্রসাদের হত্যার রাত্রেও এইখানে উপস্থিত ছিলেন। আপনাবা নিশ্চযই বুঝতে পারছেন, সেই কাবণেই সূর্যপ্রসাদের হত্যার ব্যাপাবে আপনারা যাঁরা এই মুহূর্তে এই ঘরে আছেন, প্রত্যেকেই সন্দেহের তালিকায় পড়েন।

সকলে নিস্তব্ধ।

কিরীটী আবার বলতে থাকেন, অতএব আপনাদের মধ্যেই যে একজন কেউ সে-রাত্রে সূর্যপ্রসাদকে হত্যা করেছেন সে-বিষয়ে আমি স্থিরনিশ্চিত।

ঘরের মধ্যে যেন একটা শ্বাসরোধকারী বরফের মতোই ঠান্ডা স্তব্ধতা।

আবার কিরীটী বলতে লাগলেন, আজ আপনাদের এখানে এইভাবে ডেকে আনবার কারণই হচ্ছে, আপনাদের মধ্যে থেকে হত্যাকারীকে আপনাদের স্বীকৃতির দ্বারাই আমি সর্বসমক্ষে চিহ্নিত করে দিতে—।

সকলেই চুপ করে রইলেন, কিন্তু আমি পারলাম না চুপ করে থাকতে, মৃদু কণ্ঠে বললাম, তা হলে মিস্টার রায়, আপনার স্থির ধাবণা যে, আজ আমরা যারা এখানে এই মুহূর্তে উপস্থিত আছি, তাদের মধ্যে একজন সূর্যপ্রসাদের হত্যাকাবী?

হ্যাঁ ডাক্তার সেন, আপনাদের মধ্যেই একজন।

চকিতের জন্যে বোধহয় নিজ-নিজ অজ্ঞাতসারেই পরস্পর-পরস্পরের দিকে সকলেই আমরা নিঃশব্দে একবার তাকালাম। এবং মুখে আমরা কেউ প্রকাশ না করলেও, একটি প্রশ্নই যে আমাদের সকলের মনে ওই মুহূর্তে জেগেছিল, সে-ও বোধহয় ঠিক।

কে? কে? কে?

কী যেন আমি বলতে উদ্যত হলাম, কিন্তু বাধা দিলেন আমাকে মিস্টার রায়। বললেন, কিরীটী রায়ের কথায় এখনও আপনি সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করতে পারছেন না, ডাক্তার সেন, তাই না?

না, মানে বলছিলাম—।

বলুন, থামলেন কেন, ডাক্তার সেন?

আপনার কথাই যদি মেনে নিতে হয়, তা হলে বলব, একজন ওই একই সন্দেহের তালিকাভুক্ত—কিন্তু এখনও অনুপস্থিত এখানে—

কে ডাক্তার সেন? আপনি কার কথা বলছেন?

সমর।

সমরবাবু এসময়ে এখানে অনুপস্থিত থাকলেও, আমি জানি তিনি কোথায়—।

আপনি জানেন?

হ্যাঁ ডাক্তার সেন, আমি জানি।

কোথায় সে?

ওই যে, চেয়ে দেখুন দরজার সামনেই তো সমরবাবু দাঁড়িয়ে আছেন।

সঙ্গে-সঙ্গে সকলে আমরা দরজার দিকে তাকাতেই যেন স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। সত্যিই দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে সমর।

আসুন সমরবাবু, ওই সোফাটায় এসে বসুন।

কিরীটীর আহ্বানে সমর এসে নির্দিষ্ট শূন্য সোফাটি নিঃশব্দে অধিকার করে বসল।

এবারে তো সকলেই এখানে উপস্থিত, ডাক্তার সেন?

আমি কোনও সাড়া দিলাম না।

সমরের দিকে যে তাকাব তাও যেন পারছি না।

স্তব্ধতা ভঙ্গ করে কিরীটীই আবার বলতে শুরু করলেন, তা হলে সকলেই আজ যখন আপনারা এখানে উপস্থিত এবং আপনাদের মধ্যেই যখন একজন সূর্যপ্রসাদের হত্যাকারী রূপে চিহ্নিত, অথচ সেই দুঃসাহসিক স্বীকৃতি স্বেচ্ছায় যখন হত্যাকারীর কাছ থেকে পাবার আশা নেই, আমি নিজের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েই সমগ্র দুর্ঘটনাটা আপনাদের সকলের সামনে আলোচনা করছি। শুনুন, বিমলবাবুর বিশেষ অনুরোধে সূর্যপ্রসাদবাবুর রহস্যজনক হত্যার মীমাংসার ভার নিয়ে এ-বাড়িতে আসবার পর এবং আপনারা যাঁরা সেই দুর্ঘটনার রাত্রে এখানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের প্রত্যেকের জবানবন্দি বা বক্তব্য থেকে যতটুকু আমি বুঝতে পেরেছি ও সেইসঙ্গে এখানকার কয়েকটি ব্যাপার যা আমার দৃষ্টিকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছে, সেগুলোই একে-একে আপনাদের সকলের সামনে আমি বলছি, আপনারা সকলেই মন দিয়ে শুনুন।

ওই পর্যন্ত বলে কিরীটী মুহূর্তের জন্য থামলেন।

সকলেই আমরা নির্বাক।

কিরীটী বলতে লাগলেন, এক নম্বর হচ্ছে—এ-বাড়ির পশ্চাতের বাগানে মালির ঘরের পাশে যে-ঘরটি সাধারণত দীর্ঘকাল অব্যবহার্য পড়ে আছে, সেটা প্রথম যেদিন বাগানে যাই সেইদিনই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দু-নম্বর—ওই ঘরটা পরীক্ষা করতে গিয়ে প্রথমত আমি দেখতে পাই, ঘরের মেঝেতে ধুলোয় কতকগুলো জুতার ছাপ ও গোল-গোল ছোট-ছোট কয়েকটা চিহ্ন এবং কুড়িয়ে পাই একটি নস্যির কালো কৌটো বা ডিবে, যে-সম্পর্কে ইতিপূর্বেই আপনাদের আমি বলেছি বা আপনারা জানতে পেরেছেন। বলা বাহুল্য, ওই দুটি ব্যাপার থেকে আমি সিদ্ধান্ত করি, মাত্র কয়েক দিন আগে নিশ্চয়ই ওই ঘরের মধ্যে কেউ গিয়েছিল। এবং আপনাদের মধ্যে সেই ঘরে কে যেতে পারে, আপনাদের সকলের গতিবিধি সম্পর্কে আলোচনার দ্বারা আমার বদ্ধমূল ধারণা হয়—বিমলবাবু ও সুবলবাবুরই কেবলমাত্র ওই ঘরে যাবার সম্ভাবনা ছিল। পরে অবিশ্যি জানতে পেরেছি, সুবলবাবু ও রাধিকাবাবুই দুর্ঘটনার দিন রাত্রে কমলবাবুর সঙ্গে দেখা করতে ওই ঘরে গিয়েছিলেন। আরও জেনেছি, ওই রাত্রেই সাড়ে এগারোটা নাগাদ মেজর স্বামী কাউকে বাগানপথে ওইদিকে যেতে

দেখেছিলেন। কথা হচ্ছে এখন, তা হলে কে অত রাত্রে ওইদিকে যেতে পারেন? পরে অবিশ্যি আমি অমলেন্দুবাবুর সঙ্গে গোপনে কথা বলে জানতে পেরেছি, সে-রাত্রে ওই সময় ওই ঘরে বিমলবাবুকেই নাকি যেতে দেখেছিলেন।

বিমলবাবু? বললেন মেজর স্বামী।

হ্যাঁ মেজর, বিমলবাবুই।

কিন্তু অত রাত্রে?

হ্যাঁ, উনি গিয়েছিলেন সমরবাবুর সঙ্গে দেখা করতে ওই ঘরে। তাই না, সমরবাবু?

কিরীটীর প্রশ্নোত্তরে মৃদুভাবে মাথা হেলিয়ে সমর্থন জানালেন সমর।

বিমলবাবু, সত্যি নিশ্চয়ই কথাটি?

হ্যাঁ, মিস্টার রায়, গিয়েছিলাম সমরের সঙ্গে দেখা করতে। বিমলবাবুও বললেন।

তা হলেই বোঝা যাচ্ছে ওই ব্যাপার থেকে যে, সমরবাবু ও বিমলবাবুর মধ্যে দুজনের কেউ সূর্যপ্রসাদের হত্যাকারী নয়। বললেন কিরীটী।

কিন্তু তাই যদি হয় তো সে-রাত্রে রাত সাড়ে এগারোটা নাগাদ সূর্যপ্রসাদ কার সঙ্গে তাঁর প্রাইভেট ঘরে বসে কথা বলছিলেন? প্রশ্ন করলেন এবারে মেজর স্বামীই।

আপনার সেই প্রশ্নের জবাবেই এবারে তিন নম্বর পয়েন্টে আমি আসছি। কিরীটী বলতে লাগলেন, এই তিন নম্বর পয়েন্টটি এই রহস্যপূর্ণ হত্যার ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

কীরকম? প্রশ্ন করলেন আবার মেজর কৃষ্ণস্বামীই।

একটা কথা হয়তো আপনাদের কারও মনেই উদয় হয়নি মেজর, সূর্যপ্রসাদের রহস্যজনক ভাবে নিহত হওয়ার মাত্র কয়েকদিন আগে একজন ভদ্রলোক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। তাই না, অমলেন্দুবাবু?

হ্যাঁ, একটা ডিকটাফোনের ব্যাপারে।

Exactly! কিন্তু আপনি জানেন যে শেষ পর্যন্ত সূর্যপ্রসাদ ডিকটাফোনটি কেনেননি। আসলে তা নয়, আপনার সংবাদটা ভুল। আমি নিজে হাজরা ট্রেডিং কোম্পানিতে খোঁজ নিয়ে জেনেছি, সূর্যপ্রসাদ ওই দুর্ঘটনার মাত্র দিন দুই পূর্বেই একটি ডিকটাফোন মেশিন ক্রয় করেছিলেন ক্রেডিট ভাউচারে ও তার দাম দেওয়ার জন্যেই তিনি আপনাকে দিয়ে মৃত্যুর দিন ব্যাঙ্ক থেকে টাকাটা তুলেছিলেন, কারণ পরের দিন সকালেই তাঁর টাকাটা দোকানে পাঠিয়ে দেওয়ার কথা ছিল।

আশ্চর্য! এটা কিছুতেই আমি এখনও পর্যন্ত বুঝতে পারছি না, মিস্টার রায়, সূর্যপ্রসাদ হঠাৎ একটি ডিকটাফোন কিনতেই বা যাবেন কেন? বললেন এবারে মেজর স্বামীই।

সেটা অবিশ্যি এখন আর জানবার উপায় নেই, তবে তিনি যে ডিকটাফোন কিনেছিলেন একটা, সেটা ক্রেডিট ভাউচারে তাঁর সই-ই প্রমাণ দেবে এখনও। কিরীটী বলতে লাগলেন, সে যা হোক, ওই ডিকটাফোনেই সূর্যপ্রসাদের গলার আওয়াজের পুনরাবৃত্তি শুনে মেজর স্বামীর সে-রাত্রে মনে হয়েছিল, বুঝি তিনি ওই সময় কারও সঙ্গে কথা বলছিলেন!

কী বলছেন আপনি, মিস্টার রায়? তবে কি—।

হ্যাঁ মেজর, যদিও সেটা আপনি সূর্যপ্রসাদেরই কণ্ঠস্বর শুনেছিলেন, তথাপি সেটা জীবিত সূর্যপ্রসাদের নয়, তাঁর recorded voice-এরই পুনরাবৃত্তি মাত্র। এবং সেসময় তিনি জীবিত ছিলেন না।

কী ভয়ানক কথা। যেন স্বগতোক্তি করলেন মেজর কৃষ্ণস্বামী।

যাক সে-কথা, এবারে আমি আমার চার নম্বর পয়েন্টে আসব। সেটা হচ্ছে, সমরবাবুর ব্যাপার। সমরবাবু আদৌ নিরুদ্দেশ হননি বা আত্মগোপন করেননি স্বেচ্ছায়। তিনি কিছুদিনের জন্যে তাঁর জীবনের অন্যতম শুভাকাঙ্ক্ষী ডাক্তার সেনেরই পরামর্শে গা-ঢাকা দিয়েছিলেন মাত্র, পাছে পুলিশ

তাঁকে নিয়ে টানা হ্যাঁচড়া করে বলে। হাজারিবাগে ডাক্তার চৌধুরীর যে-পলিক্লিনিক আছে, সেখানেই ডাক্তার সেনের পেশেন্ট হিসাবে ভরতি হয়েছিলেন সমরবাবু।

How interesting! বললেন মেজর।

Interesting-ই বটে। মৃদু কণ্ঠে মিস্টার রায় বললেন।

But how could you guess it? পুনরায় মেজর প্রশ্ন করলেন।

সেই কথাতেই আসছি এবারে, মেজর। কিরীটী বলতে লাগলেন, ডাক্তার সেনের সেই রাত্রের ও পরের দিন প্রত্যুষের গতিবিধিই আমার মনে সন্দেহের উদ্রেক করে সর্বপ্রথম। কারণ, স্পষ্টই তাঁর কথাবার্তা শুনে সেদিন বুঝতে পেরেছিলাম, তিনি সমরবাবু সম্পর্কে অনেক কিছুই জানেন যা আমার কাছে গোপন করছেন। তাই গোপনে-গোপনে আমি অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই ডাক্তার সেনের সর্বপ্রকার গতিবিধি সম্পর্কে এবং তাতে করেই জানতে পারি, ডাক্তার সেনের হাজারিবাগে ডাক্তার চৌধুরীর পলিক্লিনিকে রীতিমতো যাতায়াত তো আছেই, তিনি ওই ক্লিনিকের অন্যতম পেট্রনও বটে। যা হোক, অনুসন্ধানে সেইখানেই একটি নতুন রোগীর সন্ধান পাই যাকে a case of early T.B. বলে diagnosis করে, ঠিক যে-রাত্রে সূর্যপ্রসাদ রহস্যজনকভাবে নিহত হন তারই পরের দিন প্রত্যুষে ভরতি করে নেওয়া হয়, ডাক্তার সেনেরই সুপারিশে। নাম বীরেন্দ্র ভদ্র। ব্যাপারটা বুঝতে এখন আর বোধহয় আপনাদের কারোরই কষ্ট হচ্ছে না, এই বীরেন্দ্রই আমাদের ডাক্তার সেনের পরামর্শানুযায়ী, ছদ্মনামধারী আত্মগোপনকারী সূর্যপ্রসাদবাবুর একমাত্র ছেলে সমরেন্দ্রবাবু।

সত্যি, আশ্চর্য লোক মশাই মিস্টার রায় আপনি। মৃদু হেসে আমি বলি, এত কাণ্ড করেছেন? আশ্চর্য, আশ্চর্য।

আশ্চর্য, তাই না? কিন্তু যাক, এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, ডাক্তার সেন, কিরীটীর কাছে অজ্ঞাত কিছুই ছিল না সেদিন? কথাগুলো বলে পুনরায় ঘরের মধ্যে উপস্থিত সকলের প্রতি একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে মিস্টার রায় বললেন, যাক সে-কথা, সব কথাই আপনাদের বললাম এবং কাল প্রত্যুষেই মিঃ পাণ্ডেকেও সব কথাই আমি বলব। কিন্তু তার পূর্বে আপনারা এখানে যাঁরা উপস্থিত আছেন, তাঁদের সকলকেই শেষবারের মতো আবার বলছি, সূর্যপ্রসাদের হত্যাকারীকে আমি চিনেছি, খুনি কে আমি জানি। অতএব তিনি যতই চেষ্টা করুন, আইন তাঁকে নিষ্কৃতি দেবে না।

কিরীটীবাবু থামলেন।

ঘরের মধ্যে একটা হিম-কঠিন স্তব্ধতা।

কারও মুখে টুঁ শব্দটি পর্যন্ত নেই।

এমন সময় বাইরে একটা জুতোর শব্দ শোনা গেল।

সকলেই আমরা দরজার দিকে তাকালাম। কিরীটী বললেন, লোকটিকে ভেতরে আসতে দাও, আবদুল।

পরক্ষণেই সাধারণ ধুতি ও চাদর গায়ে একটি লোক ঘরে এসে ঢুকল।

কী খবর, রমেশ?

এই চিঠিটা—।

কিরীটী নিঃশব্দে রমেশের হাত থেকে খামটা নিয়ে খামের মুখ ছিঁড়ে চিঠিটা পড়ে মৃদুকণ্ঠে বললেন, ঠিক আছে, তুমি যেতে পারো।

রমেশ বের হয়ে গেল ঘর থেকে।

কিরীটী এবারে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, ডাক্তার সেন, বাড়ি যাবেন নাকি?

হ্যাঁ, চলুন।

উঠে দাঁড়ালাম আমি।

চব্বিশ

রাত খুব বেশি হয়নি তখনও।

মাত্র দশটা। হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম।

হঠাৎ মনে পড়ল, মাত্র পনেরো দিন আগে ঠিক এমনি এক রাত্রে রহস্যজনকভাবে নিহত হয়েছিলেন সূর্যপ্রসাদ এবং আজ রাত্রে সেই হত্যাকারীর সন্ধান পাওয়া গেল।

কিন্তু সত্যিই খুনি কে?

সত্যি-সত্যিই কি কিরীটী রায় সূর্যপ্রসাদের হত্যাকারীকে চিনতে পেরেছেন?

নিঃশব্দে পাশাপাশি দুজনে আমারই গাড়িতে বসে চলেছি। গাড়ি চালাচ্ছিলাম আমিই।

মিস্টার রায়? মৃদুকণ্ঠে ডাকলাম।

ইয়েস, ডাক্তার সেন।

রাত তো এমন কিছু বেশি হয়নি, যদি আপত্তি না থাকে তো চলুন না চেম্বারে এক কাপ কফি খেয়ে যাবেন।

বেশ তো, চলুন।

গাড়ি চেম্বারের দিকেই চালালাম।

চেম্বারে পৌঁছে নিজের হাতেই দু-কাপ কফি তৈরি করে এককাপ দিলাম মিস্টার রায়কে, এককাপ নিলাম আমি।

দুজনে দুটি চেয়ারে মুখোমুখি বসে আছি, সামনেই টেবিলের ওপর নিঃশেষিত দুটি কফির কাপ।

কিরীটীর ওষ্ঠপ্রান্তে ধৃত পাইপ।

টেবিলের ওপরে রক্ষিত টেবিল-ল্যাম্পের আলো কিরীটীর মুখের ওপর এসে পড়েছে। বোঝা যায় গভীর চিন্তায় যেন অন্যমনস্ক ওই লোকটি ওই মুহূর্তটিতে।

সহসা ঘরের স্তব্ধতা ভঙ্গ করে মিস্টার রায়ই একসময় মৃদুকণ্ঠে বললেন, আজকের আলোচনাটা কেমন লাগল আপনার, ডাক্তার সেন?

Rather exciting!

কিন্তু আপনাকে যেন একটু বিশেষ চিন্তিত বলে হঠাৎ মনে হচ্ছে, ডাক্তার?

না চিন্তা কী—তবে—।

বলুন, থামলেন কেন?

সত্যি কথা বলতে কী, মিস্টার রায়, আপনার কথাটা যেন সত্যিই এখনও আমার কাছে প্রহেলিকার মতোই মনে হচ্ছে!

কোন কথাটা, ডাক্তার? খুনির পরিচিতি সম্পর্কে কি?

হ্যাঁ, মানে—এখনও আমি বুঝতে পারছি না, সত্যিই যদি আপনি জানতে পেরে থাকেন যে হত্যাকারী কে, তবে তাকে এই মুহূর্তে মিস্টার পান্ডের হাতে না তুলে দিয়ে, খোলাখুলিভাবে, এইভাবে আলোচনা করবার পরও আগামী প্রত্যুষ পর্যন্ত—।

তাকে সময় দিলাম কেন, তাই না?

হ্যাঁ, মানে ধরুন—যদি সে পালায়?

আছে—একটা উদ্দেশ্য আছে বইকী, ডাক্তার। বিনা উদ্দেশ্যে কিছু আমি করি না।

উদ্দেশ্য?

হ্যাঁ, কিন্তু যাক সে-কথা, you need not worry! আমি জানি সে পালাতে পারবে না। ধরা তাকে দিতেই হবে।

তা হলে আমাদের মধ্যেই একজন সূর্যপ্রসাদকে হত্যা করেছে, আপনার স্থির বিশ্বাস?

হ্যাঁ।

কিন্তু কে?

তা হলে সবই আপনাকে খুলে বলি, ডাক্তার, বুঝতেই তো পারছেন আমার ক্ষণপূর্বের আলোচনা থেকে যে সমর বা বিমলবাবু হত্যাকারী নন।

তা হয়তো নয়—।

তা হলে বাকি যারা উপস্থিত ছিল তাদের মধ্যে কে হত্যাকারী হতে পারে, এই তো?

হ্যাঁ।

বেশ, তা হলে গোড়া থেকেই শুরু করি। প্রথমেই ধরুন, টেলিফোনে সে-রাত্রে আপনার সূর্যপ্রসাদের মৃত্যুসংবাদটা পাওয়া। প্রমাণিত হয়েছে নিঃসংশয়ে যে 'লিলি কটেজ' থেকে কেউই আপনাকে ফোন করেনি, ফোনটা এসেছিল অন্য জায়গা থেকে, কেমন কি না?

হ্যাঁ—।

তাই যদি হয়, তবে ফোনটা করা হয়েছিল কেন? একমাত্র হতে পারে, হত্যাকারী চেয়েছিল সেই রাত্রেই ওইভাবে ফোন মারফতই হত্যার ব্যাপারটা সকলের গোচরীভূত করে দিতে?

কিন্তু—।

হ্যাঁ, আপনি হয়তো বলবেন তার সেই রাত্রেই ব্যাপারটা সকলের গোচরীভূত করবারই বা এমন কী প্রয়োজন ছিল, পরের দিনই তো সকলে জানতে পারত! তা নিশ্চয়ই পারত। তবে এক্ষেত্রে খুনির ইচ্ছাই ছিল যে ওই রাত্রেই খুনের ব্যাপারটা সকলের গোচরীভূত যাতে হয়ে যায়!

কেন?

কেন? ভেবে দেখেছি, তার কারণও ছিল বইকী। হত্যাকারী চেয়েছিল মনে মনে, এমন একটা নির্দিষ্ট সময়ে ওই হত্যার ব্যাপারটা প্রকাশিত হোক, পুলিশের গোচরীভূত হওয়ার পূর্বেই, যাতে করে তার হাতে এমন খানিকটা সময়ের সুযোগ থাকে, যে-সময়ের মধ্যে বা পরে ওই সুযোগ নিয়ে সে অনায়াসেই দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকবার অবকাশ পায়। আশা করি, আমি যা বলতে চাইছি, আপনি বুঝতে পারছেন, ডাক্তার সেন!

বলুন?

কিরীটী আবার বলতে লাগলেন, টেলিফোনের ব্যাপারটার পর তা হলে আসা যাক—সেই ব্যাকরেস্ট দেওয়া চেয়ারটার কথায়।

চেয়ার!

হ্যাঁ, যেটা সম্পর্কে বহুবার ইতিপূর্বে তুচ্ছতম একটা ব্যাপার বলে আপনি আমাকে ইঙ্গিত করেছেন। আপনি যে তদন্তের ব্যাপারটা আপনার ডায়েরিতে ধারাবাহিক ভাবে লিখেছেন তাতে সেই ঘরের, মানে অকুস্থানের যাবতীয় খুঁটিনাটি সম্পর্কে চমৎকার একটা স্কেচ দিয়েছেন। সেটা যদি একটু ভালো করে পর্যবেক্ষণ করেন তা হলে দেখবেন, আপনারও বুঝতে কষ্ট হবে না যে, আবদুলের কথামতো যদি চেয়ারটা সত্যিই সরানো হয়ে থাকে তা হলে চেয়ারটা এমনভাবে এমন জায়গায় ঠেলে দেওয়া হয়েছিল যাতে করে চেয়ারটা ঠিক ঘরের বাইরে যাওয়ার দরজা ও ঘরের একটিমাত্র জানলার মাঝামাঝি position নেয়।

জানলার?

হ্যাঁ, জানলা-দরজার সঙ্গে ঠিক একই লাইনে ওই চেয়ারটা ইচ্ছা করেই অর্থাৎ প্ল্যান মতোই রাখা হয়েছিল। আর তাতেই আমার মনে হয়েছিল, আবদুল মিথ্যে বলেনি।

কিন্তু—।

কিন্তু কেন, তাই তো। শুনুন, ডাক্তার সেন, চেয়ারটার original position এইজন্যে পরিবর্তন করা হয়েছিল, যাতে করে ওই position-এ চেয়ারটা সরিয়ে রাখলে দরজাপথে কেউ ঘরে প্রবেশ করলে চেয়ারটার উঁচু ব্যাকরেস্টের জন্যে সহসা কারওই চেয়ারের পশ্চাতের জানলাটা নজরে পড়বে না। কিন্তু একটু ভালো করে নজর করে দেখলেই বোঝা যায়, চেয়ারের ব্যাকরেস্টটা এত বেশি উঁচু নয় যে, সেটা দরজাপথে কেউ প্রবেশ করলে তার দৃষ্টিপথ থেকে সম্পূর্ণভাবে জানলাটা ঢাকা পড়তে পারে। তবে হ্যাঁ একটা কথা—and which was more improtant, ওই চেয়ার-জানলার মধ্যস্থলে, অর্থাৎ চেয়ারটার ঠিক পশ্চাতেই ছিল একটা নিচু গোল টেবিল এবং ওইভাবে চেয়ারের original position চেঞ্জ করার দরুন জানলাটা সম্পূর্ণভাবে দৃষ্টিপথের অগোচর না থাকলেও টেবিলটাকে দৃষ্টির অগোচর করতে কিন্তু পুরোমাত্রায়ই সাহায্য করেছিল, অর্থাৎ হত্যাকারী চেয়ারটার position ওইভাবে সরিয়ে দিতে চেয়েছিল তার পশ্চাতে রক্ষিত টেবিলটা যেন ঘরে ঢুকলেই কারও সহজ নজরে না আসে।

কিন্তু কেন—কেন?

এ তো সোজা কথা, ডাক্তার সেন, সেই টেবিলটার ওপরে এমন কোনও বস্তু হয়তো ছিল যেটা খুনি চায়নি যে ঘরে ঢুকে কেউ দেখতে পাক। এবং যে-মুহূর্তে ওই সম্ভাবনাটি আমার অনুসন্ধিৎসু মনে পরের দিন প্রত্যুষে সেই ঘরে প্রবেশ করার সঙ্গে-সঙ্গেই উঁকি দিয়েছে, সেই মুহূর্তেই সত্যি কথা বলতে কী আমি যেন সত্যের ছায়া দেখতে পেলাম। আর সেই মুহূর্ত থেকেই একটা চিন্তা কেবলই মনের মধ্যে আমার ঘোরাফেরা করতে লাগল, সেটা কী? কী হতে পারে? কী হওয়া সম্ভব? প্রথমটায় অবিশ্যি কোনও সূত্রই খুঁজে পাইনি। কিন্তু কতকগুলো ব্যাপার তারপর অনুসন্ধান করতে-করতে এমন কয়েকটি বিষয় আমার দৃষ্টিকে আকর্ষণ করেছে যাতে করে ক্রমশ সত্যটা একটু-একটু করে আমার চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

কিন্তু—।

হ্যাঁ, ক্রমশ এইটাই বুঝলাম, হত্যাকারী হয়তো হত্যা করবার পর ঘর ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় ওই টেবিলের ওপরে এমন কোনও জিনিস ছিল যেটা সেসময় তার পক্ষে নিয়ে যাওয়া সুবিধে হয়নি বা হবে না জেনেই পরে তাকে টেলিফোন কলটার সহায়তা নিতে হয়েছিল। এবারে বুঝতে আশা করি নিশ্চয়ই কষ্ট হচ্ছে না আমার কথাগুলো, ডাক্তার সেন, অর্থাৎ সেটা এমন কিছু মারাত্মক যেটা পরে অন্যের নজরে পড়লে হত্যাকারীর সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা ছিল।

তাই বুঝি!

হ্যাঁ, সেইজন্যই সে ওই টেলিফোন-কলের সুযোগে সকলের সঙ্গে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে সেই গোলমালের ও সকলের অন্যমনস্কতার মধ্যে সেই মারাত্মক বস্তুটি সরিয়ে নেওয়ার সুযোগ পেয়েছিল।

এখন পুলিশ সেখানে পৌঁছবার আগে কারা-কারা সে-ঘরে গিয়েছিল? আপনি, আবদুল, মেজর, বলদেববাবু, রাধিকাপ্রসাদবাবু ও বিমলবাবু। প্রথম ধরা যাক আবদুলকে। সে-ই যদি হবে তবে চেয়ারের কথা সে কোনওমতেই বলত না। একমাত্র এই কারণেই আমি আবদুল যে নির্দোষ সে-সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চিত। তারপর মেজর, বিমলবাবু ও রাধিকাপ্রসাদবাবু। তাঁদের প্রতি একটু সন্দেহ হয় বটে। কিন্তু কথা হচ্ছে, সে জিনিসটা কী? আমি মেজরের কাছে খোঁজ নিয়ে শুনেছি, সূর্যপ্রসাদের কথাবার্তা যা সে-রাত্রে তিনি শুনতে পেয়েছিলেন, সেটা বেশ একটু অস্বাভাবিক রকম জোরে-জোরে। কোনও মানুষই—বিশেষ করে প্রাইভেট কথাবার্তা অত জোরে বলতে পারে না।

কিরীটী বলতে লাগলেন।

যে-মুহূর্তে আমি হাজরা কোম্পানি থেকে জানতে পারি, সূর্যপ্রসাদ মৃত্যুর দু-দিন আগে মাত্র

একটা ডিকটাফোন ক্রয় করেছেন, তখনই ডিকটাফোনের ব্যাপারটা আমার মনে গেঁথে যায়। আমি চিন্তা করতে শুরু করি। হঠাৎ একসময় মনে হল, সূর্যপ্রসাদ যে-ডিকটাফোনটা ক্রয় করেছেন সেটা কোথায়? বহু পরিশ্রম করে খোঁজাখুঁজি করেও আমি বা ও-বাড়ির কেউ সেটা পাননি।

আমি কিন্তু এ-কথাটা একবারও ভাবিনি, মিস্টার রায়।

স্বাভাবিক। যাক, তখন আমার মনে হল, এমনও তো হতে পারে, ওই ডিকটাফোনটাই টেবিলের ওপরে ছিল এবং সেটাই সরিয়ে ফেলা হয়েছে। কিন্তু খুনি যদি সেটা সরিয়ে ফেলেই থাকে, তবে সকলের সামনে অজ্ঞাতে কীভাবে সেটা সরিয়ে ফেললে? নিশ্চয়ই এমন কোনও কিছু খুনি সঙ্গে এনেছিল যার সাহায্যে সেটা অনায়াসেই অলক্ষ্যে সরিয়ে ফেলেছে। বুঝতে পারছেন এখন ডাক্তার সেন, খুনি আমাদের চোখের সামনে অঙ্গে-অঙ্গে আকার নিচ্ছে। এখন বোধহয় বুঝতে পারছেন, কেন খুনি কৌশলে ফোন করে সেই রাত্রেই খুনের কথা সকলকে জানিয়ে ডিকটাফোনটা নিয়ে সরে পড়েছিল? যাতে করে পরের দিন সকালে তার কোনও কাজকর্মের বা সূত্রের চিহ্ন পর্যন্ত না থাকে। কিন্তু সকালে হলেই বা ক্ষতি ছিল কি? ছিল—ডিকটাফোন নিয়ে যাওয়ার সময় সকলের চোখে ধরা পড়ত।

আমি বাধা দিলাম, কিন্তু ডিকটাফোনটা সরানোর কী এমন প্রয়োজন ছিল?

আপনি জানেন, সূর্যপ্রসাদের কণ্ঠস্বর রাত্রি সাড়ে এগারোটার সময়ও তাঁর ঘর থেকে শোনা গিয়েছিল। কিন্তু ভেবে দেখুন, আপনি ডিকটাফোনের মাউথপিসে এখন কিছু বললে এবং কিছু সময় পরে মেশিন চালালেই আবার সে-কথাটা শোনা যেতে পারে।

অর্থাৎ—।

হ্যাঁ, অর্থাৎ আমি বলতে চাই, রাত্রি এগারোটার ঢের আগেই স্যার সূর্যপ্রসাদকে খুন করা হয়েছিল। রাত সাড়ে এগারোটার সময় তাঁর গলা ডিকটাফোনে শোনা গিয়েছিল, তার কারণ খুনি খুন করে চলে যাওয়ার আগেই মেশিনটা চালিয়ে দিয়ে গিয়েছিল অন্যকে ধোঁকা দিতে। এই সব থেকেই বোঝা যায়, খুনি সূর্যপ্রসাদের যথেষ্ট পরিচিত ও জানত যে সূর্যপ্রসাদ ডিকটাফোন কিনেছেন। তারপরে আসা যাক জানলার গায়ে পায়ের ছাপে। পায়ের ছাপ দেখে এবং তাজ হোটেলে সমরের কাদামাখা জুতো দেখে মনে হয়—জানলার পায়ের ছাপ সমরের হতে পারে। কিন্তু খোঁজ নিয়ে জেনেছি, সে-রাত্রে সমরের পায়ে যে-জুতো ছিল সেটা তাজ হোটেলে পাওয়া জুতোর মতো একই প্যাটার্নের রবার সোল দেওয়া জুতো। কিন্তু হাসপাতালে সমরের পায়ের সেই জুতো ভালো করে দেখেছি, সে জুতোয় এতটুকুও কাদার দাগ ছিল না। অথচ সমরের ঘরে কাদামাখা জুতো পাওয়া গেল। কোনও লোকই একই প্যাটার্নের তিনজোড়া জুতো কিনতে পারে না। তা ছাড়া প্রমাণিত হয়েছে, সমর সে-সময় হোটেলের জুয়া-ঘরে জুয়া খেলায় মত্ত ছিল। এবং সমরকে আপনিই বলে দিয়েছিলেন যে, সে হাজারিবাগ যাচ্ছে সে-কথা যেন সেই রাত্রেই ফোনে আপনাকে জানায়। এতে মনে হয়, নিশ্চয়ই কেউ সমরের জুতো পায়ে দিয়ে সূর্যপ্রসাদকে খুন করে জুতো আবার তার ঘরে অন্যের অলক্ষ্যে রেখে এসেছে—তার ঘাড়ে খুনের দোষ চাপানোর জন্যে। এ থেকে এ-ও প্রমাণিত হয়, খুনি সমরকেও বেশ ভালোভাবেই চিনত ও তার সঙ্গে পরিচিত ছিল। এই সব কারণ থেকেই বোঝা যায়, খুনি এমন একজন লোক যে জানত মেক্সিকান ছোরাটা কোথায় আছে এবং যে স্যার সূর্যপ্রসাদের পরিচিত ও বিশ্বাসের পাত্র ছিল, যে সূর্যপ্রসাদের সংসারের অনেক সংবাদই জানত, যে ডিকটাফোনের শুধু সংবাদই নয় তার ব্যবহারও বেশ ভালোভাবেই জানত এবং যার সঙ্গে ডিকটাফোনটাকে লুকিয়ে নিয়ে যাওয়ার মতো বাক্স বা তেমন কিছু ছিল। তা হলেই বুঝুন খুনি কে? শুনুন ডাক্তার সেন, গোখরো সাপ নিয়ে খেলা করার চাইতে আরও ভয়ংকর কিরীটী রায়কে নিয়ে খেলা করা। এখন বুঝে দেখুন, এই সব কিছুর সঙ্গে মিলে যাচ্ছে কে—আপনি। হ্যাঁ—আপনি, ডাক্তার সেনই সূর্যপ্রসাদের হত্যাকারী।

পঁচিশ

আমি হো-হো করে হেসে উঠলাম, কী বলছেন পাগলের মতো, মিস্টার রায়? শেষপর্যন্ত এই ধারণা হল আপনার যে সূর্যপ্রসাদের হত্যাকারী আমি? হাঃ-হাঃ-হাঃ।

শুনুন ডাক্তার সেন, পাগল আমি নই—আপনার জবানবন্দির মধ্যে সামান্য একটা সময়ের হেরফেরই সমস্ত রহস্য আমার কাছে দিনের আলোর মতো পরিষ্কার করে দিয়েছে। আমি অনেক দিনই আপনাকে ধরিয়ে দিতে পারতাম, শুধু সমস্ত প্রমাণের জন্যেই এবং আজকের রাতটির জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম।

সময়ের হেরফের!

হ্যাঁ। আপনি আপনার জবানবন্দিতে কোনও এক অসতর্ক মুহূর্তে বলেছেন, রাত সাড়ে দশটায় সূর্যপ্রসাদের ঘর থেকে আপনি বিদায় নেন, অথচ গেটের কাছে কমলের সঙ্গে যখন আপনার দেখা হয়, তখন রাত্রি এগারোটা বাজল গির্জার ঘড়িতে। ঘর থেকে বের হয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেটের কাছে আসতে পাঁচ-ছ মিনিটের বেশি কারও লাগতেই পারে না, অথচ আপনার আধঘণ্টা লাগল। কেন? কী করছিলেন এই আধঘণ্টা সময়? কোথায় ছিলেন? তা ছাড়া, সূর্যপ্রসাদের নিহত হবার সংবাদ ফোনে পেয়ে কালো রঙের ডাক্তারি ব্যাগটা নিয়েই বা সে-রাত্রে 'লিলি কটেজে' গিয়েছিলেন কেন? মৃত ব্যক্তিকে ইনজেকশান দিতে বুঝি? ডাক্তার, নিজের জালে নিজেই জড়িয়েছেন! ব্যাগটা না নিয়ে গেলে যে ডিকটাফোনটা আনতে পারতেন না এবং ঘরে ঢুকেই চেয়ারটা সরিয়ে রেখেছিলেন পাছে কারও নজরে পড়ে!

সবই আপনার উর্বর মস্তিষ্কের কল্পনা মাত্র, মিস্টার রায়!

কল্পনা নয় ডাক্তার, আপনি মস্ত বড় একটা কথা ভুলে যাচ্ছেন, ঘরের কথাবার্তার মধ্যে মেজর পরে আমাকে বলেছিলেন তিনি নাকি আপনার কণ্ঠস্বরই শুনেছিলেন, তাতেই বোঝা যায় আপনি ছাড়া অন্য কোনও তৃতীয় ব্যক্তি ওই ঘরে ঢোকেনি বা ওই সময়ে ছিল না।

মেজরের কথাই যে অভ্রান্ত সত্য তারই বা প্রমাণ কী? বললাম আমি।

নয় তা জানি। আর সেই কারণেই ডিক্‌টাফোনটা কৌশলে পরে আপনার বাড়ি থেকে আমাকে সরিয়ে সেফ কাস্টোডিতে রেখে দিতে হয়েছে। যাক সে-কথা—let me finish! সে-রাত্রে সূর্যপ্রসাদকে খুন করে জানলা টপকিয়ে নীচে নেমে তাড়াতাড়ি তাজ হোটেলে গিয়ে সমরের জুতোটা সেখানে রেখে সাইকেলে চেপে ফিরে আসতে কুড়ি মিনিটের বেশি সময় লাগে না। তারপর সেই রাত্রে তাজ হোটেলে গিয়ে সমরকে ভয় দেখিয়ে তাকে সরিয়ে ফেলতেও চমৎকার বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু হায়, এত করেও সব দিক বাঁচাতে পারলেন না। নিজের জবানিতেই ধরা দিলেন। দোষীর বিচার ভগবান এমন করে তাকে দিয়েই করান। আচ্ছা আসি—Good night! পালাবার চেষ্টা করবেন না, তাতে করে শুধু বিড়ম্বনাই বাড়বে। তা ছাড়া ঘুমিয়ে নেই—সজাগ হয়েই আছেন মিস্টার পান্ডে।

কিরীটী অতঃপর ধীর মন্থর পদে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন।

ডায়েরিটা শেষ করে যাওয়া দরকার।

আর কারও জন্যে না হোক, অন্তত মিতা—মিতার জন্যেও শেষ করে যাওয়া দরকার।

অন্ধকার। শুধুই অন্ধকার।

সব—সব আজ স্বীকার করে যাব।

লোভের বশবর্তী হয়ে যে-মহাপাপ করেছি, নিজের মুখে স্বীকৃতি না রেখে গেলে তো মুক্তি নেই আমার।

মুক্তি!—হ্যাঁ মুক্তি—।

লোভের আগুনে পুড়ে মরেছি। জগৎজীবনকে টিউবারকুলিন ইনজেকশন দিয়ে তাঁর পুরাতন টি. বি. রোগকে flare up করে তাঁকে হত্যা করেছি—পুলকজীবন, তার ভাইয়েরই পরামর্শে দশ হাজার টাকার লোভে। আর সমরই পুলকজীবনের সঙ্গে আমার যোগাযোগ ঘটিয়েছিল। কিন্তু অর্থের নেশা আর পাপের নেশা যে কী ভয়াবহ পথ ধরে চলে তখন তো তা বুঝিনি। তাই সেই নগদ দশ হাজার টাকা প্রাপ্তির পরও যখন দুর্দান্ত লোভের বশবর্তী হ'ে পুলকজীবনকে blackmailing করতে শুরু করলাম এবং শেষপর্যন্ত যখন বুঝলাম দোহন আর সহ্য না করতে পেরে সে বেঁকে দাঁড়াবার উপক্রম করছে তখন তাকেও পথ থেকে সরাতে বাধ্য হলাম ওই একই উপায়ে। তারও টি. বি. রোগ ছিল—তাকেও টিউবারকুলিন ইনজেকশন দিয়ে শেষপর্যন্ত হত্যা করলাম। তারপর ধরলাম সমরকে। সমরের সাহায্যে arsenic দিয়ে slow poisoning করতে শুরু করলাম সূর্যপ্রসাদকে।

কিন্তু হায়, তখন তো বুঝিনি, পাপ চিরদিন চাপা থাকে না। আর তাই বোধহয় মৃত্যুর পূর্বে পুলকজীবন তার বন্ধুকে সব জানিয়ে গেল একটা চিঠিতে এবং সেই বন্ধু চিঠি লিখে সব গোচরীভূত করল সূর্যপ্রসাদের।

পুলকজীবন সম্পর্কে কিরীটীর অনুসন্ধিৎসা দেখেই কেমন যেন আমার সন্দেহ হয়েছিল এবং সেই সন্দেহ দৃঢ়ীভূত হল সূর্যপ্রসাদের আমন্ত্রণ পেয়ে।

তাই প্রস্তুত হয়েই সূর্যপ্রসাদের ঘরে গিয়ে প্রবেশ করেছিলাম সে-রাত্রে। ওপরে যাওয়ার পূর্বেই সূর্যপ্রসাদের মিউজিয়াম ঘর থেকে চন্দনকাঠের বাক্সটা খুলে ছোরাটা নিয়ে গিয়েছিলাম সঙ্গে করে লুকিয়ে এবং সূর্যপ্রসাদের চিঠি পড়া শুরু হতেই বুঝলাম, অনুমান আমার মিথ্যা নয়—সব এবারে জানাজানি হয়ে যাবে।

আর রক্ষা নেই।

অনন্যোপায় হয়েই তাই সূর্যপ্রসাদকে সে-রাত্রে হত্যা করেছি।

কিন্তু হত্যা তো উত্তেজনার বশে অকস্মাৎ করে বসলাম, তারপর এদিক-ওদিক তাকাচ্ছি, সহসা পাশেই টেবিলের ওপর নজরে পড়ল সূর্যপ্রসাদের সদ্যক্রীত ডিকটাফোনটা। দেখলাম সেটা নিঃশব্দে তখনও চলছে। সঙ্গে-সঙ্গে একটা বুদ্ধি মাথায় এসে গেল—মেশিনটাকে থামিয়ে আবার গোড়া থেকে চালিয়ে দিলাম।

হ্যাঁ, আমিই সূর্যপ্রসাদের হত্যাকারী।

কিন্তু সমর—সমর দোষী নয়, মিতা। তাকে তুমি যেন ভুল বুঝো না। তাকে তুমি গ্রহণ কোরো।

মিতা, ক্ষমা করিস ভাই তোর এই পথভ্রান্ত হতভাগ্য দাদাকে।

হ্যাঁ, ওই যে এখান থেকেই দেখতে পাচ্ছি স্পষ্ট দেওয়াল আলমারিতে সাজানো সারি-সারি 'বিষ' লেখা ওষুধের শিশিগুলো।

বেলেডোনা, টিনচার ওপিয়াই, টিনচার হায়োসায়মাস, বারবিটোন, হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিড, লুমিনল, সেকোনল সোডিয়াম, ভেরোনল—।

ঠিক, ভেরোনলই সবচাইতে ভালো। অনেক রাত ঘুমোইনি। একটু—একটু ঘুমোতে চাই। ঘুমোব—হ্যাঁ, ওই ভেরোনলই দেবে আমাকে ঘুম।

আঃ, ঘুম।

ঘুম—সত্যিই কি ঘুম আসছে?

ভানু গোয়েন্দা জহর অ্যাসিস্ট্যান্ট



প্রণব রায়

শ সে. র. উ ২—১৪

প্রখ্যাত কৌতুকশিল্পী
শ্রীভানু বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীজহর রায়

বন্ধুবরেষু,

ভাই ভানু ও জহর,

বাঙালির বিড়ম্বিত জীবনে তোমরা অনেক আনন্দের খোরাক যুগিয়েছ। তোমাদের কাছ থেকে অনেক পেয়ে একটুখানি দিতে চাই। আমার এই বইটি তাই তোমাদের উৎসর্গ করলাম।

প্রণবদা

পয়লা ফাল্গুন, ১৩৭২
কলকাতা

পাঠক সমীপেষু,

*হাসির গোয়েন্দা-গল্প বাংলায় লেখা হয়নি বললেই চলে। আমার এ গল্পে সেই প্রচেষ্টাই করেছি। ইংরেজিতে যাকে বলে **slapstick comedy,** এ গল্পও তাই। নিছক হাসি। যাঁরা গল্পে যুক্তি খুঁজবেন, তাঁরা ঠকবেন।*

প্রখ্যাত কৌতুকাভিনেতা ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ও জহর রায় আমার প্রিয় বন্ধু। আমি তাঁদের অনুরাগী। বহুতর চবিত্রে তাঁদেরকে আমরা দেখেছি, হেসেছি, কিন্তু বোকা গোয়েন্দার চরিত্রে কেউ বোধকরি কখনো তাঁদেরকে কল্পনা করেননি। আমি কল্পনা করেছি এবং সেই কারণেই তাঁদের নামও ব্যবহার করলাম। বলে রাখা ভালো, ভানু ও জহর ছাড়া এ গল্পের অন্যান্য চরিত্রগুলিও কাল্পনিক।

আমার এ গল্প পড়ে যদি আপনাদের হাসি পায়, আমার লেখার সার্থকতা সেইখানেই। যারা 'রামগরুড়ের ছানা', তাদের জন্য লিখিনি। ইতি--

প্রণব রায়

প্রতিরক্ষা তহবিলের জন্য নিউ এম্প্রেস স্টেজে জলসা। রাত সাড়ে দশটায় অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বোম্বে-বাংলার সর্বাধিক জনপ্রিয় গায়ক অচল মুখার্জির প্রোগ্রাম সবার শেষে হওয়ায় আসর ভাঙতে দেরি হচ্ছে। মুগ্ধ ও ভক্ত শ্রোতাদের ফরমায়েশ মতো খানআষ্টেক গান পরিবেশনের পর অচল মুখার্জি নবম গানটি ধরেছে। এটি অচলের লেটেস্ট হিট। শুনতে-শুনতে শ্রোতারা প্রায় মরে যাচ্ছে। মরে অচল মুখার্জিও যাচ্ছে। শ্রোতাদের অনুরোধের জ্বালায়। এবং মরতে-মরতে প্রায় মরিয়া হয়ে উঠেছে।

বার পাঁচেক ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে গাইবার পর অচলকুমার গানটি শেষ করল। সঙ্গে-সঙ্গে অডিটোরিয়াম থেকে সরু মোটা হেঁড়ে মিহি নানাবিধ গলার চিৎকার।

'আর একখানা। আর একখানা।'

'রিকশার গানখানা দাদা—সেই ''পিচ গলে যায় আগুন হাওয়ায়—''।'

'না, না, ওখানা নয়, সেই ''দিলকো শিককাবাব বানায়া তেরে লিয়ে পিয়া—''।'

'আরে রাখেন মশায়, যা হৌক একখান হইলেই হইল!'

কিন্তু অচলকুমার ততক্ষণে হারমোনিয়াম ছেড়ে স্টেজের ওপর উঠে দাঁড়িয়েছে। কোনওমতে দর্শকদের একটা নমস্কার জানিয়েই সে উইংসের পাশে অদৃশ্য হল।

ব্যাক স্টেজের দরজা দিয়ে বেরিয়ে অচলকুমার হনহন করে আসছে। কিন্তু বারান্দা পার হয়ে দোতলার লবির দিকে আসতেই অচলকুমার সত্যিই অচল হয়ে গেল। মুখ উঠল শুকিয়ে, বুক করতে লাগল গুরগুর। অটোগ্রাফের খাতা হাতে একদল মেয়ে ওত পেতে দাঁড়িয়ে আছে। বয়েসে তারা সকলেই তরুণী। অচলকুমার জীবনে কখনও রয়াল বেঙ্গল বাঘিনী দেখেনি, কিন্তু তারা শাড়ি পড়লে যে হুবহু ওদেরই মতো দেখতে হবে, এ-বিষয়ে সে নিশ্চিত।

অচলকুমারকে এগোতে হল না। প্রগতিশীলারাই গতি বাড়িয়ে দিলে। অচলের চারপাশে সপ্তরথীর ব্যূহ রচনা করে তারা খাতা এগিয়ে কলকণ্ঠে কলরব করে উঠল, 'কী অপূর্ব গাইলেন আজকে! স্টেজের ওপর যখন গাইছিলেন, আপনাকে দেবদূতের মতো দেখাচ্ছিল। সত্যি অচলদা, আপনি যে কী—মানে কত—।'

'জানেন অচলদা, রোজ রাতে ঘুমোবার আগে আপনার ছবির সঙ্গে আমি ইয়ে—মানে কত কথা বলি।'

'আচ্ছা অচলদা, আপনার গান এত চার্ম করে কেন বলুন তো? একেবারে জার্মের মতো বুকের মধ্যে—ওকী, কী হল আপনার?'

'মুখখানা অমন হয়ে গেল কেন?'

'খুব ক্লান্ত লাগছে বুঝি?'

দু-হাতে পেটটা খামচে ধরে কাতর স্বরে অচলকুমার শুধু বলে উঠল, 'পেট—।'

তারপর হঠাৎ দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে মরিয়ার মতো অচলকুমার লবি দিয়ে ছুটতে লাগল। লবির পর একতলার সিঁড়ি, সিঁড়ির পর রাস্তা।

নিউ এম্প্রেস থিয়েটার থেকে শ'তিনেক গজ তফাতে একটা অন্ধকার নিরালা জায়গায় অচলকুমার তার গাড়ি রেখেছিল। যাতে তার ফ্যানদের চোখে সহজে না পড়ে। ঊর্ধ্বশ্বাসে এসে গাড়িতে উঠে বসে স্টার্ট দিয়ে হাঁপ ছাড়ল। ওঃ, সাংঘাতিক বিপদ থেকে বেঁচে যাওয়া গেছে! অল্পবয়েসি মেয়েদের দেখলে জনপ্রিয় স্মার্ট অচলকুমারের কেন যে এত ভয় লাগে, কেন যে গা গুলিয়ে ওঠে, তা সে নিজেই জানে না। কিন্তু ওঠে। ঠোঁটে রং-মাখা, বিনুনি দোলানো ন্যাকা মেয়েগুলো তার কাছে যেন রঙিন শাড়ির লেবেল আঁটা তেতো ওষুধের এক-একটা শিশি। বা রয়াল বেঙ্গল বাঘিনীর

এক-একটি পিসি।

যাক, খুব ফাঁড়া কেটে গেছে আজ। এবার আরাম করে একটা সিগারেট ধরানো যেতে পারে।

গাড়ি তখন পার্ক স্ট্রিট ছাড়িয়েছে। একটা সিগারেট মুখে গুঁজে লাইটারটা জ্বালাতেই অচল ভূত দেখে চমকে উঠল। ভূত গাড়ির সামনে নয়, পিছনে। রিয়ার গ্লাসে তারই ছায়া। চকিতে অচল পিছন ফিরে তাকাল। আর সঙ্গে-সঙ্গে গাড়িখানা মাতালের পায়ের মতো বেসামাল হয়ে উঠল। রাত বারোটার পর রাস্তা প্রায় ফাঁকা ছিল তাই রক্ষে।



অচল দেখলে, ব্যাক সিটের তলা থেকে কোঁকড়া কালো চুলে ঘেরা ফরসা একখানা মুখ আস্তে-আস্তে উঠছে। বড়-বড় কালো চোখে কিছু ভয়, কিছু কৌতূহল।

ভূত নয়, প্রেতিনী, তরুণী প্রেতিনী। অচলের গা ছমছম করে উঠল। তাজ্জব ব্যাপার! গাড়িতে উঠে যখন সে স্টার্ট দিল, তখন তো কেউ ছিল না! এই চলতি গাড়িতে প্রেতিনী কখন উঠে এল? কেমন করেই বা এল? কাছে-পিঠে শ্মশান তো নেই, তবু এল কী করে?

ঘ্যাঁস করে ব্রেক চেপে অচল রাস্তাব বাঁ-দিকে গাড়ি কখল। প্রেতিনীর সঙ্গে একটা বোঝাপডা করার দরকার। মনে-মনে তিনবার রামনাম জপ করে অচল সাহস সঞ্চয় করে নিল।

কিন্তু প্রেতিনীই আগে বললে, 'থামলেন কেন, চলুন?'

অচল সাহসে ভর করে জিগ্যেস করলে, 'কে তু—আপনি?'

অচলের হঠাৎ মনে পড়ে গেল, প্রেতিনী হলেও সে লেডি। সম্মান রেখে কথা বলা উচিত।

ছোট্ট জবাব এল, 'কেউ না। আপনি চলুন।'

অচলের চোখ দুটো গোল-গোল হয়ে উঠল। বললে, 'কেউ না? তবে কি আপনি সত্যিই প্রে—প্রে—।'

খিলখিল হাসির সঙ্গে শোনা গেল, 'না, না, ভয় পাবেন না, আমি প্রেতিনী নই। আমি নূপুর—নূপুর চ্যাটার্জি।'

'চলতি গাড়িতে উঠলেন কী করে?'

'চলতি গাড়িতে উঠব কেন? আগেই লুকিয়ে ছিলাম পিছনের সিটের পা-দানিতে—।'

'লুকিয়ে ছিলেন? কেন?'

'একটা রাতের আশ্রয়ের জন্যে।'

অচলের এবার ভয় থেকে রাগ হল। বললে, 'আমার গাড়িটা কি গ্র্যান্ড হোটেল? আপনার চালাকি আমি বুঝতে পারছি না, ভাবছেন? যান, নেমে যান। মেয়েদের আমি পছন্দ করিনে।'

নূপুরের দুই চোখে অনুনয় দেখা দিল। বললে, 'রাগ করছেন কেন? একা মেয়ে আমি, এত রাতে কোথায় যাব বলুন? আপনাকে দেখে তো শিক্ষিত ভদ্রলোক বলেই মনে হয়। দয়া করে একটু আশ্রয়—।'

বিষম রেগে গেল অচল। বললে, 'আচ্ছা ঝামেলায় পড়লাম তো। আপনাকে চিনি না, জানি না, কোথায় নিয়ে যাব?'

মিনতি করে নূপুর বললে, 'যেখানে হয়—রাতটা নিরাপদে কাটাবার মতো কোথাও নিয়ে চলুন।'

'না, আমি যাব না। আপনি নেমে যান।'

হঠাৎ পিছনদিকে তাকিয়ে নূপুর ভীত গলায় বলে উঠল, 'শিগগির চলুন, প্লিজ, আমার বড় বিপদ—।'

দেখা গেল, দূরে আর একখানা গাড়ির হেড লাইট ক্রমশ এগিয়ে আসছে।

অচল বললে, 'বিপদ? কী বিপদ?'

রুদ্ধশ্বাসে নূপুর বলে উঠল, 'গোয়েন্দা তাড়া করেছে আমায়—সেই সন্ধে থেকে।'

চমকে উঠে অচল বললে, 'গো—গোয়েন্দা! খুন-টুন করেছেন নাকি?'

'না-না, খুন করব কেন? পরে সব বলব। আপনি শিগগির চলুন। ওরা দেখতে পেলেই আমায় ধরবে। আর ভাববে আমাকে নিয়ে আপনি পালাচ্ছেন।'

'অ্যাঁ। আপনাকে নিয়ে পা—পা—পালাচ্ছি?'

অচলের হঠাৎ ভীষণ জলতেষ্টা পেয়ে গেল। পিছনের হেড লাইট ততক্ষণে আরও কাছে এসে পড়েছে। অচলের কাঁধে সজোরে নাড়া দিয়ে নূপুর বলে উঠল, 'ওই ওরা এসে পড়ল! স্টার্ট দিন গাড়িতে।'

গাড়িতে স্টার্ট দিয়েই অচল টপ গিয়ার ঠেলে দিল। পিছন থেকে চিৎকার শোনা গেল, 'গাড়ি থামাও বলছি—স্টপ। স্টপ।'

কিন্তু অচলের অস্টিন কেমব্রিজ যেন হাওয়ায় উড়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। আর ঠিক পরের মুহূর্তে অচলের গাড়ির জায়গায় উনিশশো উনত্রিশ সালের একখানা ফোর্ড এসে দাঁড়িয়ে সশব্দে হাঁফাতে লাগল।

অস্টিন কেমব্রিজখানা এসে পৌঁছল যোধপুর পার্কের রাস্তায়। তিনতলা একটা ফ্ল্যাটবাড়ির সামনে। অচল বললে, 'আর তো গোয়েন্দার ভয় নেই। এখন আপনি আসুন।'

নূপুর বললে, 'তাড়িয়ে দেবেন তো আনলেন কেন শুনি?'

'বাঃ। আমি আপনাকে আনলাম, না আপনি আমাকে আনলেন?'

'আপনিই তো আনলেন।'

হাতজোড় করে অচল বললে, 'ঘাট হয়েছে আমার। এবার দয়া করে নেমে যান।'

অসহায় গলায় নূপুর বললে, 'এত রাতে—একা—কোথায় যাব?'

'উত্তর-দক্ষিণ পুব-পশ্চিম যেদিকে খুশি যান। গ্যারেজে গাড়ি রেখে আমি এখন ঘরে যাব।'

'আপনার গ্যারেজেই না হয় আজকের রাতটা থাকতে দিন।'

'বাঃ! বেশ বললেন তো! কাল ভোরে আমার ক্লিনার এসে যখন গ্যারেজ খুলবে, তখন? সোজা থানায় গিয়ে ধরা দিন।'

'বিশ্বাস করুন, আমি চোর, ডাকাত বা খুনে নই।'

'আপনি বললেই আমি বিশ্বাস করব? আমার মাথা অত নিরেট নয়। আচ্ছা বেশ, থানায় যেতে না চান, হাসপাতাল খোলা আছে। সেখানে গদিওলা বিছানাও পাবেন। আমি কিন্তু আর দাঁড়াতে পারছি না। জানেন, আমাব নিশ্বাসেব সঙ্গে ছাই বেরিয়ে আসছে?'

নূপুর হাঁ করে তাকিয়ে বললে, 'ছাই! কেন?'

তেতো গলায় অচল বললে, 'কেন আবার! রাত একটা বাজে। খিদের চোটে পেটের নাড়ি জ্বলে ছাই হয়ে গেছে।'

স্থান-কাল-পাত্র ভুলে নূপুর জোরে হেসে ফেলল। একরাশ রুপোর ঘণ্টাধ্বনির মতো মিষ্টি খিলখিল হাসি। আর তখুনি দোতলার একটা অন্ধকার জানলায় টুপ করে আলো জ্বলে উঠল। দেখা দিল গ্লোবের মতো গোল একখানি মুখ। আলো পিছনে থাকায় মুখটা স্পষ্ট দেখা গেল না, শুধু টাকের পালিশ চকচক করতে লাগল। এবং শোনা গেল হাসি-খুশি মোটা গলার কথা : 'বউরে লইয়া আইলেন নাকি, অচলবাবু? বালো, বালো। ফাল্গুন মাস পরসে, বউরে আর কয়দিন বাপের বাড়িতে রাখন যায় ? দারান, আমি সদর খুইলা দিতে আছি।'



গ্লোবের মতো গোল মুখখানি জানলা থেকে অপসৃত হল।

অচলের কপালে তখন বিনবিন করে ঘাম দেখা দিয়েছে। মুখ দিয়ে শুধু একটা কথাই বেরোল, 'সর্বনাশ।'

ফিসফিস করে নূপুর বললে, 'কী হল?'

'কাল সকালে মুখ দেখাব কেমন করে?' অচলের গলাটা প্রায় কাঁদো-কাঁদো হয়ে উঠল। নূপুর টপ করে গাড়ি থেকে বললে, 'উনি দরজা খোলার আগেই আমি বরং পালিয়ে যাই।'

অচল খপ করে নূপুরের হাত ধরে ফেলল। চাপা-গলায় পাগলের মতো বলে উঠল, 'না, না, পালাবেন না, পালিয়ে আর কেলেঙ্কারি বাড়াবেন না।'

ঘটাং করে একটা শব্দ। সদর দরজা খুলে গ্লোবের মতো সেই মুখ সাদরে অভ্যর্থনা করলেন, 'আসেন, আসেন।'

যন্ত্রচালিতের মতো অচল গাড়ি থেকে নেমে পিছনের দরজা খুলল। তারপর অমায়িকভাবেই বলার চেষ্টা করলে, 'ধন্যবাদ, দুন্দুভিবাবু। আপনি শুয়ে পড়ুনগে, আমি গ্যারেজে গাড়ি তুলে যাচ্ছি।'

কিন্তু দুন্দুভিবাবুর শোওয়ার কোনও তাড়া দেখা গেল না। দরজা থেকে খানিক এগিয়ে এসে হাসি-হাসি মুখে বলতে লাগলেন, 'রাত দুপুরে আপনাগো হাসি-মশকরা শুইনাই বুঝছি যে বউ লইয়া আইলেন। আরে মশয়, পরিবার ছাড়া পুরুষ আর পাইলট ছাড়া প্লেন—সমান। কখন কোথায় গোঁৎ খাইয়া পড়ব, তার কিছু ঠিক আছে?'

নিজের রসিকতায় দুন্দুভিবাবু নিজেই দুন্দুভিনিনাদ করে হেসে উঠলেন। তারপর বললেন, 'ভেতরে চলেন। শ্রীমতী আর কতক্ষণ খাড়াইয়া থাকবেন।'

অচল গ্যারেজ খুলে গাড়ি তুলল। তারপর বন্ধ করে সদর দরজার দিকে এগোতে-এগোতে মোলায়েম গলায় নূপুরকে বললে, 'কই, এসো—।'

নারীজাতের জন্মগত সংস্কারের বশেই বোধহয় নূপুর আঁচলটা মাথায় তুলে দিল।

অচলের ফ্ল্যাট তেতলায়। দরজার সামনে এসে নূপুর বললে, 'ভয় করছে!'

অচল রাগতভাবে বললে, 'এখানে ভয়টা কীসের?'

'আপনার বাড়ির লোকজন—মানে, আপনার স্ত্রী যদি—।'

দরজা খুলে ঢুকে নূপুর বললে, 'ঝগড়া করে সত্যিই বাপের বাড়িতে গেছেন বুঝি?'

'কী বাজে বকছেন? মাথা নেই তার মাথা-ব্যথা! ভণ্ডুল চাকর ছাড়া কেউই এখানে থাকে না—তাও সন্ধের পর সে চলে যায়।'

নূপুর একটা স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়লে।

শোওয়ার ঘরটা দেখিয়ে অচল বললে, 'যান, শুয়ে পড়ুনগে; আমার ভীষণ খিদে পেয়েছে।'

'খাবার কোথায়? খাবেন কী?'

বসবার ঘরের একধারে ডাইনিং টেবিলের ওপরে ঢাকা দেওয়া খাবার দেখিয়ে অচল বললে, 'ভণ্ডুল যা রেখে গেছে।'

নূপুর সেদিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললে, 'একা-একা খেলে আপনাব পাপ হবে।'

'তার মানে?'

'আমার বুঝি খিদে পায় না? দুপুরেও আজ খাওয়া হয়নি!'

অচল দুই চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করে তাকিয়ে বললে, 'এইজন্যেই মেয়েদের আমি পছন্দ করি না! সব কিছুতেই তারা ভাগ বসাতে চায়;.গাড়ি করে আনব, আশ্রয় দেব, খেতে দেব—এতখানি দাসত্ব আমার পোষায় না।'

'আপনার পোষাতে হবে না, থাক।'

নূপুর শোওয়ার ঘরের দিকে এগোল।

অচল বললে, 'ওঃ, রাগটুকু আছে ষোলো আনা।'

নূপুর ততক্ষণে শোওয়ার ঘরের মধ্যে অদৃশ্য হয়েছে।

এ-ঘর থেকে অচল চেঁচিয়ে বললে, 'খাওয়ার ইচ্ছে থাকে তো টেবিলে এসে বসা হোক।'

অচল তোয়ালেখানা নিয়ে বাথরুমে ঢুকে গেল।

মিনিট পাঁচেক বাদে বেরিয়ে এসে দেখলে, নূপুর আসেনি। ভিজে মাথা মুছতে-মুছতে শোওয়ার ঘরে উঁকি মেরে দেখে, জানলার ধারে নূপুর পিছন ফিরে চুপ করে দাঁড়িয়ে। দরজার গোড়া থেকেই অচল হেঁকে বললে, 'সাধাসাধি করতে পারব না বলছি—আমার পেটে আগুন জ্বলছে।'

মুখ না ফিরিয়েই নূপুর জবাব দিলে, 'আপনি খেয়ে নিন।'

রেগে গিয়ে অচল বললে, 'আমি একা খেলে আপনার নজর লাগবে না? তারপর কলেরা হয়ে মরি আর কি!'

নূপুর হেসে ফেলে বললে, 'এই বয়েসেও নজর লাগার ভয়?'

অচল জোর দিয়ে বললে, 'নিশ্চয়ই। মেয়েদের নজর সাঙ্ঘাতিক।'

কী করে জানলেন? নূপুর বললে, 'আপনার ওপর নজর লেগেছিল বুঝি কখনও?'

'কখনও! অনবরত লাগছে—পথে-ঘাটে, সিনেমা-হোটেলে সর্বত্র। চলুন, খাওয়ার টেবিলে চলুন।'

সেই রাতেই—।

শহরের উত্তরাঞ্চলে এক জনবিরল পাড়ায় সেই উনিশশো উনত্রিশ সালের ফোর্ডগাড়িখানা হাঁসফাঁস করতে-করতে একখানা একতলা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। স্টিয়ারিং-এর সামনে লম্বা রোগাটে চেহারার স্যুট-পরা এক ব্যক্তিকে দেখা গেল। মুখে ধূমায়িত একটা প্রকাণ্ড বর্মা-চুরুট। কপালের দুই ভুরুর মাঝখানে বিরক্তির একটা বিছে যেন কামড়ে বসে আছে। তিরিক্ষে গলায় লোকটি বললে, 'নেমে পড়, জহর।'

জবাবে ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে বার দুয়েক আওয়াজ হল শুধু। লোকটি এবার পাশে তাকাল। জহর অঘোরে ঘুমোচ্ছে! মাথায় খাটো, স্থূলাকার—প্রকাণ্ড একটা বেলুনকে যেন স্যুট পরানো হয়েছে। সুখ-নিদ্রায় ভুঁড়িটা হাপরের মতো ওঠা-নামা করছে।

ফোর্ডগাড়ির চালক চাপা গর্জনে শুধু বললে, 'ক্যাডাভ্যারাস কুম্ভকর্ণ!'



তারপর মুখ থেকে ধূমায়িত চুরুটটা নামিয়ে সুখসুপ্ত জহরের নাকের নীচে ধরলে। পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যেই বিরাট একটা হাঁচির শব্দে ঝড়ঝড়ে ফোর্ডগাড়িখানা থরথর করে উঠল। চোখ রগড়ে জহর বলে উঠল, 'আঃ, চোখ বুজে একটা প্ল্যান ভাবছিলাম, দিলে সব ভেস্তে। কেন যে চুরুট খাস ভানু!'

তিরিক্ষে গলায় জবাব এল, 'থাম! রবার্ট ব্লেক চুরুট খেত, জানিস? ভালো গোয়েন্দা হতে গেলে ভালো চুরুট খেতেই হবে।'

ব্যক্তি দুটি কে, এতক্ষণে পাঠক নিশ্চয় চিনতে পেরেছেন? একজন বিখ্যাত ভানু গোয়েন্দা, অপরজন তার সহকারী জহর। বলা বাহুল্য দুজনেই শখের গোয়েন্দা। এতবড় দুই প্রতিভাকে সরকারি

গোয়েন্দা-বিভাগে রাখতে সরকার ভরসা করেনি।

আশ্চর্য এদের প্রতিভা, অত্যাশ্চর্য এদের বুদ্ধি। এমনকী এদের বাসস্থানটিও অদ্ভুত—লোহার শিক-লাগানো কয়েকটা জানলা ছাড়া বাড়িতে কোথাও দরজা নেই।

গ্যারেজে গাড়ি রেখে ভানু পকেট থেকে একটা টর্চ বের করে বাড়ির ছাদে আলো ফেললে। দেখতে-দেখতে মই নেমে এল। সেই মই বেয়ে উঠতে-উঠতে ভানু বললে, চোরই বল, আর আততায়ীই বল, ব্যাটারা ভারি জব্দ হয়েছে। বাড়িতে দরজাই তৈরি করিনি—আয়, কোথা দিয়ে আসবি!

জহর গদগদ হয়ে বললে, 'সত্যি, কী ব্রেন তোর, ভানু!'

দুজনে ছাদে ওঠার পর মইখানা টেনে নেওয়া হল। যে লোকটি টেনে নিল, সে হচ্ছে ভানুর বিশ্বস্ত চাকর ঘণ্টাকর্ণ।

ভানু বললে, 'আর এই ঘণ্টাকে রেখেছি কেন, জানিস?'

জহর বললে, 'কেন?'

'বুঝতে পারলি না? ঘণ্টা হচ্ছে বোবা এবং কালা—আমাদের প্ল্যান বা গুপ্ত-খবর কিছুতেই শত্রুপক্ষকে জানাতে পারবে না।'

বিগলিত হয়ে জহর বলে উঠল, 'ওঃ, তুই শার্লক হোমসের ওপরে গেছিস, ভানু!'

ছাদের মাঝখানে আংটা লাগানো লোহার একখানা চৌকো পাত। ভানু আংটা ধরে টানতে পাতটা সিন্দুকের ডালার মতো উঠে এল—ভেতরে একসারি সিঁড়ি। দুজনে নেমে গেল। তাদের পিছনে নামল ঘণ্টাকর্ণ। সঙ্গে-সঙ্গে বন্ধ হয়ে গেল চৌকো লোহার দরজা।

খাওয়া-দাওয়ার পর নতুন একটা চুরুট ধরিয়ে চিন্তিত-মুখে ভানু বললে, 'এখন কী করা যায়?'

হাতের আড়াল দিয়ে প্রকাণ্ড একটা হাই তুলে জহর বললে, 'ঘুমোনো যাক।'

চুরুটটা দাঁতে চেপে ভানু বলে উঠল, 'রাবিশ! এতবড় একটা কেস হাতে ঝুলছে, আর তুই বলছিস ঘুমোতে! গোয়েন্দার চোখে ঘুম আসে? রবার্ট ব্লেক মাসে ক'রাত্তির ঘুমোত, জানিস? মোটে দু-রাত্তির!'

অমায়িক হেসে জহর বললে, 'রাগ করছিস কেন?'

পকেট থেকে একমুঠো রাংতা-মোড়া চকোলেট বের করলে জহর। একটা মুখে ফেলে দিয়ে বললে, 'এই চকোলেটগুলোতে কী মিশিয়েছি জানিস?'

'কী?'

'অ্যান্টি স্লিপিং ডোজ। ঘুম তাড়াবার ওষুধ। ব্যস, আর ঘুম আসবে না।'

ভানু টেবিলের ড্রয়ার থেকে খবরের কাগজের একটা কাটিং বের করে আনলে। কাগজের অংশটুকুতে অল্পবয়সি একটি সুরূপা মেয়ের ছবি ছাপা। ছবির নীচে যা লেখা, ভানু সেটা পড়ল। এইবার নিয়ে তিয়াত্তরবার পড়া হল।

নূপুর চ্যাটার্জি নামে বছর একুশ-বাইশের একটি মেয়ে দিল্লি হইতে নিখোঁজ হইয়াছে। রং চৌদ্দ ক্যারেট সোনার ন্যায় গৌর, দোহারা গড়ন, উচ্চতা পাঁচ ফুট তিন ইঞ্চি, চিবুকের ডানদিকে তিল, বাম ভুরুতে ঈষৎ কাটার দাগ।

জীবিত বা মৃত ধরিয়া দিতে পারিলে নগদ পঁচিশ হাজার টাকা পুরস্কার।

ডাঃ দিগম্বর চ্যাটার্জি,
দরিয়াগঞ্জ, দিল্লি

জহরের সামনে কাগজের কাটিংটা ধরে ভানু বললে, 'ভালো করে দেখ তো এই মেয়ে কি না।'

ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বার কয়েক দেখে জহর গম্ভীর মুখে বললে, 'শিওর অ্যান্ড সার্টেন।'

ভানু প্রশ্ন করলে, 'তা হলে একেই তুই রেনবো কাফেতে দেখেছিলি?'

'শিওর অ্যান্ড সার্টেন।'

'কী দেখেছিলি, ঠিক করে বল তো।'

'তেইশবার বলা হয়ে গেছে, এইবার নিয়ে চব্বিশবার হবে। হগ মার্কেটের পাশে তোর গাড়িখানা রেখে তুই নেমে গেলি শার্লক হোমসের বই কিনতে, আর আমি ঢুকলাম রেনবো কাফেতে কবিরাজি কাটলেট খেতে। ফার্স্ট ক্লাস বানায় ওরা। চোখ বুজে গোটা কাটলেটটা সবে মুখে পুরেছি, এমন সময় খিঁক করে একটা আওয়াজ কানে এল। চোখ মেলে দেখি, সামনের টেবিলে...ওঃ, সে কী বলব ভানু—একখানা বিউটি!'

ধমকে উঠল ভানু, 'রাখ তোর বিউটি! কী হল বল।'

জহর বলতে লাগল, 'দেখলাম, খান কয়েক স্যান্ডউইচ আর এককাপ কফি নিয়ে বসে নীল শাড়ি-পরা একটি মেয়ে আমার দিকে তাকিয়ে খিঁক-খিঁক করে হাসছে। দেখে ভাই, কাটলেট চিবোতে ভুলে গেলাম।'

'ভুলে গেলি!'

'গেলাম। মনে হল, মুখখানা চেনা-চেনা, দেখা-দেখা; তাড়াতাড়ি পকেট থেকে এই কাটিংটা বের করে মিলিয়ে দেখি, এই তো পলাতকা নূপুর চ্যাটার্জি!'

'ঠিক দেখলি?'

'শিওর অ্যান্ড সার্টেন।'

'চিবুকের ডানদিকে তিল ছিল?'

'বোধহয়।'

'বাঁ-ভুরুতে কাটার দাগ?'

'হয়তো।'

তিরিক্ষে গলায় ভানু উঠল, 'বোধহয়! হয়তো! তবে শিওর অ্যান্ড সার্টেন কী দেখলি?'

থতমত খেয়ে জহর বললে, 'তার বিউটি।'

'রাবিশ! বল তারপর কী হল।'

'আমাকে একবার কাটিং-এর দিকে, একবার তার দিকে চাইতে দেখে, মেয়েটা—মানে নূপুর চ্যাটার্জি, চট করে ঘুরে বসল, আর আড়ে-আড়ে চাইতে লাগল আমার দিকে।'

'তুই তখন কী করলি?'

'কাটলেটখানা কোঁৎ করে গিলে ফেলে, আমি তক্ষুনি তোকে ডাকতে গেলাম। ফিরে এসে দেখি, শুধু দেড়খানা স্যান্ডউইচ আর আধকাপ কফি পড়ে আছে—নীলবসনা সুন্দরী হাওয়া!'

দাঁতে চুরুট চেপে ভানু বলে উঠল, 'ইস, কী চান্সই মিস করলি! আমাকে ডাকতে না গিয়ে মেয়েটাকে কিছুক্ষণ আটকে রাখতে পারলি না?'

'কী করে আটকাব?'

'কী করে আবার! আলাপ জমিয়ে।'

'তাই ভেবেছিলাম; কিন্তু বলব কী ভাই, মেয়েটাকে দেখা-ইস্তক আমার বুকের ভেতর, ''কাম সেপ্টেম্বরের'' মিউজিক বাজছিল।'

রাগে ভানু প্রায় চিৎকার করে উঠল, 'থাম! ক্যাডাভারাস কোথাকার!'

কাঁচুমাচু মুখে জহর বললে, 'রাগ করছিস কেন? আমার কপালই মন্দ।'

'তারপর?'

'তারপর রেনবো কাফে থেকে বেরিয়ে মেয়েটাকে রাস্তায় খুঁজতে বেরোলাম। আমায় দেখেই সে ছুটে একটা প্রাইভেট মোটরে উঠে পড়ল। আমার ভুঁড়ির ওয়েট বেশি, তাই তোকে বললাম গাড়ি চালিয়ে ফলো করতে, কিন্তু তোর গাড়ি আর স্টার্ট নেয় না। যদি বা স্টার্ট নিল, চলতে চায় না। আর যদি বা চলল, দু-ফার্লং গিয়েই হেঁপো রুগির মতো হাঁপাতে লাগল। ততক্ষণে নূপুর চ্যাটার্জি হাওয়াগাড়ি চেপে আবার হাওয়া।'

ভুরু কুঁচকে ভানু প্রশ্ন করলে, 'গাড়ির নম্বরটা নিয়েছিস?'

'শিওর। ব্লেকের যেমন স্মিথ, ভানু গোয়েন্দার তেমনি জহর অ্যাসিস্ট্যান্ট।'

'কত নম্বর?'

'০১০৯।'

এতক্ষণে ভানুর কোঁচকানো ভুরু সরল হল। খুশি-খুশি মুখে বললে, 'সে তো বিখ্যাত গায়ক অচল মুখার্জির গাড়ি। যাক, একটা ক্লু পাওয়া গেল। ডাঃ দিগম্বর চ্যাটার্জির পঁচিশ হাজার টাকা আমাদেরই কপালে নাচছে রে, জহর। পঁচিশ হাজার টাকা। অর্ধেক রাজত্ব বললেই হয়!'

গদগদ হয়ে জহর বললে, 'অর্ধেক রাজত্ব তুই নিস, ভানু, রাজকন্যাটি যেন আমার ভাগ্যে পড়ে।'

চুরুটটা মুখ থেকে নামিয়ে ভানু বললে, 'রাজকন্যার শখ! হিপোপটেমাসের মতো ওই ভুঁড়ি নিয়ে!'

সলজ্জভাবে জহর বললে, 'কেন, পাত্র হিসেবে আমি কি মন্দ? দিনকতক ডায়েটিং করে ভুঁড়িটা না হয় কমিয়ে ফেলব।'

চুরুটটা আবার দাঁতে চেপে ভানু বললে, 'হোপলেস!'

ঠিক সেই সময় খাওয়ার টেবিলে বসে নূপুর চ্যাটার্জি ওই একই কথার পুনরুচ্চারণ করলে, 'হোপলেস।'

'কী?'

'রান্না।'

একটা সিগারেট ধরাতে-ধরাতে অচলকুমার বললে, 'অথচ খাবারের ডিশগুলো তো চেটেপুটে আরশি বানিয়ে ফেলেছেন দেখছি! মেয়েরা এমনই অকৃতজ্ঞ বটে! পথ থেকে এনে আশ্রয় দিলাম, নিজের ভাগ থেকে খেতে দিলাম, প্রতিদানে শুধু নিন্দে!'

'বেশ, প্রতিদানে কাল আমি রান্না করে খাওয়াব!'

হাত-জোড় করে অচল বলে উঠল, 'রক্ষে করুন। মেয়েদের পলিসি আমার জানা আছে। প্রথমে রাঁধুনি হতে চায়, তারপর গিন্নি।'

হেসে ফেলে নূপুর বললে, 'তাও জানেন? মেয়েদের বিষয় আপনার অসীম জ্ঞান দেখছি! কিন্তু আমার দিক থেকে সে ভয় নেই!'

বিরস মুখে অচল বললে, 'মেয়েদের বিশ্বাস কী?'

'আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন না?'

'না।'

'কেন?'

'আপনি সাংঘাতিক সুন্দরী। আমার ভয় করে।'

'মেয়েদের সঙ্গে কথা বলতেও শেখেননি।' —মুখ লাল করে নূপুর উঠে পাশের ঘরে চলে গেল।

অচলের মুখের ওপর দড়াম করে দরজা বন্ধ হওয়ার আওয়াজ শোনা গেল শুধু। সেদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে, অচল উঠে গিয়ে একটা সোফার ওপর আড় হল।

দুই

আচমকা কলিংবেলটা ঘুমন্ত কানে যেন ঠাস করে চড় মারলে।

মুখময় রাজ্যের বিরক্তি নিয়ে সোফার ওপর অচল ওপাশ ফিরে শুল। কিন্তু কী জ্বালা, কলিংবেলটা আবার তারস্বরে ডাকাডাকি শুরু করল।

অগত্যা উঠতেই হল অচলকে। জানলাটা খুলে দিতেই ভোরের আলো যেন হাসি মুখে গুডমর্নিং জানালে। কিন্তু অচলের বিরক্তি বেড়েই গেল। ইস, সবেমাত্র ভোর! আরও ঘণ্টাখানেক দিব্যি ঘুমিয়ে নেওয়া যেত। কোন হতভাগা এল কে জানে। নিশ্চয় ইনসমনিয়ার রুগি। নইলে, কাক ডাকার আগে কেউ ভদ্রলোকের বাড়িতে ডাকাডাকি করে!

কোঁচকানো ভুরু আর ঘুম-জড়ানো রাঙা চোখ নিয়ে অচল ফ্ল্যাটের দরজাটা খুলে দিলে। আর সঙ্গে-সঙ্গে তার চোখ থেকে ঘুম ছেড়ে গেল।

বিচিত্র দুটি মূর্তি দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে। একজন লম্বাটে লিকলিকে, আরেকজন খাটো ভুঁড়িদার। দুজনেরই পরনে স্যুট। একজনের ঢলঢলে, আরেকজনের আঁটো-সাঁটো ফাটো-ফাটো। একজনের চোখে তিরিক্ষে চাউনি, আরেকজনের মুখে কান-এঁটো-করা হাসি।

দুরকম আওয়াজে দুজনেই একসঙ্গে বলে উঠল, 'নমস্কার!'

অচলের কাছ থেকে ভারী গলায় প্রত্যুত্তর এল, 'নমস্কার।'

লম্বাটে বললে, 'আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এলাম। চলুন, বসা যাক।'

নেহাত ভদ্রতার খাতিরে অচলকে দরজা ছেড়ে ভেতরে সরে দাঁড়াতে হল। আগন্তুক দুজন ঘরে ঢুকে সোফায় বসলে।

লম্বাটে বললে, 'ভালো আছেন তো?'

সঙ্গে-সঙ্গে অমায়িক হেসে খাটো বললে, 'ভালো ঘুম হয়েছে?'

অচলের সর্বাঙ্গ রি-রি করে উঠল। চেপে গিয়ে শুধু বললে, 'হুঁ। কী চাই আপনাদের?'

লম্বাটে একটা চুরুট ধরিয়ে বললে, 'একটা কথা আছে আপনার সঙ্গে।'

সঙ্গে-সঙ্গে খাটো যোগ করলে, 'প্রাইভেট!'

'আমার সঙ্গে?' —অচলের মুখে বিস্ময় প্রকাশ পেল।

'ইয়েস জেন্টলম্যান, আপনারই সঙ্গে।' —লম্বাটে বললে।

খাটো হাসি-হাসি মুখে বললে, 'আপনিই তো বিখ্যাত গাইয়ে অচল মুখার্জি? আপনার গান—।'

এতক্ষণে বোমার মতো ফেটে পড়ল অচল, 'গান! হবে না—পারব না—গাইব না। টাকা দিলেও গাইব না। জলসা আর ফাংশন, ফাংশন আর জলসা করে-করে আমার দিনে খাওয়া নেই, রাতে ঘুম নেই—লাইফ মিজারেবল। আমার কাশি হয়েছে, ফ্যারেঞ্জাইটিস হয়েছে, ব্লাডপ্রেসার বেড়েছে! যান, আপনারা আসুন।'

অচল দম নিতেই খাটো বিরাট একটা নিশ্বাস ফেলে বললে, 'ডেঞ্জারাস! গানের নাম শুনে একেবারে মেশিনগান চালিয়ে দিলেন।'

লম্বাটে তার গলাকে কিছুটা মোলায়েম করবার চেষ্টা করে বললে, 'আপনি বৃথা চটছেন, জেন্টলম্যান, গানের জন্যে আমরা আসিনি এসেছি অন্য একটা ব্যাপারে।'

'অন্য ব্যাপার! কী?'

'প্রাইভেট ডিটেকটিভ ভানু-গোয়েন্দার নাম শুনেছেন?'

'শুনেছি।'

'দেখেছেন?'

'না।'

নিজের বুকে আঙুল ঠেকিয়ে ভানু সগর্বে বললে, 'এই দেখুন।'

হাসি-হাসি মুখে জহর বলে উঠল, 'আর এই দেখুন, ওর অ্যাসিস্ট্যান্ট জহর।'

অচলের ঠোঁট দুটো ইঞ্চিখানেক ফাঁক হয়ে গেল। সেই অবস্থায় সেকেন্ড কয়েক থেকে বললে, 'কিন্তু আমার এখানে গোয়েন্দা কেন?'

সোফায় আরাম করে হেলান দিয়ে ভানু বললে, 'সেটা আপনিই বুঝে দেখুন।'

'তার মানে? কী বলতে চাইছেন?'

আবার সোজা হয়ে বসল ভানু। চতুর গোয়েন্দার মতো চতুর চোখে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, 'মিস নূপুর চ্যাটার্জিকে চেনেন নিশ্চয়?'

এক মুহূর্তের জন্যে অচলের দেহের রক্তস্রোত সত্যিই অচল হয়ে গেল। এক মুহূর্তের মধ্যেই অচলের মনে সন্দেহ, আশঙ্কা, আতঙ্ক প্রভৃতি নানা উৎকট ভাবের খিচুড়ি পাকিয়ে গেল। কিন্তু নিজেকে সামলে নিলে অচল। মুখ-চোখে যতটা সম্ভব বিস্ময় ফুটিয়ে বলে উঠল, 'নূপুর চ্যাটার্জি! কই, না।'

'চেনেন না?'

'আজ্ঞে না। কে তিনি?'

'দিল্লির ডাক্তার দিগম্বর চ্যাটার্জির মেয়ে।'

জহর যোগ করল, 'পরমাসুন্দরী।'

অচল বললে, 'আমি কলকাতার মানুষ। ব্যাচিলার। মেয়েছেলেই আমার ধাতে সয় না, তায় আবার দিল্লিওয়ালি! ভুল হয়েছে আপনাদের।'

ভানুর মুখখানা আবার তিরিক্ষে হয়ে উঠল। চিমনির মতো চুরুটের ধোঁয়া ছেড়ে বললে, 'মিথ্যে লুকোবার চেষ্টা করবেন না, অচলবাবু, আমি সব জানি।'

ঘাবড়ে গেল অচল। বললে, 'জানেন! কী জানেন?'

'যা ঘটেছে। নূপুর চ্যাটার্জি এবং আপনি পরস্পরের "লভে" পড়েন। কিন্তু ডাক্তার দিগম্বর আপনাদের বিবাহে আপত্তি করায় মেয়েটি দিল্লি থেকে পালিয়ে আসে এবং আপনি তাকে এখানে লুকিয়ে রেখেছেন। কেমন, ঠিক কি না?'

অচল বললে, 'বাঃ, দিব্যি একখানা উপন্যাসের প্লট বানিয়ে ফেলেছেন তো।'

ভানু এবার প্রায় ধমকে বললে, 'অস্বীকার করতে পারেন, গত রাত্রে এক নীলবসনা সুন্দরীকে নিয়ে আপনি মোটর হাঁকিয়ে পালাচ্ছিলেন?'

উত্তরে অচল শুধু বললে, 'মাথা খারাপ!'

ভানু এবার সোফা থেকে সোজা উঠে এল অচলের সামনে। একচোখ ছোট করে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে রইল তার দিকে। তারপর বললে, 'ভানু-গোয়েন্দার চোখে ধুলো দেওয়া সহজ নয়, জেন্টলম্যান! রবার্ট ব্লেককে আমি গুলে খেয়েছি। ভালোয়-ভালোয় নূপুর চ্যাটার্জিকে বের করে দিন।'

'বের করে দেব, মানে?' —অচল এবার রাগ দেখিয়ে বললে, 'আপনাদের কি ধারণা, আমি তাকে ট্যাঁকে গুঁজে রেখেছি?'

গম্ভীর মুখে ভানু বললে, 'ট্যাঁকে নয়, আপনার এই ফ্ল্যাটে।'

জহর যোগ করলে, 'শিওর অ্যান্ড সার্টেন।'

অচল বললে, 'কেন ঝামেলা করছেন, স্যার ? হারমোনিয়াম আছে, তানপুরা আছে, কিন্তু নূপুর-টুপুর এখানে নেই।'

'নেই ?'

'আজ্ঞে না।'

কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে একটা অভাবনীয় কাণ্ড ঘটে গেল। পাশের ঘর থেকে সরু মিষ্টি মেয়েলি গলার গান ভেসে এলঃ

'এ-দিন আজি কোন ঘরে গো খুলে দিল দ্বার!
আজি প্রাতে সূর্য ওঠা সফল হল কার ?'

মুগ্ধ হয়ে গেল অচল। তারপরেই নিমেষে হিম হয়ে গেল তার রক্ত! সব মাটি করে দিলে বুঝি নূপুর, বজ্জাত মেয়েটা গান গাইবার আর সময় পেল না!

আর, গান শুনতে-শুনতে ভানুর তিরিক্ষে মুখে একটু-একটু করে সন্দেহের ছায়া দেখা দিল। একটা চোখ ছোট করে প্রশ্ন করলে, 'কে গায় ?'

মরিয়া হয়ে অচল বলে ফেলল, 'রেডিও।'

হাসি-হাসি মুখে জহর বলে উঠল, 'কেন ব্লাফ দিচ্ছেন, স্যার ? স্পষ্ট বুঝতে পারছি পাশের ঘরে খোশমেজাজে কে গাইছেন!'

'পাশের ঘরটা আমরা সার্চ করব।'—ভারী গলায় ভানু বললে।

অচলের হৃৎপিণ্ডটা একবার লাফিয়ে উঠেই স্থির হয়ে গেল। তার মুখ দিয়ে শুধু বেরুল, 'স্—স্—সার্চ!'

'ইয়েস জেন্টলম্যান, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, পাশের ঘবে যিনি গাইছেন, তিনি নূপুর চ্যাটার্জি ছাড়া আর কেউ নন।'

'আঃ, বলছি রে—রে—রেডিওতে গান হচ্ছে!'

'বেশ তো, দেখাই যাক না কে গাইছে।'

শোওয়ার ঘরের দরজার দিকে ভানু এগোল। সঙ্গে-সঙ্গে স্প্রিংয়ের মতো লাফ দিয়ে দরজা আগলে দাঁড়াল অচল। তার মনের পরদায় সিনেমাব 'মনতাজের' মতো পরপর কতকগুলো ছবি খেলে যাচ্ছে—থানা, পুলিশ, আদালত, খবরের কাগজে বড়-বড় হেডলাইন! যেন বিকারের ঘোরে সে চেঁচিয়ে উঠল, 'খবরদার, এ-ঘরে ঢুকেছেন কি একটি ঘুষিতে নক-আউট!'

ভীষণ চমকে উঠে জহর বললে, 'নক-আউট!'

'আলবত! সাড়ে তিন বচ্ছর আমি বকসিং লড়েছি—এই দেখুন আমার বাইসেপ!'

অচলের চওড়া হাতের দিকে তাকিয়ে জহর বললে, 'বকসিং আমরাও জানি, কিন্তু লড়ব না। চলে আয়, ভানু।'

ভানু বললে, 'অলরাইট! গুডবাই!'

কিন্তু এক পলকের মধ্যে দুজনের চোখে চোখে কী যে ইশারা হল, জহর দু-হাত দিয়ে বুক চেপে ধরে কাতরে উঠল, 'ওঃ!'

তারপর প্রচণ্ড হাঁপাতে-হাঁপাতে বসে পড়ল সোফার ওপর।

হতভম্ব হয়ে অচল [illegible] [illegible] হল?'

'[illegible]রোনার।' —ভানু উত্তর দিলে।

রীতিমতো ঘাবড়ে গেল অচল। বললে, 'বলেন কী! বলেন কী! মরে যাবে নাকি?'

রুমাল নেড়ে জহরকে বাতাস-করতে কর্রতে ভানু বললে, 'যেতেও পারে। নারীর কথা শুনলেই

ওর করোনারি অ্যাটাক হয়। ঠান্ডা জল আছে? শিগগির এক গেলাস জল দিন—।'

দরজা ছেড়ে অচল প্রায় ছুটে গেল ঘরে জলের সোরাইয়ের কাছে। আর সেই সুযোগে ভানু হুড়মুড় করে ভেজানো দরজা ঠেলে ঢুকে গেল পাশের ঘরে। ভানুর পিছু-পিছু করোনারি অ্যাটাক ভুলে জহর এবং জলের সোরাই ফেলে দুজনের পিছু-পিছু অচল।

আশ্চর্য, ঘরে কেউ নেই! জানলার পাশে ঝকঝকে রেডিওগ্রামটা যেন হাসছে। গান চলেছে ঃ

'বনে বনে ফুল ফুটেছে, দোলে নবীন পাতা,
কার হৃদয়ের মাঝে হল তাদের মালা গাঁথা।'

ভানু আর জহর একবার পরস্পরের দিকে তাকালে, তারপর আস্তে-আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আর, বিস্ময়ে হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল অচল। কী আশ্চর্য, গেল কোথায় নূপুর?

কিন্তু যায়নি সে কোথাও। গানটা হঠাৎ থেমে গেল, আর ওয়ার্ডরোবের পাল্লা ঠেলে বেরিয়ে এসে নূপুর চাপা গলায় প্রশ্ন করলে, 'গেছে?'

তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল অচল। তেতো গলায় বললে, 'কী, ভেবেছেন কী? আমি মরছি গোয়েন্দার ভয়ে, আর আপনার প্রাণে গানের ফোয়ারা!'

নূপুর ভয়ে-ভয়ে বললে, 'বিশ্বাস করুন, ওরা যে গোয়েন্দা, আমি প্রথমে জানতেই পারিনি। জানলে কি গাইতাম? আর, আপনি বললেন, রেডিওতে গান হচ্ছে। হঠাৎ গান থামালে ওদের সন্দেহ বাড়ত না?'

অচল একটু খুশি হল। নাঃ, খোট্টার দেশের মেয়ে হলে কী হয়, বুদ্ধি আছে!

নূপুর বললে, 'ওয়ার্ডরোবের ফাঁক দিয়ে আমি ওদের দেখেছি। ওই ঢ্যাঙা আর বেঁটে লোক দুটোই কাল রাত্তিরে আমার পিছু নিয়েছিল।'

'কিন্তু ওরা যা বলে গেল, তা সত্যি?'

'কী বলে গেল?'

'আপনি দিল্লির ডক্টর দিগম্বর চ্যাটার্জির মেয়ে। বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছেন?'

নূপুর বললে, 'সত্যি।'

'কিন্তু কেন?'

চুপ করে রইল নূপুর। অচল আবার বললে, 'পালিয়ে এলেন কেন বলুন।'

'বিয়ের ভয়ে।'

'বিয়ের ভয়ে! চালাকি পেয়েছেন? বিয়ে করতে মেয়েরা আবার ভয় পায় কবে? ভয় তো পুরুষরাই পায়।'

শুকনো মুখে নূপুর বললে, 'মেয়েরাও ভয় পায়—আমার মতো বর জোটে যাদের।'

'তার মানে?' —অচল একটু উৎসুক হয়ে বললে, 'কেমন বর জুটেছিল আপনার? উড়িয়া, না কাবলিওয়ালা?'

'বাঙালি।'

'তবে ভয় পেলেন কেন? বাঙালি স্বামীরাই তো আসলে বউ। শুধু মেটারনিটি হোমে যায় না, এই যা। কানা-খোঁড়া ছিল বুঝি পাত্রটি?'

'না।'

'তবে কেন পছন্দ হল না শুনি?'

নূপুর কাঁদো-কাঁদো হয়ে বললে, 'একটা শিম্পাঞ্জিকে কারও পছন্দ হয়?'

চমকে উঠে অচল বললে, 'বলেন কী! শিম্পাঞ্জিরা আজকাল বাঙালি মেয়েদের বিয়ে করতে চাইছে! ওরা বাঙলা সিনেমা দেখছে বুঝি?'

নূপুর এবার মুখ ভারী করে বললে, 'জানি না। মেয়েদের বিপদে ছেলেরা বেশ মজা পায় দেখছি।'

অচল একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেল। বললে, 'সরি! আপত্তি না থাকে তো ব্যাপারটা পরিষ্কার করে বলুন। বিপদটা আপনার কোথায় ঠিক বুঝতে পারছি না।'

উদাস চোখে জানলার বাইরে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে নূপুর বলতে শুরু করল ঃ

ছোটবেলা থেকেই আমি দিল্লিতে মানুষ হয়েছি। মা নেই, বাবা দিগম্বর চ্যাটার্জি আরউইন হসপিটালের নাম-করা সার্জন। আমাকে তিনি ভালোবাসতেন খুবই, তবে রাশভাবি লোক বলে মুখে প্রকাশ ছিল না। আমাকে দেখাশুনা করার জন্যে আয়া ছিল। রোজ রাতে বাড়িতে ফিরে বাবা আয়ার কাছে খবর নিতেন আমি ঠিক সময়ে খেয়েছি কি না, ঠিকমতো পড়াশুনা করেছি কি না, আমার জন্যে কী-কী জিনিস চাই। কিন্তু আমাকে কোনওদিনও জিগ্যেস করতেন না। আমার সুখ-সুবিধের জন্যে তিনি এত খরচ করতেন যে কোনও সাধারণ বাপ তা কবে না। অথচ সেই স্নেহশীল মানুষ হঠাৎ যেন—।

উদ্গত একটা দুঃখের আবেগকে সামলে নিলে নূপুর। তারপর আবার শুরু করল ঃ সিনিয়ার কেম্ব্রিজ পরীক্ষা সবে দিয়েছি, মনে আমার তখন অনেক স্বপ্ন, অনেক কল্পনা। এমনসময় একদিন পানুমামা—মানে আমার ছোটমামা আমাকে বললে, 'তোর বিয়ে বে, নূপুর!'

শুনে আকাশ থেকে পড়লাম। ভেবেছিলাম সিনিয়ার কেম্ব্রিজ পাশ করে ইয়োরোপ ট্যুরে বেরোব। জীবনটাকে আর দশটা বাঙালি মেয়ের মতো মামুলি ছবির মতো মামুলি ফ্রেমে বাঁধিয়ে ছোট একখানা ঘরের মধ্যে টাঙিয়ে রাখব না। তাই বিয়ের কথাটা ভাবিইনি কখনও।

অচল গম্ভীর হয়ে বললে, 'না ভাবাই ভালো। বিয়ে একটা ন্যাস্টি প্রথা। সাধ করে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘরে এনে ঢোকানো। তারপর বলুন।'

নূপুর বলতে লাগল ঃ পানুমামা যখন আমাকে বললে, 'তোব বিয়ে রে, নূপুর', তখন চমকে গেলাম। তবু মনে-মনে কোথায যেন একটা বঙিন স্বপ্ন ঘনিযে উঠতে লাগল। অনেক আলো, রসুনচৌকি, ফুল দিয়ে সাজানো প্রকাণ্ড মোটরে রূপকথার রাজপুত্র—।

অচল বলে উঠল, 'এবং দু-দিন বাদেই দাম্পত্য-জীবনের সেই ফুল দিয়ে সাজানো মোটর গাড়ির টায়ার পাংচার। আর স্বামী-স্ত্রী দুজনেই গাড়ি ঠেলতে-ঠেলতে গলদঘর্ম। এই তো রঙিন স্বপ্নের পরিণাম! ছোঃ! যাকগে, কুমাবী-সমাজ চিরকালই নির্বোধ।'

নূপুর এবার চটে গেল। বললে, 'কুমার ছাড়া কুমারীদেব বিযে হয়? নির্বোধ বলতে হয়, দু-দলকেই বলুন।'

অচল একটু থতিয়ে গিয়ে বললে, 'বেশ, তাই। এখন বলুন।'

নূপুর আবার শুরু করলে, 'বিয়ের কথা শুনে সব মেয়ের যা হয়, আমারও তাই হল। মনের মধ্যে যে-ভাবটা বেশি প্রবল হয়ে উঠল, সেটা কৌতূহল।'

অচল মন্তব্য করলে, 'ওটা মেয়েদের স্বভাব-দোষ। তারপর?'

নূপুর বলতে লাগল ঃ পানুমামার বয়েস চল্লিশের কাছাকাছি হলেও অনেকটা আমার বন্ধুর মতো। তাই জিগ্যেস করলাম, 'বর কেমন পানুমামা?'

পানুমামা তার ফ্রেঞ্চকাট দাড়িতে হাত বুলিয়ে তৎক্ষণাৎ জবাব দিলে, 'ফার্স্ট ক্লাস। জামাইবাবু বেছে-বেছে তোর জন্যে যে বর ঠিক করেছে, গ্র্যান্ড!'

মনটা খুশি-খুশি হয়ে উঠল। জিগ্যেস করলাম, 'দেখতে কেমন?'

পানুমামা বললে, 'দিব্যি।'

'মাথায় বেশ লম্বা তো?'

'হ্যাঁ, অ্যাভারেজ বাঙালির তুলনায় লম্বাই বলতে হয়। সাড়ে চার ফুটের কাছাকাছি।'

'সেকি! আমি যে পাঁচ ফুট তিন ইঞ্চি! গায়ের রং?'

'রং? রংটা অবিশ্যি ফরসা নয়। মানে কালো রঙের সোয়েটার পরলে মনে হয় খালি গায়ে আছে। তবে ব্যাটাছেলের রঙে কী আসে-যায় বল?'

বুকের ভেতরটা কেমন করে উঠল। আমার বর হবে বেঁটে কালো। জিগ্যেস করলাম, 'নাক মুখ চোখ?'



পানুমামা জবাব দিলে, 'অনবদ্য। জামাইবাবুর সিলেকশন কি যা-তা ভেবেছিস? ছোটবেলায় বকসিং শিখতে গিয়ে ছোকরার নাকটা চেপটে গেছে বটে, কিন্তু তার ফলে একটা আশ্চর্য ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠেছে। আর, চোখ দুটোর গুণ কী জানিস? একই সঙ্গে দু-দিকে দুটো জিনিস দেখতে পায়।'

বুক ঠেলে কান্না উঠে এল। তবু চেপে জিগ্যেস করলাম, 'ঠাট্টা করছ বুঝি?'

জিভ কেটে পানুমামা বলে উঠল, 'ছি, ছি! সে সম্পর্ক তোর বাবার সঙ্গে, তোর সঙ্গে নয়।'

মাথাটা ঘুরছিল। কোনওমতে বললাম, 'এমন পাত্রটি কোত্থেকে জুটল? নাম কী?'

পানুমামা তার ফ্রেঞ্চকাট দাড়িতে আর একবার হাত বুলিয়ে বললে, 'নামটা ঠিক—দাঁড়া, দাঁড়া, মনে পড়েছে। গোলকবিহারী, না ঢোলকবিহারী গোছের কিছু একটা হবে। যাই বলিস, নামটার মধ্যে ভারতীয় ঐতিহ্য কিন্তু বজায় আছে।'

আমি যেন বোবা হয়ে গিয়েছিলাম। পানুমামা বলেই যাচ্ছিল, 'তোর কপাল ভালো রে, নূপুর! ছেলে একেবারে কমল-হীরের টুকরো। ইস্কুল-টিস্কুলে বেশিদূর পড়েনি বটে, তবে কমার্সে আশ্চর্য মাথা। বিরাট ব্যবসা আছে রেড়ির তেলের। নিখিল-ভারত রেড়ি-উৎপাদক সমিতির সম্পাদক। হেঁজিপেঁজি লোক নয়, রীতিমতো মানী—।'

আর শুনতে পারছিলাম না। পানুমামার ফ্রেঞ্চকাট দাড়িওয়ালা মুখখানা দেখতে-দেখতে একটা রামছাগলের মুখে পরিণত হয়ে গেল। আর মনে হল, শিং উঁচিয়ে যেন আমাকে তেড়ে আসছে। আমি ছুটে পালিয়ে গেলাম।

চোখ বুজে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল নূপুর। যেন রামছাগল সদৃশ ফ্রেঞ্চকাট দাড়িওয়ালা পানুমামার মুখখানা দেখতে পাচ্ছে এখনও।

তার থমথমে বিষণ্ণ মুখের পানে তাকিয়ে অচলও কিছু মন্তব্য করলে না। একটু কাশলে শুধু।

নূপুর চোখ মেলে তাকাল। তারপর আবার শুরু করল ঃ সারাটা দিন আমার কেঁদে আর ভেবে কাটল। এত দুঃখের মধ্যেও একটা আশা উঁকি দিতে লাগল যে, বাবাকে আমি মুখ ফুটে বললে এ-পাত্র তিনি ক্যানসেল করে দেবেন নিশ্চয়। ভালো তো বাসেন আমাকে। কিন্তু দুনিয়ায় এত ছেলে থাকতে ওই বিদঘুটে গোলকবিহারী না ঢোলকবিহারীকে বাবার পছন্দ হল কেন ভেবে পেলাম না। বাবার রুচির ওপর শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেললাম।'

রাতে হসপিটাল থেকে বাবা ফিরলেন। রামধনিব বদলে আজ আমিই তাঁর কফি নিয়ে গেলাম। বাবা একবার তাকিয়ে বললেন, 'রামধনি কোথায়? কাজ ছেড়ে দিয়েছে?'

'না।'

'তবে তুমি কেন?'

'একটা কথা আছে।'

'বলতে পারো।'

লজ্জা-সংকোচ-ভয় সব মিলিয়ে বুকের ভেতবটা আমার দুরুদুরু কবছিল। সাহসে ভর করে বললাম, 'পানুমামা বলছিলেন আমাব নাকি—।'

'হ্যাঁ, তোমার বিয়ে। (বাবার স্বভাবগম্ভীর মুখখানা জীবনে এই প্রথম হাসি-হাসি দেখলাম) অনেক খুঁজে অত্যন্ত ভালো একটি ছেলে পেয়েছি। দেখতে শুনতেও যেমন চমৎকাব, গুণেও তেমনি। পানুর কাছে শুনেছ বোধহয়?'

কান্না পাচ্ছিল, তাই মুখ নিচু করেই বললাম, 'বিয়ে আমি করব না, বাবা।'

কফিতে চুমুক দিতে গিয়ে বাবা থেমে গেলেন; বলে উঠলেন, 'বাজে কথা বোলো না! তুমি বায়োলজি পড়োনি, তাই এমন কথা বলছ। তোমার বিয়ের বয়েস হয়েছে, এমন পছন্দসই পাত্র পেয়েছি, আর তুমি—।'

মরিয়া হয়ে বলে ফেললাম, 'আমার পছন্দ নয়।'

বাবার মুখের হাসি-হাসি চেহারা নিমেষে পালটে গেল। কফির পেয়ালা নামিয়ে, মোটা ভুরুর তলা থেকে পাঁচ-সাত সেকেন্ড তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে। তারপর বললেন, 'স্ত্রীলোকের স্বামী কি শাড়ি, না ভ্যানিটি ব্যাগ, যে তাদের পছন্দ না হলে চলবে না? তোমার মা পছন্দ করে আমাকে বিয়ে করেননি, বিয়ে করে পছন্দ করেছিলেন। তুমিও তাই করবে।'

ডুবতে বসে মানুষ যেমন দু-হাত বাড়িয়ে একটা কিছু ধরবার চেষ্টা করে, তেমনিভাবে আমি বললাম, 'কিন্তু আমার ভবিষ্যৎ—আমার আদর্শ—।'

বাবার গলায় এবার মেঘ ডেকে উঠল, 'জ্যাঠামো কোরো না। তোমার ভবিষ্যৎ তোমার চেয়ে আমি ভালো বুঝি। তেরোস্কোভার মতো রকেটে চেপে স্পেস-এ যাওয়ার মেয়ে তুমি নও। তুমি বিয়ে করবে, সংসার করবে, ছেলেপুলে মানুষ করবে—এই তোমার আদর্শ। সাতাশে ফাল্গুন তোমার বিয়ের দিন স্থির করেছি, তার আগের দিন পারগেটিভ নেবে, বুঝলে?'

পায়ের তলায় মেঝেটা দুলতে লাগল। ঝাপসা হয়ে এল দুই চোখ। কোনওমতে ছুটে চলে এসে বিছানায় মুখ গুঁজে পড়লাম। এতক্ষণের চেপে-রাখা কান্না এবার ফুলে-ফুলে উঠল। এই আমার বাবা! স্নেহ নেই, ভালোবাসা নেই, দয়া-মায়া কিচ্ছু নেই। নিষ্ঠুর এক সার্জন মাত্র। একজন অপারেশন-পেশেন্টের সঙ্গে নিজের মেয়ের কোনও তফাত নেই। ছুরি উঁচিয়েই আছেন। আজ যদি আমার মা থাকতেন, ওইরকম একটা জাম্বুবানের সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে পারতেন কি?

মায়ের ছবির দিকে তাকিয়ে বহুক্ষণ কাঁদলাম। (সেই কান্নার কথা বলতে গিয়ে নূপুরের নতুন করে কান্না পেয়ে গেল। চোখ দিয়ে টসটস করে গড়িয়ে এল জল। আর, আইভরির মতো ফরসা গালের ওপর তরল মুক্তোর মতো জলের ফোঁটা দেখে অচল সিগারেট টানতে ভুলে গেল।) কান্নার বেগটা কমে আসতেই মনের মধ্যে একটা জ্বালা অনুভব করতে লাগলাম। সে-জ্বালাটা বিদ্রোহের। মেয়ে হয়ে জন্মেছি বলে আমি কি একটা শাড়ি-পরা পুতুল? নিজস্ব কোনও সত্তা নেই আমার? নিশ্চয় আছে। এমন করে নিজেকে বলি দেব না। মাথা পেতে নেব না বাবার এই স্বেচ্ছাচারিতা। মনে-মনে হিসেব করে দেখলাম, বাবার বয়েস ষাটের কাছে এসেছে। পঞ্চাশ পার হলেই পুরুষের ভীমরতি হয়। নইলে একটা মর্কটের হাতে আমাকে দিতে চান তিনি! একটা বেঁটে কালো কুচ্ছিৎ—রেড়ির তেলের ব্যবসাদার—।

মনে-মনে একটা কঠিন সঙ্কল্প করে ফেললাম। রাত তখন শেষ হয়ে এসেছে। পুবদিক ফিকে হচ্ছে। হাত-খরচের টাকা যা ছিল, সঙ্গে নিয়ে এক কাপড়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলাম। সারা বাড়ি তখন ঘুমোচ্ছে।

তারপর দিল্লি স্টেশন। ট্রেন। কলকাতা।

এসে উঠলাম শীলার ফ্ল্যাটে। শীলা একসময় দিল্লিতে পড়ত আমার সঙ্গে। বিয়ে করে চলে এসেছে কলকাতায়। ওর স্বামী মিস্টার মেহরা এয়ার-ইন্ডিয়ায় কাজ করে।

আমাকে দেখে শীলা অবাক। মিথ্যে করে বললাম, 'একটা চাকরির ইন্টারভিউ দিতে এসেছি। থাকব দিন কয়েক।'

শীলা খুব খুশি। কিন্তু তিনদিনও গেল না।

খুব ভোরে ওঠাই আমার অভ্যেস। তাই খবরের কাগজ সর্বপ্রথমে আমার হাতেই পড়ে। চতুর্থ দিনে দেখি, সর্বনাশ! কাগজে আমার ফোটো সমেত বাবা বিজ্ঞাপন দিয়েছেন। জীবিত বা মৃত আমাকে ধরে দিতে পারলে পঁচিশ হাজার টাকা পুরস্কার! বাবার ভীমরতি সম্পর্কে আমার আর সন্দেহ রইল না।

কাগজখানা লুকিয়ে ফেললাম। শীলা একবার জিগ্যেস করল, 'আজ কাগজ দিয়ে যায়নি?'

বললাম, 'কাগজওয়ালা বললে, কাগজ আজ বন্ধ।'

'আজ বন্ধ! কেন?'

'ইয়ে—অফিসে ধর্মঘট হয়েছে কি না!'

কিন্তু ধরা পড়ে গেলাম রাতে যখন মিস্টার মেহরা বাড়ি ফিরলেন। দেখলাম, হাতে তাঁর খবরের কাগজ। তাড়াতাড়ি ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লাম। ঘুমিয়ে গেছি মনে করে শীলা খেতে ডাকল না। বেশি রাতে শুনলাম পাশের ঘরে শীলা চাপা উত্তেজিত গলায় বলছে, 'চাকরির ইন্টারভিউটা তা হলে নেহাতই মিথ্যে। বাপের সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি করে পালিয়ে এসেছে নিশ্চয়ই।'

মিস্টার মেহরা বললেন, 'কোয়াইট ন্যাচারাল। স্বামী যখন নেই, তখন বুড়ো বাপ ছাড়া কার সঙ্গেই বা ঝগড়া করা যায় বলো?'

শীলা রেগে বলল, 'তার মানে? আমি বুঝি তোমার সঙ্গে ঝগড়া করি?'

মেহরা সাহেব বললেন, 'না করলে আমি বাঁচব কী করে, শীলু? মনে হবে তুমি নেই।'

'কী বললে! তুমি বর নও, বর্বর!'

'তুমি স্ত্রী নও, ইস্ত্রি!'

ঝনঝন করে কাচ ভাঙার শব্দ। ফুলদানিটা বোধ করি গুঁড়িয়ে গেল। তারপর একদম চুপচাপ।

আমি হতভম্ব হয়ে বসে রইলাম। খানিকক্ষণ বাদে মেহরা সাহেবের গলা শোনা গেল, 'পাঁচ মিনিট হয়ে গেছে। এবার ভাব করা যেতে পারে। কী বলো?'

শীলা নরম গলায় বললে, 'নিশ্চয়। কেন যে স্বামী-স্ত্রীতে ঝগড়া হয় বুঝি না—হ্যাঁ, নূপুরের বাবাকে তাহলে কালই টেলিফোন করে দিও।'

মেহরা সাহেব বললেন, 'টেলিগ্রামে কাজ কী? আমাকে তো কাল ভোরেই দিল্লিতে ফ্লাই করতে হবে। গিয়ে ডক্টর চ্যাটার্জিকে সঙ্গে করে আনলেই হবে।'

ফ্যানের তলায় বসেও ঘেমে উঠলাম। মনে হল, বাবা যেন এসে পড়েছেন। মোটা ভুরুর তলা থেকে তাকিয়ে আছেন আমার দিকে, আর জাঁদরেল আওয়াজে বলছেন, সাতাশে ফাল্গুন তোমার বিয়ের দিন স্থির করেছি।

বন্ধু হয়ে শীলা যে এতখানি শত্রুতা করবে ভাবতেও পারিনি। উঃ, মেয়েটা কী বিশ্বাসঘাতক!

মনে-মনে একটা প্ল্যান ঠিক করে বাকি রাতটুকু কাটিয়ে দিলাম। সকালে নিজের শাড়িখানা পরে বেরোতে যাব, শীলা হাঁ-হাঁ করে ছুটে এল।

'ওকি! বেরোচ্ছিস নাকি? কোথায়? কেন?'

থতমত খেয়ে বললাম, 'মার্কেটে যাচ্ছি। কিছু কেনা-কাটা—।'

'এখন তো মোটে সাতটা। দোকান খোলেইনি। তার চেয়ে বিকেলে যাস'খন।'

বললাম, 'বিকেলে তো সময় হবে না। আজ দুপুরে সেই চাকরির ইন্টারভিউটা—।'

শীলা এমনভাবে তাকাল আমার দিকে, যেন আমি একটা শিশু, প্রথম মিথ্যে বলতে শিখছি। তারপর বললে, 'তা হলে একটা ট্যাক্সি ডাকাই। চল, আমারও কিছু কেনা-কাটা আছে।'

ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলাম শীলার পানে। বুঝতে পারলাম, আমাকে সে এক সেকেন্ডও চোখের আড়াল করতে নারাজ। জীবিত বা মৃত আমাকে বাবার হাতে সঁপে না দেওয়া অবধি তার স্বস্তি নেই।

বুদ্ধিটা হঠাৎ খুলে গেল। বললাম, 'একসঙ্গে মার্কেটে গেলে তো ভালোই হত শীলা। কিন্তু কি জানিস—আজ সকালে এখানে একজনের আসার কথা।'

'কে?'

'ইয়ে—মানে—আমার এক বন্ধু।'

'বন্ধু!' শীলার মুখে চাপা কৌতুকের দুষ্টু হাসি ফুটে উঠল। বললে, 'ও, তাই বল! নাম কী রে?'

'ঢোলকবিহারী। ফাইন দেখতে। —প্লিজ শীলা, সে এলে তুই রিসিভ করিস ভাই, আমি এলুম বলে।'

শীলা আর সন্দেহ করলে না। বললে, 'তোকে ভাবতে হবে না। যা, তুই চটপট ঘুরে আয়।'

বাঁচলাম। তরতরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে, রাস্তার হাওয়ায় মুক্তির নিশ্বাস নিলাম।

সারা সকালটা কাটল পথে-পথে। ম্যাটিনিতে একটা সিনেমা দেখলাম। সন্ধেবেলা ভীষণ খিদে পেয়েছিল বলে ঢুকলাম কফি হাউসে। সেখানেও কি নিস্তার আছে? দুটো বদখৎ গোয়েন্দা লাগল পিছনে। একটু আগে যারা এসেছিল, ওই তারাই। তাদের কবল থেকে পালাতে গিয়ে আপনার গাড়িতে—তারপর আপনার বাড়িতে।

আমার ফেরারি জীবনের গোড়াটুকু বললাম। শেষ কোথায় আমি নিজেই জানি না।
নূপুর থামল।

সিগারেটটা দু-আঙুলেব ফাঁকে নিভে গিয়েছে অনেকক্ষণ। সেটা ছুড়ে ফেলে অচল বিমর্ষ মুখে বললে, 'আপনাকে সহানুভূতি জানাব কী, আমিও ওই জ্বালায় জ্বলছি। বলতে গেলে আমরা দুজনে একই নৌকোয় ভাসছি।'

নূপুর জিজ্ঞাসু চোখ তুলে তাকাল।

'কিছুদিন হল আমাবও জীবনে এইরকম একটা ফাঁড়া এসেছিল।' —অচল নতুন একটা সিগারেট ধরাল। তারপর শুরু করলে, 'লক্ষ্ণৌতে আমাদেব দু-পুরুষের বাস। বাবা ওখানকার কোর্টে বরাবর প্র্যাকটিস করতেন। পসার ছিল খুব। একমাত্র ছেলে আমি, কিন্তু পড়াশুনো করেছি কলকাতায়। গ্র্যাজুয়েট হওয়ার পরেই বাবা মারা গেলেন। যা রেখে গেলেন, সারা জীবন দু-হাতে ওড়াবার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু দেখলাম ওড়াবার বিদ্যেটা শেখা হয়নি। তবে একটা বিদ্যের ওপর ঝোঁক আমার ছোটবেলা থেকেই। বাবার ভয়ে বেশিদূর এগোতে পারিনি। সেটা—।'

'গান-বাজনা।'—নূপুর বললে।

'ঠিক।'—অচল বলতে লাগল, 'চলে গেলাম লক্ষ্ণৌ। মা খুশি হলেন, গান শেখাও চলতে লাগল। ক্রমে নাম হল। রেডিও রেকর্ডে চান্স মিলল। ফিল্মে ডাক পড়ল। ব্যস, আর যায় কোথা। অমনি জুটে গেল ঝাঁকে-ঝাঁকে ভক্তের দল। ভক্ত না বলে ভক্তা বলাই উচিত।'

নূপুর অবাক হয়ে বললে, 'ভক্তা!'

'ভক্তের ফেমিনিন। শব্দটা আমার নিজের তৈরি। তারপর শুনুন। যেখানেই গাইতে যাই, গাদা-গাদা অটোগ্রাফের খাতা। সই করতে-করতে হাত ব্যথা হয়ে যায়। গানের পর গান ফরমায়েশ হয়, গাইতে-গাইতে গানে ঘেন্না ধরে যায়। তবু রেহাই নেই। সরু মোটা মিহি মেয়েরা আমাকে দেখলেই ছেঁকে ধরে। আমি যেন হরির লুটের বাতাসা। ক্রমে অবস্থা এমন দাঁড়াল যে, অল্পবয়েসি মেয়ে দেখলেই আমার আতঙ্ক হয়।'

নূপুর বললে, 'তাই বুঝি মোটরে আমাকে দেখে ভয় পেয়েছিলেন?'

অচল বললে, 'সে তো পেত্নী ভেবে।'

'পেত্নীতে আপনি বিশ্বাস করেন?'

'করিনে আবার। পেত্নী, ডাইনি, পিশাচী, মায়াবিনী—আসলে সবাই তো মেয়ে। —ডিস্টার্ব করবেন না, দুঃখের কথাটা শুনুন।'

'বলুন।'

—কলকাতা ছেড়ে আবার পালিয়ে গেলাম লক্ষ্ণৌ। ভাবলাম, মাস কয়েক অজ্ঞাতবাস করলে জলসা আর ভক্তাদের হাত থেকে তো রেহাই মিলবে। মা ভেরি গ্ল্যাড। রোজই খাওয়ার সময় বলেন, 'কী ভাগ্যি আমাকে তোর মনে পড়েছে! দেখ না এত বড় বাড়িটা খাঁ-খাঁ করছে।'

বলি, 'খাঁ-খাঁ করবে কেন? এই তো এসেছি।'

মা বলেন, 'আসবি বইকী, বাবা। মা-র দুঃখু তুই বুঝবি না তো কে বুঝবে? তুই আমার কতবড় মাতৃভক্ত ছেলে!'

মা-র মতলবটা ঠিক আঁচ করতে পারছিলাম না। একদিন জিগ্যেস করলাম, 'কী বলতে চাও সোজাসুজি বলো দিকি?'

মা আমার পিঠে হাত বুলিয়ে, দাড়ি ছুঁয়ে বললেন, 'তোর ঝানুকাকা বড় ভালো একটি মেয়ের সম্বন্ধ এনেছে। তুই বিয়ে করে সংসারী হ', আমি শান্তিতে মরি।'

বলতে-বলতেই মা-র দু-চোখে গঙ্গা বয়ে গেল। দেখেশুনে আমারও চোখ দিয়ে জল বেরোবার উপক্রম।

মাকে বোঝালাম, 'তারচেয়ে তোমায় নিয়ে তীর্থে ঘুরে আসি চলো। বিয়ে যদি করতেই হয়, পরে ভেবেচিন্তে করা যাবে।'

কিন্তু রেকর্ডে পিন আটকে গেলে যেমন হয়, মা-র মুখে সেই এক কথা, 'তোর ঝানুকাকা বলছিল, মেয়েটি বড় ভালো। এমন মেয়ে আর হয় না।'

আমার হল শাঁখের করাত। কলকাতায় ভক্তার দল, লক্ষ্ণৌতে মা। জীবন বিষময়। ভেবে-ভেবে নাচার হয়ে স্থির করলাম, বিয়েই করব। কত লোকে তো আত্মহত্যাও করে...বিয়ে করলে অন্তত একটা বিষয়ে বাঁচব। নিলামে কোনও মালের গায়ে Sold লেখা টিকিট ঝুলিয়ে দিলে, লোকে যেমন সেদিকে আর নজর দেয় না, আমিও তেমনি ভক্তাদের হাত থেকে বেঁচে যাব।

ঝানুকাকাকে পাকড়াও কবলাম। ঝানুকাকা বাবার দূব সম্পর্কের ভাই। পেশা ছিল কুস্তি লড়া। বয়স হওয়াতে এখন আর লড়ে না, খালি বাদাম বেটে সিদ্ধির শরবত খায়। গোল মুখে মোষের শিঙের মতো প্রকাণ্ড একজোড়া গোঁফ, দু-প্রান্ত দুই কানের সঙ্গে পাকানো।



ঝানুকাকা তখন শরবত খাচ্ছিল। আমায় দেখে বললে, 'কীরে, বে করতে চাচ্ছিস না কেন? দেব এক রদ্দা?'

বললাম, 'সে তোমায় দিতে হবে না, বউ এসে দেবে। মেয়ে কেমন বলো।'

গোঁফজোড়া চুমরে ঝানুকাকা বললে, 'এক নম্বর।'

'গান-বাজনা করে?'

'আলবত! রোজ ভোরে যখন ভয়রোঁ আলাপ করে, কাকেরা লজ্জায় চুপ মেরে যায়।'

সত্যিই যেন ঘাড়ে রদ্দা পড়ল। তবু জিগ্যেস করলাম, 'দেখতে কেমন?'

জবাব এল, 'কাঁধে ব্যান্ডেজ-করা পরী।'

'কাঁধে ব্যান্ডেজ কেন?'

'সবে ডানা কেটেছে কি না।'

'তামাশা রাখো। কেমন দেখতে সত্যি বলো।'

আর একবার গোঁফজোড়া চুমরে ঝানুকাকা বললে, 'হাইক্লাস। মাথায় য়্যাসা কোঁকড়ানো কালো চুল যে দেখলে সত্যি মনে হয়।'

লাফিয়ে উঠে বললাম, 'সত্যি মনে হয় মানে?'

ঝানুকাকা বললে, 'ছোটবেলায় কী একটা ব্যামোয় চুল আর দাঁতগুলো—কিন্তু নকল বলে ধরে কার সাধ্যি!'

মাথাটা ঘুরছিল। মনে হল, আমিই সিদ্ধির শরবত খেয়েছি।

একসঙ্গে গোটা ছয়েক মিঠে পানের খিলি কিমাম সমেত মুখে পুরে ঝানুকাকা বলতে লাগল, 'তবে মেয়ে হাইক্লাস! তোর সঙ্গে যা মানাবে, একদম লায়লা-মজনু! জলদি বে করে ফ্যাল, নইলে দেব এক রদ্দা!'

বিশ্বাস করুন মিস চ্যাটার্জি, আমার অবস্থাও তখন আপনার মতো। ঝানুকাকার বিশাল গোঁফওয়ালা মুখখানা দেখতে-দেখতে শিংওয়ালা একটা বাইসনের মুখ হয়ে গেল!

সেই রাতেই লক্ষ্ণৌ ছাড়লাম। মাকে দু-লাইন চিঠি লিখে এলাম ঃ

স্বপ্নে গুরুর আদেশ পাইয়াছি। হরিদ্বারে গিয়া সন্ন্যাস লইতে বলিয়াছেন। চলিলাম।

তারপর কলকাতায় ফিরেই ফ্ল্যাট-বদল। পাইকপাড়া থেকে যোধপুর পার্ক।

নূপুর অবাক হয়ে শুনছিল অচলের প্রায়-হব-হব বিয়ের উপাখ্যান। আর ভাবছিল, আজকাল সংসারে সব বাপ-মায়েরই ভীমরতি হয়েছে নাকি? তাদের দুজনের জীবনের দুর্ঘটনা গল্প-উপন্যাস আকারে লিখলে লোকে নিশ্চয় বলবে আজগুবি! কিন্তু বাস্তব জীবন গল্প-উপন্যাসকেও যে হার মানিয়ে দেয়, এ-কথা ক'জন জানে?

অচল থামতে নূপুর বললে, 'কিন্তু কী দরকার ছিল এত কাণ্ড করার? আপনি পুরুষ, আপনার ভক্তাদের মধ্যে থেকে নিজের পছন্দমতো কাউকে বিয়ে করলেই তো পারতেন? মা'ও খুশি হতেন।'

ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেলে অচল বললে, 'আবার! বাপের পুণ্যফলে পরচুল আর বাঁধানো দাঁতের হাত থেকে বেঁচে গেছি। এর পর আরও কত কী নকল বেরোত কে জানে! —কিন্তু আপনি এখন কী করবেন? দিল্লিতেই ফিরে যাবেন?'

নূপুরের মুখখানা শুকিয়ে উঠল। বললে, 'তারচেয়ে আমায় ডবল-ডেকারের তলায় শুয়ে পড়তে বলুন। আপনি আমার বাবাকে জানেন না, ফিরে গেলে সেই রেড়ির তেলের সঙ্গেই—।'

'তা হলে কলকাতায় কোনও ভালো পাত্র দেখে—।'

হাতজোড় করে নূপুর সবেগে বলে উঠল, 'রক্ষে করুন। রেড়ির তেলের পর হয়তো কেরোসিন তেল জুটবে! বিয়ে আমিও জীবনে করব না।'

খুশি হয়ে অচল কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার মুখ হাঁ করাই রইল। পাশের ঘর থেকে অতি অমায়িক গলার ডাক শোনা গেল, 'আছেন নাকি?'

ভড়কে গেল দুজনে। আবার কে এল? তাড়াতাড়ি এ-ঘরে এসে অচল দেখে, সেই পরিচিত

পালিশ-করা টাক। দুন্দুভিবাবু!

অচলের এলোমেলো চুল আর স্লিপিং পায়জামার দিকে নজর করে একগাল হেসে দুন্দুভিবাবু বললেন, 'ঘুমডা ভাঙ্গায়ে দিলাম বুঝি?'

অচল বললে, 'না, না।'

টাক চুলকে দুন্দুভিবাবু বলে উঠলেন, 'হ, বুঝচি-বুঝচি। বয়সকালে পরিবার বাপের বারি থনে আইলে আমারও ঘুমের থিকা উঠতে বেলা অইত। অমাবস্যার রাতেও চাঁদ দ্যাখতাম। কী দিনই আছিল রে মশয়! (পাঠকদের জেনে রাখা দরকার, দুন্দুভিবাবু বিপত্নীক) যাক, এখন চা-পর্ব অইব তো? বউঠানরে তিনকাপ বানাইতে কন!'

'বউঠান!'—অচল যেন জীবন্ত বিস্ময়চিহ্ন।

আকর্ণ হাসি-মুখ নিয়ে, টাক চুলকে দুন্দুভিবাবু বললেন, 'ওই আপনার ইয়ে—মিসেস। সম্পর্কে আমি ওনার দেওর হই না? বিশ্বাস করেন অচলবাবু, বউয়ের চিন্তায় আমার টাক পইড়াছে, বয়স কিন্তু বেশি না। —যান, দ্যাখেন চা কদ্দুর!'

দুন্দুভিবাবু সোফায় চেপে বসলেন।

অচল বিরস মুখে বললে, 'চা বাড়ন্ত! ভণ্ডুলের জ্বর, কাল থেকে ছুটি নিয়েছে।'

'অ্যাঁঃ! এতক্ষণ কন নাই ক্যান?'

দুন্দুভিবাবু তৎক্ষণাৎ সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

'ভণ্ডুল নাই, আমি তো আছি। আমি আইন্যা দিমু। বাজার-টাজার লাগব তো ? আচ্ছা লোক মশয় আপনি! বউঠানেরে উপাস দিয়া রাখবেন নাকি ?

দুন্দুভিবাবু আর দাঁড়ালেন না। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে অচল পাশের ঘরে যেতেই দেখলে, নূপুর তার ধুতি ছেড়ে নিজের নীল শাড়িখানা পরেছে। মৃদুস্বরে বললে, 'আমি যাচ্ছি।'

অচলের মুখ দিয়ে শুধু বেরোল, 'যাচ্ছেন!'

'হ্যাঁ।'

তারপর নমস্কারের ভঙ্গিতে হাত দুটি জোড় করে নূপুর বললে, 'একটা রাতের জন্যে আশ্রয় দিয়েছেন, আপনার দয়ার কথা আমি ভুলব না। অনেক ধন্যবাদ।'

বলতে-বলতে নূপুরের গলাটা কেমন ধরে এল।

কয়েক মুহূর্ত গুম হয়ে রইল অচল। তারপর বললে, 'আমাকে এমন অপদস্থ করে, চলে না গেলে কি চলছিল না? এক্ষুনি দুন্দুভিবাবু একগাদা বাজার নিয়ে ফিরে আসবেন। তখন সবই তো জানাজানি হয়ে যাবে, আর দুন্দুভিবাবুর জানা মানেই এই গোটা ফ্ল্যাট-বাড়ি, গোটা পাড়ার জানা। বউঠান কোথায়, জিগ্যেস করলে কী কৈফিয়ত আমি দেব শুনি?'

নূপুর বললে, 'বলবেন আমি হঠাৎ মরে গেছি।'

মুখখানা তেতো করে অচল বলে উঠল, 'বললেই হল! লোকে যখন জিগ্যেস করবে, লাশ কোথায়, তখন? শেষকালে কি আমাকে গুমখুনের চার্জে ফেলতে চান? ডেঞ্জারাস মেয়ে তো আপনি!'

চটে গিয়ে নূপুর বললে, 'তা হলে কী করব বলুন? সত্যি-সত্যিই মরব?'

'কিচ্ছু করতে হবে না, দয়া করে শুধু থাকুন। থেকে আমায় কৃতার্থ করুন।'

'বারে, কাল রাতে তো দূর-দূর করে তাড়িয়ে দিচ্ছিলেন!'

কালো দিঘির মতো নূপুরের বড়-বড় চোখ দুটো টল-টল করে উঠল।

'ঘাট মানছি। হয়েছে ? নিজে আধপেটা খেয়ে কাল রাতে খাওয়ালাম, আর আজ ভণ্ডুলের জ্বর হয়েছে শুনেও দিব্যি চলে যাওয়া হচ্ছে! উঃ, কী স্বার্থপর, কী অকৃতজ্ঞ এই মেয়ে জাতটা!'

নূপুর মুখ ভারী করে বললে, 'মেয়েজাতের নিন্দে তো আপনার ঠোঁটের আগায়। কিন্তু একরাত আধপেটা খেতে দিয়ে কী এমন মাথা কিনেছেন শুনি? —বেশ ভণ্ডুল যতদিন না আসে, আমি যাব না। বেঁধে আপনাকে খাইয়ে কৃতজ্ঞতার দেনা শোধ করব।'

অচল খুশি হয়ে বললে, 'থ্যাঙ্ক ইউ। এ-কথাটা আগে বললেই হত।'

খিচুড়ি আর মাংসের শুকনো কারি।

খেতে-খেতে অচল বললে, 'রান্নার হাতটা আপনার ভালোই দেখছি। খিচুড়ি আর আছে নাকি?'

নূপুর ডেকচির বাকিটুকু উজাড় কবে অচলের প্লেটে ঢেলে দিলে। অচল বলে উঠল, 'এই যা! আপনার জন্যে আর রইল না যে!'

'থাক,' নূপুর বললে, 'আমার জন্যে অত মহানুভবতা না দেখালেও চলবে। মাংস আর দেব?'

'আপনি তা হলে খাবেন কী?'

'সে-ভাবনায় আপনার কাজ নেই।' —আরও খানিকটা কারি অচলের পাতে দিয়ে নূপুর বললে, 'আপনি আমাকে আধপেটা খাইয়েছিলেন, আমি কিন্তু পেট ভরে খাওয়ালাম। আমার কৃতজ্ঞতার ঋণ শোধ হল। ওবেলা আমি চলে যাব।'

'কোথায়?'

'দেখি, কোথায় নিরাপদ আশ্রয় মেলে।'

অচলের খাওয়া হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। কিছুক্ষণ নূপুরেব দিকে তাকিয়ে থেকে বললে, 'আপনার মাথা খারাপ হয়েছে। আপনাব মতো মেয়ে সহজে কখনও নিরাপদ আশ্রয় পায়? দুনিযাটা কি বেলুড় মঠ, না জেলেব ফিমেল ওয়ার্ড? পাগলামি করবেন না, সত্যিকার নিরাপদ আশ্রয় যতদিন না জোটে, এইখানেই থাকুন।'

নূপুর কী বলতে যাচ্ছিল, তাকে বাধা দিয়ে অচল আবার বললে, 'তা ছাড়া রাস্তা-ঘাটে বেরোবেনই বা কোন সাহসে? পুলিশ আছে, গোয়েন্দা আছে। আপনার বাবার বিজ্ঞাপনের কথা এরই মধ্যে ভুলে গেলেন?'

নূপুরের মুখখানা শুকিয়ে উঠল। এদিকটা সে ভাবেনি। অসহায়ের মতো সে চুপ করে রইল কিছুক্ষণ; তারপরে বললে, 'কিন্তু এখানেই বা থাকব কী করে? কোনও মেয়েকেই তো আপনি দু-চক্ষে দেখতে পারেন না—বিশ্বাসও করেন না।'

অচল বললে, 'ঠিক। বিশ্বাস করতাম না। জীবনে এই প্রথম একজন মেয়েকে বিশ্বাস করলাম। কেন জানেন? আপনার আগে আর কোনও মেয়েকেই বলতে শুনিনি "বিয়ে করব না"। কিন্তু আমাকে আপনি বিশ্বাস করতে পারবেন কি? সোজাসুজি বলুন।'

অচলের মুখের ওপর বড়-বড় চোখ মেলে নূপুর বললে, 'পারব।'

তিন

পাঠক-পাঠিকা, দিল্লিতে যাওয়া যাক চলুন। দরিয়াগঞ্জে ডক্টর চ্যাটার্জির ড্রয়িংরুমে।

রাত আটটা।

দুটো একানে সোফায় মুখোমুখি দুজন বসে। দুজনেই প্রায় সমবয়সি, পঞ্চাশোত্তর। একজনের খাটো বলিষ্ঠ চেহারা, মাথার চুলে জার্মান ছাঁট, পরনে পুলিশি পোশাক, মুখে বর্মা চুরুট। ইনি মিস্টার

দুবে, দিল্লি পুলিশের মেজকর্তা। আরেকজনের লম্বা, দোহারা গড়ন, ফরসা মুখে নাকের ডগা লাল, আর তারই নীচে টুথব্রাশের মতো ছাঁটা গোঁফ। ড্রেসিং গাউন চাপিয়ে পাইপ টানছেন। ইনিই নায়িকার বাপ বিখ্যাত সার্জন দিগম্বর চ্যাটার্জি।

সামনের নিচু টেবিলে দু-কাপ ধোঁয়া-ওঠা কফি।

দুটো জীবন্ত ভিসুভিয়াসের মতো দুজনে নীরবে ধোঁয়া ছাড়ছেন। ঘরের কোণে গ্র্যান্ড ফাদার্স ক্লকের টকটক ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই।

পাইপটা দাঁতে চেপে হঠাৎ গর্জন করে উঠলেন সার্জনসাহেব, 'শুধু আমার বউ—মানে নূপুরের মায়ের জন্যেই এমন কাণ্ডটা ঘটল, বুঝলে দুবে। কাণ্ডজ্ঞানহীন মহিলা!'

মুখ থেকে বর্মা চুরুট নামিয়ে পুলিশসাহেব এক মুহূর্ত হাঁ করে চেয়ে রইলেন। তারপর বললেন, 'সেকী! মিসেস চ্যাটার্জি তো বহুদিন হল স্বর্গে গেছেন!'

সার্জনসাহেব বিষম রেগে বললেন, 'কেন গেছেন? স্বর্গ কী এমন ভালো জায়গা? সেখানে কি দিল্লির চেয়ে ভালো জরদা পাওয়া যায়?'

পুলিশসাহেব হাসতে গিয়ে কেশে ফেললেন।

সার্জনসাহেব বলতে লাগলেন, 'সে থাকলে কি আমাকে এত ঝঞ্ঝাট পোহাতে হয়? বোঝো আমার অবস্থাটা! আমি অপারেশন-টেবিলে পেশেন্টের দিকে নজর রাখব, না ঘরে মেয়ের দিকে?'

'তাই তো!'

'নূপুরের জন্যে যে ছেলেটি পেয়েছিলাম, বুঝলে দুবে, জুয়েল! একখানা জুয়েল! বেটি বলে কি না "আমার পছন্দ নয়"! আরে বাবা, তুই কী বুঝিস? স্বামী নিয়ে কখনও ঘর করেছিস? আমার কথা শুনলই না, রাতারাতি গায়েব হয়ে গেল?'

'ছেলেমানুষ—ঝোঁকের মাথায় একটা বোকামি করে ফেলেছে।'

'তুমি জান না দুবে, মেয়েটা ঠিক তার মায়ের স্বভাব পেয়েছে। একবার জরদার কৌটো কেড়ে নিয়েছিলাম বলে সে একমাস বাপের বাড়ি গিয়ে বসেছিল! নূপুরও ঠিক তেমনি জেদি আর রাগী।'

'তাই দেখছি।' —পুলিশসাহেব মুচকে হেসে মন্তব্য করলেন, 'মেয়েটা যদি বাপের মতো ঠান্ডা মেজাজ পেত, তা হলে কি আর এমনটা হত!'

টেবিলের ওপর প্রচণ্ড একটা ঘুষি মেরে সার্জনসাহেব বলে উঠলেন, 'আলবত!'

সঙ্গে-সঙ্গে কফির কাপ দুটো শূন্যে লাফিয়ে উঠে কার্পেটের ওপর চুরমার হয়ে গেল।

উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে উঠে সার্জনসাহেব বললেন, 'যেখান থেকে হোক, যেমন করে হোক, নূপুরকে তুমি ধরে দাও, দুবে। জীবিত বা মৃত। পঁচিশ হাজার দেব বলেছি, না হয় তিরিশ, না হয় পঞ্চাশ—।'

'আরে দাঁড়াও, দাঁড়াও চ্যাটার্জি, অত উত্তেজিত হলে কি চলে?'

ড্রইংরুমের এধার থেকে ওধার অবধি পায়চারি করতে-করতে সার্জনসাহেব বললেন, 'উত্তেজিত হব না। ভাবী কুটুম-বাড়িতে আমার মান-ইজ্জত কিছু বাকি রাখলে সে-বেটি?'

সার্জনসাহেবের দাঁতের চাপে পাইপটা বোধহয় গুঁড়িয়ে গেল। পায়চারি দ্রুততর হয়ে উঠল।

বর্মা চুরুটের টুকরোটা ছাইদানিতে ফেলে দিয়ে পুলিশসাহেব বললেন, 'সামথিং রঙ সামহোয়্যার। নূপুর মাইয়াকে আমি যতদূর জানি—সে তো তেমন মেয়ে নয়!'

সার্জনসাহেবের দাঁতের চাপে ওককাঠের পাইপটা আরেকবার কড়মড় করে উঠল, 'জীবিত কিংবা মৃত, বেটিকে যেমন করে হোক ধরে দাও, দুবে!'



পুলিশসাহেব বললেন, 'ধরে দাও বললেই তো আর ধরা যায় না, চ্যাটার্জি। সেই ইস্কুল থেকে দেখছি তুমি চিরকাল একরোখা।'

সার্জনসাহেবের গলায় এবার বাজ ডেকে উঠল, 'এতবড় পুলিশ-ডিপার্টমেন্ট তবে আছে কী করতে? ইউ হাঞ্চব্যাক অব নোতরদাম!'

পুলিশসাহেবের গলায় এবার কড়া সুর শোনা গেল, 'তুমি কি মনে কর, তোমাদের বাপ-বেটির ঝগড়া মেটাবার জন্যে? ইউ ব্রেনলেস ফ্রাঙ্কেনস্টাইন! তোমার দোষেই তো এই কাণ্ডটা ঘটল। বাপ হয়ে তুমি শাসন করতে পার, অথচ মেয়ের মন বুঝতে পার না।'

পায়চারি হঠাৎ থেমে গেল সার্জনসাহেবের; টুথব্রাশের মতো ছাঁটা গোঁফওয়ালা তিরিক্ষে মুখখানা মিইয়ে গিয়ে করুণ হয়ে এল। পাইপটা মুখ থেকে নামিয়ে বললেন, 'ঠিক! ঠিক বলেছ, দুবে! মানুষের দেহের অ্যানাটমিই আমি ভালো বুঝি—ইন্ডিয়ার খুব কম সার্জনই আমার মতো এত ভালো বোঝে—কিন্তু মেয়েদের মন আমি বুঝি না। নূপুরের মায়েরও না, নূপুরেরও না। আমি কী করি বলো তো?'

পুলিশসাহেব উঠে গিয়ে সার্জনসাহেবের পিঠে হাত রাখলেন। দুজনে যেন স্কুল-জীবনের সেই পুরোনো বন্ধু। বললেন, 'ঠিক আছে। যা করবার, আমিই করছি। কাগজে তুমি যে-বিজ্ঞাপন দিয়েছিলে, তার কী হল? কোনও চিঠিপত্র এসেছে?'

'এসেছে।'

সার্জনসাহেব দেরাজ খুলে একতাড়া চিঠি বের করে টেবিলের ওপর ফেলে দিলেন।

'এগুলো এসেছে বেরিলি, শিলং, কোয়েম্বাটুর, কন্যাকুমারিকা, আরও নানা জায়গা থেকে। সকলেই নূপুরকে খুঁজে পেয়েছে। এখন পঁচিশ হাজার টাকা আমি পাঠিয়ে দিলেই তারা ধরে দেবে।'

পুলিশসাহেব বললেন, 'বোগাস! এদের মধ্যে কেউই সত্যি করে আসল নূপুরকে খুঁজে পায়নি। খুঁজে পেয়েছে শুধু নীল সিল্কের শাড়ি আর গালের কালো তিল।'

'কিন্তু সত্যিই যদি কেউ সন্ধান পেয়ে থাকে?'

'তা হলে টাকা না চেয়ে আগে তোমাকেই যেতে লিখত শনাক্ত করার জন্যে।'

'একজন কিন্তু যেতে বলেছিল দুবে।'

'কে সে?'

'মিস্টার মেহরা। এয়ার সার্ভিসের লোক। তার স্ত্রী নাকি নূপুরের কলেজ-বান্ধবী। পালিয়ে গিয়ে নূপুর তারই ওখানে উঠেছিল।'

'বটে! মেহরা থাকে কোথায় ?'

'কলকাতায়। আমাকে যেতে বলেছিল, কিন্তু সেদিন একটা শক্ত অপারেশন ছিল বলে—।'

এবার পুলিশসাহেব উত্তেজিত হলেন, 'সেদিন না গিয়ে পরের দিন গেলে না কেন ?'

'পরের দিনই একটা টেলিগ্রাম এল। মেহরার ফ্ল্যাট থেকে নূপুর আবার পালিয়েছে।'

'যাক, মেয়েটা তা হলে কলকাতাতেই আছে।' পুলিশসাহেব নিশ্চিন্ত হয়ে বললেন।

'কী করে বুঝলে?'

'তুমি আমাকে নূপুরের পালানোর খবর দেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই সমস্ত বড়-বড় শহরের পুলিশকে আমি জানিয়ে দিয়েছি। তারা এয়ারপোর্ট, রেলওয়ে-স্টেশন আর গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোডের ওপর কড়া নজর রাখছে। কলকাতা থেকে পালাতে গেলে সে নিশ্চয় ধরা পড়ত।'

পুলিশসাহেব আবার সোফায় বসলেন আরাম করে। ধরালেন নতুন চুরুট। হেসে বললেন, 'যাক, এতক্ষণে অন্ধকারে তবু আলো দেখা গেল। আরো দু-কাপ কফি আনতে বলো হে ডক্টর ফ্রাঙ্কেনস্টাইন!'

চার

'একটা চাকরি দিন না।'

সকালে চায়ের টেবিলে বসে নূপুর কথাটা পাড়ল।

মুখে চাযেব কাপ তুলতে গিয়ে অচল থেমে গেল। বললে, 'চাকরি! আমাকে কি এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ পেয়েছেন? না মন্ত্রী পেয়েছেন?'

'নাই বা মন্ত্রী হলেন, কত লোকের সঙ্গে তো আপনার খাতির। দিন না একটা চাকবি।'

গম্ভীর হয়ে অচল বললে, 'আপনার চাকরি হওয়া মুশকিল। হলেও থাকবে না।'

'সেকি! কেন?'

'আপনার একটা মস্ত ডিসকোয়ালিফিকেশন আছে।'

একটু দমে গেল নূপুর। বললে, 'কী ডিসকোয়ালিফিকেশন?'

'আপনি বড্ড বেশি সুন্দর। যে অফিসে আপনি কাজ পাবেন, সেখানে আপনি ছাড়া আর কেউ কাজ করবে না—সবাই পদ্য লিখবে। কেউ-কেউ বা অফিসের আটতলার ছাদ থেকে লাফিয়েও পড়তে পারে। তারপরেও কি আপনার চাকরি থাকবে আশা করেন?'

নূপুরের মুখখানা লাল হয়ে উঠেছিল; সামলে নিয়ে বললে, 'চাকরিটা পাগলা-গারদে হবে নাকি?'

টোস্টে কামড় দিয়ে অচল বললে, 'উঁহু, অফিসটাই পাগলা-গারদ হয়ে যাবে।'

হাসি চেপে গম্ভীর মুখে নূপুর বললে, 'এখানেও তার নমুনা দেখছি।...কিন্তু তামাশা রাখুন, চাকরি আমার একটা চাই-ই চাই। আপনার কাঁধে ভার হয়ে আর কতদিন কাটাব বলুন?'

অচল বললে, 'দেমাক তো ষোলো আনা আছে দেখছি! কিন্তু চাকরি করতে গিয়ে ফেরারি নূপুর চ্যাটার্জি পুলিশে যদি ক্যাচ হয়ে যায়, তখন? আপনার ছবি তো পুলিশের মাদুলি হয়ে আছে।'

ফ্যাকাসে হয়ে গেল নূপুরের মুখ। হতাশ হয়ে বললে, 'তা হলে কোনও চান্স নেই চাকরির?'

'দাঁড়ান-দাঁড়ান! ভাবতে দিন।'

চা শেষ করে একটা সিগারেট ধরালে অচল। ধোঁয়া ছেড়ে বললে, 'আচ্ছা, ভানু গোয়েন্দা

যেদিন এসেছিল, সেদিন একটা গান গাইছিলেন আপনি। শুনে মনে হয়েছিল তালিম নেওয়া গলা।'

'দিল্লিতে শিখতাম।'

'শুধু গান?'

'নাচও কিছু-কিছু শিখেছিলাম।'

খুশি হয়ে উঠল অচল। বললে, 'ঠিক আছে। চাকরি হয়ে যেতে পারে।'

উৎসুক গলায় নূপুর জিগ্যেস করলে, 'কোথায়?'

'দেখতেই পাবেন। সন্ধেবেলা নিয়ে যাব।'

'কী করতে হবে?'

'যেমন-যেমন বলব, তাই করবেন। তার আগে আমার কাছ থেকে একটা গানের দুটো লাইন শিখে নিতে হবে।'



'স্টার্ট মিউজিক! ওয়ান—টু—।'

হাত নেড়ে অচল কনডাকটিং শুরু করলে।

স্থান—রুবি থিয়েটারের প্রেক্ষাগৃহ। নতুন গীতিনাট্য 'সিতারার স্বপ্ন'র রিহার্সাল চলেছে।

মিউজিক ডিরেক্টার অচল মুখার্জি। স্টেজের ওপর অভিনেতা, অভিনেত্রী, ব্যালে আর বাজিয়েদের জটলা। অডিটোরিয়ামের প্রথম সারিতে গদি-আঁটা একটা চেয়ারে অদ্ভুত এক মূর্তি বসে। লম্বা ভাটিয়া কোট-পরা প্রকাণ্ড একতাল চর্বির ওপর পাঁউরুটির মতো ফুলো-ফুলো একজোড়া গাল, আর দুটো কিশমিশের মতো মিটমিটে চোখ।

থিয়েটার-মালিক রতিলাল শেঠ।

মিউজিক কিছু বাজবার পর একটি মেয়ে স্টেজের মাঝখানে এসে গান ধরলে। চেহারায় রূপের চেয়ে রূপের চটক বেশি। হিরোইনদের বয়স নেই। দর্জির কল্যাণে তারা চিরযৌবনা। রুবি থিয়েটারের বাঁধা হিরোইন ললিতাকুমারী। যেমন গাইতে, তেমনি নাচতে। স্টেজ মাত্ত করে রাখে।

কিন্তু গানের মুখড়াটা একবার মাত্র গাইতেই অচল হাত তুলে থামিয়ে দিলে। বললে, 'হল না।'

ললিতাকুমারীর রং-মাখা ঠোঁটের কোণ একটু বেঁকে গেল। মিহি ধাতব গলায় বললে, 'হচ্ছে তো!'

'না, হচ্ছে না। আবার ধরুন। স্টার্ট—।'

আবার শুরু হল গান। এবার মুখড়া পুরো গাওয়ার আগেই অচল বলে উঠল, 'হচ্ছে না! কিছুই হচ্ছে না!'

ললিতাকুমারীর বাঁ-দিকের আঁকা ভুরু একটু উঠল। মিহি ধাতব গলা এবার একটু তীক্ষ্ণ হল, 'পরদার ভুল হচ্ছে কি?'

'না।'

'তবে?'

অসহিষ্ণু গলায় অচল বললে, 'পরদাগুলো সুর, গান নয়। ভাব দিয়ে পরদাকে প্রকাশ করাই গান। আপনার গানে প্রাণ কই? আপনার বুকে প্রেমিকা সিতারার মন কই? হচ্ছে না—কিচ্ছু হচ্ছে না!'

প্রকাণ্ড চর্বির তাল নড়ে উঠল। সামনের সারি থেকে শেঠ রতিলাল হাঁপাতে-হাঁপাতে বললে, 'ললিতা যা গাইছে, ওতেই কেলাপ পেয়ে যাবে, ওচোলবাবু। চালিয়ে লিন না।'

অচল একবার তাকিয়ে দেখলে। তারপর স্টেজের সিঁড়ি দিয়ে সোজা নেমে এসে দাঁড়াল রতিলালের সামনে। স্থির গলায় বললে, 'তা হলে আমায ছেড়ে দিন।'

রতিলালের জোঁকের মতো পুরু ঠোঁট দুটো ইঞ্চিখানেক ফাঁক হয়ে গেল। একটা আওয়াজ শুধু বেরোল, 'অ্যাঁ!'

অচল প্রতিধ্বনি করলে, 'হ্যাঁ। আমায় ছেড়ে দিন, আমি চালাতে পারব না।'

স্টেজের ওপর থেকে মিহি ধাতব গলা শোনা গেল, 'আমার মাথা ধরেছে, শেঠজি। আমি যাচ্ছি।'

হাঁসফাঁস করে চর্বির তাল আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। কিন্তু তার আগেই ললিতাকুমারীর হাইহিলের শব্দ স্টেজ থেকে মিলিয়ে গেছে। ধপ করে আবার বসে পড়ল শেঠজি। হাঁপাতে-হাঁপাতে বলে উঠল, 'হায় রাম। নয়া ড্রামার অ্যাডভান্স বুকিং শুরু হয়ে গেছে, আর আপনি বলছেন, হিরোইন চলবে না! হামি এখোন কী করবে বোলেন তো?'

রতিলালের থলথলে চিবুক থরথর কবে কাঁপতে থাকে।

অচল যেন এই প্রশ্নেরই অপেক্ষায় ছিল। বললে, 'হয় নতুন হিরোইন নিয়ে আসুন, নয় আমাকে ছেড়ে দিন।'

রতিলাল ককিয়ে উঠল, 'বোলেন কী, ওচোলবাবু! আপনাকে ছাড়লে হামার ঠিয়েটার কানা হইয়ে যাবে। লেকিন, নয়ি হিরোইন এখুন পাব কোথায়? এ কি পকৌড়া ফুচকা যে যাব আর কিনে লিয়ে আসব? গানা জানবে, নাচ জানবে, বিউটিফুল হোবে—হায় রাম, তেমন লেড়কি কই?'

'আছে!' —অচল গম্ভীর ভাবে জবাব দিল।

'আছে! কই? কোথায়?'

রতিলাল সাগ্রহে অচলের মুখের দিকে তাকাল।

'একটু সবুর করুন।' —বলে অচল বেরিয়ে গেল। মিনিট তিন-চার বাদেই অচলের সঙ্গে যেন সচল একটি মোমের শিখা প্রবেশ করল প্রেক্ষাগৃহে। উনিশ-কুড়ি বছরের ছিপছিপে সুঠাম দেহ, টকটকে ফরসা রং, টানা চোখে কাজল আছে কি না বোঝা যায় না, সাপিনীর মতো লম্বা বেণীতে

ফুল। মেয়েটি পশ্চিমা, পরনে ধবধবে সাদা সাটিনের সালোয়ার আর কামিজ, মাথা ঘিরে বুকের ওপর ধানী রঙের ফিনফিনে দোপাট্টা।

মেয়েটি রতিলালের সামনে এসে দাঁড়াতেই জোঁকের মতো পুরু ঠোঁটজোড়া এবার দেড় ইঞ্চি ফাঁক হয়ে গেল। ক্যা তাজ্জব! বেহেস্তের এই হুরিকে কোত্থেকে কুড়িয়ে নিয়ে এল ওচোলবাবু!

অচল বললে, 'দেখে নিন শেঠজি, সিতারার পার্টে চলবে কি না।'

মেয়েটির দিকে তাকিয়ে রতিলাল প্রশ্ন করলে, 'নাম?'

চোস্ত উর্দু উচ্চারণে জবাব এল, 'খুশিবানু।'

'ঘর?'

'ফৈজাবাদ।'

'বাংলা জানেন? হামার ঠিয়েটার তো বাংলা আছে।'

খুশিবানু মিষ্টি হেসে নিখুঁত বাংলায় জবাব দিলে, 'জানি বইকী! বাংলাদেশে অনেকদিন আছি।'

আশ্বস্ত হয়ে রতিলাল বললে, 'ব্যস! ব্যস!...এবার টেস লিয়ে লিন, ওচোলবাবু।'

'টেস!' —অচল অবাক হয়ে তাকাল।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, গানের টেস।'

'ও, টেস্ট।'

খুশিবানুকে নিয়ে অচল স্টেজের ওপর উঠে গেল। ললিতাকুমারীর গানের প্রথম দুটো লাইন নিজে গেয়ে শোনাল। তারপর রতিলালকে শুনিয়ে প্রশ্ন করলে খুশিবানুকে, 'গাইতে পারবেন?'

'পারব।'

অচল হুকুম দিলে, 'স্টেজ ফাঁকা করে দাও—সব আলো নিভিয়ে ব্লু লাইট দাও—স্টার্ট মিউজিক! ওয়ান টু—ওয়ান টু—।'

নবম নীলাভ আলোয় একা স্টেজে দাঁড়িয়ে গাইতে শুরু করলে খুশিবানু ঃ

'শেষ প্রহরের চাঁদ যেতে-যেতে ফিরে যায়,
তোমার আমার মিলনের রাতি বুঝি বা পোহায়ে যায়।।'

মৃদু থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠল খুশিবানুর গান। বেহালার সঙ্গে এক হয়ে মিশে গেছে তার গলা। প্রাণের আবেগে সুরের মূর্ছনায় ভরে উঠল ফাঁকা প্রেক্ষাগৃহ। বাজিয়েরা তন্ময় হয়ে বাজাচ্ছে। সত্যিকারের সিতারা বোধ করি এর চেয়ে 'বেশি দরদ দিয়ে গাইতে পারত না।

একবার—দুবার—তিনবার মুখড়া গেয়ে থামল খুশিবানু। স্টেজ থেকে নেমে এল অচল। বললে, 'কেমন বুঝছেন, শেঠজি?'

কেঁদে-কেঁদে রতিলালের তখন সর্দি হয়ে গেছে। রুমালে সশব্দে নাক ঝেড়ে বললে, 'ওচোলবাবু, খুশিবানু পাবলিকের দিল জ্বালিয়ে দেবে। ললিতাকে হামি পানশো দিই, ওকে সাতশো দিব। রাজি?'

অচল বললে, 'বেশ। আজই কনট্রাক্ট করবেন তো?'

'জরুর। লেকিন, পাঁচ দিন তো মোটে বাকি। আপনি রাত ভোর রিহার্সাল দিতে থাকুন। আর হামি দমভোর পাবলিসিটি দিয়ে শহর গরম করিয়ে দিই।'

প্রবল উৎসাহে রতিলালের থলথলে চিবুক থরথর করে কাঁপতে লাগল।

শহর সত্যিই গরম করে দিলে রতিলাল। পোস্টারে-পোস্টারে ছেয়ে গেল যত দেওয়াল। পুরো-পাতা বিজ্ঞাপনে ভরে গেল যত দৈনিক কাগজ। সিতারার রূপসজ্জায় খুশিবানুর রঙিন মুখ, তার তলায় বড়-বড় হরফে লেখা ঃ

রুবি থিয়েটার্সের
নৃত্য-গীতমুখর নবনাট্য-নিবেদন

সিতারার স্বপ্ন

নাম ভূমিকায়
নবাগতা অভিনেত্রী

খুশিবানু

লোকের মুখে-মুখে শুধু একটি নাম—'খুশিবানু!'

'খুশিবানু! নামেই মনটা খুশি! চেহারাখানা দেখো, ডেঞ্জারাস!'

হাসি-হাসি মুখে জহর দৈনিক কাগজটা এগিয়ে দিল।

বিজ্ঞাপনের পাতায় খুশিবানুর ছবিখানার দিকে ভুরু কুঁচকে তাকাল ভানু। মাথায় নকশা-কাটা রুমাল বাঁধা একটি জিপসি মেয়ে। পানের মতো মুখাকৃতি, সুর্মা-টানা চোখে বাঁকা ইশারা, ঈষদ্‌ভিন্ন ঠোঁটে মোহিনী হাসি।

ছবিখানা বেশ কিছুক্ষণ দেখল ভানু। ভুরু দুটো আরও কুঁচকে গেল। বর্মা-চুরুটটা দাঁতে চেপে বললে, 'কে বল তো?'

জহর তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'একটি সুন্দরী মেয়ে।'

'ইডিয়ট!' —ধমকে উঠে ভানু বললে, 'সুন্দরী মেয়ে সে তো দেখতেই পাচ্ছি! এ কে? কোত্থেকে এল? পরিচয় কী?'

থতমত খেয়ে জহর বললে, 'পরিচয় মানে—থিয়েটার থেকে খোঁজ নিয়েছি, খুশিবানু ফৈজাবাদ থেকে এসেছে। দারুণ নাচ-গান জানে, বাইজির মেয়ে-টেয়ে বোধহয়। নাচ-গানের জন্যেই অচল মুখুজ্যে ওকে থিয়েটারে এনেছে।'

'কে এনেছে?'

'মিউজিক ডিরেক্টার অচল মুখুজ্যে। লোকটার কপাল দেখো! দুনিয়ার যত সুন্দরী মেয়ে সব যেন ওর কাছে মুড়ি-মুড়কি! —নাঃ, মরে আর জন্মে গাইয়ে হব!'

গম্ভীর হয়ে ভানু বললে, 'গাইয়ে হবি তুই!'

জহর বললে, 'হুঁ। ভাবছি, একটা তানপুরা কিনব।'

'কেনবার দরকার কী? তোর পেটে গোটা চারেক তার লাগিয়ে নিলেই হবে।'

হাসবার চেষ্টা করে জহর বললে, 'কী যে বলিস!'

ভানু ড্রয়ার খুলে আইগ্লাস এনে খুশিবানুর ছবিটা দেখতে লাগল কিছুক্ষণ। তারপর জহরের দিকে তাকিয়ে জেরা করলে, 'খুশিবানুকে আগে কখনও দেখেছিস?'

'না তো।'

'দেখেছিস।'

'ধেৎ; আমার তিনপুরুষে কেউ কখনও ফৈজাবাদে যায়নি, দেখব কী করে?'

ছবিখানা জহরের চোখের সামনে ধরে ভানু বললে, 'ভালো করে দেখ।'

ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে জহর বললে, 'না ভাই, আর দেখব না। বলেছি তো, সুন্দরী মেয়ের মুখ দেখলেই আমার বুকের মধ্যে "কাম সেপ্টেম্বরের" মিউজিক বাজে—যৌবনে কোকিল ডাকে—।'

ধমকে উঠল ভানু, 'রাবিশ! তোর যৌবনে যা ডাকে, সে কোকিল নয়, কাক! দাঁড়কাক! নাঃ, তোকে নিয়ে আর গোয়েন্দাগিরি চলবে না।'

ফুল। মেয়েটি পশ্চিমা, পরনে ধবধবে সাদা সাটিনের সালোয়ার আর কামিজ, মাথা ঘিরে বুকের ওপর ধানী রঙের ফিনফিনে দোপাট্টা।

মেয়েটি রতিলালের সামনে এসে দাঁড়াতেই জোঁকের মতো পুরু ঠোঁটজোড়া এবার দেড় ইঞ্চি ফাঁক হয়ে গেল। ক্যা তাজ্জব! বেহেস্তের এই হুরিকে কোত্থেকে কুড়িয়ে নিয়ে এল ওচোলবাবু!

অচল বললে, 'দেখে নিন শেঠজি, সিতারার পার্টে চলবে কি না।'

মেয়েটির দিকে তাকিয়ে রতিলাল প্রশ্ন করলে, 'নাম?'

চোস্ত উর্দু উচ্চারণে জবাব এল, 'খুশিবানু।'

'ঘর?'

'ফৈজাবাদ।'

'বাংলা জানেন? হামার ঠিয়েটার তো বাংলা আছে।'

খুশিবানু মিষ্টি হেসে নিখুঁত বাংলায় জবাব দিলে, 'জানি বইকী। বাংলাদেশে অনেকদিন আছি।'

আশ্বস্ত হয়ে রতিলাল বললে, 'ব্যস! ব্যস!...এবার টেস লিয়ে লিন, ওচোলবাবু।'

'টেস!' —অচল অবাক হয়ে তাকাল।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, গানের টেস।'

'ও, টেস্ট।'

খুশিবানুকে নিয়ে অচল স্টেজের ওপর উঠে গেল। ললিতাকুমারীর গানের প্রথম দুটো লাইন নিজে গেয়ে শোনাল। তারপর রতিলালকে শুনিয়ে প্রশ্ন করলে খুশিবানুকে, 'গাইতে পারবেন?'

'পারব।'

অচল হুকুম দিলে, 'স্টেজ ফাঁকা করে দাও—সব আলো নিভিয়ে ব্লু লাইট দাও—স্টার্ট মিউজিক! ওয়ান টু—ওয়ান টু—।'

নরম নীলাভ আলোয় একা স্টেজে দাঁড়িয়ে গাইতে শুরু করলে খুশিবানু ঃ

'শেষ প্রহরের চাঁদ যেতে-যেতে ফিরে যায়,
তোমার আমার মিলনের রাতি বুঝি বা পোহায়ে যায়।।'

মৃদু থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠল খুশিবানুর গান। বেহালার সঙ্গে এক হয়ে মিশে গেছে তার গলা। প্রাণের আবেগে সুরের মূর্ছনায় ভরে উঠল ফাঁকা প্রেক্ষাগৃহ। বাজিয়েরা তন্ময় হয়ে বাজাচ্ছে। সত্যিকারের সিতারা বোধ করি এর চেয়ে বেশি দরদ দিয়ে গাইতে পারত না।

একবার—দুবার—তিনবার মুখড়া গেয়ে থামল খুশিবানু। স্টেজ থেকে নেমে এল অচল। বললে, 'কেমন বুঝছেন, শেঠজি?'

কেঁদে-কেঁদে রতিলালের তখন সর্দি হয়ে গেছে। রুমালে সশব্দে নাক ঝেড়ে বললে, 'ওচোলবাবু, খুশিবানু পাবলিকের দিল জ্বালিয়ে দেবে। ললিতাকে হামি পানশো দিই, ওকে সাতশো দিব। রাজি?'

অচল বললে, 'বেশ। আজই কনট্রাক্ট করবেন তো?'

'জরুর। লেকিন, পাঁচ দিন তো মোটে বাকি। আপনি রাত ভোর রিহার্সাল দিতে থাকুন। আর হামি দমভোর পাবলিসিটি দিয়ে শহর গরম করিয়ে দিই।'

প্রবল উৎসাহে রতিলালের থলথলে চিবুক থরথর করে কাঁপতে লাগল।

শহর সত্যিই গরম করে দিলে রতিলাল। পোস্টারে-পোস্টারে ছেয়ে গেল যত দেওয়াল। পুরো-পাতা বিজ্ঞাপনে ভরে গেল যত দৈনিক কাগজ। সিতারার রূপসজ্জায় খুশিবানুর রঙিন মুখ, তার তলায় বড়-বড় হরফে লেখা ঃ

রুবি থিয়েটার্সের

নৃত্য-গীতমুখর নবনাট্য-নিবেদন

সিতারার স্বপ্ন

নাম ভূমিকায়

নবাগতা অভিনেত্রী

খুশিবানু

লোকের মুখে-মুখে শুধু একটি নাম—'খুশিবানু!'

'খুশিবানু! নামেই মনটা খুশি! চেহারাখানা দেখো, ডেঞ্জারাস!'

হাসি-হাসি মুখে জহর দৈনিক কাগজটা এগিয়ে দিল।

বিজ্ঞাপনের পাতায় খুশিবানুর ছবিখানার দিকে ভুরু কুঁচকে তাকাল ভানু। মাথায় নকশা-কাটা রুমাল বাঁধা একটি জিপসি মেয়ে। পানের মতো মুখাকৃতি, সুর্মা-টানা চোখে বাঁকা ইশারা, ঈষদ্‌ভিন্ন ঠোঁটে মোহিনী হাসি।

ছবিখানা বেশ কিছুক্ষণ দেখল ভানু। ভুরু দুটো আরও কুঁচকে গেল। বর্মা-চুরুটটা দাঁতে চেপে বললে, 'কে বল তো?'

জহর তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'একটি সুন্দরী মেয়ে।'

'ইডিয়ট!' —ধমকে উঠে ভানু বললে, 'সুন্দরী মেয়ে সে তো দেখতেই পাচ্ছি। এ কে? কোত্থেকে এল? পরিচয় কী?'

থতমত খেয়ে জহর বললে, 'পরিচয় মানে—থিয়েটার থেকে খোঁজ নিয়েছি, খুশিবানু ফৈজাবাদ থেকে এসেছে। দারুণ নাচ-গান জানে, বাইজির মেয়ে-টেয়ে বোধহয়। নাচ-গানের জন্যেই অচল মুখুজ্যে ওকে থিয়েটারে এনেছে।'

'কে এনেছে?'

'মিউজিক ডিরেক্টার অচল মুখুজ্যে। লোকটার কপাল দেখো! দুনিয়ার যত সুন্দরী মেয়ে সব যেন ওর কাছে মুড়ি-মুড়কি! —নাঃ, মরে আর জন্মে গাইয়ে হব!'

গম্ভীর হয়ে ভানু বললে, 'গাইয়ে হবি তুই!'

জহর বললে, 'হুঁ। ভাবছি, একটা তানপুরা কিনব।'

'কেনবার দরকার কী? তোর পেটে গোটা চারেক তার লাগিয়ে নিলেই হবে।'

হাসবার চেষ্টা করে জহর বললে, 'কী যে বলিস!'

ভানু ড্রয়ার খুলে আইগ্লাস এনে খুশিবানুব ছবিটা দেখতে লাগল কিছুক্ষণ। তার॰র জহরের দিকে তাকিয়ে জেরা করলে, 'খুশিবানুকে আগে কখনও দেখেছিস?'

'না তো।'

'দেখেছিস।'

'ধেৎ; আমার তিনপুরুষে কেউ কখনও ফৈজাবাদে যায়নি, দেখব কী করে?'

ছবিখানা জহরের চোখের সামনে ধরে ভানু বললে, 'ভালো করে দেখ।'

ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে জহর বললে, 'না ভাই, আর দেখব না। বলেছি তো, সুন্দরী মেয়ের মুখ দেখলেই আমার বুকের মধ্যে "কাম সেপ্টেম্বরের" মিউজিক বাজে—যৌবনে কোকিল ডাকে—।'

ধমকে উঠল ভানু, 'রাবিশ! তোর যৌবনে যা ডাকে, সে কোকিল নয়, কাক! দাঁড়কাক! নাঃ, তোকে নিয়ে আর গোয়েন্দাগিরি চলবে না।'

কাঁচুমাচু মুখে জহর বললে, 'রাগ করিস কেন? চকোলেট খা।'

ভানু এবার ফাইল থেকে ডক্টর দিগম্বর চ্যাটার্জির বিজ্ঞাপনের কাটিং বের করে আনল। নূপুরের ছবিখানা পাশে রেখে ফাউন্টেন পেন দিয়ে খুশিবানুর চিবুকের বাঁ-দিকে আঁকলে ছোট্ট একটা কালো তিল। তারপর জহরকে বললে, 'দেখ।'

দেখে জহরের গোল চোখ আরও গোল হয়ে উঠল। ঝুলে পড়ল নীচের ঠোঁটখানা। মুখ দিয়ে বেরোল, 'এ কী রে ভানু! এ যে—।'

কোঁচকানো ভুরু নিয়ে ভানু বললে, 'হুঁ! ভেরি ডাউটফুল! খুশিবানু আসল না নকল দেখতে হবে। এখুনি থিয়েটারের দুটো সিট বুক কর।'

টেলিফোনে ডায়াল কবে জহর তৎক্ষণাৎ ডাকলে, 'হ্যালো, রুবি থিয়েটার্স!'

রুবি থিয়েটার্সের 'সিতারার স্বপ্ন'। প্রেক্ষাগৃহে বাদুড় ঝুলছে। নাট্যপাগল মানুষ-বাদুড়। একস্ট্রা সিট দিয়েও কুলোয়নি। সাড়ে ছ'টায় শো আরম্ভ।

কাঁটায়-কাঁটায় সাড়ে ছ'টায় প্রেক্ষাগৃহের যত আলো একে-একে নিভে গেল। অতি মৃদু সুরে বেজে উঠল অর্কেস্ট্রা, ধীরে-ধীরে সরে গেল পরদা। স্টেজের ওপর নাটক শুরু হল। আরব্যোপন্যাসের যাদু যেন দর্শকের চোখের সামনে রূপ ধবে ফুটে উঠল।

শ্বেত পাথরে গড়া এক প্রাসাদের অলিন্দ। দূরে পাহাড়ের মাথায় সূর্যোদয় হচ্ছে। তরুণ শাহজাদা তার সহচরকে বলছে, 'কাল রাতে আমি এক আশ্চর্য স্বপ্ন দেখেছি, বন্ধু! আশমানের এক তারা থেকে এক পরমাসুন্দরী মেয়ে নেমে এল। চোখে তার তারার আলো, মুখে গোলাবের হাসি, কণ্ঠে বুলবুলের আওয়াজ। তাকে ধরতে গেলাম, পারলাম না। নাম জিজ্ঞাসা করতে সে বললে, সিতারা। তাকে দেখা অবধি আমার চোখে আর ঘুম নেই, মন পাগল। বলো বন্ধু, কী করে আমি পাব সেই স্বপ্নের সিতারাকে? কে এনে দেবে তাকে?'

সহচব বললে, 'তোমার আঙুলে তো যাদুর আংটি রয়েছে, শাহজাদা! ভাবনা কী?'

'ঠিক বলেছ বন্ধু।'

শাহজাদা তখন তার আংটি অলিন্দের পাথরে ঘষতেই ঝোড়ো হাওয়ার সোঁ-সোঁ শব্দ হতে লাগল, আর সঙ্গে-সঙ্গে দেখা দিল বিরাটকায় এক দৈত্য।

কুর্নিশ করে দৈত্য বললে, 'গোলামকে স্মরণ করেছেন কেন, শাহজাদা?'

শাহাজাদা হুকুম দিল, 'সেই কন্যাকে নিয়ে এসো, চোখে যার তারার আলো, ঠোঁটে গোলাবের হাসি আর কথায় বুলবুলের আওয়াজ।'

'জো হুকুম!'

দৈত্য অদৃশ্য হল।

অন্ধকার হয়ে গেল স্টেজ। ঘুরতে লাগল ঘূর্ণি মঞ্চ। সামনের পঞ্চম সারির দুটো চেয়ার দখল করে বসে আছে ভানু আর জহর। জহরের কানে-কানে চাপা তিরিক্ষে গলায় ভানু বললে, 'রাবিশ! অল গাঁজা-অ্যাফেয়ার্স! খুশিবানু কোথা?'

'দাঁড়া, এই তো সবে শুরু। পরের সিনে আসবে।'

'ঠিক জানিস?'

'শিওর অ্যান্ড সার্টেন।'

চুপি-চুপি জহর বললে।

ততক্ষণে স্টেজের ওপর দেখা দিল প্রমোদ-কাননের দৃশ্য। গুলবাগে মর্মর-চত্বরে শাহজাদা বসে। আকাশে মাধবী রাতের চাঁদ। একজন বাঁদি পেয়ালা ভরে সিরাজি আনলে, শাহজাদা ছুঁল না।

একজন রবাবের তারে ঝঙ্কার তুললে, আরেকজন শুরু করলে নাচ। শাহজাদা হাতের ইশারায় থামিয়ে দিল। বাঁদিরা অবাক চোখে এ ওর মুখের পানে তাকাল।

কিছুই ভালো লাগছে না আজ শাহজাদার! কোথায় সিতারা? আশমানের তারা থেকে নেমে-আসা সেই অপরূপ কন্যা ? তাকে স্বপ্নে দেখা অবধি পাগল হয়ে উঠেছে শাহজাদার তরুণ হৃদয়। এখনও আসছে না কেন যাদু-আংটির সেই দৈত্য?

ঠিক এই সময় শোনা গেল ঝোড়ো হাওয়ার সোঁ-সোঁ শব্দ। আর সঙ্গে-সঙ্গে এসে হাজির সেই দৈত্য। তার পিঠে এক মস্ত ঝোলা।

শাহজাদাকে কুর্নিশ করে ঝোলার মুখটা খুলে দিয়েই সে অদৃশ্য হয়ে গেল। আর ঝোলার ভেতর থেকে বেরিয়ে এল আশ্চর্য রূপবতী এক কন্যা।

পলক পড়ল না শাহজাদার চোখে। এই তো সেই মেয়ে। চোখে যার তারার আলো, মুখে গোলাবের হাসি!

বাঁদিরা অবাক হয়ে প্রশ্ন করলে, 'কে তুমি?'

বুলবুলের মতো মিঠে আওয়াজে মেয়েটি জবাব দিল ঃ

'নীল আশমানে তারা হয়ে ছিনু আমি,
কে যেন ডাকল, মাটিতে এলাম নামি।
(মোর) হাসিতে গোলাপ ফোটে,
আমার গানে যে বুলবুল গেয়ে ওঠে,
আমি যে স্বপ্ন, যেন আলেয়ার ছলনা,
কে আমি ? আমি কে বলো না?

বিহ্বল শাহজাদা বলে উঠল, 'সিতারা!'

গদগদ জহর বললে, 'খুশিবানু!'

উত্তেজিত ভানু বললে, 'নূপুর চ্যাটার্জি!'

প্রমোদ-কাননে তখন ব্যালে নাচ শুরু হয়ে গেছে। মুগ্ধ শাহজাদা সিতারাকে ধরতে চাইছে, আর সিতারা ধরা দিয়েও ধরা দিচ্ছে না, নৃত্যরতা বাঁদিদের মাঝে পালিয়ে-পালিয়ে বেড়াচ্ছে। অর্কেস্ট্রায় বাজছে মধুর ছন্দ, নানা রঙের আলোর খেলায় স্টেজের ওপর যেন ইন্দ্রধনুর মেলা!

দর্শকরা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে দেখছে আর শুনছে। জহরের বাহ্যজ্ঞান নেই। হঠাৎ ভানুর কনুইয়ের একটা গুঁতো খেয়ে কোঁক করে উঠল। মুখ ফেরাতেই তার কানে-কানে কী যেন বলল ভানু। তারপর দুজনে সিট ছেড়ে উঠে, শিকারি বেড়ালের মতো গুঁড়ি মেরে অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহ থেকে বেরিয়ে গেল।

না, থিয়েটার ছেড়ে চলে যায়নি ভানু-জহর। থিয়েটারের পিছন দিকে স্টেজে ঢোকবার দরজার মুখে এসে দাঁড়াল তারা। একবার দেখল দরজায় লোক নেই। তারপর সুট করে ঢুকে গেল দুজনে।

অর্কেস্ট্রার ছন্দ তখন দ্রুততর হয়েছে। জমে উঠেছে নাচ। প্রমোদ-কাননে বাঁদিদের মাঝখানে প্রজাপতির মতো উড়ে বেড়াচ্ছে সিতারা। আলোর খেলায় রূপের মেলায় হাজার আরব্য-রজনীর একটা রাত যেন সত্যিই নেমে এসেছে স্টেজের ওপর। হঠাৎ দু-ধারের উইংসের পাশ থেকে স্টেজে ঢুকে পড়ল ভানু আর জহর।

ঘাঘরা-ওড়না পরা একঝাঁক সুন্দরীর মাঝখানে আচমকা সেই কোট-প্যান্ট পরা দুটি বিচিত্র মূর্তির আবির্ভাবে আরব্য-রজনীর স্বপ্ন এক মুহূর্তের জন্য লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল। থেমে গেল বাঁদিদের কোরাস গান, হারিয়ে গেল ভয়ে-কাঠ খুশিবানু ওরফে নূপুরের নাচের ছন্দ! রয়্যাল বক্স থেকে হাঁসফাঁস করতে-করতে স্টেজের দিকে ছুটল চর্বির তাল রতিলাল শেঠ। মিউজিকের জায়গা ছেড়ে উইংসের পাশে এসে দাঁড়াল অচল। আর ভানু-জহরকে দেখেই দারুণ জলতেষ্টায় শুকিয়ে উঠল তার গলা।

কিন্তু সবই এক মুহূর্তের জন্যে।

তারপর যেমন চলছিল, তেমনিই চলতে লাগল নাচগান। হইহই করতে গিয়ে চুপ হয়ে গেল দর্শকরা। স্টেজের ওপর তখন শুরু হয়ে গেছে সিতারার সত্যিকার লুকোচুরি খেলা। ভানু-জহর যতই ধরতে যায়, নূপুর ততই পাশ কাটিয়ে পালায়। এ-বাঁদির পাশ দিয়ে, ও-বাঁদির পিছন দিয়ে, সে-বাঁদির আড়াল দিয়ে। ভানু জহর যেন গোলকধাঁধায় পড়েছে।

অর্কেস্ট্রায় দ্রুতলয়ে নাচের ছন্দ বেজে চলেছে। বাঁদিরা নাচছে, নূপুর নাচছে, দলে পড়ে বা দায়ে পড়ে ভানু-জহরও নাচছে।

খুশি হয়ে দর্শকেরা পায়রা উড়িয়ে দিল। ফেটে পড়ল প্রেক্ষাগৃহ হাততালির আওয়াজে। এমন চমৎকার কমিক সিন তারা জীবনে দেখেনি।

রতিলালের থলথলে চিবুক খুশিতে থরথর করে কাঁপছে। অচলের কানে-কানে বললে, 'বহুত আচ্ছা কমেডিয়ান! বাংলার লোরেল-হার্ডি আছে, কী বোলেন?'

উইংসের পাশ থেকে অচলের সজাগ চোখ দুটো নূপুরের সঙ্গে যেন আঠা দিয়ে সাঁটা। প্রমোদ-কাননের দৃশ্যের বদলে এতক্ষণ সে দেখছিল থানা-পুলিশ-আদালত!

রতিলালের কথায় মুখ না ফিরিয়েই বললে, 'নিশ্চয়। দারুণ জমিয়েছে সিনটা! ওদের ছাড়বেন না, শেঠজি, আজই কনট্রাক্ট করে নিন।'

ঠিক এইসময় ভানুর হাতের তলা দিয়ে, জহরের ভুঁড়ির পাশ কাটিয়ে নূপুর উইংসের ধারে এসে পড়ল। আর বিদ্যুৎগতিতে তার হাত ধরে ভেতরে টেনে নিয়ে অচল বলে উঠল, 'ওদের স্টেজ থেকে বেরোতে দেবেন না, শেঠজি, সিনটা মাটি হয়ে যাবে! খুশিবানু ড্রেস চেঞ্জ করে এখুনি আসছে।'

নূপুরকে ধরতে ভানু-জহরও তখন নাচতে-নাচতে উইংসের ধারে এসে পড়েছে। উৎসাহী দর্শক আবার পায়রা ওড়াল।

হাঁসফাঁস করে উইংসের পথ আগলে দাঁড়াল রতিলাল, 'আরে, আরে, কোথা যাচ্ছেন? শুনচেন না, পাবলিক কেলাপ দিচ্ছে! সিনটা মার্ডার হইয়ে যাবে! যান, যান, ফের নাচ করুন! খুশিবানু এখুনি আসছে।'

একরকম ঠেলেই রতিলাল দুজনকে আবার স্টেজের ভেতরে চালান করে দিলে।

অর্কেস্ট্রায় নাচের ছন্দ আরও দ্রুত হয়ে উঠল। রঙিন আলোয় রঙিন ঘাঘরা ফুলিয়ে অভ্যস্ত পায়ে বাঁদিরা নেচে চলেছে। তাদের সঙ্গে তাল রাখতে গিয়ে ভানু স্প্রিংয়ের পুতুলের মতো অনবরত হাত-পা ছুঁড়ছে। জহর গলদঘর্ম, দরদর করে ঘাম গড়াচ্ছে। মুখে অমায়িক হাসি, দুটো চোখের তারা দু-দিকে।

রতিলাল হাঁকলে, 'ফেলাশ!'

সঙ্গে-সঙ্গে লাল-নীল দুটো ফ্ল্যাশ-লাইট এসে পড়ল ভানু-জহরের মুখে।

আরও একটু দ্রুত হল নাচের মিউজিক।

ভানুর দম ফুরিয়ে আসছে। তবু ধনুষ্টঙ্কার রোগীর মতো প্রাণপণে হাত-পা ছুঁড়ছে। জহরের অবস্থা আরও কাহিল। এঞ্জিনের মতো হাঁপাচ্ছে, বিরাট একটা হাপরের মতো ওঠা-নামা করছে ভুঁড়িটা। মুখে অমায়িক হাসি নিয়ে তবু নাচছে জহর।

হঠাৎ পট করে ছিঁড়ে গেল কোটের একটা বোতাম। ভ্রূক্ষেপ নেই জহরের। তারপর আরও একটা বোতাম। দৃকপাত নেই তার। অবশেষে প্যান্টের পুরোনো চামড়ার বেল্ট।

হাজার হাতের হাততালিতে ফেটে পড়ল প্রেক্ষাগৃহ। যেন উড়ে গেল একলক্ষ পায়রা। বাঁদিরা মুখে ওড়না চাপা দিল।

খেয়াল নেই জহরের। নাচের নেশায় নেচেই চলেছে। যেন উদয়শংকরকে ডাউন করে দেবে, এই পণ।

হঠাৎ ভানুর দিকে চোখ পড়তেই থমকে থেমে গেল জহর। দেখলে তার কোমরের দিকে তাকিয়ে ভানুর চোখ দুটো ভাঁটার মতো গোল-গোল হয়ে উঠেছে। ভানুর মুখ থেকে নিজের কোমরের দিকে চোখজোড়া নেমে আসতেই জহরের অমায়িক হাসি শুকিয়ে গেল। প্যান্ট আর কোমরে নেই! রয়েছে শুধু আন্ডারওয়্যার!

হাঁপাতে-হাঁপাতে করুণ স্বরে জহর শুধু বলে উঠল, 'ড্রপ!'

ধীরে-ধীরে পরদা নেমে এল।

পাঁচ

সেই রাতে।

অস্টিন কেমব্রিজখানা তখন যোধপুর পার্কের পথে ছুটেছে। অচলের পাশে নূপুর। পরনে সিতারার পোশাক। মুখের মেক-আপ তোলারও সময় পায়নি।

অচল বলছে, বুলডগের হাত থেকে বরং বাঁচা যায়, কিন্তু গোয়েন্দা-জাতটা তার চেয়েও সাংঘাতিক! ওরা বোধহয় গন্ধে-গন্ধে টের পায়! নইলে খুশিবানুর মেক-আপে নূপুর চ্যাটার্জিকে চিনে ফেলল কী করে?

শুকনো গলায় নূপুর বললে, 'কী হবে এখন? থিয়েটারের চাকরিটা—।'

'চুলোয় যাক থিয়েটারের চাকরি। এখন চাচা আপনা বাঁচা।' —তেতো গলায় অচল বলে উঠল।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে নূপুর বললে, 'তাই করুন। আমার জন্যে অনেক ঝামেলা আপনি নিজের কাঁধে নিয়েছেন। কতদিন মানুষ পারে? আমায় বরং ছেড়ে দিন—আমার কপালে যা আছে, তাই হোক!'

বলতে-বলতে কান্নায় নূপুরের গলা বুজে এল।

ঝাঁঝিয়ে উঠল অচল, 'ওই তো দোষ মেয়েদের! পানসে চোখের জল ঝরতেই আছে! আপনার ঝামেলা আমি কাঁধে নিয়েছি সে আমার খুশি, আপনার তাতে কী? ওঃ, ভারি উদারতা দেখাচ্ছেন—আমায় ছেড়ে দিন! আমি ছেড়ে দিলেও পুলিশ আমায় ছাড়বে নাকি? ফেরারি নূপুর চ্যাটার্জির সঙ্গে জড়িয়ে আমাকে সুদ্ধু কোর্টে দাঁড় করাবে না? লোকে তখন ভাববে কী শুনি?'

ভয়ে-ভয়ে নূপুর বললে, 'কী ভাববে?'

'ভাববে আপনাকে আমি ভা—ভা—ভা—।'

অচল তোতলাতে শুরু করলে। হঠাৎ-উত্তেজনায় ওর প্রায়ই এমন হয়। কিন্তু কথাটা স্পষ্ট করে বেরিয়ে আসার আগেই নূপুর মুখ লাল করে বললে, 'মোটেই ভাববে না।' তারপর একটু থেমে আস্তে-আস্তে বললে, 'এ তো আর সত্যি নয়।'

'সত্যি হতে কতক্ষণ! আপনার মতো মেয়েরা ভে—ভে—ভেলকি জানে। অল রেডি আপনাকে আমার ভালো লাগতে শুরু হয়েছে জানেন? কপালে আমার কী যে আছে তাই ভাবছি।' —অচল সখেদে ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেললে।

এত দুঃখেও নূপুরের হাসি পেয়ে গেল। তবু ব্যস্ত হয়ে বললে, 'ও ভাবনা পরে ভাবলেও চলবে। এখন কী করা যায় তাই ভাবুন।'

'ভেবেছি।'

'কী?'

'আগে বাড়ি চলুন; বলছি।'

'পালাতে হবে। এখুনি আমাদের পালাতে হবে।' —ছোট একটা স্যুটকেস গুছোতে-গুছোতে অচল বললে।

নূপুর প্রশ্ন করলে, 'কোথায়?'

'কলকাতার বাইরে।'

'কলকাতার বাইরে কোথায়?'

'যেখানে হোক। স্টেজে উইংসের পাশে আমাকে ভানু-জহর দেখেছে। যে-কোনও মুহূর্তে এখানে এসে হানা দিতে পারে। তার আগেই পালিয়ে যাওয়া চাই। যান, রেডি হয়ে নিন।'

নূপুব শোওয়ার ঘরে ঢুকলে।

চটপট করে অচল স্যুটকেসটা গুছিয়ে নিলে। ড্রয়ার খুলে ক্যাশ টাকা যা ছিল মনিব্যাগে ভরলে। তারপর ডাকলে, 'হল আপনার?'

ভেজানো দরজা খুলে বেরিয়ে এল নূপুর। মুখের রং তুলে ফেলেছে। পরনে শাড়ি। বললে, 'চলুন।'

কিন্তু তার দিকে বড়-বড় চোখে তাকিয়ে অচল বলে উঠল, 'এ কী করেছেন?'

হকচকিয়ে গেল নূপুর। বললে, 'কেন? কী হল?'

'খুশিবানু সেজেও গোয়েন্দার চোখে ধুলো দিতে পারলেন না। আর আপনি কি আশা করেন, বিনা মেক-আপে পুলিশকে ঠকাতে পারবেন?'

নূপুর বললে, 'গলা অবধি ঘোমটা টেনে দেব?'

'পুলিশ যদি ঘোমটা তুলে দেখে?'

'আচ্ছা, মুসলমানি বোরখা পরলে হয় না?'

'সে তো আরও সন্দেহজনক। পুলিশ অত বোকা নয়।'

ভয়ানক দমে গেল নূপুর। বললে, 'তা হলে উপায়?'

একটা সিগারেট ধরিয়ে অচল দেশলায়ের বাক্সে আঙুল দিয়ে মৃদু-মৃদু তাল দিতে লাগল। তারপর হঠাৎ বলে উঠল, 'ঠিক আছে!'

দুই চোখে জিজ্ঞাসা নিয়ে নূপুর তাকাল।

শোওয়ার ঘরে ঢুকল অচল। ওয়ার্ডরোব খুলে নীচের ড্রয়ার থেকে একটা পুরোনো ট্রাউজার, একটা কোট আর শার্ট বের করে ফেললে।' খুশি মুখে বললে, 'যাকে রাখো, সেই রাখে। এগুলো আমার পাঁচ-সাত বছর আগেকার। কে জানত, আজ কাজে লেগে যাবে!'

আলনা থেকে একটা ফেল্টহ্যাট নূপুরের মাথায় বসিয়ে দিয়ে অচল ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মিনিট দশেক বাদে নতুন রূপসজ্জায় সেজে বেরিয়ে এল নূপুর। এক মিনিট তীক্ষ্ণ চোখে তার দিকে তাকিয়ে অচল বললে, 'আপনার মেকআপের বাক্স থেকে ভুরু-আঁকা পেনসিলটা দিন তো?'

'কী হবে?'

'দিয়েই দেখুন না!'

পেনসিলটা এনে দিতেই অচল বললে, 'অফেন্স নেবেন না যেন। চোখ বন্ধ করুন।'

হতবাক নূপুর চোখ বুজলে।

মিনিট দুয়েক বাদে অচল বললে, 'ব্যস, নিশ্চিন্ত! এইবার নূপুর চ্যাটার্জিকে চেনে কার সাধ্যি। চোখ খুলুন।'

চোখ মেলতেই চোখ পড়ল সামনে ড্রেসিং আরশির ওপর। আর একটু হলেই নূপুর চেঁচিয়ে উঠত। তার টিকোলো নাকের নীচে গোলাপি ঠোঁটের ওপর সূক্ষ্ম একজোড়া গোঁফের রেখা।

সিঁড়িতে দেখা। একেবারে মুখোমুখি।

সেই চিরপরিচিত পালিশ-করা টাক।

একগাল হেসে দুন্দুভিবাবু বললেন, 'কই যান? হাতে সুটকেস দ্যাখছি যে?'

অচলকে বাধ্য হয়ে দাঁড়াতে হল। বললে, 'চেঞ্জে যাচ্ছি।'

'তাই নাকি! কোনহানে?'

'এই কাছে-পিঠে। লালটিলা।'

'তা একা যাইতে আছেন কেন? বউঠান কই?'

'বউঠান! ইয়ে—তিনি আগেই চলে গেছেন।'

দুন্দুভিবাবু টাক চুলকে বললেন, 'অ, তাই কন। হনিমুনে যাইতে আছেন।'

অচল বললে, 'কী জ্বালা! হনিমুন কোথায়? চেঞ্জে।'

হেসে দুন্দুভিবাবু বললেন, 'একই কথা। কপোত-কপোতী মিল্যা চেঞ্জে গ্যালে তারে হনিমুনই কয়। আমিও বুঝিরে মশয়। আমিও একদিন লভ ম্যারেজ করছিলাম।'

'লাভ ম্যারেজ! আপনি!'

অচলের চোখ দুটো গোলাকার হয়ে উঠল।

দুন্দুভিবাবু বললেন, 'হ। তখন আমার একমাথা চুল আছিল। আর, সেই দেইখ্যা আমার ওয়াইফ একেরে লভ অ্যাট ফার্স্ট সাইট।'

অচলের পিছন থেকে 'খুঁক' করে একটা ছোট্ট আওয়াজ শোনা গেল। সেদিকে তাকিয়ে দুন্দুভিবাবু বললেন, 'আপনার পিছনে ও সায়েব ছোকরাটি কে, অচলবাবু? বউঠানের মুখখান যেন বসানো।'

ঘাবড়ে গিয়ে অচল বললে, 'ইয়ে—মানে—আমার শা—সম্বন্ধী।'

দুন্দুভিবাবু বললেন, 'অ। বেশ, কিষ্টো-কিষ্টো চেহারা। তা পশ্চিমে যাইবেন, টিকেট আগেভাগে কাটছেন তো। স্টেশনে যা ভিড়।'

'মোটরেই যাব। এই তো সোয়া শো মাইলের মধ্যে।. আচ্ছা, চলি।'

তরতরিয়ে কয়েক ধাপ নেমে গেল অচল। মুখে রুমাল চেপে নূপুরও। অচল কিন্তু আবার উঠে এল। বললে, 'একটা কথা। আমি যে লালটিলা যাচ্ছি, কাউকে বলবেন না যেন। প্লিজ।'

দুন্দুভিবাবু বললেন, 'রাম কহো। আমি যা শুনি, ব্যাবাক হজম কইরা ফ্যালাই। কিচ্ছু চিন্তা করবেন না। —আসেন। দুর্গা, দুর্গা।'

একটু বাদেই নীচের থেকে অস্টিন কেমব্রিজের গর্জন দূরে মিলিয়ে গেল। আর, প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই উনিশশো উনত্রিশ সালের সেই বনেদি ফোর্ডখানা পাড়া কাঁপিয়ে এসে হাজির।

সিঁড়িতে আবার জুতোর আওয়াজ পেয়ে দুন্দুভিবাবু ফিরে তাকালেন। ভানু-জহর তাঁকে একরকম ঠেলেই ওপরে উঠে গেল।

কিন্তু অচলের ফ্ল্যাটের দরজায় তালা।

ভানু বললে, 'তাই তো।'

জহর বললে, 'নাই তো।'

দুজনে সিঁড়ির ধাপে বসে পড়ল। পিছন থেকে গলা বাড়িয়ে দুন্দুভিবাবু বললে, 'কারে খোঁজেন স্যার?'

ভানু বললে, 'অচল মুখার্জি—।'

'এইমাত্র মোটরে চাইপ্যা হনিমুনে গেছেন।'

'হনিমুনে।'—তড়াক করে লাফিয়ে উঠল ভানু। '—কোথায় গেছে বলতে পারেন?'

মাথা নেড়ে দুন্দুভিবাবু বললেন, 'উঁহু, সেটি কমু না।'

'বলনু না দয়া করে—বিশেষ দরকার—ভীষণ জরুরি।'

'মাপ করেন, মশয়। কইতে পারুম না।'

দুন্দুভিবাবু অটল।

চুরুটটা দাঁতে চেপে ভানু বললে, 'হোপলেস।'

জহর দুন্দুভিবাবুর হাত দুটো ধরে ফেললে। কাঁদো-কাঁদো মুখে বললে, 'দোহাই দাদা, কেস খারাপ করবেন না। পঁচিশ হাজার টাকা মাঠে মারা যাবে। বলুন, অচল মুখুজ্যে কোথায় হনিমুন করতে গেছে? দিল্লি? আগ্রা? কাশ্মীর?'

দুন্দুভিবাবু খাপ্পা হয়ে উঠলেন, 'দূর মশয়! মাথাডা আপনার খারাপ। বউ গেল লালটিলা, আর সে যাইবে গিয়া কাশ্মীর! —যান, যান, পথ দ্যাখেন। আমি কমু না—অচলবাবু কোনহানে গেছে কিছুতেই কমু না।'

নিজের ফ্ল্যাটে ঢুকে দুন্দুভিবাবু দড়াম করে দরজা বন্ধ করলেন।

আর, ভানু-জহর একসঙ্গে বলে উঠল, 'ইউরেকা! লালটিলা!'

যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই সন্ধে হয়।

হেডলাইটের আলোয় দেখা গেল, কারা যেন হাত তুলে গাড়ি থামাতে বলছে। অদূরে রেল-লাইনের একটা লেভেলক্রসিং।

গাড়ি থামতেই টর্চের আলো পড়ল মুখে! পুলিশের টর্চ! গুরুগম্ভীর গলার প্রশ্ন শোনা গেল, 'নাম?'

'অচল মুখার্জি।'

'যাওয়া হচ্ছে কোথায়?'

'লালটিলা। কেন বলুন তো? কী ব্যাপাব?'

সূচলো গোঁফের প্রান্ত পাকিয়ে পুলিশ-অফিসার বললে, 'দিল্লির এক ডাক্তারের মেয়ে পালিযে গেছে, আমরা তাকেই খুঁজছি।... আপনার সঙ্গে কে?'

অচল একবার চোরা চোখে নূপুরের দিকে তাকালে। তারপর ঢোক গিলে বললে, 'ইনি আমার ইয়ে—বা—বা—ব্রাদার ইন-ল।'

'নাম কী?'

'নাম—মানে—নকল চ্যাটার্জি।'

পুলিশ-অফিসারের সূচলো গোঁফের একটা প্রান্ত উঁচু হয়ে উঠল। সন্দিগ্ধ গলায় বললে, 'নামের বাহার তো খুব! কিন্তু চেহারাটা তো দেখছি মেয়ে-মেয়ে!'

কোট-প্যান্টের আড়ালে নূপুরের সর্বাঙ্গ হিম হয়ে গেল। কপালে নাকে ঠোঁটের ওপর বিনবিন করে দেখা দিল ঘাম।

অচল তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার, ঠিক ধরেছেন! যাত্রায় ফিমেল পার্ট করে কিনা! মওড়ার সখিও সাজে।'

'বটে!' —অফিসারের সূচলো গোঁফের উঁচু প্রান্তটা আবার নেমে এল। কিন্তু গলায় সন্দেহের সুর যেন কাটল না। বললে, 'কিন্তু এই গরমে গরমের স্যুট পরেছ কেন হে, ছোকরা? ঘেমে তো নেয়ে যাচ্ছ দেখছি!'

কলের পুতুলের মতো নূপুর পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখের ঘাম মুছে ফেললে।

আর, নূপুরের দিকে তাকিয়ে অচলের মুখ শুকিয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি বললে, 'এই রে! রাধা সেজে-সেজে এর আবার মৃগী রোগ হয়েছে কি না! ঘামতে শুরু করলেই ফিট হয়...আমরা যেতে

পারি, স্যার?'

টর্চ নিভিয়ে অফিসার বললে, 'আচ্ছা, যান।'

পরমুহূর্তেই অচলের পা অ্যাকসিলেটর চেপে ধরলে। হাওয়ায় যেন উড়ে গেল অস্টিন কেমব্রিজ।

লেভেল ক্রসিং পার হয়ে অচল বললে, 'আর একটু হলেই হাতে দড়ি দিয়েছিলেন আর কী! ভাগ্যিস অফিসারের নজর পড়েনি।'

অবাক হয়ে নূপুব বললে, 'কী হয়েছে?'

'আমার মাথা! ঘাম মুছতে গিয়ে আপনার ডানদিকের গোঁফটা মুছে গেছে, আবার এঁকে নিন।'

ছয়

লালটিলা এল অনেক রাতে।

জানা একটা হোটেলের কম্পাউন্ডে অস্টিন কেমব্রিজখানা থামল। দোতলায় একখানা মাত্র ঘর খালি আছে; তাই সই।

বাথরুম থেকে হাত-মুখ ধুয়ে পোশাক বদলে দুজনে যখন দুটো চেয়ারে এসে বসল, ক্লান্তিতে তখন চোখ জুড়ে আসছে। খাওয়ার প্রয়োজন ছিল না, সেটা পথেই সারা হয়েছে।

অচল বললে, 'এবার শুয়ে পড়া যাক। আপনি ঘরে, আমি বারান্দায়।'

'উঁহু, আপনি ঘরে, আমি বারান্দায়।' —নূপুর বললে।

'তা হয় না।'

'খুব হয়।'

অচল বললে, 'একগুঁয়েমি মেয়েদের স্বভাব। —আচ্ছা, আপনার কথাও থাক, আমার কথাও থাক।' —ঘবে জোড়া খাট ছিল, অচল একখানা টেনে ওধাবে নিয়ে গেল। স্যুটকেস থেকে নূপুরের একখানা শাড়ি নিযে ঘরের মাঝামাঝি টাঙিয়ে দিলে পার্টিশন কবে। তাবপর বললে, 'আর কথা নয়। ঘুমিয়ে পড়ুন।'

দুজনে শুয়ে পড়ল দুখানা খাটে। মাঝে রইল শাড়ির পার্টিশন। পাহারা দিতে লাগল একটা দেওয়ালগিরি।

ওদিকে সেই সময় উনিশশো উনত্রিশ সালের ফোর্ডখানা হাঁপাতে-হাঁপাতে লালটিলার সীমানায় এসে পৌঁছল।

ভানু বললে, 'যত হোটেল আছে, সব খুঁজে দেখতে হবে। এবার দেখি, ভানু-গোয়েন্দার হাত ফসকে শ্রীমান অচল কেমন করে সচল হয়! বাছাধন ঘুঘু দেখেছে, ফাঁদ তো দেখেনি! কী বলিস?'

উত্তরে ভানুর পাশ থেকে একটা আওয়াজ এল, 'গব্‌র্ ঘোঁৎ।'

ধাক্কা দিয়ে ভানু ডাকলে, 'এই জহর! ঘুমোচ্ছিস!'

চমকে উঠে জহর বললে, 'নাঃ, ঘুমোব কেন? চোখ বুজে ভাবছিলাম।'

তিরিক্ষে-মেজাজে ভানু বললে, 'চোখ খুলে ভাব, ঘুম-তাড়ানো চকোলেট খেয়ে নে। আমি রাস্তার ডান ধারে লক্ষ রাখছি, তুই বাঁ-ধারে রাখ। লালটিলার হোটেলগুলোতে গ্যারেজ নেই, সুতরাং

অচল মুখুজ্যের গাড়ি যেখানে পাবি, জানবি সেই হোটেলেই ওরা উঠেছে। বুঝলি?'

উত্তরে আবার আওয়াজ শোনা গেল, 'গর্‌র্‌ ঘোঁৎ।'

ঘুমের জন্যই শোওয়া। কিন্তু শোওয়ার পর ঘুম নেই।

লালটিলার রাত ঝিমঝিম করছে।

বারান্দার দিকে জানলা খোলা। খানিক আগে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। দেখা যাচ্ছে, বৃষ্টি-ধোওয়া একটুকরো ফিরোজা-রঙের আকাশ, একমুঠো ফিকে জ্যোৎস্না। অনেক দূরে কোথায় যেন বুনো বাঁশি বাজছে। আর তার সঙ্গে ঢাকের গম্ভীর আওয়াজ।

শুনতে বেশ ভালো লাগছে। পাশ ফিরে শুল নূপুর। শাড়ির পার্টিশনের ওপাশে যে-মানুষটা শুয়ে, সে কি জেগে, না ঘুমিয়ে আছে? এমন রাতেও মানুষের ঘুম আসে? কী ক্ষতি হত, সে যদি এখন জেগে থাকত? অদ্ভুত মানুষ যা হোক! ঘুমোক সে পড়ে-পড়ে, নূপুব কিন্তু আজ জেগে থাকবে—সারাবাত।

বিছানায় উঠে বসল নূপুর। তারপর আস্তে-আস্তে দরজা খুলে বেরিয়ে এল বারান্দায়। এদিকটা হোটেলের পিছন দিক। উঁচু-নিচু ধু-ধু মাঠ। গাছ-গাছালির ঝোপ। আকাশে হেলান-দেওয়া টিলার সারি, তারই মাথায় আধখানা মোছা-টিপের মতো ভাঙা চাঁদ।

আজকের রাতটা আশ্চর্য। বাইশ বছর বয়েসে নূপুরের এই প্রথম মনে হল, ভারি একা লাগছে। অথচ জলজ্যান্ত একটা মানুষ ঘরের মধ্যে দিব্যি ঘুমোচ্ছে।

চোখ ফেরাতেই হঠাৎ খুশিতে নূপুরের বুকের ভেতরে যেন ঢেউ খেলে গেল। বারান্দাব ওপাশে সিগারেট হাতে দাঁড়িয়ে অচল না? চুপ করে দাঁড়িযে কী ভাবছে?

এগিয়ে গেল নূপুর। বললে, 'ঘুমোননি?'

অচল ফিবে তাকিয়ে বললে, 'ঘুম আসছে না।'

'সেকী! কেন?'

থতমত খেয়ে অচল জবাব দিলে, 'ইয়ে—ম-ম-মশা।'

তারপর একটু থেমে জিগ্যেস করলে, 'আপনি ঘুমোননি কেন?'

নূপুর বললে, 'ছারপোকা।'

আচমকা ভানুর কনুইয়ের গুঁতো খেয়ে ধড়মড় করে জেগে উঠল জহব।

চাপা গলায় ভানু বললে, 'দেখেছিস?'

আশপাশে তাকিয়ে জহর বললে, 'হুঁ।'

'কী দেখেছিস?'

'কোলাব্যাঙ।'

খিঁচিয়ে উঠল ভানু, 'সে তো আমার পাশেই বসে আছে! নাঃ, তোকে দিয়ে কিসসু হবে না।'

কাঁচুমাচু হয়ে জহর বললে, 'রাগ করছিস কেন? বল না কী দেখব?'

'ওই বাড়িটার কম্পাউন্ডে একখানা মোটর দেখতে পাচ্ছিস?'

'পাচ্ছি।'

'টর্চটা নিয়ে ওর নম্বরটা দেখে আয়।'

টর্চ হাতে নেমে গেল জহর। ফিরে এসে বললে, '০১০৯।'

উৎফুল্ল হয়ে ভানু বললে, 'অচল মুখুজ্যের গাড়ি। সুতরাং এই হোটেলেই ওরা উঠেছে।'

জহর বললে, 'শিওর অ্যান্ড সার্টেন। হোটেলের দরজায় ধাক্কা দেব?'

'না, ধাক্কা দিলে ওরা জেনে ফেলবে। অন্য উপায়ে ঢুকতে হবে। আয়।'

বনেদি ফোর্ডখানা খানিকটা তফাতে রেখে দুজনে পা টিপে-টিপে গিয়ে দাঁড়াল হোটেলের কম্পাউন্ডে। বাড়িখানা নিঝুম, সব ঘরই অন্ধকার। কম্পাউন্ড দিয়ে ঘুরে ওরা গেল হোটেলের পিছনে। সেদিকেও একটা দরজা—কিন্তু বন্ধ। এদিকটা একেবারে নির্জন। দরোয়ান বা চাকর-বাকরের কোনও চিহ্ন নেই।

ফিসফিস কবে জহব বললে, 'এ দরজাও বন্ধ যে! ঢুকবি কী করে?'

চাপা গলায় ভানু বললে, 'গোয়েন্দার কাছে কিছুই অসম্ভব নয়। রবার্ট ব্রেক বড়-বড় দুর্গ-প্রাসাদে কী কবে ঢুকত জানিস?'

'না তো।'

'দেখাচ্ছি, দাঁড়া।'

ভানু চলে গেল। গাড়ির ভেতর থেকে নিয়ে এল একটা রোপল্যাডার—আংটা লাগানো দড়ির মই। ওপর দিকে তাকিয়ে দেখল, দোতলার ঘরগুলোর সামনে সারি-সারি ঝুল-বারান্দা। সেদিকে লক্ষ করে ভানু দড়ির মই ছুঁড়তেই একটা বারান্দার আলসেয় আটকে গেল আংটা।

ভানু বললে, 'নে, উঠে পড়।'

জহর ঘাবড়ে গিয়ে বললে, 'আমি!'

চাপা গলায় ভানু ধমকে উঠল, 'তুই না তো কি আমি?'

আমতা-আমতা কবে জহর বললে, 'না—মানে আমার ওয়েট একটু বেশি কি না—যদি ছিঁড়ে-টিড়ে যায়—।'

'ইডিয়ট! হাতি চড়লেও এ-দড়ি ছিঁড়বে না। ওঠ!'

'দুর্গা! দুর্গা!' বলে দড়িব মইয়ে জহর পা দিল।

আর ঠিক সেই সময় ঘব থেকে বাবান্দায় বেরিয়ে এল নূপুর আব অচল।

তরুণ বয়েসে একরকম ইনসমনিয়া বা অনিদ্রা-রোগ হয়। সেটা দেখা দেয় অবিবাহিত কুমার-কুমারীদের মধ্যে। আর, সে-রোগে আক্রান্ত হলেই কল্পিত মশা এবং ছারপোকা কামড়াতে শুরু করে।

অচল আর নূপুরকে আজ সেই রোগে ধবেছে।

'জায়গাটা বেশ, না?'

'হুঁ। রাতটাও চমৎকার!'

'এখানে কিছুদিন থাকলে কেমন হয়?'

'বেশ হয়। কিন্তু এখানে যদি কেউ জানতে চায় আমি কে, কী বলবেন?' —নূপুর জিগ্যেস করলে।

অচল বললে, 'সে যা হয় একটা বলে দিলেই হবে।'

'আমি কিন্তু আর কোট-প্যান্ট পরতে পারব না।'

'নাই পরলেন ? এখানে তো আর ভানু-জহব নেই, ভয়টা কীসের? ওঃ, টিকটিকি দুটো কী দৌড়টাই না করিয়েছে আমাদের!'

'সত্যি, গোয়েন্দারা যে এমন ছিনে জোঁক, আগে জানতাম না। এখানে পালিয়ে এসে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম।'

হঠাৎ নীচের দিকে তাকিয়ে নূপুর যেন আঁতকে উঠল, 'ও কী। দেখুন, দেখুন।'

মুখ বাড়িয়ে অচল দেখলে, তাদেরই বারান্দা থেকে একটা দড়ির মই নীচে নেমে গেছে। আর তারই মাঝামাঝি ঝুলছে একটা বস্তা! না, বস্তা নয়, আবছায়া চাঁদের আলোয় অচল ঠাহর করে দেখলে, সেটা গজকচ্ছপের মতো একটা অদ্ভুত প্রাণী।

দড়ি ধরে অচল নাড়া দিতেই সেই প্রাণীটা হাউমাউ করে চেঁচিয়ে উঠল, 'এই, এই, নাড়া দিচ্ছ কেন? পড়ে যাব যে!'

'কে? কে তুমি?' —অচল প্রশ্ন করল।

জবাব এল, 'আমি!'

'আমি কে? শিগগির বলো—নইলে—।'

দড়িটায় সজোরে নাড়া দিলে অচল।

লোকটা এবার কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলে উঠল, 'আঃ, কী ইয়ার্কি হচ্ছে। বলছি পড়ে যাব! আমি জহর—ভানু-গোয়েন্দার অ্যাসিস্ট্যান্ট!'

এক মুহূর্তের জন্য অচল সত্যিই অচল হয়ে গেল। এখানেও ভানু-জহর! এই লালটিলাতেও! দুনিয়ার কোথাও গিয়ে কি ওদের হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই?

হঠাৎ খুন চেপে গেল অচলের মাথায়। দু-হাতে দড়িটা ধরে পাগলের মতো ঝাঁকানি দিতে শুরু করল। আর অতিকায় শিম্পাঞ্জির মতো শূন্যে দোল খেতে-খেতে জহর ভেউ-ভেউ কেঁদে উঠল, 'ভানু রে, আমি চললাম। তোকে কত জ্বালিয়েছি, সব ক্ষমা করে দিস, ভাই! আর এই অভাগা জহরের জন্যে দু-ফোঁটা চোখের জল ফেলিস!'

নীচে থেকে চাপা গলায় ভানু বললে, 'ভয় পাচ্ছিস কেন? ব্যালান্স ঠিক রাখ!'

জহর ডুকরে উঠে বললে, 'আর ব্যালান্স! আমার হয়ে এসেছে! তোকে ছেড়ে যেতে আমার প্রাণ ফেটে যাচ্ছে, ভাই! আমি পরলোকে তোর জন্যে অপেক্ষা করব—শিগগির-শিগগিব আসিস!'

জহরের সেই গগনভেদী বিলাপে শেষ রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙে-চুরে টুকরো-টুকরো হয়ে গেল। দেখতে-দেখতে হোটেলের ঘরে-ঘরে আলো জ্বলে উঠল, খুলে গেল দরজা, বেরিয়ে এল ঝুল-বারান্দাগুলোয় বোর্ডারদের দল হইহই করে।

'কী হয়েছে?'

'কেয়া হুয়া?'

'কৌন হ্যায়?'

শুকনো মুখে নূপুর বললে, 'একী করলেন! এখুনি ধরা পড়ে যাব যে!'

ব্যাপারগতিক দেখে অচলও ঘাবড়ে গেল। নূপুবের হাত ধরে ঘরেব মধ্যে ঠেলে দিয়ে বললে, 'আর-এক মিনিটও দেরি নয়—কোট-প্যান্ট পরে নিন—।'

হোটেলের হইহই ক্রমেই বাড়ছে।

খিড়কির দরজা খুলে ঘুম-চোখে বেরিয়ে এল দরোয়ান। হাতে পাকা বাঁশের লাঠি। ঝুলন্ত জহরকে দেখে বাজখাঁই গলায় হাঁকলে, 'কৌন সশুরা রে? আরে এ ভগলু, ই তো চোর বা!'

জহর কেঁদে বললে, 'চোর নেহি হ্যায় বাবা, পরলোককা যাত্রী হ্যায়।'

দরোয়ান আবার হেঁকে উঠল, 'তুম জরুর চোর হ্যায়!'

এগিয়ে এল ভানু! ধমক দিয়ে দরোয়ানকে বললে, 'তোমার মুন্ডু হ্যায়। এতক্ষণ তো ডাল-রুটি মারকে দিব্যি মজাসে ঘুম দেতা হ্যায়, আর উপরকা ঘরমে চোর হানিমুন করতা, সে-খেয়াল হ্যায়?'

কিছুই না বুঝে হাঁ করে রইল দরোয়ান।

ভানু ওপর দিকে তাকিয়ে বললে, 'উঠে যা জহর—কুইক! আমি হোটেলের সিঁড়ি দিয়ে উঠছি—দেখি, এবার ভানু-গোয়েন্দার হাত থেকে ওরা কেমন করে পালায়! আজ এসপার, কি ওসপার!'

বলতে-বলতে হোটেলের মধ্যে ঢুকে পড়ল ভানু। আর হাঁপাতে-হাঁপাতে ঘামতে-ঘামতে দড়ির মই বেয়ে উঠতে লাগল জহর।

আলসে টপকে যখন সে বাবান্দায় নামল, তখন অন্ধকার। ধরা পড়ার ভয়ে নূপুর আলো নিভিয়ে লুকিয়েছে নিশ্চয়। কিন্তু জহরের ভাগ্য ভালো। অন্ধকার ঘরে পা দিতে নূপুরের দেহের সঙ্গে ধাক্কা। আর সঙ্গে-সঙ্গে দু-হাতে জাপটে ধরে জহর চেঁচিয়ে উঠল, 'ধরেছি! ধরেছি!'

পরমুহূর্তেই তিরিক্ষে গলায় শোনা গেল, 'আঃ, আমি ভানু। ছাড়—ছেড়ে দে বলছি! ক্যাডাভ্যারাস!'

জহরের হাত দুটো আলগা হয়ে খসে পড়ল।

পকেট থেকে দেশলাই বের করে ভানু দেওয়ালগিরি জ্বেলে ফেললে। অচল আর নূপুরের ছায়াও নেই ঘরে। একটা ঠাট্টার মতো শাড়ির পার্টিশনটা রয়েছে শুধু।

করিডরে বেরিয়ে এল ভানু। পিছু-পিছু জহর। টর্চেব আলোয় ভালো করে তাকিয়ে দেখলে, করিডরের শেষপ্রান্তে বাথরুমের দরজা বন্ধ। দৌড়ে গিয়ে ভানু দরজা ঠেলতেই খুলে গেল। বাথরুমের ভেতরে আরেকটা দরজা হাট করে খোলা। আর সেই দবজা থেকে একতলা অবধি নেমে গেছে জমাদার আসা-যাওয়ার জন্যে একটা ঘোরানো লোহার সিঁড়ি।

সেই সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে ভানু নীচে তাকিয়ে দেখলে, হোটেলের কম্পাউন্ডে অস্টিন কেমব্রিজখানা নেই।

পালিয়েছে! অচল-নূপুর ফের পালিয়েছে!

ভানু আর দাঁড়ালে না। জহরকে নিয়ে সেই লোহার সিঁড়ি বেয়ে তাড়াতাড়ি নেমে এল কম্পাউন্ডে। তারপর রাস্তায়।

জহর তখনও হাঁপাচ্ছে। বললে, 'অচল মুখুজ্যে বোধহয় ভোজবাজি জানে। কোথায় হাওয়া হল বল তো?'

ভিজে রাস্তার ওপর টর্চের আলো ফেলে ভানু বললে, 'যেদিক থেকে এসেছিল, সেই দিকেই।'

'কী কবে বুঝলি?'

'অচলের গাড়ির টায়ারের দাগ কোনদিকে গেছে দেখ না।'

টর্চের আলোয় ভিজে রাস্তাটা লক্ষ করে জহর বলে উঠল, 'ওঃ, একেই বলে ব্রেন। ভানু রে, তুই সাক্ষাৎ রবার্ট ব্রেক!'

শেষ-রাতের অন্ধকারে ছুটছে অস্টিন কেমব্রিজ।

'এবার একটু ঘুমিয়ে নিন।'—অচল বললে।

সিটের গায়ে হেলান দিয়ে নূপুর বসে আছে চুপচাপ। বললে, 'ঘুম দেশ ছেড়ে পালিয়েছে ভানু-জহরের তাড়া খেয়ে।'

'তাই বটে! ওরা যেন কানামাছি খেলছে আমাদের সঙ্গে। খুব বেঁচে গেছি এ-যাত্রা।'

একটা স্টেশন এসে পড়েছে কাছাকাছি। গাড়ির স্পিড একেবারে কমিয়ে দিলে অচল। গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোডের ধারে ছোট একটা চালাঘরে টিমটিমে আলো জ্বলছে। লরিওয়ালাদের জন্যেই দোকানটা রাতভোর খোলা থাকে বোধহয়। অচল তারই সামনে গাড়ি থামাল।

'ছুটোছুটি করে দম বেরিয়ে গেছে! একটু চা পেলে মন্দ হয় না, কী বলেন?'

অচল নেমে গিয়ে দু-ভাঁড় চা নিয়ে এল।

চায়ে চুমুক দিয়ে নূপুর জিগ্যেস করলে, 'কোথায় যাচ্ছি আমরা? আবার কলকাতায়?'

একটা সিগারেট ধরিয়ে অচল বললে, 'দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে পালিয়ে এসেছি। কিছুই ঠিক করিনি।'

'ভোর হওয়ার আগেই ঠিক করা দরকার।'

'আচ্ছা, সুন্দরবনে গেলে কেমন হয়?'

'সুন্দরবনে! সেখানে যে বাঘ আছে।'

'কিন্তু ভানু-জহর তো নেই।'

অন্ধকারের মধ্যে হঠাৎ তিরিক্ষে গলায় শোনা গেল, 'হ্যান্ডস আপ!'

আর, অন্ধকার ফুঁড়ে ছায়ামূর্তির মতো বেরিয়ে এল দুটি অদ্ভুত চেহারা।

ঠাস করে পড়ে গেল চায়ের ভাঁড় অচল-নূপুরের হাত থেকে। আচমকা ভূত দেখলেও ওরা এতখানি চমকে উঠত না।

ভানু আর জহর! সেই উনিশশো উনত্রিশ সালের ফোর্ড গাড়িতে পিছু নিয়ে, কখন যে তারা অস্টিন কেমব্রিজকে ধরে ফেলেছে, চা খেতে-খেতে অচল আর নূপুর টেরই পায়নি।

ভানুর হাতে একটা পিস্তল। সেটা অচলের দিকে উঁচিয়ে তেমনি তিরিক্ষে গলায় আবার বললে, 'আই সে হ্যান্ডস আপ!'

জহর তাড়াতাড়ি বললে, 'তুলুন—তুলুন—হাত তুলুন!'

অচল বললে, 'এর মানে?'

পিস্তলটা তেমনি উঁচিয়ে ধরে ভানু বললে, 'ডক্টর দিগম্বর চ্যাটার্জির মেয়ে মিস নূপুর চ্যাটার্জিকে হরণ করার দায়ে আপনাকে আমি অভিযুক্ত করলাম।'

অচল বললে, 'কী বাজে বকছেন! কোথায় নূপুর চ্যাটার্জি?'

ফেল্টহ্যাট মাথায় নূপুরের মুখে টর্চের আলো ফেলে ভানু বললে, 'আর ব্লাফ দিয়ে লাভ নেই অচলবাবু। ভানু-গোয়েন্দার এক্স-রে চোখ আছে। মিস চ্যাটার্জি আপনার পাশে। ওঁকে নামিয়ে দিন।'

অচল বললে, 'নামিয়ে দিন বললেই নামিয়ে দিতে হবে?'

জহর বললে, 'শিওর অ্যান্ড সার্টেন।'

'কেন? কী জন্যে?'

ভানু বললে, 'ডক্টর চ্যাটার্জি আসছেন, তাঁর হাতে তাঁর মেয়েকে ফিরিয়ে দেব।'

সভয়ে নূপুর অচলের একখানা হাত আঁকড়ে ধরলে। আর গাড়ির সেলফ স্টার্টার অমনি হুঙ্কার ছাড়ল অচলের চাপে।

পিস্তল হাতে ভানু চেঁচিয়ে উঠল, 'পালাবার চেষ্টা করবেন না—করলেই ফায়ার করব!'

হাঁ-হাঁ করে উঠল জহর, 'কেন গোঁয়ার্তুমি করছেন, স্যার? একবার মরে গেলে আর বাঁচবার চান্স পাবেন না!'

অচল গিয়ার টানল।

চিৎকার করে ভানু বললে, 'স্টপ। এখুনি গুলি করব—এই করলাম—।'

জহর তাড়াতাড়ি দু-কানে হাত চাপা দিলে। আর থরথর করে কাঁপতে-কাঁপতে চোখ বুজে পিস্তলের ঘোড়া টিপে দিলে ভানু।

ছোট একটা আওয়াজ হল—খুট।

পর মুহূর্তেই হুস করে বেরিয়ে গেল অস্টিন কেমব্রিজ।

চোখ খুলে ভানু বললে, 'পিস্তলে গুলি ভরিসনি?'

ফ্যালফ্যাল করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল জহর। তারপর কাঁদো-কাঁদো হয়ে বললে, 'বড্ড ভুল হয়ে গেছে ভাই। ঘুমের ঘোরে গুলির বদলে রাংতা-মোড়া চকোলেট ভরে দিয়েছি বোধহয়।'

বিষম রাগে ভানু খিঁচিয়ে উঠল, 'ইউ ইডিয়ট ক্যাডাভ্যারাস কুম্ভকর্ণ।'

তারপরেই হঠাৎ শান্ত হয়ে জিগ্যেস করলে, 'চকোলেট মনে করে গুলিটা খেয়ে ফেলিসনি তো?'

জহর কয়েক সেকেন্ড হাঁ করে রইল। চোখ দুটো হয়ে উঠল গোল-গোল। তারপর কেঁদে ফেলে বলে উঠল, 'মনে নেই। আমার কী হবে, ভানু?'

ভানু বললে, 'ঘাবড়াস না। তোকে ডবল জোলাপ খাইয়ে দেব।'

সাত

গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোডে ভোর হচ্ছে।

অস্টিন কেমব্রিজখানা ছুটেছে ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইল স্পিডে।

পাশাপাশি দুজনে বসে। অচল আর নূপুর। রাত-জাগা রাঙা চোখে অসীম ক্লান্তি। মাঝে-মাঝে হর্নের আওয়াজ ছাড়া আব কোনও শব্দ নেই। দুজনেই চুপচাপ।

হঠাৎ অচল বলে উঠল, 'নাঃ, আর পাবা যায় না। কী বলেন?'

ক্লান্ত গলায় নূপুর বললে, 'সত্যিই এমন করে আর পারা যায় না।'

'আমবা যেন চোব-ডাকাতেবও অধম হয়ে গেলাম। ক্রমাগত পুলিশ আব গোয়েন্দার তাড়া খেয়ে ছুটছি! ঘেন্না ধবে গেল জীবনে।'

বিষণ্ণ মুখে নূপুব বললে, 'সেটা আমারই জন্যে। আমারই জন্যে আপনার এত দুর্ভোগ!'

গলায় জোর দিয়ে অচল বললে, 'নেভার। আপনাব জন্যে নয়, দ্যাট ফ্যাট অ্যান্ড থিন টিকটিকি জহব ভানুব জন্যে। এ-দেশে আর থাকব না, চলুন, আমরা বিদেশে চলে যাই।'

হাওয়ায নূপুরের ফেল্টহ্যাটটা খুলে যাওযাব উপক্রম। সেটা ভালো করে বসিয়ে নূপুর বললে, 'না, অনেক হয়েছে, আর নয়। যেখানে হয় আমাকে নামিয়ে দিন। দিয়ে বেহাই নিন আপনি।'

'আব আপনি?'

'আমাব কথা ভাববেন না। মনে কববেন কোনও স্টেশনেব ওযেটিংরুমে কিছুক্ষণের জন্যে দেখা হয়েছিল, তাবপর আমাকে ভুলে যাবেন।'

বলতে-বলতে ভারী হয়ে এল নূপুরের গলা। বড বড় কালো চোখের কোল উঠল টলটলিয়ে।

ব্যস্ত হয়ে অচল বললে, এই দেখো! আবার কাঁদে। জল গড়িয়ে পড়ে গোঁফ মুছে যাবে যে।'

একটু থেমে অচল নিজের মনেই বললে, 'কিন্তু কেন? আমবা তো সত্যিই চোর-ডাকাত নই, ভদ্রঘরেব ছেলেমেয়ে আমরা, এমন করে পালিয়ে বেড়াচ্ছি কেন। ইচ্ছে করলেই তো ভানু-জহরকে জব্দ করতে পাবি।'

'কেমন করে?' —উৎসুক গলায় নূপুর প্রশ্ন করলে।

'একটা প্ল্যান মাথায় এসেছে।' —অচল বললে।

'কী প্ল্যান?'

'খুব সোজা প্ল্যান। বলব?'

'বলুন না।'

'আচ্ছা, আপনি অদৃষ্ট মানেন? যাকে বলে ভবিতব্য?'

'মানি।'

'আমিও মানি। মানে, মানতে বাধ্য হয়েছি। তাই বলছিলাম, বিয়ের জন্যেই যখন এত ঝামেলা, তখন আসুন আমরা ইয়ে—মানে বিয়েই করে ফেলি।'

চমকে উঠে অচলের দিকে তাকাল নূপুর। তার গোঁফ আঁকা মুখখানায় কে যেন লাল কালির

দোয়াত উপুড় করে ঢেলে দিল। মুখখানা ঘুরিয়ে নিয়ে সে শুধু বললে, 'না।'

আর, কে যেন ব্লটিং পেপার দিয়ে অচলের মুখ থেকে সমস্ত রং শুষে নিল। করুণ গলায় বললে, 'কেন, আমাকে প—প—পছন্দ নয়? আমাকে কি রেড়ির তেলের চেয়েও খারাপ দেখতে?'

'না।'

'তবে?'

নূপুর বাঁকা চোখে চেয়ে বললে, 'মেয়েদের তো আপনি দু-চক্ষে দেখতে পারেন না।'

ধড়ফড় করে অচল বলে উঠল, 'কে—কে—কে বললে? আগে দেখতে পারতাম না, এখন পারি।'

মুখখানা গম্ভীর করে নূপুর বললে, 'ওটা আপনার মুখের কথা। আসলে আমি নিরাশ্রয় বলে আমাকে দয়া করে বিয়ে করতে চাইছেন।'

অচল খপ করে নূপুরের একখানা হাত ধরে ফেললে, 'তোমাকে ছুঁয়ে বলছি, দয়া নয়। তোমার জন্যে আমার হার্ট উইক হয়েছে।'

বড় চোখ আরও বড় করে নূপুর বললে, 'সেকী! ডাক্তারকে দেখাননি কেন?'

অস্থির হয়ে অচল বললে, 'তুমি কিছুই বুঝতে পারছ না, নূপুর। ডাক্তার কী করবে? এ সে হার্ট-উইক নয়।'

'তবে?'

'ইয়ে—মানে আমি তোমাকে ভা—ভা—ভা—।'

ফিক করে হেসে ফেলে নূপুর বললে, 'থাক, খুব হয়েছে!'

আর সেই হাসি দেখে অচল ডুবতে-ডুবতে যেন একটা লাইফ বেল্ট পেয়ে গেল। মুখ উজ্জ্বল করে জিগ্যেস করলে, 'তা হলে রাজি তো?'

কোনও সাড়া এল না নূপুরের কাছ থেকে। ফেল্টহ্যাটটা খুলে গভীর সুখে আর তৃপ্তিতে মাথাটা অচলের কাঁধে ঠেকিয়ে চুপ করে রইল।

অচল তার কানে-কানে বলল, 'কী? রাজি?'

ছোট করে জবাব এল, 'হুঁ। কিন্তু—।'

'আবার কিন্তু কী?'

'ভাবছি, বাবা যদি জানতে পারেন—ভীষণ রাগী মানুষ—।'

'তাঁকে ঘাঁটাবার দরকার কী? কলকাতায় পৌঁছে আমরা বিয়ে করব আইন-মতে রেজেস্ট্রি করে। কী বলো?'

'তোমার যা ইচ্ছে।'

অচলের হঠাৎ ঝানুকাকার কথা মনে পড়ে গেল। একটু চুপ করে থেকে বলল, 'একটা কথা আছে।'

'কী?'

'এক্সকিউজ মি—তোমাব মাথার চুলগুলো পরচুল নয় তো?'

হাসি চেপে নূপুর বললে, 'টেনেই দেখো না।'

'দাঁতগুলো? বাঁধানো নয়?'

অচলের বাঁ-হাতের একটা আঙুল নিয়ে নূপুর নিজের দাঁতের ফাঁকে রেখে একটু চাপ দিলে।

'উঃ!'—বলে লাফিয়ে উঠল অচল।

দুষ্টু হেসে নূপুর বললে, 'আর প্রমাণ চাই?'

মস্তবড় একটা ক্রিসেন্থিমামের মতো তার মুখের ওপর অচলের মুখখানা নেমে আসতেই সভয়ে নূপুর চেঁচিয়ে উঠল, 'এই—এই—।'

স্টিয়ারিং-এর এক মোচড়ে অচল একখানা চলন্ত লরির পাশ কাটিয়ে নিল।
নূপুর চোখ পাকিয়ে বললে, 'বড্ড খুশি যে! অ্যাকসিডেন্ট করবে নাকি?'
হাসি-মুখে অচল গলা ছেড়ে বলে উঠল:

'তোমায় খুশি করতে আমি সব পারি,
ইচ্ছে করে তোমায় নিয়ে
দুর্গমে আজ দিই পাড়ি।।'

দরজার পাশে ট্যাবলেটে লেখা:

বিবাহবিশারদ

শ্রীপ্রজাপতি ঘটক

রেজিস্ট্রার অফ ম্যারেজ

গাড়ি থেকে নেমে অচল আর নূপুর সটান ঢুকে গেল।

বহু পুরোনো টেবিলের ওপাশে গলাবন্ধ কোট গায়ে, মাথায় কাঁচাপাকা কদমছাঁট চুল নিয়ে স্বয়ং ঘটকমশায় বসে। অজীর্ণ রোগীর মতো রোগা, লম্বা চেহারা, মুখ দেখলে মনে হয় এইমাত্র চোঁয়া ঢেঁকুর উঠল।

অচল আর নূপুর ঘরে ঢুকতেই প্রশ্ন হল, 'কী চাই?'

অচল বললে, 'আজ্ঞে বিয়ে করতে চাই।'

'কেন?'

এ প্রশ্নের জন্যে অচল তৈরি ছিল না, মনে-মনে জবাব খুঁজতে লাগল।

ঘটকমশায় বললেন, 'লটারিতে টাকা পেয়েছ বুঝি?'

অবাক হয়ে অচল বললে, 'মানে? বিয়ে করতে গেলে লটারিতে টাকা পাওয়া চাই নাকি?'



'তা নইলে এই মাগ্‌গি-গণ্ডার বাজারে এমন দুর্বুদ্ধি কার হবে? পটলের সের দু-টাকা। খাবে, না তুলবে?'

হাসি চাপতে গিয়ে অচল কেশে ফেলল। মুখে রুমাল গুঁজে দিল নূপুর।

বিবাহবিশারদ আবার বললেন, 'ডোমেস্টিক অ্যানিম্যাল মানে জানো।'

অচল বললে, 'গৃহপালিত পশু। যেমন, গোরু-ছাগল-ভেড়া।'

'না।'—বিবাহবিশারদ বললেন, 'ডোমেস্টিক অ্যানিম্যাল মানে আদর্শ স্বামী। খাবে কম, দুধ দেবে বেশি। আর একটা অ্যাডভাইস দিই শোনো। স্ত্রীকে কখনও বলবে না ভালোবাসি। বলেছ কি ট্যাক্স দিতে হবে। তিন-তিনবার বিয়ে করে এই সার বুঝেছি।

নূপুরের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে অচল বললে, 'আপনার উপদেশ মনে থাকবে।'

চোখে চশমা এঁটে বিবাহবিশারদ ফর্ম বের করলেন, খাতা খুললেন। বললেন, 'পাত্র-পাত্রীর নাম?'

নাম বললে অচল।

'পাত্রী সাবালক তো? বয়েস?'

'আজ্ঞে বাইশ।'

'কনে কই?'

অচল দেখিয়ে দিলে।

চোখ পিটপিট করে বিবাহবিশারদ নূপুরের পানে তাকিয়ে রইলেন বেশ কিছুক্ষণ। তারপর বোমার মতো ফেটে পড়ে বললেন, 'তামাশা করার জায়গা পাওনি, ছোকরা? পঁচিশ বছর ধরে আমি বিয়ে দিচ্ছি ছেলেতে-মেয়েতে, আর তুমি বলছ আজ ছেলেতে-ছেলেতে বিয়ে দিতে!'

নূপুরের পানে তাকিয়ে অচলের চক্ষুস্থির। তার পরনে যে এখনও কোট, প্যান্ট, টুপি, তাড়াতাড়িতে এতক্ষণ সে-খেয়ালই ছিল না। এমনকি, গোঁফজোড়াও মোছা হয়নি!

নার্ভাস হয়ে অচল বললে, 'মাপ করবেন স্যার, এখুনি কনেকে হাজির করে দিচ্ছি। পাশের ঘরটা খালি আছে তো।'

উত্তরের অপেক্ষা না করেই অচল স্যুটকেস সমেত নূপুরকে পাশের ঘরটায় ঢুকিয়ে দরজা ভেজিয়ে দিলে।

মিনিট দশেকের মধ্যেই পোশাক বদলে বেরিয়ে এল নূপুর।

অচল বললে, 'পাত্রী হাজির স্যার।'

চোখের পাতা পিটপিট করে ঘটকমশায় চশমার ফাঁকে নূপুরের পানে তাকিয়ে রইলেন কয়েক সেকেন্ড। তারপর অচলকে বললেন, 'এই দেখলাম ছেলে, আর এই হয়ে গেল মেয়ে! ব্যাপার কী হে, ছোকরা? ম্যাজিক দেখাচ্ছ নাকি?'

অচল বললে, 'আজ্ঞে না। ও থিয়েটার করে কি না, তাই ছেলে সেজেছিল।'

'তখন ছেলে সেজেছিল, না এখন মেয়ে সাজল?'

'আজ্ঞে মেয়ে সাজবে কেন? ও তো মেয়েই।'

'বটে!' —ঘটকমশায়ের চোখের পাতা আরও দ্রুত পিটপিট করতে লাগল। মাথা নেড়ে বললেন, 'উঁহু, সন্দেহ হচ্ছে বাপু! আজকাল বিজ্ঞানের যুগ। ঠিক করে বলো দিকি, ছেলে না মেয়ে?'

ঘাবড়ে গিয়ে অচল বলে উঠল, 'মেয়ে স্যার! জেনুইন মেয়ে—খাঁটি মেয়ে!'

'থামো হে!' —খেঁকিয়ে উঠলেন ঘটকমশায়, 'আমি বিবাহ করেছি বত্রিশ বছর—তেরোটি সন্তানের বাপ। আমি বলতে পারি আমার স্ত্রী খাঁটি মেয়ে। কিন্তু বিয়ের আগে তুমি বল কোন সাহসে?'

অচল একেবারে বোবা। আর নূপুরের ফরসা মুখখানা শীতকালের টোম্যাটো হয়ে উঠল। শুধু লজ্জায় নয়, ওই বেয়াক্কেলে বুড়োর ওপর চাপা রাগেও।

ঘটকমশায় রেজেস্টারি খাতা মুড়ে ফেললেন। তারপর চোঁয়া ঢেঁকুর ওঠা মুখে বললেন, 'না বাপু, আমি বিয়ে দিতে পারব না।'

রীতিমতো নার্ভাস হয়ে অচল বললে, 'এই মরেছে! বিয়ে আমাদের দিতেই হবে, স্যার! বিয়ে

না করে আমাদের উপায় নেই!'

ধমকে উঠলেন ঘটকমশায়, 'বিয়ে করবে তো ভেলকি দেখাচ্ছ কেন? এই দেখলাম ছেলে, আবার এই দেখছি মেয়ে! বুড়ো বলে আমাকে ধাপ্পা দেওয়ার মতলব?'

জিভ কেটে অচল বললে, 'ছি, ছি, এ কী বলছেন! বিশ্বাস করুন, স্যার, ও মেয়ে। সত্যিকার মেয়ে!'

'প্রমাণ?'

অচল ধপ করে একখানা চেয়ারে বসে পড়ল। হতাশ গলায় নূপুরকে বললে, 'প্রমাণ চায় যে! ডোবালে! কেন মরতে তোমাকে স্যুট পরিয়ে এনেছিলাম!'

নূপুব এবাব ক্ষেপে গেল। মিহি গলা আরও মিহি করে ঘটকমশায়কে বললে, 'তার আগে আপনি যে পাগল নন, প্রমাণ করুন!'

চোখের পাতা পিটপিট করে ঘটকমশায় বললেন, 'আমি পাগল!'

'শুধু পাগল নয়, বদ্ধ পাগল।'

তেতো মুখে ঘটকমশায় বললেন, 'তোমাদের পাল্লায় পড়ে পাগলই হব দেখছি! আমায় ঠকাবার জন্যে গলার আওয়াজটা পর্যন্ত মেয়েদের মতো নকল করেছ!'

নূপুর হাঁ করে তাকিয়ে রইল ঘটকমশায়ের মুখের পানে।

অচল বললে, 'খুব আক্কেল হয়েছে। আর বিয়ে করতে হবে না, চলো।'

ঠিক এই সময় ভেতরের দরজার পরদার ফাঁকে উঁকি দিল সাত-আট বছরের ফ্রক-পরা একটি মেয়েব মুখ। বললে, 'বাজারের টাকা দাও, বাবা।'

তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন ঘটকমশায়, 'টাকা ছাড়া তোদের মুখে আর কথা নেই বে, টেঁপি ? যা বেরো—।'

ভয়ে-ভয়ে টেঁপি বললে, 'মা যে বললে চাল বাড়ন্ত।'

'তোব কাবলিওয়ালা মাকে বলগে যা টাকাও বাড়ন্ত।'

কিন্তু টেঁপিকে গিয়ে আর বলতে হল না। ঘটকমশায়েব তৃতীয পক্ষ বোধ কবি পবদার বাইবেই ছিলেন, নিজেই পরদা সরিয়ে অফিসঘবে পা দিলেন। মোটাসোটা ভাবীভুবি চেহাবা, আধহাত চওড়া কস্তা-পেড়ে শাড়ি পরনে, নাকে ফাঁদি-নথ। সেই নথ নেড়ে ঘটকগিন্নি কাঁসর-বাজানো গলায় স্বামীকে বললেন, 'কী বললে! আমি কাবলিওয়ালা!! তোমাব হাতে পডে হাড়মাস আমার কালি হয়ে গেল, আর আমায় বলছ কিনা—।'

চোঁয়া ঢেঁকুর ওঠা মুখ যথাসম্ভব হাসি-হাসি করাব চেষ্টা করে ঘটকমশায় বললেন, 'আহা-হা, ওসব প্রাইভেট কথা এখানে কেন? দেখছ না, বাইরেব লোক রয়েছে!'

এতক্ষণ অচল-নূপুরকে লক্ষ করেননি ঘটকগিন্নি। এবাব চোখ পড়তেই আরেকটু ঘোমটা টেনে বলে উঠলেন, 'ওমা, আগে বলতে হয়!'

ঘটকমশায় বললেন, 'এসেছ, ভালোই হয়েছে। দেখো তো গিন্নি—বেশ ভালো করে দেখো—ওই মেয়েটি ছেলে না মেয়ে।'

ঘটকগিন্নি বললেন, 'এ আবার কেমনধারা কথা!'

নূপুর হঠাৎ এগিয়ে এসে টিপ করে ঘটকগিন্নিকে একটা প্রণাম কবলে। তাবপর কাঁদো-কাঁদো মুখে বলল, 'আপনিই বলুন তো, মাসিমা, আমি ছেলে না মেয়ে। উনি কিছুতেই বিশ্বাস করছেন না!'

'আর, কিছুতেই আমাদের বিয়ে দিতে চাইছেন না। কী করি বলুন তো, মাসিমা ?'—অচল বললে।

মদনভস্মের আগে মহাদেব যেমন চোখে মদনের দিকে তাকিয়েছিলেন, ঘটকগিন্নি তেমনি

চোখে স্বামীর দিকে তাকালেন। তারপর কাঁসর-বাজানো গলায় বলে উঠলেন, 'বলি ভীমরতি ধরেছে বুঝি? বিয়ে দিয়ে আর বিয়ে করে মাথার চুল পেকে গেল তোমার, মেয়ে চেনো না?'

ঘটকমশায়ের মুখে কথাটি নেই।

নূপুরের চিবুকে হাত দিয়ে ঘটকগিন্নি আবার বললেন, 'এমন ফুলের মতো ফুটফুটে মেয়ে, তাকে বলে কি না ছেলে! আবার বলে কি না বিয়ে দেব না! দাও, এখুনি এদের বিয়ে দাও বলছি!'

আমতা-আমতা করে ঘটকমশায় বললেন, 'আমার দোষ কী বলো? এই দেখলাম ছেলে, আবার এই দেখছি মেয়ে! তা তুমি যখন সার্টিফাই করছ, তখন হেঁ-হেঁ—আর কথা কী!'

ঘটকমশায় আবার রেজেস্ট্রি খাতা খুললেন। আর নূপুর টিপ করে আরেকটা প্রণাম করলে ঘটকগিন্নিকে।

গলা নামিয়ে ঘটকগিন্নি বললেন, 'সংসার করতে যাচ্ছ, দুটো হিতকথা বলি, মনে রেখো, মা। স্বামীকে সদাই নিজের তাঁবে রাখবে। স্বামী যদি এক পরদা গলা চড়ায়, তুমি সাত পরদা চড়াবে। তবেই স্বামী বশে থাকবে! আর একটা কথা। সুযোগ পেলেই স্বামীর পকেট থেকে পয়সাকড়ি সরাবে। আবার সংসারে টান পড়লে সেগুলো স্বামীকেই ধার দেবে। তবে দেখবে সংসারে শান্তি আছে, বুঝলে?'

হাসি চেপে নূপুর বললে, 'বুঝলাম।'

ঘটকগিন্নি খুশি হয়ে বললেন, 'সুখে থাকো, মা। হিঁদুর মেয়ে তো, কালীঘাট থেকে মাথায় সিঁদুর দিয়ে যেও।'

ঘটকমশায় ডাকলেন, 'এসো হে ছোকরা, সই করো দুজনে। সাক্ষী কোথায়?'

'সাক্ষি!' —অচল কিন্তু হয়ে বললে, 'আজ্ঞে সাক্ষী তো নেই!'

চোখের পাতা পিটপিট করে ঘটকমশায় বললেন, 'নেই! যাকগে, তোমাদের বিয়েতে আমি আর গিন্নি সাক্ষী। ঘটক-বিদায়টা পুষিয়ে দিও কিন্তু—হেঁ-হেঁ!'

আমার গল্প এইখানেই শেষ করা যেত। বলতে পারতাম, অনেক ঝামেলার পর, অনেক অঘটনের পর অচল-নূপুরের বিয়ে হয়ে গেল। এবং কালীবাড়ি থেকে মাথায় সিঁদুর পরে হাসতে-হাসতে নূপুর এসে উঠল অচলের ফ্ল্যাটে।

কিন্তু আমার বিশ্বাস, গল্পের এইখানে দাঁড়ি টানলে পাঠক-পাঠিকারা খুশি হবেন না। তাঁদের কৌতূহলী প্রশ্ন আমি শুনতে পাচ্ছি, 'ভানু-জহরের কী হল?' কেননা, আমার গল্প আসলে ভানু গোয়েন্দা আর জহর অ্যাসিস্ট্যান্টকে নিয়ে।

অতএব তারপর শুনুন।

আট

অচল-নূপুর প্রজাপতি ঘটকের অফিসে যখন বিয়ে করছে, তখন ভানু-জহরকে দেখা গেল দমদম এয়ারপোর্টে?

দিল্লির প্লেন নামছে।

প্রবেশ পথের মুখে দাঁড়িয়ে ভানু-জহর ঘনঘন তাকাচ্ছে ভেতরের দিকে। জহর বললে, 'টেলিগ্রাম করে ভদ্রলোককে আসতে তো বলা হল, কিন্তু—।'

চুরুট ধরাতে-ধরাতে ভানু বললে, 'কিন্তু কী?'

'ইয়ে হয়েছে—ভদ্রলোককে তো কখনও দেখিনি। চিনব কী করে?'

'এই কথা! ঠিক চিনে নেব দেখিস।'

'বলিস কী! কেমন করে?'

'লাল গোলাপ দেখে। ভদ্রলোককে কোটের বাটনহোলে লাল গোলাপ লাগিয়ে আসতে লিখেছি।'

জহর মুগ্ধ হয়ে বলে উঠল, 'ভানু রে, তুই একটা জিনিয়াস!'

কায়দা করে ধোঁয়া ছেড়ে ভানু বললে, 'ভালো গোয়েন্দা হতে গেলে ব্রেন চাই, ব্রেন! বুঝলি?'

জহর বললে, 'ব্রেন আমারও আছে। তবে ছোটবেলায় পণ্ডিতমশায়ের গাঁট্টা খেয়ে ব্রেনটা নড়ে গেছে।'

প্যাসেঞ্জাররা বেরিয়ে আসছে। ভানু-জহর সজাগ হয়ে উঠল। ডেক্রনের স্যুট পরা মোটা, খাটো এক সম্ভ্রান্ত চেহারার বয়স্ক ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। তাঁর কোটের বাটনহোলে জ্বলজ্বল করছে একটা লাল গোলাপ। ভানু তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল। বিলেতি কায়দায় মাথা ঝুঁকিয়ে হাসি-মুখে বললে, 'গুড মর্নিং, জেন্টলম্যান! আমরা আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছি।'

ভদ্রলোক থমকে দাঁড়ালেন। সন্দিগ্ধ চোখে তাকিয়ে বললেন, 'আমার জন্যে! কেন?'

'সে-কথা আমাদের টেলিগ্রামেই তো লেখা ছিল।'

'টেলিগ্রাম!' ভদ্রলোক আকাশ থেকে পড়লেন, 'আপনারা নিশ্চয় ভুল করছেন।'

জহর হাসি-হাসি মুখে বললে, 'আপনি বেশ হিউমার করতে পারেন, স্যার।'

ভুরু দুটো কপালে তুলে ভানু বললে, 'ওয়েল, ভুল বরং ববার্ট ব্লেক করতে পারে, কিন্তু ভানু গোয়েন্দা করে না। নেভার! আপনার বুকের ওই গোলাপই প্রমাণ করে দিচ্ছে যে, আপনি আমাদের টেলিগ্রাম পেয়েছেন এবং আমাদেরই সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। চলুন।'

'কোথায়?'

'আপনার যে-মেয়ে পালিয়ে গেছে, তারই কাছে।'

দেখতে-দেখতে ভদ্রলোকের মুখখানা টকটকে লাল হয়ে উঠল। তিনি চিৎকার করে উঠলেন, 'হোয়াট! আমার মেয়ে পালিয়ে গেছে! বলছ কী তোমরা! এই তো আমার মেয়ে।'

পিছন থেকে বব-ছাঁটা একটি তরুণীকে সামনে টেনে এনে ভদ্রলোক বলতে লাগলেন, 'বুঝেছি, তোমরা কলকাতার গুণ্ডা, জোচ্চোর, বদমাশ! দাঁড়াও, আমি এখুনি পুলিশ ডাকছি।'

ভানুর কানে-কানে জহর বললে, 'রং নাম্বার! পালিয়ে আয়।'

ভানু আর দেরি করলে না, পায়ে-পায়ে সরে গেল। আর ঠিক তখনই চোখে পড়ল, ভিড় থেকে খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে ছাঁটা গোঁফওয়ালা লম্বা-চওড়া এক আধাবয়েসি ভদ্রলোক পাইপ মুখে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছেন। তাঁরও ছাইরঙের কোটের বাটনহোলে একটি লাল গোলাপের কুঁড়ি।

জহর বললে, দেখেছিস?'

ভানু বললে, 'দেখেছি। তুই যা।'

'বেজায় ষণ্ডামার্কা যে। এবারেও যদি রং নাম্বার হয়?'

'ঘাবড়াচ্ছিস কেন? আমি তো পিছনে আছি। যা—।'

সাহসে ভর করে জহর এগোল। ভদ্রলোকের সামনে গিয়ে হাসি-হাসি মুখ করে একবার তাকাল।

ভদ্রলোক গম্ভীরভাবে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন।

জহরও আবার ঘুরে গেল তাঁর মুখের সামনে। নিজের টাইটা নিয়ে খেলা করতে-করতে হাসিমুখে তাকাল তাঁর দিকে। ভদ্রলোক ভুরু কুঁচকে অন্য দিকে মুখ ফেরালেন।

জহর আবার তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াল। এবার ভরসা করে কাঁপা গলায় বললে, 'এক্সকিউজ মি, আপনি নিশ্চয় ডক্টর দিগম্বর চ্যাটার্জি?'

বাঘের ডাকের মতো আওয়াজে জবাব এল, 'ইয়েস।'

আনন্দে জহর চেঁচিয়ে ডাকলে, 'রং নাম্বার নয় রে, ভানু। আয়।'

দিগম্বর চ্যাটার্জি প্রশ্ন করলেন, 'তুমি কে?'

'বলছি।'

ভানু এগিয়ে এল। জহর পরিচয় করিয়ে দিলে, 'ডক্টর চ্যাটার্জি, আর দ্য গ্রেট গ্রেটার গ্রেটেস্ট ডিটেকটিভ ভানু-গোয়েন্দা অ্যান্ড হিজ অ্যাসিস্ট্যান্ট জহর।'

দিগম্বর চ্যাটার্জি একবার ভানু-জহরের আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বললেন, 'তোমাদের চেহারা তো আদপেই গোয়েন্দার মতো নয়।'

একটু উচ্চাঙ্গের হাসি হেসে ভানু বললে, 'সেই তো আমাদের বাহাদুরি। গোয়েন্দা বলে আমাদের চেনবার উপায় নেই।'

জহর বললে, 'বড় গোয়েন্দার লক্ষণই এই। দেখতে ক্লাউনের মতো।'

দিগম্বর চ্যাটার্জি বললেন, 'তাই দেখছি। আমার মেয়ে কোথায়? নূপুর?'

'আছে।' —সংক্ষেপে জবাব দিল ভানু।

বাঘের আওয়াজে দিগম্বর চ্যাটার্জি বলে উঠলেন, 'কোথায় সে? জীবিত বা মৃত তাকে আমার চাই—যেমন করেই হোক তাকে চাই!'

ভানু বললে, 'ব্যস্ত হবেন না, জেন্টলম্যান। তাকে ধরে দেব বলেই তো আপনাকে টেলিগ্রাম করেছি। কিন্তু আপনার শর্তটা মনে আছে নিশ্চয়?'

'পঁচিশ হাজার টাকা তো? দিগম্বর চ্যাটার্জির কথার নড়চড় হয় না। চেকবই আমি নিয়েই এসেছি।'

খুশি হয়ে ভানু বললে, 'থ্যাঙ্ক ইউ, জেন্টলম্যান, থ্যাঙ্ক ইউ! আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, মেয়েকে আপনি জীবিতই ফিরে পাবেন।'

টাই নিয়ে খেলা করতে-করতে হাসি-হাসি মুখে জহর বললে, 'শুধু মেয়ে নয়, একটি পছন্দসই হবু জামাইও আপনি পেতে পারেন!'

দিগম্বর চ্যাটার্জি আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'হবু জামাই?'

বিগলিত হয়ে জহর ঘাড় নাড়লে।

'কে সে?'

জহর কিছু বলার আগেই ভানু তার বুটের আগা দিয়ে জহরের একটা পা চেপে ধরলে। তারপর ডক্টর চ্যাটার্জিকে বললে, 'চলুন, আমি গাড়ি এনেছি।'

উনিশশো উনত্রিশ সালের সেই ফোর্ড গাড়িখানার সামনে এসে দিগম্বর চ্যাটার্জি থমকে থেমে গেলেন। বললেন, 'এ গাড়ি আপনার?'

সগর্বে ভানু বললে, 'ইয়েস, জেন্টলম্যান। ইন্ডিয়াতে ভানু গোয়েন্দা যেমন অদ্বিতীয়, এ গাড়িরও তেমনি জোড়া নেই। উঠুন।'

'চলে তো?'

'শিওর অ্যান্ড সার্টেন!'

স্টার্ট দিতেই বিকট শব্দে গাড়িখানা কেঁপে উঠল। দিগম্বর চ্যাটার্জি চমকে উঠে বললেন, 'ও কী!'

জহর বললে, 'কিছু না, স্যার। গাড়িটার বাতের শরীর কি না, তাই চলবার আগে গা-ঝাড়া দিল।'

ভানু আশ্বাস দিল, 'ভয় নেই। বনেদি গাড়ি কি না, তাই আওয়াজ একটু বেশি হয়—হর্নের দরকার হয় না। কিন্তু চলে ফার্স্ট ক্লাস।'

ক্লাচ টিপে ভানু গিয়ার দিতেই গাড়িখানা বার দুয়েক পিছন দিকে ঝাঁকানি দিয়েই হার্টফেল করলে।

দিগম্বর চ্যাটার্জি বললেন, 'কী হল?'

ভানু বললে, 'ও কিছু নয়। একবার ঠেলে দিলেই চলবে! ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড, একটু হাত লাগান তো!'

একটা চাপা গর্জন করে দিগম্বর চ্যাটার্জি অগত্যা নেমে হাত লাগালেন। এবং আধমাইলটাক ঠেলবার পর ভানুব গাড়ি আবাব গা-ঝাড়া দিয়ে উঠল।

জহর জিগ্যেস করলে, 'কোথায় যাচ্ছি আমরা?'

ভানুর কাছ থেকে জবাব এল, 'নূপুর চ্যাটার্জিকে ধরতে।'

দিগম্বর চ্যাটার্জির কান বাঁচিয়ে জহর বললে, 'তাকে পাবি কোথায়? সে তো হাওয়া দিয়েছে।'

ভানুর মুখে আবার সেই উচ্চাঙ্গের হাসি দেখা দিল। বললে, 'ভানু গোয়েন্দা হাওয়ারও খবর রাখে। কাল রাতে পালিয়ে ওরা কলকাতায় ফিরেছে।'

'কী করে জানলি? পথে যদি আর কোথাও ওঠে?'

'উঠলে হোটেলেই উঠতে হবে। কিন্তু অচল বুঝেছে যে, বাইরে তার গাড়িখানা দেখলেই আমরা আবার ধরে ফেলব। সুতরাং কলকাতায় ফেরা ছাড়া ওদের উপায় নেই।'

'ঠিক বলেছিস। কিন্তু কলকাতায় কোথায় উঠেছে ওরা? কোনও বড় হোটেলে বোধহয়—যেখানে গ্যারেজ আছে?'

'উঁহু। সব হোটেলে ফোন করে জেনেছি, ওরা কোথাও ওঠেনি।'

'তবে? কোনও বন্ধুব বাড়িতে উঠেছে নিশ্চয।'

'ইমপসিবল। নূপুর চ্যাটার্জির ছবি কাগজে-কাগজে ছড়িয়ে পড়েছে—বন্ধু-বান্ধবের বাড়িতে উঠলেই নূপুরকে তারা ক্যাচ লুফে নেবে।'

জহর দমে গেল; করুণ মুখে বললে, 'হয়েছে! বালিব্রিজের ওপর থেকে দুজনে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়েছে নির্ঘাত! গাড়িটা একবার থামা, ভানু।'

'কেন?'

'একছড়া ফুলের মালা কিনব। বাড়ি গিয়ে নূপুরের ছবিতে দেব।'

চাপা গলায় ভানু ধমকে উঠল, 'তুই একটা আস্ত ক্যাডাভ্যারাস! গঙ্গায় ঝাঁপ দেওয়া, লেক-এ ডুবে মরা তো সেকেলে ফ্যাশন। এখন সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিংয়ের ছাদ থেকে লাফ দেওয়ার যুগ। নূপুর তা করলে এতক্ষণে সারা কলকাতা তোলপাড় হয়ে যেত।'

ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ছেড়ে জহর বললে, 'যাক, তা হলে আত্মহত্যা করেনি! কিন্তু গেল কোথায়?'

ভানু বললে, 'আপাতত একটিমাত্র আশ্রয় তাদের আছে। আর, সেইখানেই আমরা যাচ্ছি।'

জহর আড়-চোখে একবার পিছনের সিটের দিকে তাকিয়ে বললে, 'কিন্তু সেখানে গিয়ে যদি নূপুরকে পাওয়া না যায়? ডাক্তার সাহেবের হাতের পাঞ্জাখানা দেখেছিস?'

ভানু তেমনি উচ্চাঙ্গের হাসি হেসে বললে, 'ভানু গোয়েন্দার তদন্তে কখনও ভুল হয় না।'

সিঁড়ির মুখেই দেখা—সেই পালিশ করা টাক! সেই সদা হাস্যময় বদন।

'গুড মর্নিং! আজই ফিব়্যা আইলেন যে! হনিমুনের শখ একদিনেই মিট্যা গেল নাকি?'

দ্ব্যর্থবোধক ভাবে অচল বললে, 'আজ আমাদের বিয়ের তারিখ কি না।'

সহর্ষে দুন্দুভিবাবু বলে উঠলেন, 'নাকি! আজ তা অইলে ঘরেই হনিমুন।'

দুটো ধাপ নেমে দুন্দুভিবাবু ফের বললেন, 'আসল কথাডা কি জানেন, মশয়? মনের মতো পরিবার পাইলে ঘরেই হনি, ঘরেই মুন। কী কন? ঠিক কই না? আমারও একদিন আছিল রে, মশয়।' —হাসতে-হাসতে দুন্দুভিবাবু নীচে নেমে গেলেন।

অচল আর নূপুর তালা খুলে ফ্ল্যাটে ঢুকল। সদরে ছিটকিনি লাগিয়ে অচল শোওয়ার ঘরে এসে ধপ করে খাটে বসে পড়ল। হাঁপ ছেড়ে বললে, 'ওঃ, বিয়ে করা কী ঝকমারি।'

সিঁদুর পরা মাথা থেকে ঘোমটা সরিয়ে নূপুর হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। বললে, 'সত্যি! বিয়ে তো নয়, যেন একটা ফাঁড়া কাটল। এখন তোমার মা আর আমার বাবার কাছে কী করে ফাঁড়া কাটবে, তাই ভাবছি।'

আরাম করে একটা সিগারেট ধরিয়ে অচল বললে, 'কাল মাকে একটা টেলিগ্রাম করব। লিখব, "গুরুদেবের আদেশে সন্ন্যাস ত্যাগ করিয়া সংসারী হইয়াছি"। তুমি তোমার বাবাকে কী লিখবে?'

ভয়-ভয় মুখে নূপুর বললে, 'আমি কিছু লিখতে পারব না। বাবার কথা ভাবলেই বুকটা ধড়াস করে ওঠে।'

অচল বললে, 'মাভৈঃ! এখন আর তোমাকে ধরবার উপায় নেই। আসুক না ভানু-গোয়েন্দা। ডোন্ট কেয়ার।'

নূপুর হেসে বললে, 'ইস, ভারি সাহস দেখছি! আমার কিন্তু ওদের ধন্যবাদ দিতে ইচ্ছে করছে। ওরা যদি অমন করে আমাদের পিছনে ধাওয়া না করত, তবে হয়তো—।'

'তোমার-আমার জীবনে বিয়ের নামে এই লটারি খেলা হত না?'

দুষ্টু হেসে নূপুর জিগ্যেস করলে, 'লটারিতে জিতলে, না হারলে?'

খপ করে নূপুরের একখানা হাত ধরে ফেলে অচল বললে, 'তুমিই বলো।'

'উঁহু, আগে তুমি বলো।'

সদরে কলিংবেলটা হঠাৎ বেয়াড়ারকম বেজে উঠল। নূপুরের হাতখানা ছেড়ে দিয়ে অচল বললে, 'দেখো তো—মোড়ের দোকানে বলে এসেছিলাম, ফুল নিয়ে এল বোধহয়।'

নূপুর গিয়ে সদর খুলে দিলে, আর সঙ্গে-সঙ্গে ছিটকে পিছিয়ে এল বসবার ঘরের মাঝখানে। সারা দেহ তার কাঠ হয়ে গেছে।

দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে আর কেউ নয়, যাঁর কথা ভাবলে নূপুরের বুক ধড়াস করে ওঠে, সেই দিগম্বর চ্যাটার্জি স্বয়ং। তাঁর পিছনে ভানু গোয়েন্দা আর জহর অ্যাসিস্ট্যান্ট।

ভানু বললে, 'দেখুন জেন্টলম্যান, এই আপনার নূপুর চ্যাটার্জি তো?'

জহর বললে, 'নিন স্যার, আপনার লস্ট প্রপার্টি বুঝে পড়ে নিন।'

মিনিটখানেক দিগম্বর চ্যাটার্জি কোনও কথা কইলেন না, শুধু চেয়ে রইলেন মেয়ের দিকে। থমথম করতে লাগল ভয়ানক একটা নিস্তব্ধতা; বোমা ফাটার আগে যেমন হয়।

তারপর বোমা ফাটল। বাজখাঁই গলায় বাজের মতোই হাঁক দিলেন দিগম্বর চ্যাটার্জি, 'নূপুর!'

নূপুর চমকে উঠল। গলা তার বুজে এসেছে। বাপের ছাঁটা-গোঁফওয়ালা লাল টকটকে গম্ভীর মুখখানা তার চোখের সামনে ড্রাগনের মুখ হয়ে গেছে।

দিগম্বর চ্যাটার্জি বলতে-বলতে ঘরের মধ্যে এগোতে লাগলেন, 'গোটা দিল্লির কাছে আমার মুখ হাসিয়ে তুমি এখানে এসে লুকিয়ে আছ! আর আমার খাওয়া, ঘুম, ডাক্তারি সব চুলোয় গেছে। ছি, ছি, ছি, এত বড় বংশের মেয়ে হয়ে তোমার এই কাজ! তোমার মতো একগুঁয়ে বজ্জাত মেয়েকে —একি, তোর মাথায় সিঁদুর!'

সোফার পিঠটা নূপুর শক্ত হাতে চেপে ধরলে।

এক মুহূর্তের জন্য যেন বোবা হয়ে গেলেন দিগম্বর চ্যাটার্জি। তারপরেই গর্জে উঠলেন, 'তুই বিয়ে করেছিস! স্বাধীন হয়েছিস তুই! কার হুকুমে বিয়ে করলি? কোন বাঁদরকে? কোন ওরাংওটাংকে? বল, কে সে?'

'আজ্ঞে আমি।'

শোওয়ার ঘর থেকে বসবার ঘরে এসে দাঁড়াল অচল।

দিগম্বর চ্যাটার্জি কেমন থতিয়ে গিয়ে শুধু বললেন, 'তুমি!'

ভানুর হাঁ-করা ঠোঁটের ফাঁক থেকে চুরুটটা খসে পড়ল। এগিয়ে এসে অচলকে বললে, 'বলেন কি! ব্ল্যাকে বিয়ে করলেন নাকি?'

'ব্ল্যাকে!'

'মানে—গোপনে বিয়ে করলেন বুঝি?'

অচল বললে, 'কী করব বলুন, আপনাদের গোয়েন্দাগিরির জ্বালায় বিয়ে করতে হল। আজই, একটু আগে। এই যে আমাদের বিয়ের সার্টিফিকেট।'

পকেট থেকে সার্টিফিকেটখানা বের করে অচল দেখালে।

করুণ চোখে সেই কাগজখানার দিকে তাকিয়ে ভানু বললে, 'আজ থেকে তাহলে আপনি শ্রীমতী নূপুরের সোল প্রোপ্রাইটার? একমাত্র সত্ত্বাধিকারী?'

অচল সবিনয়ে বললে, 'আজ্ঞে, আইনত তাই।'

জহরের চোখ ছলছল করে উঠল। ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে নূপুরের দিকে তাকিয়ে বললে, 'এই যদি মনে ছিল, ম্যাডাম, কেন তবে আমাকে স্টেজে নাচালেন, আর কেনই বা দড়ির মইয়ে ঝোলালেন? ভগবান আপনাদের সুখী করুন!'

দিগম্বর চ্যাটার্জি এতক্ষণ অচলের মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন। বললেন, 'তোমার নাম?'

'অচল মুখার্জি।'

'অচল মুখার্জি! তুমি হেমাঙ্গিনী দেবীর ছেলে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'লক্ষ্ণৌতে বাড়ি না?'

অচল ঘাড় নেড়ে জানালে, 'ঠিক।'

ছাঁটা গোঁফওয়ালা গম্ভীর মুখ থেকে দুর্যোগের আবহাওয়া নিমেষে কেটে গেল। বাবাকে এত খুশি নূপুর জীবনে দেখেনি। অচলের কাঁধ চাপড়ে দিগম্বর চ্যাটার্জি বলে উঠলেন, 'ওয়েল, ওয়েল। তোমাকে তাহলে ঠিকই চিনেছি, অচল। পানু আমাকে তোমার ফোটো দেখিয়েছিল। বাঁদর বলেছি বলে কিছু মনে কোরো না যেন। আরে, তোমার সঙ্গেই তো নূপুরের সম্বন্ধ করেছিলাম।'

অচল আর নূপুর দুজনেই হতবাক।

দিগম্বর চ্যাটার্জি আবার বললেন, 'একটা কথা আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না, নূপুর। সেই যদি অচলকেই বিয়ে করবি, তবে বাড়ি থেকে পালিয়ে এলি কেন?'

এবার নূপুরের মুখে কথা ফুটল, 'পানুমামা যে আমাকে বললে, "যার সঙ্গে সম্বন্ধ হচ্ছে, সে কালো বেঁটে—রেড়ির তেলের ব্যবসা করে—"।'

'পানুটা হরিণঘাটার গোরু। (গর্জে উঠলেন দিগম্বর চ্যাটার্জি) আমাকে একবার হাসতে-হাসতে বলেছিল বটে, "নূপুরকে খুব ঘাবড়ে দিয়েছি, বিয়ের রাতে কিন্তু দারুণ খুশি করে দেব!" তা পানুর কথায় ভয় পেয়ে তুই পালিয়ে এলি! আমাকে একবার জিগ্যেসও করলি না! ছি, ছি, ছি! কিন্তু অচল, তুমিও লক্ষ্ণৌ ছেড়ে পালিয়েছিলে কেন বলো তো?'

মাথা চুলকে অচল বললে, 'আজ্ঞে, নূপুরের পানুমামার মতো আমারও একজন ঝানুকাকা

আছেন। পালিয়েছিলাম তাঁরই জন্যে।'

দিগম্বর চ্যাটার্জি এবার নিশ্চিন্ত মনে পাইপ ধরালেন। বেশ খানিকটা ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 'আজকের দিনের বুদ্ধিমান মানুষেরা যতই আজগুবি বলুক, যা ঘটবার তা ঘটবেই। কে যে ঘটায়, বিজ্ঞানও তা বলতে পারে না। যাক, তোমার মাকে টেলিগ্রাম করে দিই যে, দুই আসামি একসঙ্গেই ধরা পড়েছে।'

অচল আর নূপুর লজ্জিত মুখে ডাক্তারসাহেবকে প্রণাম করলে।

ভানু বললে, 'এবার তা হলে লিখে ফেলুন, জেন্টলম্যান।'

'কী লিখব?'

'চেক।'

'চেক?'

দুটো হাতে ঘষাঘষি করতে-করতে ভানু উৎফুল্ল হয়ে বললে, 'আপনার প্রতিশ্রুত পঁচিশ হাজার টাকা।'

পাইপটা মুখ থেকে সরিয়ে দিগম্বর চ্যাটার্জি শান্ত গলায় বললেন, 'কথা ছিল, জীবিত বা মৃত নূপুর চ্যাটার্জিকে ধরে দিতে পারলে আমি ওই টাকা পুরস্কার দেব। কেমন, তাই তো?'

ভানু বললে, 'রাইট! রাইট!'

চ্যাটার্জি সাহেব বললেন, 'কিন্তু তোমরা যাকে ধরে দিলে সে তো নূপুর চ্যাটার্জি নয়, সে এখন নূপুর মুখার্জি। সুতরাং, টাকাটা তোমরা দাবি কর কোন হিসেবে?'

ভানু-জহর নিঃশব্দে পরস্পরের দিকে তাকালে। তাদের চোখের তারাগুলো ট্যারা হয়ে গেছে!

দিগম্বর চ্যাটার্জি বললেন, 'পঁচিশ হাজার টাকা যদি দিতে হয়, তবে অচলকেই দেওয়া উচিত। কেননা, নূপুর চ্যাটার্জিকে খুঁজে পেয়েছিল সেই-ই। তবে তোমাদেরও আমি একেবারে হতাশ করব না। দিল্লিতে ফিরে যাওয়ার আগে দুটো মেডেল তোমাদের দিয়ে যাব।'

ভানু-জহর আর একবার পরস্পরের দিকে তাকালে। ভানু বললে, 'ডাক্তার না হয়ে আপনার ব্যারিস্টার হওয়া উচিত ছিল, স্যার।' তারপর টুপিটা তুলে বললে, 'গুডবাই এভরিবডি!'

ছলছল চোখে নূপুরের পানে তাকিয়ে জহর শুধু বললে, 'বিদায়!'

দুজনে বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল।

গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে ভানু বললে, 'মেয়েছেলের কেস আর জীবনে নেব না।'

জহর বললে, 'শিওব অ্যান্ড সার্টেন। নারী ছলনাময়ী!'

উনিশশো উনত্রিশ সালের সেই ফোর্ড গাড়িখানা প্রচুর ধোঁয়া ছাড়তে-ছাড়তে ক্রমশ দূরে চলে গেল।

হ্রদ



বিমল কর

মেঘে ঢাকা দুপুর কখন যে ফুরিয়ে গেছে, দিনের আলো মুছে গিয়ে ঘন হয়ে এসেছে অন্ধকার সুদক্ষিণা বুঝতে পারেনি। পড়ন্ত বেলায় চোখের পাতা তার বুজে এসেছিল। তারপর এক সময় ঠান্ডা বাতাসে গায়ে কাঁটা দিল; চাদর টেনে নিয়ে নরম বিছানার মধ্যে ডুবে গেল সুদক্ষিণা।

অতসীর ডাকে চোখ মেলে চেয়ে দেখে। জানলার বাইরে তখন হাওয়ার দাপাদাপি আর অন্ধকারের ছড়াছড়ি। মেঘে-মেঘে আকাশ গেছে ছেয়ে, পলাশবনের মাথায় ক্ষণে-ক্ষণে বিদ্যুতের চমক।

চোখ মেলে চেয়ে ভালোই লাগল সুদক্ষিণার। আসন্ন এক বৃষ্টিমুখর স্বপ্নঘন রাত্রির স্পর্শ পাওয়ার লোভে মন তার ব্যাকুল হয়ে উঠল—ঘুমভাঙার আলস্য জড়িয়ে থাকল সর্বাঙ্গে।

'কই ওঠ। শুয়ে থাকলি যে।' অতসী ওর গায়ে ঠেলা মেরে তাগাদা দিলে।

'বেশ লাগছে।' খুশির আমেজ সুদক্ষিণার গলায়, 'ক'টা বেজেছে রে?'

'সাড়ে পাঁচটাও বাজেনি! কী ঘটা দেখেছিস—,' অতসী জানালার বাইরে চোখ রেখে বললে, 'বৃষ্টি নামল বলে।'

সুদক্ষিণা গায়ের চাদর আরও ঘন করে জড়িয়ে নিল। অতসী কয়েক মুহূর্তের জন্যে আনমনা হয়ে গিয়েছিল। সুদক্ষিণার আলস্য যেন তাকেও পেয়ে বসেছে। একটু পরে হঠাৎ বললে, 'ওমা, দিব্যি শুয়ে থাকলি যে। ওঠ, তোকে ডাকতে এলাম—'

বিছানা ছেড়ে ওঠার কোনও আগ্রহ সুদক্ষিণার নেই; পরম নিশ্চিন্তে অতসীর হাতটা টেনে নিয়ে বললে, 'কী হবে উঠে? আয় বোস, গল্প করি।'

অতসীর ঠোঁটের কোণে কোন ফাঁকে এক ফালি দুষ্টু হাসি নেমে এল, 'এমন দিনে আমার সঙ্গে গল্প? উঁহু, জমবে না। গল্প জমাবার লোক নীচে এসে বসে রয়েছে। তাইতো তোকে ডাকতে এলুম!' অতসীর হাসি সুদক্ষিণা দেখতে পেল না, কিন্তু তার গলার স্বরে যে রহস্যের ইঙ্গিত জাগল, সুদক্ষিণার কানে তা ধরা পড়ল।

অবাক হল সুদক্ষিণা।

'কে আবার এসে বসে রয়েছে?'

'কী করে তা বলি। তবে দর্শনপ্রার্থী কেউ নিশ্চয়। বেশ দেখতে ভদ্রলোকটিকে—' অতসী ইচ্ছে করেই শেষ কথাটায় জোর একটা টান দিল।

সুদক্ষিণার আলস্য একটু ফিকে হল। কী যেন জানবার চেষ্টায় বিছানার ওপর উঠে বসল। অতসী ঘর ছেড়ে চলে যেতে-যেতে বললে, 'তুই নীচে গিয়ে বোস, আমি তোদের জন্যে চা পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

কে এল এই ঝড় বাদলের দিনে? সুদক্ষিণা ভাবল। কাউকে তার মনে পড়ছে না। এখানের চেনা-জানা কেউ নিশ্চয় নয়। অতসী তাহলে চিনত, নাম বলতে পারত। কলকাতা থেকে কেউ কি এল? সুদক্ষিণা মনে-মনে অনুমান করবার চেষ্টা করলে। কারুর তো আসার কথা নেই! তবে?

বিছানা ছেড়ে উঠল ও। আলস্যে সারা শরীরটা তখনও ভার হয়ে রয়েছে। বাথরুম থেকে ফিরে এসে সুদক্ষিণা আয়নার সামনে দাঁড়াল। অবেলায় ঘুমিয়ে ওঠার জন্যে তার চোখ আর মুখ যেন একটু বেশিই ফুলে উঠেছে। হালকা হাতে খোঁপাটা জড়িয়ে নিল। পাউডারের কেস থেকে কখন যেন পাফটাও তুলে নিয়েছে। তারপর কী মনে করে নিজের মনেই হেসে উঠল ও। পাফটা রেখে সরে এল আয়নার সামনে থেকে আলনার কাছে। বাইরে বৃষ্টি নেমেছে। দমকা ঠান্ডা হাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টির ছিটে এসে ঢুকল ঘরে।

তাড়াতাড়ি জানালাটা বন্ধ করে দিল সুদক্ষিণা। বিছানা থেকে চাদর কুড়িয়ে নিয়ে গায়ে জড়াল। তারপর ঘর ছেড়ে মন্থর পায়ে নেমে গেল নীচে।

*

বসবার ঘরের পরদা সরিয়ে উঁকি দিয়েও আগন্তুককে চেনা গেল না। মুখ দেখতে পেল না সুদক্ষিণা।

নিঃশব্দে ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়াল ও। ছোট্ট একটু কাশির শব্দ করে দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করলে।

আগন্তুক একমনে দেওয়ালের গায়ে ঝুলনো একটা গ্রুপ ফটো লক্ষ করছিল। সুদক্ষিণার কাশির শব্দে ঘুরে দাঁড়াল।

সামান্য কয়েকটা মুহূর্ত। ওরা পরস্পরের দিকে শুধু বিস্ময়সুলভ দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকল।

আগন্তুকই প্রথমে কথা বললে—নমস্কারের পর্ব শেষ করে, 'আপনিই শ্রীমতী সুদক্ষিণা চট্টোপাধ্যায়?'

সুদক্ষিণা ছোট্ট একটা প্রতিনমস্কাবে অভ্যর্থনা জানিয়ে মৃদু হাসল, 'হ্যাঁ, আমি। বসুন!'

'বসছি। আপনি বসুন। একটু বিরক্ত করতে এসেছি আপনাকে।' ভদ্রলোক চেয়ারে বসে সুদক্ষিণাকে লক্ষ করতে-করতে হাসল।

'তাতে কী—' সুদক্ষিণা ভদ্রজনোচিত সৌজন্যে বলল।

'পরিচয় দিলে অবশ্য আমাকে আপনি চিনতে পারবেন না। ভদ্রলোক কথা শুরু করলেন, 'পরেশনাথ মেন্টাল হসপিটাল থেকে আমি আসছি। আমাব নাম প্রণব দাশগুপ্ত। আমি সেখানকার একজন ডাক্তার।'

সুদক্ষিণা সচকিত হল। মেন্টাল হসপিটাল—পাগলাদেব হাসপাতালেব সঙ্গে তার সম্পর্ক কী? প্রণবের দিকে অদম্য কৌতূহল নিযে তাকিয়ে থাকল সুদক্ষিণা।

'মনোজ রায় বলে কাউকে চেনেন আপনি?' প্রশ্ন কবলে প্রণব।

'মনোজ?' সুদক্ষিণা মনে কববার চেষ্টা করলে।

'কই, না?'

'ভালো করে একটু ভেবে দেখুন তো—কাউকে মনে পড়ছে না?'

সুদক্ষিণাব পরিচিত জনের তালিকা খুব দীর্ঘ নয়। তবু আবার একবার স্মৃতি-সমুদ্রে ডুব দিয়ে মনোজ রাযকে মনে কববার চেষ্টা করলে।

'চিনতে পারলেন না?'

মাথা নেড়ে সুদক্ষিণা জানালে, 'না—ওই নামেব কাউকে চিনি বলে মনে পড়ছে না।'

'আমিও তাই আশা করেছিলুম।' প্রণব চিন্তিত হল।

সুদক্ষিণা উগ্র কৌতূহল চেপে রেখে প্রণবকে একমনে লক্ষ করতে লাগল। সুদর্শন, সুপুরুষ চেহারা। বয়েস ওর খুব অল্পই হবে। হয়তো বা সুদক্ষিণারই সমবয়েসি। ছেলেটির চোখে মুখে প্রখব বুদ্ধির দীপ্তি। চোখ দুটো বড় সুন্দর। আর আশ্চর্য তার দৃষ্টি। সুদক্ষিণার দৃষ্টির সঙ্গে যতবার ওর দৃষ্টি মিলিত হয়েছে—কেমন একটা আকর্ষণ স্পষ্ট অনুভব করেছে ও; ঠিক তীব্র নয়, তীব্র-মধুর।

প্রণব পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বের করে এগিয়ে দিলে সুদক্ষিণার দিকে। বললে, 'দেখুন তো, এটা চিনতে পারেন?'

টেবিল-ল্যাম্পের অনুজ্জ্বল আলোয় কাগজের টুকরোটুকু মেলে অবাক হল সুদক্ষিণা। হাতের লেখাটা তার। একটা গানের স্বরলিপির শেষ দুটি কলি। বাকিটা ছিঁড়ে গেছে। স্বরলিপির পাশে সুদক্ষিণার নাম-ঠিকানা লেখা। আর আশ্চর্য, সেটাও তার নিজের হাতের। স্বরলিপির সেই ছিন্ন অংশটুকু হাতে করে সুদক্ষিণা বোবার মতন বসে থাকল।

'হাতের লেখাটা আপনার?'

মাথা নেড়ে সায় দিলে সুদক্ষিণা।

'কাউকে এই স্বরলিপিটা লিখে দিয়েছিলেন বলে মনে পড়ে?'

সুদক্ষিণা মনে করবার আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল।

ঝি এসে চা রেখে গেল। একটা প্লেটে কিছু খাবার।

সুদক্ষিণা বললে, 'এটুকু খেয়ে নিন।'

'আপনি?'

সলজ্জ হাসি হাসল সুদক্ষিণা, 'চা ছাড়া এখন আর কিছু আমি খাই না। তা বলে আপনি যেন 'না' বলবেন না।'

প্রণব হেসে খাবারের প্লেটটা তুলে নিল।

চায়ে নিঃশব্দে একটা চুমুক দিয়ে সুদক্ষিণা আবার কিছুক্ষণ ভাবলে।

'আমার তো মনে পড়ছে না। তবে গানটা আমার খুব প্রিয়।'

'ভেবে দেখুন তো আপনার পরিচিত জনের মধ্যে গানটি আর কারও খুব প্রিয় কি না?' প্রণব খানিকটা ভেবে চিন্তে বললে।

প্রণবের কথায় সুদক্ষিণার মনের একটা রুদ্ধ জানালা খুলে গেল দমকা ঝড়ের আঘাতে যেমন বন্ধ ভেজানো কপাটি খুলে যায়। মুহূর্তে সুদক্ষিণার সর্বাঙ্গ ক্ষণেকের জন্যে শিউরে উঠল। বিস্ফারিত হল নয়নপল্লব। অর্ধস্ফুট একটা শব্দ উচ্চারিত হল, তার কণ্ঠ থেকে।

প্রণব সুদক্ষিণার মুখে পূর্ণদৃষ্টি মেলে অপেক্ষা করতে লাগল পরম আগ্রহে।

অন্ধকার ক্ষয়ে ক্রমশ আলো জাগল। বিস্মৃত একটা অধ্যায় স্পষ্ট হয়ে জেগে উঠল সুদক্ষিণার স্মৃতিকোঠায়। সংশয় সন্দিগ্ধ কণ্ঠে বললে সুদক্ষিণা, 'এই গানের স্বরলিপির কথায় একজনকে আমার মনে পড়ছে কিন্তু'—কথার মাঝে একটু থেমে আবার যোগ করলে, 'কিন্তু তার নাম তো মনোজ রায় নয়?'

'না-ই হতে পারে।' প্রণব উৎসাহিত হয়ে উঠল 'যার কথা আপনার মনে পড়ছে তার কথাই বলুন।'

সুদক্ষিণার কিন্তু হঠাৎ যেন অনিচ্ছা দেখা গেল। প্রণব লক্ষ করল, গানটা উল্লেখ করবার পর থেকে সুদক্ষিণার স্বাভাবিক শান্ত মুখশ্রীতে কেমন একটা পরিবর্তন ফুটে উঠছে।

'আপনার ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে আমার এ অনাবশ্যক কৌতূহল অবশ্য বাঞ্ছনীয় নয়, সুদক্ষিণা দেবী। কিন্তু সময় সময় অপরিচিত, অনাত্মীয়জনের কাছেও মানুষকে অনেক কিছু প্রকাশ করতে হয়। একটা গুরুতর প্রয়োজন না থাকলে নিশ্চয় আপনার কাছে ব্যাঘাত ঘটাতে আসতাম না।'

সুদক্ষিণা প্রণবের কথা ও স্বরের মধ্যে অনুভব করছিল বিশেষ একটা গুরুত্ব। খানিকটা বুঝি প্রয়োজনের তাগিদও। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে অবশেষে বললে ও, 'আমার মনে পড়ছে গানটি আমি আমার পরিচিত এক ভদ্রলোককে স্বরলিপি সমেত লিখে দি।'

'কী সূত্রে তা কি বলবেন?'

'তিনি গানের বিশেষ গুণগ্রাহী ছিলেন। নিজেও চমৎকার বেহালা বাজাতে পারতেন। আমার মুখ থেকে গানটি শোনার পর তাঁর ইচ্ছে হয় সুরটি বেহালায় তুলে নেবেন। সেই সূত্রে আমি স্বরলিপি সমেত গানটি তাঁকে লিখে দি।'

'আর এই নামটা?'

'সেটাও তাঁর তাগিদে।'

চায়ের পেয়ালায় শেষ চুমুক দিয়ে প্রণব সুদক্ষিণার সামনে ঝুঁকে বসল। পকেট থেকে বের করল একটা খাম, তার মধ্যে থেকে আবার একখানি ফটো। ফটোটি এগিয়ে দিলে সুদক্ষিণার দিকে, 'দেখুন তো চিনতে পারেন কি না?'

সুদক্ষিণা ফটোটা হাতে নিয়ে তাকাতেই সর্বাঙ্গ তার নিথর হয়ে গেল। চোখের পাতা পড়ে

না—মুখে একটা শব্দও ফোটে না আর।.. চিন্তার শাখা-প্রশাখা বেয়ে মন তার ডুব দিয়েছে সযত্নে সরিয়ে রাখা এক অতীত ইতিবৃত্তের মাঝে। সুদক্ষিণা জানল না তার নিজের অজ্ঞাতে প্রণবের প্রশ্নার্ত দৃষ্টির মাঝে কোন পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হল, শত অনিচ্ছাসত্ত্বেও ওর মুখে চোখে যে বিষাদমিশ্রিত পেশিকুঞ্চন ফুটে উঠল, তারই করুণ রেখায়-রেখায় কোন রহস্যের সন্ধান পেল প্রণব।

'চিনতে পারলেন?'

প্রণবের কথায় সুদক্ষিণা চমকে উঠল। ছবিটা এগিয়ে দিলে প্রণবকে।

প্রণব সযত্নে ফটোটি পকেটে রেখে প্রশ্ন করলে, 'চিনতে পারলেন?'

মাথা নেড়ে সায় দিলে সুদক্ষিণা।

'কী নাম ভদ্রলোকের?'

'বাণীব্রত চক্রবর্তী।'

'কোথায় থাকতেন?'

'কলকাতা।'

প্রণব প্রশ্ন করে যেতে লাগল আর মন্ত্রমুগ্ধের মতন সুদক্ষিণা উত্তর দিতে থাকল।

'তাঁর বাড়ি আপনি চেনেন?'

'বাড়ি চিনি না। ঠিকানা জানি।'

'দয়া করে ঠিকানাটা বলবেন?'

'সঠিক এখুনি বলতে পারব না। তবে ওপরে আমার বইখাতার মধ্যে কোথায় যেন লেখা আছে। খুঁজে এনে দিতে পারি।'

'মাপ করবেন, একটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন করতে বাধ্য হচ্ছি।'

'বলুন—।'

'বাণীব্রতবাবুর সঙ্গে আপনার পরিচয়—।'

'খুব বেশিদিনের নয়। আমার পিসতুতো দাদার বন্ধু তিনি। দল বেঁধে দাদারা এসেছিলেন দেওঘরে পুজোর সময় চেঞ্জে। দাদার সঙ্গে তিনিও আসেন। আমিও সে সময় দাদাদের দলে ছিলাম। সেই সূত্রে আলাপ।'

'তারপর?'

সুদক্ষিণা প্রণবের প্রশ্ন ঠিক অনুধাবন করতে পারলে না। বললে, 'কী তারপর?'

'সেটাই তো আমি আপনার কাছে জানতে এসেছি।' প্রণব তার দৃষ্টি উজ্জ্বলতর করলে।

সুদক্ষিণা বুঝতে পারে না, প্রণব আসলে কী জানতে চায়। বাণীব্রতর সম্পর্কে পরিবেশন করার মতন অনেক তথ্য অবশ্য তার জানা আছে। আর জানা আছে বলেই কি এই অনর্থক উৎপাত?

'আপনি শেষ তাকে দেখেন কখন?' প্রণব প্রশ্ন করলে।

'পুজোর সময় দেওঘরে। সেই আমার প্রথম এবং শেষ সাক্ষাৎ।'

'ও, তাহলে তো বেশিদিন হয়নি।' প্রণব কেমন যেন নিজের মনেই বলে উঠল।

'না। বেশিদিন আর কই?'

'আশা করি বাণীব্রতবাবুকে আপনি স্বাভাবিক অবস্থায় দেখেছেন?'

'বুঝলাম না।' সুদক্ষিণা বিস্মিত হয়ে বললে।

'মানে—স্বাভাবিক মানুষের মতন। এই যেমন আমি, আপনি—এই রকম আর কী।'

কথায়-কথায় আলোচনার বিষয়বস্তু যে কোন পথে গড়িয়ে যাচ্ছে সুদক্ষিণা তার অস্পষ্ট আভাস পাচ্ছিল। অতি সযত্নে যে-বিষয়টা প্রথম থেকেই সে পরিহার করতে চায়—কেমন করে না-জানি তাদের আলাপ সেই বিষয়টির দিকেই কেন্দ্রীভূত হচ্ছে। সুদক্ষিণার মনে বাণীব্রতর স্মৃতি যে মুহূর্তে জাগল তখন থেকেই অনেক কষ্টে সে তার মনোভাব লুকিয়ে রাখায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

তবু প্রণবের শেষ কথায় সুদক্ষিণা নিজের অজ্ঞাতেই জালে জড়িয়ে পড়ল।

'আপনার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, প্রণববাবু। বাণীব্রতবাবুকে স্বাভাবিক অবস্থায় দেখেছি কি না—এ প্রশ্ন কেন করছেন? স্বাভাবিক একজন মানুষকে অস্বাভাবিক দেখার কোনও কারণ নেই।'

'ক্ষমা করবেন। আপনার সঙ্গে যখন বাণীব্রতবাবুর আলাপ হয় তখন তিনি স্বাভাবিক মানুষের মতনই ছিলেন। যদিও আমার ধারণা তাও ঠিক হয়তো ছিলেন না। যাক সে কথা। আচ্ছা সুদক্ষিণা দেবী, বাণীব্রতবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার একবার সুবিধে আপনার হবে?'

প্রণবের অনুরোধে সুদক্ষিণার বিস্ময়ের মাত্রা ছাড়িয়ে গেল; কিছুটা যেন বিরক্ত হল সুদক্ষিণা।

'হঠাৎ তাঁর সঙ্গে আমার দেখা করার প্রয়োজন?'

'গুরুতর একটা প্রয়োজন আছে বইকী? নয়তো আপনাকে অনুরোধ করব কেন? যাবেন একবার আমাদের হাসপাতালে? একটু দূর হবে অবশ্য। খানিকটা কষ্টও হবে—যাওয়া-আসায়। তা হোক—তবুও আমি আপনাকে অনুরোধ করব। আপনি জানেন না—এই সাক্ষাতের ফলে কী পরম উপকারই না হতে পারে!' প্রণবের স্বর গভীর হয়ে এল।

হঠাৎ কী যেন হল সুদক্ষিণার। কঠিন কণ্ঠে বললে, 'মাপ করবেন। দেখা করার সুবিধে আমার হবে না!'

প্রণব বুঝি জানত এমন একটা উত্তরই সে পাবে। কিছুমাত্র হতাশ না হয়ে আবার সে বললে, সুদক্ষিণার চোখে তার স্থির শান্ত গভীর দৃষ্টি রেখে, 'এমনটা আশা কবিনি আপনার কাছে। অবশ্য এও আপনি হয়তো জানেন না, আপনার পরিচিত এই ভদ্রলোক—এক পাগলা হাসপাতালে অসহ্য কষ্টে, স্মৃতি-বিভ্রম ঘটিয়ে, পাগল হয়ে দিন কাটাচ্ছেন।'

প্রণবের কথায় সুদক্ষিণার সাবা শরীরের ওপর দিয়ে যেন বরফের স্রোত বয়ে গেল। রুদ্ধ হল তার নিশ্বাসপতন; নিষ্পলক হল নয়ন। বুকের মধ্যে অব্যক্ত একটা যন্ত্রণা পাক দিয়ে উঠল। সুদক্ষিণার মুখচোখের এই আকস্মিক পরিবর্তন অত্যন্ত সতর্ক নিরপেক্ষ চোখে দেখলে প্রণব।

'সুদক্ষিণা দেবী!'

সংবিত ফিরে এল সুদক্ষিণার। প্রণবের মুখের দিকে অর্থহীন দৃষ্টি মেলে বসে থাকল ও।

'শরীরটা কি অসুস্থ মনে হচ্ছে আপনার?'

সে কথার কোনও জবাব না দিয়ে মৃদু জড়িতস্বরে সুদক্ষিণা বললে, 'বাণীব্রতবাবু কি পাগল হয়ে গেছেন?'

'হ্যাঁ, তাই।'

'ভাবতে পারিনি। তবে ও-ঘটনার পর পাগল হওয়া বিচিত্র নয়!'

'কোন ঘটনা?'

'ও, আপনি জানেন না? অনেকেই কিন্তু জানে। বাণীব্রতবাবু তাঁর ভাইকে খুন করে নিরুদ্দেশ হয়ে যান।'

প্রণবের চোখের সামনে সেই অনুজ্জ্বল ঘরের আলো যেন নিভে গেল হঠাৎ; তারপর কয়েক মুহূর্তেই আবার জ্বলে উঠল শতগুণ তীব্র হয়ে। আশ্চর্য একটা উত্তেজনা জাগল প্রণবের সর্বাঙ্গে। ঘরের মধ্যে খানিকটা পায়চারি করে থমকে দাঁড়াল প্রণব সুদক্ষিণার মুখোমুখি।

'কোনও একটা মারাত্মক ঘটনা আশা করলেও যা বললেন তেমন কিছু অনুমান করিনি। বাণীব্রত খুনি। হ্যাঁ—তা এ ধরনের কিছু ঘটা বিচিত্র নয়। যাই হোক—সুদক্ষিণা দেবী, সমস্ত ঘটনাটা দয়া করে আমায় বলতে হবে। আর আপনাকে একবাব যেতেও হবে আমাদের হাসপাতালে।'

'আমার মুখ থেকেই শুনতে চান?' সুদক্ষিণা ব্যথাহত সুরে প্রশ্ন করলে।

'তেমন কোনও আপত্তি যদি না থাকে!'

'না—আপত্তি কী, জানতেই যখন পারলেন। তবে একটা কথা প্রণববাবু, যা আমি শুনেছি তাই বলছি; ঘটনাস্থলে থাকলেও আমি প্রত্যক্ষদর্শী নই।'

'বুঝেছি। আপনি বলুন।'

কথাশেষে প্রণব একটা সিগারেট কেস থেকে বের করে জ্বালিয়ে নিল।

সেই আধো-অন্ধকার ঘরের মধ্যে থমথমে আবহাওয়া জমাট হয়ে এল। বৃষ্টি নেমেছে বাইরে অঝোর ধারায়। খোলা জানালা দিয়ে চোখে পড়ে দিগন্তছাওয়া আঁধার। বৃষ্টির একটানা শব্দ।

সুদক্ষিণা তার কথা শুরু করল।

'ব্যাপারটা আপনাকে সব গুছিয়ে না বললে ঠিক বুঝতে পারবেন না,'—সুদক্ষিণা গায়ের চাদর আবও ঘন করে জড়িয়ে নিয়ে বলে যেতে লাগল। ধীর, স্পষ্ট, বিষণ্ণ তার কণ্ঠস্বর, 'আমার এক দূর সম্পর্কীয় দাদা আছেন কলকাতায়। নাম তাঁব বিভূতিভূষণ। আগে তাঁরা শোভাবাজার অঞ্চলে থাকতেন। গত বছর দাদা টালিগঞ্জ অঞ্চলে ছোটখাটো একটা বাড়ি তৈরি করে সেখানে উঠে যান। প্রতিবেশী হিসেবে দাদার সঙ্গে আলাপ হয় বাণীব্রতবাবুর। সেই আলাপ ক্রমে অন্তরঙ্গ বন্ধুত্বে পরিণত হয়। অল্পদিনের মধ্যে দাদার অন্তঃপুরেও বাণীব্রতবাবু আত্মীয়ের মতো সহজস্থান অধিকার করলেন। শুনেছি বাণীব্রতবাবু একা মানুষ। চাকর-বাকর নিয়ে তাঁর সংসার। আমার বউদি—এই একা নিঃসঙ্গ নিরীহ মানুষটিকে পছন্দ করতেন। স্নেহও করতেন প্রচুর। দাদার চেয়ে বউদির সঙ্গেই যেন বাণীব্রতবাবুর বেশি ভাব—প্রীতিব সম্পর্ক আরও গভীব। এবার পুজোর ঠিক পরেই দাদারা এলেন দেওঘবে হাওয়া বদলাতে। তাঁদের সঙ্গে বাণীব্রতবাবু। আমিও সেই সময় স্কুলের ছুটি থাকায় ওঁদের দলে হাজিব ছিলাম। বাণীব্রতবাবুব সঙ্গে দেওঘবেই আমাব প্রথম আলাপ হল। ভদ্রলোক বাস্তবিক অত্যন্ত নিরীহ, শান্ত। তাঁর শিক্ষা, দীক্ষা, রুচি—সবই প্রশংসনীয়। উপরন্তু আমার মতনই সংগীতের ওপর ছিল তাঁর গভীর অনুবাগ। আমরা দুজনে সম্ভবত সেই কারণেই খুব অল্পদিনের মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে উঠি। আমি তাঁর কাছ থেকে বেহালা শেখার প্রথম পাঠ নিতেও শুরু কবেছিলাম। আর তিনি ভালো গান—যা আমি ভালোভাবে জানতুম বলে তিনি মনে করতেন—সেগুলোর সুর তুলে নিতেন বেহালায়। একদিন বেড়িয়ে ফেরার পথে দাদা-বউদির অনুরোধ আর পীড়াপীড়িতে আমি একটা গান গাই। গানটা আমার নিজের লেখা এবং সুব দেওয়া। বাণীব্রতবাবুর সেই গান খুব ভালো লাগে। সেদিন বাড়ি ফিরে এসেই তিনি গানটিব সুব তুলতে বসে গেলেন। গানটির স্বরলিপি তাঁর সামনে বসে আমায় তখুনি করে দিতে হয়। এবং তাঁরই অনুরোধে স্বরলিপির শেষে নিজের নাম ঠিকানাও লিখেছি। আমার যতদূর মনে পড়ে—গানটি তিনি কোনও গানেব পত্রিকায় ছাপতে পাঠাবেন বলেই আমাব নাম ও ঠিকানা লিখে দিতে বলেন,—' এইখানেই সুদক্ষিণা থামল। যেন মন্থন করলে অতীতস্মৃতি। নিস্তব্ধ কতকগুলো মুহূর্ত কেটে গেল। সহসা সুদক্ষিণা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আবাব বলে চলল, 'এর দিন কয়েক পরে আশ্চর্য একটা ঘটনা ঘটল। বউদি একদিন সন্ধের দিকে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ওখানের এক ডাক্তারকে ডেকে পাঠানো হল। তাঁর নাম দিব্যেন্দু চক্রবর্তী। ডাক্তার চক্রবর্তীর সঙ্গে আমাদের কোনও আলাপ ছিল না। সেরকম কোনও সম্ভাবনাও দেখা দেয়নি আগে। ডাক্তার চক্রবর্তী এসে বউদিকে দেখে চলে যাওয়ার পর হঠাৎ দেখলাম বাণীব্রতবাবুর মধ্যে অদ্ভুত একটা পরিবর্তন। কেমন যেন হঠাৎ খুব গম্ভীর আর অস্থির হয়ে গেলেন। একটু রাত করে বাড়ি ফিরলেন তিনি। তারপর নিজের ঘরের দরজা দিলেন বন্ধ করে। আমাদের সকলের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে শুধু জানালেন তাঁর শরীর খারাপ। আমরাও আর তাঁকে সে রাত্রের মতন বিরক্ত করলুম না। প্রতিদিনের মতন দশটা নাগাদ যে যার ঘরে ঘুমিয়ে পড়লুম। পরের দিন একটু বেলাতেই এক অপ্রত্যাশিত সংবাদ শুনে আমরা পাথর হয়ে গেলুম। মাঝ রাত্রে ডাক্তার চক্রবর্তীর বাড়িতে গিয়ে নাকি বাণীব্রতবাবু

ডাকাডাকি শুরু করেন। ডাক্তার চক্রবর্তী বৈঠকখানা ঘর খুলে বাণীব্রতবাবুকে বসান। তারপর ডাক্তার চক্রবর্তীর সঙ্গে বাণীব্রতবাবুর কী নিয়ে যেন বচসা বেধে যায়। শেষ পর্যন্ত একটা অভাবনীয় কাণ্ড ঘটে গেল। বাণীব্রতবাবু ডাক্তার চক্রবর্তীর ওপর হিংস্র হয়ে উঠে তাঁকে গুলি করেন। এরপর সেইরাত্রেই তিনি কোথায় যে নিরুদ্দেশ হয়ে যান তা জানি না। আপনার কাছেই আজ আমি প্রথম জানলুম বাণীব্রতবাবু জীবিত এবং পাগল অবস্থায় রয়েছেন।' সুদক্ষিণা তার কথা শেষ করে নীরব হল।

প্রণব সুদক্ষিণার প্রতিটি কথা গভীর মনোযোগের সঙ্গে শুনছিল। গেঁথে নিচ্ছিল মনে-মনে। সুদক্ষিণার কথা শেষ হতে প্রণব বললে, 'কিন্তু একটা ব্যাপার তো আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না। হঠাৎ ডাক্তার চক্রবর্তীকে খুন করার কারণ কী? বাণীব্রতবাবুর তাতে স্বার্থ কোথায়?'

'আমিও প্রথমে তাই ভেবেছিলুম। কথাটা বিশ্বাস করিনি। তারপর শুনলাম—' সুদক্ষিণা থেমে গেল।

'কী শুনলেন?' প্রণব ব্যাকুল সুরে প্রশ্ন করলে।

'সে এক অদ্ভুত ঘটনা। ডাক্তার চক্রবর্তী আসলে হচ্ছেন বাণীব্রতবাবুর খুড়তুতো ভাই। একমাত্র জীবিত ও ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। কলকাতায় উভয়েই ছিলেন উভয়ের অন্তরঙ্গ বন্ধু। একটি মেয়ে, নাম নীলা তাকে নিয়েই এই দুই ভাই এবং পরম বন্ধুর মধ্যে চিরদিনের মতো একটা বিচ্ছেদ ঘটে যায়—।'

'আমাকে আরও একটু বোঝবার সময় দিন, সুদক্ষিণা দেবী।' প্রণব কৌতূহল চাপতে না পেরে বললে।

কেমন একটা সংকোচ হচ্ছিল সুদক্ষিণাব এ-সব কথা বলতে। কিন্তু সংকোচের অবকাশ আর ও দিল না। ও বলছিল, 'বাণীব্রতবাবু নীলাকে ভালোবাসতেন। নীলারও বাণীব্রতবাবুর ওপর সমান অনুবাগ ছিল। কিন্তু নীলা পরে জানতে পারে বাণীব্রতবাবু তাকে সন্দেহ করেন। এই সন্দেহের দরুনই বাণীব্রতবাবু নীলাকে একদিন হঠাৎ ক্ষেপে উঠে মেরে ফেলতে পর্যন্ত গিয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারেননি। ডাক্তার চক্রবর্তী নীলাকে বাঁচান। এরপর থেকে ওদের পরস্পরের সম্পর্ক ভীষণ তিক্ত হয়ে ওঠে। ডাক্তার চক্রবর্তী নীলাকে বিয়ে করে কলকাতা ছেড়ে মফস্‌সলে চলে আসেন। শুনেছি এছাড়া নাকি বাণীব্রতবাবুর হাত থেকে বাঁচবার অন্য কোনও পথ তাঁদের ছিল না। এ ঘটনার বছর তিনেক পরে অত্যন্ত আকস্মিকভাবে দেওঘবে সেই ভাইয়ের সঙ্গে বাণীব্রতবাবুর দেখা হয়ে গেল— ডাক্তার চক্রবর্তী যখন বউদিকে প্রথম দেখতে এলেন আমাদের বাড়িতে। শুনেছি ভাইয়েব বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধই নাকি তিনি নিয়েছেন এ-ভাবে।

প্রণব যেন এক রোমাঞ্চ কাহিনির মধ্যে নিজের অস্তিত্ব বিলিয়ে দিয়েছে। চোখে তার অতল বিস্ময়, ঠোঁটের কোণে রুদ্ধ উত্তেজনার কুঞ্চিত রেখা।

নিস্তব্ধ কতকগুলো মুহূর্ত শেষ হল; অসহনীয়, অস্বস্তিকর পরিবেশ। হঠাৎ প্রণব বললে, 'বাণীব্রতবাবুর পারিবারিক জীবনের এই পরিচ্ছেদটি আপনি কেমন করে জানলেন?'

'দাদার কাছ থেকে।'

'ডাক্তার চক্রবর্তী খুন হওয়ার আগে না পরে?'

'পরে। ডাক্তার চক্রবর্তীর স্ত্রী—নীলার কাছ থেকে খবর পেয়ে পুলিশ যখন আমাদের বাড়ি এসে হানা দিল।'

'ও! আপনাদের বাড়িতে পুলিশ এসেছিল?'

'আসবেই তো। বাণীবাবুকে আমাদের লোক বলেই সকলে জানত। তাঁর সম্বন্ধে নানা তথ্য জানবার আশায় পুলিশ আমাদের কাছে না এসে পারে না। তা ছাড়া—'

'কী, তা ছাড়া—?'

'ডাক্তার চক্রবর্তীকে যে রিভলভার দিয়ে গুলি করে মারা হয় সেটা আমার দাদার। বাণীবাবু যাওয়ার সময় সকলের অজ্ঞাতে সেটি সরিয়ে নিয়ে যান।'

'ও! আচ্ছা, রিভলভারটা নিশ্চয়ই ঘরে পাওয়া গিয়েছিল?'

'তাই। ডাক্তার চক্রবর্তীর মৃতদেহের পাশেই, মেঝের ওপর। এই রিভলভার নিয়ে দাদাকে কম ঝামেলা পোহাতে হয়নি।'

'তা তো হবেই।'

প্রণব কী যেন ভাবতে-ভাবতে উঠে দাঁড়াল।

'এখনকার মতো চলি। জানবার মতো অনেক জিনিস এখনও বাকি থেকে গেল। এদিকে কালই আমি হাসপাতালে ফিরে যাব। আপনি কি আমার সঙ্গে যাবেন?'

'কী হবে—' ক্লান্ত সুরে সুদক্ষিণা বললে।

'কিছু হবে বইকী। খুন—খুনই বা কেন বলি—আশ্চর্য একটা মনের রহস্য হয়তো জানা যাবে। এখন আমি চললুম। বৃষ্টি একটু থেমেছে। আপনি রাত্রিতে যাওয়ার সম্বন্ধে ভেবে স্থির করে রাখবেন। কাল সকালে আমি খোঁজ নেব।'

ছোট্ট একটা নমস্কার জানিয়ে প্রণব চলে গেল। তার যাওয়ার পথে অর্থহীন দৃষ্টি মেলে বসে থাকল সুদক্ষিণা।

যে অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে গেল, তারপর রাত্রে সুদক্ষিণা যে ঘুমোতে পারবে নিরঙ্কুশ মনে—এমন কোনও সম্ভাবনা ছিল না। অনেক রাত পর্যন্ত তন্দ্রাহীন, দুশ্চিন্তাপীড়িত মন নিয়ে ছটফট করলে সুদক্ষিণা। আকাশ-পাতাল কত কী ভাবল, আবার ভাবতে না পেরে হালও ছেড়ে দিলে।

বাইরে বৃষ্টির তাণ্ডব কখন যেন আরও বেড়েছে। বজ্রপাতের নির্ঘোষ মাঝে-মাঝে চমকে দিয়ে যায় সুদক্ষিণাকে, ঝড়ের মাতাল হিংস্র রূপটা চোখে না দেখেও অনুমান করতে পারে সে। শ্যামুখর রাত্রির স্পর্শ পাওয়ার লোভে মন যার বিকেলে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল—রাত্রে মৃদু আলোকময় রুদ্ধ ঘরের নরম বিছানায় শুয়ে তার সেই মনই হাঁপিয়ে উঠছে—অদ্ভুত একটা ভয় গ্রাস করছে তিলে-তিলে; কী আশ্চর্য!...সুদক্ষিণা মনের সব ভাবনাকে কিছুক্ষণের জন্যে তাড়িয়ে দিয়ে একটু নিশ্চিন্ত হতে চাইল; কিন্তু পারলে না।

বিছানার ওপর উঠে বসল সুদক্ষিণা। দুহাতে মাথা টিপে বসে থাকলে অনেক—অনেকক্ষণ। তারপর ঘড়িতে যখন দুটো বাজার শব্দ শুনল তখন হাল ছেড়ে দিয়ে মাটিতে নেমে এল। না, আজ আর তার ঘুম হবে না। মুখে চোখে জলের ছিটে দিল সুদক্ষিণা। অনেকটা জল খেল। পায়চারি করলে ঘরের মধ্যে খানিকক্ষণ। অতসীকে ডেকে আনবে কি না পাশের ঘর থেকে তাও ভাবলে কবার।

শেষ পর্যন্ত আবার সেই বিছানা—সেই চিন্তা। সবার চেয়ে বড় চিন্তা—যা তার চেতনার পুরো আকাশটাকেই ঢেকে রেখেছে, তুমুল একটা ঝড়ও দিয়েছে জাগিয়ে —তা বাণীব্রতর পাগল হয়ে যাওয়ার সংবাদ। স্মৃতি-বিভ্রম ঘটিযে পাগলা হাসপাতালে দিন কাটাচ্ছে বাণীব্রত দীনতম অবস্থায়। মানসিক চরম নিষ্পেষণ সহ্য করে এখনও বেঁচে রয়েছে এমন একটা মানুষ যার মৃত্যুও এ-ক্ষেত্রে বুঝি বাঞ্ছনীয়। বাণীব্রতর দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণা, আত্মপীড়ন—সবই যেন সুদক্ষিণা নিজের মধ্যে অনুভব করতে পারে। কিন্তু কেন? কী তার যায় আসে বাণীব্রত পাগল হোক আর না-হোক। কীসের সম্পর্ক তার বাণীব্রতর সঙ্গে? একটা প্রতারক, পাপীর জন্যে সুদক্ষিণার দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ কেন?...কেন তা সুদক্ষিণা জানে। কিন্তু অস্বীকার করতে চায় সহজ সত্যটাকে জোর করে দাবিয়ে-দমিয়ে। বাণীব্রতকে ভালোবাসে সে। আজ নয়, সেই, সে-দিন—যেদিন বাণীব্রত তার হাত তুলে নিল, চুপ করে বসে

থাকল তার দিকে তাকিয়ে; চোখের দৃষ্টি ভরে তুলল মিনতি ও প্রত্যাশায়, প্রার্থনার আশায়, ব্যাকুলতায়। সুদক্ষিণা মাঠ-শেষের সেই বকুলগাছের বেদি আর অস্তমান সূর্যের ছড়ানো সোনায় সে-দিন যা গ্রহণ করলে তার স্পষ্ট কোনও রূপ নেই। আজও তাই মাঝে-মাঝে সুদক্ষিণা ভেবে পায় না—বাণীব্রত তার কে—কেন তার জন্যে এত দুঃখ, এত উদ্বেগ?

আত্মদ্বন্দ্বের নিষ্পেষণে ক্ষয়ে যেতে লাগল সুদক্ষিণা। কী যে তার করা উচিত কিছুতেই ভেবে ঠিক করে উঠতে পারল না।

প্রণবের মুখ থেকে বাণীব্রতর কথা শোনার পর মন চাইছে ছুটে যেতে। বাণীব্রতর পাশে দাঁড়িয়ে তার দুঃখ, দৈন্য, দুর্ভাগ্যকে নিজের করে নিতে। সেবায়, যত্নে, সোহাগে—হতভাগ্য বাণীব্রতকে কিছুটা শান্তি দিতে।

সুদক্ষিণার মন যা চায় সেটা তার স্বভাব—ভালোবাসার স্বভাব। কিন্তু স্বভাবে চাইলে কি হয়, বাণীব্রতর তরফ থেকে একটা অভাব তার যাওয়ার পথে কঠিন বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। একটা মানুষকে আমরা পুরোপুরিভাবে গ্রহণ করতে পারি না—যখন দেখি আমাদের নীতিবোধকে সে অমান্য করছে, আঘাত করছে বিশ্বাসকে। সুদক্ষিণার ক্ষেত্রে সেটাই একমাত্র বাধা—ব্যবধান। কেন বাণীব্রত এমন কাজ করল? নীলা তাকে প্রতারণা করেছিল বলে সকলকেই কি সে প্রতারণা করবে? সত্যি কি বাণী তাকে ভালোবাসেনি? বাণী কি তার বন্ধু বিভূতি আর বউদির সমস্ত স্নেহ আর প্রীতিকে ভুলে গেল? খুনের মামলার সঙ্গে তাদের নাম জড়িত করে এতবড় অমর্যাদা করলে স্নেহ, প্রীতি, বন্ধুত্ব আর ভালোবাসার! সহজভাবে সুদক্ষিণা যার হাত ধরে এ পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে চেয়েছিল—সেই তাকে আঘাত দিয়ে চলে গেল। বাণীব্রতকে জড়িয়ে কুৎসা, ঘৃণা, ভয়। সমাজমনের অসমর্থনই ন্যায় নীতি ও আইনের বাধা। বাণীব্রতর কলঙ্ক কেউ ক্ষমা করবে না। আইনের চোখে মানুষ-সমাজে নিকৃষ্টতম পাপী সে। তার বিচারে বাণীব্রতর বেঁচে থাকবার অধিকারটুকুও যে ছিনিয়ে নেওয়া হয়! এই জঘন্য, কুশ্রী, গ্লানিময়, একটা জীবনের সঙ্গে কেন সুদক্ষিণা নিজেকে জড়াতে যাবে? কেন—কেন? জীবনে একদা মাত্র ক'টি দিনের জন্যে সুদক্ষিণা যে-স্বর্গ রচনা করেছিল—দেওঘর থেকে ফিরে এসে প্রাণপণে তা ভুলে যেতে চেয়েছে—মুছে ফেলতে চেয়েছে তাব কুমারী জীবনের সেই শুক্লপক্ষ, ধবলস্বপ্ন। বহুপরিশ্রমে বাণীব্রতকে সে ভুলতে না পারলেও দূরে সরিয়ে রাখতে পেরেছিল, পেরেছিল ওর ওপর অশ্রদ্ধা, বিরক্তি আর ঘৃণার একটা সমর্থন তৈরি করে সযত্নে নিজে সরে আসতে। সুদক্ষিণার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল প্রণবের আবির্ভাবে। যুক্তি, ন্যায়, নীতি, আইন—যত বাধা, যত শৃংখল সব ভেঙে গেল, ভেসে গেল। ওর ভালোবাসা যেন মন্ত্র দিল কানে-কানে—বিচার করো না, বাধা মেনো না। ভালোবাসা আদালতের আইন নয়।

ঘড়িতে পাঁচটা বেজে গেল।

সুদক্ষিণা স্থির করলে সে যাবে। বাণীব্রতর পাশে গিয়ে দাঁড়াবে। ভবিষ্যৎ ভেবে কোনও লাভ নেই। ভবিতব্য যা, তাই তো হবে। এই বুঝি তার ভাগ্য।

সুদক্ষিণার সঙ্গে প্রণবের সাক্ষাতের পর এ কাহিনির আবার যবনিকা উঠল পরেশনাথ মেন্টাল হসপিটালের একটি কক্ষে। পূর্বঘটনার দিন চারেক পরে। হসপিটালের চিফ মেডিকেল অফিসারের চেম্বার। পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন,—অপেক্ষাকৃত অল্প আসবাবসজ্জিত একটি ঘর। সেক্রেটারিয়েট টেবিলের সামনে বসে রয়েছেন ডাক্তার অরুণকান্তি গুপ্ত। তিনিই এ হাসপাতালের প্রধান কর্মকর্তা। ডাক্তার গুপ্তর বয়স পঞ্চাশের কোঠা ছাড়িয়ে গেছে। তবু প্রৌঢ়ত্ব যেন আজও পরিপূর্ণভাবে গ্রাস করতে পারেনি তাঁকে। দেহে তাঁর আজ মধ্য-যৌবনের শান্ত দীপ্তি। গৌরবর্ণ এই লোকটির রূপেরও বুঝি শেষ নেই। দেহের প্রতিটি অঙ্গ সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে বর্ধিত হয়েছে। ডাক্তার গুপ্ত তাঁর চেয়ারে ঝুঁকে বসেছিলেন। একটি হাত চিবুকে, অপরটি টেবিলের ওপর ছড়ানো। মাঝে-মাঝে আঙুল দিয়ে মৃদু টোকা দিচ্ছেন টেবিলে বিছানো কাচের ওপর। ঠিক এইরকম ভঙ্গিটিই ডাক্তার গুপ্তর গভীর-চিন্তাকালীন

বিশেষ একটি মুদ্রা বলা চলে। সুদক্ষিণা সেক্রেটারিয়েট টেবিলের উলটো দিকেই বসেছিল। সম্ভবত অভিভূত হচ্ছিল ডাক্তার গুপ্তর বিরাট ব্যক্তিত্বের মুখোমুখি বসে। নীরবে শুনছিল ডাক্তার গুপ্ত আর প্রণবের কথাবার্তা। লক্ষ করছিল ডাক্তাব গুপ্তের চোখের ভাষা। ঘনকৃষ্ণ ভ্রূদ্বয়ের নীচে আশ্চর্য দুটো চোখ ডাক্তার গুপ্তর; হালকা বাদামি রঙের স্বচ্ছ প্রচ্ছদপটের ওপর ধূসর দুটি মণি। অচঞ্চল, অচপল কিন্তু অস্বাভাবিক উজ্জ্বল ও আকর্ষণীয়। ঊর্ধ্ব ওষ্ঠের পাশ দিয়ে মৃদু একফালি হাসি ছড়িয়ে পড়েছে। কুঞ্চিত কয়েকটি ক্ষীণ পেশি-রেখায় অপূর্ব সুষমামণ্ডিত হয়েছে ডাক্তার গুপ্তর মুখশ্রী।

প্রণব ডাক্তার গুপ্তর পাশে দাঁড়িয়েছিল—হাতে তার খোলা ফাইল। ডাক্তার গুপ্ত গভীর চিন্তার মাঝে কথা বলে উঠলেন, 'Yes, I do quite agree with you, that particular detail has a great—great significance,'—কথার শেষে ডাঃ গুপ্ত চিবুক থেকে হাত সরিয়ে নিলেন। একটু থেমে সুদক্ষিণার দিকে ইঙ্গিত করে প্রশ্ন করলেন প্রণবকে, 'এঁর সঙ্গে তোমার পেশেন্টের দেখা হয়েছে?'

প্রণব ঘাড় নাড়লে। বললে, 'না। এখনও হয়নি। আজ সকালেই প্রথম আমি এঁকে হাসপাতালে নিয়ে এসেছি।'

'That's well! তোমার পেশেন্টকে ডাকো।'

'এখানে?'

'ক্ষতি কী? Let us see the result!'

প্রণব কলিং বেলে হাত দিল। একটু পরে ঘবের পবদা সবিয়ে এসে দাঁড়াল মেট্রন মিসেস নাগ।

প্রণব বললে, 'মিসেস নাগ, বত্রিশ নম্বর পেশেন্ট—মনোজ রায়কে এখানে নিয়ে আসুন।'

'Yes sir!' মিসেস নাগ সুদক্ষিণার দিকে এক ঝলক তাকিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ডাক্তার গুপ্ত বললেন, 'একটা জিনিস তুমি লক্ষ করেছ প্রণব?'

প্রণব ঠিক বুঝতে পারলে না ডাক্তার গুপ্ত কোন বিষয়ের উল্লেখ করছেন। 'কোন বিষয়ের কথা বলছেন স্যার?'

'আমি এই পেশেন্টের ইনট্রিগের কথা বলছি। কী যেন মেয়েটির নাম বললে—ইলা—। Think!'

'নীলা—।'

'Yes—নীলা। বাণীব্রত নীলাকে ভালবাসত, হঠাৎ সন্দেহ করতে শুরু করলে। কেন? নীলার সঙ্গে ডাক্তার চক্রবর্তীর এমন কোনও সম্পর্ক কি বাণীব্রত আবিষ্কার কবেছিল যা তার পক্ষে বরদাস্ত করা সম্ভব নয়? হয় তো তাই—সন্দেহের বশে বাণীব্রত একবাব এতদূর উত্তেজিত হয়ে পড়ে যে, নীলাকে গলা টিপে মেরে ফেলতে পর্যন্ত চেষ্টা করে। তাই নয় কি?'

'হ্যাঁ স্যার। তবে আর একটু কথা আছে।'

ডাঃ গুপ্ত প্রশ্নার্ত চোখ তুলে তাকালেন।

'নীলার সঙ্গে ডাক্তার চক্রবর্তীর কোনও খারাপ সম্পর্ক আবিষ্কার করে বাণীব্রত নীলাকে সন্দেহ করতে শুরু করে কি না—সে বিষয়ে কিছু জানা যাচ্ছে না। নীলাকে সন্দেহ করার অন্য কোনও কারণও থাকতে পারে।'

'How can you say that? Was he suffering from some psychoses?'

'যদি তাই হয়—কিংবা আরও জটিল কোনও কারণ থাকে তা হলে উত্তেজিত অবস্থায় নীলাকে হত্যা করবার ইচ্ছে হওয়া বাণীব্রতর পক্ষে অসম্ভব নয়।'

'অবশ্যই। আমি ভাবছিলুম প্রণব, নীলার ওপর সন্দেহ জাগার কারণ ডাক্তার চক্রবর্তী। নীলা নিশ্চয় পুলিশকে সেরকম স্টেটমেন্ট দিয়েছে। এক্ষেত্রে তাই স্বাভাবিক।'

'সেটাই স্বাভাবিক হত, স্যার। কিন্তু আমি দেখছি এক্ষেত্রে সেটা নয়। তাই ব্যাপারটা আমাদের ভাবিয়ে তুলেছে। আজকের ডাকে নীলার স্টেটমেন্ট পুলিশ অফিস থেকে এসেছে।'

'তাই নাকি? ওরা তা হলে আমাদের—' ডাঃ গুপ্ত খুশি হলেন।

'হ্যাঁ, আমাদের প্রোপোজালেই রাজি হয়েছে। নীলা, বিভূতিবাবু, ডাক্তার চক্রবর্তীর একটা চাকর সকলেরই স্টেটমেন্ট এবং আজ পর্যন্ত পুলিশ-এনকোয়ারির ফলে যতটা ইনভেসটিগেশান সম্ভব হয়েছে তার পুরো রিপোর্টও পুলিশ অফিস থেকে এসেছে।'

ডাঃ গুপ্ত আরও খুশি হলেন।

'তাহলে প্রণব, পুলিশ আজকাল আমাদের মূর্খ ভাবে না। বাণীব্রতকে আমরা এখানে রাখতে পারছি!'

'হ্যাঁ, স্যার, পারছি। অবশ্য যতদিন না বাণীব্রতকে সুস্থ করতে পারি। সুস্থ করতে না পারলে তাকে পুলিশের হাতে আমাদের হ্যান্ড ওভার করে দিতে হবে। পুলিশ থেকে ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চের একজন সিনিয়ার লোককে ওরা এখানে পাঠাচ্ছে।'

'Oh, they are quite upto the mark this time! যাক—তুমি যেন কী বলছিলে?'

ডাঃ গুপ্ত টেবিলে রাখা সিগারেটের টিন থেকে সিগারেট নিয়ে ধরালেন।

প্রণব বললে, 'অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা সূত্র। নীলাকে কেন যে বাণীব্রত সন্দেহ করত তা নীলা বলেনি।'

'আশ্চর্য!'

ডাঃ গুপ্ত উগ্র কৌতূহল বোধ করলেন।

'না। পুলিশ এ সম্পর্কে তাকে কয়েকবারই প্রশ্ন করেছে—প্রতিবারেই সে বলেছে—বাণীব্রত কেন তাকে সন্দেহ করত, নীলা জানে না। একবার সে এমন কথাও বলেছে যে, ডাঃ চক্রবর্তীর সম্পর্ক নিয়ে তাকে সন্দেহ করার মতন কোনও কারণ বাণীব্রতর ঘটেনি বলেই নীলার বিশ্বাস। নীলার সঙ্গে ডাক্তার চক্রবর্তীর আলাপ থাকলেও উভয়ের অন্তরঙ্গ হওয়ার কোনও কারণ ছিল না।'

সুদক্ষিণা এতক্ষণ অবাক হয়ে এদের কথাবার্তা শুনছিল। আর পরম উৎকণ্ঠায় অপেক্ষা করছিল বাণীব্রতর আগমনের। তবু কে জানে কেন—প্রণবের কথাবার্তার মধ্যে সুদক্ষিণা কী যেন আবিষ্কার করে মনে-মনে খুশি হচ্ছিল।

'আমার মনে হয়,' প্রণব বললে, 'হয়-নীলা তার সঙ্গে ডাক্তার চক্রবর্তীর অন্তরঙ্গ হওয়ার ইতিহাস গোপন রাখতে চায়; না হয়—সে গোপন রাখতে চায় বাণীব্রত তাকে প্রকৃতই কেন সন্দেহ করত সে কথা।'

'তোমার এ ধারণার যুক্তি?'

'আছে স্যার, ডাক্তার চক্রবর্তীর সঙ্গে নীলার ঘনিষ্ঠ হওয়ার ইতিহাস পুলিশের কাছে প্রকাশ করা তার পক্ষে শোভন নয়। তাতে নিজের অমর্যাদা। বাণীব্রতর বাগদত্তা হয়েও ডাক্তার চক্রবর্তীর সঙ্গে বেশি মেলামেশা আর একমাত্র সেই কারণে বাণীব্রতর মনে একটা সন্দেহের জন্ম—এটা প্রকাশ হলে যেন নীলার গৌরবহানি তো হয়ই উপরন্তু বুঝি বাণীব্রতর অপরাধের গুরুত্ব কমে যায়। নয় কি?'

'Yes, it is so!'

'আমার দ্বিতীয় সিদ্ধান্তের যুক্তি আরও সরল।'

'বুঝলাম; তুমি বলতে চাও বাণীব্রত প্রকৃতই যে কারণে নীলাকে সন্দেহ করত তা প্রকাশ করলে নীলারই ক্ষতি। এজন্যেই সে আসল কারণ বলতে চায় না।'

প্রণব ঘাড় নাড়লে।

এমনসময় ঘরের পরদা সরিয়ে মিসেস নাগ মুখ বাড়ালে। তার স্বাভাবিক মিষ্টি গলায় জানালে,

'আসব, স্যার?'

প্রণব ইঙ্গিতে মিসেস নাগকে আসতে অনুমতি দিল।

ধীরে-ধীরে পরদা সরিয়ে মিসেস নাগ বাণীব্রতকে নিয়ে ঘরের মাঝামাঝি এগিয়ে এল। নিমেষে ঘুরে তাকাল সুদক্ষিণা। এক মুহূর্ত। তীক্ষ্ণ তীব্র একটা আর্তনাদ তার গলার মাঝপথে এসে থেমে গেল। বিস্ফারিত ওষ্ঠের মাঝে সেই আর্তধ্বনি চাপবার আশায় একটা হাত এসে থমকে গেল। ভীত, বিহ্বল সেই ভঙ্গির দিকে তাকিয়ে প্রণব হাসল। ডাক্তার গুপ্তও প্রণবের মুখের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লেন। .সুদক্ষিণা বুঝি এতটা ভাবেনি। এই কি বাণীব্রত? এ তো একটা আতঙ্কের মূর্তি। মাথার চুলগুলো রুক্ষ, বিশৃঙ্খল। মুখময় অযত্নবর্ধিত দাড়ির বাহুল্য। পরনে একটা পা জামা আর হাফ-শার্ট। শার্টের একটা হাত ছিঁড়ে কাপড়টা ঝুলে রয়েছে। বাণীব্রত আরও রোগা হয়ে পড়েছে। দেহের লালিত্য, সুষমা সবই অপহৃত; নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে তার মুখের স্নিগ্ধ সরল বিন্যাস, চোখের মধুর জ্যোতি, স্বপ্নালু দৃষ্টি, তার বদলে কেমন একটা ঘোলাটে আভায় জ্বলজ্বল করছে বাণীব্রতর চোখ, ঠোঁট দুটো হাওয়া-লাগা-পাতার মতো কেঁপে চলছে ক্ষণে-ক্ষণে। সে মূর্তির দিকে তাকিয়ে থাকা যায় না। সুদক্ষিণা মুখ ফিরিয়ে নিল। তার বুকের মধ্যে একরাশ শোকের ঢেউ উত্তাল হয়ে মাথা খুঁড়তে লাগল। গলার কাছে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠল ব্যথার গোমুখী ধারা। ডাঃ গুপ্ত আর প্রণব না থাকলে সুদক্ষিণা তার শোকের উলঙ্গ প্রকাশকে বাধা দিতে পারত না —হয়তো চাইতও না। কিন্তু স্থান-কাল ভেদে অতিকষ্টে সুদক্ষিণা নিজেকে সামলাবার আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল। অবদমিত হল তার ক্ষোভের নগ্ন, নিষ্ঠুর প্রকাশ। সুদক্ষিণা নতমুখে রুদ্ধ-ওষ্ঠ হয়ে বসে থাকল।

প্রণব ধীরে-ধীরে এগিয়ে এসে বাণীব্রতর সামনে দাঁড়াল। মৃদু হেসে কোমল কণ্ঠে প্রশ্ন করলে, 'কেমন আছেন—মনোজবাবু?'

বাণীব্রত প্রণবের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে খুব আস্তে-আস্তে বললে, 'ভালো।' তারপর হঠাৎ মিসেস নাগের দিকে তাকিয়ে দু'পা সরে গেল বাণীব্রত।

প্রণব মিসেস নাগের দিকে তাকিয়ে বললে, 'আপনি যান, পরে ডাকব।'

প্রণব বাণীব্রতর শার্টের ছেঁড়া অংশটায় হাত দিয়ে বললে, 'নতুন জামাটা ছিঁড়লেন কী করে?'

বাণীব্রত ঘরের চার পাশ তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখছিল। এই ঘরে অনেকবার সে এসেছে। আর প্রতিবারই এমনই ভাবে চারিদিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখে। ডাঃ গুপ্ত চেয়ার ছেড়ে ধীরে-ধীরে উঠে এসে বাণীব্রতর সামনে দাঁড়ালেন। হাত রাখলেন বাণীব্রতর গায়ে। বাণীব্রত তাঁর দিকে তাকাল। ডাঃ গুপ্ত তার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন শুধু। একটু পরে হেসে বললেন, 'বসুন।'

বাণীব্রত নিরুত্তরে চেয়ারের ওপর বসে পড়ল।

ডাক্তার গুপ্ত সহজ ভাবে প্রশ্ন করলেন, 'সিগারেট!'

বাণীব্রত মাথা নাড়লে।

প্রণব এগিয়ে এসে বাণীব্রতকে সিগারেট দিল, পকেট থেকে লাইটার বের করে জ্বালাল, এগিয়ে ধরল ওর মুখের সামনে। বাণীব্রতর সিগারেট হাতেই আটকে থাকল। লাইটারের জ্বলন্ত অগ্নিশিখার দিকে তাকিয়ে বসে থাকল বাণীব্রত। তার দৃষ্টি লাইটারের অগ্নিশিখাকে কেন্দ্র করে ক্রমশ তীক্ষ্ণতর হতে লাগল। ডাক্তার গুপ্ত আর প্রণব দুজনেই লক্ষ করল বাণীব্রতের সেই ক্রমবর্ধিত উত্তেজনা। তাড়াতাড়ি লাইটার নিভিয়ে প্রণব হাত সরিয়ে নিল।

একটু পরে বাণীব্রতর সদ্যোত্থিত উত্তেজনা শান্ত হয়ে এল। ডাক্তার গুপ্ত তার সিগারেট জ্বালিয়ে দিলেন নিজের জ্বলন্ত সিগারেটের অংশটুকু দিয়ে। সহজ সুরে কথা শুরু করলেন।

'আপনার জন্যে আমরা একটা কেবিনের ব্যবস্থা করেছি। বাগানের দিকে যে কেবিনগুলো আছে তারই একটায়। আজ বিকেল থেকে আপনি সেখানে থাকবেন। Is it not good?'

বাণীব্রত নীরবে মাথা নাড়লে।

ডাক্তার গুপ্ত একটু পরে আবার বললেন, 'দাড়ি কামাননি কেন?'

'ভালো লাগে না—'

ডাক্তার গুপ্ত হাসলেন, 'সকলের ভালো লাগে, আপনার লাগবে না কেন?'

'লাগে না!' বাণীব্রত একটু জোরে আগের মতো ছোট করে উত্তর দিল।

ডাক্তার গুপ্ত একবার ভালো করে বাণীব্রতকে লক্ষ করে হঠাৎ বিষয়ান্তরে মনোযোগ দিলেন।

'একজন ভদ্রমহিলা আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন?' ডাঃ গুপ্ত বললেন।

বাণীব্রতর মধ্যে কোনও ভাবান্তর প্রকাশ পেল না। শুধু বললে, 'কে?'

'একটি মহিলা। আপনার বিশেষ পরিচিত।' ডাক্তার গুপ্ত প্রণবকে ইঙ্গিত করলেন। প্রণব সুদক্ষিণাকে কাছে ডাকল।

ধীর পায়ে সুদক্ষিণা বাণীব্রতর সামনে এসে দাঁড়াল। ডাঃ গুপ্ত লক্ষ করতে লাগলেন। বাণীব্রত মুখ তুলে তাকাল সুদক্ষিণার দিকে। কয়েক মুহূর্ত নীরবে শুধু তাকিয়েই থাকল। দৃষ্টিতে তার ধরা পড়ল না এতটুকু আনন্দ অথবা বিষাদ। অর্থহীন, ভাষাহীন, ধূসর সে দৃষ্টির পানে তাকিয়ে সুদক্ষিণার মুখটা আরও বিবর্ণ হয়ে উঠল।

ডাঃ গুপ্ত সুদক্ষিণাকে বললেন, 'তুমি কথা বলো তো দেখি।'

সুদক্ষিণা কথা বলবে কী করে! তার ঠোঁটের আগায় সমস্ত কথা কেউ যেন লাগাম দিয়ে আটকে রেখেছে। বিশ্রী একটা অস্বস্তি সুদক্ষিণার সর্বাঙ্গ সংকুচিত করে তুলেছে। বেদনাহত বিবর্ণ মুখখানি তার বাণীব্রতর দৃষ্টি অনুসরণ করে বোবা হয়ে থাকল।

বাণীব্রত কী যেন স্মরণ করবার চেষ্টা করল আপ্রাণ। তার ম্লান কপালে কতকগুলো কুঞ্চিত রেখা ফুটে উঠে আবার ধীরে-ধীরে মিলিয়ে গেল। মনে হল, বাণীব্রতর মধ্যে কীসের যেন একটা যন্ত্রণা জেগেছে।

প্রণবের তাগাদায় অবশেষে সুদক্ষিণা মুখ খুললে। অত্যন্ত ধীর সংযত, কোমল কণ্ঠে ডাকলে, 'বাণীবাবু!'

সুদক্ষিণার ডাকে বাণীব্রত ওর দিকে মুখ তুলে তাকাল। নির্মম নিষ্ঠুর অস্বীকারের ভাষা তার চোখে। অল্প একটু তাকিয়ে থেকে বাণীব্রত মুখ ফিরিয়ে নিল।

অবাক হওয়ার সময় পার হয়ে গেছে সুদক্ষিণার। সে জানে বাণী তাকে চিনতে পারবে না। কিন্তু তবু হাল ছাড়লে চলবে না তার। একটু-একটু করে অনেক কষ্ট, পরিশ্রম, ধৈর্য, অধ্যবসায়ের ফলে এই স্মৃতি-হৃত মানুষটিকে আবার সুস্থ করে তুলতে হবে। প্রণব তাকে সব কথাই বুঝিয়ে বলেছে আর এও সত্য সুদক্ষিণার অকুণ্ঠ সাহায্য ও সহানুভূতি না পেলে বাণীকে সুস্থ করে তোলা সম্ভব হবে না। নিজেকে সামলে নিয়ে সুদক্ষিণা আরও একটু কাছে সরে এল।

'আমায় চিনতে পারছেন না?'

বাণী বিকৃত একটা মুখভঙ্গি করে নতমুখ হল।

সুদক্ষিণা এবার তার সংযম হারালে। বাণীব্রতর পায়ের কাছে কার্পেটের ওপর বসে পড়ল আচমকা। বাণীর হাঁটুতে নাড়া দিল, ধরল তার হাত—তারপর ব্যাকুল কণ্ঠে ডাকল, 'বাণীবাবু—বাণীবাবু, আমায় চিনতে পারছেন না? আমি—আমি সুদক্ষিণা। সেই যে সেই দেওঘরে, বেড়াতে গিয়ে—'

মুহূর্তের মধ্যে বাণী সুদক্ষিণার হাত ছাড়িয়ে উঠে দাঁড়াল। সরাসরি সামনে এগিয়ে গিয়ে বুক-কেসের কাছে থামল। সেখান থেকে মুখ না ফিরিয়েই বললে, 'সুদক্ষিণা? না। আপনাকে আমি চিনি না।'

'দেওঘরের কথা কিছুই কি মনে নেই আপনার?' প্রণব বাণীব্রতর ঠিক পিছনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। বললে, 'সুদক্ষিণা, বিভূতিবাবু, আপনার সেই বউদি গায়ত্রীদেবী?'

'না—না—না। কিছু আমার মনে নেই। আমি জানি না—জানি না!' বাণী ঘুরে দাঁড়াল। মুখে তার উত্তেজনার চিহ্ন।

ডাক্তার গুপ্ত বললেন, 'কিন্তু মনে যে আপনাকে করতেই হবে। আপনার অতীতই আপনার জীবন—'

'জীবন—A life!' বাণীব্রতর গলায় তিক্ততা ফুটে উঠল।

সুদক্ষিণা কখন উঠে দাঁড়িয়েছে। চোখের জল নিয়েছে মুছে। ধীর পায়ে কক্ষ ত্যাগ করতে উদ্যত হয়েছে। এমনসময় প্রণব তার পাশে এগিয়ে কী যেন বললে মৃদুস্বরে। সমস্ত ব্যাপারটা তীক্ষ্ণ চোখে লক্ষ করলে বাণীব্রত। ওদের কথা শেষ হতে..সুদক্ষিণা আবার চলে যাওয়ার উদ্যোগ করছিল—।

বাণীব্রত তাকে ডাকল। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সুদক্ষিণা।

বাণীব্রত বললে—দু-পা এগিয়ে এসে, ক্ষুব্ধকণ্ঠে, 'দেখুন, বাস্তবিক আমি আপনাকে মনে করতে পারছি না। জানি না, কেন আপনি আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন? কী আপনাব উদ্দেশ্য?' বাণীব্রত একটু থেমে পরমুহূর্তে চাপা উত্তেজনায় অধীর হয়ে বলে উঠল, 'সর্বক্ষণ আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, কানাকানি। আমি কিন্তু বাণীবাবু নয়। মনোজ—আমাব নাম মনোজ, মনে রাখবেন।'

'মনে রাখব।' সুদক্ষিণার গলা থেকে অর্ধস্ফুটভাবে শব্দটা প্রত্যুচ্চারিত হল।

বাণীব্রতর উত্তেজনা ডাঃ গুপ্ত আর প্রণবকে কিছুটা বিস্মিত করে তুলল। তবু প্রণব নিজেকে সংযত করে সহজকণ্ঠে বাণীব্রতকে বললে, 'আমাদের সম্পর্কে এরকম ভুল ধারণা করবেন না, বাণীব্রতবাবু! আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে আমাদের লাভ কী? আমরা আপনার কল্যাণকামী, বন্ধু!'

'বন্ধু?' তীক্ষ্ণ বিদ্রূপে বাণীব্রতর মুখ বীভৎস হয়ে উঠল। কখন যেন বাণীব্রত পিছন হেঁটে বুককেসের কাছে ফিরে গেছে।

সুদক্ষিণা সম্ভবত বাণীব্রতর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল তাকে শান্ত করবার আশায়। কিন্তু তার এই এগিয়ে আসার চেষ্টায় বাণীব্রত আরও উত্তেজিত ও শঙ্কিত হল। ঘুরে দাঁড়াতেই বুককেসের গায় হাত ঠেকল তার। মুহূর্তে কেস থেকে একটার পর একটা বই টেনে নিয়ে ছুঁড়তে লাগল সুদক্ষিণাকে লক্ষ করে। তার ক্রুদ্ধ চিৎকার সেই ঘরের বাতাসকে খান-খান করতে লাগল, 'বেরিয়ে যান—বেরিয়ে যান বলছি। শয়তানি আমার সঙ্গে? মেরে ফেলব। খুন করে ফেলব। বন্ধু? ঘটা করে বন্ধুত্ব দেখাতে এসেছেন। Get out—get out!'

নিক্ষিপ্ত বইগুলো সুদক্ষিণার আশেপাশে পড়ল। একটা এসে ঠিকরে লাগল মুখে। ঠোঁট কেটে রক্ত পড়তে লাগল। সুদক্ষিণা মুখ নিচু করে হাত আড়াল দিলে।

ঘটনাটা অপ্রত্যাশিত, আকস্মিক। ডাঃ গুপ্ত আর প্রণব পরস্পরের দিকে তাকিয়ে একে অপরেব চোখের ভাষা পড়ে নিলেন। প্রণব তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে সুদক্ষিণাকে আড়াল করে দাঁড়াল। ডাঃ গুপ্ত কলিং বেল টিপলেন।

বইগুলো ছুঁড়ে বাণীব্রত দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছিল। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে স্পষ্ট অনুভব করা যায়—সর্বাঙ্গে তার কেমন যেন একটা ক্লান্তি ও বেদনা নেমে এসেছে।

মিসেস নাগ পরদা সরিয়ে ঘরে ঢুকল।

ডাঃ গুপ্ত ইঙ্গিতে সুদক্ষিণাকে দেখিয়ে বললেন, 'ওকে নিয়ে যাও।'

সুদক্ষিণাকে ডাকল মিসেস নাগ, 'আসুন।'

সুদক্ষিণা ঠোঁটে রুমাল চেপে প্রথমে তাকাল বাণীব্রতর দিকে—তারপর প্রণবের।

প্রণব মৃদুস্বরে বললে, 'অত্যন্ত দুঃখিত, সুদক্ষিণা দেবী।'

সুদক্ষিণা একটা প্রশ্ন করবার চেষ্টা করল, 'ওঁর কোনও—।'

সুদক্ষিণার কথা শেষ না হতেই বলল প্রণব, 'ভয় নেই। আচ্ছা, আসুন!'

মিসেস নাগ সুদক্ষিণাকে নিয়ে চলে গেল। বাণীব্রত ওদের যাওয়ার পথে দৃষ্টি মেলে ম্লানভাবে হাসল। বিড়-বিড় করে কী যেন বললে আপন মনে। কেউ শুনতে পেল না।

রাত বেশি হয়নি। সাধারণত অন্যান্য দিন এ-সময় প্রণব বেড়াতে বেরোয়। অজস্র হাওয়া, জংলা মাঠ; তারা-জ্বলা আদিগন্ত আকাশ; দেবদারু, শাল, আমলকী গাছের বুনো গন্ধ তার সারাদিনের ক্লান্তি মুছে নেয়। মনের খেয়ালে অনেকটা ঘুরে বাড়ি ফেরে প্রণব। অন্যান্যদিনের মতো আজ আর সে বেড়াতে বেরোল না। হাসপাতাল থেকে ফিরে এসে অল্প খানিকক্ষণ জিরিয়ে নিল। তারপর নিজের ঘরে ঢুকে পড়ার টেবিলে ঝুঁকে বসল।

ঘড়ির কাঁটায় রাত বাড়তে থাকে।

সুদক্ষিণা বারদুয়েক ঘরে ঢুকে আবার নিঃশব্দে ফিরে গেল। প্রণবের অখণ্ড মনোযোগে বাধা দিতে তার ইচ্ছে হয়নি। মন না মানতে চাইলেও কঠিন হয়েছে সুদক্ষিণা। প্রণবের দিদির সঙ্গে পাঁচ কথায় দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করেছে।

ঘড়িতে ন'টা বেজে যাওয়ার পর সুদক্ষিণা তৃতীয়বারের মতো প্রণবের ঘরে এসে ঢুকল। টেবিলের সামনে সেই একই ভঙ্গিতে প্রণব বসে। হাতে তখন তার খোলা ফাউন্টেন পেন। লেখার মাঝে বুঝি অল্পক্ষণের জন্যে থেমেছে। ভাবছে কিছু গভীরভাবে।

সুদক্ষিণা ভাবছিল, ডাকবে কী ডাকবে না।

এমনসময় কুন্তলাদি এলেন। হাতে তাঁর ওভালটিনের পেয়ালা।

সুদক্ষিণার দিকে তাকিয়ে কুন্তলাদি একটু হাসলেন।

'তুমি বুঝি এসে দাঁড়িয়েই রয়েছ!' কুন্তলাদি প্রণবের সামনে এসে টেবিলের ওপর পেয়ালা নামিয়ে রাখলেন।

চোখ তুলে তাকাল প্রণব। দিদিকে দেখেই তার মনটা খুশিতে টলমল করে উঠল।

'এই যে, দিদি! তোমাকে ডাকব ভাবছিলাম। উঃ, মাথাটা একেবারে ছিঁড়ে যাচ্ছে। একটু চা খাওয়াবে?'

কুন্তলাদি হাসলেন। মধুর সেই হাসি। প্রণবের হাত থেকে কলম নিয়ে এককোণে সরিয়ে রাখলেন।

'আমি সে আগেই বুঝেছি! মাথাধরার ছুতো করলেও এখন আর চা খায় না। ওভালটিন করে এনেছি।'

· প্রণবের চোখ পড়ল পেয়ালার ওপর। তিলমাত্র বিলম্ব না করে প্রণব ওভালটিনের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে গভীর তৃপ্তির একটা ছোট টানা শব্দ উচ্চারণ করলে।

'বাস্তবিক, আমি মাঝে-মাঝে ভাবি দিদি, তুমি না থাকলে আমার চলবে কী করে?'

'বিয়ে করো, বউ এসে চালাবে!' কুন্তলাদি হেসে উত্তর দেন।

'বউ কি চালায় দিদি, বউকেই চালাতে হয়! তা ছাড়া সে এক মহাহুজ্জোতি ব্যাপার! ওসবে দরকার কী? তার চেয়ে এই বেশ আছি!'

প্রণবের গলার স্বরে পরিপূর্ণ শান্তি ফুটে উঠল।

'আমাকে কি চিরটাকাল তুই আটকে রাখতে চাস? কোন ছেলেবেলা থেকে মানুষ করলাম। এখন তুই যথেষ্ট বড় হয়েছিস—আমারও তো বয়স কম হল না। এবার একটু পরজন্মের কাজকর্ম

করতে দে।' কুন্তলাদি প্রণবের চুলে আস্তে-আস্তে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন।

'পরজন্ম?' প্রণব উৎকট একটা ভঙ্গি করলে, 'তা ওটা এজন্মে করলে হিসেবপত্রের গোলমাল হবে। তার চেয়ে পরজন্মেই করো।'

কথার শেষে প্রণব এমনভাবে হেসে উঠল যে কুন্তলাদিও না হেসে পারলেন না। সুদক্ষিণাও হেসে উঠল।

ভাই-বোনের ছোট্ট সংসার। ওদের পরস্পরের প্রতি গভীর প্রীতি, স্নেহ ও মায়া এ বাড়ির সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। সুদক্ষিণা যত দেখছে—মনটা ততই যেন স্নিগ্ধ-শান্তিতে ভরে উঠছে।

সুদক্ষিণার অবস্থিতি প্রণব জানত না। কুন্তলাদিও ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলতে-বলতে কখন যেন ভুলে গিয়েছিলেন তার কথা। হঠাৎ সুদক্ষিণার হাসির শব্দে খেয়াল হল কুন্তলাদির।

প্রণবও মুখ ফিরিয়ে তাকাল।

চোখের ইঙ্গিতে সুদক্ষিণাকে দেখিয়ে কুন্তলাদি প্রণবকে বললেন, 'ওকে আর কতক্ষণ বসিয়ে রাখবি? কবারই তো এ ঘরে এসে ঘুরে গেল।'

'তাই তো বড় অন্যায় হয়ে গেছে! আপনি আমায় ডাকলেই পারতেন।' প্রণব চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

'না—অন্যায় আর কী? আপনি কাজ করছিলেন—' সুদক্ষিণা মৃদু হেসে বললে।

'ক'টা বেজেছে?'

'সাড়ে ন'টা!' কুন্তলাদি উত্তর দিলেন।

'তা হলে খাওয়া-দাওয়া সেরেই আপনার সঙ্গে কথা বলব।'

'সেই ভালো।' কুন্তলাদি বললেন, 'তোরা আয়। আমি খাবার দিতে যাই!'

'কুন্তলাদি চলে যেতে সুদক্ষিণা বললে, 'একটা কথা বলব?'

'নিশ্চয়। অসংকোচে বলুন!'

'আপনার এখানে যেরকম যত্ন ও স্নেহের মধ্যে আছি তেমনটা আমার ভাগ্যে খুব কমই জুটেছে, প্রণববাবু। কিন্তু মাঝে-মাঝে যেন কেমন লাগে! আমায় আর কতদিন আটকে রাখবেন?'

'কেমন-কেমন লাগবার কারণ?' প্রণব সুদক্ষিণার কাছে এসে দাঁড়াল।

চট করে সে কথার কোনও উত্তর দিল না সুদক্ষিণা। একটু পরে বললে, 'আমি ভেবেছিলাম কারণটা আপনি বুঝতে পারবেন। বাণীবাবু আমার আত্মীয় নন। অথচ তাঁর জন্যে এভাবে এখানে এসে বসে থাকা যেন কেমন বিসদৃশ। কুন্তলাদি কী ভাবেন কে জানে? ওদিকে স্কুলের সেক্রেটারি ভদ্রলোক লোক সুবিধের নন। এভাবে চলে আসায় তিনি যে কী সব যুতসই গল্প গড়ে প্রচার করছেন তাও বুঝছি না।'

সুদক্ষিণার কথায় প্রণব যেন অনেকটা ম্লান হয়ে গেল। খানিকটা ভেবে নিয়ে জবাব দিলে, 'দিদির তরফ থেকে আপনি নিশ্চিন্ত হতে পারেন। তবে হ্যাঁ, আপনার স্কুলের ব্যাপার! আপনার মতন আমিও যে দোটানায় পড়েছি। আপনাকে রাখা মুশকিল অথচ না রাখলেও চলে না। দেখি, কী করতে পারি। আরও দিন কয়েক অন্তত থাকুন। তারপর ভেবে-চিন্তে, যা হোক একটা কিছু করা যাবে।'

এমনসময় দিদির ডাক শুনতে পাওয়া গেল।

খাওয়া-দাওয়া সেরে ঘরে এসে বসল ওরা। ঠান্ডা হাওয়া আসছিল খোলা জানলা দিয়ে। চোখে পড়ে তারা-জ্বলা একটুকরো ধবল আকাশ। কাচের শার্সিটা ভেজিয়ে দিয়ে প্রণব চেয়ারে বসল। সিগারেট ধরিয়ে টেবিল থেকে খাতাখানা তুলে নিল। সুদক্ষিণা দেখল, এই সেই খাতা এতক্ষণ প্রণব

যার ওপর ঝুঁকে একমনে কী যেন লিখছিল। প্রণব খাতার পাতা উলটে সুদক্ষিণার দিকে তাকিয়ে বললে, 'এটা আমার ব্যক্তিগত পুঁথি। বাণীবাবু প্রথম যেদিন আমার হাতে এসে পড়লেন সেই দিনটি থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত তাঁর সম্পর্কে আমার মনোভাব, মতামত, নানা তথ্য, অনুসন্ধান ও সিদ্ধান্তের ধারাবাহিক ইতিহাস লিখে চলেছি। এর আগে আপনাকে আমার এই পুঁথিটি পড়ে শোনাইনি। তার অনেক কারণ ছিল। আজ সকালে পুলিশ অফিস থেকে রিপোর্ট পাওয়ার পর আমার আগের ধারণা অনেকটা বদ্ধমূল হয়েছে। এই পুঁথি থেকে কিছু-কিছু অংশ আপনাকে পড়ে শোনালেই সব বুঝতে পারবেন। আগাগোড়া পড়ার কোনও প্রয়োজন নেই। তাছাড়া সেসব নীরস ডাক্তারি ব্যাপার আপনার পক্ষে বোঝা মুশকিল হয়ে পড়বে।'

সুদক্ষিণা শাড়ির আঁচল গায়ে ভালো করে জড়িয়ে নিল। নিরুত্তরে বসে থাকল প্রণবের মুখের দিকে তাকিয়ে। কোন রহস্যের ইঙ্গিত প্রণবের কথায়, কীসের সিদ্ধান্ত তার চিন্তার উপজীব্য—কিছুই বুঝতে পারলে না সে। প্রণব খাতার পাতা উলটে পড়া শুরু করল ঃ

২১শে ডিসেম্বর

অদ্ভুত একটা কেস আজ আমার হাতে এসেছে। সকালে হাসপাতালের কাজ সেবে গিয়েছিলাম স্টেশনে। আমাব পরিচিত এক ভদ্রলোকের আসার কথা ছিল। ভদ্রলোক কাছাকাছি একটি কোলিয়ারির ডাক্তার। তাঁর নাম শ্যামল ঘোষ। শ্যামলবাবুর সঙ্গে আমাব বহুকালের আলাপ না হলেও আমাদের উভয়ের মধ্যে কর্মসূত্রে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে।...শ্যামলবাবু মাঝে-মাঝে আমার কাছে বেড়াতে আসেন। আমি ভেবেছিলাম তিনি বেড়াতেই আসছেন। জানতুম না, এবার তিনি এক খোরাক জুগিয়ে আনছেন আমার জন্যে।

...শ্যামলবাবুর সঙ্গে আর একটি লোককে নামতে দেখলুম ট্রেন থেকে। ইতিপূর্বে লোকটিকে আমি কখনও দেখিনি। প্রথম দর্শনেই আমাব মনে হল, লোকটি ঠিক প্রকৃতিস্থ নয়। তার আকৃতি, প্রকৃতি ও বেশভূষায় এ-বহস্য ধরা পড়ছিল।

..শ্যামলবাবু পরিচয় করিয়ে দিলেন। মনোজ রায় ওর নাম।

...মনোজবাবুকে নিয়ে বাসায় এলাম। ডাঃ ঘোষ বা শ্যামলবাবু ইতিমধ্যে আমায় গোপনে বললেন—মনোজবাবুকে ভালো করে লক্ষ করতে।

দুপুরে শ্যামলবাবু আমায় আড়ালে ডেকে তাঁর বক্তব্য বুঝিযে বললেন। তাঁব মুখে যা শুনলাম তা এইরকম—।

...শ্যামলবাবুর কাছে একদিন হঠাৎ একটি লোক এসে হাজির হয়। নাম বলে মনোজ। লোকটি একটা চাকরি খুঁজছিল। শ্যামলবাবু তার সঙ্গে কথাবার্তা বলে বোঝেন সে শিক্ষিত। মনোজ বলে, তার আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই। এর বেশি সে কিছু বলেনি। বলতেও পারেনি।

মনোজের কথাবার্তায় কেমন যেন কৌতূহলী ও আকৃষ্ট হলেন শ্যামলবাবু। বিপদগ্রস্ত এই লোকটিকে নিরাশ করে ফিরিয়ে দিতে মন তাঁর চাইল না। তিনি মনোজকে তাঁর ডিসপেনসারিতে ক্লার্কের কাজ জুটিয়ে দিলেন। আর নিজের বাড়িতেই থাকা ও খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করলেন।

...কিছুদিন কেটে গেল, শ্যামলবাবু লক্ষ্য করলেন—মনোজ মনোবিকার রোগে ভুগছে। তার কথাবার্তা, আচার-ব্যবহার, সবের উৎকট একটা অসামঞ্জস্য থেকে-থেকে দেখা দেয়। আবার শান্ত হয়ে আসে। মাঝে-মাঝে একদিন-দুদিন এমন কী তিন-চারদিন পর্যন্ত মনোজকে বেশ সুস্থ থাকতে দেখা গেছে। আবার কখনও-কখনও তার অস্থিরতা প্রকাশ হয়ে পড়েছে অত্যন্ত প্রকটভাবে। শ্যামলবাবু বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে মনোজের এই ভাবান্তর

লক্ষ করতেন। এবং স্থির করেছিলেন তাকে আমাদের হাসপাতালে পাঠিয়ে দেবেন। তিনিও এই বিষয়ে যথেষ্ট উৎসাহী।

যাই হোক, সম্প্রতি একটা ঘটনার পর মনোজকে আমার হাতে তুলে দিয়ে তিনি নিশ্চিন্ত হতে চান। ঘটনাটা ঘটে একদিন বিকেলে। শ্যামলবাবুর ডিসপেনসারির কমপাউন্ডার একদিন গুরুতরভাবে আহত হয়ে এসে তাঁকে জানায়—মনোজ তাকে অফিসের মধ্যে আক্রমণ করে মেরে ফেলবার চেষ্টা করে। ঘটনাটা গুরুতর। অনুসন্ধান করে শ্যামলবাবু জানতে পারলেন—কমপাউন্ডারের সঙ্গে মনোজের যে ব্যাপার নিয়ে বচসা হয় এবং যার ফলে এই কেলেঙ্কারি, তার পিছনে আছে এক অদ্ভুত ঘটনা। কোলিয়ারির হাসপাতালের ক্লার্ক হিসেবে মনোজের নানা কাজের মধ্যে অন্যতম একটি কাজ ছিল মাসের শেষে ওষুধ-পত্রের স্টক মিলিয়ে হিসেব পাঠানো। সেই সঙ্গে নতুন যে-যে ওষুধ ইত্যাদি আনার দরকার—তার একটা লিস্ট তৈরি করে পাঠানো। এইরকম একটা লিস্ট পাঠাবার তারিখ হয়েছিল। এবং কদিন ধরে শ্যামলবাবু কমপাউন্ডারকে এর জন্য তাগাদা দিচ্ছিলেন। কমপাউন্ডার তাগাদা দিচ্ছিল মনোজকে। ঘটনার দিন কমপাউন্ডার মনোজের কাছ থেকে লিস্ট নিয়ে দেখে তার মধ্যে প্রতি লাইনে কাটাকাটি। লিস্টটা নিয়ে মনোজকে দেখিয়ে চেঁচামেচি করতেই মনোজ হাতের কাছে টেবিলের ওপর যে রুল পড়েছিল তাই নিয়ে কমপাউন্ডারকে আক্রমণ করে। কমপাউন্ডার আহত হয়। লিস্টটা শ্যামলবাবুর হাতে আসে। তিনি লিস্টটা দেখে অবাক হয়ে যান। প্রতিলাইনে কাটাকাটি করে সে এমন এক নোংরা 'রিটার্ন-লিস্ট' তৈরি হয়েছে যে, যে-কোনও লোকই তা দেখলে চটে যাবে। তার হাতের লেখা স্পষ্ট ও সুন্দর। কোথাও বানান ভুলও নেই। তবু কেন এমন হল? একটু লক্ষ করতেই শ্যামলবাবুর চোখে একটা আশ্চর্য জিনিস ধরা পড়ল। মনোজ কিছুতেই একেবারে অর্থাৎ প্রথম চেষ্টায় ইংরিজি অক্ষর '1' (এক) লিখতে পারে না। যতবার সে '1' লিখতে গেছে প্রতিবারই প্রথমে সে 'A' অক্ষরটি লিখেছে। এবং পরে 'A' অক্ষর কেটে তারপর '1' লিখেছে। আগাগোড়া সমস্ত লিস্টেই এই কাণ্ড। এছাড়া অন্য কোনও ভুল নেই কোথাও। এই অদ্ভুত ঘটনা শ্যামলবাবুকে ভীষণ কৌতূহলী করে তোলে। পরের দিনই তিনি এক সুযোগে মনোজকে পরীক্ষা করে দেখলেন—তাঁর সন্দেহই ঠিক। অফিসের পুরোনো কাগজপত্র পরীক্ষা করে শ্যামলবাবুর সন্দেহ আরও দৃঢ় হল।

...মনোজের মনোবিকার সম্বন্ধে নিঃসন্দিহান হয়ে শ্যামলবাবু স্থির করেন তাকে আমাদের হাতে তুলে দেওয়াই এখন একমাত্র কর্তব্য। এই উদ্দেশ্য নিয়ে আজ শ্যামলবাবু এসেছিলেন আমার কাছে। আমি সাগ্রহে মনোজকে হাসপাতালে ভরতি করে নিতে রাজি হয়েছি।

২২শে ডিসেম্বর

...শ্যামলবাবু কাল রাত্রেই ফিরে গেছেন। মনোজকে আমি হাসপাতালে ভরতি করেছি। ডাক্তার গুপ্তকে সমস্ত কথা বললাম। তিনিও মনোজ সম্পর্কে উৎসাহিত হয়েছেন।

২৪শে ডিসেম্বর

...আজ আমরা—ডাক্তার গুপ্ত ও আমি মনোজকে প্রায় দু-ঘণ্টা যাবৎ নানাভাবে পরীক্ষা করেছি। ডাক্তার গুপ্ত বলেন—এটা Melancholia-র কেস। মনোজের স্মৃতিভ্রংশে সম্বন্ধে নিঃসন্দিহান হলেও আমার ব্যক্তিগত অভিমত It's a combine case! Emotional blocking বা স্মৃতিভ্রংশের সঙ্গে জড়িয়ে আছে Manic Depressive Psychoses.

২৯শে ডিসেম্বর

...শ্যামলবাবু চিঠি লিখেছেন। মনোজের ফেলে আসা জিনিসপত্রের মধ্যে একটা ময়লা কোট, খান দুয়েক ইংরিজি মাসিক পত্রিকা, একটা বহু-ব্যবহৃত ট্রাউজার—এ ছাড়া, আর কিছুই নেই। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তার মধ্যে থেকে এমন কিছু পাওয়া যায়নি—যাতে মনোজের পূর্ব-পরিচয় জানতে সাহায্য হতে পারে। মনোজের চিকিৎসার কোনও ত্রুটি হচ্ছে না। দুঃখের বিষয় এখনও পর্যন্ত রোগীর কোনও উন্নতি দেখা যায়নি।

১লা জানুয়ারি

...আজ আর একটা ঘটনা ঘটল। হাসপাতালের নাপিত মনোজের দাড়ি কামিয়ে দিতে গিয়েছিল—মনোজ তার হাত থেকে 'রেজার' কেড়ে নিয়ে তাড়া করে। ঘটনাস্থলে আমি হঠাৎ এসে পড়ি। অনেক কষ্টে মনোজের এই অদ্ভুত উত্তেজনা নিবৃত্ত করেছি। এই প্রসঙ্গে বলে রাখি—মনোজ কিছুতেই দাড়ি কামাতে চায় না। এ বিষয় যথেষ্ট মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ করে আমার ধারণা হয়েছে মনোজের অবচেতন মনে একটা উৎকট ভয় বিরাজ করছে। সেই ভয়ের হাত থেকে আত্মগোপন করতে মনোজ সর্বদাই উৎসুক। এক্ষেত্রে দাড়ি না-কামানোর মধ্যে এই আত্মগোপনের ইচ্ছেই বর্তমান। অবশ্য এটি একটি হাস্যকর ধারণা!

স্বতন্ত্র এবং স্বাধীনভাবে মনোজের কেসটি দেখাশোনা করার ভার ডাঃ গুপ্ত আমায় দিয়েছেন। এটা আমার সৌভাগ্য। আমার চিকিৎসক জীবনে এ ধরনের জটিল মনোবিকারগ্রস্ত অন্য কোনও রুগির সাক্ষাৎ পাইনি।

২রা জানুয়ারি

...আজ মনোজকে সোডিয়াম অ্যামিটল ইনজেকশান দেওয়া হয়েছে।

৭ই জানুয়ারি

...রোগীর সাধারণ স্বাস্থ্যের কিছু উন্নতি দেখা যাচ্ছে। বুঝিয়ে-সুঝিয়ে মনোজের দাড়ি কামিয়ে দিতে পেরেছি। He looks pretty well!

৮ই জানুয়ারি

...মনোজকে আজ খুব শান্ত মনে হচ্ছে। বিকেলে বহুক্ষণ যাবৎ সে ঘুমিয়েছে। No improvement.

১০ই জানুয়ারি

শ্যামলবাবু চিঠি দিয়েছেন। মনোজ যে-ঘরে থাকত—সেই ঘরের দেওয়াল-আলমারির মধ্যে একটা কাগজে মোড়া তালগোল পাকানো একটা ছেঁড়া শার্ট পাওয়া গেছে। আর সেই শার্টের পকেটে একটুকরো কাগজ। শ্যামলবাবু কাগজটা পাঠিয়েছেন—তবে এই চিরকুটটির ওপর কোনও গুরুত্ব আরোপ করতে তাঁর বাধে।

আমি কাগজের টুকরোটুকু ভালো করে দেখলাম। একটি গানের স্বরলিপি, রুলটানা কাগজে হাতে লেখা। কোনও কারণে কাগজটির অর্ধেকেরও বেশি ছিঁড়ে গেছে। নীচের দিকের খানিকটা মাত্র অংশ এখনও অক্ষত। তাতে গানের শেষ দুই কলি স্বরলিপি সমেত লেখা; এবং স্বরলিপির শেষে, নীচে—বাঁদিকে জনৈক ভদ্রমহিলার নাম ও ঠিকানা। সুদক্ষিণা

চট্টোপাধ্যায়, মনোহরপুর গার্লস স্কুল—মনোহরপুর।...কে এই সুদক্ষিণা চট্টোপাধ্যায়? গানের স্বরলিপি, সুদক্ষিণা ও মনোজের শার্টের পকেটে এই চিরকুটটুকু থাকা—এই তিনের মধ্যে কোনও সম্পর্ক আছে কি? কে জানে? চিরকুটটা সযত্নে রেখে দিয়েছি।

১১ই জানুয়ারি

...মনোজকে পরীক্ষা করলাম যদি সুদক্ষিণার নাম শুনে ও চিনতে পারে। কিছুই মনে করতে পারল না সে। তবে কাগজের টুকরো টুকু দেখার পর মনোজ যেন কী মনে করবার আপ্রাণ চেষ্টা করল—বুঝতে পারলাম।

১৬ই জানুয়ারি

...সত্যিই মনোজ গান শুনতে খুব ভালোবাসে। ক'দিন লক্ষ করে দেখলাম প্রায় প্রতিদিন বিকেলে সে নিরিবিলিতে বাগানের বেঞ্চি দখল করে বসে থাকে। হাসপাতালের রেডিও যতক্ষণ না বন্ধ হয় ততক্ষণ একমনে গান শোনে একলাটি বসে। এই সময়টা মনোজকে ভালো করে লক্ষ করলে স্পষ্টই বোঝা যায় তার অপ্রকৃতিস্থ মন সুরের স্পর্শে যেন অনেকটা প্রকৃতিস্থ, শান্ত ও স্নিগ্ধ হয়ে ওঠে। সর্বক্ষণ তাকে যে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করতে হয় গানের মাঝেই শুধু সে-যন্ত্রণার ক্ষণিক বিরাম।

১৯শে জানুয়ারি

...আজ আমি যখন মনোজের পাশে গিয়ে বসলাম তখন দিনের আলো ফুরিয়ে এসেছে। সূর্যাস্তের কাল। আকাশে ছড়িয়ে রয়েছে গোধূলির আলো। দূরে পাহাড়ের নীচে কারা যেন শুকনো পাতায় আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। টকটকে লাল হয়ে উঠেছে আকাশটা আগুনের আভায়। মনোজের পাশে গিয়ে আমি চুপচাপ বসলাম। বাগানের মধ্যেই আমাদের হাসপাতালের ছোট্ট ক্লাব ঘর। রুগিরা কেউ এখানে এসে বসে গান শোনে, কেউ বই দেখে, একটু আধটু তাস খেলে।..আজ 'ক্লাব-ঘর' একেবারে খালি পড়ে ছিল। বেশ একটু শীতের হাওয়া দিচ্ছিল আজ। মনোজকে বললাম, 'চলুন না, ভেতরে গিয়ে বসি।'...আমার মুখের দিকে ও শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল অনেকক্ষণ। তারপর হঠাৎ বললে, 'বরষার ঝরা চম্পা—যূথিকাও অশ্রুমতী চামেলি বকুল বনে বেদনার সরস্বতী...কী অপূর্ব কথা, না?'

আমি বললুম, 'হ্যাঁ, প্রতিটি শব্দ এর সুন্দর!' মনোজ খুশি হয়ে উঠল। আমার চোখের ওপর চোখ রেখে প্রশ্ন করলে, 'বলুন তো, এ গান কার লেখা?'...আমি বললুম, 'আমি ঠিক জানি না।'... আমার কথায় ভারি অবাক হল মনোজ। যেন আমার না-জানাটা মারাত্মক কোনও অপরাধ আর সেই অপরাধ ও আমায় স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে এমনভাবে বললে—'জানেন না? আশ্চর্য!'..যথেষ্ট লজ্জিত হয়ে বললুম, 'বাস্তবিক আমার জানা উচিত ছিল। আচ্ছা মনোজবাবু, আপনি বুঝি গান খুব ভালোবাসেন?'

মনোজ খুব শান্তকণ্ঠে ও শ্রদ্ধিতচিত্তে বললে, 'ভালোবাসি—শুধু ভালোবাসি বললে যেন অনেক কিছুই ফাঁক থেকে যায়।'...আমি মনে-মনে প্রস্তুত হয়ে নিচ্ছিলাম সুযোগের সদ্ব্যবহারের আশায়। অন্তরঙ্গ হয়ে উঠে মনোজের হাত ধরে টানলাম, 'চলুন একটু বেড়াই।'...মনোজ উঠে দাঁড়াল।...বাগানে বেড়াতে-বেড়াতে আবার আমি মনোজকে জিজ্ঞাসা করলাম—'আচ্ছা মনোজবাবু, গানটা যে কার লেখা আপনি জানলেন কী করে? আগে নিশ্চয় শুনেছেন?'...জের তখনও কাটেনি। ধীরে-ধীরে সে বললে, 'কী জানি—হয়তো শুনেছি—আমার মনে পড়ে না।' এবার আমি প্রশ্ন করলাম, 'তাহলে কী করে বুঝলেন যে

ওটা অমুকের গান?'...মনোজ ছেলেমানুষের মতন বললে, 'কেন রেডিওতে যে আগে থাকতেই বলে দেয়!'...তাইতো এ সহজ ব্যাপারটা আমিই বা ভুলে গিয়েছিলাম কী করে।

...আরও খানিকটা ঘুরে মনোজকে আবার আমি প্রশ্ন করলাম, 'আমি একটা গান শুনেছিলাম একবার; তার কথাগুলোও বেশ মিষ্টি কিন্তু কে লিখেছে জানি না!'...মনোজ আমার দিকে তাকাল। এই তো আমার সুযোগ, মনোজের পকেটে পাওয়া স্বরলিপির সেই দুটি কলি আমার মনে ছিল। বললাম, 'চৈতালি হাওয়া বেণুবনেরও আন্দোলিয়া শাখা, হাতের প্রদীপ নিভায়ে দিয়ে রাখিয়া যাবে গো একা। বেশ, মিষ্টি কথাগুলো, না?'...মনোজ আমার মুখের দিকে খানিকক্ষণ নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে থেকে অবশেষে বললে, 'আমিও যেন এ গান কোথায় শুনেছি।' মনোজের কথায় আমার বুক নেচে উঠল। বললুম—মনোজের হাত জড়িয়ে উৎসাহিত হয়ে, 'শুনেছেন? কবে শুনেছেন? কার কাছে শুনেছেন?'...মনোজ আমার উৎসাহিত মুখের দিকে তাকিয়ে শুধু মাথা নাড়লে।...'কিছু মনে নেই আপনার? একটুও মনে পড়ছে না?' আমি আবার বললুম।...মনোজ আগের মতোই মাথা নেড়ে বললে, 'না, আমার কিছুই মনে পড়ছে না।' একবার শেষ চেষ্টা হিসাবে আবার মনোজকে প্রশ্ন করলুম, 'এ গানের সঙ্গে সুদক্ষিণা নামের একটি মেয়ের নাম জড়িত আছে। চেনেন আপনি তাকে?' মনোজ চোখ তুলে তাকাল, 'কী নাম?' 'সুদক্ষিণা চট্টোপাধ্যায়।' মনোজ হাসল—মৃদু শান্ত হাসি। বললে, 'বড় সুন্দর নাম তো!'...হ্যাঁ, নামটা সুন্দরই, কিন্তু আপনি তাকে চেনেন?'...'না চিনি না। কিছুই আমার মনে নেই।'

মনোজেব কথায় হতাশ হইনি আমি।

সুদক্ষিণাকে মনোজ মনে করতে না পারলেও গানের কলি দুটি তার অস্পষ্ট মনে আছে। সম্প্রতি এই যথেষ্ট। আমার বিশ্বাস সুদক্ষিণা, স্বরলিপি আর মনোজ—এই তিনের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে।

শীঘ্রি আমি শ্রীমতী সুদক্ষিণা চট্টোপাধ্যায়ের খোঁজে যাব।

২১শে জানুয়ারি

...মনোজের অবস্থার সামান্য উন্নতি দেখা যাবে আশা করেছিলুম। কোনও উন্নতিই হয়নি। ডাঃ গুপ্ত বলছেন ওকে ইনসুলিন শক (shock) দেওয়াই ভালো। আমারও তাই ইচ্ছে। আগামী হপ্তা থেকে শক দেওয়া শুরু করব।

২৩শে জানুয়ারি

...আজ চিঠি পেয়েছি। মনোহরপুর গার্লস স্কুলে শ্রীমতী সুদক্ষিণা চট্টোপাধ্যায় বলে এক ভদ্রমহিলা সত্যি-সত্যি থাকেন। হাতে কতকগুলো জরুরি কাজ জমেছে, না হলে এ সপ্তাহে মনোহরপুর যেতাম।

৩০শে জানুয়ারি

সোডিয়াম অ্যামিটল ইনজেকশান ও ফ্রি অ্যাসোসিয়েসনের সাহায্য নিয়ে মনোজের অবচেতন মনের লুকানো রহস্য জানার সমস্ত প্রয়াস ব্যর্থ হতে চলেছে।

ইনজেকশানের পর অতি অল্প সময়ের মধ্যেই মনোজ তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। তারপর কত রকমের কত চেষ্টাই না করেছি; আশ্চর্য, একটা কথাও সে বলে না, বলতে পারে না; খানিক পরে ঘুমিয়ে পড়ে।

ডাঃ গুপ্ত বলছেন—রুগি দিনের পর দিন যে রকম মনমরা হয়ে পড়ছে তাতে

ওকে শক (shock) দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হয়। আমিও তাঁর সঙ্গে একমত। কেননা, প্রকৃতপক্ষে মনোজ যে অবস্থায় থাকে তাকে আমরা depressed condition বলতে পারি। কখনও কদাচিৎ একটু উত্তেজিত হয়ে পড়ে। তাও খুব কম সময়ের জন্যে। হাসপাতালে ভরতি হওয়ার পর মাত্র একবারই মনোজকে একটু বেশি উত্তেজিত হতে দেখেছি; আর সেটা—সেই প্রথম দাড়ি কামানোর বেলায়।

২৮শে জানুয়ারি

প্রায় দু-মাস হতে চলল মনোজ হাসপাতালে রয়েছে। আমরা তার শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলাম তার মধ্যে একটা ভুল থেকে গেছে। তার ডান হাতের ব্যথাটার কথা বলছি। ওর হাতের রিস্ট বা মণিবন্ধে মাঝে-মাঝে যে তীব্র ব্যথা হয় তা সোমাটিক (somatic) নয়, সোমাটোসাইকিক (somatopsychic)। আমি হাতের এক্স-রে নিয়ে দেখেছি—কোনও আঙ্গিক ত্রুটি নেই। ব্যথাটা যে সোমাটোসাইকিক বা মানস-প্রসূত আঙ্গিক ব্যথা তার প্রমাণ পাই আব একটি উপসর্গ থেকে। অল্প ক'দিন যাবৎ মনোজের এই উপসর্গটি দেখছি। একে আমাদের মনঃসমীক্ষণের ভাষায় বলে—'stereotyped action।'...নির্জন কোনও জায়গায় গিয়ে সে ডান হাতের কতকগুলো অদ্ভুত ভঙ্গি করে। ভালোভাবে নজর করে দেখলে মনে হবে—মনোজ যেন কিছু একটা হাতে করে ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। হাতটা সোজা বাড়ানো। কিছুক্ষণ এভাবে সামনের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকার পর তার forefinger বা তর্জনী সে ভেতর দিকে নাড়তে থাকে—তাবপর হঠাৎ একবার চমকে উঠে ধৃত বস্তুটি ফেলে দেয়। মাটিতে বসে একমনে কী যেন লক্ষ কবতে থাকে।. .খানিক পরে উঠে দাঁড়ায। সমস্ত মুখখানা তখন তার বিবর্ণ, শুষ্ক, শ্বাসপ্রশ্বাস দ্রুত। ভীত বিহ্বল দৃষ্টি মেলে এদিক-ওদিক তাকাতে-তাকাতে সে ফিরে আসে নিজের ঘরে। বিছানায় শুয়ে পড়ে, সর্বাঙ্গ তখন ঘামে ভেসে যাচ্ছে; অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো কঠিন, নাড়ি দ্রুত। ঠিক এ ঘটনার পর মনোজ কিছুটা সুস্থ হযে উঠে হাতের ব্যথার কথা বলে।

এই নতুন উপসর্গ বা লক্ষণটি মনোজের আগে ছিল না। সম্প্রতি দেখা দিয়েছে। আমার ধারণা এটা ইনজেকশান ও শকের পরোক্ষ ফল। তার মনের দ্বন্দ্ব মুখে প্রকাশ করতে না পারলেও সে সম্বন্ধে একটু বুঝি সচেতন হয়েছে মনোজ।

১লা ফেব্রুয়ারি

তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থার মধ্যে মনোজকে কথা বলানোর চেষ্টা আজ সর্বপ্রথম সার্থক হল। মনোজ মাত্র তিন চারটি কথা বলেছে। অসংলগ্ন সেই কথাগুলোর মধ্যে থেকে কোনও অর্থ উদ্ধার করতে আমি পারিনি। তার কথাগুলো এই রকম : পড়ে গেল—একলা—সুটকেস—কে।

২রা ফেব্রুয়ারি

আজ একটু বেশি পরিমাণ সোডিয়াম অ্যামিটল ইনজেকশান করেছিলাম। মনোজ মাত্র দুমিনিটের মধ্যে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ল।

প্রথমে সে কথা বলেনি; বলতে পারেনি। প্রায় চার মিনিট শুধু ঠোঁট নেড়েছে। আমি আপ্রাণ চেষ্টা করছিলুম, যদি সেই অল্প একটু ঠোঁট নাড়া থেকে অস্পষ্ট কোনও কথা ভেসে ওঠে। না, কোনও কথাই বুঝতে পারিনি।

একটু দেরি করে মনোজ কথা বলা শুরু করলে :

বড় যন্ত্রণা হয় মাথায়—কী হয়েছে আমার—সবসময় কারা যেন ধরতে আসে—আমি কিছু

করিনি—আমি চাইনি—তার আগেই (মনোজ ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে)—এ ষড়যন্ত্র—ঘোর ষড়যন্ত্র—ও আমার সমস্ত জীবনটা বিষিয়ে দিয়েছে। টাইমটেবল...।

৫ই ফেব্রুয়ারি

আজকের অ্যাসোসিয়েসান। মনোজ যা বলছে ঃ

'হ্যাঁ, ডাক্তার দাশগুপ্ত আমি স্বপ্ন দেখি—কাল—ঠিক কাল রাত্রেই স্বপ্ন দেখেছি—রোজ দেখি—মাথায় ভীষণ যন্ত্রণা হয়। ডাক্তার—(মনোজ হঠাৎ থেমে যায়। আবার বলে) ভুলে যাই—স্বপ্নটা আমার মনে থাকে না—মাথায় কী যে হল! মনে থাকবে কী করে—মনে আমার থাকে না—poor memory...মনে রেখেই বা লাভ কী, প্রণববাবু? যত মনে রাখব ততই দুঃখ—ততই কষ্ট—কষ্ট কি আমি কম পাই— কেউ সে কথা কি বুঝবে—সবাই আমায় দোষ দেবে— বিশ্বাস করবে না, কেউ সে কথা বিশ্বাস করবে না—ষড়যন্ত্র—আমার সর্বনাশ করতে চায়—সর্বনাশ করলে তো শেষ পর্যন্ত?..কী সাঙ্ঘাতিক—সাঙ্ঘাতিক—আ, কী সাঙ্ঘাতিক স্বপ্ন—এত ভয় করে—কুকুরটা যেমন বড় তেমনি তার ডাক—বাঘের মতো লাফিয়ে পড়ল—আমার বিছানা, নৌকো—কুকুর—কুকুর—গ্রে হাউন্ড, অ্যালসেসিয়ান (মনোজ চিৎকার করে উঠে বসতে যায়)।

মনোজ আর কথা বলতে পারে না—ভয়ে তার চোখ মুখ কেমন হয়ে যায়। সর্বাঙ্গে ঘাম ঝরে দরদর করে।

৭ই ফেব্রুয়ারি

মনোজ নিজে থেকেই আজ বলল কাল রাত্রে সে স্বপ্ন দেখেছে। এই ধরনের স্বপ্নই প্রায় সে দেখে। সুখের বিষয় স্বপ্নটা তার মনে আছে। মাঝে মাঝে যদিও ঠিক মনে পড়ছে না—তবু চেষ্টা করলে হয়তো সে পুরো স্বপ্নটাই ভাসা-ভাসা বলতে পাবে।

মনোজের কথা শুনে আমার মনে হল এতদিনে বুঝি একটা আলো দেখতে পেলুম। মাঝে-মাঝে তাকে সাহায্য করতে হচ্ছিল। মনোজের স্বপ্ন দীর্ঘ। এর চেয়েও দীর্ঘতর স্বপ্ন মানুষ দেখে। মনোজের কথায় তার স্বপ্ন লিখে রাখলাম।

স্বপ্নটা আমার মনে পড়েছে ডাক্তার দাশগুপ্ত—আমি স্বপ্ন দেখি—জলের ওপর একটা ভাসানো বিছানা, আমি সেই বিছানায় শুয়ে রয়েছি। আমার পাশে বসে কে যেন আমায় ঘুম পাড়াচ্ছে। কে যে তা আমি দেখতে পাচ্ছি না। তবে মনে হয় সে আমার খুব চেনা।—আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুম ভাঙল হঠাৎ! চোখ খুলে দেখি —একটা নৌকো আমার বিছানার পাশ দিয়ে ভেসে যাচ্ছে; তাতে অনেক লোক। তাদের কথাবার্তা কানে আসছিল। ওদের মধ্যে কে যেন বললে—এই হ্রদের জলে একটি মেয়ে ডুবে গেছে। তাদের কথা শুনে আমার কী জানি কেন ভীষণ ভয় হল। উঠে বসে চারপাশে তাকালাম। সব কেমন যেন অস্পষ্ট অন্ধকার। শুধু দেখতে পেলুম হ্রদের এপার থেকে ওপার পর্যন্ত একটা ব্রিজ—সেই ব্রিজের ওপর একটা কুকুর বসে বিশ্রীভাবে চিৎকার করে ডাকছে। কী বিকট তার ডাক—আর জ্বলন্ত দৃষ্টি। কুকুরটা আমাকে দেখতে পেয়ে লাফিয়ে পড়বার জন্য ছুটে এল। ভয়ে আমার সমস্ত শরীর কেমন হয়ে আসে। কুকুরটা আমার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ার জন্যে বিরাট লাফ দিল। তারপর কী যে হল কে জানে—জল, কুকুর, ব্রিজ সব তালগোল পাকিয়ে গেল।

খানিক পরে আবার স্বপ্ন দেখি—আমি মাঠের ওপর দিয়ে হেঁটে চলেছি। ঝড় উঠেছে। গাছগুলো মাটির সঙ্গে মিশে যেতে লাগল ঝড়ের দাপটে। মাঠের মধ্যে একটা

বাড়ি দেখে আমি সেখানে গিয়ে উঠলাম। একটি মেয়ে—হ্যাঁ একটি মেয়ে এসে আমায় দরজাটা খুলে দিল। আমার বেশ মনে পড়ে মেয়েটি আমায় দেখে হেসে বললে—এত দেরি হল? আমিও হাসলুম। খানিক পরে আমি সেই মেয়েটির সঙ্গে টেবিলে বসে খাচ্ছি, হঠাৎ দেখি কড়িকাঠ থেকে একটা দড়ির দোলনা ঝোলানো রয়েছে। কে একজন অন্ধকারে বসে দুলছে তাতে। দোলনাটা দুলতে-দুলতে আমাদের টেবিলের কাছে এসে পড়ছিল। এত ভয় করছিল আমার। আমি বারণ করলুম। দোলনার লোকটা হেসে উঠে যেন আরও বাড়াবাড়ি শুরু করলে। খাওয়া ছেড়ে উঠে চলে আসতে যাচ্ছি—হঠাৎ দোলনা থেকে লোকটা নেমে এসে আমার হাত চেপে ধরল। দোলনার দড়িটা জড়িয়ে দিল আমার গলায়! যেন বললে আমার গলায় দড়ি দিয়ে মরাই উচিত। তারপর লোকটা সেই মেয়েটিকে নিয়ে হাসতে-হাসতে চলে গেল। টেবিলের পাশে দাঁড় করানো পাথরের একটি ভাঙা 'ভেনাস মূর্তি' এতক্ষণ পরে আমার চোখে পড়ল। ভেনাস মূর্তিটা যেন প্রাণ পেয়ে খিল-খিল করে হেসে উঠল।

১০ই ফেব্রুয়ারি

গত কাল রাত্রে মনোজ যে স্বপ্ন দেখেছে ঃ

ট্রেনের কামরা থেকে নামলাম। একটা সুন্দর ছোট্ট স্টেশন---স্টেশনের পাশ দিয়ে একটা পথ—সেই পথ দিয়ে হেঁটে চলেছি---হ্যাঁ, আমি গান শুনতে পেলাম—কে যেন জানালা খুলে ডাকল আমায়---চেয়ে দেখি বিয়ের সাজ আর সিঁথিমৌর পরা একটি মেয়ে-- কত ফুল ফুটে রয়েছে জানলার ধারে। সেই ফুলের ওপর ভাসছে মেয়েটির মুখ। কী সুন্দর তার হাসি। আমায় সে ডাকল। এগিয়ে এলাম তার কাছে। খুব ভালো লাগছিল। আমি সেই মেয়েটির কাছাকাছি এসেছি হঠাৎ দেখলাম ফুলের গাছ মিলিয়ে একটা বীভৎস কুকুরের মুখ ভেসে উঠে ক্রুদ্ধ গর্জনে সমস্ত জায়গাটা ভরে তুলল। কুকুরটা আমায় দেখতে পেল। আমি ভয় পেয়ে পিছিয়ে এলাম। মেয়েটির কাছে যাওয়ার জন্যে অন্য পথে পা বাড়ালুম। খানিকটা গিয়ে দেখি সে পথও বন্ধ। একটা লোক খুব বড় একটা দড়ি নিয়ে ঘোরাচ্ছে। কাছে গিয়ে দেখি সেটা দড়ি নয়, ভীষণ বড় একটা সাপ। আমায় দেখে সে দড়িটা আমার দিকে ছুড়ে দেওয়ার চেষ্টা করতেই আমি তাকে বাধা দিতে গেলাম। তারপর কী হল কে জানে। ভীষণ গণ্ডগোল আর হইচই। কারা যেন 'পুলিশ-পুলিশ' বলে চিৎকার করতে লাগল। আমি পালাতে লাগলাম। মাঠ, নদী, বন, ট্রেন---।'

মনোজ চুপ করে যায়। একটু পরে বলে, 'এরপর আর কিছু নেই ডাক্তার। ঘুম আমার ভেঙে যায়। ভীষণ ভয় করতে থাকে। অসহ্য যন্ত্রণা মাথায়। জানলা খুলে চুপচাপ বসে থাকি।'

১৪ই ফেব্রুয়ারি

স্বপ্ন মনোজ রোজই দেখে। সব স্বপ্ন তার মনে থাকে না। একটু-আধটু যা থাকে তা মনে করে মনোজ বলে। সমস্ত স্বপ্নগুলোতেই এমন কিছু-না-কিছু থাকে যাতে সে ভয় পায়।

৭ই ফেব্রুয়ারি থেকে ১০ই ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মনোজ যে স্বপ্ন তিনটি দেখেছে এই তিনটি স্বপ্নই নাকি নানাভাবে সে দেখে। কখনও আংশিক, কখনও পুরোটা। আরও একটা কথা, সমস্ত স্বপ্নের মধ্যে তিনটি জিনিস তার সবচেয়ে স্পষ্টভাবে মনে আছে। দিনের আলোতেও সর্বক্ষণ পরিষ্কারভাবে সেগুলো মনে করতে পারে মনোজ। সেই তিনটি জিনিস,—কুকুর, ভাঙা ভেনাস মূর্তি আর সাপ।

আমাদের বিশ্বাস মনোজ যে স্বপ্ন তিনটির কথা বলে লক্ষ করলে সহজেই ধরা পড়বে এই স্বপ্ন যদিও তিনটি, তবু আসলে তারা একটিরই অংশ। সমস্ত স্বপ্নটাই পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত। মূল একটি স্বপ্ন তিনটি আংশিক স্বপ্ন জড়িয়ে রয়েছে।

স্বপ্ন তিনটির অর্থ এখনও আমরা উদ্ধার করতে পারিনি। তার প্রধান কারণ স্বপ্নটি অত্যন্ত জটিল, দ্বিতীয়ত কোনও সূত্র থেকেই মনোজের অতীত ইতিহাস জানার সুবিধে ঘটছে না। তবে একটা বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ হয়েছি। মনোজের মধ্যে একটা পাপবোধ রয়েছে। তার ভারে সে পীড়িত। কিন্তু আমাদের ধারণা মনোজের পাপবোধটা কাল্পনিক—প্রকৃতপক্ষে সে কোনও পাপ করেনি। Manic depressive psychoses—acute melancholia-র লক্ষণ, বইয়ে বলছে : The patients think themselves responsible for all the crimes...They themselves have commited some great sin and their souls are forever lost.

১৫ই ফেব্রুয়ারি

সুদক্ষিণা চট্টোপাধ্যায় অর্থাৎ স্বরলিপিতে যে-ভদ্রমহিলার নাম আছে তাঁর কাছ থেকে মনোজের সম্বন্ধে কিছু জানা যাবে আশা করি। অনেক আগেই তাঁর কাছে যাওয়া উচিত ছিল। সময়াভাবে পারিনি। আগামী সপ্তাহে মনোহরপুরে তাঁর কাছে যাব স্থির করেছি।

২৩শে ফেব্রুয়ারি

মনোহরপুর থেকে ফিরে এসেছি। সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি সুদক্ষিণা দেবীকে।

প্রণব তার ডায়েরি বন্ধ করে অকস্মাৎ থেমে গেল। তাকাল সুদক্ষিণার দিকে। সুদক্ষিণা সামনের চেয়ারে পুতুলের মতো বসেছিল; তন্ময় হয়ে শুনছিল প্রণবের পুঁথি পাঠ। সত্যিই তাই, তার কাছে এ এক নতুন জিনিস শোনা, নতুন জিনিস জানা। এত কী সে কোনওদিন ভাবতে পেরেছে? প্রণব যা পড়ে গেল অনেক কথাই তার বুঝল না সুদক্ষিণা। মন, মনস্তত্ত্ব, মনঃসমীক্ষা, অ্যাসোসিয়েশান, শক, স্বপ্ন—এ যেন মনের জাদুঘর আর কথার জাদুকরের কাছে নিজের সত্তা বিলিয়ে দিয়ে বসে থাকা।

প্রণব সুদক্ষিণার দিকে তাকিয়ে হেসে বললে, 'আপনাকে খুব অ্যাবজর্ভড মনে হচ্ছে, সুদক্ষিণাদেবী।'

সুদক্ষিণা প্রণবের একটানা কথার আকর্ষণ থেকে বিচ্যুত হল। একটু হাসল। বললে, 'অবাক হচ্ছি!'

'এবার তাহলে সবাক হন।' প্রণব জোরে হেসে উঠল।

'আমার সবাক হওয়ার আর কিছু তো নেই, প্রণববাবু।'

'বোধহয় আছে, ভালো করে ভেবে দেখবেন। তাড়াতাড়ির কোনও দরকার নেই।'

সুদক্ষিণা মনে-মনে কী ভাবলে কে জানে, হঠাৎ মৃদুস্বরে আলোচনার প্রসঙ্গ পরিবর্তন করলে। 'হ্যাঁ, আমি এলাম। তারপর?'

'তারপর যা, তা তো আপনি নিজেই জানেন। সে সব আর অযথা পড়ে কোনও লাভ নেই। রাত অনেক হল।'

সুদক্ষিণা তাকিয়ে দেখল বারোটা বাজতে চলেছে।

'আর কিছু আমি জানতে পারি না?'

'অবশ্যই পারবেন। আজ নয়; আগামী কাল। আজকের মতো এখানেই সভা ভঙ্গ হোক,

কী বলেন।'

সুদক্ষিণা বুঝল প্রণব ক্লান্ত। রাতও অনেক হয়েছে। তার নিজের শরীরটাও ভালো লাগছে না।

'আচ্ছা, যাই।' সুদক্ষিণা উঠে দাঁড়াল কী যেন ভাবতে-ভাবতে। হঠাৎ মাঝপথ থেকে ফিরে এসে কেমন যেন ভয়ে-ভয়ে সুদক্ষিণা বললে, 'একটা কথা আপনাকে জিগ্যেস করব, প্রণববাবু। সত্যি করে বলবেন?'

'বলুন।' প্রণব সিগারেট ধরিয়ে শরীরের ক্লান্তি কাটাবার উদ্যোগে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল।

'পাপ-বোধ কথাটা বললেন না আপনি? আচ্ছা, বাণীবাবু কি সত্যি—' সুদক্ষিণা তার কথা শেষ করতে পারলে না।

প্রণব গা এলিয়ে চেয়ারে শুয়ে পড়ল। হেসে বলল, 'হ্যাঁ, আমার যতদূর মনে হয় বাণীব্রতবাবু ডাক্তার চক্রবর্তীকে গুলি করে মারেননি।'

সুদক্ষিণা আর কোনও কথা বললে না। তার বুকের মধ্যে কেমন যেন করে উঠল। নিঃশব্দে সে সরে গেল প্রণবের সামনে থেকে।

পরের দিন। হাসপাতাল থেকে ফিরে এসে প্রণব দেখলে বারান্দায় বেতের চেয়ার টেনে সুদক্ষিণা চুপ করে বসে আছে। সন্ধের আবছা অন্ধকারে নিঃসঙ্গ সুদক্ষিণাকে বড় অসহায় বলে মনে হল তার। অনুকম্পায় ভরে উঠল মন।

প্রণব পাশে এসে দাঁড়াল।

'চুপ করে একলাটি বসে রয়েছেন যে।'

সুদক্ষিণা কী যেন ভাবছিল। প্রণবের উপস্থিতি সে অনুভব করতে পাবেনি। গলাব স্বরে চমকে উঠে চাইল প্রণবের দিকে।

'এইমাত্র ফিরলেন?'

'হ্যাঁ। কিন্তু আপনাকে যেন ভীষণ মনমরা দেখাচ্ছে।'

'কই। মাথাটা বড় ধরেছে।' ক্লান্ত ভাবে হাসল সুদক্ষিণা। প্রণব পকেট থেকে একটা খাম বের করে এগিয়ে দিল; বললে, 'আপনার একটা চিঠি এসেছে।'

হাত বাড়িয়ে চিঠি নিল সুদক্ষিণা।

প্রণব আবার বললে, 'হাসপাতালের পোশাকটা বদলে নি। তারপর চলুন একটু ঘুরে আসি। ফাঁকা হাওয়ায় মাথা ধরা ছেড়ে যাবে।'

'তাই ভালো।' সুদক্ষিণা হাতের চিঠিতে নজর রেখে উত্তর দিল।

প্রণব চলে গেল পোশাক বদলাতে। চেয়ার ছেড়ে উঠে সুদক্ষিণা মন্থর পায়ে ঘরে গিয়ে ঢুকল।

পথ হাঁটতে-হাঁটতে বললে সুদক্ষিণা—যেন অত্যন্ত আপনজনের কাছে উপদেশ চাইছে, 'অতসী চিঠি লিখেছে, কী করি বলুন তো?'

সুদক্ষিণার কথায় প্রণবের হাসি পায়, 'কী লিখেছে না জেনে, কী করা উচিত তা আমি কী করে বলব বলুন?'

'স্কুল থেকে আর ছুটি দিতে চাইছে না। আমি আর এক হপ্তা ছুটির জন্যে দরখাস্ত পাঠিয়েছিলাম। সেক্রেটারি তা মঞ্জুর করেননি, উপরন্তু হাজাররকম প্রশ্ন করেছেন অতসীকে।

ভদ্রলোকের এমন বিশ্রী স্বভাব—।'

প্রণব চট করে কোনও জবাব দিল না। কথাটা সে ইতিপূর্বেই গভীরভাবে ভেবেছে। এখনও ভাবছে। মনে-মনে ব্যবস্থাও যে একটা না ভেবে রেখেছে এমন নয়।

এক জায়গায় এসে ওরা দাঁড়াল। ঝরনার ক্ষীণ একটা ধারা এসে পড়েছে—উঁচু পাথরের ক'টা ঢিবি; সামনে কামরাঙা গাছ। চারপাশে আর কোনও ঝোপ-ঝাড় নেই। জায়গাটা প্রণবের মনের মতো। প্রায় রোজই সে বেড়াতে-বেড়াতে এখানে এসে বসে।

সুদক্ষিণাকে বসবার আহ্বান জানিয়ে প্রণব একটা পাথরের ওপর বসল। এর আগে সুদক্ষিণা কোনওদিন এখানে আসেনি। পার্বত্য অঞ্চলের এই জনমানবহীন, শান্ত উদার পারিপার্শ্বিকের মাঝে দাঁড়িয়ে মুগ্ধ হল সুদক্ষিণা।

'বেশ সুন্দর তো জায়গাটা!'

প্রণব নীরবে হাসল, 'আমার নিত্য দিনের সাথী। কিন্তু আপনি দাঁড়িয়ে থাকলেন কেন? বসুন।'

পাথরের ওপর বসে সুদক্ষিণা শুধল, 'আজ কোন তিথি?'

'এই রে, বিপদে ফেললেন, তিথি-টিথির খোঁজ রাখি না।'

আকাশের দিকে চেয়েছিল সুদক্ষিণা, হিসেব করছিল, 'বোধহয় নবমী, দশমী হবে। এতদিন মেঘলা হয়ে আকাশটা ডুবে ছিল। কী সুন্দর চাঁদ উঠেছে দেখেছেন?'

প্রণব অনেক চাঁদ দেখেছে এইখানে একলাটি বসে। আজ তার আর চাঁদ দেখাব অবসর নেই। অনেক কাজের কথা আছে সুদক্ষিণার সঙ্গে। ফিরে গিয়ে আবার কয়েকটা বই নাড়া চাড়া করতে হবে।

প্রণব প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে বলে উঠল, 'আপনি স্কুলের কথা বলছিলেন না!'

সুদক্ষিণা প্রণবের মুখের দিকে তাকাল, 'হ্যাঁ, অতসীর চিঠি—।'

'ভেবে দেখলুম', প্রণব সুদক্ষিণার কথায় বাধা দিয়ে বললে, 'আপনাকে আর আটকে রাখব না। কাল-পরশুই ফিরে যেতে পারেন। তবে—মাঝে-মাঝে আপনাকে আসতে হবে এখানে।'

'মাঝে-মাঝে?' করুণ শোনাল সুদক্ষিণার গলার স্বর।

'এই ধরুন মাসে একবার। পারবেন না?'

'পারব।' সুদক্ষিণা ছোট্ট করে উত্তর দিল, 'কিন্তু আমার আসা-না-আসায় কিছুই যায় আসে না, প্রণববাবু।'

সুদক্ষিণার কণ্ঠস্বরের প্রতিটি স্তর বেদনায় সিক্ত।

প্রণব বুঝতে পারল কী বলতে চায় সুদক্ষিণা, এত ব্যথা তার কেন?

সমবেদনা ও সহানুভূতিতে প্রণবের গলা বিষণ্ণ হয়ে উঠল। বললে সে, অভিমানের সময় তো এটা নয়, সুদক্ষিণা দেবী। কার ওপরেই বা অভিমান করবেন।'

সুদক্ষিণা সে-কথার কোনও জবাব দিল না। বেদনার্ত দুটি চোখ মেলে তাকিয়ে থাকল দূরে—পরেশনাথ পাহাড়ের অস্পষ্ট ছায়া আর চাঁদের আলোয় বন্য পৃথিবী যেখানে বেদনা-বিধুর হয়ে উঠেছে।

প্রণবও চুপ করে থাকল খানিকক্ষণ। একটু পরে বললে, 'ওরকম মনমরা, হতাশ হলে তো চলবে না। আপনার কাছ থেকে কত সাহায্য আশা করে বসে আছি; আর আপনি—।'

'সত্যি, আমি হতাশ হয়েছি,' সুদক্ষিণা প্রণবের কথায় বাধা দিলে, 'বাণীবাবু যে আবার ভালো হয়ে উঠবেন এ আশা করা আমার পক্ষে স্বপ্ন বলে মনে হয়। তা ছাড়া ভালো হয়েই বা কী লাভ বলতে পারেন। আবার তো একটা—' কথার মধ্যে গভীর আশঙ্কার আভাস জানিয়ে সুদক্ষিণা একটু থামলে। হতাশ হয়ে শেষ করলে তার বক্তব্য, 'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'পারবেনও না। আইনের ঘোর-প্যাঁচ, ডাক্তারির হাজাররকম ফ্যাকড়া আপনার বোঝার কথাও নয়। সোজাসুজি শুধু বুঝে রাখুন, বাণীবাবুর কোনও ক্ষতি আইনের হাতে যাতে না ঘটে তার চেষ্টা

আমরা করছি।'

'কিন্তু আপনি যদি প্রমাণ করতে না পারেন?' সুদক্ষিণা সন্দেহ জানালে।

'পারব বলেই আমার বিশ্বাস। আচ্ছা, আপনার কাছেই উপস্থিত আমার কতকগুলো সন্দেহের আভাস দি—আপনিই বলুন, বাণীবাবুকে খুনি বলে মনে হয় কি না?'

সুদক্ষিণা সচকিত হল।

প্রণব হাতের জ্বলন্ত সিগারেট ছুঁড়ে দিয়ে বললে, 'ডাক্তার চক্রবর্তীর বাঁ-দিকের বুকে গুলি লেগেছিল। সেই আঘাতেই তিনি মারা যান। পোস্টমর্টেম করার পর বুকের মধ্যে যে কার্টিজ পাওয়া গেছে, সেই কার্টিজ আর আপনার দাদা বিভূতিবাবুর রিভলভারে যে বাকি চারটে কার্টিজ ভরতি ছিল তাদের নম্বর এক নয়। সোজা কথায় আপনার দাদার রিভলভারের গুলিতে যে ডাঃ চক্রবর্তী মারা যাননি—এটা পোস্টমর্টেমেই জানা যাচ্ছে।'

সুদক্ষিণা অবাক বিস্ময়ে রুদ্ধবাক হয়ে প্রণবের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল।

'তা হলে—' সুদক্ষিণা বিস্ময়াভিভূত হয়ে সন্দেহ জানাল।

'তা হলে এইটাই প্রমাণিত হয় যে, অন্য কোনও রিভলভারের গুলিতে ডাঃ চক্রবর্তী মারা গেছেন।' প্রণব কথা শেষ করে আর একটা সিগারেট ধরাল, 'নীলা পুলিশের কাছে বলেছে, দুজনের মধ্যে যখন তীব্র বচসা হচ্ছে সে সময় গোলমাল শুনেই নীলা নেমে এসেছিল। তারপর ঘরের পরদা সরিয়ে সে দেখে বাণীব্রত আর ডাঃ চক্রবর্তী মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। ওদের কথাবার্তা নীলা স্পষ্টভাবে কিছুই বুঝতে পারছিল না। বাণীব্রত ডাঃ চক্রবর্তীকে শাসাচ্ছিল খুন করে ফেলব বলে। অবশ্য এরকম শাসানোর কোনও মানে হয় না। ডাঃ চক্রবর্তীও তাই ভয় পাননি। কিন্তু বচসার মধ্যেই বাণীব্রত ছুটে গিয়ে ডাঃ চক্রবর্তীর গলা টিপে ধরে। তখন দুজনার মধ্যে ধস্তাধস্তি শুরু হয়। নীলা বিমূঢ় হয়ে পড়ে। কী করবে ভাবছে এমনসময় বিকট শব্দ শুনতে পেল ও। ডাঃ চক্রবর্তী যন্ত্রণায় চিৎকার করে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। বাণীব্রত ঘর ছেড়ে পালিয়ে গেল। নীলা ঘরের জানালা দিয়ে দেখেছে বাণীব্রত মাঠের পথ ধরে পালাচ্ছিল। পূর্ণিমা রাত্রি বলে নীলা স্পষ্টই বাণীব্রতকে পালাতে দেখেছে।'

প্রণব থামল। সুদক্ষিণা অকপট-বিস্ময়ে প্রণবের মুখেব পানে আগের মতোই তাকিয়ে থাকল। অসমাপ্ত কাহিনি শোনার যে অস্বস্তি ও সম্পূর্ণ কাহিনি শোনার যে আগ্রহ সুদক্ষিণার মুখে চোখে সেই একই ধরনের অস্বস্তি ও আগ্রহ ফুটে উঠেছে। প্রণব হাতের সিগারেট ছুড়ে ফেলে দিয়ে বললে, 'আমি বড়ই অবাক হয়ে যাচ্ছি সুদক্ষিণা দেবী, এ কেমন করে হয়? ডাঃ চক্রবর্তী যে গুলিতে মারা গেলেন সেটা বাণীব্রতর মানে আপনার দাদার রিভলভারের নয়। অথচ বাণীব্রতর রিভলভারটা ডাঃ চক্রবর্তীর মৃতদেহের পাশেই পাওয়া গেল। তাও পুরো ভরতি নয়। দুটো গুলি খরচ করা হয়েছে। এ যেন একটা মিস্ট্রি। বাণীব্রত নিশ্চয় দুটো রিভলভার পকেটে করে নিয়ে যায়নি। আর নিয়েই বা যাবে কী করে! একটার জন্যেই যাকে বন্ধুর রিভলভার চুরি করতে হয় তার পক্ষে দুটো রিভলভার—' প্রণব কথা শেষ না করেই থেমে গেল।

সুদক্ষিণা এতক্ষণে কথা বললে, 'পুলিশ কী বলে?'

'পুলিশ অন্যরকম সন্দেহ করে। তাদের ধারণা ডাঃ চক্রবর্তী আর বাণীব্রত দুজনের কাছেই রিভলভার ছিল। যখন ওরা পরস্পর ধস্তাধস্তি করে তখন দুজনেই সম্ভবত নিজের-নিজের রিভলভার বের করে একে অন্যকে ভয় দেখাচ্ছিল। কিন্তু ধস্তাধস্তি করবার সময় দুজনেরই রিভলভার হাত থেকে পড়ে যায়। তারপর বাণীব্রত সুযোগমতো যে-রিভলভার হাতের সামনে পেয়েছে তাই দিয়ে গুলি করেছে ডাঃ চক্রবর্তীকে। অন্য রিভলভারটি ফেলে দিয়েই পালিয়ে গেছে।'

'ও, তার মানে—বাণীবাবু ডাঃ চক্রবর্তীর রিভলভার দিয়েই তা হলে তাঁকে মেরেছেন?'

'পুলিশ তো তাই সন্দেহ করে। তাদের এ সন্দেহ আরও দৃঢ় হয়েছে নীলার কথায়। নীলা জানিয়েছে, ডাঃ চক্রবর্তীর রিভলভারটা বাড়িতে পাওয়া যাচ্ছে না।'

প্রণব নীরব হল। সুদক্ষিণাও বসে থাকল বোবার মতো। প্রণবের কথাগুলো তার মনের মধ্যে চিন্তার আবর্ত তুলেছে। অনেকটা সময় কেটে গেল চুপচাপ। তারপরে বললে প্রণব, 'আমি কিন্তু পুলিশের সন্দেহ সমর্থন করি না।'

প্রণবের কথায় সুদক্ষিণা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল।

'আমার এই অসমর্থন ভিত্তিহীন নয়। যথেষ্ট জোরালো যুক্তি আছে এর পেছনে।'

'যুক্তি।'

প্রণব মাথা নাড়ল। তার মুখে রহস্যের আভাস সঞ্চারিত হল।

'আমার কথা ভালো করে ভেবে দেখুন। যেদিন এই দুর্ঘটনা ঘটে সেদিন আপনাদের বাড়িতে আপনার বউদি গায়ত্রী দেবী অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। ডাঃ চক্রবর্তীকে ডাকা হয়েছিল মাত্র সে কারণেই। অর্থাৎ, স্বাভাবিক ঘটনাটা হচ্ছে একজন রুগির জন্যে একজন ডাক্তারকে ডেকে পাঠানো ও ডাক্তারের আবির্ভাব। এই তো?'

'হ্যাঁ।' সুদক্ষিণা ঘাড় নাড়ল।

'আচ্ছা, সুদক্ষিণা দেবী, তারপর রুগির বাড়ির কেউ যদি মাঝরাতে সেই ডাক্তারের বাড়িতেই তাকে ডাকতে যায় তাহলে ডাক্তার ভদ্রলোক কী ভাবতে পারেন?'

'রুগির বাড়ি থেকে রাত্রিতে লোক যখন ডাকতে এসেছে তখন নিশ্চয় রুগির বাড়াবাড়ি অবস্থা।' সুদক্ষিণা সহজ-যুক্তিতে বললে।

'ঠিক তাই। আমি তাই ভাবছি, ডাঃ চক্রবর্তী বাণীব্রতর ডাক শুনে যখন নীচে নেমে এলেন তখন রুগির কথা না ভেবে হঠাৎ অন্য কথা ভাবতে গেলেন কেন?'

'অন্য কথা? বুঝলাম না।'

'মানে রিভলভার পকেটে পুরে বাণীব্রতর সঙ্গে দেখা করতে আসার ইচ্ছে। এর কারণ কী?'

'রিভলভার হয়তো ওঘরেই ছিল।'

'না, বৈঠকখানা ঘরে ওসব মারাত্মক জিনিস কেউ রাখে না। ডাঃ চক্রবর্তীরও ছিল না। নীলাও সে-কথা স্বীকার করেছে। উপরন্তু নীলার কাছ থেকে আরও জানা গেছে, ডাক্তার চক্রবর্তী শোওয়ার ঘরে আলমারির মধ্যে রিভলভার রাখতেন। আলমারিটা তালাবন্ধ থাকত। তাছাড়া নীলা বলেছে, বাণীব্রতর ডাক শুনে ডাঃ চক্রবর্তী তাড়াতাড়ি নীচে নেমে গিয়েছিলেন। রিভলভাব সে-সময় তিনি সঙ্গে নিয়েছিলেন কি না তা নীলা জানে না।

প্রণবের জটিল ও সূক্ষ্ম যুক্তির আবর্তে সুদক্ষিণা হাঁপিয়ে উঠছিল। ও বললে, 'দেখুন, আমার মাথায় এত সব ব্যাপার ঢোকে না। কিছুই বুঝতে পারছি না। তবে যুক্তি আপনার আমিও সমর্থন করছি।'

সুদক্ষিণার কথায় কান না দিয়েই প্রণব বলে চলল, 'আমার বিশ্বাস ডাক্তার চক্রবর্তী রিভলভার পকেটে পুরেই নীচে নেমেছিলেন। আর এ-থেকে এ-কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, বিপদের আশঙ্কা তিনি আগেই করেছেন।' প্রণব একটু থামল। একটা সিগারেট ধরাল। নিঃশব্দে গোটা কয়েক জোর টান দিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললে আবার—অনেকটা যেন আনমনে, 'বিপদ সম্পর্কে যিনি এত সচেতন তিনি যে কী করে অত সহজে আহত হলেন—আমি তাই ভাবি।'

এদিকে রাত হয়ে আসছিল। সামনের জঙ্গলে শিয়ালদের সমবেত কলরবে সুদক্ষিণা চমকে-চমকে উঠছিল। একটা বন্য কুকুরের আর্ত চিৎকার সেই নির্জন বনভূমির বাতাসকে কাঁপিয়ে তুলছিল। কেমন যেন ভয়-ভয় গলায় সুদক্ষিণা বললে, 'কী বিশ্রী।'

'কী?' প্রণব গভীর চিন্তার মধ্যে কথা কইল।

'ওই কুকুরের ডাকটা।'

'কুকুরের ডাক? ও, হ্যাঁ। এখানে ক'ঘর দেহাতি পরিবার বাস করে তাদেরই কুকুর। রাত

হল, চলুন উঠি!'

প্রণব উঠে দাঁড়াল। সুদক্ষিণাও।

এবার ওদের ফিরে যাওয়ার পালা। মন্থর পায়ে নিঃশব্দে এগিয়ে চলল দুজনে। পাতা মাড়ানোর শব্দ উঠতে লাগল পায়ে-পায়ে।

চুপচাপ খানিকটা পথ অতিক্রম করার পর সুদক্ষিণা বললে, 'আপনার কাছে লজ্জা করে কিছু লুকিয়ে রাখা আমার আর শোভা পায় না।'

সুদক্ষিণার গলার স্বর এত নম্র আব করুণ যে, প্রণব থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে বাধ্য হল। অবাক বিস্ময়ে নীরবে সুদক্ষিণার মুখের দিকে চেয়ে তার মনের ভাষা পাঠ করবার চেষ্টা করলে খানিক। চাঁদের আলোয় সুদক্ষিণাব শীর্ণ-শান্ত মুখশ্রী আরও মধুর লাগছে। নিজের অজ্ঞাতেই প্রণবের চোখে ফুটে উঠল মুগ্ধ-বিস্ময়, 'বলুন' প্রণব অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতো ঘনিষ্ঠ সুরে কথা বললে।

অনেক কষ্টে সংকোচ কাটিয়ে বললে সুদক্ষিণা, 'এখান থেকে যেতে মন আমার সত্যিই চায় না। আপনাকে সমস্ত কিছু গুছিয়ে বলার শক্তিও নেই। এমন দোটানায় পড়েছি—' সুদক্ষিণা একটু থামল—স্বর তার ভার-ভার হয়ে উঠছে, 'ভুলেই যেতাম হয়তো, কিন্তু আপনি আবার নতুন করে অতীতকে জাগিয়ে তুললেন। তারপর আপনার কাছে যত শুনি ততই মনে হয়—বাণী দোষী নয়। আর সত্যি, ওকে যে একটুও চেনে সেই বলবে ওর পক্ষে একাজ করা একেবারেই অসম্ভব।'

'অসম্ভব বলে কোনও কথা অবশ্য আমাদের—মনঃসমীক্ষকদের বিশ্বাস করতে নেই সুদক্ষিণা। বিশ্বাসও আমরা করি না।'

একটু অসতর্ক হয়েছিল প্রণব তার কথায়।

সুদক্ষিণা! সুদক্ষিণাব মর্মে এসে ডাকটা বিঁধল। মুহূর্তের জন্যে বাণীব্রতর মুখ তার চোখের সামনে ভেসে উঠল। থমকে দাঁড়িয়ে চেয়ে থাকল ও প্রণবেব দিকে।

প্রণবও তার অসতর্ক সম্বোধনের গুরুত্ব বুঝে লজ্জিত হয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি বললে, 'ক্ষমা করবেন, হঠাৎ—।'

সুদক্ষিণা প্রণবেব কথায বাধা দিলে। আন্তরিকতায় তাব কণ্ঠস্বর মধুর হয়ে উঠল। বললে, 'কুন্তলাদি বলছিলেন—আমরা সমবয়েসি—আপনি আর আমি। আপনি আমার নাম ধরেই ডাকবেন। সত্যি, আমি খুব খুশি হব।

প্রণব এমনটা আশা করেনি। সমস্ত ঘটনাটা হৃদয়ঙ্গম করতে তার খানিকটা সময় লাগল। তারপব সহসা ছেলেমানুষের মতো হেসে উঠল—সজোরে, খেয়াল-খুশিতে, 'মানে, এই বন্ধুত্বের সুযোগ নিয়ে তুমি আমায় ফাঁকি দিতে চাও?'

'তাই কি?'

'তুমিই ভেবে দেখ। যদি বাণীবাবুকে কষ্টেসৃষ্টে সারিয়ে তুলে তোমার হাতে দিতে পারি, তখন—।'

'কী বলুন না, থামলেন কেন? অনাত্মীয়তার সংকোচ আমরা কাটিয়ে উঠেছি।'

'আমি কাটালেও তুমি যে কাটাতে পেরেছ পুরোপুরি তা তো মনে হচ্ছে না। সম্বোধনপদে শ্রদ্ধাভাজন হতে আমিও রাজি নই।'

'ও! বেশ! তবে বলো, বাণীকে সারিয়ে দিতে পারলে? আমি—।

'তুমি আমায় ফাঁকি দেবে!'

'দিলেই বা। যে দরিদ্র সে তোমায় দক্ষিণা দেবে কোথা থেকে, যদিও আমি সুদক্ষিণা।'

সুদক্ষিণা এত সুন্দর ও সহজভাবে হাসল যে প্রণব অসংকোচে আরও ঘনিষ্ঠ হতে পারল। বললে প্রণব, 'আমি মন নিয়ে দোকান করি সুদক্ষিণা। সব মানুষই ফাঁকি দেয়, তা আমি জানি। তা হোক, তোমার বন্ধুত্বের মূল্য দিয়ে সে-ফাঁক আমি ভরতি করে নেব। কেমন?'

'তাই নিও।' সুদক্ষিণার দুচোখ জলে ভরে উঠল। অনেকক্ষণ পরে বললে, 'এ সংসারে আমার নিজের বলতে কেউ নেই, কিছুই নেই। আজ একজনকে বন্ধু করে পেলাম। তোমার হাতে বাণীর সব ভার তুলে দিয়ে যাচ্ছি প্রণব। যদি ও সেরে ওঠে—আমি সবচেয়ে বেশি সুখী হব। তোমার কাছে কৃতজ্ঞ থাকব আজীবন।' কথা বলতে-বলতে আবেগে প্রণবের হাত ধরে ফেলেছিল সুদক্ষিণা।

প্রণব হাত ছাড়িয়ে নিল। ধীরে-ধীরে বললে, 'কোথায় গিয়ে ঠেকব জানি না। তবে তোমার বন্ধুত্বের মর্যাদা রাখবার চেষ্টা আমি করব, সুদক্ষিণা।'

নিঃশব্দে আবার দুজনে পথ হাঁটতে শুরু করলে। হঠাৎ বললে সুদক্ষিণা 'তুমি ভগবান বিশ্বাস করো?'

প্রশ্নটা আচমকা। প্রণব একটু বুঝি অবাক হল এ ধরনের প্রশ্ন শুনে।

'না।' মাথা নাড়লে প্রণব।

'আমি করি। শুধু ভগবান নয়, ভাগ্যও।'

'নেহাতই বোকা তুমি! প্রণব হাসে।'

'তোমার চেয়ে নিশ্চয় নয়। কিন্তু ও কথা থাক। আমি বিশ্বাস করি। আমাদের পরস্পরের সাক্ষাৎটা তাই আমি ভাগ্য বলেই মনে করি, আর আমাদের বন্ধুত্বকে—।'

'দোহাই তোমার—তুমি যা ভাববার ভেবো, আমায় শুনিও না। তার চেয়ে এসো তোমার আর এক ভগবান যে প্রকৃতপক্ষে খুনি নয় তার প্রমাণ স্বরূপ আমার দ্বিতীয় যুক্তিটা—' প্রণবের হাসির ঢেউ অনেকটা জায়গা জুড়ে ভাসতে লাগল।

'ঠাট্টা করছ?'

'না—না ঠাট্টা নয়; হিংসে। মনের গতি বড়ই বক্র এবং জটিল। সে তুমি বুঝবে না। তার চেয়ে আমার কথা শোনো—।'

'বলো।'

'দ্বিতীয় প্রমাণ নীলার নিজের মুখের কথা। বাণী নাকি একদিন নীলাকে গলা টিপে মেরে ফেলবার চেষ্টা করে। নীলা বলেছে, শুধু সন্দেহের বশে বাণী এমন মারাত্মক একটা কাণ্ড করতে বসেছিল। অথচ মজা এই, কেন যে বাণী নীলাকে সন্দেহ করত তা নীলা বলে না।' প্রণব কথার মাঝে হঠাৎ থেমে গিয়ে সুদক্ষিণার মুখের দিকে অল্প কয়েক মুহূর্ত নীরবে তাকিয়ে থেকে বললে, 'বাণী নীলাকে সন্দেহ করে এটা যদি নীলা বুঝে থাকে, কেন সে সন্দেহ করে সেটা নীলা জানত না, তা আমি বিশ্বাস করি না। এ বিষয়ে নীলার নীরবতার নিশ্চয় গভীর অর্থ আছে। যদি ডাক্তার চক্রবর্তী এই সন্দেহের কারণ না হন তা হলে হয় নীলার দিক থেকে অন্য ত্রুটি আছে না হয়—।'

'না হয়—' সুদক্ষিণা রুদ্ধনিশ্বাসে পুনরাবৃত্তি করলে শেষ দুটো শব্দ।

'না হয় বাণীর দিক থেকেই কোনও ত্রুটি ছিল। সম্ভবত বিনা কারণে অনর্থক মনে-মনে একটা সন্দেহ পোষণ করার বাতিক ছিল ভদ্রলোকের। অর্থাৎ একটা মনোবিকারে 'সাইকোসিসে' সে আগে থেকেই ভুগছিল। তাই যদি হয় তবে প্রশ্ন করব, কেন? কেন এই মনোবিকার?'

প্রণবের ভাব-ব্যাকুল মুখের দিকে তাকিয়ে সুদক্ষিণা বললে, 'তোমাদের মনের-ডাক্তারিতে এর কি কোনও উত্তর নেই?'

'নেই মানে? অজস্র আছে।'

'তবে?'

'বাণীব্রতর বেলায় কোন উত্তরটা খাটবে সেটা জানতে হবে।'

'কিছু ঠিক করতে পারোনি?'

'না। মনঃসমীক্ষণ-শাস্ত্র যেমন সূক্ষ্ম, তেমনি জটিল। খুশিমতো একটা কিছু মনে করতে আমরা পারি না। বাণীব্রত মনোবিকারে ভুগছিল। এটা আমার অনুমান। কতকগুলো বাহ্য-প্রমাণ থেকে এটা অনুমান করা যায়। কিন্তু আরও কতকগুলো প্রমাণ চাই—কতকগুলো বাস্তব কারণ যার ওপর ভিত্তি কবে অনুমানটা সত্য বলে স্বীকাব করে নিতে পারি।'

সুদক্ষিণার পায়ে লতা জড়িয়ে যাওয়ায় পড়ে যাচ্ছিল, প্রণব তাকে ধরে ফেলল।

'লাগল?'

'না। বাণীর মনেব বিকাব কী কাবণে ঘটল তুমি তো তা অনুমান করতে পার!'

'এমন বোকাব মতন একটা কথা বললে!'

'কেন?'

'তুমি যে বাণীকে ভালোবেসেছ এটা নিশ্চয় স্বীকার করবে।'

'ঠাট্টা হচ্ছে?' সুদক্ষিণা কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ করলে।

'না। ঠাট্টা, ইয়ার্কি নয়। আমার কথার জবাব দাও।'

সুদক্ষিণা কিন্তু কোনও জবাব দিল না। চুপ করে পথ হাঁটতে লাগল। 'বুঝেছি! মৌনং সম্মতি লক্ষণং।' একটু অপেক্ষা কবে প্রণব বললে, 'কিন্তু শ্রীমতী সুদক্ষিণা দেবী, বাণীকে ভালোবাসো এটা জানতে পাবলেও তুমি কি কোনওদিন জানতে পেবেছ কেন বাণীকেই ভালোবাসলে। আরও তো অনেক ছেলেব সঙ্গে তোমার আলাপ হযেছে। কারুর সঙ্গে হয়তো বা বন্ধুত্বও ঘটেছে।'

প্রণব একটু মুচকি হাসল। সুদক্ষিণা আড়চোখে লক্ষ করল সে হাসি।

'পাগল নাকি?' সুদক্ষিণা ছোট্ট কবে কাশল।

'আমায় বলছ?'

'আর কাকে বলব? এখানে তৃতীয ব্যক্তি কেউ নেই। কেন ভালোবাসলাম তা কি বলা যায়—না জানা যায়? এব কোনও কারণ নেই—থাকে না।' সুদক্ষিণার সুরে দৃঢ়তা।

'দোহাই তোমার, অমন সবজান্তা অথবিটির সুরে বায় দিও না।' প্রণব সজোরে হেসে উঠল। ফাঁকা মাঠেব মধ্যে সে হাসি ছড়িয়ে পড়ল বাতাসের স্তবে স্তরে, 'তোমরা অবশ্য তাই ভাবো। আর পৃথিবীতে যা নিজে জানো না, বোঝো না—অনাযাসে তাব ওপর হালকা একটা মন্তব্য বা টিপ্পনী কেটে ছেড়ে দাও!'

'মানে?'

'মানে—ভূমিকম্প হওয়াব যেমন কয়েকটা বিশেষ কাবণ আছে—তেমনি হাজার ছেলের মধ্যে বাণীব্রতকে তোমার ভালোবাসারও একটা বিশেষ কারণ আছে বইকী। সে কারণটা তুমি অবশ্য জানো না।'

'তুমিও তো সাইকোলজিস্ট—মনোবিদ—তুমিই দাও না কেন—?'

'বেশ দেব। তবে উপস্থিত তার চেয়ে জরুরি জিনিস—কিছু জ্ঞানদান করি তোমায় শোনো। যা বলছিলুম—বাণীব্রতর মনোবিকারেরও একটা কারণ আছে। কিন্তু সেই কারণটা কী তা জানা মুশকিল। হাজার কারণে মনোবিকার ঘটতে পারে। কিন্তু ঠিক কোন কারণে বাণীব্রতর মনোবিকার ঘটেছে তা জানা সহজ নয়। যেমন সহজ নয় জানা হাজার কারণের মধ্যে ঠিক কী কারণে বাণীব্রতকে তুমি ভালোবাসো। বাণীব্রতর মনোবিকারের কারণ বের করতে হলে ওর বাবা-মা ও আত্মীয়-স্বজনের খবর জানা চাই। জানা চাই বাণীব্রতর ব্যক্তিগত জীবনের ধারাবাহিক ইতিহাস। এমনি আরও কত কী? কিন্তু এসব জেনেও কোনও ফল নাও হতে পারে।'

'নাও হতে পারে?' সুদক্ষিণার বিস্ময় মাত্রা হারাল।

'হ্যাঁ, নাও হতে পারে?' ধরো এমন একটা ঘটনা ঘটে গেছে বাণীব্রতর জীবনে যার সম্বন্ধে ও এখন একেবারেই অচেতন। পাগল না হলেও সারাজীবন এ সম্পর্কে সে অচেতন থাকতে পারত।

এই ঘটনাটা হয়ত স্থূল, হয়ত বা সূক্ষ্মও হতে পারে। কিন্তু সে যাই হোক শেষ পর্যন্ত ঘটনাটা তলিয়ে গেছে নির্জ্ঞান মনে। তারপর অবচেতন মনের অন্ধতলায় তালা বন্ধ হয়ে পড়ে আছে বছরের পর বছর—সজ্ঞান বা কনসাস (conscious) মনে যার তিলমাত্র ছায়া নেই। সেক্ষেত্রে কী হবে! কেমন করে তুমি জানতে পারবে ওর মনোবিকারের রহস্য?'

প্রণব কথা বলতে-বলতে তন্ময় হয়ে উঠেছিল। দেখতে পায়নি সামনে একটা শিশুগাছের মরা ডাল বেঁকে আড়াল করে রেখেছে তার পথ। আচমকা ধাক্কা খেয়ে প্রণব মৃদু কাতরোক্তি করে উঠল।

হেসে ফেলল সুদক্ষিণা।

'এতে হাসবার কী আছে?' প্রণব কপালে হাত বুলিয়ে পাশে সরে এল।

'মনের ডাক্তাররা বুঝি চোখের বেলায় অন্ধ হয়?' সুদক্ষিণা চেপে-চেপে হাসছে তখন।

সিগারেট ধরিয়ে প্রণব হেসেই উত্তর দিল, 'না। মনের ডাক্তারদের চোখ অন্য ডাক্তারদের চেয়েও বেশি তীক্ষ্ণ।'

'বেশি?'

'অনেক বেশি। আমার এই ধাক্কা খাওয়াটাই তার প্রমাণ। আমি এই ধাক্কা খেয়ে কী বোঝাতে চাই জানো?'

'না।'

'মানুষ সংসারে এমনিভাবেই বেহুঁশ হয়ে পথ হাঁটে। খাওয়া, পরা, বাঁচা, বিয়ে, সন্তান—বাস্তবজীবনের এইসব দাবি মেটাতেই সে তন্ময়। হঠাৎ যখন তাদের সামনে ওই গাছের ডালটার মতো একটু কিছু আচমকা এসে পথ আগলায়—তখন ধাক্কা খেয়ে সে থমকে দাঁড়ায়। ধাক্কাটা একটু জোর হলে তার অবস্থা হয় তোমার বাণীর মতন। বুঝলে?'

'বুঝলাম।'

'না, বোঝোনি—এখনও অনেক আছে। বাণীব্রত এই রকমই একটা ধাক্কা খেয়েছে। আর সেই ধাক্কার জের এসে থেমেছে নীলাকে গলা টিপে মারার চেষ্টা আর ডাঃ চক্রবর্তীকে গুলি করে মারতে গিয়ে পাগল হয়ে যাওয়ায়।'

'আশ্চর্য!' সুদক্ষিণার চোখের পাতা বিস্ফারিত হল।

'আমার মনে হয় বাণীব্রত শৈশবজীবনেই বোধহয় প্রথম ধাক্কাটা খায়।'

'শৈশবজীবনে?' গলার স্বরে অগাধ বিস্ময় সুদক্ষিণার।

'বেশির ভাগ যে তাই হয়।'

'তারপর এতদিন—।'

'এতদিনই। অবাক হওয়ার কিছু নেই। হয়তো সারাজীবনই তেমন কোনও ঘটনা আবার না ঘটলে বাণীব্রত তার ধাক্কার কথা জানতে পারত না, আমরাও না। নির্জ্ঞান মনের অন্ধকূপে বন্দি থেকে সেই ধাক্কাটা দেহের সঙ্গেই একদিন মিলিয়ে যেত!'

হাঁটতে-হাঁটতে বাড়ির কাছে এসে পড়েছিল ওরা।

গেট খুলে প্রণব দাঁড়াল। সুদক্ষিণা পা বাড়াল গেটের মধ্যে।

প্রণব আবার গেটটা বন্ধ করলে। বললে, 'পাগল কী জানো? Disbalanced personality—ব্যক্তিত্বের বেখাপ্পা ওজন, দাঁড়িপাল্লা যেখানে সমান নয়। যদি কোনওদিন আমাদের ভাগ্যেও এই বেখাপ্পা ওজন চলে—আমরাও পাগল হতে বাধ্য হব।'

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে-উঠতে বললে সুদক্ষিণা, 'তোমার কথা বোঝার মতো বিদ্যে আমার নেই। আমায় শুধু একটা কথা সহজ করে বলো, বাণীর জীবনে তুমি যা বললে তাই যদি ঘটে থাকে, তুমি তা জানলে কী করে?'

'যেমন করে আমরা জানি। বাণীব্রতর স্বপ্ন, তার '1' (one) বদলে 'A' লেখা, তার ব্যবহার, প্রকৃতি—এই সমস্ত লক্ষ করে।'

'বুঝেছি। এগুলোই বুঝি রোগের লক্ষণ?'

'চমৎকার। কে তোমায় বোকা বলবে?' প্রণব সজোরে হেসে উঠল।

লজ্জা পেয়ে সুদক্ষিণা বললে, 'তুমি আমায় কী ভাবো বলো তো?'

'বন্ধু!' প্রণব ছোট্ট করে বলল। তার গলার স্বরে আনন্দ ও প্রীতির মাধুর্য উপচে উঠছে।

কুন্তলাদি বাইরে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। বললেন, 'এত বেড়াতে পারিস?'

'তোমার মতন তো আমাদের পায়ে বাত হয়নি, দিদি।' প্রণব আবার হেসে উঠল।

'তা বইকী, আমার মতন বুড়ো হ। তখন বুঝবি।'

'ও আশীর্বাদ করবেন না, দিদি। কিন্তু ভাইটির আপনার বয়েস আমার চেয়ে কম হলে কী হবে—মনের দিক থেকে সে আপনার চেয়েও বুড়িয়ে গেছে।'

সুদক্ষিণার কথার ইঙ্গিত কুন্তলাদি বুঝলেন না। কিন্তু প্রণব আর সুদক্ষিণার হাসির সঙ্গে তিনিও গলা মেলালেন।

একদিনও বুঝি ঘুম থেকে জেগে উঠে প্রণবের দেখা উচিত ছিল পলাশ বনের রং ফিকে হয়ে এসেছে, আকাশটা আরও বেশি তামাটে, তাত বেড়েছে রোদের। বসন্ত-শেষের অলস দুপুর মাঝে-মাঝে খেপে ওঠে; ঘূর্ণি হাওয়ায় গাছের ঝরা পাতা উড়ে এসে পায়ে চলা পথ দেয় ঢেকে। প্রকৃতির এই পরিবর্তন প্রণবের চোখে পড়ার কথা, কিন্তু পড়ল না। কর্মব্যস্ত জীবনে আজ আর তার এ পরিবর্তন লক্ষ করার অবসর নেই। সে লক্ষ করে চলেছে মানুষের পরিবর্তন। প্রকৃতির চেয়েও, মানুষের আকর্ষণ যেন তার কাছে আরও বেশি বেড়েছে, দেখা দিয়েছে আরও অনেক বেশি লোভনীয় ও চমকপ্রদ হয়ে। বরাবরই যে প্রণব বাহ্য জগৎ সম্বন্ধে এতটা উদাসীন ছিল তা নয়। এই বন আর বনের বাতাস, মাঠ, পাথর, ঝরনা—সবই তার অসম্ভব ভালো লাগত। ভালোবেসে ফেলেছিল ও এই নির্জন বন্য-জগতটাকে। সে ভালোবাসা আজ আর নেই কিংবা হয়তো আগের মতোই আছে সব, কেবল সেই তীব্র আকর্ষণটা কমে এসেছে।

প্রণবের আজকাল সময়াভাব। হাসপাতালের যাবতীয় কাজের ভার এসে চেপেছে ঘাড়ে। ডাঃ গুপ্ত কিছুদিনের জন্যে ছুটি নিয়ে বাইরে গেছেন। একরাশ কাজ নিয়ে হাসপাতালে সারাটা দিন কেটে যায় প্রণবের। সন্ধেবেলায় হাসপাতালের নতুন মেয়ে ডাক্তার কুমারী ডোরা দত্তকে ডেকে রুগিদের রিপোর্ট নিতে, আর তাকে এটা সেটা বুঝোতে-বুঝোতে রাত হয়ে আসে। তাবপর ঘড়ির কাঁটায় কোনওদিন আটটা, কোনওদিন ন'টা বেজে যাওয়ার পর ক্লান্ত দেহটা টানতে-টানতে বাড়ি ফেরে প্রণব। এরপর তার আর শক্তি থাকে না বাইরের জগৎটার দিকে চোখ মেলে চাইবার।

প্রণবের অজান্তে তাই নিঃশব্দে বসন্ত শেষ হল—এল গ্রীষ্ম। তামাটে আকাশ উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হল। আগুনের হলকার মতো তপ্ত রোদ। ক্রমে দেখা দিল কালবৈশাখী। ঝড়ের দাপটে এক একটা বিকেলকে মনে হত সৃষ্টিছাড়া। সেই সর্বনাশা ঝড়ও কবে যেন থেমে গেল। চাপা, ঠাসা আবহাওয়া ভরা দিন এল আর গেল। তারপর আবার একদিন তার অজান্তে আকাশ ভরে জমে উঠল মেঘ। ছায়ায়-ছায়ায় থমথম করতে লাগল পাহাড় আর হাসপাতাল, মাঠ আর বন।

একদিন ঘুমোতে গিয়ে জানালা খুলে বসে থাকল প্রণব। বৃষ্টি নেমেছে। অন্ধকারের গায়ে সেই মসৃণ বারিপাতের রূপটা চোখে দেখার উপায় নেই। মনে-মনে কেবল তাকে অনুভব করা

যায়। আর সেই সঙ্গে যাকে ভাবতে ভালো লাগে প্রণব তার চিন্তায় তন্ময় হয়ে উঠল। অবশেষে একসময় প্রণব উঠে টেবিল থেকে লেখার প্যাড আর কলমটা তুলে নিল।

টেবিল-ল্যাম্পটা জ্বালিয়ে টেনে আনল কাছে। তারপর বুকের তলায় বালিশ সাজিয়ে আরামদায়ক এক ভঙ্গি করে চিঠি লিখতে বসল।

সুদক্ষিণা,

এখন অনেক রাত। বিছানায় শুয়ে তোমায় চিঠি লিখছি। কী চুপচাপ, শান্ত এই রাত্তির! বাইরে বেশ জোরে বৃষ্টি নেমেছে। জানালা খোলা। জলের ছাট এসে মাঝে মাঝে আমায় ভিজিয়ে দিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। এত ভালো লাগছে আজকের এই রাত্তির—বৃষ্টি, নিস্তব্ধতা, তোমায় কী করে তা বোঝাই। এরই সঙ্গে ভীষণ ইচ্ছে করছে তোমার সঙ্গে দুটো কথা বলার।

তুমি বোধ হয় ভাবছ, আমি সম্ভবত আজকাল কাব্যচর্চা করছি—তাই এ উচ্ছ্বাস। দোহাই তোমার, আর যাই ভাব, কবিতা লিখছি এমন মারাত্মক কল্পনা যেন করো না। লিখতে পারলে অবশ্য লিখতাম, কিন্তু ওটা আমি পারি না। আমি যা পারি সেটাকেও কিন্তু কবিতা বলা উচিত! শব্দ দিয়ে ভাবকে, ভাষা দিয়ে ইমোশানকে তোমরা ফুটিয়ে তোলো। মনের মধ্যে যা সুপ্ত তাকে সাজসজ্জা পরিয়ে অন্তঃপুর থেকে রাজপথে এনে দাঁড় করাও। এ যেন নতুন বউয়ের ঘোমটা খুলে মুখ দেখানোর মতন; ঘোমটার আড়ালে অজানার রহস্য ঘোমটা খুললে জানার বিস্ময়।

আমার জীবনে কাব্যচর্চাটা আরও একটু বেশি বাস্তব। মনের লুকোনো রহস্য টেনে বের করি আমি। কিন্তু তোমাদের সঙ্গে তফাতটা কোথায় জানো? তোমরা রহস্যটা নিজে জেনে যখন অপরকে জানাতে যাও তখন আবার রহস্য করে বসো। আর আমি রহস্যটা জেনে যখন জানাতে যাই তখন একেবারে নিরস যুক্তিবাদী, নিরপেক্ষ।

বুঝতে পারছি আমায় সহ্য করা তোমার পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ছে। তা হোক। অন্তত এখনও কিছুদিন যে আমায় সহ্য করবে সে সম্বন্ধে আমার সন্দেহ নেই। কেননা বাণীব্রত আজও সুস্থ হয়ে ওঠেনি।

ভাবছ বুঝি তোমায় স্বার্থপর বলে গালাগাল দিলাম। না, গালাগাল দিইনি—যদিও স্বার্থপর বলতে বাকি রাখছি না। স্বার্থপর সকলেই। একটু মাত্রা বেশি হলেই লোকের চোখ টাটায়, অন্যথায় নির্দোষ গুণ। নিজের ছেলেকে আগলাবার জন্যে মার স্বার্থপরতা সর্বদাই ক্ষমণীয়—কিন্তু সেটা যদি পরিধিতে আর একটু বিস্তৃত হয়ে পড়ে তা হলে আর কথা থাকে না—ট্যারা কথায় কান কালা হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। তাই বলি, স্বার্থপর বলছি বলে রাগ করো না। আমি যে কম স্বার্থপর নই—সে কথাটা অন্তত মনে করলে অনায়াসে আমায় সহ্য করতে পারবে।

চিঠিটা বোধ করি একটু বেয়াড়া হয়ে উঠেছে। সুরটা যেন বাইরের বর্ষার সঙ্গে মিলছে না। সম্ভবত বিরহের মধ্যে যে নিসঙ্গ একাকীত্ব আর বেদনাবোধ তার অভাব ঘটছে—নয় কি? আচ্ছা, এসো প্রসঙ্গ পরিবর্তন করি।

ক'দিন ধরে তোমায় চিঠি লিখব ভাবছিলুম। সময় করে উঠতে পারছিলাম না। আজকাল আমার অবস্থা হয়েছে অনেকটা তোমারই মতন। জানো, সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে যেই চোখ মেললাম একটা দুশ্চিন্তা এসে জুড়ে বসল মন—তারপর সারাটা দিন গেল, আবার রাত্রে বিছানায় শুয়ে যতক্ষণ না ঘুমিয়ে পড়ছি ততক্ষণ চিন্তার বিরাম নেই। হাসপাতাল আর রুগি। এ যে কী সাঙ্ঘাতিক গুরুদায়িত্ব তা তোমায় বোঝানো মুশকিল।

ডাক্তার গুপ্ত যতদিন ছিলেন—আমার কোনও দায়িত্ব ছিল না। রোগ আর রুগি ঘেঁটেই দিনটা কেটে যেত। এখন রুগি তো আছেই তার ওপর এই হাসপাতালের সব কিছু দেখাশোনা। সব সময় ভয় হয়—কোথায় কী ত্রুটি থেকে যাবে কে জানে—শেষ পর্যন্ত অপদার্থ বলে ধরা পড়ব। ডাঃ গুপ্ত ফিরে এসে কান মলে তাড়িয়ে দেবেন। তারপর? ভাবতেও আমার ভয় করে। এ হাসপাতালের বাইরে আমার অস্তিত্ব কল্পনা করা আমার পক্ষে অসম্ভব।

তুমি বোধহয় শঙ্কিত হয়ে উঠলে। ভাবছ, আমার নব-পদমর্যাদা রক্ষার চেষ্টায় এত ব্যস্ত যে তোমার ব্যাপারে শিথিল হয়ে পড়েছি। ঠিক কি না—বলো? বিশ্বাস করো তা হইনি। তোমায় কথা না দিলেও বাণীব্রতকে যতদিন না সুস্থ করতে পারতুম আমি তার প্রতি আমার কর্তব্য অবহেলা করতাম না। হি ইজ মোর ইন্টারেস্টিং টু মি।

তোমার আগ্রহ এবং কৌতূহল মেটাবার জন্যে এবার তার কথা বলি।

গতবার তুমি এসে তাকে যেমন দেখে গেছ এখন তার চেয়ে অবস্থা তার আরও ভালো। সেই ফেব্রুয়ারি মাসে যখন তুমি এখানে প্রথম এলে—(বাণীব্রতর সঙ্গে সাক্ষাতের ঘটনাটা একবার মনে করো) তখন দিন কয়েকের জন্যে হঠাৎ ও খুব উত্তেজিত হয়ে পড়ে। কেন যে তা আমি তোমায় গতবার বলেছি। যাক, সেই ফেব্রুয়ারি মাস থেকে এই জুলাই মাস প্রায় পাঁচ মাস কেটে গেল। ইতিমধ্যে তুমি আরও বার তিনেক এসেছ। নিজের চোখেই দেখেছ বাণীর অবস্থায় ক্রমোন্নতি। বিশেষত গতবার গরমের ছুটিতে এখানে এসে বেশ ক'দিন ছিলে। বাণীকে খুব ভালো করে দেখবার সুযোগ তোমার হয়েছে। তখনই দেখেছ বাণী যেন তোমায় অনেকটা মনে করতে পারছে। আজকাল সে প্রায়ই তোমার কথা জানতে চায়। তুমি এবার এসে ওকে যে বই আর বেহালা দিয়ে গেছ সেগুলো যক্ষের ধনের মতো আগলে রেখেছে। বাণী আজকাল প্রায়ই বেহালা বাজায়। তবে তেমন ভালো করে বা পুরোপুরি কোনও সুর বাজাতে পারে না। চিন্তাশক্তির শৃংখলা এখনও পুরোপুরি ফিরে আসেনি। তবু এ কথা সত্যি, ওর মানসিক শক্তি এখন অপেক্ষাকৃত উন্নত; সাধারণ স্বাস্থ্যও ভালো।

বাণীর সম্পর্কে অন্যান্য নতুন খবরের মধ্যে প্রধান হচ্ছে—ও যে সেই একলা নির্জন জায়গায় গিয়ে একটা যান্ত্রিক অভ্যাসের পুনরাবৃত্তি (stereotyped action) করত তার পাট চুকে গেছে। হাতের ব্যথা কিন্তু এখনও ঘোচেনি।

এবার তোমায় আরও ক'টা কথা বলি। তুমি তো জানো পুলিশ থেকে যে ভদ্রলোক এসেছিলেন তিনি আমাদের কথায় বিশেষ কর্ণপাত করতে রাজি হননি। তাঁর বিশ্বাস বাণীব্রত ছাড়া আর কেউ ডাঃ চক্রবর্তীকে খুন করেনি, করতে পারে না। ভদ্রলোক আমাদের আমলেই আনতে চাইলেন না তো সাহায্য! তারপর আবার কী কাণ্ড করেছেন ভদ্রলোক জানো? ফিরে গিয়ে অফিসে রিপোর্ট দিয়েছেন—বাণীব্রতর মনোবিকারের কথা বাড়িয়ে বলা হয়েছে। প্রকৃত ব্যাপার জানার জন্যে তাকে সরকারি হাসপাতালে পাঠানো হোক। এর ফলে পুলিশ থেকে তাড়া দিয়ে চিঠি লিখেছে। তোমাকে বোধহয় বলেছিলাম—আমার দিদির শ্বশুর এবং আমার বাবার বিশিষ্ট বন্ধু মিস্টার সেনগুপ্ত বিহার গোয়েন্দা পুলিশ দপ্তরের একজন হোমরা-চোমরা কর্তা। তাঁকে চিঠি-লিখেই আমি বাণীব্রতকে এখানে ধরে রাখি এবং তাঁর তদ্বিরে পুলিশ থেকে যাবতীয় সাহায্য লাভের প্রতিশ্রুতি পাই।

কাকাবাবু—মানে মিস্টার সেনগুপ্তকে আমি চিঠি দিয়েছিলাম। তিনি জানিয়েছেন, পুলিশ তদন্ত করে যে-ভাবে মামলাটি সাজিয়েছে তাতে বাণীব্রতকে অপরাধ থেকে দোষমুক্ত করবার কোনও পথই খোলা নেই। যে পুলিশ অফিসার এই ঘটনাটি তদন্তের ভার নিয়েছিলেন

তাঁর মতে—আসামি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থায়, স্থির মস্তিষ্কে উক্ত ডাক্তারের প্রাণনাশ করে। উদ্দেশ্য স্পষ্ট ও সরল। প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে আসামি তার আত্মীয় ও ভ্রাতাকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে প্রতিশোধ-স্পৃহা চরিতার্থ করে।

বুঝতেই পারো—সমস্ত ঘটনাটা এখন কী অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। যাই হোক—কাকাবাবু আমাকে মাত্র আর দুমাস সময় করিয়ে দিতে রাজি হয়েছেন। কোনওরকমে ধামাচাপা দিয়ে তিনি আরও দুটি মাস বাণীব্রতকে আমাদের হাতে রেখে দেওয়ার ব্যবস্থা করে দেবেন। কিন্তু তারপর? তারপর কী সেটা তুমি অনায়াসে কল্পনা করে নিতে পারো। হাল ছেড়ে দিয়ে হতাশ হয়ে বসে থাকার পাত্র কিন্তু আমি নই। ঠিক জানি না, কতদূর সফল হতে পারব তবে আমার বিশ্বাস এর মধ্যে একটা অঘটন ঘটে যেতেও পারে।

তোমার কলকাতার দাদা বাণীব্রতর সম্পর্কে তেমন কোনও উল্লেখযোগ্য খবর দিতে পারেননি। আমি স্থির করেছি নিজে একবার কলকাতায় যাব। তোমার দাদা, বউদি ও নীলার সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ করব।

নতুন খবর আর একটা আছে। অবশ্য খবরটা শুনলে তুমি হতাশ হবে—নিদেনপক্ষে 'জেলাস' তো নিশ্চয়ই। আমাদের হাসপাতালের নতুন ডাক্তার মিস ডোরা দত্তকে দেখবার সৌভাগ্য তোমার হয়নি। ভদ্রমহিলার বয়স বোধহয় বছর তিরিশ হবে। চেহারাখানির মধ্যে কোনও বৈশিষ্ট্য না থাক জলুস আছে। গায়ের রঙে সে জলুস আরও প্রখরভাবে দীপ্ত। চোখ আর ঠোঁট দুটি কিন্তু বাস্তবিক অপূর্ব, ঠিক গরুর চোখের মতো আশ্চর্যরকম করুণ, মায়াময় আর শান্ত। দ্বিতীয় গুণটি শুনলে তুমি মূর্ছা যাবে। মিস দত্ত গান গাইতে পারেন। আর শুধু পারেন নয় অমন মিষ্টি গলা যার, তার কিন্তু কোকিল হয়ে জন্মানো উচিত।...কী? বুকটা বুঝি কেমন করে উঠল!

কিন্তু আমি কী করতে পারি বলো? বাণীব্রত ডোরার গানের সুরে মুগ্ধ। যত্ন ও ব্যবহারে সর্বদা কৃতজ্ঞ। ঠিক জানি না কেন ডোরাও বাণীব্রতর ওপর কেমন যেন একটু বেশি ইনটারেস্টেড। তোমায় সতর্ক করে দিচ্ছি—you may loose your case.

সম্প্রতি জানাবার মতো আর কোনও খবর নেই। কবে এখানে আসছ জানিও। দিদি রোজই একবার করে তোমার কথা বলেন। আর আমি তো ফাঁক পেলেই সর্বক্ষণ।

বৃষ্টি এখনও থামেনি। কিন্তু ঘুম পাচ্ছে ভীষণ। খুব বড় চিঠি লিখে ফেললাম। আবার পরে।

প্রণবের চিঠির উত্তর এল দিন পাঁচেক পরে। ছোট্ট চিঠি—

প্রণব, তোমার অনেক পাতার চিঠি পড়লাম। খুব কষ্ট হচ্ছিল পড়তে। হাতের লেখাটা একটু ভালো করতে পারো না?

বাণীর কথা যা লিখেছ তাতে আমার উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা যে বেড়েছে তা না লিখলেও বুঝতে পারো। তোমায় বলার ঔদ্ধত্য আমার নেই। যে দাবিটুকু স্বেচ্ছায় দিয়েছ তার জোরে মাত্র এইটুকু বলতে পারি যেমন করে হোক, ওকে তুমি সারিয়ে দাও। কদর্য জীবন ও গ্লানি থেকে তুমি ওকে মুক্ত করো। তুমি না করলে এ কাজ আর কেউ করবে না।

তোমাদের নতুন ডাক্তার ডোরা দত্ত যদি বাণীকে জিতে নেন তার জন্য আমি দুঃখ করব না। তিনি ওকে সুস্থ করে তুলুন তাতেই আমি সুখী।

আর একটা কথা বলে চিঠি শেষ করি। সহজ ভাবে যাকে গ্রহণ করতে পেরেছি বন্ধুর মতন, যার কাছে হাত পেতে ভিক্ষে করতে আমার একবিন্দু দ্বিধা, সংকোচ নেই,

তাকে কতটা আপন করে নিয়েছি তবেই এই দাবি।

আমি আগামী মাসের প্রথম সপ্তাহেই যাব। আমার প্রীতি ও শুভেচ্ছা নিও। দিদিকে প্রণাম জানিয়ো...।

নিমগাছের তলায় বসেছিল বাণীব্রত, ঘাসের ওপর হাত-পা ছড়িয়ে আধশোওয়ার ভঙ্গিতে, আরামদায়কভাবে। চোখে তার অলস, উদাস, অর্থহীন দৃষ্টি। কখনও সামনের করবীগাছের ঝোপের ওপর, কখনও ঝোপ পেরিয়ে চিকরিকাটা রোদে-ভেজা পেঁপেগাছের পাতায়, কখনও বা নীল আকাশের বুকের ওপর দিয়ে যে তুলোটে মেঘগুলো ভেসে যাচ্ছে—তার ওপর বাণীর দৃষ্টি থামছে, ভেসে বেড়াচ্ছে, আবার এক থেকে অন্য আর এক বস্তুতে সরে যাচ্ছে। বাণী কখন যে এই নিরালা জায়গাটিতে এসে আশ্রয় নিয়েছে তা সে নিজেই জানে না। রোদের তাত বাড়লেও গাছের ছায়ায় বসে রয়েছে বলে বুঝতেও পারে না বেলা বেড়ে চলেছে।

কার যেন হাতের স্পর্শ লাগল তার গায়। একটু চমকে উঠে মুখ ফেরাল বাণী। কুমুদশংকর। কুমুদশংকর আনন্দের আগুনে জ্বলছে। চোখ দুটো খুশির আমেজে চঞ্চল, চপল।

বাণীর পাশে বসে পড়ল কুমুদশংকর।

'শুনেছ?' কুমুদশংকব বাণীর গায়ে ঠেলা দিল। বাণী তাকাল তার দিকে।

'আজ বিকেলে আমি চললাম। ছুটি, আমার ছুটি।' কুমুদশংকর ছোট ছেলের মতো খুশির দাপটে লাফিয়ে উঠে বসল।

'চললে?' বাণী প্রশ্ন করল।

'বিকেলে যাচ্ছি। আমার ছোট ভাই—সেই যে যার কথা বলতুম, কোলিয়ারির ম্যানেজার, সে এসেছে আমায় নিতে। এমন মজা, আমার মাও এসেছেন।' কুমুদশংকর হাতের সিগারেট দূরে ছুড়ে ফেলে দিল।

'আবার কবে আসবে?' বাণীব্রত জানতে চাইল।

'কী যে বলো তুমি!' কুমুদশংকর বাণীর নির্বুদ্ধিতার জন্যে সকরুণ সহানুভূতি জানালে, 'আমি আব আসব না। আমি সেরে গেছি। হাসপাতাল থেকে আমায় ছুটি দিয়ে দিয়েছে।'

'একেবারে?'

'হ্যাঁ—একেবারে। তোমাকেও দেবে।' কুমুদশংকর বাণীর মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ থেমে গেল; ঠোঁটের হাসি একটু-একটু করে নিভে এল। তার বদলে জেগে উঠল বেদনা-বিষণ্ণ কালিমা। চুপচাপ অনেকক্ষণ, বাণীর দিকে তাকিয়ে কুমুদশংকর তার কাঁধে হাত রেখে ধীরে-ধীরে বললে, 'তোমায় আর তপেনকে ছেড়ে যেতে আমার বড় কষ্ট হচ্ছে। তোমাদের আমি খুব ভালোবাসতাম।'

'আমি তোমায় চিঠি লিখব।' বাণী বললে।

'নিশ্চয় লিখবে। আমি চিঠির উত্তর দেব। ঠিক দেব।'

'তোমার ঠিকানা?'

'সে আমি তোমায় দিয়ে যাব।'

খানিকটা চুপচাপ। আবার এক সময় কুমুদশংকর কথা বলল, 'জানো আমার সমস্ত কথা মনে পড়ছে আজ। একদিন কলেজ থেকে বাড়ি ফিরে শরীরটা ভীষণ খারাপ লাগতে লাগল। সমস্ত মাথা ভার। কপালের শিরাগুলো ফুলে উঠেছে; চোখে অসহ্য যন্ত্রণা আর মাথার কথা কী বলব যেন মনে হচ্ছিল কেউ করাত দিয়ে চিরছে। খানিকপরে জ্বর এল। ক'দিন বুঝি জ্বরে ভুগলাম।

তারপর জ্বর ছেড়ে গেল, কিন্তু যাওয়ার সময় মাথাটা নিয়ে গেল; আমি পাগল হয়ে গেলাম। সারাক্ষণ আমার মনে হত কে যেন আমার গায়ে, হাতে, পায়ে ইলেকট্রিক তার ছুঁইয়ে দিচ্ছে। আমাদের বাড়িতে আমার বউদির এক বোন থাকতেন। একদিন আমি তাঁর ঘরে ঢুকে ক'খানা শাড়ি চুরি করে নিয়ে এলাম। তারপর আর একদিন মেয়েটির মাথায় মাখার তেল আর কানের দুল। ক'দিনের মধ্যেই জিনিসগুলো সমেত ধরা পড়ে গেলাম। আবার জ্বর হল। এল ডাক্তার। বললে পাগলা হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে। তারপব এলাম এখানে। প্রায় দেড়বছর হতে চলল। ডাঃ গুপ্ত, প্রণববাবু, এঁদের দয়ায়, যত্নে আজ আমি সেবে উঠেছি।...কিন্তু দেড়বছর—উঃ, এর প্রতিটা দিন কীভাবে কাটিয়েছি কী বলব! আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধব কেউ নেই, কর্মহীন অনন্ত অবসর; খালি ওষুধ, শক, আর যা মনে আসে বলে যাও। নরকযন্ত্রণাও বুঝি এর চেয়ে ভালো।'

কুমুদশংকর থামল।

বাণী কুমুদশংকবের হাত থেকে দেশলাইটা নিলে। কুমুদশংকর বললে, 'সিগাবেট খাবে?'

বাণী মাথা নাড়ল।

'না কেন, খাও না,' কুমুদশংকব পকেট থেকে একমুঠো সিগারেট বের বরলে, 'জানো অধ্যাপক হিসেবে ছাত্রীরা আমার পাণ্ডিত্যের আর সিগাবেটখোর হিসেবে ছাত্রেরা আমার রুচির প্রশংসা কবত। Again I will have the two.' কুমুদশংকব বাণীর পকেটে সিগারেটগুলো পুবে দিয়ে হাসল।

'তুমি আবার কাজ কববে!'

'শুধু কাজ নয়, বন্ধু, এবাব আমি বিয়ে করব! ডাক্তারদের মতে বিয়ে করাটা আমাব নাকি একান্ত দরকাব,' কুমুদশংকর হেসে উঠল খুব জোরে, 'তোমায় নেমন্তন্ন করব।'

'আমিও যাব।' বাণীব্রত হাসিমুখে উত্তর দিলে।

'আগে সেরে ওঠ তবে তো?'

'সেরে?' বাণীব্রত আচমকা থেমে গেল। ভাবতে লাগল।

হঠাৎ একসময় বাণীব্রত প্রশ্ন করলে, 'তুমি কতদিন এখানে ছিলে?'

'প্রায় দেড়বছর!'

'আমি?'

'ডিসেম্বর মাসে এসেছ এখানে।'

'এটা কি মাস?'

'আগস্ট!'

বাণীব্রত ভাবতে লাগল, ডিসেম্বর—আগস্ট, কতদিন সে এখানে আছে!

কুমুদশংকর উঠে দাঁড়াল।

'আচ্ছা ভাই, এখন চলি। সকলের সঙ্গে দেখা করতে হবে। বিকেলে খাবার সময় আবার তোমার সঙ্গে দেখা করব!' কুমুদশংকর যাওয়ার জন্যে পা বাড়িয়ে কী ভেবে বাণীর পাশে আবার বসে পড়ল। বাণীর একটা হাত ধরে খানিকক্ষণ চুপ করে থাকল। বললে তারপর, 'যাওয়ার সময় একটা কথা তোমায় বলি। রোগ হলেই কি লোকে মরে যায়! যায় না। বেশির ভাগই ভালো হয়ে ওঠে চিকিৎসা আর সেবায়। তুমিও ভালো হয়ে উঠবে। এই দেখো না, আমিও তো সেরে উঠলুম। মনমরা হয়ে থেকো না। ডাক্তারের কথা শুনো। মনে জোর আনো, বিশ্বাস আনো। আমি বলছি, তুমি ভালো হয়ে উঠবে, বাণী।'

কুমুদশংকর অনেকক্ষণ বাণীর হাত ধরে বসে থেকে শেষে নিঃশব্দে কখন উঠে চলে গেল।

কুমুদশংকর কখন যে উঠে গেছে বাণীব্রত জানে না। জানবার কোনও আগ্রহই তার নেই। কখনও হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে কখনও বা মুখ তুলে বসে থাকল বাণীব্রত। মানসিক অসাচ্ছন্দ্যের লক্ষ্মণ তার মধ্যে ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে উঠল। সামনের দিকে আর তাকাতে পারছে না ও। রোদের

ঝাঁঝে কেমন যেন ঝাপসা হয়ে আসে পেঁপে গাছের চিকরিকাটা পাতা; টনটন করে ওঠে তার চোখ দুটো। চশমা? চশমাটা যে কোথায় ফেলে এল?... বাস্তবিক চশমা না থাকলে অসুবিধে যে কত! একটু দূরের জিনিস তার চোখে ঝাপসা ঠেকে! মনে হচ্ছে চশমা না হলে বুঝি কিছু ভাবা যায় না। দৃষ্টির মতোই—ভাবনাগুলো ঝাপসা হয়ে এসেছে বাণীব্রতর। মুঠো করে মাথার চুল ধরে বার কয়েক টানল ও। বেশ লাগে চুল ধরে টানতে। আরও একটু জোরে পাক দিলে কেমন হয়? হাত নামিয়ে নিল বাণীব্রত। চোখ পড়ল হাতের ওপর। ইস—কেমন কাঁপছে দেখেছ হাত! জ্বর এল নাকি? ভয়—আমি কি ভয় পেলাম? আশ্চর্য! ভেবে পাই না কেন ভয় পাচ্ছি! এখানে কীসের ভয়! এখানে—এখানে- ।...কী, আমি কোথায়?

বাণীব্রত চোখের পাতা বুজে চুপ করে বসে থাকল।

বসে থাকতে-থাকতে পায়ের শব্দ শুনতে পেল বাণীব্রত। মৃদু দ্রুত শব্দ! একটু পরে নতুন গলার স্বর—খুব সরু—মিষ্টি গলা, 'আপনাকে নিয়ে আর পারা যাবে না!'

চোখ মেলে চাইল বাণীব্রত। ডোরা। পাতলা, ফরসা, ছোটখাটো গড়ন মেয়েটির। হালকা রঙের শাড়ি। কী রং ওটা—লাল, ব্রাউন, অরেঞ্জ? শাড়ির ওপর সাদা অ্যাপ্রন কিন্তু বেশ দেখায়। এমনভাবে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে ডাক্তার দত্ত! ডাক্তার দত্ত—না মিস দত্ত? ওকে আমি ডোরা বলেও ডাকতে পারি।

'অমন করে দেখছেন কী? উঠুন!' ডোরা মুখ টিপে হেসে আদেশ জানাল।

'কোথায়?' বাণীব্রত ডোরার চশমাটা লক্ষ করছিল। চশমা রয়েছে যার চোখে তার চিন্তা-শক্তি ঝাপসা হবে না নিশ্চয়।

'আজ কী বার মনে আছে?' ডোরা একটু মুখ নিচু আর বাঁকা করে ঘাড়টা একপাশে হেলিয়ে প্রশ্ন করলে।

'না। বুধবার—শুক্রবার— ।' বাণীব্রত ভাবছিল—ও কি আমায় বকবে নাকি! এমনভাবে তাকিয়েছে। ডোরার ঠোঁট দুটো কী সরু।

'বুধবার। আজ না আপনার বাথ নেওয়ার দিন?'

'মনে নেই।'

'মনে নেই বললে চলবে কেন? মনে আপনাকে রাখতে হবে।' আদেশের সুর ডোরা দত্তর গলায়।

বাণীব্রত দেখছিল—সরু সাদা গলা—All white and naked.

'কই, উঠুন! অনেক বেলা হয়ে গেছে।'

না বলতে পারল না বাণীব্রত। কুমুদশংকর বলেছে, ডাক্তারদের কথা শুনো। ভালো করতে যারা পারে তাদের ভালো করেই সব জানা উচিত। নয় কি? ডোরা জানে—নিশ্চয় জানে, কবে সে ভালো হয়ে উঠবে। ও কি বলতে পারে বাণীব্রত তার চশমাটা কোথায় রেখে এসেছে!

'আমি চশমার কথা ভাবছিলুম।'

'চশমা—কীসের চশমা!' ডোরা দত্তর গলায় বিস্ময়।

'আমার। চশমা ছাড়া ভাবা যায় না। আমার মনের মধ্যে জট পাকিয়ে গেছে।' বাণীব্রত হাত দিয়ে কপাল টিপে ধরল।

ডোরা কী যেন ভেবে নিল অল্পক্ষণ। বললে, 'উঠুন, আর দেরি করে না।'

বাণীব্রত উঠে দাঁড়াল।

পথ চলতে-চলতে বললে বাণীব্রত, 'কুমুদশংকরবাবু ছুটি পেয়েছেন?'

'হ্যাঁ, আজ বিকেলে তিনি বাড়ি ফিরে যাবেন।'

'আমি?'

'ভালো হয়ে গেলে আপনিও বাড়ি যাবেন।'

বাড়ি! তার বাড়ি কোথায়? বাণীব্রত মনে করবার চেষ্টা করল। কলকাতা—দেওঘর? কে আছে তার বাড়িতে? এরা বলে তার বাড়ি নাকি কলকাতায়। এখানে আসবার আগে সে ছিল দেওঘরে। বাড়িতে আমার কে আছে? ভাই, বোন, মা, বাবা? আশ্চর্য, তারা কেউ ওকে দেখতে আসে না কেন! ও হ্যাঁ সুদক্ষিণা আসে। বেশ লাগে মেয়েটিকে। অনেক রকম গল্প করে। এমন সব কথা বলে—মনে হয় হেঁয়ালি! আর—আর কী যেন। সেই ভাঙা-ভাঙা সুরকাটা গানের মতন কথাটা! মনে পড়েছে ঃ তুমি আমায় সত্যি চিনতে পারছ না? দেওঘরের কথা ভুলে গেলে? সেই মাঠ, বকুলগাছ!

চিনতে পারছে না। না, পারছে না। আর কী আশ্চর্য! বাণীব্রত দেওঘরে কী করছিল? অবাক হচ্ছি ভেবে দেওঘরে কী করছিলুম!

'কী ভাবছেন?' ডোরা প্রশ্ন করলে।

বাণীব্রত থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল, ভরা চোখে ডোরার দিকে তাকিয়ে, 'বলতে পারেন, আমি দেওঘরে কেন ছিলাম?'

'পারি।' ডোরার চোখের দৃষ্টি বাণীর দৃষ্টির সঙ্গে মিশল, 'দেওঘরে আপনি বেড়াতে এসেছিলেন বন্ধু-পরিবারের সঙ্গে।' ডোরার গলায় স্বর মৃদু হয়ে এল। প্রতিটা শব্দ সে উচ্চারণ করলে স্পষ্ট ভাবে। কোথায় যেন আচ্ছন্নতার আকর্ষণ ছিল তার কথা বলার ভঙ্গিতে, 'মনে পড়ছে না আপনার—সেখানে আপনি কী করেছেন?'

ধীরে-ধীরে বাণীব্রত তার মাথা নাড়লে। জ্বরের ঘোরে মানুষ যেমন ভাবে মাথা নাড়ে। অস্পষ্ট দুটি কথা তার ঠোঁটের পাশ থেকে ঝরে পড়ল, 'না। মনে নেই।'

'নেই নয়। মনে করুন। নীলা-নীলা কে?'

'জানি না।'

'দিব্যেন্দু?'

'কে দিব্যেন্দু?'

'ডাক্তার দিব্যেন্দু চক্রবর্তী—আপনার ভাই।'

'আমার ভাই!' বাণীব্রত অবাক হল, খুশি হল। আমার ভাই—আমার ভাই আছে। বলতে হবে কুমুদশংকরকে। হঠাৎ বললে বাণীব্রত, 'আমার ভাই আসে না কেন?'

'হাসপাতালে থাকার জন্যে।' ডোরার মুখে রহস্য ফুটে উঠল।

'আমায় দেখতে—।'

'ও!' ছোট্ট একটা শব্দ করে থেমে গেল ডোরা দত্ত। একটু পরে যেন তার হঠাৎ মনে পড়ল, এমনভাবে বললে, 'বাণীব্রতবাবু, আপনি বুঝি চশমা হারিয়েছেন?'

'হারিয়েছি কি না বুঝতে পারছি না। কোথায় যেন রেখেছিলাম।'

বাণীব্রত তখন অন্য কথা ভাবছে! এরা আমায় বাণীব্রত বলে। আশ্চর্য, মনোজ, মনোজ আমার নাম; বাণীব্রত নয়; তবু ওরা বলবে বাণীব্রত। আপত্তি জানালে বলে মনোজ তার নাম নয়, বাণীব্রতই তার নাম। কী কাণ্ড!...এরা কি নাম-ধাম সবই পালটে দিতে চায় নাকি? না, আর ভালো লাগে না এই মাথা-মোটাদের সঙ্গ। ভাইকে—কী নাম যেন তার ভাইয়ের।

'আপনি কী বললেন যেন নামটা?' বাণীব্রত প্রশ্ন করলে।

'নীলা!'

'চুলোয় যাক নীলা। ও নাম তো মেয়ের। আমার ভাইয়ের নামটা বলুন।

'দিব্যেন্দু। দিব্যেন্দু চক্রবর্তী।' আড়চোখে চাইল ডোরা।

বেশ নাম। দিব্যেন্দু! বাণীব্রত ভাবল—দিব্যেন্দুকে লিখতে হবে, হাসপাতাল থেকে নিয়ে

যাওয়ার জন্যে। এতদিন কেন সে লেখেনি? ফেব্রুয়ারি—কুমুদশংকর বলেছে। না ফেব্রুয়ারি নয়—ডিসেম্বর। ডিসেম্বর মাস থেকে এটা আগস্ট মাস। আমি গুনতে পারি। আট...আট মাস। এই আট মাস পাগলদের সঙ্গে একসঙ্গে থাকা কী সাঙ্ঘাতিক! আর ভালো লাগে না।

বাথটবের মধ্যে বসে বাণীব্রত ভাবছিল ঃ এত লোক এরা সবাই কি আমার মতন সমস্ত ভুলে গেছে? ওদের অতীত নেই? তপেন—ওই যে তপেন—বাচ্চা এক রত্তি ছেলে—কুড়ি বছরও বয়স হয়নি কুমুদশংকর বলে—ওই তপেনটাই বা কেন চোখে দেখতে পায় না? একদিন সকালে উঠে তপেন দেখল সব অন্ধকার; অন্ধ হয়ে গেছে সে। কত ডাক্তার, বড়-বড় নাম। কেউ চোখের, কেউ—। বাণীব্রত অজান্তে জল থেকে হাত তুলে তার মুখের ওপর বুলোলে। সেই ব্যথাটা যেন আরও বাড়ল দেখি। চোখের চারপাশে জমে বসেছে।...মাথার মধ্যে কোথায় যেন একটা পোকা দাঁত বসিয়ে কুরছে। চশমা—আ, চশমা না থাকার এত বিপদ!

বিশ্রী চিৎকার করে কে যেন কেঁদে উঠল। চমকে মুখ ফেরাল বাণী। সেই বদ্ধ পাগল প্রৌঢ় বিহারী ভদ্রলোক। নতুন এসেছে হাসপাতালে। সব সময় চিৎকার করছে।

'ডাকু হ্যায়—ইয়ে সব ডাকু হ্যায়—ছিনা লিয়া...বিলকুল কপাইয়া হামারা চোরি করকে পানি মে গিরা দিয়া—দে দেও—আগর...' লোকটা ভেউ-ভেউ করে কেঁদে ফেলল।

'আর আমি পারছি না —উঠিয়ে নাও—কী গরম...ও বাবা—আর পারছি না—পুড়ে গেল—ফোসকা পড়ে গেল সারা গায়ে—হারামজাদি মাগি দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে মজা দেখছে!'

'চুপ করুন, বেশি চেঁচামেচি করলে আরও গরম জল গায়ে ঢেলে দেব।' তৃপ্তি—নার্স তৃপ্তি ধমক দিল।

ওই আর এক লোক—এমন বিশ্রী-বিশ্রী কথা বলে!

বাণীব্রতর পাশে এসে দাঁড়াল মিসেস নাগ।

'নিন, খেয়ে নিন।'

'কী?'

'ওষুধ।'

'সাদা?'

'দুধের সঙ্গে মেশানো আছে।'

বাণীব্রত ওষুধ খেয়ে নিল। শাওয়ারের জল ঝরছে পাশের বাথটবে। কী ঝিরঝিরে ফোঁটা-ফোঁটা জল—হিস-হিস শব্দ!

'একটা কথা।'

'কী?' মিসেস নাগ ফিরে দাঁড়াল।

'এখানে আর আমি থাকতে পারছি না। সমস্ত মাথা কেমন করছে। আমাকে আমার কেবিনে যেতে দিন।'

মিসেস নাগ ভালো করে লক্ষ করল বাণীকে। কী যেন ভাবল মনে-মনে। বললে, 'আচ্ছা দাঁড়ান, আমি ডাক্তার দাশগুপ্তকে জিগ্যেস করে আসছি।' মিসেস নাগ চলে গেল।

বিচিত্র কলরবভরা এই জায়গা। কী যেন বলে একে এরা—হাইড্রোপ্যাথি ট্রিটমেন্ট। চিকিৎসার কী রূপ! এত চিৎকার গোলমাল আর কী বিশ্রী এই এক-একটা লোকের ব্যবহার!

ওই দেখো। বাণীব্রত দেখতে লাগল। কে একজন বাথটব থেকে উঠে পালাচ্ছিল। পড়ে গেল ছুটতে গিয়ে। নার্সরা তাড়াতাড়ি গিয়ে তাকে ধরে তুলল। লোকটার মাথা কেটে রক্ত ঝরছে।

রক্ত। লাল রক্ত—মুখটা ভিজে গেছে রক্তে। করুণভাবে চিৎকার করছে। কিন্তু রক্ত—Red, colour of the blood—Red, colour of the teeth—White, colour of the hair—Black...টা, টা...টাটু...টুকলু...তুলতুল।

বাণীব্রতর চোখের সামনে বাথশাওয়ারের জলের ঝরনা হঠাৎ কেমন যেন গোল হয়ে ঘুরতে লাগল পাক খেয়ে-খেয়ে। অনেকটা সেই ঘূর্ণি আতসবাজির মতো। অস্পষ্ট হয়ে আসতে লাগল জল-রেখার আবর্ত। একটু-একটু করে সেই অস্পষ্টতার মধ্যে থেকে কার যেন ছায়া ফুটে উঠতে লাগল। দুর্বল রেখায় খাপছাড়া-ভাবে আঁকা ছাই রঙের ছবির মতো ফুটে উঠল একটি মুখ ঃ এলোমেলো চুল, দুটি বিনুনির আভাস; ছোট্ট কচিমুখ, দুষ্টু-দুষ্টু চোখ আর হাসি। তুলতুল, পিসিমা কেন 'আনটি'? আমি যে 'আনটি' বলি। তুলতুল—কী সুন্দর নাম তোমার খুকি।. .ছবিটা—দাগ কাটা আয়নার মতো কিম্ভুতকিমাকার হয়ে এল। তুলতুল...আইভি—আইভি—মিত্র। বাবার নাম? জানি মশাই জানি।...বাণীব্রতর মাথার মধ্যে পোকাটা বুঝি সবকটা দাঁত দিয়ে কামড়ে দিল। উঃ। মনে পড়েছে—অমরবাবুর মেয়ে—ইংরেজিতে তার মাসি তাকে রং চেনা শেখাত দোলনায় দুলতে-দুলতে। ডাক নাম তুলতুল.. ভালো নাম আইভি মিত্র। কোথায় এই খুকিটিকে দেখেছিল বাণীব্রত? কী করে ভাব হল?

বাণীব্রতর স্মৃতি আবার নীরব হয়ে গেল। এক মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে গেল আচমকা। কালো পরদা এসে ঢেকে দিল অতীত। শাওয়ারের জলের হিসহিস শব্দ ভেসে উঠল।

'চাকুসে নেহি রে ভাই—আঁখসে দিল তোড়া।' বিহারী ভদ্রলোক চোখ টিপে হাসছে। বীভৎস তার মুখভঙ্গি।

'বাড়ি ভাড়া না দিলে তুলে দেবে, ঘাড় ধরে মারতে-মারতে বের করে দেবে। মাইরি আর কি? আমি বাড়িউলির বেয়াই না।' আপনমনে বকে চলেছে আর একজন।

তপেন তৃপ্তির হাত ধরে উঠে আসছে বাথটব থেকে। কে যেন গান গেয়ে উঠল—করাত-চেরা গলায় ঃ

'সখি কেবা শুনাইল শ্যাম নাম...না...ম কানেরও...।'

'তোমরা কেউ করো না মানা। রাত দুপুরে ঘুম ভাঙিয়ে খুকু খাবে ছানা।'

ছড়া। তুলতুলের মুখে সব সময় লেগে থাকত ছড়া। সেলুলয়েডের পুতুল বুকে করে দোলাতে-দোলাতে ছেলে ভুলোনো ছড়া কাটত তুলতুল। চালাক-চতুর বুদ্ধিমতী মেয়ে। পিসি সে বলবে না। বলবে 'আনটি', মাসি তাকে শিখিয়েছে। বলত কী, 'ঘুড়ি লাটাই চুরি করে পালিয়ে গেল বর। ছাদনা-তলায় নাতনি আমার বাঁধাল পাঁচ জ্বর। ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে হল খুঁজতে নতুন বর। অবশেষে পেলাম খুঁজে...।' কোথায়, কোথায় খুঁজে পেল তাকে তুলতুল? আহা, সুন্দর একটা মিল ছিল শেষে—শিলচর, ঘুন্টিঘর, ঘর...ঘর.....দেওঘর।

বাণীব্রত আনন্দে অদ্ভুত একটা চিৎকার করে উঠল।...মনে পড়েছে। দেওঘর। তুলতুলকে ইংরিজি আর রং চিনতে শেখানো। ছড়া। দোলনা। 'আনটি'। মাসি। সুদক্ষিণা।

সুদক্ষিণা। সুদক্ষিণা দেওঘরের গল্প বলে। কিছুতেই ভাবতে পারছি না—মনেও আসে না ঃ বাণীব্রত মনে-মনে ভাবে দেওঘরে আমি কী করছিলাম। সুদক্ষিণা কে?

মিসেস নাগ অবশেষে এসে পড়ল।

'উঠুন!'

মুখ তুলে তাকাল বাণীব্রত। মিসেস নাগ বোধহয় আবার কোনও ফ্যাসাদ জুটিয়ে আনল। বিরক্তি ফুটে উঠল বাণীব্রতর দৃষ্টিতে।

'ডাক্তার দাশগুপ্ত বললেন, আপনি ইচ্ছে করলে কেবিনে ফিরে যেতে পারেন।'

পারি বইকী, অবশ্যই পারি—উঠে দাঁড়াতে-দাঁড়াতে ভাবল বাণীব্রত, ইচ্ছে করলে আমি বাড়ি ফিরে যেতে পারি। একটা চিঠি লেখার যা কষ্ট। তারপর—।

*

আর একদিন।

দুপুরে হঠাৎ ঝড় উঠল। হাওয়ায়, পাতায়, ধুলোতে মিলে মিশে সে এক তাণ্ডব। গাছের ডাল ভাঙল, ধুলোব ঝড়ে ঘর গেল ভরে। ফাঁকা মাঠে ঘূর্ণি হাওয়ায় পাতা উড়তে লাগল।

নিজের কেবিনে চুপটি কবে বসে বাণীব্রত ঝড় দেখছিল। কাঁঠাল গাছের পাতা-কাঁপা শব্দে আর পাখিদেব পাখা ঝাপটানোব মাঝে কোথায় যেন হাতছানি আছে। সে হাতছানি পেয়েছে বাণী। ওইরকমই একটা ঝড় উঠেছে তার মনে। তার নাম নেই, ধাম নেই—স্থান, কাল, পাত্র কিছুই না। শুধু ঝড়। ঝড়ের গর্জন বুঝি কানেই শুনতে পায় বাণী। বুঝতে পারে এবার আকাশ বাতাস মাতাল কবে দুর্যোগ দেখা দেবে। তাই দিক। ঈশ্বর, তাই হোক। এ বোবা, পাথর চাপা, অজ্ঞাত অতীতকে তুমি ভেঙে চুরে, তছনছ করে দাও। একটি বার। শুধু একটি বার। আমি কে? কী আমার পরিচয়? কোথায় আমার বাড়ি। আমাব ভাই বোন? তাদের পরিচয়? সুদক্ষিণা? দেওঘর? তুলতুল? ভালো হয়ে উঠবে তুমি—কুমুদশংকর বলেছে। ডিসেম্বর থেকে আগস্ট। হাসপাতালে আট মাস কেটে গেল।...

'এই যে, গালে হাত দিয়ে বসে আছেন?' ডোরা দত্ত সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। সাদা অ্যাপ্রন গাযে। ফরসা চশমার ঝিলিক তোলা ছোটখাটো একটা মুখ, বোকা-বোকা চোখ, পাতলা ঠোঁট। এত নরম মনে হয় ওর গা। কথাবার্তাগুলো শুধু যদি আরও একটু নবম হত। এমন সুন্দর মিষ্টি গলায় ও যে কী করে কথা বলে ডাক্তারি চালে!

'কী দেখছেন?'

'আপনাকে।' বাণীব্রত গাল থেকে হাত সরিয়ে নিল।

'আমায! আমায় দেখবাব কী আছে?' বিলাতি হাসি হাসল ডোরা।

'বেশ দেখতে আপনাকে। বেখাপ্পা, বেঢপ। কপাল ছোট, থুতনি চ্যাপটা, ছোট চোখ—বোগা—বোকা—' বাণীব্রত হাসতে লাগল অদ্ভুতভাবে।

ডোরা সন্দেহ কবল-- কোনও কাবণে আজ বাণীব্রতব মেজাজ বিগড়েছে। ভেতরে-ভেতবে প্রস্তুত হয়ে নিতে লাগল ও।

'বেশ, আমি না হয় দেখতেই খারাপ—কিন্তু তা' বলে তো আর হতকুৎসিত নই?'

'কুৎসিত কে নয়?'

'সেকি—সকলেই কুৎসিত!'

'মানুষ মাত্রেই।'

'আপনি?'

'আমি কি মানুষ নই?'

ডোরা দত্তর বুক বুঝি একটু কেঁপে উঠল। ভেসে যাওয়া মেঘের মতন তার মুখের ওপব দিয়ে সরে গেল এক ফালি ছায়া।

'একটু বেহালা বাজান না শুনি!' হাসল ডোরা দত্ত। ঘবেব কোণ থেকে বেহালাটা এনে বাণীর কোলে রাখল।

বেহালা তুলে নিয়ে চুপ করে বসে থাকল বাণীব্রত।

খানিকটা সময় চুপচাপ কেটে গেল।

'কী হল?' বললে ডোরা।

টুং-টাং করে মৃদু ক'টা শব্দ উঠল। আনমনে আঙুল দিয়ে আঘাত করল বেহালার তারে। বললে বাণীব্রত, 'ঠাট্টা করছেন আমার সঙ্গে?'

'না-না, ঠাট্টা কেন করব?' ডোরা বাণীব্রতর পাশে ঘন হয়ে সরে এল।

'ঠাট্টাই তো! আমি কি বুঝি না? সুর তুলতে গিয়ে বেসুরো বাজাব। পূরবীর সঙ্গে সাহানা

মিশে যাবে!' বাণীব্রত করুণভাবে বললে।

'তা কেন? আপনার কি কিছুতেই একটা রাগ বা রাগিনী পুরো মনে থাকে না?'

'না। চেষ্টা করি—পারি না। ও ঠিক মিশে যায়।'

'ও!' একটু থেমে—'আচ্ছা, আমি যদি গান গাই? তাহলে?'

'কী করে বলব?'

'চেষ্টা করুন না?'

ডোরা কেবিনের দরজার কাছে এসে চারদিকে একবার ভালো করে দেখে নিল। দরজা দিল ভেজিয়ে। তারপর বাণীব্রতর পাশে এসে বিছানায় বসল।

'খুব আস্তে-আস্তে আমি গাইছি। আপনি বাজান।'

বাইরে ঝড়ের গর্জন। কেবিনের ভেতরে মুখোমুখি ডোরা আর বাণীব্রত, সুর আর স্বর। সহজ একটা রাগিনী বেছে নিয়েছিল ডোরা। বাণীব্রতর যাতে কষ্ট পেতে না হয়। সুর না কাটে। ...তবু সুর কাটল।

'ভুল হল!' ব্যথাহত হয়ে বললে বাণী।

'হল! আপনি পুরোপুরি মন দিতে পারছেন না।'

'আমি পারি না।'

'পারেন। আমি বলছি—আপনি পারেন।' ডোরা বাণীর হাত থেকে বেহালা নিয়ে বিছানার ওপর রাখল। ঘন হয়ে এল আরও। বাণীব্রতব চোখে চোখ রেখে তাকিয়ে ডোরা বললে, 'তাকান তো আমার দিকে।' ডোরার গলায় এমন একটা মাদকতা মাখানো আদেশ ছিল যে বাণীব্রত না তাকিয়ে পারল না।

তাকিয়ে থাকতে-থাকতে ডোরার দৃষ্টি যেন বদলে গেল। ধীর, স্পষ্ট, সংযত গলায় বললে সে, 'বলুন, আপনার নাম?'

'মনোজ।'

'না। আসল নাম কী আপনার?'

'মনোজ।'

'না। ঠিক করে বলুন। এখানে কেউ নেই। আপনার নাম?'

'মনোজ।'

'মনোজ নয়, বাণীব্রত।'

'বাণীব্রত।'

'বাড়ি?'

'দেওঘর।' বাণীব্রত মন্ত্রমুগ্ধের মতো বলে যেতে লাগল।

'দেওঘরে আপনি বেড়াতে এসেছিলেন বন্ধুর সঙ্গে। বাড়ি আপনার কলকাতায়।

'কলকাতা।'

'দেওঘরের কথা মনে করার চেষ্টা করুন : আপনি, আপনার বন্ধু বিভূতিবাবু, তাঁর স্ত্রী গায়ত্রী—'

'তুলতুল।' ডোরাকে বাধা দিয়ে বললে বাণীব্রত আচমকা।

'কে তুলতুল?'

কে তুলতুল। কী কাণ্ড দেখেছ? কে তুলতুল তাই বলতে হবে। বাণীব্রত অবাক হচ্ছিল ডোরার কথা শুনে। তুলতুল কে? কে আবার? একটা ছোট্ট মেয়ে। ছড়া কাটত, ফ্রক পরে বেণী দুলিয়ে দোলনায় দুলত।

'কে তুলতুল?' ডোরা আবার প্রশ্ন করলে।

'ছোট্ট মেয়ে। ছড়া কাটত সারাদিন। পিসিকে বলত আনটি।' বাণীব্রত যেন চোখের সামনে দেখতে পেল তুলতুলকে।

'ও। আর কাউকে মনে পড়ে না?'

বাণীব্রত মাথা নাড়ল। ডোরা কী ভেবে বাণীব্রতর মুখের কাছে আরও ঘন হয়ে এল। বাণীব্রতর কানের কাছে ডোরার ঠোঁট নড়তে লাগল—আস্তে-আস্তে, থেকে-থেকে।

'আপনার ভাই ডাঃ চক্রবর্তী। মনে করুন—মনে করুন তাকে। ডাঃ চক্রবর্তী।...একদিন আপনার বন্ধুর বউয়ের অসুখ করল। ডাক্তার এল দেখতে। তারপর?'

'ভাই? কী মুশকিল। আমার ভাই তো তোমার কী? সে বুঝি ডাক্তার? অসুখ হলে ডাক্তার আসবে না তো আসবে কে, ধোপা!'

'রাত হল। অনেক রাত। আপনি চুপি-চুপি বাড়ি থেকে বেরুলেন। পকেটে পিস্তল।' বাণীব্রতর কানে ডোরার ঠোঁট মিশে এল।

বাণীব্রত সেই কথার সুরে কেমন যেন অভিভূত হয়ে ওঠার উপক্রম করল। অনুভব করল কোথায় একটি অস্বস্তি জমে উঠে সর্বাঙ্গে ধীরে-ধীরে ছড়িয়ে যাচ্ছে।...আধো-ঘুমের মধ্যে সুদূর থেকে ভেসে আসা ঝড়ের সুরে নিজের অস্তিত্ব যেমন তলিয়ে গিয়ে অস্বস্তি জমা হয়—এও তেমনি।

সাপ চলার সুরে প্রতিটি বাক্য উচ্চারিত হচ্ছে। আর প্রতিটি বাক্য অর্থবহ—মোহসঞ্চারী, উত্তপ্ত।

'রাত। অনেক রাত। পিস্তল পকেটে করে আপনি চুপিচুপি এলেন ডাঃ চক্রবর্তীর বাড়িতে। মনে পড়ছে না? পড়বে। নিশ্চয় মনে পড়বে। তারপবের কথা মনে করুন। ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে আপনি আর আপনার ভাই ডাঃ চক্রবর্তী। তারপর?'

বাণীব্রত নীরব, নিশ্চল।

'তারপর?' ডোরা শব্দ দিয়ে ওর মনের দরজায় আবার আঘাত দিলে। ভেঙে দিতে চাইল কঠিন অর্গল।

কেবিনের ভেজানো দরজা খুলে ঘরে ঢুকল মিসেস নাগ। ঘরের মধ্যেকার অবস্থা দেখে বেচারা হকচকিয়ে গেছে। বিমূঢ়ের মতো খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে অবশেষে মিসেস নাগ শব্দ করে কাশল।

কাশির শব্দে চমকে উঠে মুখ ফিরিয়ে চাইল ডোরা। ক্ষণিকের জন্যে তার মুখের রক্ত কে যেন শুষে নিল।

'ডাক্তার দাশগুপ্ত বললেন, বড় দেরি হচ্ছে। তিনি অপেক্ষা করছেন, শীঘ্রি আসুন।'

সামলে নিল ডোরা নিজেকে। ঠোঁটে হাসি টেনে এনে বলল, 'ভদ্রলোক একটু মুষড়ে পড়েছিলেন হঠাৎ। সামলে নিয়েছেন। এখুনি আসছি।'

মিসেস নাগ বিদায় নিল।

'আসুন।' ডোরা দাঁড়িয়ে উঠে বাণীব্রতকে ডাকলে।

বাণীব্রত উঠল না। মুখে চোখে এমন একটা অসহায় ভাব ফুটে উঠেছে—ওকে দেখলে কষ্ট হয়।

ডোরা আবার ডাকলে, 'আসুন—দেরি করবেন না।' হাত ধরে টানল ডোরা।

বাণীব্রত উঠল। উঠবার সময় তার হাত পড়ল বেহালাটার ওপর। বিছানা থেকে নেমেই খপ করে বেহালাটা তুলে আঁকড়ে ধরল বুকের কাছে।

অবাক হয়ে ডোরা বললে, 'ও কী? ওটা থাক।'

সজোরে মাথা নাড়ল বাণীব্রত। আরও জোরে আঁকড়ে ধরল বেহালাটা বুকের ওপর।

বাণীব্রতকে নিয়ে ডোরা এসে দাঁড়াল একটা ছোট ঘরে। ঘরটা দেখার সঙ্গে-সঙ্গে বাণীব্রত মনে করতে পারল, এর আগে শক নিয়েছে সে এখানে। নতুন করে ঘাবড়াবার কিছু নেই। বাণীব্রত

আর ভাবে না। ঘরের মধ্যে কেমন একটা গন্ধ। বাণীব্রতর মনে হল গন্ধটা যেন আঁশটে মতন। দেওয়ালে ঘোলাটে লাল কাচ বসানো।

'শুয়ে পড়ব?' বাণীব্রত বললে।

'হ্যাঁ, শুয়ে পড়ুন।' সামনের নার্সটি বললে।

অপারেশন টেবিলের মতন একটা টেবিল ছিল সামনে। বাণীব্রত জানে, ওর ওপর গিয়ে শুয়ে পড়তে হবে। টেবিলে শোওয়ার জন্যে ধীরে-ধীরে এগিয়ে গেল ও।

টেবিলের ওপর উঠে বসতেই কিন্তু আর এক বিপদ ঘটল। ডোরা দত্ত ওর হাত থেকে বেহালাটা নেওয়ার জন্যে হাত বাড়ালে।

'দিন।'

'না।' বাণীব্রত সজোরে মাথা ঝাঁকুনি দিল।

'না কী? টেবিলের ওপর আপনাকে শুতে হবে যে।' ডোরা বেহালাটা হাতে করে ধরল।

এক টান মেরে ছাড়িয়ে নিয়ে বাণীব্রত বললে, 'ছোঁবেন না।'

'What's the trouble?'

বাণীব্রত তাকাল। একটা লোক টেবিলের সামনে এগিয়ে আসছে। ডাঃ দাশগুপ্ত। ডাক্তার। সাদা কোট পরা ডাক্তার। বাণীব্রত চিনতে পারল।

'কী হল? এই যে বাণীব্রতবাবু? তারপর কেমন আছেন আজ?'

'ভালো।'

'বেহালাটা দিন।' ডোরা এবার একটু রেগে উঠেছে মনে হল।

'না।' বাণীব্রত পিঠের পাশে আড়াল করলে তার বেহালা।

প্রণব বেশ খানিকটা অবাক হয়ে বাণীব্রত আর ডোরাকে দেখতে লাগল। কী ব্যাপার? হঠাৎ।

ডোরা ইঙ্গিতে সামনের আর-একটি নার্সকে ডেকে বাণীব্রতকে ধরতে বলল।

নার্সটি পিছন দিকে যেতেই বাণীব্রত হাত ঘুরিয়ে বুকের কাছে টেনে নিল বেহালা। ডোরার দিকে ধকধকে চোখ নিয়ে তাকিয়ে রয়েছে ও।

বোধহয় আত্মসংবরণ করা একান্তই কঠিন হয়ে পড়ছিল। তাই অনেকটা মরিয়া হয়ে ডোরা বাণীব্রতর বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বেহালাটা কেড়ে নেওয়ারে চেষ্টা করলে। পারলে না।

'Stop it.' প্রণবের কঠিন গলা। ফিরে এল ডোরা। পিছনের নার্সটিও নিজের জায়গায় গিয়ে দাঁড়াল।

'What's the matter!'

'বেহালাটা কিছুতেই উনি দেবেন না।' ডোরা বললে। জোরে-জোরে নিশ্বাস নিচ্ছে সে, চোখ মুখ লাল হয়ে উঠেছে।

'আচ্ছা, আমি দেখছি। আপনি তেরো নম্বর পেশেন্টের সেনসোরিয়াম টেস্টটা সেরে নিনগে যান।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও ডোরা চলে গেল। যাওয়ার আগে কঠিন দৃষ্টিতে দেখে নিল বাণীব্রতকে।

ডোরা চলে যেতে প্রণব বাণীব্রতর পাশে এসে দাঁড়াল। হেসে ওর কাঁধে হাত রেখে বললে, 'আপনার বেহালাটা আমায় দিন। এখন আপনি এই টেবিলের ওপর শুয়ে পড়বেন সেই আগের মতো। জানেন তো সবই।'

প্রণব টেবিলের পাশ থেকে আলগা ঝুলোনো একটা স্ট্র্যাপ তুলে নিল।

বাণীব্রত আপত্তি করলে না। বেহালা তুলে দিল প্রণবের হাতে।

প্রণব বেহালাটা নিয়ে একজন নার্সের হাতে দিল।

'শুয়ে পড়ুন।'

বাণীব্রত শুয়ে পড়ল। নার্স তার বুক থেকে পা পর্যন্ত তিনটে চওড়া আলগা স্ট্র্যাপ জড়িয়ে দিল।

বাণীব্রতর পিঠের তলায় একটা বালিশের মতো প্যাড গুঁজে দিতে-দিতে বললে প্রণব, 'মিস দত্তর ওপর অনর্থক চটে গেলেন কেন? তিনি তাঁর কর্তব্য পালন করছিলেন।'

পিঠের তলায় প্যাড দেওয়া শেষ হলে বাণীব্রতর ভীষণ অস্বস্তি বোধ হতে লাগল। পিঠটা এমন এক অস্বস্তিকর ভঙ্গিতে রাখা হয়েছে। বাণীব্রতর চোখের দৃষ্টি আটকে থাকল সেই ঘোলাটে লাল কাচের গায়। দেওয়ালে কাচটা গাঁথা। তুমি চেষ্টা করলেও আর চোখ ফেরাতে পারবে না। বাণীব্রত জানে এখুনি ওই কাচটা জ্বলতে থাকবে। আর তারপর সে আর কাচ জ্বলা দেখতে পাবে না। কে একজন—ও নিশ্চয় নার্স। বাণীব্রত বুঝতে পারল, বিকট-গন্ধ মলম ওর কপালের পাশে রগে ঘষে দেওয়া হচ্ছে। কী ঠান্ডা মলম।...আ—এই যে এইবার এইবার। হ্যাঁ, মাথায় আটকে দিয়েছে। কী অদ্ভুত জিনিস। টেলিফোন অপারেটাররা সেই যেমন মাথার ওপর দিয়ে কানে ঝুলোনো পরে অনেকটা তেমনি। কপালের দুপাশে রগে আটকে গেল।

কথা বলবার জন্যে বাণীব্রত মুখ খুলতেই প্রণব রবারের একটা গোঁজ ওর মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল।

'That's well! Thank you! Be ready, nurse!'

...এক...দুই তিন...মাত্র ক'টা মুহূর্ত—তারপরই বাণীব্রতর চেতনায়, স্নায়ুতে বিদ্যুতের তীব্র একটা শিহরণ। হাত-পা গুলো বাঁধন থেকে ছেঁড়বার জন্যে মরিয়া হয়ে শেষ চেষ্টা করল ও। ...তীব্র বিকট চিৎকার। সব নিস্তব্ধ...মাত্র একটা বৈদ্যুতিক আঘাত...বাণীব্রতর সমস্ত ভাবনা, দুঃখ, উত্তেজনা শান্ত হয়ে গেল।

কালো মেঘের ঘনঘটার পালা কবে একদিন ফুরিয়ে গেল। আকাশ জুড়ে হাসতে থাকল উজ্জ্বল নীল স্রোত, স্বচ্ছ রোদ। বাতাসে কোথায় যেন একটা গান গুনগুনিয়ে উঠেছে—শ্যামল প্রান্তরের সবুজে সে গানের ধুয়া।

শরৎকালের এমনি এক সকাল। বাণীব্রত তার কেবিনে একলা বসে একটা বইয়ের পাতা উলটে যাচ্ছিল। সামনের জানালা খোলা। চোখ তার বইয়ের পাতা থেকে কখন সরে এসে থেমে গেছে হাসপাতালের রাস্তার ওপর।

ক'টা বাজে এখন? বাণীব্রত ভাবছিল : আটটা কি বেজে গেছে? বোধহয় এখন বাজেনি। একটা ঘড়ি থাকলে বেশ হত। ইচ্ছেমতো সময় জানা যেত।

রাস্তার ওপর মূর্তি ভেসে উঠল; অস্পষ্ট দুটি নরনারী। ইজিচেয়ার থেকে উঠে বাণীব্রত জানালার কাছে এসে ঝুঁকে তাকাল। না, চেনা যাচ্ছে না। চোখের জন্যে দূরের জিনিস কিছুই সে দেখতে পায় না। কতবার চশমার কথা বলেছে।...কারুর সেদিকে একটু নজর নেই। এ কেমন কথা। তার চশমাটা ফেরত দিয়ে দিলেই তো সব ঝঞ্ঝাট চুকে যায়। এখন দেখছি ডোরাকে বলে কিছু হবে না। প্রণববাবুকেই বলতে হবে।

ডোরা মেয়েটি যেন কেমন। কী যে বলে তার মাথা-মুণ্ডু নেই। দেওঘরের এত কথা সে জানল কী করে—কে জানে। সে বলে আমি যখন দেওঘরে ছিলুম, সেও ছিল, সেখানে। আমার সঙ্গে নাকি খুব ভাব হয় তার। কত গল্প, বেড়ানো, গান। তারপর একদিন...

সেই একদিনের কথা নিয়েই যত ফ্যাসাদ। আসলে ডোরা কী যে বলতে চায় বাণীব্রত ঠিক

বুঝতে পারে না। মাঝরাতে পিস্তল হাতে করে সে কোথায় গিয়েছিল। কেন গিয়েছিল। কিছুই মনে পড়ে না বাণীব্রতর। অথচ যখন-তখন কানের কাছে ডোরা তাকে ওই একটা কথাই বলবে। কেন যে ডোরা এসব কথা বলে কে জানে। আর কী আশ্চর্য। বাণীব্রত কতবার—বোধ হয় হাজার, লক্ষ কোটিবার শুনল—তার ভাই, বন্ধু, বউদি—এদের নাম, এদের বিষয়ে কত কথা—কিন্তু কাউকে তার একবারের জন্যেও মনে পড়ল না। শুধু তার মনে পড়ে তুলতুলকে—আর বুঝি খুব অস্পষ্টভাবে আর একজনকে। মনে ঠিক পড়ে না—ভাবতেও পারে না বাণীব্রত তার মূর্তি। ধোঁয়াটে, তালগোল পাকানো কেমন যেন একটা অতি সূক্ষ্ম অনুভূতি দিয়ে তাকে উপলব্ধি করতে পারে বাণীব্রত।

কে সে। ডোরা, সুদক্ষিণা?

সুদক্ষিণা—সুদক্ষিণা ঃ বিড়বিড় করে বাণীব্রত উচ্চারণ করলে। রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকল আগের মতোই।

সুদক্ষিণা এখনও আসছে না। আটটা কি বাজেনি? বেশ লাগে তার এই সুদক্ষিণাকে। এত মিষ্টি স্বভাব, কেমন নরম তার চাউনি। আমি তার কে? সে বলে আত্মীয়, বন্ধু। বোধ হয় তাই। এত মায়া, এ আর কারুর নেই.

'কে!' বাণীব্রত চমকে উঠে মুখ ফেরাল।

'কার কথা ভাবা হচ্ছে?' বাণীব্রতর পিঠ থেকে হাত সরিয়ে ডোরা ঠোঁটের কোণে বাঁকা করে হাসল।

'ও, আপনি!'...বাণীব্রত হাতের বইখানা ছুঁড়ে দিল বিছানার ওপর।

'কী ভাবছিলেন অত তন্ময় হয়ে? গায়ে হাত না দিলে হুঁশ হত না বোধ হয়।' ডোরা কাচ ভাঙার মতো শব্দবহুল তীক্ষ্ণ হাসি হেসে কথা শেষ করল, 'নিশ্চয় বান্ধবীর কথা ভাবছেন!'

বাণীব্রত বোধ হয় পছন্দ করল না অমন হাসি। জানালা থেকে সরে এসে ইজিচেয়ারে বসে পড়ল আবার।

একটু অপেক্ষা করে ডোরা বললে, 'কই, কথার উত্তর দিলেন না?'

বাণীব্রত চোখ তুলে তাকাল শুধু।

'কথা বলবেন না বুঝি?'

বাণীব্রতর চশমা নেই, চোখও বোধহয় নেই। থাকলে দেখতে পেত ডোরার ফরসা মুখটা লাল হয়ে উঠেছে। সম্ভবত তার পাতলা ঠোঁটের কোণে এক ফালি অভিমান ফুটে উঠেছে।

বাণীব্রত কিছু না বুঝলেও কথা বললে, 'কী বলব?'

'জানেন না কী বলতে হয়?'

বাণীব্রত মাথা নাড়লে।

ডোরার গালে মাংসপেশির কুঞ্চন দেখা দিল। বিদ্রুপে ক্ষুরধার হয়ে উঠল তার রসনা, 'জানেন সবই। বান্ধবীটির সঙ্গে সন্ধেবেলায় বাগানে বসে গল্প করার সময় পাগলামির বাষ্পও তো আপনার মগজে থাকে না। দিব্যি তার হাত ধরে হাসপাতাল থেকে পালিয়ে গিয়ে নিরালা নির্জন জায়গায় ঘর বাঁধার ষড়যন্ত্র করেন! যত বুঝি মাথার গোলমাল আমাদের কাছে?' সাপের মতো হিংস্র হয়ে উঠল ডোরার দৃষ্টি।

'হাসপাতাল আমার আর ভালো লাগে না!' বাণীব্রত সহজভাবে বললে।

'তা জানি।'

'আপনার কথাবার্তা যেন কেমন। কিছু বুঝতে পারি না।'

'সবই পারেন। যেটুকু পারছেন না—তাও শীঘ্রি বুঝতে পারবেন।' ডোরা হাতের চিঠিখানা বাণীব্রতর কোলে ছুঁড়ে দিয়ে দ্রুত পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ডোরা চলে যাওয়ার পর বাণীব্রত চিঠি হাতে চুপ করে বসে থাকল।

কেন ও এমন করে? বাণীব্রত ভাবছিল। অযথা অশান্তি সৃষ্টি করে লাভ কী? ডোরা যেন কেমন হয়ে গেছে আজকাল। আগে প্রথম-প্রথম ডোরা যখন হাসপাতালে এল তখন এই মেয়েটিকে বেশ লাগত ওর। বাণীব্রত সে-সব কথা মনে করতে পারে সহজেই। অনেক যত্ন, সাহায্য, সহানুভূতি, জুটেছে তার কাছ থেকে। বলতে গেলে ডোরা তখন যেন ঠিক মেয়ে—হাঁ মেয়েদের মতনই ছিল, আর এখন ও হয়ে দাঁড়িয়েছে একেবারেই ডাক্তার। মায়া, মমতা শুকিয়ে গেছে তার বুক থেকে। কিন্তু তাই কী? বাণীব্রতর হাত থেকে চিঠিখানা খসে মেঝের ওপর পড়ল। মিটশেফের পায়ার কাছে পড়ে রয়েছে খামখানা, বাণীব্রত দেখল—তবু, তবু তার কোনও আগ্রহ নেই চিঠির জন্যে। কুমুদশংকরের চিঠি। বাণীব্রত জানে ও চিঠি কুমুদশংকরের। এ জগতে ওই একটা মাত্র লোক আছে যে তাকে চিঠি লেখে। কী লিখেছে কুমুদশংকর বাণীব্রত জানে না। বোধ হয় চাকরি পাওয়ার খবর। এমনও হতে পারে সে বিয়ে করছে তার সংবাদ।

'একটু দেরি হয়ে গেল।' ঘরে পা দিয়ে সুদক্ষিণা বললে। এগিয়ে এল বাণীব্রতর পাশে।

সুদক্ষিণার গলার স্বরে বাণীব্রত মুখ তুলে তাকাল।

'দুপুরেই আমার ট্রেন। গোছগাছ সেরে এলুম একেবারে।' টুল টেনে নিয়ে বাণীব্রতর পাশে বসে পড়ল সুদক্ষিণা। শাড়ির আঁচলটা ঠিক করে নিতে-নিতে বলল, 'কী করছিলে চুপচাপ বসে?'

বাণীব্রত সুদক্ষিণার মুখের দিকে তাকিয়েছিল। কেমন যেন একটু বেশি ফরসা দেখাচ্ছে ওকে। ভিজে চুল। মিষ্টি একটা গন্ধ ভেসে আসছে।

'কী দেখছ?' সুদক্ষিণা অস্বস্তি বোধ করলে।

বাণীব্রতর মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠল। কোনও জবাব না দিয়েও শুধু দৃষ্টি সরিয়ে নিল।

বাণীব্রতব হাসির মর্ম উদ্ধার করতে না পেরে সুদক্ষিণা আবার বললে, 'হাসছ যে! কী হল হঠাৎ হাসির?'

মাথা নাড়ল বাণীব্রত। বললে, 'আচ্ছা, তুমি কি আমাব বান্ধবী?'

প্রশ্নটা যেমন বেয়াড়া, তেমনি অযথা। সুদক্ষিণার অন্তত তাই মনে হল প্রথমটায়। কেমন যেন লজ্জা পেল ও।

'তোমার কী মনে হয়?' পালটা প্রশ্ন করলে সে।

'আমার?' বাণীব্রত ভাববার চেষ্টা করলে, 'আমার কিছুই মনে হয় না।'

'কিছু না?'

'না।'

'তাহলে আমি তোমার কিছুই না।' সুদক্ষিণা এবার মুখটিপে হাসল।

'তবে মিস দত্ত এ কথা বললে কেন?'

'কে বলেছে, মিস দত্ত?' সুদক্ষিণার মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। কী খানিকটা ভেবে সে বললে, 'এমনি বলেছেন বোধ হয়!'

বাণীব্রতর চোখ পড়ল মেঝেয় লুটোনো চিঠিটার ওপর। ঝুঁকে চিঠিখানা কুড়িয়ে নিল ও।

'কার চিঠি?' সুদক্ষিণা জানতে চাইল।

'কুমুদশংকরের।' খাম ছিঁড়ে চিঠিখানা বের করল বাণীব্রত। অল্প একটু নীরবতা। চিঠি পড়া শেষ করে বাণীব্রত বললে, 'ও বিয়ে করছে। খুব শীঘ্রি তার বিয়ে। আমায় নেমন্তন্ন করেছে। লিখেছে, আমি সেরে উঠে যেন—' বাণীব্রত হঠাৎ থেমে গেল।

সুদক্ষিণা একটু অপেক্ষা করে বললে, 'কী? তুমি সেরে উঠে!'

বাণীব্রত মুঠোর মধ্যে চিঠিখানা পিষতে লাগল।

'আমি কবে সেরে উঠব বলতে পারো?'

বাণীব্রতর গলার স্বরে বেদনা ফুটে উঠল। সুদক্ষিণার বুকেও সে বেদনার ছোঁয়া লাগল।

'আমি তো ডাক্তার নই। কবে সেরে উঠবে তা কী করে বলব? তবে এবার সেরে উঠবে। ভেব না।'

'কী জানি। আমার কিন্তু আর একমুহূর্ত ভালো লাগে না। পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করে।' বাণীব্রত হাতের তালগোল-পাকানো চিঠিখানা ছুঁড়ে ফেলে দিল।

সুদক্ষিণা বুঝতে পারল বাণীব্রতর মনে কীসের বিরক্তি আর ক্লান্তি জমা হয়ে উঠেছে। হাসপাতালের এই একঘেয়ে বিস্বাদ জীবনকে সহ্য করা যে কত কঠিন সুদক্ষিণা আজ তা বুঝতে পেরেছে।

বাণীব্রতর মনের মেঘ কাটাবার চেষ্টা করল ও। আলাপের মোড় ঘুরিয়ে দিল, 'সেরে উঠে তুমিও একটা বিয়ে করে ফেল, কেমন?'

বাণীব্রত সে কথার কোনও জবাব দিল না। শুধু লক্ষ করতে লাগল সুদক্ষিণাকে। কেমন হাসছে দেখেছ?

'আমায় তখন নেমন্তন্ন করবে তো?' সুদক্ষিণার হাসি আরও উজ্জ্বল হল।

'না।'

'সে কী? আমায়!'

'তোমাকেই তো বিয়ে করব।' বাধা দিয়ে অম্লান কণ্ঠে বাণীব্রত বলে বসল। কথায় তার না একটু সংকোচ, না দ্বিধা।

সুদক্ষিণার বুকে কে যেন হাতুড়ি পিটতে লাগল। কেমন যেন উষ্ণ হয়ে উঠল তার মুখখানা। চোখের পাতা আপনা থেকেই বুজে এল। রুদ্ধ আবেগের তরঙ্গ এসে কাঁপিয়ে তুলল ঠোঁট দুটি।

বাণীব্রত বুঝি সুদক্ষিণার এই আকস্মিক পরিবর্তনটুকু লক্ষ করছিল। কিংবা হয়তো ভাবছিল, ডোরা না সুদক্ষিণা কে বেশি সুন্দর।

নিজেকে সামলে নিতে সময় লাগল সুদক্ষিণার। রুমাল আনতে ভুলে গিয়েছিল ও। শাড়ির আঁচলে কপালের ঘাম মুছে সুদক্ষিণা উঠে দাঁড়াল।

'উঠলে যে!' বাণীব্রত বললে।

'এমন অসভ্য হয়েছ আজকাল তুমি।' সুদক্ষিণা জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

আমি কি কিছু অন্যায় করলাম? বাণীব্রত মনে-মনে ভাবতে শুরু করলে। জিভ থেকে যেন হঠাৎ কথাটা বেরিয়ে গেল। সুদক্ষিণা কি বিবাহিতা? ওর কাছে ক্ষমা চাইব নাকি? ক্ষমা।

'সুদক্ষিণা।' বাণীব্রত ডাকল।

সুদক্ষিণা জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকল। হালকা দুটি মেঘ কেমন জড়াজড়ি করে মিশে যাচ্ছে এক হয়ে। একটা পাখি শূন্যে পাখা ভাসিয়ে পা এলিয়ে কোথায় ভেসে চলেছে কে জানে।

'সুদক্ষিণা।' বাণীব্রত আবার ডাকল।

'কী, বলো?'

'শোনো। এসো না এখানে?'

সুদক্ষিণা ফিরে এসে টুলটার ওপর বসল একটু। বাণীব্রত ওর মুখের দিকে তাকাল একটু। তারপর চোখ সরিয়ে নিয়ে বললে, 'কিছু মনে করো না। আমি কী বলতে কী বলে ফেলি—নিজেই বুঝি না। তোমার—'

'থামো। আমি কিছু মনে করিনি।'

'করনি।'

সুদক্ষিণা মাথা নাড়ল।

'আচ্ছা, তোমার বিয়ে হয়ে গেছে, না?'

সুদক্ষিণার হাসি পেলেও সে হাসতে পারল না, বরং একটা দুঃখের বোঝা তার বুকে চেপে বসল। তবু বললে, 'দেখতে পাচ্ছ না?'

বাণীব্রত যে কী দেখবে তা সে বুঝতে পারে না।

'না। আমার চশমা হারিয়ে ফেলেছি। সব কিছু ঝাপসা দেখি—অস্পষ্ট। কিছু দেখতে পাই না পরিষ্কার। এত কষ্ট হয়।'

ভাগ্যকে ধিক্কার দেওয়ার কোনও দরকার নেই। এ তো তার সব কিছু জেনে শুনে নিজের হাতে তুলে নেওয়া। সুদক্ষিণা এত দুঃখেও তাই হাসল।

'হিন্দুর মেয়ে। স্বাভাবিক সংস্কারটুকু মানি বইকী। বিয়ে হলে আমার সিঁথিতে সিঁদুর থাকত। তাই কি আছে?'

বাণীব্রতর মাথার মধ্যে যেন সেই পোকাটা দাঁত বসাল আবার। কেমন যেন একটা তীব্র ব্যথা তার বোধের শাখা-প্রশাখায় বিদ্যুৎ প্রবাহের মতো বয়ে গেল।

তাই তো। কী আশ্চর্য। ওর সিঁথিতে সিঁদুর নেই। তা হলে সুদক্ষিণার বিয়ে হয়নি।

সুদক্ষিণা অন্য কথা ভাবছিল। বললে, 'তুমি চশমাব কথা বলছিলে না?'

'হ্যাঁ, আমার চশমা। চশমার অভাব বোধ কবি বড়।'

'কিন্তু চশমা তো তুমি পরতে না?'

'কী যে বলো।' বাণীব্রত হেসে উঠল, 'চশমা আমি পরতাম। চিরকালই পরতাম।'

সুদক্ষিণা ভীষণ অবাক হল। বাণীব্রতকে কোনওদিন সে চশমা পরতে দেখেনি দেওঘরে।

'দেওঘরে কিন্তু কোনওদিন তুমি চশমা ব্যবহার করনি। আমি তো কোনওদিন দেখিনি তোমায় চশমা পরতে।'

'তাই নাকি। আমার কিন্তু চশমা ছাড়া চলবে কী করে? তোমার হয়তো মনে পড়ছে না।'

'দেওঘরের কথা তোমার মনে পড়ছে?'

'না। তা মনে পড়লে তো সব গোলমালই চুকে যেত।' বাণীব্রত হঠাৎ একটু হেসে সুদক্ষিণাকে আরও সরে আসতে বলল কাছে। কিছু একটা ও বলবে এমন ভাব।

সুদক্ষিণা টুলটা আরও একটু সরিয়ে নিল।

'আমায় একটা কথা সত্যি করে বলবে?' খুব ধীরে প্রশ্ন করলে বাণীব্রত।

'বলো।'

'তুমি দেওঘরে আমার সঙ্গে তো ছিলে?'

'হ্যাঁ। এক বাড়িতে, এক সাথে।'

'আমার ভাইকে তুমি চেন?'

'না। নাম শুনেছি।' সুদক্ষিণা মনে-মনে বিপদ গুনছিল।

'বলতে পারো আমি একদিন রাত্রে পিস্তল হাতে ভাইয়ের বাড়িতে কেন গিয়েছিলাম?'

'সর্বনাশ। একথা তোমায় কে বলেছে?' সুদক্ষিণাব সারা শরীর কেঁপে উঠল। ফ্যাকাসে হয়ে উঠল তার মুখ।

'তুমি তো আমার সঙ্গে ছিলে বলছ। বলো না—কেন আমি—?'

'চুপ করো।' সুদক্ষিণা ধমক দিল, 'কে তোমায় এ কথা বলেছে?'

'কেন, ডোরা।'

'আর কী বলেছেন তিনি?'

'ওই কথাই বলেছে। আর কিছু না।'

'তিনি কী করে দেওঘরের কথা জানলেন?' সুদক্ষিণা ক্রমশ উত্তেজিত ও কঠিন হয়ে উঠছিল।

'বা, ও যে দেওঘরে থাকত। আমার সঙ্গে নাকি খুব আলাপ ছিল ওদের।'

'হুঁ।' সুদক্ষিণা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, 'মিস দত্ত তোমায় বুঝি এসব কথা বলেন?'

বাণীব্রত মাথা নাড়ল।

'রোজই বলেন নাকি?'

'প্রায়ই।'

'চশমা পরতে উনি তোমায় দেখেছেন?'

'হ্যাঁ। শুধু পরতে কেন—মিস দত্ত আমার চশমার কাচের পাওয়ার কত তাও জানেন! বাণীব্রত উঠে দাঁড়াল হঠাৎ। বিছানার পায়েব দিকে দেওয়ালের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমার চশমার পাওয়ার এখানে লিখে রেখেছি। যদি ভুলে যাই আবার তাই। আমার কিন্তু এমনিতেই মনে আছে।'

'কত?'

'মাইনাস ফোর পয়েন্ট টু সেভেন, সিলেন্ড্রিক্যাল হানড্রেড সিক্সটি, রাইট গ্লাস..'

সুদক্ষিণাকে কেউ যেন দুহাতে তুলে শূন্যে ছুঁড়ে দিল। প্রাণহীন, একটা পুতুলের মতো সে বসে থাকল টুলের ওপর।

সুদক্ষিণার আর যাওয়া হল না।

প্রণব খানিক ঠাট্টা করলে। কুন্তলাদি আড়ালে চোখের জল মুছলেন সুদক্ষিণার ভাগ্য বিড়ম্বনাব কথা ভেবে।

সন্ধেবেলায় বেড়াতে বেরিযে সুদক্ষিণা প্রণবকে সব কথা খুলে বলল। সকালের পুরো ঘটনাটা। শেযে বললে, 'তোমায় এ কথা না জানিয়ে চলে যাওয়ার মতো সাহস পেলুম না।'

সব শুনে প্রণব রীতিমত স্তম্ভিত হযে পড়েছিল। চুপ কবে পথ হাঁটছিল ও চিন্তিত মনে। নীরবে অনেকটা পথ হেঁটে তাদের পুবোনো জায়গাটায় এসে বসল ওরা।

'এখন বোধহয় বুঝছ, না-যাওয়ার জন্যে যে ঠাট্টা করেছিলে, সেটা আমাব প্রাপ্য নয়।' সুদক্ষিণা হেসে বললে।

'হ্যাঁ—তা সত্যি!' প্রণব আবার একটা সিগারেট ধবাল। অস্থির ভাবে উঠে দাঁড়াল পাথব ছেড়ে। খানিকটা পায়চারি করলে। আবার ফিরে এসে বসল তার জায়গায়।

'কিছুদিন ধরে একটা জিনিস লক্ষ করছিলাম। কিন্তু তেমন নজর দিইনি। তোমার কাছ থেকে আজকের ঘটনা শোনার পর সব বুঝতে পারছি।

'লক্ষ যখন করেছিলে, নজর দেওয়া তোমার উচিত ছিল।'

'এখন তাই দেখছি।'

প্রণব সুদক্ষিণাকে কয়েকটা ঘটনা বললে। এমন সব ঘটনা যাতে ডোরার ওপর বাণীব্রতর বিজাতীয়, বিরক্তিকর মনোভাবের পরিচয় পাওয়া গেছে। এমন কী সেই 'শক' নেওয়ার দিন বেহালা কাড়াকাড়ির ঘটনাটা পর্যন্ত।

বাণীব্রত এক সময় ডোরার ওপর প্রসন্ন ছিল। এখন আর নেই। থাকা সম্ভবও নয়। অপ্রীতিকর আলোচনা ও ঘটনা এই দুই-ই বাণীব্রত এড়িয়ে থাকতে চাইবে এটাই সবচেয়ে স্বাভাবিক।'

'কিন্তু উনি এসব করছেন কেন?' সুদক্ষিণা জানতে চাইল।

'আমিও তাই ভাবছি।'

দুজনেই চুপ করে ভাবতে লাগল।

'আচ্ছা শোনো,' সুদক্ষিণা বললে, 'মিস দত্তর কি কোনও স্বার্থ আছে এতে?'

'বুঝতে পারছি না।'

'তা হলে কী করবে?'

'ব্যবস্থা একটা করব বইকী! ডোরার প্ররোচনায় পড়ে উত্তেজনার মাথায় কিছু একটা করে ফেলা বাণীব্রতর পক্ষে অসম্ভব নয়। তাছাড়া এ-সব চিন্তা তার সেরে ওঠার পক্ষেও বাধা।'

সুদক্ষিণার মন মানছিল না। থাকতে না পেরে শেষ পর্যন্ত ও বলে বসল, 'একটা কাজ করবে?'

'কী?'

'ডোরাকে বাণীর ত্রিসীমানা মাড়াতে দিও না।'

প্রণব সে কথা আগেই ভেবেছে। 'না, তা হয় না। ডোরাকে আমি জানতে দিতে চাই না। অবশ্য, তোমার ভয় নেই। বাণীব্রতর কোনও ক্ষতি সে যাতে করতে না পারে তার ব্যবস্থা আমি করব।' প্রণব উঠে দাঁড়াল।

ফেরার পথে প্রণব বললে, 'তুমি একটা কাজ করবে?'

'সাধ্যে কুলোলে নিশ্চয় করব।'

'মনোহরপুর নয়—তুমি কালই কলকাতায় যাও। আর কিছু নয়, বাণীব্রতর জীবনের ছোট বড় ঘটনা যা জানতে পার—তার বাবা-মা ঘনিষ্ঠ আত্মীয় স্বজন এদের সম্বন্ধে যতটুকু জানা যায় ভালোভাবে খোঁজ করে জেনে এসো। তারপর আমি দেখছি। ডাঃ গুপ্ত না থাকায় আমার হাসপাতালের বাইরে পা বাড়াবার উপায় নেই—না হলে আমিই যেতাম। এটুকু সাহায্য তুমি আমায় করো, সুদক্ষিণা।'

'সব বুঝলাম, কিন্তু—' সুদক্ষিণা দোটানায় পড়ল।

'কোনও কিন্তু নয়। লজ্জার কথা ভাবলে চলবে না। তোমাব সমস্ত লজ্জা একদিন ধুয়ে যাবে। আমি বলছি, আমায় বিশ্বাস করো।' প্রণব সুদক্ষিণাব হাত ধরল।

'তাই যাব।' সুদক্ষিণা ধবা গলায় জবাব দিলে।

মাসখানেক পবের কথা।

সুদক্ষিণা কলকাতা থেকে ফিবে আবার তার কর্মস্থান মনোহরপুব চলে গেছে। সেখান থেকে চিঠি লিখে জানিয়েছে—স্কুলের চাকবি আর থাকবে না। কর্তৃপক্ষ তার ওপর অসন্তুষ্ট। উপবন্তু বাণীব্রতর কাছে তার যাওয়া আসার কথাটাও না জানি কেমন করে জানাজানি হয়ে গেছে। অতসী বলে, উড়ো চিঠি দিয়ে সেক্রেটারিকে সব কথা কে যেন জানিযে দিয়েছে। চিঠি পেযে প্রথমটা প্রণব যতটা না মুষড়ে পড়েছিল তার চেয়ে অবাক হযেছিল বেশি। কে এসব কথা জানাতে গেল!

কিছুদিনের মধ্যেই আবার পাটনা থেকে প্রণবের নামে চিঠি এল পুলিশ দপ্তর থেকে। বাণীব্রতকে পরীক্ষা করবার জন্যে পুলিশ থেকে 'এনকোয়ারি কমিশন' পাঠাচ্ছে। প্রণব এ চিঠি পেয়ে বিস্মিত হল না। কেননা মিস্টার সেনগুপ্তের কথামতো দুমাস শেষ হওয়ার আগেই সে পাটনায় চিঠি লিখে জানিয়েছিল—রুগি ক্রমশ আরোগ্যের পথে এগিয়ে চলেছে। এ সময় তাকে তার পুরাতন চিকিৎসক ও আবহাওয়ার মধ্যে না রেখে হঠাৎ নতুন এক পরিস্থিতির মধ্যে টেনে নিয়ে গেলে তাতে সম্ভবত আবার রুগির অবস্থার অবনতি ঘটবে। একান্তই যদি তাকে সবকাবি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়াই কর্তৃপক্ষ স্থির করেন তবে সে দায়িত্ব সরকাবের। ভবিষ্যতে কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে 'পরেশনাথ মেন্টাল হসপিটাল' তার প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা বজায় রাখবার জন্যে এবং চিকিৎসক হিসেবে প্রণব তার নৈতিক দায়িত্ব সরকার কর্তৃক উপেক্ষিত হওয়ার দরুন আদালতের আশ্রয় প্রার্থনা করবে। মোটকথা, বাণীব্রতকে নিয়ে যাওয়াই যদি সরকারের অভিপ্রেত হয়, তা হলে ভবিষ্যতের সমস্ত দায়িত্বই সরকারের। 'পরেশনাথ মেন্টাল হসপিটালের' প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রেসিডেন্ট লালগড়ের বর্তমান রাজা হরিনারায়ণ সিংহ বাহাদুর এ সম্পর্কে সরকারি ব্যবস্থা অবলম্বনের হঠকারিতা সহ্য করবেন না বলে জানিয়েছেন। এখন পাটনা পুলিশ দপ্তর যা বিবেচনা করেন...।

প্রণবের এ চিঠির সরকারি জবাব আসার আগে মিস্টার সেনগুপ্ত চিঠি লিখে জানালেন,

'তোমার চিঠি নিয়ে আমাদের ডিপার্টমেন্টে অত্যন্ত উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। কুমার বাহাদুরের কাছ থেকে পুলিশ কমিশনার এবং মিনিস্ট্রিতেও চিঠি এসেছে। বেশ বাধিয়ে তুলেছ কাণ্ডটা। যাই হোক, একদিকে যেমন তোমার ওপরওয়ালা কুমার বাহাদুর তোমায় সাহায্য করছেন, তেমনি আর একদিকে তোমারই হাসপাতাল থেকে অভিযোগ আসছে তোমার নামে।...সমস্ত ভেবেচিন্তে আমরা স্থির করেছি একটা কমিশন পাঠাব। তাতে দুজন সরকারি ডাক্তার, আমার অ্যাসিস্টেন্ট ও বন্ধু মিঃ ঝা এবং দেওঘরের ব্যাপারটা যে ইন্সপেক্টার প্রথম থেকে তদন্ত করছেন এঁরা কজন থাকবেন। কমিশনের সঙ্গে আর একজন থাকবেন যাঁকে তুমি চেন। কলকাতার বিখ্যাত মনোবিদ্ ডাঃ মুখার্জি। ...আশা করি, কমিশনের কাছে তুমি তোমার সততা ও কর্তব্যনিষ্ঠার জন্যে প্রশংসিত হবে।....'

কমিশন আসবে আসুক, প্রণব তার জন্য চিন্তিত নয়, কিন্তু তার নামে গোপন অভিযোগ জানাল কে? কার এই দুঃসাহস?

সুদক্ষিণা, কমিশন, বাণীব্রত...চিন্তায়-চিন্তায় প্রণবের সমস্ত মন হাঁপিয়ে উঠল, রাত্রে ঘুম গেল; মুখেব হাসি মুছে গিয়ে থমথমে কঠিন একটা গাম্ভীর্য জেগে থাকল।

অবশেষে একদিন সকালে হাসপাতালে পা দিয়ে প্রণব দেখলে কমিশনের লোকজন এসে গেছে।

ডাঃ মুখার্জি তাকে চিনতে পেরে আনন্দে ফেটে পড়লেন। ছাত্র-জীবনে প্রণব ছিল তাঁর অন্যতম প্রিয় ছাত্র। দীর্ঘ ক'টা বছর এই জ্ঞানী অধ্যাপকেব পায়ের তলায় বসে প্রণব তার ভবিষ্যৎজীবনের পুঁজি সঞ্চয় কবেছে। এতদিন পবে তার পবমশ্রদ্ধেয় বৃদ্ধ অধ্যাপকটিকে দেখে প্রণবও ছেলেমানুষের মতো আনন্দে বিহ্বল হয়ে উঠল।

অপর দুজন ডাক্তাবের মধ্যে একজন এসেছেন রাঁচির হাসপাতাল থেকে, আর একজন সবকারি আর একটি হাসপাতাল থেকে। রাঁচির ডাক্তারটি সাহেব। নাম ডাঃ টমসন। দ্বিতীয় ডাক্তাবটি বাঙালি, ডাঃ লাহিড়ী। ডাঃ মুখার্জির সহপাঠী ছিলেন এককালে। এখনও তাঁদের বন্ধুত্ব বজায় আছে। কমিশনের লোকজনকে বসিয়ে প্রণব নিজে গেল বাণীব্রতকে ডেকে আনতে।

কেবিনে ঢুকে প্রণব দেখল—বাণীব্রত গভীর মনোযোগে বেহালার সুর তোলবার চেষ্টা কবছে—পারছে না। ভুল হচ্ছে বারবার—তবু তার চেষ্টার ত্রুটি নেই।

প্রণব সামনে এসে দাঁড়াতে বাণীব্রত হাত থেকে বেহালা নামিয়ে তার দিকে তাকাল।

'হচ্ছে না। ভুল হয়ে যাচ্ছে।' হতাশ হয়ে বললে বাণীব্রত।

'আস্তে-আস্তে ঠিক হয়ে যাবে। আমি কিন্তু আপনাকে এক জায়গায় নিয়ে যেতে এসেছি।' হাসিমুখে জানাল প্রণব।

'কোথায়?'

'বাইরে কোথাও নয়, এই এখানেই। আমার অফিস ঘরে।'

'সে তো রোজই যাই।' বাণীব্রত উঠে দাঁড়াল।

প্রণব ওর কাঁধে হাত রাখল, 'আজ কিন্তু সেখানে অনেক লোকজন আছে।'

'তা হলে থাক। আমি—'

বাধা দিয়ে প্রণব বললে, 'না, থাক নয়। ওদের কাছেই আপনাকে যেতে হবে।' একটু থেমে আবার বললে, 'যাঁরা এসেছেন তাঁরা সকলেই নামজাদা বড় ডাক্তার, দেখতে এসেছেন আপনাকে।'

'আমার দেখবার কী আছে? আমি বেশ আছি।'

প্রণব বাণীব্রতর শার্টের কলারটা ঠিক করে দিয়ে বললে, 'এলেই বা, ক্ষতি কী? আপনার ভালোর জন্যেই তো তাঁদের আসা। আমার চেয়ে তাঁরা অনেক বিদ্বান, অভিজ্ঞ। যদি আমার কোনও ভুল হয়ে থাকে তাঁরা শুধরে দেবেন।'

'আপনি ওঁদের ডেকে এনেছেন?' বাণীব্রত বিচলিত হল।

'আমি? না—হ্যাঁ, তা আমিই ডেকে এনেছি।' প্রণব মুশকিলে পড়ল। পরমুহূর্তেই তার স্বভাবসিদ্ধ সুন্দর হাসি ফুটিয়ে বললে, 'হাসপাতাল ছেড়ে যাওয়ার জন্যে আপনি খুব ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। সুদক্ষিণাও আপনাকে এখানে রাখতে রাজি নয়। তাই। বড়-বড় ডাক্তাররা একবার দেখে গেলে ভালো হবে। তাঁদের কথামতো দিনকয়েক চিকিৎসা করলেই আপনি একেবারে সেরে উঠবেন। তারপর বাড়ি।'

বাণীব্রত তবু পুরোপুরি সহজ হতে পারল না। 'আমায় কী করবে ওরা?' প্রশ্ন করলে।

'করবে আবার কী? এই এটা-ওটা জানতে চাইবে। আমি তো থাকব, ভয় কী? ওরা যা জানতে চাইবে আপনি শুধু তার উত্তর দিয়ে যাবেন।'

মাথা নেড়ে সায় দিল বাণীব্রত, বললে, 'বেশ চলুন।'

হাতের বেহালাটা নামিয়ে রেখে ও পা বাড়াল।

প্রণবের ঘরের দরজায় পা দিয়ে বাণীব্রত থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। চার-পাঁচজন অপরিচিত ভদ্রলোক। একেবারে সামনে সব বসে আছেন। একপাশে ডোরাকেও দেখতে পেল বাণীব্রত। ওকে ঘরে ঢুকতে দেখে সকলেই তার দিকে তাকাল।

প্রণব বাণীব্রতর হাত ধরে টানল। 'যান, ওই চেয়ারটায় গিয়ে বসুন।' আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে চেয়ার।

একটু দাঁড়িয়ে থেকে বাণীব্রত সামনের একটা চেয়ারে গিয়ে বসল। ওদের মুখোমুখি করে পাতা ছিল চেয়ারটা। বাণীব্রত হাত দুটো কোলের ওপর রেখে চুপ করে বসে থাকল।

কে একজন মোটা গলায় বললে, Well, we can go with our work, Just you please try with him Dr. Lahiri?

বিলেতি ঢঙে আর একজন বললে, জড়ানো কথা—অস্পষ্ট উচ্চারণ।

বাণীব্রত সামনে তাকাল।

দোহারা চেহারা কালোমতন এক ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন। ট্রাউজারের পকেটে হাত রেখে এগিয়ে এলেন বাণীব্রতর সামনে। ডাঃ লাহিড়ী বাণীব্রতর মুখের দিকে খানিকক্ষণ তীব্র চোখে তাকিয়ে কী যেন লক্ষ করে প্রশ্ন করলেন, 'আপনার নাম কী?'

'বাণীব্রত।' খানিকটা থেমে জবাব দিল বাণীব্রত।

'পুরো নাম?'

বাণীব্রত চক্রবর্তী।'

'আপনার বাড়ি কোথায়?'

'কলকাতায়।'

'কলকাতার কোথায়?'

'টালিগঞ্জে।' বাণীব্রত প্রণবের দিকে তাকাল। যেন বলতে চাইল মনে-মনে : কেমন ঠিক হচ্ছে তো।

'ডাঃ দিব্যেন্দু চক্রবর্তীকে আপনি চেনেন?'

'আমার ভাই।'

'কোথায় থাকতেন তিনি?'

'দেওঘরে।' বাণীব্রত দিব্যি উত্তর দিয়ে যেতে লাগল।

'আপনার ভাই এখন কেমন আছেন?'

'জানি না।'

'I see! আপনার ভাইয়ের সংসারে কে-কে আছেন?'

বাণীব্রত চুপ করে থাকল।

মিঃ ঝা হঠাৎ ডাঃ লাহিড়ীর পাশে এসে দাঁড়ালেন। প্রশ্ন করলেন, 'আপনি কি দেওঘরে ছিলেন?'

'ছিলাম।'

'কোথায় ছিলেন? কার কাছে? ভাইয়ের কাছে?'

'না।'

'তবে?'

'বন্ধুর বাড়িতে।'

'আপনার বন্ধুর নাম?'

'বিভূতি।'

মিঃ ঝা বললেন প্রণবকে, 'ভদ্রলোক প্রায় নির্ভুল উত্তর দিতে সমর্থ। Is this not enough?'

ডাঃ লাহিড়ী তখনও মনোযোগ সহকারে লক্ষ করছিলেন বাণীব্রতকে। ওর মুখচোখের ভাবভঙ্গি তীক্ষ্ণভাবে পর্যবেক্ষণ করলে বোঝা যায়—সেটা ঠিক স্বাভাবিক মানুষের নয়। বিশেষ করে তার এই নির্বিকার নিস্পৃহ ভাব, ফাঁকা চাউনি, নামতা পড়ার মতো প্রাণহীন উত্তর। কোথায় যেন একটা ফাঁক থেকে যাচ্ছে।

ডাঃ লাহিড়ী তাঁর আসনে ফিরে গিয়ে ডাঃ টমসনের সঙ্গে মৃদুস্বরে কয়েকটা কথা আলাপ করলেন। অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে খানিক আলোচনা করে আবার বাণীব্রতর সামনে এসে দাঁড়ালেন।

'আপনি যেন অস্বস্তি বোধ করছেন।'

বাণীব্রত সে কথার কোনও উত্তর দিল না। মনে-মনে বললে : তা যদি বুঝে থাক আমায় ছেড়ে দাও না কেন! কী লাভ হচ্ছে তোমার আমায় এভাবে বসিয়ে রেখে। সুরটা কিছুতেই মনে আসছিল না। এতক্ষণ চেষ্টা করলে বোধ হয় শুধরে নিতে পারতাম।

'Well, if you can just think us your friend gentleman!'

বাণীব্রত একটু বুঝি চমকে উঠেই তাকাল। ডাঃ লাহিড়ী নতুন ভাবে তোড়জোড় শুরু করলেন। সিগারেট ধরালেন। গলার টাইটা ঢিলে করলেন একটু। বাণীব্রত সিগারেটের দিকে তাকিয়ে থাকল।

'Would you?'

ডাঃ লাহিড়ী বাণীব্রতকে সিগারেট দিলেন।

বাণীব্রত নিঃশব্দে খানিকক্ষণ সিগারেট টেনে হঠাৎ খুশি হয়ে উঠল, 'It is fine!'

'Is it?' ডাঃ লাহিড়ী সুযোগ গ্রহণ করলেন, 'আপনারও এরকম হওয়া উচিত। You should be nice to us! বলুন, কেন আপনি অস্বস্তি বোধ করছেন? আমরা ডাক্তার, আপনি রুগি। আমাদের কাছে কিছু লুকোনো আপনার উচিত নয়।'

বাণীব্রত কী ভাবল কে জানে। বললে, 'মাথায় কেমন যন্ত্রণা হচ্ছে।'

'তাই নাকি?' ডাঃ লাহিড়ী প্রণবকে ডেকে কানে-কানে কী যেন বললেন।

প্রণব আবার ডোরাকে ডেকে কী আদেশ করলে।

'এরকম মাথার যন্ত্রণা আপনার কতদিন হয়?'

'প্রায়।'

'না-না, প্রায় বললে চলবে না। কতদিন ধরে হয়—মানে ক'মাস বা ক'বছর ধরে এরকম যন্ত্রণায় ভুগছেন?'

'রোজ।'

'রোজ-ই?' ডাঃ লাহিড়ী মৃদু হাসলেন, 'রোজ—বেশ রোজই। আমি বলছি কি এই রোগটা কতদিন ধরে হয়েছে। এই ধরুন যখন আপনি দেওঘরে ছিলেন, তখন এরকম মাথার যন্ত্রণা হত?'

'জানি না।'

'সেকী? আপনার মাথায় যন্ত্রণা হত কি না আপনি জানেন না?'

'না।'

এমন সময় অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় ধীরে-ধীরে উঠে সামনে এসে দাঁড়ালেন। ডাঃ লাহিড়ী প্রণবের পাশে সরে এলেন।

'আমরা জানি, আপনার মাথায় যন্ত্রণা হত।'

অধ্যাপকের গম্ভীর শান্ত স্বরে তাঁর দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকাল বাণীব্রত।

'আপনার ভাই আমাদের বলেছেন, দেওঘরে আপনি ভীষণ মাথার যন্ত্রণায় ভুগতেন। মনে পড়ছে?'

বাণীব্রত ধোঁয়াটে চোখে তাকিয়ে শুধু মাথা নাড়ল।

অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় আর এক পা এগিয়ে এলেন। তাঁর হাতের পাইপটা কথা বলার সময় বাণীব্রতর মুখের সামনে নড়ে উঠছিল।

'মাথার যন্ত্রণার কথা আপনি আমাদের কাছে লুকোচ্ছেন কেন?'

বাণীব্রত নীরব। সে অধ্যাপকের পাইপের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

'Why you are concealing the fact?'

বাণীব্রত কোনও কথা না বলে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

'দেওঘরের এত কথা আপনাব মনে আছে, আর মাথার যন্ত্রণার কথা মনে নেই?'

'না—নেই।'

'তা কী করে হয়? আপনার এরকম ভুল হওয়া উচিত নয়। মাত্র সেদিনের কথা।' অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় বাণীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে চোখে চোখ রেখে তাকিয়েছেন, 'কতদিন হল আপনি দেওঘরে ছিলেন?'

'জানি না।'

'জানেন না? হিসেব করে বলুন।'

'সাত বছর পাঁচ মাস।'

'কী বলছেন? ভালো করে হিসেব করে বলুন।' ডাঃ লাহিড়ী বললেন।

'হিসেব জানি না।'

'গুনতে জানেন না?'

'গুনতে? আচ্ছা, বলছি।' বাণীব্রত মনে-মনে হিসেব করার চেষ্টা করল, 'সাত বছর না-হয় পাঁচ বছর হবে।'

'তারও কম।'

'তাই নাকি? তাহলে দাঁড়ান। মিস দত্ত?' বাণীব্রত ডাকল।

'তিনি নেই। কিন্তু মিস দত্ত কেন?' ডাঃ লাহিড়ী প্রশ্ন করলেন বিস্মিত হয়ে।

'উনি বলে দেবেন।' বাণীব্রত মৃদু শান্ত গলায় বললে।

'উনি কী জানেন? আপনি—।'

প্রণবের কথায় বাধা দিয়ে বাণীব্রত দ্রুত বলে উঠল, 'উনি জানেন—সব জানেন। উনি আমার কথা সমস্ত জানেন।'

'কী করে আপনি বুঝলেন মিস দত্ত আপনার সমস্ত কথা জানেন?' অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় গম্ভীর স্বরে জানতে চাইলেন।

বিচলিত হল বাণীব্রত। তার অস্থিরতা বেড়ে উঠল। ও বললে, 'তিনি বলেন।'

'কী বলেন?'

'দেওঘরের কথা বলেন।'

'দেওঘরের কোন কথা বলেন?' অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় বাণীব্রতর মুখের ওপর স্থির রাখলেন তাঁর অনুসন্ধানী দৃষ্টি।

বাণীব্রত চুপ করে থাকল। অসুস্থ মনে হচ্ছিল নিজেকে। চোখের সামনে মূর্তিগুলো ক্রমশ ঝাপসা হয়ে আসছে। অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়ের হাতের পাইপ তার মুখের সামনে বড় বেশি নড়ে উঠছে। সরু লম্বা নল, একটু-একটু ধোঁয়া। ঝাপসা, আরও ঝাপসা হয়ে এল সেই সূক্ষ্মাগ্র অংশটুকু। সেদিকে তাকিয়ে থাকল বাণীব্রত, আতঙ্ক-বিস্ফারিত দৃষ্টিতে।

ডোরা দত্ত ঘরে এল। হাতে ওষুধ।

বাণীব্রতকে চেয়ারে বসিয়ে ডোরা ওষুধটা খাইয়ে দিল। বাণীব্রত· কপালে ঘাম জমে উঠেছে। দ্রুত নিশ্বাসপতনের শব্দ কানে বাজছে।

বাণীব্রত ডোরার একটা হাত সজোরে চেপে ধরল।

কয়েক মিনিট অখণ্ড নিস্তব্ধতা। বরফের হাওয়ার মতো ঠান্ডা একটা আবহাওয়া ঘরের মধ্যে ঘনিয়ে উঠতে লাগল। সকলেই চিন্তিত, নির্বাক, নিশ্চল।

'That's alright! Would you mind leaving this room Miss Dutt? অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় হঠাৎ বললেন।

বুঝি চমকে উঠল ডোরা।...ধীরে-ধীরে উঠে দাঁড়াল। যাওয়ার জন্যে ঘুরে দাঁড়াতেই বাণীব্রত হাত বাড়িয়ে তার অ্যাপ্রনের একটা অংশ ধরে ফেলল।

'যাবেন না, মিস দত্ত!'

বাণীব্রতর মুঠো থেকে অ্যাপ্রন ছাড়িয়ে নিলে ডোরা।

'আমি কিছুই জানি না। আমায় বাঁচান!' 'ব্যাকুল স্বরে বললে বাণীব্রত।

ডোরার সর্বাঙ্গ ক্ষণিকের জন্যে কেঁপে উঠল। নিশ্বাসপতন দ্রুত, শব্দময় হয়ে উঠল অকস্মাৎ।

'ভয় কী, যা আপনি জানেন, তারই জবাব দিন। আমার অন্য কাজ আছে।' ফ্যাকাসে মুখে বললে ডোরা।

কথাশেষে তিলমাত্র বিলম্ব না করে দ্রুতপায়ে ডোরা ঘর ছেড়ে চলে গেল। তার যাওয়ার পথে তাকিয়ে বাণীব্রত অসহায় দৃষ্টি মেলে বসে থাকল। প্রণব বাণীব্রতর মানসিক চরম উত্তেজনার সম্ভাবনায় শঙ্কিত হয়ে উঠছিল ক্রমশ। অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়কে মৃদুস্বরে প্রণব তার আশঙ্কার আভাস দিলে।

অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় আবার বললেন, 'আমাদের কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দিলেই আপনার ছুটি, বাণীব্রতবাবু। Why are you getting afraid of us?'

অধ্যাপকের কথা শেষ হতে প্রণবও বাণীব্রতকে সাহস যোগাল, 'এঁদের কথার জবাব দেওয়া আপনার উচিত, বাণীব্রতবাবু। এঁরা সকলে কত বড় এক-একজন ডাক্তার। রোগ সারাতে হলে ডাক্তারের অবাধ্য হওয়া কি উচিত?'

বাণীব্রতর মাথার যন্ত্রণা বাড়তে শুরু করছিল। মনে পড়ল তার কুমুদশংকরের কথা: ডাক্তারের কথা শুনো।...কিন্তু কেন, সে তো অবাধ্য হয়নি। তার যা জানা আছে—যা মনে পড়ছে সমস্তই

সে বলেছে। সমস্ত—সমস্ত কথা। তাই নয় কি?

'দেওঘরে আপনি যে বন্ধুর সঙ্গে ছিলেন, তাঁর নাম তো আপনি জানেন দেখছি। বলতে পারেন তিনি কোথায় থাকেন?' অধ্যাপক প্রশ্ন করলেন।

'কোথায়? মনে পড়ে না।'

'Do you remember your brother ? How he looks ?" ডাঃ টমসন প্রশ্ন করলেন।

'জানি না।'

'তাঁকে মনে পড়ছে না—অথচ তাঁর নাম মনে আছে?' অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় আরও একটু কাছে এগিয়ে ঝুঁকে দাঁড়ালেন। তাঁর চোখের দৃষ্টি বাণীব্রতর চোখের ওপর স্থির হয়ে থাকল।

অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় সম্ভবত রহস্যের সূত্র পেলেন কিছু। বিস্মিত ভাবটা কাটিয়ে উঠে সহজ হওয়ার জন্যে হেসে উঠলেন তিনি।

বাণীব্রত দেখছিল—এক জোড়া চোখ—দীর্ঘ দাড়ি; লম্বা ছুঁচোলো পাইপের আগা ধোঁয়ায় ভরে উঠেছে—তার বুকের কাছে নড়ছে ঘন-ঘন। কী—কী—ওটা কী? ধোঁয়া কেন? কেন অত নড়ে?

'হাত সরিয়ে নিন—সরিয়ে নিন। আমায় কি মেরে ফেলতে চান?' হঠাৎ ভীষণ ভয় খেয়ে তীব্র চিৎকার করে বাণীব্রত দু-পা পিছনে সরে গেল।

বাণীব্রতর ব্যবহারে সকলে বিস্ময়ে বোবা হয়ে গেল ক্ষণকালের জন্যে। ওর দিকে অগাধ কৌতূহল নিয়ে তাকিয়ে থাকল সবাই। অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় সম্ভবত কিছু সন্দেহ করলেন। বিস্মিত ভাবটা কাটিয়ে উঠে সহজ হওয়ার জন্যে হেসে উঠলেন তিনি, 'বাস্তবিক আপনি হাসালেন। মারব কি মশাই, অ্যাঁ? এ তো একটা পাইপ—তামাক খাবার পাইপ। দেখুন—দেখুন না হাতে করে!'

বাণীব্রত তখন ভীতার্ত দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়ের প্রসারিত হাতের দিকে।

একটু অপেক্ষা করে ডাঃ মুখোপাধ্যায় বললেন, 'এখনও দেখছি আপনার ভয় গেল না?' পাইপটা পরিষ্কার করে পকেটে ঢুকিয়ে ফেললেন তিনি, 'এবার বলুন, হঠাৎ ভয় পাবার কী হল?'

বাণীব্রত অপেক্ষাকৃত সুস্থ বোধ করছিল। তার ভীত ভাবটা কেটে এসেছিল অনেকটা।

'What's the trouble with you ? Are you still afraid ?'

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বাণীব্রত বললে, 'আমি ভালো বুঝতে পারি না—দেখতে পাই না।'

'দেখতে পান না?'

'না। কেমন অস্পষ্ট, ঝাপসা। চশমা না হলে আমার বড় কষ্ট হয়।'

চশমার কথায় প্রণব বললে, 'খুব অসুবিধে বোধ করেন, না?'

'ভীষণ। আমার চশমাটা যে কোথায়—'

'আপনি কি চশমা ব্যবহার করতেন আগে?'

'করতাম। মাইনাস ফোর পয়েন্ট টু সেভেন, রাইটগ্লাস সিলেন্ডিক্যাল হানড্রেড, অ্যান্ড সিক্সটি।'

আর একবার অবাক হওয়ার পালা এল সকলের। মিঃ ঝা অবাক হয়ে বললেন, 'বলেন কী, এই দীর্ঘ প্রেসক্রিপশন আপনার মনে আছে!'

বাণীব্রত মাথা নাড়ল।

অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় হঠাৎ ভীষণ গম্ভীর হয়ে উঠলেন, 'you remember that?'

'হ্যাঁ।' বাণীব্রত মাথা নাড়ল।

'অথচ দেওঘরের অন্য কোনও কথা আপনার মনে পড়ছে না? এমন কি নিজের ভাই, বন্ধু, এদের কেমন দেখতে, তাও আপনার মনে নেই?'

'না।'

'দেওঘরের কোনও কথাই আপনার মনে পড়ে না?'

'না। খালি একজনকে।'

'কে সে?'

'তুলতুল।'

'কে তুলতুল?'

'ছোট্ট একটি মেয়ে। কেমন সুন্দর ছড়া বলত; দুলত দোলনায়? পিসিকে বলত 'আনটি'।'

অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় ডাঃ লাহিড়ীর দিকে তাকালেন। প্রগাঢ় বিস্ময়ে তাঁর চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠেছে।

মিঃ ঝা শুধু বললেন, 'Strange !"

অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় বিচলিত হলেন। ডান হাতটা তাঁর আবার একসময় পকেট থেকে পাইপটা টেনে নিয়েছে। বাঁ-হাতের তালুর ওপর পাইপটা ঠুকতে-ঠুকতে হঠাৎ তিনি প্রশ্ন করলেন, 'আপনার চশমার ফ্রেমের রঙটা মনে আছে নিশ্চয়?'

মাথা নেড়ে বাণীব্রত জানালে তার মনে নেই।

'বাণীব্রতবাবু একটা কথা আপনাকে জিগ্যেস করি। আপনার চশমার কাচের পাওয়ারের আগাগোড়া সব মনে আছে, অথচ তাব ফ্রেমের রংটা মনে করতে পারছেন না? কেমন করে তা হবে?' ডাঃ লাহিড়ী নরম সুরে বললেন।

'কেন হবে না? আমি মনে রেখেছি।'

'কী করে বেখেছেন তাই ভেবে আমরা অবাক হচ্ছি।'

'মিস দত্তর কাছ থেকে জেনে। পাছে ভুলে যাই, তাই লিখে রেখেছি।'

'তাহলে মিস দত্ত আপনাকে বলেছে?'

'হ্যাঁ—তিনি দয়া করে বলেছেন।'

'আর তুলতুলের কথা?'

'কেউ আমায় বলেনি তো!'

অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় মৃদু হাসলেন। বললেন বাণীব্রতকে, 'আপনি এখন যেতে পারেন।'

প্রণব কলিংবেল টিপল।

বাণীব্রত অকস্মাৎ প্রশ্ন করলে, 'আমি কবে সেরে উঠব?'

'শীঘ্রি—খুব শীঘ্রি?'

নার্স এসে দাঁড়াল। প্রণব বাণীব্রতকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে ইঙ্গিত জানালে।

বাণীব্রত যাওয়ার আগে একটু হেসে সকলকে বুঝি তার কৃতজ্ঞতা জানিয়ে গেল।

কমিশনের লোকজন ফিরে গেল। থেকে গেলেন কেবল অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়। প্রণব যেতে দিল না। বললে ঃ আপনি দু-একদিন থেকে যান, স্যার। আপনার সাহায্য ও পরামর্শ পেলে কেসটার একটা মীমাংসা করে ফেলতে পারব। অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় সে অনুরোধ এড়াতে পারলেন না। তাছাড়া জায়গাটা দু-একদিন বিশ্রাম নেওয়ার উপযুক্ত বটে। তিনি বললেন ঃ বেশ। কিন্তু বাবা দুদিনের বেশি আমায় আটকে রেখো না। শুক্রবার দিন আমায় ফিরতেই হবে।

কমিশনের অপরাপর সভ্যেরা বিদায় নেওয়ার আগে প্রণবকে জানিয়ে গেল—তারা হাসপাতালের কাজ দেখে বাস্তবিক খুশি হয়েছে।

মিঃ ঝা প্রণবকে আড়ালে ডেকে বললেন, 'মিঃ দাশগুপ্ত, আপনার 'আংকল' আমায়

বিশেষভাবে এই ঘটনাটিতে এনকোয়ারি করতে পাঠিয়েছিলেন। আসলে আমি এসেছিলাম আপনাকে সাহায্য করতেই। And I am too glad you have satisfied me—you have helped me much. এখন আমিও আপনাকে সাহায্য করতে পারব। ...চশমার ব্যাপারটা এমনভাবে এড়িয়ে গেছে জানতাম না। আমি নিজে নতুন করে এ সম্পর্কে এনকোয়ারি করব। ভবিষ্যতে আপনি আমার সর্বপ্রকার সাহায্য পাবেন। ভালো কথা, আপনার নামে কমপ্লেন কে পাঠিয়েছিল তা নিশ্চয় অনুমান করতে পারছেন! মিস দত্তর ওপর চোখ রাখার ব্যবস্থা আমি করছি। তিনিও কোনও সূত্রে এ রহস্যের সঙ্গে জড়িত বলেই মনে হয়। হয়তো তাঁকে কেন্দ্র করেই আমরা রহস্যের সমাধান করতে পারব।'

প্রণব বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাল মিঃ ঝাকে, 'আপনার সাহায্য সর্বতোভাবে না পেলে সব চেষ্টাই বৃথা হবে, মিঃ ঝা। ভদ্রলোকের মনের তদন্তটুকুই আমার হাতে, বাকিটা সবই আপনাদের হাতে।'

সেইদিনই সন্ধেবেলায় বেড়াতে বেরিয়ে অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় ও প্রণবের মধ্যে কথা হচ্ছিল।

'আমি ভেবেছিলাম তোমার রুগি দেওঘরের মাত্র একটি ঘটনাই মনে কবতে পারছে—সেই বাচ্চা মেয়েটির কথা।' অধ্যাপক বলছিলেন।

'আজ্ঞে না—কোনও ঘটনাই সে মনে করতে পারছে না। আপনাদের তো আমি আগেই বলেছি—তুলতুল নামেব কোনও বাচ্চা মেয়ের কোনওরকম অস্তিত্বই দেওঘরে ছিল না। আমিও প্রথমে কথাটা শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম, তারপর সুদক্ষিণার কাছ থেকে জানলাম তুলতুলের ব্যাপাবটা বাণীব্রতব সম্পূর্ণ কাল্পনিক, মনগড়া।'

'তা হঠাৎ এবকম মনগড়া একটা ঘটনার সঙ্গে বাণীব্রত নিজেকে জড়িয়ে ফেলল কী করে?'

'আমি তার একটা সমাধান করেছি। বাণীব্রতকে যে সমস্ত গল্পের বই ও মাসিক পত্রিকা পড়তে দেওযা হত তারই মধ্যে একটি পত্রিকায় গল্প ছিল একটা। বাণীব্রতর তুলতুল আসলে সেই গল্পের একটি দুষ্টু মেয়ের চরিত্র; নামও তার তুলতুল। ছড়া কাটে, দোলনায় দোলে, পুতুল কোলে করে ঘুবে বেড়ায়। মজা কী জানেন, সেই গল্পটির ঘটনাস্থানও দেওঘর। বাণীব্রত নিজেকে এই গল্পের দেওঘব আর তুলতুলের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলেছে।'

'তাই!'

'কিন্তু এ থেকে ওর মনের একটা অবরুদ্ধ বাসনা বোধ হয় ধরা পড়ে।'

'কী?'

'বোধহয় তার নিজের বাল্যকালের স্মৃতি, সেই দিনগুলোতে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছে।'

'কিছু জানতে পেরেছ?'

'পেরেছি। পেশেন্ট ফাইলে সেটা লেখা নেই। আমার ডায়েবিতে লেখা আছে। সুদক্ষিণাকে আমি কলকাতায় পাঠিয়েছিলাম বাণীব্রতর পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে ছোট-বড় যে-কোনও তথ্য জানা যাক না কেন জেনে আসতে। বাণীব্রতর কোনও আত্মীয় নেই। তার মার এক বাল্যসখীর কাছ থেকে সুদক্ষিণা অনেক কষ্টে কিছু তথ্য জোগাড় করে এনেছে। বাসায় ফিরে গিয়ে স্যার, আমি আপনাকে সে-সব কথা বলব। আর সেই সঙ্গে বাণীব্রতর স্বপ্নও।'

নীরবে দুজনে পথ হাঁটতে লাগল।

একসময় অধ্যাপক বললেন, 'তোমার এই রুগিটি বাস্তবিক ইনটারেসটিং। বড় জটিল কেস হে। মাঝে-মাঝে প্যারানইয়ার লক্ষণ চোখে পড়ে।'

'হ্যাঁ, স্যার, একটার সঙ্গে আর একটা এমনভাবে মেশানো যে এখনও নিঃসন্দেহে ওর রোগটা কী, তা স্থির করতে পারিনি।'

'তোমার কী মনে হয়?'

'Manic depressive psychoses—acute melancholia! আপনার কী ধারণা স্যার?'

'আমার?' অধ্যাপক মুখ থেকে পাইপ নামিয়ে একটু ভাবলেন, 'A case of extraordinary Paranoic psychoses! Of course this case is not of an acute type.'

আরও খানিকটা বেড়িয়ে অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় বললেন, 'ওহে, তোমাদের এ পার্বত্যপ্রদেশে আর বেশি হাঁটলে কাল আর আমার পায়ের অস্তিত্ব থাকবে না। চলো, বাড়ি ফেরা যাক।'

'চলুন।'

প্রণবের ঘর। গুরুশিষ্য গভীর আলোচনায় মগ্ন।

ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে শুয়ে রয়েছেন অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়। চোখ দুটি বোজা। পাইপের পাতলা, আঁকা-বাঁকা ধোঁয়ার রেখা উঠছে। ঘরের বাতাস ভরে উঠেছে তামাকের গন্ধে।

প্রণব অধ্যাপকের মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসে। হাতে তার নিজের ডায়েরি। সামনে টিপয়ের ওপর পড়ে রয়েছে হসপিটাল থেকে আনা বাণীব্রতর কেস-ফাইল আর চায়ের শূন্য পাত্র।

কুন্তলাদি ঘরে ঢুকে কখন নিঃশব্দে শূন্য চায়ের পাত্র পূর্ণ করে দিয়েছেন সেদিকে ওদের খেয়াল ছিল না। খেয়াল হল কুন্তলাদির কথায়, 'এবার জুড়িয়ে গেছে বললে আমি আর চা আনছি না।'

'বেশ তো, তুমি তৈরি করে রেখো, আমরা গিয়ে নিয়ে আসব।' অধ্যাপক বললেন মৃদু হেসে।

হেসে ফেললেন কুন্তলাদি, 'আপনি বুঝি তাই ভেবেছেন? না-না, আর নয়। কী যে মাথা মুন্ডু বক-বক করছেন দুজনে সারাদিন। আমাব কি গল্প করার কিচ্ছু নেই নাকি? এতদিন পরে এলেন যদি-বা, একটু কথা বলার জো নেই।' কুন্তলাদি রাগ করলেন।

'নেভার মাইন্ড। কাল আমি তোমার সঙ্গে পুরো একবেলা গল্প করব মা, কথা দিচ্ছি।' অধ্যাপক আগের মতো হাসতে লাগলেন।

'বেশ দেখব!' কুন্তলাদি ঘব ছেড়ে চলে গেলেন।

'কুন্তলা সেই আগের মতো তেমনটি থেকে গেল।' চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে অধ্যাপক বললেন, 'একেবারে মায়ের জাত। কোনওদিন তাকে বদলাতে দেখলাম না।'

প্রণব চুপ করে থাকল। এ কথার কোনও জবাব নেই। কুন্তলাদির জীবনের ব্যর্থতা এত গভীর ও অন্তঃস্রোতা যে তাকে অনুভব করা যায়, আলোচনায় টেনে আনা যায় না।

'হ্যাঁ, এবার স্বপ্নের কথাটা বলো।'

প্রণব তৈরি হয়ে নিলে।

'আগাগোড়া স্বপ্নটা কি আবার বলার দরকার হবে স্যার?'

'না তুমি এমনিই বলে যাও।'

'বাণীব্রতর দেখা প্রথম স্বপ্নের ব্যাখ্যা আমি এইভাবে করেছি।...জলের ওপর ভাসানো বিছানা; তার ওপর সে শুয়ে রয়েছে। কে যেন পাশে বসে ঘুম পাড়াচ্ছে। কে যে তা বাণীব্রত দেখতে পাচ্ছে না। তবু তার মনে হয় সে খুব চেনা। বাণীব্রত ঘুমিয়ে পড়ল। এখানে আমি স্যার, স্টেকেলের মতানুযায়ী জলের ব্যাখ্যা করেছি।...স্বপ্নে জল মানের প্রতীক। বিছানার সঙ্গে রেস্ট বা বিশ্রাম বৃহত্তরভাবে মনের একটা আরামপ্রদ নিরাপদ অবস্থা বোঝায়। স্বপ্নদ্রষ্টার মনের ইচ্ছেও তাই। —ঘুম পাড়ানো বলতে এখানে আমি বুঝছি বাণীর শৈশবাবস্থা। কেননা ছেলেবেলাতেই ঘুমপাড়ানোর প্রয়োজন ঘটে, পরে

আর নয়। আর ঘুমপাড়ানোর সঙ্গে সম্বন্ধ রয়েছে শিশুর নির্ভাবনাময় স্নেহ, আশ্রয়, পূর্ণ আত্মসমর্পণ। নির্ভরশীল অনায়াস এক জীবন। স্বপ্নের প্রথম অংশটির মোটামুটি অর্থ তা হলে দাঁড়াল—বাণীব্রত তার শৈশবজীবনের মধ্যে ফিরে যেতে ইচ্ছে করে। পাশে বসে যে ঘুম পাড়াচ্ছে বাণী তাকে চিনতে পারছে না—তবু তার মনে হয় সে খুব চেনা। বাণী ঘুমিয়ে পড়ে। এখানে বাণীকে ঘুম পাড়াচ্ছে যে তাকে আমরা বাণীর মা হিসেবেই গ্রহণ করতে পারি। মনে হয় খুব চেনা—অর্থাৎ বাণী তার অনুভূতিতে এই মহিলাটিকে অনুভব করতে পারছে; চিনতে পারছে না। কারণ বাণী তার মার প্রত্যক্ষ মূর্তিকে যে-কোনও কারণেই হোক মনে করতে চায় না। এ এমন কিছু আশ্চর্যের বিষয় নয়। মনের এই দ্বিত্বভাব—'হ্যাঁ' আর 'না' সর্বক্ষেত্রেই দেখা যায়। মার আশ্রয়ে যে নিরাপদ মধুর জীবনের আস্বাদ বাণীব্রত পেয়েছে সেটা আবার সে ফিরে পেতে চায়—কিন্তু তার মাকে চায় না। কেন? তবে কি এই মাকে কেন্দ্র করে কোনও তীব্র দুঃখপূর্ণ অভিজ্ঞতা লাভ করেছে ও?...আমার ধারণা স্যার, বাণী সত্যিই তাই করেছে।'

'কেমন করে?'

'সুদক্ষিণা বাণীব্রতর মার বাল্যসখীর কাছ থেকে যে খবর জোগাড় করে এনেছে তাতে দেখি বাণীব্রতর মা অ্যাকসিডেন্টে—দুর্ঘটনায় মারা যান। কী করে এই দুর্ঘটনা ঘটে তা ভদ্রমহিলা বলতে পারেননি। সে-সময় তিনি নাগপুরে। বহুদিন পরে কলকাতায় ফিরে এসে জানতে পারেন তাঁর বান্ধবী, বাণীর মা অ্যাকসিডেন্টের ফলে হাসপাতালে মারা গেছেন। ওর বাবা বাড়ি বদল করে অন্য জায়গায় উঠে গেছেন।'

'আর কিছু খবর?'

'হ্যাঁ, সামান্য। বাণী তার মাকে ভীষণ ভালোবাসত। এবং মা-ও তাঁর ছেলেকে ভীষণ ভালোবাসতেন। বাণীর সঙ্গে তার বাবার সম্পর্কটা বরং একটু ভয়-ভক্তির মাত্রা মেনে চলত।'

অধ্যাপক তাঁর চায়ের শূন্যপাত্র আবার পূর্ণ করলেন। প্রণবের পাত্রটিও দিলেন পূর্ণ করে। চিনি মেশাতে-মেশাতে বললেন তিনি, 'তুমি তা হলে বলতে চাও, যেহেতু অ্যাকসিডেন্টের ফলে বাণীব্রতর মা মারা যান, আর এটা একটা বড় দুঃখের অভিজ্ঞতা, তাই বাণীব্রত তার মাকে মনে করতে চায় না?'

'অনেকটা তাই। আমার আরও বিশ্বাস, এই অ্যাকসিডেন্টের সঙ্গে বাণীব্রত কোনও-না-কোনও ভাবে নিজেকে জড়িত বলে মনে করে। তাই তার মার মৃত্যুতে যে চরম দুঃখময় অভিজ্ঞতা সে সঞ্চয় করেছে—সে দুঃখ আর সে পেতে চায় না। ফলে বাণী স্বপ্নেও তার মাকে মনে করতে চায় না। আমার এ ধরনের বিশ্লেষণের যুক্তির কারণ আপনি স্বপ্নের পরের অংশটুকুতে পাবেন।' প্রণব চায়ের পেয়ালায় দ্রুত ক'টা চুমুক দিয়ে পকেটে হাত ঢোকাল সিগারেট কেসের জন্যে। হঠাৎ তার মনে পড়ল সামনে তার পরমশ্রদ্ধাস্পদ ব্যক্তিটি বসে। বেচারার সমস্ত শরীরটা মুষড়ে পড়ল। অনেকক্ষণ সিগারেট খাওয়া হয়নি। আর তার তো ঘণ্টায় কমপক্ষেও তিনটে সিগারেটের প্রয়োজন হয়। দুর ছাই। এরপর আবার বক-বক করতে হবে এখন ক'ঘণ্টা কে জানে? মাথা জমে গেছে যেন। অতএব মাথা ছাড়াবার জন্যে প্রণব বললে, 'আপনি এটা একটু দেখুন, আমি আসছি।'

প্রণব চলে গেল। অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় স্বপ্নের পরের অংশটুকু গভীর মনোযোগের সঙ্গে বিচার করতে বসলেন।

কখন যে প্রণব আবার ফিরে এসে বসেছে অধ্যাপক বুঝতে পারেননি। তন্ময় হয়ে তিনি স্বপ্ন-বিশ্লেষণ পাঠ করে চলেছেন।

'আমার অ্যানালিসিস—'প্রণব বলতে চাইল।

কিন্তু তার আগেই অধ্যাপক বলে উঠলেন, 'চমৎকার। ব্যাখ্যা তোমার ঠিক হয়েছে বলেই আমার মনে হয়। কিন্তু নৌকো বলতে তুমি এখানে ধরেছ বাণীব্রতর পারিপার্শ্বিক সংসার, তার আত্মীয়,

স্বজন, বন্ধু, বান্ধব—অর্থাৎ পারিবারিক পারিপার্শ্বিক। কেমন কি না?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। নৌকো একটা ভেসেল—আমাদের চলতি কথায় সব সময় 'জীবন-তরণী' কথাটা আমরা ব্যবহার করে থাকি। কিন্তু এখানে নিজেকে বাদ দিয়ে সংসারের দিকে তাকালে কি মনে হয় না, সত্যি বুঝি লোকজন, হাসি-দুঃখ, অভাব অভিযোগ ভরা, ভিড় করা একটা নৌকো ভেসে চলেছে! আমি শুধু তার নীরব দর্শক। শুধু বাণীব্রতর শৈশবজীবন কেন, তার উত্তরজীবনের দিনগুলো যেভাবে কেটেছে তাতে তো দেখি সে একা, নিরপেক্ষ, আত্মকেন্দ্রিক একটি প্রাণী। তার আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধবের সংখ্যা একান্তই নগণ্য। আবার যাও আছে তাদের সঙ্গে ওর কোনও সম্পর্ক নেই। সংসার থেকে নিজেকে সে সরিয়ে রাখতে চায়—আর বাণীব্রতর মনের গড়নটাই সেরকম বলে আমার ধারণা—তখন তার পক্ষে নিজের শৈশব ও কৈশোর জীবনেও সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পারিপার্শ্বিক ব্যবহারিক জগৎকে দেখার ইচ্ছেই কি যুক্তিযুক্ত নয়?'

'আমি বলি কি নৌকোর ব্যাখ্যাটা তুমি এভাবে করো না। যদিও তোমার-আমার শেষ বক্তব্য একই দাঁড়াবে, তবু এখানে স্বপ্নে রূপান্তরিত নৌকো সময়ের প্রতীক হিসেবে দেখা দিয়েছে বলেই আমার বিশ্বাস। তাহলে স্বপ্নের পরবর্তী অংশের অর্থ দাঁড়ায়—বাণীব্রতর সুখময় শৈশবজীবনের পর সময় কেটে যেতে লাগল।...ঘুম ভাঙল হঠাৎ। চোখ খুলে দেখি—একটা নৌকো আমার বিছানার পাশ দিয়ে ভেসে যাচ্ছে; তাতে অনেক লোক। তাদের কথাবার্তা আমার কানে আসছিল। ওদের মধ্যে কেউ যেন বললে—এই হ্রদের জলে একটি মেয়ে ডুবে গেছে। তাদের কথা শুনে আমার ভীষণ ভয় হল।...আমার মতে এই অংশটুকুর অর্থ : বাণীব্রত একদিন তার পারিপার্শ্বিক আত্মীয়-স্বজনের কারুর কাছ থেকে হঠাৎ জানতে পাবল—কি নিজেই তার 'সাবকনসাসে' অনুভব করলে প্রথম যে, তার মার অ্যাকসিডেন্টের জন্যে সে দায়ী।'

'সে দায়ী?' প্রণব প্রায় চমকে উঠে উচ্চারণ করলে।

'Yes—he thought himself responsible for the accident—his conscious partly admitted the fact! যদি তার সজ্ঞান মনে—আমি আমার মার দুর্ঘটনার জন্যে দায়ী—এই চিন্তা না আসবে, তাহলে সে ভয় পাবে না। স্বপ্নে তুমি হ্রদ কথাটার অর্থ বাদ দিয়ে রেখেছ। এখানে হ্রদ আর কিছুই নয়, বাণীব্রতর সমস্ত জীবনটার প্রতীক। ভেবে দেখ, স্বপ্নটুকুর অর্থ কেমন সহজ হয়ে এল। একদিন হঠাৎ কোনও সূত্রে বাণীব্রত বোধ হয় জানতে পারল, তার জন্যেই মা তার মারা গেছেন। এই জানার আঘাত যে কী, তা তো বুঝতেই পারো। তারপর শুরু হল তার অবচেতন মনে এই মারাত্মক পাপ বোধের চিন্তা আর সজ্ঞান মনে সেই পাপ বোধকে অস্বীকার করার দুর্দমনীয় স্পৃহা। The conflict comes—বিপরীত উভয় চিন্তার দ্বন্দ্ব হল শুরু।'

'ব্রিজ?'

'ব্রিজই তো হবে।...শুধু দেখতে পেলুম হ্রদের এপার থেকে ওপার পর্যন্ত একটা ব্রিজ—সেই ব্রিজের ওপর একটা কুকুর বসে ডাকছে। কী বিকট তার ডাক আর জ্বলন্ত দৃষ্টি! কুকুরটা আমায় দেখতে পেয়ে লাফিয়ে পড়ার জন্যে ছুটে এল। ভয়ে আমার সমস্ত শরীর কেমন হয়ে আসে। কুকুরটা আমার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ার জন্যে বিরাট লাফ দিল।'...এ অংশটায় তোমার সঙ্গে আমি একমত। ব্রিজ যেমন একটা জায়গার সঙ্গে আর একটা জায়গার সংযোগ আই মিন লিংক রাখে, তেমনি বাণীব্রতর সমস্ত জীবন ওই এক দুশ্চিন্তা দিয়ে লিংক-আপ মানে জোড়া থাকল। কুকুরের ব্যাপারটা কিন্তু আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। আবার কোন এক জায়গায় কুকুরের উল্লেখ আছে না?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ—তার শেষ স্বপ্নে আবার কুকুরের কথা আছে। তা ছাড়া বাণীব্রত ফ্রি অ্যাসোসিয়েশানের সময় অনেকবারই কুকুরের কথা বলেছে।'

'What it means?' অধ্যাপক চিন্তিত হলেন।

'আমার মনে হয় কুকুরটা বাস্তবেও কুকুর।'

'ওকি কুকুর দেখে ভয় পায়?'

'কুকুর দেখে ঠিক ভয় পায় না—অস্বস্তি বোধ করে। কুকুরের ডাক ভীষণ অপছন্দ করে। একদিন আমি পরীক্ষা করার জন্যে ডাঃ গুপ্তের গ্রে হাউন্ড কুকুরটা নিয়ে ওর কাছে গিয়েছিলাম। বাণীব্রতকে দেখে সে ডেকে উঠল। দেখলুম, বাণীব্রত ভয় পেয়ে ছুটে তার কেবিনে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল। তারপর ক'দিনই ও আমাকে দেখলে সোজা কেবিনে ঢুকে পড়ে দরজা বন্ধ করে দিত। অনেক কষ্টে আমি তার সে ভয় ভাঙিয়েছি। অবশ্য আর কোনওদিন কুকুর নিয়ে তার সামনে যাইনি।'

'ও! যাক, তুমি দ্বিতীয় স্বপ্নটা বলো।' অধ্যাপক আবার ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে শুয়ে পড়ে পাইপে তামাক ভরতে লাগলেন।

প্রণব তার ডায়েরিটা তুলে নিল।

'দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্বপ্ন দুটো তেমন জটিল নয়। তার কারণ স্বপ্নের এই দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্ব দুটির পরিপূরক হিসেবে বাণীব্রতর জীবনের দুটি অধ্যায়ের নানা বিষয় জানা সম্ভব হয়েছে। আপনি স্যার স্বপ্নটি পড়ে যান আমি তার যা ব্যাখ্যা করেছি বলে যাই—তাতে সুবিধে হবে।'

'বেশ তো দাও।' অধ্যাপক হাত বাড়িয়ে ওর ডায়েরিটা নিলেন। পাইপটা জ্বালিয়ে নিয়ে পড়তে লাগলেন, 'আমি মাঠের ওপর দিয়ে হেঁটে চলেছি। ঝড় উঠেছে। গাছগুলো মাটির সঙ্গে মিশে যেতে লাগল ঝড়ের দাপটে। মাঠের মধ্যে একটা বাড়ি দেখে আমি সেখানে গিয়ে উঠলাম।'

'বাণীব্রত তার অশান্তিময় জীবনের দিনগুলো এক-এক করে কাটিয়ে চলল। কৈশোর শেষ হল। এল যৌবন। দুশ্চিন্তা আর আত্মদ্বন্দ্ব যেন আরও বেড়ে উঠল। অন্তরে সে অনুভব করল যৌবনের প্রথম তাপ। মন চাইল একটুখানি আশ্রয়। অবশেষে সে আশ্রয় খুঁজে পেল বাণীব্রত।' প্রণব থামল।

'Quite good!' অধ্যাপক পড়ে যেতে লাগলেন আবার : 'একটি মেয়ে—হ্যাঁ, একটি মেয়ে এসে আমায় দরজাটা খুলে দিল। আমার বেশ মনে পড়ে, মেয়েটি আমায় দেখে হেসে বললে, এত দেরি হল? আমিও হাসলুম।'

'এই মেয়েটি বাণীব্রতর জীবনে আনল প্রথম প্রেম!' প্রণব বলে চলল, 'যৌবনে বাণীব্রত যাকে তার সাথী করার জন্যে উন্মুখ হয়ে উঠেছিল, যার কাছে চেয়েছিল আনন্দ, ভোগ, ভালোবাসা ও আশ্রয়—এই মেয়েটি সেই। বাণীব্রত ভেবে নিল তার দাবি মেটাবার ক্ষমতা আছে এর। এবং বাস্তবে এরই নাম নীলা।'

'You mean that lady—wife of Dr. Chakravartty?'

'হ্যাঁ স্যার, তবে নীলা তখন কুমারী। বাণীব্রতর প্রেমের জীবনের এই শুরু।'

'Can You explain this—আমার বেশ মনে পড়ে মেয়েটি আমায় দেখে হেসে বললে, এত দেরি হল? আমিও হাসলুম।'

'আলাদাভাবে এ কথাটির ওপর আমি গুরুত্ব আরোপ করিনি। কেননা মেয়েটির হাসা এবং আসতে দেরি হওয়ার জন্যে প্রশ্ন করা আর কিছু নয় নীলা ও বাণীর সহজ ঘনিষ্ঠ পরিচয়কে বোঝাচ্ছে।'

'আচ্ছা, তারপর পড়ি।...খানিক পরে আমি সেই মেয়েটির সঙ্গে টেবিলে বসে খাচ্ছি, হঠাৎ কড়িকাঠ থেকে একটা দড়ির দোলনা ঝোলানো রয়েছে দেখি। কে একজন অন্ধকারে বসে দুলছে তাতে। দোলনাটা দুলতে-দুলতে আমাদের টেবিলের কাছে এসে পড়ছিল। এত ভয় করছিল আমার। আমি বারণ করলুম। দোলানার লোকটা হেসে উঠে যেন আরও বাড়াবাড়ি শুরু করলে।' অধ্যাপক থামলেন।

প্রণব বলে চলল, 'নীলার সঙ্গে বাণীব্রতর ঘনিষ্ঠতা বেশ বৃদ্ধি পেল। এমন সময় বাণীব্রত আবিষ্কার করলে—তার এবং নীলার ঘনিষ্ঠতা অন্তরাল থেকে আর একজনের লক্ষ্যবস্তু হয়ে উঠেছে। এই লোকটিকে বাণীব্রত পছন্দ করে না, তাই মনে করতেও চায় না। ক্রমশই সেই অন্তরালের লোকটি

বাণী ও নীলার প্রেম-জীবনের গণ্ডির মধ্যে প্রবেশ করল। বাস্তবের ঘটনাও বোধহয় তাই। নীলা যদিও বলে, ডাঃ চক্রবর্তীর সঙ্গে তার আলাপ প্রথমটায় তেমন ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেনি, তবু সে কথা বিশ্বাস করতে আমার বাধে। বরং আমার মনে হয় বাণীব্রতর চোখের আড়ালে নীলা এবং ডাঃ চক্রবর্তীর মধ্যে যথেষ্ট অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠেছিল। বাণীব্রত যখন সেটা বুঝতে পারল, তখন থেকেই অস্বস্তি এবং ভয়ে ও বেচারি মুষড়ে পড়ল। ডাঃ চক্রবর্তী যদিও বাণীব্রতর ভাই এবং সমবয়েসি বন্ধু, তবু মনে হয়, বাণীব্রত ডাঃ চক্রবর্তীকে মনে-মনে কোনওদিনই খুব বেশি পছন্দ করত না। বিশেষত এ-হেন ঘটনার পর বাণীব্রতর মনে হয়েছে, ডাঃ চক্রবর্তী স্বভাবে স্বার্থপর, নির্দয়, যুক্তিহীন এক মানুষ। ...যাই হোক, শেষ পর্যন্ত বাণীব্রত বোধ হয় ডাঃ চক্রবর্তীকে বারণ করলে নীলার সঙ্গে বেশিমাত্রায় মেশামেশি করতে। ডাঃ চক্রবর্তী সে কথা হেসে উড়িয়ে দিয়ে নীলার সঙ্গে তার গোপন অন্তরঙ্গতা আরও বাড়িয়ে তুলল।'

অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় মাথা নেড়ে অস্পষ্ট, মৃদু দু-একটা কথায় প্রণবের স্বপ্ন ব্যাখ্যায় সমর্থন জানাচ্ছিলেন। প্রণব চুপ করলে বললেন অধ্যাপক, 'এবার শেষ অংশটুকু ঃ খাওয়া ছেড়ে উঠে চলে আসতে যাচ্ছি, হঠাৎ দোলনা থেকে লোকটা নেমে এসে আমার হাত চেপে ধরল। দোলনার দড়িটা জড়িয়ে দিল আমার গলায়, বললে, আমার গলায় দড়ি দিয়ে মরাই উচিত তারপর লোকটা সেই মেয়েটিকে নিয়ে হাসতে-হাসতে চলে গেল। টেবিলের পাশে দাঁড় করানো পাথরের একটি ভাঙা 'ভেনাস মূর্তি' এতক্ষণ পরে আমার চোখে পড়ল। ভেনাস মূর্তিটা যেন প্রাণ পেয়ে খিল-খিল করে হেসে উঠল।'

'স্বপ্নের এই অংশটুকু বেশ বুঝতে পারি। বাণীব্রত বুঝতে পারল নীলার সঙ্গে তার মন বিনিময়ে বাধা এসে জুটেছে, আর সে বাধা ঘুচোনো সম্ভব নয়।'

'কেন সম্ভব নয়?'

'বোধ হয় কোনও ব্যাপারে বাণীব্রত ডাঃ চক্রবর্তীকে ভয় পেত। উপরন্তু হয়তো নীলাব প্রেমের সততা সম্বন্ধে সে সন্দেহ করেছিল ইতিমধ্যে।'

'বেশ, তারপর?'

'তখন বাণীব্রত নীলার জীবন থেকে সরে আসতে চেয়েছে। সম্ভবত এ সময়েই ডাঃ চক্রবর্তী বাণীব্রতকে একেবারে চিরকালের জন্যে নীলার জীবন থেকে সরিয়ে দেওয়ার আশায় কোনওরকম ভয় দেখায়। এরপর ডাঃ চক্রবর্তী নীলাকে নিয়ে উধাও হয়ে গেলেন। বাণীব্রতর জীবনে প্রথম প্রেম এমনি করেই একদিন গভীর আঘাত পেয়ে ব্যর্থ হয়ে গেল। তাই 'ভেনাস' অর্থাৎ প্রেমেব দেবীর প্রতিমূর্তিকে বাণীব্রত দেখেছে ভাঙা। মূর্তির হাসিটা আর কিছু নয় বিদ্রুপ। প্রেম যেন বাণীকে হেসে উঠে বিদ্রুপের কশাঘাতে স্থবির করে দিলে।'

দ্বিতীয় স্বপ্নটির বিশ্লেষণ শেষ হল। প্রণব আবার একবার উঠে বাইরে থেকে ঘুরে এল। অধ্যাপক ইজিচেয়ারে চোখ বুজে শুয়ে ভাবতে লাগলেন স্বপ্ন-কথা।

একটু পরে প্রণব নিজের চেয়ারে ফিরে এসে বললে, 'তৃতীয় স্বপ্নটা স্যার, যদিও গোড়ার দিকটা সহজ কিন্তু শেষটা বেশ জটিল। এই স্বপ্নটি থেকেই আমার বদ্ধমূল ধারণা দাঁড়িয়েছে বাণীব্রত খুনি নয়—ডাঃ চক্রবর্তীকে সে হত্যা করেনি।'

'বলো শুনি।'

'স্বপ্নটা বাণীর ভাষায় এরকম।' প্রণব ডায়েরি তুলে নিয়ে পড়তে লাগল; 'ট্রেনের কামরা থেকে নামলাম। একটা সুন্দর ছোট্ট স্টেশন—স্টেশনের পাশ দিয়ে একটা পথ। হেঁটে চলেছি আমি।'

'জীবনের চলার পথে আর এক নতুন অধ্যায়ের কথা বলতে চাইছে ও।

'A fresh start?'

'ঠিক তাই, স্যার। বাণীব্রতর জীবনের নতুন পর্ব—তারই কথা। শুনুন স্বপ্নটা ঃ হেঁটে চলেছি—

হ্যাঁ, আমি গান শুনতে পেলুম, কে যেন জানলা খুলে ডাকল আমায়—চেয়ে দেখি সাজপরা, সিঁথিমৌর পরা একটি মেয়ে—কত ফুল ফুটে রয়েছে জানালার ধারে। সেই ফুলের ওপর ভাসছে মেয়েটির মুখ। কী সুন্দর তার হাসি। আমায় সে ডাকল।' প্রণব একটু থামল। ডায়েরির পাতা থেকে চোখ তুলে বলল, 'দেওঘরের বিষয় আর কী। বাণীব্রতর সঙ্গে সুদক্ষিণার পরিচয়। সুদক্ষিণার গান শুনে তার প্রতি আকৃষ্ট হওয়া। সুদক্ষিণাকে আপনি দেখেননি; দেখলে বুঝতে পারতেন—তার প্রকৃতিতে এমন সুন্দর একটা নমনীয় ভাব আছে যা সকলকে মুগ্ধ করে। লক্ষ করে দেখুন—গান, ফুল, সিঁথিমৌর—ব্যবহারিক জীবনে যা সুন্দর, যা আমরা ভালোবাসি, শ্রদ্ধা করি, সবের মিলন ঘটেছে স্বপ্নে। উপরন্তু—'আমায় সে ডাকল।' বুঝতে পারছেন, বাণীব্রত এতদিন পরে তার মনের মতো একটি নারীকে আবার খুঁজে পেল। দেওঘরের কথা সুদক্ষিণার কাছে সবই আমি শুনেছি। বাণীব্রত তাকে দেখে বাস্তবিক মুগ্ধ হয়েছিল, ভালোবেসেছিল। ওদের মন জানাজানিও হয়ে যায় এসময়।'

'বুঝতে পেরেছি। তারপর?'

'এলাম তার কাছে। খুব ভালো লাগছিল। আমি যেই মেয়েটির কাছাকাছি এসেছি, হঠাৎ দেখলাম ফুলের গাছ মিলিয়ে একটা বীভৎস কুকুরের মুখ ভেসে উঠল; ক্রুদ্ধ গর্জনে সমস্ত জায়গাটা ভরে তুলল। কুকুরটা আমায় দেখতে পেলে। আমি ভয় পেয়ে পেছিয়ে এলাম। মেয়েটির কাছে যাওয়ার জন্যে অন্য পথে পা বাড়ালুম।' প্রণব ডায়েরির পাতা থেকে চোখ তুলে বললে, 'এর অর্থ বোধহয়, বাণীব্রত যখন সুদক্ষিণার জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠে নতুন দিনের স্বপ্নে বিভোর হয়ে উঠেছে, তখন হঠাৎ কোনওরকম বাধা এসে জুটল আবার।'

'কী বাধা?'

'তা জানি না। সম্ভবত ডাঃ চক্রবর্তীর আবির্ভাবের ব্যাপারটাই বোঝাচ্ছে।'

'আমারও তাই মনে হয়।'

প্রণব পড়ে চলল ঃ 'অন্য পথে পা বাড়ালুম। খানিকটা গিয়ে দেখি সে পথও বন্ধ। একটা লোক খুব বড় একটা দড়ি নিয়ে ঘোরাচ্ছে। কাছে গিয়ে দেখি সেটা দড়ি নয় ভীষণ বড় সাপ। আমায় দেখে সে দড়িটা আমার দিকে ছুঁড়ে দেওয়ার চেষ্টা করতে আমি বাধা দিতে গেলাম। তারপব কী হল কে জানে! ভীষণ গণ্ডগোল আর হইচই। কারা যেন 'পুলিশ' 'পুলিশ' বলে চিৎকার করতে লাগল। আমি পালাতে লাগলাম।'

প্রণব ডায়েরি বন্ধ করে অধ্যাপকের মুখের দিকে তাকিয়ে বসে থাকল।

'দড়ি নিয়ে ঘোরানোয় কী বুঝতে পারো?'

'গোপন ষড়যন্ত্র। দড়ির সঙ্গে বাঁধার অঙ্গাঙ্গী একটা সরল সম্বন্ধ আছে। ষড়যন্ত্রের জালে বাণীকে বাঁধার চেষ্টা চলছিল বলে মনে হয়। স্বপ্নে যে লোকটা অদৃশ্য আছে সে যে কে, তা বলা মুশকিল।'

'ডাঃ চক্রবর্তী?'

'সন্দেহ হয় তাঁকেই বেশি। অন্য কেউ হতেও পারে।'

'তাহলে শেষ পর্যন্ত?'

'অনেক বিচার বিবেচনা করে আমার ধারণা হয়েছে, বাণী তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পেরে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু বাধা দিতে গিয়ে তাকেই হিংস্র কোনও আক্রমণ সহ্য করতে হয়। সাপের ভাবগত অর্থ বিচার করলে দেখব, আলোচ্য প্রাণীটা আমাদের মনে হিংস্র, নিষ্ঠুর, বিষাক্ত দ্রব্য, বিপদ ও ভয়ের ভাব জাগায়। এখানে সাপ ছুঁড়ে দিয়ে বাণীব্রতকে ভয় পাওয়ানো এবং হত্যা এই উভয় চেষ্টাই করা হয়েছে। তবে মনে হয় ভয় ঠিক নয়—সম্ভবত হত্যা করার চেষ্টাই করা হয়েছিল। নয়তো—' প্রণব হঠাৎ থেমে গেল।

'নয়তো—নয়তো কী?' অধ্যাপক উদগ্র কৌতূহল নিয়ে জানতে চাইলেন।

'ডাঃ চক্রবর্তীর রিভলভারে তিনি নিজেই কী করে আহত হন?' প্রণবের কথাটা গভীর রহস্যময় বলেই মনে হল অধ্যাপকের।

তিনি বললেন, 'ষড়যন্ত্র আর হত্যা করার বিষয় তুমি দৃঢ় সঙ্কল্প?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। স্বপ্নে সাপ ডাঃ চক্রবর্তীর প্রতীকও হতে পারে। এমন কি রিভলভারেরও। এ রকম একটা ব্যাখ্যা আমি পড়েছি।'

'তুমি ফ্রি অ্যাসোসিয়েশান করে কিছু উদ্ধার করতে পারোনি?'

'না। আগে যাও বা এক আধদিন হয়েছে এখন তাও হয় না।'

দুজনেই নির্বাক হয়ে ভাবতে লাগলেন।

অনেকক্ষণ পরে প্রণব বললে, 'সমস্ত স্বপ্ন মিলিয়ে, বিচার বিশ্লেষণ করে আমার ধারণা হয়েছে, বাণী ছেলেবেলায় কোনও কারণে একটা ভীষণ রকমের মানসিক আঘাত পায়। সেই আঘাতই তার মনের নিভৃতে বেড়ে উঠেছে। যৌবনে নীলাকে ভালোবেসেও শেষ অবধি তাকে হারাতে হল, গোপনে বহন করা এই আঘাতের জের হিসেবে। সুদক্ষিণাকে একান্ত করে পেয়েও পাওয়া হল না, তাও এই আঘাতেরই আর একটা জের। বাণীব্রত আজীবন ভয় পেয়েই গেছে, কাউকে ভয় দেখাতে যায়নি। খুন—না, বাণীব্রত খুন করেনি। তার পক্ষে ওটা নেহাতই বাহুল্য।'

অধ্যাপক কোনও উত্তর দিলেন না। ইজিচেয়ার ছেড়ে উঠে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন।

প্রণব চিন্তিতমনে চুপ করে বসে থাকল।

এক-একটি দিনের আয়ু খুব বেশি নয়। বিশেষ কোনও অবস্থায় যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করে বিচার করলে তবেই যেন মনে হয়, একটা পুরো দিন, দীর্ঘ চব্বিশ ঘণ্টা যেন অনেক—অনেকটা সময়। দুহাত দিয়েও যাকে কুলিয়ে ওঠা যায় না। এ না হলে একটি দিনের আয়ু আর এক মুহূর্তের একটি নিশ্বাস—এদের পরমায়ু সমানই। চোখের পলকে তার স্থিতি।

দিন আসে, যায়।

দেখতে-দেখতে আরও আট-ন'মাস কেটে গেল। ক্যালেন্ডারের পাতায় আর হাসপাতালের খাতায় দীর্ঘ এই সময়ের হিসেব লেখা থাকল। লেখা থাকল না শুধু বাণীব্রতর জীবনে। তার কাছে বুঝি সময়ের মূল্য শেষ হয়ে গেছে।

আজও সেই আগের মতোই দিন কাটছে বাণীব্রতর। বড় রকমের কোনও একটা পরিবর্তন তার হয়নি। নিকট ভবিষ্যতে হবে—এমন আশাও করা যায় না। মনের দিক থেকে, ব্যবহারে, কার্য-কারণ, শৃঙ্খলা-বোধ ও অনুভূতির ক্ষেত্রে বাণীব্রত যথেষ্ট উন্নতি লাভ করেছে। সহজে কারুর ধরার উপায় নেই সে মনোবিকারের রুগি। কথাবার্তা, আচরণ স্বাভাবিক, একটা মানুষের যেমনটা হতে পারে বাণীব্রতরও তাই। সেটা স্থায়ী নয়। অস্থায়ী। মাঝে-মাঝে, হঠাৎ সমস্ত সামঞ্জস্যকে উলটে-পালটে বাণীব্রত তার স্বরূপ প্রকাশ করে ফেলে।

সম্ভবত বাণীব্রতর সুবিধে এবং ভালোর আশা করেই তাকে পুরোনো কেবিন থেকে সরিয়ে হাসপাতালের প্রথম শ্রেণীর স্বতন্ত্র একটি কেবিনে ঠাঁই দেওয়া হয়েছে। এখানকার কড়াকড়ি নিয়মকানুন ওর ওপর থেকে যথাসম্ভব উঠিয়ে, স্বাধীন একটা জীবনের যথাসম্ভব ব্যবস্থা করে দিয়েছে প্রণব। বাণীব্রত সে স্বাধীনতা ভোগ করছে অক্ষুণ্ণভাবে।

এদিকে সুদক্ষিণার দিন কাটছে মাঝরাতের ছোট স্টেশনের মতো। থেকেও যেন নেই। দরকার পড়লেই ওকে জেগে উঠতে হবে—সাড়া দিতে হবে ডাক এলেই; কিন্তু দরকার আর হয় না, ডাক আর আসে না। অপেক্ষায়-অপেক্ষায় ও যেন অসাড়।

চাকরি গেছে সুদক্ষিণার। মনোহরপুর থেকে পাততাড়ি গুটিয়ে ধানবাদ অঞ্চলে কোথায় যেন

ও একটা চাকরি আবার খুঁজে নিয়েছিল। এখন এখানেই মাস্টারি করে। নিয়মিত আসে পরেশনাথে। ক'দিন থাকে। আবার ফিরে যায়।

পুলিশ থেকে ইতিমধ্যে একটা খবর এল। মিঃ ঝা জানালেন প্রণবকে। খবরটা চশমা সংক্রান্ত। ডাঃ চক্রবর্তীর বসবার ঘরে যে ভাঙা চশমার কাচ পাওয়া যায় এবং এতদিন যা বাণীব্রতর বলে অতি সহজেই অনুমান করে নেওয়া হয়েছিল, আসলে সে চশমাটা নীলার। পুলিশ ডাঃ চক্রবর্তী যে-ঘরে মারা যান সে ঘরে বাণীব্রতর হাজির হওয়া সম্বন্ধে একাধিক যেসব স্থূল প্রমাণ পেয়েছিল তারপর আর সামান্য একটা ভাঙা চশমার কাচ নিয়ে মোটেই তারা মাথা ঘামায়নি। চশমাটা যে তার সেটা স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণের মতোই ওদের মনে হয়েছে। সাম্প্রতিক তদন্তের ফলে নীলা জানিয়েছে, তাড়াতাড়ি ছুটে আসতে গিয়ে তার চশমাটা ভেঙে যায়। চশমার বাকি অংশটুকু কোথায় সে রেখেছে মনে পড়ছে না। তাড়াতাড়িতে কোথায় ফেলেছে কে জানে—মনে করতে পারে না এখন। চিঠিটা পেয়ে প্রণব যেন একটু বেশি উৎসাহিত হয়ে উঠল।

একদিন। কত রাত কারুর খেয়াল নেই। পুবের হাওয়া আসছিল দমকে-দমকে। খাওয়া-দাওয়া সেরে বারান্দায় বেতের চেয়ার টেনে বসে গল্প করছিল প্রণব, কুন্তলাদি আর সুদক্ষিণা।

গল্প বেশ জমে উঠেছিল। বক্তা কুন্তলাদি। বিষয়—ছেলেবেলায় নানা দুষ্টুমির কাহিনি। কী একটা কথায় প্রণবের বুঝি আপত্তি দেখা দিল। আপত্তি জানিয়ে সে বললে, 'কে বললে মনে নেই? তবে—' প্রণব তার কথা শেষ না করেই সামনে গেটের দিকে তাকিয়ে থাকল। অন্ধকারে টর্চ জ্বালিয়ে গেট খুলে কে যেন দ্রুতপায়ে এগিয়ে আসছে।

সকলেই সেদিকে চোখ ফেরাল।

বারান্দার কাছাকাছি আসতেই আগন্তুকের টর্চের আলো এসে পড়ল প্রণবদের গায়ে। লোকটা হন্তদন্ত হয়ে বারান্দার নীচে এসে দাঁড়াল।

'ডাক্তারবাবু, শীঘ্রি আসুন।' গলায় তার উত্তেজনা। হাঁপাচ্ছে লোকটা। হাসপাতাল থেকে ছুটতে-ছুটতে আসছে বোঝা গেল।

প্রণব চেয়ার ছেড়ে উঠে এগিয়ে এসেছে। 'কী হয়েছে, কালিচরণ?'

'দুনম্বর কেবিনের বাবুকে পাওয়া যাচ্ছে না!'

'সেকি—বাণীবাবু?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, বাণীবাবু। তিনি যে কখন হাসপাতাল থেকে চলে গেছেন কেউ জানে না।'

প্রণবের চোখের সামনে অন্ধকার আরও ঘন হয়ে এল। পায়ের তলায় বারান্দাটা যেন হঠাৎ খুব হালকা মনে হল ওর। হৃৎপিণ্ডটা ঝোড়ো হাওয়ার মতো বেসামাল হয়ে উঠল।

সুদক্ষিণাও ততক্ষণে প্রণবের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, 'কতক্ষণ বাণীবাবুকে পাওয়া যাচ্ছে না?'

'ঠিক করে কেউ বলতে পারছে না। কেউ বলছে বিকেল থেকে, কেউ বলছে সন্ধের পর থেকে।'

'দারোয়ান কী করছিল? প্রণবের গলার স্বর ভীষণ গম্ভীর।'

'আজ্ঞে সে দেখেনি।'

'দেখেনি?' প্রণব দাঁতে-দাঁত চেপে ক্রোধ দমন করলে। 'বড় ডাক্তারবাবুকে খবর দিয়েছ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, সিধু গেছে খবর দিতে।'

প্রণব অস্থিরভাবে পায়চারি শুরু করলে। এমন যে হতে পারে সে ভাবেনি, কল্পনা করেনি। কোথায় গেল বাণীব্রত? কেনই বা গেল? হাসপাতাল থেকে লুকিয়ে পালিয়ে যাওয়ার কী কারণ ঘটল? কিন্তু হাসপাতালই যে একরকম তার জামিন। এবার তো আর পুলিশ ছাড়বে না। বাণীব্রত

যে খুনি নয়, তার কোনও প্রমাণ আজ পর্যন্ত পুলিশের কাছে পেশ করা হয়নি। এখনও বাণীব্রতর নামে হত্যা-দায়ের অভিযোগ। তার নামে ওয়ারেন্ট। কী হবে এবার? বাণীব্রতকে যদি খুঁজে না পাওয়া যায়? পুলিশ থেকে সহজে ছাড়বে না তাদের। ওরা নিশ্চয় সন্দেহ করবে তাকে। হয়তো প্রমাণ করবার চেষ্টা করবে প্রণব ষড়যন্ত্র করে বাণীব্রতকে সরিয়ে দিয়েছে। কী লজ্জার কথা! ছিঃ-ছিঃ। তার নিজের সম্মান, দায়িত্ব, এ হাসপাতালের সুনাম, কুমার বাহাদুরের উঁচু মাথা সব আজ ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে দিল বাণীব্রত। নিজের ওপর অসম্ভব রাগ হতে লাগল প্রণবের। বাণীব্রতকে অতটা স্বাধীনতা দেওয়া তার উচিত হয়নি। হাসপাতালের খানিকটা কড়াকড়ি নিয়মের মধ্যে রাখলে এমন মারাত্মক কাণ্ডটা ঘটত না। কুন্তলাদি জামা এনে দিলেন। প্রণব কোনওরকমে জামাটা গলিয়ে নীচে নামবার জন্যে পা বাড়িয়েছে, দেখে সুদক্ষিণাও তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

'তোমার সঙ্গে আমিও যাব।' সুদক্ষিণা দৃঢ় কণ্ঠে বললে।

প্রণব বারণ করতে যাচ্ছিল, হঠাৎ কী ভেবে শেষে বললে, 'বেশ, চলো।'

ওরা বারান্দা থেকে নেমে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। কুন্তলাদি নির্বাক বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন পাথরের মতো।

হাসপাতালে এসে প্রণব দেখল, ডাঃ গুপ্ত ততক্ষণে পৌঁছে গেছেন। বাণীব্রতর কেবিনের সামনে জনাকতক নার্স আর চাকর-দারোয়ানদের ভিড়। ডাঃ গুপ্তকে রাগতে প্রণব কোনওদিন দেখেনি। আজ এই প্রথম দেখল। শান্ত, মৃদু, হাস্যসিক্ত স্বর আর নয়—রাগে তাঁর সমস্ত মুখখানা আগুন-ধরা উনুনের আঁচের মতো লাল টকটকে হয়ে উঠেছে। থরথর করে কাঁপছেন তিনি। কর্কশ, তিক্ত, কঠিন হয়ে উঠেছে তাঁর কণ্ঠস্বর। জেরা করে, ধমকে একসার করছেন। প্রণব এসে দাঁড়াতে ডাঃ গুপ্ত বললেন, 'প্রণব, কালকে এদের একধার থেকে সব দূর করে তাড়িয়ে দেবে। আমার হাসপাতালে দায়িত্বজ্ঞানহীন কতকগুলো অপদার্থ ভূত পুষতে আমি রাজি নই।'

প্রণব সে-কথার কোনও জবাব না দিয়ে প্রথমেই কেবিনের মধ্যে ঢুকে পড়ল। টিপয়ের ওপর বাণীব্রতর খাবার ঢাকা দেওয়া পড়ে রয়েছে। জানালা ভেজানো। টেবিলের ওপর টুকিটাকি জিনিস, দু-একটা বই অগোছালো হয়ে পড়ে আছে।

টেবিলের ওপর থেকে প্যাডখানা টেনে নিল প্রণব। পাতা ওলটালো। সবুজ কাগজের ওপর কোথাও একটি কালির আঁচড় নেই। বাইরে এসে প্রণব বললে, 'দু-নম্বর কেবিনে খাবার দিয়ে গেছে কে?'

'বিশ্বনাথ কই?'

'বিশ্বনাথ ভিড়ের মধ্যে ছিল না। মিসেস নাগ বললে, 'ও বোধ হয় মিস দত্তর বাড়িতে আছে।'

'কেন?'

'আজকাল রাত্রিতে ও ওখানেই থাকে, রান্নাবান্না করে।'

বিশ্বনাথকে ডাকতে পাঠানো হল।

ডাঃ গুপ্ত বললেন, 'স্টেশনে আমি লোক পাঠিয়েছি। যদি কোনও খোঁজখবর পাওয়া যায়। পুলিশেও একটা তার পাঠানো দরকার।'

প্রণবও কথাটা ভেবে দেখেছে। কিন্তু তার পাঠাবার আগে নিজেদের একবার চেষ্টা করে দেখা উচিত। প্রণব বললে, 'দেখি একবার চেষ্টা করে। নাহলে কাল তার করে দেব।'

অনেকক্ষণ থেকেই তৃপ্তি—তৃপ্তি দে কী একটা কথা বলবার জন্যে উসখুস করছিল। তার দিকে চোখ পড়তে প্রণব বললে, 'আপনি কিছু বলবেন?'

ঢোক গিলে তৃপ্তি অস্পষ্টভাবে জবাব দিলে, 'বাণীব্রতবাবুকে আমি দেখেছি বোধহয়।'

'কখন—কোথায় দেখেছেন?'

'সন্ধেবেলা। আমি তখন হাসপাতালে আসছিলুম। মিস দত্তর সঙ্গে বাণীব্রতবাবুর মতোই একজনকে চলে যেতে দেখেছি মাঠের রাস্তা ধরে। আমার একবার মনে হয়েছিল ভদ্রলোক বাণীব্রতবাবু। তারপর আর—'

'দেখেছ তো এতক্ষণ বলোনি কেন?' ডাঃ গুপ্ত ধমকে উঠলেন।

তৃপ্তির কথায় প্রণব যেন আলো দেখতে পেল। বাণীব্রতর পলায়নের একটা কারণ অস্পষ্টভাবে জানা গেল এতক্ষণে। পলকের জন্যে ও একবার সুদক্ষিণার মুখের দিকে তাকিয়ে নিল। খোদাই করা মূর্তির মতো মুখের সমস্ত রেখাগুলো কঠিন ও প্রখর হয়ে উঠেছে।

বিশ্বনাথকে যে লোকটা খুঁজতে গিয়েছিল ফিরে এসে সে জানাল বিশ্বনাথ নেই। মিস ডোরা দত্তর কোয়ার্টার অন্ধকার। ডাকাডাকি করেও সাড়া পাওয়া গেল না।

এদিকে স্টেশন থেকেও লোক ফিরে এল। মাস্টারবাবু বলেছেন, হাসপাতালের লোকজন কাউকে তিনি স্টেশনে দেখেননি। তাছাড়া রাত সাড়ে ন'টার প্যাসেঞ্জার গাড়ি এখনও আসেনি। ভীষণ দেরি করছে আজ। কোথায় যেন লাইনের গোলমাল হয়েছে। সন্ধে থেকে সারারাত পরেশনাথ স্টেশনে থামে এমন দ্বিতীয় কোনও গাড়িও নেই যাওয়া আসার। কেউ যদি এসেও থাকে—পালাতে পারবে না। মাস্টারমশাই চোখ রাখবেন—ট্রেনে চড়ে কেউ যেন পালাতে না পারে।

সব শুনে প্রণব বললে, 'মিস দত্তর সঙ্গেই বাণীবাবু চলে গেছেন দেখছি। তবে পালিয়ে খুব বেশিদূর ওরা যেতে পেরেছে বলে আমার মনে হয় না।'

'কোথায় গেছে—কেনই বা গেল, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।'

যাওয়ার পথ তো মাত্র দুটো—হয় স্টেশন না হয় পাহাড়ের পাশ দিয়ে জঙ্গলের যে রাস্তাটা উত্তর দিকে চলে গেছে সেটা। এ-ছাড়া যাবেই বা কোথায়? গাঙ্গুলীবাবু সিধুকে নিয়ে স্টেশনে গিয়ে অপেক্ষা করুন। আমরা জঙ্গলের রাস্তা ধরে খোঁজ করিগে।'

'তাই ভালো। আমার গাড়ি আর বন্দুকটা আনতে পাঠিয়ে দাও।'

'বন্দুক?'

'পাহাড়ের পাশটা গরমকালে নিরাপদ নয়। সিজারকেও যেন আনে।' সিজার তাঁর গ্রে-হাউন্ড কুকুরটার নাম।

ডাঃ গুপ্তের শিকারের শখ ছিল। ব্যবস্থাও ছিল তাই সবরকমের। কালীচরণ ছুটল ডাঃ গুপ্তের বাংলোয়।

মিনিট কুড়ির মধ্যে তৈরি হয়ে গাড়িতে উঠে বসল প্রণব, ডাঃ গুপ্ত আর কালীচরণ। সুদক্ষিণা উঠতে যাচ্ছিল। বাধা দিয়ে প্রণব বললে, 'তুমিও যাবে? জায়গাটা কিন্তু ভালো নয়।'

'আমায় যেতে হবে।' সুদক্ষিণার কণ্ঠস্বর অনমনীয়।

'না গেলে পারতে।' প্রণব দ্বিতীয়বাবুর তার আপত্তি জানালে।

'এসো।' ডাঃ গুপ্ত কী বুঝে সুদক্ষিণাকে ডেকে নিলেন। বললেন প্রণবকে, 'ওর যাওয়াই ভালো।'

আর কোনও বাক্যব্যয় না করে প্রণব গাড়িতে স্টার্ট দিলে।

পাহাড়ি এবড়ো-খেবড়ো গাছপালাভরা পথ দিয়ে ছুটে চলল গাড়িখানা। অন্ধকার-ঘন অরণ্য আলোয় চিরে, স্তব্ধ পারিপার্শ্বিককে যান্ত্রিক গর্জনে বিক্ষুব্ধ করে এগিয়ে যাওয়ার মধ্যে কোথায় যেন

একটা বর্বর স্বাদ আছে। সে স্বাদের স্পর্শ পেয়ে প্রণব বুঝি ক্রমশই উত্তেজিত হয়ে উঠছিল। তার হাতের স্টিয়ারিং আর পায়ের ব্রেক বেসামাল হয়েও হয় না। গাছের ধাক্কা ফসকে, ঝাঁকুনি খেয়ে, বাঁক নেয় হঠাৎ। আবার ছুটে চলে। মাঝরাতে এ উৎপাত ভালো লাগে না বনচর জন্তুদের। তীব্র চিৎকার ওঠে মাথার ওপর, পাখা ঝাপটানোর রাশিকৃত শব্দ, আশেপাশে পলাতক শেয়াল আর বন্যকুকুরের ভীতার্ত আর্তনাদ। থেকে থেকে সিজারও গর্জন করে ওঠে। ভয় পেয়েছে এরা—প্রণব ভাবে মুহূর্তের জন্যে। আর তারপরই কেমন একটা অব্যক্ত আনন্দ ওর গতির নেশাটাকে উগ্র করে তোলে।

দেখতে-দেখতে প্রায় দেড় মাইল পথ এগিয়ে এসে একটা ফাঁকা মাঠের মধ্যে প্রণব গাড়ি থামাল।

'থামালে যে?' প্রশ্ন করলেন ডাঃ গুপ্ত।

'ওই যে খাপরার বাড়িটা দেখছেন, ওটা প্রসাদ রায়ের কাঠগোলা। লোকজন দু-চারটে থাকে। ওদের কাছ থেকে খোঁজ নিয়ে আসি, যদি কেউ বাণীদের দেখে থাকে। এসো কালীচবণ।'

প্রণব কালীচরণকে ডেকে নেমে গেল।

সুদক্ষিণা দেখল টর্চের আলোয় পথ দেখে-দেখে ওরা এগিয়ে যাচ্ছে।

ডাঃ গুপ্ত সিগারেট ধরিয়ে চুপ করে বসে ভাবতে লাগলেন।

একটু পরে হঠাৎ সুদক্ষিণা বললে, 'দূরে ওগুলো কী?'

'কোনটা?'

'ওই যে—সার-সার বাতি জ্বলছে?'

'ও! বাতিই মনে হয়। যেন দূবে কেউ হাজার-হাজার প্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়েছে নয়?'

'ঠিক সেরকম।'

'ওগুলো কিন্তু প্রদীপ নয়। গরমকালে সরকারি ফরেস্ট অফিস থেকে পাহাড় জঙ্গল পরিষ্কার করবার জন্যে আগুন জ্বালিয়ে দেয়।'

'গাছপালা সব পুড়ে যাবে না?' অতল বিস্ময় সুদক্ষিণার গলায়।

'না পুড়বে কেন? বনের কোনও ক্ষতি হয় না—বন পরিষ্কার করবার জন্যেই সরকারি ব্যবস্থা এটা।'

সুদক্ষিণা চুপ করে সামনের দিকে তাকিয়ে থাকল। পাহাড় তাহলে এখনও অনেক দূর। অনেক দূরই তো! বাণীব্রতও তার কাছ থেকে আজ এমনি অনেক দূরেই চলে গেল। ডোবার সঙ্গে গেছে বলে যত না দুঃখ, তার চেয়ে বেশি দুঃখ প্রণবের এত ঐকান্তিক পরিশ্রম ও প্রীতিকে সে অনায়াসে উপেক্ষা করে চলে গেল। নিজের জন্যে কিছু বলবার আর নেই সুদক্ষিণার। প্রচণ্ড একটা বিস্ময় ও ক্ষোভ তার অবশ্য প্রথমে হয়েছিল বাণীব্রতর পালিয়ে যাওয়ার খবর শুনে। এখন তা পুড়ে, নিভে, ছাইচাপা পড়ে গেছে। পালিয়ে যাওয়াই যার স্বভাব, তাকে সুদক্ষিণা কতদিন ধরে রাখতে পারে? কিন্তু এ কথা কেন ভাবছে সে? এমনও হতে পারে, ডোরাই বাণীব্রতকে ভুলিয়ে নিয়ে পালিয়ে গেছে কোনও স্বার্থ সিদ্ধির আশায়। যদি তাই হয়, তবু বাণীব্রত কেন যাবে? প্রণব, হাসপাতাল, সুদক্ষিণা এরা কি কেউ নয়? কিন্তু ও যে পাগল! পাগল, পাগল—পাগল তো হয়েছে কী? এই এক কথা। দোষ, ত্রুটি ঢেকে নেওয়ার একটা মস্তবড় সুবিধে।

প্রায় ছুটতে-ছুটতে প্রণবরা ফিরে আসছে। সেদিকে তাকিয়ে সুদক্ষিণার বুকটা অকস্মাৎ কেঁপে উঠল। ডাঃ গুপ্ত বললেন, 'কোনও খবর-টবর পেলো নাকি ওরা?'

একটু পরেই প্রণব গাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। এক লাফে সিটে বসে প্রণব বললে, 'যা ভেবেছিলাম, স্যার। পাহাড়ের প্রায় কাছ বরাবর পুকুরধারের পাশে যে ভাঙা ডাক-বাংলোটা আছে, ফরেস্ট অফিসাররা আগে যেখানে থাকত, সেখানেই ওরা গেছে বলে মনে হয়।'

'Strange! কেউ দেখেছে নাকি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। কাঠগোলার লোক সন্ধের মুখে ফেরবার সময় একটি মেয়ে ও দুটি লোককে ওদিক পানে যেতে দেখেছে। দেখে সে খুব অবাক হয়েছিল। সে ভেবেছে ওরা বুঝি শিকার করতে বেরিয়েছে। মেয়েমানুষ দেখে পুরোপুরি আবার তা বিশ্বাস করতেও পারেনি। আমি গিয়ে দেখি কাঠগোলায় এ নিয়ে রীতিমতো আলোচনা ও বচসার তখনও শেষ হয়নি।' গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে প্রণব বললে আবার, 'শুনলাম ক'দিন থেকে একটা ভাল্লুক বেরিয়েছে এদিকে।'

সুদক্ষিণার বুকটা ছাঁত করে উঠল।

ডাঃ গুপ্ত পাশে রাখা বন্দুকটায় হাত দিয়ে ধীরে-ধীরে বললেন, 'বেশ ভয়ের ব্যাপার। পালিয়ে ওরা এমন জায়গায় কেন এল কে জানে?'

ডাঃ গুপ্তের কথা শেষ হওয়ার আগেই গাড়ি আবার চলতে শুরু করল।

নির্জন, নিস্তব্ধ বনভূমির এক অংশে এসে গাড়ি থামিয়ে প্রণব নীচে নামল। গাড়ির হেড্‌লাইট সে নিভিয়ে দিল ইচ্ছে করেই। সামনে খানিকটা ফাঁকা জমি—তারপর ঝোপ-ঝাপ, কাঁটাবন, দু-চারটে গাছ জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে আছে। ঠিক তার পাশেই ভাঙা, জীর্ণ কাঠের বাড়ি একটা। টর্চের আলো বাড়িটার দিকে ফেলে প্রণব বললে, 'এখানেই বোধহয় লুকিয়ে আছে। রাত্রে বেশিদূর যাওয়ার সাহস ওদের নিশ্চয় হবে না। আসুন খুঁজে দেখি।'

ডাঃ গুপ্ত নামলেন। বন্দুকটা তুলে নিলেন গাড়ি থেকে। সুদক্ষিণাও নেমে এল। কালীচরণ কুকুরের চেন ধরে প্রণবের পাশে-পাশে হেঁটে চলল। ডাঃ গুপ্ত ভেবেচিন্তে বললেন, 'বেশি গোলমাল করে দরকার নেই। কী বল?'

প্রণবের হঠাৎ কেমন হাসি পেল। বললে ও, 'ওরা যদি সজাগ থেকে থাকে, আমাদের আসার কথা এতক্ষণে জেনে গেছে। কালীচবণ কুকুর নিয়ে তুমিই এগিয়ে চলো। দেখো, ওটা যেন আবার বেশি চেঁচামেচি না করে।'

অত্যন্ত সন্তর্পণে ওরা পা টিপে-টিপে এগুতে লাগল। নেহাত টর্চের আলোয় পথ যেটুকু না দেখলেই নয়—সেইটুকু আলো জ্বাললে। কাঁটাগাছে, ঝোপে সুদক্ষিণার শাড়ি জড়িয়ে যাচ্ছিল। অনেক কষ্টে পা হাত কেটে, শাড়ি ছিঁড়ে সেও এগিয়ে যেতে লাগল সকলেব সঙ্গে। বাড়ির কাছাকাছি আসতে—ভাঙা গেটটার সামনে থেকে দুটো শেয়াল ছুটে ভেতরে পালিয়ে গেল। কালীচরণের হাতের শেকল বুঝি একটু আলগাভাবেই ধবা ছিল। মুহূর্তের মধ্যে কালীচরণের হাত ছাড়িয়ে বিকট একটা হুঙ্কার করে সিজার তীরের মতো পিছু ধাওয়া করলে পলাতক পশুদ্বয়ের। দেখতে-দেখতে সিজারের ক্রুদ্ধ কর্কশ গর্জনে নিস্তব্ধ জায়গাটা ভরে উঠল। নিশীথ রাত্রে নির্জন বনভূমির অন্ধকার আর বাতাস সেই তীব্র, তীক্ষ্ণ, প্রতিধ্বনিত গর্জনের সংস্পর্শে ভয়ংকর হয়ে উঠল।

'সিজার—সিজার!' ডাঃ গুপ্ত ডাকতে লাগলেন বারবার।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিল সকলে প্রথমটায়। ঘটনাটা হৃদয়ঙ্গম করে নিতে সময় লাগল। শেষে প্রণব বললে, 'আপনারা একটু দাঁড়ান।' কথা শেষ করে প্রণব আবার গাড়িব দিকে ফিরে চলল ছুটে।

সুদক্ষিণার চিন্তা করবার, কি স্বতন্ত্রভাবে কিছু করবার অবস্থা নয়। জড় পদার্থের মতো ও দাঁড়িয়ে। তার চোখের সামনে যেন রোমাঞ্চকর কোনও নাটকীয় দৃশ্য অভিনীত হচ্ছে, আর নির্বাক বিস্ময়ে ও তাই দেখে চলেছে।

কালীচরণ সামনে অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিল। তারও ডাক শোনা যেতে লাগল, 'সিজার—সিজার!'

গাড়ির শব্দে মুখ ফেরাতে ডাঃ গুপ্ত দেখলেন—প্রণব ফিরে গিয়ে আবার গাড়িতে স্টার্ট দিয়েছে। চোখের পলকে সে গাড়িটাকে একেবারে গেটের সামনে এনে ভাঙা বাড়িটার মুখোমুখি করে দাঁড় করাল। গাড়ির হেডলাইট আর টপলাইট নেভাল না। কেবলমাত্র স্টার্ট বন্ধ করে নেমে এল। গাড়ির আলোয় এতক্ষণে স্পষ্টভাবে কাঠের ভাঙা বাড়িটা ভেসে উঠল সকলের চোখের সামনে।

প্রণব ডাঃ গুপ্তের কাছে এসে বললে, 'আপনি সুদক্ষিণাকে নিয়ে গাড়িতে গিয়ে বসুন। আমরা দুজনে এগিয়ে দেখে আসছি।'

'না-না, আমরা ঠিক আছি। সিজারটা এমন কাণ্ড করলে!'

'ওতে কিছু যাবে-আসবে না। ওরা যদি এখানে এসে লুকিয়ে থাকে ঠিক খুঁজে বের করব।'

প্রণব আর বাক্যব্যয় না করে ছুটে ডাকবাংলোর দালানটায় গিয়ে উঠল।

সিজারকে দেখা যাচ্ছে না—কোথায় গিয়ে ঢুকেছে কে জানে? তার ক্রুদ্ধ গর্জনের কিন্তু বিরাম নেই। সিজারের অবিরাম আর্তনাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বনচর জন্তুর দল দূরে-দূরে মুখর হয়ে উঠছে। ভেসে আসছে তাদের বহুভাষী রব। দুটো বাদুড় প্রণবের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল। বিশ্রীভাবে চিৎকার করে একটা পেঁচা অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

'কালীচরণ?' প্রণব ডাকলে।

কালীচরণ কাছে আসতে প্রণব বললে, 'দেখ তো, ওই দরজাটা বন্ধ কি না?'

কালীচরণ সামনের দরজাটায় জোরে ধাক্কা দিল।

'বন্ধ।'

'দাঁড়াও।' প্রণব এদিক ওদিক খুঁজে ভাঙা একটা কাঠের ভারী গুঁড়ি খুঁজে নিল। ধরো, এই দিয়ে ধাক্কা মেরে দরজাটা ভেঙে ফেলতে হবে। দুজনে মিলে ওরা গুঁড়িটা তুলে নিয়ে দরজায় ধাক্কা দিতে লাগল। মড়মড় করে উঠল মাথার ওপরে আধভাঙা ছাদ। দরজাটা একপাশে ভেঙে গেল। আর ঠিক সেই মুহূর্তে অকস্মাৎ সমস্ত জায়গাটা কাঁপিয়ে বন্দুকের গুলির শব্দ শোনা গেল। প্রণবদের হাত থেকে কাঠের গুঁড়ি গেল পড়ে। চমকে উঠে মুখ ফেরাতেই তারা দেখতে পেল দালানের ঠিক নীচেই ঝোপের পাশ দিয়ে একটা ছোট নেকড়ে বাঘ সরে যাচ্ছে। মোটরের হেডলাইটের আলোয় সমস্ত জায়গাটাই আলোকিত—তাই স্পষ্ট ওরা দেখতে পেল। বন্দুকের শব্দেই হোক, কি গুলিতে চোট খেয়েই হোক—নেকড়েটা ঘুরে দাঁড়াল। সম্ভবত ঘুরে দাঁড়িয়ে ও আক্রমণকারীকে খুঁজে বের করবার চেষ্টা করছিল। সেই মুহূর্তে আবার একটা গুলি এসে বিঁধল। ভয়াবহ বিকট আর্তনাদে সমস্ত জায়গাটা কাঁপিয়ে আহত পশু সামনের দিকে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করলে। এমন সময় সিজার কোথা থেকে যেন ছুটে এসে লাফিয়ে পড়ল তার ঘাড়ে।

প্রণব আর কালীচরণ ইতিমধ্যে একটা থামের আড়ালে গা ঢাকা দিয়েছিল। রুদ্ধ বিস্ময়ে, নির্বাক নিথর হয়ে তারা তাকিয়েছিল সামনে।

সিজার এক ফাঁকে একটু দূরে সরে আসতেই ডাঃ গুপ্ত পরপর আবার দুটো গুলি করলেন। শেষবারের মতো আক্রোশ জানিয়ে নেকড়ে বাঘটা শান্ত হয়ে গেল। সিজার তার সামনে দাঁড়িয়ে বার কয়েক ডাকল। তারপর হাঁপাতে লাগল ঝড়ে দোলা গাছের ডালের মতো।

প্রণব আর কালীচরণ সংবিত ফিরে পেয়ে পা বাড়াবার আগেই ভাঙা দরজাটা খুলে দুটো ছায়ামূর্তি বেরিয়ে এল। ত্রস্ত, ভীতার্ত সেই দুটি মূর্তির পানে তাকাতেই স্পষ্ট চেনা গেল ওদের। বাণীব্রত আর ডোরা। দরজার বাইরে পা দিয়ে আলো দেখেই বোধহয় হকচকিয়ে গিয়েছিল ওরা। ডোরা বাণীব্রতর হাত ধরে টানল। ডানপাশের ভাঙা সিঁড়ি দিয়ে ওঠবার জন্যে ওরা প্রায় ছুটে গেল।

প্রণব চিৎকার করে ডাকল, 'বাণীবাবু—বাণীবাবু?'

বাণীব্রত ঘুরে দাঁড়াল ডোরার হাত ছাড়িয়ে। ডোরা তার হাত ধরে আবার টেনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে। পারলে না। শেষ পর্যন্ত নিজেই সিঁড়ির দিকে ছুটে গেল।

সিজার কী ভাবল কে জানে—চকিতে সে ক্রুদ্ধ একটা গর্জন করে তেড়ে এল। দালান থেকে সিঁড়ির মাঝামাঝি ছুটে এসে ডোবাব গায়ের ওপর লাফিয়ে পড়ল। চোখের পাতা পড়তে যতটুকু সময় লাগে ততটুকু সময়ের মধ্যে কাণ্ডটা ঘটে গেল। বাধা দেওয়ার কোনও উপায় ছিল না। ডোরাব পক্ষে সিজারের ভার সহ্য করা সম্ভব নয়। তীক্ষ্ণ একটা চিৎকার শোনা গেল। আর তারপরই সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে পড়ল ডোরা। সিজারও যেন নাছোড়বান্দা। কী ভেবেছে সে কে জানে। ডোরার ভুলুণ্ঠিত দেহের ওপর দ্বিতীয়বার লাফিয়ে পড়ে তাকে ক্ষত-বিক্ষত করে তুলল।

'সিজার—সিজার।' প্রণব ছুটে এল।

ডাঃ গুপ্তও দালান থেকে বারান্দার নীচে এসে পৌঁচেছেন। সামনে তাকিয়ে তাঁরও চক্ষুস্থির।

'সিজার—সিজার—leave her—সিজার?' ডাঃ গুপ্ত পাগলের মতন চিৎকার কবে উঠলেন।

সিজারের কাছে আজ সমস্ত অনুরোধ, আদেশ মূল্যহীন। পাশবিক উন্মাদনা ওকে পেয়ে বসেছে। বীভৎস হয়ে উঠেছে তার নির্দয়তা।

আর কোনও উপায় নেই বুঝি। ডাঃ গুপ্ত স্বগতোক্তি করলেন, 'He has become wild!'

ডোরার দেহবাস ছিন্ন-বিছিন্ন, বিক্ষিপ্ত, বিস্রস্ত। দেহ রক্তাক্ত। এ দৃশ্য দেখা যায় না চোখে। বৃথা সময় নষ্ট না করে ডাঃ গুপ্ত তাঁর বন্দুকের ট্রিগারে হাত দিলেন আবার।

সামান্য ক'টা মুহূর্ত। পরপর দুবার বন্দুকের গুলির শব্দ শোনা গেল। আর সেই সঙ্গে সিজারের মর্মভেদী আর্ত গর্জন উগ্র থেকে উগ্রতর হল ক্ষণিকের জন্যে, আর তারপর একটানা করুণ কান্নার মতো তার শেষ আর্তনাদ শোনা গেল কিছুক্ষণ। একটু পরে পরিপূর্ণ নিস্তব্ধতা। পেঁচাটা শুধু ডেকে উঠল আবার। ডাঃ গুপ্ত, প্রণব, কালীচরণ তিনজনেই ডোরার পাশে এসে দাঁড়াল। সিজারের প্রাণহীন দেহটা ডোবার বুকেব পাশে লুটিয়ে পড়ে রয়েছে।

প্রণব তাড়াতাড়ি বসে পড়ে ডোরার গায়ে হাত দিল।

'এখনও বেঁচে আছেন। কালীচরণ, এঁকে তুলে গাড়িতে নিয়ে যাও।'

কালীচরণ ডোরা দত্তর সংজ্ঞাহীন রক্তাক্ত দেহটা ধীবে-ধীরে কুড়িয়ে নিল।

ডাঃ গুপ্ত সিজারের পাশে বসে পড়ে গায়ে হাত দিলেন। মাথাটায় হাত বুলোলেন একটু। তারপর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মৃদুকণ্ঠে বললেন, 'হতভাগা কোথাকার।'

কালীচরণ বারান্দা থেকে নেমে দালান দিয়ে চলে যাচ্ছিল। ডাঃ গুপ্ত আর প্রণবও ফিরে আসছিলেন। তাঁদের দৃষ্টি পড়ল দালানের নীচে। বাণীব্রত দূরে পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

প্রণবের কী মনে হল, বললে, 'সুদক্ষিণাকে দেখছি না?'

'গাড়িতে বসে আছে।'

কালীচরণ খানিকটা এগিয়ে গিয়েছিল। বাণীব্রত তাকে দেখতে পেয়ে ছুটে তার সামনে গিয়ে পথ আগলে দাঁড়াল।

প্রণব দৃশ্যটা দেখার সঙ্গে-সঙ্গেই দ্রুতপায়ে এগিয়ে চলল ডাঃ গুপ্তকে টেনে নিয়ে।

ডোরা দত্তর ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত দেহটা অনেক—অনেকক্ষণ ধরে বাণীব্রত দেখলে নেড়েচেড়ে। চোখ তুলল। তাকাল চারপাশে। ওর মুখের রেখায় অব্যক্ত রুদ্ধ একটা যন্ত্রণায় ছাপ সুস্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠছিল।

প্রণব ততক্ষণে বাণীব্রতর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। প্রণবকে দেখা মাত্র বাণীব্রতর চোখ দুটো জ্বলে উঠল। কী একটা কথা বলবার আশায় সে দু-পা এগিয়ে এসে প্রণবের হাত দুটো চেপে ধরে

হঠাৎ ছেলেমানুষের মতো কেঁদে উঠল।

প্রণব অবাক! ডাঃ গুপ্তও এসে পড়েছিলেন। তিনিও যেন কেমন হয়ে গেলেন। কেউ কিছু অনুধাবন করতে পারলে না।

প্রণব বাণীব্রতর কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললে, 'কী হয়েছে?'

বাণীব্রত কোনও কথা বলতে পারছে না। তার কুঞ্চিত ওষ্ঠ, বারবার কেঁপে উঠতে লাগল অস্পষ্ট একটা শব্দ সৃষ্টি করে। অন্তরে ওর কীসের একটা দুর্দমনীয় উত্তেজনা প্রকাশের পথ খুঁজে মরতে লাগল। কালীচরণ চলে যাচ্ছিল। বাণীব্রত দেখতে পেল তাকে। হঠাৎ যেন তার মুখ থেকে পিছলে একটা শব্দ বেরিয়ে এল, 'আমি, আমি করিনি।'

প্রণবের বিস্ময় মাত্রা হারাল।

ডাঃ গুপ্ত বললেন, 'What's the matter with you?'

বাণীব্রত আপ্রাণ চেষ্টা করলে কথা বলবার—পারলে না। কালীচরণের হাত থেকে ডোরাকে কেড়ে নেওয়ার চেষ্টাও একবার করলে হঠাৎ। সক্ষম হল না। অবশেষে প্রণবের হাত জড়িয়ে ধরে আবার ও আবেগে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

কখন যে সুদক্ষিণা ওদের মাঝে এসে দাঁড়িয়েছে—কেউ জানতে পারেনি। সুদক্ষিণা ডোরার রক্তাক্ত দেহের দিকে তাকিয়ে তীক্ষ্ণ ভীতার্ত একটা আর্তধ্বনি করে উঠল। সেই শব্দে মুখ ফেরাল সকলে।

বাণীব্রত চোখ তুলে চাইল। দেখল একমুহূর্ত। তারপর অকস্মাৎ বাঁধভাঙা নদীর মতো ওর সমস্ত পুঞ্জীভূত আবেগ মুখর হয়ে উঠল মাত্র ক'টি অস্পষ্ট কথার মধ্য দিয়ে।

ডাঃ গুপ্তকে ঠেলে দিয়ে বাণীব্রত সুদক্ষিণার কাছে গিয়ে তার হাত ধরে ফেলল, 'সুদক্ষিণা! বিশ্বাস করো সুদক্ষিণা আমি নয়। আমি করিনি। আমি আমার মাকে মারিনি। মা হঠাৎ পড়ে গিয়েছিলেন।' বাণীব্রতর শেষদিকের কথাগুলো কান্নায় জড়িয়ে অস্পষ্ট, ভারী ও করুণ হয়ে উঠল।

প্রণব আর ডাঃ গুপ্ত নির্বাক বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন। বনের বাতাসে যেন তাঁদের অনুভূতি ক্ষণেকের জন্যে ভেসে গেল। আকাশ থেকে খসে পড়ল একটা তারা। গাছের পাতায় শব্দ উঠল। ঝড়ের না নিশাচর কোনও পাখির কে জানে।

বিস্ময়ের ধাক্কাটা কেটে যাওয়ার পর ওরা দেখল বাণীব্রতর সংজ্ঞাহীন দেহ সুদক্ষিণার কাঁধে লুটিয়ে পড়েছে। প্রণব তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে বাণীব্রতকে ধরে ফেলল।

জনমানবহীন অরণ্যপ্রান্তরে যে অবরুদ্ধ কান্নার জোয়ার জাগল—তার জের এসে থামল হাসপাতালের ছোট্ট একটি ঘরে।

ঘরের দরজা জানালা সমস্ত বন্ধ। শুধু সবুজ একটা বাতি জ্বলছে এক কোণে। অস্পষ্ট ছায়া, রহস্যময় আবহাওয়া, অন্ধকার আর পরিপূর্ণ নিস্তব্ধতা। ঘবের মধ্যে একটি নরম বিছানায় তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় পড়ে আছে বাণীব্রত। তার মাথার পাশে বসে প্রণব। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করার পর, প্রণব যখন দেখল বাণীব্রত সোডিয়াম অ্যামিটলের ঘোরে তার বাহ্যচৈতন্য বিস্মৃত হয়েছে, তখন ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ধীর স্পষ্টকণ্ঠে বলল, 'মনে পড়ছে না কিছু? পড়বে, নিশ্চয় পড়বে। বলুন, আপনার যা মনে আছে—যা ইচ্ছে হয়। Relax, relax yourself!'

বাণীব্রত বোবার মতো শুয়ে থাকল। একটা শব্দও শোনা গেল না তার মুখ থেকে।

প্রণব বললে আবার, 'মনে আপনার যা আসছে বলে যান। আমার কাছে লুকিয়ে রাখার মতো আপনার কিছু নেই। ভয় কী, আমি তো প্রায় সবই জানি। বলুন, বলুন, চুপ করে থাকবেন না।'

'আমি—,' বাণীব্রত যেন ঘুমের ঘোরে হঠাৎ কথা বলে উঠল, 'আমি কিছুই লুকিয়ে রাখিনি। না-না, কিছু লুকোনো নেই। বিশ্বাস করুন।'

'আমি আপনাকে বিশ্বাস করি বইকী। আপনি কিন্তু আমায় বিশ্বাস করতে পারছেন কই? বিশ্বাস করলে মনের কথা লুকিয়ে রাখতেন না আমার কাছে।'

'লুকিয়ে রেখেছি? না। আমি—আমি—'

'হ্যাঁ, আপনি লুকোচ্ছেন। বলুন, কী লুকিয়ে রাখতে চাইছেন? কী আপনি করেননি বলুন?' প্রণবের গলার স্বরে আশ্চর্য একটা আকর্ষণ।

বাণীব্রত কেমন যেন চুপ করে গেল হঠাৎ। একটু পরে অদম্য এক আবেগে ও বললে, 'আমি—হ্যাঁ আমি, আমি করিনি। বাস্তবিক—বিশ্বাস করুন ডাক্তারবাবু, আমার দোষ নেই। তবু সকলে আমায় দোষ দেয়। কেমন যেন সব। বুদ্ধি নেই, বিবেচনা নেই। মা—নিজের মাকে কেউ মারতে পারে? ছিঃ ছিঃ। কী সাঙ্ঘাতিক। যে শুনবে কানে আঙুল দেবে।'

'আপনার মাকে কে মারল তাহলে?'

'আমি জানি না—আমি মারিনি (বাণীব্রত ভয় পেয়ে অতি দ্রুত বাধা দিল)। It was an accident—of course accident—অ্যাকসিডেন্ট ছাড়া কিছু নয়—হতে পারে না। আমার দোষ, আমি শুধু সেই সময় ছাদে ছিলাম।'

'কেন ছিলেন আপনি ছাদে? কী কাজ ছিল আপনার সেখানে?'

'কেন? এমনি। ছাদে উঠে আমি বাজি পুড়োনো দেখছিলাম। দেখছিলাম ঘরে-ঘরে কেমন চমৎকার করে সব প্রদীপ সাজিয়ে দিয়েছে।'

'বাজি পোড়ানো হচ্ছিল? কেন, বলুন তো?'

'বাঃ, সেদিন যে দেওয়ালি? ছাদে, বারান্দায়, পাঁচিলে কেমন সুন্দর করেই না সকলে আলো সাজাত। আমার খুব ভালো লাগত দেখতে। ইচ্ছে হত নিজের হাতে পাঁচিলে উঠে পিদ্দিম সাজাই। বাবার ভয়ে কিছুতেই পাঁচিলে উঠতে পারতাম না। ...হ্যাঁ—মনে পড়েছে ডাক্তারবাবু, বাবার ভয়েই আমি ছাদে পালিয়ে এসেছিলাম। বাবা যেন কেমন ছিলেন। একটু একলা বেড়াতে গেলে বকবেন, পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে মিশলে আর রক্ষে নেই, এমন কী নন্তু— নন্তুকে আপনি চিনতে পারবেন না—দিদিমণির ছেলে। নন্তুটা কী গুন্ডাই ছিল। নন্তুরা আমাদের বাড়িতে থাকত বলে আমি ওর সঙ্গে খেলাধুলো করতাম। বাবা কিন্তু একেবারে খড়্গহস্ত ছিলেন নন্তুর ওপর (বাণীব্রত একটু থামল)। ও যেন চোখের সামনে তার বাবা, নন্তু, মা সকলকে দেখতে পাচ্ছে। চোখেমুখে তার খুশির একটা ভাব ফুটে উঠেছে—একটু-একটু করে গলার স্বর সহজ হয়ে আসছে। কথা বলতেও আর যেন তার ক্লান্তি নেই। বরং খুশি হচ্ছে ও কথাগুলো বলতে পারছে বলে, 'নন্তুর জন্যে আমি বাবার কাছে প্রায়ই বকুনি খেতুম। বাবা বলতেন, নন্তুর মতো ডানপিটে ছেলের সঙ্গে মিশে-মিশে আমি নাকি ভীষণ বেয়াড়া হয়ে উঠেছি। বাবা চাইতেন আমি যেন একা-একা থাকি। একলা কি ভালো লাগে—বলুন তো?'

'আপনার বাবা বুঝি আপনাকে তেমন ভালোবাসতেন না?' প্রণব প্রশ্ন করলে।

'না-না, তা কেন? বাবা আমায় ভালোবাসতেন বইকী। ভালোবাসতেন—তবে মার মতন নয়। মা আমায় সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতেন। আমার মা—কী সুন্দর ছিলেন আমার মা। এত সুন্দর আমি আর দেখিনি। (বাণীব্রত চোখের ওপর যেন তার মাকে দেখতে পাচ্ছে) জানেন ডাক্তারবাবু, কী চুল ছিল আমার মার। এক পিঠ কালো-কালো চুল। আর গায়ের রং কী—ফুটফুটে সাদা। ছোটখাটো পাতলা মতন মানুষটি। এমন সুন্দর চোখ আর মুখ কী বলব। মা যে কত কী জানতেন। যেমন সুন্দর গান গাইতে পারতেন, তেমনি ছিল তাঁর মিষ্টি গলা। মাকে আমি কোনওদিন জোরে কথা বলতে শুনিনি। তিনি যখন কাউকে বকতেন মনে হত বুঝি আদর করছেন (বাণীব্রত একটু হেসে

ওঠে), আমায় কিন্তু বকতেন না। বকলে এমন কাণ্ড আমি করতাম যে শেষ পর্যন্ত মা বেচারি কেঁদেকেটে একসার হত। (হঠাৎ কী একটা কথা মনে পড়ল বাণীব্রতর। একটু চুপ করে থেকে অতীতের একটা ভাঙা-চোরা অস্পষ্ট ছবিকে ক্রমশ সে চোখের সামনে ধীরে-ধীরে স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠতে দেখল) বকার কথায় মাকে মনে পড়ছে আমার। সেদিনের ঘটনাটা স্পষ্ট মনে পড়ছে, ডাক্তারবাবু। আপনাকে সে কথা বলি ঃ সেদিন ছিল দেওয়ালি—কালিপুজো। দশই কার্তিক। আমার আবার সেইদিনই জন্মদিন। বাড়িতে মা-বাবার আমি একটি মাত্র সন্তান। আমার জন্মদিন তাই বেশ ঘটা করে পালন করতেন ওঁরা। স্পষ্ট মনে পড়ছে আমার—দেওয়ালির দিন সকাল-সকাল স্নান করিয়ে কাপড়চোপড় পরিয়ে দিদিমণি আমায় সাজিয়ে দিলেন। কতই বা আমার বয়েস তখন—এগারো কি বড়জোর বারো। আমি গোলাপি রঙের একটি সিল্কের পাঞ্জাবি পরেছিলাম। পায়ের সঙ্গে ধুতি জড়িয়ে যাচ্ছিল। বাবা দেখতে পেয়ে দিদিমণিকে বললেন, মালকোঁচা মেরে কাপড় পরিয়ে দিতে। আমি কিন্তু কিছুতেই মালকোঁচা বাঁধলুম না। আয়নার সামনে বাবার মতন কোঁচা হাতে ধরে হেঁটে বেড়াতে লাগলুম।...খানিক পরে মা সেজেগুজে এলেন। আমরা—আমি, মা, বাবা—আমরা তিনজনে এবার দিদিমার কাছে যাব। আমি তা জানতুম। প্রতিবারই তাই হয়। প্রথমেই আমরা দিদিমার কাছে যাই। দিদিমা থাকতেন কালীঘাটের দিকে। গাড়ি এল। আমরা গাড়িতে করে দিদিমাকে প্রণাম করতে গেলাম। একটা কথা মনে পড়েছে ডাক্তার দাশগুপ্ত, যাওয়ার সময় নন্তু লুকিয়ে-লুকিয়ে একটা কুকুরের বাচ্চা এনে আমায় দেখাল। এমন সুন্দর কুকুরটা। গোলগাল। কী লোম! সমস্ত গাটা লোমে ঢাকা। তুলোর বল যেন একটা। নন্তু বললে—ওপাড়ার বলাই কুকুরটা বিক্রি করবে। আমি কিনব বলেছিলাম কি না তাই ও নিয়ে এসেছে। এদিকে ততক্ষণে বাবা গাড়িতে গিয়ে বসেছেন। দেরি করতে আমার সাহস হল না। নন্তুকে বললুম, তুই রেখে দে। দিদিমাকে প্রণাম করে ফিরে এসেই আমি মাকে বলব টাকা দিতে।...(বাণীব্রত একটু জল খেতে চাইল। প্রণব তাকে জল দিল। খানিকটা চুপচাপ। সেই রহস্যময়, আলো-আঁধার ঘরের বাতাসে নিশ্বাসের সুর শোনা যেতে লাগল। বাণীব্রত একসময়ে আবার কথা কইল)...তখন খুব বেশি বেলা হয়নি। বোধহয় সাড়ে দশটা কী এগারোটা হবে। আমরা বাড়ি ফিরে এলাম। বাড়ি ঢুকেই দেখি বারান্দায় বলাই কুকুর বাচ্চাটা কোলে করে বসে আছে। গাড়ি থেকে নেমেই ছুটে গিয়ে আমি কুকুর বাচ্চাটা বুকে তুলে নিলাম। কী নরম! ...মা, বাবা গাড়ি থেকে নেমে আমার কাছে আসতে আমি মাকে বললুম কুকুরটা আমি কিনব। বলাইকে টাকা দিয়ে দিতে। মা তো আমার কথা শুনে অবাক! বাবাও। মা বললেন, (বাণীব্রত যেন তার মাকে কথা বলতে শুনছে) হাঁ—মা বললেন, না-না, কুকুর-টুকুর আমার ভালো লাগে না, খোকা, দিয়ে দাও। কুকুরটাকে আমি আরও জাপটে ধরলুম। কুকুর আমার চাই! কুকুর কিনব বলে দোকানে ঢুকে আমি কোনও খেলনাই কিনিনি। বাবাও বারণ করলেন। আমি কিন্তু শুনলাম না। গোঁ ধরে থাকলুম। শেষ পর্যন্ত বাবা অসম্ভব রেগে আমার হাত থেকে কুকুরছানাটা কেড়ে নিয়ে বলাইকে দিয়ে দিলেন। বলাই চলে যাচ্ছিল। সেদিকে তাকিয়ে রাগে, অভিমানে, দুঃখে আমি কেঁদে ফেললাম। মা তখন বলাইকে আবার ফিরে ডাকলেন। বাবাকে মা বললেন ঃ ও যখন শুনবেই না, দিয়ে দাও। বাবা তখনকার মতো আর কিছু বললেন না। বলাইকে টাকা দিয়ে দিলেন।...সেইদিনই খাবার সময় আবার একটা কাণ্ড ঘটল। আমরা তিনজনে খেতে বসেছি টেবিলে। এমন সময় বাবা—বাবা খুব গম্ভীর হয়ে গিয়েছিলেন সেই কুকুর কেনার পর থেকে—বাবা আমার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে মাকে বললেন, দিন-দিন তোমার ছেলে যেমন অসভ্য হয়ে উঠছে, তেমনি হচ্ছে জেদি। এ ভালো নয়। বাবার কথা শুনে মাও গম্ভীর হয়ে বললেন, হ্যাঁ, কেমন যেন একগুঁয়ে হয়ে উঠছে। নেহাত আজ ওর জন্মদিন, চোখের জল দেখতে চাই না। নয়তো কিছুতেই কুকুর কিনতে দিতাম না আমি। যেসব ছেলে মা-বাবার কথা শোনে না, তাদের আমি একেবারেই পছন্দ করি না। মার কথা শেষ হলে বাবা বললেন, নন্তুর সঙ্গে খেলা করতে তোমার ছেলেকে যেন আর না দেখি। যত সব অসভ্য, হতচ্ছাড়া ছেলে। কী

জানি কেন, মা বাবার কথায় সায় দিলেন দেখে আমার অসম্ভব রাগ হল। বাবা তো আমায় যখন তখন একটু খুঁত পেলেই বকেন। কিন্তু মা—মা-ও বকবে! যেমন হল রাগ, তেমনি দুঃখ। আমি খাবারের থালায় হাত না দিয়ে চুপ করে বসে থাকলুম। মা-বাবা দুজনেই আমার মুখের দিকে বারকয়েক তাকিয়ে দেখলেন। তারপর মা বললেন, হাত গুটিয়ে বসে রয়েছ কেন? খাবে না?..আমি বললুম, না।...কেন? মা জানতে চাইলেন। খিদে নেই, বললুম আমি। বাবা বললেন, না খাবে তো উঠে যাও। খাবার টেবিলে পেঁচার মতো মুখ করে বসে থাকতে হবে না। আমি কোনও কথা না বলে গুম হয়ে বসে থাকলুম। শুনলাম, বাবা-মা'কে বলছেন, দেখছ তো, কেমন অবাধ্য হয়েছে! মা আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন। বুঝলাম, মা খুব রেগে গেছেন। তিনি বললেন, তোমার বাবা কী বললেন শুনতে পাওনি? খেতে হয় খাও, না হয় যাও—উঠে যাও এখান থেকে। আমার তখন এমন রাগ হচ্ছিল মার ওপর, বাবার চেয়েও বেশি। কোনও কথা না বলে আমিও সোজা উঠে চলে এলুম খাবার ঘর ছেড়ে। (বাণীব্রত নীরব হল। মনের মধ্যে তার মাকড়সার জালের মতো অতীত-স্মৃতির জটিল জাল। সন্তর্পণে সেই জাল পরিষ্কার করতে তার সময় লাগছে। প্রণব নির্বাক, নিশ্চল। বাণীব্রতর প্রতিটি কথা, প্রতিটি শব্দ সে মনের খাতায় টুকে নিচ্ছে নির্ভুলভাবে। হঠাৎ বাণীব্রত বলে যেতে লাগল) খাবার ঘর থেকে বেরিয়ে আমি সোজা আমার ঘরে চলে গেলুম। মার ঘরের গা-লাগানো আমার একটা ছোট ঘর ছিল। সেখানে আমি পড়তাম। আমার যত রাজ্যের খেলনা, ছবি, কাঠের দোলনা-ঘোড়া সব থাকত সে ঘরে। আমার ঘরে এসে দেখি কুকুরটা টেবিলের তলায় ঘুমিয়ে পড়েছে। একটা মখমলের পুঁটলি যেন পড়ে রয়েছে মনে হল। লুসি—লুসি—আমার লুসি—আস্তে-আস্তে আমি তার মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করলুম। ও হ্যাঁ—আমি ওর নাম দিয়েছিলুম লুসি। লুসিকে আদর করে উঠে দাঁড়াতেই টেবিলের ওপর আমাদের ছবিটার দিকে নজর পড়ল। মার আর আমার ফটো। বাগানে বেঞ্চির ওপর মা—আমি তাঁর কোলের ওপর বসে। কী জানি কেন ফটো-টা দেখে আমার খুব কান্না পেতে লাগল। রাগ আর অভিমান হল সব চেয়ে বেশি। মনে হল, মা আমায় আর আগের মতো ভালোবাসেন না। মা আজকাল—আজকেই তো বাবার দিক নিয়ে আমায় কেমন করেই না বকলেন। কেন? মা কেন বাবার হয়ে আমায় বকবেন? ভালোবাসেন না ছাই। মিথ্যে কথা। মা আমায় ভালোবাসেন না। ভালোবাসলে কি কেউ একটা কুকুর কিনে না দিয়ে বকে? আর আমার বুঝি খিদে পেতে নেই। ওঃ, খুব একেবারে বলে দিলেন : খেতে হয় খাও, না হয় উঠে যাও। যাবই তো, বেশ করব যাব। মা না আর কিছু! ছাই মা। কে চায় এমন মা? আমি চাই না—চাই না। তোমার কোলে বসতে চাই না—আদর চাই না। কিছু আমার দরকার নেই। ফটো? টেবিলের ওপর ছবির বই আর কাঁচি পড়েছিল। ছবি কেটে-কেটে জোড়ার শখ ছিল আমার খুব। কাঁচিটা আমি হাতে তুলে নিলুম। তারপর কী যে ভাবলুম কে জানে। ফটোটা বের করে মার কোমরের কাছ থেকে কচ-কচ করে কেটে ফেললুম। ফটোর নীচের অংশটা—মার কোমর আর আমার গলা পর্যন্ত কেটে নীচে পড়ে গেল। বেশ হয়েছে। ছবি দেখে ভাবতে লাগলুম, আর আমি তোমার কোলে বসে নেই। (বাণীব্রত একটু উঠে বসল। গলার স্বর ভারী হয়ে উঠতে লাগল ক্রমশই) আমার হাতে তখনও ফটোটার ওপরের অংশটা রয়েছে। আগের মতোই মা দেখি হাসছেন। হাসি দেখে রাগ আমার আরও বেড়ে গেল। মনে হল, মা বুঝি আমায় জব্দ করবার জন্যে হাসছেন। হাতের মুঠোর মধ্যে দুমড়ে মুড়ে তালগোল পাকিয়ে জানালা দিয়ে ছুঁড়ে দিলাম ছেঁড়া-কাটা ফটোটা। হাওয়ায় দুলতে-দুলতে তালগোল পাকানো ছবিটা গিয়ে পড়ল করপোরেশানের ময়লা-ফেলা গাড়ির মধ্যে। গাড়িটা গলির নীচে দাঁড়িয়ে ময়লা তুলছিল। জানালা দিয়ে বেশ স্পষ্ট দেখতে পেলুম—একটা মেথর একঝুড়ি জঞ্জাল তুলে গাড়ির মধ্যে ফেললে। চাপা পড়ে গেল মার ছবির ছেঁড়া, কাটা, তালগোল পাকানো অংশটুকু। হঠাৎ বুকটা আমার কেমন করে উঠল। মার ছবিটা অমন জঞ্জালের মধ্যে গিয়ে পড়বে তা কি আমি জানতুম। মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। (বাণীব্রত নীরব হল। তার সারা মুখে ঘাম জমে উঠেছে। চোখের

দৃষ্টিতে ক্লান্তি। সারা মুখে বেদনার ছায়া। দু-এক ফোঁটা জল চোখ থেকে গড়িয়ে পড়ল। বুকের মধ্যে গুমরে উঠছিল অবরুদ্ধ ব্যথা। মুখের মধ্যে আঙুল ঢুকিয়ে—দাঁত কামড়ে প্রাণপণে বাণীব্রত তার ভাবাবেগ দমন করবার চেষ্টা করতে লাগল। প্রণব বাণীকে আবার শুইয়ে দিল বিছানায়। ওর হাত সরিয়ে দিলে মুখ থেকে। বললে, তারপর? বাণীব্রত চোখের পাতা বন্ধ করে শুয়ে থাকল খানিকটা, কোনও উত্তর দিল না প্রণবের ডাকে। একসময় নিজে থেকেই কথা কয়ে উঠল ধীরে-ধীরে) বিকেলের একটু পরেই আমি বাড়ির ছাদে গিয়ে উঠলাম। আমাদের বাড়ির আশেপাশে সমস্ত বাড়িতেই ছেলেরা পিদ্দিম সাজাচ্ছিল। কেউ-কেউ পটকা ফাটাচ্ছে। হাউইগুলো সোঁ-সোঁ করে মাথার ওপর দিয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে আকাশে। ছাদে একলা-একলা দাঁড়িয়ে আমি তাই দেখছিলাম। সন্ধের দিকে বাড়িতে লোকজন আসতে শুরু করবে—আমার জন্মদিনের নেমন্তন্ন রাখতে। মা, বাবা, দিদিমণি, চাকর-বাকর সকলেই তাই নীচে কাজে ব্যস্ত রয়েছে। বাজি পোড়াবার জন্যে মনটা আমার ছটফট করছিল। অথচ আমার কাছে কিছু নেই। কেউ আমায় এক পয়সারও বাজি কিনে দেয়নি। মার ওপর রাগ আমার তখনও যায়নি। অনেক ভেবেচিন্তে নীচে নিজের ঘরে এলুম। আমার একটা ছোট—সেই—সেই যে ছোট-ছোট বাচ্চা ছেলেদের খেলার জন্যে একরকম লোহার পিস্তল পাওয়া যায়—আমার একটা সেইরকম পিস্তল ছিল। আর টাকাও ছিল পকেটে। হ্যাঁ—চকচকে দুটো টাকা। কে যেন দিয়েছিল। চুপিচুপি নন্তুকে ডেকে টাকা দুটো দিলাম। বললাম চট করে দুটাকার টোটা কিনে নিয়ে আয় তো। লুকিয়ে আনবি। আমি ছাদে থাকব। বুঝলি? ...নন্তু মাথা নেড়ে এক ছুটে টোটা কিনে আনতে গেল। আমিও পিস্তলটা পকেটে পুরে ছাদে পালিয়ে এলাম। নীচে মা-বাবা সকলেই এখন খুব ব্যস্ত। কেউ আর ওপরে আসবেন না, তা জানতাম। ভালো কথা ডাক্তারবাবু, আসবার সময় লুসিটাকে নিয়ে এলাম ছাদে। ছাদে এনে ছেড়ে দিতে লুসির কী ফূর্তি। লেজ নেড়ে, লাফিয়ে-লাফিয়ে সারা ছাদে ও খেলে বেড়াতে লাগল। লুসি বোধহয় জাতে বিলিতি কুকুর ছিল। ওইটুকু বাচ্চার তখন কী ডাক! খানিক পরে ঠিক নন্তু এসে হাজির। টোটা কিনে এনেছে। আমি পিস্তলে একটা করে টোটা লাগাই আর ফাটাই! বেশ জোর শব্দ হচ্ছিল কিন্তু। ক্রমেই সন্ধে ঘনিয়ে এল। যতদূর দেখি, কাছে দূরে সব বাড়িতেই সারি-সারি প্রদীপ জ্বলে উঠেছে। পটকা, তুবড়ি, হাউই, ফুলঝুরি, আকাশ-প্রদীপ—সে এক অপূর্ব দৃশ্য। আমিও পিস্তল নিয়ে খেলা করছি। সাথী আমার শুধু লুসি। এখন হল কী—লুসির মুখের কাছে আমি যেই না একবার পিস্তল ছুঁড়েছি—ভীষণ শব্দ হয়েছে, আর লুসি সারা ছাদ ঘেউ-ঘেউ করে লাফিয়ে ছুটে বেড়াতে লাগল। ভয় পাচ্ছিল না খেলা পাচ্ছিল কে জানে? আর ও যতই ঘেউ-ঘেউ করছিল, আমি ততই খেলায় মেতে উঠছিলাম। ঠিক খেয়াল হচ্ছে না—কখন যেন ছাদে মা এসে উঠেছিলেন। আমি তখন লুসির সঙ্গে ছুটোছুটি করছি। মা যে কেন ছাদে এসেছিলেন জানি না। বোধহয় আমায় দেখতে কিংবা ডাকতে। লুসির কানের কাছে ঠিক সে সময় আমি একটা টোটা ফাটিয়েছি। আর সে বেটা ঘেউ-ঘেউ করে ছুটে গিয়ে মার পিছনে—আড়ালে লুকোবার চেষ্টা করতে লাগল। মা বকতে লাগলেন—কুকুরের ছোঁয়া বাঁচানোর জন্যে প্রায় দৌড়োদৌড়ি করতে লাগলেন ছাদের ওপর। আমিও যেন মজা পেয়ে গেলুম। হ্যাঁ—জব্দ করার একটা উপায়। যতই মা ছুটোছুটি করেন আর বকেন, লুসি ততই মার আড়ালে লুকোবার চেষ্টা করে, আর আমি মনের সুখে লুসির মুখের কাছে গিয়ে পিস্তলের বিকট শব্দ করি। মা খুব রেগে উঠেছেন বলে আমার মনে হল। মা বকছিলেন, খোকা, শীঘ্রি তোমার কুকুর সরাও। এইমাত্র আমি গা ধুয়ে পুজোর কাপড়চোপড় পরেছি। কুকুর ছুঁয়ে দিলে আবার এই ঠান্ডায় আমায় স্নান করতে হবে। বেয়াড়া অসভ্য ছেলে কোথাকার! সরাও শীঘ্রি! মার বকুনি আমি গ্রাহ্যই করলাম না। তখন কি জানতাম এমনটা হবে। কিন্তু তাই হল। মা শেষ পর্যন্ত পিছনে সরে-সরে কখন যেন কাঠের সিঁড়িটার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। আমার তাড়া খেয়ে লুসি গিয়ে মার পায়ের কাছে লাফিয়ে পড়ল—আর তারপর শাড়িতে আর কুকুরের সঙ্গে জড়িয়ে গেল মার পা—মা বোধহয় একটু পিছু হটতে যাচ্ছিলেন। পিছনে সরবেন

কোথায়? মা সিঁড়ির ওপর থেকে গড়িয়ে পড়লেন। লুসিও।' (বাণীব্রত সোজা উঠে বসেছে। চোখ দুটো তার সামনে মেলা। সে চোখের দৃষ্টিতে বীভৎস একটা দৃশ্য দেখার ভীতি-বিহ্বলতা। গলার স্বরে অজস্র উত্তেজনা আর আবেগ। বাণীব্রত দেখছে ঃ অন্ধকাব রাত, সার-সার প্রদীপ জ্বলছে। একটা কুকুর, সোজা সিঁড়ি। পিস্তলের শব্দ, আর, আর—তীক্ষ্ণ করুণ আর্তধ্বনি কবে কে যেন সিঁড়ি দিয়ে উলটে গড়িয়ে-গড়িয়ে পড়ছে। কুকুবটা ডাকছে—সেই সার-সার বাতি। বাণীব্রত বিশ্রী বিকট একটা চিৎকার করে কেঁদে উঠল। সেই আবছা আলো-আঁধারি নিস্তব্ধ থমথমে ছোট ঘর বাণীব্রতর মর্মস্পর্শী আর্তনাদ আর কান্নার শব্দে খান-খান হতে লাগল। প্রণবের মনে হল ঘরের বাতাসে যেন অশরীরী প্রেতাত্মাদের কান্না আর হিম নিশ্বাসের ঝড় উঠেছে। নিজেকে সংযত কবে প্রণব উঠে দাঁড়াল। কী একটা ওষুধ জলেব সঙ্গে মিশিযে ওকে খাওয়ালে। বাণীব্রত স্নান করার মতো ঘেমে উঠেছিল। প্রণব ওর ঘাম মুছিয়ে দিযে ফ্যানের সুইচটা অন করলে। কী খেযাল হল ওর। ঘরের বাতিটাও জ্বালিয়ে দিল। সাদা আলোয় এতক্ষণে ভেসে উঠল বাণীব্রত।)

বাণীব্রত একটু সুস্থ হলে প্রণব প্রশ্ন করলে, 'আপনাব মা বুঝি এই অ্যাকসিডেন্টের ফলেই মারা যান?'

'হ্যাঁ। রক্তাক্ত দেহে, তালগোল পাকিয়ে মা নীচে পড়ে থাকেন। অজ্ঞান। পা ভেঙে যায়! তখুনি তাঁকে হাসপাতালে পাঠানো হল অ্যামবুলেন্সে কবে। বাবা হাসপাতালে গেলেন। শুধু আমি বাড়িতে নিজের ঘবে একা পড়ে-পড়ে কাঁদতে লাগলুম। সাবাবাত ধবে ভগবানকে ডাকলাম, মা যাতে সেবে ওঠে। ভগবান আমার কথা শুনলেন না। মা ভোবের দিকে মারা গেলেন।'

'কী কবে মাবা গেলেন তা কিছু জানেন?'

'পবে শুনেছি। পড়ে যাওযাব পব মার দুটো পায়েব হাড়ই নাকি ভীষণ ভাবে ভেঙে টুকরো-টুকরো হযে গিযেছিল। ডাক্তাররা অ্যামপুট কবে পা কেটে বাদ দিয়ে মাকে বাঁচাবার চেষ্টা কবে। গ্যাংগ্রিন হয়ে গিয়েছিল। অপাবেশান টেবিলে মা মারা যান।'

প্রণব একটু চুপ করে থেকে বললে, 'এ ঘটনা সম্পর্কে আপনার আর কিছু মনে পড়ে?'

বাণীব্রত বিছানা ছেড়ে উঠতে-উঠতে বললে, 'পড়ে। মার সেই পা-কাটা ফটোর অংশটুকু বুকে করে আমি সারাবাত অনেক কথা—কী যেন ভেবেছি। আর মাব সঙ্গে যখন শ্মশানে যাচ্ছিলাম—আমাদের সঙ্গে যাবা ছিল তারা সকলে এমন বিশ্রীভাবে আমার দিকে তাকাচ্ছিল কী বলব! ফিসফিস করে দু-একটা কথাও বলছিল ওরা। সেসব কথা আমার কানে আসেনি। তবু মনে হল তাবা যেন আমাকে দুষছে। কিন্তু আমি আপনাকে সমস্ত কথা খুলে বললাম, ডাক্তার দাশগুপ্ত। আপনিই বলুন, সত্যিই কি আমি এর জন্যে দাযী?'

'না।' সমবেদনা, সহানুভূতি ও আশ্বাসের সুর প্রণবের গলায়। মুখে শান্ত, সুন্দর হাসি। বাণীব্রতর হাত ধরে প্রণব বললে, 'না, আপনি আপনার মাব মৃত্যুর জন্যে দায়ী নয়। মানুষেব জীবনে নানারকম দুর্ঘটনা ঘটে। এ সেইরকমই একটা দুর্ঘটনা। যেমন ধরুন, আমি একটা রাস্তা দিযে যাচ্ছি, এমন সময় হঠাৎ একটা বাড়ির পাঁচিল আমার মাথায় পড়ল। আমি ভীষণ চোট পেলাম। মাবাও গেলাম। এর জন্যে কাউকে কি দায়ী করা চলে? যাব বাড়ি তাকে গিযে কেউ কি বলতে পারে, ওহে তুমিই লোকটাকে মেরেছ? না-না, তা কখনও বলা যায় না। অথচ মজা এই, আপনি আজীবন এই কথাটাই ভেবেছেন যে, আপনার মাব মৃত্যুর জন্যে আপনি দায়ী! আসলে আপনি নির্দোষ।'

বাণীব্রত তার ভাসা-ভাসা টানা চোখ দুটো মেলে থাকল প্রণবের মুখের ওপব। প্রণব ওকে নিয়ে জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। খুলে দিল জানালা। ভোরের ঠান্ডা বাতাস যেন হাত বুলিয়ে দিয়ে গেল ওদের চোখে, মুখে, মাথায়। দূরে পাখিদের কাকলি। শুকতারাটা জ্বলছে।

প্রণব বাণীব্রতর কাঁধে হাত রেখে বললে, 'এই কথাটাই আপনাকে ভালো করে বুঝতে হবে। এতদিন আপনি যা বুঝে এসেছেন তা ভুল। একেবারেই ভুল। আপনার মাকে আপনি ভালোবাসতেন,

খুব ভালো। আর ঠিক সেই জন্যে সব সময় চাইতেন, মা যেন কেবলমাত্র আপনাকে নিয়েই ব্যস্ত থাকেন। ছোট্ট করে বললে বলতে হয়—মা যেন শুধু একলা আপনাকেই ভালোবাসেন—এইটেই ছিল আপনার অন্তরের কামনা ও দাবি। মানুষের মনের এটা একটা স্বাভাবিক নিয়ম। যাকে সে ভালোবাসে তাকে একেবারে নিজের করে পেতে চায়। আপনার মা যখন স্বামীর পক্ষ নিয়ে আপনাকে কিছু বলতেন, আপনি রাগ করতেন। কেন জানেন? আপনি ভাবতেন, মা-বাবার পক্ষ টানছেন আপনাকে উপেক্ষা করে। তাঁর স্বামীকে তিনি বেশি ভালোবাসছেন ছেলের চেয়ে। এক্ষেত্রে আপনার বাবার ওপর একটা হিংসের ভাব আর মার ওপর রাগ হওয়া স্বাভাবিক। খাবার টেবিলে যখন আপনার মা তাঁর স্বামীর পক্ষ নিয়ে আপনাকে বকলেন, আপনার ধারণা হল—মা তাঁর ছেলের চেয়ে স্বামীকেই বেশি ভালোবাসেন। এই চিন্তাটা আবার এতই বিশ্রী লাগছিল আপনার—বুঝলেন বাণীবাবু, এত খারাপ লাগছিল মার এই পক্ষপাতিত্ব যে, আপনার মার ওপর আপনি অসম্ভব রেগে উঠতে লাগলেন। এ পক্ষপাতিত্ব কেন! আর ঠিক এইরকম একটা দুরন্ত অভিমানের দরুনই আপনি মার ছবি কাঁচি দিয়ে কেটে নিজেকে তাঁর কোল থেকে মুক্ত করে মনের দুঃখ জ্বালা মেটাতে চেয়েছেন। মুক্তি পেতে চেয়েছেন মার কাছ থেকে। যে ভালোবাসে না তার কাছ থেকে সরে আসাটাই আমাদের ধর্ম। You wanted to get rid of your mother.'

বাণীব্রত প্রায় চমকে উঠে বলল, 'মানে? আমি কি চেয়েছি মা মারা গিয়ে আমায় মুক্তি দিন?'

'ঠিক তা নয়, তবে অনেকটা তাই। মুক্তি চাওয়ার অর্থ মৃত্যু-কামনা করা নয়। তবে আপনিই ভেবে দেখুন, আপনার মার পক্ষে আপনাকে সে সময় আর কীভাবে মুক্তি দেওয়া সম্ভব হতে পারে। মৃত্যু মুক্তির একটা প্রতীক। মার মৃত্যু আপনি চাননি—তবে মুক্তি চেয়েছেন মার কাছ থেকে। আপনার দুর্ভাগ্য সে মুক্তি এসেছে মৃত্যুর বেশে। দুঃখের বিষয় মৃত্যুটা আপনার কাম্য না হলেও ঘটনাক্রমে কাকতালীয়ভাবে একই দিনে সমস্ত ঘটনা ঘটে গেল এবং মা আপনার মারা গেলেন, আর সেই পা-কাটতে গিয়েই। বেঁচে থাকলে মাকে আপনি পা-কাটা অবস্থায় দেখতেন। ঠিক সেই কোমর থেকে-কাটা ফটোর অংশটুকুর মতো। দেখুন, আমরা মনের ডাক্তাররা মোটামুটি মনের তিনটে ভাগ করেছি। একটা ভাগকে বলি 'নির্জ্ঞান মন'। অর্থাৎ যে মনের সম্বন্ধে আমাদের কোনও চেতনা নেই। কী হচ্ছে সেখানে কিছুই জানি না। সে-মন অন্ধকারে ঢাকা। সেখানে এমন সব বাসনা, কামনা, দাবি তলিয়ে রয়েছে, যা কোনওদিন সাধারণ একটা মানুষের পক্ষে সচেতনভাবে ভাবা তো দূরের কথা কল্পনা করা মুশকিল। এই নির্জ্ঞান বা অন্ধকারে ঢাকা মনটাই আমাদের মনের সবচেয়ে বড় অংশ। তারপর আর একটা অংশ আছে, যেটা হচ্ছে আমাদের 'সেনসার বোর্ড'। নির্জ্ঞান মনের গ্লানিময় কুশ্রী বাসনাকে মনের এই অংশ বাধা দেয়—সচেতন মনে উঠে আসতে দেয় না। সাধারণভাবে যাকে 'বিবেক' বলি আমরা এ তাই। মনের তৃতীয় অংশটার নাম 'সজ্ঞান মন'। খুব অল্প অংশ জুড়ে এই সজ্ঞান বা সচেতন মন। এই মনটুকুর কথাই আমাদের মাত্র জানা থাকে।'

'আশ্চর্য! আমি কী ভুল করেছি!'

'তা তো করেছেনই।' প্রণব পকেট থেকে সিগারেট বের করে নিজে ধরাল। বাণীব্রতকে দিল। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললে, 'আশা করি, এখন ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন। আপনার মার মৃত্যু প্রকৃতপক্ষে একটা শোচনীয় দুর্ঘটনা মাত্র। প্রকারান্তরে আপনি সেই দুর্ঘটনার অন্যতম একটা কারণ। কিন্তু তা অনিচ্ছাকৃত। প্রকারান্তরে মানুষ কী না করে? কী না হয়? যে শিশুর জন্ম দিতে গিয়ে মা মারা যান, সেই শিশুকে তার মার মৃত্যুর কারণ বলে গণ্য করলে আইনে তো তার জন্যে ফাঁসির ব্যবস্থা করে রাখতে হয়। কিন্তু তাই কি হয়—না কেউ ভাবে? আসলে সব জিনিসের মূল উদ্দেশ্য দেখতে হবে। মার কাছ থেকে মুক্তি পাওয়ার বাসনা জেগেছিল আপনার মনে—মাকে মৃত্যুর পথে এগিয়ে দেওয়ার ইচ্ছে নয়। আর মুক্তি পাওয়ার বাসনাটাও নির্জ্ঞান মনের এলাকাভুক্ত। যার ওপর কোনও হাত ছিল না আপনার। I think now it is clear to you—আপনার মার মৃত্যু

একটা অ্যাকসিডেন্ট। আর দুর্ঘটনার সঙ্গে দিন, ক্ষণ কার্যকারণের মিলটাও কাকতালীয় ব্যাপার—সেটাও দৈবক্রমে।'

প্রণব নীরব হল। বাণীব্রত তার ক্লান্ত দৃষ্টি সাদা আকাশের গায়ে নিবদ্ধ করে রাখল। শুকতারাটা ক্রমেই যেন মুছে আসছে। নীড় ছেড়ে পাখিরা উধাও হল। ওদের ঠোঁটের গানে বাতাস শব্দময়।

একসময় বাণীব্রত বললে, আশ্বাসলাভের স্বস্তি ও স্থৈর্যে ওর কণ্ঠস্বর আশ্চর্য একটা সমাহিত লাভ করেছে, 'আমি যেন রাত্রের দুঃস্বপ্ন থেকে জেগে উঠে আজকের এই ভোর দেখছি, ডাক্তার দাশগুপ্ত। কেমন যেন মনে হচ্ছে নিজেকে। কে যেন আমায় এতদিন দড়ি দিয়ে আষ্টেপিষ্টে বেঁধে রেখেছিল। সে বাঁধন খুলে গেছে।' পরিতৃপ্তির একটা নিশ্বাস পড়ল বাণীব্রতর বুক থেকে। বাণীব্রত বিড়বিড় করছিল তখনও, 'It is not I—It is an accident—accident. Not I, but accident! আর আমার কোনও দুঃখ নেই।'

প্রণব বাণীব্রতর কথাগুলো যথেষ্ট মনোযোগ দিয়ে শুনছিল। বাণীব্রত যখন বারবার বললে, নট আই বাট অ্যাকসিডেন্ট—প্রণব হঠাৎ যেন একটা রহস্যের সূত্র খুঁজে পেল। তাইতো—হ্যাঁ তাইতো—ঠিক। অ্যাকসিডেন্টের 'এ'(A) আর আইয়ের (I) আই, ইংরিজি এক 'ওয়ান সংখ্যা (one '1') আর 'আই' (I) অক্ষর লিখতে গেলে প্রায় একইরকম দেখতে হয়। 'I' আর '1'— ঠিক হয়েছে। বাণীব্রত যখনই এক বা ওয়ান সংখ্যা লিখতে গেছে—অলক্ষ্যে বাধা পেয়েছে। বেশ স্পষ্টই বোঝা যায় 'ওয়ান' আর 'আইয়ের' সাদৃশ্য থাকার দরুনই তার নির্জ্ঞান মনে মাতৃহত্যার দরুন যে পাপ-বোধ তলিয়ে রয়েছে, সেই পাপ-বোধের (অর্থাৎ, I have killed my mother—কথাই মনে হয়েছে—পীড়িত করেছে ওর সচেতন অস্তিত্বকে। কিন্তু এই অসহ্য কষ্টকর দুশ্চিন্তাকে বাণীব্রত বাধা দিতে চায়—বলতে চায় : It is not I, but an accident—'I' নয় 'A' : হ্যাঁ—বাণীব্রত 'A' লেখে, ও A লিখে ফেলে। আবার কাটে। তারপর আবার নতুন করে লেখে '1'। নিজের পাপ-বোধকে অস্বীকার করে সান্ত্বনা পাওয়াব জন্যে বাণীর মন তাই বারবার—বোধহয় বহুকাল থেকেই এই জটিল অদ্ভুত একটা প্রক্রিয়া আবিষ্কার করে নিয়েছিল। যাক, বাণীব্রত ভবিষ্যতে আর '1' লিখতে গিয়ে 'A' লিখে বসবে না।

কথায়-কথায় আরও খানিকটা সময় কাটল। শেষে প্রণব বললে, 'এখনকার মতো আপনার ছুটি। সারাদিন আপনি বিশ্রাম করুন। বিকেলে আবার দেখা হবে। আশা করি, অতীতের সমস্ত কথা ইতিমধ্যে স্পষ্টভাবে আপনার মনে পড়বে।'

প্রণব চলে যাচ্ছিল, বাণীব্রত পিছু ডাকলে, 'মিস দত্ত কোথায়?'

'এখানে।'

'কেমন আছেন?'

'জানি না। তাঁর কাছেই যাচ্ছি।' প্রণব দরজা খুলতেই একজন নার্সকে দেখতে পেল। ডাকলে তাকে। বললে, 'এঁকে এঁর কেবিনে নিয়ে যান। And give him some hot milk.'

প্রণব সোজা চলে গেল।

ডোরা দত্তর ঘরে গিয়ে প্রণব সবেমাত্র পা দিয়েছে, দেখে ডাঃ গুপ্ত ডোরার ব্যান্ডেজ ঢাকা মুখের ওপর আস্তে-আস্তে চাদরটা টেনে দিচ্ছেন। প্রণব হঠাৎ যেন তার সমস্ত অনুভূতি হারিয়ে ফেলল। অপ্রকাশ্য একটা হিমস্রোত তার সর্বাঙ্গ গ্রাস করল। চোখের সামনে ডাঃ গুপ্ত অস্পষ্ট হয়ে উঠলেন। বিছানার সাদা চাদরখানা যেন আকাশের মতো সারা ঘরে ছড়িয়ে গেল।

প্রণব যখন সংবিত ফিরে পেলে, দেখে ডাঃ গুপ্ত তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন।

ডাঃ গুপ্ত ধীরে-ধীরে বললেন, 'অনেক চেষ্টা করলাম। হল না।' মাথা নাড়লেন ডাঃ গুপ্ত।

সারা ঘরটা আশ্চর্য ঠান্ডা আর নিস্তব্ধ। সেখানে দাঁড়িয়ে নিশ্বাস নিতেও কষ্ট হয়। অনেক কষ্টে বললে প্রণব, 'মিস দত্ত কি কোনও কথা বলতে পেরেছিলেন?'

'হ্যাঁ। দুটো তিনটে কথা। অস্পষ্ট বিকার।'

'কী বললেন?'

'ঠিক বুঝলাম না, মনে হল, ও বাণীব্রতকে নিয়ে পালিয়ে যেতে চাইছে দূরে কোথাও।'

প্রণব কোনও কথা বললে না। অপলক চোখে তাকিয়ে থাকল চাদর ঢাকা ডোরার মৃতদেহের পানে। নিজেরই অজ্ঞাতে একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল ওর বুক বেয়ে'

সেইদিনই সন্ধেবেলা। স্থান—হাসপাতাল। ডাঃ গুপ্তের ঘরে ওরা ক'জন বসেছিল। ডাঃ গুপ্ত, প্রণব, মিঃ ঝা, ইনসপেক্টার গুপ্তা, সুদক্ষিণা আর বাণীব্রত। জরুরি তার পেয়ে মাত্র খানিক আগে মিঃ ঝা এবং ইনসপেক্টার গুপ্তা পরেশনাথে এসে পৌঁছেছেন মোটরে। প্রথমেই বাণীব্রতর শৈশবজীবনের দুর্ঘটনাব কথা উল্লেখ করে তার ইতিহাস সবিস্তারে বুঝিয়ে বলেছে প্রণব। তারপর ডেকে পাঠিয়েছে বাণীব্রতকে।

বাণীব্রত প্রণবের প্রশ্নের উত্তরে বলছিল, 'নীলার সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ হয় এক গানের মজলিশে। নীলা ভালো গান গাইতে পারত—সেই সূত্রেই আমাদের আলাপ পরিচয়। এবং পরে ঘনিষ্ঠতা বেড়ে ওঠে। নীলাদের সংসারের কথা একটু বলতে হয় এখানে। আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে ওর ছিল বৃদ্ধ বাবা আর বিধবা এক পিসিমা। ছোট একটি বোনও ছিল নীলার। বছব খানেক নীলার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেশার পর একদিন নীলা আমায় ওকে বিয়ে করার কথা বললে। আপনাদের কাছে আজ আর অস্বীকার করবার মতো কোনও কথা আমার নেই, মিঃ ঝা। নীলা যেদিন এ প্রস্তাব জানালে এবং বললে, তার বাবার কাছে গিয়ে আমি যেন প্রস্তাবটা উত্থাপন করি, সেদিন প্রথমে অবশ্য আমি খুবই খুশি হয়েছিলাম। কিন্তু পরে রাত্রিতে যতবার কথাটা ভেবেছি, কেমন যেন একটা অস্বোয়াস্তি আর ভয়ে আমার সর্বাঙ্গ মুষড়ে পড়ছিল। কেন যে জানি না—আজও বুঝতে পারিনি। যাই হোক—এমনি ভাবে একদিন দুদিন করে ক্রমেই একটা গোটা মাস শেষ হল। আমার মনের অস্বোয়াস্তিও ক্রমে বেড়ে উঠছিল। কেমন যেন হয়ে যাচ্ছিলাম আমি দিন-দিন। আমার হাব, ভাব, আচার, ব্যবহার, কথাবার্তা—সব কিছুর মধ্যে থেকে উৎকটভাবে আমার এ পরিবর্তন ফুটে উঠতে লাগল। আত্মীয়-স্বজন বলতে আমার কেউ ছিল না চোখের সামনে—নয়তো তাদের কাছে নিশ্চয় আমি ধরা পড়ে যেতুম। আর বাস্তবিক শেষ পর্যন্ত তাই হল। ধরা পড়ে গেলুম—আমার এক প্রিয় বন্ধুর কাছেই। বন্ধুই বললাম, যদিও দেবু, আপনারা যাঁকে দিব্যেন্দু বলে জানেন, যাকে হত্যা করার অভিযোগে আমি অভিযুক্ত, সেই দেবু সম্পর্কে আমার ভাই হত। একটু দূর সম্পর্কের। আমাব বাবা ও তার বাবা ছিলেন আপন খুড়তুতো ভাই। ভাই না বলে বন্ধু বললাম, কেননা ওর সঙ্গে আমার সম্বন্ধটা বন্ধুর মতো ছিল, ঠিক ভাইয়ের মতো নয়। দেবু একদিন ধরে ফেলল। বললে, তোমার এমন বিশ্রী চেহারা হয়ে যাচ্ছে কেন দিন-দিন? শুনলাম রাত্রে ঘুমোও না, যেখানে-সেখানে ঘুরে বেড়াও সারাদিন টো-টো করে। কী হয়েছে?...কী হয়েছে তা আমি দেবুকে বোঝাই কী করে? যাই হোক, শেষ পর্যন্ত ওর কাছে সমস্ত কথা খুলে বললাম। দেবুব সঙ্গে নীলার আলাপ ছিল। সে আলাপের উদ্যোক্তা ছিলাম আমি নিজেই। তবে আমি জানতাম, আলাপ থাকলেও ওদের মধ্যে বিশেষ কোনও যোগাযোগ কি অন্তরঙ্গতা ছিল না। আমার কথা শুনে দেবুকে চিন্তিত হতে দেখলাম। ও তখন ফাইন্যাল পরীক্ষা দিয়ে রেজাল্টের আশায় বসে রয়েছে। ডাক্তার লোক, তার ওপর ভাই, বন্ধু। আমি ওর কাছে অনেক কিছু আশা করে সব কথাই খুলে বললাম। ভেবেছিলাম আমার এই হঠাৎ বিবাহ-বিমুখতা, ভয়, এ সব নিশ্চয় শারীরিক দুর্বলতার জন্যেই দেখা দিয়েছে। Yes, I was suffering from nervous breakdown at that time. সমস্ত কথা শুনে দেবু বললে, নীলার সঙ্গে দেখা করে সেসব কথা বুঝিয়ে বলবে। যাতে কি না, নীলা অন্য কিছু মনে না করে বসে—সবুর করে আরও কিছুদিন।

'দেবুর কাছে ভরসা পেয়ে আমি একটু সুস্থির হলাম। এই সময় একদিন দেবু আমায় বললে, কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে পরামর্শ করে ওর ধারণা হয়েছে, আমার যা ব্যাধি, তাকে মনের রোগ বলা যায়। কিছু একটা ব্যাপার নিশ্চয় আছে যার জন্যে যে মেয়েকে আমি ভালোবাসি তার কাছ থেকে বিবাহের প্রতিশ্রুতি পাওয়া সত্ত্বেও আমি মেয়েটিকে বিয়ে করার কল্পনা করতেও ভয় পাচ্ছি। দেবুর কথা আমি সেদিন বুঝিনি—আজও বুঝি না।'

বাণীব্রতর কথায় বাধা দিয়ে প্রণব বললে, 'আপনার ভাই আপনার স্নায়বিক দুর্বলতার (nervous breakdown) কারণ ঠিকই অনুমান করেছিলেন, বাণীবাবু। আপনি সেদিন যা বুঝতে পারেননি, আজ তা বুঝতে পারবেন। আমি আপনাকে পরে তা বুঝিয়ে দেব। এখন আপনার কথা বলে যান।'

'দেবু আমায় বললে, এ বিষয়ে সে কলকাতার কোনও একজন সাইকো-অ্যানালিস্টের সঙ্গে আলাপ করবে।'

ডাঃ গুপ্ত একটা বিস্ময়-উক্তি করলেন।

'আমি যে কী বিশ্রী, মর্মান্তিক একটা অবস্থার মধ্যে দিন কাটাচ্ছিলাম, তা আপনাদের বোঝাবার শক্তি আমার নেই। দেবুর কথা শুনে যা সে ভালো বোঝে—যাতে আমার ভালো হয় তাই করতে বললুম। দিন দুয়েক পরে দেবু এসে আমায় নানা বিষয়ে প্রশ্ন করলে। আমার প্রশ্নের উত্তরগুলো লিখে নিয়ে চলে গেল। অজস্র উদ্বেগ নিয়ে আমি অপেক্ষা করতে লাগলুম দেবুর জন্যে। একদিন দুদিন করে পুরো একটা হপ্তা কেটে গেল—দেবু এল না। অবশেষে আমি একদিন তার বাড়ি গেলাম। গিয়ে শুনলাম, সে নীলার বাড়িতে গেছে। দেবুর বোন—সীতা আমায় খবরটা দিল। সীতা যেন আরও কী-কী বললে যাতে আমার কেমন সন্দেহ হল। দেবুব বাড়ি থেকে নীলার বাড়িতে এসে হাজিব হলাম। নীলার ছোট বোনের সঙ্গে দেখা হতে তার কাছ থেকেই জানলাম নীলা আর দেবু বাগানে বসে গল্প কবছে।' বাণীব্রত একটু থামল। অতীতেব ঘটনাটুকু মনে করবার আপ্রাণ প্রয়াস ওর ক্লান্ত, শুষ্ক মুখের রেখাবিন্যাস থেকেই বোঝা যায়। বেদনাব সুব তার কণ্ঠে। 'আমি—আমি—' বাণীব্রত বলে চলল, 'আমি বাগানের পথে পা বাড়ালুম ওদের খোঁজে। সন্ধে তখন হয়ে এসেছে। আধো-অন্ধকার ভরা বাগানের এদিক-ওদিক খুঁজেও কিন্তু কাউকে দেখতে পেলুম না। হতাশ হয়ে ফিরে আসছি, এমনসময় নীলার গলা শুনে আমি থমকে দাঁড়িয়ে পড়লুম। একটু নজর করে তাকাতেই দেখি—কতকগুলো ফুলগাছের ঝোপের তলায়—সহজে যে স্থানটা কারুর চোখে পড়বে না, এমন একটা জায়গায়—ওই সন্ধের অন্ধকারে নীলা আর দেবু পরস্পরের—' বাণীব্রত যেন চাবুক খেয়ে হঠাৎ থেমে গেল। ওর সমস্ত মুখখানা বিবর্ণ হয়ে উঠল।

'কী দেখলেন, বলুন? লজ্জা পাওয়ার কোনও কারণ নেই, বাণীবাবু। দৃশ্যটা যতই কুৎসিত হোক, তা জানার প্রয়োজন আছে আমাদের।' বললে প্রণব।

বাণীব্রত একটু থেমে শেষে বললে, 'আমি ওদের আলিঙ্গনাবদ্ধ দেখলাম।'

'তারপর?'

'সম্ভবত তারপর সংযম রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। পাগলের মতো তখন কী করেছি আমার মনে নেই। খালি মনে পড়ছে আমি নীলার সামনে এসে দাঁড়াই। নীলা ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছিল। দেবু লুকিয়ে পড়েছে। আমায় দেখে নীলা বোধহয় ভূত দেখার মতনই চিৎকার করে উঠেছিল। কী জানি কেন রাগে দুঃখে আমি জ্ঞান হারিয়েছি তখন। নীলার কাঁধ ধরে দু-হাতে ঝাঁকুনি দিয়ে আমি ওকে কী সব যেন বললাম। কী বললাম আজ আর তা মনে নেই। বোধহয় জানতে চেয়েছিলাম এমন ভাবে আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা কেন করল ও? নীলা প্রথমটায় চুপ করে ছিল। আমি যখন মনের সমস্ত জ্বালা উজাড় করে ফিরে আসছি, নীলা আমায় বললে, যা বললে, তা কখনও ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করিনি। ও বলল, আমি নাকি পাগল! ছেলেবেলা থেকেই পাগল। ডাক্তারেরা

বলেছে—আমার রক্তে পাগলামি লুকিয়ে আছে। আমি নাকি আমার মাকে মেরেছি—যে লোক তার মাকে হত্যা করতে পারে, তাকে নীলা বিশ্বাস করবে কী করে? একটা উদ্ভট পাগলকে সে ভালোবাসে না—ভালোবাসতে পারে না। ...কথাটা শুনে আমার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। কী যে তখন মনে হল সে কথা আজ বুঝিয়ে বলা অসম্ভব। তবে হ্যাঁ—আমি বাস্তবিক তখন পাগলই হয়ে গিয়েছিলাম। নয়তো নীলার গলা টিপে ধরে বলতাম না, মিথ্যে কথা—সমস্ত মিথ্যে কথা। কে তোমায় বলেছে? কে?...বোধ হয় নীলার গলাটা একটু জোরেই চেপে ধরেছিলাম আমি। নীলার দমবন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। তার গোঙানি শুনতে পেলাম। এমন সময় ঝোপের পাশ থেকে দেবু বেরিয়ে এসে আমার হাত থেকে নীলাকে বাঁচালে। ও বললে—নীলা যা বলেছে তা সবই ঠিক। দেবু নীলাকে সব কথা জানিয়েছে। আর দেবু সাইকোঅ্যানালিস্টের কাছ থেকে এবং অন্যান্য সূত্র থেকে জানতে পেরেছে বাস্তবিকই আমি একটা পাগল। আমি আমার মাকে মেরেছি। নীলাকেও আর একটু হলে আমি মেরে ফেলছিলাম। দেবুর মুখ থেকে এসব কথা শোনার পর আমি পাথর হয়ে গেলুম। কী ভাবছিলাম তখন জানি না। যখন জ্ঞান হল দেখি ওরা কেউ নেই। বাগানে আমি শুধু একা। অন্ধকারে সমস্ত জায়গাটা ছেয়ে গেছে। হাওয়া দিচ্ছে জোরে—বড় জোরে।' বাণীব্রত চুপ করল।

ঘরের মধ্যে আবহাওয়া কেমন যেন গুমোট ভারী হয়ে উঠছে আস্তে-আস্তে। সকলেই নির্বাক, বিস্মিত, ব্যথিত।

ডাঃ গুপ্তই প্রথমে কথা বললেন, 'এর পরই কি আপনার ভাই নীলাকে সঙ্গে করে পালিয়ে আসে?'

'হ্যাঁ। এ ঘটনার মাত্র কয়েকদিন পরেই।' বাণীব্রত চেয়ার ছেড়ে উঠে আস্তে-আস্তে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

'কিন্তু আপনার ভাই নীলাকে বিয়ে করে কলকাতাতেই থাকতে পারত। ওরা পালিয়ে এল কেন? মিঃ ঝা প্রশ্ন করলেন।

'আপনি ঠিকই বলেছেন। এ কথাটা আমিও বহুবার ভেবেছি। কিছুতেই বুঝতে পারিনি।' উত্তর দিল বাণীব্রত।

'আমি কিন্তু ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছি। বললে প্রণব। সকলে তার দিকে মুখ ফেরাল। 'ডাঃ চক্রবর্তী অসম্ভব বুদ্ধিমান ব্যক্তি ছিলেন দেখছি। বাণীবাবুর দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তিনি নীলাকে হস্তগত করবার এক সুন্দর ষড়যন্ত্র সৃষ্টি করেছিলেন। এমন চমৎকার বৈজ্ঞানিক ষড়যন্ত্র ডিটেকটিভ গল্পের বইতেও বড় একটা পড়া যায় না। ষড়যন্ত্রটা বিষদভাবে বললে এইরকম দাঁড়ায়। বাণীবাবুর বিবাহ-ভীতিটা প্রকৃতপক্ষে ওঁর মনোবিকারের অন্তর্গত প্রধান লক্ষণ। আপনি যে বললেন না বাণীবাবু, আপনার সে সময়ে স্নায়বিক দুর্বলতা দেখা দিয়েছিল—সেটা ঠিকই। নীলা যখন আপনাকে বিয়ে করতে বললে, তখন থেকেই আপনার মনে অস্বোয়াস্তি, উদ্বেগ, কেমন একটা ভয় দেখা দেয়। তারপর সেটা ক্রমেই বেড়ে যেতে থাকে। এর কারণ কী জানেন? নীলা যখনি সোজাসুজি আপনাকে বিয়ের কথা বলল, তখুনি আপনার মনে মাতৃ-হত্যাজনিত সুপ্ত পাপবোধ নির্জ্ঞান মনের সীমানা ছাড়িয়ে ভেসে উঠে সচেতন মনকে গ্রাস করতে চেয়েছে। যেমন ধরুন, একটা কাচের গ্লাসে থিতিয়ে পড়া বালি, ময়লা নীচে পড়ে রয়েছে, আর ওপরে তার পরিষ্কার জল। গ্লাসটা যদি এবার নেড়ে দেওয়া যায়—কাচের গ্লাসে থিতিয়ে পড়া বালি, ধুলো, ময়লা যেমন সমস্ত কাচের গ্লাসের জলটাকে ঘোলাটে, ময়লা করে দেয়, ঠিক তেমনি। কিন্তু কেন এমন হল এটাই আপনি জানতে চান, না বাণীবাবু? জিনিসটা আপনার কাছে খুবই আশ্চর্য বলে মনে হবে, কিন্তু আমাদের—মনঃসমীক্ষকদের কাছে এটা খুবই সাধারণ ব্যাপার। হামেশাই এমনটা ঘটে। একটু গুছিয়ে বলি, আপনিও বুঝতে পারবেন। ছেলেবেলায় আপনি আপনার মাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতেন। মা ছাড়া আপনার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব কল্পনা করা মুশকিল। পরে যৌবনে যখন আপনি একটি মেয়েকে ভালোবাসলেন, তখন সত্যি বলতে

কী নীলার মধ্যে আপনার সেই ছেলেবেলার ভুলে যাওয়া মার একটা প্রতিচ্ছবি খুঁজে পেলেন। আপনি হয়তো এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন না, কিন্তু ভালো করে নীলার চরিত্র, দেহ, মন বিশ্লেষণ করলে নিশ্চয় কোথাও না কোথাও আপনার মা ও নীলার মধ্যে একটা সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যেত। আচ্ছা বলুন তো, কোনও সাদৃশ্য আপনি কি খুঁজে পেয়েছিলেন, যা আজ মনে করতে পারেন? একটা সাদৃশ্যের কথা বলি। আপনি বলেছেন, আপনার মা খুব ভালো গান গাইতে পারতেন, নীলাও ঠিক তাই। নয় কি?'

বাণীব্রত তার বিস্মিত দৃষ্টি প্রণবের মুখের পানে নিবদ্ধ করে বললে, 'আশ্চর্য! আপনি ঠিক বলেছেন, ডাঃ দাশগুপ্ত। মার মতনই নীলার গলার স্বর ছিল অসম্ভব মিষ্টি, এমন কী, ও যখন কথা বলত আমার মাঝে-মাঝে মনে হয়েছে আমি যেন মার গলা শুনছি। এ ছাড়া নীলার সঙ্গে মার চোখেরও একটা মিল ছিল। খুব টানাটানা চোখ, ভাসা-ভাসা, তেমনি চুল।' বাণীব্রত থামল।

'তাই হয়। ছেলেরা তাদের স্ত্রীর মধ্যে মা, আর মেয়েরা তাদের স্বামীর মধ্যে পিতার প্রতিচ্ছবিই খুঁজে বেড়ায়। আপনি নীলার মধ্যে মার একটা অংশ প্রতিফলিত হতে দেখেছিলেন, আর তাই ভালোবেসেছিলেন তাকে। কিন্তু নীলা যখন আপনাকে বিয়ের কথা বলে, আপনি হঠাৎ খুব ভয় পেয়ে গেলেন। কেন জানেন? নীলাকে বিয়ে করার কথা ভাবতে গেলেই সব সময় আপনার মনে হত মাকে—মনে পড়ত তাঁর কথা। যাঁকে আপনি প্রকারান্তরে হত্যা করেছেন এ চিন্তা কিন্তু আপনার অবচেতন মনে শেকড় গেড়ে বসে রয়েছে। তাই নীলার বেলাতেও মনে হত—ভাবতেন, নীলাকেও বুঝি আপনি মেরে ফেলবেন। বাণীবাবু, পাপবোধই আপনার মনোবিকার, আর সেটাই আপনার আসল চরিত্র। দুঃখের বিষয়, এই পাপবোধের ভারে আপনি এতই পীড়িত ছিলেন যে নীলাকে ভালোবাসা সত্ত্বেও তাকে বিয়ে করার মতো সাহস খুঁজে পাচ্ছিলেন না।'

'But what's about Dr. Chakravartty's conspiracy—তাঁর কী হল?' মিঃ ঝা প্রশ্ন করলেন।

'ডাঃ চক্রবর্তী বাণীবাবুব কাছে যা বলেছিলেন তা ঠিক। তিনি বাণীবাবুর অস্বাভাবিক ও আকস্মিক পরিবর্তনের মূল কারণ কোনও একজন মনঃসমীক্ষকের সাহায্য নিয়ে জেনে নেন। নিজেও তো তিনি একজন সাধারণ ডাক্তার। মনোবিকারের ইতিহাসটুকু জানার পর বাণীবাবুর এই দুর্বলতাটুকু নিজের স্বার্থে ব্যবহার করেন। নীলাকে ভুল বুঝিয়ে, বাণীবাবুর মনে যে দুশ্চিন্তা এতদিন সুপ্ত ছিল, সেটাকে জাগিযে, ডাঃ চক্রবর্তী নিজের কার্যসিদ্ধি করলেন।'

'It's terrible!' মিঃ ঝা বিস্ফারিত নেত্রে বাণীব্রতর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

'নীলাকে নিয়ে ডাঃ চক্রবর্তী পালিয়ে গিয়েছিলেন ঠিক সেই কারণে। তাঁর ভয় ছিল, যদি বাণী এসব জানার পর নিজেই কোনও মনঃসমীক্ষকের কাছে যায়, তা হলে আসল সত্য ধরা পড়ে যাবে। তখন আর নীলাকে পাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না। তার ওপর ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে গেলে ভবিষ্যতে আরও অনেক ক্ষতিই হয়তো হতে পারত ডাঃ চক্রবর্তীর।' প্রণব তার কথা শেষ করল।

ডাঃ গুপ্ত প্রণবের ঘটনা বিশ্লেষণে মুগ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। মিঃ ঝা তাঁর সুদীর্ঘ কর্মজীবনের ইতিহাসে এমন অদ্ভুত একটি হত্যা-মামলার সংস্পর্শে আসেননি কখনও। তিনি চমৎকৃত হলেন ঘটনার জটিলতা এবং প্রণবের বুদ্ধির অসাধারণ তীক্ষ্ণতা দেখে। ইনসপেক্টার গুপ্তার চোখের পাতা আর পড়ে না। তাঁর কল্পনা হার মেনে মাথা লুটিয়েছে। এখন তিনি ভাবছেন—এরপর কী শুনবেন কে জানে? সুদক্ষিণা যেন বিশেষ কোনও একটা জটিল দর্শনসূত্রের মীমাংসা করছে মনে-মনে—এমনি একটা আত্মকেন্দ্রিক তন্ময়তায় বিভোর।

সিগারেটের টুকরোটা ফেলে দিয়ে ডাঃ গুপ্ত ঘরের নিস্তব্ধতা নষ্ট করলেন। তাঁর সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর সকলকে সচকিত করল, 'এবার শেষ কথা ক'টা জানতে পারলেই সমস্ত পরিশ্রম সার্থক হয়। কিন্তু তার আগে আমাদের যেন একটু করে কফি দরকার। নয় কি?'

'মন্দ কী! আমিই এবার পাগল হয়ে যাওয়ার মতো হয়েছি।' মিঃ ঝা সজোরে হেসে উঠলেন।

মিঃ ঝার হাসি ঘরের থমথমে আবহাওয়াকে অনেকটা লঘু করে তুলল।

খানিকক্ষণ পরস্পরে নীলার বিষয় নিয়ে এটা-সেটা আলাপ আলোচনা করলেন। নানা অনুমান, সিদ্ধান্ত, মতামত, কটূক্তি—যার যা মনে এল তাই। কফি এল। সুদক্ষিণা আর বাণীর জন্যে চা।

আরও খানিকটা সময় অতিবাহিত হল। শেষে মিঃ ঝা মূল প্রসঙ্গের অবতারণা করলেন, 'ডাঃ দাশগুপ্ত, এবার দেওঘরের কথাটা জানতে পারলেই আমাদের ছুটি।'

প্রণব কোনও উত্তর দেওয়ার আগে বাণীব্রত তার হাতের সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে নামিয়ে রেখে বললে, 'দেওঘরের কথা আপনারা যা জানেন সবই ঠিক। খালি সামান্য যে ক'টি কথা জানেন না সেটুকুই আমি বলব। জানি না, আমার কথা আপনারা বিশ্বাস করবেন কি না?'

'আপনার কথা বিশ্বাস না করবার তো কোনও কারণ নেই। আপনি বলুন।' বললে প্রণব।

বাণীব্রত বলতে লাগল, 'দেবুকে আবার আমি দেখি দেওঘরে। গায়ত্রী বউদির হঠাৎ শরীর খারাপ হওয়ায় বিভূতি ডাক্তার ডেকে আনে। সেই ডাক্তারই যে দেবু তা আমি জানলাম—গায়ত্রী বউদির বিছানার পাশে বসে—দেবু যখন ঘরে ঢুকল। দেবুকে দেখে অবাক যত না হয়েছিলাম ভয় হয়েছিল তার শতগুণ বেশি। আমার দিকে তাকিয়ে দেবুর কিন্তু কোনও ভাবান্তর প্রকাশ পেল না। গম্ভীর হয়ে নিজের কাজ করতে লাগল ও। আমি ঘর ছেড়ে চলে এলাম। দেবু চলে গেল, আমি তাও দেখলাম আড়াল থেকে। কিন্তু দেবুকে দেওঘরে দেখার পর থেকেই আমার মনের সমস্ত শান্তি কে যেন আশ্চর্যভাবে কেড়ে নিল। ভেতরে-ভেতরে ছটফট করতে লাগলাম সাঙ্ঘাতিক একটা দুশ্চিন্তা আর ভয়ে। আমার সে দুশ্চিন্তা আর ভয়ের কারণটা আপনাদের বলি। না জানি কেন, আমার মনে হতে লাগল, দেবু আমার পরমশত্রু। বিভূতিদের সংসারের সঙ্গে আমার এই অকৃত্রিম সৌহার্দ্য, বন্ধুত্ব, আর বিশেষ করে সুদক্ষিণার সঙ্গে আমার মন বিনিময়ের কথা ওর কাছে লুকোনো থাকবে না। যেমন করেই হোক দেবু সব জেনে নেবে। আর তারপর প্রকাশ করে দেবে আমার গুপ্ত কলঙ্ক। কথাটা ভাবতেই আমার সারা শরীর যেন হিম হয়ে আসছিল। কী বিশ্রী হবে, যদি দেবু বিভূতিকে জানিয়ে দেয় আমার মধ্যে পাগলামির বীজ আছে, আমি অস্বাভাবিক প্রকৃতির এক ছেলে, মাকে হত্যা করেছি, পাগল হয়ে যেতে পারি যে-কোনও দিন, যে-কোনও মুহূর্তে। আর পাগলে কি না করতে পারে? কে বিশ্বাস করে তাকে? বিভূতি এসব কথা শোনার পর, গায়ত্রী বউদি, সুদক্ষিণা, কার আর জানতে বাকি থাকবে আমাব কলঙ্ক-কাহিনি। তারপর? তারপর জেনেশুনে সুদক্ষিণা নিশ্চয় আমায় বিয়ে করতে আর রাজি হবে না। বিভূতি ও বউদিও কখনও এমন বিয়েতে মত দেবেন না। জানেন প্রণববাবু, এসব কথা ভাববার পর আমার মনে হল এ জগতে আমার সব ছিল, অথচ আর একটু পরে কিছু থাকবে না। সুদক্ষিণাকে নীলার মতোই হারাতে হবে এ কল্পনা আমার কাছে যে কী দুঃসহ মনে হয়েছিল, তা আজ আপনাদের বোঝানো মুশকিল।' বাণীব্রত একটু থামল। তাকাল সুদক্ষিণার দিকে। এক কোণে মুখ নিচু করে বসে রয়েছে ও।

'বুঝেছি। আপনি বলুন।'

'ঠিক এই জন্যেই আমি মাঝরাতে লুকিয়ে দেবুর বাড়ি যাই। আমার কোনও অসৎ উদ্দেশ্য ছিল না। আমি শুধু লুকিয়ে তাকে বলতে গিয়েছিলাম, সে যেন আমার কলঙ্কের কথা এদের কাছে প্রকাশ করে না দেয়। যে শান্ত, মধুর, মনের মতো সম্পর্ক আমি গড়ে তুলেছি, দেবু যেন আমার সে প্রীতির সম্পর্ক নষ্ট না করে। তার পরিবর্তে আমি আমার যা আছে সব তাকে দিয়ে দেব। ও শুধু আমায় বাঁচাক। যাদের আমি ভালোবেসেছি—যারা আমায় ভালোবেসেছে—তাদের কাছে একটা পশুর মতো বিভীষিকার বস্তু হয়ে থাকতে আমি পারি না। না—না—কখনও নয়।' বাণীব্রতর স্বর উত্তেজনায় কাঁপতে লাগল।

'আপনি বিভূতিবাবুর রিভলভার নিয়েছিলেন কেন?' প্রশ্ন করলেন মিঃ ঝা।

'দেবুকে আমি বিশ্বাস করতে পারিনি তাই। ও যদি আমার অনুরোধে রাজি না হয়, ওকে ভয় দেখাব এই ছিল আমার উদ্দেশ্য। তা ছাড়া যদি আমার সে উদ্দেশ্যও ব্যর্থ হয়, আত্মহত্যা করে মনের এই অসহ্য যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি নেব, এই ছিল আমার ইচ্ছে।'

'ডাঃ চক্রবর্তীকে হত্যা করবার উদ্দেশ্য আপনার ছিল না?'

'না—না—কখনওই না।' বাণীব্রত দৃঢ় আপত্তি জানাল।

'তা হলে উনি কেমন করে মারা গেলেন? আপনার রিভলভারের কার্টিজ খরচ হল কী করে?' মিঃ ঝা জেরা করলেন।

'বলছি। মাঝরাত্রে দেবুর বাড়ি যাওয়ার পথে এক জায়গায় আমি রিভলভারের একটা কার্টিজ খরচ করি। তখন রেললাইনের ওপর দিয়ে একটা মালগাড়ি যাচ্ছিল। তার শব্দে আমার গুলির শব্দ ঢাকা পড়ে যায়।'

'তাতো বুঝলাম। কিন্তু কেন কার্টিজ খরচ করেন তা তো বললেন না?'

'রিভলভার ছুঁড়তে আমি জানতাম না, দেখছিলাম প্রয়োজন হলে আমি সেটা ব্যবহার করতে পারব কিনা।'

'My god!'

'দেবুর বাড়িতে গিয়ে ওকে ডাকাডাকি করি। ও নীচে নেমে আসে। দেবুর বাইরের ঘরে আমবা কথা বলছিলাম। সামনা-সামনি বসে। তারপর অবশ্য উঠে দাঁড়িয়েছিলাম। দেবু আমার কথা শুনে মজা পাচ্ছিল বলে মনে হল। সে খুব হাসছিল। আর যতবাব আমি তার কাছে জোড়হাতে ভিক্ষে চাইছিলাম আমার সুখ, শান্তি, ভবিষ্যৎ, ততবারই কুৎসিত পশুর মতন কী নির্মম ভাবেই না ও আমায় উপহাস করছিল। আমি যখন আমার সমস্ত সম্পত্তি ওকে দেব জানালাম, তখন সে কী বললে জানেন? বললে, আমায় পাগল প্রমাণিত করে সম্পত্তি তো বটেই, সুদক্ষিণাকে পর্যন্ত সে ছিনিয়ে নেওয়ার কথা ভাবছে। আমি তাকে লক্ষ না করলেও দেওঘরে আমার উপস্থিতি তার চোখ এড়ায়নি। সুদক্ষিণার সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গতার কথাও সে জানে। ও শুধু অপেক্ষা করছিল একটা সুযোগের। এতদিনে সে সুযোগও জুটেছে। এ কথা শোনার পর আমার পক্ষে ধৈর্য রাখা আর সম্ভব হয়নি। আমি পকেট থেকে রিভলভার বের করে তাকে শাসাই। হ্যাঁ—আমি তাকে শাসাচ্ছিলাম। অনেক কটুকথা আমি বলেছি তাকে সে সময়। কিন্তু কী করব—আমি যেন কেমন হয়ে গিয়েছিলাম। রিভলভার দেখে দেবু ভয় পেয়েছিল। স্পষ্ট আমি দেখতে পাচ্ছি—কীরকম কুঁকড়ে, কাতরভাবে সে আমার হাতের দিকে নির্বোধের মতো তাকিয়ে রয়েছে। ঠিক এ সময়—আমি জানি না—তবে এটা জানি, আমি রিভলভারের ট্রিগার টিপিনি—সাঙ্ঘাতিক একটা শব্দ হল। আর আমার পায়ের কাছে দেবু বিকট একটা চিৎকার করে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। শব্দের সঙ্গে-সঙ্গে আমি চমকে উঠি—আমার হাত থেকে রিভলভার পড়ে যায় মাটিতে। আমার তখন মনে হয়েছে—আমিই দেবুকে মেরেছি। দেবু মারা গেল কি না তা পর্যন্ত আমি দেখিনি। তার করুণ গোঙানি তখনও শুনতে পাচ্ছিলাম। ধরা পড়বার ভয়ে আমি জানালা ডিঙিয়ে বাইরে পালিয়ে আসি। পাশেই ছিল কুয়ো—আর কুয়োর পাশে কলাগাছেব ঝোপ। সেই কলাগাছের ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে আমি বসে থাকলাম প্রায় ঘণ্টাখানেক, কী তারও বেশি। যখন দেখলাম লোকজন কেউ এল না, তখন সেখান থেকে গা ঢাকা দিয়ে সোজা স্টেশনে পালিয়ে আসি।'

'আশ্চর্য ব্যাপার। আপনি কলাগাছের ঝোপের মধ্যে ঘণ্টাখানেক লুকিয়ে থাকলেন, এর মধ্যে গুলির শব্দ শুনে কোনও লোকজন এসে জুটল না? বাড়ির মধ্যেও কোনওরকম সাড়া, শব্দ, চেঁচামেচি শুনলেন না?'

মাথা নাড়লে বাণীব্রত। বললে, 'না। শ্মশানের মতো নীরব—খাঁ-খাঁ করছিল। কোনও সাড়া, শব্দ, চেঁচামেচি কিছুই শুনিনি। কেবল—।'

'কী?'

'আমি যখন কলাগাছের ঝোপে লুকিয়েছিলাম, কে একজন গায়ে চাদর ঢাকা দিয়ে কুয়োতলার পাশে এসে দাঁড়াল।'

'চাদর ঢাকা দিয়ে? কে লোকটা?' প্রণব প্রশ্ন করলে। গলায় তার উত্তেজনা।

'জানি না। চিনতে পারিনি। তবে একজন মহিলা। কেননা পরনে তার শাড়ি ছিল। আমি তার পা দেখেছি। মুখ, মাথা কিছুই দেখতে পাইনি। চাদর জড়ানো ছিল।'

'তিনি কী করলেন?'

'কী করলেন?' বাণীব্রতর কপালে কুঞ্চিত রেখা ফুটে উঠল। বুজে এল চোখের পাতা। কী একটা কথা মনে করবার চেষ্টায় ও যে আপ্রাণ মানসিক পরিশ্রম করছে তা স্পষ্টই বোঝা গেল।

'কী করলেন তিনি, মনে করতে পারছেন না? You have to remember—you must. বলুন—তিনি কী করলেন?' প্রণব হঠাৎ যেন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। ঝুঁকে পড়ল বাণীব্রতর মুখের কাছে এসে।

বাণীব্রতর ক্লান্ত শুষ্ক মুখের বিবর্ণতা হঠাৎ যেন আলোর আভাসে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। সে বললে আচমকা, 'কী যেন কুয়োর মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সেই নারীমূর্তি নিঃশব্দে ঘরের মধ্যে ফিরে গেল আবার। তার আসাও যেমন আকস্মিক, চলে যাওয়াও তেমনি।'

মিঃ ঝা কিছু একটা বলবার উপক্রম করছিলেন। কিন্তু তাঁর আর কথা বলা হল না।

প্রণব বললে, 'মিঃ ঝা, আপনি আর সময় নষ্ট করবেন না। এখুনি মোটর নিয়ে বেরিয়ে পড়ুন। সোজা দেওঘর। ডাঃ চক্রবর্তীর বাড়ি। সেখানে কুয়োর মধ্যে লোক নামিয়ে দয়া করে ডাঃ চক্রবর্তী যে রিভলভারে মারা গিয়েছেন সেই রিভলভারটা তুলে নিন।'

প্রণবের কথায় সকলে তার মুখের দিকে বোকার মতো চোখ তুলে তাকাল। সমস্ত ঘরটা বুঝি ভেঙে পড়েছে হঠাৎ—এমনি একটা বিহ্বলতা ও বিস্ময়ের ভাব ওদের।

'What do you mean?' মিঃ ঝা অস্পষ্টভাবে বললেন।

'যা অনুমান করেছি বোধহয় তা ঠিকই। ডাঃ চক্রবর্তীর হত্যাকারী নীলা, অর্থাৎ স্ত্রীই স্বামীকে হত্যা করেছে। যে রিভলভারে ডাঃ চক্রবর্তী মারা গেছেন এবং যেটা পাওয়া যাচ্ছে না, সেটা উপযুক্ত কাজে ব্যবহারের পর কুয়োর মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়েছে পুলিশের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্যে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সেই রিভলভার আজও কুয়োর মধ্যে জলের তলায় তলিয়ে রয়েছে।'

মিঃ ঝা আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর সারা শরীর উত্তেজনায় কাঁপছে। চোখমুখ লাল হয়ে উঠেছে—গলার স্বর অসংযত। অধৈর্যের আবেগ তাঁর সারা দেহে: 'যাচ্ছি। এখুনি আমি যাচ্ছি। Good heavens! আমি ইনসপেক্টারকে নিয়েই যাচ্ছি।'

'Will you allow me?' ডাঃ গুপ্ত বললেন।

'অবশ্য আপনি যদি দয়া করে যান?'

'তাহলে চলুন। একটু অ্যাডভেঞ্চার করে আসি।'

মিঃ ঝা প্রণবের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'খুব শীঘ্রি আপনাকে সুখবর জানাতে পারব বলে আশা করি।'

প্রণব মৃদু হাসল শুধু।

আধঘণ্টার মধ্যে মিঃ ঝা তাঁর দলবল নিয়ে দেওঘরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।

রাত হয়ে এসেছিল। বাণীব্রতকে কেবিনে পৌঁছে দিয়ে প্রণব ফিরছিল তার কোয়ার্টারে—সঙ্গে সুদক্ষিণা।

পথে যেতে-যেতে সুদক্ষিণা বললে, 'আমার দুটো কথার উত্তর দেবে?'

'বলো।'

'বাণী ডোরার সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছিল কেন?'

'বাণীব্রতর নামে পুলিশের যে অভিযোগ, সে-সংক্রান্ত সব রিপোর্ট, এনকোয়ারি, চিঠিপত্র, ফাইল ইত্যাদি হাসপাতালে আছে। ডোরা সেগুলো বাণীব্রতকে নিয়ে গিয়ে দেখায়। তাকে বিশ্বাস করতে বাধ্য করে যে ও একজন খুনি। আমরা তাকে হাসপাতালে রেখেছি সারিয়ে তুলে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দেব বলে। কিন্তু ডোরার সঙ্গে যদি বাণী পালিয়ে যায়, ডোরা তাকে বাঁচাবে। বাণী পুলিশের হাত থেকে বাঁচবার আশায় ডোরার কাছে আত্মসমর্পণ করে।'

সুদক্ষিণার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হল। খানিকটা হাঁটার পর আবার ও প্রশ্ন করলে, 'আর একটা কথা। বাণীর সমস্ত কথা হঠাৎ মনে পড়ল কী করে?'

'তাই পড়ে। মানুষের মনের ওই আর একটা বিস্ময়। আমরা মনঃসমীক্ষকরা একে বলি— 'অ্যাসোসিয়েশান'। ওই অন্ধকার রাত্রি, দূরে-দূরে পাহাড়ে আগুন-জ্বলা দৃশ্য, যা দূর থেকে দেখতে ঠিক প্রদীপসজ্জার মতো দেখায়, সেই বন্দুকের শব্দ, কুকুরের ডাক, এ সমস্তই বাণীব্রতর মনে তার সেই ছেলেবেলায় শোচনীয় দুর্ঘটনার দিনটির অবস্থা ও আবহাওয়াকে সৃষ্টি করেছে, ফলে তার মনে পড়ে গেছে বিস্মৃত অতীত।'

'আশ্চর্য।' সুদক্ষিণা তার অগাধ বিস্ময়কে প্রকাশ করবার আর ভাষা খুঁজে পেল না।

প্রণবের অনুমান সত্য বলে প্রমাণিত হল।

দেওঘরে ডাঃ চক্রবর্তীর বাড়ির কুয়ো থেকে উদ্ধার করা হল ডাঃ চক্রবর্তীর কোল্ট রিভলভার। দীর্ঘ আড়াই বছর জলের তলায় পড়ে ছিল আগ্নেয় অস্ত্রটা। রিভলভারের সঙ্গে নীলার সেই ভাঙা চশমাটাও একই জায়গা থেকে পাওয়া গেল।

দেওঘর থেকে নতুন করে প্রমাণ জোগাড় করে মিঃ ঝা গেলেন কলকাতায় নীলার বাড়িতে। ডাঃ চক্রবর্তী মারা যাওয়ার কিছুদিন পরেই নীলা দেওঘরের বাড়িতে তালা লাগিয়ে চলে এসেছিল কলকাতায় বাবার কাছে। সেখানেই থাকত ও।

বিভূতির রিভলভারটা ছিল ওয়াসন (Wesson)। অথচ কোল্ট (Colt) রিভলভারের গুলিতে মারা গেছেন ডাঃ চক্রবর্তী। ডাক্তারের মৃতদেহে প্রাপ্ত বুলেট থেকে এ-সত্য আগেই উদ্ধার করা হয়েছিল। সেই কোল্ট রিভলভারটা আবার পাওয়া যাচ্ছিল না এতদিন। রিভলভার এবং ভাঙা চশমা পাওয়ার পর মিঃ ঝা নীলার বিরুদ্ধে যেসব নিখুঁত এবং অবধারিত প্রমাণ জোগাড় করলেন, তার থেকে রেহাই পাওয়া মুশকিল।

মিঃ ঝার পুলিশি জেরাকে ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা নীলা অবশ্য অনেক করেছিল। কিন্তু কোনও মতেই পাশ কাটাতে পারলে না। অবশেষে সে স্বীকার করলে : বাণীব্রত আমার স্বামীকে রিভলভার হাতে করে শাসাচ্ছিল। আমি তাই দেখে ভীষণ ভয় পেয়েছিলাম। জানি তো লোকটা পাগল। কখন যে কী করে ফেলে কে জানে? তাই আমি ওপরে ছুটে গিয়ে আমাদের রিভলভারটা নিয়ে আসি। আমি যে কী করে গুলি করলাম জানি না, চোখের চশমা ভেঙে যাওয়ায় সবই অস্পষ্ট দেখছিলাম। আমি বাণীব্রতকে মারতে চেয়েছিলাম। আমার দুর্ভাগ্য, লক্ষ্য ভুল হয়ে যায়। আর চশমা? চশমাটা আমি পরে কুয়োর মধ্যে ফেলে দি। পুলিশের লোক ওই একটা ফ্যাকড়া নিয়ে হয়তো আমায় অতিষ্ঠ করে তুলত। আমার স্বামীর মৃত্যুর জন্যে আমি দায়ী এবং এ-জন্যে অনুতপ্ত হওয়া উচিত। কিন্তু ঈশ্বর জানেন, আমার প্রথম অপরাধের জন্যে যতটা অনুতপ্ত হচ্ছি, দ্বিতীয় অপরাধের জন্যে ততটা নয়।'

*

একদিন বৃষ্টি-ছাওয়া বিকেলে যে কাহিনির যবনিকা উঠেছিল—দীর্ঘ দু-বছর পরে তেমনি ঘন বর্ষণমুখর এক সন্ধ্যায় সে কাহিনিরই যবনিকা নেমে এল।

পরেশনাথ স্টেশন। বাণীব্রত আর সুদক্ষিণা কলকাতাগামী ট্রেনের জন্যে প্ল্যাটফর্মে অপেক্ষা করছে। কুন্তলাদি বাণীব্রতর সঙ্গে গল্প করছিলেন। সুদক্ষিণা প্রণবের সঙ্গে পায়চারি করছিল ভিজে প্ল্যাটফর্মের ওপর। আকাশ ভরে মেঘ জমছিল আবার।

গাড়ি এসে থামল। বাণীব্রত আর সুদক্ষিণা অপেক্ষাকৃত একটা ফাঁকা কামরায় নিজেদের জায়গা করে নিলে। প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে প্রণব। বাণীব্রত জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বললে, 'আপনি কলকাতায় এলে দিদিকে নিশ্চয় নিয়ে আসবেন। আপনারা না এলে বাস্তবিক আমি অত্যন্ত দুঃখিত হব প্রণববাবু।'

'কী যে বলেন? যাব—নিশ্চয় যাব। দিদিকে সঙ্গে করেই নিয়ে যাব। কিন্তু আমি মশাই বিয়ের নেমন্তন্ন না পেলে যাচ্ছি না।'

'দেখি।' বাণীব্রত আড়চোখে সুদক্ষিণার দিকে তাকিয়ে হাসল।

গাড়ি ছাড়বার তখনও দেরি ছিল। জানালা দিয়েই মুখ বাড়িয়ে সুদক্ষিণা বলল প্রণবকে, 'আচ্ছা, তুমি তো ডোরার সেই কথাটা কই বললে না? কেন সে বাণীকে নিয়ে পালিয়ে যেতে চেয়েছিল?'

'সেই একই কারণে—যে কারণে তুমি ওকে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছ। ডোরাও তাই চেয়েছিল। ভালোবেসে মানুষ যখন মনের মানুষকে না পায়, তখন হয় সে তাকে না-হয় নিজেকে ধ্বংস করতে চায়। এতেই তার আনন্দ। মনের এ আর এক আশ্চর্য রহস্য।'

'ও!' সুদক্ষিণা একটু চুপ করে থেকে শেষে মৃদু সুরে বললে, 'তুমি নিশ্চয় ডোরার মতো বোকা হবে না?'

'বোধহয় নয়। আর হলেও তুমি জানতে পারবে না।' প্রণবের ঠোঁটের হাসিতে বেদনার আভাস।

গাড়ি ছাড়ল। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে থাকল বাণী আর সুদক্ষিণা। যতক্ষণ দেখা যায় প্রণব আর কুন্তলাদি তাকিয়ে থাকলেন ওদের মুখের দিকে।

কখন এক সময় প্রণব দেখল—চোখের সামনে শুধু মাঠ আর জঙ্গলের দিগন্ত-বিস্তৃত প্রচ্ছদপট। কেউ কোথাও নেই—কানের কাছে ট্রেনের চাকার অতি অস্পষ্ট একটু শব্দ—আর বুকের মধ্যে একরাশ ঠাসা হাওয়া।

'আয়'। কুন্তলাদি ডাকলেন।

'হ্যাঁ—চলো। বৃষ্টি এল দেখছি।' প্রণব মুখ ঘুরিয়ে তার দীর্ঘ নিশ্বাসের শব্দ লুকোতে চাইল।

বাদশাহী আংটি



সত্যজিৎ রায়

শ সে র. উ ২—৩৩

১

বাবা যখন বললেন, 'তোর ধীরুকাকা অনেকদিন থেকে বলছেন—তাই ভাবছি এবার পুজোর ছুটিটা লখ্‌নৌতেই কাটিয়ে আসি'—তখন আমার মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। আমার বিশ্বাস ছিল লখ্‌নৌটা বেশ বাজে জায়গা। অবিশ্যি বাবা বলেছিলেন ওখান থেকে আমরা হরিদ্বার লছমনঝুলাও ঘুরে আসব, আর লছমনঝুলাতে পাহাড়ও আছে—কিন্তু সে আর ক'দিনের জন্য? এর আগে প্রত্যেক ছুটিতে দার্জিলিং না হয় পুরী গিয়েছি। আমার পাহাড়ও ভালো লাগে, আবার সমুদ্রও ভালো লাগে। লখ্‌নৌতে দুটোর একটাও নেই। তাই বাবাকে বললাম, 'ফেলুদা যেতে পারে না আমাদের সঙ্গে?'

ফেলুদা বলে ও কলকাতা ছেড়ে যেখানেই যাক না কেন, ওকে ঘিরে নাকি রহস্যজনক ঘটনা সব গজিয়ে ওঠে। আর সত্যিই, দার্জিলিঙে যেবার ও আমাদের সঙ্গে ছিল, ঠিক সেবারই রাজেনবাবুকে জড়িয়ে সেই অদ্ভুত ঘটনাগুলো ঘটল। তেমন যদি হয় তাহলে জায়গা ভালো না হলেও খুব ক্ষতি নেই।

বাবা বললেন, 'ফেলু তো আসতেই পারে, কিন্তু ও যে নতুন চাকরি নিয়েছে, ছুটি পাবে কি?'

ফেলুদাকে লখ্‌নৌয়ের কথা বলতেই ও বলল, 'ফিফ্‌টি-এইটে গেসলাম—ক্রিকেট খেলতে। জায়গাটা নেহাত ফেলনা নয়। বড়া-ইমামবড়ার ভুলভুলাইয়ার ভেতরে যদি ঢুকিস তো তোর চোখ আর মন একসঙ্গে ধাঁধিয়ে যাবে। নবাব-বাদশাহের কী ইম্যাজিনেশন ছিল—বাপরে বাপ!'

'তুমি ছুটি পাবে তো?'

ফেলুদা আমার কথায় কান না দিয়ে বলল, 'আর শুধু ভুলভুলাইয়া কেন—গুমতী নদীর ওপর মাঙ্কি ব্রিজ দেখবি, সেপাইদের কামানের গোলায় বিধ্বস্ত রেসিডেন্সি দেখবি।'

'রেসিডেন্সি আবার কী?'

'সেপাই বিদ্রোহের সময় গোরা সৈনিকদের ঘাঁটি ছিল ওটা। কিস্যু করতে পারেনি। ঘেরাও করে গোলা দেগে ঝাঁঝরা করে দিয়েছিল সেপাইরা।'

দু-বছর হল চাকরি নিয়েছে ফেলুদা, কিন্তু প্রথম বছর কোনও ছুটি নেয়নি বলে পনেরো দিনের ছুটি পেতে ওর কোনও অসুবিধে হল না।

এখানে বলে রাখি—ফেলুদা আমার মাসতুতো দাদা। আমার বয়স চোদ্দো, আর ওর সাতাশ। ওকে কেউ-কেউ বলে আধপাগলা, কেউ-কেউ বলে খামখেয়ালি, আবার কেউ-কেউ বলে কুঁড়ে। আমি কিন্তু জানি ওই বয়সে ফেলুদার মতো বুদ্ধি খুব কম লোকের হয়। আর ওর মনের মতো কাজ পেলে ওর মতো খাটতে খুব কম লোকে পারে। তাছাড়া ও ভালো ক্রিকেট জানে, প্রায় একশো রকম ইনডোর গেম বা ঘরে বসে খেলা জানে, তাসের ম্যাজিক জানে, একটু-একটু হিপনটিজম জানে, ডান-হাত আর বাঁ-হাত দু-হাতেই লিখতে জানে। আর ও যখন স্কুলে পড়ত তখনই ওর মেমারি এত ভালো ছিল যে ও দুবার রিডিং পড়েই পুরো 'দেবতার গ্রাস' মুখস্থ করেছিল।

কিন্তু ফেলুদার যেটা সবচেয়ে আশ্চর্য ক্ষমতা, সেটা হল—ও বিলিতি বই পড়ে আর নিজের বুদ্ধিতে দারুণ ডিটেকটিভের কাজ শিখে নিয়েছে। তার মানে অবিশ্যি এই নয় যে চোর ডাকাত খুনি এইসব ধরার জন্য পুলিশ ফেলুদাকে ডাকে। ও হল যাকে বলে শখের ডিটেকটিভ।

সেটা বোঝা যায় যখন একজন অচেনা লোককে একবার দেখেই ফেলুদা তার সম্বন্ধে অনেক কিছু বলে দিতে পারে।

যেমন লখ্‌নৌ স্টেশনে ট্রেন থেকে নেমে ধীরুকাকাকে দেখেই ও আমায় ফিসফিস করে বলল, 'তোর কাকার বুঝি বাগানের শখ?'

আমি যদিও জানতাম ধীরুকাকার বাগানের কথা, ফেলুদার কিন্তু মোটেই জানার কথা নয়, কারণ, যদিও ফেলুদা আমার মাসতুতো ভাই, ধীরুকাকা কিন্তু আমার আসল কাকা নন, বাবার ছেলেবেলার বন্ধু।

তাই আমি অবাক হয়ে জিগ্যেস করলাম, 'তুমি কী করে জানলে?'

ফেলুদা আবার ফিসফিস করে বলল, 'উনি পিছন ফিরলে দেখবি ওঁর ডানপায়ের জুতোর গোড়ালির পাশ দিয়ে একটা গোলাপ পাতার ডগা বেরিয়ে আছে। আর ডানহাতের তর্জনীটায় দেখ টিনচার আয়োডিন লাগানো। সকালে বাগানে গিয়ে গোলাপ ফুল ঘাঁটার ফল।'

স্টেশন থেকে বাড়ি আসার পথে বুঝলাম লখ্নৌ শহরটা আসলে খুব সুন্দর। গম্বুজ আর মিনারওয়ালা বাড়ি দেখা যাচ্ছে চারদিকে, রাস্তাগুলো চওড়া আর পরিষ্কার, আর তাতে মোটরগাড়ি ছাড়াও দুটো নতুন রকমের ঘোড়ার গাড়ি চলতে দেখলাম। তার একটার নাম টাঙ্গা আর অন্যটা এক্কা। 'এক্কা গাড়ি খুব ছুটেছে'—এই জিনিসটা নিজের চোখে এই প্রথম দেখলাম। ধীরুকাকার পুরোনো সেভ্রোলে গাড়ি না থাকলে আমাদের হয়তো ওরই একটাতে চড়তে হত।

যেতে-যেতে ধীরুকাকা বললেন, 'এখানে না এলে কি বুঝতে পারতে শহরটা এত সুন্দর? আর কলকাতার মতো আবর্জনা কি দেখতে পাচ্ছ রাস্তাঘাটে? আর কত গাছ দেখো, আর কত ফুলের বাগান।'

বাবা আর ধীরুকাকা পিছনে বসেছিলেন, ফেলুদা আর আমি সামনে। আমার পাশেই বসে গাড়ি চালাচ্ছে ধীরুকাকার ড্রাইভার দীনদয়াল সিং। ফেলুদা আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলল, 'ভুলভুলাইয়ার কথাটা জিগ্যেস কর।'

ফেলুদা কিছু করতে বললে সেটা না করে পারি না। তাই বললাম, 'আচ্ছা ধীরুকাকা, ভুলভুলাইয়া কী জিনিস?'

ধীরুকাকা বললেন, 'দেখবে-দেখবে—সব দেখবে। ভুলভুলাইয়া হল ইমামবড়ার ভেতরে একটা গোলকধাঁধা। আমরা বাঙালিরা অবিশ্যি বলি ঘুলঘুলিয়া, কিন্তু আসল নাম ওই ভুলভুলাইয়া। নবাবরা তাঁদের বেগমদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলতেন ওই গোলকধাঁধায়।'

এবার ফেলুদা নিজেই বলল, 'ওর ভেতরে গাইড ছাড়া ঢুকলে নাকি আর বেরোনো যায় না?'

'তাই তো শুনিচি। একবার এক গোরাপল্টন—অনেকদিন আগে—মদটদ খেয়ে বাজি ধরে নাকি ঢুকেছিল ওর ভেতরে। বলেছিল কেউ যেন ধাওয়া না করে—ও নিজেই বেরিয়ে আসবে। দু-দিন পরে ওর মৃতদেহ পাওয়া যায় ওই গোলকধাঁধার এক গলিতে।'

আমার বুকের ভেতরটা এর মধ্যেই টিপটিপ করতে শুরু করেছে।

ফেলুদাকে জিগ্যেস করলাম, 'তুমি কি একা গিয়েছিলে, না গাইড নিয়ে?'

'গাইড নিয়ে। তবে একাও যাওয়া যায়।'

'সত্যি?'

আমি তো অবাক। তবে ফেলুদার পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়।

'কী করে একা যাওয়া যায় ফেলুদা?'

ফেলুদা চোখটা ঢুলুঢুলু করে ঘাড়টা দু-বার নাড়িয়ে চুপ করে গেল। বুঝলাম ও আর কথা বলবে না। এখন ও শহরের পথঘাট, বাড়িঘর, লোকজন, এক্কা, টাঙ্গা সব খুব মন দিয়ে লক্ষ করছে।

ধীরুকাকা কুড়ি বছর আগে লখ্নৌতে প্রথম আসেন উকিল হয়ে। সেই থেকে এখানেই আছেন, এবং এখন নাকি ওঁর বেশ নামডাক। কাকিমা তিনবছর হল মারা গেছেন, আর ধীরুকাকার ছেলে জার্মানির ফ্র্যাঙ্কফার্ট শহরে চাকরি নিয়ে চলে গেছেন। ওঁর বাড়িতে এখন উনি থাকেন, ওঁর বেয়ারা

জগমোহন থাকে, আর রান্না করার বাবুর্চি আর একটা মালি। ওঁর বাড়িটা যেখানে সে জায়গাটার নাম সেকেন্দার বাগ, স্টেশন থেকে প্রায় সাড়ে তিন মাইল দূরে। বাড়ির সামনে গেটের ওপর লেখা—'ডি. কে. সান্যাল, এম. এ., বি. এল. বি., অ্যাডভোকেট'। গেট দিয়ে ঢুকে খানিকটা নুড়ি পাথর ঢালা রাস্তার পর একতলা বাড়ি, আর রাস্তার দু-দিকে বাগান। আমরা যখন পৌঁছলাম তখন মালি 'লন মোয়ার' দিয়ে বাগানের ঘাস কাটছে।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর বাবা বললেন, 'ট্রেন জার্নি করে এসেছ, আজ আর বেরিও না। কাল থেকে শহর দেখা শুরু করা যাবে।' তাই সারা দুপুর বাড়িতে বসে ফেলুদার কাছে তাসের ম্যাজিক শিখেছি। ফেলুদা বলে—'ইন্ডিয়ানদের আঙুল ইউরোপিয়ানদের চেয়ে অনেক বেশি ফ্লেক্সিবল। তাই হাতসাফাইয়ের খেলাগুলো আমাদের পক্ষে রপ্ত করা অনেক সহজ।'

বিকেলে যখন ধীরুকাকার বাগানে ইউক্যালিপটাস গাছটার পাশে বেতের চেয়ারে বসে চা খাচ্ছি, তখন গেটের বাইরে একটা গাড়ি থামার আওয়াজ পেলাম। ফেলুদা না দেখেই বলল 'ফিয়াট'। তারপর রাস্তার পাথরের ওপর দিয়ে খচমচ-খচমচ করতে-করতে ছাই রঙের সুট পরা একজন ভদ্রলোক এলেন। চোখে চশমা, রং ফরসা আর মাথার চুলগুলো বেশিরভাগই সাদা। কিন্তু তাও দেখে বোঝা যায় যে বয়স বাবাদের চেয়ে খুব বেশি নয়।

ধীরুকাকা হেসে নমস্কার করে উঠে দাঁড়িয়ে প্রথমে বললেন, 'জগমোহন, আউর এক কুরসি লাও,' তারপর বাবার দিকে ফিরে বললেন, 'আলাপ করিয়ে দিই—ইনি ডক্টর শ্রীবাস্তব, আমার বিশিষ্ট বন্ধু।'

আমি আর ফেলুদা দুজনেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছিলাম। ফেলুদা ফিসফিস করে বলল, 'নার্ভাস হয়ে আছে। তোর বাবাকে নমস্কার করতে ভুলে গেল।'

ধীরুকাকা বললেন, 'শ্রীবাস্তব হচ্ছেন অস্টিওপ্যাথ, আর একেবারে খাস লখ্নৌইয়া।'

ফেলুদা চাপা গলায় বলল, 'অস্টিওপ্যাথ মানে বুঝলি?'

আমি বললাম, 'না।'

'হাড়ের ব্যারামের ডাক্তার। অস্টিও আর অস্থি—মিলটা লক্ষ করিস। অস্থি মানে হাড় সেটা জানিস তো?'

'তা জানি।'

আরেকটা বেতের চেয়ার এসে পড়াতে আমরা সকলেই বসে পড়লাম। ডক্টর শ্রীবাস্তব হঠাৎ ভুল করে বাবার চায়ের পেয়ালাটা তুলে আরেকটু হলেই চুমুক দিয়ে ফেলতেন, এমনসময় বাবা একটু খুক-খুক করে কাশাতে 'আই অ্যাম সো সরি' বলে রেখে দিলেন।

ধীরুকাকা বললেন, 'আজ যেন তোমায় একটু ইয়ে বলে মনে হচ্ছে। কোনও কঠিন কেসটেস দেখে এলে নাকি?'

বাবা বললেন, 'ধীরু, তুমি বাংলায় বলছ—উনি বাংলা বোঝেন বুঝি?'

ধীরুকাকা হেসে বললেন, 'ওরে বাবা, বোঝেন বলে বোঝেন। তোমার বাংলা আবৃত্তি একটু শুনিয়ে দাও না।'

শ্রীবাস্তব যেন একটু অপ্রস্তুত হয়েই বললেন, 'আমি বাংলা মোটামুটি জানি। ট্যাগোরও পড়েছি কিছু-কিছু।'

'বটে?'

'ইয়েস। গ্রেট পোয়েট।'

আমি মনে-মনে ভাবছি। এই বুঝি কবিতার আলোচনা শুরু হয়, এমনসময় কাঁপা হাতে তাঁরই জন্যে ঢালা চায়ের পেয়ালাটা তুলে নিয়ে শ্রীবাস্তব বললেন, 'কাল রাতে আমার বাড়িতে ডাকু আসিয়াছিল।'

ডাকু? ডাকু আবার কে? আমাদের ক্লাসে দক্ষিণা বলে একটা ছেলে আছে যার ডাকনাম ডাকু।

কিন্তু ধীরুকাকার কথাতেই ডাকু ব্যাপারটা বুঝে নিলাম।

'সেকী—ডাকাত তো মধ্যপ্রদেশেই আছে বলে জানতাম। লখ্‌নৌ শহরে আবার ডাকাত এল কোত্থেকে?'

'ডাকু বলুন, কি চোর বলুন। আমার অঙ্গুরির কথা তো আপনি জানেন মিস্টার সানিয়াল?'

'সেই পিয়ারিলালের দেওয়া আংটি? সেটা কি চুরি গেল নাকি?'

'না, না। লেকিন আমার বিশ্বাস কি, ওই আংটি নিতেই চোর আসিল।'

বাবা বললেন, 'কী আংটি?'

শ্রীবাস্তব ধীরুকাকাকে বললেন, 'আপনি বোলেন। উর্দুভাষা এঁরা বুঝবেন না আর অত কথা আমার বাংলায় হোবে না।'

ধীরুকাকা বললেন, 'পিয়ারিলাল শেঠ ছিলেন লখ্‌নৌ-এর নামকরা ধনী ব্যবসায়ী। জাতে গুজরাটি। এককালে কলকাতায় ছিলেন। তাই বাংলাও অল্প-অল্প জানতেন। ওর ছেলে মহাবীরের যখন বারো কি তেরো বছর বয়স, তখন তার একটি কঠিন হাড়ের ব্যারাম হয়। শ্রীবাস্তব তাকে ভালো করে দেন। পিয়ালিলালের স্ত্রী নেই, দুই ছেলের বড়টি টাইফয়েডে মারা যায়। তাই বুঝতেই পারছ, সবেধন নীলমণিটিকে মৃত্যুর দরজা থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য শ্রীবাস্তবের ওপর পিয়ারিলালের মনে একটা গভীর কৃতজ্ঞতাবোধ ছিল। তাই মারা যাওয়ার আগে তিনি তাঁর একটা বহুমূল্য আংটি শ্রীবাস্তবকে দিয়ে যান।'

বাবা বললেন, 'কবে মারা গেছেন ভদ্রলোক?'

শ্রীবাস্তব বললেন, 'লাস্ট জুলাই। তিনমাস হল। মে মাসে ফার্স্ট হার্ট অ্যাট্যাক হল। তাতেই প্রায় চলে গিয়েছিলেন। সেই টাইমে আংটি দিয়েছিলেন আমায়। দেবার পরে ভালো হয়ে উঠলেন। তারপর জুলাই মাসে সেকেন্ড অ্যাট্যাক হল। তখনও আমি দেখা করতে গিয়েছিলাম। তিন দিনে চলে গেলেন।...এই দেখুন—'

শ্রীবাস্তব তাঁর কোটের পকেট থেকে একটা দেশলাই-এর বাক্সর চেয়ে একটু বড় নীল রঙের ভেলভেটের কৌটো বের করে ঢাকনাটা খুলতেই তার ভেতরটায় রোদ পড়ে রামধনুর সাতটা রঙের একটা চোখ ঝলসানো ঝিলিক খেলে গেল।

তারপর শ্রীবাস্তব এদিক-ওদিক দেখে সামনে ঝুঁকে পড়ে খুব সাবধানে ডানহাতের বুড়ো আঙুল আর তার পাশের আঙুল দিয়ে আলতো করে ধরে আংটিটা বের করলেন।

দেখলাম আংটিটার ওপরে ঠিক মাঝখানে একটা প্রায় চার আনির সাইজের ঝলমলে পাথর—নিশ্চয়ই হিরে—আর তাকে ঘিরে লাল নীল সবুজ সব আরও অনেকগুলো ছোট-ছোট পাথর।

এত অদ্ভুত সুন্দর আংটি আমি কোনওদিন দেখিনি।

ফেলুদার দিকে আড়চোখে চেয়ে দেখি সে একটা শুকনো ইউক্যালিপটাসের পাতা নিয়ে কানের মধ্যে ঢুকিয়ে সেটাকে পাকাচ্ছে, যদিও তার চোখটা রয়েছে আংটির দিকে।

বাবা বললেন, 'দেখে তো মনে হয় জিনিসটা পুরোনো। এর কোনও ইতিহাস আছে নাকি?'

শ্রীবাস্তব একটু হেসে আংটিটা বাক্সে পুরে বাক্সটা পকেটে রেখে চায়ের পেয়ালাটা আবার হাতে তুলে নিয়ে বললেন, 'তা একটু আছে। এর বয়স তিনশো বছরের বেশি। এ আংটি ছিল আওরঙ্গজেবের।'

বাবা চোখ কপালে তুলে বললেন, 'বলেন কী! আমাদের আওরঙ্গজেব বাদশা? শাজাহানের ছেলে আওরঙ্গজেব?'

শ্রীবাস্তব বললেন, 'হাঁ—তবে আওরঙ্গজেব তখনও বাদশা বনেননি। গদিতে শাজাহান।

সমরকন্দ দখল করবেন বলে ফৌজ পাঠাচ্ছেন বারবার—আর বারবার ডিফিট হচ্ছে। একবার আওরঙ্গজেবের আন্ডারে ফৌজ গেল। আওরঙ্গজেব মার খেলেন খুব। হয়তো মরেই যেতেন। এক সেনাপতি সেভ করল। আওরঙ্গজেব নিজের হাত থেকে আংটি খুলিয়ে তাকে দিলেন।'

'বাবা! এ যে একেবারে গল্পের মতো!'

'হাঁ। আর পিয়ারিলাল ওই আংটি কিনলেন ওই সেনাপতির এক বংশধরের কাছ থেকে আগ্রাতে। দাম কত ছিল তা পিয়ারিলাল বলেননি। তবে—দ্যাট বিগ স্টোন ইজ ডায়মন্ড, আমি যাচাই করিয়ে নিয়েছি। বুঝতেই পারছেন কত দাম হোবে।'

ধীরুকাকা বললেন, 'কমপক্ষে লাখ দুয়েক। আওরঙ্গজেব না হয়ে যদি জাহান্নন খাঁ হত, তাহলেও লাখ দেড়েক হত নিশ্চয়ই।'

শ্রীবাস্তব বললেন, 'তাই তো বলছি—কালকের ঘটনার পর খুব আপসেট হয়েছি। আমি একেলা মানুষ, রোগী দেখতে হামেশাই বাইরে যাচ্ছি। আজ যদি পুলিশকে বলি, কাল আমি বাইরে গেলে রাস্তায় কেউ যদি ইট পাটকেল ছুঁড়িয়ে মারে? একবার ভেবেছিলাম কি কোনও ব্যাঙ্কে রেখিয়ে দিই। তারপর ভাবলাম—এত সুন্দর জিনিস বন্ধুবান্ধুবকে দেখিয়েও আনন্দ। ওই জন্যেই তো রেখে দিলাম নিজের কাছে।'

ধীরুকাকা বললেন, 'অনেককে দেখিয়েছেন ও আংটি?'

'মাত্র তিনমাস হল তো পেলাম। আর আমার বাড়িতে খুব বেশি কেউ তো আসে না। যাঁরা এলেন—বন্ধুলোক, ভদ্রলোক, তাঁদেরই দেখিয়েছি।'

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। ইউক্যালিপটাসের মাথায় একটু রোদ লেগে আছে, তাও বেশিক্ষণ থাকবে না। শ্রীবাস্তবকে দেখছিলাম কিছুতেই স্থির হয়ে বসে থাকতে পারছিলেন না।

ধীরুকাকা বললেন, 'চলুন ভেতরে গিয়ে বসা যাক। ব্যাপারটা নিয়ে একটু ভাবা দরকার।'

আমরা সবাই বাগান ছেড়ে গিয়ে বৈঠকখানায় বসলাম। ফেলুদাকে দেখে মনেই হচ্ছিল না যে ওর এই আংটির ব্যাপারটা একটুও ইন্টারেস্টিং লাগছে। ও সোফাতে বসেই পকেট থেকে তাসের প্যাকেট বের করে হাতসাফাই প্র্যাকটিস করতে লাগল।

বাবা এমনিতে বেশি কথা বলেন না, কিন্তু যখন বলেন তখন বেশ ভেবেচিন্তে ঠান্ডা মাথায় বলেন। বাবা বললেন, 'আচ্ছা, আপনি কেন ভাবছেন যে আপনার ওই আংটিটা নিতেই ওরা এসেছিল? আপনার অন্য কোনও জিনিস চুরি যায়নি? এমনও তো হতে পারে যে ওরা সাধারণ চোর, টাকাকড়ি নিতেই এসেছিল?'

শ্রীবাস্তব বললেন, 'ব্যাপার কী বলি। বনবিহারীবাবু আছেন বলে এমনিতেই আমাদের পাড়ায় চোর-টোর আসে না। আর আমার পাশের বাড়িতে থাকেন মিস্টার ঝুনঝুনওয়ালা, আর তার পাশের বাড়িতে থাকেন মিস্টার বিলিমোরিয়া—বোথ ভেরি রিচ। আর সেটা তাদের বাড়ি দেখলেই বোঝা যায়। তাদের কাছে আমি কী? তাদের বাড়ি ছেড়ে আমার বাড়ি আসবে কেন চোর?'

ধীরুকাকা বললেন, 'তারা যেমন ধনী, তেমনি তাদের পাহারার বন্দোবস্তও নিশ্চয়ই খুব জমকালো। সুতরাং চোর সে বাড়িতে যাবে কেন? তারা তো বিরাট ধনদৌলতের আশায় যাবে না। শ'পাঁচেক টাকা মারতে পারলে তাদের ছ'মাসের খোরাক হয়ে যায়। কাজেই আমার-আপনার বাড়িতে চোর আসার ব্যাপারে অবাক হওয়ার কিছু নেই।'

শ্রীবাস্তব তবু যেন ভরসা পাচ্ছিলেন না। উনি বললেন, 'আমি জানি না মিস্টার সানিয়াল—আমার কেন জানি মনে হচ্ছে চোর ওই আংটি নিতেই এসেছিল। আমার পাশের ঘরের একটা আলমারি খুলেছিল। দেরাজ খুলেছিল। তাতে অন্য জিনিস ছিল। নিতে পারত। টাইম ছিল। আমার ঘুম ভাঙতে চোর পালিয়ে গেল, একেবারে কিচ্ছু না নিয়ে। আর, কথা কী জানেন?—'

শ্রীবাস্তব হঠাৎ থামলেন। তারপর ভ্রূকুটি করে কিছুক্ষণ ভেবে বললেন, 'পিয়ারিলাল যখন

আমাকে আংটি দিয়েছিলেন, তখন মনে হল কি—উনি আংটি নিজের বাড়িতে রাখতে চাইলেন না। তাই আমাকে দিয়ে দিলেন। আউর—'

শ্রীবাস্তব আবার থেমে ভ্রূকুটি করলেন।

ধীরুকাকা বললেন—'আউর কেয়া, ডক্টরজি?'

শ্রীবাস্তব একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'দ্বিতীয়বার যখন হার্ট অ্যাটাক হল, আর আমি ওঁকে দেখতে গেলাম, তখন উনি একটা কিছু আমাকে বলতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু পারলেন না। তবে একটা কথা আমি শুনতে পেয়েছিলাম।'

'কী কথা?'

'দু-বার বলেছিলেন—"এ স্পাই..." "এ স্পাই..."।'

ধীরুকাকা সোফা ছেড়ে উঠে পড়লেন।

'না ডক্টরজি—পিয়ারিলাল যাই বলে থাকুক—আমার দৃঢ় বিশ্বাস ও চোর সাধারণ চোর, ছ্যাঁচড় চোর। আপনি বোধহয় জানেন না, ব্যারিস্টার ভূদেব মিত্তিরের বাড়িতেও রিসেন্টলি চুরি হয়ে গেছে। একটা আস্ত রেডিও আর কিছু রুপোর বাসন-কোসন নিয়ে গেছে। তবে আপনার যদি সত্যিই নার্ভাস লাগে, তাহলে আপনি ও আংটি স্বচ্ছন্দে আমার জিম্মায় রেখে যেতে পারেন। আমার গোদরেজের আলমারিতে থাকবে ওটা, তারপর আপনার ভয় কেটে গেলে পর আপনি ওটা ফেরত নিয়ে যাবেন।'

শ্রীবাস্তব হঠাৎ হাঁপ ছেড়ে একগাল হেসে ফেললেন।

'আমি ওই প্রস্তাব করতেই এলাম, লেকিন নিজে থেকে বলতে পারছিলাম না। থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ, মিস্টার সানিয়াল। আপনার কাছে আংটি থাকলে আমি নিশ্চিন্ত থাকব।'

শ্রীবাস্তব তাঁর পকেট থেকে আংটি বের করে ধীরুকাকাকে দিলেন, আর ধীরুকাকা সেটা নিয়ে শোওয়ার ঘরে চলে গেলেন।

এইবার ফেলুদা হঠাৎ একটা প্রশ্ন করে বসল।

'বনবিহারীবাবু কে?'

'পার্ডন?' শ্রীবাস্তব বোধহয় একটু অন্যমনস্ক ছিলেন।

ফেলুদা বলল, 'আপনি বললেন না যে, বনবিহারীবাবু পাড়ায় আছেন বলে চোর-টোর আসে না—এই বনবিহারীবাবুটি কে? পুলিশ-টুলিশ নাকি?'

শ্রীবাস্তব হেসে বললেন, 'ও নো নো। পুলিশ না। তবে পুলিশের বাড়া। ইন্টারেস্টিং লোক। আগে বাংলাদেশে জমিদারি ছিল। তারপর সেটা গেল—আর উনি একটা ব্যবসা শুরু করলেন। বিদেশে জানোয়ার চালান দেওয়ার ব্যবসা।'

'জানোয়ার?' বাবা আর ফেলুদা একসঙ্গে প্রশ্ন করল।

'হাঁ। টেলিভিশন, সার্কাস, চিড়িয়াখানা—এইসবের জন্য এদেশ থেকে অনেক জানোয়ার চালান যায় ইউরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, এইসব জায়গায়। অনেক ইন্ডিয়ান এই ব্যবসা করে। বনবিহারীবাবু ওতে অনেক টাকা করেছিলেন। তারপর রিটায়ার করে এখানে চলে এলেন আজ দু-তিন বছর। আর আসার সময় সঙ্গে কিছু জানোয়ার ভি নিয়ে এসে একটা বাড়ি কিনে সেখানে একটা ছোটখাটো চিড়িয়াখানা বানিয়ে নিলেন।'

বাবা বললেন, 'বলেন কি—ভারি অদ্ভুত তো।'

'হাঁ। আর ওই চিড়িয়াখানার স্পেশালিটি হল কি, ওর প্রত্যেক জানোয়ার হল ভারি...ভারি...কী বলে—'

'হিংস্র?'

'হাঁ, হাঁ—হিংস্র।'

লখ্‌নৌতে এমনিতেই যে চিড়িয়াখানাটা আছে সেটা শুনেছি খুব ভালো। ওখানে বাঘ সিংহ নাকি খাঁচায় থাকে না। জাল দিয়ে ঘেরা দ্বীপের মতন তৈরি করা আছে, তার মধ্যে মানুষের তৈরি পাহাড় আর গুহার মধ্যে থাকে ওরা। তার ওপর আবার এই প্রাইভেট চিড়িয়াখানা!

শ্রীবাস্তব বললেন, 'ওয়াইল্ড ক্যাট আছে ওঁর কাছে। হাইনা আছে, কুমির আছে, স্করপিয়ন আছে। আওয়াজ শুনা যায়। চোর আসবে কী করিয়ে?'

এর পরে আমি যেটা জিগ্যেস করতে যাচ্ছিলাম, ফেলুদা আমার আগেই সেটা জিগ্যেস করে ফেলল।

'চিড়িয়াখানাটা একবার দেখা যায় না?'

ধীরুকাকা ঠিক এই সময় ঘরে ফিরে এসে বললেন, 'সে তো খুব সহজ ব্যাপার। যে-কোনও দিন গেলেই হল। উনি মানুষটি মোটেই হিংস্র নন।'

শ্রীবাস্তব উঠে পড়লেন। বললেন, 'লাটুশ রোডে আমার এক পেশেন্ট আছে। আমি চলি।'

আমরা সবাই শ্রীবাস্তবের সঙ্গে গেটের বাইরে অবধি গেলাম। ভদ্রলোক সকলকে গুড নাইট করে ধীরুকাকাকে আবার ধন্যবাদ জানিয়ে ওঁর ফিয়াট গাড়িতে উঠে চলে গেলেন। বাবা আর ধীরুকাকা বাড়ির দিকে রওনা দিলেন। ফেলুদা সবে একটা সিগারেট ধরাতে যাচ্ছে, এমনসময় হুশ করে একটা কালো গাড়ি আমাদের সামনে দিয়ে শ্রীবাস্তবের গাড়ির দিকে চলে গেল।

ফেলুদা বলল, 'স্ট্যান্ডার্ড হেরাল্ড। নম্বরটা মিস করে গেলাম।'

আমি বললাম, 'নম্বর দিয়ে কী হবে?'

'মনে হল শ্রীবাস্তবকে ফলো করছে। রাস্তায় ওদিকটা কেমন অন্ধকার দেখছিস? ওইখানে গাড়িটা ওয়েট করছিল। আমাদের গেটের সামনে গিয়ার চেঞ্জ করল দেখলি না?'

এই বলে ফেলুদা রাস্তা থেকে বাড়ির দিকে ঘুরল।

বাড়ির গেট থেকে প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে। আমার আন্দাজ আছে, কেননা আমি স্কুলে অনেকবার হান্ড্রেড ইয়ার্ডস দৌড়েছি। ধীরুকাকার বৈঠকখানায় বাতি জ্বলছে। জানলা দিয়ে ভেতরের দরজাটাও দেখা যাচ্ছে। বাবা আর ধীরুকাকাকে দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকতে দেখলাম। ফেলুদা দেখি হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে সেই জানালার দিকে দেখছে। ওর চোখে ভ্রূকুটি আর দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ানোর ভাবটা দেখে বুঝলাম ও চিন্তিত।

'জানিস তোপ্‌সে—'

আমার ডাকনাম কিন্তু আসলে ওটা নয়। ফেলুদা তপেশ থেকে তোপ্‌সে করে নিয়েছে।

আমি বললাম, 'কী?'

'আমি থাকতে এ ভুলটা হওয়ার কোনও মানে হয় না।'

'কী ভুল?'

'ওই জানালাটা বন্ধ করে দেওয়া উচিত ছিল। গেট থেকে জানালা দিয়ে ঘরের ভেতরটা পরিষ্কার দেখা যায়। ইলেকট্রিক লাইট হলে তা ও বা কথা ছিল, কিন্তু তোর কাকা আবার লাগিয়েছেন ফ্লুয়োরেসেন্ট।'

'তাতে কী হয়েছে?'

'তোর বাবাকে দেখতে পাচ্ছিস?'

'শুধু মাথাটা। উনি যে চেয়ারে বসে আছেন।'

'ওই চেয়ারে দশ মিনিট আগে কে বসেছিল?'

'ডক্টর শ্রীবাস্তব।'

'আংটির কৌটোটা তোর বাবাকে দেওয়ার সময় উনি উঠে দাঁড়িয়েছিলেন মনে পড়ে?'

'এর মধ্যেই ভুলে যাব?'

'সেই সময় এই গেটের কাছে কেউ থেকে থাকলে তার পক্ষে ঘটনাটা দেখে ফেলা অসম্ভব নয়।'

'এই রে! কিন্তু কেউ যে ছিল সেটা তুমি ভাবছ কেন?'

ফেলুদা নিচু হয়ে নুড়ি পাথরের ওপর থেকে একটা ছোট্ট জিনিস তুলে আমাব দিকে এগিয়ে দিল। হাতে নিয়ে দেখলাম সেটা একটা সিগারেটের টুকরো।

'মুখটা ভালো করে লক্ষ কর।'

আমি সিগারেটটা চোখের খুব কাছে নিয়ে এলাম, আর রাস্তার ল্যাম্পের অল্প আলোতেই যা দেখবার সেটা দেখে নিলাম।

ফেলুদা হাত বাড়িয়েই সিগারেটটা ফেরত নিয়ে নিল।

'কী দেখলি?'

'চাবমিনার। আর যে লোকটা খাচ্ছিল, তার মুখে পান ছিল, তাই পানের দাগ লেগে আছে।'

'ভেরি গুড। চ' ভেতবে চ'।'

রাত্রে শোওয়ার আগে ফেলুদা ধীরুকাকার কাছ থেকে আংটিটা চেয়ে নিয়ে সেটা আরেকবার ভালো করে দেখে নিল। ওর যে পাথব সম্বন্ধে এত জ্ঞান ছিল সেটা আমি জানতাম না। ল্যাম্পের আলোতে আংটিটা ধরে সেটাকে ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে বলতে লাগল—

'এই যে নীল পাথরগুলো দেখছিস, এগুলোকে বলে স্যাফায়ার, যার বাংলা নাম নীলকান্ত মণি। লালগুলো হচ্ছে চুনি অর্থাৎ রুবি, আর সবুজগুলো পান্না—এমারেল্ড। অন্যগুলো যতদূর মনে হচ্ছে পোখরাজ —যার ইংরেজি নাম টোপ্যাজ। তবে আসল দেখবার জিনিস হল মাঝখানের ওই হিরেটা। এমন হিরে হাতে ধরে দেখাব সৌভাগ্য সকলের হয় না।'

তারপর ফেলুদা আংটিটা বাঁ-হাতেব কড়ে আঙুলের পাশের আঙুলে পরে বলল, 'আওরঙ্গজেবের আঙুল আর আমার আঙুলের সাইজ মিলে যাচ্ছে, দেখেছিস।'

সত্যিই দেখি ফেলুদার আঙুলে আংটিটা ঠিক ফিট করে গেছে।

ল্যাম্পের আলোতে ঝলমলে পাথরগুলির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে ফেলুদা বলল, 'কত ইতিহাস জড়িয়ে আছে এ আংটির সঙ্গে কে জানে। তবে কী জানিস তোপ্‌সে—এর অতীতে আমার কোন ইন্টারেস্ট নেই। এটা আওরঙ্গজেবেব ছিল কি আলতামসের ছিল কি আক্রম খাঁর ছিল, সেটা আনিম্পরট্যান্ট। আমাদেব জানতে হবে এর ভবিষ্যৎটা কী, আর বর্তমানে কোনও বাবাজি সত্যি করেই এর পিছনে লেগেছেন কি না, আব যদি লেগে থাকেন তবে তিনি কে এবং তাঁব কেন এই দুঃসাহস।'

তারপর ফেলুদা আংটি হাত থেকে খুলে নিয়ে আমার হাতে দিযে বলল, 'যা, ফেরত দিয়ে আয়। আর এসে জানালাগুলো খুলে দে।'

২

পরদিন দুপুরে একটু তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে আমরা ইমামবড়া দেখতে বেরিয়ে পড়লাম। বাবা আর ধীরুকাকা মোটরে গেলেন। গাড়িতে যদিও জায়গা ছিল, তবু ফেলুদা আর আমি দুজনেই বললাম যে আমরা টাঙ্গায় যাব।

সে দারুণ মজা। কলকাতায় থেকে তো ঘোড়াব গাড়ি চড়াই হয় না। সত্যি বলতে কি, আমি কোনওদিনই কোনওরকম ঘোড়ার গাড়ি চড়িনি। ফেলুদা অবিশ্যি চড়েছে। ও বলল কলকাতার



ঠিকা গাড়িব চেযে টাঙ্গায় নাকি অনেক বেশি ঝাঁকুনি হয, আব সেটা নাকি হজমেব পক্ষে খুব ভালো।

'তোব কাকাব বাবুর্চি যা ফার্স্ট ক্লাস বাঁধে, বুঝছি এখানে খাওযাব ব্যাপাবে হিসেব বাখাটা খুব মুশকিল হবে। কাজেই মাঝে মাঝে এই টাঙ্গা বাইডটাব এমনিতেই দবকাব হবে।'

নতুন শহবেব বাস্তাঘাট দেখতে-দেখতে আব টাঙ্গাব ঝাঁকুনি খেতে-খেতে যে জাযগাটায পৌঁছলাম, গাড়োযানকে জিগ্যেস কবাতে ও বলল সেটাব নাম কাইজাব-বাগ। ফেলুদা বলল, 'জার্মান আব উর্দুতে কেমন মিলিয়েছে দেখছিস?'

নবাবি আমলের যত প্রাসাদ-টাসাদ সব নাকি এই কাইজার-বাগের আশেপাশেই রয়েছে। গাড়োয়ান এদিকে-ওদিকে আঙুল দেখিয়ে সব নাম বলে দিতে লাগল।

'উয়ো দেখিয়ে বাদশা মনজিল...উয়ো হ্যায় চাঁদিওয়ালি বরাদরি...উসকো বোলতা লাখুফটক...'

কিছুদুর গিয়ে দেখি রাস্তাটা গেছে একটা বিরাট গেটের মধ্যে দিয়ে। গাড়োয়ান বলল, 'রুমি দরওয়াজা।'

রুমি দরওয়াজা পেরিয়েই 'মচ্ছি ভওয়ন' আর মচ্ছি ভওয়নেই হল বড়া-ইমামবড়া।

ইমামবড়ার সাইজ দেখে আমার মুখের কথা বন্ধ হয়ে গেল। এত বড় প্রাসাদ যে হতে পাবে সেটা আমার ধারণাই ছিল না।

টাঙ্গা থেকেই ধীরুকাকার গাড়িটা দেখতে পেয়েছিলাম। গাড়োয়ানকে ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে আমরা বাবাদের দিকে এগিয়ে গেলাম। বাবা আর ধীরুকাকা একজন লম্বা মাঝবয়সি লোকের সঙ্গে কথা বলছেন।

ফেলুদা হঠাৎ আমার কাঁধে হাত দিয়ে চাপা গলায় বলল, 'ব্ল্যাক স্ট্যান্ডার্ড হেরাল্ড।'

সত্যিই তো! ধীরুকাকার গাড়িব পাশে একটা কালো স্ট্যান্ডার্ড গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।

'মাডগার্ডে একটা টাটকা ঘষটার দাগ দেখছিস?'

'টাটকা কী করে জানলে?'

'চুনের গুঁড়ো সব ঝরে পড়েনি এখনও--লেগে রয়েছে। রং-করা পাঁচিল কিংবা গেটের গায়ে ঘষটে ছিল বোধহয়। আজ সকালে যদি গাড়ি ধোওয়া না হয়ে থাকে, তাহলে ও দাগ কাল রাত্রে লেগে থাকতে পারে।'

ধীরুকাকা আমাদের দেখে বললেন, 'এসো আলাপ করিয়ে দিই। ইনিই বনবিহারীবাবু—যাঁর চিড়িয়াখানা আছে।'

আমি অবাক হয়ে নমস্কার করলাম। ইনিই সেই লোক। প্রায় ছ'ফুট লম্বা, ফরসা রং, সরু গোঁফ, ছুঁচলো দাড়ি, চোখে সোনার চশমা। সব মিলিয়ে চেহারাটা বেশ চোখে পড়ার মতো।

আমার পিঠে একটা চাপড় মেরে ভদ্রলোক বললেন, 'লক্ষ্মণের রাজধানী কেমন লাগছে খোকা? জান তো, রামায়ণের যুগে লখ্নৌ ছিল লক্ষ্মণাবতী।'

ভদ্রলোকের গলার আওয়াজও দেখলাম বেশ মানানসই।

ধীরুকাকা বললেন, 'বনবিহারীবাবু চৌক-বাজারে যাচ্ছিলেন, আমাদের গাড়ি দেখে চলে এলেন।'

ভদ্রলোক বললেন, 'হ্যাঁ। দুপুরবেলাটা আমি বাইরে কাজ সারতে বেরোই। সকালসন্ধে আমার জানোয়ারগুলোর পেছনে অনেকটা সময় চলে যায়।'

ধীরুকাকা বললেন, 'আমরা ভাবছিলাম দলেবলে একবার আপনার ওখানে ধাওয়া করব। এদের খুব শখ একবার আপনার চিড়িয়াখানাটা দেখার।'

'বেশ তো। এনি ডে। আজই আসুন না। আমি তো কেউ এলে খুশিই হই। তবে অনেকেই দেখেছি ভয়েই আসতে চায় না। তাদের ধারণা আমার খাঁচা বুঝি জু গার্ডেনের খাঁচার মতো অত মজবুত নয়। তাই যদি হবে তো আমি আছি কী করে?'

একথায় ফেলুদা ছাড়া আমরা সকলেই হাসলাম। ফেলুদা আমার দিকে সামান্য ঝুঁকে পড়ে চাপা গলায় বলল, 'জানোয়ারের গন্ধ ঢাকার জন্যে কষে আতর মেখেছে।'

স্ট্যান্ডার্ড গাড়িটা দেখলাম বনবিহারীবাবুর নয়, কারণ তিনি তার পাশের একটা নীল অ্যাম্বাসাডর গাড়ি থেকে তাঁর ড্রাইভারকে ডেকে তার হাতে দুটো চিঠি দিয়ে বললেন' ডাকবাক্সে ফেলে দিয়ে আসতে, তারপর আমাদের দিকে ফিরে বললেন, 'আপনারা ইমামবড়া দেখবেন তো? তারপরই না হয় সোজা চলে যাব আমার ওখানে।'

ধীরুকাকা বললেন, 'তাহলে আপনিও ভেতরে আসছেন আমাদের সঙ্গে?'

'চলুন না। নবাবের কীর্তিটা দেখে নেওয়া যাবে। সেই সিক্সটিথ্রিতে গিয়েছিলাম লখ্‌নৌতে আসার দু-দিন বাদেই। তারপর আর যাওয়া হয়নি।'

গেট দিয়ে ঢুকে একটা বিরাট চত্বরের ওপর দিয়ে প্রাসাদের দিকে হাঁটতে-হাঁটতে বনবিহারী বললেন, 'দুশো বছর আগে নবাব আসাফ-উদ্‌-দৌল্লা তৈরি করেছিলেন এই প্রাসাদ। ভেবেছিলেন আগ্রা দিল্লিকে টেক্কা দেবেন। ভারতবর্ষের সেরা প্রাসাদ-করনে-ওয়ালাদের নিয়ে একটা কম্পিটিশন করলেন। তারা সব নকশা পাঠাল। তার মধ্যে বেস্ট নকশা বেছে নিয়ে হল এই ইমামবড়া। বাহারের দিক দিয়ে মোগল প্রাসাদের সঙ্গে কোনও তুলনা হয় না, তবে সাইজের দিক থেকে একেবারে নাম্বার ওয়ান। এত বড় দরবার-ঘর পৃথিবীর কোনও প্রাসাদে নেই।'

দরবার-ঘরটা দেখে মনে হল তার মধ্যে অনায়াসে একটা ফুটবল গ্রাউন্ড ঢুকে যায়। আর একটা কুয়ো দেখলাম, অত বড় কুয়ো আমি কখনও দেখিনি। গাইড বলল, অপরাধীদের ধরে-ধরে ওই কুয়োর মধ্যে ফেলে দিয়ে নাকি তাদের শাস্তি দেওয়া হত।

কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য লাগল ভুলভুলাইয়া। এদিক ওদিক এঁকেবেঁকে সুড়ঙ্গ চলে গেছে সেগুলো এমন কায়দায় তৈরি যে, যতবারই এক-একটা মোড় ঘুরছি, ততবারই মনে হচ্ছে যেন যেখানে ছিলাম সেখানেই আবার ফিরে এলাম। একটা গলির সঙ্গে আরেকটা গলির কোনও তফাত নেই—দুদিকে দেওয়াল, মাথার ওপরে নিচু ছাত, আর দেওয়ালের ঠিক মাঝখানটায় একটা করে খুপরি। গাইড বলল, নবাব যখন বেগমদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলতেন, তখন ওই খুপরিগুলোতে পিদিম জ্বলত। রাত্তিরবেলা যে কী ভূতুড়ে ব্যাপার হবে সেটা বেশ বুঝতে পারছিলাম।

ফেলুদা যে কেন বারবার পিছিয়ে পড়ছিল, আর দেওয়ালের এত কাছ দিয়ে হাঁটছিল সেটা বুঝতেই পারছিলাম না। আমিও গোলকধাঁধাটা দেখতে-দেখতে, আর তার মধ্যে লুকোচুরি খেলার কথা ভাবতে-ভাবতে এত মশগুল হয়ে গিয়েছিলাম যে ওর বিষয় খেয়ালই ছিল না। এর মধ্যে হঠাৎ বাবা বলে উঠলেন, 'আরে ফেলু কোথায় গেল?'

সত্যিই তো! পিছন ফিরে দেখি ফেলুদা নেই। আমার বুকের ভেতরটা ঢিপ করে উঠল। তারপর 'ফেলু, ফেলু' বলে বাবা দু-বার ডাক দিতেই ও আমাদের পিছন দিকের একটা গলি দিয়ে বেরিয়ে এল। বলল, 'অত তাড়াতাড়ি হাঁটলে গোলকধাঁধার প্ল্যানটা ঠিক মাথায় তুলে নিতে পারব না।'

গোলকধাঁধার শেষ গলিটার শেষে যে দরজা আছে, সেটা দিয়ে বেরোলেই ইমামবড়ার বিরাট ছাদে গিয়ে পড়তে হয়। গিয়ে দেখি সেখান থেকে প্রায় সমস্ত লখ্‌নৌ শহরটাকে দেখা যায়। আমরা ছাড়াও ছাদে কয়েকজন লোক ছিল। তাদের মধ্যে একজন অল্পবয়সি ভদ্রলোক ধীরুকাকাকে দেখে হেসে এগিয়ে এলেন।

ধীরুকাকা বললেন, 'মহাবীর যে—কবে এলে?'

ভদ্রলোককে দেখলে যদিও বাঙালি মনে হয় না, তবু তিনি বেশ পরিষ্কার বাংলায় বললেন, 'তিন দিন হল। এই সময়টাতে আমি প্রতি বছরই আসি। দেওয়ালিটা সেরে ফিরে যাই। এবারে দুজন বন্ধু আছেন, তাঁদের লখ্‌নৌ শহর দেখাচ্ছি।'

ধীরুকাকা বললেন, 'ইনি পিয়ারিলালের ছেলে—বোম্বাইতে অভিনয় করছেন।'

মহাবীর দেখলাম বনবিহারীবাবুর দিকে কীরকম যেন অবাক হয়ে দেখছেন—যেন ওঁকে আগে দেখেছেন, কিন্তু কোথায় সেটা মনে করতে পারছেন না।

বনবিহারীবাবু বললেন, 'চেনা-চেনা মনে হচ্ছে কি?'

মহাবীর বলল, 'হ্যাঁ—কিন্তু কোথায় দেখেছি বলুন তো?'

বনবিহারীবাবু বললেন, 'তোমার স্বর্গত পিতার সঙ্গে একবার আলাপ হয়েছিল বটে, কিন্তু তুমি তো তখন এখানে ছিলে না।'

মহাবীর যেন একটু অপ্রস্তুত হয়েই বলল, 'ও। তাহলে বোধহয় ভুল করছি। আচ্ছা, আসি তাহলে।'

মহাবীর নমস্কার করে চলে গেল। ভদ্রলোকের বয়স হয়তো ফেলুদার চেয়েও কিছু কম—আর চেহারা বেশ সুন্দর আর শক্ত। মনে হল নিশ্চয়ই এক্সারসাইজ করেন, কিংবা খেলাধূলা করেন।

বনবিহারীবাবু বললেন, 'আমার মনে হয় এবার আমার ওখানে গিয়ে পড়তে পারলে ভালোই হয়। জানোয়ারগুলো যদি দেখতেই হয়, তাহলে আলো থাকতে-থাকতে দেখাই ভালো। খাঁচাগুলোতে আলোর ব্যবস্থা এখনও করে উঠতে পারিনি।'

আমরা গাইডকে বকশিশ দিয়ে ছাদ থেকে সোজা সিঁড়ি দিয়ে একদম নীচে নেমে এলাম।

গেটের বাইরে এসে দেখলাম মহাবীর আরও দুজন ভদ্রলোককে নিয়ে সেই কালো স্ট্যান্ডার্ড গাড়িটায় উঠছে।

৩

বনবিহারীবাবুর বাড়িতে পৌঁছতে প্রায় চারটে বাজল। বাইরে থেকে বোঝার কোনও উপায় নেই যে ভেতরে একটা চিড়িয়াখানা আছে, কারণ, যা আছে তা বাড়ির পিছন দিকটায়।

'মিউটিনিরও প্রায় ত্রিশ বছর আগে এক ধনী মুসলমান সওদাগর এবাড়ি তৈরি করেছিলেন' বনবিহারীবাবু বললেন। 'আমি বাড়িটা কিনি এক সাহেবের কাছ থেকে।'

দেখেই বোঝা যায় বাড়িটা অনেক পুরানো। আর দেওয়ালের গায়ে যেসব কারুকার্য আছে তা থেকে নবাবদের কথাই মনে হয়।

বাড়ির ভেতর ঢুকে বনবিহারীবাবু বললেন, 'আপনারা সবাই কফি খান তো? আমার বাড়িতে কিন্তু চায়ের পাট নেই।'

আমাকে বাড়িতে বেশি কফি খেতে দেওয়া হয় না, কিন্তু আমার খেতে খুব ভালো লাগে, তাই আমার তো মজাই হয়ে গেল। কিন্তু কফি পরে—আগে জানোয়ার দেখা।

বৈঠকখানা পেরিয়ে একটা বারান্দা, তার পরেই প্রকাণ্ড বাগান, আর সেই বাগানেই এদিকে ওদিকে রাখা বনবিহারীবাবুর সব খাঁচা। বাগানের মাঝখানে ছুঁচলো শিক দিয়ে ঘেরা একটা পুকুর। সেটায় একটা কুমির রোদ পোহাচ্ছে।

বনবিহারীবাবু বললেন, 'এটাকে বছর দশেক আগে মুঙ্গের থেকে এনেছিলাম একেবারে বাচ্চা অবস্থায়। প্রথমে আমার কলকাতার বাড়ির চৌবাচ্চায় ছিল। একদিন দেখি বেরিয়ে এসে একটা আস্ত বেড়ালছানা খেয়ে ফেলেছে।'

পুকুরের চারপাশ থেকে বাঁধানো রাস্তা অন্য খাঁচাগুলোর দিকে গেছে। একটা খাঁচার দিক থেকে ফ্যাস-ফ্যাস শব্দ শুনে আমরা কুমির ছেড়ে সেইদিকেই গেলাম।

গিয়ে দেখি খাঁচার ভেতরে একটা মাঝারি গোছের কুকুরের সাইজের বেড়াল, তার চোখ দুটো সবুজ আর জ্বলজ্বলে, আর গায়ের রং ডোরাকাটা খয়েরি। এত বড় বেড়ালকে বাঘ বলতেই ইচ্ছে করে।

বনবিহারীবাবু বললেন, 'এটার বাসস্থান আফ্রিকা। এটা কিনি কলকাতায় রিপন স্ট্রিটের এক ফিরিঙ্গি পশু ব্যবসায়ীর কাছ থেকে। এ জিনিস আলিপুরের চিড়িয়াখানাতেও নেই।'



বেড়ালের পর হাইনা, হাইনার পর নেকড়ে, নেকড়ের পর আমেরিকান র‍্যাটল স্নেক। দারুণ বিষাক্ত সাপ। একরকম সরু ছুঁচলো শামুক পুরী থেকে আমরা অনেকবার এনেছি; এই সাপের ল্যাজের ডগায় সেইরকম একটা শামুকের মতো জিনিস আছে। সাপটা এদিক-ওদিক চলার সময় ল্যাজটাকে কাঁপায়, আর তাতে ওই জিনিসটা মাটিতে লেগে একটু ঝুমঝুমির মতো করকর-করকর শব্দ হয়। আমেরিকার জঙ্গলে অনেকদূর থেকেই এরকম শব্দ শুনতে পেয়ে নাকি লোকে বুঝতে পারে যে র‍্যাটল স্নেক ঘোরাফেরা করছে।

• আরও দুটো জিনিস দেখে ভয়ে গা শিউরে উঠল। একটা কাচের বাক্সর মধ্যে দেখলাম নীল রঙের বিশ্রী বিরাট এক কাঁকড়া বিছে। এটাও আমেরিকার বাসিন্দা। এর নাম ব্লু স্করপিয়ন। আর আরেকটা কাচের বাক্সে দেখলাম, একটা মানুষের আঙুল ফাঁক করা হাতের মতো বড় কালো রোঁয়াওয়ালা মাকড়সা—আফ্রিকার বিষাক্ত 'ব্ল্যাক উইডো' মাকড়সা।

বনবিহারীবাবু বললেন, 'ওই বিছে আর মাকড়সা—ওই দুটোরই বিষ হল যাকে বলে নিউরোটক্সিক। অর্থাৎ এক কামড়ে একটা আস্ত মানুষ মেরে ফেলার শক্তি রাখে ওই দুটোই।'

চিড়িয়াখানা দেখে আমরা বৈঠকখানায় এলাম। আমরা সোফায় বসার পর নিজে একটা চেয়ারে বসে বনবিহারীবাবু বললেন, 'রাত্রে চারিদিক নিস্তব্ধ হলে মাঝে-মাঝে আমার বাগান থেকে বনবেড়ালের ফ্যাঁসফ্যাঁসানি, হাইনার হাসি, নেকড়ের খ্যাঁকরানি আর র‍্যাটল স্নেকের করকরানি মিলে এক অদ্ভুত কোরাস শুনতে পাই। তাতে ঘুমটা হয় বড় আরামের। এরকম বডিগার্ডের সন্তার আর ক'জনের আছে বলুন। অবিশ্যি চোর এলে এরা খুব হেলপ করতে পারে না বটে, কারণ এরা খাঁচায় বন্দি। তার জন্যে আমার আলাদা ব্যবস্থা আছে।—বাদশা!'

হাঁক দিতেই পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এল এক বিরাট কালো হাউন্ড কুকুর। এটাকেই নাকি বনবিহারীবাবু পাহারার জন্য রেখেছেন। শুধু যে বাড়ি পাহারা তা নয়—চিড়িয়াখানারও কোনও অনিষ্ট নাকি এই বাদশা করতে দেবে না।

ফেলুদা আমার পাশেই বসেছিল। কুকুরটা দেখে আমার কানে ফিস-ফিস করে বলল, 'ল্যাব্রেডর হাউন্ড। বাস্কারভিলের কুকুরের জাত।'

বাবা এতক্ষণ একটাও কথা বলেননি। এবার বললেন, 'আচ্ছা, সত্যিই আপনার এইসব হিংস্র জানোয়ারের মধ্যে বাস করতে ভালো লাগে?'

বনবিহারীবাবু তাঁর পাইপে তামাক ভরতে-ভরতে বললেন, 'কেন লাগবে না বলুন? ভয়টা কিসের? এককালে কত বাঘ ভালুক মেরেছি জানেন? ওয়াইল্ড অ্যানিম্যাল ছাড়া মারতুম না। অব্যর্থ টিপ ছিল। একবার কী যে ভীমরতি ধরল। চাঁদার জঙ্গলে এক মার্কিন সাহেবকে বড়াই করে টিপ দেখাতে গিয়ে দেড়শো গজ দূর থেকে এক হরিণ মেরে ফেললুম। আর তারপর সে কী অনুতাপ! সেই থেকে শিকার ছেড়ে দিয়েছি। তবে জানোয়ার ছাড়াও থাকতে পারব না, তাই চালান দেওয়ার ব্যবসা ধরলুম। ব্যবসা যখন ছাড়লুম, তখন বাধ্য হয়েই বাড়িতে চিড়িয়াখানা করলুম। এদের নিয়ে বাস করার কী আনন্দ জানেন? এরা যে হিংস্র ও বিষাক্ত, সেটা সকলেরই জানা। এরা তো নিরীহ ভালোমানুষ বলে চালাতে চাইছে না নিজেদের! অথচ মানুষের মধ্যে দেখুন---একজনকে আপনি ভাবছেন সৎ লোক, শেষে হঠাৎ বেরিয়ে গেল সে আসলে একটা ক্রিমিনাল। অন্তরঙ্গ বন্ধুকেই কি আর আজকের দিনে বিশ্বাস করার জো আছে? তাই স্থির করেছি জানোয়ার পরিবেষ্টিত হয়েই বাকি জীবনটা কাটাব—তাতে শান্তি অনেক বেশি। আমি মশাই সাতেও নেই পাঁচেও নেই। নিজের সম্পত্তি একা নিজে ভোগ করছি—তাতে কে কী ভাবছে না ভাবছে সেই নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কী হবে? তবে শুনিচি আমার এ চিড়িয়াখানার দৌলতে পাড়ায় নাকি চুরি-চামারি বন্ধ হয়ে গেছে। তাহলে বলতে হয় অজান্তে আমি লোকের উপকারই করেছি!'

এই শেষ কথাটা শুনে আমি প্রথমে ধীরুকাকার দিকে, তারপর ফেলুদার দিকে চাইলাম। বনবিহারীবাবু কি তাহলে শ্রীবাস্তবের বাড়ির ঘটনাটা জানেন না?

. এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না, কারণ বনবিহারীবাবুর বেয়ারা কফি আর মিষ্টি এনে দেওয়ার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই শ্রীবাস্তব এসে হাজির হলেন।

সকলকে নমস্কার-টমস্কার করে ধীরুকাকাকে বললেন, 'আপনাদের বাড়ির কাছেই কেলভিন রোডে একটি ছেলে গাছ থেকে পড়ে হাত ভেঙেছে। তাকে দেখে আপনার বাড়ি গিয়ে দেখি আপনারা ফেরেননি। তাই এখানে চলে এলাম।'

ধীরুকাকা শ্রীবাস্তবের দিকে চোখ দিয়ে একটা ইশারা করে বুঝিয়ে দিলেন যে তাঁর আংটি ঠিকই আছে।

বনবিহারীবাবুর সঙ্গে দেখলাম শ্রীবাস্তবের যথেষ্ট আলাপ। ছোট শহরে পাড়ার লোকেদের পরস্পরের মধ্যে আলাপটা বোধহয় সহজেই হয়।

শ্রীবাস্তব ঠাট্টার সুরে বললেন, 'বনবিহারীবাবু, আপনার পাহারাদারেরা কিন্তু আজকাল ফাঁকি দিচ্ছে।'

বনবিহারীবাবু একটু অবাক হয়েই বললেন, 'কীরকম?'

'কাল আমার বাড়িতে চোর এল, আর আপনাব একভি জানোয়ার কিছু সাড়াশব্দ করল না।'

'সে কী? চোর? আপনার বাড়িতে? কখন?'

'রাত তিনটের কাছাকাছি। নেয়নি কিছুই। ঘুমটা ভেঙে গেল আমার, তাই পালিয়ে গেল।'

'না নিলেও—খুব এক্সপার্ট বলতে হবে। আমার "বাদশা" অন্তত খুবই সজাগ। দুশো গজের মধ্যে আপনার বাড়ি—আর চোর এলেও আমার কম্পাউন্ডের পিছন দিয়েই তাকে যেতে হবে।'

'যাক গে। আপনাকে ঘটনাটা জানিয়ে রাখলাম।'

কফির সঙ্গে একরকম মিষ্টি দিয়ে গিয়েছিল প্লেটে। শ্রীবাস্তব বললেন সেটার নাম সান্ডিলা লাড্ডু।

সান্ডিলা লাড্ডু, গুলাবি রেউরি, আর ভুনা পেঁড়া—এই তিন মিষ্টি হল লখ্‌নৌয়ের স্পেশালিটি।'

আমার নিজের মিষ্টি জিনিসটা খুব ভালো লাগে না, তাই আমি ওসব কথায় বিশেষ কান না দিয়ে বনবিহারীবাবুকে লক্ষ করছিলাম। ওঁকে যেন একটু অন্যমনস্ক মনে হচ্ছিল। ফেলুদা কিন্তু দেখি এর মধ্যেই দুটো লাড্ডু শেষ করে নিয়ে, আমার কফির পেয়ালার ওপর মাছি তাড়াবার মতো করে হাত নাড়িয়ে দারুণ কায়দায় আমার প্লেট থেকে আরেকটা লাড্ডু তুলে নিল।

বনবিহারীবাবু হঠাৎ শ্রীবাস্তবের দিকে ফিরে বললেন, 'আপনার সেই বাদশাহী আংটি ঠিক আছে তো?'

শ্রীবাস্তবের হঠাৎ বিষম লেগে গেল। তারপর কোনওরকমে নিজেকে সামলে নিয়ে কাশিটাকে হাসিতে চেঞ্জ করে বললেন—'ও বাবা—আপনার দেখি মনে আছে।'

বনবিহারীবাবু পাইপের ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 'মনে থাকবে না। আমার যদিও ওসব ব্যাপারে কোনও ইন্টারেস্ট নেই, তবুও ওরকম আংটি তো সচরাচর দেখা যায় না।'

শ্রীবাস্তব বললেন, 'আংটি ঠিকই আছে। ওর ভ্যালু আমার জানা আছে।'

বনবিহারীবাবু এবার হঠাৎ উঠে পড়ে বললেন, 'এক্সকিউজ মি—আমার বেড়ালের খাওয়ার সময় হয়ে গেছে।'

একথার পর আর থাকা যায় না—তাই আমরাও উঠে পড়লাম।

বাইরে এসে একজন লোককে হাতে একটা ব্যাগ নিয়ে বনবিহারীবাবুর গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকতে দেখলাম। তার যে দারুণ মাসল সেটা গায়ে জামা থাকলেও বোঝা যায়। শুনলাম তাঁর নাম নাকি গণেশ গুহ। বনবিহারীবাবুর যখন জানোয়ার চালান দেওয়ার কারবার ছিল তখন থেকেই নাকি ইনি আছেন, এখন নাকি চিড়িয়াখানা দেখাশোনা করেন।

বনবিহারীবাবু বললেন, 'গণেশকে ছাড়া আমার চিড়িয়াখানা মেনটেন করা হত না। ওর ভয় বলে কোনও বস্তুই নেই। একবার ওয়াইল্ড ক্যাটের আঁচড় খাওয়া সত্ত্বেও ও আমার চাকরি ছাড়েনি।'

আমরা যখন গাড়িতে উঠছি তখন বনবিহারীবাবু বললেন, 'আপনার আসাতে খুব ভালো লাগল। মাঝে-মাঝে এসে পড়বেন না হয়। এখন এখানেই আছেন তো?'

বাবা বললেন, 'ক'দিন আছি। তারপর ভাবছি এদের একবার হরিদ্বারটা দেখিয়ে আনব।'

'বটে? লছমনঝুলা থেকে একটা বারো ফুট পাইথনের খবর এসেছে। আমিও তাই একবার ওদিকটায় যাব-যাব করছিলাম।'

শ্রীবাস্তবকে আমরা ওঁর বাড়ির সামনে নামিয়ে দিলাম। ঠিক সেই সময় বনবিহারীবাবুর বাড়ির দিক থেকে একটা বিকট চিৎকার শুনতে পেলাম।

ফেলুদা একটা হাই তুলে বলল, 'হাইনা।'

বাপরে।—একেই বলে হাইনার হাসি।

শ্রীবাস্তব বললেন তাঁর নাকি প্রথম প্রথম এই হাসি শুনে গা ছমছম করত, এখন অভ্যেস হয়ে গেছে।

'আপনার বাড়িতে কাল আর কোনও উপদ্রব হয়নি তো?' ধীরুকাকা প্রশ্ন করলেন।

শ্রীবাস্তব হেসে বললেন, 'নো, নো। নাথিং।'

আমরা যখন বাড়িতে ফিরলাম তখন প্রায় সন্ধে হয়ে গেছে। গাড়ি থেকে নেমে শুনতে পেলাম দূর থেকে একটা ঢাক ঢোলের শব্দ আসছে। ধীরুকাকা বললেন, 'দেওয়ালির সময় এখানে রামলীলা হয়। এটা তারই প্রিপারেশন হচ্ছে।'

আমি বললাম, 'রামলীলা কীরকম?'

প্রায় দশটা মানুষের সমান উঁচু একটা রাবণ তৈরি করে তার ভেতর বারুদ বোঝাই করা হয়। তারপর দুজন ছেলেকে মেকআপ-টেকআপ করে রাম লক্ষ্মণ সাজায়। তারা রথে চড়ে এসে তীর দিয়ে রাবণের দিকে তাক করে মারে—আর সেইসঙ্গে রাবণের গায়ে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। তারপর গা থেকে তুবড়ি হাউই চরকি রংমশাল ছড়াতে ছড়াতে রাবণ পুড়ে ছাই হয়ে যায়। সে একটা দেখবার জিনিস।'

বাড়িতে ঢুকতে বেয়ারা শ্রীবাস্তবের আসার খবরটা দিল। তারপর বলল, 'আউর এক সাধুবাবা ভি আয়া থা। আধঘণ্টা বইঠকে চলা গিয়া।'

'সাধুবাবা?'

ধীরুকাকার ভাব দেখে বুঝলাম উনি কোনও সাধুবাবাকে এক্সপেক্ট করছিলেন না।

'কোথায় বসেছিলেন?'

বেয়ারা বলল, 'বৈঠকখানায়।'

'আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

'আমার নাম করেছিলেন?'

বেয়ারা তাতেও বলল হ্যাঁ।

'তাজ্জব ব্যাপার।'

হঠাৎ কী মনে করে ধীরুকাকা ঝড়ের মতো শোওয়ার ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। তারপর গোদরেজ আলমারি খোলার শব্দ পেলাম। আর তার পরেই শুনলাম ধীরুকাকার চিৎকার—

'সর্বনাশ।'

বাবা, আমি আর ফেলুদা প্রায় একসঙ্গে হুড়মুড় করে ধীরুকাকার ঘরে ঢুকলাম।

গিয়ে দেখি উনি আংটির কৌটোটা হাতে নিয়ে চোখ বড়-বড় করে দাঁড়িয়ে আছেন।

কৌটোর ঢাকনা খোলা, আর তার ভেতরে আংটি নেই।

ধীরুকাকা কিছুক্ষণ বোকার মতো দাঁড়িয়ে থেকে ধপ করে তাঁর খাটের ওপর বসে পড়লেন।

৪

পরদিন সকালে মনে হল যে শীতটা একটু বেড়েছে, তাই বাবা বললেন গলায় একটা মাফলার জড়িয়ে নিতে। বাবার কপালে ভ্রুকুটি আর একটা অন্যমনস্ক ভাব দেখে বুঝতে পারছিলাম যে উনি খুব ভাবছেন। ধীরুকাকাও কোথায় জানি বেরিয়ে গেছেন—আর কাউকে কিছু বলেও যাননি। কালকের ঘটনার পর থেকেই কেবল বলছেন—শ্রীবাস্তবকে মুখ দেখাব কী করে? বাবা অবিশ্যি অনেক সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। 'বিকেল বেলা সন্ন্যাসী সেজে চোর এসে তোমার বাড়ি থেকে আংটি নিয়ে যাবে সেটা তুমি জানবে কী করে। তার চেয়ে তুমি বরং পুলিশে একটা খবর দিয়ে দাও। তুমি তো বলছিলে ইন্সপেক্টর গরগরির সঙ্গে তোমার খুব আলাপ আছে।' এও হতে পারে যে ধীরুকাকা হয়তো পুলিশে খবর দিতেই বেরিয়েছেন।

সকালে যখন চা আর জ্যাম-রুটি খাচ্ছি, তখন বাবা বললেন, 'ভেবেছিলাম আজ তোদের রেসিডেন্সিটা দেখিয়ে আনব, কিন্তু এখনও মনে হচ্ছে আজকের দিনটা যাক। তোরা দুজনে বরং কোথাও ঘুরে আসিস কাছাকাছির মধ্যে।'

কথাটা শুনে আমার একটু হাসিই পেয়ে গেল, কারণ ফেলুদা বলছিল ওর একটু পায়ে হেঁটে শহরটা দেখার ইচ্ছে আছে, আর আমিও মনে-মনে ঠিক করেছিলাম ওর সঙ্গে যাব। আমি জানতাম শুধু শহর দেখা ছাড়াও ওর অন্য উদ্দেশ্য আছে। আমি সন্ধেবেলা থেকেই দেখছি ওর চোখের দৃষ্টিটা মাঝে-মাঝে কেমন জানি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠছে।

আটটার একটু পরেই আমরা দুজনে বেরিয়ে পড়লাম।

গেটের কাছাকাছি এসে ফেলুদা বলল, 'তোকে ওয়ার্নিং দিচ্ছি—বকবক করলে বা বেশি প্রশ্ন করলে তোকে ফেরত পাঠিয়ে দেব। বোকা সেজে থাকবি, আর পাশে-পাশে হাঁটবি।'

'কিন্তু ধীরুকাকা যদি পুলিশে খবর দেন?'

'তাতে কী হল?'

'ওরা যদি তোমার আগে চোর ধরে ফেলে?'

'তাতে আর কী? নিজের নামটা চেঞ্জ করে ফেলব!'

ধীরুকাকার বাড়িটা যে রাস্তায় সেটার নাম ফ্রেজার রোড। বেশ নির্জন রাস্তাটা। দুদিকে গেট আর বাগানওয়ালা বাড়ি, তাতে শুধু যে বাঙালিরা থাকে তা নয়। ফ্রেজার রোডটা গিয়ে পড়েছে ডাপলিং রোডে। লখ্‌নৌতে একটা সুবিধে আছে—রাস্তার নামগুলো বেশ বড়-বড় পাথরের ফলকে লেখা থাকে। কলকাতার মতো খুঁজে বার করতে সময় লাগে না।

ডাপলিং রোডটা যেখানে গিয়ে পার্ক রোডে মিশেছে, সেই মোড়টাতে একটা পানের দোকান দেখে ফেলুদা হেলতে-দুলতে সেটার সামনে গিয়ে বলল, 'মিঠা পান হ্যায়?'

'মিঠা পান? নেহি, বাবুজি। লেকিন মিঠা মাসাল্লা দেকে বানা দেনে সেকতা।'

'তাই দিজিয়ে।' তারপর আমার দিকে ফিরে বলল, 'বাংলা দেশ ছাড়লেই এই একটা প্রবলেম।'

পানটা কিনে মুখে পুরে দিয়ে ফেলুদা বলল, 'হ্যাঁ ভাই, আমি এ-শহরে নতুন লোক। এখানকার রামকৃষ্ণ মিশনটা কোথায় বলতে পারো?'

ফেলুদা অবিশ্যি হিন্দিতে প্রশ্ন করছিল, আর লোকটাও হিন্দিতে জবাব দিয়েছিল, কিন্তু আমি বাংলাতেই লিখছি।

দোকানদার বলল, 'রামকিষণ মিসির?'

'রামকৃষ্ণ মিশন। শহরে একজন বড় সাধুবাবা এসেছেন, আমি তাঁর খোঁজ করছি। শুনলাম তিনি রামকৃষ্ণ মিশনে উঠেছেন।'

দোকানদার মাথা নেড়ে বিড়বিড় করে কী জানি বলে বিড়ি বাঁধতে আরম্ভ করে দিল। কিন্তু



দোকানের পাশেই একটা খাটিয়ায় একটা ইয়াবড় গোঁফওয়ালা লোক একটা পুরোনো মরচেধরা বিস্কুটের টিন বাজিয়ে গান করছিল, সে হঠাৎ ফেলুদাকে জিগ্যেস করল, 'কালো গোঁফদাড়িওয়ালা কালো চশমা পরা সাধু কি? তাই যদি হয় তাহলে তাকে কাল সন্ধেবেলা টাঙ্গার স্ট্যান্ড কোথায় বলে দিয়েছিলাম।'

'কোথায় টাঙ্গার স্ট্যান্ড?'

'এখান থেকে পাঁচমিনিট। ওই দিকে প্রথম চৌমাথাটায় গেলেই সার-সার গাড়ি দাঁড়ানো আছে দেখতে পাবেন।'

'শুক্রিয়া!'

শুক্রিয়া কথাটা প্রথম শুনলাম। ফেলুদা বলল ওটা হল উর্দুতে থ্যাঙ্ক ইউ।

টাঙ্গা স্ট্যান্ডে পৌঁছে সাতটা টাঙ্গাওয়ালাকে জিগ্যেস করার পর আট বারের বার সাতান্ন নম্বর গাড়ির গাড়োয়ান বলল যে, গতকাল সন্ধ্যায় একজন গেরুয়াপরা দাড়িগোঁফওয়ালা লোক তার গাড়ি ভাড়া করেছিল বটে।

'কোথায় নিয়ে গিয়েছিলে সাধুবাবাকে?'—ফেলুদা প্রশ্ন করল।

গাড়োয়ান বলল, 'ইস্টিশান।'

'স্টেশন?'

'হাঁ।'

'কত ভাড়া এখান থেকে?'

'বারো আনা।'

'কত টাইম লাগবে পৌঁছুতে?'

'দশ মিনিটের মতো।'

'চার আনা বেশি দিলে আট মিনিটে পৌঁছে দেবে?'

'টিরেন পাকাড়না হ্যায় কেয়া?'

'টিরেন বলে টিরেন! বঢ়িয়া টিরেন—বাদশাহী এক্সপ্রেস!'

গাড়োয়ান একটু বোকার মতো হেসে বলল, 'চলিয়ে—আট মিনিটমে পৌঁছা দেঙ্গে!'

গাড়ি ছাড়বার পর ফেলুদাকে একটু ভয়ে-ভয়ে জিগ্যেস করলাম, 'সেই সাধুবাবা কি এখনও বসে আছেন স্টেশনে আংটি নিয়ে?'

এটা বলতে ফেলুদা আমার দিকে এমন কটমট করে চাইল যে আমি একেবারে চুপ মেরে গেলাম।

কিছুক্ষণ যাওয়ার পর ফেলুদা গাড়োয়ানকে জিগ্যেস করল, 'সাধুবাবার সঙ্গে কোনও মালপত্তর ছিল কি?'

গাড়োয়ান একটুক্ষণ ভেবে বলল, 'মনে হয় একটা বাক্স ছিল। তবে, বড় নয়, ছোট!'

'হুঁ।'

স্টেশনে পৌঁছে টিকিট ঘরের লোক, গেটের চেকার, কুলি-টুলি এদের কাউকে জিগ্যেস করে কোনও ফল হল না। রেস্টুরেন্টের ম্যানেজার বাঙালি; তিনি বললেন, 'আপনি কি পবিত্রানন্দ ঠাকরের কথা বলছেন? যিনি দেরাদুনে থাকেন? তিনি তো তিনদিন হল সবে এসেছেন। তাঁর তো এখনও ফিরে যাওয়ার সময় হয়নি। আর তাঁর সঙ্গে তো দেদার সাঙ্গপাঙ্গ চেলাচামুণ্ডা!'

সবশেষে ফার্স্টক্লাস ওয়েটিং রুমের যে দারোয়ান, তাকে জিগ্যেস করতে সে বলল, একজন গেরুয়াপরা দাড়িওয়ালা লোক গতকাল সন্ধ্যায় এসেছিল বটে।

'ওয়েটিংরুমে বসেছিলেন?'

'আজ্ঞে না। বসেননি।'

'তবে?'

'বাথরুমে ঢুকেছিলেন। হাতে একটা ছোট বাক্স ছিল।'

'তারপর?'

'তারপর তো জানি না।'

'সে কী? বাথরুমে ঢোকার পর তাকে আর দেখনি?'

'দেখেছি বলে তো মনে পড়ছে না।'

'তুমি এখানেই ছিলে তো?'

'তা তো থাকবই। ডুন এক্সপ্রেস আসছে তখন। ঘরে অনেক লোক যে।'

'তাহলে হয়তো খেয়াল করনি। এমনও হতে পারে তো?'

'তা পারে।'

কিন্তু লোকটার হাবভাব দেখে মনে হল যে, সে বলতে চায় যে সাধুবাবা বেরোলে সে নিশ্চয়ই দেখতে পেত। কিন্তু তাহলে সে সাধুবাবা গেলেন কোথায়?

স্টেশনে আর বেশিক্ষণ থেকে এ রহস্যের উত্তর পাওয়া যাবে না, তাই আমরা বাইরে বেরিয়ে এলাম।

এখানেও বাইরে টাঙ্গার লাইন, আর তারই একটাতে আমরা উঠে পড়লাম। টাঙ্গা জিনিসটাকে আর অবজ্ঞা করতে পারছিলাম না, কারণ সাতান্ন নম্বরের গাড়োয়ান আমাদের ঠিক সাত মিনিট সাতান্ন সেকেন্ডে স্টেশনে পৌঁছে দিয়েছিল।

এবারেও কিন্তু গাড়ি ছাড়বার পরে আমার মুখ থেকে একটা প্রশ্ন বেরিয়ে পড়ল—

'সাধুবাবা বাথরুমে গিয়ে ভ্যানিশ করে গেল?'

ফেলুদা দাঁতের ফাঁক দিয়ে ছিক করে খানিকটা পানের পিক রাস্তায় ফেলে দিয়ে বলল, 'তা হতে পারে। আগেকার দিনে তো সাধুসন্ন্যাসীদের ভ্যানিশ-ট্যানিস করার ক্ষমতা ছিল বলে শুনেছি।'

বুঝলাম ফেলুদা কথাটা সিরিয়াসলি বলছে না, যদিও ওর মুখ দেখে সেটা বোঝার কোনও উপায় নেই।

স্টেশনের গেট ছাড়িয়ে বড় রাস্তায় পড়তেই একটা ব্যান্ডের আওয়াজ পেলাম। ভোঁপ্পর-ভোঁপ্পর-ভোঁপ্পর ভোঁপ্পর..আওয়াজটা এগিয়ে আসছে।

তারপর দেখলাম আমাদের মতো একটা টাঙ্গা, কিন্তু সেটার গায়ে কাগজের ফুল, বেলুন, ফ্ল্যাগ—এইসব দিয়ে খুব সাজানো হয়েছে। বাজনাটা বাজছে একটা লাউডস্পিকারে, আর-একটা রঙিন কাগজের গাধার টুপি পরা লোক গাড়ির ভেতর থেকে গোছা-গোছা করে কী একটা ছাপানো কাগজ রাস্তার লোকের দিকে ছুড়ে দিচ্ছে।

ফেলুদা বলল, 'হিন্দি ফিল্মের বিজ্ঞাপন।'

সত্যিই তাই। গাড়িটা আরেকটু কাছে আসতেই রঙচঙে ছবি আঁকা বিজ্ঞাপনের বোর্ডটা দেখতে পেলাম। ছবির নাম 'ডাকু মনসুর।'

হ্যান্ডবিলের দু-একটা আমাদের গাড়ির ভেতর এসে পড়ল, আর ঠিক সেই সময় একটা দলাপাকানো সাদা কাগজ বেশ জোরে গাড়ির মধ্যে এসে ফেলুদার বুক পকেটে লেগে গাড়ির মেঝেতে পড়ল।

আমি চেঁচিয়ে বলে উঠলাম, 'লোকটাকে দেখেছি ফেলুদা! কাবলিওয়ালার পোশাক, কিন্তু—'

আমার কথা শেষ হল না। ফেলুদা চট করে কাগজটা তুলে নিয়ে একলাফে চলন্ত টাঙ্গা থেকে রাস্তায় নেমে পাঁইপাঁই করে যে দিকে লোকটাকে দেখা গিয়েছিল সেইদিকে ছুটে গেল। ভিড়ের মধ্যে কলিশন বাঁচিয়ে একটা মানুষ কত স্পিডে ছুটতে পারে সেটা এই প্রথম দেখলাম।

এর মধ্যে অবিশ্যি টাঙ্গাওয়ালা গাড়ি থামিয়েছে। আমি আর কী করব? অপেক্ষা করে রয়েছি। ব্যান্ডের আওয়াজ ক্রমশ মিলিয়ে আসছে, তবে রাস্তায় কতকগুলো বাচ্চা-বাচ্চা ছেলে এখনও হ্যান্ডবিল কুড়োচ্ছে। এমন সময় হাঁপাতে-হাঁপাতে ফিরে এসে গাড়োয়ানকে ইশারা করে চালানোর হুকুম দিয়ে এক লাফে গাড়িতে উঠে ধপ করে সিটে বসে পড়ে ফেলুদা বলল, 'নতুন জায়গাতে অলিগলিগুলো জানা নেই, তাই বাবাজি রক্ষে পেয়ে গেলেন।'

আমি জিগ্যেস করলাম, 'তুমি লোকটাকে দেখেছিলে?'

'তুই দেখলি, আর আমি দেখব না?'

আমি আর কিছু বললাম না। ফেলুদা লোকটাকে না দেখে থাকলে আমি ওকে বলতাম যে যদিও লোকটার গায়ে কাবলিওয়ালার পোশাক ছিল, কিন্তু অত কম লম্বা কাবলিওয়ালা আমি কখনও দেখিনি।

ফেলুদা এবার পকেট থেকে দলাপাকানো কাগজটা খুলে হাত দিয়ে ঘষে সমান করে, চোখের খুব কাছে নিয়ে তার মধ্যে যে লেখাটা ছিল সেটা পড়ে ফেলল। তারপর সেটাকে তিনভাঁজ করে ওর মানিব্যাগের ভেতর নিয়ে নিল। লেখাটা যে কী ছিল সেটা আর আমার জিগ্যেস করার সাহস হল না।

বাড়ি ফিরে দেখি ধীরুকাকার সঙ্গে শ্রীবাস্তব এসেছেন। শ্রীবাস্তবকে দেখে মনে হল না যে আংটিটা যাওয়াতে তাঁর খুব একটা দুঃখ হয়েছে। তিনি বললেন, 'উ আংটি ছিল অপয়া। যার কাছে যাবে তারই দুশ্চিন্তা হোবে, বিপদ হোবে, বাড়িতে ডাকু আসবে। আপনি তো লাকি, ধীরুবাবু। ধরুন যদি ডাকু এসে ঝামেলা করত, গোলাগোলি চালাত।'

ধীরুকাকা একটু হেসে বললেন, 'তাহলে তবু একটা মানে হত। এ যে একেবারে ভাঁওতা দিয়ে বুদ্ধু বানিয়ে জিনিসটা নিয়ে চলে গেল। এটা যেন কিছুতেই হজম করতে পারছি না।'

শ্রীবাস্তব বললেন, 'আপনি কেন ভাবছেন ধীরুবাবু। আংটি আমার কাছে থাকলেও যেত, আপনার কাছে থাকলেও যেত। আর আপনি যে বলেছিলেন পুলিশে খবর দেবেন—তাও করবেন না। ওতে আপনার বিপদ আরও বেড়ে যাবে। যারা চুরি করল, তারা ক্ষেপে গিয়ে ফির আপনাদের উপর হামলা করবে।'

ফেলুদা এতক্ষণ একটা সোফায় বসে একটা 'লাইফ' ম্যাগাজিন দেখছিল, এবার সেটাকে বন্ধ করে টেবিলে রেখে দিয়ে হাত দুটোকে সোফার মাথার পিছনে এলিয়ে দিয়ে বলল, 'মহাবীরবাবু জানেন এ আংটির কথা?'

'পিয়ারিলালের ছেলে?'

'হ্যাঁ।'

'সে তো আমি জানি না ঠিক। মহাবীর ডুন স্কুলে পড়ত, ওখানেই থাকত। তারপর মিলিটারি অ্যাকাডেমিতে জয়েন করেছিল। তারপর সেটা ছেড়ে দিল, বোম্বাই গিয়ে ফিল্মে অ্যাকটিং শুরু করল।'

'উনি ফিল্মে নামার ব্যাপারে পিয়ারিলালের মত ছিল?'

'সে বিষয়ে আমায় কিছু বলেননি পিয়ারিলাল। তবে জানি উনি ছেলেকে খুব ভালোবাসতেন।'

'পিয়ারিলাল মারা যাওয়ার সময় মহাবীর কাছে ছিলেন?'

'না। বোম্বাই ছিল। খবর পেয়ে এসে গেল।'

ধীরুকাকা বললেন, 'ফেলুবাবু যে একেবারে পুলিশের মতো জেরা করছ।'

বাবা বললেন, 'ও যে শখের ডিটেকটিভ। ওর ওদিকে বেশ ইয়ে আছে।'

শুনে শ্রীবাস্তব খুব অবাক হয়ে ফেলুদার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বাঃ—ভেরি গুড, ভেরি গুড!'

কেবল ধীরুকাকাই যেন একটু ঠাট্টার সুরে বললেন, 'খোদ ডিটেকটিভের বাড়ি থেকেই মালটা চুরি হল, এইটেই যা আপসোস।'

ফেলুদা এসব কথাবার্তায় কোনও মন্তব্য না করে শ্রীবাস্তবকে আরেকটা প্রশ্ন করল, 'মহাবীরবাবুর ফিল্মে অ্যাকটিং করে ভালো রোজগার হচ্ছে কি?'

শ্রীবাস্তব বললেন, 'সেটা ঠিক জানি না। মাত্র দু-বছর তো হল?'

'ওঁর এমনিতে টাকার কোনও অভাব আছে?'

'নাঃ। কারণ, পিয়ারিলাল ওকেই সম্পত্তি দিয়ে গেছেন। সিনেমাটা ওর শখের ব্যাপার।'

'হুঁ'—বলে ফেলুদা আবার লাইফটা তুলে নিল।

শ্রীবাস্তব হঠাৎ তাঁর রিস্ট ওয়াচের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এই দেখুন, আপনাদের সঙ্গে কথা বলতে-বলতে আমার পেশেন্টের কথাই ভুলে গেছি। আমি চলি!'

শ্রীবাস্তবকে তাঁর গাড়িতে পৌঁছে দিতে বাবা আর ধীরুকাকা বাইরে গেলে পর ফেলুদা ম্যাগাজিনটা বন্ধ করে একটা বিরাট হাই তুলে বলল, 'তোর চাঁদে যেতে ইচ্ছে করে, না মঙ্গল গ্রহে?'

আমি বললাম, 'আমার এখন শুধু একটা জিনিসই ইচ্ছে করছে।'

ফেলুদা আমার কথায় কান না দিয়ে বলল, 'লাইফে চাঁদের সাবফেসের ছবি দিয়েছে। দেখে জায়গাটাকে খুব ইন্টারেস্টিং বলে মনে হচ্ছে না। মঙ্গল সম্বন্ধে তবু একটা কৌতূহল হয়।'

আমি এবার একেবারে চেয়ার ছেড়ে উঠে বললাম, 'ফেলুদা, আমার কৌতূহল হচ্ছে তোমাব মানিব্যাগে যে কাগজটা আছে সেইটে দেখার জন্যে।'

'ওঃ—ওইটে!'

'ওটা দেখাবে না বুঝি?'

'ওটা উর্দুতে লেখা।'

'তবু দেখি না।'

'এই দ্যাখ।'

ফেলুদা ভাঁজ করা কাগজটা বের করে সেটা দু-আঙুলের ফাঁকে ধরে ক্যারামের গুটির মতো করে আমার দিকে ছুড়ে দিল। খুলে দেখি সেটায় লেখা আছে—'খুব হুঁশিয়ার!'

আমি বললাম, 'তবে যে বললে উর্দু?'

'বোকচন্দর—"খুব" আর "হুঁশিয়ার"—এই দুটো কথাই যে উর্দু সেটাও বুঝি তোর জানা নেই?'

সত্যিই তো! মনে পড়ল একবার বাবা বলেছিলেন, যে-কোনও বাংলা উপন্যাস নিয়ে তার যে-কোনও একটা পাতা খুলে পড়ে দেখ, দেখবে প্রায় অর্ধেক কথা হয় উর্দু, নয় ফারসি, না হয় ইংরেজি—, না হয় পর্তুগিজ, না হয় অন্য কিছু। এসব কথা বাংলায় এমন চলে গেছে যে, আমরা ভুলে গেছি এগুলো আসলে বাংলা নয়।

আমি লাল অক্ষরে লেখা কথা দুটোর দিকে চেয়ে আছি দেখে প্রায় যেন আমার মনের প্রশ্নটা আন্দাজ করেই ফেলুদা বলল, 'একটা সাজা পানের ডগা দিয়ে অনেক সময় চুন খয়ের মেশানো লাল রস চুঁইয়ে পড়ে দেখেছিস? এটা সেই পানের ডগা দিয়ে লাল রস দিয়ে লেখা।'

আমি লেখাটা নাকের কাছে আনতেই পানের গন্ধ পেলাম।

'কিন্তু কে লিখেছে বল তো?'

'জানি না।'

'লোকটা বাঙালি তো বটেই?'

'জানি না।'

'কিন্তু তোমাকে কেন লিখতে যাবে? তুমি তো আর আংটি চুরি করনি।'

ফেলুদা হো-হো করে হেসে বলল, 'হুমকি জিনিসটা কি আর চোরকে দেয় রে বোকা? ওটা দেয় চোরের যে শত্রু তাকে। অর্থাৎ ডিটেকটিভকে। তাই এসব কাজে নামতে হলে ডিটেকটিভের একেবারে প্রাণটি হাতে নিয়ে নামতে হয়।'

আমার বুকের ভেতরটা টিপ-টিপ করে উঠল, আর বুঝতে পারলাম যে গলাটা কেমন জানি

শুকিয়ে আসছে। কোনওরকমে ঢোক গিলে বললাম, 'তাহলে এবার থেকে সত্যিই হুঁশিয়ার হওয়া উচিত।'

'হুঁশিয়ার হইনি সে কথা তোকে কে বললে?'—এই বলে ফেলুদা পকেট থেকে একটা গোল কৌটো বার করে আমার নাকের সামনে ধরল। দেখলাম বাক্সটার ঢাকনায় লেখা রয়েছে—'দশংসংস্কারচূর্ণ।'

ওটা যে একটা দাঁতের মাজনের নাম সেটা আমি ছেলেবেলা থেকে জানি—কারণ দাদু ওটা ব্যবহার করতেন। তাই আমি একটু অবাক হয়েই বললাম, 'দাঁতের মাজন দিয়ে কী করে হুঁশিয়ার হবে ফেলুদা?'

'তোর যেমন বুদ্ধি!—দাঁতের মাজন হতে যাবে কেন?'

'তবে ওটায় কী আছে?'

চোখ দুটো গোল করে গলাটা বাড়িয়ে আর নামিয়ে নিয়ে ফেলুদা বলল, 'চূর্ণীকৃত ব্রহ্মাস্ত্র!'

৫

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর ফেলুদা হঠাৎ বলল, 'তোপ্‌সে, কী মনে হচ্ছে বল তো?'

আমি বললাম, 'কীসের কী মনে হচ্ছে?'

'এই যেসব ঘটনা ঘটছে-টটছে।'

'বারে বা, সে তো তুমি বলবে। আমি আবার কী করে বলব? আমি কি ডিটেকটিভ নাকি? আর সন্ন্যাসীটা কে, সেটা না জানা অবধি তো কিছুই বোঝা যাবে না।'

'কিন্তু কিছু-কিছু জিনিস তো বোঝা যাচ্ছে। যেমন, সন্ন্যাসীটা বাথরুমে ঢুকে আর বেরোল না। এটা তো খুব রিভিলিং।'

'রিভিলিং মানে?'

'রিভিলিং মানে যার থেকে অনেক কিছু বোঝা যায়।'

'এখানে কী বোঝা যাচ্ছে?'

'তুই নিজে বুঝতে পারছিস না?'

'আমি বুঝতে পারছি যে ওয়েটিংরুমের দারোয়ানটা অন্যমনস্ক ছিল।'

'তোর মুন্ডু।'

'তবে?'

'সন্ন্যাসী বেরোলে নিশ্চয় দারোয়ানের চোখে পড়ত।'

'তাহলে? সন্ন্যাসী বেরোয়নি?'

'সন্ন্যাসীর হাতে কী ছিল মনে আছে?'

'আমি তো আর.. ও হ্যাঁ-হ্যাঁ--অ্যাটাচি কেস।'

'সন্ন্যাসীর হাতে অ্যাটাচি কেস দেখেছিস কখনও?'

'তা দেখিনি।'

'সেই তো বলছি। ওটা থেকেই সন্দেহ হয়।'

'কী সন্দেহ হয়?'

'যে, সন্ন্যাসী আসলে সন্ন্যাসী নন। উনি প্যান্ট শার্ট কি ধুতি পাঞ্জাবি পরা আমাদের মতো অ-সন্ন্যাসী, আর সেই পোশাক ছিল ওই অ্যাটাচি কেসে। গেরুয়াটা ছিল ছদ্মবেশ। খুব সম্ভবত দাড়ি-গোঁফটাও।'



'বুঝেছি। সেগুলো ও বাক্সে পুরে নিয়েছে, আর অন্য পোশাক পরে বেরিয়ে এসেছে। তাই দারোয়ান ওকে চিনতে পারেনি।'

'গুড। এইবার মাথা খুলেছে।'

'কিন্তু আজ সকালে তাহলে কে তোমার গায়ে কাগজ ছুঁড়ে মারল?'

'হয় ও নিজেই, না হয় ওর কোনও লোক। স্টেশনের আশেপাশে ঘোরাফেরা করছিল। আমি যে একে-তাকে সন্ন্যাসীর কথা জিগ্যেস করছি, সেটা ও শুনেছিল—আর তাই হুমকি দিয়ে গেল।'

'বুঝেছি। কিন্তু এ ছাড়া আর কোনও রহস্য আছে কি?'

'বাবা, বলিস কী! রহস্যের কোনও শেষ আছে নাকি? শ্রীবাস্তবকে স্ট্যান্ডার্ড গাড়িতে কে ফলো করল? সেও কি ওই সন্ন্যাসী, না অন্য কেউ? গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে চারমিনার আর পান খেতে-খেতে কে ওয়াচ করছিল? পিয়ারিলাল কোন "স্পাই"-এর কথা বলতে চেয়েছিলেন? বনবিহারীবাবু হিংস্র জানোয়ার পোষেন কেন? পিয়ারিলালের ছেলে বনবিহারীবাবুকে আগে কোথায় দেখেছে? সে আংটির ব্যাপার কতখানি জানে?'...

রাত্রে বিছানায় শুয়ে এইসব রহস্যের কথাই ভাবছিলাম। ফেলুদা একটা নীল খাতায় কী যেন সব লিখল। তারপর সাড়ে দশটায় শুয়ে পড়ল, আর শোওয়ার কিছুক্ষণ পরেই জোরে-জোরে নিশ্বাস। বুঝলাম ও ঘুমিয়ে পড়েছে।

দূর থেকে রামলীলার ঢাকের শব্দ ভেসে আসছে। একবার একটা জানোয়ারের ডাক শুনলাম—হয়তো শেয়াল কিংবা কুকুর, কিন্তু হঠাৎ কেন জানি হাইনার হাসি বলে মনে হয়েছিল।

বনবিহারীবাবু যে হিংস্র জানোয়ার পোষেন, তাতে ফেলুদার আশ্চর্য হওয়ার কী আছে? সব সময় কি সব জিনিসের পিছনে লুকোনো কারণ থাকে? অনেকরকম অদ্ভুত-অদ্ভুত শখের কথা তো শুনতে পাওয়া যায়। বনবিহারীবাবুর চিড়িয়াখানাও হয়তো সেইরকমই একটা অদ্ভুত শখের নমুনা।

এইসব ভাবতে-ভাবতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি, আর কখন যে আবার ঘুমটা ভেঙে গেছে তা জানি না। জাগতেই মনে হল চারিদিক ভীষণ নিস্তব্ধ। ঢাকের বাজনা থেমে গেছে, কুকুর শেয়াল কিচ্ছু ডাকছে না। খালি ফেলুদার জোরে-জোরে নিশ্বাস ফেলার শব্দ, আর মাথার পিছনে টেবিলের ওপর রাখা টাইম পিসটার টিকটিক শব্দ। আমার চোখটা পায়ের দিকের জানালায় চলে গেল।

জানালা দিয়ে রোজ রাত্রে দেখেছি আকাশ আর আকাশের তারা দেখা যায়। আজ দেখি আকাশের অনেকখানি ঢাকা। একটা অন্ধকার মতো কী যেন জানালার প্রায় সমস্তটা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ঘুমের ঘোরটা পুরো কেটে যেতেই বুঝতে পারলাম সেটা একটা মানুষ। জানালার গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে আমাদেরই ঘরের ভেতর দেখছে।

যদিও ভয় করছিল সাংঘাতিক, তবু লোকটার দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারলাম না। আকাশে তারা অল্প-অল্প থাকলেও ঘরের ভেতর আলো নেই, তাই লোকটার মুখ দেখা অসম্ভব। কিন্তু এটা বুঝতে পারছিলাম যে তার মুখের নীচের দিকটা—মানে নাক থেকে থুতনি অবধি—একটা কালো কাপড়ে ঢাকা।

এবার দেখলাম লোকটা ঘরের ভেতর হাত ঢুকিয়েছে, তবে শুধু হাত নয়, হাতে একটা লম্বা ডান্ডার মতো জিনিস রয়েছে।

একটা মিষ্টি অথচ কড়া গন্ধ এইবার আমার নাকে এল। একে ভয়েতেই প্রায় দম-বন্ধ হয়ে আসছিল, এখন হাত-পাও কীরকম যেন অবশ হয়ে আসতে লাগল।

আমার মনে যত জোর আছে, সবটা একসঙ্গে করে, শরীরটা প্রায় একদম না নাড়িয়ে, আমার বাঁ-হাতটা আমার পাশেই ঘুমন্ত ফেলুদার দিকে এগিয়ে দিলাম।

আমার চোখ কিন্তু জানালার দিকে। লোকটা এখনও হাতটা বাড়িয়ে রয়েছে, গন্ধটা বেড়ে চলেছে, আমার মাথা ভোঁ-ভোঁ করছে।

আমার হাতটা ফেলুদার কোমরে ঠেকল। আমি একটা ঠেলা দিলাম। ফেলুদা একটু নড়ে উঠল। নড়তেই ক্যাঁচ করে খাটের একটা শব্দ হল। আর সেই শব্দ হতেই জানালার লোকটা হাওয়া।

ফেলুদা ঘুমো-ঘুমো গলায় বলল, 'খোঁচা মারছিস কেন?'

আমি শুকনো গলায় কোনওরকমে ঢোক গিলে বললাম, 'জানালায়।'

'কে জানালায়? ইস—গন্ধ কীসের?'—বলেই ফেলুদা একলাফে উঠে জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর কিছুক্ষণ একদৃষ্টে বাইরের দিকে চেয়ে থেকে ফিরে এসে বলল, 'কী দেখলি ঠিক করে বল তো।'

আমি তখনও প্রায় কাঠের মতো পড়ে আছি। কোনওমতে বললাম, 'একটা লোক...হাতে ডান্ডা...ঘরের ভেতর—'

'হাত বাড়িয়েছিল?'

'হ্যাঁ।'

'বুঝেছি। লাঠির ডগায় ক্লোরোফর্ম ছিল। আমাদের অজ্ঞান করবার তালে ছিল।'

'কেন?'

'বোধহয় আরেক আংটি-চোর। ভাবছে এখনও আংটি এখানেই আছে। যাকগে—তুই এ ব্যাপারটা আর বাবা-কাকাকে বলিস না। মিথ্যে নার্ভাস-টার্ভাস হয়ে আমার কাজটাই ভেস্তে দেবে।'

পরদিন সকালে বাবা আর ধীরুকাকা দুজনেই বললেন যে আর বিশেষ কোনও গোলমাল হবে বলে মনে হচ্ছে না। আংটি উদ্ধারের ভার পুলিশের ওপর দিয়ে দেওয়া হয়েছে, ইন্সপেক্টর গরগরি কাজ শুরু করে দিয়েছেন।

পুলিশে আংটি খুঁজে পেলে ফেলুদার ওপর টেক্কা দেওয়া হবে, আর তাতে ফেলুদার মনে লাগবে, এই ভেবে আমি মনে-মনে প্রার্থনা করলাম পুলিশ যেন কোনওমতেই আংটি খুঁজে না পায়। সে ক্রেডিটটা যেন ফেলুদারই হয়।

বাবা বললেন, 'আজ তোদের আবও কয়েকটা জায়গা দেখিয়ে আনব ভাবছি।'

ঠিক হল দুপুরে খাওয়ার পর বেরোনো হবে। কোথায় যাওয়া হবে সেটা ঠিক করে দিলেন বনবিহারীবাবু।

আমরা সবে খেয়ে উঠেছি, এমনসময় বনবিহারীবাবু এসে হাজির। বললেন, 'আপনাদের বাড়িতে দিনে ডাকাতির খবর পেয়ে চলে এলাম। একটা ভালো দেখে হাউন্ড পুষলে এ-কেলেঙ্কারি হত না। সাধুবাবার উদ্দেশ্য সাধু না অসাধু, সেটা বুঝতে একটা ওয়েল-ট্রেনড জেতো হাউন্ডের লাগত ঠিক পাঁচ সেকেন্ড। যাক, চোর পালানোর পর আর বুদ্ধি দিয়ে কী হবে বলুন।'

বনবিহারীবাবু সঙ্গে কাগজে মোড়া পান নিয়ে এসেছিলেন। বললেন, 'লখ্‌নৌ শহরের বেস্ট পান। খেয়ে দেখুন। এক বেনারস ছাড়া কোথাও পাবেন না এ জিনিস।'

আমি মনে-মনে ভাবছি, বনবিহারীবাবু যদি বেশিক্ষণ থাকেন তাহলে আমাদের বাইরে যাওয়া ভেস্তে যাবে, এমনসময় উনি নিজেই বললেন, 'বাড়িতে থাকছেন, না বেরোচ্ছেন?'

বাবা বললেন, 'ভেবেছিলাম এদের নিয়ে একটা কিছু দেখিয়ে আনব। ইমামবড়া ছাড়া তো আর কিছুই দেখা হয়নি এখনও।'

'রেসিডেন্সি দেখনি এখনও?' প্রশ্নটা আমাকেই করলেন ভদ্রলোক। আমি মাথা নেড়ে না বললাম।

'চলো—আমার মতো গাইড পাবে না। মিউটিনি সম্বন্ধে আমার থরো নলেজ আছে।'

তারপর ধীরুকাকার দিকে ফিরে বললেন, 'আমার কেবল একটা জিনিস জানার কৌতূহল হচ্ছে। আংটিটা কোত্থেকে গেল। সিন্দুকে রেখেছিলেন কি?'

ধীরুকাকা বললেন, 'সিন্দুক আমার নেই। একটা গোদরেজের আলমারি খুলে নিয়ে গেছে। চাবি অবিশ্যি আমার পকেটেই ছিল। বোধহয় ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে খুলেছে।'

'শুনলাম বাক্সটা নাকি রেখে গেছে?'

'হ্যাঁ।'

'ভেরি স্ট্রেঞ্জ! বাক্স দেরাজে ছিল?'

'হ্যাঁ।'

'দেবাজ ভালো কবে খুঁজে দেখেছেন তো?'

'তন্নতন্ন কবে।'

'কিন্তু একটা জিনিস তো কবতে পাবেন। আলমারির হাতলে, বাক্সটাব গায়ে ফিঙ্গাব প্রিন্ট আছে কি না সেটা তো .'

'থাকলে সবচেয়ে বেশি থাকবে আমারই আঙুলের ছাপ। ওতে সুবিধে হবে না।'

বনবিহারীবাবু মাথা নেড়ে বললেন, 'খাসা লোক ছিলেন বাবা পিয়ারিলাল। আংটিটা ইনসিওব পর্যন্ত কবেননি। আর যাঁকে দিয়ে গেলেন তিনিও অবিশ্যি তথৈবচ। যাক—হাড়েব ডাক্তাবের এবাব হাড়ে-হাড়ে শিক্ষা হয়েছে।'

এবার আর আমাদের টাঙ্গায় যাওয়া হল না। বনবিহাবীবাবুব গাড়িতেই সবাই উঠে পডলাম। ফেলুদা আর আমি সামনে ড্রাইভারের পাশে বসলাম।

ক্লাইভ রোড দিয়ে যখন যাচ্ছি, তখন বনবিহারীবাবু আমাদের দুজনকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'তোমরা এখানে এসে এমন একটা রহস্যেব ব্যাপারে জড়িয়ে পডবে ভেবেছিলে কি?'

আমি মাথা নেড়ে না বললাম। ফেলুদা খালি হিঃ-হিঃ করে একটু হাসল।

বাবা বললেন, 'ফেলুবাবুব অবিশ্যি পোয়া বারো, কাবণ ওর এসব ব্যাপাবে খুব ইন্টারেস্ট। ও হল যাকে বলে শখেব ডিটেকটিভ।'

'বটে?'

বনবিহাবীবাবু যেন খবরটা শুনে খুবই অবাক আর খুশি হলেন। বললেন, 'ব্রেনের ব্যায়ামেব পক্ষে ওটা খুব ভালো জিনিস। তা, রহস্যের কিছু কিনারা করতে পারলে ফেলুবাবু?'

ফেলুদা বলল, 'এ তো সবে শুরু।'

'অবিশ্যি তুমি কোন বহস্যের কথা ভাবছ জানি না। আমার কাছে অনেক কিছুই রহস্যজনক।'

ধীরুকাকা বললেন, 'কীরকম?'

'এই যেমন ধরুন—সন্ন্যাসী গোদরেজের আলমারির চাবি পেল কোত্থেকে। তাবপর বাড়িতে চাকব বাকর থাকতে সে-সন্ন্যাসীব এত সাহসই বা হবে কোত্থেকে যে সে একেবাবে আপনার বেডরুমে গিয়ে ঢুকবে। তাছাড়া একটা ব্যাপার তো অনেকদিন থেকেই খটকা লেগে আছে।'

ধীরুকাকা বললেন, 'কী ব্যাপাব?'

'শ্রীবাস্তবকে সত্যিই পিয়াবিলাল আংটি দিয়েছিলেন, না শ্রীবাস্তব সেটা অন্যভাবে—'

ধীরুকাকা বাধা দিয়ে বললেন, 'সে কি মশাই, আপনি কি শ্রীবাস্তবকেও সন্দেহ কবেন নাকি?'

'সন্দেহ তো প্রত্যেককেই করতে হবে—এমনকী আমাকে আপনাকেও—তাই নয় কি ফেলুবাবু?'

ফেলুদা বলল, 'নিশ্চয়ই। আর যেদিন সন্ন্যাসী আমাদের বাড়ি এসেছিলেন, সেদিন তো শ্রীবাস্তবও এসেছিলেন—ওই বিকেলেই। তারপর আমাদের না পেয়ে বনবিহারীবাবুর বাড়িতে এলেন।'

'এগজ্যাক্টলি!' বনবিহারীবাবু যেন রীতিমতো উত্তেজিত হয়ে উঠলেন।

এবারে বাবা যেন বেশ থতমত খেয়েই বললেন, 'কিন্তু শ্রীবাস্তব যদি অসদুপায়ে আংটি পেয়ে

থাকেন, তাহলে তিনি সেটা আমাদের কাছে রাখবেনই বা কেন, আর রেখে সেটা চুরিই বা করবেন কেন?'

বনবিহারীবাবু হো-হো করে হেসে উঠে বললেন, 'বুঝলেন না? অত্যন্ত সহজ। শ্রীবাস্তবের পেছনে সত্যিই ডাকাত লেগেছিল। ভীতু মানুষ—তাই ভয় পেয়ে আংটিটা আপনাদের কাছে এনে রেখেছিলেন। এদিকে লোভও আছে ষোলো আনা, তাই তিনি নিজেই আবার সেটা চুরি করে চোরদের ধাপ্পা দিয়ে এক ঢিলে দুই পাখি মেরেছেন।'

আমার মাথার মধ্যে সব কেমন জানি গণ্ডগোল হয়ে যাচ্ছিল। শ্রীবাস্তবের মতো এত ভালোমানুষ হাসিখুশি লোক, তিনি কখনও চোর হতে পারেন? ফেলুদাও কি বনবিহারীবাবুর সঙ্গে একমত, নাকি বনবিহারীবাবুর কথাতেই ওর প্রথম শ্রীবাস্তবের ওপর সন্দেহ পড়েছে?'

বনবিহারীবাবু বললেন, 'শ্রীবাস্তব অমায়িক লোক তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু একবার ভেবে দেখুন—লখ্‌নৌ-এর মতো জায়গা—এমন আর কি—সেখানে স্রেফ হাড়ের ব্যারামের চিকিৎসা করে এত বড় বাড়ি গাড়ি বাগান আসবাবপত্র—ভাবতে একটু ইয়ে লাগে না কি?'

ধীরুকাকা বললেন, 'ওর বাপের হয়তো টাকা ছিল।'

বনবিহারীবাবু বললেন, 'বাপ ছিলেন এলাহাবাদ পোস্ট আপিসের সামান্য কেরানি।'

এই সময় ফেলুদা হঠাৎ একটা বাজে প্রশ্ন করে বসল—

'আপনার কোনও জানোয়ার কখনও আপনাকে কামড়েছে কি?'

'নো নেভার।'

'তাহলে আপনার ডানহাতের কবজিতে ওই দাগটা কী?'

'ও হো-হো—বাঃ-বাঃ, তুমি তো খুব ভালো লক্ষ করেছ—কারণ ও দাগটা সচরাচর আমার আস্তিনের ভেতরেই থাকে। ওটা হয়েছিল ফেনসিং করতে গিয়ে। ফেনসিং বোঝো?'

ফেলুদা কেন—আমিও জানতাম ফেনসিং কাকে বলে। রেপিয়ার বলে একরকম সরু লম্বা তলোয়ার দিয়ে খেলাকে বলে ফেনসিং।

'ফেনসিং করতে গিয়ে হাতে খোঁচা খাই। এটা সেই খোঁচার দাগ।'

রেসিডেন্সিটা সত্যিই একটা দেখবার জিনিস। প্রথমত জায়গাটা খুব সুন্দর। চারিদিকে বড়-বড় গাছপালা—তার মাঝখানে এখানে ওখানে এক-একটা মিউটিনির আমলের সাহেবদের ভাঙা বাড়ি। গাছগুলোর ডালে দেখলাম ঝাঁকে-ঝাঁকে বাঁদর। লখ্‌নৌ শহরের বাঁদরের কথা আগেই শুনেছি, এবার নিজের চোখে তাদের কাণ্ডকারখানা দেখলাম।

কতকগুলো রাস্তার ছেলে গুলতি দিয়ে বাঁদরগুলোর দিকে তাক করে ইট মারছিল—বনবিহারীবাবু তাদের কষে ধমক দিলেন। তারপর আমাদের বললেন, 'জন্তুজানোয়ারের ওপর দুর্ব্যবহারটা আমি সহ্য করতে পারি না। আমাদের দেশেই এ-জিনিসটা সবচেয়ে বেশি দেখা যায়।'

ইতিহাসে সিপাহী বিদ্রোহের কথা পড়েছি, রেসিডেন্সি দেখার সময় সেই বইয়ে পড়া ঘটনাগুলো চোখের সামনে ভেসে উঠল।

একটা বড় বাড়ির ভেতর আমরা ঘুরে-ঘুরে দেখছি, আর বনবিহারীবাবু বর্ণনা দিয়ে চলেছেন—

'সেপাই মিউটিনির সময় লখ্‌নৌ শহরে নবাবদেরই রাজত্ব। ব্রিটিশরা তাদের সৈন্য রেখেছিল এই বাড়িটার ভেতরেই। স্যার হেনরি লরেন্স ছিলেন তাদের সেনাপতি। বিদ্রোহ লাগল দেখে প্রাণের ভয়ে লখ্‌নৌ শহরের যত সাহেব মেমসাহেব একটা হাসপাতালের ভেতর গিয়ে আশ্রয় নিল। ক'দিন

খুব লড়েছিলেন স্যার হেনরি, কিন্তু আর শেষটায় পেরে উঠলেন না। সেপাই-এর গুলিতে তাঁর মৃত্যু হল। আর তার পরে ব্রিটিশদের কী দশা হল সেটা এই বাড়ির চেহারা দেখেই কিছুটা আন্দাজ করতে পারছ। স্যার কলিন ক্যাম্পবেল যদি শেষটায় টাটকা সৈন্য সামন্ত নিয়ে না-এসে পড়তেন, তাহলে ব্রিটিশদের দফারফা হয়ে যেতো।...এ ঘরটা ছিল বিলিয়ার্ড খেলার ঘর। দেওয়ালে সেপাইদের গোলা লেগে কী অবস্থা হয়েছে দেখ।'

বাবা আর ধীরুকাকা আগেই রেসিডেন্সি দেখেছেন বলে মাঠে পায়চারি করছিলেন। আমি আর ফেলুদাই তন্ময় হয়ে বনবিহারীবাবুর কথা শুনছিলাম। আর দুশো বছরের পুরোনো পাতলা অথচ মজবুত ইটের তৈরি ব্রিটিশদের ঘরবাড়ির ভগ্নাবশেষ দেখছিলাম, এমন সময় ঘরের দেওয়ালের একটা ফুটো দিয়ে হঠাৎ কী একটা জিনিস তীরের মতো এসে ফেলুদার কান ঘেঁষে ধাঁই করে পিছনের দেওয়ালে লেগে মাটিতে পড়ল। চেয়ে দেখি সেটা একটা পাথরের টুকরো।

তার পরমুহূর্তেই বনবিহারীবাবু একটা হ্যাঁচকা টানে ফেলুদাকে তাঁর দিকে টেনে নিলেন, আর ঠিক সেই সময় আরেকটা পাথব এসে আবার ঘরের দেওয়ালে লেগে মাটিতে পড়ল। পাথরগুলো যে গুলতি দিয়ে মারা হয়েছে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

বনবিহারীবাবুর বয়স হলেও এখনও যে কত চটপটে সেটা এবার বেশ বুঝতে পারলাম। উনি এক লাফে দেওয়ালের একটা বড় গর্তের ভেতর দিয়ে গিয়ে বাইরের ঘাসে পড়লেন। আমি আর ফেলুদাও অবিশ্যি তক্ষুনি লাফিয়ে গিয়ে ওঁর কাছে পৌঁছলাম। আর গিয়েই দেখলাম যে-দিক দিয়ে পাথর এসেছে, সেই দিকে বেশ খানিক দূরে, একটা লাল ফেজটুপি আব কালো কোট পরা দাড়িওয়ালা লোক দৌড়ে পালাচ্ছে।

ফেলুদা আর এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে সোজা লোকটার দিকে ছুটল। আমি ফেলুদার পিছনে-পিছনে যাব বলে পা বাড়িয়েছিলাম, কিন্তু বনবিহারীবাবু আমার জামার আস্তিনটা ধরে বললেন, 'তুমি এখনও স্কুলবয় তপেশ; তোমার এসব গোলমালেব মধ্যে না যাওয়াই ভালো।'

কিছুক্ষণ পরে ফেলুদা ফিরে এল। বনবিহারীবাবু বললেন, 'ধবতে পারলে?'

ফেলুদা. বলল, 'নাঃ। অনেকটা ডিসট্যান্স। একটা কালো স্ট্যান্ডার্ড গাড়িতে উঠে ভেগেছে লোকটা।'

বনবিহারীবাবু চাপা গলায় বললেন 'স্কাউন্ড্রেল। তারপর আমাদের দুজনের পিঠে হাত দিয়ে বললেন, 'চলো—আর এখানে থাকা ঠিক হবে না।'

একটু এগিয়ে গিয়ে বাবা আর ধীরুকাকার সঙ্গে দেখা হল। বাবা বললেন, 'ফেলু এত হাঁপাচ্ছ কেন?'

বনবিহারীবাবু বললেন, 'ওর বোধহয় গোয়েন্দাগিরিটা বেশি না করাই ভালো। মনে হচ্ছে ওর পেছনে গুন্ডা লেগেছে।'

বাবা আর ধীরুকাকা দুজনেই ঘটনাটা শুনে বেশ ঘাবড়ে গেলেন।

তখন বনবিহারীবাবু হাসতে-হাসতে বললেন, 'চিন্তা করবেন না। আমি রসিকতা কবছিলাম। আসলে পাথরগুলো আমাকেই লক্ষ করে মারা হয়েছিল। ওই যে ছোকরাগুলোকে তখন ধমক দিলুম এ হচ্ছে তারই প্রতিশোধ।'

তারপর ফেলুদার দিকে ঘুরে বললেন, 'তবে তাও বলছি ফেলুবাবু, তোমারও বয়সটা কাঁচাই। বিদেশ-বিভুঁয়ে একটা গোলমালে জড়িয়ে পড়বে সেটা কি খুব ভালো হবে? এবার থেকে একটু খেয়াল করে চলো।'

কথাটা শুনে ফেলুদা চুপ করে রইল।

গাড়ির দিকে হাঁটার সময় দুজনে একটু পিছিয়ে পড়েছিলাম—সেই সুযোগে ফেলুদাকে ফিস-ফিস করে বললাম, 'পাথরটা তোমাকে মারছিল, না ওঁকে?'

ফেলুদা দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'ওঁকে মারলে কি উনি চুপ করে থাকতেন নাকি? হল্লা-টল্লা করে রেসিডেন্সির বাকি ইট ক'টা খসিয়ে দিতেন না?'

'আমারও তাই মনে হয়।'

'তবে একটা জিনিস পেয়েছি। লোকটা পালানোর সময় ফেলে গিয়েছিল।'

'কী জিনিস?'

ফেলুদা পকেট থেকে একটা কালো জিনিস বের করে দেখাল। ভালো করে দেখে বুঝলাম সেটা একটা নকল গোঁফ, আর তাতে এখনও শুকনো আঠা লেগে রয়েছে।

গোঁফটা আবার পকেটে রেখে ফেলুদা বলল, 'পাথরগুলো যে আমাকেই মারা হয়েছে, সেটা ভদ্রলোক খুব ভালোভাবেই জানেন।'

'তাহলে বললেন না কেন?'

'হয় আমাদের নার্ভাস করতে চান না, আর না হয়...'

'না হয় কী?'

ফেলুদা উত্তরের বদলে মাথা ঝাঁকিয়ে একটা তুড়ি মেরে বলল, 'কেসটা জমে আসছে রে তোপ্‌সে। তুই এখন থেকে আর আমাকে একদম ডিস্টার্ব করবি না।'

বাকি দিনটা ও আর একটাও কথা বলেনি আমার সঙ্গে। বেশির ভাগ সময় বাগানে পায়চারি করেছে, আর বাকি সময়টা ওর নীল নোটবইটাতে হিজিবিজি কী সব লিখেছে। ও যখন বাগানে ঘুরছিল, তখন আমি একবার লুকিয়ে-লুকিয়ে বইটা খুলে দেখেছিলাম, কিন্তু একটা অক্ষরও পড়তে পারিনি, কারণ সেরকম অক্ষর এর আগে আমি কখনও দেখিনি।

৬

টাঙ্গায় উঠে ফেলুদা গাড়োয়ানকে বলল, 'হজরতগঞ্জ।'

আমি বললাম, 'সেটা আবার কোন জায়গা?'

এখানকার চৌরঙ্গি। শুধু নবাবি আমলের জিনিস ছাড়াও তো শহরে দেখবার জিনিস আছে। আজ একটু দোকান-টোকান ঘুরে দেখব।'

গতকাল রেসিডেন্সি থেকে আমরা বনবিহারীবাবুর বাড়িতে কফি খেতে গিয়েছিলাম। সেই সুযোগে ওঁর চিড়িয়াখানাটাও আরেকবার দেখে নিয়েছিলাম। সেই হাইনা, সেই র‍্যাট্‌ল স্নেক, সেই মাকড়সা, সেই বনবেড়াল, সেই কাঁকড়া বিছে।

বৈঠকখানায় বসে কফি খেতে-খেতে ফেলুদা একটা দরজার দিকে দেখিয়ে বলল, 'ও দরজাটায় সেদিনও তালা দেখলাম, আজও তালা।'

বনবিহারীবাবু বললেন, 'হ্যাঁ—ওটা একটা একস্ট্রা ঘর। এসে অবধি তালা লাগিয়ে রেখেছি। খোলা রাখলেই ঝাড়পোঁছের হাঙ্গামা এসে যায়, বুঝলে না!'

ফেলুদা বলল, 'তাহলে তালাটা নিশ্চয়ই বদল করা হয়েছে, কারণ এটায় তো মরচে ধরেনি।'

বনবিহারীবাবু ফেলুদার দিকে একটু হাসি-হাসি অথচ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ—এর আগেরটায় এত বেশি মরচে ধরেছিল যে ওটা বদলাতে বাধ্য হলাম।'

বাবা বললেন, 'আমরা ভাবছিলাম হরিদ্বার লছমনঝুলাটা এই ফাঁকে সেরে আসব।'

বনবিহারীবাবু পাইপ ধরিয়ে একটা লম্বা টান দিয়ে কড়া গন্ধওয়ালা ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 'কবে যাবেন? পরশু যদি যান তো আমিও আসতে পারি আপনাদের সঙ্গে। আমার এমনিতেই সেই বারো ফুট অজগর সাপটা দেখার জন্য একবার যাওয়া দরকার। আর ফেলুবাবুও যেভাবে গোয়েন্দাগিরি



শুরু করেছেন, কয়েকদিনের জন্য শহর ছেড়ে কোথাও যেতে পারলে বোধহয় সকলেরই মঙ্গল।'

ধীরুকাকা বললেন, 'আমার তো শহর ছেড়ে যাওয়ার উপায় নেই। তোমরা ক'জন ঘুরে এসো না। ফেলু তপেশ দুজনেরই লছমনঝুলা না-দেখে ফিরে যাওয়া উচিত হবে না।'

বনবিহারীবাবু বললেন, 'আমার সঙ্গে গেলে আপনাদের একটা সুবিধে হবে—আমার চেনা ধরমশালা আছে, এমনকী হরিদ্বার থেকে লছমনঝুলা যাওয়ার গাড়ির ব্যবস্থাও আমি চেনাশুনার মধ্যে থেকে করে দিতে পারব। এখন আপনারা ব্যাপারটা ডিসাইড করুন।'

ঠিক হল পরশু শুক্রবারই আমরা রওনা দেব। দুদিন আগে যদি বনবিহারীবাবু বলতেন আমাদের সঙ্গে যাবেন, তাহলে আমার খুব ভালোই লাগত। কিন্তু আজ বিকেলে রেসিডেন্সির ঘটনার পর থেকে আমার লোকটা সম্বন্ধে মনে একটা কীরকম খটকা লেগে গেছে। তবুও যখন দেখলাম ফেলুদার খুব একটা আপত্তি নেই, তখন আমিও মনটাকে যাওয়ার জন্য তৈরি করে নিলাম।

আজ সকালে উঠে ফেলুদা বলল, 'দাড়ি কামাবার ব্লেড ফুরিয়ে গেছে—ওখানে গিয়ে মুশকিলে পড়ে যাব। চল্ ব্লেড কিনে আনিগে।'

তাই দুজনে টাঙ্গা করে বেরিয়েছি। হজরতগঞ্জে নাকি সব কিছুই পাওয়া যায়।

কাল থেকেই দেখছি ফেলুদা আংটি নিয়ে আর কিছুই বলছে না। আজ সকালে ও যখন স্নান করতে গিয়েছিল, তখন আমি আরেকবার ওর নোটবইটা খুলে দেখেছিলাম, কিন্তু পড়তে পারিনি। অক্ষরগুলোর এক-একটা ইংরিজি মনে হয়, কিন্তু বেশির ভাগই অচেনা।

গাড়িতে যেতে-যেতে আর কৌতূহল চেপে রাখতে না পেরে ফেলুদাকে জিগ্যেস করে ফেললাম।

ও প্রথমে লুকিয়ে ওর খাতা দেখার জন্য দারুণ রেগে গেল। বলল, 'এটা তুই একটা জঘন্য কাজ করেছিস। তোকে প্রায় ক্রিমিন্যাল বলা যেতে পারে।'

তারপর একটু নরম হয়ে বলল, 'তোর পক্ষে ওটা পড়ার চেষ্টা করা বৃথা, কারণ ও অক্ষর তোর জানা নেই।'

'কী অক্ষর ওটা?'

'গ্রিক।'

'ভাষাটাও গ্রিক?'

'না।'

'তবে?'

'ইংরিজি।'

'তা তুমি গ্রিক অক্ষর শিখলে কী করে?'

'সে অনেকদিনের শেখা। ফার্স্ট-ইয়ারে থাকতে। আল্ফা বিটা গামা ডেল্টা পাই মিউ এপসাইলন—এসব তো অঙ্কতেই শিখেছি, আর বাকিগুলো শিখে নিয়েছিলাম এন্‌সাইক্লোপিডিয়া ব্রিট্যানিকা থেকে। ইংরিজি ভাষাটা গ্রিক অক্ষরে লিখলে বেশ একটা সাংকেতিক ভাষা হয়ে যায়। এমনি লোকের কারুর সাধ্য নেই যে পড়ে।'

'লখ্‌নৌ বানান কী হবে গ্রিকে?'

'ল্যাম্‌ডা উপসাইলন কাপা নিউ ওমিক্রন উপসাইলন। C আর W-টা গ্রিকে নেই, তাই বানানটা হচ্ছে L-U-K-N-O-U ।'

'আর ক্যালকাটা বানান?'

'কাপা আল্ফা ল্যাম্‌ডা কাপা উপসাইলন টাউ-টাউ আল্ফা।'

'বাসরে বাস। তিনটে বানান করতেই পিরিয়ড কাবার।'

চৌরঙ্গি বললে অবিশ্যি বাড়িয়ে বলা হবে—কিন্তু হজরতগঞ্জের দোকান-টোকানগুলো বেশ ভালোই দেখতে।

টাঙ্গার ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে ফেলুদা আর আমি হাঁটতে আরম্ভ করলাম।

'ওই তো মনিহারি দোকান ফেলুদা—ওখানে নিশ্চয়ই ব্লেড পাওয়া যাবে।'

'দাঁড়া, আগে একটা অন্য কাজ সেরে নিই।'

আরও কিছুদূর গিয়ে ফেলুদা হঠাৎ একটা দোকান দেখে সেটার দিকে এগিয়ে গেল। দোকানের সামনে লাল সাইনবোর্ডে সোনালি উঁচু-উঁচু অক্ষরে লেখা আছে—

MALKANI & CO.
ANTIQUE & CURIO DEALERS

কাচের মধ্যে দিয়ে দোকানের ভেতরটা দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম সেটা সব পুরোনো আমলের জিনিসের দোকান। ঢুকে দেখি হরেকরকমের পুরোনো জিনিসে দোকানটা গিজ-গিজ করছে—গয়নাগাটি, কার্পেট, ঘড়ি, চেয়ার, টেবিল, ঝাড়লণ্ঠন, বাঁধানো ছবি আর আরও কত কী।

পাকাচুলওয়ালা সোনার চশমা পরা একজন বুড়ো ভদ্রলোক আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন।

ফেলুদা বলল, 'বাদশাদের আমলের গয়নাগাটি কিছু আছে আপনাদের এখানে?'

'গয়না তো নেই। তবে মুগল আমলের ঢাল তলোয়ার জাজিম বর্ম, এইসব কিছু আছে। দেখাব?'

ফেলুদা একটা কাচের আতরদান হাতে নিয়ে দেখতে-দেখতে বলল, 'পিয়ারিলালের কাছে কিছু মুগল আমলের গয়না দেখেছিলাম। তিনি তো আপনার খুব বড় খদ্দের ছিলেন, তাই না?'

ভদ্রলোক যেন অবাক হলেন।

'বড় খদ্দের? কোন পিয়ারিলাল?'

'কেন—পিয়ারিলাল শেঠ, যিনি কিছুদিন আগে মারা গেলেন।'

মালকানি মাথা নেড়ে বললেন, 'আমার কাছ থেকে কখনই কিছু কেনেননি তিনি, আর আমার চেয়ে বড় দোকান এখানে আর নেই।'

'আই সি। তাহলে বোধহয় যখন কলকাতায় ছিলেন তখন কিনেছিলেন।'

'তাই হবে।'

'এখানে বড় খদ্দের বলতে কাকে বলেন আপনি?'

মালকানির মুখ দেখে বুঝলাম বড় খদ্দের তাঁর খুব বেশি নেই। বললেন, 'বিদেশি টুরিস্ট এসে মাঝে-মাঝে ভালো জিনিস ভালো দামে কিনে নিয়ে যায়। এখানের খদ্দের বলতে মিস্টার মেহতা আছেন, মাঝে-মাঝে এটা সেটা নেন, আর মিস্টার পেস্টনজি আমার অনেকদিনের খদ্দের—সেদিন তিন হাজার টাকায় একটা কার্পেট কিনে নিয়ে গেছেন—খাস ইরানের জিনিস।'

ফেলুদা হঠাৎ একটা হাতির দাঁতের তৈরি নৌকোর দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, 'ওটা বাংলা দেশের জিনিস না?'

'হ্যাঁ, মুরশিদাবাদ।'

'দেখেছিস তোপ্‌সে—বজরাটা কেমন বানিয়েছে।'

সত্যি, এত সুন্দর হাতির দাঁতের কাজ করা নৌকো আমি কখনও দেখিনি। বজরার ছাতে শামিয়ানার তলায় নবাব বসে গড়গড়া টানছেন, তাঁর দুপাশে পাত্রমিত্র সভাসদ সব বসে আছে, আর সামনে নাচগান হচ্ছে। ষোলোজন দাঁড়ি দাঁড় বাইছে, আর একটা লোক হাল ধরে বসে আছে। তাছাড়া সেপাই বরকন্দাজ সব কিছুই আছে, আর সব কিছুই এত নিখুঁতভাবে করা হয়েছে যে দেখলে তাক লেগে যায়।

ফেলুদা বলল, 'এটা কোত্থেকে পেলেন?'

'ওটা বেচলেন মিস্টার সরকার।'

'কোন মিস্টার সরকার?'

'মিস্টার বি সরকার—যিনি বাদশানগরে থাকেন। উনি মাঝে-মাঝে এটা সেটা কিনে নিয়ে যান। ভালো জিনিস আছে ওঁর কাছে।'

'আই সি। ঠিক আছে। থ্যাঙ্ক ইউ। আপনার দোকান ভারি ভালো লাগল। গুড ডে।'

'গুড ডে, স্যার।'

বাইরে এসে ফেলুদা বলল, 'বনবিহারী সরকারের তাহলে এসব দোকানে যাতায়াত আছে। অবিশ্যি সে সন্দেহটা আমার আগেই হয়েছিল।'

'কিন্তু উনি যে বলেছিলেন এসব ব্যাপারে ওঁর কোনও ইন্টারেস্ট নেই।'

'ইন্টারেস্ট না থাকলে পাথর দেখেই কেউ বলতে পারে সেটা আসল কি নকল?'

মালকানি ব্রাদার্সের সামনে দেখি এম্পায়ার বুক স্টল বলে একটা বইয়ের দোকান। ফেলুদা বলল ওর হরিদ্বার লছমনঝুলা সম্বন্ধে একটা বই কেনা দবকার, তাই আমরা দোকানটায় ঢুকলাম, আর ঢুকেই দেখি পিয়ারিলালের ছেলে মহাবীর।

ফেলুদা ফিসফিস করে বলল, 'ক্রিকেটের বই কিনছে। ভেরি গুড।'

মহাবীব আমাদেব দিকে পিঠ কবে দাঁড়িয়ে বই কিনছিল তাই আমাদের দেখতে পাযনি।

ফেলুদা দোকানদারের দিকে এগিয়ে গিয়ে বলল, 'নেভিল কার্ডাসের কোনও বই আছে আপনাদের?'

বলতেই মহাবীর ফেলুদার দিকে ফিরে তাকাল। আমি জানতাম নেভিল কার্ডাস ক্রিকেট সম্বন্ধে খুব ভালো-ভালো বই লিখেছে।

দোকানদার বলল, 'কোন বইটা খুঁজছেন বলুন তো?'

'Centuries বইটা আছে?'

'আজ্ঞে না—তবে অন্য বই দেখাতে পারি।'

মহাবীর মুখে হাসি নিয়ে ফেলুদার দিকে এগিয়ে এসে বলল, 'আপনার বুঝি ক্রিকেটে ইন্টাবেস্ট?'

'হ্যাঁ। আপনাবও দেখছি.'

মহাবীর তার হাতের বইটা ফেলুদাকে দেখিয়ে বলল, 'এটা আমার অর্ডার দেওয়া ছিল। ব্র্যাডম্যানেব আত্মজীবনী।'

'ওহো—ওটা পড়েছি। দারুণ বই।'

'আপনার কী মনে হয়—রণজি বড় ছিলেন, না ব্র্যাডম্যান?'

দুজনে ক্রিকেটের গল্পে দারুণ মেতে গেল। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে কথা বলার পর মহাবীর বলল, 'কাছেই কোয়ালিটি আছে, আসুন না একটু বসে চা খাই।'

ফেলুদা আপত্তি করল না। আমরা তিনজনে গিয়ে কোয়ালিটিতে ঢুকলাম। ওরা দুজনে চা আর আমি কোকা-কোলা অর্ডার দিলাম। মহাবীর বলল, 'আপনি নিজে ক্রিকেট খেলেন?'

ফেলুদা বলল, 'খেলতাম। স্লো স্পিন বল দিতাম। লখ্‌নৌয়ে ক্রিকেট খেলে গেছি।...আর আপনি।'

'আমি ডুন স্কুলে ফার্স্ট ইলেভেনে খেলেছি। বাবাও স্কুলে থাকতে ভালো খেলতেন।'

পিয়ারিলালের কথা বলেই মহাবীর কেমন জানি গম্ভীর হয়ে গেল।

ফেলুদা চা ঢালতে-ঢালতে বলল, 'আপনি আংটির ঘটনাটা জানেন নিশ্চয়ই।'

'হ্যাঁ। ডক্টর শ্রীবাস্তবের বাড়ি গিয়েছিলাম। উনি বললেন।'

'আপনার বাবার যে আংটি ছিল, আর উনি যে সেটা শ্রীবাস্তবকে দিয়েছিলেন সেটা আপনি জানতেন তো?'

'বাবা আমাকে অনেকদিন আগেই বলেছিলেন যে আমাকে ভালো করে দেওয়ার জন্য শ্রীবাস্তবকে উনি একটা কিছু দিতে চান। সেটা যে কী, সেটা অবিশ্যি আমি বাবা মারা যাওয়ার পর শ্রীবাস্তবের কাছেই জেনেছি।'

তারপর হঠাৎ ফেলুদার দিকে তাকিয়ে মহাবীর বলল, 'কিন্তু আপনি এ ব্যাপারে এত ইন্টারেস্ট নিয়েছেন কেন?'

ফেলুদা একটু হেসে বলল, 'ওটা আমার একটা শখের ব্যাপার।'

মহাবীর চায়ে চুমুক দিয়ে একটু যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল।

ফেলুদা বলল, 'আপনার বাড়িতে আর কে থাকেন?'

'আমার এক বুড়ি পিসিমা আছেন, আর চাকর-বাকর।'

'চাকর-বাকর কি পুরোনো?'

'সবাই আমার জন্মের আগে থেকে আছে। অর্থাৎ কলকাতায় থাকার সময় থেকে। প্রীতম সিং বেয়ারা আছে আজ পঁয়ত্রিশ বছর।'

'আংটির মতো আর কোনও জিনিস আপনার বাবার কাছে ছিল?'

'বাবার এ-শখটার কথা আমি প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। এটা অনেক দিন আগের ব্যাপার। তখন আমি খুবই ছোট। এবার এসে এই সেদিন বাবার একটা সিন্দুক খুলেছিলাম, তাতে বাদশাহী আমলের আরও কিছু জিনিস পেয়েছি। তবে আংটির মতো অত দামি বোধহয় আর কোনওটা নয়।'

আমি 'স্ট্র' দিয়ে আমার ঠান্ডা কোকা-কোলায় চুমুক দিলাম। মহাবীর একটুক্ষণ চুপ করে থেকে গলাটা একটু নামিয়ে নিয়ে বলল, 'প্রীতম সিং একটা অদ্ভুত কথা বলেছে আমাকে।'

ফেলুদা চুপ করে অপেক্ষা করত লাগল। রেস্টুরেন্টের চারিদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে ফেলুদার দিকে একটু ঝুঁকে পড়ে মহাবীর বলল, 'বাবার যেদিন দ্বিতীয় বার হার্ট অ্যাট্যাক হল, সেদিন সকালে অ্যাট্যাকটা হওয়ার কিছু আগেই প্রীতম সিং বাবার ঘর থেকে বাবারই গলায় একটা আর্তনাদ শুনতে পেয়েছিল।'

'বটে?'

'কিন্তু প্রীতম সিং তখন খুব বিচলিত হয়নি, কারণ বাবার মাঝে-মাঝে কোমরে একটা ব্যথা হত, তখন চেয়াব বা বিছানা থেকে উঠে দাঁড়াবার সময় উনি একটা আর্তনাদ করতেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও কারুর সাহায্য নিতেন না। প্রীতম সিং প্রথমে ভেবেছিল ব্যথার জন্যই উনি চিৎকার করছেন, কিন্তু এখন বলে যে ওর হয়তো ভুল হতে পারে, কারণ চিৎকারটা ছিল বেশ জোরে।'

'আচ্ছা, সেদিন আপনার বাবার সঙ্গে কেউ দেখা করতে গিয়েছিলেন কি না সে খবর আপনি জানেন? প্রীতম সিং-এর কিছু মনে আছে কি?'

'সে কথা ওকে আমি জিগ্যেস করেছি, কিন্তু ও ডেফিনিটলি কিছু বলতে পারছে না। সকালের দিকটায় মাঝে-মাঝে বাবার কাছে লোকজন আসত—কিন্তু বিশেষ করে সেদিন ওঁর কাছে কেউ এসেছিল কি না সেকথা প্রীতম বলতে পারছে না। প্রীতম যখন বাবার ঘরে গিয়েছিল, তখন ওঁর অবস্থা খুবই খারাপ, আর তখন ঘরে অন্য কোনও লোক ছিল না। তারপর প্রীতমই ফোন করে শ্রীবাস্তবকে আনায়। বাবার হার্টের চিকিৎসা যিনি করতেন—ডক্টর গ্রেহ্যাম—তিনি সেদিন এলাহাবাদে ছিলেন একটা কনফারেন্সে।'

'আর স্পাই ব্যাপারটা সম্বন্ধে আপনার কী ধারণা?

'স্পাই?'—মহাবীর যেন আকাশ থেকে পড়ল।

'ও, তাহলে আপনি এটা জানেন না। আপনার বাবা শ্রীবাস্তবকে 'স্পাই' সম্বন্ধে কী যেন বলতে গিয়ে কথাটা শেষ করতে পারেননি।'

মহাবীর মাথা নেড়ে বলল, 'এটা আমার কাছে একেবারে নতুন জিনিস। এ সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না, আর বাবার সঙ্গে গুপ্তচরের কী সম্পর্ক থেকে থাকতে পারে তা আমি কল্পনাই করতে পারছি না।'

আমি কোকা-কোলাটাকে শেষ করে সবে স্ট্র-টাকে দুমড়ে দিয়েছি, এমন সময় দেখলাম একজন ষণ্ডা মার্কা লোক আমাদের কাছেই একটা টেবিলে বসে চা খেতে-খেতে আমাদের দিকে দেখছে। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই ভদ্রলোক টেবিল ছেড়ে উঠে এগিয়ে এলেন, আর ফেলুদার দিকে

ঘাড়টা কাত করে বললেন, 'নমস্কার। চিনতে পারছেন?'

'হ্যাঁ—কেন পারব না।'

আমি প্রথমে চিনতে পারিনি, এখন হঠাৎ ধাঁ করে মনে পড়ে গেল—ইনিই বনবিহারীবাবুর বাড়িতে থাকেন আর ওঁর চিড়িয়াখানা দেখাশোনা করেন। ভদ্রলোকের থুতনিতে একটা তুলোর ওপর দুটো স্টিকিং প্লাস্টার ক্রসের মতো করে লাগানো রয়েছে। বোধহয় দাড়ি কামাতে গিয়ে কেটে গেছে।

ফেলুদা বলল, 'বসুন। ইনি হচ্ছেন মহাবীর শেঠ—আর ইনি গণেশ গুহ।'

এবার লক্ষ করলাম যে ভদ্রলোকের ঘাড়েও একটা আঁচড়ের দাগ রয়েছে—যদিও এ দাগটা পুরোনো।

ফেলুদা বলল, 'আপনার থুতনিতে কী হল?'

গণেশবাবু তার নিজেব টেবিল থেকে চায়ের পেয়ালাটা তুলে এনে আমাদের টেবিলে রেখে বলল, 'আর বলবেন না—সমস্ত শবীরটাই যে অ্যাদ্দিন ছিঁড়ে-ফুঁড়ে শেষ হয়ে যায়নি সেই ভাগ্যি। আমাব চাকরিটা কী সে তো জানেনই।'

'জানি। তবে আমার ধারণা ছিল চাকরিটা খুশি হয়েই করেন আপনি।'

'পাগল! সব পেটের দায়ে। এক কালে বিজু সার্কাসের বাঘেব ইন্‌-চার্জ ছিলুম—তা সে বাঘ তো আফিম খেয়ে গুম হয়ে পড়ে থাকত। বনবিহারীবাবুর এই সব জানোয়ারের কাছে তো সে দুগ্ধপোষ্য শিশু। সেদিন বেড়ালের আঁচড়, আর কাল এই থুতনিতে হাইনার চাপড়! আর পারলুম না। সকালে গিয়ে বলে এসেছি—আমার মাইনে চুকিয়ে দিন। আমি ফিরে যাচ্ছি সার্কাস পার্টিতে। তা ভদ্রলোক রাজি হয়ে গেলেন।'

ফেলুদা যেন খবরটা শুনে অবাক হয়ে গেল। বলল, 'সেকী, আপনি বনবিহারীবাবুর চাকরি ছেড়ে দিলেন? কাল বিকেলেও তো আমরা ওঁর ওখানে ঘুরে এলাম।'

'জানি। শুধু আপনারা কেন, অনেকেই যাবেন। কিন্তু আমি আর এ তল্লাটেই নয়। এই এখন স্টেশনে যাব, গিয়ে হাওড়ার টিকিট কাটব। ব্যস—ঘরের ছেলে ঘবে ফিরে গিয়ে নিশ্চিন্ত। আব—' ভদ্রলোক নিচু হয়ে ফেলুদার কানের কাছে মুখ নিয়ে এলেন, '—একটা কথা বলে যাই—উনি লোকটি খুব সুবিধের নন।'

'বনবিহারীবাবু?'

'আগে ঠিকই ছিলেন, ইদানীং হাতে একটি জিনিস পেয়ে মাথাটি গেছে বিগড়ে।'

'কী জিনিস?'

'সে আর না হয় নাই বললাম'—বলে গণেশ গুহ তার চায়ের পয়সা টেবিলের ওপর ফেলে দিয়ে রেস্টুরেন্ট থেকে হাওয়া হয়ে গেল।

ফেলুদা এবার মহাবীরের দিকে ফিরে বললেন, 'আপনি দেখেছেন বনবিহারীবাবুর চিড়িয়াখানা?'

'ইচ্ছে ছিল যাওয়ার—কিন্তু হয়নি। বাবার আপত্তি ছিল। ওই ধরনের জানোয়ার-টানোয়ার উনি একদম পছন্দ করতেন না। একটা আরশোলা দেখলেই বাবার প্রায় হার্ট প্যালপিটেশন হয়ে যেত! তবে এবার ভাবছি একদিন গিয়ে দেখে আসব।'

মহাবীর তুড়ি মেরে বেয়ারাকে ডাকল। ফেলুদা অবিশ্যি চায়ের দামটা দিতে চেয়েছিল, কিন্তু মহাবীর দিতে দিল না। আমি মনে-মনে ভাবলাম যে ফিল্মেব অ্যাক্টরের অনেক টাকা, কাজেই মহাবীর দিলে কোনও ক্ষতি নেই।

বিলটা দেওয়ার পর মহাবীর তার সিগারেটের প্যাকেটটা বের করে ফেলুদার দিকে এগিয়ে দিল। দেখলাম প্যাকেটটা চারমিনারের।

'আপনি ক'দিন আছেন?' মহাবীর জিগ্যেস করল।

'পরশু দিন-দুয়েকের জন্য হরিদ্বার যাচ্ছি, তারপর ফিরে এসে বাকি এ মাসটা আছি।'

'আপনারা সবাই যাচ্ছেন হরিদ্বার?'

'ধীরেনবাবুর কাজ আছে তাই উনি যাবেন না। আমরা তিনজন যাচ্ছি, আর বোধহয় বনবিহারীবাবু। উনি লছমনঝুলায় একটা অজগরের সন্ধানে যাচ্ছেন।'

রেস্টুরেন্টের বাইরে এসে পড়লাম। মহাবীর বলল, 'আমার কিন্তু গাড়ি আছে—আমি লিফট দিতে পারি।'

ফেলুদা ধন্যবাদ দিয়ে বলল, 'না, থাক। মোটর তো কলকাতায় হামেশাই চড়ি। এখানে টাঙ্গাটা বেড়ে লাগছে।'

এবার মহাবীর ফেলুদার কাছে এসে ওর হাতটা নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে নিয়ে বলল, 'আপনার সঙ্গে আলাপ করে সত্যিই ভালো লাগল। একটা কথা আপনাকে বলছি—যদি জানতে পারি যে বাবার মৃত্যু স্বাভাবিক ভাবে হয়নি, তার জন্য অন্য কেউ দায়ী, তাহলে সেই অপরাধী খুনিকে খুঁজে বের করে তার প্রতিশোধ আমি নেবই। আমার বয়স বেশি না হতে পারে, কিন্তু আমি চার বছর মিলিটারি অ্যাকাডেমিতে ছিলাম। রিভলভারের লাইসেন্স আছে, আমার মতো অব্যর্থ টিপ খুব বেশি লোকের নেই।...গুড বাই।'

মহাবীর রাস্তা পেরিয়ে গিয়ে একটা কালো স্ট্যান্ডার্ড গাড়িতে উঠে হুশ করে বেরিয়ে চলে গেল।

ফেলুদা খালি বলল, 'সাবাস।'

আমি মনে-মনে বললাম, ফেলুদা যে বলেছিল প্যাঁচের মধ্যে প্যাঁচ সেটা খুব ভালো নয়।

টাঙ্গার খোঁজে আমরা হাঁটতে শুরু করলাম। এটাও বুঝতে পারছিলাম যে ব্রেড জিনিসটার খুব বেশি দরকার বোধহয় ফেলুদার নেই।

৭

হরিদ্বার যেতে হয় ডুন এক্সপ্রেসে। লখ্‌নৌ থেকে সন্ধ্যায় গাড়ি ছাড়ে, আর হরিদ্বার পৌঁছয় সাড়ে চারটেয়।

লখ্‌নৌ আসার আগে যখন হরিদ্বার যাওয়ার কথা হয় তখন আমার খুব মজা লেগেছিল। কারণ পুরী ছাড়া আমি কোনও তীর্থস্থান দেখিনি। কিন্তু লখ্‌নৌতে এসে আংটির ব্যাপারটা ঘটে যাওয়ায় আর সে রহস্যের এখনও কোনও সমাধান না হওয়ায়, আমার এখন আর লখ্‌নৌ ছেড়ে যেতে খুব বেশি ইচ্ছে করছিল না।

কিন্তু ফেলুদার দেখলাম উৎসাহের কোনও অভাব নেই। ও বলল, হরিদ্বার, হৃষিকেশ আর লছমনঝুলা—এই তিনটে জায়গা পরপর দেখতে দেখবি কেমন ইন্টারেস্টিং লাগে। কারণ তিন জায়গার গঙ্গা দেখবি তিনরকম। যত উত্তরে যাবি তত দেখবি নদীর ফোর্স বেড়ে যাচ্ছে। আর ফাইন্যালি লছমনঝুলায় গিয়ে দেখবি একেবারে উত্তাল পাহাড়ে নদী। তোড়ের শব্দে প্রায় কথাই শোনা যায় না।'

আমি বললাম, 'তোমার এসব দেখা আছে বুঝি?'

'সেই যেবার ক্রিকেট খেলতে লখ্‌নৌ এলাম, সেবারই দেখা সেরে গেছি।'

ধীরুকাকা অবিশ্যি আমাদের সঙ্গে যেতে পারলেন না, তবে উনি নিজে গাড়ি চালিয়ে আমাদের সকলকে স্টেশনে নিয়ে এলেন। কামরাতে মালপত্র রাখতে না রাখতে আরেকজন ভদ্রলোক এসে পড়লেন, তিনি হচ্ছেন ডাঃ শ্রীবাস্তব। আমি ভাবলাম উনিও বুঝি ধীরুকাকার মতো 'সি-অফ' করতে এসেছেন, কিন্তু তারপর দেখলাম কুলির মাথা থেকে স্যুটকেস নামাচ্ছেন। আমাদের সকলেরই অবাক



ভাব দেখে শ্রীবাস্তব হেসে বললেন, 'ধীরুবাবুকে বলিয়েছিলাম যেন আপনাদের না বোলেন। উনি জানতেন আমি যাব আপনাদের সঙ্গে। কেমন সারপ্রাইজ দিলাম বোলেন তো।'

বাবা দেখলাম খুব খুশি হয়েই বললেন, 'খুব ভালোই হল। আমি ভাবতে পারিনি আপনি আসতে পারবেন, তা না হলে আমি নিজেই আপনাকে বলতাম।'

শ্রীবাস্তব বেঞ্চির একটা কোণ ঝেড়ে সেখানে বসে বললেন, 'সত্যি জানেন কি—ক'দিন বড্ড ওয়ারিড আছি। আমাকে বাইরে থেকে দেখলে বুঝতে পারবেন না। পিয়ারিলালের দেওয়া

জিনিসটা এইভাবে গেল—ভাবলে বড় খারাপ লাগে। শহর ছেড়ে দু-দিনের জন্য আপনাদের সঙ্গে ঘুরে আসতে পারলে খানিকটা শান্তি পাব।'

পাঁচ মিনিটের মধ্যে বনবিহারীবাবুও এসে পড়লেন। তাঁর মালপত্তর যেন একজনের পক্ষে একটু বেশিই মনে হল। ভদ্রলোক হাসিমুখে নমস্কার করে বললেন, 'এইবার রগড় দেখবেন। পবিত্রানন্দস্বামী চলেছেন এ-গাড়িতে। তাঁর ভক্তরা তাঁকে বিদায় দিতে আসছেন। ভক্তির বহরটা দেখবেন এবার।'

সত্যিই, কিছুক্ষণ পরে অনেক লোকজন ফুলের মালাটালা নিয়ে একজন মোটামতো গেরুয়াপরা লম্বা চুলওয়ালা সন্ন্যাসী এসে আমাদের পাশের ফার্স্টক্লাস গাড়িটায় উঠলেন। ওঁর সঙ্গে আরও চার-পাঁচজন গেরুয়াপরা লোক উঠল—আর কিছু গেরুয়াপরা, আর অনেক এমনি পোশাক পরা লোক কামরার সামনে ভিড় করে দাঁড়াল। বুঝলাম এরাই সব ভক্তের দল।

গাড়ি ছাড়তে আর পাঁচমিনিট দেরি, তাই আমরা সব উঠে পড়েছি, ধীরুকাকা কেবল জানালার বাইরে থেকে বাবার সঙ্গে কথা বলছেন, এমনসময় একজন গেরুয়াপরা লোক হঠাৎ ধীরুকাকার দিকে হাসিহাসি মুখ করে হাত বাড়িয়ে এগিয়ে এল।

'ধীরেন না? চিনতে পারছ?'

ধীরুকাকা কিছুক্ষণ হতভম্বের মতো চেয়ে থেকে, হঠাৎ—'অম্বিকা নাকি?'—বলে এগিয়ে গিয়ে ভদ্রলোককে প্রায় জড়িয়ে ধরলেন। 'বাপরে বাপ!—তোমার আবার এ-পোশাক কী হে?'

'কেন, এ তো প্রায় সাত বছর হতে চলল।'

ধীরুকাকা তখন ভদ্রলোকের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, 'অম্বিকা হল আমার স্কুলের সহপাঠী। প্রায় পনেরো বছর পরে দেখা ওর সঙ্গে।'

গার্ড হুইস্‌ল দিয়েছে। ঘ্যাঁ-চ্ করে গাড়ি ছাড়ার শব্দ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে আমরা সকলেই শুনতে পেলাম অম্বিকাবাবু ধীরুকাকাকে বলছেন, 'আরে, সেদিন বিকেলে তোমার বাড়ি গিয়ে প্রায় আধঘণ্টা বসে রইলাম। তুমি ছিলে না। তোমার বেযারা তোমাকে সেকথা বলেনি?'

ধীরুকাকা কী উত্তর দিলেন সেটা আব শোনা গেল না, কাবণ গাড়ি তখন ছেড়ে দিয়েছে।

আমি অবাক হয়ে প্রথমে ফেলুদা, আর তারপর বাবার দিকে চাইলাম। ফেলুদাব কপালে দারুণ ভ্রূকুটি।

বাবা বললেন, 'ভেরি স্ট্রেঞ্জ।'

বনবিহারীবাবু বললেন, 'ওই ভদ্রলোককেই কি আপনাবা আংটিচোর বলে সাসপেক্ট করছিলেন?'

বাবা বললেন, 'সে-প্রশ্ন অবিশ্যি আর ওঠে না। কিন্তু আংটিটা তাহলে গেল কোথায? কে নিল?'

ট্রেনটা ঘটাং-ঘটাং করে লখ্‌নৌ স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম ছাড়িয়ে বেরোল। স্টেশনের মাথাব গম্বুজগুলো ভারি সুন্দর দেখতে, কিন্তু এখন আর ওসব যেন চোখেই পড়ছিল না। মাথার মধ্যে সব যেন কীরকম গণ্ডগোল হয়ে যাচ্ছিল। ফেলুদা নিশ্চয়ই মনে-মনে খুব অপ্রস্তুত বোধ করছে। ও-তো সেই সন্ন্যাসীর খোঁজ নিতে-নিতে একেবারে লখ্‌নৌ স্টেশন অবধি পৌঁছে গিয়েছিল।

কিন্তু তাহলে স্টেশনের সেই অ্যাটাচি-কেসওয়ালা সন্ন্যাসী কে? আজকে যাকে দেখলাম সে তো আর ছদ্মবেশধারী সন্ন্যাসী নয়—একেবারে সত্যিকার সন্ন্যাসী। সে কি তাহলে আরেকজন লোক? আর সেও কি ধীরুকাকার বাড়ির আশেপাশে ঘোরাফেরা করছিল? আর সেটার কারণ কি ওই আংটি, না অন্য কিছু? আর ফেলুদার গায়ে 'খুব হুঁশিয়ার' লেখা কাগজ কে ছুঁড়ে মেরেছিল—আর কেন?

ফেলুদার মাথাতে কি এখন এই সব প্রশ্নই ঘুরছে—না সে অন্য কিছু ভাবছে?

ওর দিকে চেয়ে দেখি ও সেই গ্রিক অক্ষরে হিজিবিজি লেখা খাতাটা বের করে খুব মন

দিয়ে পড়ছে—আর মাঝে-মাঝে কলম দিয়ে আরও কী সব জানি লিখছে।

বনবিহারীবাবু হঠাৎ একটা প্রশ্ন করে বসলেন ঃ 'আচ্ছা, ডক্টর শ্রীবাস্তব—পিয়ারিলাল মারা যাওয়ার আগে আপনিই বোধহয় শেষ তাঁকে দেখেছিলেন, তাই না?'

শ্রীবাস্তব একটা থলি থেকে কমলালেবু বের করে সকলকে একটা-একটা করে দিতে-দিতে বললেন, 'আমি ছিলাম, ওনার বিধবা বোন ছিলেন, ওনার বেয়ারা ছিল, আর অন্য একটি চাকরও ছিল।'

বনবিহারীবাবু একটু গম্ভীর হয়ে বললেন, 'হুঁ। ওঁর অ্যাটাকটা হওয়ার পর আপনাকে খবর দিয়ে আনানো হয়?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আপনি কি হার্টের চিকিৎসাও করেন?'

'হাড়ের চিকিৎসা করলে হার্টের যে করা যায় না এমন তো নয় বনবিহারীবাবু! আর ওঁর ডাক্তার গ্রেহ্যাম শহরে ছিলেন না, তাই আমাকে ডেকেছিলেন।'

'কে ডেকেছিল?'

'ওঁর বেয়ারা।'

'বেয়ারা?' বনবিহারীবাবু ভ্রূ কপালে তুলে জিগ্যেস করলেন।

'হ্যাঁ। প্রীতম সিং। অনেক দিনের লোক। খুব বুদ্ধিমান, বিশ্বস্ত, কাজের লোক।'

বনবিহারীবাবু মুখ থেকে পাইপ নামিয়ে কমলালেবুর একটা কোয়া মুখে পুরে দিয়ে বললেন, 'আপনি বলেছেন পিয়ারিলাল আংটিটা দিয়েছেন প্রথম অ্যাটাকের পর। আর দ্বিতীয় অ্যাটাকের পর আপনাকে ডাকা হয়, আর সেই অ্যাটাকেই তাঁর মৃত্যু হয়।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আংটিটা দেওয়ার সময় ঘরে কেউ ছিল কি?'

'তা কী করে থাকবে বনবিহারীবাবু? এসব কাজ কি আর বাইরের লোকের সামনে কেউ করে? বিশেষ করে পিয়ারিলাল কীরকম লোক ছিলেন তা তো আপনি জানেন। ঢাক বাজিয়ে নোব্‌ল কাজ করার লোক তিনি একেবারেই ছিলেন না। ওনার কত সিক্রেট চ্যারিটি আছে তা জানেন? লাখ লাখ টাকা হাসপাতালে অনাথাশ্রমে দান করেছেন, অথচ কোনও কাগজে তার বিষয়ে কখনও কিছু বেরোয়নি।'

'হুঁ।'

শ্রীবাস্তব বনবিহারীবাবুর দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বললেন, 'আপনি কি আমার কথা অবিশ্বাস করছেন?'

বনবিহারীবাবু বললেন, 'আসলে ব্যাপারটা কী জানেন—এই আংটি দেওয়ার ঘটনার অন্তত একজন সাক্ষী রাখলে আপনি বুদ্ধিমানের কাজ করতেন। এমন একটা মূল্যবান জিনিস হাত বদল হল—অথচ কেউ জানতে পারল না।'

শ্রীবাস্তব একটুক্ষণ গম্ভীর থেকে হঠাৎ হো হো করে হেসে বললেন, 'বাঃ বনবিহারীবাবু, বাঃ! আমি পিয়ারিলালের আংটি চুরি করলাম, আমিই ধীরেনবাবুর কাছে সেটা রাখলাম, আবার আমিই সেটা ধীরেনবাবুর বাড়ি থেকে চুরি করলাম? ওয়ান্ডারফুল।'

বনবিহারীবাবু তাঁর মুখের ভাব একটুও না বদলিয়ে বললেন, আপনি বুদ্ধিমানের কাজই করেছেন। আমি হলেও তাই করতাম। কারণ, আপনার বাড়িতে ডাকাত পড়াতে আপনি সত্যিই ভয় পেয়েছিলেন, তাই আংটিটা ধীরুবাবুর কাছে রাখতে দিয়েছিলেন। তারপর ধীরুবাবুর আলমারি থেকে সরিয়ে সেটা আবার নিজের কাছে রেখে ভাবছেন এইবার ডাকাতের হাত থেকে রেহাই পাওয়া গেল। কী বল, ফেলু মাস্টার? আমার গোয়েন্দাগিরিটা কি নেহাত উড়িয়ে দেওয়ার মতো?'

ফেলুদা তার খাতা বন্ধ করে কমলালেবুর খোসা ছাড়াতে-ছাড়াতে বলল, 'ডাক্তার শ্রীবাস্তব যে মহাবীরকে প্রায় দুরারোগ্য ব্যারাম থেকে বাঁচিয়ে তুলেছিলেন, তার কি কোনও সাক্ষীর অভাব আছে?'

বনবিহারীবাবু বললেন, 'না, তা হয়তো নেই।'

ফেলুদা বলল, 'আমি বিশ্বাস করি, আংটির দাম যত লাখ টাকাই হোক না কেন, একটি ছেলের জীবনের মূল্যের চেয়ে তার মূল্য বেশি নয়। শ্রীবাস্তব যদি আংটি চুরি করে থাকেন, তাহলে তাঁর অপরাধ নিশ্চয় আছে, কিন্তু এখন যারা ওঁর আংটির পিছনে লেগেছে, তাদের অপরাধ আরও অনেক বেশি, কারণ তারা একেবারে খাঁটি চোর এবং খুব ডেঞ্জারাস জাতের চোর।'

'বুঝেছি।' বনবিহারীবাবুর গলার স্বর গম্ভীর। 'তাহলে তুমি বিশ্বাস কর না যে শ্রীবাস্তবের কাছেই এখনও আংটিটা আছে।'

'না। করি না। আমার কাছে তার প্রমাণ আছে।'

কামরার সকলেই চুপ। আমি অবাক হয়ে ফেলুদার দিকে চাইলাম। বনবিহারীবাবু কিছুক্ষণ ফেলুদার দিকে চেয়ে থেকে বললেন, 'কী প্রমাণ আছে তা জিগ্যেস করতে পারি কি?'

'জিগ্যেস নিশ্চয় করতে পারেন, কিন্তু উত্তর এখন পাবেন না—তার সময় এখনও আসেনি।'

আমি ফেলুদাকে এরকম জোরের সঙ্গে কথা বলতে এর আগে কখনও শুনিনি।

বনবিহারীবাবু আবার ঠাট্টার সুরে বললেন, 'আমি বেঁচে থাকতে সে উত্তর পাব তো?'

ফেলুদা বলল, 'আশা তো করছি। একটা স্পাই-এর রহস্য আছে—সেটা সমাধান হলেই পাবেন।'

'স্পাই?' বনবিহারীবাবু অবাক হয়ে ফেলুদার দিকে চাইলেন ঃ 'কী স্পাই?'

শ্রীবাস্তব বললেন, 'ফেলুবাবু বোধহয় পিয়ারিলালের লাস্ট ওয়ার্ডস-এর কথা বলছেন। মারা যাওয়ার আগে দুবার "স্পাই" কথাটা বলেছিলেন।'

বনবিহারীবাবুর ভ্রূকুটি আরও বেড়ে গেল। বললেন, 'আশ্চর্য! লখ্‌নৌ শহরে স্পাই?'

তারপর কিছুক্ষণ পাইপটা হাতে নিয়ে চুপ করে কামরার মেঝের দিকে চেয়ে থেকে বললেন, 'হতে পারে...হতে পারে...আমার একবার একটা সন্দেহ হয়েছিল বটে।'

'কী সন্দেহ?'—শ্রীবাস্তব জিগ্যেস করলেন।

'নাঃ। কিচ্ছু না।...আই মে বি রং।'

বুঝলাম বনবিহারীবাবু আর ও বিষয়ে কিছু বলতে চান না। আর এমনিতেই হরদোই স্টেশন এসে পড়াতে কথা বন্ধই হয়ে গেল।

'একটু চা হলে মন্দ হয় না'—বলে ফেলুদা প্ল্যাটফর্মে নেমে পড়ল। আমিও নামলাম, কারণ ট্রেন স্টেশনে থামলে গাড়ির ভেতর বসে থাকতে আমার ইচ্ছে করে না।

আমরা নামতেই আরেকজন গেরুয়াপরা দাড়িওয়ালা লোক কোত্থেকে জানি এসে আমাদের গাড়িতে উঠে পড়ল। বনবিহারীবাবু ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'কামরা রিজার্ভড—জায়গা নেই, জায়গা নেই!'

তাতে গেরুয়াধারী ইংরিজিতে বলল, 'বেরিলি পর্যন্ত যেতে দিন দয়া করে। তারপর আমি অন্য গাড়িতে চলে যাব। রাত্রে আপনাদের বিরক্ত করব না।'

অগত্যা বনবিহারীবাবু তাকে উঠতে দিলেন।

ফেলুদা বলল, 'সন্ন্যাসীদের জ্বালায় দেখছি আর পারা গেল না। এই চা-ওয়ালা!'

চা-ওয়ালা দৌড়ে এগিয়ে এল।

'তুই খাবি?'

'কেন খাব না?'

অন্যদের জিগ্যেস করাতে ওঁরা বললেন যে খাবেন না।

গরম চায়ের ভাঁড় কোনওরকমে এ-হাত ও-হাত করতে-করতে ফেলুদাকে বললাম, 'শ্রীবাস্তব চোর হলে কিন্তু খুব খারাপ হবে।'

ফেলুদা ওই সাংঘাতিক গরম চায়ে চুমুক দিয়ে বলল, 'কেন?'

'কারণ ওঁকে আমার বেশ ভালো লাগে—আর মনে হয় খুব ভালোমানুষ।'

'বোকচন্দর—তুই যে ডিটেকটিভ বই পড়িসনি। পড়লে জানতে পারতিস যে, যে-লোকটাকে সবচেয়ে নিরীহ বলে মনে হয়, সে-ই শেষপর্যন্ত অপরাধী প্রমাণ হয়।'

'এ ঘটনা তো আর ডিটেকটিভ বইয়ের ঘটনা নয়।'

'তাতে কী হল? বাস্তব জীবনের ঘটনা থেকেই তো লেখকরা আইডিয়া পান।'

আমার ভারি রাগ হল। বললাম, 'তাহলে শ্রীবাস্তব যখন প্রথম দিন আমাদের বাড়িতে বসে গল্প করছিলেন, তখন বাইরে থেকে কে ওঁকে ওয়াচ করছিল, আর চারমিনার খাচ্ছিল?'

'সে হয়তো ডাকাতের দলের লোক।'

'তাহলে তুমি বলছ শ্রীবাস্তবও খারাপ লোক, আর ডাকাতবাও খারাপ লোক? তাহলে তো সকলেই খারাপ লোক—কারণ গণেশ গুহ বলছিল বনবিহারীবাবুও লোক ভালো নয়।'

ফেলুদা উত্তরের বদলে চায়ের ভাঁড়ে একটা বড় রকম চুমুক দিতেই কোত্থেকে জানি একটা দলা পাকানো কাগজ ঠাঁই করে এসে ওর কপালে লেগে রিবাউন্ড করে একেবারে ভাঁড়ের মধ্যে পড়ল।

এক ছোবলে কাগজটা ভাঁড় থেকে তুলে নিয়ে ফেলুদা প্ল্যাটফর্মের ভিড়ের দিকে চাইতেই গার্ডেব হুইসিল শোনা গেল। এখন আর কারুর সন্ধানে ছোটাছুটি করার কোনও উপায় নেই।

কম্পার্টমেন্টে ওঠার আগে কাগজটা খুলে একবার নিজে দেখে তারপর আমাকে দেখিয়ে ফেলুদা সেটাকে আবার দলা পাকিয়ে প্ল্যাটফর্মেব পাশ দিয়ে একেবারে ট্রেনের চাকার ধারে ফেলে দিল।

কাগজে লেখা ছিল 'খুব হুঁশিয়ার'—আর দেখে বুঝলাম এবারও পানের রস দিয়েই লেখা।

বাদশাহী আংটির রহস্যজনক আর রোমাঞ্চকর ব্যাপারটা আমরা মোটেই লখ্নৌ শহরে ছেড়ে আসিনি। সেটা আমাদের সঙ্গে-সঙ্গেই চলেছে।

৮

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। কামরার বাতিগুলো এইমাত্র জ্বলেছে। ট্রেন ছুটে চলেছে বেরিলির দিকে।

কামরায় সবসুদ্ধ সাতজন লোক। আমি আর ফেলুদা একটা বেঞ্চিতে, একটায় বাবা আর শ্রীবাস্তব, আর তৃতীয়টায় বনবিহারীবাবু আর সেই সন্ন্যাসী। বাবাদের ওপরের বাঙ্কে বনবিহারীবাবুর একটা কাঠের প্যাকিং কেস আর একটা বড় ট্রাঙ্ক রয়েছে। আমাদের ওপরের বাঙ্কে একটা লোক আপাদমস্তক চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছে। লখ্নৌ স্টেশনে গাড়িতে উঠে অবধি তাকে এই ঘুমন্ত আর চাদরমুড়ি অবস্থাতেই দেখেছি। তার পায়ের ডগাদুটো শুধু বেরিয়ে আছে, ওপরের দিকে চাইলেই দেখা যায়।

বনবিহারীবাবু বেঞ্চির ওপর পা তুলে বাবু হয়ে বসে পাইপ টানছেন, শ্রীবাস্তব 'গীতাঞ্জলি' পড়ছেন, আর বাবাকে দেখলেই মনে হয় ওঁর ঘুম পেয়েছে। মাঝে-মাঝে চোখ রগড়িয়ে টান হয়ে বসছেন। সন্ন্যাসীর যেন আমাদের কোনও ব্যাপারেই কোনও ইন্টারেস্ট নেই। সে একমনে একটা



হিন্দি খবরের কাগজের পাতা উলটোচ্ছে। ফেলুদা জানালার বাইরে চেয়ে গাড়ির তালে-তালে একটা গান ধরেছে। সেটা আবার হিন্দি গান। তার প্রথম দু-লাইন হচ্ছে—

যব ছোড় চলে লখ্‌নৌ নগরী
তব হাল আদম পর ক্যা গুজরী. .

বাকিটা ফেলুদা হুঁ-হুঁ করে গাইছে। বুঝলাম ওই দু-লাইন ছাড়া আর কথা জানা নেই। বনবিহারীবাবু হঠাৎ বললেন, 'ওয়াজিদ আলি শা-র গান তুমি জানলে কী করে?'

ফেলুদা বলল, 'আমার এক জ্যাঠামশাই গাইতেন। খুব ভালো ঠুংরি গাইয়ে ছিলেন।'

বনবিহারীবাবু পাইপে টান দিয়ে জানালার বাইরে সন্ধ্যার লাল আকাশের দিকে চেয়ে বললেন, 'আশ্চর্য নবাব ছিলেন ওয়াজিদ আলি। গান গাইতেন পাখির মতো। গান রচনাও করতেন। ভারতবর্ষের প্রথম অপেরা লিখেছিলেন—একেবারে বিলিতি ঢং-এ। কিন্তু যুদ্ধ করতে জানতেন না এক ফোঁটাও। শেষ বয়সটা কাটে কলকাতার মেটেবুরুজে—এখন যেখানে সব কলকাতার মুসলমান দরজিগুলো থাকে। আর সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং ব্যাপার কী জানো? তখনকার বিখ্যাত ধনী রাজেন মল্লিকের সঙ্গে একজোটে কলকাতার প্রথম চিড়িয়াখানার পরিকল্পনা করেন ওয়াজেদ আলি শা।'

কথা শেষ করে বনবিহারীবাবু দাঁড়িয়ে উঠে বাঙ্কে রাখা ট্রাঙ্কটা খুলে তার ভেতর থেকে একটা ছোট গ্রামোফোনের মতো বাক্স বের করে বেঞ্চির ওপরে রেখে বললেন, 'এবার আমার প্রিয় কিছু গান শোনাই। এটা হচ্ছে আমার টেপরেকর্ডার। ব্যাটারিতে চলে।'

এই বলে বাক্সটার ঢাকনা খুলে হারমোনিয়ামের পরদার মতো দেখতে একটা সাদা জিনিস টিপতেই বুঝতেই পারলাম কী একটা জিনিস জানি চলতে আরম্ভ করল।

বনবিহারীবাবু বললেন, 'এ গান যদি সত্যি করে উপভোগ করতে হয় তাহলে জানলা দিয়ে বাইরের দিকে দেখতে-দেখতে শোনো।'

আমি বাইরের দিকে চেয়ে আবছা আলোতে দেখলাম, বিরাট-বিরাট গাছওয়ালা ঘন অন্ধকার জঙ্গল ছুটে চলেছে ট্রেনের উলটো দিকে। সেই জঙ্গল থেকেই যেন শোনা গেল বনবিড়ালের কর্কশ চিৎকার।

বনবিহারীবাবু বললেন, 'ভলুম ইচ্ছে করে বাড়াইনি—যাতে মনে হয় চিৎকারটা দূর থেকেই আসছে।'

তারপর শুনলাম হাইনার হাসি। সে এক অদ্ভুত ব্যাপার। ট্রেনে করে জঙ্গলের পাশ দিয়ে ছুটে চলেছি—আর সারা জঙ্গল থেকে হাইনার হাসির শব্দ ভেসে আসছে।

বনবিহারীবাবু বললেন, 'এর পরের শব্দটা আরেকটু কমানো উচিত, কারণ ওটা শোনা যায় খুব আস্তেই। তবে গাড়ির শব্দের জন্য আমি ওটা একটু বাড়িয়েই শোনাচ্ছি।'

'কির্‌র্‌র্ কিট্ কিট্ কিট্...কির্‌র্‌র্ কিট্ কিট্ কিট্..'

আমার বুকের ভেতরটা যেন টিপ টিপ করতে লাগল। সন্ন্যাসীর দিকে চেয়ে দেখি তিনিও অবাক হয়ে শুনছেন।

বনবিহারীবাবু বললেন, 'র‍্যাট্‌ল স্নেক। আওয়াজটা শুনলে যদিও ভয় করে, কিন্তু আসলে ওরা নিজের অস্তিত্বটা জানিয়ে দেওয়ার জন্যই শব্দটা করে—যাতে অন্য কোনও প্রাণী অজান্তে ওদের মাড়িয়ে না ফেলে।'

বাবা বললেন, 'তাহলে ওরা এমনিতে মানুষকে অ্যাটাক করে না?'

'জঙ্গলে-টঙ্গলে এমনিতে করে না। সে আমাদের দিশি বিষাক্ত সাপেরাই বা ক'টা অ্যাটাক করে বলুন। তবে কোণঠাসা হয়ে গেলে করে বইকী। যেমন ধরুন, একটা ছোট ঘরের মধ্যে আপনার সঙ্গে যদি সাপটাকে বন্দি করে রাখা যায়—তাহলে কি আর করবে না? নিশ্চয়ই করবে। আর এদের আরেকটা আশ্চর্য ক্ষমতা কী জানেন তো—ইনফ্রা রেড রশ্মি এদের চোখে ধরা পড়ে। অর্থাৎ, এরা অন্ধকারে স্পষ্ট দেখতে পায়।'

তারপর রেকর্ডার বন্ধ করে দিয়ে বনবিহারীবাবু বললেন, 'দুঃখের বিষয় আমার বাকি যে-ক'টি প্রাণী আছে—বিছে আর মাকড়সা—তারা দুটিই মৌন। এবার যদি অজগরটি পাই, তাহলে তার ফোঁসফোঁসানি নিশ্চয়ই রেকর্ড করে রাখব।'

বাবা বললেন, 'ভয়-ভয় করছিল কিন্তু শব্দগুলো শুনে।'

বনবিহারীবাবু বললেন, 'তা তো বটেই। কিন্তু আমার কাছে এ-শব্দ সংগীতের চেয়েও মধুর।

বাইরে যখন যাই, জানোয়ারগুলোকে তো তখন নিয়ে যেতে পারি না, তাই এই শব্দগুলোকেই নিয়ে যাই সঙ্গে করে।'

বেরিলিতে আমাদের ডিনার দিল, আর সন্ন্যাসী ভদ্রলোক নেমে গেলেন।

ফেলুদা এক প্লেট খাবার পরেও আমার প্লেট থেকে মুরগির ঠ্যাং তুলে নিয়ে বলল, 'ব্রেনের কাজটা যখন বেশি চলে, তখন মুরগি জিনিসটা খুব হেল্প করে।'

'আর আমি বুঝি ব্রেনের কাজ করছি না!'

'তোরটা কাজ নয়, খেলা।'

'তোমার এত কাজ করে কী ফলটা হচ্ছে শুনি।'

ফেলুদা গলাটা নামিয়ে নিয়ে শুধু আমি যাতে শুনতে পাই এমনভাবে বলল, 'পিয়ারিলাল কোন স্পাই-এর কথা বলেছিলেন সেটার একটা আন্দাজ পেয়েছি।'

এইটুকু বলে ফেলুদা একেবারে চুপ মেরে গেল।

গাড়ি বেরিলি ছেড়েছে। বাবা বললেন, 'ভোর চারটেয় উঠতে হবে। তোরা সব এবার শুয়ে পড়।'

বেঞ্চির অর্ধেকটা আমি নিয়ে বাকি অর্ধেকটা ফেলুদাকে ছেড়ে দিলাম। বনবিহারীবাবু বললেন উনি ঘুমোবেন না। 'তবে আপনারা নিশ্চিন্তে ঘুমোন, আমি হরিদ্বার আসার ঠিক আগেই আপনাদের তুলে দেব।'

বাবা আর শ্রীবাস্তব ওঁদের বেঞ্চিটায় ভাগাভাগি করে শুয়ে পড়লেন। বনবিহারীবাবু দেখলাম বাতিগুলো নিভিয়ে দিলেন। ঘরের ভেতরটা অন্ধকার হতেই বুঝতে পারলাম বাইরে চাঁদের আলো রয়েছে। শুধু তাই না, আমি যেখানে শুয়ে আছি সেখান থেকে চাঁদটা দেখাও যাচ্ছে। বোধহয় পূর্ণিমার আগের দিনের চাঁদ, আর সেটা আমাদের গাড়ির সঙ্গে-সঙ্গেই ছুটে চলেছে।

চাঁদ দেখতে-দেখতে আমার মন কেন জানি বলল যে, হরিদ্বারে শুধু তীর্থস্থানই দেখা হবে না—আরও কিছু ঘটবে সেখানে। কিংবা এও হতে পারে যে আমার মন চাইছে হরিদ্বারেও কিছু ঘটুক। শুধু গঙ্গা আর গঙ্গার ঘাট আর মন্দির দেখলেই যেন ওখানে যাওয়াটা সার্থক হবে না।

আচ্ছা, ট্রেনের এত দোলানি আর এত শব্দের মধ্যে কী করে ঘুম এসে যায়? কলকাতায় আমার বাড়ির পাশে যদি এরকম ঘটাং-ঘটাং শব্দ হত, আর আমার খাটটাকে ধরে কেউ যদি ক্রমাগত ঝাঁকুনি দিত, তাহলে কি ঘুম আসত? ফেলুদাকে কথাটা জিগ্যেস করাতে ও বলল, 'এরকম শব্দ যদি অনেকক্ষণ ধরে হয়, তাহলে মানুষের কান তাতে অভ্যস্ত হয়ে যায়; তখন আর শব্দটা ডিস্টার্ব করে না। আর ঝাঁকুনিটা তো ঘুমকে হেল্পই করে। খোকাদের দোল দিয়ে ঘুম পাড়ায় দেখিসনি? বরং শব্দ আর দোলানি যদি হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায় তাহলেই ঘুম ভেঙে যাওয়ার চান্স থাকে। তুই লক্ষ করে দেখিস, অনেক সময় স্টেশনে গাড়ি থামলেই ঘুম ভেঙে যায়।'

ঘুমে যখন প্রায় চোখ বুজে এসেছে, তখন একবার মনে হল বাঙ্কের ওপর যে লোকটি চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছিল, সে যেন উঠে বাঙ্ক থেকে নেমে একবার ঘরেব মধ্যে ঘোরাফেরা করল। তারপর একবার যেন কার একটা হাসি শুনতে পেলাম—সেটা মানুষও হতে পারে, আবার হাইনাও হতে পারে। তারপর দেখলাম আমি ভুলভুলাইয়ার ভেতর পথ হারিয়ে পাগলের মতো ছুটোছুটি করছি, আর যতবারই এক একটা মোড় ঘুরছি, ততবারই দেখছি একটা প্রকাণ্ড মাকড়সা আমার পথ আগলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আর প্রকাণ্ড দুটো জ্বলজ্বলে সবুজ চোখ দিয়ে আমাকে দেখছে। একবার একটা মাকড়সা হঠাৎ আমার দিকে এগিয়ে এসে তার একটা প্রকাণ্ড কালো লোমে ঢাকা পা আমার কাঁধের ওপর রাখতেই আমার ঘুম আর স্বপ্ন একসঙ্গে ভেঙে গেল, আর দেখলাম ফেলুদা আমার কাঁধে হাত রেখে ঠেলা দিয়ে বলছে—

'এই তোপ্‌সে ওঠ। হরিদ্বার এসে গেছে।'

৯

'পাণ্ডা চাই, বাবু, পাণ্ডা?'

'বাবুর নামটা কী? নিবাস কোথায়?'

'এই যে বাবু, এদিকে! কোন ধর্মশালায় উঠেছেন বাবু?'

'বাবা দক্ষেশ্বর দর্শন হবে তো বাবু?'

প্ল্যাটফর্মে নামতে না নামতে পাণ্ডারা যে এভাবে চারিদিক থেকে ছেঁকে ধরবে সেটা ভাবতেই পারিনি। ফেলুদা অবিশ্যি আগেই বলেছিল যে এরকম হয়। আর এইসব পাণ্ডাদের কাছে নাকি প্রকাণ্ড মোটা-মোটা সব খাতা থাকে, তাতে নাকি আমাদের সব দুশো তিনশো বছরের পূর্বপুরুষদের নাম ঠিকানা লেখা থাকে—অবিশ্যি তাঁরা যদি কোনওদিন হরিদ্বার এসে থাকেন তাহলেই। বাবার কাছে শুনেছি আমার ঠাকুরদাদার ঠাকুরদা নাকি সন্ন্যাসী হয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন, আর তিনি নাকি অনেকদিন হরিদ্বারে ছিলেন। হয়তো এইসব খাতার মধ্যে তাঁর নাম, ঠিকানা আর হাতের লেখা পাওয়া যাবে।

বনবিহারীবাবু বললেন, 'পাণ্ডাটাণ্ডার কোনও দরকার নেই। এতে সুবিধের চেয়ে উৎপাতটাই বেশি। চলুন, আমার জানা শীতলদাসের ধরমশালায় নিয়ে যাই আপনাদের। একসঙ্গে থাকা যাবে, খাওয়াও মন্দ না। একদিনের তো মামলা। তারপর তো মোটরে করে হৃষিকেশ-লছমনঝুলা।'

কুলির মাথায় জিনিস চাপিয়ে প্রায় রাতের মতো অন্ধকারে আমরা পাঁচজন তিনটে টাঙ্গায় উঠে পড়লাম।—একটায় ফেলুদা আর আমি, একটায় বনবিহারীবাবু, আর একটায় বাবা আব শ্রীবাস্তব।

যেতে-যেতে ফেলুদা বলল, 'তীর্থস্থান মানেই নোংরা শহর। তবে একবার গঙ্গার ধারটায় গিয়ে বসতে পারলে দেখবি ভালোই লাগবে।'

খটখট-ঘড়ঘড় করতে-করতে আমাদের টাঙ্গা অলিগলির মধ্যে দিয়ে চলেছে। দোকান-টোকান এখনও একটাও খোলেনি। রাস্তার দুপাশে লোক কম্বল মুড়ি দিয়ে খাটিয়ায় শুয়ে ঘুমোচ্ছে। কেরোসিনের বাতি দু-একটা টিমটিম করে জ্বলছে এখানে সেখানে। কিছু বুড়ো লোক দেখলাম হাতে ঘটি নিয়ে রাস্তা হেঁটে চলেছে। ফেলুদা বলল, ওরা গঙ্গাস্নান যাত্রী। সূর্য যখন উঠবে তখন কোমরজলে দাঁড়িয়ে সূর্যের দিকে চেয়ে স্তব করবে। বাকি শহর এখনও ঘুমন্ত বললেই চলে।

আমাদের সামনের গাড়িটায় বনবিহারীবাবু ছিলেন। একটা সাদা একতলা থামওয়ালা বাড়ির সামনে সেটা থামল। আমাদের আর বাবাদের গাড়িও তার পিছনে থামল। বুঝলাম এটাই শীতলদাসের ধর্মশালা।

বাড়ির সামনের ফটকের ভেতর দেখতে পেলাম একটা বেশ বড় খোলা জায়গা, আর তার তিন পাশে বারান্দা আর ঘরের সারি।

ধর্মশালার চাকর এসে মালগুলো তুলে নিয়ে গেল। আমরা তার ফটকের পিছন গেট দিয়ে ঢুকছি, এমনসময় আরেকটা টাঙ্গা এসে ফটকের সামনে দাঁড়াল। তারপর দেখি, বেরিলি পর্যন্ত যে সন্ন্যাসী আমাদের সঙ্গে গিয়েছিলেন, তিনি সেই টাঙ্গা থেকে নামলেন। লোকটাকে দেখে আমি ফেলুদার কোটের আস্তিন ধরে একটা টান দিয়ে বললাম, 'এই সেই ট্রেনের সন্ন্যাসী, ফেলুদা!'

ফেলুদা একবার আড়চোখে লোকটার দিকে দেখে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে বলল, 'এই বাবাজির মধ্যেও তুই রহস্যজনক কিছু পেলি নাকি?'

'কিন্তু বারবার—'

'চোপ! চ' ভেতরে চ'।'

দুটো পাশাপাশি ঘরে আমাদের থাকার বন্দোবস্ত হল। একটাতে চারটে খাটিয়া পাতা রয়েছে,



তার মধ্যে একটাতে একজন লোক ঘুমোচ্ছে, আর বাকি তিনটে আমি, বাবা আর ফেলুদার জন্য ঠিক হল। পাশের ঘরে শ্রীবাস্তব আর বনবিহারীবাবুর ব্যবস্থা হল। বনবিহারীবাবুর ঘরেই দেখলাম সেই বাবাজিও আশ্রয় নিলেন।

মুখ-টুখ ধুয়ে চা বিস্কুট খেতে-খেতে সূর্য উঠে গেল, আর ধর্মশালাতেও লোকজন উঠে গিয়ে বেশ একটা গোলমাল শুরু হয়ে গেল। এখন বুঝতে পারলাম কতরকম লোক সেখানে এসে রয়েছে।

ছেলে বুড়ো মেয়ে পুরুষ বাঙালি হিন্দুস্থানি মারোয়াড়ি গুজরাটি মারাঠি মিলে হইচই হট্টগোল ব্যাপার।

বাবা বললেন, 'তোরা কি বেরোবি নাকি?'

ফেলুদা বলল, 'সেরকম তো ভাবছিলাম। একবার ঘাটের দিকটা ঘুরে এলে...'

'তাহলে সেই ফাঁকে আমি বনবিহারীবাবুর সঙ্গে গিয়ে কাল সকালের জন্য দুটো ট্যাক্সির ব্যবস্থা দেখি। আর একটা কাজ করো তো ফেলু—বাজারের দিকটা গিয়ে একবার দেখো তো যদি একটা এভারেডি টর্চ পাওয়া যায়। এ তো আর লখ্নৌ শহর না—ও জিনিস একটা হাতে রাখা ভালো।'

আমরা দুজনে বেরিয়ে পড়লাম। ফেলুদা বলল এত ছোট শহরে টাঙ্গা না নিয়ে হাঁটাই ভালো।

হাঁটতে-হাঁটতে বুঝলাম হরিদ্বার শহরে সত্যিই বেশ ঠান্ডা। আর গঙ্গার পাশে বলেই বোধহয় সমস্ত শহরটা একটা আবছা কুয়াশায় ঢেকে রয়েছে। ফেলুদাকে জিগ্যেস করতে ও বলল, 'যত না কুয়াশা তার চেয়ে বেশি উনুনের ধোঁয়া।'

ধর্মশালার সামনের রাস্তা দিয়ে কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে একজন লোককে জিগ্যেস করতেই সে ঘাটের পথ দেখিয়ে দিয়ে বলল, 'ইঁহাসে আধা মিল যানেসেই ঘাট মিল যায়গা।'

ঘাটে পৌঁছনোর কিছু আগে থেকেই একটা গন্ডগোল শুনতে পাচ্ছিলাম, শেষে বুঝতে পারলাম যে সেটা আসলে এত লোক একসঙ্গে স্নান করার গন্ডগোল। তার ওপর ঘাটের পথের দুদিকে ভিখিরি আর ফেরিওয়ালার সারি, তারাও কম চেঁচামেচি করছে না।

আমরা ভিড় ঠেলে ঘাটের সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেলাম। এরকম দৃশ্য আমি আর কখনও দেখিনি। জলের মধ্যে যেন একটা মেলা বসেছে। ঘাটের ওপরেই একটা মন্দির, তার থেকে আরতির ঘণ্টার আওয়াজ আসছে। এক জায়গায় গলায় কণ্ঠি পরা, কপালে তিলক কাটা একজন বৈষ্ণব গান গাইছে। তাকে ঘিরে একদল বুড়োবুড়ি বসে আছে। মানুষের আশেপাশে ছাগল কুকুর গোরুবাছুরও কিছু কম নেই।

ফেলুদা ঘাটের ধাপে একটা খালি জায়গা বেছে নিয়ে বসে পড়ে বলল, 'প্রাচীন ভারতবর্ষ যদি দেখতে চাস তো এই ঘাটের ধাপে কিছুক্ষণ বসে থাক।'

লখ্নৌ থেকে এই জায়গার ব্যাপারটা এত অন্যরকম যে, আমার মন থেকে আংটির ঘটনাটা প্রায় মুছেই যাচ্ছিল। ফেলুদারও কি তাই—না কি ও মনে-মনে রহস্য সমাধানের কাজ চালিয়েই চলেছে? ওকে সে কথাটা আর জিগ্যেস করতে সাহস হল না। ওর দিকে ফিরে দেখি, ও বেশ একটা খুশি-খুশি ভাব নিয়ে পকেট থেকে দেশলাই আর সিগারেট বের করেছে। বাবাদের সামনে তো খেতে পারে না, তাই এই সুযোগে খেয়ে নেবে।

সিগারেটটা মুখে পুরে দেশলাইয়ের বাক্সটা খুলতেই দেখলাম তার মধ্যে কী যেন একটা জিনিস ঝলমল করে উঠল।

আমি চমকে উঠে বললাম, 'ওটা কী, ফেলুদা?'

ফেলুদা ততক্ষণে দেশলাই বের করে বাক্স বন্ধ করে দিয়েছে। সে অবাক হওয়ার ভাব করে বলল, 'কোনটা?'

'ওই যে চকচক করে উঠল—দেশলাইয়ের বাক্সে?'

ফেলুদা কায়দা করে দু-হাতের আড়ালে গঙ্গার হাওয়ার মধ্যেও সিগারেটটা ধরিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'দেশলাইতে ফসফরাস থাকে জানিস তো? সেইটেই রোদে চকচক করে উঠেছে আর কি।'

আমি আর কিছু জিগ্যেস করতে পারলাম না, কিন্তু দেশলাইয়ের ওপর রোদ পড়ে এতটা ঝলমল করে উঠতে পারে, এ জিনিসটা আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিলাম না।

হরি-কা-চরণ ঘাট থেকে গঙ্গার দৃশ্য দেখে, দক্ষেশ্বরের মন্দির দেখে বাজারের মনিহারি দোকান

থেকে যখন আমরা তিন-সেলের একটা টর্চ কিনছি, তখন প্রায় সাড়ে দশটা বাজে। যতই ঘুরি না কেন, আর যা-ই দেখি না কেন, ফেলুদার দেশলাইয়ের বাক্সর মধ্যে ওই চকচকানির কথাটা আমি কিছুতেই ভুলতে পারছিলাম না। বারবার খালি মনে হচ্ছিল যে ওটা আসলে ওই আওরঙ্গজেবের আংটির হিরের চকচকানি। ফেলুদা যদি বলত ওটা একটা সিকি বা আধুলি—তাহলেও হয়তো বিশ্বাস করতে পারতাম, কিন্তু ফসফরাসের ব্যাপারটা যে একেবারে গুল, সেটা আমার বুঝতে বাকি ছিল না।

আর আংটিটা যদি সত্যিই ফেলুদার কাছে থেকে থাকে, আর সেটার পিছনে যদি সত্যিই ডাকাত লেগে থাকে, আর সে ডাকাত যদি জেনে থাকে যে ফেলুদার কাছেই আংটিটা আছে—তাহলে? সেটা সে জানে বলেই কি ফেলুদা ওসব হুমকি দেওয়া-দেওয়া কাগজ পাচ্ছে, আর ওর দিকে গুলতি দিয়ে ইট মারছে, আর লাঠির ডগায় ক্লোরোফর্মের ন্যাকড়া বেঁধে আমাদের ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে দিচ্ছে?

ফেলুদা কিন্তু সারা রাস্তা গুন-গুন করে গান গেয়েছে। একবার গান থামিয়ে আমায় বলল, 'খট বলে একটা রাগ আছে জানিস? এটা সেই রাগ। সকালে গাইতে হয়।'

আমি বলতে চেয়েছিলাম যে 'খট-টট জানি না, রাগ-রাগিণী জানি না—কিন্তু আমার ভীষণ রাগ হচ্ছে আর খটকা লাগছে তুমি আমায় ধাপ্পা দিলে কেন।' কিন্তু কথাটা আর বলা হল না, কারণ তখন আমরা ধর্মশালায় পৌঁছে গেছি। মনে-মনে ঠিক করলাম যে আজকের মধ্যেই ফেলুদার সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলতেই হবে।

ধরমশালার বারান্দায় দেখি বাবা, বনবিহারীবাবু, শ্রীবাস্তব আর একজন ধুতি-পাঞ্জাবি পরা বাঙালি ভদ্রলোক বসে গল্প করছেন।

বাবা আমাদের দেখেই বললেন, 'ট্যাক্সির ব্যবস্থা হয়ে গেছে—কাল ভোর ছ'টায় রওনা। বনবিহারীবাবুর চেনা থাকায় বেশ সস্তায় হয়ে গেল।'

বাঙালি ভদ্রলোক শুনলাম এলাহাবাদে থাকেন—নাম বিলাসবাবু। তিনি নাকি একজন নামকরা হাত-দেখিয়ে। আপাতত বনবিহারীবাবুর হাত দেখছেন। বনবিহারীবাবু বললেন, 'কোনও জানোয়ারের কামড়-টামড় খেয়ে মরব কি না সেটা একবার দেখুন তো।'

ভদ্রলোক হাতে একটা লবঙ্গ নিয়ে বনবিহারীবাবুর হাতের ওপর বুলোতে-বুলোতে বললেন, 'কই, তা তো দেখছি না। স্বাভাবিক মৃত্যু বলেই তো মনে হচ্ছে।'

হতে পারেন বিলাসবাবু হাত-দেখিয়ে, আমার কিন্তু তাঁর পা-টা দেখে ভারি অদ্ভুত লাগল। বুড়ো আঙুলটা তার পাশের আঙুলের চেয়ে প্রায় আধ ইঞ্চি বড়। আর সেটা দেখে মনে হল খুব রিসেন্টলি যেন আমি সেরকম পা দেখেছি। কিন্তু কোথায় বা কার পা সেটা মনে করতে পারলাম না।

বনবিহারীবাবু একটা হাঁপ-ছাড়াব শব্দ করে বললেন, 'যাক, বাঁচা গেল।'

'কেন মোশাই, আপনি কি শিকার করেন নাকি? বাঘ-ভাল্লুক মারেন?'

বিলাসবাবুর বাঙলায় একটা অবাঙালি টান লক্ষ করলাম।

বনবিহারীবাবু বললেন, 'নাঃ। তবু—এসব জেনে-টেনে রাখা ভালো। আমার এক খুড়তুতো ভাই—কোথাও কিছু নেই—হঠাৎ এক পাগলা কুকুরের কামড় খেয়ে হাইড্রোফোবিয়ায় মরল। তাই আর কি...'

'আপনি কি আগে কলকাতায় ছিলেন?' বিলাসবাবু জিগ্যেস করলেন।

বনবিহারীবাবু একটু অবাক হয়েই বললেন, 'ওটাও কি হাতের রেখায় পাওয়া যায় নাকি?'

'তাই তো দেখছি। আর...আপনার কি পুরোনো আমলের শিল্পদ্রব্য বা অন্য দামি জিনিস জমানোর শখ আছে?'

'আমার? না-না—আমার কেন? সে ছিল পিয়ারিলালের। আমার শখ জন্তুজানোয়ারের।'

'তাই কী? তাই কামড় খাওয়ার কথা বলছিলেন? কিন্তু...'

'কিন্তু কী?'

বনবিহারীবাবুকে বেশ উত্তেজিত বলে মনে হল। বিলাসবাবু প্রশ্ন করলেন, 'আপনার কি সম্প্রতি কোনও উদ্বেগের কারণ ঘটেছে?'

'সম্প্রতি মানে?'

'এই ধরুন—গত মাসখানেকের মধ্যে?'

বনবিহারীবাবু বেশ জোরে হেসে উঠে বললেন, 'মশাই—আমার, যাকে বলে, নট এ কেয়ার ইন দ্য ওয়র্লড। কোনও উদ্বেগ নেই। তবে হ্যাঁ—একটা অ্যাংজাইটি আছে এই যে, কাল লছমনঝুলায় গিয়ে একটা বারো ফুট অজগরের দেখা পাব কি না পাব।

বিলাসবাবুর বোধহয় আরেকটু দেখার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু বনবিহারীবাবু হঠাৎ হাত দুটো সরিয়ে নিয়ে একটা হাই তুলে বললেন, 'আসলে ব্যাপারটা কী জানেন—কিছু মনে করবেন না—এসব পামিস্ট্রি-ফামিস্ট্রিতে আমার বিশ্বাস নেই। আমাদের ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান সবই আমাদের হাতে বটে—কিন্তু সেটা হাতের রেখায় নয়। হাত বলতে আমি বুঝি ক্ষমতা, সামর্থ্য। সেইটের ওপরেই সব নির্ভর করে।'

এই বলে বনবিহারীবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে সোজা ঘরের ভিতর চলে গেলেন।

আমার চোখ আবার চলে গেল বিলাসবাবুর পায়ের দিকে।

অনেক ভেবেও কিছুতেই মনে করতে পারলাম না কোথায় দেখেছি ওরকম লম্বা বুড়ো আঙুলওয়ালা পা।

১০

সারাদিনের মধ্যে একবারও ফেলুদাকে সেই ঝলমলে জিনিসটার কথা জিগ্যেস করার সুযোগ পেলাম না।

রাত্রে বাবা যদিও বললেন, 'তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়, ভোরে উঠতে হবে—' তবুও খাওয়া-দাওয়া করে বিছানা পেতে শুতে-শুতে প্রায় দশটা হয়ে গেল।

লেপের তলায় যখন ঢুকছি, তখন আমাদের পাশাপাশি দুটো ঘরের মাঝখানের দরজা দিয়ে একটা বিকট নাক ডাকার আওয়াজ পেলাম।

ফেলুদা বলল, 'বিলাসবাবু।'

'আমি বললাম, 'কী করে জানলে?'

'কেন, কাল ট্রেনেও ডাকছিল—শুনিসনি?'

ট্রেনে? বিলাসবাবু ট্রেনেও ছিলেন? তাই তো। একটা রহস্যের হঠাৎ সমাধান হয়ে গেল।

'ওই বুড়ো আঙুল।'

ফেলুদা আস্তে করে আমার পিঠ চাপড়ে বলল, 'গুড।'

ঠিক কথা। আমাদের ওপরের বাঙ্কে উনিই সারা রাস্তা চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে ছিলেন। কেবল পায়ের ডগা দুটো বেরিয়েছিল বাঙ্ক থেকে, আর তখনই দেখেছিলাম ওই বুড়ো আঙুল।

কিন্তু এবার যে আসল প্রশ্নটা করতে হবে ফেলুদাকে। বাবার নড়াচড়া দেখে বুঝতে পারছিলাম উনি এখনও ঘুমোননি। বাবা না ঘুমোলে কথাটা বলা চলে না, তাই আরেকটু অপেক্ষা করতে হবে।

ধরমশালাটা ক্রমেই আরও নিঝুম হয়ে আসছে, আর তার সঙ্গে সমস্ত শহরটা। শীতকাল,



তাই এমনিতেই লোকে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ে। আমাদের ঘরের ভেতর অন্ধকার। বাইরে উঠোনে বোধহয় একটা লাইট জ্বলছে, আর তারই আলো আমাদের দরজার চৌকাঠে এসে পড়েছে। একবার আমাদের ঘরের মেঝে থেকে যেন খুট করে একটা শব্দ এল। বোধহয় ইঁদুর-টিদুর কিছু হবে।

এবার বাবার খাটিয়া থেকে শুনলাম ওঁর জোরে-জোরে নিশ্বাস পড়ার শব্দ। বুঝলাম উনি ঘুমিয়ে পড়েছেন। আমি ফেলুদার দিকে ফিরলাম। তারপর গলা নামিয়ে একেবারে ফিসফিস করে বললাম, 'ওটা আংটিই ছিল, তাই না?'

ফেলুদা কিছুক্ষণ চুপ। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আমারই মতো ফিস ফিস করে বলল,

'তুই যখন জেনেই ফেলেছিস, তখন আব তোব কাছে লুকোনোব কোনও মানে হয না। আংটিটা আমাব কাছেই বযেছে, সেই প্রথম দিন থেকেই। তোবা সব ঘুমিযে পডাব পব, ধীরুকাকাব ঘবে আলনায ঝোলানো ওঁব পাঞ্জাবিব পকেট থেকে চাবি নিযে আলমাবি খুলে আংটিটা বাব কবে নিই। বাক্সটা নিইনি যাতে ডেফিনিটলি বোঝা যায আংটিটা গেছে।'

'কিন্তু কেন নিলে আংটিটা?'

'কাবণ ওটা সবিয়ে বাখলে আসল ডাকাতকে উসকে দিযে তাকে ধবাব আবও সুবিধে হবে বলে।'

'তাহলে সেই সন্ন্যাসী কি আংটিটাই নিতে এসেছিলেন?'

'অম্বিকাবাবু নয, আবেকজন সন্ন্যাসী, যে নকল। যাব হাতে অ্যাটাচি কেস ছিল। সে-ই এসেছিল চুবি কবতে, কিন্তু গেট থেকেই বৈঠকখানায আবেকজন গেরুযাধাবীকে দেখে চম্পট দেয। তাবপব টাঙ্গা কবে স্টেশনে ওযেটিংরুমে ঢুকে পোশাক বদলে নেয।'

'সেই নকল সন্ন্যাসী কে?'

'একটা সন্দেহ আছে মনে, কিন্তু এখনও প্রমাণ পাইনি।'

'এতদিন ধবে তুমি ওই আংটি পকেটে নিযে ঘুবে বেডিযেছ?'

'না।'

'তবে?'

'একটা নিবাপদ জাযগায বেখে দিযেছিলাম।'

'কোথায?'

'ভুলভুলাইযাব একটা খুপবিব ভেতব।'

বাপবে বাপ কী সাংঘাতিক বুদ্ধি! এতদিনে বুঝতে পাবলাম ফেলুদাব দ্বিতীযবাব ভুলভুলাইযা যাওযাব এবং গিযে কিছুক্ষণেব জন্য হাবিযে যাওযাব কাবণটা। কিন্তু তবু মনে একটা খটকা লাগল, তাই জিগ্যেস কবলাম, 'কিন্তু তুমি তো ভুলভুলাইযাব প্ল্যান জানতে না।'

'প্রথম দিনই সেটাব একটা ব্যবস্থা কবেছিলাম। আমাব বাঁ হাতেব কডে আঙুলেব নখটা বড সেটা জানিস তো? প্রথম দিনে হাঁটবাব সময ভুলভুলাইযাব প্রত্যেকটি গলিব মুখে দেওযালেব গাযে নখ দিযে ঘষে ১, ২, ৩ কবে নম্বব দিযে বেখেছিলাম। সাত নম্বব গলিব খুপবিব মধ্যে ছিল আংটিটা। আমি জানতাম ওব চেযে নিবাপদ জাযগা আব নেই। এদিকে হবিদ্বাব যাব, অথচ আংটিটা লখ্নৌযে থেকে যাবে, এটা ভালো লাগছিল না, তাই সেদিন গিযে বেব কবে নিযে আসি।'

আমাব বুকেব ভেতবটা আবাব টিপটিপ কবতে আবম্ভ কবেছে। বললাম—

'কিন্তু সে ডাকাত যদি সন্দেহ কবে যে, তোমাব কাছে আংটিটা আছে?'

'সন্দেহ কবলেই বা। প্রমাণ তো নেই। আমাব বিশ্বাস সন্দেহ কবেনি, কাবণ অত বুদ্ধি ওদেব নেই।'

'কিন্তু তাহলে তোমাব পিছনে এভাবে লেগেছিল কেন?

'তাব কাবণ, আংটিব লোভ ওবা ছাডতে পাবছে না। আব ওবা জানে যে আমি যদ্দিন আছি, তদ্দিন ওদেব সব প্ল্যান ভন্ডুল কবে দেওযাব ক্ষমতা আমাব আছে।'

'কিন্তু—' আমাব গলা শুকিযে প্রায আওযাজই বেবোচ্ছিল না, কোনওবকমে ঢোক গিলে তবে কথাটা শেষ কবতে পাবলাম,—'তাব মানে তো তোমাব সাংঘাতিক বিপদ হতে পাবে।'

'বিপদেব মুখে ঝাঁপিযে পডাই তো ফেলু মিত্তিবেব ক্যাবেকটাব।'

'কিন্তু—'

'আব কিন্তু না। এবাব ঘুমো।'

ফেলুদা একটা তুডি মেবে হাই তুলে পাশ বদল কবল।

ধরমশালা এখন একেবারে চুপ। দূরে রাস্তায় একটা কুকুর ডেকে উঠল। পাশের ঘরে নাক ডাকার শব্দ একটানা চলেছে। ঘুম কি আসবে? ফেলুদার টেক্কামার্কা দেশলাই-এর বাক্সে রোদের আলোতে ঝলমল করা বাদশাহী আংটির কথাটা কিছুতেই ভুলতে পারছিলাম না। এই আংটির ব্যাপারে কী অদ্ভুত সাহসের সঙ্গে ফেলুদা নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছে তা ভাবতেও অবাক লাগে। অথচ এটাও ঠিক যে, ও যদি না থাকত, তাহলে হয়তো আংটি চুরিও হয়ে যেত, আর চোর ধরাও পড়ত না।

'কির্‌র্‌র্‌ কিট্‌ কিট্‌ কিট...কিররর কিট কিট কিট...কিরর কিট কিট্‌ কিট্‌ কিট্‌...'

পাশের ঘর থেকে—কিন্তু মনে হয় যেন অনেক দূর থেকে—র‍্যাটল স্নেকের আওয়াজ পেলাম। বুঝলাম বনবিহারীবাবু তাঁর প্রিয় সংগীত শুনছেন।

আর এই ঝুমঝুমির আওয়াজ শুনতে-শুনতে বোধহয় ঘুমটা এসে গিয়েছিল।

বাবার ট্র্যাভলিং ক্লক-এ পাঁচটার সময় অ্যালার্ম দেওয়া ছিল, কিন্তু আমার ঘুম ভেঙে গেল সেটা বাজার একটু আগেই। তাড়াতাড়ি মুখটুখ ধুয়ে চা-টা খেয়ে তৈরি হয়ে নিলাম। সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার জন্য খাবারের কথা বলতে শ্রীবাস্তব বললেন, 'লছমনঝুলায় একেবারে ব্রিজের মুখেই দোকানে চমৎকার পুরি-তরকারি পাবেন। খাবার নেওয়ার দরকার নেই।'

সকলেই বেশ ভালো করে গরম জামা পরে নিয়েছিলাম। কারণ পথে তো ঠান্ডা হবেই, আর লছমনঝুলার হাইট বেশি বলে সেখানে এমনিতেই এখানের চেয়ে বেশি ঠান্ডা।

পৌনে ছ'টার সময় দুটো ট্যাক্সি পরপর এসে ধরমশালার গেটের সামনে দাঁড়াল। আমাদের সঙ্গে-সঙ্গে দেখলাম বিলাসবাবুও এসেছেন। শুনলাম উনিও লছমনঝুলা যাবেন বলে আমাদের দলে ঢুকে পড়েছেন। কোন গাড়িতে উঠব ভাবছি, এমনসময় বনবিহারীবাবু এগিয়ে এসে বললেন, 'তিনজন তিনজন করে ভাগাভাগি হয়ে যেতে হবে অবশ্যই। জানোয়ার সম্বন্ধে আমার কিছু ইন্টারেস্টিং গল্প আছে, তপেশবাবু যদি চাও তো আমার গাড়িতে আসতে পার।'

আমি বললাম, 'শুধু আমি কেন, ফেলুদাও নিশ্চয় শুনতে চাইবে।'

ফেলুদা কোনও আপত্তি করল না। তাই শেষপর্যন্ত আমি, ফেলুদা আর বনবিহারীবাবু একটা গাড়িতে, আর বাবা, শ্রীবাস্তব আর বিলাসবাবু অন্য গাড়িটায় উঠলাম। শ্রীবাস্তবের সঙ্গে দেখলাম বিলাসবাবুর বেশ ভাব হয়ে গেছে।

সামনের সিটে ড্রাইভারের পাশে বনবিহারীবাবু তাঁর কাঠের বাক্সটা রাখলেন। বললেন, 'এইটেতে আমার অজগর আসবে।' পিছনের সিটের মাঝখানে ফেলুদা, আর দুপাশে আমি আর বনবিহারীবাবু বসলাম।

ঠিক সোয়া ছ'টার সময় আমাদের গাড়ি দুটো একসঙ্গে রওনা দিল।

শহর ছাড়িয়ে খোলা জায়গায় পৌঁছতে আরও পাঁচ মিনিট লাগল। সামনে পাহাড়। ডানদিকে চেয়ে থাকলে মাঝে-মাঝে গঙ্গা দেখা যাচ্ছে। আমার মনটা খুশিতে ভরে উঠল। বনবিহারীবাবুও বোধহয় বেশ ফুর্তিতেই আছেন, কারণ গুন-গুন করে গান ধরেছেন। বোধহয় অজগরের আশাতেই ওঁর মনের এই ভাব।

ফেলুদাই কেবল দেখলাম একেবারে চুপ মেরে গেছে। কী ভাবছে ও? আংটিটা কি এখনও ওর পকেটেই আছে? সেটা জানার কোনও উপায় নেই। কারণ ও বনবিহারীবাবুর সামনে সিগারেট খাবে না।

বাবাদের ট্যাক্সিটা আমাদের সামনেই চলেছে। ট্যাক্সির পিছনের কাচের ভেতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে বিলাসবাবু শ্রীবাস্তবকে কী সব যেন বোঝাচ্ছেন। হয়তো শ্রীবাস্তব এই ফাঁকতালে তাঁর হাতটা দেখিয়ে নিচ্ছেন।

বনবিহারীবাবু হঠাৎ বললেন, 'শিশির-ভেজা রাস্তা থেকে এখনও ধুলো উঠছে না, কিন্তু রোদের তেজ বাড়লে উঠবে। আমার মনে হয় ওদের একটু এগিয়ে যেতে দেওয়া উচিত। এই ড্রাইভার—একটু আস্তে চালাও তো দিকি।'

দাড়িওয়ালা পাগড়িপরা পাঞ্জাবি ড্রাইভার বনবিহারীবাবুর কথামতো গাড়ির স্পিড কমিয়ে দিল, আর তার ফলে বাবাদের ট্যাক্সি বেশ কিছুদূর এগিয়ে গেল। ধুলো হোক আর যাই হোক, আমি মনে-মনে চাইছিলাম গাড়ি দুটো যেন কাছাকাছি একসঙ্গে চলে, কিন্তু বনবিহারীবাবুর আদেশের ওপর কিছু বলতে সাহস হল না। ভদ্রলোক জানোয়ারের গল্প আরম্ভ করবেন কখন?

একটা গাড়ি যেন পিছন থেকে বেশ কিছুক্ষণ ধরে বারবার হর্ন দিচ্ছে। বনবিহারীবাবু বললেন, 'এ তো জ্বালাল দেখছি। পাশ দাও হে ড্রাইভার, পাশ দাও—নইলে প্যাঁক-প্যাঁক করে কান ঝালাপালা করে দেবে।'

ড্রাইভার বাধ্যভাবে গাড়িটাকে রাস্তার একটু বাঁ-দিকে নিল, আর অমনি একটা পুরোনো ধরনের শেভ্রোলে ট্যাক্সি আমাদের গাড়ির পাশ দিয়ে হুশ করে বেরিয়ে এগিয়ে গেল। যাওয়ার সময় দেখলাম যে, সে-গাড়ির পিছনের সিটে বসা একজন লোক মুখ বের করে আমাদের দিকে দেখে নিল।

এ আমাদের চেনা লোক—সেই বেরিলি পর্যন্ত যাওয়া গেরুয়াধারী সন্ন্যাসী।

১১

আমরা আগেই ঠিক করেছিলাম যে প্রথমে লছমনঝুলা যাব, তারপর সেখানে বেশ কিছুক্ষণ থেকে দুপুরের খাওয়া সেরে ফেরার পথে হৃষিকেশটা দেখে আসব। সত্যি বলতে কি, হৃষিকেশ সম্বন্ধে আমার খুব বেশি উৎসাহ ছিল না। সেও তো তীর্থস্থান—পাণ্ডা ধর্মশালা অলিগলি ঘাট মন্দির, এইসব—কেবল গঙ্গাটা একটু অন্যরকম।

বনবিহারীবাবু এখন ফেলুদার গানটা ধরেছেন—

'যব ছোড় চলে লখ্নৌ নগরী
তব হাল আদ্ পর ক্যা গুজরী!'..

গান থামিয়ে হঠাৎ বনবিহারীবাবু বললেন, 'এই গানের সুরে জ্যোতি ঠাকুরের একটা বাংলা গান আছে জানো?'

ফেলুদা বলল, 'জানি—"কত কাল রবে বল ভারত হে"।'

'ঠিক বলেছ।'

তারপর আমার দিকে ফিরে বনবিহারীবাবু বললেন, 'Steal মানে হরণ, Horn মানে শিং, Sing মানে গান, Gun মানে কামান, Come on মানে আইস, I Saw মানে আমি দেখিয়াছিলাম--এটা জানো?'

এটা আমি জানতাম না; শুনে খুব মজা লাগল, আর মনে-মনে মুখস্থ করে নিলাম।

বনবিহারীবাবু বললেন, 'এটার জন্যই বোধহয় আমার গান বলতেই বন্দুকের কথা মনে পড়ে, আর বন্দুক বলতেই জিম করবেট। শিকারি করবেটের কথা জানো তো?'

ফেলুদা বলল, 'জানি।'

'তিনি কিন্তু এইসব অঞ্চলে মানুষখেকো বাঘ মেরে গেছেন। আমার করবেটকে কেন এত ভালো লাগে জান? কারণ উনিও আমার মতো জানোয়ারদের স্বভাব বুঝতেন, ওদের ভালোবাসতেন।'

এই বলে আবার গুন-গুন করে গান ধরলেন বনবিহারীবাবু।



গাড়ি ছুটে চলেছে লছমনঝুলার দিকে। বাঁ-দিকে পাহাড়, সামনে পাহাড়, ডানদিকে মাঝে-মাঝে গঙ্গাটা দেখা যাচ্ছে, মাঝে-মাঝে ঘন জঙ্গল। আকাশে মেঘ জমছে। সূর্যটা এক-একবার মেঘে ঢেকে যাচ্ছে, আর তক্ষুনি বাতাসটা আরও ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে।

আমি প্রথম দিকে কেবল লছমনঝুলার কথাই ভাবছিলাম, এখন আবার মাঝে-মাঝে আংটির ব্যাপারটা মনটাকে খোঁচা দিতে আরম্ভ করেছে। অনেক কিছু নতুন জিনিস এ দুদিনে জানতে পেরেছি, কিন্তু আরও অনেক কিছুই যে এখনও জানতে বাকি আছে। মহাবীর কেন সন্দেহ করে যে পিয়ারিলাল স্বাভাবিক ভাবে মারা যাননি? পিয়ারিলাল কীসের জন্য চিৎকার করেছিলেন মারা যাওয়ার আগে?

পিয়ারিলাল কোন স্পাই-এর কথা বলতে চেয়েছিলেন? সে স্পাই কি আমার চেনার মধ্যে কেউ, না চেনার বাইরে?

এইসব ভাবতে-ভাবতে আমার চোখটা গাড়ির সামনে আয়নাটার দিকে চলে গেল। আয়নায় ফেলুদাকে দেখা যাচ্ছে। সে অদ্ভুত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে সামনের দিকে চেয়ে কী জানি দেখছে।

এবার আমি আড়চোখে ফেলুদার দিকে চেয়ে দেখি সে দেখছে তার সামনেই বসা ড্রাইভারেব দিকে।

আমার চোখটাও প্রায় আপনা থেকেই ঘুরে ড্রাইভারের দিকে গেল, আর সেদিকে দৃষ্টি পড়তেই আমার বুকের ভেতরটা ছাঁৎ করে উঠল।

ড্রাইভারের পাগড়িব নিচে আর কোটের কলারের ঠিক ওপরে ঘাড়ের মাঝখানে আঁচড়ের দাগ।

এরকম দাগ আমরা আরেকজনের ঘাড়ে দেখেছি।

সে হল গণেশ গুহ।

আবার ফেলুদার দিকে চেয়ে দেখি সে দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিয়ে জানালার বাইরে দেখছে। তাকে এমন গম্ভীর এর আগে আমি কখনও দেখিনি।

কোয়ালিটি রেস্টুরেন্টে বসে গণেশ গুহ বলেছিল সে বনবিহারীবাবুর চাকরি ছেড়ে দিয়ে সেই দিনই কলকাতায় চলে যাচ্ছে। আর আজ সে পাঞ্জাবি ড্রাইভারের ছদ্মবেশে আমাদের নিয়ে চলেছে লছমনঝুলা! হঠাৎ মনে পড়ল বনবিহারীবাবুই এই ট্যাক্সি ঠিক করে দিয়েছেন। তাহলে কী...?

আমি আর ভাবতে পারলাম না। আমার মাথা ভোঁ-ভোঁ করতে আরম্ভ করেছে। আমরা কোথায় চলেছি এখন? লছমনঝুলা, না অন্য কোথাও? বনবিহারীবাবুর উদ্দেশ্যটা কী? অথচ তাঁকে দেখে তো তাঁর মনে কোনওরকম উত্তেজনা বা দুরভিসন্ধি আছে বলে মনে হয় না।

হঠাৎ বনবিহারীবাবুর গলার আওয়াজে চমকে উঠলাম।

'আমরা বাঁয়ে একটা রাস্তা ধরব এবার। ওই জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে রাস্তাটা গেছে। কিছুদূর গেলেই একটা বাড়ি পাব, সেখানেই আমার অজগরটা থাকার কথা। যাওয়ার সময় একবার দেখে যাই, ফেরার পথে একেবারে বাক্সে পুরে নিয়ে গাড়িতে তুলে নেব। কী বলেন ফেলুবাবু?'

আশ্চর্য শান্তভাবে ফেলুদা বলল, 'বেশ তো।'

আমি কিন্তু একটা কথা না বলে পারছিলাম না—

'আপনি যে বলেছিলেন অজগরটা লছমনঝুলায় আছে?'

বনবিহারীবাবু হো-হো করে হেসে উঠে বললেন, 'এটা যে লছমনঝুলা নয় সেটা তোমাকে কে বলল তপেশবাবু? হাওড়া বলতে কি কেবল হাওড়ার পুল আর তার আশপাশটা বোঝায়? লছমনঝুলা শুরু হয়ে গেছে এখান থেকেই। গঙ্গার ব্রিজ এখান থেকে মাইল দেড়েক।

শালবনের মধ্যে দিয়ে আগাছায় ঢাকা, প্রায় দেখা যায় না, এমন একটা পথ ধরে গাড়িটা বাঁ-দিকে ঘুরল। লক্ষ করলাম ড্রাইভারটা এবার বনবিহারীবাবুর নির্দেশের অপেক্ষাও করল না— যেন তার আগে থেকেই জানা ছিল এ রাস্তা দিয়ে যেতে হবে।

'কেমন লাগছে ফেলুবাবু?'

বনবিহারীবাবুর গলায় একটা নতুন সুর। কথাগুলোর পিছনে যেন একটা চাপা উত্তেজনা লুকোনো রয়েছে।

'দারুণ!'

কথাটা বলেই ফেলুদা তার বাঁ-হাতটা দিয়ে আমার ডান-হাতটা ধরে আস্তে একটা চাপ দিল: বুঝতে পারলাম ও বলতে চাইছে—ভয় পাস না, আমি আছি।

'রুমাল এনেছিস, তোপ্‌সে?'

ফেলুদার এ-প্রশ্নটার জন্য আমি একেবারেই তৈরি ছিলাম না, তাই কীরকম ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলাম।

'রু-রুমাল?'

'রুমাল জানিস না?'

'হ্যাঁ—কিন্তু...ভুলে গেছি।'

বনবিহারীবাবু বললেন, 'ধুলোর জন্যে বলছ? এখানে কিন্তু ধুলোটা কম হবে।'

'না, ধুলো না'—বলে ফেলুদা তার কোটের পকেট থেকে একটা রুমাল বের করে আমার পকেটে গুঁজে দিল। কেন যে সে এটা করল তা বুঝতেই পারলাম না।

বনবিহারীবাবু তাঁর টেপরেকর্ডারটা নিজের কোলের ওপর নিয়ে সেটাকে চালিয়ে দিলেন। শালবনের ভেতর হাইনা হেসে উঠল।

বন এখন আরও গভীর। সূর্যের আলো আর আসছে না এখানে। এমনিতেই মেঘ আরও ঘন হয়েছে। বাবাদের গাড়ি এখন কোথায়? লছমনঝুলা পৌঁছে গেছে কি? আমাদের যদি কিছু হয়, ওঁরা টেরও পাবেন না। সেই জন্যেই কি বনবিহারীবাবু ওঁদের গাড়িটা এগিয়ে যেতে দিলেন?

মনে যত জোর আছে, সাহস আছে, সব একসঙ্গে জড়ো করার চেষ্টা করলাম। কেন জানি বুঝতে পারছিলাম ফেলুদার ওপর যতই ভরসা থাকুক না কেন, আজ যে অবস্থায় পড়তে হবে ওকে, তাতে ওর যত বুদ্ধি, যত সাহস আছে, সবটুকু দরকার হবে।

গাড়ি আরও গভীর বনের মধ্যে দিয়ে চলেছে এখন। বনবিহারীবাবু আর গান গাইছেন না। এখন কেবল ঝিঁঝির ডাক আর মোটরের চাকার তলায় আগাছার খসখসানি।

প্রায় দশ মিনিট চলার পর গাছের গুঁড়ি আর পাতার ফাঁক দিয়ে কিছু দূরে একটা বাড়ি দেখা গেল। এরকম জায়গায় এত গভীর বনের ভেতর কে আবার বাড়ি তৈরি করল? হঠাৎ মনে পড়ল, আমার এক দূর সম্পর্কের কাকা আছেন যিনি সুন্দরবনের কোথায় যেন ফরেস্ট অফিসার। তাঁরও এরকম একটা বাড়ি আছে শুনেছি—আশেপাশে বাঘ ঘোরাফেরা করে। এও হয়তো সেই ধরনের একটা বাড়ি।

আরেকটু কাছে গিয়ে বুঝতে পারলাম বাড়িটা কাঠের তৈরি, আর সেটা বহু পুরোনো। শুধু তাই না, বাড়িটা আসলে একটা মাচার ওপর তৈরি। একটা কাঠের সিঁড়ি দিয়ে সেই মাচায় উঠতে হয়। বাইরে থেকে দেখে মনেই হয় না সেখানে কোনও লোক থাকে।

আমাদের ট্যাক্সি বাড়িটার সামনে এসে থামল। বনবিহারীবাবু বললেন, 'পাঁড়ে আছেন বলে তো মনে হয় না। তবে এসেইছি যখন, তখন ভেতরে গিয়ে একটু অপেক্ষা করা যাক। হয়তো কাছাকাছির মধ্যেই কোথায় গেছেন কাঠটাঠ সংগ্রহ করতে বোধ হয়। একা মানুষ তো, সব নিজেই করেন। আর ওঁর অত জানোয়ারের ভয় নেই। আমারই মতো। এসো ফেলুচন্দ্র, তপেশচন্দ্র ভেতরে গিয়ে বসা যাক। মেকি সন্ন্যাসী তো অনেক দেখলে। এবার একজন সত্যিকারের সাধুপুরুষ কীভাবে থাকেন দেখবে চল।'

আমরা তিনজন গাড়ি থেকে নামলাম। ফেলুদা না থাকলে আমার মনের অবস্থা যে কী হত জানি না। এখনও যে সাহস পাচ্ছি তার একমাত্র কারণ হল ফেলুদার নির্বিকার ভাব। এক-এক সময় তাই মনে হচ্ছে বিপদটা হয়তো আসলে আমার কল্পনা। আসলে ড্রাইভার সত্যিকারের শিখ ড্রাইভার, আর বনবিহারীবাবু খুব ভালো লোক, আর এই বাড়িটায় সত্যিকারের পাঁড়েজি বলে একজন সাধুপুরুষ থাকেন যাঁর কাছে একটা বারো ফুট লম্বা অজগর সাপ আছে, আর সেটা দেখার জন্যই বনবিহারীবাবু এখানে আসছেন।

আগাছা আর শুকনো শালপাতার ওপর দিয়ে হেঁটে কাঠের সিঁড়িটা দিয়ে উঠে আমরা বাড়িটার ভেতরে ঢুকলাম।

যে ঘরটায় ঢুকলাম সেটা সাইজে আমাদের ট্রেনের কামরার চেয়ে খুব বেশি বড় নয়। ঢোকার দরজা ছাড়াও আরেকটা আছে, সেটা দিয়ে পাশের আরেকটা ঘরে যাওয়া যায়—কিন্তু মনে হল সে দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ। দুটো দরজার উলটো দিকে দুটো ছোট্ট জানালাও রয়েছে। জানালা দিয়ে বাইরের শালবন দেখা যাচ্ছে। মাচাটার হাইট একটা মানুষের বেশি নয়।

বনবিহারীবাবু কাঁধে ঝোলানো টেপরেকর্ডার মাটিতে নামিয়ে রেখে বললেন, 'পাঁড়েজির কেমন সরল জীবনযাত্রা, দেখেই বুঝতে পারছ।'

ঘরের মধ্যে একটা ভাঙা টেবিল, একটা হাতল ভাঙা বেঞ্চি, আর একটা টিনের চেয়ার। ফেলুদা বেঞ্চিটার ওপর বসল দেখে আমিও তার পাশে গিয়ে বসলাম।

বনবিহারীবাবু তাঁর পাইপে তামাক ভরে তাতে আগুন দিয়ে, দেশলাইটা জানালা দিয়ে বাইরে ফেলে দিয়ে, টিনের চেয়ারটা মজবুত কি না হাত দিয়ে চেপে পরীক্ষা করে, মুখ দিয়ে একটা আরামের শব্দ করে সেটার ওপর বসলেন। তারপর পাইপটাতে একটা বিরাট টান দিয়ে ঘরটাকে প্রায় ধোঁয়ায় ভরে দিয়ে, চাপা অথচ পরিষ্কার গলায় ভীষণ স্পষ্ট উচ্চারণে বললেন—

'তারপর, ফেলুবাবু—আমার আংটিটা যে এবার ফেরত চাই!'

১২

'আপনার আংটি?'

বনবিহারীবাবুর কথাটা যে ফেলুদাকে বেশ অবাক করেছে সেটা বুঝতে পারলাম।

বনবিহারীবাবু ঠোঁটের কোণে পাইপ আর একটা অল্প হাসি নিয়ে চুপ করে বসে রইলেন। বাইরে ঝিঁঝির শব্দ কমে এসেছে। ফেলুদা বলল—

'আর সে আংটি যে আমার কাছে রয়েছে তা আপনি কী করে জানলেন?'

বনবিহারীবাবু এবার কথা বললেন।

'অনুমান অনেক দিন থেকে করছিলাম। বাইরের একটা লোক এসে ধীরুবাবুর শোওয়ার ঘরের আলমারি খুলে তার থেকে আংটি বের করে নিয়ে যাবে, এটা প্রথম থেকেই কেমন যেন অবিশ্বাস্য লাগছিল। তবে তোমার ওপর সন্দেহ গেলেও, এতদিন প্রমাণ পাইনি। এখন পেয়েছি।'

'কী প্রমাণ?'

বনবিহারীবাবু উত্তরে কিছু না বলে মেঝে থেকে টেপরেকর্ডারটা কোলে তুলে নিয়ে ঢাকনা খুলে সুইচ টিপে দিলেন। যা শুনলাম তাতে আমার রক্ত জল হয়ে গেল। চাকা ঘুরছে, আর যন্ত্রটা থেকে আমার আর ফেলুদার গলার স্বর বেরোচ্ছে—

'ওটা আংটিই ছিল—তাই না?'

'তুই যখন জেনেই ফেলেছিস, তখন আর তোর কাছে লুকোনোর কোনও মানে হয় না। আংটিটা আমার কাছেই রয়েছে—সেই প্রথম দিন থেকেই।—'

বনবিহারীবাবু খট করে রেকর্ডারের সুইচ বন্ধ করে দিলেন। তারপর বললেন, 'কাল রাত্রে তোমরা শোওয়ার আগেই মাইক্রোফোনটা তোমাদের খাটিয়ার তলায় রেখে এসেছিলাম। অবিশ্যি তোমরা যে ঠিক এই বিষয়েই কথাবার্তা বলবে সেটা আমার জানা ছিল না, কিন্তু যখন বলেইছ, তখন কি আর এ সুযোগ ছাড়া যায়? এর চেয়ে বেশি প্রমাণ কী দরকার আছে তোমার—অ্যাঁ, ফেলুবাবু?'

'কিন্তু আংটিটা আপনার, সে কথা আপনি বলছেন কী করে?'

বনবিহারীবাবু রেকর্ডারটা টেবিলের ওপর রেখে দিয়ে পায়ের ওপর পা তুলে চেয়ারে হেলান



দিয়ে বললেন, '১৯৪৮ সালে, অর্থাৎ আজ থেকে আঠারো বছর আগে, কলকাতাব নৌলাখা কোম্পানি থেকে দু-লাখ টাকা দিয়ে আমি ও আংটিটা কিনি। পিয়ারিলালের সঙ্গে আমার আলাপ হয় তাব কিছু পরেই। তাঁর যে এসব জিনিসের শখ ছিল সেটা তিনি আমাকে বলেননি, কিন্তু আংটিটা আমি তাঁকে দেখিয়েছিলাম। দেখে তাঁর চোখ-মুখের অবস্থা যা হয়েছিল, তাতেই আমার মনে একটা সন্দেহ জাগে। তার দু-দিন পরেই আংটিটা আমার বাড়ি থেকে লোপ পেয়ে যায়। পুলিশে খবর দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু চোর ধরা পড়েনি। তারপর লখ্নৌ এসে ক'বছর থাকার পর এই সেদিন শ্রীবাস্তবের কাছে আংটিটা দেখে জানতে পারি পিয়ারিলাল সেটা তাঁকে দিয়েছেন। পিয়ারিলাল ভাবেননি তিনি

প্রথম অ্যাটাকটা থেকে বেঁচে উঠবেন। তাই মানে-মানে চোরাই মাল অন্যের হাতে চালান করে দিয়েছিলেন। কিন্তু তারপর তিনি সুস্থ হয়ে উঠলেন। আমি তাঁর আরোগ্যের সুযোগ নিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। ভাবলাম, তিনি যদি ব্যাপারটা স্বীকার করেন, তাহলে শ্রীবাস্তবকে বললে নিশ্চয়ই আমাকে আংটিটা দিয়ে দেবেন। শ্রীবাস্তবকে তার দরুন কিছু টাকাও দিতে রাজি ছিলাম আমি। কিন্তু আশ্চর্য কী জান? পিয়ারিলাল চুরির ব্যাপারটা বেমালুম অস্বীকার করে গেলেন। বললেন, আমার কাছে ওরকম আংটি উনি কোনওদিন দেখেননি। অথচ সে আংটির রসিদ পর্যন্ত রয়েছে এখনও আমার কাছে।'

এবার ফেলুদা কথা বলল, আর তার গলার স্বরে ভয়ের কোনও চিহ্নমাত্র নেই।

'কিন্তু বনবিহারীবাবু, আমি এবার আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই—আশা করি আপনি তার জবাব দেবেন।'

বনবিহারীবাবু বললেন, 'আগে বলো সে-আংটি এখনও তোমার কাছেই রয়েছে, না তুমি সেটা অন্য কোথাও রেখে এসেছ। নিজের জিনিস আমি নিজের হাতেই ফেরত নিতে চাই।'

এবারে ফেলুদার গলায় বিদ্রূপের ইঙ্গিত—

'কিন্তু এত দিন তো অন্য লোক লাগিয়ে আংটি চুরির চেষ্টার ব্যাপারে, এবং আমার পিছনে লাগার ব্যাপারে আপনার উৎসাহের কোনও অভাব দেখিনি। আপনার ওই গণেশ গুহ লোকটি—যিনি আজ দাড়ি-পাগড়ি পরে পাঞ্জাবি ড্রাইভার সেজেছেন, তিনিই তো বোধহয় সেই নকল সন্ন্যাসী, তাই না? শ্রীবাস্তবের বাড়ির ডাকাতও তো বোধহয় তিনিই, আর প্রথম দিন শ্রীবাস্তবকে ধাওয়া করার ভারও তো তাঁর ওপরেই ছিল। অবিশ্যি পরে শ্রীবাস্তবকে ছেড়ে আমার পিছনে লাগানো হয় তাকে। রেসিডেন্সিতে গুলতি মারা, ক্লোরোফর্ম দিয়ে আমাকে অজ্ঞান করার চেষ্টা, হুমকি-কাগজ ছুঁড়ে মারা—এ সবই তো তার কাজ, তাই না?'

বনবিহারীবাবু একটু হেসে বললেন, 'সব কাজ তো আর নিজে করা যায় না ফেলুরাম। এমন কিছু-কিছু কাজ সব সময়েই থাকে যার ভার অন্যের ওপর দিতে হয়। আর বুঝতেই তো পারো—গণেশের স্বাস্থ্যটা তো ভালো, কারণ সে এককালে সার্কাসে বাঘ সিংহ হ্যান্ডল করেছে—সুতরাং ডানপিটেমোর কাজগুলো সে ভালোই করে। আর এটা আমি অবশ্যই বলব যে, আমার হুকুমে এসব কাজগুলো করে সে যে-অপরাধ করেছে, তোমার অপরাধ তার চেয়ে অনেক বেশি। কারণ তুমি যে-আংটি তোমার কাছে ধরে রেখেছ, তাতে তোমার কোনও অধিকার নেই। ওটা আমার জিনিস, আমার প্রপার্টি। এবং সেটা আমার ফেরত চাই—আজই, এখনই!'

শেষ কথাগুলো বনবিহারীবাবু বললেন প্রায় চিৎকার করে। মনে সাহস আনার অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও আমার হাত-পা কীরকম যেন ঠান্ডা হয়ে আসছিল।

ফেলুদার উত্তরটা এল ইস্পাতের মতো কঠিন স্বরে—

'খুনের দায়ে অভিযুক্ত হলে পর ও-আংটি কি আপনার কোনও কাজে আসবে?'

বনবিহারীবাবু প্রায় কাঁপতে-কাঁপতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

'তুমি তো কম বেয়াদব নও হে ছোকরা। যাকে তাকে ফস করে খুনি বলে দিচ্ছ।'

'যাকে তাকে বলতে যাব কেন। আমার বিশ্বাস খুনিকেই খুনি বলছি। আপনি পিয়ারিলালের স্পাই-এর ব্যাপারটা একটু খুলে বলবেন কি? পরশু আপনার কথা শুনে মনে হয়েছিল আপনার ও সম্বন্ধে কিছু জানা আছে।'

বনবিহারীবাবু একটা শুকনো হাসি হেসে বললেন, 'ভেরি সিম্পল। খুলে বলার কিছু নেই। আমি আংটিটা সম্পর্কে খোঁজখবর করার জন্য ওঁর পিছনে কিছু লোক লাগিয়েছিলাম। পিয়ারিলাল নিশ্চয়ই তাদের সম্পর্কে কিছু বলতে চেয়েছিলেন।'

'আমি যদি বলি পিয়ারিলালের স্পাই-এর সঙ্গে গুপ্তচরের কোনও সম্পর্ক নেই?'

'তার মানে? কী বলতে চাইছ তুমি?'

'আপনি পিয়ারিলালের দ্বিতীয় অ্যাটাকের দিন সকালে তাঁর বাড়িতে গিয়েছিলেন, তাই না?'

'তাতে কী হয়েছে? আমি গেলেই তাঁর অ্যাটাক হবে? তাঁর বাড়িতে তো আগেও গিয়েছি আমি।'

'তখন তো খালি হাতে গেছেন।'

'খালি হাতে মানে?'

'কিন্তু এই শেষবার আপনি খালি হাতে যাননি। আপনার সঙ্গে একটা বাক্স ছিল, আর সেই বাক্সের মধ্যে ছিল আপনার চিড়িয়াখানার একটা অধিবাসী—আপনার বিশাল, বিষাক্ত আফ্রিকান মাকড়সা—ব্ল্যাক উইডো স্পাইডার, তাই না? পিয়ারিলাল বলতে চেয়েছিলেন 'স্পাইডার', কিন্তু পুরো কথাটা সেই অবস্থায় উচ্চারণ করা সম্ভব হয়নি, তাই স্পাইডার হয়ে গিয়েছিল 'স্পাই'।'

বনবিহারীবাবুর মুখ হঠাৎ জানি কেমন ফ্যাকাসে হয়ে গেল। তিনি আবার চেয়ারে বসে পড়লেন। বললেন, 'কিন্তু...তাঁকে আমি মাকড়সা দেখিয়ে করবটা কী?'

ফেলুদা বলল, 'পিয়ারিলালের আরশুলা দেখে হৃৎকম্প হয় সেটা বোধহয় আপনার জানা ছিল না। আপনি হয়তো মাকড়সাটা দেখিয়ে ভয় পাইয়ে আংটিটা আদায় করে নিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু হয়ে গেল একেবারে হার্ট অ্যাটাক, এবং শেষপর্যন্ত মৃত্যু। এ মৃত্যুর জন্য আপনি ছাড়া আর কে দায়ী বলুন? আর আপনি বলছেন আংটিটা আপনি কিনেছিলেন এবং পিয়ারিলাল সেটা চুরি করেন। আমি যদি বলি, আংটি পিয়ারিলাল কিনে কলকাতায় আঠারো বছর আগে আপনাকে দেখিয়েছিলেন। আর সেই থেকে আপনার ও আংটির ওপর লোভ—আর আপনার বাড়ির ওই তালা-দেওয়া বন্ধ ঘরে এরকম আরও অনেক পুরোনো জিনিস আপনার আছে, আর ওইসব মূল্যবান জিনিস চোর ডাকাতের হাত থেকে সামলানোর জন্যেই আপনার ওই চিড়িয়াখানা?'

বনবিহারীবাবু গম্ভীর গলায় বললেন, 'তুমি আর কী বিশ্বাস কর সেটা শুনতে পারি কি?'

ফেলুদা গম্ভীরও গলায় বলল, 'নিশ্চয়ই পারেন। আমার বিশ্বাস পিয়ারিলালের ওই বাদশাহী আংটি আপনি আর কোনওদিন চোখেও দেখতে পাবেন না, আর আমার বিশ্বাস আপনার ভবিষ্যতে রয়েছে আপনার অপরাধের উপযুক্ত শাস্তি।'

'গণেশ!'

বনবিহারীবাবুর গুরুগম্ভীর চিৎকারে কাঠের ঘরটা গমগম করে উঠল।

ফেলুদা হঠাৎ বলল, 'মুখে রুমাল চাপা দে!'

কেন একথা বলল জানি না—কিন্তু আমি তৎক্ষণাৎ পকেট থেকে ফেলুদার দেওয়া রুমালটা বের করে মুখের ওপর চাপা দিলাম।

গণেশ গুহ ঘরের ভেতর এসে ঢুকল—হাতে সেই কাঠের বাক্স।

বনবিহারীবাবু দেখি টেপরেকর্ডারটা নিয়ে দরজার দিকে পিছিয়ে যাচ্ছেন।

ফেলুদা নিজের পকেট থেকে রুমাল বের করল, আর তার সঙ্গে সেই মাজনের কৌটোটা—যাতে লেখা 'দশংসংস্কারচূর্ণ'।

গণেশ গুহ বাক্সটা মাটিতে রেখে ঢাকনাটা খুলে যেই পিছিয়ে যাবে, সেই মুহূর্তে ফেলুদা কৌটোটার ঢাকনা খুলে তার ভেতর থেকে এক খাবলা কী জানি গুঁড়ো তুলে নিয়ে গণেশ আর বনবিহারীবাবুর দিকে ছুড়ে দিয়ে নিজের মুখে রুমাল চাপা দিল।

আমার রুমালের ফাঁক দিয়ে সামান্য যে গন্ধ এল তাতে বুঝলাম সেটা গোলমরিচ।

সেই গোলমরিচের গুঁড়ো দু-জনের চোখে নাকে ঢুকে ওদের যে কী অবস্থা হল তা বলে

বোঝাতে পারব না। প্রথমে যন্ত্রণায় তাদের মুখ একেবারে বেঁকে গেল, তারপরে একসঙ্গে দুজনের আরম্ভ হল হাঁচি আর আর্তনাদ। বনবিহারীবাবু টলতে-টলতে দরজার বাইরে গিয়ে সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে একেবারে সোজা মাটিতে গিয়ে পড়লেন। গণেশ গুহরও প্রায় একই অবস্থা। তবু সে যাওয়ার সময় কোনওরকমে দরজাটা টেনে বন্ধ করে আমাদের বন্দি করে দিয়ে গেল।

এবার মেঝেতে খোলা বাক্সটার দিকে চেয়ে দেখি তার ভেতর থেকে একটা সাপের মাথা বেরিয়েছে, আর সেই সঙ্গে আরম্ভ হয়েছে সেই হাড়কাঁপানো শব্দ—

'কির্‌র্‌র্‌ কিট্‌ কিট্‌ কিট্‌...কির্‌র্‌র্‌ কিট্‌ কিট্‌ কিট্‌ কিট্‌—কির্‌র্‌র্‌ কিট্‌ কিট্‌ কিট্‌...'

আমি বুঝতে পারলাম আমার মাথার ভেতরটা কেমন জানি করছে, বুঝতে পারলাম ফেলুদা আমাকে ধরে বেঞ্চির ওপর দাঁড় করিয়ে দিল, আর বুঝলাম যে ফেলুদা নিজেও বেঞ্চির ওপর উঠে দাঁড়িয়েছে।

খুব বেশি ভয় পেলে একটা অদ্ভুত ব্যাপার হয় সেটা এখন বুঝতে পারলাম। যার থেকে ভয়, তার দিকেই যেন চোখটা চলে যায়। কিংবা হয়তো সাপ জিনিসটার সত্যি করেই একটা হিপনোটাইজ করার ক্ষমতা আছে। মাথা ঝিম-ঝিম অবস্থাতেই স্পষ্ট দেখলাম র‍্যাট্‌ল স্নেকটা বাক্স থেকে বেরিয়ে ঝুমঝুমির শব্দ করতে-করতে এদিক-ওদিক দেখে আমাদের দিকে চোখটা ফেরাল, আমাদের দিকে চেয়ে রইল, তারপর কাঠের মেঝের ওপর দিয়ে এঁকেবেঁকে আমাদেরই বেঞ্চির দিকে প্রায় যেন আমাকে লক্ষ করেই এগোতে লাগল।

বুঝলাম আমার চোখের দৃষ্টি ক্রমশ ঝাপসা হয়ে আসছে। সাপটা যখন বেঞ্চি থেকে তিন হাত দূরে, তখন হঠাৎ মনে হল যেন একটা বাজ পড়ল, আর সেটা যেন আমাদের ঘরেরই ভেতর। একটা চোখ ঝলসানো আলো, একটা কানফাটা আওয়াজ, আর তার পরেই বারুদের গন্ধ।

আর সাপ?

সাপের মাথা দেখলাম থেঁতলে শরীর থেকে আলগা হয়ে পড়ে আছে। ঝুমঝুমিটা দু-একবার নড়ে থেমে গেল।

তারপর আর কিছু মনে নেই।

যখন জ্ঞান হল, তখন দেখি আমি শালবনের মধ্যেই একটা সতরঞ্চির ওপর শুয়ে আছি। কপাল আর মাথাটা ঠান্ডা-ঠান্ডা লাগছে—বুঝলাম জল দেওয়া হয়েছে। শ্রীবাস্তবের মুখটা প্রথম চোখে পড়ল—আর তার পরেই বাবা।

'কেমন আছেন তপেশবাবু—'

গলাটা শুনে চমকে উঠে পাশ ফিরে দেখি—মহাবীর। কিন্তু গায়ে গেরুয়া পোশাক কেন?

মহাবীর বলল, 'ট্রেনে বেরিলি পর্যন্ত একসঙ্গে এলাম, আর চিনতে পারলে না?'

দারুণ মেক-আপ করে তো লোকটা! দাড়িওয়ালা অবস্থায় সত্যিই চিনতে পারিনি। আর তাছাড়া গলার আওয়াজ আর কথা বলার ঢং-ও বদলে ফেলেছিল।

মহাবীর বলল, 'আমার রিভলবারের টিপ দেখলে তো? আসলে যেদিন ভুলভুলাইয়ায় দেখা হল, আর উনি বললেন আমাকে চেনেন না—সেদিন থেকেই বনবিহারীবাবুর ওপর আমার সন্দেহ হয়েছিল। কারণ কলকাতায় উনি আমাদের বাড়ি অনেকবার এসেছেন, আমার সঙ্গে কথাও বলেছেন। একদিন বাবার সঙ্গে খুব কথা কাটাকাটি হয়েছিল—ওই আংটিটা নিয়েই। সেটাও আমার কিছুদিন আগেই মনে পড়েছে।'

বাবা বললেন, 'তোদের দেরি দেখে লছমনঝুলা থেকে গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে শেষটায় টায়ারের

দাগ দেখে বনেব রাস্তাটা ধরে ভেতরে ঢুকেছি। মহাবীরবাবুই অবিশ্যি গাড়ি ঘোরানোর কথা প্রথম বলেন।'

'আর ওরা দুজন কোথায় গেলেন?'

'গোলমরিচের ঝাঁজে খুব শাস্তি পেয়েছে। ফেলুর ব্রহ্মাস্ত্রের তুলনা নেই। ওরা এখন পুলিশের জিম্মায় আছে।'

'পুলিশ কোত্থেকে এল?'

'সঙ্গেই তো ছিল। বিলাসবাবু তো আসলে ইন্সপেক্টর গরগরি!'

কী আশ্চর্য! ওই হাত-দেখিয়ে ভদ্রলোকই ইন্সপেক্টর গরগরি। এমন অদ্ভুত ভাবে যে আংটির ঘটনাটা শেষ হবে তা ভাবতেই পারিনি।

কিন্তু ফেলুদা? ফেলুদা কোথায়?

ওর কথা মনে পড়তেই আমার চোখে একটা ঝিলিক-মারা আলো এসে পড়ল। যেদিক থেকে আসছে সেদিকে তাকিয়ে দেখি ফেলুদা আঙুলে আংটিটা পরে কিছুদূরে একটা খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে, গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে এসে পড়া সূর্যের আলোটা আংটির হিরের ওপর ফেলে সেটা রিফ্লেক্ট করে আমার চোখে ফেলছে।

আমি মনে-মনে বললাম—এই আংটি রহস্য সমাধানের ব্যাপারে কেউ যদি সত্যি করে বাদশা হয়ে থাকে, তবে সে ফেলুদাই।

অলঙ্করণ : সত্যজিৎ রায়

দু-মুখো সাপ



সমরেশ বসু

শ সে ব উ ২—৪১

খুট করে একটি শব্দ, আর খাটের শিয়রের দিকে দেওয়ালের একশো পাওয়ারের বিজলি বাতি জ্বলে উঠল। অশোক বুকের নীচে বালিশ চেপে, উপুড় হয়ে, পা ছড়িয়ে গভীর মনোযোগের সঙ্গে মাথা নিচু করে বই পড়ছিল। ও মুখ না তুলে বা না ফিরিয়েই বলে উঠল, 'ফাইন। ভাবছি উঠে বাতিটা জ্বালি, কিন্তু এমন নেগেটিভ-পজেটিভ ইলেকট্রিকের তার জুড়ে যাওয়া লেখা, একদম চুম্বকের মতো টেনে রেখেছে।' বলে পিছনদিকে মুখ ফিরিয়ে হাসল।

ঘরে ঢোকবার দরজার কাছ থেকে ততক্ষণে কাঞ্চন চলে এসেছে খাটের সামনে ডিম্বাকৃতি শ্বেত পাথরের টেবিলের কাছে। হাতে তার ডিশের ওপর বসানো ধূমায়িত চায়ের কাপ। সেটা ঠক করে বসিয়ে দিল টেবিলের ওপর, এবং অশোকের দিকে না তাকিয়েই পিছন ফিরে পা বাড়িয়ে বলল, 'তাতে তো যদ্দূর জানি, শক খেয়ে পুড়ে মরার কথা, তার তো কোনও লক্ষণ দেখছি না।'

'আরে, পুড়েই তো মরছি। তা বলে তুমি চললে কোথায়?' অশোক বুকের নীচের বালিশ সরিয়ে উঠে বসল : 'আমি আসলে বলছিলাম, ইলেকট্রিকের কারেন্টের মতো টেনে রেখেছে এমন লেখা। ছেড়ে উঠতেই পারছিলাম না। অথচ এমন গাঁজাখুরি ব্যাপার—।'

কাঞ্চন দরজার কাছে পৌঁছে বলে উঠল, 'আর এক গাঁজাখোরের খেয়ালই নেই, শীতের ছোট বেলা, ঘর প্রায় অন্ধকার হয়ে এসেছে। অবিশ্যি গোয়েন্দা অশোক ঠাকুরের তো আবার বাঘের চোখ। অন্ধকারেও দেখতে পায়, চোখ খারাপ হওয়ার কোনও ভয় নেই। বাতিটা কি তা হলে অফ করে দিয়ে যাব?'

'না-না, অফ করবে কী!' অশোক বলল চোখ বড় করে, 'আলোরই দরকার। কথা আছে, শোনো।'

কাঞ্চন ফিরে তাকাল। দেখেই বোঝা যাচ্ছে তার বিকেলের গা-ধোয়া সারা। মাঝখানে লাল সিঁথির দু-পাশের ঘন চুল টেনে আঁচড়ানো। মাথার পিছনে উঁকি দিয়ে আছে পিছনের মোটা বিনুনির আঁট বাঁধা খোঁপার অংশ। অনুমান করার দরকার হয় না, সেটাও সদ্য বাঁধা, আর সাদা জামার ওপরে সদ্য পাট-ভাঙা তাঁতের শাড়ি। চওড়া বেগুনি পাড়ে বেগুনি ডোরা আটপৌরে ধরনে পরা। কাঞ্চনের প্রসাধনের তেমন বালাই নেই। নেহাত শীতের দিন বলেই মুখে সামান্য ক্রিমের প্রলেপ, কপালে সিঁদুরের ফোঁটা। কাঁচা সোনা রং বলতে যা বোঝায়, সেই রকম রং, কিন্তু নীরক্ত না। ঠোঁটের রং স্বাভাবিক লাল, আয়ত কালো চোখে বা সরু টানা ভুরুতে কোনওকালেই কাজল বা কালি টানে না। গলায় একটি সরু সোনার হার, হাতে শাঁখা-নোয়া আর কয়েক গোছা করে সোনার চুড়ি। পায়েব আলতাও সদ্য রাঙানো। ওটাকে প্রসাধন না বলে, প্রাচীন ঠাকুরবাড়ির সধবাদের জীবনযাত্রার সাবেকি অঙ্গ বলা চলে।

চকমিলানো থামওয়ালা ঢাকা বারান্দা এই বিরাট বাড়ি যার গায়ে-গায়ে আরও কয়েকটি বাড়ি, খিড়কি দরজা দিয়ে যাতায়াতের যোগাযোগ আছে, সবগুলো বাড়িই সাবেকি আমলের। কলকাতার উত্তর শহরতলি, ভিন্ন মিউনিসিপ্যালিটির এলাকায়, এই সাবেকি বাড়িগুলো নিয়েই প্রায় একটি পাড়া। পাড়ার নাম ঠাকুরপাড়া, বাড়িগুলোর পরিচয় ঠাকুরবাড়ি। অশোক এমনই এক ঠাকুরবাড়ির বর্তমান বংশধরদের কনিষ্ঠতম। ওর ওপরে দুই দাদা। চল্লিশোর্ধ্ব বড়দা অবনী ঘোরতর সংগীতসাধক, ধ্রুপদ-ধামার নিয়ে ওর জগৎ। ভোরের দিকেই বিশেষ করে নীচের তলায় রাস্তার ওপরে রকের ধারে কয়েকটি ঘরের একটিতে তার সাধনা চলে তারস্বরে, তানপুরা আর হারু মুচির পাখোয়াজের সংগত সহযোগে। আর এক ঘরে বসে মেজদা অচিন্ত্যর জ্যোতিষীচর্চার আসর। তার হাঁকডাকও কম না। সেখানে শনি, মঙ্গল, রাহু, লগ্ন, নক্ষত্রাদির জটিল অবস্থান নিয়ে বিতর্কের ঝড়ও শুরু হয়ে যায় সকাল থেকেই। অশোক বেছে নিয়েছে রকের মন্দির সংলগ্ন একটু দূরের এক ঘর। ওর ঘরের আড্ডায় প্রধানত চলে সমসাময়িক রাজনীতির তর্ক-বিতর্ক, শহরের নিত্যনতুন ঘটনার

ফিরিস্তি আর ব্যাখ্যা এবং তার সঙ্গে অবিশ্যিই অপরাধতত্ত্বের আলোচনা। মাঝে-মাঝে বসে তাসের আসর।

এ বাড়ি আর অন্যান্য ঠাকুর জ্ঞাতি-গোষ্ঠীদের বাড়ির পূর্বপুরুষেরা অধিকাংশই ছিলেন স্মার্ত, ন্যায়তীর্থ, তর্কচূড়ামণি, যাঁদের খ্যাতি ছিল দেশজোড়া। সেইসঙ্গে ভারত জুড়ে যজমানি যার আয় জমিদারির থেকে কোনও অংশেই কম না। জ্ঞাতি-গোষ্ঠীদের মধ্যে কারওরই এখন আর ন্যায়স্মৃতির চর্চা নেই, কেউ-কেউ যজমানি করে। কিন্তু আগের সেই রমরমা নেই। অশোক আর ওর দুই দাদাও সেদিকে যায়নি। তিনভাইয়ের কেউ বিয়ে করেনি। দূরের জেলায় ও কাছেপিঠে যা কিছু সম্পত্তি আছে, সেসব দেখাশোনা করার জন্য এখনও বাবার আমলের দপ্তরহীন নায়েবমশাই আছেন। এ শহরেও কয়েকটি বাড়ি, দোকানপাটের ভাড়া আদায় সবই তাঁর হাতে। তিনি তিনভাইকে যা হাতে তুলে দেন, তা নিয়েই তিনভাইয়ের জীবনধারণ। অবিশ্যি সেই আয়ের অঙ্কটা কিছু কম না। এ জীবনের মতো তিনভাইয়ের অনায়াসেই চলে যাবে, যাচ্ছেও। একরকমের অলস জীবনযাপন বলা যায়, যদিও সকলেই কিছু-না-কিছু নিয়ে ব্যস্ত। লোকে বলে ঠাকুরবাড়ির পাগলা-গারদ, কেউ বলে ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো। তা বলুক, ওদের কানে তুলো, পিঠে কুলো।

বাড়ির মধ্যে তিনভাইয়ের অভিভাবিকা বলতে এক বিধবা প্রৌঢ়া পিসিমা। আসলে তিনি ভাইপোদের রান্নাবান্না, খাওয়ানো নিয়েই থাকেন। বাকি দেখাশোনা বাড়ির পুরনো বয়স্ক দুই দাসী ও ভৃত্যের ওপর।

কাঞ্চন হল পাশের জ্ঞাতিবাড়ির একমাত্র বংশধর গোবিন্দদার বউ। গোবিন্দদা বিকলাঙ্গ, কিন্তু প্রচুর সম্পত্তির মালিক, অতএব কাঞ্চনের মতো একটি রূপসী বধূ জোটাতে এ দেশে অসুবিধে হয়নি। কাঞ্চনের পেটে বিদ্যাও আছে। কলকাতার দক্ষিণে প্রায় গ্রামাঞ্চলের মেয়ে হলেও ডেলি-প্যাসেঞ্জারি করে কলকাতার কলেজে বি. এ. পাশ করেছে। কিন্তু ওর গরিব বাবা-মায়ের মতে জামাই ভাগ্যটা নাকি ভালোই, কারণ মেয়ে তাদের রাজেন্দ্রাণী হয়েছে। আসলে রাজার স্বপ্নটা বোধহয় কাঞ্চনের বাবার মনেই। জামাইয়ের অবর্তমানে মেয়েই গোবিন্দ ঠাকুরের বিষয়সম্পত্তির মালকাইন হবে। এখনও প্রাপ্তিযোগটা কিছু কম না। আর রাজেন্দ্রাণীটিকে দেখলেই বোঝা যায়, হাতে শাঁখা, মাথায় সিঁদুর নিয়ে একটি কুমারী মেয়ে একটা ঘোর-লাগা যেন অবাক জিজ্ঞাসু চোখে বিশাল বাড়িতে চলে-ফিরে বেড়াচ্ছে। শয্যাশায়ী বিকলাঙ্গ স্বামীর সেবা করে চলেছে। কেবল অশোকের ঘরে এলে ওর অবাক জিজ্ঞাসু চোখের দৃষ্টি বদলে যায়। সারাদিনের বোবামুখে কথা ফোটে, রাগ-অভিমান থেকে চটুল চপলতা সব মিলিয়ে একটি স্বাভাবিক মেয়ে হয়ে ওঠে। আর অশোকের সকালে ঘুম ভেঙে প্রথম চায়ের কাপ জোটে কাঞ্চনের কাছ থেকে এবং বিকেলেও এক কাপ। এ অলিখিত চুক্তিটি যে দুজনের মধ্যে কবে থেকে, কেমন করে লেখা হয়েছিল নিজেরাই মনে রাখেনি।

অশোকের ডাক শুনে কাঞ্চনের ভুরু কুঁচকে উঠল, চোখে সন্দেহ, 'কী কথা শুনতে হবে? তোমার ওই বইয়ের গাঁজাখুরি গপ্পো?'

'আসলে সত্যি গাঁজাখুরি নয়।' অশোক বলল, 'পড়লে মনে হয় গাঁজাখুরি, কিন্তু একেবারে সত্যি ঘটনা। যাকে বলে ট্রুথ ইজ স্ট্রেঞ্জার দ্যান ফিকশন।'

কাঞ্চন দরজার কাছ থেকেই বলল, 'তোমার স্ট্রেঞ্জার দ্যান ফিকশন শোনার সময় নেই। আমাকে সন্ধেবাতি দিতে হবে।'

'বইয়ের গপ্পো তোমাকে শোনাব না।' অশোক ঝটিতি মুখ ফিরিয়ে একবার জানলা দিয়ে বাইরের দিকে দেখে নিল।

'সন্ধে তো এখনও হয়নি, আকাশে এখন শেষবেলা। তা ছাড়া, তোমার আনা চা খাওয়া পর্যন্ত একটু থাকবে তো, সেটাই আমাদের শর্ত।'

কাঞ্চন ঘাড় কাত করে বলল, 'শর্ত? শর্ত আবার কীসের?'

'থুড়ি, শর্ত না। আসলে তোমার আনা চা তোমার সামনে না খেলে এ-চায়ের কোনও স্বাদই থাকে না।' অশোক ঝুঁকে পড়ে শ্বেত পাথরের টেবিল থেকে চায়ের কাপ তুলে নিল। ছোট একটা চুমুক দিয়ে কাঞ্চনের দিকে তাকিয়ে হাসল।

কাঞ্চনের লাল ঠোঁট বেঁকে উঠল, 'ন্যাকামি।'

'সত্যি, তোমার মুখে ওই কথাটা শুনতে এত ভালো লাগে।' অশোক চায়ের কাপে আবার একটা চুমুক দিল, 'মনে হয় চায়ের থেকেও বেশি স্বাদ। কাছে এসো না একটু।'

কাঞ্চন সন্দিগ্ধ চোখে তাকিয়ে ভুরু কোঁচকাল। পায়ে-পায়ে এসে দাঁড়াল টেবিলের সামনে, 'বলো, কী বলবে।'

'মেজাজটা ভালো নেই মনে হচ্ছে?'

'না, ভালো নেই।'

'কেন, গোবিন্দদার শরীরটা ভালো নেই নাকি?'

'কেন ভালো থাকবে না?'

'তা অবিশ্যি বটে, তোমার সেবার একটা গুণ আছে তো!' অশোক একটা নিশ্বাস ফেলে চায়ের কাপটা রাখল টেবিলে। বালিশের কাছে রাখা সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই টেনে নিল, 'তা হলে তোমার শরীরটা কি খারাপ হয়েছে নাকি?'

'দেখে কি তাই মনে হচ্ছে?'

অশোক যেন খারাপ-ভালো যাচাই করার জন্যই ঝুঁকে পড়ে দেখল কাঞ্চনের পায়ের দিকে। আস্তে-আস্তে মুখ তুলে তাকাল কাঞ্চনের মুখের দিকে। কাঞ্চনের ভুরু কোঁচকানো, তবু মুখে ঈষৎ লাল ছটা লাগল। অশোকের দেখার দৃষ্টিতে এমন কিছু ছিল, কাঞ্চনের চোখের পাতা নত হল, বলল, 'ইয়ারকি।'

'মেজাজটা তোমার সত্যি খারাপ দেখছি।' অশোক ওর কিংসাইজ সিগারেটটা ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়ার আড়াল থেকে বলল, 'মেজাজটা যখন খারাপ, তখন কষ্ট করে চা আনতে গেলে কেন?'

কাঞ্চন চোখ তুলে তাকাল। ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা, চোখের তারায় ঝিলিক, ঠাকুরমশাইয়ের অভিমান হয়ে গেল?'

অশোক কপট উদাস স্বরে বলল, 'না, মন-মেজাজ যখন ভালো নেই—।'

'কেন থাকবে জিগ্যেস করি?' কাঞ্চন ঘাড় কাত করে তাকাল, আর ওর খোলস ছাড়ানো কুচকুচে কালো কালকেউটে সাপ জড়ানোর মতো খোঁপাটা অনেকখানি দেখা গেল, 'কথা কী ছিল এ-বেলা?'

এবার অশোকের চোখে ভুরু কোঁচকানো জিজ্ঞাসা, 'কী কথা বলো তো?'

'বলব কেন?' কাঞ্চনের চোখে রহস্য। ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা বিদ্রূপের বাঁক নিল, 'খুনের তদন্তে যার শ্যেন চক্ষে কিছু ফাঁক যায় না, একটা সামান্য কথা তাব মনে থাকে না?'

অশোক ঠোঁট ভুরু কুঁচকে সিগারেটে ঘনঘন কয়েকটা টান দিল, তারপরেই চোখ বড় করে প্রায় চিৎকার করে উঠল, 'ওহ্হো, আজ এ-বেলা যে তোমার কাছে গিয়ে চা খাওয়ার কথা ছিল! এখন কী হবে বলো তো?'

'হবে হাতি আর ঘোড়া।' কাঞ্চনের মুখ গম্ভীর, 'আমি অপেক্ষা করে-করে বুঝলাম, বাবু নিশ্চয় ভুলে গেছেন, এতক্ষণে বোধহয় নীচের আড্ডাঘরে জমে গেছেন, নয়তো কোনও বিদঘুটে বইয়ে মুখ গুঁজে পড়ে আছেন।'

অশোক দু-হাতে দু-কান আর নাক মলে বলল, 'এ অপরাধ ক্ষমার অযোগ্য, তবে—।' কথা শেষ না করেই ও অনেকখানি ঝুঁকে কাঞ্চনের একটা হাত ধরার চেষ্টা করল।

কাঞ্চন তার আগেই এক পা সরে গেল, 'থাক, খুব হয়েছে। এদিকে চা ঠান্ডা হচ্ছে।'

অশোক বইটা তুলে বিছানায় আছাড় মেরে ফেলে বলল, 'এই বিদঘুটে চুম্বকি বইগুলো হল যত নষ্টের গোড়া।'

ও চায়ের কাপ হাতে তুলে নিল।

'এখন যত দোষ নন্দ ঘোষ, বইটার নেহাত প্রাণ নেই।' কাঞ্চনের স্ফুরিত ঠোঁটে রুদ্ধ হাসি, 'মনের টানটা কতখানি, ওতেই বোঝা যায়।'

অশোক চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বলল, 'বিশ্বাস করো, আমার মনটা—।'

'সবসময় এখানে পড়ে আছে।' কাঞ্চন বাধা দিয়ে নিজের বুকে আঙুল ঠেকিয়ে বলে উঠল।

অশোক কাঞ্চনের আঁচল-ঢাকা বুকের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ যেন নিশি-পাওয়া হয়ে গেল, কেবল শব্দ করল, 'অ্যাঁ'।

ইতিমধ্যে কাঞ্চনের মুখে লেগেছে লজ্জার ছটা। তাড়াতাড়ি পিছন ফিরে বলল, 'আমি চলি।'

'প্লিজ, কাঞ্চন।' অশোক ডাকল।

কাঞ্চন ডাকে ঝটকা দিয়ে ফিরে তাকাল, 'কাঞ্চন!'

'থুড়ি, বউদি।' অশোক যেন খুব বিব্রত মুখে হাসল, 'কিন্তু সত্যি বলছি, একেবারে ভেতর থেকে স্বতো-স্বতো-আহ্ কী কথাটা—হ্যাঁ, স্বতোৎসারিত—।'

'থাক, স্বতোৎসারিত কি ন্যাকামো আমার জানবার দরকার নেই।' কাঞ্চন বলল, 'নাম ধরে ডাকার মতো ক্ষমতা থাকা দরকার। তা যখন নেই, ডাকাডাকিরও দরকার নেই।'

অশোক কাঞ্চনের চোখের দিকে তাকাল, কিন্তু হঠাৎ কিছু বলল না। কাঞ্চন বলল, 'বোকার মতো তাকিয়ে থেকো না, চা খেয়ে কাপ দিয়ে দাও।'

'এই দিচ্ছি।' অশোক একটা নিশ্বাস ফেলে চায়ের কাপে লম্বা চুমুক দিল, 'আসলে তখন বলতে যাচ্ছিলাম—যখন ঘরে এলে, তোমাকে দেখে কালীঘাটের জীবন্ত পটের মতো মনে হচ্ছিল।'

কাঞ্চন উদাস স্বরে বলল, 'পট তো আমি বটেই, তবে জীবন্ত কি না জানিনে।'

'এখন অবিশ্যি আর তা বলতে ইচ্ছে করছে না।' অশোক কাপে শেষ চুমুক দিয়ে টেবিলে নামিয়ে রাখল, 'একটা ফুলের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে।'

কাঞ্চন ঘাড় বাঁকিয়ে ভুরু কুঁচকে তাকাল। অশোক সিগারেটে টান দিয়ে বলল, 'সিলেটের লোকেরা একটা ফুলের নাম বলে সন্ধ্যাচণ্ডী। ঢাকার লোকেরা বলে সন্ধ্যামালতী। আমাদের বাবা-জ্যাঠাবা বলতেন কেষ্টকালী। আসলে নামটা কী বলো তো?'

কাঞ্চন অবুঝ চোখে তাকিয়ে বলল, 'জানিনে তো?'

'কৃষ্ণকলি।' অশোক হাসল, 'সন্ধেবেলার নিবালায় যে ফুল ফোটে। তোমাকে দেখে মনে হল, সন্ধেয় ফোটা কৃষ্ণকলি।'

কাঞ্চনের চোখের তারায় বাঁকা ঝিলিক। ঠোঁটের কোণে বাঁকা রেখা, 'সত্যান্বেষী নাকি গোয়েন্দা, সে আবার কবি হল কবে? তা ছাড়া আমি আবার ফুটলামই বা কবে?' ঈষৎ ম্লানতা নেমে এল মুখে।

'যে ফোটে, সে দেখতে পায় না।' অশোক বলল, 'যে দেখতে পায়, সে দ্যাখে। এমনকী কৃষ্ণকলির হালকা মিষ্টি গন্ধটাও পাচ্ছি।'

কাঞ্চন টেবিল থেকে কাপ-ডিশ তুলে নিল, 'একদিন তো বলছিলে, তুমি মড়ার গন্ধ পাও। অপরাধের গন্ধও পাও। ফুলের গন্ধও পাও নাকি।'

'তার মানে, তুমি আমাকে আবার সেই পিশাচ বলছ?' অশোক সাবেকি উঁচু খাট থেকে নামবার উদ্যোগ করে দু-পা নীচে ঝোলাল।

কাঞ্চন বলল, 'মোটেই না। তুমি বলেছিলে, তাই বললাম।' ও পিছন ফিরতে উদ্যত হল।

'শোনো—।'

'ছোট ভাই।' অশোকের কথার শেষের আগেই দরজার কাছ থেকে ডাক শোনা গেল।

অশোক-কাঞ্চন দুজনেই দরজার দিকে তাকাল। বাড়ির প্রাচীন প্রৌঢ় ভৃত্য হরেরামদা। অশোকের বাবা বেঁচে থাকতে তাঁকে ডাকত 'বাবা'। আর তিনভাইকে, 'বড় ভাই', 'মেজো ভাই', 'ছোট ভাই'। অশোক জিগ্যেস করল, 'কী বলছ হরেরামদা?'

'তোমার একটা টেলিফোন এয়েছে।' হরেরাম বলল, 'সেই তোমার হমকানো দারোগাবাবু না সি. আই. সাহেব। জিগ্যেস করল, তুমি বাড়ি আছ কি না। থাকলে তোমার সঙ্গে এক ভদ্দরলোক দেখা করতে আসবেন।'

অশোক জিগ্যেস করল, 'কে ভদ্রলোক? নামধাম কিছু বলল?'

'না। বললে, বিশেষ জরুরি দরকার।' হরেরাম বলল, 'দারোগাসাহেব কী কাজে আটকে গেছে, তা নইলে ভদ্দরলোকের সঙ্গে আসত। এখন কী বলব?'

অশোক চকিতে একবার কাঞ্চনের মুখের দিকে দেখে নিয়ে বলল, 'দেখা যাক ভদ্রলোকটি কে। হরেবামদা, তুমি আসতে বলে দাও।'

হবেরাম চলে গেল। কাঞ্চন বলল, 'অপরাধের গন্ধ পাচ্ছ নিশ্চয়? শুঁকতে থাকো, আমি চলি।'

অশোক হাত বাড়িয়ে কাঞ্চনের আঁচলটা ধরল, বলল, 'আজ দেখছি সত্যি তোমার মন-মেজাজ ভালো নেই।'

'তার জন্যে আঁচল টেনে ধরার দরকার নেই।' কাঞ্চনের একহাতে কাপ-ডিশ, অন্য হাতে আঁচলটা ছাড়াবার চেষ্টা করল, 'আমার এখন অসুখ।'

অশোকের ভুরু কুঁচকে উঠল, 'অসুখ? ওহ্, মানে ইয়ে?'

'ইয়ে নয়, হিয়ে।' কাঞ্চন ঝটিতি আঁচলটা ছাড়িয়ে নিল, 'অসুখ আমার হিয়েতে।' হাসতে-হাসতে দ্রুত চলে গেল দরজার কাছে।

কাঞ্চন অদৃশ্য হওয়ার আগেই অশোক গলা তুলে বলল, 'রাত্রে একবাব তোমার কাছে যাব।'

'দরজা বন্ধ থাকবে।' কাঞ্চন ঘরের বাইরে পা দিয়ে বলল।

অশোক বলল, 'তা হলে পাঁচিল টপকাব।'

'ভেতরের দরজাও বন্ধ থাকবে।' কাঞ্চন ঘরের বাইরে দালানে।

অশোক বলল, 'দবজা ভাঙব।'

কাঞ্চন দালানে ফিরে দাঁড়াল, ঘাড়ে ঝটকা দিয়ে চোখের তারা ঘুবিয়ে বলল, 'তাব জন্যে মুরোদ থাকা চাই।'

অশোক আবার কিছু বলতে গেল। তার আগেই কাঞ্চন অদৃশ্য হয়ে গেল। অশোক সেদিকে তাকিয়ে হাসল আর আস্তে-আস্তে ওর হাসিটা করুণ আর ম্লান হয়ে উঠল। একটা উদগত নিশ্বাস ঢোঁক চেপে গিলল।

অশোক যখন নীচে নামল তখন ওর পরনে টেরি-উলের ট্রাউজার। গায়ে কাঞ্চনের হাতে বোনা সাদা উলের গলার কণ্ঠা পর্যন্ত ঢাকা হাফ-হাতা সোয়েটার। সোয়েটারের গলার কাছে আব হাতার শেষে নেভি-ব্লু বর্ডার। হাতের বাঁ কবজি তুলে ঘড়ি দেখল। সময় সাড়ে পাঁচটা। বড়দা-মেজদাব ঘরের সান্ধ্যকালীন আসর এখনও বসেনি। ওর নিজের বন্ধুরাও এখনও আসেনি। সকলেই প্রায় চাকুরে, সাড়ে ছ'টা-সাতটার আগে এসে পৌঁছতে পারে না, একমাত্র ফটিক ছাড়া। অয়স্কান্ত রায় যার ভালো নাম। বন্ধুদের মধ্যে একমাত্র সেই বেকার, সি এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। সেই

সঙ্গে কলকাতায় সপ্তাহে তিনদিন ক্যারাটে শিখতে যায়। ইদানীং যে-কোনও তদন্তের ব্যাপারেই ফটিক ওর সঙ্গে থাকে। ও এসে পড়বে সকলের আগে।

অন্ধকার নেমে এসেছে। রাস্তার আলো জ্বলে উঠেছে। অশোক রকের ওপর দিয়ে মন্দিরের গায়ে ওর বসবার ঘরের খোলা দরজা দিয়ে ঢুকল। বাঁদিকে হাত বাড়িয়ে সুইচ টিপে আলো জ্বালল। গোটা মেঝে জুড়ে ডবল শতরঞ্চি পাতা। এপাশে-ওপাশে গোটা ছয়েক তাকিয়া আর সমসংখ্যক নানা আকারের ছাইদানি। চেয়ার-টেবিল-সোফা সেটের কোনও বালাই নেই। এ-বাড়ির সবকিছুই এখনও সাবেকি চালের।

অশোক দরজার চৌকাঠের ভেতরে স্যান্ডেল খুলতে-খুলতেই একটা সাইকেল রিকশোব ভেঁপু শুনতে পেল। স্যান্ডেল না খুলে ও বাইরে এল। রাস্তার আলোয় দেখল, একটা সাইকেল রিকশো এসে দাঁড়িয়েছে ওদের রকের সামনেই। আবোহী একজন ধুতি পাঞ্জাবির ওপরে শাল চাপানো ব্যক্তি। রাস্তার আলোয় লোকটির চেহারা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না।

বাঙালি রিকশোওয়ালা বলল, 'এটাই ঠাকুরবাড়ি।'

অশোক রকের ধারে এগিয়ে গেল। রিকশোর আরোহী মুখ তুলে ওর দিকে তাকালেন। ভরাট গলায় একটু ব্যস্ততার সঙ্গে জিগ্যেস করলেন, 'এটা কি অশোক ঠাকুরের বাড়ি?'

'হ্যাঁ।' অশোক জবাব দিল এবং বুঝতে পারল, অতীতের ও. সি. বর্তমানে সার্কেল ইন্সপেক্টর শ্যামাপদর প্রেরিত ভদ্রলোক ইনিই।

ভদ্রলোক রিকশোয় বসেই পকেট থেকে পার্স বের কবে রিকশোওয়ালাকে ভাড়া দিলেন। নেমে এলেন রিকশো থেকে। রকে ওঠার সিঁড়ি খুঁজলেন এদিক-ওদিক তাকিয়ে। অশোক বলল, 'ওই যে, আপনার ডানদিকে আর-একটু এগিয়ে যান, ওখানে সিঁড়ি আছে।'

ভদ্রলোক কয়েক পা পুবে গিয়ে সিঁড়ি দিয়ে রকে উঠলেন। এগিয়ে গেলেন অশোকের কাছে, কিছুটা ব্যগ্র স্বরে জিগ্যেস করলেন, 'একটু আগে থানা থেকে সি. আই. শ্যামাপদবাবু অশোকবাবুকে টেলিফোন কবেছিলেন?'

'জানি।' অশোক বলল, 'আসুন'। ও ঘরের দিকে এগিয়ে গেল।

ভদ্রলোক অশোকের পিছনে যেতে-যেতেই জিগ্যেস করলেন, 'উনি বাড়ি আছেন তো?'

'আছেন। আপনি এ-ঘরে বসুন।' অশোক দরজার পাশে দাঁড়াল।

ভদ্রলোক দরজার সামনে এসে ঘরেব চেহাবা দেখে পায়েব কালো চামড়ার পাম্পশু বাইরে খুলে রাখলেন। অশোক বলে উঠল, 'জুতো বাইরে রাখবেন না, ভেতরে শতরঞ্চির সামনে খোলা মেঝেয় রাখুন। নইলে কুকুবে নিয়ে যেতে পারে।'

ভদ্রলোক যেন হতচকিত হয়ে জিগ্যেস করলেন, 'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ, আর বলেন কেন?' অশোক হেসে বলল, 'বিশেষ কবে রাত্তিরবেলা রাস্তার কুকুরগুলো বড় জ্বালাতন করে।'

ঘরের আলোয় দেখা গেল, ভদ্রলোকও যেন একটু হাসলেন। উপুড় হয়ে জুতোজোড়া হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকে মেঝের ওপরে রাখলেন। শতরঞ্চিতে পা দিয়ে একটু যেন দোননাভাবে কোথায় বসবেন ঠিক করতে পারছেন না। অশোক ইতিমধ্যেই ভদ্রলোককে দেখে নিচ্ছিল। ফরসা, লম্বা, দোহারা গঠনের চেহারা। মাথার চুলে পাক ধরেছে। গোঁফ-দাড়ি কামানো মুখ। চোখ-মুখ পরিচ্ছন্ন দীপ্ত, কিন্তু আপাতত গম্ভীর, চিন্তাক্লিষ্ট এবং ভাবে ভঙ্গিতে একটি বিশেষ ব্যস্ততা। বড় চোখের দুই কোল বসা, এবং কিছুটা আরক্ত। রাত জাগার জন্য হতে পারে। কাঁচা-পাকা চুলের বিন্যাসও তেমন পরিপাটি না। কোঁচানো তাঁতের ধুতি, সিল্কের পাঁশুটে রঙের পাঞ্জাবির ওপরে ধূসর বর্ণের কাশ্মীরের পশমি শালে সুন্দর নকশা করা। বয়েস অনুমান চল্লিশোর্ধ্বে, অনধিক পঞ্চাশ।

অশোক বলল, 'আপনার যেখানে খুশি বসুন, কোনও অসুবিধে নেই।'

ভদ্রলোক ভেতরের একদিকে দেওয়াল ঘেঁষে বসলেন। অশোক পায়ের স্যান্ডেল খুলে শতরঞ্চিতে পা দিতেই ভদ্রলোক ব্যস্তভাবে বলে উঠলেন, 'আপনি একটু কাইন্ডলি অশোকবাবুকে খবর দিন।'

অশোক এটাও জানে, ভদ্রলোক ওকে আদৌ অশোক ঠাকুর বলে ঠাওরাননি এবং পরিচয় পাওয়ামাত্রই ওঁর মুখে যুগপৎ বিস্ময় এবং হতাশা ফুটে উঠবে। ও ভদ্রলোকের দু-হাত দূরে বসতে-বসতে বলল, 'শ্যামাপদবাবুর টেলিফোন পেয়ে আমি আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছি।'

'মানে—।' ভদ্রলোকের বড় চোখ দুটিতে বিস্ময় ফুটে উঠল।

অশোক হাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে বলল, 'আমার নামই অশোক ঠাকুর।'

যা ভেবেছিল তা-ই। ভদ্রলোকের ব্যগ্র চোখে-মুখে একটা হতাশার ছায়া নেমে এল। 'আপনি—!' তাড়াতাড়ি কপালে দু-হাত ঠেকিয়ে নমস্কার করলেন এবং দ্বিধাজড়িত অবাক হেসে বললেন, 'অবিশ্যি সি. আই. সাহেব আমাকে বলেই দিয়েছিলেন, আপনি অল্পবয়সি যুবক। তা বলে—।'

'এতটা অল্প ভাবতে পারেননি।' অশোক হেসে বলল, 'অবিশ্যি বয়েস আমার কম নয়, তিরিশ পেরোতে চলল। কী করব বলুন, চেহারাটা কিছুতেই আর ভারিক্কি করে তুলতে পারছি না। ভাবছি একজোড়া গোঁফ রেখে দেখব, চেহারাটা ভারী করা যায় কি না।'

ভদ্রলোক যেন হতচকিত হয়ে একটা শব্দ করলেন, 'অ্যাঁ!' তারপরেই ওঁর মুখে লজ্জিত হাসি ফুটল, 'না-না, আমার ভুলের জন্যে কিছু মনে করবেন না। আমি সত্যি ভাবতে পারিনি, আপনি এত ছেলেমানুষ। তিরিশ বছর বয়েস তো কিছুই না—মানে আমার বয়েসি লোকের কাছে। কিন্তু আপনি যে এ বয়েসেই এতটা খ্যাতি লাভ করেছেন—সত্যি, চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন।'

'খ্যাতির কথা বলবেন না।' অশোক হেসে বলল, 'আজকের খ্যাতি কালই কুখ্যাতি হয়ে যেতে পারে।'

ভদ্রলোক মাথা নেড়ে বললেন, 'না-না, যেসব মহলে আপনার কথা শুনেছি, আপনার কখনও কুখ্যাতি হতে পারে না।'

অশোক লজ্জিত হাসল, 'আমি কি আপনার সামনে সিগারেট খেতে পারি?'

ভদ্রলোক কপালে ভুরু তুলে চমকানো স্বরে বললেন, 'অ্যাঁ? আরে, নিশ্চয়-নিশ্চয়, এতে আবার জিজ্ঞাসার কী আছে?'

অশোকের হাতেই সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই ছিল। সিগারেটের প্যাকেট ভদ্রলোকের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'আপনার চলে?'

'ঠিক নেশা বলতে যা বোঝায় সেরকম কিছু না।' ভদ্রলোক বললেন, 'মাঝে-মধ্যে একটা-আধটা চলে।'

অশোক প্যাকেটের ঢাকনা খুলে এগিয়ে দিল, 'তা হলে নিন।'

ভদ্রলোক একটি সিগারেট নিলেন। অশোকও একটি সিগারেট ঠোঁটে চেপে দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালাল। এগিয়ে দিল ভদ্রলোকের দিকে। ওঁর সিগারেট ধরানো দেখেই বোঝা গেল, ধূমপানে অনভ্যস্ত। অশোক নিজের সিগারেট ধরিয়ে একটি ছাইদানি টেনে নিয়ে জ্বলন্ত কাঠি গুঁজে দিল, 'আপনার নামটা এখনও জানা হল না।'

ভদ্রলোক ব্যস্ত হয়ে একটু নড়েচড়ে বসলেন, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ, আমার নাম নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। গোত্রে অবিশ্যি আমরা শাণ্ডিল্য।'

'মানে বন্দ্যো ঘটি সাদা।' অশোক হেসে বলল।

নরেন্দ্রবাবু একটু হেসে বললেন, 'সাদাসিধে কি না, সেটা আপনাদের বিচার্য, কিন্তু অশোকবাবু,

সেসব ভাবনা আজ সাতদিন ধরে মন থেকে ঘুচে গেছে।' বলতে-বলতে ওঁর চোখ-মুখের ক্লিষ্টতা আরও গভীর হয়ে উঠল।

অশোক বলল, 'স্বাভাবিক। এবার আমরা কাজের কথায় আসতে পারি।'

'তার আগে আপনি এই চিঠি দুটো দেখুন।' বলে তিনি পকেট থেকে টাইপ করা একটি চিঠি আর একটি মুখবন্ধ খাম এগিয়ে দিলেন। অশোক প্রথমে খোলা চিঠিটাই পড়ল। ইংরেজিতে টাইপ করা ছোট চিঠি, স্থানীয় সার্কল ইন্সপেক্টর শ্যামাপদ ভট্টাচার্যকে সম্বোধন করে লেখা ঃ

'প্রিয় শ্রীভট্টাচার্য, আমার বিশেষ পরিচিত এবং কলকাতার একজন বিশিষ্ট আইনজীবী শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য আপনার কাছে যাচ্ছেন। উদ্দেশ্য, শ্রীঅশোক ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করা। আপনার মারফত যাওয়াই সংগত, শ্রীঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ-পরিচয়ের সুবিধা হবে। বিষয়টি চব্বিশ পরগনা জেলার এক্তিয়ারভুক্ত না, তবু শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য অশোক ঠাকুরের সাহায্যের জন্য আমার শরণাপন্ন হয়েছেন। একটি জটিল খুনের তদন্তে ইনি শ্রীঅশোক ঠাকুরের সাহায্যপ্রার্থী। আশা করি আপনি উভয়ের যোগাযোগ করিয়ে দিতে সমর্থ হবেন। আমি শ্রীঅশোক ঠাকুরকেও একটি চিঠি এইসঙ্গে দিলাম। ধন্যবাদান্তে,

স্বাক্ষর/সুপারিন্টেনডেন্ট অফ পুলিশ, জেলা চব্বিশ পরগনা
আর কে মিত্র।'

অশোক শ্যামাপদকে লেখা চিঠিটা রেখে খামের ওপরের লেখা দেখল। কেবল লেখা আছে, 'শ্রীঅশোক ঠাকুর'। অশোক খামের মুখ খুলে চিঠি বের করল। ছাপানো প্যাডের ওপরে অশোকস্তম্ভ মুদ্রিত। পাশে 'সুপারিন্টেনডেন্ট অফ পুলিশ, ডিস্ট্রিক্ট ২৪ পরগনা'। ইংরেজি টাইপ করা চিঠি। একপাশে আন্ডারলাইন করে লেখা, 'বিশেষ গোপনীয় এবং জরুরি'। অশোক নীচের স্বাক্ষরে একবার চোখ বুলিয়ে নিল। এস. পি. ২৪ পরগনা, আর কে মিত্রর চেনা সই। অশোককে যথাবিহিত সম্বোধন করে নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের পরিচয় দিয়েছেন। পরিচয়টা এ-চিঠিতে কিছু ইলাবোরেট। যথা ঃ

'ইনি দেওয়ানি মামলা বিষয়ক একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ আইনজীবী, নিবাস এন্টালি থানার অধীন সুরেশ সরকার রোড। এঁর অনুরোধে আপনাকে চিঠি দেওয়ার আগে আমি স্পেশাল সুপারিন্টেনডেন্ট অফ পুলিশ, সি. আই. ডি., ওয়েস্ট বেঙ্গল-এর সঙ্গে কথা বলে নিয়েছি। তিনিও আপনার সম্পর্কে উৎসাহী বিশেষ করে যখন এঁর তরুণী অবিবাহিতা কনিষ্ঠা ভগ্নিকে বাড়ির পিছনের বাগানে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে খুন করা হয়েছে। ডাক্তার ময়নাতদন্ত করে নিশ্চিতভাবে হোমিসাইডাল বলে মতামত দিয়েছেন। ফরেনসিক রিপোর্ট এখনও পাওয়া যায়নি। পুলিশ মহলকে যা সব থেকে চিন্তিত করে তুলেছে, তা হল, গত ছ'দিনের মধ্যে সামান্যতম আলোকপাতও তাঁরা করতে পারেননি। ইতিমধ্যেই পত্র-পত্রিকায় মন্তব্য করা হয়েছে আপনি হয়তো দেখে থাকবেন। শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের অনুরোধে আপনাকে চিঠি দেওয়ার আগে আমি স্পেশাল সুপারিন্টেনডেন্ট অফ পুলিশ, সি. আই. ডি., পশ্চিমবঙ্গ-এর সঙ্গে কথা বলে নিয়েছি। উনিও আপনার সম্পর্কে বিশেষ উৎসাহী। এবং তিনিও চান আপনি এই খুনের তদন্তের ভার নিন। পুলিশের পক্ষ থেকে আপনাকে সর্বপ্রকারে সাহায্যের প্রতিশ্রুতিও তিনি দিয়েছেন, অবিশ্যি যদি আপনার প্রয়োজন হয়। বলা বাহুল্য, আমারও বিশেষ অনুরোধ, এই খুনের তদন্তের ভার আপনি নিন। বাকি কথা আপনাকে শ্রীভট্টাচার্য নিজেই বলবেন। ইত্যাদি...আপনার বিশ্বস্ত...

অশোক চিঠিটা ভাঁজ করতে-করতে মুখ না তুলে বলল, 'মিঃ মিত্রর চিঠিতে খুনের যে-ঘটনার কথা লেখা আছে, আমি খবরের কাগজে প্রায় সবই পড়েছি। আপনার বোনের নাম তো পারমিতা ভট্টাচার্য?'

'হ্যাঁ, খবরের কাগজে মিতার ছবি নাম সবই বেরিয়েছে।' নরেন্দ্রনাথ উৎসুক চোখে তাকিয়ে বললেন।

অশোক বলল, 'পুলিশ তো কুকুরও নিয়ে গিয়েছিল, আর কুকুর বাগানের পাঁচিল টপকাবার চেষ্টা করেছিল। তারপরে কুকুর বাইরে আনার পরে এন্টালি মার্কেটের সামনে সার্কুলার রোডে এসে থমকে যায়।'

'ঠিক তাই, এসবও—।'

'খবরের কাগজের রিপোর্ট।' অশোক বাধা দিয়ে বলল, 'এসবই আমি পড়েছি। আজও কলকাতার পয়লা নম্বর দৈনিকের শেষ নগর সংস্করণে খবর বেরিয়েছে, কলকাতা ইউনিভারসিটির পঞ্চম বর্ষের ছাত্রী পারমিতা ভট্টাচার্যের খুন যেন একটা ভোজবাজির ঘটনা। অন্তত পুলিশি তদন্তে সেইরকমই মনে হচ্ছে। পারমিতার হত্যাকারী যেন বাতাসে মিলিয়ে গেছে, আদৌ তার কোনও অস্তিত্ব আছে কি না সেটাই সন্দেহজনক। কিন্তু এ সন্দেহ অমূলক, সবাই বোঝেন। হত্যা যখন সংঘটিত হয়েছে তখন হত্যাকারীও নিশ্চয় একজন আছে। এমনকী পুলিশের তরফেই এমন অভিমতও প্রকাশ করা হয়েছে, পারমিতা বা তার পরিবারের সঙ্গে পরিচয় আছে এমন কোনও ব্যক্তির দ্বারাই খুনের সম্ভাবনা অনুমান করা হচ্ছে। অথচ তার হদিশ করা যাচ্ছে না। খবর, পুলিশ নিশ্চিন্তে বসে নেই, সম্ভাব্য সবরকম তৎপরতা চালানো হচ্ছে।'

'প্রায় মুখস্থ বললেন দেখছি।' নরেন্দ্রনাথের ক্লিষ্ট মুখে মুগ্ধতার ঝলক।

অশোক হেসে বলল, 'যার যাতে মন। খেলায় যাদের মন, দেখবেন খেলার খবর তাদেব মুখস্থ। এবার আপনার মুখ থেকে কিছু শোনা যাক। পুলিশ ক'জনকে গ্রেপ্তার করেছে?'

'গ্রেপ্তার?' নরেন্দ্রনাথের চোখে বিস্ময়ের ভ্রূকুটি, 'খবরের কাগজে তো এমন কোনও কথা ছাপেনি?'

অশোকের মুখে সেই একই হাসি, 'সব খবরই কি ছাপা হয়, না ছাপতে দেওয়া যায়? আজকের খবরের মধ্যেই ইঙ্গিত রয়েছে, পুলিশ নিশ্চয়ই এক বা·একাধিক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে। আপনি জানেন না?'

নরেন্দ্রনাথ সহসা কিছু বলতে পারলেন না। বিভ্রান্ত বিস্ময়ে অশোকের মুখের দিকে প্রায় মিনিটখানেক তাকিয়ে থাকলেন, তারপর প্রায় অস্ফুটে উচ্চারণ করলেন, 'আশ্চর্য।'

'এতে আশ্চর্যের কী আছে, নরেনবাবু?' অশোকের মুখে সেই হাসি, 'আপনি সিভিল কোর্টের ল-ইয়ার হলেও এটা নিশ্চয় বুঝতে পারেন, পুলিশ একবার যখন অনুমান করেছে, পারমিতা বা তার পরিবারেরই কারোর দ্বারা খুনের সম্ভাবনা রয়েছে, তখন সেরকম কারওকে নিশ্চয় পুলিশ আটক করেছে। অন্তত পারমিতার ঘনিষ্ঠ কারওকে তো নিশ্চয়ই। আর এ অনুমানের ভিত্তি বোধহয় এই, রাত্রি আটটার সময় বাড়ির পেছনের বাগানে পারমিতা কেন গিয়েছিলেন। একে শীতের রাত, আর পেছনের বাগানটায় বোধহয় আপনারা অবসর সময়ে বিশ্রাম বা চায়ের আসর-টাসর করেন, না?'

নরেন্দ্রনাথের চোখে-মুখে তখনও তীব্র বিস্ময়ের অভিব্যক্তি, বললেন, 'ঠিকই বলেছেন, পেছনের বাগানে বিশেষ প্রয়োজন না হলে আমরা যাই না। বাগান বলতে সেরকম মালি লাগিয়ে সাজানো বাগান কিছু নয়, কাঠা-তিনেক জমির ওপরে গোটা কয়েক গাছ আছে। বাড়ির বাচ্চারা খেলাধুলো করে। একটা পেয়ারা গাছে একটি দোলনাও ঝোলানো আছে, বাচ্চাদের জন্যেই। তার দ্বারা আপনার এ কথা মনে হল কেন?

'হতে পারে, আপনার বোন পারমিতার চেনা কেউ ওই সময়ে বাগানে আসতে বলেছিল।' অশোক বলল, 'আমার বিশ্বাস, আপনার বাড়িতে টেলিফোন আছে।'

নরেন্দ্রনাথ মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, 'আছে।' এবং আস্তে-আস্তে তাঁর কপালে গভীর চিন্তার রেখা ফুটে উঠল।

'না-না, আপনি এখন ওসব নিয়ে ভাববেন না।' অশোকের মুখে হাসি, 'আমি পুলিশের অনুমান আর কার্যক্রম বোঝবার চেষ্টা করছিলাম। যাই হোক, আমি ধরে নিচ্ছি, আপনি কারোর গ্রেপ্তারের খবর জানেন না।'

নরেন্দ্রনাথ মাথা নেড়ে বললেন, 'এর পরে জানিনে বলার কোনও মানেই হয় না। মিতার দুই ঘনিষ্ঠ ছাত্র ছেলে-বন্ধুকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। এ গ্রেপ্তারের খবর গোপন রাখতে বলা হয়েছে। আমি ছাড়া আমাদের বাড়িরও কেউ জানে না।'

'স্বাভাবিক।' অশোক আবার একটি সিগারেট ঠোঁটে চেপে ধরে প্যাকেট এগিয়ে দিল নরেন্দ্রনাথের দিকে।

নরেন্দ্রনাথ বললেন, 'ধন্যবাদ, আমি আর নেব না।'

'এ ছাড়া পুলিশের এগোবার আর কোনও রাস্তাও ছিল না।' অশোক দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে সিগারেট ধরাল, 'এ তদন্তের ভার যদি আমি নিই, আমিও সেই ছাত্র-বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলব।'

নরেন্দ্রনাথ ব্যগ্র স্বরে বললেন, 'যদি নিই না, অশোকবাবু, মিতার খুনের তদন্তের ভার আপনাকে নিতেই হবে। বাপ-মা মরা আমার এই ছোট বোনের আমি পিতৃতুল্য, আমার নিজের সন্তানের থেকেও মিতা আমার বেশি আদরের। আপনাকে বোঝাতে পারব না, বড় কষ্টে আছি—।' ওঁর গলার স্বর ধরে এল, আরক্ত চোখ ছলছলিয়ে উঠল।

অশোক সিগারেটে টান দিয়ে মুখ ঘুরিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল, 'আমি আপনার মনের অবস্থা বুঝতে পারছি। আগামীকাল সকাল দশটা নাগাদ আমি আপনার কলকাতার বাড়িতে যাব।'

নরেন্দ্রনাথ ধুতির কোঁচা দিয়ে চোখ মুছে বললেন, 'বেঁচে থাকতে মিতার জীবনে যা কিছুই ঘটুক, কিন্তু ওর যে এমন শত্রু থাকতে পারে, যে ওকে প্রাণে মেরে ফেলবে, কখনও ভাবতে পারিনি। হাসিখুশি মিওকে—যতদূর জানতাম, কলেজে ইউনিভারসিটিতেও প্রফেসর-ছাত্র-ছাত্রী সকলের সঙ্গেই ওর খুব সদ্ভাব ছিল। বাড়ির কথা তো আসেই না। আমার তিন ছেলে, মেয়ে নেই, ওর আদর ছিল সব থেকে বেশি।'

'সেটাই তো মুশকিল নরেনবাবু, এসব ভেবে কে কেন খুন হয় তার কোনও কূলকিনারা পাওয়া যায় না।' অশোক ম্লান হাসল, 'সরষের মধ্যে ভূতের মতো ব্যাপার, কার্যকারণ আর খুনি সেইরকমভাবে লুকিয়ে থাকে। নির্ভর করে মোটিভ খুঁজে বের করা, খুনি কোন শ্রেণির লোক ভাবতে পারা আর তার পরিকল্পনাটা সে কীভাবে কাজে লাগিয়েছে।' অশোক সিগারেটে টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল, 'আপনার নিজের কী ধারণা? কারওকে সন্দেহ হয়? সামান্যতম?' কথাটা ও খুব আচমকাই জিগ্যেস করল।

নরেন্দ্রনাথ অবাক মুখ তুলে বললেন, 'আমার? পুলিশও আমাদের বাড়ির সবাইকে জিগ্যেস করেছে। আমি তো মাথার চুল ছিঁড়েছি কিন্তু কারওকে সন্দেহ করতে পারিনি। এমনকী যে ছেলে দুটিকে পুলিশ সন্দেহবশত অ্যারেস্ট করেছে, তাদেরও আমি সন্দেহ করতে পারি না।'

'কেন?' অশোক স্পষ্ট জিগ্যেস করল।

নরেন্দ্রনাথ বললেন, 'প্রথমত, ওরা আমাদের বাড়িতে প্রায় নিয়মিত আসত। কলকাতার অত্যন্ত বনেদি শিক্ষিত পরিবারের ছেলে। মিতা যেদিন খুন হল সেদিনও বিকেলে ওরা দুজনেই

আমাদের বাড়িতে এসেছিল, চা খেয়েছে, গল্প করেছে। বাড়ির সকলের সঙ্গে ওদের আলাপ, মিতার সঙ্গে ওদের তুইতোকারি সম্পর্ক।'

'হুঁ।' অশোক হাসল, 'একমাত্র এইসব কারণেই ওদের দুজনকে সন্দেহের বাইরে রাখা যায় না। আপনি নিজে সজ্জন, ভদ্র, উদারপন্থী সামাজিক ব্যক্তি, আপনি আপনার মতো ভেবেছেন। কিন্তু পারমিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ-অসাক্ষাতে যত মহিলা পুরুষের যোগাযোগ ছিল, তাদের কারওকেই আমরা সন্দেহের বাইরে রাখতে পারিনে। অসাক্ষাতে যদি কারোর সঙ্গে যোগাযোগ থেকে থাকে, তাও খুঁজে বের করতে হবে। যাই হোক, সেসব পরের কথা, কাজের সময়ে দেখা যাবে।' অশোক সিগারেটে টান দিল, 'আচ্ছা, আপনি বা আপনার বাড়ির লোকেরা কেউ কি পারমিতার আচরণে বিশেষ কিছু তফাত লক্ষ করেছেন? মানে, খুন হওয়ার আগে দু-চার দিন বা তারও আগে?'

নরেন্দ্রনাথ গম্ভীর হলেন, একবার মাথা নিচু করলেন, তারপরে মুখ তুলে ঘাড় ঝাঁকালেন, 'হ্যাঁ, আমার স্ত্রী আর বড় বউমা—।'

'বড় বউমা?'

'আমার বড় ছেলের স্ত্রী।'

'ও, সরি ফর দ্য ইন্টারাপশন।'

নরেন্দ্রনাথ বললেন, 'না, তাতে কী। ওরা বলছিল, ইদানীং মাঝেমধ্যে মিতাকে আনমনা দেখাত, কখনও বলত, দূর ছাই কিছু ভালো লাগে না। কখনও নাকি বলত, দিন-সাতেকের জন্যে একলা কোথাও বেড়িয়ে আসব। এসব কথা বড় বউমার সঙ্গেই বেশি হত, আগে এ ধরনের কথাবার্তা ও তেমন বলত না। বড় বউমা যদি জিগ্যেস করত, একলা কেন? কারও সঙ্গে যাবে নিশ্চয়ই, মিতা বলত, হ্যাঁ, মরণের সঙ্গে যাব।' নরেন্দ্রনাথের গলাটা আবার যেন ডুবে গেল।

অশোক চুপচাপ খানিকক্ষণ সিগারেটে টানল। মনে-মনে ভাবল, মরণের সঙ্গে আর যেতে হল না। মরণই ওর কাছে এসেছিল। নরেন্দ্রনাথ অশোকের নিবিষ্ট চিন্তিত মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন। অশোক বলল, 'আপনাকে বেশি কথা আর জিগ্যেস করবার নেই। যা জিগ্যেস করবার এখানেই সেরে নিই। আমি ধরেই নিচ্ছি বাড়ির মহিলারা মেয়েদের কথা যতটা জানেন বা বোঝেন আপনার পক্ষে তেমনটা সম্ভব না। আপনার কোর্ট-কাছারি-মক্কেল এসব নিয়েই কাটে। অল্পস্বল্প অবসর সময়ে কিছু পারিবারিক কথাবার্তা চলত।'

'ঠিক বলেছেন।' নরেন্দ্রনাথ বললেন, 'আমি সারাদিন কাজে ব্যস্ত থাকি, কোর্ট থেকে ফেরার পর, সন্ধেবেলায়ও মক্কেলদের ভিড়। রাত্রে খাবার টেবিলে বসে যত কথা। ওই একটা সময়েই সকলের সঙ্গে আমার সংসারের দৈনিক খোঁজখবর কথাবার্তা হত।'

অশোক মাথা ঝাঁকাল, 'আপনারা ক' ভাইবোন?'

'তিন ভাই, দু-বোন।' নরেন্দ্রনাথ বললেন, 'কেন বলুন তো?'

অশোক সিগারেটে টান দিল, 'এমনি জিগ্যেস করছি। পারমিতা ছিল সকলের ছোট, তাই তো?'

'হ্যাঁ।'

'আপনার আর তিন ভাই-বোন? কোথায় থাকেন, কে কী করেন?'

'আমার পরের ভাই ডাক্তার, ও আলাদা বাড়ি করে ল্যান্সডাউনে থাকে। তার পরের ভাই থাকে ক্রিক রো-তে, আমাদেরই একটা বাড়ির দোতলায়। নীচের তলায় ভাড়াটে আছে। ও রাইটার্স-এ হেলথ ডিপার্টমেন্টে কেরানির চাকরি করে। ভায়েদের মধ্যে ওর অবস্থাই একটু খারাপ। অবিশ্যি ও অল্প বয়সেই একটু বখাটে হয়ে গেছিল, বাবার মনে খুব দুঃখ ছিল ওকে নিয়ে। তার পরে বোন, ওর বিয়ে হয়ে গেছে, শ্বশুরবাড়ি সোদপুরে—গ্রপারে নয়, সুখচরে। তারপরেই পারমিতা।'

'আপনার সুরেশ সরকার রোডের বাড়ি কি আপনি করেছেন?'

'না, ওটা আমার পৈতৃক সম্পত্তি।'

'আপনার পৈতৃক সম্পত্তির পরিমাণ কী? কাকে-কাকে কী দিয়ে গেছেন?'

নরেন্দ্রনাথ এসব প্রশ্নে একটু অবাক হচ্ছিলেন, তবু বললেন, 'সুরেশ সরকার রোডের বাড়ি বাবার নিজের তৈরি। ক্রিক রো আর লোয়ার রেঞ্জে দুটি বাড়ি বাবা কিনেছিলেন। তার মধ্যে সুরেশ সরকার রোড আর ক্রিক রো-র বাড়ি আমাদের তিনভাইয়ের যৌথ সম্পত্তি হিসেবে দিয়ে গেছেন। লোয়ার রেঞ্জের বাড়ি দুই বোনকে—অর্পিতা আর পারমিতাকে দিয়ে গেছেন। আমার মেজো ভাই—ডাক্তার, আর ছোট ভাই, তাদের সুরেশ সরকার রোডের বাড়ির অংশ আমাকে বিক্রি করে দিয়েছে। এখন ও-বাড়ির মালিক আমিই।'

'নগদ টাকাপয়সা বা কোম্পানির শেয়ার-টেয়ার কিছু ছিল নাকি?'

নরেন্দ্রনাথ এবার যেন কিঞ্চিৎ বিরক্ত বোধ করলেন, 'এসবও কি আপনার তদন্তের মধ্যে পড়ে নাকি? পুলিশ কিন্তু এসব কিছুই জিগ্যেস করেনি।'

অশোক হাসল, সিগারেটে শেষ টান দিয়ে ছাইদানিতে গুঁজে দিল, 'বিরক্ত হবেন না, নরেনবাবু। আমি আপনাদের পরিবারের টোটাল চেহারাটা বুঝে নিতে চাইছি। হ্যাঁ, তদন্তের জন্যে এসবও দরকার হয়। পুলিশের কথা পুলিশই জানে। কিন্তু মনে রাখবেন, এর দ্বারা আমি আপনাদের পরিবারের রেপুটেশন সম্পর্কে কোনও কটাক্ষ করছি না। আপনি সিভিল কোর্টের অ্যাডভোকেট, সম্পত্তি নিয়ে কত কী ঘটে, আপনার না জানার কথা নয়।'

'জানি।' নরেন্দ্রনাথ বেশ জোরের সঙ্গে বললেন, 'আপনাকে এটুকু বলতে পারি, সম্পত্তি নিয়ে আমাদের ভাইবোনদের মধ্যে কোনওরকম বিবাদ-বিসম্বাদ মনকষাকষি নেই।'

অশোক লজ্জিত হেসে বলল, 'সে-কথা আপনাকে আমি জিগ্যেস করিনি। কেবল সম্পত্তির পরিমাণ আর ভাগ-বাটোয়ারার কথা জানতে চেয়েছিলাম। যাক, আপনি যখন—।'

'না-না, কথাটা যখন তুলেছেন, আপনাকে সবই বলছি।' নরেন্দ্রনাথ একটু ক্ষুব্ধভাবেই বললেন, 'আর বাবার নগদ টাকাকড়ি বা কোম্পানির শেয়ারের কথা বলছেন? বাবা মারা গেছেন আট বছর আগে। তখন তাঁর ব্যাংকে জমা ছিল প্রায় ষাট হাজার টাকা। তার মধ্যে তিরিশ হাজার টাকাই তিনি মিতার জন্যে রেখেছিলেন—অর্থাৎ মিতার বিয়ের জন্যে। বাবা বেঁচে থাকতেই আমরা তিনভাই দাঁড়িয়ে গেছলাম, অপু—মানে অর্পিতার বিয়েও তিনি বেঁচে থেকেই দিয়ে গেছলেন। দিয়ে যেতে পারেননি মিতার বিয়ে। বাকি টাকা তিন ভাইকে সমান ভাগে দিয়ে গিয়েছিলেন। একটি কোম্পানির পঁচিশ হাজার টাকার শেয়ার কিনেছিলেন। বাবা বেঁচে থাকতেই সে-কোম্পানির গণেশ উলটেছিল। ওটা নিট লস।'

অশোক মাথা ঝাঁকাল, 'তাহলে, মিতার মৃত্যুর পরে লোয়ার রেঞ্জের বাড়ির অংশ, বিয়ের জন্যে রাখা তিরিশ হাজার টাকা, এসব কে পাবে? উইলের সময় নিশ্চয় এ-কথা ভাবা হয়েছিল, মানুষের মৃত্যুর কথা তো কিছু বলা যায় না। স্বাভাবিক মৃত্যুই যদি হত, বা, এখন এই অস্বাভাবিক মৃত্যুর পরে কে পারমিতার সম্পত্তির ওয়ারিশ?'

'হ্যাঁ, সে-কথাও উইলে উল্লেখ করা হয়েছে।' নরেন্দ্রনাথ বললেন, 'আপনি খবরের কাগজেই পড়েছেন আমার বাবা নৃসিংহ ভট্টাচার্যও ছিলেন সিভিল অ্যাডভোকেট।'

'পড়েছি।'

'উইলে বলা হয়েছে, মিতার যদি বিয়ের আগে মৃত্যু ঘটে, তাহলে সে-সম্পত্তি পাবে অর্পিতার সন্তানেরা। কন্যাদের সম্পত্তি বাবা কন্যাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন। এমনকী, অর্পিতা যদি নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যায়, তাহলে সবটাই পারমিতা পাবে, এইরকম ব্যবস্থা ছিল।'

'আর অর্পিতার বর?'

'তাকে নিয়ে ভাবনা কীসের? অর্পিতা নিঃসন্তান অবস্থায় মারা গেলে বিক্রম আবার বিয়ে করতে পারে। তখন আর আমাদের সঙ্গে তার কী সম্পর্ক?'

'ঠিক। বিক্রম নিশ্চয়ই অর্পিতার স্বামী?'

'হ্যাঁ।'

'আর একটা কথাই জিগ্যেস করার আছে।' অশোক দু-হাতে মুখ ঘষল, 'আপনার তিন ছেলেদের কার কত বয়েস, কে কী করেন?'

নরেন্দ্রনাথ বললেন, 'বড় ছেলের বত্রিশ বছর বয়েস, চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট, একটি কোম্পানিতে চাকরি করছে, এখন নিজে একটি ফার্ম খোলার কথা ভাবছে। ও বিয়ে করেছে, এক ছেলে এক মেয়ে। মেজো ছেলে এম. এ. পাশ করে আইন পড়ছে। ছোট ছেলেটি এ বছরই হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করে ডাক্তারি পড়ার সুযোগ পেয়েছে।'

'আপনার বয়েস তাহলে কত হল?' অশোক হাসল, 'দেখে তো পঞ্চাশ-পঞ্চান্নর বেশি মনে হয় না।'

নরেন্দ্রনাথ ঈষৎ হেসে বললেন, 'আমার ষাট চলছে।'

'চেহারা আর স্বাস্থ্য বেশ ভালো আপনার।' অশোক বলল, 'আপনার সঙ্গে আমার আর কথা নেই। আমার জিজ্ঞাসাবাদে অসন্তুষ্ট হননি তো?'

নরেন্দ্রনাথের মুখে এখন বিরক্তি-বিক্ষোভ নেই, 'একটুও না। প্রথমটা বুঝতে পারিনি। কিন্তু অশোকবাবু, আসল কথাটা—।'

'বললাম তো, আগামীকাল আমি আপনার বাড়ি যাব।' অশোক বলল, 'বেলা দশটা নাগাদ যাব। আপনি কাল কোর্টে বেরোবেন?'

'এতদিনে বেরোইনি। আপনি যদি বলেন, কালও বেরোব না।'

'হ্যাঁ, কালকের দিনটা আপনি থাকুন, নইলে বাড়ির লোকদের সঙ্গে আমার পরিচয় করার অসুবিধে হবে।'

'নিশ্চয় থাকব।'

'কিন্তু আজ বাড়ি গিয়ে আমার কথা কারওকে কিছু বলবেন না। আপনার স্ত্রীকেও না। যখন যাব, তখন পরিচয় করিয়ে দেবেন।'

নরেন্দ্রনাথ আবার একটু অবাক হলেন, তারপরে হেসে বললেন, 'তাই হবে।'

অশোক উঠে দাঁড়াল। নরেন্দ্রনাথ পকেটে হাত দিয়ে বললেন, 'আপনাকে কিছু অ্যাডভান্স টাকা—।'

'এটা আমার পেশা নয়, নরেনবাবু।' অশোক বিনীত হাসল, 'কিন্তু আমি ডেডিকেটেড। তবে আপনার কাজের জন্যে খরচের দরকার হলে টাকা আমি সময়মতো চেয়ে নেব।'

নরেন্দ্রনাথ উঠে দাঁড়িয়ে মুগ্ধ, করুণ চোখে অশোকের দিকে তাকালেন, 'আমরা উকিল মানুষ, টাকার কথা আগে ভাবি, সে যে যাই বলুক। তাহলে আপনাকে পাচ্ছি। এটাই আমার বড় সান্ত্বনা। তবু একটা কথা জিগ্যেস করব?'

'নিশ্চয়ই করবেন।'

'আমাকে যে এত কথা জিগ্যেস করলেন, তা থেকে কী বুঝলেন?'

অশোক হাসল, 'কী আবার? যে-কোনও লোকই আপনার কথা থেকে একটা কনক্লুশনে আসতে পারে। পারমিতাকে মার্ডারের মোটিভ থাকতে পারে দুজনের। আপনার বোন আর ভগ্নিপতি অর্পিতা আর বিক্রমের।'

'কী বলছেন আপনি!' নরেন্দ্রনাথ প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন, 'ওরা দুজন যে এমনিতেই কথায়-কথায় বলে মিতার বিয়েতে লোয়ার রেঞ্জের বাড়িটা ওকে যৌতুক হিসেবে দিয়ে দেবে। বিক্রম

তো এমন কথাও বলত লোয়ার রেঞ্জের বাড়িটা ঝরঝরে পুরোনো, সস্তার ভাড়াটেরা উঠতে চায় না। কোনওরকমে ভাড়াটে তুলতে পারলে, ওই বাড়িটা ভেঙে ফেলে ব্যাংক লোন নিয়ে মালটিস্টোরিড বিল্ডিং করবে, সবটাই থাকবে মিতার নামে, ফ্ল্যাট বিক্রি করে লাখ-লাখ টাকা করবে। ওরা মিতাকে অত্যন্ত ভালোবাসে। শুধু তাই নয়, অপু-বিক্রমের অবস্থা বিরাট। সুখচরে ওদের বিরাট বাড়ি, আশেপাশেও বেশ কিছু জমি-বাড়ি ওদের নিজেদের। কলকাতায় একটি বাড়ি আছে। বিরাট ব্যবসা, আর বিক্রম ওর বাবার একমাত্র ছেলে।'

অশোক নরেন্দ্রনাথকে বাধা না দিয়ে কথাগুলো শুনে গেল, তারপরে হাসল, 'সবই ঠিক, আমি আপনার কথার একটা জবাব দিলাম মাত্র। পুলিশ এসব ডিটেল জানলে তারাও ওই মোটিভের কথাই আগে ভাববে। কিন্তু এটাই সত্যি, এ কথা আমি বলিনি। আপনি জিগ্যেস করলেন, আমি জবাব দিলাম, জাস্ট কথার কথা।'

'তাই বলুন।' নরেন্দ্রনাথ যেন স্বস্তিতে নিশ্বাস ফেললেন, 'আপনার কথা শুনে আমি রীতিমতো ভয় পেয়ে গেছলাম। শেষটায় অপু-বিক্রমকে নিয়ে টানাটানি?'

অশোক হাসল, কিছু বলবে ভেবেও না বলে হাতের ঘড়ি দেখল, 'সাড়ে সাতটা বাজে, আপনাকে আবার কলকাতায় ফিরতে হবে।'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, চলুন।' অশোকের সঙ্গে জুতো পরে বাইরে এলেন।

অশোক দেখল, ফটিক ছাড়াও ওর আরও দুই বন্ধু রকে দাঁড়িয়ে কথা বলছে। ভেতরে নতুন অচেনা লোক দেখে ইচ্ছে করেই কেউ ঢোকেনি। অশোক বলল, 'তোরা বোস, আমি আসছি।'

বন্ধুরা ঘরে ঢুকে গেল। অশোক জিগ্যেস করল, 'শ্যামাপদবাবুর চিঠিটা আমার কাছেই থাকবে?'

'হ্যাঁ, উনি বলে দিয়েছেন, আপনার সঙ্গে পরে দেখা করবেন।' নরেন্দ্রনাথ রকের ওপর দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে একবার অশোকদের বাড়িটার দিকে দেখলেন।

ইতিমধ্যে বড়দা মেজদার ঘরে সংগীতচর্চা আর জ্যোতিষী শাস্ত্রালোচনা শুরু হয়ে গেছে। অশোক বলল, 'আপনি নতুন মানুষ, স্টেশন চিনে যেতে পারবেন তো?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, একটা রিকশো নিয়ে চলে যাব।'

'আর-একটা কথা।' অশোক সিঁড়ির সামনে দাঁড়াল, 'ময়না তদন্তের রিপোর্টের কোনও কপি আপনার বাড়িতে আছে?'

নরেন্দ্রনাথ হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লেন। তাকালেন অশোকের মুখের দিকে। একবার মুখ নিচু করলেন, আবার তুললেন। রাস্তার আলোয় অশোক নরেন্দ্রনাথের মুখ স্পষ্ট দেখতে পেল না। তিনি বললেন, 'আছে। আপনাকে একটা কথা বলা হয়নি। ময়না তদন্তের রিপোর্টে বলা হয়েছে, মিতা প্রায় তিনমাস কনসিভ করছিল। খবরের কাগজে এ কথা—।'

'বুঝেছি।' অশোক বলল, 'এটা একটা ভাইটাল পয়েন্ট। এনিহাউ, আপনি আজ আসুন, আমি কাল দশটা নাগাদ যাচ্ছি।'

নরেন্দ্রনাথ কোনও কথা বলতে পারলেন না। কোনওরকমে কপালে দু-হাত ঠেকিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে হেঁটে চললেন। অশোকের ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটল। ভদ্রলোক কি ভেবেছিলেন, অশোক পোস্টমর্টেম রিপোর্ট দেখতে চাইবে না? আশ্চর্য আত্মসম্মানবোধ! এতবড় কথাটাই বলতে ভুলে গিয়েছিলেন? তা সম্ভব না। ও ঘরে গিয়ে ঢুকল।

অশোক রাত্রি ন'টা নাগাদ ওদের বাড়ির ভেতরের অন্দর পেরিয়ে খিড়কি দরজার সামনে এল। দরজাটা খোলাই ছিল। ভেতরে ঢুকে ছোট গলি ডিঙিয়ে কাঞ্চন বউদির বাড়ি ঢুকল। এত

তাড়াতাড়ি আড্ডাভঙ্গে বন্ধুরা খুশি হয়নি, বলেছে, 'ও এখন কুকুর হয়ে গেছে, গন্ধ শুঁকে বেড়াচ্ছে।' অশোক হেসেছে। বন্ধুরা ওকে ভালোই চেনে। ও আসবার আগে ফটিককে বলে এসেছে, আগামীকাল সকালে আটটার সময় কলকাতা যাওয়ার জন্যে যেন প্রস্তুত হয়ে আসে।

কাঞ্চন বউদির—অর্থাৎ জ্ঞাতি সম্পর্কে দাদা গোবিন্দর—বাড়িও ছোটখাটো না। অশোক বাড়িতে ঢোকবার সদর দরজাটা খোলাই পেল। সামনে লম্বা-চওড়া বিরাট বাঁধানো উঠোন। তার কোলে উঁচু রক, রকের কোলে লম্বা টানা দালান। দালানের ভেতরে সারি-সারি ঘর। দক্ষিণের শেষ প্রান্তে দালান, পুবে বাঁক নিয়ে রান্নাঘর, কলতালার দিকে প্রসারিত।

অশোক দালানে ঢুকে দেখল, একটিমাত্র ঘরে আলো জ্বলছে। গোবিন্দদা শুয়ে আছে সাবেকি উঁচু খাটে। সারা দিনরাত্রি প্রায় শুয়েই থাকে। সকালে-বিকেলে কাঞ্চন তুলে ধরে, পাশেই রাখা ইজিচেয়ারে বসিয়ে দেয়। স্নান করানো, খাওয়ানো তো আছেই। গোবিন্দদার কথার উচ্চারণও অস্পষ্ট। সে ঘুমোচ্ছে। নিশ্চয় রাত্রের খাবার খাওয়ানো হয়ে গেছে। বাড়ির পুরোনো বুড়ো চাকর বসে আছে এক কোণে। একবার মুখ ফিরিয়ে অশোককে দেখল। অশোক সোজা দক্ষিণে গিয়ে পুবে ঘুরে রান্নাঘরের দরজায় উঁকি দিল। দেখল কাঞ্চন উনোনের কাছাকাছি পিঁড়েয় বসে গভীর মনোযোগে একটি বই পড়ছে। তার মানে উনোনে এখনও আগুন আছে। শীতে আগুন পোহানো আর বই পড়া একসঙ্গে চলছে। ঘরের বাইরে ছাদ ঢাকা বারান্দার টিমটিমে আলোয় ঝি ভাত খাচ্ছিল। অশোককে দেখে তাড়াতাড়ি ঘোমটা টেনে মুখ ঢাকল।

কাঞ্চনের দিকে তাকিয়ে অশোকের ঠোঁটে হাসি ফুটল। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বলল, 'মনে হচ্ছে বিজলি চুম্বকের মতো কোনও বই পড়া হচ্ছে?'

কাঞ্চন চমকে উঠে মুখ ফেরাল। পরমুহূর্তেই আবার মুখ ফিরিয়ে নিল, 'সকলে যদি ভাবে তারাই একমাত্র চুম্বকের মতো বই পড়ে তাহলে ভুল করেছে।'

অশোক বাইরে স্যান্ডেল রেখে ঘরের মধ্যে ঢুকল। একপাশে জড়ো করে রাখা আসনের একটা টেনে নিয়ে কাঞ্চনের এক হাত দূরে পেতে বসে পড়ল, 'না তা করব কেন? তবে গাঁজাখুরি গল্প না হলেই হল। কিন্তু ইংরেজি পকেটবুক সাইজে বইটা কী, জানতে পারি?'

'আমি গাঁজাখুরি বই পড়িনে।' কাঞ্চন বইটির মলাট তুলে দেখিয়ে দিল।

অশোক দেখল, 'ফোর ট্র্যাজেডিস অফ শেকসপিয়র'। ওর চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, 'চমৎকার। একেবারে মূল নিয়ে নাড়াচাড়া? এর ওপরে তো আর কথাই চলে না। যাকে বলে খাঁটি চুম্বক। তা, কোনটি পড়া হচ্ছে?'

'হ্যামলেট।' কাঞ্চন বইটা পিঁড়ির পাশে রাখল, 'তা এত রাত্রে, রান্নাঘরে, এরকম ঘনিয়ে এসে বসার মানে?'

অশোক বোকা-বোকা হেসে বলল, 'দেখতে এলাম, তোমার বাড়ির দরজাটা খোলা আছে কি না, দেখলাম খোলা আছে। অমনি যেন চায়ের তেষ্টায় গলাটা শুকিয়ে উঠল।'

'বয়ে গেছে এখন আমার চা করে দিতে। কাঞ্চন মুখ ফিরিয়ে নিল, 'এখন আমি খেয়ে শুতে যাব।'

অশোক ঝুঁকে পড়ে কাঞ্চনের আলতা-পরা পায়ের দিকে হাত বাড়াল, 'লক্ষ্মীটি—।'

'কী হচ্ছে?' কাঞ্চন ঝটিতি পা-জোড়া সরিয়ে নিল, ঘাড় বাঁকিয়ে চোখের কোণে তাকাল, 'এত রাত্রে অন্দরে ঢুকে পরস্ত্রীর কাছে চা চাইতে লজ্জা করে না?'

অশোক মাথা নেড়ে বলল, 'না, পরস্ত্রীর চোখে তো কোনওদিন দেখিনি;'

'মানে?' কাঞ্চনের ভুরু কুঁচকে উঠল।

অশোক তাড়াতাড়ি ঢোঁক গিলে বলল, 'থুড়ি, পরস্ত্রী বটে, বলতে যাচ্ছিলাম, বন্ধু—মানে বউদি, পর বলে তো কোনওদিন ভাবতে দাওনি।'

'আমি ঠিকই দিয়েছি, তুমিই ভাবনি।' কাঞ্চন মুখ ফিরিয়ে শিক তুলে নিয়ে উনোনের আগুন উসকে তুলল।

অশোক দু-হাত ঘষে বলল, 'আসলে আমি তো ভালোবাসি, তোমার হল বিরাগ—।'

কথা শেষ করার আগেই কাঞ্চন ঘাড় বাঁকিয়ে তাকাল। চোখের তারা নিবিড়। কিন্তু কিছু না বলেই আবার মুখ ঘুরিয়ে নিল। হাতের সামনে জলের পাত্র ছোট কেতলি এমনভাবে রাখা যে, চা তৈরির জন্য যেন প্রস্তুত হয়েই ছিল। কেতলিতে জল ঢেলে উনোনে বসাতে-বসাতে নিজের মনেই উচ্চারণ করল, 'ভালোবাসা।'

'সত্যি, কোথায় যে হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছে, ধরা-ছোঁয়া যায় না।' অশোক বলল।

কাঞ্চন আবার মুখ ফিরিয়ে তাকাল। এখন ওর ডাগর কালো চোখে যেন একটা বিষণ্ণ অভিযোগ, 'যা ধরা-ছোঁয়া যায় না তার পেছনে ছুটে লাভ কী?'

'মনের রোগ।'

কাঞ্চন অশোকের চোখের দিকে তাকিয়ে কিছু বলতে গেল। পারল না। দুজনেই কেমন ভাবাবিষ্ট হয়ে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল। কাঞ্চন আস্তে-আস্তে মুখ ফিরিয়ে নিল। হাতের কাছেই ওর চা-চিনির কৌটো। ঝুঁকে পড়ে বাঁ-দিকের মিট সেফ-এর পাল্লা খুলে কাপ-ডিশ-চামচ বের করল। অশোক বলল, 'জীবনে কিছু-কিছু কথা কখনও বোধহয় বলা যায় না। তা না-ই যাক, একটা কথার জবাব দাও তো।'

'আজ্ঞা করুন।' কাঞ্চন মুখ ফেরাল না।

অশোক বলল, 'হ্যামলেট তো নতুন পড়ছ না। বলতে পারো, কোনও তদন্তের সময় আমরা কেন হ্যামলেটের মতো মরা মানুষের ভূত দেখতে পাই না? তা হলে অপরাধীকে ধরাটা অনেক সহজ হত।'

'দেখতে ঠিকই পাও, না দেখতে পেলে আর খুনিকে পাকড়াও কেমন করে?' কাঞ্চন ফুটে যাওয়া জলের কেতলি আঁচল দিয়ে ধরে নামাল, 'তবে হ্যামলেটের উন্মাদ একাগ্রতা থাকলে তোমরাও মরা মানুষের ভূত দেখতে পেতে। সাবকনসাস মাইন্ডের কথা তো তোমাদের মুখেই শুনি।'

অশোকের চোখে বিস্ময়ের ঝিলিক খেলে গেল, 'পায়ের ধুলো দাও, কাঞ্চন—থুড়ি, বউদি।

'গায়ে গরম জল ঢেলে দেব।' কাঞ্চন নিজেকে একটু গুটিয়ে নিল, 'যাকে ভূতে পায় না তার কিছুই করা হয়ে ওঠে না।'

অশোক উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল, 'দারুণ বলেছ। যাকে ভূতে পায় না, তার কিছুই করা হয়ে ওঠে না। প্রায় রামকৃষ্ণদেবের মতো কথা। ভর না হলে কিছুই হয় না।'

'এখন দয়া করে বলো তো, কী বলতে এসেছ?' কাঞ্চন কেতলির ঢাকনা খুলে চা পাতা ফেলে দিল। ঢাকনা বন্ধ করে মুখ ফিরিয়ে তাকাল, 'কে ভদ্রলোক দেখা করতে এসেছিলেন?'

অশোক ঘাড় ঝাঁকিয়ে একটা সিগারেট ধরাল, 'আমার দেখছি ক্রমেই প্রমোশন বাড়ছে। এস. এস. পি., সি. আই. ডি., ওয়েস্ট বেঙ্গলও আমার সাহায্য চাইছেন। তুমি চা দাও, জুত করে সব বলছি।'

'তুমি শুরু করো, আমি চা দিচ্ছি।'

অশোক সিগারেটে টান দিয়ে পারমিতা হত্যার সব ঘটনা বলল। বলতে-বলতেই কাঞ্চনের চা হয়ে গেল, চুমুক দেওয়া চলল। কাঞ্চন সব শুনল। অশোক বলল, 'এবার বলো তো গুরু, কী বুঝলে?'

'আমার আবার বোঝাবুঝির কী আছে? আমি গুরুগিরি জানি না।' যদিও কাঞ্চনের চোখে চিন্তিত অন্যমনস্কতা, 'তবে দিদি-জামাইবাবুর দিক থেকে সম্পত্তির ব্যাপারটা আমার তেমন মনে লাগছে না। তিন মাসের প্রেগন্যান্সিটাই কেমন গোলমেলে।'

অশোক চোখ বুজে ধ্যানস্থভাবে বলল, 'যথা?'

'তা কী করে বলব?' কাঞ্চন বলল, 'আত্মহত্যা যখন নয়, তখন যার দ্বারা প্রেগন্যান্ট হয়েছিল, হয় সে, নয় তো আর কেউ, না পাওয়ার জ্বালায় হিংসায় খেপে গিয়ে একেবারে খতম করেছে। তবে পুলিশের প্রথম ভাবনাটা ঠিকই, পারমিতার অচেনা কারওর দ্বারা এ খুন ঘটেনি।'

অশোক চোখ মেলে বলল, 'আর কেউ না-পাওয়ার জ্বালায় হিংসেয় খেপে গিয়ে খতম করেছে, কথাটা ঠিক পরিষ্কার হল না।'

'কেন, অপরিষ্কারের কী আছে?' কাঞ্চন বলল, 'যদি ধরে নিই পারমিতা যার প্রেমে পড়েছিল, যার কাছে ও নিজেকে সঁপে দিয়েছিল, সে ছাড়া এমন হয়তো কেউ ছিল যে ওকে চেয়েছিল। পুরুষরা তো কোনওদিন বুঝল না, একটা জিনিস মেয়েদের কাছে চেয়ে, জোর করে আদায় করা যায় না, অতএব, সে যদি না পেল অপরকে কেন পেতে দেবে?'

অশোক ভুরু তুলে বলল, 'অবিশ্যি মেয়েরাও এরকম অবুঝ হয়, কিন্তু সে-তর্ক এখন থাক। তাহলে, মোটামুটি তোমার এই দুটি সম্ভাবনার কথা মনে হয়েছে। যে পেয়েছিল, অথচ চায়নি, আর যে চেয়েছিল, অথচ পায়নি। এরকম দুজনেব একজন—।'

'হতে পারে।' কাঞ্চন বলল, 'কিন্তু খুনের আগে পারমিতার ''ইচ্ছে করে দিন-সাতেকের জন্যে একলা কোথাও বেড়িয়ে আসি'' কথাটাও ভেবে দেখা দরকার।'

অশোক কিছু না বলে ভ্রূকুটি জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল। কাঞ্চন বলল, 'তার সঙ্গে পারমিতার বউদিকে বলা আরও একটি কথা, একলা বেড়াতে যাওয়ার জবাবে বলেছে, ''মরণের সঙ্গে যাব।'' কেন সে একলা যেতে চেয়েছিল, আর মবণের সঙ্গেই বা কেন?'

অশোক কাঞ্চনের চোখের দিকে অপলক তাকিয়ে বলল, 'পারমিতা কি ক্লিনিকে যাওয়ার কথা ভেবেছিল?'

'একলা যেতে চাওয়ার অর্থ তো সেরকমই বোঝায়।' কাঞ্চন হাসল।

অশোক জিগোস করল, 'আর মরণের সঙ্গে কেন?'

'কুমারী মেয়ে, অ্যাবরশন করাবে, প্রাণে একটা ভয় থাকবে না?'

অশোক চিন্তিত মুখে চুপ করে রইল। কাঞ্চন বলল, 'এবার ওঠো তো। আমি রান্নাঘরের পাট মেটাই।'

'হ্যাঁ।' অশোক উঠে দাঁড়াল, 'কাল সকালে কলকাতা যাচ্ছি, অবিশ্যি তার আগে তোমার হাতে চা খেয়ে যাচ্ছি। কোনও কাবণে কলকাতায় আটকে গেলে বিকেল চারটে নাগাদ তোমাকে টেলিফোন করব।'

কাঞ্চন ঘাড়ে ঝটকা দিয়ে বলল, 'পারব না। আস্তে-আস্তে তুমি কলকাতাব লোক হয়ে যাচ্ছ আর আমাকে সময় নেই অসময় নেই টেলিফোনের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে, ওসব হবে না।'

'লক্ষ্মীটি, প্লিজ!' অশোক হাত বাড়িয়ে কাঞ্চনের একটা হাত ধরল।

কাঞ্চন অশোকের চোখের দিকে তাকাল, কিন্তু ওর হাতটা যেন অবশ হয়ে গেল। কয়েক মুহূর্ত দুজনেরই একটা আবেশে কাটে। অশোক হঠাৎ একটা নিশ্বাস ফেলে দ্রুত দরজার দিকে পা বাড়িয়ে বলল, 'কাল চারটে নাগাদ একটু টেলিফোনেব কাছে থেকো।'

কাঞ্চন শূন্য দরজার দিকে তাকিয়ে রইল। এখন ওর মুখে একটা ব্যাকুল আর্তি।

অশোক পরের দিন সকাল দশটা বাজতে পাঁচ মিনিট আগে নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। ওর গায়ে গতকাল সন্ধেব সেই হাতের কনুই পর্যন্ত উলেন সোয়েটার আব

ট্রাউজারই ছিল। পায়ে স্যান্ডেলের বদলে কালো ক্রোম লেদারের শ্যু। সঙ্গে ফটিক। গায়ে সাদা ফুলস্লিভ শার্ট, ট্রাউজার, হাতকাটা সাদা উলেন সোয়েটার, সাদা ক্যাম্বিসের জুতো। হাতে একটা অ্যাটাচি।

অশোক ঠিকানা মিলিয়ে বাড়িটা খুঁজে বের করল। সুরেশ সরকার রোড যেখানে প্রায় সি আই টি রোডের জংশনে এসে মিশেছে, বাড়িটা তার কাছাকাছি। পুরোনো আমলের বাড়ি, সি আই টি রোডের নতুন বাড়িগুলোর সঙ্গে কোনও মিল নেই। নতুন গজিয়ে ওঠা সি আই টি রোডের সঙ্গে তুলনায় এ পাড়াটা এখনও যেন তার সাবেক চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একদা বিশাল এলাকা জুড়ে মৌমাছির চাকের মতো ঘিঞ্জি বস্তি অঞ্চলকে সাফ করে যে সি আই টি রোড তৈরি হয়েছে সুরেশ সরকার রোডের আশেপাশে এখনও সেই বস্তির কিছু অবশিষ্ট আছে। অল্প ছড়ানো-ছিটোনো।

নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের বাড়িটা সম্ভবত কোনও এককালে দোতলা সাহেব-বাড়ি ছিল। নিচু দোতলা। নীচে-ওপরে চওড়া গোল থাম। কাঠের রেলিং-ঘেরা চওড়া বারান্দা। খিলানওয়ালা ত্রিকোণ। বাড়িতে ঢোকবার জন্য একপাশে চওড়া গেটের দুই পাল্লা। কোমর সমান উঁচু। গেটের দুপাশে চৌকো থাম। থামের গায়ে শ্বেতপাথরের উৎকীর্ণ কালো অক্ষরে ইংরেজি আর বাংলায় লেখা, 'এন. এন. ভট্টাচার্য, বি. এ. বি. এল.'। গেটের গায়ে একটি টিনের পাতে লেখা আছে, 'বিওয়্যার অফ ডগ'। বাড়িতে কুকুর আছে? অশোককে নরেন্দ্রনাথ তা বলেননি। আর সেই কুকুরের জন্য সাবধানী নোটিসও ঝুলছে। অথচ বাড়িতে এত বড় একটা খুনের ঘটনা ঘটে গেল। কুকুরটার ভূমিকা কী ছিল? অশোককে আগে থেকে সাবধান করার জন্য নরেন্দ্রনাথের বলা উচিত ছিল। হয়তো তাঁর মনে ছিল না।

গেটের সামনে থেকে শান বাঁধানো চওড়া স্পেস বাড়ির ভেতর ঢুকে ডানদিকে মোড় ফিরেছে। একটা ছোটখাটো পুরোনো কালো বিলিতি মডেলের গাড়ি দেখে মনে হয় লম্বা ফালিটা গাড়ি পার্কিংয়ের জায়গা। মাথার ওপর অ্যাসবেসটসের ছাউনি। ডানদিকে হলুদ বাড়ি। নীচের সামনেব চওড়া বারান্দায় গোল থামের পাশে ও ফাঁকে-ফাঁকে বড়-বড় ফুলের টব। শীতের চন্দ্রমল্লিকা আছে, কিছু বা শুকিয়েছে। অন্য ফুলের গাছও দু-একটা টবে রয়েছে। অশোক গেটের দু-পাশে দেখে বলল, 'ফটিক, কোনও কলিংবেল দেখছি না, লোকজনও চোখে পড়ছে না।'

'তার ওপর শালা বিওয়্যার অব ডগ।' ফটিক বাড়িটাব দোতলার দিকে তাকিয়ে বলল, 'দরজা খুলে ঢুকে পড়ার কোনও উপায় নেই। শেষটায় ডালকুত্তোর মুখে—' ফটিক থেমে গেল।

অশোক ফটিকের দৃষ্টি লক্ষ করে দোতলার বারান্দার দিকে তাকাল। একজন মহিলা দোতলা থেকে ওদের দিকেই তাকিয়ে দেখছেন। বয়েস অনুমান করা কঠিন। অনধিক তিরিশ। বেশিও হতে পারে। মাঝারি লম্বা, কিছুটা দোহারা কিন্তু মোটা বলা যাবে না। তবে স্বাস্থ্যবতী, রূপসী বলতেই হবে। এমন কিছু দূরে না, তাই চোখে পড়ছে অল্প কোঁচকানো বাসি চুলের বাসি বিনুনি, খোলা সিঁথের মাঝখানে সিঁদুরের রেখা। কপালের ওপর একগুচ্ছ চুল। হাতে-কানে-গলায় সোনার ঝিলিক। কালো, উজ্জ্বল চোখে ভ্রূকুটি, জিজ্ঞাসা। একটু ঝুঁকে পড়ে জিগ্যেস কবলেন, 'কাকে চান?'

'নরেনবাবু—মানে উকিলবাবুকে।' অশোক বলল।

মহিলা জিগ্যেস করলেন, 'কোথা থেকে আসছেন? কী নাম বলব?'

'বলুন সোনারপুর থেকে এসেছি, তাহলেই উনি চিনতে পারবেন।' অশোক বলল।

ফটিক চোখের কোণে অশোকের দিকে দেখল। মহিলা বারান্দা থেকে ভেতরে চলে যাওয়ার আগে বললেন, 'দেখছি।'

ফটিক গলা নামিয়ে বলল, 'একেবারে উত্তরের বদলে দক্ষিণের সোনারপুর?'

'হ্যাঁ, রূপকথার রাক্ষসীদের কাছ থেকেও কিছু জ্ঞান নিতে হয়।' অশোক হাসল।

বারান্দায় উদয় হল নতুন দুজন। পায়জামা পরা গায়ে পাতলা চাদর জড়ানো বছর সতেরো-আঠারোর একটি ছেলে। তার পাশে একটি নীল ফ্রক পরা বছর আটেকের মেয়ে। ঝাঁকড়া-কোঁকড়া চুল, ফুটফুটে ফরসা মেয়ে। দুজনেই কিছু খাচ্ছে, আর নিজেদের মধ্যে কথা বলছে। অশোক ফটিককেও দেখছে। কিন্তু চোখে তেমন কৌতূহল নেই। রাস্তায় তেমন যানবাহনের ভিড় নেই। লোক চলাচল করছে। আশেপাশে, রকে, রাস্তার ধারে দু-একগুচ্ছ ছেলে জটলা করছে। পাড়ারই বেকার ছেলে মনে হয়। তাদের দৃষ্টি নরেন্দ্রনাথের বাড়ির দিকেই। আলোচ্য বিষয়ও বোধহয় পারমিতা হত্যা। অশোক ফটিকের দিকে তাদের তেমন লক্ষ্য নেই।

নীচের বারান্দা দিয়ে একজন বেরিয়ে এল গেটের দিকে। ঘন নীল রঙের স্যুট, সাদা শার্ট, লাল টাই। শক্তপোক্ত মাঝারি চেহারা, ফরসা। মাথার চুলে বাঁ-দিকে সিঁথি। চেহারা আর বয়েস দেখে অশোকের মনে হল নরেন্দ্রনাথের বড় ছেলে। বোধহয় অফিসে বেরোবার জন্য তৈরি। অশোক ফটিকের দিকে দেখে গেটের একটা পাল্লা খুলে বলল, 'আসুন।'

'নরেনবাবু বাড়ি আছেন তো?' অশোক জিগ্যেস করল।

স্যুটেড-বুটেড বলল, 'আছেন। শরীরটা খারাপ, একটু বেলায় চান করে পুজোয় বসেছেন। এখুনি হয়ে যাবে। আপনাদের দু-মিনিট বসতে বললেন।'

'কিন্তু আপনাদের কুকুরটা?' ফটিক জিগ্যেস করল, 'সে কোথায়?'

স্যুটেড-বুটেড গোঁফ-দাড়ি কামানো মুখে একটু হাসল, 'কুকুর নেই, বছরখানেক হল মরে গেছে। গেটের লেখাটা রয়ে গেছে।'

'ভালোই হয়েছে।' অশোক গেট দিয়ে ঢুকতে-ঢুকতে বলল, 'চোর-ছ্যাঁচড়রা তবু একটু থমকে দাঁড়াবে।'

স্যুটেড-বুটেড বলল, 'যা বলেছেন। লেখাটা দেখে এখনও অনেকেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে।'

'আপনাদের কলিংবেলটা খুঁজছিলাম।' অশোক বলল।

স্যুটেড-বুটেড ডানদিকের সিঁড়ি দিয়ে টব সাজানো বারান্দায় উঠতে-উঠতে বলল, 'কলিংবেলটা এখানে, এই বাইরের ঘরে দরজার গায়ে।' আঙুল তুলে দেখিয়ে দিল, আর খোলা দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকে ডাকল, 'আসুন।'

অশোকের পিছনে ফটিক ঢুকল। জানলা-দরজা খোলা থাকা সত্ত্বেও ঘরটা তেমন আলোকিত না। দেখলেই বোঝা যাচ্ছে, ঘরটি বেশ বড়। ঘরের ডানদিকে কাঠের পার্টিশান দেওয়া। পার্টিশানের ভেতরে যাওয়ার এক পাল্লার দরজাটা বন্ধ। পিতলের একটা গোল হ্যান্ডেল। পার্টিশানের ও-পাশে কি নরেন্দ্রনাথের অফিস চেম্বার? বাড়িটা যে পুরোনো তার প্রমাণ মাথার ওপরে কাঠের কড়িবরগা।

অশোক যে-ঘরে ঢুকল, সে-ঘরের চেহারাটা তেমন সাজানো-গোছানো বসবার মতো না। মাঝখানে একটা টেবিল, চারপাশে কিছু চেয়ার। গোটা দুয়েক বেঞ্চিও আছে। এ-ঘর সম্ভবত নরেন্দ্রনাথের মক্কেলদের বসবার ঘর। পিছন দিকের দেওয়ালে একটি খোলা দরজা দেখা যাচ্ছে। দরজায় মোটা পরদা। মনে হয় একতলার ভেতরে যাওয়ার দরজা। কারও কোনও সাড়া-শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না।

স্যুটেড-বুটেড বলল, 'আপনারা এ-ঘরে বসুন, উনি আসছেন।' বলে ঘরের বাঁদিকে গিয়ে একটা দরজা খুলল।

অশোক তাকিয়ে দেখল, ওপরে ওঠার কাঠের সিঁড়ি ডানদিকে উঠে গেছে। সিঁড়ির নীচের ধাপের বাঁদিকে গোল চওড়া পালিশ করা কাঠের স্তম্ভ থেকে সিঁড়িব রেলিং। এ-ঘর থেকে সিঁড়ির মাত্র দুটো ধাপ দেখা যায়। সিঁড়িটা নিশ্চয়ই এ-ঘরে ঢোকবার বারান্দার মুখেই বাঁদিকে। চোখে পড়া উচিত ছিল। পড়েনি কেন? সিঁড়ির সামনে কি কোনও দরজা বা আড়াল করা আছে? সম্ভবত। স্যুটেড-বুটেড সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেল।

ফটিক কিছু বলতে যাচ্ছিল। ভেতরে দরজার পরদা তুলে একজন ঘরে ঢুকল। পুরুষ। বয়স চল্লিশের মধ্যে। মাথায় ঘন কালো কোঁকড়ানো চুল। শক্ত, ধারালো, ফরসা, মেদহীন, দীর্ঘ শরীর। পায়জামার ওপরে সাদা পাঞ্জাবি, এলোমেলো করে জড়ানো একটি ছোট লাল পশমি শাল। বোধহয় মেয়েদের। পায়ে হরিণের চামড়ার নরম চটি, বাঁ-হাতের দু-আঙুলে কিংসাইজ জ্বলন্ত সিগারেট। চোখ-মুখও বেশ ধারালো, বুদ্ধিদীপ্ত। দেখলেই শৌখিন রুচির মানুষ বলে মনে হয়। পরদা তুলে ঘরে ঢোকবার মুহূর্তে অন্যমনস্ক ছিল। অশোক আর ফটিককে দেখে ভুরু কুঁচকে জিগ্যেস করে উঠল, 'আপনারা?'

'আমরা মিঃ ভট্টাচার্যের—মানে, নরেনবাবুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।' অশোক জবাব দিল।

ইতিমধ্যেই একটা চেনা সুগন্ধ লোকটির গা থেকে ছড়িয়ে পড়ছিল। গম্ভীর, হতাশ স্বরে খানিকটা যেন আপনমনে বলল, 'দেখা কি হবে? ওঁর শরীর, মন কিছুই ভালো নেই, কোর্টেও বেরোচ্ছেন না। কোথা থেকে আসছেন?'

'সোনারপুর।' অশোক জবাব দিতে-দিতে লোকটির পরিচয় বোঝবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু বলল না, ইতিমধ্যেই নরেন্দ্রনাথ খবর পেয়ে লোক পাঠিয়ে ওদেব ঘরে বসিয়েছেন।

শৌখিন সুপুরুষ লোকটির মুখে চিন্তার ছায়া। সিগারেটে টান দিয়ে আস্তে-আস্তে ধোঁয়া ছাড়ল, 'আজ কি আপনাদের আসবার কথা ছিল?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।' অশোক ট্রাউজারের পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট আর লাইটার বের করল।

লোকটি বাঁদিকে পার্টিশানের দিকে একবার দেখল, তারপরে কিছু বলতে গিয়ে থেমে গেল। চিন্তিত চোখের দৃষ্টিতে ফুটল চকিত জিজ্ঞাসা, 'উনি—মানে, মিঃ ভট্টাচার্য আপনাদের আসার খবর পেয়েছেন নিশ্চয়ই?'

'হ্যাঁ।' অশোক হাসল। লোকটি এতক্ষণে বুঝতে পেরেছে, অনাহূত হয়ে ও আর ফটিক এ-ঘবে বসেনি।

লোকটি লজ্জা পেয়ে অপ্রস্তুত হাসল। তাকাল অশোক আর ফটিকের দিকে। বুদ্ধিদীপ্ত অথচ ভাবালু চোখে একটু বিশেষ অনুসন্ধিৎসা। বলল, 'আমাবই বোঝা উচিত ছিল। আমাদের কারওরই মাথাব ঠিক নেই।' সে আবার পিছন ফিরে পরদা সরিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল।

ফটিক তাকাল অশোকের দিকে। অশোক সিগারেট ধবাল। ধোঁয়া ছেড়ে নিচু স্বরে বলল, 'নরেনবাবু কথা রেখেছেন। আমাদের আসার কথা বাড়িতে কারওকে জানাননি।'

ফটিক ধূমপান করে না। ভেতবে যাওয়ার দরজার পরদার দিকে ওর চোখ, 'ভদ্রলোক কে হতে পারে? নরেনবাবুর ছেলে?'

'না, বোধহয় জামাই।' অশোক বলল, 'যে আমাদের ঘরে এনে বসাল, সে বোধহয় ছেলে। চেহারা দেখে মনে হচ্ছিল।'

বাঁদিকে সিঁড়ির দরজার কাছে শব্দ পেয়ে অশোক ফিরে তাকাল। নরেন্দ্রনাথ। ধুতি-পাঞ্জাবি, গায়ে জড়ানো পাতলা চাদর, পায়ে বিদ্যাসাগরী চটি। ব্যস্তভাবে ঢুকলেন, 'দেবি হয়ে গেল, কাল রাত্রে আপনার ওখান—।'

'আমরা কি এ-ঘরে বসে কথা বলব?' অশোক বাধা দিয়ে বলে উঠল।

নরেন্দ্রনাথ অবাক চোখে ভুরু কুঁচকে তাকালেন, 'কোথায় বসবেন বলুন? পার্টিশানের ও-পাশে বসবেন?

'এ-ঘর দিয়ে তো বোধহয় নীচের তলার লোকজন যাতায়াত করবে।' অশোক বলল।

নরেন্দ্রনাথ পরদা ঢাকা দরজার দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকালেন, 'ঠিকই বলেছেন। চলুন, আমরা পার্টিশানের ও-ধারে আমার চেম্বারে গিয়ে বসি।' কথার সময়ে তাঁর জিজ্ঞাসু দৃষ্টি বারেবারেই ফটিকের দিকে পড়ছিল।

অশোক উঠে দাঁড়াল। ফটিকও। নরেন্দ্রনাথ পার্টিশানের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলেন, ডাকলেন, 'আসুন।'

পার্টিশানের ভেতরের ঘরটিও ছোট না। ঘরের মাঝখানে বড় সেক্রিটারিয়েট টেবিল। টেবিল ক্যালেন্ডার, প্লাস্টিকের কলমদানিতে নানা আকার আর রঙের একগুচ্ছ কলম, পেনসিল। বাঁদিকে সাজানো ফাইল নথিপত্রের গোছা। এ পার্টিশান করা ঘর থেকেও বাইরের বারান্দায় এবং পিছনে অন্দরে যাওয়ার মুখোমুখি দুটো দরজা। দুটো দরজাই বন্ধ। উত্তর দিকের দুটো জানলা। দুই জানলার দু-দিকে আর পিছনের দরজার একপাশে, তিনটি বই-ঠাসা আলমারি। সামনের বারান্দার দিকেও একটা জানলা আছে। সবই বন্ধ। নরেন্দ্রনাথ আগে জানলাগুলো খুলে দিলেন। পাশের ঘর থেকে আলো আসায় ঘরটাকে একটু বেশি আলোকিত দেখাল। নরেন্দ্রনাথের মোটা গদিওয়ালা চেয়ার ছাড়া মুখোমুখি বসবার জন্য আরও তিনটি চেয়ার রয়েছে। পিছনের এক কোণে ছোট একটি টেবিল ও একটি চেয়ার। টেবিলের ওপরে কিছু নথিপত্র। এবং ঢাকা দেওয়া একটি টাইপরাইটার। টেবিলটার কাছে দেওয়ালের নীচের দিকে টেলিফোনের কানেকশন রয়েছে। এখন সম্ভবত টেলিফোন ওপরে রয়েছে। নরেন্দ্রনাথ বললেন, 'বসুন।'

'এ আমার বন্ধু অয়স্কান্ত রায়।' অশোক চেয়ারে বসতে-বসতে নরেন্দ্রনাথের কৌতূহল মেটাল, 'চব্বিশ পরগনার এস. পি. মিঃ মিত্র ওকে চেনেন। প্রায় ক্ষেত্রেই ও আমার সঙ্গে থাকে।'

ফটিক হাত তুলে নমস্কার করল। নরেন্দ্রনাথ কপালে দু-হাত ঠেকিয়ে বললেন, 'তাই ভাবছিলাম, ইনি আবার কে? মনে করেছিলাম আপনি একলা আসবেন।'

'মাঝে-মধ্যে ওর সাহায্যের দরকার হয়।' অশোক সিগারেটে টান দিল, 'গতকাল আপনাকে একটা কথা জিগ্যেস করা হয়নি। বাগানে আপনার বোনের ডেডবডি প্রথম কে, কখন দেখেছিলেন?'

নরেন্দ্রনাথ বললেন, 'মথুরা, যে আমাদের বাড়িতে রান্না করে। বোধহয় রাত্রি তখন ন'টা, সোয়া ন'টা বেজেছিল। নীচের তলার পেছনদিকেই তো রান্নাঘর—।'

'আচ্ছা, মথুরার সঙ্গে আমি কথা বলে নেব।' অশোক বলল, 'আপনার বোনকে কখন থেকে বাড়িতে দেখা যায়নি, কোনও খোঁজখবর করা হয়েছিল?'

নরেন্দ্রনাথ বললেন, 'আমি তো তখন এ-ঘরেই ছিলাম। মিতা সন্ধের দিকে ঠিক কখন বাগানে গেছল, কেউ বলতে পারেনি। আসলে মিতা যে বাগানে যেতে পারে সে-কথাটাই কারও মাথায় আসেনি। সবাই ভেবেছিল, কাছেপিঠেই কোথাও গেছে, দোকানে-টোকানে বা কাছাকাছি কারও বাড়িতে। এরকম তো বেরোত আর সবসময়েই যে বলে বেরোত তাও নয়। বিশেষ করে কাছেপিঠে কোথাও গেলে। তবু বেশ খানিকক্ষণ ওকে দেখতে না পেয়ে, বাড়ির কেউ কেউ ভাবছিল, মিতা গেল কোথায়? এরকম না বলে-কয়ে বেরোলে ওর বড় বউদি— মানে আমার স্ত্রী বিরক্ত হত। বকুনি দিত। তবে ওসব নিয়ে সিরিয়াস ঝগড়াঝাটি কিছু হত না।'

'বাগানে যখন আপনার বোনকে পাওয়া গেল, নিশ্চয়ই পুলিশকে খবর দিয়েছিলেন?'

'নিশ্চয়ই।'

'ডেডবডি যেমন পড়েছিল, তেমনিই ছিল?'

'হ্যাঁ, কেউ ছোঁয়নি।'

'পুলিশ ফটো তুলেছিল?'

'অনেকগুলো।'

'সেসব ফটো কোথায়?'

'পুলিশের কাছেই আছে।'

'সেগুলো একবার দেখা দরকার।' অশোক সিগারেটে টান দিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছাড়ল। 'লোকাল থানায় না থাকলে লালবাজারে অথবা ফরেনসিক ডিপার্টমেন্টে আছে। এখন কথা হচ্ছে,

পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হলে এস. পি. মিঃ মিত্র অথবা এস. এস. পি., সি. আই. ডি.-র কাছ থেকে কোনও পরিচয়পত্র না পেলে, আমার পক্ষে অসুবিধে, এ কথাটা—।'

নরেন্দ্রনাথ হাত তুলে ব্যস্তভাবে বলে উঠলেন, 'ওহ্, আর বলবেন না। এস. এস. পি., সি. আই. ডি.-র একটা চিঠি গতকালই আমি আপনার জন্যে নিয়ে গেছলাম। এমনকী মিঃ মিত্র আমাকে বলেও দিয়েছিলেন, আপনাকে চিঠিটা দেওয়া বিশেষ দরকারি। আর সেটাই আমি পকেটে নিয়ে চলে এসেছি।' তিনি চেয়ার ছেড়ে ওঠবার উদ্যোগ করলেন, 'তা ছাড়া মিঃ মিত্র আপনাকে আপনার সুবিধেমতো সময়ে একবার টেলিফোন করতেও বলেছিলেন।'

'ব্যস্ত হবেন না, বসুন।' অশোক হাত তুলল, 'ওসব পরে দেখছি। আপনাদের পেছনের বাগানে কোন-কোন দিক দিয়ে যাওয়া যায়?'

নরেন্দ্রনাথ অশোকের কথাটা ঠিক ধরতে না পেরে জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন। অশোক বলল, 'আমি বলছি, কেবল কি নীচের রান্নাঘরের দিক থেকেই বাগানে যাওয়া যায়, না আর কোনও রাস্তা আছে?'

'আছে বইকি।' নরেন্দ্রনাথ উত্তরের জানলা দিয়ে কয়েক হাত দূরে সীমানা-পাঁচিল দেখিয়ে বললেন, 'এ-ঘর থেকে বেরিয়ে ওই পাঁচিলের পাশ দিয়ে যাওয়া যায়। ওপরের দুপাশে দুটো বাথরুম থেকে বাগানের দিকে দুটো লোহার স্পাইরাল সিঁড়ি আছে। সেদিক থেকেও যাওয়া যায়।'

অশোক বলল, 'সেটাই জানতে চাইছিলাম। পারমিতা কোন পথে বাগানে গেছল, সে বিষয়ে কিছু জানা গেছে কি?'

'গেছে।' নরেন্দ্রনাথ উত্তরের জানলার দিকে দেখিয়ে বললেন, 'পুলিশের ধারণা, মিতা নিশ্চয়ই আমার ঘরের সামনে দিয়ে, পাঁচিলের ওই ধার দিয়ে বাগানে গিয়েছিল। শীতের দিন, বিকেলেই আমার এ-ঘরের উত্তরেব জানলাগুলো বন্ধ করা থাকে। বারান্দার দিকের দরজাও বন্ধ থাকে, না থাকলে পরদা ফেলা থাকে। শব্দ করে কেউ না গেলে আমার পক্ষে টের পাওয়া মুশকিল। বুঝতেই পারছেন, আমি তখন ক্লায়েন্টদের সঙ্গে কাজে ব্যস্ত থাকি।'

'ওপরের বাথরুমের সিঁড়ি দিয়ে যায়নি, সেটা কেমন করে জানছেন?'

'প্র্যাকটিক্যালি ওপরের বাথরুমের পেছনের দরজা বিকেল থেকেই বন্ধ থাকে, সারারাত্রে আর খোলা হয় না। সকালে জমাদারের জন্যে প্রথম খোলা হয়।'

'সেই রাত্রে, পারমিতা খুন হওয়ার পরে, কী দেখা গিয়েছিল? বাথরুমের পেছনের সিঁড়ির দরজা বন্ধ?'

'হ্যাঁ, বন্ধ ছিল। আর নীচের রান্নাঘরের দিক দিয়ে গেলে তো মথুরা বা ঝি দেখতে পেত। তা ছাড়া, আমার স্ত্রী, বড় বউমাও রান্নার সময় প্রায়ই নীচের ঘরেই থাকে। আমাদের খাওয়া-দাওয়ার পাট সব নীচে। আমার মেজো আর ছোট ছেলে নীচের একটা ঘরে রাত্রে থাকে।'

'থাকবার মতো ঘর কি নীচে একটাই?'

'না, আরও একটা ঘর আছে। নীচের ঘরে বাথরুমের অসুবিধে। অবিশ্যি ঝি-চাকরের বাথরুম ছাড়াও একটা ছোটখাটো আলাদা বাথরুম আমি করিয়ে নিয়েছি, ছেলেরা রাত্রে সেটা ব্যবহার করে। আসলে বাড়িটা এমনভাবে তৈরি, নীচে খাওয়া-বসা ইত্যাদি চলে। একবার ওপরে চলে গেলে, নীচের সঙ্গে তেমন যোগাযোগ থাকে না।'

'বুঝেছি।' অশোক সিগারেটে টান দিল, 'বোধহয় কোনও সাহেবের বাড়ি ছিল। নীচের তলাটা সারাদিনের খাওয়া-বসা-গল্প-বিশ্রাম, রাত্রে ওপরে চলে যাওয়া।'

নরেন্দ্রনাথ একটু হাসলেন, 'ঠিক বলেছেন। কিন্তু বাড়িটা সাহেবের ছিল, বুঝলেন কী করে?'

'অনুমান। রাত্রে নীচের তলার দায়দায়িত্ব চাকর বেয়ারা আয়া খানসামার হাতে দিয়ে সাহেবরা ওপরের দরজা বন্ধ করে আলাদা হয়ে যেত।' অশোক হাসল, 'নেটিভদের সামনে তো আর রাত্রিবাস

করা যায় না। তা ছাড়া, বাড়িটার চেহারা দেখেও সেইরকম মনে হয়। যাই হোক, সেসব আমি পরে ঘুরে দেখব। পারমিতার কি ওপরে কোনও আলাদা ঘর ছিল নাকি?'

নরেন্দ্রনাথ বললেন, 'ছিল কেন, এখনও আছে। ও আলাদা ঘরেই থাকত।'

'ঘরটা কি খোলা আছে?'

'না, তালা বন্ধ।'

'পুলিশ সিল করে দিয়ে গেছে?' অশোকের চোখে অস্বস্তি।

নরেন্দ্রনাথ বললেন, 'সিল করাই ছিল। গতকাল সিল খুলে দিয়ে গেছে, চাবিও দিয়েছে। তবে আমরা এখনও তালা খুলে কেউ ও-ঘরে ঢুকিনি। মানে ঢুকতে পারছিনে।' তাঁর মুখ বিমর্ষ হয়ে উঠল।

'বুঝতে পেরেছি।' অশোকও সহানুভূতিসূচক করুণ মুখ করে সিগারেটে শেষ টান দিয়ে ছাইদানির জন্য টেবিলের আশেপাশে তাকাল।

নরেন্দ্রনাথ ব্যস্তভাবে নিজেও টেবিলের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'অ্যাশট্রে তো একটা থাকে। কোথায় যে গেল? আমি তো স্মোক করিনে, বুঝতেই পারছেন, ক্লায়েন্টদের জন্যে—।'

'ওই তো, ওই টেবিলে রয়েছে।' ফটিক উঠে দাঁড়িয়ে কোণের দিকের টাইপরাইটার রাখা টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল। লাল রং করা অ্যালুমিনিয়ামের একটা বড় ছাইদানি টাইপরাইটারের পাশ থেকে এনে অশোকের সামনে রাখল।

অশোক সিগারেটটা ছাইদানিতে গুঁজে দিল, 'কে প্রথম দেখল, ওপরের বাথরুমের পেছনের দরজা বন্ধ রয়েছে?'

'পুলিশ।' নরেন্দ্রনাথ বললেন, 'আমাদের তো ওসব খেয়ালই ছিল না। পুলিশই প্রথম জানতে চাইল, ওপরের থেকে পেছনের বাগানে যাওয়ার কোনও পথ আছে কি না। তারপরে তারাই দেখল, দুটো বাথরুমের পেছনের দরজাই ভেতরদিক থেকে বন্ধ।'

অশোক জিগ্যেস করল, 'আর বাড়িতে তখন আপনারা সবাই রয়েছেন?'

'হ্যাঁ—না, সবাই ছিলাম, আমার মেজো ছেলে নবেন্দু তখন বাড়ি ছিল না, ওর এক বন্ধুর বাড়ি গেছল। আর সবাই বাড়ি ছিল।' নরেন্দ্রনাথ বললেন, 'ও কোথায় কাদের বাড়ি গেছল, পুলিশ সেসব খোঁজখবরও করেছে। আর ছেলের তো আমার মেজাজ খুবই খারাপ। পুলিশ যে ওকেও সন্দেহ করবে এটা ও ভাবতেই পারে না। মিতা আর ও 'তো প্রায় কাছাকাছি বয়েসি, পিসি-ভাইপোতে খুবই ভাব ছিল।'

অশোক হাসল, 'স্বাভাবিক, তবে পুলিশেরও কোনও উপায় নেই। খুন একটা এমন ব্যাপার, আর বাড়ির মধ্যে—সন্দেহ থেকে কারওকেই রেহাই দেওয়া যায় না।'

'তা বলে ছেলেবেলা থেকে একসঙ্গে মানুষ, অলমোস্ট ভাইবোনের মতো—!' নরেন্দ্রনাথ কথা শেষ না করে একটু তিক্ত হাসলেন, 'জানিনে ভাই, আপনাদের যে কাকে সন্দেহ হয় আর কাকে হয় না, আমি বুঝতে পারিনে। হয়তো আমিও সেই তালিকায় আছি।'

অশোক হাসল, কিন্তু কঠিন সত্যটা এড়িয়ে গিয়ে বলল, 'আসলে কার কী মোটিভ থাকতে পারে তা খোঁজার জন্যেই অনেক অপ্রিয় কাজ করতে হয়। এসব একটু ক্ষমাঘেন্না করে নেবেন।' কথাটা বলতে-বলতেই অশোকের নাসারন্ধ্র স্ফীত হয়ে উঠল। সেই হালকা সুগন্ধটা ওর ঘ্রাণে এসে লাগল। যে-গন্ধটা একটু আগে সেই সুপুরুষ শৌখিন মানুষটির গা থেকে ছড়িয়ে পড়েছিল। তারপরেই পার্টিশানের ওপারে দু-একটি অস্পষ্ট কথা শোনা গেল। ও সেদিকে তাকাল।

পার্টিশানের দরজায় ঠুকঠুক শব্দ হল। নরেন্দ্রনাথ জিগ্যেস করলেন, 'কে?'

দরজাটা আস্তে-আস্তে একটু ফাঁক হল। সেই স্যুটেড-বুটেড যুবক, এখন তার ডানহাতের অ্যাটাচি অংশত দেখা যাচ্ছে। একবার অশোক আর ফটিকের দিকে দেখে নিয়ে নরেন্দ্রনাথকে বলল,

'বাবা, আমি তা হলে বেরোচ্ছি। জ্যোতুকে বলে দিয়েছি, সেরকম কোনও দরকার হলে বা তোমার শরীর-টরির আরও খারাপ লাগলে, আমাকে যেন অফিসে টেলিফোন করে।'

নরেন্দ্রনাথ ছেলেকে কিছু বলবার আগেই অশোকের মুখের দিকে তাকালেন। অশোক নরেন্দ্রনাথের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসি-হাসি মুখে বলল, 'আমার ঠাকুর্দার উইলটা তো আপনি দেখলেন, এটাই আসল উইল। আমার জ্যাঠতুতো দাদা যেটা ঠাকুর্দার উইল বলে সাবমিট করেছে, তার তারিখটা—।'

নরেন্দ্রনাথ একদম বেকুবের মতো অশোকের মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন। ফটিক ঝুঁকে পড়ে পার্টিশানের দরজায় নরেন্দ্রনাথের ছেলেকে দেখিয়ে বলল, 'উনি কী বলছেন, শুনুন। উনি বেরোচ্ছেন, ওঁকে ছেড়ে দিন, আমাদের মামলার কথা পরে বলছি।'

ইতিমধ্যে স্যুটেড-বুটেডের মুখেও কিঞ্চিৎ বিস্ময়ের ছোঁয়া লেগেছিল। সেটা নরেন্দ্রনাথের মুখের অবস্থা দেখে। নরেন্দ্রনাথ আর-একবার অশোকের ফিরিয়ে রাখা মুখের দিকে তাকিয়ে দরজার দিকে ফিরে বললেন, 'হ্যাঁ—আচ্ছা, তুই বেরোচ্ছিস? ঠিক আছে। আমি সারাদিন বাড়িতেই আছি।'

'তুমি এই শরীর-মন নিয়ে আজ আর এঁদের সঙ্গে কাজে না বসলেই পারতে।' স্যুটেড-বুটেডের অবাক মুখে এখন কিঞ্চিৎ বিরক্তি। চকিতে একবার অশোক ফটিকের দিকে দেখে নিল।

নরেন্দ্রনাথ বললেন, 'না, এঁদের সেরকম কিছু কাজ নেই। তুই অফিসে বেরিয়ে পড়।' আবার জিজ্ঞাসু চোখে অশোকের দিকে তাকালেন।

অশোক মুখ ফিরিয়ে নরেন্দ্রনাথের মুখের দিকে নির্বিকার চোখে তাকাল। পার্টিশানের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। জুতো পরা পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেল। কিন্তু সেই হালকা সুগন্ধটা এখনও যেন ছড়িয়ে রয়েছে। শৌখিন যুবকটি কি পার্টিশানের ওপাশে এখনও দাঁড়িয়ে আছে নাকি? এদিকে নরেন্দ্রনাথের বোধহয় দম বন্ধ হয়ে আসছিল, বললেন, 'কী ব্যাপার বলুন তো?'

'আপনার বড় ছেলের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে চাইছিলেন তো?' অশোক খুব নিচু স্বরে বলল।

নরেন্দ্রনাথ অশোকের এত নিচু স্বর শুনেও অবাক হলেন, 'হ্যাঁ, কিন্তু ও আমার বড় ছেলে, তা বুঝলেন কেমন করে?'

'অনুমান।' অশোক পার্টিশানের ওপারে ছাদের কড়িবরগার দিকে দেখল, 'ওঁকে যখন কিছু জানানো হয়নি, অকারণ ঘাঁটাঘাঁটি করার কী দরকার? সেরকম বুঝলে, আমরা ওঁর অফিসেই যাব।'

নরেন্দ্রনাথ বললেন, 'আপনিই কারওকে কিছু বলতে বারণ করেছিলেন।'

'আপনাকে কোনও দোষ দিচ্ছিনে।' অশোক হাসল, 'আপনি ঠিক কাজই করেছেন। পাছে আপনি পরিচয় করিয়ে দিতে যান, সেইজন্যে তাড়াতাড়ি আপনার মক্কেল সেজে গেলাম। উনি অফিসে যাচ্ছেন, যান, পরে কথা বলা যাবে। তবে আপনার এই ঘরে কথা বলার একটু অসুবিধে আছে। পার্টিশানের ও-ধারে কেউ থাকলে আমাদের সব কথাই শুনতে পাবে।'

নরেন্দ্রনাথ বললেন, 'আশা করি, এ-ঘরের কথা আড়ি পেতে শোনবার মতো লোক এ-বাড়িতে কেউ নেই।'

অশোক হাসল, প্রতিবাদ করল না। স্বাভাবিক, পরিবারের লোকদের সম্পর্কে কোনও খারাপ কটাক্ষ কোনও ভদ্রলোকেরই ভালো লাগে না। সেই হালকা সুগন্ধটা ইতিমধ্যে প্রায় মিলিয়ে গেছে। অশোক বলল, 'কথা অনেক হল, এবার আমরা একটু কাজ শুরু কবি।'

'বাড়ির সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন তো?' নরেন্দ্রনাথ বললেন, 'কোথায় বসে করবেন? এখানে, না অন্য কোনও ঘরে? আপনি যেখানে বলবেন। ওপরেও যেতে পারেন।'

অশোক উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'না, জিজ্ঞাসাবাদ পরে। চলুন, পেছনের বাগানটা আগে একবার দেখে আসি।'

নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে ফটিকও উঠে দাঁড়াল। নরেন্দ্রনাথ জিগ্যেস করলেন, 'কোন দিক দিয়ে যাবেন?'

'আপনার ঘরের সামনের বারান্দা দিয়ে পাঁচিলের পাশ ঘেঁষে।' অশোক বলল।

নরেন্দ্রনাথ গায়ের চাদরটা গুছিয়ে বারান্দার দরজার দিকে এগোলেন।

দরজা খুলতেই বারান্দা। বারান্দার ওপরে সারি-সারি ফুলের টব। হাত তিন-চারেক ফালি জায়গা শান বাঁধানো, তারপরে পাঁচিল। পাঁচিলের ওপারে রাস্তা। বাড়িটা পশ্চিমমুখো। বারান্দায় দাঁড়ালে রাস্তার লোক চলাচল, যানবাহন দেখা যায়। বারান্দাটা উত্তর-দক্ষিণে লম্বা। গেট দিয়ে ঢুকে বারান্দার দক্ষিণ দিক দিয়ে অশোক ঢুকেছিল। উত্তরে খানিকটা গিয়ে বারান্দার দু-ধাপ সিঁড়ি। সামনেব মতো উত্তরেও কয়েক হাত ফালি জায়গা, শান বাঁধানো। পুবের পাঁচিল উত্তর-পুব কোণ থেকে ঘুরে সোজা পশ্চিমে গিয়েছে।

অশোক আর ফটিক নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে বারান্দা থেকে নামল। বাঁয়ে ফিরে কয়েক হাত গিয়ে গ্রিলের একটা দরজা ছোট। সাধারণ ছিটকিনি লাগানো, তালা বন্ধ নেই। নরেন্দ্রনাথ ছিটকিনি খুলে পাঁচিলের পাশ ঘেঁষে এগিয়ে গেলেন। পাঁচিলের উত্তরে কয়েক হাত দূরে লম্বা টিনের শেড। শেডের ওপরে কোথাও ত্রিপলের টুকরো ইঁট চাপা দেওয়া। নিশ্চয়ই বৃষ্টির জল আটকানোর জন্য। টিনের শেডের আরও উত্তরে পুরনো একতলা বাড়ির মাথা দেখা যাচ্ছে। তারও উত্তরে তিনতলা একটা বাড়ি।

নরেন্দ্রনাথ বাগানের একটা গাছতলায় দাঁড়ালেন। অশোক দেখল, বাড়িব যেখানে শেষ সেখান থেকেই বাগানের শুরু। আড়াই-তিন কাঠার বাগান। বাগান না বলে পোড়ো বলাই ভালো। আম, পেয়ারা আর কাঁঠাল গাছ। এক কোণে একটি লেবু গাছ। জমির কোথাও মুথো ঘাস, কোথাও মাটি দেখা যাচ্ছে। তা ছাড়া পাঁচ-ছ'ইঞ্চির মতো উঁচু নাম না জানা জঙ্গুলে গাছের ঝাড় এখানে-ওখানে। কাটা গাছ বা বিছুটি না, এই যা রক্ষা। ছড়িয়ে আছে শুকনো পাতা। পেয়ারা গাছে নাইলনের দড়িতে একখণ্ড কাঠে ঝোলানো একটি ছোট দোলনা। উত্তর পশ্চিম আর দক্ষিণ, তিন দিকেই প্রায় আট ফুট লম্বা পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। পশ্চিমের পাঁচিলের ওপারে অনেকটা জায়গা জুড়ে মাথা তুলে আছে টিন টালির চালার মাথা। তার মানে ওদিকটায় এখনও একটা ঘিঞ্জি বস্তি রয়েছে। দক্ষিণের পাঁচিলের ওপারেও কয়েকটা গাছ দেখা যাচ্ছে। সম্ভবত নরেন্দ্রনাথের দক্ষিণের প্রতিবেশীর বাড়িরও পিছনে একটি বাগান আছে। গাছপালার ফাঁকে-ফাঁকে চারতলা নতুন বাড়ি মাথা তুলে আছে।

অশোক বাগানে পা দিয়ে আগে দোতলা বাড়িটার পিছন দিকে তাকাল। ওপরের বাথরুমের দরজা বন্ধ, দু-দিকে দুটো ঘোরানো সিঁড়ি নীচে নেমে এসেছে। বাথরুমের দরজা ছাড়াও একটি করে কাচের পাল্লা লাগানো ছোট জানলা আছে। দুটো বাথরুমের মাঝখানের হলুদ দেওয়ালে, প্রায় ছ'ফুট ফারাকে, কাঠের খড়খড়ি লাগানো দুটো বড়-বড় সবুজ জানলা। দুটোই বন্ধ। জানলার ওপরের খিলান ত্রিকোণ। বাথরুমের ডাইনে-বাঁয়েও একই মাপের দুটো বন্ধ জানলা।

নীচের তলায়, উত্তর-দক্ষিণে লম্বা দেওয়ালের মাঝখানে, একটি বড় দরজা। দরজার নীচেই সিঁড়ি ধাপে-ধাপে নেমে ক্রমে চওড়া হয়ে গেছে। সিঁড়ির ধারগুলো সিমেন্ট বাঁধানো চওড়া রেলিং-এর মতো। দরজার মাথার খিলান ত্রিকোণ। চওড়া দু-পাল্লার দরজাটা সামান্য একটু ফাঁক করা।' অর্থাৎ খোলা রয়েছে। সামান্য ফাঁক দিয়ে ভেতরের কিছুই দেখা যায় না। বাঁদিকে, ওপর তলার মতোই একটি খড়খড়ি লাগানো বন্ধ জানলা। ডাইনেও সেইরকম। তারপরেও ডাইনে মূল বাড়ির সঙ্গে অনেকটা নিচু ছোট একটা একতলা যেন জুড়ে দেওয়া হয়েছে। এই ছোট একতলার একটা দরজা এবং জানলা বাগানের দিকে। দরজাটা বন্ধ, জানলাটা আধখোলা। আধখোলা দিয়ে কথাবার্তার

অস্পষ্ট শব্দ, নির্গত ধোঁয়া, রান্নার গন্ধে বোঝা যায় ওটা রান্নাঘর। তারপরেও নিচু একতলাটা পশ্চিমে আরও অন্তত আট ফুট মতো লম্বা। ঝি-চাকরদের বাথরুম।

অশোক এগিয়ে গেল সেদিকে। ঘরটার একেবারে পিছনে, পশ্চিমের শেষে দেখা গেল ছোট একটা বন্ধ দরজা। দরজার মাথার ওপরে এক ফুট লম্বা চওড়া চৌকো জানলা, লোহার শিক দিয়ে ঘেরা। দরজার সামনেই ছোট একটা ম্যানহোল।

অশোক সেখান থেকে ডানদিকে ফিরে গোটা বাড়ির ওপর-নীচে দেখতে-দেখতে বাগানের দিকে ফিরল। তাকাল পশ্চিমের পাঁচিলের দিকে। নরেন্দ্রনাথ উত্তর ঘেঁষে আমগাছের নীচে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ফটিক পেয়ারা গাছের দোলনাটার কাছে। ও বাগানের চারদিকে তাকিয়ে দেখছিল। মাঝে-মাঝে পিছনের সামান্য ফাঁক করা বড় দরজা আর রান্নাঘরের আধখোলা জানলার দিকে।

অশোক নরেন্দ্রনাথের দিকে পা বাড়াতেই বাড়ির পিছনের বড় দরজাটা খুলে গেল। দরজায় দাঁড়িয়ে সেই সুঠাম, বলিষ্ঠ, শৌখিন, সুপুরুষ যুবক। ভ্রুকুটি চোখে অবাক জিজ্ঞাসা। হাতে এখন আর সিগারেট নেই। অশোক আর ফটিকের দিকে কয়েকবার দেখে নরেন্দ্রনাথের দিকে তাকাল। নরেন্দ্রনাথ কিংকর্তব্যবিমূঢ়, তাকালেন অশোকের দিকে। অশোকও তাঁর দিকেই তাকাল। বুঝল, এখন আর গোপন করবার কিছু নেই। নিজেই খুব স্বাভাবিক কৌতূহল প্রকাশ করল, 'ইনি?'

'বিক্রম, অর্পিতার বর।' নরেন্দ্রনাথ কয়েক পা এগিয়ে এলেন।

অশোক যেহেতু নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে বিক্রমের চেহারার মিল খুঁজে পায়নি, বয়েসটাও ছেলেদের সঙ্গে মেলাতে পারেনি, তাই প্রথম দর্শনে এরকমই একটা অনুমান করেছিল। বিক্রমের ভ্রুকুটি চোখে বিস্ময়ের মাত্রা বাড়ল, সিঁড়ির এক ধাপ নেমে এল, 'কী ব্যাপার বড়দা? আপনারা—মানে এঁরা—ওদের নিয়ে বাগানে—?' কথাটা সে শেষ না করে অশোক আর ফটিকের দিকে আবার দেখল।

'একটু দরকার আছে।' নরেন্দ্রনাথ অশোকের দিকে তাকালেন। তারপর বিক্রমের দিকে ফিরে বললেন, 'এঁরা মিতার ব্যাপারে বাড়ির সবার সঙ্গে একটু কথা বলবেন।'

'ও।' বলে বিক্রম চলে গেল। তবে তার চোখে ভ্রুকুটি থেকেই গেল।

'বিক্রম মনে হয়—' নরেন্দ্রনাথ আমতা-আমতা করে শুরু করলেন।

অশোক হাসল। হঠাৎ দেখল দূরে ফটিক হুমড়ি খেয়ে ঘাস-পাতার ওপরে পড়ল।

অশোক বলল, 'চলুন, মিতার ঘরে যাওয়া যাক।'

'চলুন।' নরেন্দ্রনাথ ওদের নিয়ে বাড়ির দিকে এগোলেন।

অশোক ফটিকের চোখে তাকাল। কোনও কথা বলল না।

মিতার ঘরে ঢুকতে ঢুকতে নরেন্দ্রনাথ বললেন, 'এ-ঘরে ঢুকতে যে এত কষ্ট হবে আগে কখনও বুঝতে পারিনি। আমার—।'

'টেলিফোনটা তখন কোথায় ছিল?' অশোক নরেন্দ্রনাথের কথার মাঝখানেই জিগ্যেস করল।

নরেন্দ্রনাথ ভুরু কোঁচকালেন, 'টেলিফোন?'

'হ্যাঁ। আপনাদের টেলিফোনটা তখন কোথায় ছিল, মিতাকে যখন থেকে বাড়িতে দেখা যাচ্ছিল না?'

'টেলিফোন তো সন্ধে সাড়ে ছ'টায় রোজই আমার চেম্বারে নামিয়ে নেওয়া হয়।'

'আর মিতা ঠিক কখন বেরিয়েছিল, সেটা কেউ বলতে পারছে না?'

'না। সকলেরই ধারণা, সাতটার পর থেকে ওকে দেখা যায়নি। কারওকে কিছু বলেও যায়নি।'

'আপনার বোন অর্পিতা কি সেই রাত্রে এখানে ছিলেন?'

'হ্যাঁ, ওকে বিক্রম সকালবেলাই সুখচর থেকে পৌঁছে দিয়ে নিজের কাজে চলে গেছে।'

অশোক পুবের দরজা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাল। রাস্তার ওপারে পাশাপাশি কয়েকটা

দোতলা, তিনতলা, চারতলা বাড়ি। সেদিকে মুখ রেখেই জিগ্যেস করল, 'পুলিশ তো নিশ্চয় এ-ঘর তন্নতন্ন করে সার্চ করেছে?

'তা করেছে।'

'কিছু নিয়ে গেছে?'

'গেছে। মিতার একটা ছোট নোট বুক, যার মধ্যে কিছু নাম ঠিকানা টেলিফোন নাম্বার লেখা ছিল। আর কিছু চিঠিপত্র। নানান জনের লেখা, খান দশ-বারো চিঠি।'

'কোনও প্রেমপত্র ছিল তার মধ্যে?'

নরেন্দ্রনাথ জবাব দিতে গিয়ে থমকে গেলেন। তাঁর মুখ লাল হয়ে উঠল। আস্তে-আস্তে মাথা নেড়ে বললেন, 'বলতে পারিনে, পুলিশ সেরকম কিছু বলেছে বলে শুনিনি।'

'আর কোনও ঘর পুলিশ সার্চ করেনি?'

'না, মিতার গহনাগাটি ছাড়া, সবই তো ওর নিজের ঘরে রাখত। গহনাগাটিগুলো আমার স্ত্রীর কাছে থাকত—মানে, এখনও আছে। পুলিশকে তা বলাও হয়েছে।'

অশোক মাথা ঝাঁকাল, 'এবার তাহলে জিজ্ঞাসাবাদের পালাটা শেষ করে ফেলা যাক। আপনার স্ত্রীকেই আগে ডেকে দিন, গুরুজন দিয়ে শুরু করা যাক।' ও হাসল, 'এ ঘরটা পরে আমরা দেখব।'

'নিশ্চয়ই দেখবেন।' নরেন্দ্রনাথ বেরিয়ে যেতে-যেতে বললেন।

অশোক ফটিকের দিকে ফিরে তাকাল, 'শুকনো ডাঙায় আছাড় খেলি যে?'

ফটিক ট্রাউজারের পকেট থেকে একটা কিছু বের করে অশোকের সামনে এল, হাতের মুঠো খুলে দেখাল। একটি হিরে। সাধারণ পাথর না, পোখরাজ না, খাঁটি হিরে। অশোক দেখামাত্র চিনতে পারল। ও হিরে চেনে। বলল, 'হুঁ, খাঁটি হিবে মনে হচ্ছে।'

'একশো ভাগ।' ফটিক বলল, 'ঘাস আর শুকনো পাতার মধ্যে চিকচিক করছিল। জানতাম, বাড়িব লোকেরা আমাদের দেখছে। অগত্যা শুকনো ডাঙায় আছাড় খেতে হল, আর বস্তুটি হাতে চলে এল।'

অশোক হাসল, 'শাবাশ। পকেটে রাখ।'

ফটিক ট্রাউজারের পকেটে হাত ঢুকিয়ে সরে যেতে-যেতেই বড় বউ ঘরের দরজায় এলেন। অশোক ডাকল, 'আসুন।'

বড় বউ ঘরে ঢুকলেন। অশোকের মস্তিষ্কে হিরের ঝিলিক। তবু আশেপাশে তাকিয়ে ডিভানটা দেখিয়ে বলল, 'আপনি ওটাতে বসুন, আমি চেয়ার টেনে নিচ্ছি।'

ফটিকই পারমিতার পড়বার টেবিলের কাছ থেকে চেয়ার এনে ডিভানের কাছে রাখল। সরে গিয়ে দাঁড়াল দরজার কাছে। বড় বউ বসলেন, অশোক চেয়ারে বসতে-বসতে বড় বউয়ের পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে নিল। হাতে শাঁখা-নোয়া ছাড়া কয়েকগাছা করে সোনার চুড়ি, গলায় সরু হার, কানে ছ'টা মুক্তো বসানো সোনার টাব। অশোক কোনওরকম ভূমিকা না করেই শুরু করল, 'আমি জানি আপনি মিতাকে নিজের মেয়ের থেকেও বেশি ভালোবাসতেন। আপনি চান, আমি যেন যেমন করে হোক ওর খুনিকে ধরিয়ে দিতে পারি। আপনার দু-একটা কথার জবাবের ওপর অনেক কিছু নির্ভর করছে। প্রথম কথা, সত্যি বলুন তো, আপনাব সুন্দরী ননদটি মেয়ে হিসেবে কেমন ছিল?'

'মেয়ে হিসেবে?' বড় বউয়ের ভ্রুকুটি চোখের ওপরে, কপালে কয়েকটি ভাঁজ পড়ল, 'কেমন আবার? হাসিখুশি, মেধাবী, কথায়-কথায় ছেলেমানুষি—।' থামলেন, যেন কথা শেষ করে জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন।

অশোক কিছু না বলে হাসল। বড় বউ অশোকের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন, আর আস্তে-আস্তে তাঁর মুখ লাল হয়ে উঠল। চোখের দৃষ্টি সরিয়ে তাঁতের লাল পাড় শাড়ির গোছানো আঁচলটা অকারণেই আবার গোছালেন। তাকালেন অশোকের দিকে, 'আর কী বলুন?'

'বলুন নয়, বলো।' অশোকের মুখে হাসি, 'আপনি আমাকে তুমি করেই বলেছিলেন, আমি খুব খুশি। কিন্তু আমার কথার জবাব পেলাম না। যে-মন নিয়ে আমাকে তুমি বলেছেন, সেই মনটা খুলে আমাকে জবাব দিন।'

বড় বউ হঠাৎ কোনও কথা বললেন না, তাকিয়ে রইলেন অশোকের দিকে। আস্তে-আস্তে তাঁর মুখে গাম্ভীর্য নেমে এল, 'তোমার কথাবার্তা ঠিক পুলিশের মতো নয়। কী জানতে চাইছ, তাও বুঝতে পারছি। তোমাকে আমি এটুকু বলতে পারি, মিতা নষ্ট চরিত্রের মেয়ে ছিল না।'

'খুব শক্ত চরিত্রের মেয়ে ছিল কি?' অশোকের চোখ বড় বউয়ের চোখের ওপর।

বড় বউ বললেন, 'হয়তো তাও নয়। একটা কথা জানো তো, রূপ অনেক সময় মেয়েদের কাল করে? মেয়েরা মুখে যাই বলুক রূপ থাকলে তার মনে একটা অহংকার থাকে। মিতারও ছিল, আর সবাই ওর রূপের প্রশংসা করত, ও তা শুনতে ভালোবাসত। প্রশংসা বড় মন গলায়। পুরুষরা মন গলিয়ে, আশকারা পায়। মিতা ওর ছেলে-বন্ধুদের আশকারা দিত। তারা সবসময় ওকে ঘিরে থাকত, খুশি করার চেষ্টা করত, নিজেদের মধ্যে তা নিয়ে রেষারেষি করত। মিতা সেটা কতখানি বুঝতে পারত জানি নে, স্তাবকদের সকলের সঙ্গেই একরকম ব্যবহার করত। আমি অনেকদিন বলেছি, এটা ভালো নয়। বকাঝকা করেছি, রাগ করে বলেছি। আসলে তো ওর কাছে ওটা একটা খেলা ছিল। কিন্তু এ-খেলা তো ভালো খেলা নয়। বিপদ ঘটতে পারে।'

'বিপদ? কীরকম? এই যা ঘটে গেল, খুন?'

'না-না, এমন সর্বনাশের কথা আমার কখনও মনে আসেনি।' বড় বউয়ের চোখে আতঙ্ক। আমি বিপদ বলতে ভাবতাম, দুর্নাম, অপমান, ছেলেদের মধ্যে ঝগড়া-মারামারি লেগে যাওয়াও অসম্ভব ছিল না। এমনিতেই তো আমার জায়েরা মিতাকে—।' বলতে গিয়ে একবার ঢোক গিললেন, একটু হাসবারও চেষ্টা করলেন, 'ঢঙি ঢলানি বলত। আমি তা মনে করতাম না। ও তো নিজে গায়ে পড়া ছিল না, ঢলানি বলব কেন? তবে সকলের সঙ্গেই একেবারে হলাগলা মিশতে হবে, সেটা আমিও পছন্দ করতাম না।'

অশোক ঘাড় ঝাঁকিয়ে বলল, 'খুব ভালো বলেছেন, মিতাকে চেনা যায়। কিন্তু একটা কথা বোধহয় ভুল, মিতা নিশ্চয় সকলের সঙ্গে একরকম ব্যবহার করত না।'

'একরকম মানে—উনিশ-বিশ তো ছিল।' বড় বউ বললেন, 'সব ছেলেও তো একরকম নয়।'

'তবু এমন একজন ছিল, যে সব বন্ধুর থেকে আলাদা।' অশোকের মুখে হাসি, চোখে তীক্ষ্ণতা, 'তাই না?'

বড় বউয়ের মুখ গম্ভীর ও অন্যমনস্ক হয়ে উঠল, 'হ্যাঁ, তা না হলে ওই ব্যাপারটা ঘটবে কেন? আর সেই একজনকে আমি কিছুতেই ঠাউরে উঠতে পারছিনে। মিতা যে কারওর কাছে নিজেকে ওরকম সঁপে দিতে পারে, আমি এখনও যেন বিশ্বাস করতে পারিনে।'

'কেন?'

বড় বউ করুণ গম্ভীর মুখে বললেন, 'আমার বকাঝকার সময়ে ও একটা কথা বরাবর বলত, বড় বউদি, আমি কোনওদিন এমন কাজ করব না, যাতে তোমাদের মুখে চুনকালি পড়ে। সেরকম হলে তোমাদের বলব, বিয়ে করব। তুমি আর যাই করো, আমাকে ওই সন্দেহটা কোরো না। মেলামেশা মানে তো প্রেম নয়। আমি কারোর সঙ্গে প্রেম করিনে। এমন সাহসও কারও নেই, আমাকে কেউ কিছু করবে।'

'তা যাই বলুক, একজনের নিশ্চয় সে-সাহস ছিল, আর মিতাই তাকে সে-সাহস দিয়েছে। তাই মনে হয় না কি?'

বড় বউ আস্তে-আস্তে মাথা ঝাঁকালেন, একটা নিশ্বাস ফেললেন, 'হ্যাঁ, এখন তো তাই মনে হচ্ছে।'

'কিন্তু এর সঙ্গে কি খুনের কোনও যোগ আছে মনে হয়?'

'আমি বুঝতে পারিনে, ভেবেও পাইনে।' বড় বউ বললেন, 'বরং আমি তো উলটোটাই ভাবি। যে মিতাকে পেয়েছিল, তার বুক ফুলে বারো হাত হওয়ার কথা।'

অশোক হাসল, 'আবার এমন কেউ থাকতে পারে, মিতার প্রেমের কথা জানত, সে হিংসেয় রাগে জ্বলছিল?'

'তাও হতে পারে। কিন্তু সে কে, তা আমি ভেবে পাইনে।'

'তা হলে দুটো বিষয় পরিষ্কার হল। এক ঃ মিতা কারোর সঙ্গে প্রেম করেছিল। দুই ঃ প্রেগন্যান্সির কথা ও আপনাদের কাছে গোপন রেখেছিল।'

'তা তো বটেই।'

'কিন্তু কে, কেন খুন করতে পারে, তা আপনি অনুমান করতে পারছেন না।'

'একেবারেই না।'

'যে-ছেলে দুটিকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে, তাদের সম্পর্কে আপনার কী ধারণা?'

'খুব ভালো।' বড় বউয়ের স্বরে দৃঢ়তা, 'সুমিত আর নীহার, দুজনেই হয়তো মনে-মনে মিতাকে ভালোবাসত। কিন্তু ওদের কোনও রেষারেষি ছিল বলে জানিনে, দেখিনি। ওরা আমাদের বাড়ির ছেলের মতোই ছিল। মিতা বাড়িতে না থাকলেও ওরা আসত, নবেন্দু—আমার মেজো ছেলেরও ওরা বন্ধু। ভদ্র, নিরীহ, শিক্ষিত, ভালো পরিবারের ছেলে। ওদের কারওকে মিতা বিয়ে করলে আমি খুশি হতাম। কিন্তু মিতা ওদের তেমন আমলই দিত না। বরং ওদের নিরীহপনাকে ঠাট্টা করত। তা ছাড়া, তোমাদের ওই কী একটা কথা আছে—আমি মনে করতে পারছিনে, মিতা যখন খুন হয় তখন এরা কোথায় কী করছিল, কোথায় ছিল, সেসবও প্রমাণ হয়ে গেছে। তবু পুলিশ ওদের অ্যারেস্ট করে রেখেছে।'

অশোক বুঝতে পারল, বড় বউ 'অ্যালিবাই'-এর কথা বলছেন। ও বলল, 'আচ্ছা, আপনি আসুন। আপনার বউমাকে একটু পাঠিয়ে দিন।'

বড় বউ উঠে চলে যাওয়ার মুহূর্তেই অশোক জিগ্যেস করল, 'আচ্ছা, একটা কথা। মিতার গায়ে কি কোনও অর্নামেন্ট ছিল?'

'মানে গহনা?' বড় বউ থমকে দাঁড়ালেন, 'কিছু না। কিছু না বলতে, একেবারে কিছুই না। এমনকী গলায়, কানে, হাতে আমি একটু সোনা রাখতে বলতাম, একটা সংস্কার বলতে পারো। একটা শাঁখের আংটিও পরত না, যেটা ওকে জ্যোতিষী পরতে বলেছিল।'

'বুঝেছি।' অশোক উঠে দাঁড়াল, 'নীপাদেবীকে একটু ডেকে দিন।'

বড় বউ বেরিয়ে গেলেন। অশোক ফটিক চোখাচোখি করল। ফটিকের চোখে জিজ্ঞাসা। অশোকের মুখ গম্ভীর। নীপা দরজায় এসে দাঁড়াল। মাথায় অল্প ঘোমটা টানা। চওড়া বেগুনি পাড় তাঁতের শাড়ি, সাদা জামা গায়ে। কানে দুটো মুক্তো, গলায় সরু হার, হাতে শাঁখা, নোয়া, চুড়ি। সুশ্রী চেহারা। অশোক ডিভান দেখিয়ে বলল, 'আসুন, এখানে বসুন।'

নীপা এগিয়ে এসে বসল। অশোকও চেয়ারে বসল। 'আচ্ছা, ইদানীং—মানে মিতার খুনের আগে, ও নাকি প্রায়ই বলত, কিছুদিনের জন্য একলা কোথাও বেড়াতে চলে যাবে। আপনি ঠাট্টা করে জিগ্যেস করতেন, একলা কেন যাবে, সঙ্গে কাকে নিয়ে যাবে বলো না। মিতা বলত মরণকে। এসব কি ঠিক কথা?'

নীপার অবাক চোখ দেখে বোঝা গেল, প্রথমেই এরকম প্রশ্ন ও প্রত্যাশা করেনি। জবাব দিতে কয়েক সেকেন্ড দেরি হল, 'হ্যাঁ বলত।'

'কেন বলুন তো? আপনার কী মনে হয়?'

নীপা আবার কয়েক সেকেন্ড চুপ করে রইল, তারপরে বলল, 'তখন মনে হত, এমনি ফাজলামি করে বলছে। এখন মনে হয়—।' চুপ করে গেল।

অশোকও কোনও কথা না বলে নীপার চোখে চোখ রাখল। নীপা চোখ নামিয়ে বলল, 'ও কারও সঙ্গে পালিয়ে যাওয়ার কথা ভাবছিল।'

'কার সঙ্গে?' অশোকের চোখে ভ্রুকুটি-তীক্ষ্ণ দৃষ্টি।

নীপা বলল, 'নিশ্চয়ই যার সঙ্গে ওর—মানে, যার সঙ্গে মিশে—।' কথাটা শেষ করতে পারল না। অশোকের মুখের দিকে একবার দেখে, নিজের পায়ের ওপর চোখ রাখল।

অশোক বুঝল, নীপা কথাটা ভেঙে বলতে পারছে না। যার দ্বারা মিতা গর্ভবতী হয়েছিল, তার কথাই সে বলতে চাইছে। অশোক জিগ্যেস করল, 'সে কে হতে পারে?'

'তা কী করে জানব?' নীপাব সরল চোখে অসহায় বিস্ময়।

অশোক ঠোঁট বাঁকাল, 'তার মানে, আপনার পিসিশাশুড়িটির এতই গন্ডা-গন্ডা প্রেমিক ছিল—।'

'না-না, তা কেন? নীপা প্রতিবাদ করে উঠল, 'ওব কখনও গন্ডা-গন্ডা প্রেমিক ছিল না।'

'কী করে জানলেন? মিতা তো অনেক ছেলের সঙ্গে মিশত।'

'তা মিশত। কিন্তু কার সঙ্গে কীরকম মিশত, কে কী বলত, ও আমাকে সবই বলত। তা নিয়ে আমরা অনেক হাসাহাসি করতাম। ওতে আমাতে সব কথাই হত।'

'অথচ আসল কথাটাই আপনাকে বলেনি।'

নীপা ভুরু কুঁচকে অশোকের দিকে তাকাল। অশোক হাসল, 'সব কথাই আপনাদের মধ্যে হত, অথচ ও যে একজনের কাছে সবই বিসর্জন দিয়েছিল—মানে, ভালোবাসত, সে-কথাটা আপনাকে ও বলেনি।'

নীপা মাথা ঝাঁকাল, 'হ্যাঁ, বোধহয় লজ্জা পেয়েছিল।'

'ভয়ও পেয়েছিল হয়তো?'

'ভয় পাওয়ার মতো মেয়ে ও ছিল না।' নীপা ঘাড় নাড়ল, 'তা ছাড়া, ও মিথ্যে কথাও বলত না, আর খুব একরোখা ছিল।'

'একরোখা? কীরকম?'

নীপা একটু ভাবল, 'এই যেমন ধরুন, জাহাঙ্গির ওসমান—ইউনিভারসিটির বন্ধু, ওর সঙ্গে মেলামেশা আমার শ্বশুর-শাশুড়ি কেউই পছন্দ করতেন না। কিন্তু ও মিশত, আমাকে বলত, অনেক ছেলের থেকে জাহাঙ্গির অনেক ভালো ছেলে, কেন আমি মিশব না? আমি যদি ঠাট্টা করে বলতাম, জাহাঙ্গিরের সঙ্গে প্রেম হলে কি ওকে বিয়েও করবে নাকি? ও বলত, প্রেম হলে করতে পাবি।'

অশোকের চোখ তখন ফটিকেব দিকে। ফটিক পিছন ফিরে পকেট থেকে নোটবুক বেব করে কিছু লিখছিল। অশোক ঘাড় ঝাঁকাল, 'হুঁ, একরোখাই বলতে হবে। ঠিক বলেছেন আপনি।'

'তা ছাড়া, কে. কে. গাঙ্গুলি ব্যারিস্টার—নাম শুনেছেন বোধহয়?'

নীপা গড়গড়িয়ে বলে চলল, 'উনি আমাব শ্বশুরমশাইয়ের বিশেষ বন্ধু। মিঃ গাঙ্গুলিব ছেলে টিটো গাঙ্গুলিকে সবাই চেনে। খুব হ্যান্ডসাম চেহারা, গাড়ি চেপে বেড়ায়। আমাদের বাড়িতে আসত। মিতার সঙ্গে ভাবও ছিল। দু-একবার ওব বিলিতি গাড়িতে চেপে এদিকে-ওদিকে বেড়াতেও গেছে—মানে কলকাতার মধ্যেই। একদিন কী একটা বাজে কথা বলেছিল, মিতা অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছিল। তবু টিটো মেশবার চেষ্টা করেছিল, ক্ষমা চেয়েছিল, আমি জানি। কিন্তু মিতা ওর সঙ্গে মেশা দূরের কথা, কোনওদিন আর কথাও বলেনি।'

অশোক দেখল, ফটিক দ্রুত নোট করে যাচ্ছে। অশোকেরই নির্দেশ, নতুন নাম শুনলেই নোট করতে হবে। অশোক জিগ্যেস করল, 'এসব কথা পুলিশকে নিশ্চয়ই বলেছেন?'

'না তো।' নীপা সরল চোখে তাকাল, 'পুলিশ তো এদের কথা কিছু জিগ্যেস করেনি। তবে মিতার যে-ডায়েরি পুলিশ নিয়ে গেছে, তার মধ্যে এদের সকলেরই নাম ঠিকানা টেলিফোন লেখা আছে। দরকার মনে করলে ডাকবে নিশ্চয়ই।'

অশোক গম্ভীর চিন্তিত মুখে ঘাড় ঝাঁকাল, 'আর একটা কথাই আপনাকে জিগ্যেস করার আছে। মিতার এমন শত্রু কে থাকতে পারে, বা কারা, যে বা যারা ওকে এভাবে খুন করেছে?'

'তা কী করে জানব?' নীপার চোখে সেই অসহায় বিস্ময়, 'ওর কোনও শত্রু ছিল বলে কখনও শুনিনি।'

অশোক ঘাড় বাঁকাল, 'কেন, টিটো গাঙ্গুলি?'

নীপা মুখে হাত চেপে হেসে উঠল এবং পরমুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিল, 'আপনি আমার কথা বুঝতে পারেননি। টিটো একটা মাকাল ফল। শত্রুতা করবে ও? মিতাকে খুশি করার জন্যে বরাবর চেষ্টা করে যাচ্ছিল। সবসময় নিজেকে অপরাধী ভাবত। আপনি কী ভাবছেন জানিনে, তবে টিটোকে আমি মিতার শত্রু ভাবতে পারিনে। আসলে এক ধরনের বোকা, স্মার্ট, আর নিজের সম্পর্কে ধারণা, ওকে মেয়েরা দেখলেই প্রেমে পড়ে যায়।' সে ঠোঁট টিপে হাসি চাপল, 'আর মেয়েরাও ওর কাছ থেকে কিছু আদায় উশুল করে সরে পড়ে।'

অশোক গম্ভীর, 'যাই হোক, একটাই আশ্চর্যের কথা, মিতা আপনার কাছেও আসল কথাটা চেপে গেছল। লজ্জা পাওয়াটা বোধহয় ঠিক কথা নয়।'

নীপা অশোকের দিকে তাকিয়ে দেখল, একটা নিশ্বাস পড়ল, 'হতে পারে, তবে খবরটা জানার পরে মনে খুব কষ্ট পেয়েছি। আমাকেও বললে না?'

'তার মানে, বলার উপায় ছিল না।'

'অ্যাঁ?' নীপা ভুরু কোঁচকাল।

'তাই মনে হয় না কি? এমন লোকের সঙ্গে ঘটনাটা ঘটেছিল, তার নামটা আপনাকেও জানানোর উপায় ছিল না।'

নীপা ঘাড় ঝাঁকাল, 'তাই তো মনে হচ্ছে।' তার চোখে গভীর অন্যমনস্কতা নেমে এল।

অশোক বুঝতে পারছে, নীপার চোখের সামনে অনেক মুখ ভেসে উঠছে, অনেক নাম মনে পড়ছে। সবাই মিতার বন্ধু। কিন্তু এসব বুঝে অশোকের কোনও লাভ নেই। জিগ্যেস করল, 'মিতা যে-রাত্রে খুন হল, সেই রাত্রে আপনি সন্ধে ছটা থেকে কতক্ষণ নীচে ছিলেন, মনে করতে পারেন?'

'হ্যাঁ, আমি সাতটা সাড়ে সাতটা নাগাদ মথুরাকে সব বলে দিয়ে ওপরে চলে এসেছিলাম।'

'আপনার শাশুড়ি?'

'তিনি আমার আগেই নীচে থেকে ওপরে এসে নিজের ঘরে বসে বই পড়ছিলেন।'

'আর-একটা কথা মনে করে দেখুন তো। মিতা যেদিন খুন হয়, সেদিন ওর কোনও টেলিফোন কি আপনি রিসিভ করেছিলেন?'

নীপা চিন্তিত মুখে ভুরু কুঁচকে এক মুহূর্ত ভাবল। মাথা নেড়ে বলল, 'না, ওর কোনও টেলিফোন আমি রিসিভ করিনি।'

'ও নিজে কোনও টেলিফোন করেছিল বা রিসিভ করেছিল, দেখেছিলেন কি?'

নীপা আবার চিন্তিত মুখে কয়েক সেকেন্ড ভেবে মাথা নাড়ল।

অশোক উঠে দাঁড়াল, 'আপনাকে আর কিছু জিগ্যেস করার নেই। আপনি যান, আর কারওকে কোনও কথা বলবেন না। অর্পিতা দেবীকে ডেকে দিন। মেয়েদের পালাটা শেষ করে ফেলা যাক।'

নীপা ঘাড় কাত করে ডিভান ছেড়ে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ফটিক বলল, 'টিটো গাঙ্গুলি, জাহাঙ্গির ওসমান, কিন্তু ঠিকানা পাওয়া গেল না।'

'খুঁজে নেওয়া যাবে। এ ক'দিনে পুলিশ চেনাজানা সবাইকে হদ্দমুদ্দো করে ছেড়ে দিয়েছে, কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু ছুঁচটা হাতে ঠেকছে না।'

'কিন্তু হিরেটা তো ঠেকেছে।' ফটিক ফিরে তাকাল।

অশোক হেসে কিছু বলতে যাচ্ছিল। অর্পিতার ছায়া পড়ল দরজায়, তারপরে চেহারাটা দেখা গেল। প্রথমে তাকাল ফটিকের দিকে, তারপরে অশোকের দিকে। অশোক ডাকল, 'আসুন, বসুন।' ডিভানটা দেখিয়ে দিল।

অর্পিতা ঘরে ঢুকে ডিভানের ওপর বসল। সেই হালকা সুগন্ধ, নীচে বিক্রমের উপস্থিতিতে যা ছড়িয়েছিল। কোনও বিদেশি সুগন্ধি আরকের গন্ধ। স্বামীর গায়ে থাকলে, স্ত্রীর গায়েও থাকবে, সেটাই স্বাভাবিক। অশোক চেয়ারে বসল, 'আপনি কি মিতার খুনের দিন থেকে এখানেই আছেন?'

'না, মাঝে একদিন সুখচরে—মানে আমার শ্বশুরবাড়ি গেছলাম।' অর্পিতার চোখ অশোকের মুখের ওপর।'

'প্রায়ই এ-বাড়িতে আসেন বুঝি?'

'হ্যাঁ, উইক এন্ডে তো বটেই। ইচ্ছে হলে, উইক ডেজেও চলে আসি, যেমন সেদিন এসেছিলাম।'

'একলাই আসেন?'

'না, আমার স্বামী ওর গাড়িতে পৌঁছে দেয়। আর আমি সবসময়েই মেয়েকে নিয়ে আসি।'

'কেন, আপনার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা মেয়েকে রাখতে পারে না?'

'নিজেদের লোক বলতে তো কেউ নেই। আমি, আমার স্বামী, আর মেয়ে। বাকি সবাই ঝি-চাকর-ঠাকুর।'

'আপনার শ্বশুর-শাশুড়ি বা আর সবাই—।'

অর্পিতা কথার মাঝেই বলল, 'শ্বশুর-শাশুড়ি মারা গেছেন। আমার ভাসুর থাকেন কলকাতার বাড়িতে। আমরা থাকি শ্বশুরের পুরোনো বাড়িতে। ননদদের বিয়ে হয়ে গেছে।'

অশোক কথা বলতে-বলতেই অর্পিতার পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে নিচ্ছিল। কানে দুটো হিরের ফুল। নাকের হিরের নাকছাবিটাও আগে চোখে পড়েও পড়েনি। হাতে শাঁখা নেই, মোটা দুটো সোনার বালা, পলার বালা, আর স্টেনলেস স্টিলের সরু একটা চুড়ি। বাঁ-হাতের অনামিকায় গোমেদ আর মুক্তোর জোড়া লাগানো আংটি। গলায় সোনার হার। ধনী বধূর পক্ষে এসব তেমন সাজগোজ না, এমনি সবসময়ের ব্যবহারের জন্য। অশোক জিগ্যেস করল, 'মিতার খুনের দিন আপনি কখন এ-বাড়িতে এসেছিলেন?'

'বেলা এগারোটা নাগাদ।' অর্পিতা বলল, 'আমার স্বামী আমাকে আর মেয়েকে ছেড়ে দিয়ে অফিসে গেছল। কথা ছিল, কলকাতার অফিস থেকে এখানে এসে খেয়েদেয়ে আমাদের নিয়ে সুখচরে যাবে।'

'কিন্তু উনি তো আসেননি।'

অর্পিতা অনুসন্ধিৎসু চোখে অশোকের চোখের দিকে তাকাল, 'না। কী কারণে যেন ও সুখচরেই ফিরে গেছল, আর টেলিফোন করে জানিয়েছিল, ও আর কলকাতায় আসতে পারবে না, পরের দিন আমাদের নিয়ে যাবে।'

'কোথা থেকে টেলিফোন করেছিলেন?'

'কেন, আমাদের বাড়ি থেকেই?' অর্পিতার সরু ভুরু কুঁচকে উঠল, 'আমাদের বাড়িতেই টেলিফোন আছে।'

'কখন টেলিফোন করেছিলেন?'

'রাত্রি প্রায় দশটায়।'

'তখন কি মিতা—?'

'হ্যাঁ, তখন মিতাকে বাগানে পাওয়া গেছে। আমি সে-কথা ওকে বলেছিলাম।'

'তা শুনেও এলেন না?'

'না। ওর মেজাজ ভালো ছিল না। সুখচরে একটা বিশ্রী ঘটনা ঘটে গেছল, মানে, ওব পক্ষে আসা সম্ভব ছিল না।' অর্পিতা মুখ নিচু করল।

অশোক কোনও কথা জিগ্যেস না করে অর্পিতার দিকে চুপচাপ তাকিয়ে রইল। অর্পিতা বিক্রমের না আসার কারণ প্রথমে 'কী কারণে যেন' বলে, তারপরেই জানাচ্ছে, 'সুখচরে একটা বিশ্রী ঘটনার কথা।' নরেন্দ্রনাথের কথা মনে পড়ল। তিনিও বলেছিলেন, বিক্রম সুখচরে একটা বাজে ঘটনায় আটকে পড়েছিল, পরে সে-কথা বলবেন। কী ঘটনা? শালিখ খুন হওয়ার খবব পেয়েও আসতে পাবল না? অশোক জিগ্যেস করল, 'বিক্রমবাবু পরের দিন কখন এলেন?'

'সকালবেলাতেই।' অর্পিতা মুখ তুলল।

'ওঁব সঙ্গে কি এখানে লোকাল থানাব পুলিশেব কোনও কথা হয়েছে? মানে ওঁকে জিজ্ঞাসাবাদ কিছু কবা হয়েছে?'

অর্পিতা মাথা নাড়ল, 'না।'

'উনিও কি সেই থেকে এ-বাড়িতেই আছেন?'

'হ্যাঁ, তবে রোজই একবার সুখচরে ঘুরে আসে।'

'আপনার কি মনে আছে, খুনের দিন মিতাকে কখন থেকে দেখা যাচ্ছিল না?'

'ঘড়ি তো দেখিনি।' অর্পিতা চিন্তিত মুখে বলল, 'সাতটা সাড়ে সাতটা নাগাদ আমি নবুর ঘরে নবুর সঙ্গে গল্প করছিলাম। তখন ওকে ডাকাডাকি করে পাইনি। নীপা নীচে থেকে এলে ওকে জিগ্যেস করলাম, বলতে পারল না। ভাবলাম কাছে-পিঠেই কোথাও গেছে, এসে পড়বে।'

'নবু মানে আপনাব দাদার বড় ছেলে নবীনবাবু।'

'হ্যাঁ। ভাবছিলাম, সবাই জমিয়ে আড্ডা দেব। আমাব স্বামীও এসে পড়বে। আমি, নবু, নীপা, মিতা, আমার স্বামী, কখনও-কখনও লেবুও, আমরা সবাই একসঙ্গে বসে আড্ডা জমাতাম।'

'লেবু কে?'

'দাদার মেজো ছেলের ডাকনাম লেবু, ভালো নাম নবেন্দু।'

'উনি তো সেদিন সেই সময়ে বাড়িতে ছিলেন না।'

'না, ও বড়দার গাড়ি নিয়ে কোথায় বেরিয়েছিল।'

'ড্রাইভার নেই?'

'আছে। তাকে বড়দা কোর্ট থেকে ফিরে ছেড়ে দেন। বিশেষ কাজকর্ম পড়লে অবিশ্যি থাকতে বলেন।'

অশোক ঘাড় ঝাঁকিয়ে হাসল, 'আপনার পিসি ভাইপোরা সকলেই বেশ অন্তরঙ্গ।'

'ন্যাচারালি।' অর্পিতা বলল, 'পিসি-ভাইপো, আসলে আমরা অনেকটা ভাইবোনের মতোই, প্রায় একসঙ্গে মানুষ হয়েছি।'

'আপনার যে আরও দুই দাদা আছেন, ল্যান্সডাউনে আর ক্রিক রো-তে, সেখানে যান না?'

'যাই, খুব কম। আসলে বাপের বাড়ি বলতে তো এ-বাড়িটাই। আমি মিতা এ-বাড়িতেই জন্মেছি।' অর্পিতার গলাটা ধরে এল, 'আর এ-বাড়িতেই মিতা—।' গলাটা ডুবে গেল। কালো চোখ সজল হয়ে এল। মুখ নিচু করল।

অশোক অর্পিতাকে সামলে নেওয়ার সময় দেওয়ার জন্য একটা সিগারেট ধরাল। অর্পিতা

চোখ মুছল। অশোক সিগারেটে কয়েকটা টান দিল, ধোঁয়া ছাড়ল মুখ ঘুরিয়ে, 'আপনার আর মিতার নামে লোয়ার রেঞ্জে একটা বাড়ি আছে।'

'আছে।' অর্পিতা ঘাড় ঝাঁকাল, 'আমি ঠিক করেই রেখেছিলাম, মিতার বিয়ের সময় আমার অংশটা ওকে যৌতুক দেব। আমার স্বামী অবিশ্যি নানারকম কথা বলত। বাড়িটা ভেঙে মালটি-স্টোরিড বিল্ডিং করবে, আর...।'

'সে-কথা নরেনবাবুর কাছে শুনেছি।' অশোক সিগারেটে টান দিল, 'মিতা আপনাদের সুখচরের বাড়িতে যেত না?'

'যেত বইকি।' অর্পিতা ঘাড় কাত করল, 'মাঝে-মধ্যে যেত, তবে ট্রেনে-বাসে যাওয়ার তো অসুবিধে। সাধারণত আমি এলে, আমার আর আমার স্বামীর সঙ্গে গাড়িতে যেত। ইচ্ছে হলে থেকেও যেত। কয়েকবার ওর বন্ধু-বান্ধবীদের নিয়েও গেছে, সারাদিন হইচই করে, খেয়ে-দেয়ে ফিরে এসেছে। আমরাও খুব মেতে যেতাম। বাড়ির কাছেই গঙ্গা, স্নান, সাঁতার কাটা—একরকমের চড়ুইভাতির মতো ব্যাপার। মিতা তো খুব আসর জমানো মেয়ে ছিল।'

'কীরকম?'

'কীরকম—মানে, নেচে গেয়ে হেসে, মজার-মজার গল্প বলে সবাইকে মাতিয়ে রাখতে পারত।'

অশোক ঘাড় বাঁকিয়ে সিগারেটে টান দিল, 'আপনার সঙ্গে মিতার সম্পর্ক তা হলে বেশ ভালোই ছিল।'

'নিশ্চয়ই। খারাপ থাকবে কেন?' অর্পিতার ঘাড় বেঁকে উঠল। চোখে ভ্রূকুটি, অনুসন্ধিৎসু জিজ্ঞাসা। পালটা জিজ্ঞাসাটা যেন চ্যালেঞ্জের মতো শোনাল।

অশোকের মনে জিজ্ঞাসার খোঁচা, কিন্তু হাসল, 'কেন থাকবে, তা জিগ্যেস করিনি। ছিল ভেবেই জিগ্যেস করছিলাম, মিতা হয়তো ওর মনের কথা আপনাকে বলত।'

অর্পিতা জবাব দেওয়ার আগে পুষ্ট লাল ঠোঁট দুটো একবার টিপল। একটু যেন ভেবে নিয়ে বলল, 'হ্যাঁ—তা, দিদি হিসেবে যতটা বলা যায়, তা বলত।'

'বন্ধু হিসেবে নয়?'

অর্পিতা অশোকের চোখের দিকে তাকাল, 'তাও বলতে পারেন। একটা বয়সে মেয়েরা সবাই বন্ধু হয়ে যায়। মিতা আমাকে অনেক কথাই বলত, প্রায় বন্ধুর মতোই।'

দিদি হিসেবে অথচ প্রায় বন্ধুর মতো। কিঞ্চিৎ পারম্পর্যহীন। অশোক জিগ্যেস করল, 'মিতার কোনও প্রেমিক ছিল কি—মানে, আপনাকে কখনও কিছু বলেছে কি?'

অর্পিতা হাসল, 'আমার মনে হত, ও যত ছেলের সঙ্গে মিশত, সবাই ওর প্রেমিক। কিন্তু ও কারওর প্রেমিকা ছিল বলে কখনও কিছু শুনিনি।'

'একজন তো কেউ নিশ্চয়ই ছিল।' অশোক অর্পিতার চোখের দিকে তাকাল, 'তা নইলে—?' কথাটা ও শেষ করল না।

অর্পিতা আবার একবার ঠোঁট টিপল, কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকল, 'এটা কেন ধরে নেওয়া হচ্ছে, প্রেমিক ছাড়া আর কারওর দ্বারা ব্যাপারটা ঘটতে পারে না।'

নতুন কথা! অশোকের সঙ্গে অর্পিতার দ্রুত দৃষ্টিবিনিময় হল। অর্পিতা আবার বলল, 'এমন পরিবেশ পরিস্থিতিও তো হতে পারে, মিতার অনিচ্ছাতেই কেউ সুযোগ নিয়েছিল, তারই রেজাল্ট—।' কথাটা শেষ না করে অশোকের চোখে চোখ রাখল এবং ঝটিতি কথার মোড় ঘোরাল, 'একটা মেয়েকে, সে যত শক্তই হোক, তাকে কি কখনওই কাবু করা যায় না?'

অশোকের মস্তিষ্কে বিদ্যুতের চমক লাগল। কিন্তু নির্বিকার, চিন্তিত মুখে সিগারেট টানতে লাগল। কে বলছে কথাটা? মিতার দিদি, এবং একটি মেয়েই! অশোক জিগ্যেস করল, 'রেপ?'

'না-ই বা কেন', অর্পিতার ঠোঁটের কোণে একটু হাসি ফুটল, 'অনিচ্ছাতে কিছু করা মানেই

সেটা রেপ নয়। ওভার পাওয়ার বলে একটা কথা আছে। সিডিউসের কথাটাও মনে রাখতে হয়। মেয়েদের মন পাওয়া আর শরীর পাওয়া এক কথা নয়। এসব অবিশ্যি তর্কের খাতিরে বলছি, কিন্তু প্রেমিক কি অপ্রেমিক, এটাকে ডেফিনিট বলে ধরে নেওয়া বোধহয় ঠিক নয়। তা বলে ভাববেন না, আমার বোনকে আমি ছোট করে দেখাচ্ছি।'

অশোক তাড়াতাড়ি মাথা নাড়ল, 'না-না, তা কেন? আপনি খুব যুক্তিপূর্ণ কথা বলেছেন।' মনে-মনে বলল, 'আপনি অভিজ্ঞ রমণী, কোনও সন্দেহ নেই।'...আবার মুখে বলল, 'তাহলে আর-একটা কথা আপনাকে জিগ্যেস করি। তর্কের খাতিরে এরকম একটা সম্ভাবনার কথা ধরে নিলে এর সঙ্গে কি খুনের সম্পর্কও থাকতে পারে?'

'তা আমি বলতে পারিনে।' অর্পিতা মাথা নাড়ল, 'এর সঙ্গে খুনের কী সম্পর্ক থাকতে পারে, আমি বুঝতে পারিনে। মিতার শত্রু থাকতে পারে কিন্তু এমন শত্রু? যে ওরকম ভয়ংকরভাবে খুন করতে পারে? আমি গোটা সপ্তাহটা ভেবেও এমন কারও কথা মনে করতে পারিনি। অন্তত আমি মিতার যত পুরুষ-বন্ধুদের চিনি, তাদের কথা ভেবে বলছি।'

অশোক আবার একটা নতুন কথা শুনল, 'মিতার তাহলে শত্রু থাকতে পারে বা ছিল আপনার ধারণা।'

'এটা তো সহজ কথা।' অর্পিতা বলল, 'একটা সুন্দরী রূপসী মেয়ে, গবেট নয়, লেখাপড়ায় ভালো, যাকে অনেকেই চাইত, তার কোনও শত্রু থাকবে না, এমনটা কি হয়?'

অশোক বলল, 'আপনি ছেলে এবং মেয়ে উভয়ের কথাই বলছেন।'

'হ্যাঁ, মেয়েরাও কেউ-কেউ নিশ্চয় ওর শত্রু ছিল।'

'আর সেরকম কোনও মেয়ে, লোক লাগিয়ে মিতাকে খুন করিয়েছে, এরকমও হতে পারে।'

'অসম্ভব নয়।'

'কিন্তু সম্ভবও বোধহয় নয়। মিতাকে নিশ্চয় এমন কেউ বাগানে ডেকেছিল, যার কথা রাখতেই ও গেছল। খুব ঘনিষ্ঠ কেউ না হলে, তার ডাকে ও বাগানে যেত না। কোনও মেয়ের ভাড়াটে খুনির ডাকে মিতা বাগানে যেতে পারে বলে মনে হয় না।'

অর্পিতা মাথা নাড়ল, 'আমি এত সব ভাবিনি।'

'কিন্তু আপনাব কি মনে হয় না, মিতাকে নিশ্চয় কেউ বাগানে যেতে বলেছিল, আর সেটা সম্ভবত টেলিফোনেই?' অশোক ঘাড় কাত করে অর্পিতার মুখের দিকে তাকাল।

অর্পিতা ভুরু কুঁচকে অশোকের মুখের দিকে তাকাল, 'হতে পারে, এসব কথা আমি কী করে জানব বলুন?'

'জানবেন কী করে?' অশোক হাসল, 'আমি আপনার অনুমানের কথা জানতে চাইছি। আমার সুবিধের জন্যে।'

অর্পিতা মাথা ঝাঁকাল, 'হতে পারে। তা নইলে, ওরকম সময়ে মিতা একলা বাগানে যাবেই বা কেন।'

'আর টেলিফোনটা এসেছিল নিশ্চয়ই সাড়ে ছ'টার আগে।'

অর্পিতার ভুরু আবার কুঁচকে উঠল, 'সেটা জানলেন কী করে?'

'সাড়ে ছ'টায় টেলিফোনটা আপনার বড়দার চেম্বারে নামিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।'

অর্পিতার কালো চোখে বিস্ময়, 'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন। কী করে জানলেন?'

'আপনার বড়দাই বলেছেন।' অশোক হাসল, 'আপনারা কিছু না বললে আমি আর কী করে জানব। এখন, খটকা লাগছে একটাই। টেলিফোন কল তো অনেক আসতে পারে। যদি ধরে নেওয়া যায়, মিতাকে সাড়ে ছ'টার আগে কেউ টেলিফোন করেছিল, সেটা যে মিতাই রিসিভ করেছিল,

এমন কথা নিশ্চয় করে বলা যায় না। অন্য কেউও করতে পারে। অন্য কেউ রিসিভ করে মিতাকে ডেকে দিতে পারে।'

অর্পিতা অশোকের মুখের দিকে তাকিয়েছিল। ওর ঠোঁটে একটু হাসি ফুটল, 'তার মানে, আপনি আমাকে জিগ্যেস করছেন, আমি টেলিফোনটা রিসিভ করেছিলাম কি না, তাই তো?'

অশোক ঘাড় ঝাঁকাল। অর্পিতা বলল, 'না, আমি সারাদিনে কোনও টেলিফোনই রিসিভ করিনি।'

'মিতা কি সেদিন সারাদিনই বাড়ি ছিল?'

অর্পিতা মাথা নাড়ল, 'না, আমি যখন এসেছিলাম, মিতা তার আগেই ইউনিভারসিটিতে বেরিয়ে গেছল।'

'ফিরেছিল কখন?'

'তিনটে নাগাদ।'

'একলা?'

'না, সুকুমার—ওর সঙ্গে পড়ে, এক বছরের সিনিয়ার, তার সঙ্গে তার গাড়িতে ফিরেছিল। শুনেছি সুকুমারকে পুলিশ অ্যারেস্ট করেছে।'

'আরও একজনকে পুলিশ অ্যারেস্ট করেছে।'

'হ্যাঁ শুনেছি, দীপককে। দীপকও সেদিন সাড়ে চারটে নাগাদ এ-বাড়িতে এসেছিল।'

'দীপকও কি ইউনিভারসিটিতে পড়ে?'

'না, গত বছর পাশ করেছে, এখন বেকার।'

'আপনি দুজনকেই চেনেন?'

'চিনি বইকি! মিতার সঙ্গে ওরা আমাদের সুখচরের বাড়িতেও গেছে। এ বাড়িতেও অনেকবার দেখেছি।'

'সেদিন— মানে, মিতার খুনের দিন, সুকুমার আর দীপক কতক্ষণ ছিল, মনে আছে আপনার?'

অর্পিতা ঘাড় কাত করল, 'আছে। সুকুমার আগেই এসেছিল। আমরা নীচের বসবার ঘরে বসে চা খেতে-খেতে গল্প করছিলাম। তারপরে দীপক এসেছিল। পাঁচটা নাগাদ দুজনে একসঙ্গেই চলে গেছল।'

'আপনার বড়দার ধারণা, সুকুমার আর দীপকের মতো ছেলে মিতাকে খুন করতে পারে না।'

অর্পিতা সজোরে মাথা ঝাঁকাল, 'আমারও তাই ধারণা।'

'এত জোরের সঙ্গে বলছেন কী করে?'

অর্পিতার চোখে-মুখে বিস্ময়, 'মানুষকে দেখে কি একেবারেই চেনা যায় না?'

'যায়?' অশোক হাসল।

অর্পিতার মুখে বিরক্তি ফুটে উঠল, 'সবাইকে হয়তো চেনা যায় না। কিন্তু যাদের বেগুলার দেখছি, কথা বলছি, মেলামেশা করছি, তাদের একটুও চিনব না, তা কেমন করে হয়?'

অশোক না হেসে চিন্তিত, গম্ভীর মুখে আস্তে-আস্তে মাথা ঝাঁকাল। উঠে দাঁড়িয়েই আবার একটু হাসল, 'আমি কিন্তু আজ পর্যন্ত অনেক মিলেমিশেও মানুষ চিনতে পারিনে। যাই হোক, আপনাকে আর কষ্ট দেব না। আপনি আসুন।'

অর্পিতা উঠে দাঁড়াল, হেসে বলল, 'কষ্ট দেবেন কেন, আরও যদি কিছু জিগ্যেস করতে চান, করতে পারেন। আপনি তো পুলিশের বাড়া।'

'তাই নাকি?'

'নয়? অথচ আপনাকে দেখে ভাবতেই পারিনি, আপনি আবার একজন—।' অর্পিতা কথাটা শেষ কবল না।

অশোকও কথাটা পূরণ করে দিল না, বরং জিগ্যেস করল, 'আপনার কানের ফুল দুটো কি হিরের?'

'হ্যাঁ, কেন বলুন তো?'

'দেখে মনে হল, তাই জিগ্যেস করলাম।' অশোক বলল, 'মিতার কানেও কি ওরকম কিছু ছিল না কি?'

অর্পিতা ঠোঁট উলটে মাথা নাড়ল, 'মিতা এসব কিছুই পরত না। মডার্ন মেয়েরা নাকি ওসব পরে বেড়ায় না। অবিশ্যি হিরে পরে ইউনিভারসিটিতে কোন মেয়েই বা যায়।'

'তা ঠিক। আপনার মেয়ের বয়েস কত?'

অর্পিতা অশোকের পারম্পর্যহীন দ্রুত জিজ্ঞাসায় হতচকিত হয়ে উঠল, 'তা প্রায় দশ।'

'কী নাম ওর?'

'ইপু—মানে—ঈপ্সিতা।'

'আপনি গিয়ে ওকে একটু তাড়াতাড়ি ডেকে দিন।'

অর্পিতার কালো চোখে ভ্রুকুটি বিস্ময়, 'ওকেও আপনার দরকার? পুলিশ কিন্তু ওকে কিছুই জিগ্যেস করেনি।'

অশোক হাসল, 'আমি পুলিশ নই। আর দয়া কবে আপনাব সঙ্গে আমার কথাবার্তার বিষয় কারওকে কিছু বলবেন না।'

অর্পিতা অশোকের চোখের দিকে একপলক দেখে বেরিযে গেল। ফটিক ফিরে তাকাল অশোকেব দিকে। অশোকও তাকিয়েছিল, বলল, 'টেলিফোন? না আগে থেকেই যমদূতেব সঙ্গে কথা হযেছিল?'

'আমাকে জিগ্যেস করছিস?' ফটিক বাইবের দিকে মুখ ফিরিয়ে জিগ্যেস কবল।

অশোক জবাব দিল, 'না, নিজেকে।'

ঈপ্সিতা ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল। সুন্দরী মা, সুপুরুষ বাবা, উভয়ের মিলিত সৌন্দর্যে ফুলটুসি বালিকা। ডাগর কালো চোখে ভয়। এ-বাড়িতে ঢোকবার আগেই রাস্তা থেকে দোতলার বারান্দায় দেখা গিয়েছিল। অশোক ডাকল, 'এসো ইপু।'

ডাকনামটা শুনে ঈপ্সিতা একবাব অশোকের দিকে তাকাল। তারপরে ফটিকের দিকে। আস্তে-আস্তে ঘরের মধ্যে ঢুকে মাঝখানে দাঁড়াল। অশোক সস্নেহে ডাকল, 'এসো, এ ডিভানে বোসো। তোমাকে আমি দু-একটা কথা জিগ্যেস করব, ভয়ের কিছু নেই।'

ঈপ্সিতা আর-একবার অশোকেব মুখেব দিকে তাকিয়ে বোধহয় কিঞ্চিৎ ভরসা পেল। ডিভানে বসল। অশোক চেয়ারে বসে জিগ্যেস করল, 'ইপু, মাসি যেদিন মারা গেল, সেদিন তো বেলা এগারোটায় তুমি বাবা-মার সঙ্গে এ বাড়িতে এসেছিলে?'

ঈপ্সিতা ঘাড় ঝাঁকাল। অশোক জিগ্যেস করল, 'সেদিন সারাদিনে নিশ্চয় অনেক টেলিফোন এসেছিল, তাই না?'

ঈপ্সিতা আবার ঘাড় ঝাঁকাল, 'হ্যাঁ।'

'তুমি কোনও ফোন ধরেছিলে?'

'হ্যাঁ।'

'কখন? ক'বার, মনে আছে?'

ঈপ্সিতা মাথা নিচু করে একটু সময় ভাবল, তারপরে মুখ তুলে বলল, 'দুপুরে খাওয়ার আগে একবার আর সন্ধের সময় একবার। একটা কেনোদার, আর-একটা মাসির টেলিফোন এসেছিল।'

'কেনোদা কে?'

'কেনোদা, শিবুদার ছোট।'

'মাসিকে কে টেলিফোন করেছিল? মেয়ে না পুরুষ? নাম বলেছিল?'

ঈপ্সিতা মাথা নাড়ল, 'না। নাম বলেনি। ব্যাটাছেলে টেলিফোন করেছিল।'

'গলার স্বর চিনতে পারোনি?'

ঈপ্সিতা আবার একটু ভাবল, তারপর আস্তে-আস্তে মাথা নাড়ল, 'না, কিন্তু চেনা-চেনা মনে হচ্ছিল।'

'তবু মনে করতে পারছ না?'

ঈপ্সিতা সরল চোখে তাকিয়ে মাথা নাড়ল, 'মনে হচ্ছিল, গলাটা চেনা-চেনা। কিন্তু বুঝতে পারিনি।'

'তারপরে কি তুমি মাসিকে ডেকে দিলে?'

'হ্যাঁ।'

'তখন ক'টা বেজেছিল?'

'জানি না। সন্ধে উতরে গেছল।'

সন্ধে উতরে যাওয়ার অর্থ, এই শীতের বেলা, পাঁচটার পরেই। টেলিফোনটা তাহলে সম্ভবত পাঁচটা থেকে ছ'টার মধ্যে এসেছিল। অশোক জিগ্যেস করল, 'তুমি জানতে চাওনি, কে টেলিফোন করছেন?'

'না তো।' ঈপ্সিতা ঘাড় নাড়ল, 'আমি কেন জিগ্যেস করব? আমি মাসিকে ডেকে দিয়েছিলাম।'

অশোক ঘাড় ঝাঁকাল, 'মাসি তখন কোথায় ছিল?'

'মাসি নিজের ঘরে, আমার মার সঙ্গে গল্প করছিল। আমি ডেকে দিয়েছিলাম।'

'হুঁ। তুমি তো মাসির অনেক বন্ধুকে চেন। তোমাদের সুখচরের বাড়িতেও অনেকে গেছে।'

'হ্যাঁ, চিনি।'

'তাদের কারও গলা বলে মনে হয়নি?'

ঈপ্সিতা আবার একটু ভাবল, মাথা নাড়ল, 'না বুঝতে পারিনি। একবার মনে হয়েছিল গলাটা যেন বাবার মতো লাগছে। কিন্তু বাবা হলে তো আমার সঙ্গে কথাই বলত। আর বাবা মাসিকে পারমিতা দেবী বলবে কেন?' ও জিজ্ঞাসু চোখে অশোকের দিকে তাকাল।

'তাতো সত্যিই।' অশোক ঘাড় ঝাঁকাল, 'তবু তোমার মনে হয়েছিল, গলাটা যেন বাবার মতো শোনাচ্ছে।'

ঈপ্সিতা ঘাড় ঝাঁকিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, কিন্তু বাবা নয়, আমি জানি। একবার মনে হয়েছিল, কিন্তু লোকটার গলাটা হেঁড়ে আর বাঙাল-বাঙাল লাগছিল।'

'তার মানে মাসির বাঙাল বন্ধুও ছিল।' অশোক হাসছিল।

ঈপ্সিতাও হাসল, 'আমি কোনওদিন দেখিনি।'

'তুমি বাড়ির লোককে সেই টেলিফোনের কথা বলেছিলে?'

ঈপ্সিতা ঘাড় কাত করল, 'বলেছিলাম। পরের দিন যখন সবাই বলাবলি করছিল, মাসির কোনও টেলিফোন এসেছিল কি না, তখন বলেছি।'

সে-টেলিফোনের কোনও মূল্যই দেওয়া হয়নি, অশোক ভাবল। এবং গলাটা যারই হোক, হেঁড়ে আর বাঙাল উচ্চারণটা ইচ্ছাকৃত হওয়া অসম্ভব না। তবু ঈপ্সিতার একবার মনে হয়েছিল, যেন বাবার গলা। কেন? অশোক বলল, 'ঠিক আছে ইপু, তুমি যাও। তোমার লেবুদাকে একটু ডেকে দাও।'

ইঙ্গিতা ঘাড় কাত করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। অশোকের সঙ্গে ফটিকের দৃষ্টিবিনিময় হল।

অশোক বলল, 'হেঁড়ে গলা, বাঙাল উচ্চারণ।'

'কিন্তু বাবার গলা কেন?' ফটিক বাইরের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল।

'কাকতালীয় হতে পারে।' অশোক বলল।

লেবু—অর্থাৎ নবেন্দু ঢুকল। বয়স ছাব্বিশ-সাতাশের মধ্যে। পায়জামার ওপরে হাওয়াই শার্ট। চেহারায় মায়ের আদল। অশোক ডাকল, 'আসুন নবেন্দুবাবু, বসুন এখানে।' ডিভানটা দেখিয়ে দিল।

নবেন্দুর মুখ গম্ভীর এবং শক্ত। ডিভানে বসল। অশোক বলল, 'মিতা মারা যাওয়ার দিন, আপনি আপনার বাবার গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছিলেন, শোনা হয়ে গেছে। কোথায় গেছলেন?'

'বালিগঞ্জ প্লেসে এক বন্ধুর বাড়িতে।'

'ফিরেছিলেন ক'টায়?'

'রাত্রি দশটা নাগাদ, বাড়িতে তখন পুলিশ এসে গেছে।'

'এসব কথা তো পুলিশের সঙ্গেই হয়েই গেছে।'

'হ্যাঁ, এমনকী বালিগঞ্জ প্লেসে আমার বন্ধুর বাড়িতেও খোঁজ নেওয়া হয়েছে।' নবেন্দু রুষ্ট গলায় বলল।

অশোক হাসল, 'পুলিস কর্তব্য করেছে। আপনার কি মনে হয়, কে এভাবে মিতাকে খুন করতে পারে?'

নবেন্দু ডান হাত ঘুরিয়ে বলল, 'কিছুই বুঝতে পারছিনে। পুলিশকেও বলেছি।' একটু থেমেই আবার বলল, 'অবিশ্যি পিসির চালচলন আমি একদম পছন্দ করতাম না। বাবা-মা আদর দিয়ে মাথায় তুলে বড় বেশি আশকারা দিতেন।'

'কীরকম চালচলন?'

'কীরকম আবার? যার তার সঙ্গে মেলামেশা, যখন যেখানে খুশি যাওয়া, যখন খুশি বাড়ি ফেরা, এসব আমি পছন্দ করতাম না। সেইজন্যে পিসির সঙ্গে আমার বিশেষ বনিবনা ছিল না।'

'আপনি বুঝি পিসি বলতেন?'

'হ্যাঁ, পিসি—তবে তুইতোকারি করতাম। ও তো আমার থেকে ছোট ছিল। তবে—।' কথাটা নবেন্দু শেষ করল না, অন্যমনস্ক হয়ে উঠল।

অশোক জিগ্যেস করল, 'তবে?'

'পিসির চালচলন পছন্দ করতাম না ঠিকই, আমি হয়তো একটু রক্ষণশীল।' নবেন্দু বলল, 'কিন্তু ওর এমন কোনও শত্রু থাকতে পারে, কখনও ভাবিনি, এখনও ভাবতে পারছিনে।'

'তবে ছিল, এটা আমাদের মেনে নিতেই হচ্ছে।'

'তা হচ্ছে।' নবেন্দুর একটা নিশ্বাস পড়ল।

অশোক বলল, 'আচ্ছা, আপনি আসুন। আপনার ছোট ভাইকে একবার পাঠিয়ে দিন।'

নবেন্দু কোনও কথা না বলে উঠে চলে গেল। ফটিক অশোকের দিকে তাকিয়ে হাতের কবজি তুলে ঘড়ি দেখল।

অশোক বলল, 'উপায় নেই। আর দুজন। নীরেন আর অর্পিতার স্বামী বিক্রম।'

নীরেন দরজায় এসে দাঁড়াল। অশোক যথাবিহিত তাকে ডেকে বসাল। সতেরো-আঠারোর বেশি বয়েস না। দীর্ঘ শক্ত শরীর, কিন্তু সদ্য গোঁফ গজানো মুখ নরম। অশোক জিগ্যেস করল, 'মিতাকে তো পিসি বলে ডাকতেন?'

'হ্যাঁ।'

'খুনের দিন সন্ধে ছ'টা থেকে রাত্রি ন'টা অবধি কোথায় ছিলেন?'

'বাড়িতেই—।' হঠাৎ থমকে গিয়ে নিজেকে সংশোধন করল, 'সাড়ে আটটা নাগাদ একটু বাইরে গেছলাম।'

'কোথায়?'

'বাড়ির বাইরে, সি আই টি-র মোড়ে, বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করছিলাম।' অশোকের দিকে তাকাল।

অশোক বলল, 'পাড়ার বন্ধু, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'তার আগে, বাড়িতে কোথায় ছিলেন? নীচে নিজের ঘরে?'

'না, ওপরে, বাবার ঘরে ইপুর সঙ্গে লুডো খেলছিলাম।'

'তারপরে বোধহয় বন্ধুদের সঙ্গে একটু সিগারেট টানতে গেছলেন?'

নীরেন হতবাক, অবাক চোখে অশোকের দিকে তাকাল। অশোক হাসল। নীরেনও লজ্জিত হাসল, 'কী করে জানলেন?'

'পালটা কিছু জিগ্যেস করতে নেই।' অশোক হাসল, 'তারপরে বাড়ি ফিরলেন কখন?'

'সাড়ে ন'টা নাগাদ। তখন—।'

'বাড়িতে হইচই, যা ঘটবার তা ঘটে গেছে, তাই তো?'

নীরেন ঘাড় ঝাঁকাল, আর হঠাৎ-ই দু-হাতে মুখ ঢাকল। ওর শরীর কাঁপছে, কাঁদছে। অশোক ফটিকের দিকে তাকাল। ফটিকও তাকিয়েছিল, আস্তে-আস্তে মাথা নাড়ল। অশোক মাথা ঝাঁকাল, এবং বলল, 'আচ্ছা, তুমি এসো ভাই। তোমার পিসেমশাইকে একবার ডেকে দাও।'

নীরেন দু-হাত দিয়ে চোখ মুছল। দু-চোখ ভেজা লাল। মাথা নিচু করে আস্তে-আস্তে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ফটিক বলল, 'বেচারি।'

'তাই নাকি?' অশোক হেসে একটা সিগারেট ধরাল।

বিক্রম দরজায় এসে দাঁড়াল। অশোক ভেতরে ডেকে বসাল। বিক্রম ঢোকার সঙ্গে-সঙ্গে সেই হালকা সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়ল। এখন তার গায়ে আর ছোট উলের চাদরটি নেই। পায়জামা আর পাঞ্জাবি। ডান হাতের দুই আঙুলে সিগারেট। অনামিকায় একটি আংটি, পান্না বসানো। অশোক বলল, 'মোটামুটি আপনার সব কথাই শোনা হয়ে গেছে, তবু—।'

'সব কথা?' বিক্রমের স্বরে ও চোখে বিস্ময়।

অশোক বলল, 'সব কথা মানে, আপনি মিতার খুনের রাত্রে আসতে পারেননি, সুখচরে কী একটা বিশ্রী ব্যাপারে নাকি আটকে পড়েছিলেন, এইসব আর কি।'

'হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছেন।' বিক্রম বিষণ্ণ গম্ভীর স্বরে বলল।

অশোক সিগারেটে একটা টান দিল, 'কিন্তু আপনার তো অফিস থেকে আসার কথা ছিল এ-বাড়িতে। হঠাৎ সুখচরে চলে গেছলেন কেন?'

'একটা খবর পেয়ে।' বিক্রমের মুখে অস্বস্তির ছায়া নামল, 'সুখচরের বাড়ি থেকে আমার চাকরের একটা টেলিফোন পেয়ে, বলতে গেলে গাড়ি নিয়ে ছুটেই বেরিয়ে গেছলাম।'

'সময়?'

'প্রায় সাড়ে পাঁচটা, কাজের পাট গুটিয়ে এখানে আসবার জন্য তৈরি হচ্ছিলাম। টেলিফোনটা তখনই এসেছিল।'

'কিন্তু সুখচরে যাওয়ার আগে কথাটা টেলিফোনে আপনার স্ত্রীকে জানালেন না?'

'না, মাথাটা গরম হয়ে গেছল। টেলিফোন করার কথা মাথায় আসেনি।'

'ব্যাপারটা—।'

'বলছি।' বিক্রম সিগারেটে একটা টান দিল, 'ঘটনার ব্যাকগ্রাউন্ডটা শুনলে বুঝতে পারবেন।

সুখচরে আমাদের বাড়ি ছাড়াও গঙ্গার ধারের আশেপাশে আমাদের কিছু জমি আছে। সাত কাঠার একটা জমিতে এক সদগোপ ফ্যামিলি থাকে। জমিটা ওদের বিক্রি করা হয়নি। এমনি ইটের দেওয়াল, টালির ঘর। বাকিটা বাগান। বাবা ওদের থাকতে দিয়েছিল, অনেকটা উঠবন্দি প্রজার মতো। কিন্তু জানেন, আজকাল আর ওসব প্রথা নেই। আমি জমিটা থেকে ওদের ওঠাবার চেষ্টা করেছিলাম। আর ওরা দাবি করছিল ওদের মৌবসী স্বত্ব জন্মে গেছে। ওদের পাকা কোঠাবাড়ি তৈরি করবার অধিকার ছিল না। কিন্তু ওরা সেই চেষ্টায় উঠে-পড়ে লেগেছিল। এ নিয়ে মন কষাকষি ঝগড়া চলছিল। উকিলের সঙ্গে পরামর্শ করে আমি একটা মামলা রুজু করার ব্যবস্থা নিচ্ছিলাম। তার মধ্যেই সেদিন সাড়ে পাঁচটা নাগাদ চাকবের টেলিফোন পেলাম, ওরা নাকি বাড়ির সামনে জনমজুর লাগিয়ে ভিত খুঁড়ছে। এটা চাকরের চোখে পড়ে চারটে নাগাদ। আমাকে টেলিফোনে পেতে-পেতে সাড়ে পাঁচটা। টেলিফোনের অবস্থা তো জানেনই। সন্ধের জ্যাম কাটিয়ে পৌঁছুতে আমারও সময় লেগে যায় প্রায় ঘণ্টাখানেক। তখনও আমি ভাবছিলাম, ব্যাপারটার একটা গতি করে, ও-বাড়ি থেকে অপু-ইপুকে নিয়ে আসব। কিন্তু তা আর হয়নি।' সে কথা থামিয়ে সিগারেটে টান দিল।

'কেন হল না?' অশোক জিগ্যেস করল।

বিক্রম বিব্রত অস্বস্তিতে, ঘন-ঘন সিগারেটে টান দিল, 'মাথা গরম কবে একটা ভুল করে ফেলেছিলাম। আমি বাড়িতে গাড়ি পার্ক করেই সদগোপদের বাড়ি চলে গেছলাম। দেখেছিলাম, সত্যি খানিকটা ভিত খোঁড়ার কাজ করেছে। আমি বাড়ির ভেতরে ঢুকে ঠাকুরদাসকে চিৎকার করে ডেকেছিলাম।'

'ঠাকুরদাস কে?'

'ঠাকুরদাস মণ্ডল, ওই সদগোপ বাড়ির কর্তা।' বিক্রম বলল, 'সাড়া না পেয়ে আমি বাড়িব ভেতরের উঠোনে ঢুকে পড়েছিলাম। ভেবেছিলাম, সে ভেতরে থেকেও ইচ্ছে করে জবাব দিচ্ছে না। কিন্তু তাব বড় ছেলের বউ বেরিযে এসে বলল, শ্বশুর বাড়ি নেই। আমি খানিকটা ধমকধামক চোটপাট করে বাড়ি ফিরে এলাম। মাথা ঠান্ডা করে তখন এ-বাড়ি আসবার জন্যে তৈরি হতে গেলাম। দবকার ছিল আগে একটু চান করে নেওযা। একটু চা খেয়ে, বাথরুমে ঢুকেই শুনলাম, থানা থেকে পুলিশ এসে আমাকে ডাকছে।' সে কথা থামিয়ে সিগারেটে শেষ টান দিয়ে মেঝেয ফেলে স্যান্ডেল দিয়ে চাপল।

'পুলিশ?' অশোকের চোখে ভ্রূকুটি।

বিক্রম একটু লজ্জিত হেসে মাথা নাড়ল, 'পুলিশ। লজ্জার কথা আর বলেন কেন? শুনলাম, আমাকে থানায় যেতে হবে। অপরাধ? না, আমি নাকি ঠাকুরদাসের বাড়িতে ক্রিমিনাল ট্রেসপাস করেছি, বাড়ির মেয়েদের ইজ্জতহানি—মানে ফিজিকালি অ্যাসল্ট করেছি। থানায় যেতে হল। থানার ও. সি. অচেনা নয়, ব্যবহারও খারাপ করেনি, তবে—।'

'অ্যারেস্ট?' অশোক জিগ্যেস করল।

বিক্রম মাথা নাড়ল, 'না, সেটুকু খাতির করেছিল। থানায় তখন ঠাকুরদাস আর তার ফ্যামিলিরও দু-তিনজন ছিল। ও. সি. আমাকে শুনিয়ে দিল, আমার বিরুদ্ধে কেস, ফোরফরটিওয়ান অ্যান্ড থ্রিফিফটিফোর আই পি সি। আলাদা ডেকে বলল, অ্যারেস্ট করবে না, তবে পরদিনই যেন আলিপুর পুলিশ কোর্টে গিয়ে আমি উকিল দিয়ে জামিনের ব্যবস্থা করি।'

'করেছিলেন?'

'করেছিলাম। পরের দিন সকালেই আগে এ-বাড়িতে এলাম। তার আগে রাত্রে তো সবই জেনেছি। সুখচরের ঘটনা অপুকে বললাম, তারপরে গেলাম আলিপুর পুলিশ কোর্টে। জামিন নিয়ে আবার এ-বাড়িতে, তারপরে অফিসে।'

'থানায় ক'টার সময় গিয়েছিলেন?'

'তা হবে সাড়ে সাতটা আটটা। সেখান থেকে পানিহাটিতে এক উকিল বন্ধুর বাড়িতে। গিয়ে শুনলাম, সে তখনও বাড়ি ফেরেনি। বেরিয়ে এসে গাড়িতে বসে ভাবতে লাগলাম, কী করি? তখন যদি মিতার খুনের কথা জানতাম, হয়তো এ-বাড়িতেই এসে পড়তাম। ফলে গাড়িতে বসেই সময় কেটে গেল। উকিল বন্ধু ফিরল প্রায় রাত্রি ন'টা সাড়ে ন'টায়। তার সঙ্গে কথা বলে আবার বাড়ি। তারপরে কলকাতায় টেলিফোনের চেষ্টা। কিছুতেই পেলাম না। রাত্রি দশটার পরে অপুর টেলিফোনে এল মিতার খুনের সংবাদ, কিন্তু তখন আর কলকাতায় ফিরে যেতে পারছিলাম না। নিজের ওই ঘটনা, মিতার খুন, কেমন যেন জড়ভরত হয়ে গেলাম। নড়তে-চড়তে পারছিলাম না।'

'কেস কি চলছে?'

'হ্যাঁ, বাইশে জানুয়ারি ডেট পড়েছে।'

'সত্যি ঝামেলায় পড়ে গেছেন দেখছি।' অশোক হাসল, 'যাই হোক, প্রসঙ্গক্রমে এসব কথা এসে পড়ল। মিতার খুনের ঘটনা নিয়ে আপনি কিছু ভেবেছেন নাকি?'

বিক্রম একটি গভীর নিশ্বাস ফেলল, বিষণ্ণ মুখে মাথা নাড়ল, 'ভেবেছি, কিন্তু কোনও কূল-কিনারা পাচ্ছি না। আমার অনেক পুলিশ বন্ধুর সঙ্গে আলোচনা করেছি, লাভ কিছু হয়নি। ঘনিষ্ঠতার দিক থেকে যদি বলেন, মিতার সঙ্গে আমার কম ছিল না। প্রিয় শালির থেকেও যদি বেশি কিছু বলা যায়—তাও বলতে পারেন। কত কথাই তো বলত, কিন্তু ওর যে এমন শত্রু থাকতে পারে, ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারিনি।'

'হুঁ।' অশোক ঘাড় ঝাঁকাল, কিন্তু বিক্রমকে ও পা থেকে মাথা পর্যন্ত তীক্ষ্ণ চোখে দেখে নিচ্ছিল, 'আপনার ব্যাবসাটা কী? অফিসটা কোথায়?'

বিক্রম বলল, 'বিদেশি যন্ত্র আমদানি।' সে ক্লাইভ স্ট্রিটের একটি বাড়ির নম্বর বলল অফিসের ঠিকানা দিয়ে, 'থার্ড ফ্লোর। তবে ব্যাবসাটা আমাদের পৈতৃক। আমি আর আমার দাদা, দুজনেই ব্যাবসায় আছি।'

'আপনার দাদা তো কলকাতায় থাকেন?'

বিক্রম কোনও বিস্ময় প্রকাশ না করে বলল, 'হ্যাঁ, কলকাতায় সুকিয়া স্ট্রিটে আমাদের একটি বাড়ি আছে। দাদা সেই বাড়িতে থাকেন।'

অশোক বুঝতে পারল, বিক্রম এখানে আসার আগে অর্পিতার সঙ্গে তার কথা হয়েছে। হবে, এটা ও ধরেই নিয়েছিল। ও জিগ্যেস করল, 'এ-বাড়িতে কি আরও থেকে যাবেন?'

'থেকে যাওয়ার তো কোনও কথা নেই।' বিক্রম বিমর্ষ মুখে হাসল, 'এ-বাড়ির কেউ ছাড়তে চাইছে না। আমার বেশ কষ্টই হচ্ছে। রোজ একবার সুখচরে ঘুরে আসতে হয় অফিস থেকে বেরিয়ে। ভাবছি, আর দু-একদিন পরে স্ত্রী-কন্যাকে নিয়ে সুখচরে চলে যাব। আসলে আমার স্ত্রী-কন্যাও যেতে চাইছে না। কিন্তু সুখচরে তো একটা সংসার রয়েছে।'

'ঠিকই তো।' অশোক মাথা ঝাঁকাল, 'আপনার ওই ঠাকুরদাস মণ্ডল না কে, তারা কি এখনও ভিত খুঁড়ে চলেছে?'

বিক্রম বলল, 'না, আমি একটা ইনজাংশন জারি করে দিয়েছি।'

'আচ্ছা, আপনি আসুন।' অশোক হঠাৎ বলল, চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, 'নরেনবাবুকে একবার পাঠিয়ে দিন। আমার জিজ্ঞাসাবাদের পালা শেষ।'

বিক্রম যেন প্রস্তুত ছিল না, অশোক তাকে হঠাৎ চলে যেতে বলবে। একটু অবাক চোখে তাকিয়ে বলল, 'ওহ্, আচ্ছা। আমি বড়দাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।' সে যাওয়ার আগে অশোকের দিকে একবার দেখল, 'আপনাকে প্রথম দেখে ভাবতেই পারিনি, আপনিই সেই অশোক ঠাকুর। আপনার যে-কোনও সাহায্যে লাগলে আমি বাধিত হব।'

সুখচরে আমাদের বাড়ি ছাড়াও গঙ্গার ধারের আশেপাশে আমাদের কিছু জমি আছে। সাত কাঠার একটা জমিতে এক সদগোপ ফ্যামিলি থাকে। জমিটা ওদের বিক্রি করা হয়নি। এমনি ইটের দেওয়াল, টালির ঘর। বাকিটা বাগান। বাবা ওদের থাকতে দিয়েছিল, অনেকটা উঠবন্দি প্রজার মতো। কিন্তু জানেন, আজকাল আর ওসব প্রথা নেই। আমি জমিটা থেকে ওদের ওঠাবার চেষ্টা করেছিলাম। আর ওরা দাবি করছিল ওদের মৌবসী স্বত্ব জন্মে গেছে। ওদের পাকা কোঠাবাড়ি তৈরি করবার অধিকার ছিল না। কিন্তু ওরা সেই চেষ্টায় উঠে-পড়ে লেগেছিল। এ নিয়ে মন কষাকষি ঝগড়া চলছিল। উকিলের সঙ্গে পরামর্শ করে আমি একটা মামলা রুজু করার ব্যবস্থা নিচ্ছিলাম। তার মধ্যেই সেদিন সাড়ে পাঁচটা নাগাদ চাকবের টেলিফোন পেলাম, ওরা নাকি বাড়ির সামনে জনমজুর লাগিয়ে ভিত খুঁড়ছে। এটা চাকরেব চোখে পড়ে চারটে নাগাদ। আমাকে টেলিফোনে পেতে-পেতে সাড়ে পাঁচটা। টেলিফোনের অবস্থা তো জানেনই। সন্ধের জ্যাম কাটিয়ে পৌঁছুতে আমারও সময় লেগে যায় প্রায় ঘণ্টাখানেক। তখনও আমি ভাবছিলাম, ব্যাপারটার একটা গতি করে, ও-বাড়ি থেকে অপু-ইপুকে নিয়ে আসব। কিন্তু তা আর হয়নি।' সে কথা থামিয়ে সিগারেটে টান দিল।

'কেন হল না?' অশোক জিগ্যেস করল।

বিক্রম বিব্রত অস্বস্তিতে, ঘন-ঘন সিগারেটে টান দিল, 'মাথা গরম কবে একটা ভুল করে ফেলেছিলাম। আমি বাড়িতে গাড়ি পার্ক করেই সদগোপদের বাড়ি চলে গেছলাম। দেখেছিলাম, সত্যি খানিকটা ভিত খোঁড়ার কাজ করেছে। আমি বাড়ির ভেতবে ঢুকে ঠাকুরদাসকে চিৎকার করে ডেকেছিলাম।'

'ঠাকুবদাস কে?'

'ঠাকুরদাস মণ্ডল, ওই সদগোপ বাড়ির কর্তা।' বিক্রম বলল, 'সাড়া না পেয়ে আমি বাড়িব ভেতরেব উঠোনে ঢুকে পড়েছিলাম। ভেবেছিলাম, সে ভেতরে থেকেও ইচ্ছে কবে জবাব দিচ্ছে না। কিন্তু তার বড় ছেলের বউ বেরিয়ে এসে বলল, শ্বশুর বাড়ি নেই। আমি খানিকটা ধমকধামক চোটপাট করে বাড়ি ফিরে এলাম। মাথা ঠান্ডা করে তখন এ-বাড়ি আসবার জন্যে তৈরি হতে গেলাম। দবকার ছিল আগে একটু চান করে নেওয়া। একটু চা খেয়ে, বাথরুমে ঢুকেই শুনলাম, থানা থেকে পুলিশ এসে আমাকে ডাকছে।' সে কথা থামিয়ে সিগারেটে শেষ টান দিয়ে মেঝেয় ফেলে স্যান্ডেল দিয়ে চাপল।

'পুলিশ?' অশোকের চোখে ভ্রুকুটি।

বিক্রম একটু লজ্জিত হেসে মাথা নাড়ল, 'পুলিশ। লজ্জার কথা আর বলেন কেন? শুনলাম, আমাকে থানায় যেতে হবে। অপরাধ? না, আমি নাকি ঠাকুবদাসের বাড়িতে ক্রিমিনাল ট্রেসপাস করেছি, বাড়ির মেয়েদের ইজ্জতহানি—মানে ফিজিকালি অ্যাসল্ট করেছি। থানায় যেতে হল। থানার ও. সি. অচেনা নয়, ব্যবহারও খারাপ করেনি, তবে—।'

'অ্যারেস্ট?' অশোক জিগ্যেস করল।

বিক্রম মাথা নাড়ল, 'না, সেটুকু খাতির করেছিল। থানায় তখন ঠাকুরদাস আর তার ফ্যামিলিরও দু-তিনজন ছিল। ও. সি. আমাকে শুনিয়ে দিল, আমার বিরুদ্ধে কেস, ফোরফরটিওয়ান অ্যান্ড থ্রিফিফটিফোর আই পি সি। আলাদা ডেকে বলল, অ্যারেস্ট করবে না, তবে পরদিনই যেন আলিপুর পুলিশ কোর্টে গিয়ে আমি উকিল দিয়ে জামিনের ব্যবস্থা করি।'

'করেছিলেন?'

'করেছিলাম। পরের দিন সকালেই আগে এ-বাড়িতে এলাম। তার আগে রাত্রে তো সবই জেনেছি। সুখচরের ঘটনা অপুকে বললাম, তারপরে গেলাম আলিপুর পুলিশ কোর্টে। জামিন নিয়ে আবার এ-বাড়িতে, তারপরে অফিসে।'

'থানায় ক'টার সময় গিয়েছিলেন?'

'তা হবে সাড়ে সাতটা আটটা। সেখান থেকে পানিহাটিতে এক উকিল বন্ধুর বাড়িতে। গিয়ে শুনলাম, সে তখনও বাড়ি ফেরেনি। বেরিয়ে এসে গাড়িতে বসে ভাবতে লাগলাম, কী করি? তখন যদি মিতার খুনের কথা জানতাম, হয়তো এ-বাড়িতেই এসে পড়তাম। ফলে গাড়িতে বসেই সময় কেটে গেল। উকিল বন্ধু ফিরল প্রায় রাত্রি ন'টা সাড়ে ন'টায়। তার সঙ্গে কথা বলে আবার বাড়ি। তারপরে কলকাতায় টেলিফোনের চেষ্টা। কিছুতেই পেলাম না। রাত্রি দশটার পরে অপুর টেলিফোনে এল মিতার খুনের সংবাদ, কিন্তু তখন আর কলকাতায় ফিরে যেতে পারছিলাম না। নিজের ওই ঘটনা, মিতার খুন, কেমন যেন জড়ভরত হয়ে গেলাম। নড়তে-চড়তে পারছিলাম না।'

'কেস কি চলছে?'

'হ্যাঁ, বাইশে জানুয়ারি ডেট পড়েছে।'

'সত্যি ঝামেলায় পড়ে গেছেন দেখছি।' অশোক হাসল, 'যাই হোক, প্রসঙ্গক্রমে এসব কথা এসে পড়ল। মিতার খুনের ঘটনা নিয়ে আপনি কিছু ভেবেছেন নাকি?'

বিক্রম একটি গভীব নিশ্বাস ফেলল, বিষণ্ণ মুখে মাথা নাড়ল, 'ভেবেছি, কিন্তু কোনও কূল-কিনারা পাচ্ছি না। আমার অনেক পুলিশ বন্ধুর সঙ্গে আলোচনা কবেছি, লাভ কিছু হয়নি। ঘনিষ্ঠতার দিক থেকে যদি বলেন, মিতাব সঙ্গে আমার কম ছিল না। প্রিয় শালিব থেকেও যদি বেশি কিছু বলা যায়—তাও বলতে পাবেন। কত কথাই তো বলত, কিন্তু ওব যে এমন শত্রু থাকতে পারে, ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারিনি।'

'হুঁ।' অশোক ঘাড় ঝাঁকাল, কিন্তু বিক্রমকে ও পা থেকে মাথা পর্যন্ত তীক্ষ্ণ চোখে দেখে নিচ্ছিল, 'আপনার ব্যাবসাটা কী? অফিসটা কোথায়?'

বিক্রম বলল, 'বিদেশি যন্ত্র আমদানি।' সে ক্লাইভ স্ট্রিটের একটি বাড়ির নম্বর বলল অফিসের ঠিকানা দিয়ে, 'থার্ড ফ্লোর। তবে ব্যাবসাটা আমাদের পৈতৃক। আমি আর আমার দাদা, দুজনেই ব্যাবসায় আছি।'

'আপনার দাদা তো কলকাতায় থাকেন?'

বিক্রম কোনও বিস্ময় প্রকাশ না কবে বলল, 'হ্যাঁ, কলকাতায় সুকিয়া স্ট্রিটে আমাদের একটি বাড়ি আছে। দাদা সেই বাড়িতে থাকেন।'

অশোক বুঝতে পারল, বিক্রম এখানে আসার আগে অর্পিতার সঙ্গে তার কথা হয়েছে। হবে, এটা ও ধবেই নিয়েছিল। ও জিগ্যেস করল, 'এ-বাড়িতে কি আরও থেকে যাবেন?'

'থেকে যাওয়ার তো কোনও কথা নেই।' বিক্রম বিমর্ষ মুখে হাসল, 'এ-বাড়ির কেউ ছাড়তে চাইছে না। আমার বেশ কষ্টই হচ্ছে। রোজ একবার সুখচবে ঘুরে আসতে হয় অফিস থেকে বেরিয়ে। ভাবছি, আর দু-একদিন পরে স্ত্রী-কন্যাকে নিয়ে সুখচরে চলে যাব। আসলে আমার স্ত্রী-কন্যাও যেতে চাইছে না। কিন্তু সুখচরে তো একটা সংসার রয়েছে।'

'ঠিকই তো।' অশোক মাথা ঝাঁকাল, 'আপনার ওই ঠাকুবদাস মণ্ডল না কে, তারা কি এখনও ভিত খুঁড়ে চলেছে?'

বিক্রম বলল, 'না, আমি একটা ইনজাংশন জারি করে দিয়েছি।'

'আচ্ছা, আপনি আসুন।' অশোক হঠাৎ বলল, চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, 'নরেনবাবুকে একবার পাঠিয়ে দিন। আমার জিজ্ঞাসাবাদের পালা শেষ।'

বিক্রম যেন প্রস্তুত ছিল না, অশোক তাকে হঠাৎ চলে যেতে বলবে। একটু অবাক চোখে তাকিয়ে বলল, 'ওহ্, আচ্ছা। আমি বড়দাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।' সে যাওয়ার আগে অশোকের দিকে একবার দেখল, 'আপনাকে প্রথম দেখে ভাবতেই পারিনি, আপনিই সেই অশোক ঠাকুর। আপনার যে-কোনও সাহায্যে লাগলে আমি বাধিত হব।'

'ধন্যবাদ।' অশোক হাসল, 'নরেনবাবুকে বলবেন, কাগজপত্র যা আছে, সব যেন নিয়ে আসেন।'

বিক্রম মাথা ঝাঁকিয়ে, ফটিকের দিকে একবার দেখে, ঘরের বাইরে চলে গেল।

ফটিক তাকাল অশোকের দিকে। অশোকের দৃষ্টি ড্রেসিং-টেবিলের ওপরে পারমিতার ফটোর দিকে। মুখে গভীর চিন্তামগ্নতা। ফটিক কোনও কথা বলল না। যেখানে দাঁড়িয়েছিল, সেখানে দাঁড়িয়ে রইল। অশোক আস্তে-আস্তে ড্রেসিং-টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল। নরেন্দ্রনাথ ঢুকলেন হন্তদন্ত হয়ে। হাতে তাঁর একটি বড় খাম, আর একটি ছোট। এসেই জিগ্যেস করলেন, 'কী বুঝলেন অশোকবাবু?'

অশোক হাসল, 'বোঝবার তো কিছু নেই, মিতার সম্পর্কে সকলের মতামত জানবার চেষ্টা করলাম। আসল কথা তো মোটিভ। জিজ্ঞাসাবাদের দরকার সেইজন্যেই।'

'কিন্তু ওই ছুঁড়ি—মানে পূর্ণিমাটা হঠাৎ পালাল কেন বলুন তো?' নরেন্দ্রনাথের স্বরে উদ্বেগ ও উত্তেজনা।'

অশোক হাসল, 'ভয় একটা পেয়েছে, তবে ওর পালানোর সঙ্গে খুনের কী যোগাযোগ আছে, এখনও বোঝা যাচ্ছে না।'

'তবে পালাল কেন?'

'বোকামি হতে পারে।' অশোক নরেন্দ্রনাথের দিকে হাত বাড়াল।

নরেন্দ্রনাথ দুটো খামই অশোকের হাতে তুলে দিয়ে বললেন, 'একটা এস এস পি সি আই ডি সাহেবের চিঠি, যেটা কাল আপনাকে দিতেই ভুলে গেছলাম। আর একটা ময়না তদন্তের রিপোর্ট।'

অশোক দেখল, মোটা বড় খামটার ওপরে ওর নাম লেখা আছে। পাশে এস এস পি সি আই ডি ওয়েস্ট বেঙ্গল। আগে ও বড় খামটাই সাবধানে খুলল। দুটো আলাদা খাম, খামেব মুখ সিল করা। একটা খামের ওপরে লেখা, 'অফিসার ইনচার্জ, পি এস এন্টালি, কনভেন্ট রোড।' অন্যটি 'ডি সি ডি ডি লালবাজার, ক্যালকাটা।' আব একটি খোলা চিঠিতে অশোককে সম্বোধন করে লেখা, 'আপনার সুবিধার্থে এদের সঙ্গে যোগাযোগের প্রয়োজনে দুটি আলাদা চিঠি দিলাম। আপনার দবকারে ল'গলে অবিশ্যিই ব্যবহার করবেন।'...

অশোক সিল করা খাম দুটো দেখেই বুঝতে পারল, এর ভেতরে ওর পরিচয়-পত্র, এবং ওকে তদন্তে সাহায্য করার নির্দেশ দেওয়া আছে। খুবই প্রয়োজনীয় চিঠি, সন্দেহ নেই। বড় খাম ভাঁজ করে হিপ পকেটে ঢুকিয়ে দিল। মুখ খোলা খাম থেকে পোস্টমর্টেম রিপোর্টটা বের করল। চোখ বুলিয়ে গেল দ্রুত। পারমিতার শরীরের উচ্চতা, বর্ণনা, আভ্যন্তরীণ প্রতিটি বিশিষ্ট অঙ্গের সুস্থতা ইত্যাদি। কোনও বিষক্রিয়ার উল্লেখ নেই। তিন মাসের গর্ভবতী ছিল। গর্ভনাশের কোনও ওষধ ব্যবহারের সন্ধান মেলেনি। এবং প্রধানত, গলায় ফাঁস লাগিয়ে হত্যা করার কথা বলা হয়েছে। সময়, সন্ধ্যা ছ'টা থেকে রাত্রি দশটার মধ্যে। গলায় সরু, শক্ত, পাকানো দড়ির ফাঁসের গভীর দাগ, নাক ও ঠোঁটের কষে রক্ত। মরবার আগে নিহত পারমিতা ফাঁস খোলার চেষ্টা করেছিল, তার নিজেরই নখের আঁচড়ানোর দাগ গলায়, গালে। গালের এক জায়গায় কাটার দাগ, যেটা তার নিজের হাতের না। জামা টেনে ছেঁড়া, শাড়ি অনেকটাই খোলা। সারা গায়ে মাটি দূর্বা ঘাসেব দাগ। স্টমাকে হজম করা কয়েক আউন্স ভাত, কম হজম করা চিকেন স্যান্ডউইচ ইত্যাদি।

রিপোর্টের ওপর চোখ রেখেই অশোকের মন বাগানে চলে গেল। একটা ছবি। অন্ধকার বাগান। খুনি আগেই সেখানে উপস্থিত, হয়তো কোনও গাছের আড়ালে বা অন্ধকার কোণে। পারমিতা এল, আশেপাশে তাকাল, এগিয়ে গেল পাঁচিলের দিকে। খুনি পিছন থেকে নিঃশব্দে এগিয়ে গেল, ঝটিতি পারমিতার গলায় ফাঁস পরিয়ে দিল। ফাঁসটা টেনে দেওয়ার আগেই পারমিতা বোধহয় কোনও শব্দ করেছিল। সেই শব্দ মথুরা বা পূর্ণিমার কানে যাওয়ার কথা। কিন্তু ওরা তখন গভীর প্রেমে মত্ত। রান্নাঘরের সব দরজা জানলাই বন্ধ ছিল। নিজেদের প্রেম কুহর, ঘন নিশ্বাস, গোঙানি এসব

ছাড়া কোনও কিছুই ওদের কানে যাচ্ছে না। খুনি ফাঁস টেনেও পারমিতার মুখে পিছন থেকে আঘাত করতে গিয়েছিল। গালের কাটা দাগটা কি খুনির আংটির হিরের? পারমিতার পক্ষে দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভবও হল না। শুয়ে পড়ল বা খুনিই মাটিতে আছড়ে ফেলল, চলল ঝাপটাঝাপটি, বাঁচবার আপ্রাণ চেষ্টায় অনেকটা মুন্ডু কাটা পশু বা পাখির মতো দাপাদাপি। আস্তে-আস্তে পারমিতা নিস্তেজ হয়ে এল। খুনি যখন নিশ্চিন্ত হল, পারমিতা বেঁচে নেই, দ্রুত পাঁচিল টপকে পালাল। যতটা সন্তর্পণে সে এসেছিল, যাওয়ার সময় ততটাই ভয়ে আর উত্তেজনায় পাঁচিল টপকাতে গিয়ে দু-একবার ব্যর্থ হল, তারপরে টপকাতে সমর্থ হল।

খুনি এ-বাড়ির চারপাশ, বস্তির পিছন দিক, আশেপাশের বাড়ি এবং এ-বাড়ি তো বটেই, সবকিছু সম্পর্কে এতই ওয়াকিবহাল, সে খুবই নিশ্চিন্ত ছিল। কিন্তু মথুরা বা পূর্ণিমা বা নীরেন (যে নীচের ঘরে থাকে) এরা শব্দ পেতে পারত, এবং পেলে নিশ্চয় বাগানের দিকের দরজা খুলত। মথুরা আর পূর্ণিমার প্রেমের কথা তার জানা থাকতে পারে, কিন্তু ঠিক সে-সময়েই যে ওরা দেহজ প্রেমে মত্ত থাকবে, এ কথা খুনির জানবার কথা না। সেই হিসেবে, সে মারাত্মক রিস্ক নিয়েছিল। মারাত্মক মানে, খুবই মারাত্মক। তথাপি খুনি কেন এ-বাড়ির বাগানটাই বেছে নিল?

প্রথমেই একটা কথা মাথায় আসে, পারমিতা খুনির সঙ্গে অন্য কোথাও দেখা করতে রাজি হয়নি। দুই, অথবা খুনি নিজেই এই ভয়ংকর দায়িত্ব নিয়েছিল, এই ভেবে যে, বাড়ির মধ্যেই খুনটা করতে পারলে সে ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকবে। যদিও সে এর দরুন একটা মস্ত ভুল করেছে। পারমিতা অকারণে, সেই অসময়ে বাগানে যেত না। নিশ্চয়ই বিশেষ পরিচিত বা ঘনিষ্ঠ কারোর কথা রাখতেই ও বাগানে গিয়েছিল। অতএব, পুলিশের ধারণা, খুবই সঙ্গত—পরিচিত বা ঘনিষ্ঠ কেউ ওকে হত্যা করেছে। হিরেটা কি আদৌ খুনির আঙুলের আংটির? তা যদি হয়, সে খুব উদ্বেগে আছে। হিরেটার খোঁজে কি সে আর আসেনি? আসবে না? খুনির আঙুলের আংটির হিরে হলে তাকে যথেষ্ট সম্পন্ন বলতে হবে। অথবা হিরেটা তদন্তকারীর দৃষ্টিকে অন্যদিকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য ফেলে রাখা হয়েছিল? পুলিশ নিশ্চয় তন্নতন্ন করে বাগান খুঁজেছে। হিরেটা তাদের চোখে পড়ল না? প্রায় চার-পাঁচ রতির হিরে। খুব ছোট না। যাই হোক, এ ব্যাপারটা ফটিকের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে।

'এ-ঘরটা তো পুলিশ ভালোভাবেই সার্চ করেছে বললেন।' অশোক মুখ তুলে নরেন্দ্রনাথের দিকে তাকাল।

নরেন্দ্রনাথ অনেকক্ষণ থেকেই অশোকের চিন্তামগ্ন মুখের দিকে অবাক চোখে তাকিয়েছিলেন। বোধহয় ভেবেছিলেন, পি. এম. রিপোর্টে অশোক কিছু খুঁজে পেয়েছে। মাঝে-মাঝে ফটিকের নির্বিকার মুখের দিকেও জিজ্ঞাসু চোখে দেখছিলেন। অশোকের কথা শুনে যেন সুপ্তোত্থিতের মতো বললেন, 'অ্যাঁ? হ্যাঁ, পুলিশ তো এ-ঘরের সব কিছুই খুঁটিয়ে দেখেছে।'

'আমরাও একবার দেখি।' অশোক ফটিকের দিকে তাকাল।

নরেন্দ্রনাথ বললেন, 'নিশ্চয়ই, দেখুন। আমাকে কিছু করতে হবে?'

'না, আপনি ঘরে থাকলেই হবে।' অশোক ড্রেসিং-টেবিলের দিকে এগিয়ে ড্রয়ারের হাতল ধরে টানল।

প্রথম ড্রয়ারের মধ্যে নকল চুল, কালো নাইলনের বল, কালো জাল, নানারকমের ক্লিপ, হেয়ার পিন, রিবন ইত্যাদি রয়েছে। অশোক সবকিছুই হাতে তুলে দেখল। বন্ধ করে দিয়ে নীচের ড্রয়ার খুলল। প্রায় ফাঁকা। কসমেটিকেরই কয়েকটা কৌটো। চন্দন কাঠের সিঁদুরের কৌটোও রয়েছে।

ফটিক ইতিমধ্যে খাটের বিছানা উলটেপালটে দেখতে আরম্ভ করেছে। অশোক ওয়ার্ডরোবের দুটো পাল্লা খুলে ফেলল। বিস্তর শাড়ি, নানারকমের ও রঙের, জামা, উলেন-গারমেন্টস, নাইটি, ব্রেসিয়ারস, প্যান্টি। লেডিজ লং কোটটা বিদেশি। অশোক পকেটে হাত দিয়ে দেখল। শূন্য। প্রতিটি হ্যাঙারের ভিতর শাড়ির ভাঁজে-ভাঁজে হাত ঢুকিয়ে দেখল। একেবারে নীচে পাতা মোটা কাগজের

বোর্ডের ওপরে কয়েক ডজন ন্যাপথলিন, একটা ওডোর প্যাকেট। অশোক কাগজের বোর্ডটা টেনে তুলে আনতে গিয়ে দেখল, আটকে যাচ্ছে। বোধহয় অনেকদিন পাতা থেকে চাপ খেয়ে রয়েছে। পুলিশ কি টেনে দেখেনি?

অশোক কাগজের বোর্ডটা জোরে টানতে গেল। খানিকটা ছিঁড়ে গেল। তবু পুরোটাই টেনে তুলে ফেলল। কিছু নেই, শূন্য—অশোক আবার বোর্ডটা ঠিক করে পেতে রাখল। ফটিক তখন চেয়ারের ওপরে দাঁড়িয়ে খাটের পিছনে দেখছে। অশোক পড়ার টেবিলে এগিয়ে গেল। প্রত্যেকটা বই-খাতা আলাদা-আলাদা টেনে, পাতা মেলে-মেলে দেখল। র‍্যাক ছাড়াও গোটা টেবিলময় বই-খাতা ছড়ানো। অপরের হাত পড়েছিল, অর্থাৎ পুলিশের। প্রায় সব বই-খাতা দেখা শেষ হওয়ার মুখেই একটা মোটা খাতার ভেতর থেকে একটি খাম বেরোল। খামটা হাতে নিয়ে প্রথমে মনে হল, ভেতরে কোনও চিঠি নেই, মুখটা খোলা। অশোক আঙুল দিয়ে ফাঁক করে খামের ভেতরে দেখল একটি ছোট চিঠি ভাঁজ করা রয়েছে। পুরোনো খাম, দেখলেই বোঝা যায়। পোস্টাল স্ট্যাম্পে ছাপ মারা, পারমিতার নাম-ঠিকানা লেখা। অশোক চিঠিটা খুলল, বাংলা চারিত্রিক হস্তাক্ষরে লেখা চিঠি, সম্বোধন, 'মিতা।' প্রথমেই শুরু—

'গরিব অধ্যাপকদের কোনও মেয়েই স্বামী হিসেবে পেতে চায় না, তুমিও না। তুমি তো অধ্যাপকমাত্রকেই বিয়ে করতে চাও না। অথচ এর আগে অনেকবার বলেছি, অধ্যাপনার চাকরি ছেড়ে দেব। ছাত্রীকে বিয়ে করলে, এমনিতেই এ কলেজ থেকে চাকরি ছাড়তে হবে। তবু, তোমার ইচ্ছানুযায়ী আমি আই এ এস, এমনকি আই পি এস-এর জন্যেও নতুন করে প্রস্তুত হতে চাই। কিন্তু আমাকে প্রত্যাখ্যান কোরো না। অন্তত, এটা তো ধরে নিতে পারি, তুমি আমাকে ভালোবাসো। আমার কথা তো বলবার দরকারই হয় না। ইদানীং মাঝে-মাঝে তোমার হাসি দেখলে, নিজেকে কেমন বিদ্রুপের পাত্র মনে হয়। মনে কষ্ট পাই, কিন্তু তোমাকে সে-কথা বলতে পারিনে। এখন সব কিছুই তোমার হাতে। আমি দেবদাস হব না, জীবনটাকেও ছারখার করতে চাইনে, তবু তোমাকে না পেলে, মনে হচ্ছে ভবিষ্যৎ অন্ধকার। কিছুই দেখতে পাচ্ছিনে। আশা করি, শুক্রবার ছুটির পরে, 'সেইখানে' অপেক্ষা করবে, কিছু বলবে। চিঠি পেয়ে বিরক্ত হয়ো না। এক বছরের অন্তরঙ্গতার কথা মনে রেখে আর একবার এই হতভাগ্যের জন্যে ভেবো। 'শেষ কথা' বলার জন্যে মনস্থ করে এসো না।

—ইতি তোমারই পথ চেয়ে, সোমক।'

অশোক চিঠির ওপরে তারিখ দেখল। তিন বছর আগের চিঠি। জরুরি চিঠি। অথচ আশ্চর্য, পুলিশ এ চিঠি পায়নি। পেলে, নিশ্চয়ই অশোকের জন্য রেখে যেত না। সোমক। পদবি কী? আরও একাধিক চিঠি থাকা উচিত। সেসব কোথায়? কয়েক মুহূর্তের জন্য অশোকের বুকের তাল দ্রুত হয়ে উঠল। ও নরেন্দ্রনাথের দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করল, 'মিতা কোন কলেজে পড়ত?'

নরেন্দ্রনাথ উৎসুক চোখে অশোকের মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন। কলেজের নাম বললেন। অশোক জিগ্যেস করল, 'সোমক নামে কারওকে চিনতেন? মিতার সঙ্গে এ-বাড়িতে কখনও এসেছে?'

নরেন্দ্রনাথ ভ্রূকুটি চিন্তিত মুখে ভাবলেন, মাথা নেড়ে বললেন, 'না, এরকম কোনও নামের লোককে মনে পড়ছে না তো?'

'নামটা শুনেছেন কখনও? বাড়ির কারও মুখে?'

নরেন্দ্রনাথ তেমনি চিন্তিত মুখেই আবার মাথা নাড়লেন, 'না।'

'কলেজে নিশ্চয়ই টেলিফোন আছে?'

'আছে বইকি। আমি সেই কলেজের টেলিফোন নাম্বার জানি—মানে, প্রিন্সিপালের নাম্বার।'

'তাতেই হবে। আমার এ-ঘরের কাজ হয়ে গেছে। টেলিফোন এখন কোথায় আছে?'

'ওপরেই, আমার ঘরে।'

'চলুন, সেখানে যাওয়া যাক। কলেজের প্রিন্সিপালের সঙ্গে একবার কথা বলব।' অশোক ফটিকের দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করল, 'কিছু পেলি?'

ফটিক হতাশ মুখে মাথা নাড়ল। দুজনেই নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে ঘরের বাইরে গেল। করিডরের পরে, পাশের ঘরে নীপা আর অর্পিতাকে দেখা গেল। নরেন্দ্রনাথ সোজা গিয়ে ডানদিকে ঘুরে সিঁড়ির মুখ পেরিয়ে ডানদিকের একটি দরজা-খোলা ঘরে ঢুকলেন। বোধহয় এই একটিমাত্রই দক্ষিণ খোলা ঘর। খাট, বিছানা, আলমারি, দেওয়ালে বাঘছাল, নানা মহিলা-পুরুষের ফটো ইত্যাদি ছাড়াও রয়েছে কালীঘাটের কালীর ছবি। এককোণে একটি তেপায়ার ওপরে টেলিফোন। সামনে বসবার কোনও কিছু নেই।

নরেন্দ্রনাথ ঘরে ঢুকেই টেলিফোনের রিসিভার তুলে ডায়াল ঘোরালেন, আর এক সেকেন্ড পরেই রিসিভার এগিয়ে দিলেন আমাদের দিকে। অশোক রিসিভার কানে নিয়ে শুনল, রিং হচ্ছে। বেশ খানিকক্ষণ বেজে যাওয়ার পরে ওপার থেকে রিসিভার তোলার এবং গম্ভীর স্বর ভেসে এল, 'হ্যাঁ, হ্যালো।'

'আমি কি কলেজের প্রিন্সিপালের সঙ্গে কথা বলছি?' অশোক জিগ্যেস করল।

ওপারের জবাব, 'হ্যাঁ, কেন? কে কথা বলছেন?'

'এন্টালি থানার ও. সি.' অশোক নির্বিকার মুখে বলল।

ওপারের স্বরে ঈষৎ উদ্বেগ, 'কী ব্যাপার বলুন তো?'

'সোমকবাবু কি এখন ক্লাস নিচ্ছেন?'

ওপারের অবাক চিন্তিত উত্তর, 'সোমক? সোমক কে ঠিক চিনতে পারছি নে তো? সোমক কী? পদবি? কী করে?'

'আপনার কলেজেই, বোধহয় ইংরেজি পড়ান। পদবিটা তো ঠিক—।'

ওপার থেকে বাধা দিয়ে জবাব এল, 'ওহ্, আপনি সোমক বসুর কথা বলছেন বোধহয়। তা ছাড়া তো আর ও-নামে কেউ নেই। হ্যাঁ, ইংরেজির লেকচারার ছিল। কিন্তু সে তো অনেক—মানে ধরুন বছর তিনেক আগে চাকরি ছেড়ে দিয়েছে।'

'তাই নাকি?' অশোকের মুখে হতাশা।

ওপারের জবাব, 'হ্যাঁ, ও তো—আমি যতদূর জানি, আর টিচিং লাইনে নেই। ও তো আই এ এস করে, বর্ধমানে এ ডি এম ছিল বছর খানেক আগেও। তারপরে বোধহয় হাওড়ায় ডি এম হয়ে আসে।'

অশোকের চোখে আবার আশার আলো ফুটল, 'ধন্যবাদ। বাকিটা আমি খোঁজ করে নেব।'

তবুও ওপার থেকে জবাব এল, 'থানার ও. সি. হয়ে আপনি ম্যাজিস্ট্রেটের খোঁজ করছেন আমার কাছে?'

'দুঃখিত।' অশোক টেলিফোন নামিয়ে রাখল। কয়েক সেকেন্ড পরেই আবার রিসিভার তুলে ডায়াল করল। এবং সেকেন্ডের মধ্যেই মুখে হাসি দেখা দিল, 'নমস্কার মিঃ মিত্র। অশোক ঠাকুর বলছি।'

এস পি চব্বিশ পরগনা, মিঃ আর কে মিত্রর উৎসুক সহাস্য স্বর ভেসে এল, 'নমস্কার। কোথা থেকে?'

'নরেনবাবু—মানে, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের বাড়ি থেকে।'

'বুঝেছি, বুঝেছি।' মিঃ মিত্রর খুশি স্বর ভেসে এল, 'যাক, আপনি এসে পড়েছেন? কী রকম বুঝছেন?'

'অগাধ জলে আছি।' অশোক হাসল, 'হাওড়ার ডি এম সোমক বসুকে চেনেন নাকি?'

'হাওড়ার ডি এম সোমক বসু?' মিঃ মিত্রর স্বরে মুহূর্তের দ্বিধা, তারপরেই ভেসে এল, 'চিনি বইকি। কিন্তু সোমক বসু তো এখন আর হাওড়ার ডি এম নেই। সে তো এখন রাইটার্সে—হেলথ ডিপার্টমেন্টে আছে। সেক্রেটারি। ভেরি ব্রাইট ইয়ংম্যান। তাকেও আপনার দরকার পড়েছে নাকি?'

'একটুখানি।' অশোকের মুখে হাসি, 'ভদ্রলোক তো আমাকে চেনেন না। অথচ আজই একবার দেখা করতে পারলে ভালো হত।'

মিঃ মিত্রর জবাব এল, 'আপনাকে না চিনলেও নামটা হয়তো জানেন। তা ছাড়া আপনার কাছে এস. এস. পি. সি. আই. ডি. ডবলিউ. বি.-র চিঠিটা আছে তো?'

'আছে।'

'বেশ, তবু আমি একবার টেলিফোন করে দেখছি। আপনি ওখানেই থাকুন।' মিঃ মিত্রর গলা ভেসে এল, 'কী কথা হয় আপনাকে জানিয়ে দিচ্ছি।'

'অশেষ ধন্যবাদ, স্যার।'

'ওটা বলবেন না।' মিঃ মিত্রর হাসির সঙ্গে লাইন কেটে গেল।

অশোক রিসিভার নামিয়ে রাখল, 'এক-একটা মানুষ কতখানি একরোখা হলে, এমন হতে পারে।'

নরেন্দ্রনাথ আর ফটিক দুজনেরই জিজ্ঞাসু চোখ অশোকের ওপরে। অশোক হেসে বলল, 'এই সোমক বসু, বছর তিন আগেও কলেজের একজন লেকচারার ছিল। তারপরে আই. এ. এস. পাস করেই অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট, জাম্প করে একেবারে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট, এখন রাইটার্স হেলথের সেক্রেটারি। মিঃ মিত্র বললেন, ভেরি ব্রাইট ইয়ংম্যান।'

'কিন্তু এঁকে আপনার কী দরকার? নামই বা জানলেন কী করে?' নরেন্দ্রনাথ বিভ্রান্ত স্বরে জিগ্যেস করলেন, 'আর এঁর সঙ্গে মিতার মার্ডারেরই বা কী যোগাযোগ থাকতে পারে?'

অশোক হাসল, 'একসঙ্গে অনেকগুলো কথা জিগ্যেস করলেন। ইনি আপনার বোন পারমিতাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন।'

'ইনি মিতাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন? কই, কিছু জানিনে তো?' নরেন্দ্রনাথকে অধিকতর বিভ্রান্ত দেখাল।

অশোক হাসল, 'কী করে জানবেন? মিতা নিশ্চয়ই কারওকে কিছু বলেনি। ইনি মিতাকে কলেজে পড়াতেন, তিন বছর আগে। আপনার বউমা, আপনার স্ত্রী, আপনার বোন অর্পিতা আর তাঁর স্বামীকে জিগ্যেস করে আসুন না, এ নামটা তাঁরা কখনও মিতার মুখে শুনেছেন নাকি।'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।' নরেন্দ্রনাথ হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে গেলেন।

অশোক সোমকের চিঠিটা পকেটে রেখেছিল। আবার বের করে দ্রুত একবার চোখ বুলিয়ে চিঠিটা ফটিকের দিকে এগিয়ে দিল, 'একে বলে ভাগ্য।'

'কেন?' ফটিক চিঠিটা নিয়ে জিগ্যেস করল।

অশোক বলল, 'এরকম একটা চিঠি, বিশেষ করে মিতা মার্ডারের ক্ষেত্রে অত্যন্ত মূল্যবান। অথচ পুলিশের চোখে পড়েনি।'

ফটিক চিঠি পড়তে মন দিল। টেলিফোন বেজে উঠল। অশোক রিসিভার তুলে নিল, 'হ্যালো।'

ওপার থেকে মিঃ মিত্রর চেনা স্বর ভেসে এল, 'অশোকবাবু?'

'হ্যাঁ, বলুন, মিঃ মিত্র।'

'সোমক বসু পরশু দিল্লি গেছেন তাঁর মন্ত্রীর সঙ্গে। আজ বিকেলে ফেরার কথা।' মিঃ মিত্রর

গলা শোনা গেল, 'তার মানে, আপনি আজ ওঁকে রাইটার্সে পাচ্ছেন না। ওঁর বাড়ির ঠিকানা আর টেলিফোন নাম্বার আপনাকে দিতে পারি।'

অশোক ফটিকের দিকে তাকিয়ে লেখবার ইশারা করে বলল, 'হয়তো আজ বাড়ি গিয়ে ওঁকে বিরক্ত কবা ঠিক হবে না, তবু ঠিকানাটা লিখে রাখি। আপনি বলুন।'

ফটিক চিঠি পড়তে-পড়তেই টেলিফোন আসামাত্র অশোকের দিকে তাকিয়েছিল। ইঙ্গিত পেতেই পকেট থেকে নোটবই আর কলম বের করল। টেলিফোনে মিঃ মিত্র সোমক বসুর বালিগঞ্জের বাড়ির ঠিকানা আর টেলিফোন নাম্বার বললেন। অশোক যথাযথ ঠিকানা টেলিফোন নম্বর উচ্চারণ করে গেল। ফটিক লিখে নিল। মিঃ মিত্র আবার বললেন, 'দিল্লি থেকে ফিরে সোমক বসু যে বাড়িতেই থাকবেন এমন নাও হতে পারে। উনি নিয়মিত একটি ক্লাবে যান।' তিনি ক্লাবের নামটা বললেন, এ খবরটা অবিশ্যি আমি আগে থেকেই জানতাম।'

'আমার ইচ্ছে নেই, আজই ওঁকে ক্লাব অবধি ধাওয়া করি।' অশোক বলল, 'তবে ওঁকে আমার জরুরি দরকার।'

মিঃ মিত্রের হাসি ভেসে এল, 'অবিশ্যি আপনার কাজে অবাক না হয়ে উপায় নেই। তবু, জানতে ইচ্ছে করছে, পারমিতা ভট্টাচার্যের মার্ডারের সঙ্গে সোমক বসুর খোঁজ পড়ল কেন? মাপ করবেন, কৌতূহলটা দমন করতে পারছিনে।'

'আপনাকে বলতে আমার কোনও অসুবিধে নেই।' অশোকও হাসল, 'আমি জানি, আপনার কাছ থেকে পাঁচ কান হওয়ার ভয় নেই। সোমক বসুর সঙ্গে তিন বছর আগে পারমিতার পরিচয় ছিল। উনি পারমিতার পাণিপ্রার্থী ছিলেন।'

মিঃ মিত্রর বিস্মিত স্বর ভেসে এল, 'ইজ ইট? পুলিশ কিছুই জানে না?'

'তাই তো মনে হচ্ছে।' অশোক বলল, 'আসলে পুলিশের চোখে ব্যাপারটা এড়িয়ে গেছে। সোমকবাবু একসময়ে কলেজে পড়াতেন, পারমিতা তাঁর ছাত্রী ছিল।'

মিঃ মিত্রের স্বর শোনা গেল, 'আশ্চর্য। এ কী ভাই, আপনি কেঁচো খুঁড়তে সাপ বের করবেন নাকি?'

'এ বিষয়ে নিশ্চয় করে কিছু বলা যায় না।' অশোক শব্দ করে হাসল, 'তবে কেঁচো খোঁড়ার জন্যে আমি কিছু খুঁড়ব না। খুঁড়লে সাপের জন্যেই খুঁড়ব। আপাতত মাটির ওপর ঠুকে-ঠুকে দেখছি, সাপুড়েদের মতোই।'

টেলিফোনের ওপার থেকে মিঃ মিত্রর হাসি ভেসে এল, 'ভালো বলেছেন। আমার বিশ্বাস আছে, পারমিতার খুনিকে আপনি খুঁজে বের করতে পারবেনই।'

'এতটা আশা করবেন না।' অশোক হাসল, 'কেন না, আমার জীবনে এমন অভিজ্ঞতাও আছে, খুনিকে জেনে-শুনেও ধরতে পারিনি। এমনকী তার নিজের মুখে স্বীকারোক্তি শুনেও। যাক, সেসব কথা পরে হবে। আপনার সময় আর নষ্ট করব না।'

মিঃ মিত্রর গলা শোনা গেল, 'সময় নষ্ট কী বলছেন। ইট্‌জ এ প্লেজার। এনি হাউ, যখনই আমাকে প্রয়োজন হবে ডাকবেন, আমি আছি।'

'জানি। এসবই আমার ভরসা। ছাড়লাম। নমস্কার।'

'নমস্কার।'

অশোক রিসিভার নামিয়ে রাখল। ইতিমধ্যে নরেন্দ্রনাথ ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছেন। অশোক রিসিভার রাখতেই বললেন, 'না, সোমক বসু বলে কারও নাম মিতার মুখ থেকে কেউ শোনেনি।'

অশোক মনে-মনে ভাবল, অথচ বাড়ির সকলেরই ধারণা মিতা প্রাণখোলা মেয়ে ছিল। অন্তত নীপা আর অর্পিতাকে সব কথাই নাকি বলত। বলত নিশ্চয়ই, কিন্তু সব কথা না। যে-টুকু বলা চলত তাই বলত। অশোক বলল, 'আপনার বাড়ির সবাইকেই জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে, আপনার

বড় ছেলেকে ছাড়া। ওঁকে নিয়ে এখন ব্যস্ততার কিছু নেই। এ-বাড়ির রুটিন ওয়ার্ক শেষ, এবার আমরা যাই।'

'যাবেন কী?' নরেন্দ্রনাথ ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, 'সেই কখন এসেছেন একটু চা-টা—।'

অশোক ফটিকের দিকে তাকাল, 'চা একটু হতে পারে, টা দরকার নেই। আমরা পেছনের বস্তির সরু গলি আর আশপাশটা একটু দেখে, থানায় যাব। চলুন, নীচে যাওয়া যাক।' ও ঘরের বাইরে পা বাড়াল।

সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে-নামতে ফটিক অশোকের হাতে সোমকের খামে মোড়া চিঠিটা দিল। অশোক সেটা ট্রাউজারের পকেটে রাখল। নরেন্দ্রনাথ চটি ফটফটিয়ে আগে নীচে নেমে বাইরের ঘরের দিকে এগোচ্ছেন। বাড়ির গেট দিয়ে তখন একটা লেফটহ্যান্ডার বিলিতি সবুজ রঙের ফিয়াট ব্যাক গিয়ার দিয়ে রাস্তায় নেমেছে। চালকের আসনে বিক্রম। স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে সোজা করতে-করতেই তার চোখ পড়ল অশোকদের দিকে। অশোকও তাকিয়েছিল। বিক্রম বাঁ-হাত বাড়িয়ে বলল, 'অশোকবাবু আমি অফিসে যাচ্ছি, আব দেরি করতে পারছিনে। আপনার প্রয়োজন হলেই আমাকে স্মরণ করবেন।'

অশোক হাত তুলে বিদায় জানাল, 'নিশ্চয়ই।'

বিক্রম গাড়ি চালিয়ে চলে গেল। নরেন্দ্রনাথ ডাকলেন, 'আসুন, অশোকবাবু।'

অশোক ফটিককে নিয়ে নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে বাইরের ঘরে ঢুকল। দেখল টেবিলের ওপর বিস্তর খাবার সাজানো প্লেট আর চা। বড় বউ দাঁড়িয়ে আছেন ভেতরে ঢোকার দরজার পাশে। তাঁর পিছনে নীপা। অশোক বলল, 'করেছেন কী। এখন কি ভুরিভোজের সময়?'

'ভুরিভোজ নয় ভাই, সামান্য একটু দিয়েছি।' বড় বউ বললেন, 'ছেলেমানুষ তোমরা, চায়ের সঙ্গে এটুকু তোমাদের কাছে কিছু নয়। বোসো।'

অশোক ফটিকের দিকে তাকিয়ে হাসল। ডিম ভাজা, টোস্ট, মিষ্টি কয়েকরকম আর চা। অশোক বলল, 'কথা না বাড়িয়ে শেষ করে ফ্যাল ফটিক।' বড় বউয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনার মন খারাপ, জোর করে এখন আতিথেয়তা না করলেও চলত।'

'তা মানি।' বড় বউ বললেন, 'তবু আমাদের মন বলে একটা কথা আছে তো। আমবাও তো খাচ্ছি-পরছি। কী করব?'

অশোক আর ফটিক খেয়ে গেল, বড় বউ জিগ্যেস করলেন, 'নাম ধরেই ডাকছি। বলো তো অশোক, পূর্ণিমার পালানোর ব্যাপারটা তুমি তেমন আমল দিতে চাইছ না কেন? আমার তো মনে হয়, ও নিশ্চয়ই সেই রাত্রে কিছু দেখেছিল, অথবা জানে। নইলে ওরকম ভাবে কেউ পালায়?'

'আমল দিইনি, তা নয়।' অশোক মুখে খাবার নিয়ে বলল, 'ওকে খুঁজে বের করতে বেশি সময় লাগবে না। ওর পালাবার কারণটাও জানতে হবে। তবে, ও কিছু দেখলে বা জানলে, না বলারই বা কারণ কী থাকতে পারে? তা হলে তো বলতে হয়, খুনির সঙ্গে ওর কোনও যোগসাজশ ছিল, না?'

বড় বউ বললেন, 'তা থাকতেও তো পারে।'

'নিশ্চয়ই পারে।' অশোক হাসল, 'তবে নাও থাকতে পারে। মেয়েটাকে তো আপনারা অনেকদিন দেখছেন। আপনার কী মনে হয়? মিতার খুনের ব্যাপার জেনেও চুপ করে থাকতে পারে?'

বড় বউ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। নরেন্দ্রনাথ স্ত্রীর দিকে তাকালেন। অশোক আবার বলল, 'ও পুলিশের কাছে জবানবন্দি দিয়েছে তো?'

'তা দিয়েছে।'

'তারপরেও বাড়ি ছেড়ে পালায়নি, তাই না?'

'না।'

অশোক চায়ের কাপে চুমুক দিল, 'আর আজ আমি যখন মথুরাকে জিজ্ঞাসাবাদ করছি, তখনই হঠাৎ পালিয়ে গেল। গোলমালটা ওখানেই। ভাববেন না, ওর কাছ থেকে কথা আদায় করা যাবে।'

'আমি থানায় ফোন করে জানিয়ে দিয়েছি।' নরেন্দ্রনাথ বললেন, 'পার্কসার্কাসে ওর মা যে-বাড়িতে কাজ করে তার ঠিকানাও দিয়েছি। ওদের দেশের বাড়ির ঠিকানাও দিয়েছি।'

অশোক বলল, 'ভালোই করেছেন। আমার তো মনে হয় ওর আর পালাবার জায়গা নেই।'

সকলেই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলেন। বোঝা গেল, পূর্ণিমার ব্যাপারে অশোকের তেমন ঔৎসুক্য না দেখে সকলেই কেমন অবাক আর হতাশ হচ্ছেন। অশোক সেদিকে মনোযোগ না দিয়ে, খাওয়া শেষ করল। ফটিকেরও শেষ। দুজনেই উঠে দাঁড়াল। বড় বউ এগিয়ে এসে বললেন, 'মিতাকে পেটে ধরিনি বটে, কিন্তু ও আমার সব সন্তানের বাড়া। খুনিকে তুমি খুঁজে বের করো ভাই।' বলতে-বলতে তাঁর চোখে যেমন জ্বালা ফুটল, তেমনি জলও বিদবিদ করে উঠল।

'এটা তো এখন আমারও ধ্যানজ্ঞান।' অশোক বলল, 'চেষ্টার ত্রুটি রাখব না, এই বিশ্বাস রাখবেন।' ও দরজার দিকে পা বাড়াল।

নরেন্দ্রনাথ গেট অবধি এসে বললেন, 'আমি আজ সারাদিন বাড়িতেই আছি। কোনও দরকার হলে—।'

'নিশ্চয়ই।' অশোক গেটের কাছে দাঁড়িয়ে ফিরে তাকাল, 'এ-বাড়িতে ঢোকবার সময় বিক্রমবাবুর গাড়িটা দেখতে পাইনি।'

নরেন্দ্রনাথ ভুরু কুঁচকে বললেন, 'কেন, গাড়িটা তো ছিল। আমার গাড়ির ওপাশে ছিল।'

'তা হবে, খেয়াল করিনি।' অশোক ফটিককে নিয়ে রাস্তায় পা দিল, 'এখন চলি। দরকার হলে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করব।' ও ওপরের দিকে তাকাল।

ওপরের রেলিং-এ ভর দিয়ে অর্পিতা দাঁড়িয়েছিল। বুদ্ধিমতী মহিলা। খুব সহজেই বুঝিয়ে দিয়েছে, মিতার মতো মেয়েকে রেপ করা যায় না। এখন কি অশোককেই দেখছে? কেন?

নরেন্দ্রনাথের বাড়ি থেকে বেরিয়ে প্রথম বাঁ-দিকে ফিরে গলি দিয়ে এগোল। বাঁধানো চাতাল, টিউবওয়েল, বস্তির মেয়ে-পুরুষ-বাচ্চাদের ভিড়। টিউবওয়েলের কাছ থেকে নরেন্দ্রনাথের পাঁচিল আর গাছ চোখে পড়ে। এত সরু আর এঁদো গলি, একটা মানুষের পক্ষে কোনওরকমে যাওয়া যায়। সেখান থেকে ডানদিকে ফিরে বাজারের ধারে রাস্তায় কর্পোরেশনের জমা করা ময়লার স্তূপ। অশোক আর ফটিক ডাইনে বাজার রেখে, ট্রাম রাস্তার সামনে এসে দাঁড়াল। পুলিশের কুকুর এখানে এসে থমকে দাঁড়িয়েছিল।

'অসম্ভব।' অশোক বলল।

ফটিক জিগ্যেস করল, 'কী?'

'কুকুরের পক্ষে এর বেশি এগোনো', অশোক বলল, 'এতটা যে খুনিকে খুঁজে এসেছিল, সেটাই যথেষ্ট। এত লোকের ভিড়। এর পরে, এই সার্কুলার রোডের লোকজন ট্রাফিকের ভিড়ে খুনি যে কোথায় কোনদিকে উধাও হয়েছে, সেটা শুঁকে বের করা অসম্ভব।'

ফটিক জিগ্যেস করল, 'আচ্ছা, পূর্ণিমার ব্যাপারটাকে সত্যি তুই তেমন আমল দিচ্ছিস না কেন?'

'তার কারণ, মথুরা যতই ভয় পাক, আর লজ্জা পাক, ও স্বীকারোক্তি দিতে রাজি আছে,' অশোক বলল, 'আর পূর্ণিমা সেই স্বীকারোক্তির ভয়েই পালিয়েছে। কারণ, পুলিশ ওদের সম্পর্কটা ধরতে পারেনি।'

'মথুরার আবার কীসের স্বীকারোক্তি?'

অশোক হেসে বলল, 'খুন যখন ঘটছিল, মথুরা আর পূর্ণিমা তখন রান্নাঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে, যাকে বলে মত্ত প্রেম, তাই করছিল। ওইটাই ওদের সময় আর সুযোগ। রাত্রে খাওয়া-

দাওয়াব পাট মিটে গেলে পূর্ণিমাকে ওপরে শুতে যেতে হয়। খুনের সময় মথুরা আর পূর্ণিমা একসঙ্গে ছিল। আর যদি খুনের ঘটনার সঙ্গে পূর্ণিমার পালানোর কোনও যোগ থাকে, তা হলে মথুবার সঙ্গেও আছে। এই সেকেন্ড থিংকিংটা আমার মনে তেমন দাগ কাটছে না। মথুবা আর পূর্ণিমার প্রেমেব কথা মিতা জানত, সমর্থন করত, প্রশ্রয়ও দিত। সেই হিসেবে এক্ষেত্রে আমি কোনও মোটিভ খুঁজে পাচ্ছি না।' বলতে-বলতেই অশোক একটা রিকশোকে ডাকল।

রিকশো থামল, অশোক ফটিককে ডেকে নিয়ে রিকশোয় উঠে বলল, 'এন্টালি থানা চলো।'

ফটিক আবার জিগ্যেস করল, 'আর একটা কথা আমার মনে হয়েছে। বাড়ির লোকদের তুই এত জেরা করলি কেন? এদেরও কি খুনের কোনও মোটিভ থাকতে পারে?'

'গতকাল নরেনবাবু যখন আমার কাছে গেছলেন, তখন চলে আসবার সময়, যেন হঠাৎ মনে পড়ে গেছে, এইভাবে বলেছিলেন, ময়না তদন্তে জানা গেছে মিতা প্রেগন্যান্ট ছিল।' অশোক বলল, 'ময়না তদন্তের আগে কি বাড়ির কেউ জানত না, মিতা প্রেগন্যান্ট? যদি ধরে নেওয়া যায় জানত, তাহলে গর্ভবতী আইবুড়ো মেয়েকে মেরে ফেলে কলঙ্ক মোচনের কথাটা একেবারে ভুলে গেলে চলে না।'

ফটিক বলল, 'শালা, ভাবতেও পারিস বটে।'

'না ভেবে উপায় নেই।' অশোক বলল এবং দেখে নিল রিকশোওয়ালা সি আই টি রোড ক্রস করে কনভেন্ট রোডের দিকে যাচ্ছে কি না। ঠিকই যাচ্ছে। ও আবার বলল, 'তা ছাড়া, পুলিশের জেরা আর আমার জেরায় নিশ্চয়ই একটু তফাত হবে। নীপা আর অর্পিতার কথা থেকে বোঝা গেল বিক্রমকে পুলিশ কিছু জিগ্যেসই করেনি।'

ফটিক বলল, 'স্বাভাবিক, বিক্রম তো পিকচারেই আসছে না। তার অ্যালিবাই তো পাকা। তা ছাড়া, মোটিভের প্রশ্নও আছে।'

'সবই আছে, কোনওটাই অস্বীকার করছি না।' অশোক বলল, 'আমার কাজ তো আমাকেই করতে হবে। বিক্রমের সঙ্গে কথা না বললে, মিতার খুনের ঘটনার সঙ্গে তার সুখচরের বাড়ির ঘটনার কোইন্সিডেন্সটা জানাই যেত না।'

রিকশো থানার সামনে এসে দাঁড়াল। অশোক পকেট থেকে পার্স বের করে ভাড়া মিটিয়ে থানায় ঢুকল। ব্যস্ত থানা। কিছু ভিড়ও আছে। নানারকমের লোক সামনের ঘরে। কেউ-কেউ দাঁড়িয়ে কেউ-কেউ বসে। ঘরে ঢোকবার মুখে রাইফেলধারী পাহারা। অশোক তাকেই জিগ্যেস কবল, 'ও. সি. সাহেব আছেন।'

'হ্যাঁ, অন্দরের ঘরে আছেন।' পাহারা ভাঙা বাংলায় বলল।

অশোক বলল, 'ওঁর কাছে যেতে পারি?'

'ছোটসাহেবকে জিগ্যেস করুন।' সামনের টেবিলেই ইউনিফর্ম পরা চেয়ারে বসা একজনকে দেখিয়ে বলল।

অশোক ফটিককে নিয়ে ভিতরে ঢুকল। ছোটসাহেব—হয়তো সাব-ইন্সপেকটর। অশোক সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করল, 'একসকিউজ মি, ও. সি. সাহেবের একটা চিঠি আছে।'

'কার চিঠি?' ইন্সপেকটর একজনের সঙ্গে কথা বলতে-বলতে ভুরু কুঁচকে জিগ্যেস করল।

অশোক বলল, 'স্পেশাল সুপারিন্টেনডেন্ট অব পুলিশ, সি আই ডি, ওয়েস্ট বেঙ্গল।'

ইন্সপেক্টরের ভুরু কিঞ্চিৎ সোজা হল, পিছনের বাঁদিকের ঘর দেখিয়ে বলল, 'যান, ও ঘরে আছেন।'

'খবর না দিয়েই যাব?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, যান না।' ইন্সপেক্টর বলল, 'দরজায় দাঁড়িয়ে বলুন, আপনি কার চিঠি নিয়ে এসেছেন।'

'ধন্যবাদ।' অশোক এগিয়ে গেল। ভেতরে ঢোকবার আর-একটা দরজা আছে। ওদিকেই

বোধহয় হাজত। ভেতরটা তেমন আলোকিত নয়। ও বাঁদিকের পিছনের ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে পরদাটা তুলে বলল, 'আসতে পারি?'

অশোকের থেকে বয়েসে কিছু বড়, ও. সি. একজন সুসজ্জিতা মহিলার সঙ্গে কথা বলছিলেন। বিরক্ত মুখে জিগ্যেস করলেন, 'কী চাই?'

'আপনার একটা চিঠি ছিল। জরুরি চিঠি।' অশোক বলল।

ও. সি বললেন, 'নিয়ে আসুন, দেখি।'

অশোক ঘরের মধ্যে ঢুকে ও. সি.-র চিঠিটা বেছে নিয়ে এগিয়ে দিল। ও. সি. খামের ওপরের লেখা দেখে অশোকের দিকে একবার তাকালেন। এক পাশে দুটো চেয়ার দেখিয়ে বললেন, 'বসুন।'

অশোক আর ফটিক বসল। ও. সি. মহিলাকে বললেন, 'এক মিনিট।' খামের সিল আঙুলের চাপে ভেঙে চিঠি খুলে পড়তে-পড়তে ভুরু কুঁচকে উঠল। তারপরে অবাক চোখে অশোকের দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করলেন, 'আপনি অশোক ঠাকুর?'

'হ্যাঁ।' অশোক মাথা ঝাঁকাল।

ও. সি. গম্ভীর মুখে জিগ্যেস করলেন, 'কী করতে পারি আপনার জন্যে বলুন?'

'বিশেষ কিছু না।' অশোক বলল, 'আপনি ব্যস্ত মানুষ, সামান্য দু-একটা কথা জিগ্যেস করার ছিল। সুকুমারবাবু আর দীপকবাবু কি এখনও হাজতে আছেন?'

ও. সি. জবাব দেওয়ার আগে মহিলার দিকে ফিরে বললেন, 'আপনি ওবেলা একবার টেলিফোন করে আসবেন, আমি একটা ব্যবস্থা করবই।'

স্বভাবতই মহিলার মুখে অপ্রসন্নতা ফুটে উঠল। কাজলটানা সুন্দর চোখে রুষ্ট নজরে অশোক আর ফটিকের দিকে একবার দেখে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে ও. সি.-কে নমস্কার করে বললেন, 'আচ্ছা, তাই করব।'

ও. সি.-ও উঠে দাঁড়ালেন। মহিলা বেবিয়ে গেলেন। ও. সি. হাত তুলে ডাকলেন, 'আসুন, অশোকবাবু, সামনের চেয়ারে আসুন। হ্যাঁ, সুকুমার মল্লিক আর দীপক বায় এখনও হাজতেই আছে।'

অশোক সামনের চেয়ারে গিয়ে বসল, 'ওদের জেরা করে তেমন কিছু পেলেন?'

'কিছুই না।' ও. সি বললেন, 'কথা শুনলে তো মনে হয় দুটির কেউ ভাজা মাছ উলটে খেতে জানে না।'

অশোক জিগ্যেস করল, 'ওঁদের অ্যালিবাই কী বলছে?'

'অ্যালিবাই তো পরিষ্কার।' ও. সি. বললেন, 'তদন্তেও একরকম প্রমাণ হয়ে গেছে। সুকুমার মল্লিক সন্ধে সাড়ে ছ'টা থেকে রাত্রি দশটা অবধি একটা গল্প পাঠের আসরে ছিল। সে নাকি আবার গল্পটল্প লেখে। দীপক ওর বোন-বউদি-দাদার সঙ্গে সন্ধের শো-তে সিনেমা দেখে বাইরের থেকে খেয়ে রাত্রে বাড়ি ফিরেছিল।'

'তবু অ্যারেস্ট করলেন?' অশোক হাসল।

ও. সি. দু-হাত তুলে বললেন, 'কী করব মশাই। কাগজগুলো মাথা খারাপ করে দিচ্ছে। একটা কিছু তো করতেই হবে।'

অশোক হেসে উঠল, 'আর কারওকে অ্যারেস্ট করেছেন নাকি?'

'হাসছেন আপনি? আমাকে তো কেস একটা খাড়া করতেই হবে।' ও. সি. বললেন, 'হ্যাঁ, আর একটাকে আমার অ্যারেস্ট করার ইচ্ছে রয়েছে, পারছিনে। সে হল টিটো গাঙ্গুলি।'

'কেন পারছেন না? বাপ জাঁদরেল ব্যারিস্টার বলে?' অশোক জিগ্যেস করল।

ও. সি. অবাক চোখে তাকিয়ে বললেন 'ঠিক বলেছেন। সব জায়গা তো ঘাঁটাঘাঁটি করা যায় না। তবে টিটোর অ্যালিবাইও পাকা, কিন্তু একেবারে লম্পট আর দুশ্চরিত্রের শিরোমণি। বাপের

এক ছেলে, দু-হাতে টাকা ওড়াচ্ছে। পারমিতার খুনের দিন দুটো মেয়েকে নিয়ে সন্ধে ছ'টা থেকে রাত্রি এগারোটা পর্যন্ত একটা হোটেলে ছিল।'

'আপনি ওর সঙ্গে কথা বলেছিলেন?'

'বলেছি বইকি। মনে হল, পারমিতাকে ও পছন্দ করত না।'

'তাই নাকি?' অশোক হাসল, 'ওর ঠিকানাটা দিতে পারেন?'

'নিশ্চয়ই।' ও. সি. বেল বাজিয়ে একজন পাহারাকে ডেকে বললেন, 'ইন্সপেক্টর ঘোষসাহেবকে একবার ডাকো তো।'

দরজায় উঁকি দেওয়া পাহারা অদৃশ্য হল। অশোক জিগ্যেস করল, 'জাহাঙ্গির ওসমানের নাম শুনেছেন?'

'ওহ্ সিওর।' ও. সি. বললেন, 'সে তো একমাসের ওপর ইউ. কে.-তে গেছে।'

অশোক ঘাড় ঝাঁকুনি দিল, 'তা হলে তো মিটেই গেল।'

'দেখুন মশাই, আমি যা বুঝেছি, পারমিতা ভট্টাচার্য ছিল মক্ষীরানি।' ও. সি. বলল, 'এর মধ্যে আবার পেটও বাঁধিয়ে বসেছিল—মানে কনসিভ করেছিল।' ভাষাটা শুধরে নিলেন, 'মেয়ে যে ভালো ছিল না, কোনও সন্দেহ নেই। কম করে তার একডজন বন্ধু আর চেনাশোনা লোককে ইন্টারোগেট করেছি। কোনও ফল পাইনি। এটা পরিষ্কার, আমাদের চেনাজানা ক্রিমিনাল ওয়ার্ল্ডের কাজ এটা নয়। লালবাজারে ডি ডি-ও কিছু পাত্তা করতে পারেননি। ঘরের কেলেঙ্কারি চাপতে গিয়ে বাড়িরই কেউ মেরে বাগানে ফেলে রেখেছিল কি না, কে বলতে পারে? অবিশ্যি সেরকম কোনও প্রমাণও হাতে আসেনি।'

অশোক ফটিকের দিকে ফিরে একবার দৃষ্টিবিনিময় করল। ফটিক বলে উঠল, 'বাড়ির কেউ হলে বাগানের পাঁচিল ডিঙিয়ে আসবে কেন?'

'চোখে ধুলো দেওয়ার জন্যে, আর কেন?' এই প্রথম ও. সি. হাসলেন।

একজন ইন্সপেক্টর ঢুকল। নতুন মুখ, জিগ্যেস করল, 'ডেকেছিলেন নাকি?'

'হ্যাঁ।' ও. সি. বললেন, 'টিটোর বাড়ির ঠিকানা আপনার কাছে আছে তো?'

'হ্যাঁ।'

'এঁদের দিন।'

ইন্সপেক্টর ঘোষ অশোক আর ফটিককে একবার দেখে, পকেট থেকে একটা নোটবই বের করে বলল, 'লিখে নিন। ও বাড়ির ঠিকানা কলকাতার সবাই জানে।' বলে ঠিকানাটা নোটবই থেকে পড়ে গেল।

ফটিক প্রস্তুত ছিল। দ্রুত হাতে লিখতে-লিখতে বলল, 'কোনও টেলিফোন নাম্বার?'

'একটা না, দুটো। লিখে নিন।' ঘোষ দুটো টেলিফোন নাম্বার বলল।

ফটিক লিখে নিল। ও. সি. বললেন, 'ঠিক আছে, আপনি যান।'

ঘোষ বেরিয়ে গেল। অশোক জিগ্যেস করল, 'সুকুমার আর দীপকের সঙ্গে দু-একটা কথা বলতে পারি?'

'নিশ্চয়ই।' ও. সি. বললেন, 'আপনি যাঁর চিঠি নিয়ে এসেছেন, আপনি যা বলবেন, তাই করব। অবিশ্যি আপনার নামটা আমি এক-আধবার শুনেছি। ভেবেছিলাম, আর একটু বয়স্ক, ভারিক্কি চালের লোক হবেন।' তিনি দ্বিতীয়বার হাসলেন, 'দুজনকে একসঙ্গে, না আলাদা?'

অশোক হাসল, 'আলাদা তো বটেই। তবে এ-ঘরে, আপনার সামনে—।'

'আমি এ-ঘর থেকে চলে যাচ্ছি। ও. সি. উঠে দাঁড়ালেন, পিছনের আর একটি ভেজানো দরজার পাল্লা ঠেলে বললেন, 'আমি আগে সুকুমারকে পাঠাচ্ছি, তারপর দীপক আসবে।' তিনি দরজার ভেতরে গিয়ে আবার ভেজিয়ে দিলেন।

অশোক সিগারেট ধরাল, ফটিকের দিকে ফিরে বলল, 'বাড়ির লোকও বাগানের পাঁচিল ডিঙিয়ে আসতে পারে, এটা তোর মাথায় এল না?'

'কেন আসবে না?' ফটিক বলল, 'কিন্তু বাড়ির লোক বাইরে থেকে টেলিফোন করে কে আসতে পারে?'

'টেলিফোন করবে কেন? বাগানে ডেকে নিয়ে যেতে পারে। সম্ভাবনাটা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তবে—।'

ফটিক ভুরু কুঁচকে তাকাল। অশোক হাসল, 'বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে বাগানে যায়নি। খুনির বাগানে আসা-যাওয়া দুয়েরই চিহ্ন রয়েছে। নরেনবাবুর মেজ ছেলে লেবুই তখন একমাত্র বাইরে ছিল। মিতার চালচলনও তার পছন্দ ছিল না, রাগ ছিল। কিন্তু তার অ্যালিবাই খুব জবরদস্ত।'

অশোকের কথা শেষ হওয়ার আগেই একজন সেপাই ঘরের পিছন দিকের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল। তার পিছনে ময়লা ধুতি-পাঞ্জাবি পরা একটি যুবক। মুখে দু-তিন দিনের আকাটা গোঁফ দাড়ি। বুদ্ধিদীপ্ত পরিচ্ছন্ন মুখ এখন বিষণ্ণ, বিমর্ষ, চোখের কোলে কালি। অশোক জিগ্যেস করল, 'সুকুমার মল্লিক?'

যুবক মাথা ঝাঁকাল। অশোক পাশের চেয়ার দেখিয়ে ডেকে বলল, 'আসুন, বসুন এখানে।'

সুকুমার তথাপি দাঁড়িয়ে রইল। অশোক হাসল, 'আমি পুলিশের লোক নই, অবিশ্যি উকিলও নই। তবু আপনার সঙ্গে দু-একটা কথা আছে। আপনার ভালোর জন্যেই বলছি। আসুন।'

সুকুমার অশোকের মুখের দিকে তাকিয়েছিল। একবার ফটিকের দিকে দেখে আস্তে-আস্তে এগিয়ে এসে চেয়ারে বসল। অশোক সেপাইকে বলল, 'আপনি বাইরে যান।'

সেপাই বেরিয়ে গেল। অশোক সুকুমারের দিকে ফিরে বলল, 'আমার নাম অশোক ঠাকুর, মিতার খুনের তদন্ত করছি। এটা প্রাইভেট ইনভেস্টিগেশান, সরকারি নয়।'

'অশোক ঠাকুর মানে—।' সুকুমারের কোলবসা চোখে উৎসুক জিজ্ঞাসা ফুটল, 'বেসরকারি গোয়েন্দা?'

অশোক হাসল, 'বলতে পারেন।'

সুকুমারের চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল, কিন্তু গলাটা যেন আবেগে কেঁপে উঠল, 'আপনি মিতা মার্ডার কেসের দায়িত্ব নিয়েছেন? আমি সত্যিই—কী বলব, বোঝাতে পারছিনে, একটা বড় আশা পাচ্ছি।'

অশোক সিগারেটের প্যাকেট সুকুমারের দিকে এগিয়ে দিল। সুকুমার হেসে বলল, 'আমি স্মোক করিনে।'

'আচ্ছা।' অশোক নিজের সিগারেটে টান দিয়ে বলল, 'পুলিশের মুখে শুনেছি, আপনার অ্যালিবাই পাকা। এখন আমাকে মন খুলে বলুন তো, মিতার খুনের বিষয়ে আপনার কী মনে হয়? কারওকে সন্দেহ করেন?'

সুকুমার মাথা নেড়ে বলল, 'না। এ-কথাটা প্রায় একশোবার বলেছি।'

'কোনও কথা গোপন করবেন না সুকুমারবাবু।' অশোক বলল, 'আপনার সঙ্গে মিতার সম্পর্ক কেমন ছিল? শুধুই বন্ধুত্ব, না তার চেয়ে অনেক বেশি?'

সুকুমার একমুহূর্ত দ্বিধা করল, 'দেখুন অশোকবাবু, মিতাকে আমি ভালোবাসতাম, কিন্তু মুখ ফুটে কোনওদিন কিছু বলতে পারিনি। ও আমাকে হয়তো পছন্দ করত, ভালোবাসত কি না জানিনে।'

'আপনাদের মধ্যে কোনওরকম ফিজিকাল রিলেশন—।'

'কী বলছেন?' সুকুমার অবাক চোখে তাকাল, 'পুলিশ ঠিক এ কথাই আমাকে জিগ্যেস করেছে। আপনিও? বিশ্বাস করুন, ওর গা ঘেঁষে বসতে পারা ছাড়া আর কখনও কিছুই ঘটেনি। একটা চুমোও খাইনি।'

'আচ্ছা, মিতাকে এমন কারওর সঙ্গে মেলামেশা করতে দেখেছেন, যাকে আপনার পছন্দ হত না?' অশোক জিগ্যেস করল।

সুকুমার বলল, 'সে তো আমাদের নিজেদের মধ্যেই মিতাকে নিয়ে একটু রেষারেষি ছিল। তবে হ্যাঁ, টিটো গাঙ্গুলিকে আমার কোনওকালেই পছন্দ হত না।'

'আর জাহাঙ্গির ওসমান?'

'জাহাঙ্গির ঠিক আমার বন্ধু ছিল না।' সুকুমার বলল, 'বড়লোক মুসলমানের ছেলে, আমাদের থেকে বছর তিনেকের সিনিয়র। ওর সঙ্গে কীভাবে মিতার ভাব হয়েছিল, তাও জানিনে। ওকে কয়েকবার দেখেছি, ইউনিভারসিটি থেকে মিতাকে ডেকে নিয়ে যেতে। মিতার মুখে শুনেছিলাম, জাহাঙ্গির বিবাহিত। সেজন্য ওকে নিয়ে খুব মাথাব্যথা ছিল না।'

অশোক হাসল, 'কেন, জাহাঙ্গির বিবাহিত হলেই বা ক্ষতি কী? শরিয়তের অনুমতিক্রমে ও আরও তিনটি বিয়ে করতে পারে, পয়সার অভাব নেই।'

'জাহাঙ্গির তা ভাবতে পারে, মিতা কখনই পারে না।' সুকুমার দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়ল, 'মিতা সে-জাতের মেয়ে ছিল না।'

অশোক একটু গম্ভীর হল, 'আপনি কি জানেন, মিতার কনসেপশান হয়েছিল?'

'কনসেপশান?' সুকুমার যেন সাপের ছোবল খাওয়ার মতো চমকে পাংশু হয়ে উঠল, 'কী বলছেন আপনি? আমি বিশ্বাস করতে পারছিনে!' সে প্রায় আর্তনাদ করে উঠল।

অশোক আস্তে-আস্তে মাথা ঝাঁকাল, 'আপনাকে আমি মিথ্যা কথা বলছিনে। ময়না তদন্তের রিপোর্ট দেখেই বলছি। আপনাকে সে-খবর জানানো হয়নি। তিন মাসের কনসেপশান।'

সুকুমার দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরল। মাথার চুল টানতে লাগল দু-হাতে। হাজতবাসের থেকে এ খবরটা তাকে অনেক বেশি আঘাত করেছে। তবু সে সন্দিগ্ধ চোখে অশোকের দিকে আবার তাকাল, বলে উঠল, 'আমার মাথাটা খারাপ হয়ে যাবে। কনসেপশান। মিতার? তিন মাসের?'

'হ্যাঁ।' অশোক সুকুমারের চোখের দিকে তাকাল, 'কারওকে সন্দেহ হয় আপনার?'

সুকুমারের পাংশু মুখে বিভ্রান্তি ফুটে উঠল, মাথা নেড়ে বলল, 'না। কাকে সন্দেহ করব আমি? টিটোকে সন্দেহ করা যেত, কিন্তু মিতা ওকে পছন্দ করত না বলেই জানি। মেলামেশাও নেই অনেকদিন। জাহাঙ্গির মাসখানেক আগে বিলেত গেছে—কিন্তু না, জাহাঙ্গিরকেও আমার সন্দেহ হয় না। আসলে আমি মিতাকেই চিনতে পারিনি দেখছি।' কথা বলতে-বলতে ওর মুখে গভীর হতাশা আর যন্ত্রণা ফুটে উঠল।

'দীপকবাবু আর আপনাকে কি একই হাজতঘরে রাখা হয়েছে?' অশোক জিগ্যেস করল।

সুকুমার মাথা নাড়ল, 'না, ওকে অ্যারেস্ট করেছে, আমার উকিলের মুখে শুনেছি। আমার সঙ্গে দেখা হয়নি।'

'আপনাকে উকিলের সঙ্গে কথা বলতে দিয়েছে?'

'দিয়েছে।'

'উকিলও আপনাকে মিতার কনসেপশানের কথা বলেননি?'

'না তো!' সুকুমার মাথা নাড়ল।

অশোক বলল, 'আচ্ছা, আপনি এখন যেতে পারেন।'

সুকুমার যেন অশোকের কথার মর্মার্থ সহসা বুঝতে পারল না। তারপর হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'ওহ্, আচ্ছা। কিন্তু আপনাকে জিগ্যেস করছি, এরা আমাকে এভাবে আটকে রেখেছে কেন?'

'ওটা তো পুলিশের ব্যাপার।' অশোক হাসল, 'কী করে বলি বলুন। নিশ্চয়ই সন্দেহ করছে।'

সুকুমার উঠে যেতে-যেতে বলল, 'রাসকেলস।'

অশোক ফটিকের সঙ্গে দৃষ্টিবিনিময় করল। ফটিক ঠোঁট ওলটাল, 'বেচারা।'

'বেচারা?' অশোক হাসল, সিগারেটে টান দিল।

পিছনের দরজা আবার খুলে গেল। ট্রাউজারের ওপর শার্ট, তার ওপরে হাতকাটা সোয়েটার। সবই ময়লা কোঁচকানো, দাড়ি কামানো নেই, গোঁফ জোড়া ছাঁটা হয়নি। দোহারা, চওড়া, শক্ত গঠনের শরীর। ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে সেপাই চলে গেল। অশোক ডাকল, 'আসুন দীপকবাবু, বসুন।'

দীপক ভ্রূকুটি সন্দিগ্ধ চোখে একবার অশোক আর একবার ফটিককে দেখে এগিয়ে এসে চেয়ারে বসল। অশোক বলল, 'আমি মিতার খুনের তদন্ত করছি, তবে—।'

'তবে-টবের আর দরকার কী?' দীপকের রাত-জাগা লাল চোখে বিরক্তি আর রাগ ফুটে উঠল, 'কী জিগ্যেস করবেন করুন। তবে বলে রাখছি, আমার নতুন করে আর বলার কিছু নেই।'

অশোক হাসল, 'কিছু না জিগ্যেস করতেই আপনি—।'

'আরে মশাই, জিগ্যেস আর কী করবেন?' দীপক প্রায় রুখে উঠে বলল, 'এর পরে ভদ্রলোকের ছেলেকে ধরে ঠ্যাঙাবেন, এই তো? তাই করুন। নতুন কথা আমার আর বলার কিছু নেই।'

অশোক ফটিকের দিকে তাকিয়ে একবার হাসল, 'না, নতুন আর কী বলবেন? মিতার খুনের সময়, সন্ধে ছ'টা থেকে রাত্রি প্রায় এগারোটা পর্যন্ত আপনি কোথায় ছিলেন, সবই জানি। জানি, মিতাকে আপনি ভালোবাসতেন, কিন্তু আপনাকে—।'

'না, ভালোবাসাবাসির কথা আমি অনেক আগেই মন থেকে ত্যাগ করেছিলাম।' দীপক বলে উঠল, 'যার সঙ্গে আমার বিয়ে পাকা হয়ে গেছে, তার কথাও আপনাদের বলেছি, একটা চাকরি-বাকরি হলেই সেটা হয়ে যাবে। অন্তত যেত। এখন এই জঘন্য দুর্নামের পরে কী হবে জানিনে। আপনাদের তো বলেই দিয়েছি, মিতা আমাব বন্ধু ছিল, তার বেশি কিছু নয়।'

অশোক আর কথা না বাড়িয়ে মিতার কনসেপশানের কথা বলল। ফল সুকুমারের মতোই। অবিশ্বাস, রক্তহীন অবাক মুখ, আর আর্তস্বর, 'কী বলছেন?'

'মিথ্যে বলিনি।' অশোক হাসল, 'আমি পুলিশের লোকও নই। এটা বেসরকারি তদন্ত। আপনাকে আমি পোস্টমর্টেম রিপোর্ট দেখে বলছি।'

দীপক স্তব্ধ হয়ে গেল, মিনিটখানেক কোনও কথা বলল না। তারপরে আস্তে-আস্তে ওর মুখ শক্ত হয়ে উঠল, 'মিতা যে খুব সহজ মেয়ে ছিল না, তা আমি বুঝেছিলাম। কার সঙ্গে কখন মিশত কোথায় যেত, সব জানতেও পারতাম না। অসম্ভব কিছু নয়।'

'কী অসম্ভব নয়?'

'এই যা আপনি বললেন, কনসেপশান। তাই যদি হয়েছিল, তবে আর খুন হল কেন?'

'হয়েছিল বলেই খুন। খবরটা পেয়েই রাগের মাথায় আপনিও খুন করতে পারেন।'

দীপক হাসল, তীক্ষ্ণ বিদ্রুপের হাসি, 'আপনার যা খুশি তাই বলতে পারেন। আপনাদের তো কোনও কথাই আটকায় না। তবে আমি এ খবরটা জানতাম না। আপনারাও আমাকে বলেননি।'

'কারওকে সন্দেহ করেন?'

দীপক কপালে ভাঁজ ফুটিয়ে মাথা নাড়ল, 'না, এদিকে কার সঙ্গে কনসিভ করে বসে আছে, আর খুনের দিন বিকেলেও আমাকে কত টিজ করে কথা বলেছে।'

'টিজ করে? কেন?'

'আমার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে বলে। যে-মেয়েটির সঙ্গে আমার বিয়ে ঠিক হয়েছে, তাকেও চিনত। তার নাম করে আমাকে টিজ করত। অবিশ্যি ওটা ওর স্বভাব। ও চাইত, সবাই ওকেই ঘিরে থাকবে। অথচ নিজেই কোথায় কী বাধিয়ে বসেছিল। বাজে মেয়ে। ওর কনসেপশান হয়েছে জানলে ওর সঙ্গে আর মিশতামই না।' দীপকের চোখে-মুখে এখন ঘৃণা আর রাগ জ্বলজ্বল করছে। তার পরে হঠাৎ সচকিত হয়ে জিগ্যেস করল, 'আপনি তখন কী বলছিলেন, বেসরকারি তদন্ত? সেটা আবার কী?'

'মিতার দাদা আমাকে আলাদা করে এ খুনের তদন্তের ভার দিয়েছেন।' অশোক বলল, 'আমি পুলিশের লোক নই।'

দীপক ভুরু কুঁচকে তাকাল, 'তার মানে আপনি প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর?'

'বলতে পারেন। আমার নাম অশোক ঠাকুর।'

দীপকের চোখ দেখে বোঝা গেল, সে অশোককে চেনে না, বা নাম শোনেনি। ও টিটো আর জাহাঙ্গিরের কথা জিগ্যেস করল। দীপক বলল, 'আমি মশাই কিছুই বলতে পারিনে। এখন আমার মনে হচ্ছে, মিতার দ্বারা সবই সম্ভব ছিল। ওকে পাওয়ার আশা আমি অনেক আগেই ছেড়ে দিয়েছিলাম। কেননা, আমি বুঝতে পেরেছিলাম, ও আমাকে কোনওদিনই বিয়ে করবে না।'

'আর সুকুমারবাবু? ওঁর তো আশা ছিল।'

'আশা নয়, মিতা ওকে ভুলিয়ে রেখেছিল। সুকুমারটা বোকা, ওকে আমি অনেকদিনই বলেছি।'

'তবু কিন্তু আপনি মিতার খুনের দিনও ওদের বাড়ি গেছলেন?'

'সে তো যেতামই। বাড়ির সকলের সঙ্গেই আমার ভাব ছিল। মিতার সঙ্গেও বন্ধুত্ব ছিল। তবে এখন আপনার মুখে যা শুনলাম, তা যদি আগে জানতাম, আর কখনওই যেতাম না।'

অর্থাৎ, মিতার ওপর দীপকের দুর্বলতা ছিলই, সেটা বলতে পারছে না। অন্যথায়, মিতাকে পাবে না জেনেও বাড়ির লোকের টানে দীপক যেত না। অশোক বলল, 'আচ্ছা দীপকবাবু, আপনি আসুন। আমার আর কিছু জিগ্যেস করার নেই। তবে ঠ্যাঙাড়ে নই, এটা বিশ্বাস হল তো?'

দীপক উঠে দাঁড়াল, একটু হাসল, 'কী করে জানব মশাই? পুলিশ যা কুৎসিত কথাবার্তা বলেছে আর ধমকেছে, মারতেই বাকি রেখেছে। এরা সব পারে।'

অশোক মাথা ঝাঁকিয়ে হাসল। দীপক পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। অশোক ফটিকের দিকে তাকাল। ফটিক বলল, 'মিতার জন্যে উইকনেস ছিল, কিন্তু মনে-মনে রাগও ছিল।'

পিছনের দরজা দিয়ে সেপাই ঢুকল। অশোক জিগ্যেস করল, 'বড়সাহেব আছেন, না বেরিয়ে গেছেন?'

'আছেন, আপনাদের বসতে বলেছেন।' সেপাই বলল।

তার কথা শেষ না হতেই ও. সি. ঢুকলেন, চেয়ারে বসতে-বসতেই বললেন, 'নরেনবাবুর বাড়ির মেডসারভেন্ট মেয়েটা পার্কসার্কাসে ওর মায়ের কাছে যায়নি, এইমাত্র খবর এল।'

'তাই নাকি?' অশোকের ভুরু কুঁচকে উঠল।

ও. সি. বললেন, 'হ্যাঁ, দেখি আবার ছুঁড়িটা কোথায় কেন পালাল। এদের সঙ্গে কথা বলে কী বুঝলেন?'

'বোঝা তো সহজে কিছুই যায় না।' অশোক হাসল, 'তবে অ্যারেস্ট যখন করেছেন, কেস তো দিতেই হবে। ওদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কোর্টে প্রডিউস করে জামিন দিয়ে দিন।'

ও. সি. বললেন, 'আপনি তো মশাই বলে খালাস। খবরের কাগজগুলো তো আবার খোঁচাখুঁচি শুরু করবে।'

'করতে দিন না।' অশোক বলল, 'নতুন তো কিছু নয়। ওদের বাইরে ছেড়ে রেখে একটু নজর রাখুন। কলকাতা ছাড়তে বারণ করুন।'

ও. সি. চিন্তিত মুখে বললেন, 'বলছেন? অবিশ্যি আপনি যখন বলছেন, নিশ্চয় কিছু ভেবেই বলছেন। বেশ তাই করব, কালই কোর্টে প্রডিউস করব। নতুন কিছু জানতে পারলেন?'

'তেমন কিছু না। তবে আপনাকে আর আমি কী বোঝাব বলুন? সন্দেহজনক ব্যক্তিদের ছেড়ে রেখে চোখে-চোখে রাখাই ভালো।'

'সে তো মশাই আপনার কথা। লোকে যে মানতে চায় না। তাদের ধারণা, আমরা ইচ্ছে

করেই অপরাধীদের ধরছি না। অথচ বোঝে না, এসব খুনের অপরাধীরা পুলিশের হাতের বাইরে। চেনাশোনা ক্রিমিনালদের কাজ এসব নয়।'

'সেইজন্যেই বলছি, এক্ষেত্রে সন্দেহজনকদের বাইরে ছেড়ে রেখে নজর রাখুন।'

'ঠিক আছে, আমি সুকুমার আর দীপককে ছেড়ে দিচ্ছি। আপনার জন্যে এখন আর কী করতে পারি বলুন?'

অশোকের মনে হল, একজন পুলিশের অফিসার হিসেবে ও. সি. যথার্থই ভদ্রলোক। বলল, 'আপাতত কিছুই না। পরে দেখা যাবে। আপনার কি মনে হয় টিটো গাঙ্গুলিকে এখন বাড়িতে গিয়ে পাব।'

'ও মশাই শিবের বাবারও বলা অসাধ্য।' ও. সি. বিরক্ত মুখে বললেন, 'বাড়িতে কি কোথায় কোন হোটেল-রেস্তোরাঁয় কোনও মেয়ে নিয়ে বসে আছে, কিছুই বলা যায় না। একবার টেলিফোন করে দেখব?'

অশোক ব্যস্তভাবে বলল, 'না-না, আগে থেকে কিছু খবর নেওয়ার দরকার নেই। আজ উঠি। আপনার সঙ্গে আমার বন্ধুর পরিচয় করিয়ে দিই, অয়স্কান্ত রায়।'

ফটিক ও. সি.-র সঙ্গে নমস্কার বিনিময় করল। ও. সি. হেসে বললেন, 'ব্যোমকেশের অজিতবাবু?'

'আমি লেখক নই।' ফটিক হেসে বলল।

ও. সি. হাসতে-হাসতে উঠে দাঁড়ালেন, 'কথার কথা বললুম।'

অশোক নমস্কার করে ফটিককে নিয়ে থানা থেকে বেরিয়ে এল। ওর মুখে গভীর চিন্তামগ্নতা। হাঁটতে-হাঁটতে সি আই টি রোডে এসে মৌলালির দিকে মোড় নিল। ফটিক জিগ্যেস করল, 'কী হল?'

'পূর্ণিমা একটু ভাবিয়ে তুলল।' অশোক অন্যমনস্ক স্বরে বলল, 'মায়ের কাছে না গিয়ে কোথায় গেল? দেশের বাড়িতে? কেন? এত দূরে যাবে কেন?' বলতে-বলতে হাতের ঘড়ি দেখল। বেলা দেড়টা। ফটিকের দিকে ফিরে জিগ্যেস করল, 'খিদে পেয়েছে?'

'না, নরেনবাবুর বাড়িতে যা খেয়েছি, বেলা তিনটে-চারটে অবধি চলে যাবে।' ফটিক বলল।

অশোক বলল, 'তা হলে চল্‌, একবার টিটো গাঙ্গুলির খোঁজে যাওয়া যাক।'

'চল্‌, তবে পেলে হয়।'

'চান্স নেওয়া যাক।'

সৌভাগ্যক্রমে একটা ট্যাক্সি পাওয়া গেল, যেতেও রাজি হল। দক্ষিণ কলকাতার পশ-এরিয়া বলতে যা বোঝায় সেখানেই ব্যারিস্টার গাঙ্গুলির বাড়ি। খুঁজে পেতে অসুবিধা হল না। নিবিড় গাছপালায় ঘেরা, দুপুরে এলাকাটা একেবারে নিঝুম। ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে গেটের সামনে যেতেই ভেতর থেকে একটা গাড়ি জোরে বেরিয়ে এসে ব্রেক কষে দাঁড়াল। চালক একজন সুপুরুষ যুবক। চোখে ভ্রূকুটি জিজ্ঞাসা।

অশোক এগিয়ে গেল, 'এটা কি ব্যারিস্টার গাঙ্গুলির বাড়ি?'

'হ্যাঁ, কিন্তু উনি তো—।'

'জানি।' অশোক বাধা দিয়ে বলল, 'আপনি বোধহয় টিটোবাবু?'

যুবকের ভ্রূকুটি চোখে সন্দেহ, 'হ্যাঁ, কেন?'

'আমরা আপনার কাছেই এসেছিলাম।'

'কী দরকার?'

'মিতার মার্ডারের—!'

'ধুত্তোরি তোর মিতা মার্ডারের নিকুচি করেছে।' টিটো রীতিমতো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল, 'আমার এখন সময় নেই। কোনও কথাও বলতে পারব না। আপনি কে?'

'পুলিশের লোক নই, প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর।' অশোক ফটিকের দিকে একবার তাকাল, 'এখন কি আপনি খুব ব্যস্ত?'

'হ্যাঁ, আমি একটু বেরোচ্ছি।'

'কখন ফিরবেন?'

'তা বলতে পারছিনে। বেরোচ্ছি, এই পর্যন্ত। ফেরার কোনও ঠিক নেই।' গাড়ির স্টার্ট বন্ধ ছিল না। টিটো গিয়ার তুলে গাড়ি চালাবার উদ্যোগ করলে।

ফটিক বাঁদিকের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে বসে পড়ল। অশোকও ঝটিতি ডানদিকের দরজা খুলে টিটোকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে স্টিয়ারিং-এ হাত দিল। অ্যাকসিলারেটর আর ক্লাচে পা রেখে গাড়ি চালিয়ে দিল। টিটো চিৎকার করে উঠল, 'মানে? কিডন্যাপ করা হচ্ছে আমাকে?'

ফটিক বলল, 'আস্তে কথা বলুন, চেঁচিয়ে কোনও লাভ নেই। আপনাকে কিডন্যাপ করতে আসিনি, আপনিই আমাদের তাড়িয়ে দিতে চাইছেন। কোথায় যাবেন বলুন, আমরাও আপনার সঙ্গে সেখানে যাব।'

'আমি হাইকোর্টে যাব।' টিটো স্বর চড়িয়ে বলল।

অশোক বাঁ-হাতের কনুই দিয়ে টিটোর পাঁজরে খোঁচা মেরে বলল, 'এখন আর হাইকোর্টে বাবার কাছে যেতে হবে না। আসলে কোথায় যাচ্ছিলেন বলুন, সেখানেই যাব। চেঁচাবেন না, প্রাণটার কথা মনে রাখবেন। কোনও হোটেলে-রেস্তোরাঁয় কোনও বান্ধবীর সঙ্গে মিট করার কথা আছে কি? খেয়ে তো বেরোননি বুঝতেই পারছি। চানটান করে বেশ গন্ধ ছড়িয়ে বেরিয়েছেন। বলে ফেলুন তাড়াতাড়ি, আমি কিন্তু গুরুসদয় রোডে ঢুকছি।'

টিটো ঘামতে আরম্ভ করেছে। করবেই। রাস্তার মোড়ে ট্রাফিক পুলিশের দিকে একবার তাকাল। অশোক দ্রুত গাড়ি ঘুরিয়ে স্পিড বাড়িয়ে দিল। টিটো বারেবারে ঘাড় ঘুরিয়ে দুজনকে দেখতে লাগল, আবার বাইরের দিকে। বলল, 'আপনারা কারা? এসব কি প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটরের কাজ? আমার গাড়িতে আমাকেই জোর করে নিয়ে যাচ্ছেন?'

'আপনি একটু ভদ্র ব্যবহার করলেই হত।' ফটিক বলল, 'আমাদের রাস্তার কুকুরের মতো তাড়িয়ে দিচ্ছিলেন। বাধ্য হলাম আপনার গাড়িতে উঠতে।'

'কিন্তু আমি কোনও বান্ধবীর সঙ্গে মিট করতে যাচ্ছি, এ-কথা আপনারা জানলেন কী করে?'

'মন্ত্রগুণে।' অশোক গাড়ির স্পিড কমাল। ট্রাফিকের হাতের বাধা।

টিটো চঞ্চল হয়ে উঠল। মাথা নিচু করে ট্রাফিক পুলিশের দিকে তাকাল। অশোক বাধ্য হয়ে খারাপ রকমের দায়িত্ব নিয়ে ট্রাফিক আইন ভেঙে বাঁদিকে বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে ঢুকে গেল। পিছনে পুলিশের বাঁশি বেজে উঠল। বাজুক, আর কোনও উপায় নেই এখন। টিটো অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল, 'অ্যাকসিডেন্ট করবেন নাকি?'

'সেরকম ইচ্ছে নেই।' অশোক স্পিডোমিটারের কাঁটা দেখল, সেইসঙ্গে ফুয়েলের কাঁটা। অনেক তেল আছে। সোজা রিচি রোডে পড়ে ডানদিকে হাজরা রোডে পড়ল, 'এখনও বলছেন না, কোথায় যাচ্ছিলেন। আমাদের মাত্র দশ মিনিটের কথা আছে।' বলতে-বলতে ল্যান্সডাউনের মোড় ক্রস করে গেল।

'আমি চৌরঙ্গি যাব।' টিটো বলল।

অশোক বলল, 'সে-কথা বললেই পারতেন। মাথা ঠান্ডা রাখুন, ভয়ের কিছু নেই। আপনাকে কিডন্যাপ করছি না, মারধরও করব না। কেবল কয়েকটা কথার জবাব চাই।' ও হাজরার মোড়

ক্রস করে সোজা এগিয়ে ডানদিকে হরিশ মুখার্জি রোড ধরল। জিগ্যেস করল, 'কোনও বান্ধবীকে কোথাও অপেক্ষা করতে বলেছেন?'

'হ্যাঁ।'

'ক'টায় টাইম দিয়েছেন?'

'দুটোয়।'

'একটু দেরি হবে। চলুন, ভিকটোরিয়ার সামনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে ভেতরে বসেই কথা বলব।'

'কেন, আপনারা কি ভাবছেন, আমি মিতাকে খুন করেছি?'

'চেয়েও যখন পাননি, অসম্ভব কী?' অশোক টিটোর ডানহাতের অনামিকার দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করল, 'আপনার আংটির পাথরটা কীসের? ডায়মন্ড?'

'হ্যাঁ।' টিটো হাতটা গুটিয়ে নিল।

অশোক হাসল, 'ভয় নেই, আপনার আংটি ছিনতাই করব না। মিতাকে এমন কী কথা বলেছিলেন, যে রেগে আপনাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল?'

টিটোর অবাক মুখ লাল হয়ে উঠল, 'মানে?'

'মানে আপনিই ভালো জানেন।' অশোক বলল, 'খারাপ কথা কিছু বলেছিলেন।'

'ও কি খুব ভালো মেয়ে ছিল নাকি?' টিটো এই প্রথম ঝেঁজে উঠল।

অশোক স্বস্তিবোধ করল, 'আপনার থেকেও খারাপ কি?'

'নিশ্চয়ই। ওরকম ঢলানো মেয়ে আমি অনেক দেখেছি।'

'ভদ্রভাবে কথা বলুন।' অশোকের দৃষ্টি দূরের রবীন্দ্র সদনের সামনে ট্রাফিক পুলিশের হাতের দিকে, 'সে-হিসেবে আপনি অনেক বেশি বাজে মেয়ের সঙ্গে ঘোরেন, যারা আপনাকে বাঁদর নাচায়। মিতা যদি সেরকম মেয়ে হত, আপনাকেও নাচাত। খারাপ কথায় রেগে গিয়ে তাড়িয়ে দিত না। বলুন, কী বলেছিলেন?'

টিটো চুপ। সৌভাগ্যক্রমে ট্রাফিকের হাত ঘুরে গেল। অশোক সোজা এগিয়ে যাবে ভেবেও গাড়ি বাঁদিকে ঘুরিয়ে দিল।

'এদিকে কোথায় যাচ্ছেন?' টিটো জিগ্যেস করল।

'ভিকটোরিয়ার পেছনে, সামনে যাব না।' অশোক বলল, 'তাড়াতাড়ি জবাব দিন।'

'মিতাকে আমি একটা চুমো খেতে চেয়েছিলাম।' টিটো মুখটা নামিয়ে নিল। ভয়ে এখনও ঘামছে, তবে মনে কিছুটা ভরসাও পেয়েছে।

'মাত্র?' অশোক ফটিকের দিকে তাকিয়ে হাসল। বুঝতে পারল, সেই চুমো খেতে চাওয়ার ভাষাটা নিশ্চয়ই খুব রুচিকর বা নির্ভেজাল ছিল না। কিন্তু সে বিষয়ে আর কিছু জিগ্যেস না করে গাড়ি ঘুরিয়ে ভিকটোরিয়ার পিছনের রাস্তায় ঘুরে গেল।

শীতের দুপুর। ভিকটোরিয়ার ভেতরে তো বটেই, বাইরেও অল্প দু-চারজন রোদে বসে আছে। অশোক প্রায় পাঁচিলের কাছে একপাশে গাড়ি দাঁড় করাল। স্টার্ট বন্ধ করে চাবি খুলে নিজের হাতে রাখল, 'মিতার মার্ডারের দিন আপনি কখন থেকে কখন কোথায় ছিলেন, সে-খবর আমি জানি। কিন্তু ছ'টার আগে কি মিতাকে বাড়িতে টেলিফোন করেছিলেন?'

'আমি?' টিটোর ফরসা লাল মুখে বিস্ময় ও বিভ্রান্তি, 'গত পাঁচ মাসের মধ্যে আমি ওর কোনও খোঁজখবরই রাখিনে। আর আমি টেলিফোন করলে ও তো গালাগালি দিয়ে অপমান করত। তবে—।'

চুপ করে গেল।

অশোক টিটোর মুখের দিকে তাকাল। টিটো বলল, 'তবে কথা না বললেও, মিতাকে আমি কয়েকবার দূর থেকে দেখেছি।'

'কোথায়?'

টিটো চৌরঙ্গির একটা নামকরা হোটেলের নাম করে বলল, 'এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দুপুরের দিকে ওকে কয়েকবার সেখানে ঢুকতে দেখেছি।'

'কে সে?' অশোকের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ।

'চিনিনে।'

'কেমন দেখতে?'

'বেশ ভালো চেহারা, দেখতে সুন্দর, খুব স্মার্ট।'

'বয়েস?'

'আমার থেকে কিছু বেশি মনে হত। দেখে মনে হত মিতার খুব ঘনিষ্ঠ।'

'ঘনিষ্ঠ কেমন করে বুঝলেন?'

টিটো একটু দ্বিধা করে বলল, 'ভদ্রলোক মিতার পিঠে হাত দিয়ে চলতেন—কোমরেও।'

'বানিয়ে বলছেন?'

'অন গড, বিশ্বাস করুন।'

'পুলিশকে বলেছেন?'

'না, পুলিশ আমাকে জিগ্যেস করেনি।'

'আমিও তো জিগ্যেস করিনি।'

'তা করেননি।' টিটো একবার ঢোক গিলল, 'আমার হঠাৎ মনে পড়ে গেল, তাই বললাম, বিশ্বাস করুন।'

'আপনি মিতাকে খুব ঘেন্না করতেন, না?'

টিটো একটু চুপ করে থেকে বলল, 'না, ওকে কখনও ঘেন্না করতাম না। ও-ই আমাকে ঘেন্না করত।'

'সে তো আগের কথা। আজকাল ওকে আপনি ঘেন্না করতেন না?'

টিটো মাথা নাড়ল, 'না আমার মনে খুব কষ্ট হত। ও আমাকে বুঝতে পারেনি।'

অশোক হাসি চাপল, 'আপনার কি কারওকে সন্দেহ হয়, কে মিতাকে মার্ডার করতে পারে?'

টিটো আবার মাথা নাড়ল, 'এটা আমি ভাবতেই পারিনে, কে ওকে খুন করতে পারে?'

'কেন, ও তো খারাপ মেয়ে ছিল?' অশোক চোখের কোণে তাকাল।

টিটো মাথা নিচু করে বলল, 'কলকাতা শহরে খারাপ মেয়ে তো কত আছে, তাদের কি কেউ খুন করতে পারে?'

অশোক এক মুহূর্ত ভাবল, মাথা ঝাঁকাল, 'আচ্ছা, যে-ভদ্রলোকের সঙ্গে মিতাকে চৌরঙ্গি পাড়ার হোটেলে দেখেছেন, তাঁর চেহারার মধ্যে বিশেষ কিছু আছে কি? দেখলেই চেনা যায়?'

টিটো মিনিটখানেক ভাবল, 'বেশ লম্বা চেহারা, হ্যান্ডসাম মনে হয়। চুল উলটে আঁচড়ানো, ফিটফাট সাহেব। চোখে সানগ্লাস ছাড়া দেখিনি। মনে হয় বেশ বড়লোক কেউ হবে।'

'হুঁ।' অশোক গম্ভীর হল, 'মিতার সঙ্গে ঝগড়ার আগে, ওকে আপনি কখনও কিছু প্রেজেন্ট করেছেন? এই যেমন আপনার আংটির হিরের মতো কিছু?'

টিটো মাথা নাড়ল। 'না। অন্য প্রেজেন্ট দিতে চেয়েছি, ও কখনও কিছু নিতে চায়নি।'

'আপনি ওদের বাড়ির মেডসারভেন্ট পূর্ণিমাকে চেনেন?' অশোকের দৃষ্টি অপলক।

'মেডসারভেন্ট পূর্ণিমা? না, আমি মনেই করতে পারছি না। মেডসারভেন্টকে আমি চিনতে যাব কেন?' অবাক চোখে তাকাল।

'এমনি জিগ্যেস করলাম।' অশোক হাসল, 'বেশ, এবার আমার কথাটি ফুরোল, নটে গাছটিও মুড়োল।' ও ইগনিশনে চাবি ঢুকিয়ে গাড়ি স্টার্ট করে ব্যাক করল, ডাইনে ঘোরাল। 'আপনার অনেক

দেরি হয়ে গেছে। চলে যান। আপনার বাবা সব শুনে নিশ্চয়ই পুলিশের কাছে আমাদের খোঁজখবর করবে, তবে লাভ হবে না কিছু। খালি মনে রাখবেন, দরকার হলেই আপনাকে আমি ঠিক সুবিধেমতো জায়গায় খুঁজে বের করে নেব।' সার্কুলার রোডের মুখে গাড়ি দাঁড় করিয়ে স্টার্ট-করা অবস্থাতেই নেমে পড়ল।

ফটিকও নামল। টিটো যেন এখনও আকাশ-থেকে-পড়া ভয়ের চোখে দুদিকে দুজনকে দেখে, বাঁদিকে গাড়ি ঘুরিয়ে নিল। অশোক দাঁড়িয়ে দেখল, টিটো রবীন্দ্রসদনের সামনে ট্রাফিক পুলিশের কাছে দাঁড়ায় কি না। না। দাঁড়াল না, বাঁয়ে দ্রুত ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেল। আলিপুরের দিকে একটা খালি ট্যাক্সি যেতে দেখে অশোক হাত তুলল। ট্যাক্সিটা দাঁড়িয়ে গেল। ফটিককে নিয়ে রাস্তা পেরিয়ে ট্যাক্সিতে উঠে বলল, 'গঙ্গার ধারে চলুন।' বলে আসনে আধশোয়া হয়ে গা এলিয়ে দিল।

'খুব স্ট্রেন গেল।' ফটিক বলল।

অশোক বলল, 'তার থেকে বেশি টেনশন। টিটোর ব্যারিস্টার বাপ ব্যাপারটা নিয়ে জলঘোলা করবে। তা করুক, তবে নীপা ঠিকই বলেছিল, একটি মাকাল ফল।'

'গঙ্গার ধারে গিয়ে কী করবি?' ফটিক জিগ্যেস করল।

অশোক চোখ বুজে বলল, 'চুপচাপ বসে একটু রোদ পোয়াব।'

অশোককে দেখে মনে হচ্ছিল, গঙ্গার ধারের বেঞ্চিতে শুয়ে বুঝি ঘুমিয়েই পড়েছে। ফটিক হাতের ঘড়ি দেখল, ডাকল, 'অশোক, সাড়ে তিনটে বাজে।'

'খিদে পেয়েছে?'

'তা একটু পেয়েছে। কিন্তু এখানে এভাবে কতক্ষণ কাটাবি?'

'কত বললি? সাড়ে তিনটে?' অশোক লাফ দিয়ে উঠল, 'চারটের সময় কাঞ্চন বউদি টেলিফোনেব সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে। ইস, একদম ভুলে গেছি। পূর্ণিমা মেয়েটাই কেমন গোলমাল করে দিয়েছে। চল তাড়াতাড়ি। আগে একটা টেলিফোন করি।'

'শালা।' ফটিক উঠে অশোকের সঙ্গে চলতে-চলতে বলল, 'আমার খিদে, পূর্ণিমার চিন্তা, সবকিছুর ওপরে বউদি টেলিফোনের সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে, তাই বড় তাড়া।'

অশোক একটা সিগারেট ধরিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়াল। শীতের বিকেলের ভিড় জমতে শুরু করেছে। একটা ট্যাক্সি পেতে অসুবিধা হল না। ফটিককে নিয়ে ট্যাক্সিতে উঠে অশোক ড্রাইভারকে বলল, 'লালবাজার।'

'এখন লালবাজারে?' ফটিক অবাক চোখে তাকাল।

অশোক বলল, 'ডি. সি. ডি ডি.-র চিঠিটা দিতে হবে। ফরেনসিক রিপোর্ট এসেছে কি না, সেটা জানা দরকার। তা ছাড়া, এখন একমাত্র সেখান থেকেই বাড়িতে টেলিফোন করা যাবে। কিন্তু—।'

ফটিক ভুরু কুঁচকে তাকাল। অশোক আবার অন্যমনস্ক। 'পূর্ণিমাটা কোথায় গেল? আগে যা ভেবেছিলাম, তার মধ্যে একটা যেন খটকা লাগছে। দেখি ফটিক, হিরেটা দেখি।'

ফটিক ট্রাউজারের পকেট থেকে পার্স বের করল। তার ভেতর থেকে বের করল একটি কাগজের মোড়ক। খুলে হিরেটা দেখল। অশোক হাতে নিয়ে হিরেটা দেখল, 'প্রায় টিটোর আঙুলের আংটির হিরের মতোই সাইজ।'

'না, এটা তার থেকে অন্তত এক-দু রতি বড়।' ফটিক বলল, 'কিন্তু এর সঙ্গে পূর্ণিমার কোনও সম্পর্ক আছে নাকি?'

অশোক ফটিকের হাতে হিরে ফিরিয়ে দিয়ে বলল, 'বুঝতে পারছি না। আমি যা ভেবেছিলাম,

তাতে পূর্ণিমার মায়ের কাছেই যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, ও বোধহয় মথুরাকেও মিথ্যে কথা বলেছে। অবিশ্যি এসবই আমার অনুমান।'

ফটিক তাকিয়ে রইল অশোকের মুখের দিকে। অশোক কোনও কথা বলল না। ফটিকও কিছু জিগ্যেস করল না। ও জানে, অশোক এখন চিন্তার গভীরে ডুবসাঁতার কাটছে। কিছু জিগোস করে লাভ নেই, উচিতও না। ওদের দুজনের মধ্যে এই জানাজানিটা ভালোই আছে।

ট্যাক্সি লালবাজারের সামনে দাঁড়াল। অশোক ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে ভেতরে ঢুকে পুবদিকে গেল। ফটিককে নিয়ে দোতলায় উঠে ডি. সি. ডি. ডি.-র ঘরের সামনে সেন্ট্রিকে জিগ্যেস করল, 'সাহেব আছেন?'

'আছেন।'

অশোক পকেট থেকে এস. এস. পি. ডি. ডি. ওয়েস্ট বেঙ্গল-এর সিলকরা খামটা সেন্ট্রির হাতে দিয়ে বলল, 'জরুরি চিঠি, সাহেবকে দিতে হবে।'

সেন্ট্রি চিঠি নিয়ে ভেতরে গেল। অশোক কবজি তুলে ঘড়ি দেখল। চারটে বাজতে দশ। বলল, 'মিঃ ভট্টাচার্য একলা থাকলেই ভালো। অন্য লোক থাকলে অসুবিধে।'

সেন্ট্রি বেরিয়ে এসে বলল, 'ভেতরে যান।'

অশোক ফটিককে নিয়ে ভেতরে ঢুকল। ডি. সি. ডি. ডি. জি. এল. ভট্টাচার্য চেয়ারে ছিলেন। সামনের চেয়ারে আরও দুজন। মিঃ ভট্টাচার্য অশোক আর ফটিক দুজনের দিকেই তাকালেন। অর্থাৎ, কেউ কারোর চেনা না। অশোক বলল, 'আমার নাম অশোক ঠাকুর।'

মিঃ ভট্টাচার্য দাঁড়িয়ে অশোকের দিকে ডান হাত বাড়িয়ে দিলেন। অশোক হাত বাড়িয়ে হাত মেলাল। ফটিককে দেখিয়ে বলল, 'আমার বন্ধু অয়স্কান্ত রায়।'

মিঃ ভট্টাচার্য মাথা ঝাঁকিয়ে হাত বাড়ালেন, ফটিকের সঙ্গে হাত মিলিয়ে অশোককে পাশের দুটো চেয়ার দেখিয়ে নিজের হাতের ঘড়ি দেখলেন। সামনের দুজনকে বললেন, 'আপনারা কাল সকালে আসুন। আমি একটু এঁদের সঙ্গে কথা বলব।'

দুজনেই ওঠবার উদ্যোগ করতে অশোক বলল, 'আমি আগে একটা টেলিফোন করতে চাই। আপনি ততক্ষণ এঁদের সঙ্গে কথা বলতে পারেন।'

'এই টেবিলে কথা বলবেন, না অন্য টেলিফোন থেকে?' মিঃ ভট্টাচার্য জিগ্যেস করলেন।

অশোক বলল, 'অন্য টেলিফোন পেলেই সুবিধে হয়।'

মিঃ ভট্টাচার্য বাঁ-পাশের একটি দরজা দেখিয়ে বললেন, 'ও-ঘরে যান, ডাইরেক্ট লাইনের টেলিফোনই আছে।'

'ধন্যবাদ।' অশোক ফটিকের দিকে একবার তাকিয়ে পাশের ঘরে গেল। ফাঁকা ঘর। চেয়ার-টেবিলের তেমন কোনও জাঁকজমক নেই। ঘরের উত্তর দিকে আর-একটি দরজা রয়েছে। বন্ধ দরজা। অশোক টেলিফোনের রিসিভার তুলে তিনটি নাম্বার ডায়াল করল। ওপারে রিংয়ের শব্দ। লালবাজার বলেই বোধহয় মহিলার স্বর পাওয়া গেল তাড়াতাড়ি। অশোক নাম্বারটা বলল। সঙ্গে জুড়ে দিল, 'আর্জেন্ট।'

রিসিভার নামিয়ে দিয়ে চেয়ারে বসল। মাথায় আবার পূর্ণিমার ভাবনাটা চেপে এল। ওর অনুমান অনুযায়ী যদি পূর্ণিমা পালাত, তাহলে মায়ের কাছে ছাড়া আর কোথাও যাওয়ার কথা ভাবা একটু অসুবিধে। দেশের বাড়িতেও যদি গিয়ে থাকে বা থাকত, মাকে না জানিয়ে যেত না। মথুরাকে বলবার সুযোগ হয়তো পাওয়া সম্ভব ছিল না। ভয় জিনিসটা বুদ্ধিকে নষ্ট করে, বিভ্রান্ত করে, সাময়িকভাবে পাগল করে দিতে পারে। কিন্তু পূর্ণিমা মথুরার সঙ্গে প্রেমশয়নে ছিল, এ কথাটা স্বীকার করার ভয়েই পালাল? তা যদি না হয়, তাহলে মথুরাকেও ও নিশ্চয়ই কোনও কথা চেপে গেছে।

আর তা যদি হয়, এই পালানোর ফল মেয়েটার পক্ষে ভালো-মন্দ দুই-ই হতে পারে। মন্দটা যদি হয় তা—।'

ভাবনা থমকে দিয়ে টেলিফোন বেজে উঠল। রিসিভার তুলে ও কিছু বলবার আগেই ওপার থেকে কাঞ্চনের চেনা স্বর ভেসে এল, 'হ্যালো।'

'দু-মিনিট এখনও বাকি।' অশোকের চোখ হাতের ঘড়ির দিকে, 'ভাবছিলাম, এখনও দিবানিদ্রা ভেঙেছে কি না।'

কাঞ্চনের সরোষ স্বর ভেসে এল, 'ন্যাকামি কোরো না, ভালোই জানো, আমি দিবানিদ্রা দিই না।'

'হাতের সামনে অনেক জম্পেশ করা গল্পের বই থাকে।' অশোক হাসল।

কাঞ্চনের বিরক্তিভরা স্বর ভেসে এল, 'ছেড়ে দেব লাইন?'

'প্লিজ।'

'বলো কী করতে হবে।' কাঞ্চনের স্বরে কিছু শোনার প্রত্যাশা।

অশোক বলল, 'খুব ভেঙে কিছু বলা যাবে না। তবে আছি অগাধ জলে, কোনও পথ পাচ্ছিনে। বাগানে, মানে যেখানে—বুঝতে পারছ?'

'পারছি।' কাঞ্চনের জবাব শোনা গেল।

'একটি হিরে পাওয়া গেছে।'

'শুধু হিরে, না হিরের গয়না?'

'শুধু হিরে, খাঁটি।'

'মেয়েদের অলংকারের, না পুরুষদের আংটির?'

'সেটা তো জানিনে, তবে ধরে নিয়েছি, পুরুষের আংটির।'

'বোধহয় ঠিকই ধরেছ।'

'বাড়িতে প্রথমে জেরা রাঁধুনি যুবককে। যুবতী ঝি আছে, বুঝলে তো? কিন্তু মেয়েটা হঠাৎ পালিয়েছে, জেরার আগেই।'

'এ সাতদিনে তো পালায়নি, তবে?'

'সেটাই তো বুঝতে পারছিনে। কোনও সর্বনাশ বাধিয়ে বসল কি না কে জানে।'

কাঞ্চনের কোনও স্বর শোনা গেল না। অশোক ব্যস্ত হয়ে উঠল, 'কী হল?'

'ভাবছি, সর্বনাশ যদি হয়, তাহলে এর মধ্যেই ঘটে গেছে কি না।' কাঞ্চনের স্বর শোনা গেল, 'বাড়ির লোকদের কেমন বুঝলে?'

'মোটিভ বোঝা যাচ্ছে না। থানায় সেই দুটো ছেলেকে ছেড়ে দিতে বলেছি। এখনও পর্যন্ত তেমন কারওকে পাইনি, কেবল একজনকে খুঁজে নিতে হবে।' ও টিটোর মুখে শোনা মিতার আর-এক সঙ্গী, চৌরঙ্গির হোটেলে যার সঙ্গে দেখা গিয়েছিল, তার কথা বলল।

কাঞ্চন সব শুনল, তারপরে বলল, 'হিরের মালিককে খুঁজে বের করো। আর আমার তো একটাই কথা, যে চেয়ে পায়নি অথবা যে পেয়েও চায়নি, এদের মধ্যে কেউ। তার মধ্যে একটি কথা, যে পেয়েও চায়নি, তার সংখ্যা একের বেশি হওয়া উচিত না। চেয়ে না পাওয়ার সংখ্যা অনেক বেশি, তাই নয় কি?'

'লক্ষ্মীটি, এ জন্যেই তোমার সঙ্গে কথা না বললে চলে না।' অশোক বলল।

কাঞ্চনের স্বর, 'ন্যাকামো কোরো না। আজ কি বাড়ি ফেরা হচ্ছে?'

'বুঝতে পারছি না। লালবাজার থেকে টেলিফোন করছি।' অশোক বলল, 'না ফিরলে, চিন্তা কোরো না।'

কাঞ্চনের স্বর, 'চিন্তা করব কি না করব, সেটা তোমার না বললেও চলবে। পূর্ণিমার খোঁজ

করো, আর সেই চৌবঙ্গির হোটেলের সঙ্গী স্মার্ট ভদ্রলোকটিকে। জানো না তো, তোমাদের ওই মিতার মতো মেয়েকে নোয়াতে হলে একটু বয়েস আর এক্সপার্ট না হলে সম্ভব নয়। ছাড়লাম।'

কাঞ্চন সত্যি-সত্যি লাইন কেটে দিল। অশোক রিসিভারটার দিকে একবার দেখে, সেটা নামিয়ে রাখল। অর্পিতার 'ওভার পাওয়ার', 'সিডিউস' কথাগুলো মনে পড়ে গেল। ঘর থেকে বেরিয়ে এল। মিঃ ভট্টাচার্য সিগারেট টানছেন। অশোক সামনে এসে বসল, 'ফরেনসিক রিপোর্ট কিছু পেলেন?'

'এখনও পাইনি, দু-একদিনের মধ্যে পেয়ে যাব।' মিঃ ভট্টাচার্য জবাব দিলেন, 'কিন্তু এগোনো যাচ্ছে না, এটা বুঝতে পারছি। সাতদিনে অনেককে অনেকবার জেরা করা হয়েছে, তা থেকে বেরিয়ে আসছে না কিছুই।'

অশোক মাথা ঝাঁকাল। 'সেসব শুনেছি। আমি ফরেনসিক রিপোর্টের জন্যেই এসেছিলাম।'

'সেটা আমাদের ক্রিমিনালের সম্পর্কে ডিটারমিনেশনের সুবিধে করে দেবে নিশ্চয়।' মিঃ ভট্টাচার্য বললেন, 'কিন্তু খুনির কোনও জিনিসই পাওয়া যায়নি। মনে হচ্ছে, দুর্দান্ত মাস্টাবমাইন্ডের কাজ, একেবারে ডুব দিয়ে বসে আছে।'

অশোক হাসল, 'কিন্তু বোধহয় পেশাদার খুনি নয়।'

'জোর করে কিছুই বলা যায় না, মিঃ ঠাকুর।' মিঃ ভট্টাচার্য বললেন, 'এ-কথা তো জোর দিয়ে বলতে পারিনে, আমরা সবরকমের পেশাদার ক্রিমিনালদের চিনি।'

অশোক মাথা ঝাঁকাল, বলল, 'আমি আর-একটা টেলিফোন করতে পারি?'

'একটা কেন, একশোটা করুন না।' মিঃ ভট্টাচার্য হাসলেন, 'পাশের ঘরে যাবেন?'

অশোক বলল, 'না এখান থেকেই করতে পারি।'

মিঃ ভট্টাচার্য তাঁর টেবিলের একটা টেলিফোন অশোকের দিকে এগিয়ে দিলেন। অশোক রিসিভার তুলে ডায়াল করল। প্রায় আধমিনিট পরে ওপার থেকে জবাব এল, 'হ্যালো?'

'নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য আছেন?'

'আছেন, ধরুন।' অর্পিতার স্বর চিনতে ভুল হল না, 'কোনও নাম বলতে হবে কি?'

'আমি অশোক ঠাকুর বলছি। শুনুন, আপনার দাদাকে না হলেও হবে, পূর্ণিমার কোনও খবর মিলেছে কি?'

ওপার থেকে অর্পিতার হাসি শোনা গেল, 'আমার গলাটা চিনে ফেলেছেন দেখছি। না, মেয়েটার তো কোনও খবর পাওয়া যায়নি। ওর মা এসে এখন আমাদের বাড়িতে কান্নাকাটি করছে। দেশের বাড়িতেও লোক পাঠানো হয়েছে।'

'ঠিক আছে। নরেনবাবুকে আর দরকার নেই।' অশোক বলল, 'মেয়েটার খবরের জন্যেই টেলিফোন করেছিলাম। ওর মা কী বলছে?'

অর্পিতার স্বর শোনা গেল, 'ওর মা-তো কেবল মথুরাকেই বকছে। পুনির মায়ের ধারণা, মথুরাই একমাত্র জানে, ওর মেয়ে কোথায় গেছে।'

'হুঁ, আচ্ছা অর্পিতা দেবী ছাড়ছি।' অশোক রিসিভার নামিয়ে রাখল।

মিঃ ভট্টাচার্য বললেন, 'আপনি খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছেন দেখছি?'

অশোক পূর্ণিমার পরিচয় ও পালানোর ঘটনার কথা জানিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, ব্যাপারটাকে প্রথমে তেমন মূল্য দিইনি। এখন ক্রমেই কেমন যেন একটা অশুভ ইঙ্গিত পাচ্ছি।'

'কীরকম?' মিঃ ভট্টাচার্যের ভুরু কুঁচকে উঠল।

অশোক বলল, 'মেয়েটা বেঁচে আছে কি না, সেটাই ভাবছি।'

'ইউ মিন, অ্যানাদার মার্ডার?' মিঃ ভট্টাচার্যের ভুরু কুঁচকে উঠল, 'কখন পালিয়েছে বলুন তো?'

অশোক বলল, 'তা প্রায় এগারোটা নাগাদ।'

মিঃ ভট্টাচার্য হাতের ঘড়ি দেখে বললেন, 'এখন চারটে বারো মিনিট। আচ্ছা, আমি একটু খোঁজ নিচ্ছি।'

তিনি আর-একটা টেলিফোনে ডায়াল করে একটা এক্সটেনশন নাম্বার চাইলেন। কয়েক সেকেন্ড পরে বললেন, 'অধিকারী বলছ? আমি গৌরদা, একটা খবর চাইছি। সকাল এগারোটা থেকে, এনি নিউজ অফ সাম ডেডলি অ্যাকসিডেন্ট অর ডেলিবারেট মার্ডার অব এ ইয়ং গার্ল?..বয়েস?...এলাকা?... এক সেকেন্ড ধরো।' তিনি অশোকের দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন।

'কালো, স্বাস্থ্যবতী, বয়েস কুড়ি-একুশ, অনুমান করা গেছল এন্টালি এলাকা থেকে পার্কসার্কাসে তার মায়ের বাড়ি যাবে।'

মিঃ ভট্টাচার্য টেলিফোনে অশোকের কথাগুলো হুবহু বলে গেলেন। তারপর মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, 'হুঁ—হুঁ—বুঝেছি। না, শ্যামপুর থানা এলাকাটা বোধহয় আসছে না। কড়েয়া থানা—হ্যাঁ, ডেডবডি কি এখন কড়েয়া থানাতেই আছে? হুঁ, থ্যাংক্যু ভাই, ছাড়ছি।' রিসিভার নামিয়ে দিয়ে বললেন, 'বন্ডেল ব্রিজের কাছে একটি মেয়ের ডেডবডি পাওয়া গেছে। গলায় ফাঁস দিয়ে মারা হয়েছে, চেহারার বর্ণনাটা আপনার বর্ণনার সঙ্গে অনেকটা মিলে যায়। ডেডবডি এখনও থানায় আছে।'

অশোকের মুখ এই প্রথম পাংশু হয়ে উঠল, হতাশায় মাথা নেড়ে বলল, 'যদি পূর্ণিমা হয়, তাহলে আমার নিজেকে ক্ষমা করা অসম্ভব। মিঃ ভট্টাচার্য, আমি একটু কড়েয়া থানায় যেতে চাই। আপনি যদি একটু ব্যবস্থা করে দেন, ডেডবডিটা যেন না সরায়, আর আমাকে যেন একটু দেখতে দেওয়া হয়।'

'নিশ্চয়ই।' মিঃ ভট্টাচার্য ডাইরেক্ট লাইনের টেলিফোনের রিসিভার তুলে ডায়াল করলেন, 'এনগেজড।' বলেও বারেবারে করে যেতে লাগলেন, প্রায় পাঁচ মিনিট পরে পেয়ে গেলেন, বললেন, 'আমি লালবাজার থেকে জি. এল. ভট্টাচার্য বলছি। বন্ডেল ব্রিজের কাছ থেকে একটি...হ্যাঁ, এখনও থানায় আছে তো?...ঠিক আছে, অশোক ঠাকুর নামে এক ভদ্রলোক যাচ্ছেন। এস. এস. পি. ডি. ডি -র একটা চিঠি ওঁর কাছে আছে। আমিও একটা চিঠি দিয়ে দিচ্ছি।...অ্যাঁ—? এক মিনিট।' অশোকের দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করলেন, 'আপনি কেবল ডেডবডিটাই দেখবেন তো?'

অশোক ঘাড় ঝাঁকাল। ও তখন হাতের নখ দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে চলেছে। মিঃ ভট্টাচার্য টেলিফোনে বললেন, 'হ্যাঁ, খালি দেখবেন, ফর আইডেন্টিফিকেশন ওনলি। উনি এন্টালি থানার পারমিতা ভট্টাচার্যের মার্ডারের তদন্ত করছেন।...আমার চিঠি লাগবে না? বেশ, তাহলে উনি যাচ্ছেন। থ্যাংক্যু ভাই।' রিসিভার নামিয়ে রেখে বললেন, 'আপনাকে কোনও কাগজপত্র দেখাতে হবে না, আপনার নামটা বললেই হবে। ওরা আপনাকে ডেডবডি দেখতে দেবে, কিছু জানতে চাইলে তাও বলবে।'

অশোক উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে দিল, 'অনেক ধন্যবাদ, মিঃ ভট্টাচার্য।'

'নো মেনশন প্লিজ।' মিঃ ভট্টাচার্য অশোকের সঙ্গে হাত মেলালেন, 'ইট্স মাই ডিউটি। সেরকম কিছু ঘটলে জানতে পারব আশা করি।'

অশোক ততক্ষণে ফিরে দাঁড়িয়েছে, 'নিশ্চয়ই।'

ফটিক কোনওরকমে মিঃ ভট্টাচার্যের সঙ্গে হাত মিলিয়ে অশোকের পিছন-পিছন সিঁড়ি দিয়ে নেমে একেবারে থানার বাইরে চলে এল। ছুটির সময়, একটা ট্যাক্সি পাওয়ার উপায় নেই। বিশেষ করে এই অফিসপাড়ায়। অশোক উচ্চারণ করল, 'মুশকিল!' বলেই আবার থানায় ঢুকে পুব দিকের বিল্ডিং-এ সিঁড়ি ভেঙে মিঃ ভট্টাচার্যের ঘরের সামনে এল। সেন্ট্রিকে বলল, 'একটা জিনিস ফেলে গেছি।'

'চলে যান, সাহেব একলাই আছেন।' সেন্ট্রি বলল।

অশোক ভেতরে ঢুকল। মিঃ ভট্টাচার্য তখন টেলিফোনে কথা বলছিলেন। অশোককে দেখে টেলিফোনে বললেন, 'এক মিনিট।' তাকালেন জিজ্ঞাসু চোখে, 'কী হল, মিঃ ঠাকুর?'

'আপনার একটা সাহায্য চাই।' অশোক ব্যস্ত স্বরে বলল, 'এখন কোনও ট্যাক্সি পাওয়া সম্ভব নয়। শীতের দিন, অন্ধকার হয়ে আসছে। কড়েয়া থানা যাওয়ার জন্য কি আপনি কোনও ভেহিকেল্স-এর ব্যবস্থা করে দিতে পারেন। উপায় থাকলে বলতাম না।'

মিঃ ভট্টাচার্য কয়েক সেকেন্ড ভাবলেন, কলিংবেল টিপলেন। সেন্ট্রি ঢুকল। তাকে বললেন, 'প্রতাপকে বলো, টু সিকস ফাইভ ফোর গাড়িতে এ সাহেবকে কড়েয়া থানায় পৌঁছে দিতে।'

'জি।' সেন্ট্রি ফিরল।

অশোক কোনওরকমে মিঃ ভট্টাচার্যকে একবার হাত তুলে দেখিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল।

অশোক ফটিককে নিয়ে যখন কড়েয়া থানায় পৌঁছল, তখন বলতে গেলে রাত্রি। রাস্তায়-থানায় সর্বত্রই আলো জ্বলছে। গাড়ি থানায় ঢুকে পড়ল। অশোক ফটিককে নিয়ে নেমে ড্রাইভারকে বলল, 'আপনি চলে যান।'

থানার গেটের পাহারা লালবাজারের গাড়ি দেখে কোনওরকম বাধা দিল না। অশোক থানার বাঁদিকেব ঘরে ঢুকে দেখল, একজন ইন্সপেক্টর টেবিলের ধারে চেয়ারে বসে আছেন। তাঁর চারপাশে আরও কয়েকজন বসে রয়েছে। অন্য পাশে একদল বিভিন্ন পোশাকের লোক দাঁড়িয়ে। তাদের কাছে একজন রাইফেলধারী সেপাই। অশোককে দেখে ইন্সপেক্টর চোখ তুলে তাকালেন। অশোক নিজের নাম বলল।

ইন্সপেক্টর মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, 'বুঝেছি।' চিৎকার করে ডাকলেন, 'পরশুরাম!'

বাইরে থেকে জবাব এল, 'হাঁ জি।'

'একবার এদিকে এসো।'

তাঁর কথা শেষ হওয়ার আগেই ধুতি-পাঞ্জাবি পরা শক্তসমর্থ চেহারার একজন লম্বা-চওড়া পুরুষ ঢুকল। ইন্সপেক্টব বললেন, 'এ ভদ্রলোককে বন্ডেল ব্রিজের সেই মেয়েটার মুর্দাটা একবার দেখিয়ে দাও তো।' অশোককে বললেন, 'দেখে এসে, কোনও কথা থাকলে আমাকে বলবেন।'

'আচ্ছা।' অশোক পরশুরাম নামের ধুতি-পাঞ্জাবি পরা জোয়ানের দিকে ফিরে তাকাল।

পরশুরাম বাংলায় বলল, 'আসুন।'

সে ঘরের বাইরে বেরিয়ে বারান্দার উত্তর দিকে এগিয়ে যেতে-যেতে ডাকল, 'হরিয়া, এ হরিয়া।'

'হাঁ।' উত্তর দিক থেকেই জবাব এল।

বারান্দার শেষপ্রান্তে আলো জ্বলছিল। একটি দলাপাকানো বড় রক্তাক্ত পুঁটলি ছাড়া আর একটি শায়িত মূর্তি কাপড় দিয়ে ঢাকা ছিল। পরনে হাফ প্যান্ট, গায়ে একটা সামান্য জামা, একটি লোক বারান্দার নীচে থেকে উঠে এল। পরশুরাম হুকুম দিল, 'ওই মুর্দাটার মুখের ঢাকাটা খোল।'

অশোকের বুক ঢিপঢিপ করছিল। হরিয়া মুখের ঢাকনা খুলল। পূর্ণিমা! দেখা মাত্র বাঁ হাতের পুরোটাই প্রায় ওর মুখের মধ্যে ঢুকে গেল, আবার তৎক্ষণাৎ বের করে নিল। আরও কাছে গিয়ে ঝুঁকে পড়ল। গলায় নাইলনের সরু দড়ির ফাঁস। মুখটা হাঁ-করা, জিভটা ভেতরে দলা পাকিয়ে রয়েছে। ভেতরে রক্তও জমাট বেঁধে আছে। চোখ দুটো আধবোজা। গলায় রুপোর হার চিকচিক করছে। ও হরিয়ার দিকে ফিরে বলল, 'আর একটু খোলো তো ভাই।'

হরিয়া পূর্ণিমার কোমর অবধি ঢাকনা খুলে দিল। অশোক আরও ঝুঁকে পড়ল। জামাটা ঘাড়ের কাছে ছিঁড়ে গেছে। বুকের বোতামও দুটো খোলা। ভেতরে কোনও অন্তর্বাস নেই। বাঁ-হাতে কয়েক গাছা পিতলের চুড়ি। নাকছাবিটার কাছে রক্ত জমে আছে। ওপরের ঠোঁট থ্যাঁতলানো। ঘুষি মারা হয়েছিল। অশোক একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'দুর্ভাগা মেয়ে, যমের ডাক এড়াতে পারেনি।'

'আপনার নিজের লোক আছে?' পরশুরাম জিগ্যেস করল।

অশোক এখন যেন শান্ত আর নিরেট, 'নিজের লোক নয়, চেনা। কখন পাওয়া গেল?'

'তিন বাজে এখানে আনা হয়েছে।' পরশুরাম জবাব দিল।

অশোক বলল, 'ঠিক আছে, আমার দেখা হয়ে গেছে।'

হরিয়া পূর্ণিমাকে মাথা অবধি আবার ঢাকা দিয়ে দিল। অশোক ফটিককে নিয়ে অফিসে ঢুকল। ইন্সপেক্টর চোখ তুললেন, 'চিনতে পারলেন?'

'পারলাম।' অশোক বলল, 'এন্টালির পারমিতা ভট্টাচার্যের মার্ডারের সঙ্গে এর বোধহয় যোগ আছে। কখন পেলেন?'

ইন্সপেক্টর বললেন, 'বেলা একটা নাগাদ আমাদের এক ইনফর্মার এসে খবর দেয়। এই যে সব দেখছেন, এদের ওই এলাকা থেকেই ধরে নিয়ে এসেছি। কিছু জানা যায় কি না।' বলে ঘরের পাশে সেই একদল লোককে দেখালেন, 'মেয়েটাকে চিনতে পারলেন?'

'হ্যাঁ, পারমিতাদের বাড়িরই মেডসারভেন্ট। এগারোটা নাগাদ বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছিল। কিন্তু আপনাকে আর ব্যস্ত করব না, আমার কাজ মিটে গেছে। চলি।' কপালে হাত তুলে নমস্কার জানাল।

ইন্সপেক্টর হাসলেন, 'ব্যস, মিটে গেল? আর কোনও দরকার নেই?'

অশোক একবার ভাবল, লোকগুলোকে ছেড়ে দিতে বলে। কিন্তু না বলে হাসল, 'না অনেক ধন্যবাদ। চলি।'

ইন্সপেক্টরের হাতজোড়া কপালে উঠল, 'নমস্কার।'

অশোক ফটিককে নিয়ে থানার বাইরে এসে তারক দত্ত রোড ধরল। বলল, 'একমাত্র পূর্ণিমাই খুনিকে চিনত।'

'দেখে মনে হল, মিতা আর পূর্ণিমাকে একভাবেই মারা হয়েছে।' ফটিক বলল।

অশোক বলল, 'ঠিক। কিন্তু দিনের বেলা, কী করে কোথায় খুনির সঙ্গে ওর যোগাযোগ হল, বুঝতে পারছিনে।' বেকবাগানের মোড়ে এসে একটা খালি ট্যাক্সির দরজা খুলল, 'যাবেন ভাই?'

'কোথায় যাবেন?'

'সি আই টি—সুরেশ সরকার রোড।' অশোক বলল।

ড্রাইভার বলল, 'বসুন।'

অশোক ফটিককে নিয়ে ট্যাক্সিতে বসল। ড্রাইভার মিটার নামিয়ে গাড়ি স্টার্ট করল। ফটিক জিগ্যেস করল, 'আবার নরেনবাবুর বাড়িতে?'

'হ্যাঁ। হিরেটা সাবধানে রাখ।' অশোক বলল, হাতের ঘড়ি দেখল, 'ছ-টা বাজতে দশ।'

ফটিক জিগ্যেস করল, 'হিরেটা তো সাবধানেই রেখেছি, কিন্তু তার সঙ্গে পূর্ণিমার—?'

'পূর্ণিমার ওপরেই খুনি হিরেটা খোঁজার দায়িত্ব দিয়েছিল।' অশোক বলল, 'কথাটা অনেক পরে আমার মনে স্ট্রাইক করে। প্রেমঘটিত ব্যাপারে, কনফেশনের ভয়ে, ও পালায়নি। তাহলে আগেই পালাত। ওর ধারণা ছিল, হিরেটার খবর আমরা জানি। তুই জানতিস, তখনও আমি জানতাম না। ফলে, পূর্ণিমাকে আমি হিরেটার কথা জিগ্যেসও করতাম না। বেচারি, মরণ ওকে ডেকেছিল।'

ফটিক জিগ্যেস করল, 'কিন্তু এখন আবার নরেনবাবুর বাড়ি যাচ্ছিস কেন?'

'নিশির ডাকে যাচ্ছি।' অশোক হাসল, একটা সিগারেট ধরাল।

ট্যাক্সি ক্রিস্টোফারের পথ পেরিয়ে আরও খানিকটা এগোল। অশোক বলল, 'বাঁয়ের রাস্তায় চলুন ভাই।'

ট্যাক্সি বাঁয়ে ঢুকে দু-একটা মোড় নিয়ে নরেনবাবুর বাড়ির সামনে আসতেই, অশোক ট্যাক্সি থামাল। ভাড়া মিটিয়ে নামল। গেটের সামনে কোনও আলো নেই। নীচের ও ওপরের বাইরের

বারান্দায় আলো জ্বলছে। অশোক ফটিককে নিয়ে বন্ধ গেট খুলে ভেতরে ঢুকল। নরেনবাবুর গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে। ওপর থেকে পুরুষের গলা ভেসে এল, 'কে?'

'আমি অশোক ঠাকুর।' অশোক ওপরের দিকে তাকিয়ে বলল, দেখল, নরেনবাবুর বড় ছেলে নবীন।

নবীন ব্যস্তভাবে বলল, 'এক মিনিট, যাচ্ছি।'

অশোক ফটিককে নিয়ে বারান্দার ওপর উঠতেই নবীন নেমে এল। লুঙ্গির ওপরে চাদর জড়ানো। অফিসফেরত বাড়ির পোশাক। প্রথমেই বলল, 'আমাকে বোধহয় আপনার দরকার?'

'কেন আপনাকে ওবেলা জেরা করা হয়নি বলে?' অশোক হাসল, মাথা নাড়ল, 'না, আপনার বাবাকে দরকার। তিনি বোধহয় চেম্বারে আছেন?'

নবীন বলল, 'হ্যাঁ, ক'দিন ধরে কোর্টে যাচ্ছেন না, মক্কেলরা ব্যস্ত হয়ে উঠেছে।'

'স্বাভাবিক।' অশোক বলল, 'ওঁকে একটু খবর দিন, আমি একটু কথা বলব।'

নবীন বলল, 'আপনারা আসুন, বসুন, আমি বাবাকে ডেকে দিচ্ছি।'

অশোক ফটিক বাইরের ঘরে বসল। পিছনের দরজাটা বন্ধ। ভেতরে এখন রান্নাঘরে নীপা তার শাশুড়ির সঙ্গে নিশ্চয়ই আছে। নবীন দরজা ঠেলে পাশের চেম্বারে ঢুকল। এক মিনিট না যেতেই নরেন্দ্রনাথ বেরিয়ে এলেন। পরনে সেই ধুতি, গায়ে পশমের চাদর। ব্যস্ত স্বরে বললেন, 'কী খবর, অশোকবাবু?'

'পূর্ণিমা মারা গেছে।' অশোক উঠে দাঁড়াল।

নরেন্দ্রনাথ আর্তনাদ করে উঠলেন, 'মারা গেছে।'

'মারা গেছে মানে খুন হয়েছে।' অশোক বলল, 'কড়েয়া থানায় ওর ডেডবডিটা দেখে এলাম। মনে হল, মিতা আর ওর খুনের ধরনটা প্রায় একইরকম। বন্ডেল ব্রিজের কাছে ওর ডেডবডিটা বেলা বারোটা নাগাদ থেকে পড়েছিল। যাই হোক, আপনার সঙ্গে একটু আলাদা দরকার আছে।'

নরেন্দ্রনাথ এবং নবীনের মুখ রক্তহীন ফ্যাকাসে। পিতা-পুত্রের মধ্যে একবার দৃষ্টিবিনিময় হল। নরেন্দ্রনাথ বলে উঠলেন, 'আমার মাথাটা খারাপ হয়ে যাবে। পুনিটা খুন হয়েছে।'

'ওটা নিয়ে এখন আর ভাববেন না।' অশোক বলল, 'আমরা কেউ কারও নিয়তিকে ঠেকাতে পারিনে। এখন আপনার সঙ্গে একলা একটা কথা আছে, সেখানে কেউ থাকলে চলবে না। এ-ঘরে এ-কথা হবে না।'

নরেন্দ্রনাথ বললেন, 'তাহলে ওপরে আমার ঘরেই চলুন। চেম্বারে মক্কেলরা রয়েছে।'

'তাই চলুন। তবে, আপনি শান্ত থাকার চেষ্টা করুন।' অশোক বলল।

নরেন্দ্রনাথ ঘাড় ঝাঁকিয়ে ঘরের বাইরে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগলেন। অশোক আর ফটিক উঠতে-উঠতে দেখল, অর্পিতা সিঁড়ির মুখে বারান্দায় দাঁড়িয়ে। চোখে ভ্রুকুটি, বিস্ময়। অশোক তাকিয়ে হাসল, 'আবার একবার আসতে হল, তবে আপনাদের কারওকে জ্বালাতন করব না।'

'আমাদের আর জ্বালাতন কীসের?' অর্পিতা বলল, 'ভাবছি, ও আজ ফিরে এলে আমরা সুখচরেই ফিরে যাব। আর ভালো লাগছে না।'

অশোক হাসল, কোনও জবাব দিল না। নরেন্দ্রনাথের ঘরে ফটিককে নিয়ে ঢুকল। অশোক গোটা ঘরটা দেখে দরজা বন্ধ করল। নিচু স্বরে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনাদের কেউ হিরের আংটি পরে?'

'না তো?' নরেন্দ্রনাথ বললেন, 'হিরের আংটি তো কারও হাতে নেই?'

অশোক বলল, 'ওটা বের কর।'

ফটিক পকেট থেকে পার্স বের করে তার ভেতর থেকে হিরে জড়ানো মোড়কটা খুলে ধরল। অশোক বলল, 'দেখুন তো নরেনবাবু, মনে হচ্ছে, এটা আংটির হিরে, মেয়েদের কোনও

অর্নামেন্টের নয়। এরকম হিরের আংটি পরা কারওকে এ-বাড়িতে বা আপনাদের চেনাশোনা কারওকে দেখেছেন?'

নরেন্দ্রনাথ হিরেটার দিকে দেখলেন। দেখতে-দেখতে তাঁর মুখ লাল হয়ে উঠল, চোখ দুটো যেন ফেটে পড়ল। প্রায় এক মিনিট পরে বললেন, 'কোথায় পেলেন এটা?'

'সেটা পরের কথা।' অশোক বলল, 'আপনি না বলতে পারলে বাড়ির মহিলাদের জিগ্যেস কবতে হবে, মিতার কোনও বন্ধুর আঙুলে এরকম হিরের আংটি কেউ দেখেছেন কি না।'

নরেন্দ্রনাথের স্বরে বিহ্বলতা, 'এরকম হিরের আংটি তো একমাত্র বিক্রমের হাতেই আছে।'

'বিক্রমবাবু?' অশোক ফটিকের দিকে তাকাল, 'আজও ছিল?'

নরেন্দ্রনাথ জোর দিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই ছিল, আমি আজ ওবেলাও দেখেছি।'

'হুঁ।' অশোক আবার ফটিকের সঙ্গে দৃষ্টিবিনিময় করে, চোখের ইশারা করল, 'তাহলে অবিশ্যি বলার কিছু নেই। তা ছাড়া খুনের দিন তো তিনি সেই সময়ে সুখচরে অন্য ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছিলেন।'

নরেন্দ্রনাথ বললেন, 'হ্যাঁ, মামলা চলছে। আপনি তো সবই শুনেছেন।'

'শুনেছি।' অশোক বলল, 'এখন একটা কথা আশা করি রাখবেন। এই হিরের ব্যাপারটা আপনি ছাড়া বাড়ির কেউ জানবে না। কথাটা থাকবে কি?'

নরেন্দ্রনাথ এক মুহূর্ত দ্বিধা করে বললেন, 'নিশ্চয়ই থাকবে।'

'না-থাকাটা কিন্তু খুবই বিপজ্জনক হবে।' অশোক গম্ভীর স্বরে বলল।

নবেন্দ্রনাথ বললেন, 'আমি কথা দিচ্ছি। আপনাব কোনও কথাই তো আমি ফেলিনি। কিন্তু—।'

'এখন আব কিন্তু নয়, নরেনবাবু।' অশোক বলল, 'আমরা যাচ্ছি, সময়মতো দেখা হবে। আমি জানি, বাড়িব সবাই আপনাব কাছ থেকে কিছু শোনবার জন্যে ওত পেতে আছে। কিন্তু মনে বাখবেন, এ বিষয়ে কোনও কথা নয়। তবে হ্যাঁ, পূর্ণিমার খুনের কথাটা বলতে পারেন। অবিশ্যি নবীনবাবু এতক্ষণে বলেও ফেলেছেন। আর নয়। আজ চলি।' ও দরজা খোলবার আগে ফটিকের দিকে তাকাল।

ফটিকের হাতের পার্স পকেটে। ঘাড় বেঁকিয়ে বলল, 'চল।'

অশোক দরজা খুলল। নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে দুজনেই বেরিয়ে এল। আর একবার বিদায় নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গেল।

রাস্তায় এসে ফটিক বলল, 'কিন্তু আমি তো বিক্রমবাবুর হাতে—।'

'পান্নার আংটি দেখেছিলি ওবেলা।' অশোক বলল।

ফটিক বলল, 'হ্যাঁ। অথচ—অথচ সুখচরে—।'

'ওসব ভাবনা একদম আর নয়।' অশোক বলল, 'পেটে ইঁদুর ডন মারছে। বাড়ি আজ আর ফেরা হবে না। এখন একটা হোটেলে গিয়ে ঘর বুক করা, পেট ঠেসে খাওয়া আর ঘুমোনো। যা করার, কাল সকালে।'

সকাল সাড়ে ন'টা।

মধ্য কলকাতার এক হোটেলের ঘর থেকে ফটিক আর অশোক বেরোল। ওদের স্নান আর ভারী ওজনের জলখাবার খাওয়া শেষ। বিল মেটানোও হয়ে গেছে। দুজনেই বাইরে এল। ছোট রাস্তা থেকে বেরিয়ে চৌরঙ্গির ওপর এসে পড়ল। মোড়েই কয়েকটা খালি ট্যাক্সি। অশোক আঙুল

তুলে একজন ড্রাইভারকে ইশারা করল। ড্রাইভার দরজা খুলে দিয়ে মিটার ডাউন করল। অশোক বলল, কলকাতার বাইরে যেতে হবে ভাই।'

'কোথায়?' ড্রাইভার জিগ্যেস করল।

'খড়দহ থানায়।'

'ঠিক আছে। ব্যারাকপুর পর্যন্ত অসুবিধে নেই।' ড্রাইভার গাড়ি স্টার্ট করল।

শীতের সকালে এখনও রাস্তায় তেমন জ্যাম নেই। কিন্তু কিছুটা জ্যাম রয়েছে বিশেষ করে শ্যামবাজার থেকে ডানলপ ব্রিজ পর্যন্ত। পৌনে একঘণ্টা লাগল খড়দহ থানায় পৌঁছতে। তার আগেই অশোক এস. পি. চব্বিশ পরগনা, মিঃ মিত্রকে এস. এস. পি. ডি. ডি.-র খবর জানিয়ে রাখতে বলেছিল। মিঃ মিত্র এস. এস. পি. ডি. ডি.-র চিঠিটা থানায় দেখাবার পরামর্শ দিয়েছেন।

অশোক ফটিককে নিয়ে, বি টি রোডের ধারে খড়দহ থানায় ঢুকল। ও. সি.-র সঙ্গে দেখা করে মিঃ মিত্রের কথা বলল, আর এস. এস. পি. ডি. ডি.-র চিঠি দেখাল। ও. সি. বললেন, 'আমার ঘরে বসবেন চলুন, কী ব্যাপার শুনি।'

ও. সি.-র নিজস্ব ঘরে কেউ ছিল না। অশোক বিক্রমের কেসটার কথা বলে জিগ্যেস করল, 'উনি সেদিন থানায় ক'টার সময়ে এসেছিলেন?'

ও. সি. বেল টিপে একজন পাহারাকে ডাকলেন, বললেন, 'হরেনবাবুকে পাঠিয়ে দাও।'

পাহারা অদৃশ্য হল। ও. সি. বললেন, 'যতদূর মনে পড়ছে সাড়ে ছ'টা থেকে সাতটা।

'ঠাকুরদাস মণ্ডল ক'টায় থানায় এসেছিল মনে করতে পারেন?' অশোক জিগ্যেস করল।

ও. সি.-র জবাবের আগেই এস. আই. হরেনবাবু ঢুকলেন। ও. সি. এস. আই.-এর কাছে অশোকের প্রশ্নের পুনরুক্তি করলেন। হরেনবাবু বললেন, 'ছ'টায়।'

'তদন্তের রিপোর্ট কী? মণ্ডল পরিবারের সঙ্গে জমি নিয়ে পুরোনো ঝগড়া?' অশোক জিগ্যেস করল।

ও. সি. বললেন, 'পুরোনো ঝগড়া ছিল কি না বোঝা যাচ্ছে না, তবে ঘটনাটা ঘটেছিল। ট্রেসপাসের কথা বিক্রমবাবু অস্বীকার করেননি। কিন্তু ক্রিমিনাল ট্রেসপাস কি না, সেটা কোর্টের বিচার্য। আর মেয়েদের আসল্ট করার কেসটা টিকবে বলে মনে হয় না। কেন, বলুন তো?'

'বিক্রমবাবু সেদিন সন্ধে ছ'টা থেকে রাত্রি দশটা পর্যন্ত কোথায় ছিলেন, সেটা জানা বিশেষ দরকার হয়ে পড়েছে। ব্যাপারটা কিন্তু খুবই সিক্রেট, স্যার।' অশোক হাসল।

ও. সি.-ও হাসল, 'সিক্রেট না হলে আর আপনি এভাবে ছুটে এসেছেন? মিঃ মিত্রই বা টেলিফোন করবেন কেন?'

'তাহলে এখানে বিক্রমবাবু সাতটা নাগাদ এসেছিলেন?' অশোক হরেনবাবুর দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করল।

হরেনবাবু বললেন, 'হ্যাঁ। কিন্তু সিক্রেট ব্যাপারটা কী? ঘটনা তো সত্যি ঘটেছে, কোর্টে কেস প্রডিউসও হয়েছে, বিক্রমবাবু উকিল দিয়ে জামিন নিয়েছেন, কেসের ডেট পড়েছে।'

'হরেনবাবু, তবু ঘটনাটা যেন সিক্রেটই থাকে।' অশোক উঠে দাঁড়াল।

ও. সি. বলল, 'আপনি ভাববেন না, এস. পি. সাহেব যেখানে নির্দেশ দিয়েছেন, সেখানে কোনও কথাই থাকতে পারে না।' তিনিও উঠে অশোকের সঙ্গে থানার বাইরে এলেন।

থানার পাশে ট্যাক্সিটা দাঁড়িয়েই ছিল। অশোক ও. সি.-র কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ফটিককে সঙ্গে করে ট্যাক্সিতে উঠল, 'চলুন, আবার কলকাতায় ফেরা যাক।'

ড্রাইভার গাড়ি ঘোরাল। রাস্তায় এখন বেশ ভিড়। অশোক ড্রাইভারকে বলল, 'আপনার গাড়ি তো দেখছি নতুন।'

'ছ'মাস আগে কারখানা থেকে বেরিয়েছে।' ড্রাইভার জবাব দিল।

অশোক সিগারেটের প্যাকেট বের করে ড্রাইভারের দিকে ঝুঁকে পড়ল, 'নিন, সিগারেট খান একটা।'

'না-না, থাক না।' ড্রাইভার লজ্জিত হয়ে বলল।

'আরে নিন না।' অশোক একটা সিগারেট বের করে এগিয়ে দিল।

ড্রাইভার নিল। অশোক সিগারেটটা নিজেই দেশলাই জ্বেলে ধরিয়ে দিয়ে, নিজে একটা ধরাল, 'আচ্ছা, এখান থেকে কত তাড়াতাড়ি এন্টালি থানায় যেতে পারেন?'

ড্রাইভার বলল, 'জ্যামের সময়, তবু রিসক নিলে কতক্ষণ আর, যতক্ষণে এসেছি, প্রায় সেই টাইমেই পৌঁছে যেতে পারি।'

'তার মানে, বারোটা নাগাদ পৌঁছতে পারেন?'

'চেষ্টা করতে পারি।'

'তাহলে করুন। আপনার পাওনা দেড়া করে দেব।'

ড্রাইভার হেসে একবার পিছন ফিরে দেখল। গাড়ির স্পিড বাড়িয়ে বলল, 'আপনারা পুলিশের লোক, না?'

'আর বলেন কেন?' অশোক হাসল, 'বুঝতেই পারছেন।'

'তা আর পারছিনে?' ড্রাইভার বলল, 'আপনারা স্যার আই. বি.-র লোক।'

'ঠিক বলেছেন।'

গাড়ির স্পিড আরও বাড়ল। ডানলপ ব্রিজের মোড় থেকে জ্যাম। কিন্তু ড্রাইভার খেলা দেখাতে লাগল। বিপজ্জনকভাবেই, ডাইনে-বাঁয়ে, ওভারটেক করে ছুটল। কনভেন্ট রোডে থানায় এসে পৌঁছল যখন, তখন বারোটা বাজতে দশ। অশোক পার্স খুলে মিটার দেখতে-দেখতে বলল, 'সাবাস ভাই। এই নিন।' একশো টাকার নোট দিল।

'ভাঙানি নেই, স্যার।' ড্রাইভার বলল।

অশোক দরজা খুলে নামতে-নামতে বলল, 'দরকার নেই, ওটা পুরোই আপনার।'

ড্রাইভার দু-হাত কপালে ঠেকিয়ে নমস্কার করল। অশোক কপালে হাত ঠেকিয়ে ফটিককে ইশারা করে থানায় ঢুকল। সোজা গেল ও. সি.-র ঘরে। তিনজন ভদ্রলোক বসেছিলেন। অশোক হেসে বলল, 'একটু জ্বালাতন করব, স্যার।'

ও. সি. ঠিক প্রসন্ন হাসলেন না। বললেন, 'বসুন।' সামনের ব্যক্তিদের বললেন, 'একঘণ্টা পরে আসুন।'

ভদ্রলোক তিনজন বেরিয়ে গেলে অশোক বলল, 'টিটো গাঙ্গুলির কোনও খবর আছে নাকি?'

'না তো? কেন?' ও. সি. জিগ্যেস করলেন।

অশোক গতকালের ঘটনাটা উল্লেখ করল না। বুঝল, টিটো বোধহয় ওর বাবার কাছেও ঘটনাটা চেপে গেছে।

বলল, 'ওকে একবার টেলিফোন করে এখানে ডাকুন, জরুরি দরকার।'

'আসবে কি? ব্যারিস্টারের ছেলে।' তিনি টেলিফোনের রিসিভার তুলে ডায়াল করলেন। প্রায় মিনিটখানেক পরে বললেন, 'হ্যালো, এন্টালি থানার ও. সি. বলছি। টিটোবাবু—ওহ্, আপনি? একবার সামান্য সময়ের জন্যে আসতে পারবেন?...অ্যাঁ?' ও. সি. বেশ কয়েক মিনিট কান পেতে কথা শুনতে-শুনতে অশোক আর ফটিকের দিকে দেখতে লাগলেন, আর 'হুঁ-হুঁ' দিয়ে যেতে লাগলেন। তারপরে বললেন, 'না-না, ওসব ব্যাপার এখানে কিছু নেই। আপনি কয়েক মিনিটের জন্যে একবার ঘুরে যান।...ওয়েল, থ্যাংক্যু।' রিসিভার নামিয়ে রেখে অশোকের দিকে ভুরু কুঁচকে তাকালেন।

অশোক হাসল, 'গতকাল ওকে আমরা একরকম জোর করেই ভিকটোরিয়াতে ধরে নিয়ে গেছলাম। জোর না করলে নিয়ে যাওয়া যেত না। সে কথাই বলল বুঝি?'

'হ্যাঁ, আর আপনাদের নামে পুলিশে ডায়েরিও করেছে।'

'সেটা কাছে এলে ম্যানেজ করে নেব। সুকুমার আর দীপককে কী করলেন?'

'কোর্টে পাঠিয়েছি।'

'তাহলে আপনি কাজ করুন, আমরা বরং বাইরে গিয়ে অপেক্ষা করছি।'

'এখানেই বসুন, টিটো গাঙ্গুলি আপনাদের বাইরে দেখলে, সেখান থেকেই কেটে পড়বে। আমি বরং একবার বাইরে ঘুরে আসি। চা-টা দরকার হলে, পাহারাকে ডেকে বলবেন।' ও. সি. উঠে বেরিয়ে গেলেন।

আধ ঘণ্টা পরে ও সি.-র ঘরে টিটো ঢুকল। ঢুকেই অশোক আর ফটিককে দেখে তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম করল। অশোক দাঁড়িয়ে ডাকল, 'টিটোবাবু, প্লিজ। একটা কথা শুনুন ভাই।'

অশোকের ব্যগ্র অনুরোধে কাজ হল। টিটো ফিরে দাঁড়াল, 'আবার কী চান?'

'বসুন। আপনার সাহায্য ছাড়া মিতার খুনিকে ধরতে পারছি না।' অশোক বলল, 'কাইন্ডলি বসুন।'

টিটোর চোখে সন্দেহ, সন্তর্পণে ভেতরে ঢুকে বসল। অশোক জিগ্যেস করল, 'আপনি মিতার ভগ্নীপতিকে দেখেছেন কখনও?'

'না।' টিটো বলল।

অশোক ঝটিতি ফটিকের কাছ থেকে একটা কাগজ নিয়ে কিছু লিখল। সেটা টিটোর হাতে দিয়ে বলল, 'আপনি এ-ঠিকানায় যান। যা-যা লেখা আছে, তা দেখবেন এবং বলবেন। আপনার জন্যে আমরা নীচে দাঁড়িয়ে থাকব।'

টিটো কাগজটা পড়ল। বলল, 'তা পারব। কিন্তু আপনারা কারা? এখানে থানায় বসে আছেন?'

'আমরা মিতার খুনের তদন্ত করছি।' অশোক হাসল, 'আপনি আমাদের সম্পর্কে থানায় ডায়েরি করেছেন। আমরাই আপনার থানায় গিয়ে নিজেদের সাবমিট করব। এখন চলুন, বেরিয়ে পড়ি। আপনার গাড়ি আছে সঙ্গে?'

টিটোকে অনেকটা নির্ভয় আর সহজ দেখাল, বলল, 'আছে।'

'তাহলে আপনার গাড়িতেই আমরা যেতে পারি তো?'

'কেন পারবেন না? আসুন।'

তিনজনেই উঠল। বেরোবার সময় অশোক পাহারাকে বলল, 'বড় সাহেবকে বলবে, যে-সাহেবের আসার কথা ছিল, তিনি এসেছিলেন। তাঁর সঙ্গেই আমরা বেরিয়ে গেছি। পরে আবার আসব।'

'আজ্ঞে আচ্ছা।' বাঙালি পাহারা বলল।

তিনজনেই বাইরে এল। এবার চালকের আসনে টিটো। সামনের আসনেই অশোক আর ফটিক বসল। টিটো গাড়ি স্টার্ট করল, 'আপনারা মশাই কাল আমাকে এমন ভয় দেখিয়েছিলেন, রাতে ঘুমোতে পারিনি।'

'আপনার বাবাকে বলেননি?'

'বলেছি বইকি। বাবা তো ব্যাপারটা এখন চেপে যেতে বললেন। খালি থানায় একটা ডায়েরি করতে বললেন, তাই করেছি।'

'দরকার হলে আমরা আপনার বাবার কাছেও যাব, ক্ষমা চাইব।'

'কিন্তু মশাই, আপনারা তো যে-কোনওরকম কাজ করতে পারেন। আমার হাতের গাড়ি ছিনিয়ে আমাকেই সেই গাড়িতেই ঢুকিয়ে...।'

অশোক হেসে উঠল। টিটোও হাসল। ডালহৌসি পাক দিয়ে জি. পি. ও. থেকে এগিয়ে গিয়ে গাড়ি পার্ক করল। গাড়ির চাবি নিয়ে যাওয়ার আগে বলল, 'আর ফল্স দেবেন না যেন।'

'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।' অশোক একটা সিগারেট ধরাল।

ফটিককে বলল, 'টিটোকে নিশ্চয়ই লোকটা চেনে না।'

'মনে হয় না।' অশোক বলল, 'চান্স তো নিলাম, দেখা যাক। ছেলেটা এমনিতে ভালো। বড়লোক বাপের এক ছেলে হলে যা হয়, তাই হয়েছে। চেহারাটাও সুন্দর, মেয়েরাও হিড়িক দেয়।'

প্রায় কুড়ি মিনিট বাদে টিটো ফিরে এল। মুখ লাল, গম্ভীর। গাড়িতে ঢুকে বসে বলল, 'একটা আস্ত ছোটলোকের কাছে পাঠিয়েছিলেন।'

'কেন? তাড়িয়ে দিল নাকি?' অশোক জিগ্যেস করল।

টিটো বলল, 'যেই বলেছি, আমি ফরেন ইমপোর্ট সম্পর্কে আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে এসেছি, আমাকে প্রথমেই বলল, কোনও অচেনা ফেকলু মালের সঙ্গে আমরা কথা বলি না। তবে হ্যাঁ, এই সেই লোক।

অশোক টিটোর একটা হাত জড়িয়ে সোল্লাসে বলল, 'শিয়োর?'

'হান্ড্রেড পার্সেন্ট।' টিটো বলল, 'আর আঙুলে হিরের আংটিই রয়েছে।'

অশোক টিটোর হাতে সজোরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, 'তুলনাহীন। আর কী বলল?'

'বলবে আবার কী, বাঘের মতো আমার দিকে তাকিয়ে দেখছিল।' টিটো বলল, 'জিগ্যেস পর্যন্ত করল না, আমার কোনও ইমপোর্ট ফার্ম আছে কি না। অথচ লোকটা বাইরে থেকে দেখতে মোটেই সেরকম নয়।'

অশোক বলল, 'বোধহয় লোকটার মেজাজটা ভালো নেই। চলুন, আজ আপনাকে আমিই লাঞ্চ খাওয়াব।'

'অ্যাবসার্ড!' টিটো বলে উঠল, 'আমার জন্যে একজন এক জায়গায় অপেক্ষা করছে, সেখানে যেতে হবে। অলরেডি দেরি হয়ে গেছে। কাল আপনারা আমার বারোটা বাজিয়ে দিয়েছিলেন।'

অশোক হেসে উঠে টিটোর দু-হাত ধরে বলল, 'ক্ষমা করবেন, টিটোবাবু। তবে আপনার আজকের পারফরমেনসের কোনও তুলনা নেই।'

'কিন্তু কারণটা কিছুই বললেন না।' টিটো বলল, 'আপনি যা করতে বললেন, আমি তাই করলাম মাত্র।'

অশোক বলল, 'পরে সব জানতে পারবেন। তাহলে আপনি চলে যান।'

'বলেন তো আপনাদের এসপ্ল্যানেড অবধি এগিয়ে দিতে পারি।' টিটো বলল।

অশোক এক মুহূর্ত ভেবে বলল, 'তার বদলে আর একটা সাহায্য যদি করতে পারেন বেঁচে যাই। একটা বিশেষ জিনিস, যা আমার হাতের কাছে নেই, আপনি বোধহয় সহজেই জোগাড় করে দিতে পারেন। অবিশ্যি এখন যদি অশোক ঠাকুরকে আপনার বিশ্বাস হয়।'

টিটো জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল, 'কী বলুন তো?'

'একটা টেপরেকর্ডার, আর একটা আনকোরা টেপ।' অশোক বলল।

টিটো ঠোঁট টিপে ভাবতে আরম্ভ করল। অশোক আবার বলল, 'তবে ঢাউস সাইজ হলে চলবে না, যত ছোট সম্ভব।'

'পারি।' টিটো বলল, 'আপনাদের তাহলে আমার সঙ্গে একবার থিয়েটার রোডে যেতে হবে।'

অশোক বলল, 'যেখানে যেতে বলবেন যাব, জিনিসটা পেলেই হল। কাজ হয়ে গেলে যেখানে ফেরত দিতে বলবেন, সেখানেই ফেরত দিয়ে দেব।'

'এন্টালি থানায় জমা করে দেবেন।' টিটো গাড়ি স্টার্ট করে ঘুরিয়ে নিল, 'বলে দেবেন, আমাকে যেন টেলিফোনে ডেকে ওটা ফেরত দিয়ে দেয়।'

অশোক বলল, 'নিশ্চয়ই।'

টিটোর গাড়ি চলল রাইটার্স-এর পাশ দিয়ে। ঘুরে ময়দানের রাস্তা। পথে যেতে-যেতে শুধু একবারই বলল, 'আচ্ছা, অশোকবাবু, আপনি কী করে জানলেন, মিতার সঙ্গে আমি ওই লোকটাকেই দেখেছি?'

'জানতাম না।' অশোক হাসল, 'আপনাকে দিয়ে একবার কনফার্ম করে নিলাম।'

গাড়ি থিয়েটার রোডে ঢুকল। দাঁড়াল একটি বাড়ির সামনে রাস্তার ওপরে। টিটো নেমে যেতে-যেতে বল্‌ল, 'দু-মিনিটেই আসছি।'

ফটিক এতক্ষণে মুখ খুলল, 'গতকাল জেরার সময় লোকটার হাতে তো পান্নার আংটি ছিল।'

'ওটা ম্যাজিক।' অশোক হেসে বলল, 'লোকটা গতকাল আমাদের ম্যাজিক দেখিয়েছে। কিন্তু সব ব্যাপারটা এখনও কেমন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। কী করে এমনটা হয়?'

ফটিক অশোকের ভ্রুকুটি-চিন্তামগ্ন মুখের দিকে তাকাল, 'কোনটা কেমন করে হয়?'

অশোক জবাব দেওয়ার আগেই টিটো এগিয়ে এল। হাতে বেল্ট ঝোলানো ছোট একটা টেপরেকর্ডার, 'কলকাতায় এর থেকে ছোট টেপরেকর্ডার এসে পৌঁছয়নি, এফেক্ট মারাত্মক, ১৯/২০ গজ দূরের কথাও স্পষ্ট উঠে যাবে। পাওয়ারফুল ব্যাটারি সেট। ইলেকট্রিকেও চলে। স্টিরিয়ো আছে। নতুন টেপ ভরা আছে। একটু দেখিয়ে দিই।' সে গাড়ির ভেতর উঠে বসে, স্টার্ট বন্ধ করা সাউন্ড বাড়ানো, কমানো, সব বুঝিয়ে দিল। বলল, 'জাপানি মাল। ওরা ছাড়া এসব আর কেউ করতে পারে না।'

অশোক টেপরেকর্ডারটা হাতে তুলে নিয়ে আর একবার টিটোর হাত চেপে ধরল, 'এবার আপনাকে বলি। মিতার খুনিকে যদি ধরতে পারি, তাতে আপনার অবদান থাকবে অনেকখানি।'

'মিতার জন্যে আমার কিছু যায় আসে না।' টিটো বলল, 'ও আমাকে ভারি অপমান করেছিল।'

অশোক টিটোর ঘাড়ে হাত দিয়ে বলল, 'ওসব ভুলে যান টিটোবাবু, একটি মৃত আত্মার সদগতি কামনা করুন।'

'তা অবিশ্যি ঠিক।' টিটো গাড়ি স্টার্ট করে বলল, 'আপনাদের কোথায় নামাব?'

অশোক বলল, 'আমাদের এখানেও নামাতে পারেন। তবে এসপ্লানেডে নামালেই ভালো হয়।'

'চলুন, আমাকেও ওই এলাকাতেই যেতে হবে।' টিটো গাড়ি ঘুরিয়ে নিল।

অশোক পার্ক স্ট্রিটে একটা চাইনিজ রেস্তোরাঁয় ফটিককে নিয়ে খেতে বসেছে। মুখে কোনও কথা নেই। ফটিকের মুখে অস্বস্তি। না জিগ্যেস করে পারল না, 'এত ভাবছিস কী?'

'তোর কাছে বিক্রমবাবুর পানিহাটির উকিলের নামটা লেখা আছে তো?' অশোক মুখে খাবার পুরল।

ফটিক বলল, 'আছে বইকি।'

অশোক ঘাড় ঝাঁকাল। কথা না বলে খেতে লাগল। একটু পরে আবার বলল, 'এখন আবার আলিপুর পুলিশ কোর্টে যাব, না দুটো স্টপেজ গ্যালপ করব, ভাবছি।'

'গ্যালপ?' ফটিকের মুখে খাবার-ভরা, কথাটা শোনাল বিকৃত।

অশোক মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'হ্যাঁ গ্যালপ। সুখচরেই যাব। আলিপুরে উকিলের কাছে একবার গেলে মন্দ হত না। কিন্তু মনে হচ্ছে দরকার হবে না। সোমক বসুকে এখন হাতে রাখলাম, তার কাছেও যাব না। তার মানে দুটো স্টপেজ গ্যালপ করে স্ট্রেট সুখচরেই যাব।'

'এখন?'

'হ্যাঁ, এখনই গিয়ে তোড়জোড় করা যাক।' অশোক কাঁটাচামচেয় চাইনিজ চপসোয়ের দলা মুখে পুরে দিল।

ফটিক খেতে-খেতে অশোকের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। অশোক খাবার গিলে বলল, 'ব্যাপারটা রিসকি, কিন্তু উপায় নেই।'

'রিসকি?' ফটিক জিগ্যেস কবল।

অশোক বলল, 'মনে তো হয় তাই।'

'টেপরেকর্ডারটা নিলি কেন?'

'স্রেফ একটা অনুমানের ওপর নির্ভর করে। কাজে লাগবেই, এমন কোনও কথা নেই।' অশোক হাত তুলে চীনা স্টুয়ার্ডকে ডেকে হাতের ইশারায় বিল দিতে বলল। ন্যাপকিন দিয়ে মুখ মুছতে-মুছতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল।

ফটিক জিগ্যেস করল, 'ট্রেনে যাবি, না ট্যাক্সিতেই?'

'টাকা যা নিয়ে বেরিয়েছিলাম, প্রায় শেষ। তবু ভাবছি, ট্যাক্সিতেই যাব।' অশোক একটা সিগারেট ধরাল।

স্টুয়ার্ড বিল নিয়ে এল। অশোক বিল মিটিয়ে বেরিয়ে এল। অফিসপাড়ার সাহেবেদের লাঞ্চের সময়। পার্ক স্ট্রিট জুড়ে গাড়িব ভিড়। কয়েকটা খালি ট্যাক্সির সঙ্গে কথা বলে শেষপর্যন্ত একজন যেতে রাজি হল। ফটিককে নিয়ে অশোক ট্যাক্সিতে উঠল। রাস্তা আজকাল কোনও সময়েই ফাঁকা নেই। বি. টি. রোডেব ধারে, সুখচরে ঢোকবার মোড়ে এসে নামতেই প্রায় একঘণ্টা লাগল। অশোক ট্যাক্সিব ভাড়া মিটিয়ে দিল। মোড়ের কাছে কয়েকটা সাইকেল বিকশো দাঁড়িয়েছিল। অশোক তাদের সামনে গিয়ে বলল, 'বিক্রমবাবুর বাড়ি কেউ চেনো ভাই?'

রিকশোওয়ালারা পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। বোঝা গেল, ঠিক চিনে উঠতে পারছে না। একজন জিগ্যেস করল, 'কোন পাড়ায় বলুন তো?'

'পাড়াটার নামই তো ভুলে গেছি হে।' অশোক বলল, 'ভদ্রলোকের নাম বিক্রম চ্যাটার্জি। বড়লোক। রোজ কলকাতায় অফিসে যান গাড়ি চালিয়ে। সবুজ রঙের গাড়ি।'

একজন রিকশোওয়ালা বলে উঠল, 'বুঝেছি-বুঝেছি, বোসপাড়ার সেই বাবু। রোজ সকাল ন'টা সাড়ে ন'টায় গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যায়। কয়েকদিন দেখছি সন্ধের দিকে ফিরে আসে, আবাব চলে যায়। সকালবেলা দেখা যায় না।

'ঠিক বলেছ।' অশোক বলল, 'সেই ভদ্রলোকেব বাড়ি যাব।'

বিকশোওয়ালাটি রিকশোর সিট থেকে নেমে বলল, 'আসুন। ভাড়াটা—।'

'তোমার যা রেট, তাই পাবে, কম নয়।' অশোক ফটিককে নিয়ে রিকশোয উঠে বসল।

রিকশো চলতে লাগল। অশোক ঘড়িতে দেখল সাড়ে তিনটে। ও বিকশোওযালাকে জিগ্যেস করল, 'তুমি ঠাকুরদাস মণ্ডলকে চেনো?'

'কোন ঠাকুরদাস মণ্ডল?'

'গঙ্গার ধারের কাছে চুনুরি না জেলেপাড়ার কাছে...'

রিকশোওয়ালা একটু ভাবল, 'আপনি কি চরণ মণ্ডলের বাবার কথা বলছেন?'

'ছেলের নামটা চরণ কি না মনে করতে পারছি না। তবে ছেলের বোধহয় বিয়ে হযে গেছে।' অশোক বলল।

ফটিক অবাক চোখে অশোকের দিকে তাকাল। রিকশোওয়ালা বলল, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ বুঝেছি। চরণের একটা বিধবা বোনও আছে তো? দেখতে বেশ সুন্দরী। চরণের বউও অবিশ্যি সুন্দরী।'

'হ্যাঁ, তাই যেন মনে পড়ছে। কলকাতায় দেখেছি তো, বিশেষ মনে করতে পারছি না।'

রিকশোওয়ালা বলল, 'বুঝেছি। ননদ-ভাজ দুই-ই খুব ঢপ জানে, পাড়ায় দুর্নাম। আপনারা তাদের কাছেও যাবেন?'

'না-না, আমরা তাদের কাছে যাব না।' অশোক বলল, 'বিক্রমবাবুর সঙ্গে ওদের বাড়ি-জমি নিয়ে মামলা চলছে। আমরা কোর্ট থেকে এসেছি। যাব বিক্রমবাবুর বাড়িতে। ওদের খোঁজটা একটু নিলাম। তুমি কোথায় থাকো?'

'আমি বোসপাড়াতেই থাকি। ওই বাবুদের বাড়ির উত্তর গায়ে, বিরিজাসার বস্তিতে।' রিকশোওয়ালা বলল, 'মামলার কথাও শুনেছি। তবে ও-মামলা টিকবে না।'

'কেন?' অশোক উৎকর্ণ হয়ে উঠল।

রিকশোওয়ালা বলল, 'দেখবেন, মিটমাট হয়ে যাবে। চরণবা তো বাবুদের খুবই মান্যিগণ্যি করে। একটু বোধহয় ট্যাফোঁ করতে গেছল। তাই লেগে গেছে।'

অশোক আর কথা বাড়াল না। রিকশো ক্রমেই ডানদিকে মোড় ফিরে, এপাড়া-ওপাড়া দিয়ে চলেছে। সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়েছে। দেখতে-দেখতেই সন্ধ্যা নেমে আসবে। অচেনা জায়গা। দেখে মনে হচ্ছে, অনেক নতুন বাড়ি উঠে, অঞ্চলের চেহারাটা বদলে গেছে। অশোক নিচু স্বরে বলল, 'পথঘাট চিনে রাখিস।'

রিকশোওয়ালা একটা বড় মন্দির পেরিয়ে, সোজা খানিকটা উত্তরে গিয়ে, বাঁ-দিকে মোড় নিল। একটা পুরোনো আমলের বিরাট দোতলা বাড়ির সামনে দাঁড়াল, 'এইটা সেই বাবুর বাড়ি।'

অশোক রিকশোতে বসেই দেখল, পুবোনো দোতলাবাড়ির গায়ে নতুন একটি ছোট দোতলা বাড়ি। অ্যানেক্স বলা যায়। নতুন বাড়ির সামনেই গ্যারেজের কোলাপসিবল গেট বন্ধ। পাশ দিয়ে বাড়িতে ঢোকার দরজাও বন্ধ। বন্ধ পুরোনো বাড়ির সদর দরজাও। কারওকেই দেখা যাচ্ছে না। অশোক ফটিক দুজনেই রিকশো থেকে নামল। রিকশোওয়ালার ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে বলল, 'গঙ্গার ধারটা কোনদিকে?'

'বাঁ-হাতে সোজা পশ্চিমে গেলেই গঙ্গা পেয়ে যাবেন।' রিকশোওয়ালা ফিরে চলল।

অশোক চাটুয্যে-বাড়িটা দেখল। তারপরে ফটিককে বলল, 'চল্, গঙ্গার ধারে যাই।'

দুজনেই হেঁটে একটু অলিগলি দিয়ে ঘুরে গঙ্গার ধারে এসে পড়ল। গঙ্গার ধারের অনেকটা জায়গাই খোলা। পোর্ট ট্রাস্টের জমি। ডানদিকে একটি পাড়া। বাঁধানো ঘাট বলে কিছু নেই। এলাকাটা ফাঁকা। বোধহয় শীতকাল বলেই। আট-দশ বছরের কয়েকটা ছেলে গঙ্গার ধারে গাদি খেলছিল। অশোক ফটিকের দিকে ওদের নজর নেই। গঙ্গার ওপারে একটা চটকল আর ইটের ভাটা দেখা যাচ্ছে। দু-একটি নৌকার গতি মন্থর।

'একটু ডানদিকের পাড়ায় ঘুরে আসি।' অশোক বলল।

দুজনেই ডানদিকে, অর্থাৎ উত্তরে, এগিয়ে গেল। আগের দিনের কাঁচা বাড়ি কয়েকটা এখনও আছে। আশেপাশে কিছু পাকা বাড়ি। গঙ্গার ধারটা ঢাকা পড়ে গেল। অশোক হঠাৎ একটি বাড়ির সামনে দাঁড়াল। পাঁচ ইঞ্চির পাকা দেওয়ালের ওপর মাথায় টালি দেওয়া দু-তিনটি ঘর। রাস্তার সামনে ভিত খোঁড়া। বাড়ির ভেতর ঢোকার দরজাটা বন্ধ। চারপাশের সীমানা ঘেরা হয়েছে, ঘন ফণীমনসার ঝাড় দিয়ে। তার দিয়ে কঞ্চি বেঁধে, ঝাড়কে খাড়া রাখা হয়েছে। সীমানাটা পাকা পাঁচিলে ঘেরা হয়নি।

অশোক কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়েই, আবার চলতে আরম্ভ করল। পাড়ার ভেতরে লোকজন

চলাফেরা করছে। কিন্তু দুজন অপরিচিতকে দেখে কেউ কোনও কথা জিগ্যেস করছে না। সেরকম পল্লীঅঞ্চলের চেহারাও নেই। রিকশো চলাচল করছে। দুজনেই আশেপাশে পাক দিয়ে আবার যখন ঘোসপাড়ার ভেতর দিয়ে গঙ্গার ধারের দিকে এগোল তখন সূর্য অস্ত গেছে। সন্ধ্যার ঘন ছায়া নেমেছে। রাস্তার আলো জ্বলে উঠেছে।

অশোক উৎকর্ণ হল। একটা গাড়ির শব্দ ভেসে আসছে। বিক্রমের বাড়ি থেকে তখন ওরা উত্তরে গিয়ে বাঁদিকে মোড় নিতে উদ্যত। একটা বাড়ির পাঁচিলের আড়ালে দাঁড়িয়ে পড়ল। দেখল, সেই লেফট হ্যান্ডার ফরেন সবুজ ফিয়াট। নতুন বাড়ির গ্যারেজের সামনে দাঁড়াল। চালকের আসনে বিক্রম। হর্ন বাজাল। অশোক ভেবেছিল, ভেতরে ঢোকবার পাশের দরজাটা খুলে যাবে।

কিন্তু তা খুলল না। গ্যারেজের ভেতর থেকেই একটি পুরুষের মূর্তি এগিয়ে এল। তার মানে, গ্যারেজের ভেতর দিয়ে বাড়িতে ঢোকবার আলাদা দরজা আছে। মূর্তি কোলাপসিবল গেটের তালা খুলে দিল ভেতর থেকে। গেট সরিয়ে দিল দুপাশে। বিক্রম আলো জ্বেলে গাড়ি গ্যারেজে ঢোকাল।

লোকটি আবার ভেতরে ঢুকে গেট টেনে বন্ধ করে তালা লাগিয়ে দিল। গাড়ির আলো বিক্রম ইতিমধ্যে নিভিয়ে দিয়েছে। সব অন্ধকার, চুপচাপ।

অশোক আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে ভালো করে বাড়িটার দিকে দেখল। রাস্তার আলোগুলো টিমটিমে, সর্বত্রই একটা ভৌতিক ছায়া-ছায়া ভাব। অশোক ফটিকের গায়ে হাত দিয়ে টিপল, গঙ্গার ধারে এগোল। স্বর নামিয়ে বলল, 'বিক্রম আর মণ্ডলের বাড়ির যাতায়াতের পথে কোথাও একটা আড়াল খুঁজে দাঁড়াতে হবে।'

'পথের ওপর একটা চায়ের দোকান দেখেছিলাম।' ফটিক বলল।

অশোক বলল, 'ওখানে একদম ঢোকা নেই। যদি বিক্রম বাড়ি থেকে বেরিয়ে মণ্ডলবাড়িতে ঢোকে—।'

'মণ্ডলবাড়িতে ঢুকবে?' ফটিক অবাক অস্ফুট স্বরে বলে উঠল।

অশোক বলল, 'যদি ঢোকে, তবে তুই সোজা বিক্রমের বাড়ির মধ্যে ঢুকে যাবি। খড়দহ থানায় টেলিফোন করে ও. সি. হরেনবাবু, এস. আই. যাকেই পাস চলে আসতে বলবি। বলবি, চব্বিশ পরগনার এস. পি.-র নির্দেশে বলছি। তারপরেই টেলিফোন করবি এন্টালি থানায়, ও. সি.-কে বলবি, অশোক ঠাকুরের বিশেষ অনুরোধ আপনি এখনই সুখচরে বিক্রমবাবুর বাড়িতে চলে আসুন। তারপরেই নরেনবাবুকে টেলিফোন করে একই জায়গায় আসতে বলবি। পারবি তো? অর্পিতা বা বাড়ির কেউ যেন না জানে!'

'চেষ্টা করব। বাড়ির ভেতরে কত লোক আছে, জানিনে তো?' ফটিক বলল, 'কিন্তু তুই কোথায় থাকবি?'

অশোক বলল, 'কাছেপিঠেই। কিন্তু খুব সাবধান। দরকার হলে তোর যা কেরামতি তা করবি।'

দুজনেই গঙ্গার ধারে এসে দাঁড়াল। কাছাকাছি আলো নেই। অন্ধকার নেমে এসেছে। আকাশে তারা ফুটতে আরম্ভ করেছে। কিন্তু অশোক দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। আবার বিক্রমের বাড়ির দিকে এগোল। কিছুটা যেতেই, বিক্রমের পুরোনো বাড়ির দরজার মাথায় আলো জ্বলে উঠল। দূর থেকে বিক্রমকে বেরোতে দেখা গেল।

'চলে আয়, ফটিক।' অশোক ফটিকের হাত ধরে উত্তরের আঁকাবাঁকা রাস্তায় চলতে আরম্ভ করল। খানিকটা গিয়ে দেখা গেল বাঁদিকের বাঁকের মুখে নতুন ভিত খোঁড়া টালির বাড়ির দরজার কাছে কেউ দাঁড়িয়ে আছে। ওইটাই মণ্ডলবাড়ি। ডানদিকে দুটো বাড়ির মাঝখানের ফাঁকে কিছুটা ঝোপঝাড়। অশোক ফটিককে টেনে নিয়ে তার মধ্যে ঢুকে পড়ল।

একমিনিটের মধ্যেই বিক্রমকে দেখা গেল। সে আস্তে-আস্তে হাঁটছে। পায়জামা-পাঞ্জাবি পরা।

হাতে একটা ব্যাগ। আরও কয়েক পা গিয়ে একবার দাঁড়াল, আশেপাশে দেখল। কারোর নিচু স্বর শোনা গেল। বিক্রম দ্রুত বাঁয়ে ফিরে নতুন ভিত খোঁড়া বাড়িটার পাশের দরজার মধ্যে ঢুকে গেল। যে-লোকটা দাঁড়িয়েছিল, সে তেমনি দাঁড়িয়ে রইল। প্রায় একমিনিট। তারপরে ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল।

অশোক ফটিককে হাত ধরে টেনে ঝোপ থেকে বেরিয়ে এসে বলল, 'যা-যা বলেছি, তাই করবি। চলে যা।'

ফটিক নির্দেশ পাওয়ামাত্র উধাও হয়ে গেল। অশোক নতুন ভিত খোঁড়া বাড়ির দিকে এগিয়ে গেল। ওর জামার ভেতরে টিটোর দেওয়া টেপ-রেকর্ডার।

ফটিক বিক্রমের পুরোনো বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়াল। এখন আর আলো জ্বলছে না। পকেট থেকে পেনসিল-টর্চ বের করে জ্বেলে দেখল, কলিংবেল আছে কি না। নেই। ও পাশের নতুন বাড়ির দরজার কাছে গিয়ে টর্চ জ্বালল। কলিংবেল রয়েছে। বেল টিপল। মিনিটখানেক পরে একটি লোক বেরিয়ে এল। সাদাসিধে লোক, মাঝবয়েসি, ধুতির ওপরে একটা ময়লা শার্ট। জিগ্যেস করল, 'কাকে চান?'

'বিক্রমদাকে। পানিহাটি থেকে উকিল অবিনাশবাবু পাঠিয়েছেন। জরুরি দরকার।' ফটিক দরজার ভেতরে একটা পা রাখল।

লোকটা বলল, 'কিন্তু উনি তো একটু কোথায় বেরোলেন। ফিরেই আবার কলকাতায় যাবেন।'

'জানি। কিন্তু আমাকে তাহলে একটু বসতে হবে যে?' ফটিক বলল।

লোকটা ইতস্তত করে বলল, 'আপনি একটু ঘুরে আসুন। কোনও অচেনা লোককে ছোটবাবু বাড়িতে ঢুকতে দিতে বারণ করেছেন।'

'কিন্তু আমাকে যে ভেতরে ঢুকতেই হবে।' ফটিক লোকটিকে সরিয়ে দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল।

লোকটা অবাক হয়ে বলল, 'আপনি জোর করে বাড়িতে ঢুকছেন?'

ফটিক কোনও জবাব না দিয়ে ঝটিতি সামনের ঘরটা দেখে নিল, 'কোনও উপায় নেই ভাই। টেলিফোনটা কোন ঘরে?'

'ফোন দিয়ে আপনার কী দরকার?' লোকটা এবার গলার স্বর চড়াল।

ফটিক ফিরে দরজাটা বন্ধ করল। লোকটির ঘাড়ের ওপর একটি হাত রেখে বলল, 'তাড়াতাড়ি আমাকে টেলিফোনের কাছে নিয়ে চলো। বিক্রমবাবুর সামনে খুব বিপদ!'

লোকটা ফটিকের হাত ঘাড় থেকে নামিয়ে প্রায় দৌড়ে পাশের ঘরে গেল, চিৎকার করে ডাকল, 'কমলা, কমলা, এদিকে এসো।'

লোকটির কথা শেষ হওয়ার আগেই ফটিকের হাতটা বিদ্যুৎগতিতে উঠল, আর লোকটির মুন্ডুতে আঘাত করল।

সে ঘুরে পড়ে যাওয়ার আগেই ফটিক অচৈতন্য লোকটিকে ঠেলে বাইরের ঘরে ঢুকিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিল। মুখ ফিরিয়ে দেখল, বাঁদিকের দরজা দিয়ে বছর তিরিশ বয়েসের একটি স্ত্রীলোক ঢুকতে-ঢুকতে বলল, 'কী হল, হরিদা?'

'টেলিফোনটা কোথায়?' ফটিক জিগ্যেস করল।

কমলা অবাক, 'তুমি কে? হরিদা কোথায়? টেলিফোন তো দোতলায়।'

'হরিদা একবার বাইরে গেল। আমাকে বিক্রমদা পাঠিয়েছে, উকিলকে এখনই একটা টেলিফোন করতে হবে। সিঁড়িটা কোনদিকে?'

কমলা একবার পিছন ফিরে দেখে আবার সন্দেহের চোখে তাকাল, 'ছোটবাবু তো এই মাত্তর কোথায় গেলেন, এখনি আসবেন।'

'জানি। হরি ডাকতে গেছে। তুমি আমাকে সিঁড়িটা দেখাও।'

কমলার চোখে এখন সন্দেহ নিবিড়, 'কে তুমি, চিনিনে শুনিনে, তোমাকে দোতলায় যেতে দেব কেন?'

ফটিক কমলার পিছন ফিরে একবার তাকানো দেখেই বুঝে নিয়েছিল, সিঁড়িটা ওই দরজার ভেতরে। ও দ্রুত এগিয়ে গেল। দু-হাতে কমলার মাথাটা যেন ঝাপটে দিল। কমলা তৎক্ষণাৎ লুটিয়ে পড়ল। ফটিক কমলাকে নিয়ে দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকল। ডানদিকে সিঁড়ি। কমলার অচৈতন্য শরীরটা সিঁড়ির নীচে ঢুকিয়ে দিয়ে দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেল। ওপরে আলো জ্বলছিল, সামনের ঘরে ঢুকেই টেলিফোন দেখতে পেল। পাশেই একটা চেয়ার। প্রায় নিশ্চিন্ত হয়ে বসে অশোকের নির্দেশমতো একটা করে টেলিফোন করতে শুরু করল। সৌভাগ্যবশত, খড়দহ থানার ও. সি.-কেই পাওয়া গেল। সব শুনে জিগ্যেস করল, 'ব্যাপার কী? যেতে বলছেন কেন?'

'বিক্রমবাবুর বিশেষ বিপদ।' ফটিক উৎকণ্ঠিত স্বরে বলল।

ও. সি.-র গলা শোনা গেল, 'কুড়ি মিনিট, আধঘণ্টার মধ্যে যাচ্ছি।'

ফটিক রিসিভার নামিয়ে মিনিটখানেক অপেক্ষা করে এন্টালি থানায় টেলিফোন করল। এনগেজড। ও নরেনবাবুর নাম্বারের সুযোগ নিল। সরাসরি তাঁকেই পাওয়া গেল। ফটিক নিজের পরিচয় দিয়ে বলল, 'আপনার ড্রাইভার তো নেই এখন?'

'না, কেন?' নরেনবাবুর উদ্বিগ্ন স্বর শোনা গেল।

ফটিক বলল, 'তাহলে লেবুবাবুকে গাড়ি চালিয়ে আপনাকে সুখচরে বিক্রমবাবুর বাড়িতে এখনই নিয়ে আসতে বলুন। জরুরি, ভীষণ জরুরি। আর কোনও কথা নেই। তবে বাড়ির আর কারওকে এখন কিছু বলবেন না।' বলেই লাইন কেটে দিয়ে আবার এন্টালি থানায় টেলিফোন করল। লাইন পাওয়া গেল। ফটিক ও. সি.-কে চাইল। পাওয়া গেল। ফটিক বলল, 'মনে হচ্ছে, মিতা মার্ডারের একটা ক্লু পাওয়া গেছে। আপনি একবার সুখচরে চলে আসুন। খড়দহ থানার আন্ডারে, সুখচর, বিক্রম চ্যাটার্জির বাড়ি।'

'মিতা মার্ডারের ক্লু সুখচরে?' ও. সি.-র অবাক স্বর ভেসে এল, 'আপনি কে বলছেন?'

'অশোক ঠাকুরের বন্ধু, অয়স্কান্ত রায়। দয়া করে একমিনিট সময়ও নষ্ট করবেন না।'

ফটিকের কথা শেষ হওয়ার আগেই নীচে কলিংবেল বেজে উঠল। ও টেলিফোন ছেড়ে দিয়ে দৌড়ে নীচে নামল। সিঁড়ির নীচে কমলা তখনও অচৈতন্য। এখনও মিনিট পনেরো থাকবে। বাইরের ঘরে এসে দেখল, হরি তেমনই পড়ে আছে। এরও জ্ঞান ফিরতে ওইরকম সময়ই লাগবে। ফটিক হরির শরীরটা একপাশে টেনে সরিয়ে দিল। কলিংবেল তখন আর বাজছে না, দরজায় ধাক্কা পড়ছে, আর বিক্রমের ডাক শোনা যাচ্ছে, 'হরি, এই হরি—কমলা।'

ফটিক ঘরের আলো অফ করল। দরজা খুলে দিল। বিক্রম ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকল। তার নিশ্বাসে মদের গন্ধ। চিৎকার করে বলল, 'একী, অন্ধকার কেন?' বলে সে নিজেই চেনা জায়গায় হাত বাড়িয়ে সুইচ অন করে আলো জ্বালাল। ফটিক ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে।

'আপনি?' বিক্রমের স্বর স্খলিত শোনাল।

ফটিক হাসতে জানে না, 'আপনাকে খুঁজতে এসেছিলাম।'

বিক্রমের নজর তখন পড়ে থাকা হরির ওপরে। তাঁর মুখ কঠিন আরক্ত হয়ে উঠল, 'আপনি ওকে মেরেছেন?'

'হ্যাঁ, তেমন না, একটু শুইয়ে রেখেছি।'

হাতে একটা ব্যাগ। আরও কয়েক পা গিয়ে একবার দাঁড়াল, আশেপাশে দেখল। কারোর নিচু স্বর শোনা গেল। বিক্রম দ্রুত বাঁয়ে ফিরে নতুন ভিত খোঁড়া বাড়িটার পাশের দরজার মধ্যে ঢুকে গেল। যে-লোকটা দাঁড়িয়েছিল, সে তেমনি দাঁড়িয়ে রইল। প্রায় একমিনিট। তারপরে ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল।

অশোক ফটিককে হাত ধরে টেনে ঝোপ থেকে বেরিয়ে এসে বলল, 'যা-যা বলেছি, তাই করবি। চলে যা।'

ফটিক নির্দেশ পাওয়ামাত্র উধাও হয়ে গেল। অশোক নতুন ভিত খোঁড়া বাড়ির দিকে এগিয়ে গেল। ওর জামার ভেতরে টিটোর দেওয়া টেপ-রেকর্ডার।

ফটিক বিক্রমের পুরোনো বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়াল। এখন আর আলো জ্বলছে না। পকেট থেকে পেনসিল-টর্চ বের করে জ্বেলে দেখল, কলিংবেল আছে কি না। নেই। ও পাশের নতুন বাড়ির দরজার কাছে গিয়ে টর্চ জ্বালল। কলিংবেল রয়েছে। বেল টিপল। মিনিটখানেক পরে একটি লোক বেরিয়ে এল। সাদাসিধে লোক, মাঝবয়েসি, ধুতির ওপরে একটা ময়লা শার্ট। জিগ্যেস করল, 'কাকে চান?'

'বিক্রমদাকে। পানিহাটি থেকে উকিল অবিনাশবাবু পাঠিয়েছেন। জরুরি দরকার।' ফটিক দরজার ভেতরে একটা পা রাখল।

লোকটা বলল, 'কিন্তু উনি তো একটু কোথায় বেরোলেন। ফিরেই আবার কলকাতায় যাবেন।'

'জানি। কিন্তু আমাকে তাহলে একটু বসতে হবে যে?' ফটিক বলল।

লোকটা ইতস্তত করে বলল, 'আপনি একটু ঘুরে আসুন। কোনও অচেনা লোককে ছোটবাবু বাড়িতে ঢুকতে দিতে বারণ করেছেন।'

'কিন্তু আমাকে যে ভেতরে ঢুকতেই হবে।' ফটিক লোকটিকে সরিয়ে দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল।

লোকটা অবাক হয়ে বলল, 'আপনি জোর করে বাড়িতে ঢুকছেন?'

ফটিক কোনও জবাব না দিয়ে ঝটিতি সামনের ঘরটা দেখে নিল, 'কোনও উপায় নেই ভাই। টেলিফোনটা কোন ঘরে?'

'ফোন দিয়ে আপনার কী দরকার?' লোকটা এবার গলার স্বর চড়াল।

ফটিক ফিরে দরজাটা বন্ধ করল। লোকটির ঘাড়ের ওপর একটি হাত রেখে বলল, 'তাড়াতাড়ি আমাকে টেলিফোনের কাছে নিয়ে চলো। বিক্রমবাবুর সামনে খুব বিপদ।'

লোকটা ফটিকের হাত ঘাড় থেকে নামিয়ে প্রায় দৌড়ে পাশের ঘরে গেল, চিৎকার করে ডাকল, 'কমলা, কমলা, এদিকে এসো।'

লোকটির কথা শেষ হওয়ার আগেই ফটিকের হাতটা বিদ্যুৎগতিতে উঠল, আর লোকটির মুন্ডুতে আঘাত করল।

সে ঘুরে পড়ে যাওয়ার আগেই ফটিক অচৈতন্য লোকটিকে ঠেলে বাইরের ঘরে ঢুকিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিল। মুখ ফিরিয়ে দেখল, বাঁদিকের দরজা দিয়ে বছর তিরিশ বয়েসের একটি স্ত্রীলোক ঢুকতে-ঢুকতে বলল, 'কী হল, হরিদা?'

'টেলিফোনটা কোথায়?' ফটিক জিগ্যেস করল।

কমলা অবাক, 'তুমি কে? হরিদা কোথায়? টেলিফোন তো দোতলায়।'

'হরিদা একবার বাইরে গেল। আমাকে বিক্রমদা পাঠিয়েছে, উকিলকে এখনই একটা টেলিফোন করতে হবে। সিঁড়িটা কোনদিকে?'

কমলা একবার পিছন ফিরে দেখে আবার সন্দেহের চোখে তাকাল, 'ছোটবাবু তো এই মাত্তর কোথায় গেলেন, এখনি আসবেন।'

'জানি। হরি ডাকতে গেছে। তুমি আমাকে সিঁড়িটা দেখাও।'

কমলার চোখে এখন সন্দেহ নিবিড়, 'কে তুমি, চিনিনে শুনিনে, তোমাকে দোতলায় যেতে দেব কেন?'

ফটিক কমলার পিছন ফিরে একবার তাকানো দেখেই বুঝে নিয়েছিল, সিঁড়িটা ওই দরজার ভেতরে। ও দ্রুত এগিয়ে গেল। দু-হাতে কমলার মাথাটা যেন ঝাপটে দিল। কমলা তৎক্ষণাৎ লুটিয়ে পড়ল। ফটিক কমলাকে নিয়ে দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকল। ডানদিকে সিঁড়ি। কমলার অচৈতন্য শরীরটা সিঁড়ির নীচে ঢুকিয়ে দিয়ে দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেল। ওপরে আলো জ্বলছিল, সামনের ঘরে ঢুকেই টেলিফোন দেখতে পেল। পাশেই একটা চেয়ার। প্রায় নিশ্চিন্ত হয়ে বসে অশোকের নির্দেশমতো একটা করে টেলিফোন করতে শুরু করল। সৌভাগ্যবশত, খড়দহ থানার ও. সি.-কেই পাওয়া গেল। সব শুনে জিগ্যেস করল, 'ব্যাপার কী? যেতে বলছেন কেন?'

'বিক্রমবাবুর বিশেষ বিপদ।' ফটিক উৎকণ্ঠিত স্বরে বলল।

ও. সি.-র গলা শোনা গেল, 'কুড়ি মিনিট, আধঘণ্টার মধ্যে যাচ্ছি।'

ফটিক রিসিভার নামিয়ে মিনিটখানেক অপেক্ষা করে এন্টালি থানায় টেলিফোন করল। এনগেজড। ও নরেনবাবুর নাম্বারের সুযোগ নিল। সরাসরি তাঁকেই পাওয়া গেল। ফটিক নিজের পরিচয় দিয়ে বলল, 'আপনার ড্রাইভার তো নেই এখন?'

'না, কেন?' নরেনবাবুর উদ্বিগ্ন স্বর শোনা গেল।

ফটিক বলল, 'তাহলে লেবুবাবুকে গাড়ি চালিয়ে আপনাকে সুখচরে বিক্রমবাবুর বাড়িতে এখনই নিয়ে আসতে বলুন। জরুরি, ভীষণ জরুরি। আর কোনও কথা নেই। তবে বাড়ির আর কারওকে এখন কিছু বলবেন না।' বলেই লাইন কেটে দিয়ে আবার এন্টালি থানায় টেলিফোন করল। লাইন পাওয়া গেল। ফটিক ও. সি.-কে চাইল। পাওয়া গেল। ফটিক বলল, 'মনে হচ্ছে, মিতা মার্ডারের একটা ক্লু পাওয়া গেছে। আপনি একবার সুখচরে চলে আসুন। খড়দহ থানার আন্ডারে, সুখচর, বিক্রম চ্যাটার্জির বাড়ি।'

'মিতা মার্ডারের ক্লু সুখচরে?' ও. সি.-র অবাক স্বর ভেসে এল, 'আপনি কে বলছেন?'

'অশোক ঠাকুরের বন্ধু, অয়স্কান্ত রায়। দয়া করে একমিনিট সময়ও নষ্ট করবেন না।'

ফটিকের কথা শেষ হওয়ার আগেই নীচে কলিংবেল বেজে উঠল। ও টেলিফোন ছেড়ে দিয়ে দৌড়ে নীচে নামল। সিঁড়ির নীচে কমলা তখনও অচৈতন্য। এখনও মিনিট পনেরো থাকবে। বাইরের ঘরে এসে দেখল, হরি তেমনই পড়ে আছে। এরও জ্ঞান ফিরতে ওইরকম সময়ই লাগবে। ফটিক হরির শরীরটা একপাশে টেনে সরিয়ে দিল। কলিংবেল তখন আর বাজছে না, দরজায় ধাক্কা পড়ছে, আর বিক্রমের ডাক শোনা যাচ্ছে, 'হরি, এই হরি—কমলা।'

ফটিক ঘরের আলো অফ করল। দরজা খুলে দিল। বিক্রম ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকল। তার নিশ্বাসে মদের গন্ধ। চিৎকার করে বলল, 'একী, অন্ধকার কেন?' বলে সে নিজেই চেনা জায়গায় হাত বাড়িয়ে সুইচ অন করে আলো জ্বালাল। ফটিক ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে।

'আপনি?' বিক্রমের স্বর স্খলিত শোনাল।

ফটিক হাসতে জানে না, 'আপনাকে খুঁজতে এসেছিলাম।'

বিক্রমের নজর তখন পড়ে থাকা হরির ওপরে। তাঁর মুখ কঠিন আরক্ত হয়ে উঠল, 'আপনি ওকে মেরেছেন?'

'হ্যাঁ, তেমন না, একটু শুইয়ে রেখেছি।'

বিক্রমের চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল। পায়ে-পায়ে ফটিকের দিকে এগোল। চিবিয়ে-চিবিয়ে বলল, 'জীবনের ভয় নেই? হরি শুয়ে আছে, তোমাকে চিরদিনের মতোই শুইয়ে দেব।'

'সেটা ঠিক হবে না বিক্রমবাবু।' খোলা দরজায় অশোক এসে দাঁড়াল, 'আর কতজনকে চিরদিনের মতো শোয়াবেন?'

বিক্রম ঝটিতি পিছন ফিরে তাকাল। অশোকের গলায় ঝোলানো টেপ-রেকর্ডার।

বিক্রমের শক্ত স্বর আবার বিহ্বল হয়ে গেল, 'অশোক ঠাকুর। কিন্তু এখানে কেন?'

'মিতাকে ওভাবে খুন করলেন কেন, সেই জবাবটা এখনও পাইনি।' অশোক বলল, 'তবে অনুমান করেছি।'

বিক্রম অশোকের দিকে পা বাড়াল। একটা জিপ এসে দাঁড়াল দরজার কাছে। হেডলাইটের আলো অন করা। খড়দহ থানার ও. সি. এসে ঢুকলেন। সকলের দিকে একবার দেখে অশোককে জিগ্যেস করলেন, 'কী ব্যাপার?'

'ট্রেসপাস।' বিক্রম বলে উঠল, 'ক্রিমিনাল ট্রেসপাস। ওই দেখুন, আমার চাকরকে মেরে ফেলে রেখেছে।'

অশোক হাসল, ও. সি.-কে বলল, 'হ্যাঁ, ট্রেসপাস। বসুন, কথা হবে।' ফটিক জিগ্যেস করল, 'সবাইকে জানানো হয়েছে?'

'হয়েছে। এন্টালি থানার ও. সি. আর নরেনবাবু আসছেন।' ফটিক বলল।

ও. সি. বললেন, 'কিছু বুঝতে পারছিনে। আগে বসি।'

বিক্রমের সুখচরের নতুন বাড়ির বাইরের ঘরে খড়দহ ও এন্টালি থানার ও. সি., একপাশে নরেনবাবু বসেছেন। তাঁর পিছনে লেবু দাঁড়িয়ে। হরির জ্ঞান ফিরেছে। সে ভেতরে। ফটিক বিক্রমের পাশে পাথরের মূর্তির মতো সটান খাড়া। ইতিমধ্যে খড়দহ থানার ও. সি. ঠাকুরদাস মণ্ডলকেও ডাকিয়ে এনেছেন। সে ঘরের এক কোণে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে। অশোক সকলের সঙ্গে সোফায় বসে। সেন্টার টেবিলের ওপর টেপরেকর্ডার, আর কাগজের মোড়ক খোলা হিরে।

অশোক বলল, 'ব্যাপারটা একদিকে যেমন সোজা, তেমনি জটিল। জটিলতাব মূলে পারমিতাও অনেকটা দায়ী। বিক্রমবাবু মিতাকে পাওয়ার জন্যে পাগল ছিলেন, পেয়েও ছিলেন। মাফ করবেন, ওম্যানাইজিং কথাটার যথার্থ অর্থ আমার জানা নেই, কিন্তু বিক্রমবাবুকে আমি একটা আখ্যা দিতে চাই, এ মাস্টারমাইন্ড অফ ওম্যান, নইলে মিতাকে তিনি কাবু করতে পারতেন না। যার ফলে কনসেপশন। যোগাযোগটা গোপনে হত। মিতার নিশ্চয় বিক্রমবাবুর ওপর একটু দুর্বলতা ছিল। উনি সে-সুযোগ নিয়েছেন।'

'মিথ্যে কথা।' বিক্রম গর্জন করল।

অশোক হাসল, 'আপনাকে আর মিতার ফটো দেখে চৌরঙ্গির সেই বিখ্যাত হোটেলের রিসেপশনিস্ট দুটি মেয়েই শনাক্ত করবে, ভয় নেই। মিতা যদি আপনাকে ভয় না দেখাত, যে ও অ্যাবরশন করাবে না, তাহলে এই খুনটা আপনাকে করতে হত না। কিন্তু জেনে রাখুন, মিতা অ্যাবরশন করাত। নীপা দেবীকে সে বলেও ছিল, বাড়ি থেকে কয়েকদিনের জন্যে একলা কোথাও বেড়াতে যাবে। তার মানেই কোনও ক্লিনিকে যাওয়ার মনস্থ করেছিল। আপনার সবুর সইল না, খুনের প্ল্যান করে ফেললেন। এখন বাগানের পাঁচিলে যে আঙুলের আর হাতের দাগ পাওয়া গেছে, তার সঙ্গে আপনারটা মেলালেই প্রমাণ হয়ে যাবে।

'মিতাকে বাগানে ডেকে মারতে গিয়ে বিক্রমবাবু তাঁর হিরের আংটির আসল হিরেটা

খোয়ালেন, মানে খুলে পড়েছিল। সেটা খোঁজবার দায়িত্ব দিয়েছিলেন পূর্ণিমাকে। বিক্রমবাবু রান্নাঘরের জানলার ফাঁক দিয়ে আমার বন্ধু ফটিককে বাগানে পড়ে যেতে দেখেই বুঝে ফেলেছিলেন, ফটিক হিরেটা খুঁজে পেয়েছে। তখনই তিনি পূর্ণিমাকে পালাবার নির্দেশ দিয়ে কোনও এক জায়গায় অপেক্ষা করতে বলেছিলেন। আমার আর ফটিকের চোখকে ফাঁকি দেওয়ার জন্যে, জেরার সময় পান্নার আংটি পরে এসেছিলেন, যেন আমরা ভাবি, উনি হিরে ব্যবহার করেন না। শুধু এই কারণেই, দিনের বেলা, একটা মেয়েকে গাড়ির মধ্যে তুলে পায়ের নীচে শুইয়ে গলায় ফাঁস পরিয়ে মারতে হয়েছে, আর খুব রিসক নিয়েই সেই বডি বন্ডেল ব্রিজের পাশে ফেলে দিয়েছিলেন। এখন যে-হিরেটা বিক্রমবাবুর হাতে দেখছেন, ওটা আসল হিরে নয়, নকল। চেনাশোনাদের চোখের সামনে যাতে দেখাতে পারেন, সবই ঠিক আছে।'

'কিন্তু মামলাটা? মণ্ডলদের সঙ্গে?' খড়দহ থানার ও. সি. জিগ্যেস করলেন।

নরেন্দ্রনাথও ঘাড় ঝাঁকালেন। অশোক বলল, 'বিক্রমবাবু তো এইমাত্র মণ্ডলবাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন। দেখুন, আমি বায়োলজি জানিনে, দু-মুখো সাপ হয় কি না, তাও জানিনে। তবে সাপ বোধহয় ব্যাক গিয়ার দিতে পারে। বিক্রমবাবু মণ্ডলদের বাড়িতে ক্রিমিনাল ট্রেসপাস, মেয়েদের অ্যাসল্ট করা, সবই অ্যালিবাই হিসাবে ভালো সাজিয়েছিলেন, অবিশ্যি হরি মিথ্যে টেলিফোন করেনি, কারণ, ভিত খোঁড়াটাও ঠাকুরদাসের সঙ্গে প্রি-প্ল্যানড। মামলাটা সাজানো, তবে খুবই সার্থকভাবে। কিন্তু মুশকিল হল, সন্ধে সাতটা থেকে রাত্রি সাড়ে ন'টা পর্যন্ত বিক্রমবাবু কোথায় ছিলেন, সেটা প্রমাণ করতে পারবেন না। কারণ পানিহাটিতে উকিলের বাড়িতে উনি গেছলেন রাত্রি দশটায়, সেটা উকিল অবিনাশবাবুই আপনাদের বলবেন। একদিকে সুখচরে এক অনিচ্ছাকৃত অপরাধ, অন্যদিকে ডেলিবারেট মার্ডার, এতেই আমি দু-মুখো সাপের সঙ্গে তুলনা দিচ্ছি। এবার শুনুন, এই টেপরেকর্ডার, ঘণ্টা-দেড়েক আগে তোলা।' বলে ও টেপটা চালিয়ে দিল।

প্রথমেই ঠাকুরদাসের গলা, 'এসো ছোটবাবু, বাগানের সে মালটি খুঁজে পেলে?' বিক্রমের স্বর, 'না, সেটা বোধহয় এক শালা টিকটিকির হাতে পড়েছে। তবে সাক্ষী মেয়ে—পূর্ণিটাকে খতম করে দিয়েছি, ওটা নিয়ে আর ভাবছিনে, কিন্তু আমি অস্বস্তিবোধ করছি। অশোক ঠাকুর নামে একটা বাস্তুঘুঘু পেছনে লেগেছে, শালা অন্ধকারের সাপের থেকেও নাকি ভীষণ।' কোনও মেয়ের গলা, 'কিন্তু মামলাই তোমাকে বাঁচাবে। আসল কাজ তো গুছিয়েই রেখেছ গো ছোটবাবু।'...বিক্রমের স্বরের আগে বোতলের ছিপি খোলার শব্দ, 'হ্যাঁ সেটাই যা ভরসা। এখন তুমি জল গেলাস নিয়ে এসো তো মঙ্গলা, আমার পাশে একটু বোসো। আমার আর কিছু ভালো লাগছে না। অপুটা যদ্দিন না এখানে আসে ততই ভালো।'...ঠাকুরদাসের গলা, 'হ্যাঁ বউ, তুমি থাকো ছোটবাবুর কাছে, তোমার ননদকেও ডেকে নাও। আমি বাইরে গিয়ে পাহারা দিচ্ছি। তবে দেখবেন ছোটবাবু, এই জমি যেন আমি পাই।'...বিক্রমের স্বর, 'পাবে-পাবে, যা চাইবে, তাই পাবে।' কয়েক সেকেন্ডের নীরবতা, মঙ্গলার স্বর, 'আহা, একেবারে জামাকাপড় খুলে দিচ্ছ যে গো, ছোটবাবু—।'...আবার কয়েক সেকেন্ড নীরবতা, মঙ্গলার গলা, 'ওই দ্যাখো, ননদ এসে গেছে, ছোটবাবু।'...ভিন্ন মেয়ের গলা, 'ননদকে আর ডেকো না বউদি, ছোটবাবুকে এখন আমার ভয় করে, কোনদিন আমাদেরও গলা টিপে শেষ করবে।'...খিলখিল হাসি, বিক্রমের গলা, 'ওসব কথা রাখো, দুজনে আমাকে একটু জুড়োতে দাও, আমার যেন সব জ্বলে যাচ্ছে। আর থেকে-থেকে মনটাও কেমন খারাপ হয়ে যাচ্ছে।'...আবার মেয়ে গলার খিলখিল হাসি...।

'উহ্, অসহ্য, বন্ধ করুন, অশোকবাবু।' নরেন্দ্রনাথ অস্ফুটে আর্তনাদ করে উঠলেন।

অশোক সঙ্গে-সঙ্গে টেপরেকর্ডার থামিয়ে দিল, তাকাল সকলের মুখের দিকে। নরেন্দ্রনাথ দু-হাতে মুখ ঢেকে আছেন। বাকিরা স্তব্ধ। বিক্রমের মাথা নিচু। ঠাকুরদাস হেঁচকি তুলে কাঁদছে। অশোক দুই ও. সি.-র দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করল, 'টেপটা কি আর আপনারা শুনবেন?'

খড়দহ ও. সি. বললেন, 'কোনও দরকার নেই আর।'

'তবে বিক্রম চ্যাটার্জিকে আমিই নিয়ে যাব।' এন্টালি থানার ও. সি. বললেন, 'আপনি ঠাকুরদাস আর তার ফ্যামিলির যাকে-যাকে দবকার, অ্যারেস্ট করে নিয়ে যান।'

অশোক টেপরেকর্ডার থেকে টেপটা খুলে নিয়ে বেকর্ডারটা এন্টালি থানার ও. সি.-কে দিয়ে বললেন, 'এটা টিটো গাঙ্গুলির, ওঁকে ডেকে দিয়ে দেবেন। উনি আজ খুব উপকাব কবেছেন, পরে সেসব বলব। আর টেপটা আজ আমি নিয়ে যাচ্ছি, কাল কলকাতায় আপনাদেব কাছে জমা দেব।' বলে ও উঠে দাঁড়াল, তাকাল নরেন্দ্রনাথের দিকে, 'নরেনবাবু, আমি আপনার কথা রেখেছি।'

নরেনবাবু মুখ না তুলে, মাথা ঝাঁকালেন, রুদ্ধ স্বরে বললেন, 'বড় সাংঘাতিকভাবেই রেখেছেন, আপনার ফি-র টাকাটা—।'

'পরে হবে। চল ফটিক, আমরা যাই।' অশোক ডাকল।

ফটিক অশোকের পাশে এসে দাঁড়াল। অশোক বিক্রমের দিকে ফিবে বলল, 'বিক্রমবাবু, এ-ঘটনা শুনে অর্পিতা দেবী হয়তো খুব আশ্চর্য হবেন না।' ফটিকের হাত ধবে বেবিয়ে গেল।

ভোর রাতের আর্তনাদ



নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

পাঁচ নম্বর পীতাম্বর চৌধুরি লেনের একতলার ভাড়াটে নকুলচন্দ্র বিশ্বাস যে খুন হয়েছে, বাড়িওয়ালা সদানন্দবাবুই সে-কথা প্রথম জানতে পারেন কিনা, বলা শক্ত, তবে তার ডেডবডি যে তিনিই প্রথম দেখেছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু সে-সব কথা যথাসময়ে হবে। ভদ্রলোকের পরিচয়টা আগে দেওয়া দরকার।

সদানন্দবাবুর পুরো নাম সদানন্দ বসু। সস্ত্রীক তিনি দোতলায় থাকেন। আগে একটা সওদাগরি কোম্পানির শিপিং ডিপার্টমেন্টে কাজ করতেন, বার দুয়েক এক্সটেনশান পাবার পরে রিটায়ার করেছেন। তা সেও প্রায় বছর দশেক হল।

ভদ্রলোকের বয়স এখন বাহাত্তর। সন্তানাদি হয়নি, তবে তা নিয়ে তাঁর কোনও আক্ষেপ নেই। বরং অন্যেরা আক্ষেপ করলে বলেন, 'রাখুন মশাই! ছেলে হলেই যে সেটা বনমানুষ না হয়ে মানুষ হত, তার কোনও গ্যারান্টি আছে? গুন্ডার দলে নাম লিখিয়ে ব্যাটা হয়তো বোমবাজি করে বেড়াত, আর আমাকে তার হ্যাপা সামলাতে হত। না রে ভাই, তার চেয়ে এই দিব্যি আছি।'

সদানন্দবাবু সত্যিই যে 'দিব্যি' আছেন. এটা যে নেহাত কথার কথা নয়, সে তাঁর মুখ দেখলেই বোঝা যায়। পার্ক সার্কাস এলাকার যে বাড়িটাতে এর আগে আমি থাকতুম, বাড়িওয়ালা সেটা বিক্রি করে দেওয়ায় বছর দশেক আগে আমি এখানে উঠে আসি। পাড়াটা ঘিঞ্জি, প্রথম-প্রথম তাই একটুও ভালো লাগত না। কিন্তু সবই তো আস্তে-আস্তে সয়ে যায়, আমারও গিয়েছে। তা ছাড়া সদানন্দবাবুর মতো একজন প্রতিবেশী যে পেয়েছি, এটাকেও আমার মস্ত একটা সৌভাগ্য বলে মনে হয়। সদানন্দ সত্যিই সার্থকনামা পুরুষ। মুখ নাকি মনের আয়না। তা সদানন্দবাবুর ক্ষেত্রে সেই আয়নাটা আমি কখনও ঝাপসা হতে দেখিনি, প্রশান্ত হাস্যে ভদ্রলোকের মুখখানা একেবারে ঝকঝক করত।

হালে অবশ্য সেই ঝকঝকে মুখেই একটু-একটু মেঘ জমতে শুরু করেছিল। কিন্তু সে-কথায় একটু পরে আসছি।

সদানন্দবাবুর বয়স যে সত্তর ছাড়িয়েছে, সেটা আমি তাঁরই কাছে শুনি। দেখে অবশ্য বয়স বুঝবার উপায় নেই। ভদ্রলোকের চুল এখনও পুরোপুরি পাকেনি, সাদার হামলার বিরুদ্ধে কালো এখনও সমানে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। বছর দুয়েক আগে ছানি কাটিয়েছিলেন; দৃষ্টিশক্তি তার পরেও পুরোপুরি স্বাভাবিক হয়নি বটে, তবে দেহযন্ত্রের অন্য কোনও কলকবজায় জং ধরেছে বলে মনে হয় না। শরীর মোটামুটি পোক্ত। উদরে মেদ জমতে দেননি, টান হয়ে হাঁটাচলা করেন।

আমি রোগাভোগা মানুষ। একে তো খবরের কাগজে কাজ করি বলে স্বাস্থ্যের ব্যাপারে নিয়ম-টিয়ম মেনে চলার উপায়ই নেই, তার ওপরে আবার নিয়ম-টিয়ম মেনে চলবার উপায় থাকলেই যে মান্যি করতুম তাও নয়। বেশ কিছুকাল ধরেই আমাকে তার মাশুল গুনতে হচ্ছে। অম্বলের অসুখ তো আছেই, তার সঙ্গে জুটেছে গেঁটেবাতের যন্ত্রণা। শীত পড়লেই আঙুলের গাঁট ফুলে যায়, ভালো করে তখন কলমটা পর্যন্ত ধরতে পারি না, ব্যথায় যেন হাতখানা একেবারে ঝনঝন করতে থাকে।

সদানন্দবাবু বলেন, 'সিগারেটটা ছাড়ুন মশাই। চা অবশ্য আমিও ছাড়তে পারিনি, আপনিও পারবেন বলে মনে হয় না, তবে এই যে দিনের মধ্যে পনেরো-বিশ কাপ চা খাচ্ছেন, এটা তো একেবারে সর্বনেশে ব্যাপার। মেরেকেটে তিন কাপ পর্যন্ত চলতে পারে। ঘুম থেকে উঠে এক কাপ, সকালে জলখাবারের সময় এক কাপ আর বিকেলে এক কাপ। ব্যস, ওই হচ্ছে লিমিট। তাও দুধ নয়, চিনি নয়, স্রেফ হালকা লিকার। দেখবেন, অম্বলের অসুখ একেবারে বাপ-বাপ বলে পালাবে।'

বেজার হেসে আমি বলি, 'তা কি পারব?'

'পারতেই হবে। নইলে বাঁচবেন কী করে? আর হ্যাঁ, মর্নিং ওয়াকটা ধরুন। ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠে, চোখমুখ ধুয়ে, হালকা এক কাপ চা খেয়ে রোজ মাইল দুয়েক হেঁটে আসুন দেখি, স্রেফ

মাসখানেকের মধ্যেই টের পেয়ে যাবেন যে শরীরের কলকবজাগুলো আবার ঠিকমতো চলতে শুরু করেছে।'

'আপনি রোজ মর্নিং ওয়াক করেন?'

"করি বইকী।" একগাল হেসে সদানন্দবাবু বলেছিলেন, 'ঘড়িতে রোজ দম দিতে হয় না? তা এই মর্নিং ওয়াকটা হচ্ছে শরীরটাকে দম দেওয়ার ব্যাপার। দমটা নিয়মিত দিচ্ছি বলেই ঘড়িটা এখনও বন্ধ হয়নি, একেবারে কাঁটায়-কাঁটায় কারেক্ট টাইম দিয়ে যাচ্ছে।'

এসব কথা বছর দশেক আগেকার। সদ্য তখন আমি পার্ক সার্কাস থেকে মধ্য-কলকাতার এই গলিতে এসে ঢুকেছি। খবরের কাগজে কাজ করি, দুপুর এগারোটা-বারোটা নাগাদ বাড়ি থেকে বেরোই, কাজ চুকিয়ে বাড়ি ফিরতে-ফিরতে রাত ন'টা-দশটা বেজে যায়। রবিবারটা ছুটির দিন, রাস্তায় কি বাজারে সে-দিন সদানন্দবাবুর সঙ্গে দেখাও হয়। দেখা হলে উনিও নমস্কার করেন, আমিও করি। কিন্তু কথাবার্তা বিশেষ এগোয় না।

এই রকমেরই এক রবিবারের সকালবেলা। বাজার থেকে ফিরে রান্নাঘরে আনাজ আর মাছের থলি নামিয়ে রেখে বসবার ঘরে ঢুকে সদ্য সেদিনকার কাগজের ওপরে চোখ বুলোতে শুরু করেছি, এমন সময় কলিং বেল বেজে উঠল। দরজা খুলে দেখি সদানন্দবাবু দাঁড়িয়ে আছেন। বললুম, 'আরে কী আশ্চর্য, আসুন, আসুন।'

ভদ্রলোক হাসতে-হাসতে ঘরে ঢুকলেন, তারপর একটা সোফায় বসে হাসতে-হাসতেই বলেন, 'আপনি নতুন এসেছেন, তাই খবর নিতে এলুম কোনও অসুবিধে হচ্ছে কি না। অবশ্য আরও আগেই আমাব আসা উচিত ছিল। কোনও ব্যাপারে যদি দরকার হয় তো নিঃসঙ্কোচে জানাবেন, যদি কিছু করতে পারি তো খুশি হয়ে করব। আমার বাড়িটা আপনি চেনেন তো?'

বললুম, 'চিনব না কেন? বলতে গেলে আমাদের প্রায় উলটোদিকেই তো আপনারা থাকেন, তাই না?'

সদানন্দবাবু বললেন, 'হ্যাঁ, আমরা থাকি পাঁচ নম্বরে। দোতলায় থাকি।'

'একতলায় কারা থাকেন?'

'কেউ না। একতলাটা ফাঁকাই পড়ে আছে। ভাড়াটে বসাইনি, বসাবার ইচ্ছেও নেই।'

'কেন?'

'ও মশাই অনেক ঝঞ্ঝাট। আজ বলবে, রান্নাঘরের কলের ওয়াশারটা কেটে গেছে, প্লাম্বার ডেকে সারিয়ে দিন; কাল বলবে, শোবার ঘরের ছিটকিনিটা ঠিকমতো লাগানো যাচ্ছে না, ছুতোর ডেকে আনুন। ওসব ঝঞ্ঝাট কে সামলাবে? এক-একটা ভাড়াটে এমন পাজি হয় যে, সে আর কহতব্য নয়।'

আমার বাড়ি নেই, অন্যের বাড়িতে ভাড়াটে হয়ে আছি, তাই সদানন্দবাবুর কথায় আমি প্রাণ খুলে হাসতে পারলুম না। কাষ্ঠ হেসে বললুম, 'তা বটে।'

সদানন্দবাবু বললেন, 'ও-কথা ছাড়ুন। এখন কী জন্যে এসেছি, তা-ই বলি। কাল বিকেলে আপনার মিসেস আমাদের বাড়িতে গিয়েছিলেন।'

বললুম, 'তাই বুঝি?'

'হ্যাঁ। আমার গিন্নিরও তাই আসা উচিত ছিল। কিন্তু তিনি বাতের রুগি, হাঁটাচলা করতে কষ্ট হয়, তাই আমাকে একাই আসতে হল। তা ছাড়া আরও এইজন্যে এলুম যে, আপনার অসুখের কথা আমি শুনেছি। ওটা আমি সারিয়ে দেব।'

অবাক হয়ে বললুম, 'আমার আবার কী অসুখ?'

সদানন্দবাবু বললেন, 'সে কী, আপনার হাইপার-অ্যাসিডিটি নেই? বুক-জ্বালা নেই? চোঁয়া-ঢেকুর ওঠে না? আপনার স্ত্রী তো আমার স্ত্রীকে কাল তা-ই বলে এলেন।'

বাসন্তী এসে ঘরে ঢুকল। সদানন্দবাবুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনার গলা শুনে এলুম। এক্ষুনি চলে যাবেন না যেন। চা করে আনছি।'

সদানন্দবাবু বললেন, 'তা আনুন, তবে চায়ের সঙ্গে দুধ-চিনি চলবে না।'

জিগ্যেস করলুম, 'ডাক্তারের নিষেধ?'

'ডাক্তারের নয়, গুরুর নিষেধ। গুরু মানে সাক্ষাৎ মহাগুরু, অর্থাৎ আমার পিতৃদেব। তিনি বলতেন, চা খাচ্ছ খাও, কিন্তু খবরদার, তার সঙ্গে দুধ-চিনি খাবে না। খেয়েছ কি মরেছ, সারা জীবন অম্বলের ব্যথায় কষ্ট পেতে হবে।'

আমি বললুম, 'তা-ই?'

সদানন্দবাবু বললেন, 'অফ কোর্স। সার পি. সি. রায় বলতেন, চা-পান মানেই বিষপান, আব আমার স্বর্গত পিতৃদেব বলতেন, বিষপান তো বটেই, তবে কিনা দুধ চিনি মিশিয়ে যদি খাই।'

বাসন্তী বলল, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে, আপনার জন্যে স্রেফ লিকাব, কেমন?'

'হ্যাঁ, স্রেফ লিকার, তাও খুব হালকা হওয়া চাই।'

বাসন্তী চলে গেল।

সদানন্দবাবু আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'দিনে আপনি ক'কাপ চা খান?'

হেসে বললুম, 'কী করে বলব? গুনে তো কখনও দেখিনি।'

'তাও?'

'তা পনেরো-বিশ কাপ তো বটেই।'

'দুধ-চিনি মিশিয়ে?'

'বিলক্ষণ।'

'সিগারেটও পনেরো-বিশটা?'

'পনেরো-বিশটা কী বলছেন, চল্লিশ-পঞ্চাশটা তো হবেই।'

কথাটা শুনে ভদ্রলোক কিছুক্ষণ স্রেফ হাঁ করে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'তা হলে মশাই আমি তো কোন ছার, বিধান রায় বেঁচে নেই, কিন্তু বেঁচে থাকলেই বা কী হত, তিনিও আপনাকে বাঁচাতে পারতেন না। যদি বাঁচতে চান তো সিগারেট ছাড়ুন, আর চা-ও মাত্র তিন কাপ, তাও দুধ-চিনি না দিয়ে স্রেফ হালকা লিকার। পাববেন?'

'পারা শক্ত। কিন্তু যদি পারি, মানে ধরুন যে, আমি পেরেই গেলুম, তা হলেই কি আব অম্বল আমাকে জ্বালাবে না?'

চওড়া হেসে সদানন্দবাবু বললেন, 'তবে আর বলছি কী। অম্বল কি আর আপনাব একার অসুখ, এই কলকাতার অন্তত নাইনটি পার্সেন্ট লোক অম্বলে ভোগে। অম্বল আমার গিন্নিরও ছিল। কিন্তু এখন আর নেই। কেন নেই? না মাথার দিব্যি দিয়ে আমি তাঁর ওই দুধ-চিনি দিয়ে চা খাওয়ার অভ্যেসটা ছাড়িয়েছি। বাতব্যাধিও ছাড়িয়ে দিতে পারতুম। পারলুম না কেন জানেন?'

'কেন?'

কাজের মেয়েটি এসে চা-জলখাবার দিয়ে গেল। সদানন্দবাবুর জন্যে স্রেফ হালকা লিকার। ভদ্রলোক তাঁর জলখাবারের প্লেটটা ছুঁলেন না পর্যন্ত। বললেন, 'জলখাবার আমি খেয়ে এসেছি, এক সকালে দুবার জলখাবার খেতে পারব না। তবে হ্যাঁ, আপনাদের এখানে চা খেতে বলবেন, সেটা জানতুম তো, তাই বাড়িতে আর সেকেন্ড কাপ চা খাইনি।'

ভদ্রলোক চায়ে চুমুক দিলেন, তারপর বললেন, 'কী কথা যেন হচ্ছিল?'

'আপনার স্ত্রীর বাতব্যাধি কেন সারাতে পারলেন না, সেই কথা।'

'ও হ্যাঁ, তা হলে শুনুন, রোজ যদি আমার সঙ্গে বেরিয়ে দু-মাইল মর্নিং ওয়াক করতেন,

তা হলে ওটাও সেরে যেত। তা ভদ্রমহিলা সকাল সাতটার আগে বিছানা ছেড়ে উঠতেই পারেন না যে!'

'মাথার দিব্যি দিয়েছিলেন?'

'দিয়েছিলুম বইকী, কিন্তু তাও পারলেন না। আরে মশাই, সাতটায় ঘুম থেকে উঠলে কি আর মর্নিং ওয়াক হয়? তখন রোদ্দুর উঠে যায়। হাঁটায় তখন আর মজা থাকে না।'

নিজের চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে বাসন্তী ইতিমধ্যে ঘরে এসে ঢুকেছিল। বলল, 'আপনি কখন ঘুম থেকে ওঠেন?'

'সাড়ে চারটেয়।'

'ওরে বাবা,' বাসন্তী যেন আঁতকে উঠল, 'ওই সময়ে ওঠা যায় নাকি?'

'কেন যাবে না, তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লেই তাড়াতাড়ি ওঠা যায়। আর্লি টু বেড অ্যান্ড আর্লি টু রাইজ...ছেলেবেলায় পড়া সেই ছড়াটা তো আর ভুলে যাইনি, তাই সাড়ে ন'টার মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ি, আর উঠেও পড়ি কাঁটায়-কাঁটায় একেবারে সাড়ে চারটেয়। হিসেব করে দেখুন, ঝাড়া সাত ঘণ্টা ঘুমোই। কম হল?'

ঢোক গিয়ে বললুম, 'না, তা হল না বটে, তবে অত সকাল-সকাল শুয়ে পড়ব কী করে? অফিস থেকে বাড়িতে ফিরতে-ফিরতেই তো দশটা বেজে যায়। তারপর খাওয়া আছে, টুকটাক লেখাপড়ার কাজও থাকে, শুতে-শুতে সেই বারোটা। সকাল সাতটার আগে তা হলে আর কী করে উঠব। মর্নিং ওয়াকই বা কী করে করব?'

সদানন্দবাবুর চা খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। বাসন্তীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তা হলে আর আমার কিছু করবার নেই। মর্নিং ওয়াক না-করলে আপনার কর্তার ওই গেঁটে বাত সারবে না। তবে সিগারেটটা যদি ছাড়িয়ে দিতে পারেন, আর দুধ-চিনি বাদ দিয়ে আমি যেরকম চা খেলুম, কিরণবাবুর যদি তাতে আপত্তি না হয়...তবে হ্যাঁ, তিন কাপের বেশি খাওয়া চলবে না...অম্বল তা হলে সারবেই।'

বাসন্তী বলল, 'ওষুধ খাওয়ার দরকার নেই?'

'কিচ্ছু না। আজ তা হলে চলি। পরে আবার খবর নেব।'

সদানন্দবাবু চলে গেলেন।

তা এ হল দশ বছর আগের কথা। সদানন্দবাবুর কথামতো আমি মর্নিং ওয়াকটা ইতিমধ্যে ধরতে পারিনি বটে, তবে চায়ের পেয়ালা থেকে দুধ-চিনি একেবারে বাদ দিয়েছি। সিগারেটটা অবশ্য অনেক চেষ্টা করেও ছাড়তে পারছি না, তবে আগের চেয়ে অনেক কম খাই। মেরেকেটে চার-পাঁচটা। তা দেখছি, ভদ্রলোক মোটেই বাড়িয়ে বলেননি। সত্যি আর এখন আমার অম্বল হয় না, বুকজ্বালা করে না, চোঁয়া ঢেকুরও ওঠে না। গেঁটে বাতের ব্যাপারটা অবশ্য এখনও আমাকে সমানে জ্বালাচ্ছে। তাই ভাবছিলুম যে, শিগগিরই তো রিটায়ার করব, তখন তো আর রাত দশটায় বাড়ি ফিরতে হবে না, তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ব, উঠেও পড়ব তাড়াতাড়ি, তারপরে সদানন্দবাবুর সঙ্গে রোজ বেরিয়ে পড়ব মর্নিং ওয়াক করতে।

সদানন্দবাবুও আমাকে খুব উৎসাহ দিচ্ছিলেন। কথায়-কথায় সেদিন বললেন, 'দেখলেন তো, সিগারেটটা কমিয়ে দিয়ে শুধু যে অ্যাসিডিটির হাত থেকে বেঁচে গেলেন তা নয়, সর্দিকাশিও বলতে গেলে আর আপনার হয় না। তা ছাড়া দমও বেড়েছে। তা এখন এই দমটাকে কাজে লাগান। মর্নিং ওয়াক করুন, রোজ শেষ রাত্তিরে বেরিয়ে পড়ুন আমার সঙ্গে। মাইল দুয়েক হাঁটুন। ঘাম ঝরান। দেখবেন, অম্বল যেভাবে হটেছে, গেঁটেবাতও ঠিক সেইভাবেই হটে যাচ্ছে। কী, বেরিয়ে পড়বেন আমার সঙ্গে?'

বললুম, 'এখন নয়। রিটায়ার করি, তারপর বেরুব।'

সেইরকমই কথা ছিল, কিন্তু তা আর হল না। তার আগেই খুন হয়ে গেল নকুল বিশ্বাস। আর ভাড়াটে খুন হবার সঙ্গে-সঙ্গেই তার বাড়িওয়ালা সদানন্দ বসুও গ্রহের ফেরে পড়ে গেলেন।

॥ ২ ॥

সদানন্দবাবুর মুখে যে কিছু-কিছু মেঘ জমতে শুরু করেছিল, সে-কথা আগেই বলেছি। ব্যাপারটা আমি প্রথম লক্ষ করি চার-পাঁচ বছর আগে। রবিবার। সকালবেলা। কলেজ স্ট্রিট মার্কেটে বাজার করতে গিয়েছি, সেখানে ফলপট্টিতে হঠাৎ সদানন্দবাবুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ভদ্রলোক আমাকে দেখে হাসলেন, দুটো-চারটে কথাও হল, কিন্তু লক্ষ করলুম যে, হাসিটা একটু শুকনো, কথাবার্তাতেও যেন আগেকার সেই প্রাণখোলা ভাবটা আর নেই। ভণিতা না-করে জিগ্যেস করলুম, 'ব্যাপারটা কী বলুন তো?'

'কীসের ব্যাপার?'

'এই মানে কেমন যেন ঝিম মেরে রয়েছেন। মিসেসের সেই বাতের কষ্টটা আবার বেড়েছে নাকি?'

ভদ্রলোক তাতে ক্লিষ্ট হেসে বললেন, 'না মশাই, সেসব কিছু নয়, গিন্নি মোটামুটি ভালোই আছেন।'

'তা হলে?'

'তা হলে আবার কী, মাঝে-মধ্যে একটু গম্ভীরও হতে পারব না? ও-কথা থাক, আপনি তো রোজ বৈঠকখানা বাজারে যান, আজ হঠাৎ এদিকে?'

বললুম, 'বৈঠকখানা বাজারে রবিবারে বড্ড ভিড় হয়, তাই আর আজ ওদিকে যাইনি।'

এর পরে আর কোনও কথা হল না। বুঝতে পারলুম, কিছু একটা হয়েছে ঠিকই, তবে ভদ্রলোক সেটা চেপে যেতে চাইছেন। এসব ক্ষেত্রে বেশি-কিছু বলতে যাওয়াও ঠিক নয়, তাই আর কথা বাড়ালুম না, ফলপট্টিতে যা কেনাকাটা করবার ছিল, সেটা চুকিয়ে ফের বাজারে গিয়ে ঢুকলুম।

বাড়ি ফিরে বাজারের থলি দুটো বাসন্তীর হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললুম, 'সদানন্দবাবুর সঙ্গে দেখা হল।'

'কোথায়?'

'বাজারে। তা তুমি তো প্রায়ই ও-বাড়িতে যাও, কিছু জানো?'

অবাক হয়ে বাসন্তী বলল, 'কী জানব?'

'এই মানে ভদ্রলোককে কেমন যেন বেজার ঠেকল।'

বাসন্তী বলল, 'এই ব্যাপার? আমি ভাবলুম কী না কী! তা একটু বেজার তো উনি হতেই পারেন।'

'তার মানে?'

'মানে আর কী,' বাসন্তী বলল, 'এই যে সারাজীবন আমরা ভাড়াবাড়িতে কাটিয়ে গেলুম, নিজের বাড়ি তৈরি করতে পারলুম না, এখন দেখছি একপক্ষে সেটা ভালোই হয়েছে।'

বাসন্তীর অনেক গুণের মধ্যে এই একটা মস্ত দোষ। সব কথাই সে ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে বলে, ফলে কী যে বলছে, চট করে সেটা বোঝা যায় না।

বললুম, 'কথাটা একটু বুঝিয়ে বলবে?'

'বুঝিয়ে বলবার তো কিছু নেই। এ তো খুবই সহজ কথা। ধরো কলকাতা শহরে তোমার

যদি একটা বাড়ি থাকত, আর ভাড়াটে বসাতে চাও না বলে সেই বাড়ির একতলাটা যদি তুমি খালি ফেলে রাখতে, আর পাড়ার ছেলেরা যদি এসে তোমাকে বলত যে, মেসোমশাই, আপনার একতলাটা তো ফাঁকাই পড়ে রয়েছে, ওটা আমাদের দিয়ে দিন, আমরা ওখানে আমাদের ড্রামাটিব ক্লাব করব, তো তুমি বেজার হতে না?'

'পাড়ার ছেলেরা সদানন্দবাবুকে তাই বলেছে বুঝি?'

'কুসুমদি তো তা-ই বললেন।'

কুসুমদি মানে কুসুমবালা বসু। সদানন্দবাবুর স্ত্রী। ভদ্রমহিলার শুনেছি অনেক গুণ। ছেলেপুলে হয়নি বলে হাতে বিস্তর সময় ছিল, সেই সময়টাকে নষ্ট না করে তিনি রান্না, সেলাই, এমব্রয়ডারি ইত্যাদি হরেক বিদ্যার চর্চা করেছেন। দেশি-বিদেশি নানান রকম রান্না জানেন, পাড়ার মেয়ে-বউরা সেসব তাঁর কাছে শিখতেও যায়। তা ছাড়া যায় ব্লাউজ, পাঞ্জাবি, শার্ট, স্কার্ট, ইজের, প্যান্ট, ফ্রক ইত্যাদির ছাঁটকাট আর সেলাইয়ের ব্যাপারে তালিম নিতে। বাসন্তীও যায়।

বললুম, 'ও-বাড়িতে শেষ কবে গিয়েছিলে?'

'পরশু দুপুরে।' বাসন্তী বলল, 'সোয়েটার বোনার একটা নতুন প্যাটার্ন শিখতে গিয়েছিলুম। তা কথায়-কথায় কুসুমদি বললেন, এ কী উৎপাত হল বলো তো ভাই, হইচই চিৎকার চেঁচামেচি সহ্য হয় না বলে একতলাটা ভাড়া দিইনি, এখন পাড়ার ছেলেরা এসে বলছে যে একতলাটা তাদের ড্রামাটিক ক্লাবের জন্যে ছেড়ে দিতে হবে।'

'ওরে ব্বাবা, সে তো আরও মারাত্মক ব্যাপার! ড্রামাটিক ক্লাব মানেই তো রিহার্সাল, আর রিহার্সাল মানেই তো তুমুল হট্টগোল! বলতে গেলে আমাদেব সামনেই তো ওদের বাড়ি! কাণ্ডটা কী হবে, সেটা বুঝতে পেরেছ?'

বাসন্তী বলল, 'পারব না কেন। ওখানে যদি ড্রামাটিক ক্লাব হয় তো তার রিহার্সালের ঠেলায় শুধু সদানন্দবাবুদেব কেন, আমাদের কানও ঝালাপালা করে ছাড়বে।'

'এর চেয়ে ভাড়াটে বসানো অনেক ভালো ছিল।'

'ছিলই তো। কুসুমদিও সে-কথা বুঝতে পেরেছেন। বলছেন যে, ভাড়াটে বসালে আজ আর এই ঝঞ্ঝাটে পড়তে হত না।'

'তা সেটা তো এখনও বসানো যায়।'

'যায়ই তো। সদানন্দবাবু শুনলুম দালালও লাগিয়েছেন তার জন্যে। বলেছেন যে, সেলামি চাই না, ভাড়াও যা পারে দিক, তবে কিনা দেরি করা চলবে না, সামনের মাসের পয়লা থেকেই ভাড়াটে বসাতে হবে।'

হেসে বললুম, 'বোঝো ব্যাপার! কলকাতা শহরে আজকাল বাড়ি ভাড়া বলতে গেলে পাওয়াই যায় না, দু-খানা ঘরের জন্যে লোকে মাথা খুঁড়ে মরছে, আর এদিকে সদানন্দবাবুর অবস্থা দ্যাখো, না চান বেশি ভাড়া, না চান সেলামি, স্রেফ একটি ভাড়াটে পেলেই ভদ্রলোক এখন বর্তে যান।'

একটু অপেক্ষা করতে পারলে নিশ্চয় মোটামুটি শিক্ষিত আর ভদ্র একটি পরিবারকে ভাড়াটে হিসেবে পাওয়া যেত। তাড়াহুড়োর ফলে সেটা পাওয়া গেল না। সদানন্দবাবুকে সেজন্যে দোষ দেওয়া অর্থহীন, ভদ্রলোকেরও সত্যিই তখন অপেক্ষা করবার অবস্থা নয়। একেবারে শিরে-সংক্রান্তি অবস্থা। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, ভাড়াটে বাছাবাছি করতে গেলে যে কালক্ষেপ হবার সম্ভাবনা, একতলাটা তার মধ্যে হয়তো হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে।

তা নকুলচন্দ্র বিশ্বাস যে আজ থেকে মোটামুটি চার বছর আগে পাঁচ নম্বর পীতাম্বর চৌধুরি লেনের একতলার ভাড়াটে হয়ে এই গলিতে এসে ঢুকল, এই হচ্ছে তার ইতিহাস। দিনটার কথা এখনও আমার স্পষ্ট মনে আছে। সেও ছিল এক রবিবার। অফিসে আমার অফ ডে। দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকেছে। মে মাসের মাঝামাঝি। আষাঢ়স্য প্রথম দিনটিকে যদি বর্ষাকালের সূচনা-দিবস

বলে গণ্য করি, তো সেই হিসেবমতো বর্ষা নামতে এখনও অন্তত মাস খানেক বাকি, অথচ গত পনেরো দিনের মধ্যে একটিবারও কালবৈশাখীর ঝড় ওঠেনি, ফলে তাপাঙ্ক যেন চড়চড় করে চড়ে যাচ্ছিল। রাস্তার পিচ-টিচ গলে গিয়ে একেবারে একাক্কার। মনে হচ্ছিল, দুপুরের গনগনে রোদ্দুরে গোটা শহর যেন ঝলসে যাচ্ছে। তার আঁচ থেকে বাঁচবার জন্যে জানলা-দরজা বন্ধ করে, আমাদের শোবার ঘরটাকে একেবারে অন্ধকার করে নিয়ে, মেঝের ওপরে একটা বালিশ ফেলে সদ্য তখন আমি দিবানিদ্রার উদ্যোগ করছি, এমন সময় বাসন্তী এসে বলল, 'দেখে যাও।'

রাস্তার দিকের বারান্দায় গিয়ে দেখলুম, সদানন্দবাবুর বাড়ির সামনে একটা *ঠেলাগাড়ি* এসে থেমেছে। *ঠেলার* পাশে যারা দাঁড়িয়ে আছে, দেখলেই বোঝা যায় যে, তারা স্বামী-স্ত্রী। স্বামীটির বয়স বছর চল্লিশ, বউটির বয়স ত্রিশ-বত্রিশের বেশি হবে না। দুপুরের রোদ্দুরে দরদর করে ঘামতে-ঘামতে তারা *ঠেলাওয়ালার* সঙ্গে ধরাধরি করে মালপত্রগুলিকে একটা-একটা করে বাড়ির ভেতরে নিয়ে ঢোকাচ্ছে। সদানন্দবাবুও ওপর থেকে নেমে এসে তাদের সাহায্য করছেন সাধ্যমতো। মিনিট পনেরো-কুড়ির মধ্যে সবকিছু ভেতরে ঢুকে গেল।

সদানন্দবাবু আমাদের দেখতে পেয়েছিলেন। যথারীতি হাসলেন। মনে হল, হাসিটা যেন আর তত ক্লিষ্ট নয়। আমিও হাসলুম। কিন্তু কোনও কথা হল না।

ঠেলাওয়ালা ভাড়া নিয়ে চলে গেল। বউটি আগেই বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়েছিল। এবারে ভাড়াটেকে নিয়ে সদানন্দবাবুও রাস্তা থেকে ভেতরে ঢুকলেন। সদর-দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

ভাড়াটের নাম কী, আগে কোথায় থাকত, কাজকর্ম কী করে, সেসব কথা তখনও আমি কিছুই জানি না।

পরদিন জানা গেল।

মনে আছে যে, অন্যান্য দিনের তুলনায় সেদিন অনেক সকাল-সকাল আমাকে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়তে হয়েছিল। বলতে গেলে প্রায় ভোরবেলাতেই বাসন্তী আমার ঘুম ভাঙিয়ে দিয়ে বলেছিল যে, কাজের মেয়েটি আজ আর আসতে পারবে না বলে খবর পাঠিয়েছে, তাই আমাকেই যেতে হবে হরিণঘাটার দুধ আনতে।

চটপট মুখ-চোখ ধুয়ে রাস্তায় বেরিয়েছি, সদানন্দবাবুর সঙ্গে দেখা।

বললুম, 'কোথায় গিয়েছিলেন?'

'দুধ আনতে। রোজই তো এই সময়ে আমি দুধ নিয়ে ফিরি।'

'তাই বুঝি? আমি দেখছি কিছুই জানি না।'

একগাল হেসে সদানন্দবাবু বললেন, 'কী করে জানবেন? আপনার ঘুমই তো মশাই সাতটার আগে ভাঙে না। তা আজ এত সকাল-সকাল উঠে পড়েছেন যে?'

বললুম, 'কাজের মেয়েটি আসেনি। তাই আমাকেই আজ দুধ আনতে হবে।'

'ভালো, ভালো, খুব ভালো।' সদানন্দবাবু বললেন, 'কাজের মেয়েটি যদি মাঝে-মাঝেই এইরকম কামাই করে তো খুব ভালো হয়। রোজ না হোক, অন্তত মাঝে-মাঝে তা হলে আর আপনার সকাল-সকাল না-উঠে উপায় থাকে না।'

কথাটার উত্তর না দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলুম, পিছন থেকে সদানন্দবাবু আবার ডাকলেন। বললেন, 'একটা কথা আপনাকে বলা হয়নি। নকুল কিন্তু লোকটি নেহাত খারাপ নয়।'

'কে নকুল?'

'ওই কাল দুপুরে যাকে দেখলেন। নকুল বিশ্বাস...মানে একতলাটা যাকে ভাড়া দিলুম আর কি। ভাড়া অবিশ্যি খুবই কম, মাত্র একশো টাকা। তা কী আর করা যাবে, খুব তাড়াহুড়ো করে ভাড়াটে বসাতে হল তো, নইলে নিশ্চয় অনেক বেশি ভাড়া পাওয়া যেত।'

বললুম, 'তা যেত বইকী।'

সদানন্দবাবু বললেন, 'তা হোক, আমি তো আর টাকার জন্যে ভাড়া দিইনি, ভাড়া না-দিলে গোটা একতলাটাই ওই বখাটে ছেলেগুলো দখল করে নিত, তাই দিয়েছি। ভাড়া না-হয় কমই পেলুম, হল্লাবাজির হাত থেকে বাঁচলুম তো, সে-ই ঢের।' তারপর একটু থেমে বললেন, 'আর তা ছাড়া একশো টাকার বেশি দেবেই বা কী করে?'

আমার দেরি হয়ে যাচ্ছিল। এর পরে গেলে হয়তো শুনতে হবে যে, দুধ ফুরিয়ে গেছে। বললুম, 'পরে কথা বলব, এখন চলি।'

দুধ নিয়ে বাড়ি ফিরে বাসন্তীকে বললুম, 'শুনেছ?'

রান্নাঘর থেকে বাসন্তী বলল, 'কী শুনব?'

'সদানন্দবাবু তাঁর একতলাটা মাত্র একশো টাকায় ভাড়া দিলেন।'

'শুনেছি।'

বললুম, 'তুমি তো বলো কুসুমদির মতন মানুষ নাকি হয় না, অথচ কই, তোমাকে তো একবারও ওঁদের একতলাটা ভাড়া নেবার কথা বলেননি।'

'বলেছিলেন তো।'

'সে কী, এখানে আমরা তিনশো টাকা ভাড়া দিচ্ছি, তার জায়গায় একশো টাকাতেই হয়ে যেত। তবু রাজি হলে না?'

কাজের মেয়ে না-আসার জন্যেই বোধহয় বাসন্তীর মেজাজ বিশেষ ভালো ছিল না। রান্নাঘর থেকেই চড়া গলায় বলল, 'কেন রাজি হব? একে তো একটা বাড়ি করতে পারোনি, তার ওপরে আবার দোতলার ফ্ল্যাট থেকে একতলায় নামাতে চাইছ। কী না ভাড়া মাত্তর একশো টাকা। তোমার লজ্জা করে না?'

ওরে বাব্বা, এ তো দেখছি রেগে একেবারে যজ্ঞিবাড়ির উনুন হয়ে রয়েছে! আর কথা না বাড়িয়ে বাইরের ঘরে এসে খবরের কাগজের হেডলাইনে চোখ বুলোতে লাগলুম।

খানিক বাদেই সদানন্দবাবু এলেন। বললেন, 'অসময়ে এসে বিরক্ত করলুম না তো?'

বললুম, 'আরে না মশাই, কী যে বলেন! বসুন, চায়ের কথা বলে আসছি।'

সদানন্দবাবু বললেন, 'আপনার যদি খেতে হয় তো খান, আমি এখন চা খাব না। আমার সেকেন্ড কাপ অলরেডি খাওয়া হয়ে গেছে। আর থার্ড কাপ খাব সেই বিকেলবেলায়। আপনি তো জানেনই যে, তিন কাপের বেশি চা আমি খাই না, ওটাই হচ্ছে লিমিট।'

সত্যি কথা বলতে কী, সদানন্দবাবু যে এখন চা খাবেন না, এইটে জেনে ভারী স্বস্তি পাওয়া গেল। বাসন্তীর যা মেজাজ দেখলুম, তাতে তাকে চায়ের কথা বলতে বিশেষ ভরসা হচ্ছিল না।

বললুম, 'তখন দুধ আনতে যাচ্ছিলুম তো, তাই তাড়া ছিল, আপনার কথা ঠিকমতো শোনা হয়নি। তা ভাড়াটে তা হলে ভালোই পেয়েছেন?'

সদানন্দবাবু বললেন, 'তা-ই তো মনে হচ্ছে। আমি মশাই শান্তিপ্রিয় লোক, আমদানি না হয় একটু কমই হল, লোকটা মোটামুটি ঠান্ডা স্বভাবের হলেই আমি খুশি। তা নকুলকে তো ঠান্ডা স্বভাবের লোক বলেই মনে হচ্ছে। এখন দেখা যাক।'

'আগে ওঁরা কোথায় থাকতেন?'

'শ্রীমানী মার্কেটের পাশের গলিতে। একটা মাত্তর ঘর নিয়ে থাকত। তাতে অসুবিধে হচ্ছিল। নকুলের কাছে লোকজন আসে, তা ঘর তো একটাই, বাইরের লোককে ঘরে ঢুকিয়ে কথাবার্তা বলতে হলে বউয়ের অসুবিধে হয়, তাই দু-কামরাওলা ফ্ল্যাট খুঁজছিল।'

'কী করেন ভদ্রলোক?'

'অর্ডার সাপ্লাই। ডালহৌসি পাড়ার অফিসে-অফিসে ঘুরে খোঁজ নেয় কার কী দরকার, তারপর মাল সাপ্লাই করে। ওই আর কি, সস্তায় মাল কিনে কিছুটা মার্জিন রেখে বিক্রি করার ব্যাপার।

খুব একটা হাতিঘোড়া রোজগার করে বলে মনে হয় না, তবে চলে যায়।'

ভাড়াটে হিসেবে নকুলের সবচেয়ে বড় প্লাস পয়েন্ট যা বুঝলুম, সেটা অবশ্য এই যে, তারা লোক মাত্র দুটি।

সদানন্দবাবু উঠে পড়লেন। তারপর চলে যেতে-যেতে দরজা থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে একগাল হেসে বললেন, 'কী জানেন, সংখ্যাটা যে আর বাড়বে, তাও মনে হয় না। বউটির বয়েস অন্তত তিরিশ তো হবেই, তা এখনও যখন ছেলেপুলে হয়নি, তখন আর কবে হবে?'

ভদ্রলোক বেরিয়ে গেলেন। খানিক বাদে বাসন্তী এসে ঘরে ঢুকল। বললুম, 'সদানন্দবাবু এসেছিলেন।'

'কী বললেন?'

'বললেন যে, উনি যেমন নিঃসন্তান, ওঁর ভাড়াটেরও তেমনি নাকি ছেলেপুলে হবার কোনও সম্ভাবনা নেই। ভদ্রলোককে খুব খুশি বলে মনে হল।'

বাসন্তী হেসে বলল, 'খুশি তো হবেনই। যেমন বাড়িওয়ালা, তেমনি ভাড়াটে। এ তো একেবারে সোনায় সোহাগা।'

তা এও হল চার বছর আগের কথা।

॥ ৩ ॥

এই কাহিনির শুরু হয়েছে একেবারেই দিন কয়েক আগের একটা ঘটনা দিয়ে। কিন্তু তার পরেই আবার পিছিয়ে গিয়েছি। কখনও বলেছি বছর দশেক আগের কথা, কখনও বলেছি বছর চারেক আগের। এমনটা কিন্তু মাঝে-মাঝেই ঘটতে পারে। অর্থাৎ কখনও পিছিয়ে যাব, আবার কখনও এগিয়ে আসব। ঘটনাগুলিকে কালানুক্রমিকভাবেও পরপর সাজিয়ে দিতে পারতুম। কিন্তু এই কাহিনির রস তা হলে জমত না।

আমার মনে হয়, আমাদের এই গলিটার একটা বর্ণনা এখানে দেওয়া দরকার। পীতাম্বর চৌধুরি লেন যে মধ্য-কলকাতার শেয়ালদা অঞ্চলে, সেটা অবশ্য আগেই বলেছি। এর একটা মুখ আপার সার্কুলার রোডে, অর্থাৎ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোডে পড়েছে, আর অন্য মুখ পড়েছে হ্যারিসন রোডে, অর্থাৎ মহাত্মা গান্ধী রোডে। এখান থেকে শেয়ালদা ইস্টিশানে হাঁটাপথে মাত্র তিন-চার মিনিটের মধ্যেই পৌঁছে যাওয়া যায়, আর বাসে উঠে—রাস্তায় যদি না জ্যাম থাকে, তো—হাওড়া ইস্টিশানে পৌঁছতে মিনিট পনেরোর বেশি সময় লাগে না। ইস্কুল-কলেজের সুবিধেও বিস্তর। রাস্তা পার হলেই রিপন কলেজ, অর্থাৎ সুরেন্দ্রনাথ কলেজ। মিনিট পাঁচেক হাঁটলেই বঙ্গবাসী। হিন্দু স্কুল, হেয়ার স্কুল, মিত্র মেইন, প্রেসিডেন্সি কলেজ, সংস্কৃত কলেজ, সবই হাঁটা-পথের চৌহদ্দির মধ্যে, তা ছাড়া, আপার সার্কুলার রোড ধরে রাজাবাজারের দিকে খানিকটা হাঁটলেই ভিক্টোরিয়া কলেজে পৌঁছে যাচ্ছেন। যেমন ছেলেদের, তেমনি মেয়েদেরও লেখাপড়ার এত সুবিধে এই শহরে আর কোথাও আছে বলে জানি না। সেন্ট পল্স কলেজও এখান থেকে মাত্র দশ মিনিটের হাঁটা-পথ।

হাট-বাজারেরও বিস্তর সুবিধে। যেমন এদিকে রয়েছে বৈঠকখানা বাজার আর কোলে মার্কেট, তেমনি ওদিকে রয়েছে কলেজ স্ট্রিটের বনেদি বাজার। বাস ট্রাম ইত্যাদিও একেবারে দোরগোড়ায়। সত্যি বলতে কী, এত সব সুবিধে পাচ্ছি বলেই পীতাম্বর চৌধুরি লেনের দোতলার এই ফ্ল্যাটটা আমার পছন্দ হয়ে গিয়েছিল।

বাসন্তীর পছন্দ হয়নি। ঠোঁট উলটে বলেছিল, 'কী যে তোমার পছন্দ, বুঝি না বাপু। এইরকমের ঘিঞ্জি জায়গায় মানুষ থাকতে পারে! আমার তো দম বন্ধ হয়ে আসছে।'

তা পাড়াটা যে ঘিঞ্জি, তাতে সন্দেহ নেই। গলিটাও একে এঁদো, তায় সিধে-সরল নয়। এদিককার বড়রাস্তা থেকে শুরু হয়ে তিন-চারটে পাক খেয়ে তারপর ওদিককার বড়রাস্তায় গিয়ে পড়েছে। লাঠির বাড়ি লাগলে সাপ যেভাবে মোচড় খায়, এও প্রায় সেইরকমের ব্যাপার।

পীতাম্বর চৌধুরি লেনের যাঁরা বাসিন্দা, তাঁদের কেউই যে খুব অবস্থাপন্ন ব্যক্তি, এমন মনে হয় না। তাঁদের মধ্যে ছোটখাটো ব্যবসায়ী, দোকানদার ও দালাল-শ্রেণির লোক জনাকয় আছেন বটে, তবে অধিকাংশই চাকুরে। পুরুষানুক্রমে তাঁরা সরকারি ও বেসরকারি অফিসে চাকরি করে যাচ্ছেন। সকাল ন'টা সাড়ে-ন'টার মধ্যে তাঁরা বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েন, তারপর সারাটা দিন অফিসে কাটিয়ে বিকেল ছ'টা সাড়ে-ছ'টা নাগাদ বাড়িতে ফিরে, স্নান সেরে, কিঞ্চিৎ জলযোগ করে নিয়ে, বাড়ির সামনের রোয়াকে বসে গল্পগুজব করেন, আর কোঁচার খুঁট কি রুমাল ঘুরিয়ে হাওয়া খান।

বাড়িগুলো যে 'তাঁদের বাপ-ঠাকুর্দার আমলে কি তারও আগে তৈরি হয়েছিল, তা বুঝতে কারও অসুবিধে হবার কথা নয়। চুন-সুরকি দিয়ে গেঁথে তোলা মোটা-দেওয়ালের পেটা-ছাতের বাড়ি। সে-কালের কর্তারা হয়তো মিস্ত্রি ডেকে মাঝেমধ্যেই ছোটখাটো মেরামতি কি দাগরেজির কাজ করিয়ে নিতেন। এ-কালের কর্তাদের না আছে তেমন ট্যাঁকের জোর, না আছে ভাগের বাড়িতে পয়সা ঢালার উৎসাহ। ফলে মেরামতি যেমন হয় না, তেমনি জানলা-দরজাতেও আর নতুন করে রঙের প্রলেপ পড়ে না। কোনও-কোনও বাড়িতে বোধহয় গত কুড়ি-পঁচিশ বছরের মধ্যে চুনকামের কাজও হয়নি। অধিকাংশ বাড়ির অবস্থাই অতি লজ্‌ঝড়। চৌত্রিশ সালে সেই যে একটা ভয়ংকর ভূমিকম্প হয়েছিল, তার ধাক্কাটা যে এসব বাড়ি কী করে সামলে নিল তা কে জানে, তবে কিনা আবার যদি তেমন কোনও ভূমিকম্প হয় তো এ-গলির প্রত্যেকটা বাড়িই হুড়মুড় করে ধসে পড়বে। আলসেয় বটগাছের চারা, বর্ষাকালে ফাটা রেনপাইপ দিয়ে ছড়ছড় করে চতুর্দিকে জল পড়তে থাকে। রাস্তা দিয়ে তখন খুব সন্তর্পণে চলাফেরা করতে হয়। একটু অসতর্ক হলেই পাইপের নোংরা জল পড়ে জামাকাপড় ভিজে যাবার আশঙ্কা। বাইরের দেওয়ালের পলেস্তারা খসে পড়েছে, ফলে ভেতরকার গাঁথনির ইঁট এমনভাবে দাঁত বার করে রয়েছে যে, তার ওপরে চোখ পড়বামাত্র অতিশয় অশ্লীল একটা উপমা অনেকের মাথায় আসবে, মনে হবে, বাড়িগুলো যেন তাদের পরনের কাপড় তুলে উদোম হয়ে সর্বজনকে নিজেদের খোস-পাঁচড়া দেখাতে পারার একটা উৎকট উল্লাসে সারাক্ষণ নিঃশব্দে হেসে চলেছে।

যে-বাড়িতে আমরা আছি, সেটাও কিছু ব্যতিক্রম নয়, মোটামুটি এই একই রকমের। তিনতলা বাড়ি। মালিকের অবস্থা ভালো নয়। তিনি রিটায়ার করেছেন, কিন্তু তিনটে ছেলের একটাও মানুষ হয়নি, তা ছাড়া দুই মেয়ের বিয়ে এখনও বাকি। এদিকে ছেলে তিনটে যদিও কোনও কাজকর্ম করে না, তাদের মধ্যে বড় আর মেজো ইতিমধ্যে বিয়ে করে ফেলেছে। বাড়িওলার পরিবারটি অতএব নেহাত ছোট নয়। তিনতলার তিনটে ঘর নিয়ে তিনি থাকেন; খুব যে হাত-পা ছড়িয়ে থাকেন না, সেটা সহজেই বুঝতে পারি। একতলার ভাড়াটেরা সম্ভবত গত পঞ্চাশ বছর ধরে এখানে রয়েছে। ভাড়া দেয় যৎসামান্য, তাও ঠিকমতো দেয় না শুনেছি, কিন্তু কিছু করবারও নেই, মামলা করেও বাড়িওয়ালা তাদের তুলে দিতে পারছেন না। বাকি রইল দোতলা। সেখানে আমরা থাকি। আমরা মানে আমি, বাসন্তী আর আমাদের ছোট মেয়ে। ছেলেকে কর্মসূত্রে বাইরে থাকতে হয়, বড় মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে, ছোট মেয়ে ব্রেবোর্ন কলেজে পড়ে, এখান থেকে বাসে উঠে চটপট কলেজে পৌঁছে যায়, কোনও অসুবিধে হয় না।

যা কিছু অসুবিধে ছিল, তা এই পুরোনো ভাঙাচোরা বাড়ির ফ্ল্যাটটা নিয়েই। তবে সেটাও আমি নিজের উদ্যোগে যতটা সম্ভব মিটিয়ে নিয়েছি। ফ্ল্যাটটা যখন দেখতে আসি, তখনই বুঝেছিলুম যে, দেওয়ালের পলেস্তারা থেকে জানলা-দরজা, অনেক-কিছুই সারিয়ে-সুরিয়ে নিতে হবে। বাড়িওয়ালাকে

সেলামি বাবদ পাঁচ হাজার টাকা দিতে হয়েছিল, কিন্তু মেরামতির বাবদে তা থেকে তিনি একটি পয়সাও খরচ করতে রাজি হলেন না। বললেন যে, অ্যাডভান্স বাবদ যদি আরও হাজার কয়েক টাকা দিই, তো তাই দিয়ে তিনি মেরামতি করিয়ে দেবেন। তা টাকাটা তাঁকে দিয়েওছিলুম, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি কিছুই করলেন না। বারকয় তাগাদা দিতে লজ্জিত গলায় বললেন যে, তিনি অভাবী মানুষ, টাকাটা খরচ করে ফেলেছেন। ফলে, যা-কিছু মেরামতির কাজ ছিল, আবার কিছু গাঁটগচ্চা দিয়ে সেগুলি করিয়ে নিয়ে তারপর আমাকে এই নতুন আস্তানায় এসে উঠতে হয়।

পাঁচ নম্বর বাড়িটার চেহারা কিন্তু এতসব পুরোনো লজ্‌ঝড় বাড়ির মধ্যেও একটু অন্যরকম। বয়স অবশ্য সেটারও কিছু কম হয়নি। সদর-দরজার পাশে দেওয়ালের গায়ে বর্ডার-দিয়ে বসানো শ্বেতপাথরের ট্যাবলেট পড়ে যেমন বোঝা যায় যে, বাড়িটার নাম শ্যাম-নিবাস, তেমনি সেই নামের নীচে ১৮৭০ দেখে মালুম হয় যে, আজ থেকে একশো বছরেরও বেশি আগে এ বাড়ি তৈরি হয়েছিল। তৈরি করিয়েছিলেন সদানন্দের প্রপিতামহ শ্যামানন্দ বসু। পাথরের ট্যাবলেটটা অবশ্য তাঁর লাগানো নয়। সদানন্দের পিতামহ দয়ানন্দ বসু ওটা এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে লাগিয়ে দিয়ে তাঁর পিতৃভক্তিব প্রমাণ বেখেছিলেন।

পীতাম্বর চৌধুরি লেনের বেশির ভাগ বাড়িই পার্টিশান হয়েছে। সেটাই স্বাভাবিক। কালক্রমে শরিকের সংখ্যা তো বেড়েই যায়, ছোটখাটো নানা ব্যাপার নিয়েও তখন ঝগড়াঝাঁটি লাগতে থাকে, যৌথ একান্নবর্তী পরিবার ভেঙে চৌচির হয়, ফলে বাড়িটাও আর পার্টিশান না করে উপায় থাকে না। এখানেও সেই একই ব্যাপার হয়েছে।, কিছু-কিছু বাড়িতে তো যত ঘব, তত শরিক। পাঁচ নম্বর বাড়িটাও শরিকে-শরিকে ভাগ হয়ে যেতে পারত। তা যে হয়নি, তার কারণ আর কিছুই নয়, শ্যামানন্দের সময় থেকেই এ-বাড়ির মালিকদের কারও একাধিক পুত্রসন্তান হয়নি। ব্যাপারটা পরিকল্পিত নয় নিশ্চয়ই, পরিবার-পরিকল্পনা নেহাতই এ-কালের ব্যাপার, সদানন্দের পূর্বপুরুষরা এতসব প্ল্যানিংয়ের ধারা ধারতেন না। তবু যে তাঁদের প্রত্যেকেরই মাত্র একটি করে পুত্র, এটাকে একটা আকস্মিক ব্যাপারই বলতে হবে। শ্যামানন্দের একমাত্র পুত্রসন্তান দয়ানন্দ; দয়ানন্দের একমাত্র পুত্রসন্তান মহানন্দ; এবং মহানন্দেরও একমাত্র পুত্রসন্তান আমাদের এই সদানন্দ বসু। লাইনটা অবশ্য এখানেই শেষ। সদানন্দ যে নিঃসন্তান মানুষ, সে-কথা আগেই বলেছি।

যা-ই হোক, যে-কথা বলছিলুম সেটা এই যে, পূর্বপুরুষদের কারও একাধিক পুত্রসন্তান না হওয়ায় এই পরিবারের স্থাবর-অস্থাবর কোনও সম্পত্তিই কখনও ভাগ-বাঁটোয়ারা হয়নি। তা ছাড়া, সদানন্দবাবুর কাছেই শুনেছি, তাঁর পূর্বপুরুষের কারও এমন কোনও বদ-খেয়ালও ছিল না যে বাড়ি বন্ধক দেবার কি ঘটিবাটি বিক্রি করে টাকা জোগাড় করবার দরকার পড়বে। নেশা বলতে যা বোঝায়, তা ছিল একমাত্র দয়ানন্দের। তা সে-নেশাও ঘোড়া কিংবা মদ-মেয়েমানুষের নয়, ঘুড়ি আর পায়রা ওড়ানোর, যাকে কিনা বৃহৎ কোনও বদ-খেয়ালের পর্যায়ে ফেলা যাচ্ছে না।

জন্মসূত্রেই সদানন্দ তাই মোটামুটি সচ্ছল মানুষ। চাকরিটা খুব উঁচু দরের করেননি বটে, তবে মাঝেমধ্যেই দু-চার টাকা উপরির ব্যবস্থা থাকায় তাঁর রোজগার নেহাত খারাপও ছিল না। ফলে বাড়িটা যতই পুরোনো হোক, বছরে অন্তত একবার মিস্ত্রি-মজুর লাগিয়ে তিনি তাতেই একটু চেকনাই ফুটিয়ে রাখতে পেরেছেন।

বাড়িটা বিশেষ বড়ও নয়। দোতলা-একতলা মিলিয়ে ঘর মাত্রই চারটে। ওপরের তলায় দুটো আর নীচের তলায় দুটো। তবে দুটো তলাই এমনভাবে তৈরি হয়েছিল, ওপর-নীচ ভাগাভাগির দরকার হলেও যাতে কোনও তলার শরিকেরই কোনও অসুবিধে না হয়। ওপরতলায় যেমন রান্নাঘর, একফালি ভাঁড়ার আর বাথরুম আছে, তেমনি আছে নীচতলাতেও। সদানন্দবাবুর অবশ্য চারটে ঘরের দরকারও হয় না। মানুষ তো এ-সংসারে দুটি মাত্র, দোতলার দুখানা ঘরেই তাই তাঁর দিব্যি চলে যায়। একতলাটা তবু যে তিনি ফাঁকা ফেলে রেখেছিলেন, তার কারণ তো আগেই বলেছি, ভদ্রলোক ঝুট-ঝামেলা

পছন্দ করেন না। শেষ পর্যন্ত অবশ্য পাড়ার ছেলেরা বেদখল করে নিতে পারে, এই ভয়েই তিনি তাড়াহুড়ো করে ভাড়াটে বসিয়ে দিলেন। তবে সেটা বসাবার আগে, ভাড়ার ব্যাপারে মাথা না ঘামালেও, এই একটা ব্যাপার তিনি একেবারে ষোলো-আনা নিশ্চিত হয়ে জেনে নিয়েছিলেন যে, ভাড়াটে হয়ে যারা আসছে, তাদের লোকসংখ্যা খুবই কম।

পাড়ার ছেলেদের ভয়ে সদাহাস্যময় সদানন্দবাবুর মুখে তো মেঘ জমতে শুরু করেছিল। ভাড়াটে বসাবার পরে দেখলুম মেঘ কেটে গিয়েছে, সদানন্দবাবু আবার সেই আগের মতো হাসছেন। কথাবার্তাও বলছেন সেই আগের মতোই প্রাণ খুলে। দেখে আমি নিশ্চিন্ত হয়েছিলুম।

কিন্তু খুব বেশিদিন নিশ্চিন্ত থাকা গেল না। সে-কথায় একটু বাদে আসছি। তার আগে তাঁর দৈনন্দিন রুটিন আর ওই মর্নিং ওয়াকের কথাটা একটু বলে নেওয়া ভালো।

মর্নিং ওয়াকটাও অবশ্য তাঁর দৈনন্দিন রুটিনের মধ্যেই পড়ে। সবটা তো স্বচক্ষে দেখবার উপায় নেই, প্রায় বারো-আনাই শোনা-কথা। তা যে-সব কথা শুনি, তা যদি মিথ্যে না হয় তো বুঝতে হবে, সদানন্দবাবু প্রতিটি কাজ করেন একেবারে ঘড়ি ধরে, নির্দিষ্ট একটা রুটিন অনুযায়ী। কী শীত, কী গ্রীষ্ম, ভদ্রলোক ঘুম থেকে ওঠেন কাঁটায়-কাঁটায় সাড়ে চারটের সময়; চোখে-মুখে জল দিয়ে নিজের হাতে স্টোভ ধরিয়ে, জল ফুটিয়ে এক কাপ চা খান। চা মানে ওই হালকা লিকার। তাতে সব মিলিয়ে মিনিট পঁচিশেক সময় যায়। স্টোভে যখন জল গরম হচ্ছে, তার মধ্যেই পালটে নেন তাঁর জামাকাপড়। তারপর চা খেয়ে যখন সদর-দরজা খুলে মর্নিং ওয়াক করতে বেরিয়ে পড়েন, ঘড়িতে তখনও পাঁচটা বাজেনি, মিনিট কয়েক বাকি। সদর দরজায় গোদরেজের টানা-তালা বসিয়ে নিয়েছেন। তার একটা চাবি সদানন্দবাবুর কাছে থাকে, আর অন্যটা থাকে ভাড়াটেদের কাছে। দরজা বন্ধ করবার জন্যে কাউকে ডেকে তোলবার দরকার হয় না, স্রেফ পাল্লাটা টেনে দিয়ে বেরিয়ে পড়লেই হল। যখন বেরিয়ে পড়েন, তখন তাঁর হাতে থাকে একটা লাঠি আর একটা টর্চ। লাঠিটা আমি দেখেছি। এই রকমের লাঠি বড় একটা দেখা যায় না। মোটা বেতের লাঠি, তার মাথায় একটা লোহার বল বসানো।

কখনও আধ ঘণ্টা হাঁটলেন, কখনও চল্লিশ মিনিট, সদানন্দবাবুর জীবনে এমনটা হবার উপায় নেই। রোজ একেবারে নিয়ম করে তিনি ঠিক এক ঘণ্টা হাঁটেন। শ্রদ্ধানন্দ পার্ক দূরে নয়, সেখানে গিয়ে গোটাকয়েক চক্কর মেরে একেবারে কাঁটায়-কাঁটায় ছ'টায় তিনি বাড়িতে ফেরেন। ফিরে, দোতলায় উঠে, আবার স্টোভ ধরিয়ে চা বানাতে লেগে যান। এবারে বানান দু-কাপ চা। গিন্নির ঘুম ভাঙিয়ে এক কাপ তাঁর হাতে তুলে দেন, অন্য কাপ তাঁর নিজের জন্য। চা খেতে-খেতে গিন্নির সঙ্গে দুটো একটা কথা হয়, তারপর বেরিয়ে পড়েন দুধ আনতে। দুধ এনে সাতটার সময় বেরিয়ে পড়েন বাজারে। বৈঠকখানা বাজারে রোজ যান না। বাজার আজকাল তার গণ্ডি ছাড়িয়ে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে, হ্যারিসন রোডের দু-ধারেই সারে-সারে আলু-পটল-ঝিঙে-বেগুন আর মাছের ব্যাপারীরা বসে যায়, কিন্তু সদানন্দবাবুর কেনাকাটা তবু যে এক ঘণ্টার আগে শেষ হয় না, তার কারণ, তিনি দরদস্তুর করতে ভালোবাসেন, প্রতিটি জিনিস কেনেনও খুব বাছাই করে। বাড়ি ফেরেন আটটায়। তখন জলখাবার খান, কিন্তু তার সঙ্গে আর চা খান না। তৃতীয় কাপ চা খান বিকেল চারটেয়।

তা এ হল সকালবেলার হিসেব। বাকি দিনটাও এইরকমের রুটিনে বাঁধা। কোথায় কোনও নড়চড় হবার উপায় নেই। এইভাবে চললে নাকি শরীর মজুত থাকে, আয়ুবৃদ্ধি হয়। হবেও বা।

সদানন্দবাবুকে আমি কখনও মর্নিং ওয়াকে বেরোতে দেখিনি, ফিরে আসতেও না। ওই স্বর্গীয় দৃশ্য কি আর আমার মতো অলস লোকের পক্ষে দেখা সম্ভব? রোজই যে আমি দেরি করে ঘুমোই, তাই ঘুম ভাঙতে বেলা হয়ে যায়, তা অবশ্য নয়। অফিস থেকে তাড়াতাড়ি ফিরতে পারলে, আর রাত জেগে যা শেষ করতে হবে এমন কোনও জরুরি কাজ হাতে না থাকলে, এক-একদিন তো

দশটার মধ্যেই শুয়ে পড়ি। কিন্তু তাতেও দেখেছি সাতটার আগে ঘুম ভাঙে না। তা হলে আর সদানন্দবাবুর ভোর-পাঁচটার মর্নিং ওয়াক কী করে দেখব।

আমার ছোট মেয়ে পারুল অবশ্য দেখেছে। সেও দেখত না, যদি না সামনের এপ্রিলেই বি.এ. ফাইনাল পরীক্ষায় বসবার জন্যে তাকে আদাজল খেয়ে তৈরি হতে হত। পার্ট ওয়ানের ফল বিশেষ ভালো হয়নি, এখন ফাইনালটা ভালো করে দেওয়া দরকার, গত মাস তিনেক ধরেই সে তাই নাকি শেষ-রাত্তিরে ঘুম থেকে উঠে পড়তে বসে যাচ্ছে।

সেদিন সকালবেলার জলখাবার খাবার সময় কথায়-কথায় সদানন্দবাবুর প্রসঙ্গ উঠেছিল। দিন কয়েক যাবৎ আমার গেঁটেবাতের যন্ত্রণা বড় বেড়েছে। বাসন্তীকে সে-কথা বলতে সে বলল, 'দোষ তোমারও কম নয় বাপু। সদানন্দবাবুর পরামর্শ-মতো এই যে দুধ-চিনি বাদ দিয়ে চা ধরেছ, এতে তোমার অ্যাসিডিটি যে অনেক কমে গেছে, সেটা তো স্বীকার করবে?'

বললুম, 'বা রে, তা আমি অস্বীকার করব কেন?'

বাসন্তী বলল, 'এবারে ওঁর মতো মর্নিং ওয়াকটাও ধরে ফ্যালো। ভদ্রলোক তো কতদিন ধরেই বলছেন, অথচ তুমিই গা করছ না। রোজ সকাল পাঁচটায় যদি ওঁর সঙ্গে বেরিয়ে পড়ে একটু ঘুরে আসতে, তো তোমার এই গেঁটেবাতের ব্যথাও নিশ্চয় খানিকটা অন্তত কমে যেত।'

হেসে বললুম, 'ওরে ব্বাবা, ওসব আমার দ্বারা হবে না।'

পারুল বলল, 'না হবার কিছু নেই, বাবা। বোস-জেঠু তো দেখি রোজ সকালে একেবারে কাঁটায়-কাঁটায় পাঁচটার সময় বেরিয়ে পড়েন। তা তিনি যদি অত সকাল-সকাল ঘুম থেকে উঠতে পারেন তো তুমিই বা পারবে না কেন?'

বললুম, 'তুই কি সেই সময়ে ওঁকে দেখতে পাস নাকি? তুইও তো তখন ঘুমিয়ে থাকিস।'

পারুল তাতে রেগে গিয়ে বলল, 'এই হচ্ছে তোমার মস্ত দোষ। বাড়ির কোনও খবরই তুমি রাখো না; এমন কী, তোমার মেয়ে কখন ঘুম থেকে ওঠে, তাও তোমার জানা নেই। তা হলে শুনে রাখো, গত ডিসেম্বর মাস থেকেই রাত চারটেয় ঘুম থেকে উঠে আমি পড়তে বসে যাচ্ছি।'

'হঠাৎ এত সুমতি যে?'

জলখাবার খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। কাপ-প্লেট গোছাতে-গোছাতেই বাসন্তী আমার দিকে অবাক চোখে তাকাল, তারপর মেয়ের দিকে তাকিয়ে তেতো গলায় বলল, 'তা হলেই বোঝ যে, তোর বাবা কত দায়িত্বশীল মানুষ। সামনের মাসেই যে মেয়ের ফাইনাল পরীক্ষা, তা পর্যন্ত জানে না।'

পারুল যেমন হঠাৎ-হঠাৎ রেগে যায়, তেমনি তার রাগটা আবার পড়েও যায় খুব তাড়াতাড়ি। বাসন্তীর কথায় আমি যে খুব অস্বস্তির মধ্যে পড়ে গিয়েছি, এইটে বুঝে হেসে ফেলে বলল, 'থাক, থাক, বাবাকে আর কিছু বোলো না, মা। এমনিই তো বাতের ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছে, বেশি যদি বকাঝকা করো তো ব্লাড প্রেশারও চড়ে যাবে।'

বাসনপত্র গুছিয়ে নিয়ে বাসন্তী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তখন পারুল বলল, 'আমার পড়ার টেবিলটা তো জানলার ধারেই, রোজ পাঁচটায় সত্যি আমি বোস-জেঠুকে বেরিয়ে পড়তে দেখি। ডিসেম্বর মাস থেকেই দেখছি।'

'সত্যি?'

'তবে আর বলছি কী। এখন তো গরম পড়ে গেছে, শীতের সময়েও একেবারে কাঁটায়-কাঁটায় পাঁচটায় উনি মর্নিং ওয়াকে বেরিয়ে পড়তেন। উঃ, তখন যে ওঁকে কী অদ্ভুত দেখাত, সে আর কী বলব।'

'অদ্ভুত দেখাত মানে?'

'যদি না বকো তো বলি। বলো, বকবে না তো?'

'না, না, বকব কেন? আমি কি কখনও কাউকে বকি নাকি? ওটা তো তোর মায়ের ডিপার্টমেন্ট।'

পারুল হেসে বলল, 'ওঁর বাড়ির সামনেই স্ট্রিট-লাইট তো, তাই দেখতে কোনও অসুবিধে হত না। পায়ে বুটজুতো, গায়ে বিশাল অলেস্টার, তার ওপরে আবার মাথায় মাঙ্কি-ক্যাপ, ওই যা পরলে শুধু চোখ দুটো আর নাকের ফুটোটা বেরিয়ে থাকে, বাদবাকি সব ঢাকা পড়ে যায়। তখন না...তখন না...বলি বাবা?'

বললুম, 'অত কিন্তু-কিন্তু করছিস কেন, বলেই ফ্যাল না।'

'তখন ওঁকে টিভিতে যে রামায়ণ চলছিল না, তার জাম্বুবানের মতন দেখাত, বাবা!'

কথাটা বলেই ঘর থেকে পারুল ছুটে বেরিয়ে গেল।

॥ ৪ ॥

সদানন্দবাবুর মুখে যে আবার হাসি ফিরেছে, এইটে দেখে সত্যি আমি বড় নিশ্চিন্ত হয়েছিলুম। কিন্তু খুব বেশিদিন যে নিশ্চিন্ত থাকা যায়নি, আগের পরিচ্ছেদেই তা বলা হয়েছে। ভদ্রলোকের মুখটা আজ থেকে বছর তিনেক আগেই আবার মেঘলা হতে শুরু করে। তার মানে এ হল গিয়ে নকুলচন্দ্র তাঁর বাড়িতে ভাড়াটে হয়ে আসবার তা ধরুন বছর খানেক পরের কথা। রাস্তায় একদিন দেখা হয়ে যেতে সদানন্দবাবুকে তখন জিগ্যেস করেছিলুম যে, কী হল, আবার কোনও ঝামেলা বাধল নাকি।

সদানন্দবাবু তাতে বললেন, 'আরে মশাই, ঝামেলা কার নেই বলুন তো। বেঁচে থাকাটাই একটা ঝামেলা। বয়েস তো নেহাত কম হল না, এখন গেলে বাঁচি!'

কথাটা আর-কেউ বললে অবাক হতুম না। সদানন্দবাবু বলছেন বলেই অবাক হতে হল। শরীরের কলকবজাগুলোকে ঠিক রাখবার জন্যে যাঁর চেষ্টার অন্ত নেই, আর সেই চেষ্টার কথাটা যিনি সগর্বে ঘোষণা করে থাকেন, বলেন যে, তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করলে আয়ুবৃদ্ধি একেবারে অবধারিত, সেই লোক বলছেন কিনা 'গেলে বাঁচি!' এসব কথা আর-যাঁরই মুখে মানিয়ে যাক, সদানন্দবাবুর মুখে একেবারেই মানায় না।

কিন্তু তবু যে তাঁকে সেদিন আর এ নিয়ে কিছু জিগ্যেস করিনি, তার কারণ আর কিছুই নয়, তাঁর উত্তর দেবার ধরন দেখেই আমি বুঝে গিয়েছিলুম যে, প্রসঙ্গটা তিনি এড়িয়ে যেতে চাইছেন।

দু-চার দিনের মধ্যেই অবশ্য ব্যাপারটা বোঝা গেল। এক রবিবার সকালে আমার বাড়িতে এলেন সদানন্দবাবু। যথারীতি হালকা এক কাপ লিকার খেলেন। তারপর অন্যান্য প্রসঙ্গে দু-চার কথা হবার পরে বললেন, 'না মশাই, ভাড়াটে বাছতে ভুল করেছি, নকুলচন্দ্র লোকটা বিশেষ সুবিধের নয়।'

আমি বললুম, বাছাবাছি আর করলেন কোথায়। পাড়ার ছেলেদের কথায় ঘাবড়ে গিয়ে হঠাৎ ঠিক করলেন যে, একতলাটা ভাড়া দেবেন, আর তার দু-চার দিনের মধ্যেই তো নকুলচন্দ্র এসে গেল। সেই যে এক রাজার গল্প শুনেছি, রাত্তিরে ঠিক করলেন যে, সকালে ঘুম থেকে উঠে রাজবাড়ির বাইরে বেড়াতে বেরিয়ে প্রথম যার মুখ দেখবেন, তার সঙ্গেই মেয়ের বিয়ে দেবেন, আপনারও তো দেখলুম সেই ব্যাপার।'

সদানন্দবাবু বিমর্ষ মুখে বললেন, 'সেইটেই বড্ড ভুল করে ফেললুম। নকুলটা মশাই অতি নচ্ছার লোক। যাদের কথার ঠিক নেই, তাদের আমি মানুষ বলেই মনে করি না। নকুলটা মানুষ নয়।'

বললুম, 'কথার ঠিক নেই বললেই তো আর হল না, বেঠিকটা কী দেখলেন?'

'তা হলে শুনুন মশাই, বাড়িতে যখন ভাড়াটে হয়ে ঢোকে, নকুল তখন আমাকে বলেছিল যে স্রেফ ওরা স্বামী-স্ত্রী থাকবে, আর কাউকে এনে ঢোকাবে না। তা এক বছর পার হতে-না-হতেই দেখছি শ্বশুরবাড়ি থেকে একটি শালাকে এনে ঢুকিয়েছে। বলেছিল, হপ্তাখানেক থেকেই চলে যাবে, কিন্তু কই, শালাবাবুটির তো নড়বার কোনও লক্ষণই দেখছি না।'

পাঁচ নম্বরের একতলায় যে নতুন একজন লোক কিছুদিন ধরে রয়েছে, এটা, আমিও লক্ষ করেছি। বাসন্তীকে জিগ্যেসও করেছিলুম যে, লোকটা কে? তা বাসন্তী বলল, ও হচ্ছে নকুলের বউ যমুনার দাদা। মানে আপন দাদা নয়, মামাতো দাদা। গ্রামে থাকত, সেখান থেকে বোনের বাড়িতে এসে উঠেছে। এখন কিছুদিন কলকাতায় থেকে যা-হোক কিছু একটা কাজকর্ম জুটিয়ে নেবে।

তা সদানন্দবাবুর তাতে এত আপত্তি কেন, বোঝা গেল না। বললুম, 'কাজকর্মের সন্ধানে এসেছে, একটা কিছু জুটে গেলেই চলে যাবে নিশ্চয়। সব বাড়িতেই আত্মীয়স্বজনরা এমন এসেই থাকে, চিরকালের জন্যে তো আর কেউ আসে না। ও নিয়ে আপনি এত ভাবছেন কেন?'

সদানন্দবাবু বললেন, 'ভাববার কারণ আছে বলেই ভাবছি। আপনি বলছেন, একটা কাজকর্ম জুটে গেলেই চলে যাবে। আরে মশাই, কাজকর্ম কি মামার বাড়ির ক্ষীরের নাড়ু নাকি যে, দিনরাত্তির আমি বিছানায় পড়ে রইলুম, আর আদর করে দিদিমা আমার মুখের মধ্যে গুঁজে দিয়ে গেল! কাজকর্ম জোটাতে হলে হাঁটাহাঁটি করাই যথেষ্ট নয়, রীতিমতো দৌড়ঝাঁপ করা দরকার। তা বিষ্টু হতচ্ছাড়া সে-সব করছে কোথায়?'

'ওর নাম বুঝি বিষ্টু?'

'হ্যাঁ। বিষ্টুচরণ দাস।'

'সারাদিন বিছানায় পড়ে-পড়ে ঘুমোয় বুঝি?'

'যখন ঘুমোয় না, তখন হেঁড়ে গলায় যাত্রার গান গায়। আমার মশাই একটুও পছন্দ হয় না।'

সদানন্দবাবু আর বসলেন না, বেরিয়ে গেলেন।

বাড়িওয়ালার সঙ্গে ভাড়াটের সম্পর্ক অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভালো হয় না। তার ওপরে আবার বাড়িওয়ালা আর ভাড়াটে যখন একই বাড়িতে থাকে, সম্পর্কটা তখন প্রায়ই অতি তেতো হয়ে ওঠে। আমার বাড়িওয়ালার সঙ্গেও আমার সম্পর্ক বিশেষ মধুর নয়। মোটামুটি দশ বছর এখানে আছি, তার মধ্যে দুবার আমার ভাড়া বেড়েছে, তা নিয়ে আমি কোনও আপত্তিও তুলিনি, রেন্ট কন্ট্রোলে যাবার ভয় দেখানো তো দূরের কথা, মুখেও কখনও বলিনি যে, এইভাবে ভাড়া বাড়ানোটা মোটেই উচিত কাজ হচ্ছে না, তবু দেখছি আমার বাড়িওয়ালাটি ঠারেঠোরে এমন সব উক্তি প্রায়ই করছেন, যাতে মনে হয়, আমি উঠে গেলেই তিনি বাঁচেন।

ভাড়াটে উঠে গেলেই যে বাড়িওয়ালার সুবিধে, সেটা অবশ্য আমি অস্বীকার করি না। আর-কিছু না হোক, নতুন ভাড়াটের কাছ থেকে ফের নতুন করে পাঁচ-দশ হাজার টাকা সেলামি আদায় করা যায়। সেটাই তো মস্ত লাভ। সম্ভবত সেই জন্যেই আমার বাড়িওয়ালা কিছুদিন যাবৎ গাইতে শুরু করেছেন যে, তিনতলায় আর তাঁর কুলোচ্ছে না, দোতলাটা যদি এবারে ছেড়ে দিই তো তাঁর বড্ড উপকার হয়।

কথাটা তিনি যেমন আমাকে বলেন, তেমনি বাসন্তীকেও বলেন। আমি বলি, 'খোঁজাখুঁজি তো করছি, নতুন একটা ফ্ল্যাটের সন্ধান পেলেই এটা ছেড়ে দেব।' বাসন্তীও মোটামুটি সেই কথাই বলছিল। কিন্তু দিন কয়েক আগে বাড়িওয়ালা ফের যখন কাঁদুনি গাইতে শুরু করেন, বাসন্তী তখন দুম করে রেগে গিয়ে তাঁকে বলে বসে, 'আপনার কুলোচ্ছে না তো আমরা কী করব? মেয়ে দুটোর

বিয়ে দিয়ে শ্বশুরবাড়িতে পাঠিয়ে দিন, তা হলেই দেখবেন দিব্যি কুলিয়ে যাবে।'

বাস, সেই যে বাড়িওয়ালা আমাদের সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করেছেন, এখনও তিনি স্পিকটি নট। দেখা হলেই মুখ ঘুরিয়ে নেন। বাক্যালাপ বন্ধ হওয়ায় অবশ্য আমাদের বিশেষ অসুবিধে হচ্ছে না, তবে ভয় হচ্ছে যে, এবারে হয়তো জল বন্ধ হবে। তা হলে মুশকিলে পড়ব।

জল বন্ধ হওয়ার এই ভয়টা শুরু হয়েছিল বছর তিনেক আগেই। বাড়িওয়ালার সঙ্গে আমার সম্পর্ক মোটামুটি তখন থেকেই খারাপ চলছে। ব্যাপারটা সেইসময়ে সদানন্দবাবুকে আমি জানিয়েও ছিলুম। বলেছিলুম, 'আপনাব সমস্যা ভাড়াটেকে নিয়ে, আর আমার সমস্যা বাড়িওয়ালাকে নিয়ে। কী যে করব, বুঝতে পারছি না। জল বন্ধ হলে তো বিপদে পড়ব, মশাই।'

শুনে জিভ কেটে সদানন্দবাবু বলেছিলেন, 'ছি-ছি, জল আবার কেউ বন্ধ করে নাকি। ও তো একটা ক্রিমিন্যাল অফেন্স।'

তা বছর তিনেক আগে যা-ই বলে থাকুন, মাস ছয়েক আগে নিজের বাড়িতে কিন্তু সদানন্দবাবু সেই ক্রিমিন্যাল অফেন্সটাই করে বসলেন। প্রথমে তিনি নকুলচন্দ্রের জলের সাপ্লাই বন্ধ করলেন, তার পরে কাটলেন ইলেকট্রিক।

অর্থাৎ সদানন্দবাবু একেবারে তিতিবিরক্ত, তাঁর একতলার ভাড়াটেদের তিনি তাড়াতে চাইছেন। তাড়াতে চাইবার কারণ মাত্র একটি নয়, অনেক। তাঁর কথাবার্তা শুনে বুঝতে পারছি যে, নকুল-পরিবারের বলতে গেলে প্রায় কোনও কিছুই তিনি পছন্দ করতে পারছেন না।

নকুলচন্দ্রের শালাবাবু বিষ্টুচরণের চেহারা যে খুব বদখত, তা নয়, তা ছাড়া, সদানন্দ নিজেও স্বীকার করেন যে, কথাবার্তায় লোকটা খুব বিনয়ীও বটে। কিন্তু ওই যে সে কাজকর্মের জন্যে দৌড়ঝাঁপ না করে, গোটা দুপুরটা স্রেফ ঘুমিয়ে কাটায়, আর যখন জেগে থাকে, তখন মাঝে-মাঝেই হেঁড়ে গলায় যাত্রার গান গায়, এটা তাঁর পছন্দ নয়। নকুলচন্দ্রের বউ যমুনাকে কেউ কচিখুকিটি বলবে না, তার বয়েস নিশ্চয় তিরিশ পার হয়ে গেছে, অথচ এখনও সে যে চোখে পুরু করে কাজল দেয়, ঠোঁটে লিপস্টিক ঘষে, হাতকাটা ব্লাউজ পরে, আর কথাও বলে 'ন্যাকা-ন্যাকা', এটা তাঁর পছন্দ নয়। এই বাড়িতে ভাড়াটে হয়ে আসবার বছর দুয়েক বাদে যে যমুনার একটি মেয়ে হয়েছে, ফলে—বিষ্টুচরণকে হিসেবের মধ্যে ধরলে—ভাড়াটেদের লোকসংখ্যা যে মাত্র দু-বছরের মধ্যেই সেন্ট পার্সেন্ট বেড়ে গিয়ে এখন দুয়ের জায়গায় চার হয়েছে, এটাও তাঁর পছন্দ নয়।

কিন্তু তাঁর সবচেয়ে অপছন্দের ব্যাপার হল নকুলচন্দ্রের ব্যাবসা।

নকুলচন্দ্র যখন ভাড়াটে হয়ে আসে, তখন সে অর্ডার সাপ্লাইয়ের কাজ করত। তাতে সুবিধে না হওয়ায় সে জমি কেনাবেচার লাইন ধরে। কিন্তু তাতেও সে চোট খেয়ে যায়। ফলে বছর খানেক হল সে মাছের ব্যাবসা ধরেছে। আর এই মাছের ব্যাবসা নিয়েই সদানন্দের ঘোর আপত্তি।

আপত্তি হত না, নকুল যদি না বাড়ির মধ্যেই তার পাইকার ব্যাবসার আড়ত বসিয়ে দিত। দুটো ঘরের একটায় তারা স্বামী-স্ত্রী আর বাচ্চাটি থাকে। অন্য ঘরটায় বিষ্টু থাকত। এখনও থাকে, তবে কিনা ঘরের বেশির ভাগটাই ভরতি হয়ে থাকে মাছের ঝুড়িতে।

সদানন্দবাবু যে প্রথম-প্রথম এই নিয়ে খুব আপত্তি করেছিলেন, তা নয়। শুধু একদিন হাসতে-হাসতে আমাকে বলেছিলেন, 'বিষ্টুকে এবারে পালাতে হবে, মশাই।'

আমি বলেছিলুম, 'কেন?'

'যতই হোক, মানুষ তো। গন্ধের দাপটেই পালাতে হবে।'

বললুম, 'তা বটে। বিষ্টুকেও যে মাছের ঘরে থাকতে হয়, সেটা আমার মনেই ছিল না।'

বিষ্টু কিন্তু পালাল না। নকুলচন্দ্রের মাছের ব্যাবসাও সমানে চলতে লাগল। সকাল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ নাকি বাজারের খুচরো ব্যাবসায়ীরা পাঁচ নম্বর বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ায়, মাছ দেখে, পছন্দ হলে দামদস্তুর করে, দামে পোষালে মাছ ওজন হয়, তারপর পাওনাগণ্ডা মিটিয়ে দিয়ে মাছের

ঝুড়ি রিকশায় তুলে তারা ছ'টার মধ্যেই বাজারে চলে যায়। আমি তো অত সকাল-সকাল ঘুম থেকে উঠি না। তাই স্বচক্ষে এই কেনাবেচার ব্যাপারটা কখনও দেখিনি। তবে যেমন বাসন্তী আর পারুলের কাছে, তেমনি পাড়ার অন্য দু-চারজন লোকের মুখে শুনেছি যে, গলিটা তখন আঁশটে গন্ধে ভরে ওঠে।

যে-ঘরে মাছের আড়ত, তারই একপাশে বিষ্টুর শোবার জায়গা। মাঝেমধ্যে সদানন্দবাবুর বাড়িতে যাই, দোতলায় ওঠবার সময় সিঁড়ি থেকে উঁকি মেরে দেখতে পাই, ঘরের মধ্যে পরপর মাছের ঝুড়ি, আর সেই ঝুড়ির পাশে নোংরা একটা বিছানা। বিষ্টুচরণকেও দেখতে পাই। দিব্যি সে তার বিছানায় শুয়ে ঘুম লাগাচ্ছে। সদানন্দবাবু আশা করেছিলেন, বিষ্টু এবারে পালাবে, ওই আঁশটে গন্ধের মধ্যে সে টিকতে পারবে না। কিন্তু যেভাবে তাকে নাক ডাকিয়ে ঘুমোতে দেখি, তাতে আমার মনে হয় না যে, মাছের গন্ধে বিষ্টুর কোনও অসুবিধে হচ্ছে।

আসলে অসুবিধেটা যে সদানন্দবাবুরই হচ্ছে, সেটা বুঝতে পারলুম, যখন এর মাস ছয়েক বাদে তিনি আবার এক রবিবারে আমার বৈঠকখানায় এসে ঢুকলেন। সাধারণত একটা ভূমিকা করে নিয়ে তারপরে তিনি আসল প্রসঙ্গে আসেন। সেদিন কিন্তু কোনও ভূমিকার মধ্যে তিনি গেলেন না। ঘরে ঢুকেই হতাশ গলায় বললেন, 'আর তো পারছি না মশাই!'

একটা বই বেরুবে, তার প্রুফ দেখছিলুম। সেটাকে সরিয়ে রেখে বললুম, 'কেন, আবার কী হল?'

'হবে আবার কী, গন্ধে একেবারে পাগল হয়ে গেলুম!'

'রোজই কি গন্ধ ছড়ায় নাকি?'

'রোজ। তার ওপরে আবার এক-একদিন এমন উৎকট গন্ধ ছড়ায় যে, সে আর কী বলব, গোটা শরীরটা যেন গুলিয়ে ওঠে। কী করি বলুন তো?'

জীবনে আমি মাছের ব্যাবসা কেন, কোনও ব্যাবসাই করিনি। তবে কিনা যেখানে মাছের আড়ত খোলা হয়েছে, সেখানে যে আঁশটে গন্ধে বাতাস সারাক্ষণ ভরাট হয়ে থাকবে, এটা বোঝবার জন্যে আলাদা কোনও ব্যাবসাবুদ্ধি থাকার দরকার হয় না, অল্পবিস্তর কাণ্ডজ্ঞান থাকাটাই যথেষ্ট। নকুলচন্দ্র মাছের ব্যাবসা করে, বাড়িতেই তার মাছের আড়ত, খুচরো ব্যাবসায়ীরা তার কাছ থেকে মাছ কেনে, কিন্তু তার আড়তের সব মাছই কি আর সঙ্গে-সঙ্গে বিক্রি হয়ে যায়? তা নিশ্চয় হয় না। স্টকের কিছুটা মাছ নিশ্চয় পড়ে থাকে। ঠিকমতো.যদি না বরফ-চাপা দিয়ে রাখা হয়, তা হলে সেগুলো পচতে শুরু করে। তার গন্ধ তো তখন উৎকট হয়ে উঠবেই। আর তা যে উঠবে, সদানন্দবাবুর সে-কথা আগেই বোঝা উচিত ছিল।

বললুম, 'কী আর করবেন। ভাড়াটে নেবার আগে একটা কনট্রাক্ট করে নিয়েছিলেন?'

'তা তো করিনি।'

'করা উচিত ছিল। তাতে এইরকম একটা শর্তও আপনার রাখা উচিত ছিল যে, একতলাটাকে শুধু রেসিডেন্সিয়াল পারপাসেই ব্যবহার করা চলবে, ওখানে গোডাউন করা চলবে না। তা তেমন কোনও কনট্রাক্ট যখন নেই, তখন আর আপনি কী করবেন?'

'সে কী মশাই,' সদানন্দবাবু বললেন, 'বাড়ি তো আর নকুলের নয়, বাড়ি আমার। নাকি তাও আপনি স্বীকার করবেন না?'

'তা কেন করব না?' হেসে বললুম, 'বাড়ি আপনারই।'

'আর সেই বাড়িটাকে যদি কেউ নরককুণ্ড বানিয়ে তোলে, তাও আমি কিছু করতে পারব না? বাড়ি ভাড়া দিয়ে কি আমি চোর-দায়ে ধরা পড়েছি নাকি?'

বললুম, 'নিয়মিত ভাড়া দেয়?'

'তা দেয়।'

'তা হলে মামলা-টামলার মধ্যে যাবেন না, গিয়ে কোনও লাভ হবে না। বরং এক কাজ করুন। ওকে বুঝিয়ে বলুন যে, বসতবাড়ির মধ্যে এই যে ও মাছের আড়ত করেছে, এটা ঠিক হচ্ছে না। তাতে যদি কাজ না হয় তো তার পরের কথাটা তখন ভাবা যাবে।'

সদানন্দবাবু বুঝিয়ে বলতে গিয়েছিলেন। তাতে কাজ হয়নি। মাছের আড়ত অন্য কোথাও সরিয়ে নিতে হবে, এই প্রস্তাব শুনে নকুলচন্দ্র নাকি হাত কচলে বলেছিল, 'কোথায় সরাব মেসোমশাই? আমি রইলুম এখানে আর আড়ত রইল আর-এক জায়গায়, এই করে কি ব্যাবসা চলে?'

সদানন্দবাবু বলেছিলেন, 'অন্যেরা চালায় কী করে?'

তাতে নকুল বলেছিল, 'তারা পারে। তাদের পয়সা আছে। তারা মাছ পাহারা দেবার জন্যে দরোয়ান রাখে, মাছ বিক্রি করবার জন্যে আলাদা কর্মচারী রাখে। আমি ওসব কী করে পারব?'

সদানন্দবাবুর কাছে সব শুনে আমি বললুম, 'তা হলে ওকে উঠে যেতে বলুন। পাড়ার দু-চারজন ভদ্রলোককে সঙ্গে নিয়ে ওর কাছে যান। গিয়ে বলুন যে, এখানে ওর থাকা চলবে না।'

তা-ই বলা হল। নকুলচন্দ্র তাতে কাতর গলায় বলল, 'কোথায় যাব মেসোমশাই? এত কম ভাড়ায় আর কোথায় দু-খানা ঘর পাব আমি?'

অগত্যা কী আর করেন, যে-কাজকে নিয়েই একদিন ক্রিমিন্যাল অফেন্স বলেছিলেন, উপায়ান্তর না-থাকায় হঠাৎ একদিন সেটাই করতে হল সদানন্দবাবুকে। ভাড়াটের জলের সাপ্লাই তিনি বন্ধ করে দিলেন।

কিন্তু তাতে কোনও লাভ হল না। এমন নয় যে জল বন্ধ হবার ব্যাপারটা নিয়ে নকুল একটা হইচই বাধিয়ে দিল। তা সে করল না। এমনকী, সদানন্দবাবুর কাছে এই নিয়ে কোনও প্রতিবাদও জানাল না সে। স্রেফ একজন ভারী লাগিয়ে রাস্তার কল থেকে সে জল আনিয়ে নিতে লাগল।

সদানন্দবাবু বুঝে গেলেন যে, শুধুই জল বন্ধ করে নকুলচন্দ্রকে জব্দ করা যাবে না। তখন তিনি লাইটের কানেকশনও কেটে দিলেন। তার পরের দিনই আবার আমার ফ্ল্যাটে এসে কড়া নাড়লেন সদানন্দবাবু। থমথমে গম্ভীর মুখ; হাসির লেশমাত্র নেই।

বললুম, 'ব্যাপার কী মশাই, আবার কী হল?'

'হপ্তাখানেক ধরে যে ওকে জল দিচ্ছি না, সেটা জানেন তো?'

'জানতুম না। কাল রাত্তিরে বাসন্তীর কাছে শুনলুম।'

'তিনি কী করে জানলেন?'

'কাল বিকেলে কী একটা কাজে যেন আপনার মিসেসের কাছে গিয়েছিল, তাঁরই কাছে শুনেছে। কাজটা ভালো করেননি।'

'তা হয়তো করিনি,' সদানন্দবাবু বললেন, 'কিন্তু এ ছাড়া উপায়টাই বা কী ছিল?'

'তা এতে কোনও কাজ হল?'

হতাশ গলায় সদানন্দবাবু বললেন, 'কিস্সু না। ভেবেছিলুম বাছাধন এবারে পথে আসবে। কিন্তু কোথায় কী, ভারী দিয়ে জল আনিয়ে নিচ্ছে। কাল রাত্তিরে তাই লাইটের কানেকশনও কেটে দিলুম।'

বললুম, 'এটা আরও খারাপ করলেন। মামলা-টামলা যদি হয়ই, তাহলে এই দুটো ব্যাপারই কিন্তু ওর ফেভারে যাবে। আর মামলা তো পরের কথা, এক্ষুনি গিয়ে ও যদি থানায় ডায়েরি লিখিয়ে আসে তো আপনি বিপদে পড়ে যাবেন মশাই।'

সদানন্দবাবু বললেন, 'বিপদে আমি অলরেডি পড়েছি।'

'তার মানে? নকুল কি এরই মধ্যে থানায় গিয়ে ডায়েরি করেছে নাকি?'

'না মশাই, বিপদ একেবারে উলটোদিক থেকে এসেছে।'

॥ ৫ ॥

সদানন্দবাবু যে কী বলতে চাইছেন, কিছুই ঠাহর করতে পারলুম না। বললুম, 'ব্যাপাবটা একটু বুঝিয়ে বলুন তো।'

সদানন্দবাবু একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, 'সব তা হলে খুলেই বলি। দেখুন মশাই, নকুল যে মোটেই সুবিধের লোক নয়, সে ওরা ভাড়াটে হয়ে আসবার এক বছর বাদেই আমি টের পেয়েছি। বলেছিল, ওরা দুটিমাত্র প্রাণী এখানে থাকবে, অথচ বছরখানেক যেতে-না-যেতেই একটা উটকো লোককে আমার বাড়ির মধ্যে এনে ঢোকাল। তার মানে ওর কথার ঠিক নেই। না, না, বিষ্টুচরণ যে খারাপ লোক, তা আমি বলছি না। কাজকর্ম না খুঁজে ও যে পড়ে-পড়ে শুধু ঘুমোয়, তাতেও আমার আপত্তি নেই। কিন্তু এমন তারস্বরে গান গাইবে কেন? তার ওপরে আবার বছর দুয়েক আগে নকুলের একটা মেয়ে হয়েছে। রাত্তিরে সেটা এক-একদিন এমন ট্যা-ট্যা করে কাঁদে যে আমাব ঘুমের বড় ব্যাঘাত হয়। আমি মশাই শান্তিপ্রিয় লোক, আমার গিন্নিটিও তা-ই, এতসব চিৎকাব-চেঁচামেচি আমাদেব পছন্দ হয় না। তার ওপরে আবার অশান্তি আজকাল আবও বেড়েছে।'

'আঁশটে গন্ধের কথা বলছেন তো?'

'আরে সে-উৎপাত তো আছেই। মাছ যখন পচে, তখন তার গন্ধে আমাদের অন্নপ্রাশনের ভাত পর্যন্ত মুখে উঠে আসে মশাই।'

কথাটা সেদিন বাসন্তীর কাছেও শুনেছি। হাসতে-হাসতে বাসন্তী বলছিল, 'কুসুমদির কাছে আজ উলের একটা প্যাটার্ন তুলতে গিয়েছিলুম, তা পচা-মাছের দুর্গন্ধে তো বসতেই পারলুম না। কুসুমদিরও একেবারে পাগল-পাগল অবস্থা। শাড়ির আঁচল নাকের ওপব চেপে ধরে পরিত্রাহি চেঁচাচ্ছিলেন আর সদানন্দবাবুকে নাকিসুরে বলছিলেন, 'বিঁদেয় কঁরো, বিঁদেয় কঁবো, আঁজই এঁই পাঁপ বিঁদেয় কঁরো!' প্যাটার্ন তুলব কী, আমি তখন পালাতে পারলে বাঁচি।'

সদানন্দবাবুকে বললুম, 'আঁশটে গন্ধটা তো আর নতুন সমস্যা নয, ওটা তো কিছুদিন ধবেই চলছে। নতুন অশান্তিটা কী হল?'

সদানন্দবাবু বললেন, 'সেই কথাই তো বলছি। তা আপনি শুনছেন কই। ব্যাটা আজকাল বড্ড বাড়াবাড়ি করছে। মানে সবকিছুরই একটা মাত্রা থাকবে তো, তাও থাকছে না।'

ভদ্রলোকের সবই ভালো, কিন্তু মুশকিল এই যে, বক্তব্যেব চেয়ে ভূমিকাটাই বড় হয়ে দাঁড়ায়। বললুম, 'অত বিতং দিয়ে কথা বলবেন না তো, স্পষ্ট করে বলুন যে কী হয়েছে।'

সদানন্দবাবু বললেন, 'সে কী মশাই, কিছুই আপনাব কানে যায় না নাকি।' তাবপর একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'অবশ্য যাবেই বা কী কবে? রাত্তিরে তো আপনারা পেছনের দিককাব ঘরে থাকেন, তাই না?'

'হ্যাঁ, তো কী হয়েছে?'

'রাস্তার দিককার ঘরে যদি থাকতেন তো ঘুম ভেঙে যেত। উরে বাপরে বাপ, সে কী চেঁচামেচি!'

'কে চেঁচামেচি কবে?'

'কে আবার, ওই নকুল। ব্যাটা বরাবরই রাত করে ফিরত, তা আজকাল তো দেখছি রাত বারোটাও পেবিয়ে যাচ্ছে। ফিরে এসেই চেঁচামেচি জুড়ে দেয়, আর বউয়ের ওপরে চোটপাট করতে থাকে। ওপর থেকে যে আমি তাতে আপত্তি করিনি, তাও নয়। বেশ কয়েকদিনই গলা চড়িয়ে বলেছি, 'এসব কী হচ্ছে, অ্যাঁ? এত হল্লা কীসের? এটা বস্তি নয়, এটা ভদ্রপাড়া!' তা সে-সব কথা তো গেরাহ্যিই করে না। চেঁচাচ্ছে তো চেঁচাচ্ছেই, হল্লা করছে তো করছেই। ওরে বাবা রে বাবা, সে এক জগঝম্প কাণ্ড!'

'এত রাত করে ফেরে কেন, কখনও জিগ্যেস করেছিলেন?'

'তা করেছিলুম বইকী। রাত্তিরে তো আর নীচে নামতে ভরসা হয় না, তাই একদিন দিনের বেলায় দেখা হয়ে যেতে জিগ্যেস করেছিলুম যে, বাড়ি ফিরতে আজকাল এত রাত হচ্ছে কেন?'

'তাতে কী বলল?'

'বলল যে, মহাজনের পাওনা মিটিয়ে ফিরতে হয় তো, তাই একটু রাত হয়ে যায়।' সদানন্দবাবু একটা চোখ একটু ছোট করে হাসলেন। তারপর গলার স্বর একটু নীচে নামিয়ে বললেন, 'ও-ও বলল, আর আমিও বিশ্বাস করলুম! আসল কথাটা কী জানেন, ব্যাটা আজকাল খুব মাল টানছে।'

'তা টানুক না. আপনার পয়সায় তো আর টানছে না, তা হলে আর আপনার তা নিয়ে এত উতলা হবার দরকার কী? ওর ডানা গজিয়েছে, তাই উড়ছে। তা উড়ুক না, আপনি তাতে বিচলিত হচ্ছেন কেন?'

সদানন্দবাবু অবাক চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন, 'যাচ্চলে, আমি কেন বিচলিত হব? আরে না মশাই, কে মাল টানল না-টানল, তাতে আমার কী। ও-সব নিয়ে আমি একটুও ভাবছি না। আমার সাফ কথা, যা করতে হয়, মুখ বুজে করো, হল্লাবাজি চলবে না। আর হ্যাঁ, বাড়ির মধ্যে পচা মাছের দুর্গন্ধ ছড়ানোও চলবে না। ওই আড়তটাকেও এখান থেকে সরাতে হবে।'

পারুল এসে ঘরে ঢুকল। বললুম, 'কী ব্যাপার, পড়া ছেড়ে উঠে এলি যে? কিছু বলবি?'

'মা বলছে, এবার চান করতে যাও, মা'র রান্না হয়ে গেছে।'

সদানন্দবাবু বললেন, 'তা হলে চলি মশাই। আপনার অফিস যাবার টাইম হল।'

বললুম, 'বসুন, বসুন পাঁচ মিনিট পরে গেলেও চলবে।' তারপর পারুলের দিকে তাকিয়ে বললুম, 'তোর মাকে বল যে, বোসদা এসেছেন, তাঁর সঙ্গে কথা বলছি, মিনিট পাঁচেক বাদে কলঘরে ঢুকব।'

পারুল চলে গেল। সদানন্দবাবু বললেন, 'মোট কথা, হল্লা যদ্দিন পর্যন্ত না বন্ধ হচ্ছে আর যদ্দিন পর্যন্ত না সবানো হচ্ছে এই মাছের আড়ত, আমিও তদ্দিন ছাড়ছি না।'

বললুম, সেইজন্যেই যে জল আর লাইট কেটে দিয়েছেন, সে তো বুঝতেই পারছি।'

'ব্যাটা ভারী দিয়ে জল আনাচ্ছে! সকালে যখন বাজার থেকে ফিরছে তখন আবার দেখলুম, এক হাতে বাজারের থলি, আর এক হাতে দুটো হ্যারিকেন।'

'লাইট যখন কেটে দিয়েছেন, তখন হ্যারিকেন আর হাতপাখা ছাড়া উপায় কী! কিন্তু এখনও বলছি, কাজটা আপনি ভালো করলেন না। শেষ পর্যন্ত একটা বিপদে না পড়ে যান।'

'সে তো পড়েইছি। না, না, যা ভাবছেন তা নয়, নকুল এ নিয়ে কী করবে না-করবে জানি না, তবে এখনও থানা-পুলিশ করেনি।'

'বিপদটা তা হলে কীসের?'

'বিপদ একেবারে উলটো দিকের।'

কথাটা যে সদানন্দবাবু গোড়াতেই বলেছিলেন, সেটা ভুলে গিয়েছিলুম। এতক্ষণে আবার মনে পড়ল। বললুম, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ, এইরকম একটা কথা আপনি বলছিলেন বটে, আমারই খেয়াল ছিল না। তা উলটো দিকের মানে কোন দিকের?'

একটু আগেও বেশ চড়া গলায় কথা বলছিলেন সদানন্দবাবু; এমন একটা ভাব দেখাচ্ছিলেন যেন নকুলচন্দ্রকে উচিত-শিক্ষা না দিয়ে তিনি ছাড়বেন না। হঠাৎ যেন সেই 'যুদ্ধং দেহি' ভাবটা একেবারে মিলিয়ে গেল। মুখের ওপরে আবার মেঘ ঘনিয়ে এসেছে, ভঙ্গিটাও ভারী কুণ্ঠিত। বেজার গলায় ভদ্রলোক বললেন, 'বিপদটা ঘটিয়েছেন আমার গিন্নিই।'

'তার মানে?' অবাক হয়ে বললুম, 'আপনার মিসেস আবার কী বলছেন?'

কাঁচুমাচু হয়ে সদানন্দবাবু বললেন, 'বলছেন যে, আমি মানুষ নই, একেবারে অমানুষ। আমার মধ্যে নাকি মনুষ্যত্ব বলতে কিছু নেই।'

ব্যাপারটা আসলে কী ঘটেছে, সেটা জানতে আমার ভীষণ কৌতূহল হচ্ছিল। অথচ সদানন্দবাবু যেভাবে অনাবশ্যক বিতং দিয়ে কথা বলেন, তাতে সন্দেহ হচ্ছিল যে, সমস্যাটা যে ঠিক কী, বিস্তর বাক্যব্যয় করেও তিনি সেটা ঠিক পরিষ্কার করে বুঝিয়ে বলতে পারবেন না। তাই মনে হল যে, ওঁর বাড়িতে গিয়ে সরাসরি ওঁর স্ত্রীর সঙ্গে একবার কথা বলা দরকার।

সদানন্দবাবুকে একটুক্ষণ অপেক্ষা করতে বলে তাই বৈঠকখানা থেকে রান্নাঘরে এসে বাসন্তীকে বললুম, 'অফিসের আজ তেমন তাড়া নেই, ঘণ্টাখানেক পরে গেলেও চলবে। চট করে একবার ও-বাড়ি থেকে ঘুরে আসছি।'

বৈঠকখানায় ফিরে এসে সদানন্দবাবুকে বললুম, 'চলুন, আপনার মিসেসের সঙ্গে কথা বলব।'

আমাদের বাড়ির প্রায় উলটো দিকেই পাঁচ নম্বর বাড়ি। গলিটা পার হয়ে বাড়িতে ঢুকে ওপরে উঠে এলুম।

কুসুমবালা তাঁর শোবার ঘরের খাটের ওপরে একটা তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বসে আছেন। আমাকে দেখে হেসে বললেন, 'আসুন, আসুন। আমি কিন্তু উঠতে পারব না, বাতের ব্যথাটা আবার খুব বেড়েছে।'

বললুম, 'না-না, উঠতে হবে না।'

সদানন্দবাবু একটা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে আমাকে বসতে বললেন। তারপর বললেন, 'আমি তো দিনে তিন কাপের বেশি চা খাই না, তার মধ্যে দু-কাপ ইতিমধ্যে খাওয়া হয়ে গেছে। থার্ড কাপ খাব বিকেলে। কিন্তু আপনি তো আর অত হিসেব করে খান না, আপনার জন্যে একটু চা করি?'

বললুম, 'আরে না মশাই, চায়ের দরকার নেই। মিসেস বসুকে একটা কথা বলতে এসেছি। বলেই চলে যাব।'

কুসুমবালা হেসে বললেন, 'আমার সঙ্গে আবার কী কথা?'

'সদানন্দবাবু যে একতলার লাইট কেটে দিয়েছেন, তাতে আপনার আপত্তি আছে, তাই না?'

কুসুমবালার মুখ থেকে হাসিটা নিমেষে মিলিয়ে গেল। বললেন, 'আছেই তো। এটা কি একটা মানুষের মতো কাজ হল?'

'এ-কথা বলছেন কেন? নকুলদের জন্যে আপনার এত ভাবনা কীসের?'

কুসুমবালা যেন ফুঁসে উঠলেন। বললেন, 'ওদের জন্যে ভাবতে আমার বয়ে গেছে। না কিরণবাবু, আমি নকুলের কথাও ভাবছি না, যমুনার কথাও ভাবছি না, যমুনার দাদা বিষ্টুর কথাও ভাবছি না। কিন্তু দু-বছরের একটা দুধের বাচ্চা, তার কষ্টের কথাটা তো একবার ভাবতে হবে।'

সদানন্দবাবু বললেন, 'কমলির কথা বলছ? সে তো বলতে গেলে সারাটা দিন দোতলায় এসে তোমার কাছেই কাটায়।'

কুসুমবালা বললেন, 'তা কাটায়। কিন্তু সারাটা রাত একতলায় তার মায়ের কাছে থাকে। চত্তির মাস, গরম পড়ে গেছে, গরমে কাল রাত্তিরে ওই মেয়েটা ঘুমোতে পারেনি। তা ছাড়া আমি জানি তো, মাঝরাত্তিরে একবার হিটারে দুধ গরম করে ওকে খাইয়ে দিতে হয়। তা ইলেকট্রিক না থাকলে যেমন ফ্যান চলে না, তেমনি হিটারও চলে না। মাঝরাত্তিরে কাল তাই মেয়েটির নিশ্চয় কিছু খাওয়া হয়নি। তা এ-সব কথা কি তুমি ভেবে দেখেছিলে? একবারও ভাবোনি। দুম করে তুমি ইলেকট্রিকের লাইন কেটে দিলে। দিয়ে ভাবলে যে, এই করে নকুলকে খুব জব্দ করা হল। কিন্তু নকুলকে জব্দ করতে গিয়ে একটা দুধের বাচ্চাকে যে কী কষ্টে ফেলা হল, তা ভেবেও দেখলে না। তুমি কি মানুষ? ছিছি।'

সদানন্দবাবুর মুখ দেখে মনে হচ্ছিল যে, তিনি একেবারে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছেন। আমার দিকে তাকিয়ে করুণ মুখে বললেন, 'আপনি কিছু বলবেন না?'

'কী আর বলব? আমার তো মনে হয়, মিসেস বসু যা বলেছেন, ঠিকই বলেছেন।'

উঠে পড়লুম। সিঁড়ি দিয়ে নামতে-নামতে একটা বাচ্চা-মেয়ের কান্নার শব্দ কানে এল। সেইসঙ্গে একটা মেয়েলি গলার ধমক। 'থাক, জেঠির দরদ যে কত, সে তো বোঝাই গেছে, ফ্যানের হাওয়া খাওয়ার জন্যে আর তোমার ওপরে গিয়ে কাজ নেই।'

বুঝতে পারলুম যে, কমলি তার জ্যাঠাইমার কাছে যাওয়ার জন্য বায়না ধরেছে, কিন্তু তার মা তাকে যেতে দিচ্ছে না।

॥ ৬ ॥

রাইটার্সে একটা ফোন করবার দরকার ছিল। সংক্ষেপে যাকে পি. এ. বি. এক্স বলে, ডায়াল ঘুরিয়ে সেই প্রাইভেট অটোমেটিক ব্রাঞ্চ এক্সচেঞ্জের সঙ্গে যোগাযোগ করতেই সেখানকার মেয়েটি বলল, 'একটু আগেই এক ভদ্রলোক আপনাকে চাইছিলেন। আপনি নেই শুনে বললেন যে, খানিক বাদে আবার ফোন করবেন।'

'নাম বলেননি?'

'আমি জিগ্যেস করেছিলুম, উনি কিছু বললেন না। শুধু বললেন যে, উনি বাইরে থেকে এসেছেন, আপনাকে এই মেসেজটা দিয়ে দিলেই হবে।'

কিছুই বুঝতে পারলুম না। বাসন্তীর দাদা দিল্লিতে থাকেন, কিন্তু তাঁর তো এখন কলকাতায় আসবার কথা নয়, এলেও নিশ্চয় অফিসে না-করে বাড়িতেই ফোন করতেন। ছেলে থাকে এলাহাবাদে। সে-ই কি হঠাৎ তার অফিসের কাজে কলকাতায় এল? অফিসে কোনও জরুরি কনফারেন্স আছে হয়তো, তাই স্টেশন থেকে একেবারে সরাসরি অফিসে চলে গিয়ে সেখান থেকে ফোন করেছে। কিন্তু সে-ই বা অফিসে ফোন করবে কেন?

এক্সচেঞ্জের মেয়েটিকে বললুম, 'ঠিক আছে, এখন রাইটার্সকে একবার ডেকে দাও তো।'

রাইটার্সের সঙ্গে কথা শেষ করে সদ্য ডেস্কের কাজে হাত দিয়েছি, এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠল।

'কেমন আছেন মশাই?'

এ যে কার গলা, সে আর বলে দিতে হয় না। হাজার লোকের গলার ভেতর থেকেও এই গলাটিকে আলাদা করে চিনে নেওয়া যায়। চারু ভাদুড়ী।

বললুম, 'কী কাণ্ড! কোত্থেকে ফোন করছেন?'

'কলকাতায় এসে বরাবর যেখান উঠি, সেখান থেকে।'

'তার মানে মালতীদের বাড়ি থেকে, তাই না?'

'বিলক্ষণ;'

'কিন্তু এখন তো আপনার কলকাতায় আসবার কথা ছিল না। গত হপ্তাতেই তো আপনার চিঠি পেয়েছি। তাতে লিখেছিলেন যে, পুজোর আগে কলকাতায় আসবার কোনও প্ল্যান নেই।'

'প্ল্যান সত্যিই ছিল না।' ভাদুড়ীমশাই বললেন, 'কিন্তু হঠাৎ একটা কাজ পড়ে গেল। এমন কাজ যে, না এলেই নয়।'

'কবে এসেছেন?'

'তা চার-পাঁচ দিন হল।...দাঁড়ান, দাঁড়ান, হিসেব করে বলছি। আজ তো বুধবার। আমি এসেছি

গত শুক্রবার। তা শুক্র, শনি, রবি, সোম, মঙ্গল, পাঁচ রাত্তিরই তো হল, মোট পাঁচ রাত্তির এখানে কাটিয়েছি।'

'কাজ মিটেছে?'

'পনেরো আনা মিটেছে। আজ বিকেলে একজনের আসবার কথা আছে এখানে। সে এলে বাকি এক আনাও মিটে যায়। তা শুধু কাজ মিটলেই তো চলে না, তার একটা রিপোর্ট লিখে ক্লায়েন্টের হাতে দিতে হয়। কাল দুপুরে রিপোর্টটা লিখে ফেলব। ক্লায়েন্ট আসবে রাত্তিরে। রিপোর্টটা তার হাতে ধরিয়ে দিলেই আমার ছুটি।'

'তার মানে পরশুই ব্যাঙ্গালোরে ফিরবেন?'

'তা-ই তো ভেবেছিলুম। কিন্তু মালতী আটকে দিয়েছে। অরুণের শরীরটা বিশেষ ভালো যাচ্ছে না। তাই ব্যাঙ্গালোরে ফোন করে বলে দিলুম যে, সামনের হপ্তাটাও আমি কলকাতাতেই থাকব।'

'অরুণের কী অসুখ?'

'সেই একই অসুখ। ওর যে একটা মাইল্ড স্ট্রোক হয়ে গিয়েছিল, তা তো আপনি জানেনই। তার পর থেকেই খুব সাবধানে থাকতে হয়। তা মালতী ওকে যথাসাধ্য সাবধানে রাখেও। তবু যে কেন প্রেশারটা এত ফ্লাকচুয়েট করে, বুঝতে পারি না। দিন কয়েক হল, ওর প্রেশারই একটু ট্রাবল দিচ্ছে।.. না-না, চিন্তা করবেন না। মাঝে-মাঝে তো এরকম ওর হয়ই, আবার ঠিকও হয়ে যায়।'

'কবে যাব আপনার কাছে?'

'কাল পর্যন্ত ব্যস্ত আছি। পরশু থেকে একদম ফ্রি।'

'শুক্রবার আর শনিবার, দুটো দিন একটু ঝঞ্ঝাটে থাকব। অর্থাৎ পরশু আর তরশু। তারপরেই তো রোব্বার। বলেন তো রোব্বার বিকেলেই যেতে পারি। ফোনে অবশ্য রোজই খবর নেব।'

'ঠিক আছে।' ভাদুড়ীমশাই বললেন, 'তা হলে রোব্বারই আসুন। তবে বিকেলে নয়, সকালে। ...এই নিন, মালতীর সঙ্গে কথা বলুন।'

'সকালেই চলে আসুন, কিরণদা।' ফোনে মালতীর গলা ভেসে এল, 'দুপুরে এখানেই খাবেন। বিকেলের আগে আপনাকে ছাড়া হচ্ছে না। পারুল আর বউদিকেও নিয়ে আসবেন কিন্তু।'

'আবার খাওয়া-দাওয়ার হাঙ্গামা বাধাচ্ছ কেন মালতী? অরুণের শরীর তো শুনলুম ভালো যাচ্ছে না। আর তা ছাড়া তোমার বউদি যে যেতে পারবে, এমন আশাও নেই। পারুলের জন্যেই পারবে না। সামনের মাসেই পারুলের বি. এ. ফাইনাল। সারাদিন পড়ছে। অর্থাৎ কিনা মরণকালে হরিনামের ব্যাপার! তা বাসন্তীও গত দু-মাস ধরে পাড়া ছেড়ে কোথাও যায়নি। বলছে, মেয়ের পরীক্ষা যদ্দিন না শেষ হয়, কোথাও যাবেও না।'

'ঠিক আছে, তা হলে আপনি একাই আসুন। অরুণকে নিয়ে ভাববেন না। আজ প্রেশার নেওয়া হয়েছিল, আগের চেয়ে অনেক ভালো আছে।'

ফোন নামিয়ে রেখে কাজে বসে গেলুম।

কাজকর্ম চুকিয়ে অফিস থেকে বাড়িতে ফিরতে-ফিরতে রাত দশটা। বাসন্তী বলল, 'চটপট জামাকাপড় পালটে হাত-মুখ ধুয়ে নাও, সেই ফাঁকে আমি খাবারগুলো গরম করে ফেলি। দেরি কোরো না।'

বাথরুম থেকে বেরিয়ে দেখি, খাবার টেবিলে বাসন্তী সব সাজিয়ে ফেলেছে। পারুল চটপট নাকে-মুখে দুটি গুঁজে উঠে পড়ল। বলল, 'তোমরা ধীরে সুস্থে খাও, আমি গিয়ে পড়তে বসছি। আজ দুটো পর্যন্ত পড়ব।'

বাসন্তী বলল, 'দেখিস, পরীক্ষার আগে আবার একটা অসুখ বাধিয়ে বসিস না। চারদিকে বড্ড জ্বরজারি হচ্ছে।'

পারুল গিয়ে পড়তে বসে গেল। বাসন্তীকে বললুম, 'বাবা রে বাবা, ভালো করে খেল না

পর্যন্ত, মেয়েটা তো দেখছি পড়তে-পড়তেই পাগল হয়ে যাবার জোগাড়।'

বাসন্তী বলল, 'বা রে, না-পড়লে চলবে কেন? পার্ট ওয়ানে অঙ্কের জন্যে ফার্স্ট ক্লাস পায়নি, ফাইনালে সেটা মেটাতে হবে না? ...ওহো, একটা কথা তোমাকে তো বলা-ই হয়নি, ও-বাড়ির খবর শুনেছ?'

'কী করে শুনব? আমি তো এইমাত্র বাড়ি ফিরলুম। কেন, আবার কী হয়েছে?'

বাসন্তী হেসে বলল, 'ভাড়াটেদের জল আর লাইট আজ বিকেল থেকে আবার চালু হয়ে গেছে।'

বললুম, 'তাই নাকি? সদানন্দবাবুর সুবুদ্ধি হয়েছে দেখছি।'

বাসন্তী বলল, 'ওঁর আবার সুবুদ্ধি কী হল? যা কিছু হয়েছে, সবই কুসুমদির জন্যে। তুমি অফিসে চলে যাবার পরে ও-বাড়িতে একবার গিয়েছিলুম তো, কুসুমদিই ওঁদের কাজের মেয়েটাকে দিয়ে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। তা গিয়ে দেখলুম, কর্তা-গিন্নিতে একেবারে ধুন্ধুমার কাণ্ড হচ্ছে। কুসুমদি আমার সামনেই তাঁর কর্তাটিকে বলে দিলেন যে, আজ বিকেলের মধ্যেই ভাড়াটেরা যদি জল আর লাইট না পায় তো বাড়ি ছেড়ে তিনি যেদিকে দু-চোখ যায় চলে যাবেন। তা সদানন্দবাবুও দেখলুম, গায়ে একটা পাঞ্জাবি চাপিয়ে সুড়সুড় করে অমনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন। কুসুমদির অমনি অন্য চেহারা। একগাল হেসে আমাকে বললেন, 'ভয় পাসনি রে বাসন্তী, মিস্ত্রি ডাকতে গেল, আমাকে ভীষণ ভয় পায় তো!' বোঝো ব্যাপার!'

আমি বললুম, 'বটে? সদানন্দবাবু যে এত স্ত্রৈণ, তা তো জানতুম না।'

বাসন্তী মুখ টিপে হেসে বলল, 'এতে এত অবাক হচ্ছ কেন? অল্প বয়েসে যে যা-ই করুক, বুড়ো বয়েসে তো বউ ছাড়া আর গতি থাকে না, তখন আর স্ত্রৈণ না হয়ে উপায় কী।'

শুনে প্রায় বিষম খেতে যাচ্ছিলুম, অনেক কষ্টে সেটা সামলে নিয়ে বললুম, 'তা বটে।'

'এত করেও কিন্তু কিছু হল না। কুসুমদির যেটা সমস্যা, সেটা রয়েই গেল।'

'তার মানে?'

বাসন্তী বলল, 'তাও তোমাকে বুঝিয়ে বলতে হবে? সমস্যাটা যে কী, তা তুমি এখনও টের পাওনি?'

'না, পাইনি। একটু বুঝিয়ে বলবে?'

'এত তো বুদ্ধির বড়াই করো, অথচ আসল ব্যাপারটাই তুমি ধরতে পারোনি। কুসুমদির সমস্যা ওই কমলিকে নিয়ে। বাদবাকি ভাড়াটেদের কী হল না-হল, তা নিয়ে ওঁর কিছু মাথাব্যথা নেই, কিন্তু কমলির যে অসুবিধে হচ্ছে, এইটে উনি সহ্য করতে পারছেন না।'

বললুম, 'এ তো খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। ভদ্রমহিলার ছেলেপুলে হয়নি, তাই কমলির ওপরে ওঁর যে একটা টান পড়ে যাবে, সে আর বিচিত্র কী। মেয়েটা তো শুনলুম সারাদিন ওঁরই কাছে থাকে।'

বাসন্তী বলল, 'আগে থাকত, কাল রাত্তির থেকে আর থাকছে না। কাল বিকেলের মধ্যেই তো জল আর লাইট আবার চালু হয়ে গেল, তার পরেও একবার সন্ধে-নাগাদ কুসুমদির কাছে গিয়েছিলুম। গিয়ে দেখলুম, মুখ ভার করে বসে আছেন। কী ব্যাপার? না কমলিকে ওপরে নিয়ে আসবার জন্যে ওঁদের কাজের মেয়েটিকে উনি একতলায় নকুলের বউয়ের কাছে পাঠিয়েছিলেন। তা নকুলের বউ তাকে খুব মুখ-ঝামটা দিয়েছে। বলেছে, 'থাক-থাক, আর অত সোহাগ দেখাতে হবে না!' কমলিকেও ওপরে নিয়ে আসতে দেয়নি।'

বললুম, 'তাই তো, সমস্যাটা দেখছি ক্রমেই ঘোরালো হয়ে উঠছে।'

বাসন্তী বলল, 'পরকে আপন করার এই হচ্ছে বিপদ। ওই যে বলে না পরের সোনা কানে দিতে নেই, ঠিকই বলে, কখন হ্যাঁচকা টান মারবে, তার ঠিক কী। তখন সোনাও যাবে, কানও যাবে।'

বললুম, 'কমলির ওপরে মিসেস বসুর এত মায়া না-পড়লেই ভালো ছিল। ভদ্রমহিলাকে কষ্ট পেতে হবে।'

খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। মুখ ধুয়ে শোবার ঘরে এসে একটা সিগারেট ধরালুম। মনটা হঠাৎ খারাপ হয়ে গেল।

রাত্তিরে একবার ঘণ্টাখানেকের জন্যে লোডশেডিং হয়েছিল। বাড়িতে একটা ইনভার্টার আছে বটে, কিন্তু সেটা পারুলের ঘরে থাকে। ফ্যান বন্ধ। ভালো ঘুম হল না। হাতপাখা চালাতে-চালাতে শেষ রাত্তিরে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, ঘুম ভাঙল বেলা আটটায়। তাও ভাঙত না, যদি না বাসন্তী এসে ঠেলা মেরে আমাকে তুলে দিত।'

চোখ খুলে বললুম, 'কী ব্যাপার?'

'আর কত ঘুমোবে, উঠে পড়ো, সদানন্দবাবু সেই কখন থেকে বসে আছেন।'

'একটু বসিয়ে রাখো; বলো যে, হাত-মুখ ধুয়েই আমি বৈঠকখানায় যাচ্ছি। ওঁকে চা দিয়েছ তো?'

'দিয়েছি। এখন ওঠো তো।'

হাত-মুখ ধুয়ে, চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে বৈঠকখানা ঘরে ঢুকলুম। ঢুকেই বুঝলুম অবস্থা সুবিধের নয়। সদানন্দবাবুর মুখ একেবারে অন্ধকার।

বললুম, 'কী ব্যাপার মশাই, আবার কিছু হল নাকি?'

'আর বলবেন না।' সদানন্দবাবু বললেন, 'আমি এবারে নির্ঘাত পাগল হয়ে যাব।'

'কেন, পাগল হবার মতো কী ঘটল?'

'জল আর লাইট যে কাল বিকেলেই ফের চালু করে দিয়েছি, সেটা শুনেছেন তো?'

'শুনেছি। সে তো ভালোই করেছেন।'

'কিন্তু ভালোটা আমি কার জন্যে করলুম? ওই বজ্জাতগুলো কি ভালো ব্যবহার পাবার যোগ্য?'

'এ-কথা বলছেন কেন?'

সদানন্দবাবু বললেন, 'তা হলে শুনুন, যার কষ্টের কথা ভেবে আমার গিন্নির ঘুম হচ্ছিল না, সেই বাচ্চা মেয়েটাকে আজ সকালেও ওরা ওপরে আসতে দেয়নি। কমলি আসতে চায়, কিন্তু ওরা আসতে দেবে না। কমলি তাই কাল থেকে সমানে কাঁদছে। তা সে কাঁদতেই পারে। ও যে এত বড়টা হয়েছে, সে তো বলতে গেলে আমার গিন্নির হাতেই। সারাটা দিন তো তিনিই ওকে দেখতেন। রাত্তিরে গিয়ে মায়ের কাছে শুত; বাস, একতলার সঙ্গে ওইটুকুই ওর সম্পর্ক। সেই মেয়েকে ওরা কিনা ওপরে আসতে দেবে না। ফলে একতলায় যেমন কমলি একটানা কেঁদে যাচ্ছে, তেমনি দোতলায় কাঁদছেন আমার গিন্নি। কাল থেকে সমানে কাঁদছেন। আমার হয়েছে মহা জ্বালা। কী যে করি, কিছুই বুঝতে পারছি না। একটা কিছু পরামর্শ দিন তো।'

এসব ক্ষেত্রে কী আর পরামর্শ দেব। একবার ভাবলুম বলেই ফেলি যে, মাদার টেরিজার কাছ থেকে একটা বাচ্চাকে নিয়ে এসে আপনার গিন্নির কোলে ফেলে দিন। তাতে একটা অনাথ শিশুও যেমন বেঁচে যাবে, তেমনি বাঁচবেন আপনার গিন্নিও। কিন্তু সাত-পাঁচ ভেবে আর সে-কথা বললুম না। চুপ করে রইলুম।

সদানন্দবাবু বললেন, 'তার ওপরে আবার কাল রাত একটা-দেড়টার সময়ে বাড়ি ফিরে নকুল যে কাণ্ডটা করল, সে আর কহতব্য নয়। তখন লোডশেডিং চলছিল, কিন্তু হারামজাদা সে-কথা বুঝল না, ভাবল যে, আমিই বোধহয় ফের লাইট কেটে দিয়েছি। তাই প্রথমেই তো আমার চোদ্দোপুরুষ উদ্ধার করে গালাগাল করতে লাগল, তারপর শুরু হল ঠেঙানি। শুধু যে বউকে ধরে ঠেঙিয়েছে, তা নয়, ব্যাটা একেবারে বেহেড মাতাল, দুধের বাচ্চাটাকেও ছাড়েনি। তাকেও বোধহয় চড়চাপড় দিয়েছে গোটাকয়েক। মেয়েটা যেমন ডাক ছেড়ে কাঁদছিল, তাতে তো মশাই সেইরকমই মনে হয়।'

একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন সদানন্দবাবু। তারপর চেয়ার ছেড়ে উঠতে-উঠতে বললেন, 'আপনি কিছু বলবেন না, কেমন?'

বললুম, 'কী যে বলব, কিছুই তো বুঝতে পারছি না।'

'বেশ, আপনি তা হলে চুপ করেই থাকুন। কিন্তু এই আমি বলে গেলুম যে, আমিও ছেড়ে দেবার পাত্র নই। পাড়ার সকলকে আমি বলেছি যে, যদি দরকার হয় তো গুন্ডা লাগিয়ে আমি ওকে তাড়াব। আর গুন্ডারই বা দরকার কী, এই যে লাঠিটা দেখছেন না, এটাই যথেষ্ট, এইটে দিয়েই ওর মাথা ফাটিয়ে ছাড়ব আমি।'

সদানন্দবাবু বেরিয়ে গেলেন।

এ হল বৃহস্পতিবার সকালের কথা। কাল ছিল শুক্রবার। কালও নকুলচন্দ্র নাকি অনেক রাতে বাড়ি ফিরেছিল। আর আজ শনিবার ভোরবেলায় একটা বিকট আর্তনাদ শুনে পাড়ার লোকেরা ছুটে গিয়ে যা দেখল, তাতে তাদের রক্ত একেবারে হিম হয়ে যাবার জোগাড়। সে এক ভয়াবহ দৃশ্য। পাঁচ নম্বর বাড়ির একতলার সিঁড়ির ঠিক সামনেই তার নিষ্প্রাণ শরীরটা লুটিয়ে পড়ে আছে।

॥ ৭ ॥

সদানন্দবাবুই যে নকুলচন্দ্রকে খুন করেছেন, আমার পক্ষে এ-কথা বিশ্বাস করা খুব শক্ত। ভদ্রলোককে আমি চিনি, দশ বছর ধরে তাঁকে বলতে গেলে প্রায় রোজই দেখছি। তা একটা মানুষের ধাতটা যে ঠিক কীরকম, সে রগচটা না ঠান্ডা মাথার লোক, হাঙ্গামাবাজ না শান্তিপ্রিয়, তা বোঝার পক্ষে—আমার তো মনে হয়—দশ কেন, পাঁচটা বছরই যথেষ্ট। আমার বিশ্বাস। তিনি পরোপকারী, সজ্জন, উপরন্তু খুবই নিরীহ ব্যক্তি। মাঝেমধ্যে একটু রেগে যান ঠিকই, রেগে গেলে 'হ্যান্ করেঙ্গা ত্যান করেঙ্গা' বলেনও বটে, কিন্তু খুন তো খুন, কাউকে একটা চড়চাপড় মারাও তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়।

তবে কিনা বাইরে থেকে যাঁকে নেহাত ভালোমানুষ বলে মনে হয়, খুন-টুন করা যে তাঁর পক্ষে একান্তই অসম্ভব একটা ব্যাপার, নিশ্চিত হয়ে তা-ই বা বলি কী করে? বললে সে-কথা আপনারা শুনবেনই বা কেন? তার ওপরে আবার গল্পটা যেখানে শোনাচ্ছি, সেই কলকাতা শহরে সম্প্রতি খুব সমারোহ সহকারে চ্যাপলিন উৎসব হয়ে গেল। চ্যাপলিনের শতবর্ষ উপলক্ষে তাঁর যে-সব ছবি আবার নতুন করে দেখানো হল, তার মধ্যে মঁসিয়ে ভের্দুও ছিল বইকী। আপনারা সে-ছবি দেখেছেন নিশ্চয়। কেউ-কেউ হয়তো একাধিকবার দেখেছেন। ফলে আপনারা জেনেই গিয়েছেন যে, এমনিতে যে-লোক নেহাতই নিরীহ; এত নিরীহ যে, একটা পোকাকেও পিষে মারতে পারে না; চায় যে, সেটাও বেঁচেবর্তে থাক, সে-ও খুন করতে পারে। তাও একবার নয়, বারবার। সুতরাং সদানন্দবাবুকে যদি এক্ষুনি আমি একটা গুড কনডাক্ট সার্টিফিকেট দিয়ে দিই, তো সেটা আপনারা মেনে নেবেন না।

আর তা ছাড়া, যাকে অকুস্থল বলা হয়, ঘটনাটা ঘটার সময়ে আমি যে সেখানে কিংবা তার আশেপাশে হাজির ছিলুম, তাও তো নয়। ফলে কিছুই আমি স্বচক্ষে দেখিনি। সবই আমার শোনা কথা। কিছুটা সদানন্দবাবুর কাছে শুনেছি, কিছুটা অন্যদের কাছে। অন্যদের কথা পরে হবে, আগে বরং সদানন্দবাবুর কাছে যা শুনেছি, সেটাই বলব।

কিন্তু তারও আগে বলা দরকার, শনিবার ভোরবেলায় একটা ভয়ংকর আর্তনাদ শুনে যখন পারুল আমাদের ঘরে এসে আমাকে জাগিয়ে দিয়ে বলে যে, পাঁচ নম্বর বাড়িতে নিশ্চয় কিছু হয়েছে, এক্ষুনি আমার সেখানে যাওয়া উচিত, আর তার কথা শুনবামাত্র আমি ধড়মড়িয়ে বিছানা ছেড়ে উঠে নীচে নেমে সদর-দরজা খুলে একছুটে রাস্তা পেরিয়ে যখন ও-বাড়িতে গিয়ে ঢুকি, তখন

সদানন্দবাবুকে আমি ঠিক কী অবস্থায় দেখেছিলুম। ভদ্রলোক তখন সিঁড়ির কয়েক ধাপ ওপরে একেবারে পাথবের একটা মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছেন। সিঁড়ির তলায় সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে কী যেন দেখছে যমুনা আর বিষ্টুচরণ। যা-ই দেখুক, সেটা তাদের শরীরের আড়ালে পড়ে যাওয়ায় অন্তত সেই মুহূর্তে আমি দেখতে পাইনি। স্পষ্ট করে আমি দেখতে পাচ্ছিলুম শুধু সদানন্দবাবুকেই। তাঁর মাথার ওপরে কড়া পাওয়ারের একটা ইলেকট্রিক বাল্‌ব জ্বলছে। তার আলোয় আমার মনে হল যে, ভদ্রলোকের মুখ একেবারে মড়ার মতন ফ্যাকাসে। চোখের দৃষ্টিও কেমন যেন বিহ্বল। যেন কোনও কিছুই তিনি ঠিক দেখছেন না বা বুঝে উঠতে পারছেন না। সেই অবস্থাতেই হঠাৎ তিনি ধপ করে সেই সিঁড়ির ধাপের ওপরেই বসে পড়লেন।

এ হল শনিবার ভোরবেলাকার ঘটনা। মনে হয়, কথা বলবার মতো অবস্থাই তখন সদানন্দবাবুর ছিল না। বাইরের লোকেদের মধ্যে আমি আর আমার পাশের বাড়ির শম্ভুবাবুই ঘটনাস্থলে গিয়ে প্রথম পৌঁছই। পরে এক-এক করে আরও অনেকে এসে পড়েন। মোটামুটি ছটার মধ্যেই বাড়ির বাইরে রাস্তার ওপর ভিড় জমে যায়।

যমুনা আর বিষ্টুচরণের আড়ালে পড়ে গিয়েছিল বলে নকুলের লাশটা প্রথমে আমার চোখেই পড়েনি। ফলে আমি মিনিট খানেকের মধ্যে বুঝেই উঠতে পাবিনি যে, ব্যাপারটা ঠিক কী হয়েছে। সেটা বুঝলুম শম্ভুবাবু গিয়ে বিষ্টুচরণকে একপাশে সরিয়ে দেবার পর।

তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষ আর ছেচল্লিশের দাঙ্গায় এই শহরের রাস্তাঘাটে নিত্য যে-সব দৃশ্য আমি প্রত্যক্ষ করেছি, তাতে আর এখন একটা মৃতদেহ দেখে আমার শিউরে ওঠাব কথা নয়। নকুলকে দেখে তবু যে আমি শিউরে উঠেছিলুম, তার কারণ নিশ্চয় এই যে, আমারই বয়েসি আরও অনেকের মতো এখনও আমি একটা ইট কিংবা পাথরের মতো নিশ্চেতন পদার্থে পরিণত হইনি।

সিঁড়ির নীচে চিৎ হয়ে নকুল পড়ে আছে। শম্ভুবাবু এগিয়ে গিয়ে, উবু হয়ে বসে, তাব নাড়িতে হাত রাখলেন। তারপর মুখ তুলে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ডেড।'

নকুল যে বেঁচে নেই, সে তার চোখ দেখেই আমি বুঝতে পেরেছিলুম। আমার বুকেব মধ্যে দমাস-দমাস করে মুগুর পেটার শব্দ হচ্ছিল। ঠোঁট শুকিয়ে গিয়েছে, দুই কানের ভেতর দিয়ে বইছে গরম হাওয়া। অনেক কষ্টে প্রায় অস্ফুট গলায় শম্ভুবাবুকে বললুম, 'আপনি একটু থাকুন এখানে, আমি ডঃ চাকলাদারকে সব জানাচ্ছি, তারপর থানায় একটা ফোন কবে দিয়ে এখুনি আবার ফিরে আসব।'

রাস্তায় নামতেই চোখে পড়ল যে, বাসন্তী আর পারুল সদর দবজায় দাঁড়িয়ে আছে। দুজনে প্রায় একই সঙ্গে জিগ্যেস করল, 'কী হয়েছে?'

বললুম, 'সর্বনাশ হয়েছে।' তারপব ওপরে এসে ফোনের ডায়াল ঘোরাতে লাগলুম।

ফোন আজকাল চট করে পাওয়া যায় না। ডঃ চাকলাদার কাছেই থাকেন, তাঁকে পেতে দেরি হয়নি, কিন্তু থানার লাইন পেতে-পেতে মিনিট দশেক লাগল। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলুম, পাঁচটা পঁয়ত্রিশ।

ওদিক থেকে যিনি 'হ্যালো' বললেন, গলা শুনেই বোঝা গেল যে, তিনি ঘুমোচ্ছিলেন, তাঁব ঘুমের আমেজ এখনও কাটেনি।

বললুম, 'আমি পীতাম্বর চৌধুরী লেন থেকে কথা বলছি। আমার নাম কিরণ চট্টোপাধ্যায়, আমি জার্নালিস্ট, ''দৈনিক সমাচার'' পত্রিকায় কাজ করি।'

'জার্নালিস্ট? খবর চাইছেন নিশ্চয়? না, আমাদের এলাকায় কাল রাত্তিরে বড়-কিছু ঘটেনি। রাস্তা থেকে গোটা দুয়েক মাতালকে ধরে এনে লক-আপে পুরে দিয়েছি। আর আছে একটা রোড-অ্যাক্সিডেন্টের কেস। তাও মাইনর অ্যাক্সিডেন্ট, কেউ মারা-টারা যায়নি। বাস, আর কোনও খবর নেই।'

বললুম, 'আরে মশাই, আমি খবর চাইছি না, খবর দিতে চাইছি। আমাদের রাস্তায় হঠাৎ একজন মারা গেছে। মনে হচ্ছে, আপনাদের ও সি-র একবার আসা দরকার।'

'আমিই ও সি। কী হয়েছে বলুন তো? মার্ডার?'

'তা তো জানি না। মার্ডার হতে পারে, অ্যাকসিডেন্টও হতে পারে। ঠিক কী যে হয়েছে, সেটা আপনারা এসে ঠিক করুন।'

'ঠিক আছে, আমরা যাচ্ছি। একটা কথা জিগ্যেস করি, ব্যাপারটা কোথায় ঘটেছে? মানে রাস্তায় না বাড়ির মধ্যে?'

'বাড়ির মধ্যে।'

'যে-বাড়িতে ঘটেছে, আপনি কি তার কাছেই থাকেন?'

'খুবই কাছে। বলতে গেলে এটা আমাদের একেবারে উলটোদিকের বাড়ি।'

'তা হলে তো ভালোই হল। আমরা একটু বাদেই ওখানে পৌঁছে যাব। কিন্তু তার আগে আপনি কাইন্ডলি একবার ওখানে গিয়ে সবাইকে জানিয়ে দিন যে, ঘটনাটা যেখানে ঘটেছে, সেখান থেকে কেউ যেন কিছু না সরায়। মানে যা-কিছু যেখানে যেমনভাবে আছে, ঠিক সেইখানে ঠিক তেমনিভাবেই যেন থাকে। আর হ্যাঁ, ডেডবডিটাকেও যেন কেউ টাচ না করেন। এটা জানিয়ে দিতে আপনার কোনও অসুবিধে হবে?'

'কিছুমাত্র না। এখুনি ওখানে গিয়ে জানিয়ে দিচ্ছি।'

ফোন নামিয়ে রাখলুম। পরক্ষণেই মনে হল, ভাদুড়ীমশাই তো কলকাতাতেই আছেন। তাঁকে একবার ব্যাপারটা জানানো দরকার।

কপাল ভালো, এবারে আর লাইন পেতে দেরি হল না। দু-চার কথায় যা জানাবার জানাতেই তিনি বললেন, 'সম্ভবত আপনি চাইছেন যে, আপনার বন্ধু সদানন্দবাবুকে সাহায্য করবার জন্যে আমি একবার যাই। কিন্তু আমি এখন যাব না। আমার বদলে যাকে পাঠাচ্ছি, তাকে দেখলেই আপনি চিনতে পারবেন।'

বাসন্তী আর পারুল ইতিমধ্যে ওপরে উঠে এসেছিল। পাশেই এসে দাঁড়িয়ে ছিল তারা। চুপচাপ আমার কথা শুনে যাচ্ছিল। ফোন নামিয়ে রাখতে বাসন্তী বলল, 'ও বাড়িতে অত কান্নাকাটি হচ্ছে কেন? কী হয়েছে? সদানন্দবাবুর কিছু হয়নি তো?'

বললুম, 'সদানন্দবাবুর কিছু হয়নি, তবে যা ভয় করছি, তা যদি সত্যি হয় তো ভদ্রলোক বিপদে পড়ে যাবেন। নকুল মারা গেছে।'

পারুল বলল, 'সে কী! কখন মারা গেল? কী হয়েছিল?'

বললুম, 'কিচ্ছু জানি না। আমি একবার ও-বাড়িতে যাচ্ছি।'

বাসন্তী বলল, 'আমিও তোমার সঙ্গে যাব।' তারপর মেয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোর যাবার দরকার নেই। তুই নিজের জন্যে এক কাপ চা বানিয়ে নে। কাল বিকেলে যে পায়েস করেছিলুম, তার খানিকটা ফ্রিজে রয়েছে। সন্দেশও রয়েছে। তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে পড়তে বসে যা।'

আমি আর বাসন্তী চটপট নীচে নেমে রাস্তার ওপরের ভিড় ঠেলে পাঁচ-নম্বরে গিয়ে ঢুকলুম।

ছ'টা বাজে। কিন্তু যতই বেলা বাড়ুক, মধ্য-কলকাতার এইসব এঁদো গলির অন্ধকার যেন আর কাটে না। সিঁড়ির উপরকার কড়া-পাওয়ারের আলোটা তখনও জ্বলছে। নইলে নিশ্চয় চৈত্র মাসের সকাল ছ'টাতেও জায়গাটা একেবারে অন্ধকার হয়ে থাকত।

নকুলের মাথার পাশে মেঝের উপরে চাপ-চাপ রক্ত। আগে এটা চোখে পড়েনি। বাসন্তী যে ভয় পেয়ে গিয়েছে, সে তার মুখ দেখেই বুঝতে পেরেছিলুম। তাকে বললুম, 'তুমি আর এখানে দাঁড়িয়ে থেকো না, ওপরে চলে যাও।'

শম্ভুবাবু চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছেন। বাসন্তী ওপরে চলে যাবার পরে আমাকে জিগ্যেস করলেন,

'থানায় খবর দিয়েছেন?'

বললুম, 'দিয়েছি। ওরা একটু বাদেই এসে পড়বে। কিন্তু সদানন্দবাবুকে দেখছি না যে?'

'ভদ্রলোকের বয়েস হয়েছে; বললেন যে, শরীরটা অস্থির-অস্থির করছে। মাথাটা বোধহয় একটু ঘুরে গিয়েছিল। একবার একটু বমিও করে ফেললেন। ওঁকে ওপরে নিয়ে শুইয়ে দিয়েছি।'

পাড়ার যাঁরা ভেতরে এসে ঢুকেছিলেন, থানায় খবর দেওয়া হয়েছে শুনেই তাঁরা একে-একে সরে পড়তে লাগলেন। কী হয়েছে, সেটা জানবার জন্যে কারও কৌতূহলই কিছু কম নয়, কিন্তু যেমন কৌতূহল তেমনি অল্পবিস্তর ভয়ও আছে প্রায় প্রত্যেকেরই। পুলিশ এসে জেরা করবে, মামলা হলে সাক্ষী দিতে বলবে, সাধ করে কে আর ওসব ঝঞ্ঝাটে নিজেকে জড়াতে চায়।

শম্ভুবাবুকে ব্যতিক্রম বলেই গণ্য করতে হবে, তিনি গেলেন না। জিগ্যেস করলুম, 'আপনার আজ অফিস নেই?'

'আজ তো শনিবার। আমার ছুটি। একবার অবশ্য বাজারে যাবার দরকার ছিল, তা সে কাল গেলেও চলবে।'

'ভালোই হল, আপনি তা হলে আর-কিছুক্ষণ এখানে থেকে যান। ও হ্যাঁ, থানা থেকে বলল যে, কেউ যেন এখান থেকে কিছু না সরায়। ডেডবডিটাও না ছোঁয়।'

দেওয়ালের ধারে বসে হাপুস নয়নে যমুনা কাঁদছিল। বিষ্টুচরণ তার ঘরের দরজায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কথাটা মূলত ওদেরই উদ্দেশে বলা, কিন্তু শুনতে পেল কিনা, কে জানে।

শম্ভুবাবু বললেন, 'পুলিশ না আসা পর্যন্ত আপনিও এখানে থাকবেন তো?'

বললুম, 'থাকব। তবে এখন একটু ওপরে যাচ্ছি। সদানন্দবাবুর অবস্থাটা একবার দেখে আসা দরকার।'

দোতলায় এসে দেখলুম, সদানন্দবাবুকে তাঁর খাটের ওপরে শুইয়ে রাখা হয়েছে। মাথার কাছে দাঁড়িয়ে কাজের মেয়েটি বাতাস করছে তাঁকে। সদানন্দবাবুর স্ত্রী একদিকে একটা চেয়ারে বসে আছেন। পাশের চেয়ারে বসে বাসন্তী তাঁর সঙ্গে কথা বলছিল, আমি গিয়ে ঘরে ঢুকতে জিগ্যেস করল, 'থানা থেকে এসেছে?'

বললুম, 'না, পুলিশ কি এত তাড়াতাড়ি আসে নাকি?'

সদানন্দবাবু আমাকে দেখে ম্লান হাসলেন। বললুম, 'কেমন আছেন এখন?'

ক্লান্ত গলায় ভদ্রলোক বললেন, 'অনেকটা ভালো। মাথাটা হঠাৎ ঘুরে গিয়েছিল।'

'যাবারই কথা। কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে না তো?'

'না।'

'তাহলে ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে বলুন দেখি।'

আবার হাসলেন সদানন্দবাবু। সেই ম্লান হাসি। তারপর বললেন, 'কী আর বলব বলুন, সবই আমার গ্রহের ফের।'

বললুম, 'সে তো বুঝতেই পারছি। কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে যে, এই নিয়ে আপনি একটা ঝঞ্ঝাটে না জড়িয়ে যান। ঠিক কী হয়েছিল?'

সদানন্দবাবু উঠে বসতে যাচ্ছিলেন। আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'ওঠবার কোনও দরকার নেই। তাড়াহুড়ো করবারও না। যা বলবার, আস্তেসুস্থে বলুন।'

অতঃপর তিনি যা বললেন, আপনাদেরও আমি সেটাই জানাচ্ছি।

চৈত্র মাস। রাত্তিরে বেজায় গরম পড়েছিল, তা ছাড়া মাঝরাত্তিরে মত্তাবস্থায় বাড়িতে ফিরে নকুলচন্দ্র কালও এমন হই-হট্টগোল বাধিয়ে দিয়েছিল যে, সদানন্দবাবুর ঘুম ভেঙে যায়। টর্চ জ্বেলে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখেছিলেন, রাত তখন একটা। তারপরে আর ভালো করে ঘুম হয়নি, ওই একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে শুয়েছিলেন আর কি। মনে হয়, তার বেশ কিছুক্ষণ বাদে এই মোটামুটি তিনটে

নাগাদ একতলায় কিছু একটা ভারী জিনিস পড়ে যাবার শব্দও শুনেছিলেন। কিন্তু সেটা যে কীসের শব্দ, তা বুঝতে পারেননি। ভালো করে ঘুমোতে না-পারলেও, রোজ যেমন ওঠেন, তেমনি আজও ঠিক সাড়ে চারটেতেই তিনি বিছানা ছেড়ে উঠে পড়েন। স্টোভ ধরিয়ে তাতে জলের কেতলি বসিয়ে দেন। জলটা ফুটতে-ফুটতেই রোজকার মতো ধুয়ে নেন মুখ-চোখ। তারপর হালকা এককাপ লিকার খেয়ে, জামাকাপড় পালটে রোজকার মতোই মর্নিং ওয়াকে বেরুবার জন্যে যখন নীচে নামেন, পাঁচটা বাজতে তখনও মিনিট পাঁচেক বাকি। সিঁড়িটা অন্ধকার। ওপর থেকে সুইচ টিপে সিঁড়ির আলো জ্বেলে নীচে নামা যায়। কিন্তু সিঁড়ির আলোটা তিনি কোনওদিনই এইসময় জ্বালেন না। আজও জ্বালেননি। না-জ্বালবার কারণ আর কিছুই নয়, সিঁড়ির আলো জ্বালবার আর নেবাবার জন্য যে টু-ওয়ে সুইচের ব্যবস্থা আজকাল প্রায় সব বাড়িতেই দেখা যায়, সদানন্দবাবুর বাড়িতে সেটা নেই। তাই ওপর থেকে আলো জ্বেলে নীচে নামলে আর নীচ থেকে সেটা নেবাবারও উপায় নেই। মর্নিং ওয়াক শেষ করে যতক্ষণ না তিনি আবার বাড়িতে ফিরে আসছেন, ততক্ষণ সেটা জ্বলতেই থাকবে। ভদ্রলোক অনেকদিন ধরেই ভাবছেন যে, একটা টু-ওয়ে সুইচের ব্যবস্থা করে নেবেন, কিন্তু এখনও সেটা করা হয়নি। অগত্যা তাঁকে টর্চ জ্বেলে নীচে নামতে হয়। ছোট পকেট-টর্চ। আজ তার বোতাম টিপেই বুঝলেন যে, ব্যাটারির তেজ ফুরিয়ে এসেছে। একে তো ম্যাড়মেড়ে আলো, তায় ছানি কাটাবার পর থেকে চোখেও ভালো দেখতে পান না, খুবই সতর্কভাবে পা ফেলতে-ফেলতে তাই নীচে নামছিলেন তিনি। কিন্তু বারো-চোদ্দ ধাপ নেমেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন। ম্লান আলোতে আবছামতন তিনি দেখতে পান যে, সিঁড়ির শেষ ধাপের ঠিক সামনেই একটা লোক মেঝের ওপরে হাত-পা ছড়িয়ে চিৎ হয়ে পড়ে আছে। লোকটা যে নকুলচন্দ্র, সে-কথা বুঝতে তাঁর কয়েক সেকেন্ড সময় লেগেছিল। তারপরেই তিনি বিকটভাবে চেঁচিয়ে ওঠেন।

নকুল যে মারাই গেছে, চিৎকার করে ওঠবার মুহূর্তেও অবশ্য সদানন্দবাবু তা বুঝতে পারেননি। তাঁর চিৎকার শুনে সিঁড়ির দু'দিকের দুটো ঘর থেকে যখন যমুনা আর বিষ্টুচরণ ছুটে বেরিয়ে আসে, তখনও না। তিনি ভেবেছিলেন, মোদো-মাতাল লোকটা হয়তো শেষ-রাত্তিরে একবার বাথরুমে যাবার জন্যে টলতে-টলতে তার ঘর থেকে বেরিয়েছিল; তখন, কিংবা বাথরুম থেকে বেরিয়ে আবার ঘরে ফেরবার সময়ে, অন্ধকারের মধ্যে দেওয়ালে ধাক্কা লেগে আর টাল সামলাতে পারেনি, আছাড় খেয়ে মেঝেতে পড়ে গিয়ে জ্ঞান হারিয়েছে। কিন্তু আসল ব্যাপারটা যে তা নয়, আরও ভয়াবহ, একটু বাদেই তা বোঝা গেল। চিৎকার শুনে কুসুমবালারও ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। তৎক্ষণাৎ তিনি দোতলায় তাঁদের শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সিঁড়ির আলোটা জ্বেলে দেন। টর্চের ম্যাড়মেড়ে আলোয় সবকিছু এতক্ষণ স্পষ্ট দেখা যায়নি। এবারে ইলেকট্রিকের আলো জ্বলে উঠতেই দেখা গেল যে, মেঝের ওপরে চাপ-চাপ রক্ত, আর সেই রক্ত নেমে এসেছে নকুলচন্দ্রের মাথা থেকেই। যেমন নিথর, নিস্পন্দ হয়ে সে পড়ে আছে, তাতেই সদানন্দ বুঝতে পেরে যান যে, সে বেঁচে নেই। তাঁর এক হাতের লাঠি ও অন্য হাতের টর্চ খসে পড়ে যায়। সিঁড়ির রেলিং আঁকড়ে ধরে তিনি তখন দ্বিতীয়বার চেঁচিয়ে ওঠেন।

॥ ৮ ॥

ডঃ চাকলাদারকে সংক্ষেপে সব জানিয়ে রেখেছিলুম। তিনি এলেন সাড়ে ছ'টায়। একতলায় এসে আমার খোঁজ করতে শম্ভুবাবু তাঁকে সঙ্গে নিয়ে দোতলায় উঠে আসেন। ডাক্তার চাকলাদারকে একটা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে শম্ভুবাবুকে বললুম, 'আপনি একটু থেকে যান। অন্তত যতক্ষণ না থানা থেকে ওরা এসে পৌঁছচ্ছে। নীচেই থাকুন, নইলে কে কী নাড়াচাড়া করবে, কোথার থেকে কোন জিনিসটা

সরিয়ে রাখবে, তার ঠিক কী।'

শম্ভুবাবু নীচে নেমে গেলেন। ডাক্তার চাকলাদার বললেন, 'ওরে ব্বাবা, এতটা তো ভাবিনি! একতলায় তো রক্তারক্তি কাণ্ড! কী হয়েছিল মশাই?'

বললুম, 'ঈশ্বর জানেন। কিন্তু ও তো মারাই গেছে, ওকে নিয়ে আর ভাববার কিছু নেই। যিনি বেঁচে আছেন, তাঁকে দেখুন।'

ডাক্তার চাকলাদার খাটের কাছে তাঁর চেয়ারটাকে সরিয়ে আনলেন। সদানন্দবাবুর কপালে হাত রাখলেন, টেম্পারেচার নিলেন, বুকে-পিঠে স্টেথোস্কোপ বসিয়ে লম্বা করে নিশ্বাস টানতে বললেন, তারপর ব্লাড প্রেশার নিয়ে বললেন, 'কিছু না, শুধু প্রেশারটা একটু বেড়েছে। একটা ওষুধ লিখে দিচ্ছি, খান, আর আজকের দিনটা চুপচাপ শুয়ে থাকুন, নড়াচড়া করবেন না। কাল সকালে কাউকে দিয়ে প্রেশারটা আর একবার দেখিয়ে নেবেন।'

কুসুমবালা আলমারি খুলে টাকা বার করে এনেছিলেন, চাকলাদার হেসে বললেন, 'টাকা কীসের? জানেন তো আমি কারও বাড়িতে যাই না।'

কথাটা মিথ্যে নয়। ডঃ চাকলাদার আসলে প্যাথলজিস্ট। পাশের গলির মোড়েই তাঁর ল্যাবরেটরি। জ্বরজ্বারি হলে আমরা তাঁর কাছে যাই বটে, প্রেসক্রিপশনও লিখিয়ে নিই, কিন্তু তার জন্যে তিনি এক পয়সাও নেন না। বাড়িতেও যান না কারও। আজ যে এসেছেন, সেটা একেবারে না-এসে উপায় ছিল না বলেই।

চাকলাদার উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। বললেন, 'চলি তা হলে।'

ঘর থেকে ভদ্রলোক বেরিয়েওছিলেন, কিন্তু সিঁড়ির মাথা থেকেই ফিরে এসে বললেন, 'যাওয়া হল না। মনে হচ্ছে আটকে গেলুম।'

'কেন, কী হল?'

'পুলিশ এসে গেছে।'

বললুম, 'তা হলে একটু থেকেই যান। অসুবিধে নেই তো?'

'অসুবিধে আর কী, ল্যাবরেটরিতে ক'টা টেস্ট করবার ছিল, তা সে ঘণ্টা-খানেক বাদে করলেও ক্ষতি নেই। চলুন, নীচে যাওয়া যাক।'

বাসন্তীও উঠে দাঁড়াল। বলল, 'চলি কুসুমদি। মেয়েটা একলা রয়েছে। পরে আবার আসব।'

তিনজনে মিলে নীচে নেমে এলুম।

আমাদের থানা-অফিসার গঙ্গাধর সামন্তকে আমি আগে কখনও দেখিনি। নামটাই মাত্র শোনা ছিল। এও শুনেছিলুম যে, মানুষটি ধান্ধাবাজ নন; পোলিটিক্যাল পেট্রনেজের ধার ধারেন না; এলাকায় যাতে শান্তি মোটামুটি বজায় থাকে, তার জন্যে যেটা করা দরকার বলে তাঁর মনে হয়, সেটাই করেন। আর তা ছাড়া খুব পরিশ্রমীও নাকি।

তা পরিশ্রম করার জন্য যেরকম স্বাস্থ্য চাই, সামন্তমশাইয়ের স্বাস্থ্য দেখলুম সেইরকমই। চওড়া কাঁধের ছ'ফুট লম্বা মানুষ; শরীর একেবারে লোহা-পেটানো। মোটা একজোড়া গোঁফ থাকায় যেন ভদ্রলোকের চেহারার বাহার আরও খোলতাই হয়েছে। ঝুলো গোঁফ নয়, আদ্যন্ত সমান করে ছাঁটা; ওই যাকে ইংরেজিতে টুথব্রাশ-গোঁফ বলে, সেই বস্তু।

বাসন্তী আর দাঁড়াল না। সিঁড়ির সামনের জায়গাটুকু দেওয়াল ঘেঁষে সন্তর্পণে পার হয়ে রাস্তায় নেমে বাড়ির দিকে চলে গেল। সামন্তমশাই আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনি তো মিঃ চ্যাটার্জি?'

'হ্যাঁ। আমিই আপনাকে ফোন করেছিলুম।'

'এইমাত্র যিনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন, তিনি কে?'

'আমার স্ত্রী। বলতে গেলে উলটো দিকের বাড়িতেই থাকি আমরা। টেলিফোনেই তো সে-কথা আপনাকে বলেছি।'

গঙ্গাধর সামন্ত ডঃ চাকলাদারের দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন, তারপর তাঁর গলায়-ঝোলানো স্টেথোস্কোপ আর ডান-হাতে ধরা ব্লাড প্রেশার মাপবার যন্ত্রটার ওপর চোখ বুলিয়ে বললেন, 'আপনি তো দেখছি ডাক্তার। এঁদের ফ্যামিলি-ফিজিশিয়ান?'

'আজ্ঞে না। আমি ডাক্তার ঠিকই, তবে প্র্যাকটিস করি না। আমি প্যাথলজিস্ট; কাছেই আমার ল্যাবরেটরি রয়েছে। সব রকমের পরীক্ষা হয় সেখানে।'

'আপনার নামটা জানতে পারি?'

'বিলক্ষণ। হরষিত চাকলাদার। এ-পাড়ার সবাই আমাকে চেনেন। সাধারণত কারও বাড়িতে আমি রোগী দেখতে যাই না। তবে পাড়ায় থাকি যখন, এসব ক্ষেত্রে আসতেই হয়।'

'যিনি মারা গেছেন, তাঁকে পরীক্ষা করে তারপর ওপরে গিয়েছিলেন?'

ডঃ চাকলাদার অবাক হয়ে গঙ্গাধর সামন্তের দিকে তাকালেন, তারপর বললেন, 'যিনি মারা গেছেন, তাঁকে আবার পরীক্ষা করব কী! পরীক্ষা করবার কথা উঠছেই বা কেন? আমি তো ময়না-তদন্ত করি না। যিনি বেঁচে আছেন, তাঁকেই আমি পরীক্ষা করে এলুম।'

'অর্থাৎ?'

'অর্থাৎ আমি বাড়িওয়ালা সদানন্দ বসুকে দেখতে গিয়েছিলুম। এখন আমি যেতে পারি?'

'একটু থেকে যান।' গঙ্গাধর সামন্ত বললেন, 'না-না, আমি জোর করছি না, অনুরোধ করছি মাত্র। আমাদের পুলিশ-ডিপার্টমেন্টের ডাক্তার সুবেশ গুপ্তকে খবর দিয়েছি, তিনি এক্ষুনি এসে পড়বেন। এলেই আপনার ছুটি। অবশ্য যা দুর্গন্ধ এখানে, কাউকে থাকতে বলতেও সঙ্কোচ হয়।'

দুর্গন্ধের কারণ আর কিছুই নয়, মাছের ঘরের দরজা খুলে বিষ্টুচরণ ইতিমধ্যে থানা-অফিসার আব আমাদের জন্যে খান তিন-চার টিনের চেয়ার বার করে এনেছিল। গঙ্গাধর সামন্ত পকেট থেকে একখানা রুমাল বার করে গোঁফের ওপবে সেটাকে ঠেসে ধরে বললেন, 'ওরে বাবা, এ যে মারাত্মক গন্ধ মশাই। কীসের গন্ধ?'

আমি বললুম, 'পচা মাছের। ও-ঘরটায় মাছ থাকে। যা গরম, কিছু মাছ নিশ্চয় পচেছে।'

'তা হলে ও-ঘরের দরজা খুললেন কেন?' বিষ্টুচরণের দিকে তাকিয়ে সামন্তমশাই বললেন, 'শিগগির বন্ধ করুন। নইলে, একজন তো মরেইছে, এবারে আমরাও মারা পড়ব।'

বিষ্টুচরণ তক্ষুনি দরজা বন্ধ করে দিল। গন্ধটা তবু ঝুলেই রইল, মিলিয়ে গেল না।

নাক থেকে রুমাল নামিয়ে গঙ্গাধব সামন্ত বললেন, 'সদানন্দবাবুকে কেমন দেখলেন?'

ডঃ চাকলাদার বললেন, 'প্রেশারটা একটু বেড়ে গেছে, আর কোনও ট্রাবল নেই।'

'যিনি মারা গেছেন, তাঁর স্ত্রী আর শালা ছুটে এসে তো শুনলুম সদানন্দবাবুকেই সিঁড়ির কয়েক ধাপ ওপরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলেন, তাই না?'

বিষ্টুচরণ বলল, 'হ্যাঁ, স্যার।'

বাইরে রাস্তার ওপরে একটা গাড়ি এসে থামার শব্দ হল।

সদর-দরজায় যাকে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছিল, সেই কনস্টেবলটি ভেতরে এসে জিগ্যেস করল, 'ইখানে কোই কিরোনবাবু আছেন।'

বললুম, 'আমিই কিরণ চ্যাটার্জি। কী দরকার?'

কনস্টেবলটি উত্তর দেবার আগেই যে এসে সদর-দরজায় দাঁড়াল, তাকে দেখে তো আমি অবাক। ভাদুড়ীমশাই অবশ্য বলেছিলেন যে, নিজে না এলেও কাউকে তিনি পাঠিয়ে দিচ্ছেন, আর যে-লোকটিকে পাঠাচ্ছেন তাকে আমি চিনতেও পারব, কিন্তু সে যে কৌশিক, তা আমি ভাবতেও পারিনি।

কৌশিককে আমি প্রথম দেখি বছর-পনেরো আগে, সেই যে-বারে আমরা মুকুন্দপুরের মনসামূর্তি উদ্ধার করতে নর্থ বেঙ্গলে গিয়েছিলুম, তখন। কৌশিক তখন তীর্থপতি ইনস্টিটিউশনে

পড়ত, আর এখন একেবারে জবরদস্ত যুবাপুরুষ।

বললুম, 'দাঁড়াও, দাঁড়াও, মিঃ সামন্তের সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দিই। মিঃ সামন্ত, আপনি চারুচন্দ্র ভাদুড়ীর নাম নিশ্চয় শুনেছেন।'

'চারুচন্দ্র ভাদুড়ী...চারুচন্দ্র ভাদুড়ী...' নামটাকে দুবার জিভের ওপরে নাচিয়ে নিয়ে সামন্ত বললেন, 'আপনি কি. সি. সি. ভাদুড়ীর কথা বলছেন?...মানে এখন যিনি ব্যাঙ্গালোরে থাকেন?'

'আরে হ্যাঁ, মশাই।'

'ওরে ব্বাবা,' সামন্ত বললেন, 'তিনি তো স্বনামধন্য ইনভেস্টিগেটার। আমাদের লাইনে তাঁকে কে না চেনে। তা ইনি তাঁর কেউ হন নাকি?'

বললুম, 'এ হল কৌশিক সান্যাল। তাঁর ভাগ্নে। আর কৌশিক, ইনি মিঃ গঙ্গাধর সামন্ত, আমাদের থানার ও.সি.।'

নমস্কার বিনিময়ের পরে সামন্ত বললেন, 'তা মিঃ সান্যাল, আপনিও কি মামার লাইন ধরেছেন নাকি?'

কৌশিক হাসল। বলল, 'এখনও ঠিকমতো ধরিনি, তবে চেষ্টায় আছি। কিরণমামা আজ সকালে মামাবাবুকে ফোন করেছিলেন। তা মামাবাবুর একটা কাজ পড়ে গেছে, তাই আসতে পারলেন না, আমাকে বললেন, তুই গিয়ে ব্যাপারটা একটু দেখে আয়।'

আমি বললুম, 'গোয়েন্দা হিসেবে কৌশিকও কিন্তু এরই মধ্যে বেশ নাম করেছে।'

সামন্ত বললেন, 'বটে? তা মিঃ ভাদুড়ী এখন কলকাতায়?'

'হ্যাঁ, একটা কাজে এসেছেন, সামনেব হপ্তাটা থেকে যাবেন।'

'ভালো, ভালো, খুব ভালো।' সামন্তমশাই হেসে বললেন, 'ভালো করে সব দেখে যান। কাউকে যদি কিছু জিগ্যেস করতে হয় তো করুন। তারপর মিঃ ভাদুড়ীকে গিয়ে বলুন যে, কী দেখলেন, কী শুনলেন। দরকার হলে, আমিও তাঁব পরামর্শ নিতে যাব, তবে দরকার হবে বলে মনে হয না। এ তো যদ্দুর বুঝতে পারছি একেবারেই সিম্পল ব্যাপার। ওই যাকে ইংরেজিতে 'ওপন অ্যান্ড শাট 'কস' বলা হয়, তাই আর কী।'

বলেই ডঃ চাকলাদারের দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন সামন্ত। বললেন, 'কী, ঠিক বলিনি?'

চাকলাদার হকচকিয়ে বললেন, 'কী ঠিক বলেননি?...মানে আপনার কথাটা ঠিক বুঝতে পারছি না।'

সামন্ত বললেন, 'না বোঝবার তো কিছু নেই। ইটস এ প্লেন অ্যান্ড সিম্পল কেস অভ মার্ডার। তা প্র্যাকটিস করুন আর না-ই করুন, আপনি একজন ডাক্তার তো বটেন, খুনটা কখন হয়েছে বলে আপনার মনে হয়?'

চাকলাদার চুপ করে রইলেন। বুঝতে পারছিলুম যে, তিনি সাবধানী লোক, চটপট কোনও সিদ্ধান্ত করতে চাইছেন না। সামন্ত বললেন, 'কী হল, কিছু বলুন।'

চাকলাদার বললেন, 'দেখুন মশাই, এটা খুন কি না, তা বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তবে আনন্যাচারাল ডেথ অবশ্যই। তা পড়ে গিয়ে মাথা ফেটে মৃত্যু হয়ে থাকতে পারে, আবাব কেউ ভারী কিছু, এই ধরুন থান-ইট কি পাথর কি মশলা-বাটার নোড়ার মতো কিছু দিয়ে মারবার ফলে মাথা ফেটেছে, এমনটাও হওয়া সম্ভব। সত্যি বলতে কী, যদি শুনি যে, আগেই ভদ্রলোক হার্ট-ফেল করে মারা গিয়েছেন, তারপর পড়ে যাবার ফলে মাথা ফেটেছে, তো তাতেও আমি অবাক হব না। তেমন কেসও আমি দেখেছি। তা এর মধ্যে কোনটা এক্ষেত্রে ঘটেছে, অর্থাৎ এটা অ্যাকসিডেন্ট না মার্ডার, নাকি ন্যাচারাল ডেথ ইন আনন্যাচারাল সারকামস্ট্যান্সেস, তা আমি কী করে বলব, তার জন্যে তো আপনাদের এক্সপার্টরাই রয়েছেন।'

সামন্ত বললেন, 'অর্থাৎ আপনি কিছু কমিট করতে চাইছেন না, কেমন? তা না-ই করুন,

অন্তত একটা কথা তো বলতে পারেন।'

'কী বলব?'

'ঘটনাটা কতক্ষণ আগে ঘটেছে? না-না, মিনিট আর সেকেন্ড মিলিয়ে কাঁটায়-কাঁটায় নির্ভুল সময় আপনাকে বলতে হবে না, তা আমাদের এক্সপার্টদের পক্ষেও বলা সম্ভব নয়, আপনি একটা আন্দাজের কথা বলুন।'

চাকলাদার এক-পা এগিয়ে গিয়ে ডেডবডির পাশে উবু হয়ে বসলেন। ভেবেছিলুম, নকুলের মৃতদেহের ওপরে হাত রেখে তিনি তার উত্তাপ পরীক্ষা করবেন। দেখে নেবেন যে, শরীর কতটা ঠান্ডা হয়ে এসেছে। এইভাবেও অনেককে মৃত্যুর সময়টা আন্দাজ করতে দেখেছি। চাকলাদার কিন্তু সেসব কিছু করলেন না। মৃতদেহের মাথার পাশে মেঝের ওপরে যে চাপ-বাঁধা রক্ত দেখা যাচ্ছিল, সেই রক্তের দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে রইলেন তিনি। পকেট থেকে একটা ম্যাচবক্স বার করলেন। তার থেকে একটা কাঠি বার করে নিয়ে চাপ-বাঁধা রক্তের একপাশে সেটাকে চেপে ধরলেন একটু। কী যেন ভাবলেন। তারপর দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, 'আমার ধারণা, খুব বেশিক্ষণ আগের ব্যাপার এটা নয়।'

সামন্ত বললেন, 'অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট। এবারে ওই লাঠিটা দেখুন।'

প্রথম যখন এই বাড়িতে এসে ঢুকি, লাঠিটা আমি তখনই দেখেছিলুম। সদানন্দবাবুর লাঠি। যেমন সদানন্দবাবুর টর্চ, তেমনি তাঁর লাঠিটাও সিঁড়ির নীচে পড়ে আছে। দুটো বস্তুতেই অল্পবিস্তর রক্ত লেগে রয়েছে দেখলুম।

সামন্ত বললেন, 'দেখেছেন?'

চাকলাদার বললেন, 'লাঠির আর কী দেখব?'

'আরে মশাই, আমি কি আর লাঠি দেখতে বলছি? আসলে দেখতে বলছি ওর মাথায় বসানো লোহার বলটাকে।'

আমি বললুম, 'মনে হচ্ছে, আপনি কিছু বলতে চান।'

সামন্তমশাই হাসলেন। বললেন, 'চাই-ই তো। ব্রহ্মাস্ত্রটি কার?'

'লাঠিটার কথা বলছেন তো? ওটা আমার।'

গলা শুনেই চমকে গিয়েছিলুম। তাকিয়ে দেখলুম দেড়তলা-বরাবর একটা বাঁক নিয়ে সিঁড়িটা যেখানে দোতলায় উঠে গিয়েছে, সদানন্দবাবু সেই ল্যান্ডিংয়ে এসে দাঁড়িয়ে আছেন।

॥ ৯ ॥

চাকলাদার বললেন, 'এ কী, আপনি বিছানা থেকে উঠে এলেন কেন? প্রেশার বেড়েছে, মাথা ঘুরে গিয়েছিল, এখন আপনাব কমপ্লিট রেস্ট দরকার। না-না, এইভাবে উঠে আসা আপনার মোটেই উচিত হয়নি।'

সদানন্দবাবু ম্লান হাসলেন। বললেন, 'এখন অনেকটা সুস্থ বোধ করছি। মাথাও আর ঘুরছে না।'

সামন্ত বললেন, 'আপনিই সদানন্দ বসু?'

'হ্যাঁ।'

'এই বাড়ির মালিক?'

'হ্যাঁ।'

'নীচে এসে একটু বসতে পারবেন?'

'তা কেন পারব না? ভালোই তো আছি।'

'বেশ, তা হলে একটু নীচে এসে বসুন। আপনাকে দু-একটা কথা জিগ্যেস করব।'

রেলিং ধরে সিঁড়ির ধাপগুলি সাবধানে ভেঙে সদানন্দবাবুর নীচে নেমে এলেন। আমি তাঁকে একটা চেয়ার এগিয়ে দিলুম।

কৌশিক পটাপট ছবি তুলে যাচ্ছিল। হঠাৎ সে সদানন্দবাবুর সামনে এসে দাঁড়াল। বলল, 'মিঃ সামন্ত আপনাকে যে-প্রশ্নই করুন, আপনি কিন্তু তার উত্তর দিতে বাধ্য নন। দরকার বোধ করলে একজন ল-ইয়ারও রাখতে পারেন। উত্তর যা দেবার, আপনার হয়ে তিনিই দেবেন।'

সামন্ত হেসে বললেন, 'ওরে ব্বাবা, এ তো দেখছি নরাণাং মাতুলক্রমঃ। ঠিক আছে, ঠিক আছে, সদানন্দবাবুকে আমি যেসব প্রশ্ন করব, ইচ্ছে হয় তো উনি তার উত্তর দেবেন, না হয় তো দেবেন না।'

সদানন্দবাবু বললেন, 'ইচ্ছে-অনিচ্ছের কথা উঠছে কেন? তবে হ্যাঁ, উত্তরটা জানা থাকলে তবেই দেব, তা নইলে আর দেব কী করে?'

সামন্ত বললেন, 'ফেয়ার এনাফ। এখন অবশ্য সামান্য-দু-একটা প্রশ্নই করব, দরকার বুঝলে অন্যসব প্রশ্ন পরে করা যাবে। তা হলে শুরু করি?'

'করুন।'

'আমার প্রথম প্রশ্ন, ডেডবডি তো আপনিই প্রথম দেখেছিলেন, তাই না?'

প্রশ্নের মধ্যে যে ফাঁদটা ছিল, সন্তর্পণে সেটা এড়িয়ে গেলেন সদানন্দবাবু। বললেন, 'তা কী করে বলব? আমি কখন কী অবস্থায় ডেডবডিটা দেখেছিলুম, শুধু সেটাই আপনাকে বলতে পারি।'

সামন্ত বললেন, 'বেশ, তা-ই বলুন।'

অতঃপর সদানন্দবাবু যা বললেন, তা আগেই বলেছি। এই একটা ব্যাপার লক্ষ করলুম যে, ভদ্রলোক খানিক আগে আমাকে যা বলেছিলেন আর এখন গঙ্গাধর সামন্তকে যা বললেন, তা একেবারে হুবহু একরকমের, কোথাও কোনও অসঙ্গতি নেই।

সামন্ত তাঁর দ্বিতীয় প্রশ্ন করলেন লাঠিটা নিয়ে। আমাদের সঙ্গে কথা বলবার সময়ে তাঁর চোখ যে বারবার লাঠিটার দিকেই ঘুরে যাচ্ছিল, আগেই সেটা দেখেছিলুম। মৃতদেহের পাশে শুধু রক্ত নয়, বেশ-খানিকটা জায়গা জুড়ে জলও ছড়িয়ে আছে। ঠিক জলও নয়, ধুলোর ওপরে জল পড়লে যেমন হয়, তেমনি; কাদা-কাদা। সেই কাদা-জলও অবশ্য প্রায় শুকিয়ে গেছে। তবু পাছে পা হড়কে যায়, তাই সামন্ত খুব সাবধানে সেই কাদার ওপর দিয়ে দু-পা এগিয়ে লাঠিটার কাছে উবু হয়ে বসলেন, তারপর বিষ্টুর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'খানিকটা ন্যাকড়া দিতে পারেন?'

ঘর থেকে বিষ্টু খানিকটা ন্যাকড়া এনে দিল। সেই ন্যাকড়ার ফালি নিয়ে যেখানটায় রক্ত নেই, খুব সন্তর্পণে সেইখানে ধরে লাঠিটাকে মেঝের ওপর থেকে তুলে এনে মিনিট খানেক সেটাকে নিরীক্ষণ করে নিয়ে যখন সামন্ত আবার সদানন্দবাবুর দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন, তখন দেখলুম যে, তাঁর ঠোঁটের ওপরে খেলা করছে একটা রহস্যময় হাসি, আর চোখ দুটিও ঈষৎ কুঁচকে গেছে।

বললেন, 'এটা তা হলে আপনারই?'

প্রশ্নটা যেভাবে করলেন, তাতেই সম্ভবত সদানন্দবাবুর গলায় কিঞ্চিৎ শ্লেষ্মা জমে গিয়েছিল। ঘড়ঘড়ে গলায় তিনি বললেন, 'লাঠিটার কথা বলছেন তো? আজ্ঞে হ্যাঁ, ওটা আমারই। সে তো একটু আগেই বললুম।'

'এর মাথায় লোহার বল বসানো কেন?'

'না-বসিয়ে উপায় ছিল না, তাই বসিয়েছি। আসলে ভোরবেলায় রোজই আমি এক চক্কর মর্নিং ওয়াক করতে বেরোই তো, তখন কুকুরগুলো বড্ড উৎপাত করে। গত বছর একদিন যখন শ্রদ্ধানন্দ পার্কে মর্নিং ওয়াক সেরে বাড়ি ফিরছি, তখন ওই পার্কের উত্তর-পশ্চিম দিকের ফুটপাথে

যে ময়লা ফেলার ভ্যাটটা রয়েছে না, একটা নেড়িকুত্তা হঠাৎ সেই ভ্যাটের পাশ থেকে ছুটে এসে আমাকে কামড়েও দিয়েছিল।'

সদানন্দবাবু তাঁর ধুতিটা একটু সরিয়ে ডান-পায়ের একটা জায়গা দেখিয়ে বললেন, 'এই দেখুন, সেই কামড়ের দাগ এখনও মিলিয়ে যায়নি। তা সেইজন্যে আমাকে গুচ্ছের ইঞ্জেকশান নিতে হয়েছিল, স্যার। এই তো, ডাক্তার চাকলাদারও তো রয়েছেন এখানে। ওঁকে জিগ্যেস করে দেখুন, উনিও সব জানেন। যাই হোক সে যাত্রা রক্ষে পেয়ে গেলুম, কিন্তু নেড়িকুত্তার ভয়ে তো আর মর্নিং ওয়াক বন্ধ করতে পারি না, তাই লাঠির মাথায় ওই লোহার বলটা বসিয়ে নিয়েছি।'

ডঃ চাকলাদারের দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন সামন্ত। চাকলাদার বললেন, 'সত্যি ওঁকে জলাতঙ্কের ইঞ্জেকশান নিতে হয়েছিল।'

সামন্ত আবার সদানন্দবাবুর দিকে তাকালেন : 'লাঠিতে লোহার বল বসিয়ে নেবার পরে আর কুকুরগুলো আপনাকে তাড়া করে না, কেমন?'

'আজ্ঞে তার পরেও তাড়া করত। কিন্তু ওইটে দিয়ে একদিন একটা নেড়িকুত্তাকে আমি মোক্ষম এক ঘা বসিয়ে দিই। ব্যস্, তারপর থেকে আর তেড়ে আসে না। ওই যা দূর থেকেই ঘেউ-ঘেউ করে, কিন্তু লাঠি উঁচিয়ে ঘুরে দাঁড়ালেই ছুটে পালায়।'

লাঠিটা পড়েছিল রক্তের ধারে, আর তার পাশেই পড়ে ছিল টর্চটা, কিন্তু সেটা যেহেতু নেহাতই এক-ব্যাটারির পকেট টর্চ, এবং অতটুকু একটা জিনিসকে যেহেতু গঙ্গাধর সামন্তের পক্ষেও ব্রহ্মাস্ত্র কি পাশুপত অস্ত্রের সঙ্গে তুলনা করা সম্ভব নয়, তাই আর তিনি টর্চটা নিয়ে কিছু বললেন না।

বাইরে একটা গাড়ির শব্দ পাওয়া গেল। সদর-দরজার দিকে এগোতে-এগোতে সামন্ত বললেন, রওনা হবার আগে যেমন আমাদের ডাক্তার গুপ্ত তেমনি ডি সি কেও একটি ফোন করে সব জানিয়ে এসেছিলুম। বোধহয় তাঁরাই এলেন।'

গাড়ি থেকে যাঁকে নামতে দেখলুম, হাতের স্টেথিস্কোপ দেখেই বোঝা গেল যে, তিনি ডাক্তার গুপ্ত। ডি সি আসেননি। সামান্য একটা মৃত্যুর খবর পেয়ে তাঁর আসবার কথাও নয়। শুনলুম, কোথায় কোন পোলিটিক্যাল পার্টির অফিসে নাকি বোমা পড়েছে, তিনি সেখানে গেছেন।

ডাক্তার সুরেশ গুপ্ত বাড়িতে ঢুকেই কাজে লেগে গেলেন। বেশ কিছুক্ষণ ধরে, নানান দিক থেকে মৃতদেহটি নিরীক্ষণ করলেন তিনি, গায়ে হাত রেখে উত্তাপটা দেখে নিলেন, তারপর বেসিনে ভালো করে হাত ধুয়ে, পকেট থেকে একটা রুমাল বার করে হাত মুছতে-মুছতে সামন্তের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'অ্যাকসিডেন্ট নয়, এটা মার্ডার।'

সামন্ত বললেন, 'কী করে বুঝলেন?'

ডাক্তার গুপ্ত বললেন, 'কেন, আপনার তা মনে হয় না?'

'সে-কথা হচ্ছে না। সত্যি বলতে কী, আমার ধারণাও একই। কিন্তু আপনি সেটা কী করে বুঝলেন, সেটাই জানতে চাইছি।'

ডাক্তার গুপ্ত ধীরে সুস্থে একটা সিগারেট ধরালেন। তারপর বললেন, 'সিম্পল ব্যাপার। বোঝবার জন্যে খুব বেশি মাথা খাটাবার দরকার নেই। কেউ যদি পা হড়কে কি দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে টাল সামলাতে না পেরে চিৎ হয়ে মেঝের ওপরে দড়াম করে পড়ে গিয়ে মারা যায়, তা হলে তার খুলির পিছন-দিকটা ফাটবার কথা। আর যদি উপুড় হয়ে পড়ে, তো তার খুলির সামনের দিকটা ফাটবে। তার কোনওটাই কিন্তু এ-ক্ষেত্রে ঘটেনি। এ-লোকটির মাথার খুলির না-ফেটেছে পেছনের দিকটা, না-ফেটেছে সামনের দিক। ফেটেছে এর খুলির একেবারে ওপরের দিকটা। অর্থাৎ সাধুভাষায় যাকে আমরা ব্রহ্মতালু বলি আর সাদা বাংলায় বলি চাঁদি, সেই জায়গাটা। মাথার ওপরে ফ্যান কি ঝাড়লণ্ঠন ভেঙে পড়লে খুলির এই জায়গাটা এভাবে ফাটতে পারে।'

কৌশিক এতক্ষণ চুপচাপ সব শুনে যাচ্ছিল। ডাক্তার গুপ্ত একটু থামতেই সে বলল, 'কিন্তু

এখানে ওর মাথার ওপরে ফ্যানও ছিল না, ঝাড়লণ্ঠনও ছিল না। চাঁদিটা তা হলে ফাটল কী করে?'

হঠাৎ একজন অপরিচিত লোক তাঁর কথার মধ্যে ঢুকে পড়ায় স্পষ্টতই একটু বিরক্ত হলেন ডাক্তার গুপ্ত। সামন্তকে জিগ্যেস করলেন, 'একে তো চিনতে পারলুম না, আপনাদের নতুন রিক্রুট?'

সামন্ত বললে, 'ওঃ হো পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়নি। ইনি মিঃ কৌশিক সান্যাল। প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটার চারুচন্দ্র ভাদুড়ীকে মনে আছে?'

'চারু ভাদুড়ী...মানে ওই যাঁকে আমরা সিসিবি বলতুম। তিনি তো এ-লাইনে একটা লিজেন্ড মশাই। শুনেছি এখন ব্যাঙ্গালোরে থাকেন।'

'হ্যাঁ, তাঁরই কথা বলছি। ব্যাঙ্গালোরেই থাকেন বটে, তবে দিন কয়েকের জন্যে নাকি কলকাতায় এসেছেন। তা মিঃ সান্যাল তাঁরই ভাগ্নে। মামার লাইন ধরেছেন আর কি।'

ডাক্তার গুপ্ত কৌশিকের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বটে? সিসিবি তোমার মামা? 'তুমি' বলছি বলে আবার কিছু মনে কোরো না যেন।

কৌশিক বলল, 'মনে করব কেন? আপনি আমার চেয়ে অনেক বড়। 'তুমি'ই তো বলবেন।'

'মামার লাইনে এসেছ...মানে প্রাইভেট ইনভেস্টিগেশান? বাঃ, বাঃ, চমৎকার। লাইক মামা লাইক ভাগ্নে। এক্সেলেন্ট। তা মামাবাবুকে বোলো, সিসিবিকে আমরা ভুলিনি, উই অল রিমেমবার হিম সো ফন্ডলি।'

কৌশিক বলল, 'নিশ্চয় বলব। মামাবাবু প্রায়ই তাঁর কলকাতার বন্ধু-বান্ধবদের গল্প করেন।'

সামন্ত বললেন, 'মিঃ সান্যালের প্রশ্নের উত্তর কিন্তু এখনও আপনি দেননি গুপ্ত সাহেব।'

ডাক্তার গুপ্ত বললেন, 'ও হ্যাঁ, প্রশ্নটা কী ছিল যেন? ফ্যানও নেই, ঝাড়লণ্ঠনও নেই, চাঁদিটা তাহলে ফাটল কী করে? তাই না?'

কৌশিক বলল, 'হ্যাঁ, কী করে ফাটল?'

ডাক্তার গুপ্ত একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, 'আমার সন্দেহ, একটু উঁচু জায়গা থেকে, এই ধরো ওই সিঁড়িটার দু-তিন ধাপ ওপরে দাঁড়িয়ে, আচমকা কেউ ভারী কিছু দিয়ে ওর মাথার ওই জায়গাটায় একটা আঘাত করেছিল। খুব জোরেই যে সেটা করেছিল, সে তো বোঝাই যাচ্ছে। তা নইলে নিশ্চয় খুলিটা এভাবে ফেটে যেত না।'

গঙ্গাধর সামন্ত বললেন, 'পাড়ার এই ডাক্তারবাবুটি ইট কি পাথর, আর নয়তো মশলা বাটা নোড়ার কথা বলছিলেন।'

'না, না,' ডাক্তার চাকলাদার ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'নিশ্চিত হয়ে আমি কিছু বলিনি। একটা সম্ভাবনার কথাই বলেছিলুম মাত্র।'

কৌশিক তার কাজ বন্ধ করেনি। যে-সব কথা হচ্ছিল, তা শুনতে-শুনতেই তার মিনল্টা ক্যামেরা দিয়ে ডেডবডির আরও কয়েকটা ছবি তুলে নিল সে। মৃতদেহের পাশে পড়ে থাকা কিছু ধুলোবালি আর কাঠের গুঁড়োর মতো কিছু জঞ্জাল কুড়িয়ে নিয়ে ছোট-ছোট দুটো প্ল্যাস্টিকের ব্যাগের মধ্যে রাখল। তারপর একটা 'ব্যাগ' সামন্তের হাতে তুলে দিয়ে বলল, 'একটা ব্যাগ আপনি রাখুন, অন্যটা আমি নিয়ে যাচ্ছি, মামাবাবুকে একবার দেখাব। আপনার আপত্তি নেই তো?'

গঙ্গাধর সামন্ত বললেন, 'কাজটা ইরেগুলার, তবে কিনা সিসিবিকে দেখাবেন তো, তাই আপত্তি করার কোনও অর্থ হয় না। কিন্তু আজই ফেরত দেবেন মশাই, নইলে আমি মুশকিলে পড়ব।'

ডাক্তার গুপ্ত বললেন, লোকে কী ভাবে জানো তো? ভাবে যে, পুলিশ ডিপার্টমেন্টের লোকেরা প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটারদের দু-চক্ষে দেখতে পারে না। তাদের দোষ দেব কী করে, গোয়েন্দা কাহিনিগুলোতে যা লেখা হয়, তাতে ওইরকমই মনে হয় যে! আরে বাবা, ক্রাইমের কিনারা করাটাই তো কাজ, তা বাইরের কেউ যদি সে-কাজে সাহায্য করেন তো তাতে আমাদের আপত্তি হবে কেন? ইন ফ্যাক্ট, উই অলওয়েজ লুক ফরোয়ার্ড টু গেটিং সাম হেলপ ফ্রম পিপল লাইক সিসিবি।'

কৌশিক বলল, 'আপনারা ভাবছেন, এটা খুন, তাই না?'

ডাক্তারবাবু বললেন, 'সে তো বললুমই। শুধু খুন বললে অবশ্য কমই বলা হয়। ইট'স এ গ্রুসাম মার্ডার।'

'ছবি তুলতে-তুলতে আপনাদের কথা শুনছিলুম। কী দিয়ে খুন করা হয়েছে, তাও ভাবছেন নিশ্চয়?'

গঙ্গাধর সামন্ত আবার বললেন, 'ডাক্তার চাকলাদার ইট, পাথর আর মশলা-বাটা নোড়ার কথা বলছিলেন।'

চাকলাদার বললেন, 'না, না, আমি নিশ্চিত হয়ে কিছু বলিনি।'

কৌশিক বলল, 'যদি খুনই হয়, অস্ত্রটা তা হলে ইট-পাথর কি একটা নোড়া অবশ্য হতেই পারে। তবে এক সেরি কি দুসেরি একটা বাটখারা হওয়াও কিছু বিচিত্র নয়।'

ডাক্তার গুপ্ত বললেন, 'নয়ই তো। আবার শেষপর্যন্ত যদি প্রমাণ হয় যে, বড়সড় একটা রেঞ্জ কিংবা হাতুড়ি দিয়ে মাথা ফাটানো হয়েছে, তো তাতেও আমি অবাক হব না। ...কিন্তু ব্যাপার কী বলুন তো, এখানে আসা অবধি একটা দুর্গন্ধ পাচ্ছি। হঠাৎ যেন সেটা আরও বেড়ে গেল। ব্যাপার কী?'

তাকিয়ে দেখলুম, যে-ঘরে মাছ রাখা হয়, হাওয়ায় তার দরজাটা খুলে গেছে। গঙ্গাধর সামন্তও সেটা লক্ষ করেছিলেন। বললেন, 'বন্ধ করুন, বন্ধ করুন, দরজাটা এখুনি বন্ধ করে দিন।'

বিষ্টুচরণ গিয়ে দরজাটা ফের বন্ধ করে দিল। এবারে হুড়কোটাও টেনে দিল সে। বাতাসে যাতে না দরজাটা আবার খুলে যায়।

সামন্ত বললেন, 'মাছের গন্ধ। পচা মাছ। এইসব মাছ খেয়েই তো ক্যালকাটার মানুষদের একেবারে বারোটা বেজে যাচ্ছে!'

॥ ১০ ॥

ভোরবেলায় যখন পাঁচ নম্বর বাড়িতে এসে ঢুকি, যমুনাকে তখন ডেডবডির পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলুম। ফোন করে ফিরে আসার পর থেকে আর তাকে দেখতে পাইনি। অনেকক্ষণ থেকেই অবশ্য চাপা একটা কান্নার শব্দ শোনা যাচ্ছিল। তাতেই বুঝেছিলুম যে, সে তার শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকেছে, সেখানে বসে কাঁদছে। একটানা কান্নার শব্দ। সেইসঙ্গে ভেসে আসছিল টুকরো-টুকরো কিছু কথা। যে-রকমের কথা, তাতে মনে হচ্ছিল, কাঁদতে-কাঁদতেই কাউকে সে সমানে গালমন্দ করে যাচ্ছে। কাকে গালমন্দ করছে, নিজের ভাগ্যকে না আর কাউকে, তা অবশ্য বোঝা যাচ্ছিল না।

সদানন্দবাবুর স্ত্রী কুসুমবালা যে বাতের রুগি, আগেই সে-কথার উল্লেখ করেছি। ভদ্রমহিলা বিশেষ হাঁটাচলা করতে পারেন না, করেনও না। সদানন্দবাবুর সঙ্গে তিনিও ইতিমধ্যে একবার নীচে নেমে এসেছিলেন। নীচে নেমে যমুনাদের ঘরেও ঢুকেছিলেন একবার। খুব সম্ভব সান্ত্বনা দিতেই গিয়েছিলেন, কিন্তু বেশিক্ষণ থাকেননি। ভেতরে একটা চেঁচামেচি শুনেছিলুম, কিন্তু সেটা যে কী নিয়ে তা বুঝতে পারিনি। তার পরেই অবশ্য যমুনার ঘর থেকে কুসুমবালা বেরিয়ে আসেন। দেড়তলার ল্যান্ডিংয়ে এখন একটা মোড়ার ওপরে তিনি বসে আছেন। শুনছেন কে কী বলে। নিজে কিছু বলছেন না।

সদানন্দ তাঁকে বললেন, 'বাচ্চাটাকে ওপরে নিয়ে গিয়ে কিছু খাইয়ে দিলে পারতে। ও তো আজ কিছুই খায়নি। অবিশ্যি খাবেই বা কী, আজ তো দুধই আনতে পারলুম না।'

কুসুমবালা বললেন, 'দুধের জন্যে আটকাচ্ছে না। ও তো আর হরিণঘাটা কি মাদার ডেয়ারির দুধ খায় না, টিনের দুধ খায়। সে-দুধ তো ওর জন্যে দু-টিন কিনেই রেখেছি।'

সদানন্দ বললেন, 'তা হলে আর দেরি কোরো না। ওর মা'কে একটু বুঝিয়ে-শুঝিয়ে ওকে ওপরে নিয়ে যাও।'

কুসুমবালা বললেন, 'বোঝাতেই তো গিয়েছিলুম, তা শুনছে কে। কমলিকে কিছুতেই ছাড়ল না।'

গঙ্গাধর সামন্ত কথা বলছিলেন ডাক্তার গুপ্ত আর কৌশিকের সঙ্গে। কিন্তু সদানন্দবাবু আর কুসুমবালার কথাবার্তাও তাঁর কানে যাচ্ছিল নিশ্চয়ই। হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে কুসুমবালাকে তিনি প্রশ্ন করলেন, 'কমলিটা আবার কে?'

উত্তরটা কুসুমবালার বদলে সদানন্দই দিলেন। বললেন, 'নকুলের মেয়ে।' তারপর কুসুমবালাকে বললেন, 'যমুনাকে একটু ভালো করে বুঝিয়ে বলো। না-বোঝবার তো কিছু নেই।'

কুসুমবালা বললেন, 'তবেই হয়েছে! যমুনা তখন আমাকে কী বলল জানো?'

সদানন্দবাবু কিছু বলবার আগেই সামন্ত তাঁকে আড়াল করে দাঁড়ালেন। তারপর খর চোখে কুসুমবালার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কী বলল?'

কুসুমবালা কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু মুখ খোলবারও সময় পেলেন না। চারদিক থেকে ক্যানেস্তারা পিটিয়ে হাঁকোয়া করতে শুরু করলে রাগী বাঘিনি যেমন ক্রমাগত কোণঠাসা হতে-হতে তারপর হঠাৎ একসময় জঙ্গলের আড়াল থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসে, মেয়েকে কোলে করে ঘর থেকে ঠিক তেমনি করেই ছুটে বেরিয়ে এসে যমুনা বলল, 'বাপকে মেরে এখন মেয়েকে সোহাগ দেখানো হচ্ছে! ঝাঁটা মারি তোদের সোহাগের মুখে! কী ভেবেছিস তুই রাক্ষুসি, অ্যাঁ? ভেবেছিস যে, কিছুই আমি জানি না! জানি, জানি, জানি! কমলির বাপকে তোরাই মেরেছিস! হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোরাই!'

তারপরেই সে গঙ্গাধর সামন্তের সামনে এসে আছাড় খেয়ে পড়ল। চেঁচিয়ে বলল, 'দারোগাবাবু, জলজিয়ন্ত মানুষটাকে ওরাই খুন করেছে! ওদের আপনি ফাঁসিতে লটকে দিন, দারোগাবাবু, ফাঁসিতে লটকে দিন!'

গোটা ব্যাপারটাই এমন হঠাৎ করে ঘটল যে, আমি একেবারে হতবাক! সদানন্দবাবুর দিকে তাকিয়ে দেখলুম, তাঁর ঠোঁট থরথর করে কাঁপছে। যেন কিছু বলতে চাইছেন তিনি, কিন্তু মুখ দিয়ে কোনও কথা সরছে না। কুসুমবালা স্তব্ধ হয়ে বসে আছেন। কৌশিক চাকলাদার আর ডাক্তার গুপ্তও স্তম্ভিত। শুধু গঙ্গাধর সামন্তই দেখলুম হকচকিয়ে যাননি। কড়া ধাতের থানা-অফিসার। যমুনা তাঁর পায়ের কাছে পড়ে ছিল। সেখান থেকে দু'পা পিছিয়ে এসে কঠিন গলায় তিনি যমুনাকে বললেন, 'এখনও ওসব থাক। একটু বাদেই তো আপনার সঙ্গে আমরা কথা বলব। কাকে আপনার সন্দেহ হয়, সে-কথা তখনই শোনা যাবে। এখন আপনি ঘরে যান। আমরা কাজ করতে এসেছি। কাজ করতে দিন।'

মেঝের ওপর থেকে হাত ধরে তুলে বিষ্টুচরণই যমুনাকে আবার তার শোবার ঘরে পৌঁছে দিয়ে এল। ডাক্তার চাকলাদার বললেন, 'উরে ব্বাবা, এই বুঝি নকুলবাবুর স্ত্রী?'

বিষ্ণুচরণ বলল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আর যাকে কোলে করে এনেছিল, সেই বাচ্চা মেয়েটি?'

'ওর মেয়ে, কমলি।'

'মেয়েটা কবে হল?'

'গত বছরের আগের বছর চোতমাসে হয়েছে।' সিঁড়ির ল্যান্ডিং থেকে কুসুমবালা বললেন, 'গত বুধবারই তো ওর জন্মদিন গেল।'

ডাক্তার চাকলাদার আর কিছু বললেন না। মাথা নিচু করে কী যেন ভাবতে লাগলেন। তারপর হঠাৎ একসময় মুখ তুলে গঙ্গাধর সামন্তের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমার আর এখানে কোনও কাজ নেই তো?'

ডাক্তার গুপ্তকে সামন্ত বললেন, 'ওঁকে দিয়ে কি আর কোনও দরকার আছে আমাদের?'

'কিছু না।' গুপ্ত বললেন, 'এখন ওঁকে ছেড়ে দিন। পরে যদি দরকার হয় তো আমরাই বরং ওঁর ল্যাবরেটরিতে গিয়ে দেখা করব।'

সামন্ত বললেন, 'ঠিক আছে ডক্টর চাকলাদার, আপনি এবারে যেতে পারেন। অনেকক্ষণ আপনাকে আটকে রেখেছিলুম, তার জন্যে কিছু মনে করবেন না।'

চাকলাদার চলে গেলেন।

থানা থেকে ইতিমধ্যে আরও দুজন লোক এসে পৌঁছেছিল। গঙ্গাধর সামন্ত সদানন্দবাবু আর বিষ্ণুচরণকে উদ্দেশ করে বললেন, 'এরা এই বাড়িটা একটু সার্চ করে দেখবে, আপনাদের তাতে আপত্তি নেই তো?'

সদানন্দবাবু বললেন, 'কিছুমাত্র না!'

সামন্ত বললেন, 'ধন্যবাদ। আপনারা কেউ এদের সঙ্গে থাকুন।' তারপর লোক দুটির দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'তা হলে তোমরা কাজ শুরু করে দাও। একেবারে ছাদ থেকে শুরু করবে।'

যাকে বললেন, সে জিজ্ঞাসু চোখে তাকাতেই সামন্ত তাকে একপাশে খানিকটা সরিয়ে নিয়ে গিয়ে নিচু গলায় কিছু বললেন। কী খুঁজতে হবে, সেটাই জানিয়ে দিলেন সম্ভবত। লোক দুটিকে সঙ্গে নিয়ে ওপরে চলে গেলেন সদানন্দবাবু। কুসুমবালা সেই থেকে সিঁড়ির ল্যান্ডিংয়েই বসে ছিলেন। এবারে তিনিও উঠে দাঁড়ালেন। স্বামীকে বললেন, 'চলো, আমিও তোমার সঙ্গে যাচ্ছি।'

বিষ্ণুচরণও ইতিমধ্যে ঘরে গিয়ে ঢুকেছিল। সম্ভবত তার বোনকে বলতে গিয়েছিল যে, একটু বাদেই একতলা সার্চ হবে।

সিঁড়ির সামনের জায়গাটায় এখন আমরা চারজন রয়েছি। সামন্ত, ডাক্তার গুপ্ত, কৌশিক আর আমি। পুলিশের পাহারাদারটিও রয়েছে অবশ্য। তবে সে ঠিক এই জায়গাটায় নেই। সদর-দরজার সামনে তাকে মোতায়েন করা হয়েছিল, সেইখানেই সে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে।

ডাক্তার গুপ্ত বললেন, 'কী দিয়ে আঘাত করার ফলে মৃত্যু হয়েছে, তাই নিয়ে কথা হচ্ছিল। হ্যাঁ, ইট, পাথর, নোড়া, রেঞ্চ, হাতুড়ি, মুগুর, বাটখারা, অনেক-কিছু দিয়েই ও-রকম আঘাত করা সম্ভব। মানে এমন আঘাত, যাতে মাথার খুলি ফেটে যায়। তা মিস্টার সামন্ত, আপনি কি আশা করছেন যে, সার্চ করে অমন-কিছু পাওয়া যাবে?'

সামন্ত বললেন, 'দেখা যাক, তল্লাশি তো চলছে। ওই ধরনের জিনিস যা-কিছু পাওয়া যাক, পরীক্ষার জন্যে আটক করা হবে। গেরস্ত-বাড়িতে ও-সব জিনিস কিছু-না-কিছু থাকেই কিন্তু থাকলেই তো আর হল না, পরীক্ষা করে নিশ্চিন্ত হওয়া চাই যে, যে-সব জিনিস পাওয়া গেল, তারই কোনও একটা দিয়ে আঘাত করা হয়েছিল।'

ডাক্তার গুপ্ত বললেন, 'তা তো বটেই, কিছু-একটা পাওয়াই যথেষ্ট নয়, পরীক্ষা করে দেখতে হবে, তার আগে কোনও সিদ্ধান্ত করবার উপায় নেই।'

কৌশিক বলল, 'মিস্টার সামন্ত ঠিক কথাই বলেছেন। নোড়া, হাতুড়ি, রেঞ্চ কি এই ধরনের আরও নানা জিনিস যে গেরস্ত বাড়িতে থাকবে, সেটাই স্বাভাবিক। না-থাকলেই বরং আমি অবাক হব।'

সামন্ত বললেন, 'এসব জিনিস যে থাকতেই পারে, একটু আগে আমিই সে-কথা বলেছি, তাই না?'

ডাক্তার গুপ্ত বললেন, 'ঠিকই বলেছেন।'

সামন্ত বললেন, 'না মশাই, ঠিক বলিনি।'

আমি বললুম, 'সে কী, বেঠিকটা কী বললেন? যে-ক'টা জিনিসের নাম করা হল, তার সবই তো গেরস্ত বাড়িতে থাকে। রেঞ্চ, হাতুড়ি কিংবা এই ধরনের জিনিসও গেরস্তকে রাখতে হয়। কল-টল সারাবার কাজ অনেকে নিজেই করে নেন, তাতেই ওসব লাগে। সব সময়ে তো আর প্লাম্বারকে ডেকে পাওয়া যায় না, তাই রেঞ্চ আর হাতুড়ি না রেখে উপায় নেই। অন্তত সদানন্দবাবুকে তো অনেক সময় এসব খুঁটিনাটি কাজ আমি নিজের হাতেই করতে দেখেছি।'

সামন্ত বললেন, 'আরে মশাই, রেঞ্চ আর হাতুড়িব কথা আমি ভাবছি না।'

'তা হলে কীসের কথা ভাবছেন?'

'আমি ভাবছি নোড়ার কথা।'

'কেন, নোড়াই বা কী অপরাধ করল?'

গঙ্গাধর সামন্ত বললেন, 'তাও বুঝতে পারছেন না? তা হলে ভাবুন যে, নোড়া কোন কাজে লাগে।'

'কেন, মশলা বাটার জন্যেই তো নোড়া রাখতে হয়। নোড়া না-থাকলে মশলা বাটা হবে কী দিয়ে?'

'অবশ্য, অবশ্য।' গঙ্গাধর সামন্ত হেসে বললেন, 'তা হলে এবারে ভাবুন যে, ক'টা বাড়িতে আজকাল মশলা বাটা হয়। আরে মশাই, সব বাড়িতেই আজকাল গুঁড়ো-মশলা দিয়ে কাজ চলছে, সুতরাং নোড়ার কোনও ভূমিকাই কোথাও নেই। দ্য রোল অব নোড়া হ্যাজ বিন কমপ্লিটলি প্লেড আউট।'

গঙ্গাধর সামন্ত হাসতে লাগলেন। হাসি থামবার পরে আমি বললুম, 'কথাটা কিন্তু ঠিক হল না।'

'কেন, এবারে আবার বেঠিকটা কী বললুম?'

'অনেকেই যে আজকাল গুঁড়ো-মশলা ব্যবহার করছেন, সেটা বেঠিক কথা নয়। কিন্তু তাঁদের বাড়িতেও হয়তো নোড়ার সন্ধান মিলবে। কাজ ফুরিয়েছে বলেই যে নোড়াটা তাঁরা ফেলে দিয়েছেন, এমন না-ও হতে পারে; হয়তো হেঁশেলের মধ্যেই সেটা ফেলে রেখেছেন। গেরস্ত-বাড়িতে এমন কত জিনিসই তো থাকে, আসলে যা কোনও কাজেই লাগে না।'

ডাক্তার গুপ্ত বললেন, 'কথাটা আপনি মন্দ বলেননি।' তারপর সামন্তের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আই থিংক, হি হ্যাজ এ পয়েন্ট দেয়ার।'

আমি বললুম, 'আর তা ছাড়া এটাও ভেবে দেখুন যে, গুঁড়ো মশলার চলন হয়েছে কোন ধরনের পরিবারে। মোটামুটি সেইসব পরিবারেই হয়েছে, যেখানে গিন্নিরাও চাকরি-বাকরি করেন। কাজে বেরুবার তাগিদে রান্নার পাট তাঁদের চটপট চুকিয়ে নিতে হয়, ফলে মশলা বাটাবাটির ঝামেলার মধ্যে তাঁরা যেতে চান না। নোড়াও অতএব আউট। পুরনো আমলের গিন্নিরা কিন্তু গুঁড়ো-মশলায় অতটা বিশ্বাসী নন, তাঁরা এখনও শিলের ওপরে নোড়া দিয়ে মশলা পিষে নেন। তা সদানন্দবাবুর গিন্নিটি যে পুরনো আমলের মানুষ, সে তাঁকে দেখেই আপনারা বুঝেছেন। তো আমার বিশ্বাস, অন্তত তাঁর হেঁশেলে শিল-নোড়ার ভূমিকা এখনও শেষ হয়নি।'

সামন্তমশাই বললেন, 'ঠিক আছে, আই উইথড্র মাই স্টেটমেন্ট। তবে কিনা নোড়া দিয়েই যে নকুলচন্দ্রের মাথা ফাটানো হয়েছে, তাও কিন্তু আমি ভাবছিলুম না।'

ডাক্তারবাবু বলেন, 'তাহলে কী ভাবছিলেন?'

সদানন্দবাবুর লাঠিটা সামন্তের হাতে ধরাই ছিল। সেটার দিকেই খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন তিনি। তারপর বললেন, 'আমি ভাবছিলুম অন্য কথা।'

কৌশিক চুপচাপ আমাদের কথা শুনছিল। এবারে সে এগিয়ে এসে বলল, 'কী ভাবছেন

সেটা বোঝা মোটেই শক্ত নয়। লাঠিটা একবার দেখতে পারি?'

কৌশিকের দিকে লাঠিটা এগিয়ে দিয়ে সামন্ত বললেন, 'সাবধানে ধরুন। জায়গায়-জায়গায় রক্তের ছিটে লেগে আছে, মুছে না যায়।'

লাঠির মাথায় যে লোহার বল বসানো, এইটে দেখেই কৌশিকের ভুরু দুটো একটু ওপরে উঠে গিয়েছিল। খানিক বাদেই সে-দুটো আবার যথাস্থানে ফিরে এল। সামন্তের হাতে লাঠিটা ফিরিয়ে দিয়ে সে বলল, 'আপনার ধারণা, এইটে দিয়েই খুন করা হয়েছিল, তাই না?'

সামন্ত বললেন, 'করা কি অসম্ভব?'

কৌশিক বলল, 'তা কেন বলব? বিশেষ করে যে-দিকটায় লোহার বল বসানো রয়েছে, সেই দিক দিয়ে তেমন-তেমন জোরে মারতে পারলে মানুষ তো মানুষ, হাতির মাথাও হয়তো ফাটিয়ে দেওয়া যায়।...কিন্তু না, আর নয়, আপনি আপনার জেরার কাজ শুরু করুন। অনেক বেলা হয়েছে, আমি এবারে চলি।'

কৌশিক চলে যাচ্ছিল। হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে আমাকে বলল, 'কাল তো আমাদের বাড়িতে আপনার আসবার কথা, তাই না?'

বললুম, 'হ্যাঁ, কালই তো রবিবার।'

'আসবেন কিন্তু। মামাবাবু বিশেষ করে বলে দিয়েছেন।'

॥ ১১ ॥

পাড়ায় দেখলুম সদানন্দবাবুর যেমন আমার মতো কিছু শুভার্থী আছেন, তেমনি শত্রুও নেহাত কম নেই। বরং শত্রুর সংখ্যাই বেশি। তার কারণ অবশ্য আর কিছুই নয়, ঈর্ষা। সদানন্দবাবুর অবস্থা যে তাঁর প্রতিবেশীদের তুলনায় কিছুটা সচ্ছল, সেকথা আমরা আগেই বলেছি। যে-কথা বলা হয়নি, সেটা এই যে, স্রেফ সেই সচ্ছলতার কারণেই অনেকে তাঁর ওপরে বিশেষ সন্তুষ্ট নন। ভাড়াটে খুন হয়েছে, আর খুনি হিসেবে সদানন্দবাবুকেই পুলিশ সন্দেহ করছে, এই কথাটা চাউর হতে খুব দেরি হল না। শুনে তাঁরা বলাবলি করতে লাগলেন, 'ঠিক হয়েছে, ব্যাটা যেন ধরাকে সরা জ্ঞান করছিল! এখন বোঝো ঠ্যালা! যেমন কর্ম তেমনি ফল!' অর্থাৎ তাঁরা ধরেই নিয়েছিলেন যে, অপকর্মটা সদানন্দবাবুই করেছেন, আর তার ফল ভোগ না করেও তাঁর নিস্তার নেই।

মনটা ভালো নেই। রাত হয়েছে, কোনওক্রমে খাওয়া-দাওয়া সেরে বিছানায় এসে শুয়ে পড়েছি, কিন্তু ঘুম আসছে না। ব্যাপারটা নিয়ে যত ভাবছি, মন যেন ততই আরও খারাপ হয়ে যাচ্ছে। সদানন্দবাবুর মুখখানা বারবার ভেসে উঠছে আমার চোখের সামনে। খানাতল্লাশির পর্ব শেষ হবার পর পুলিশ যখন তাঁকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে যায়, তখন যে তাঁকে কী অসহায় দেখাচ্ছিল!

যা দিয়ে একটা মানুষের মাথা ফাটিয়া দেওয়া যায়, তল্লাশি করে এমন জিনিস নেহাত কম পাওয়া যায়নি। ইট, পাথর, নোড়া, রেঞ্চ আর হাতুড়ি তো বটেই, একটা বেশ মোটামতন শাবলও পাওয়া গিয়েছে। সবই সদানন্দবাবুর সম্পত্তি। তল্লাশিটা প্রথমদিকে চলেছিল ওপর-ওপর। পরে উইটনেস রেখে বাক্স-প্যাঁটরা সিন্দুক-আলমারি সবই হাঁটকে দেখা হয়। তাতে যেমন নকুলের মাছের আড়তে একগাদা বাটখারা পাওয়া যায়, তেমনি সদানন্দবাবুর আলমারি থেকেও একটা এক-কিলো ওজনের বাটখারা বেরিয়ে পড়ে। তবে, সবচেয়ে বেশি মুশকিল বাধিয়েছে ওই লোহার বল-বসানো লাঠিটাই। সামন্ত সম্ভবত ধরেই নিয়েছেন যে, ওই লাঠি দিয়েই নকুলের মাথা ফাটানো হয়েছিল। তাঁর কথা শুনে অন্তত সেইরকমই মনে হয়।

খুনি হিসেবে যে সদানন্দবাবুকেই তিনি সন্দেহ করছেন, সেটাকে অবশ্য অস্বাভাবিকও বলা যায় না। তিনি বাড়িওয়ালা। ভাড়াটের উপরে তিনি প্রসন্ন ছিলেন না। ভাড়াটে যাতে উঠে যেতে বাধ্য হয়, তার জন্যে জল দেওয়া বন্ধ করেছিলেন, এমনকী ইলেকট্রিক লাইনও কেটে দিয়েছিলেন একদিনের জন্যে। তার ওপরে আবার নকুলের লাশের কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গিয়েছিল তাঁকেই, সামন্তের সন্দেহ তো হতেই পারে।

সন্দেহের একটা কাঁটা যে আমার মনেও খচখচ করছিল না, তা-ই বা কী করে বলি। একদিকে যেমন সদানন্দবাবুর অসহায় মুখখানা আমার চোখের সামনে বারবার ভেসে উঠছিল, অন্যদিকে তেমনি বারবার আমার মনে পড়ে যাচ্ছিল সদানন্দবাবুর সেই কথাটা, বৃহস্পতিবাব সকালে আমার বৈঠকখানা থেকে বেরিয়ে যাবার সময় যা তিনি খুব উত্তেজিতভাবে আমাকে বলে গিয়েছিলেন।

কী বলেছিলেন সদানন্দবাবু? ভাড়াটে তাড়াবার জন্যে দরকার হলে যে গুন্ডা লাগাতেও পিছপা হবেন না, শুধু এইটুকু বলেই তো ক্ষান্ত হননি তিনি, সেইসঙ্গে যোগ করেছিলেন এই ভয়ংকর কথাটা যে, গুন্ডা লাগাবারই বা দরকাব কী, 'এই যে লাঠিটা দেখছেন না, এটাই যথেষ্ট, এইটে দিয়েই ওর মাথা ফাটিয়ে ছাড়ব!'

তা হলে কি শেষপর্যন্ত সেই কাজই তিনি করলেন? করা যে অসম্ভব, তাও বলা যাচ্ছে না। শারীরিক সামর্থ্যেব দিক থেকে তো নয়ই। ভদ্রলোকের একমাত্র অসুবিধে চোখ নিয়ে। ছানি কাটিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু দৃষ্টির সেই আগের মতো জোর আর ফিরে পাননি। তবে শরীর এখনও রীতিমতো মজবুত। এই যে এতদিন এখানে আছি, সদানন্দবাবুকে একদিনও বিছানায় পড়ে থাকতে দেখলুম না। জ্বর নেই, জারি নেই, সর্দি নেই, কাশি নেই, ছেলেছোকরাদের মতোই টগবগে টনকো-তাজা স্বাস্থ্য, তাই নিয়ে একটু জাঁকও করেন, লোহার বল বসানো ওই লাঠিটা দিয়ে একটা নেড়িকুত্তাব মাথাও ফাটিয়ে দিয়েছেন, মানুষের মাথা ফাটানোই বা তবে একেবারে অসম্ভব হবে কেন? বিশেষ করে সিঁড়ির দু-ধাপ ওপরে যেখানে তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন, সেখান থেকে তো কাজটা আবও সহজ হবার কথা। গঙ্গাধর সামন্ত এই ব্যাপারটার ওপবে দেখলুম খুব জোব দিচ্ছেন।

কিন্তু সত্যিই কি কাজটা সদানন্দবাবু করেছেন? ভাড়াটাকে তুলে দেবার জন্য জল আর লাইটেব লাইন কেটে দিয়েও যখন সুবিধে হল না, তখন তাকে খুনই কবে বসলেন? ভেবে-ভেবে কোনও কূলকিনারা পাচ্ছিলুম না। এক-একবার মনে হচ্ছিল যে, বিচিত্র কী, মানবচরিত্র বড়ই জটিল, বড়ই রহস্যময় ব্যাপার, তার কতটুকুই বা বুঝি আমরা? এ তো প্রায় সমুদ্রে ভাসমান সেই হিমশৈলেব মতোই, জলের ওপরে যার সামান্য অংশই আমরা দেখতে পাই, আব বেশির ভাগটাই গোপন থেকে যায় জলের তলায়। সদানন্দবাবুর ক্ষেত্রেও হয়তো সেটাই ঘটেছে। তাঁব চরিত্রের খুব সামান্যই আমি দেখেছি, বাদবাকিটার সম্পর্কে কোনও ধারণাই আমার ছিল না। বাইরে তিনি সদানন্দ, হাস্যময়, পরোপকারী প্রতিবেশী, কিন্তু ভেতরে-ভেতরে হয়তো খুবই নিষ্ঠুর। এতই নিষ্ঠুর যে, একটা জলজ্যান্ত মানুষকে মেরে ফেলতেও তাঁর হাত কিছুমাত্র কাঁপেনি।

এক-একবার এইরকম ভাবছিলুম আমি, কিন্তু পরক্ষণেই মনে হচ্ছিল যে, না, এটা সম্ভব নয়, এটা হতে পারে না। সদানন্দবাবুব পক্ষে কাউকে খুন করা একেবারেই অসম্ভব একটা ব্যাপার।

ভদ্রলোক এখন থানা-হাজতে রয়েছেন। আজ আব আমি অফিসে যাইনি। বাবোটা নাগাদ লাশ সরিয়ে নেবার ব্যবস্থা করা হল। তারপর জিপে তুলে সদানন্দবাবুকে নিয়ে যাওয়া হল থানায়। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে আমি আর শম্ভুবাবু এই দৃশ্য দেখলুম। শম্ভুবাবুর অবস্থাও আমারই মতো। সদানন্দবাবুকে তিনিও বিশেষ শ্রদ্ধা করেন, ভালোবাসেন। বললেন, 'কী করা যায় বলুন তো?'

করবার কিছুই ছিল না। একে শনিবার, তায় বেলা একটা বাজে। তাই জামিনের ব্যবস্থা করা যায়নি। কালও করা যাবে না। যা করবার, সোমবারে করতে হবে।

এখন একমাত্র ভরসা ভাদুড়ীমশাই। ভাগ্য ভালো যে, তিনি কলকাতায় রয়েছেন। সদানন্দবাবুকে যে আমি উপকারী একজন বন্ধু হিসেবে গণ্য করি, সকালে ফোনেই সে-কথা ভাদুড়ীমশাইকে আমি জানিয়েছিলুম। নিজে আসতে না-পারলেও নিশ্চয় সেইজন্যেই তিনি কৌশিককে এখানে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। আমি আর বাসন্তী যদি খুব মিনতি করে বলি যে, এই খুনের তদন্তের ভার তাঁকে নিতেই হবে, তা হলে কি, দরকার হলে, আরও কিছুদিন তিনি কলকাতায় থেকে যাবেন না? মনে তো হয় থেকে যাবেন।

কৌশিকের ওপরেও আমার আস্থা অবশ্য নেহাত কম নয়। বয়স মাত্র ছাব্বিশ-সাতাশ, কেমিস্ট্রিতে এম.এসসি. করে আর চাকরি-বাকরির চেষ্টা করেনি, মামার লাইন ধরেছে। অর্থাৎ গোয়েন্দাগিরিতে তার অভিজ্ঞতা মাত্রই চার-পাঁচ বছরের। কিন্তু এরই মধ্যে যে কিছুটা নাম করেছে, তাতে বোঝা যায় যে, ছেলেটার অভিজ্ঞতা যতই কম হোক, বুদ্ধিটা পাকা। মেদবর্জিত ছিপছিপে লম্বা চেহারা, গায়ের রং বাবার মতো ফরসা নয়, মায়ের মতো তামাটে। আর অসম্ভব রকমের ধারালো চোখ দুটি দেখে তার মামার কথাই বারবার আমার মনে পড়ে যাচ্ছিল।

নেবুতলার ঘটকবাড়ির জোড়া-খুন নিয়ে যে মামলা চলছিল, কৌশিকের পাকা বুদ্ধির প্রমাণ তাতেই প্রথম পাওয়া যায়। এ হল গত বছরের ঘটনা। তার আগেও সে খুচরো কয়েকটা কাজ করেছিল বটে, কিন্তু এটাই ছিল তার ব্রেক-থ্রু। এই মামলায় যাবতীয় সাক্ষ্যপ্রমাণ সে এত নিপুণভাবে সাজিয়ে দিয়েছিল যে, নিশ্চিত প্রাণদণ্ড থেকেও 'সন্দেহের অবকাশে' খুনের আসামিদের বাঁচিয়ে দেবার ব্যাপারে যিনি সিদ্ধহস্ত, সেই দুঁদে ব্যারিস্টার সুধাকান্ত মজুমদারও ঘটক অ্যান্ড চৌধুরি এন্টারপ্রাইজের জুনিয়ার পার্টনার অমরেশ চৌধুরিকে কিছুতেই খালাস করিয়ে আনতে পারেননি। আদালতের রায়ের যে-অংশটাকে ওবিটার ডিকটাম বলা হয়, হাইকোর্টের প্রবীণ জজ আবদুল কুরেশি তাতে কৌশিকের কর্মনৈপুণ্য ও কর্তব্যনিষ্ঠার খুব প্রশংসাও করেছিলেন। বলেছিলেন, স্রেফ পুলিশ বিভাগের গাফিলতির জন্যই অনেক ক্ষেত্রে তদন্তের কাজে অস্বাভাবিক দেরি হয়ে যায়, আর তারই পরিণামে লোপাট হয়ে যায় অনেক সাক্ষ্যপ্রমাণ। ফলে, নেহাতই সন্দেহের অবকাশে আসামিদের সে-সব ক্ষেত্রে মুক্তি না দিয়ে আদালতের উপায় থাকে না। কিন্তু এ-ক্ষেত্রে সাক্ষ্যপ্রমাণ অতি দ্রুত সংগ্রহ করা হয়েছে, এবং যথাসময়ে সেগুলি দাখিল করবার ব্যাপারেও কোনও শৈথিল্য ঘটেনি বলেই সমাজের পক্ষে অতিশয় বিপজ্জনক ও অত্যন্ত নৃশংস এক অপরাধীকে সেই শাস্তি দেওয়া গেল, যা তার প্রাপ্য ছিল।'

মিঃ জাস্টিস আবদুল কুরেশির রায় পাঠ করে অনেকে অবাক হয়েছিলেন। আমি হইনি। তার কারণ, সে ভাদুড়ীমশাইয়ের ভাগনে; মামার গুণ যে কিছু-না-কিছু সে পাবেই, তা যেন আমি ধরেই নিয়েছিলুম। আসলে হত্যাকাণ্ডের ধরন দেখে খুনির চরিত্র কীভাবে অগ্রিম আন্দাজ করে নিতে হয়, হত্যার ফলে কে কোন দিক দিয়ে কতটা উপকৃত হচ্ছে, সেইটে বুঝে নিয়ে তদন্তের একটা ছক কীভাবে তৈরি করে নিতে হয়, এভিডেন্স কীভাবে সংগ্রহ করতে হয়, এবং মামলা কীভাবে কোন পথ ধরে এগোতে পারে, সে-দিকে খেয়াল রেখে যাবতীয় সাক্ষ্যপ্রমাণকে সাজাতেই বা হয় কীভাবে, মামার কাছেই কৌশিক সে-বিষয়ে যৎপরোনাস্তি তালিম পেয়েছে। সুতরাং তদন্তের ব্যাপারে সে যে কোনও পর্যায়েই কোনও ফাঁক রাখবে না, এটাই স্বাভাবিক।

নেবুতলার কেসটাতে সে মার্ডার-ওয়েপনটিও একেবারে ঝটিতি উদ্ধার করে, এবং সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে দেয় যে, অস্ত্রটা আর কিছুই নয়, আসলে সেটা অমরেশ চৌধুরিরই অফিস-ঘরের কলমদানের মধ্যে অতিশয় যত্নে রাখা একটা নকশা-কাটা বিদেশি পেপার-নাইফ। নিহত ঘটক-দম্পতিই যে বিদেশ থেকে ঘুরে এসে ধারালো সেই কাগজ-কাটা ছুরিটি অমরেশ চৌধুরিকে উপহার দিয়েছিলেন, বাংলা কাগজে এই ঘটনাটা সেদিন 'নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাস' বলে বর্ণিত হয়েছিল।

পাঁচ নম্বর বাড়ির ক্ষেত্রে যে মার্ডার-ওয়েপনস কোনটা, তা এখনও জানা যায়নি। গঙ্গাধর সামন্ত অবশ্য ধরেই নিয়েছেন যে, লাশের পাশে যে লাঠিটা পড়ে ছিল, লোহার বল বসানো সেই লাঠিটা দিয়েই নকুলচন্দ্রের মাথা ফাটানো হয়েছে। তবে কৌশিকের মুখের ভাব দেখে মনে হয়, সামন্তের এই সিদ্ধান্ত সে ঠিক মেনে নিতে পারছে না। ঘটনাস্থল থেকে সে যখন চলে আসে, তাকে এগিয়ে দিতে আমিও তখন সদর-দরজা পর্যন্ত এসেছিলুম। সেইসময়ে সে আমাকে বলে যে সামন্তমশাই যা ভাবছেন, কেসটা তত সহজ-সরল নয়। তাতে আমি বলি, 'তোমার কী মনে হয় বলো তো। সদানন্দবাবুই খুনি?' প্রশ্ন শুনে কৌশিক একটুক্ষণ চুপ করে থাকে; তারপরে বলে, 'উনি যে খুব বিপদে পড়েছেন, তাতে সন্দেহ নেই।'

কৌশিক তাব মারুতিতে উঠে স্টার্ট দেবার আগে ভাদুড়ীমশাই সম্পর্কেও দুটো-একটা কথা হল। জিগ্যেস করেছিলুম, 'তোমার মামাবাবু এবারে কী কাজ নিয়ে এসেছেন?' তাতে কৌশিক একগাল হেসে বলল, 'আর বলবেন না কিরণমামা, একটা রেসের ঘোড়ার ব্যাপার!'

'তার মানে?'

'তাহলে শুনুন। মাদ্রাজ থেকে একটা রেসের ঘোড়াকে নাকি কলকাতায় পাঠানো হয়েছিল, কিন্তু মধ্যপথে ট্রেনের ওয়াগন থেকে সেটা হাপিস হয়ে যায়। ঘোড়ার মালিক কলকাতার এক বিরাট ব্যাবসায়ী; বিস্তর টাকা খরচা করে সে মামাবাবুকে কলকাতায় নিয়ে আসে। গ্র্যান্ডে তুলতে চেয়েছিল, কিন্তু মামাবাবুকে তো আমার চেয়ে আপনি অনেক ভালো জানেন, তিনি গ্র্যান্ডে উঠলেন না, এয়ারপোর্ট থেকে সরাসরি আমাদের ওখানে চলে এলেন। তা রেসের ঘোড়া উদ্ধার করবার জন্যে মামাবাবুকেই দেখলুম একেবারে রেসেব ঘোড়ার মতো ছোটাছুটি কবতে হচ্ছে। ক'টা দিন যা ধকল গেল ওঁব, সে আর বলবার নয়।'

'ঘোড়াটা উদ্ধার হয়েছে?'

'বিলক্ষণ। কাজ কমপ্লিট; ঘোড়া এখন তার মালিকের আস্তাবলে। ব্যাপার কী জানেন, জাল কাগজপত্র দেখিয়ে মধ্যপথে একটা স্টেশনে একজন লোক ওয়াগন থেকে ঘোড়াটাকে নামিয়ে নিয়েছিল। হেঁজিপেঁজি লোক নয়, তারও প্রচুর পয়সা, মস্ত কারবার। মামাবাবুর তদন্তে তার জারিজুরি যখন ফাঁস হবার উপক্রম, তখন সে নিজেই এসে ঘোড়াটা ফেরত দিয়ে যায়। শুধু তার একটা অনুরোধ, স্ক্যান্ডালটা যেন খবরের কাগজ টের না পায়।...ওঃহো, কথাটা আপনাকে বলে ফেললুম। আপনিও যে খবরের কাগজের লোক, তা আমার মনেই থাকে না।'

'কাল সকালে তুমি বাড়িতে থাকছ তো?'

'আপনি আসছেন, আর আমি থাকব না?' কৌশিক হেসে বলল, 'নিশ্চয় থাকব। আসবেন কিন্তু...উইদাউট ফেইল।...মামিমা আর পারুলকেও নিয়ে আসুন। মা খুব বলছিল।'

বললুম, 'পারুলের পরীক্ষা, তাই যেতে পারবে না। আর তোমার মামিই বা ওকে ছেড়ে এখন যায় কী করে?'

'ঠিক আছে, আপনিই আসুন।'

গলি থেকে বেরিয়ে বাঁ-দিকে টার্ন নিল কৌশিকের গাড়ি। আমি আবার ভেতরে চলে এলুম।

শুয়ে-শুয়ে এই সব কথাই ভাবছি। ঘুম আসছে না। কৌশিককে বিদায় দিয়ে ফিরে আসবার পরে গঙ্গাধর সামন্ত যে মন্তব্য করেছিলেন, সেটা মোটেই আশাপ্রদ নয়। সামন্ত বলেছিলেন, 'প্রাইভেট ডিটেকটিভদের সম্পর্কে পুলিশের নাকি একটা অ্যালার্জি থাকে। কই মশাই, আমার তো কোনও অ্যালার্জি নেই। দরকার হলে ওঁদের সাহায্য নেব বইকী। তবে কিনা দরকার হবে বলে মনে হয় না। এ তো একেবারে জলের মতো সোজা ব্যাপার।'

ডাক্তার গুপ্ত কোনও কথা বলেননি। চুপ করেছিলেন। তবে সামন্তর কথা শুনেই আমি বুঝতে পেরে গিয়েছিলুম যে, ভদ্রলোক মনঃস্থির করে ফেলেছেন। যে সিদ্ধান্ত করেছেন, তার আর নড়চড়

হবার উপায় নেই।

এইসব ভাবতে-ভাবতেই ঘুমিয়ে পড়েছিলুম আমি।

পারুল এসে যখন আমার ঘুম ভাঙাল, তখন প্রায় আটটা বাজে। বলল, 'মা খুব রাগারাগি করছে, বিছানা ছেড়ে এবার উঠে পড়ো বাবা।'

আমাকে তুলে দিয়ে পারুল আবার পড়তে চলে গেল। বাসন্তী ইতিমধ্যে ঘরে এসে ঢুকেছিল। বলল, 'বাজার করতে হবে না? চটপট মুখ-হাত ধুয়ে বেরিয়ে পড়ো। তোমাকে রওনা করিয়ে দিয়ে আমি একবার ও-বাড়ি যাব।'

'কেন, ও-বাড়িতে আবার কী হল?'

'নতুন কিছু হয়নি। ওদের কাজের মেয়েটা একটু আগে একবার এসেছিল। বলল, কুসুমদি সারা রাত ঘুমোননি, সকালেও খুব কান্নাকাটি করছেন।'

'তা তো করবেনই। আজ রবিবার, ফলে আজ জামিনের ব্যবস্থা করা যাবে না। হুট করে যে কেন ওঁকে ধরে নিয়ে গেল। ভদ্রলোক কি তাঁর বাড়ি আর বউ ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছিলেন?'

বাসন্তী বলল, 'আর কথা নয়, বাথরুমে যাও, তারপর বাজার করে নিয়ে এসো। তোমার না হয় নেমন্তন্ন রয়েছে, আমাদের তো মুখে কিছু দিতে হবে। এদিকে বাড়িতে সব বাড়ন্ত। অন্তত মাছটাও যদি থাকত তো আজকের দিনটা চালিয়ে নিতুম। নাও, চটপট বেরিয়ে পড়ো, তুমি বাজারে গেলে সেই ফাঁকে আমি কুসুমদির কাছ থেকে একটু ঘুরে আসব।'

বাথরুমে ঢুকে পড়লুম। বুঝতে পেরেছিলুম যে, বাসন্তীর গলা এখন ক্রমেই চড়তে থাকবে।

॥ ১২ ॥

ভাদুড়ীমশাই এবারে কলকাতায় এসেছেন তা প্রায় বছর দুই বাদে। দেখে ভালো লাগল যে, তাঁর শরীর ইতিমধ্যে একটুও টসকায়নি। অরুণ সান্যালও দেখলুম ভালোই আছেন। ভাদুড়ীমশাই মাঝখানে একবার টেলিফোন ধরবার জন্যে ঘর থেকে উঠে গিয়েছিলেন। তখন মালতীকে জিগ্যেস করলুম, 'ব্যাপার কী বলো তো? অরুণের শুনেছিলুম শরীর বিশেষ ভালো নয়, কিন্তু কই, তোমার কর্তাকে দেখে তো তা মনে হচ্ছে না।'

উত্তরটা অরুণই দিলেন। বললেন, 'বুঝলেন না কিরণদা, ওই কথা বলে দাদাকে আটকে রাখা হয়েছে আর কি। নইলে তো কাজ মেটবার সঙ্গে-সঙ্গেই উনি চলে যাচ্ছিলেন।'

মালতী মুখ টিপে হাসল। তারপর বলল, 'দাদা যে এই বয়েসেও এত খাটাখাটি করছে কেন, বুঝতে পারছি না। একটামাত্র মেয়ে, তা সে তো তার স্বামীর সঙ্গে বিদেশে থাকে। বউদিও সেই কবেই স্বর্গে গেছেন। তা হলে আর এত খাটাখাটি করছে কার জন্যে? কোনও মানে হয়? এত বলি যে, ব্যাঙ্গালোরের অফিসটা গুটিয়ে ফেলে এবারে কলকাতায় ফিরে এসে একটু থিতু হয়ে বোসো, তা সে-কথা শুনছে কে। আপনি একটু বুঝিয়ে বললেও তো পারেন।'

কৌশিক বলল, 'কালই তো কিরণমামাকে আমি বলছিলুম যে, মামাবাবুর এবারে বড্ড ধকল গেল। এই বয়েসে এত দৌড়ঝাঁপ করা ওঁর ঠিক হচ্ছে না।'

বললুম, 'সে তো আমি যখনই দেখা হয়, তখনই বলি। এও বলেছি যে, আপনার এখন আর এত ছোটাছুটি করা ঠিক নয়। আপনার ভূমিকাটি হওয়া উচিত কনসালট্যান্টের। লোকে আপনার কাছে পরামর্শ নিতে আসবে, আপনি একটা ফি নিয়ে বলে দেবেন যে, কোন পথে কীভাবে তদন্তটা

হওয়া উচিত। বাস্, ঝামেলা মিটে গেল। তা উনি সে-কথায় কানই দেন না। যত বলি, তত হাসেন। আসলে ব্যাপারটা যে কী, তা তো তোমাদের না-বোঝবার কথা নয়। মানুষটা আসলে কাজ-পাগলা, সবকিছু নিজের হাতে করতে ভালোবাসেন।'

ভাদুড়ীমশাই ঘরে ঢুকতে-ঢুকতে বললেন, 'সব শুনেছি, সব শুনে ফেলেছি।'

'কী শুনলেন?'

'ওই আমাকে নিয়ে যে-সব কথা হচ্ছিল। ঠিক আছে, যা চাইছেন তা-ই হবে, অন্তত আপনাদের এই পীতাম্বর চৌধুরি লেনের কেসটাতে আমি নিজের হাতে কিচ্ছু করব না। করবার অবশ্য দরকারও নেই, কৌশিকই তো রয়েছে। আমি স্রেফ পরামর্শ দেব। এতদিন তো নিজের হাতে সব করেছি। এবারে দেখা যাক কনসালট্যান্ট হয়ে কদ্দুর কী করা যায়। তবে হ্যাঁ, জায়গাটা কিন্তু স্বচক্ষে একবার দেখব।'

'আজই বিকেলে চলুন।'

'আজ যাব না।'

'কেন, আবার কী অসুবিধে ঘটল? বলেন তো আমি ফোন করে গঙ্গাধর সামন্তকে একটা খবর দিয়ে রাখি। হাতে কোনও জরুরি কাজ না থাকলে বিকেল নাগাদ তিনিও সেখানে হাজির থাকবেন।'

ভাদুরীমশাই হেসে বললেন, 'অসুবিধে ওই গঙ্গাধর সামন্তকে নিয়েই। আজ বিকেলে সে তো ওখানে যেতে পারবে না। অন্য জায়গায় তার একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট রয়েছে যে।'

'কোথায়?'

ভাদুড়ীমশাই হেসে বললেন, 'বুঝতে পারছেন না?'

কৌশিক বলল, 'অত হেঁয়ালি কোরো না, মামাবাবু। বলেই দাও।'

মালতী বলল, 'আমিই বলে দিচ্ছি, কিরণদা। তোমাদের ওই থানা-অফিসারটিকে আজ বিকেলে আমাদের এখানে চা খেতে বলা হয়েছে। কিন্তু আর নয়, এবারে তোমরা খেয়ে নাও। তবে এখুনি বলে দিচ্ছি, খাবার টেবিলে বসে এসব খুন-জখম নিয়ে কিন্তু একটা কথাও বলা চলবে না। ও-সব কথা পরে হবে।'

তা-ই হল। কলকাতায় এখন চ্যাপলিন-উৎসব চলছে; তারই সূত্রে মঁসিয়ে ভের্দুর প্রসঙ্গটা একবার উঠেছিল বটে, কিন্তু কৌশিক যে-ই না ভাদুড়ীমশাইকে বলতে শুরু করে, 'আচ্ছা মামাবাবু, পাথরের সঙ্গে একটা দড়ি বেঁধে আর দড়ির মাথায় একটা ফাঁস লাগিয়ে ভদ্রলোক ওই যেখানে তাঁর...মানে কী বলব, তাঁর নতুন বউয়ের গলায় সেটা...' মালতী অমনি কটমট করে কৌশিকের দিকে তাকিয়ে বলল, 'থাক, থাক, এখন আর ওসব কথার দরকার নেই, যথেষ্ট হয়েছে।'

কৌশিক চুপ করে গেল। অরুণ একবার হাসিমুখে বলেছিলেন, 'কেন, খুনের কথা বললে কী হয়? উইল দ্যাট স্পয়েল ইয়োর অ্যাপিটাইট?' তাতে মালতী তাঁকেও এমন ধমক কষাল যে, অরুণ আর তারপরে একবারও মুখ খুলবার সাহস পেলেন না।

খাওয়া-দাওয়ার পরেই যে পীতাম্বর চৌধুরি লেনের প্রসঙ্গটা উঠল, তাও নয়। ভাদুড়ীমশাইয়ের ঘরে ঢুকে দুজনেই গড়িয়ে নিলুম খানিকক্ষণ। গড়ানো মানে ঘুম নয়, শুয়ে-শুয়ে ঘণ্টা দেড়েক হরেক বিষয়ে গল্প চলল। তিনটে নাগাদ চা নিয়ে এল মালতী। চা খেয়ে ভাদুড়ীমশাই বললেন, 'সামন্তকে সাড়ে-চারটেয় আসতে বলেছি, নিজেদের মধ্যে কথাবার্তাটা তার আগেই সেরে নেওয়া যাক।' তারপর মালতীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ রে, কৌশিক বাড়িতে আছে তো?'

মালতী বলল, 'কোথায় আর যাবে, শুয়ে-শুয়ে রাজ্যের ম্যাগাজিনের পাতা ওলটাচ্ছে।'

'তা হলে ওকে একবার এ-ঘরে পাঠিয়ে দে।'

কাপ-প্লেট তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেল মালতী। তার মিনিট খানেক বাদেই কৌশিক এসে ঢুকল।

ভাদুড়ীমশাই বললেন, 'হ্যাঁ রে কৌশিক, ব্যাকগ্রাউন্ডটা তো মোটামুটি বুঝতে পেরেছি; তুই ওখানে যাবার পর যা-যা ঘটেছে, তারও একটা রিপোর্ট তোর কাছে কাল শোনা গেল। এখন বল তো, সব্বাইকে বাদ দিয়ে একা ওই সদানন্দের ওপরেই সামন্তর সন্দেহটা এ-ভাবে পড়ছে কেন?'

কৌশিক বলল, 'ওর সন্দেহের কারণ আপাতত দুটি। প্রথমত, যে-ভাড়াটেকে তুলে দেবার জন্যে বাড়িওয়ালা নানানভাবে চেষ্টা করছে, আর সেই চেষ্টার কথাটা বলেও বেড়াচ্ছে সবাইকে, তার ওপরে আবার জল আর লাইটের লাইন কেটে দেবার মতো দু-দুটো ক্রিমিন্যাল অফেন্স করতেও ছাড়েনি, সেই ভাড়াটে যদি হঠাৎ এইভাবে বাড়ির মধ্যেই মারা পড়ে, তো বাড়িওয়ালাই যে তাকে মেরেছে, এমন সন্দেহ হওয়াটাই তো স্বাভাবিক। যেটাকে খুন-খারাবির ব্যাপার বলে মনে হচ্ছে, পুলিশ সেখানে মোটিভের সন্ধান করবেই। তা সদানন্দবাবুর ক্ষেত্রে যে সেটা ছিল, সে তো আর অস্বীকার করা চলে না।'

ভাদুড়ীমশাই বললেন, 'এটা তো প্রথম কারণ। দ্বিতীয় কারণটা কী?'

'সেটাও তুমি আন্দাজ করেছ নিশ্চয়। সামন্তর সন্দেহের প্রথম কারণ যদি হয় মোটিভ, তো দ্বিতীয় কারণ সুযোগ। খুন করবার একটা সুযোগ চাই তো, তা সদানন্দবাবুর সেটা ভালোই ছিল।'

'মোটিভ আর সুযোগ।' ভাদুড়ীমশাই বললেন, 'খুনের একটা মোটিভ চাই, একটা সুযোগও চাই। ঠিক কথা। কিন্তু ও-দুটো বস্তু কি শুধু সদানন্দেরই ছিল? আর-কারও ছিল না?'

কৌশিক বলল, 'থাকতে পারে, না-ও থাকতে পারে। তবে সদানন্দবাবুর যে দুটোই ছিল, সেটা মিথ্যে নয়। তার ওপরে আবার ওই যে ওখানে লোহার বল লাগানো লাঠিটা পাওয়া গেল, সামন্তর সন্দেহ তার ফলে আরও জোরদার হয়েছে।'

'অর্থাৎ একেবারে ওয়ান-ট্র্যাক মাইন্ডের ব্যাপার। কিন্তু চোখ তো আর একটা নয়। তা হলে কথামালার সেই একচক্ষু হরিণের মতো শুধু একটা দিকেই দেখছে কেন?'

কৌশিক বলল, 'কী জানি। লাঠিটা অবশ্য দাঁড়াচ্ছে না।'

ভাদুড়ীমশাই বললেন, 'সে তো বুঝলুম। কিন্তু আমি ভাবছি অন্য কথা। হ্যাঁ রে, কৌশিক, তুই তো আজ সকালে আমার নাম করে টেলিফোনে সামন্তর সঙ্গে কথা বললি। জেরায় কে কী বলেছে, সেটা বোঝা গেল?'

'সামন্ত কিছু বললে তবে তো বুঝব। আমাকে তো কিছু জানাতেই চায় না। যা-ই জানতে চাই, উত্তরে শুধু বলে যে, বিকেলে তো যাচ্ছিই, তখন সিসিবিকে সব বলা যাবে।'

'ঠিক আছে।'

ভাদুড়ীমশাই একটা সিগারেট ধরালেন।

আমি বললুম, 'সিগারেটটা এখনও ছাড়তে পারলেন না?'

'আপনি ছেড়েছেন?'

'একেবারে যে ছেড়েছি, তা বলতে পারব না। তবে কমিয়েছি।'

'আমিও গোটা চার-পাঁচেকের বেশি খাই না।'

কৌশিক বলল, 'আমি তা হলে নিজের ঘরে যাই মামাবাবু?'

ভাদুড়ীমশাই হেসে বললেন, 'সিগারেটের কথা শুনেই উঠে পড়বার ইচ্ছে হল বুঝি? যা তা হলে, খেয়ে আয়। তবে বেশি দেরি করিস না।'

কৌশিক রেগে গিয়ে বলল, 'কী যে বলো! ওই সব ছাইভস্ম আমি খাই নাকি? ওর চেয়ে একটা রসগোল্লা খাওয়া ভালো।'

'রসগোল্লাও একটা-দুটোর বেশি খাস না। জানিস তো সর্বমত্যন্তং গর্হিতম। কোনও কিছুরই আতিশয্য ভালো নয়। যেমন অন্যসব ব্যাপারে, তেমনি খাওয়ার ব্যাপারেও এটা একেবারে খাঁটি কথা। যা-ই হোক, সিগারেট খাওয়ার তাড়া যখন নেই, তখন একটু বোস, তোর সামনেই কিরণবাবুকে

দু-একটা কথা জিগ্যেস করি। সদানন্দবাবুর ব্যাপারে ওঁর মতামতও তোর শুনে রাখা ভালো।'

আমি বললুম, 'কী জিগ্যেস করবেন করুন, আমি যা জানি সবই আপনাকে খোলাখুলি বলব।'

ভাদুড়ীমশাই বললেন, 'দেখুন মশাই, নকুলচন্দ্র কীভাবে কখন মারা গেল, আর এটা যদি খুনের ব্যাপারই হয়, তাহলে কে-ই বা খুন করল তাকে, তার বিন্দুবিসর্গও আপনার জানবার কথা নয়। তার কারণ, ঘটনাটা যখন ঘটে, তখন সেখানে আপনি ছিলেন না। সুতরাং ও-ব্যাপারে আপনাকে কিছু জিগ্যেস করে কোনও লাভ নেই, আর তা আমি করছিও না। আমি আপনাকে এমন প্রশ্ন করব, যার উত্তর দেওয়া আপনার পক্ষে সম্ভব।'

'বেশ তো, তা-ই করুন।'

'সদানন্দবাবুকে আপনি কতদিন ধরে চেনেন?'

'যতদিন ও-পাড়ায় আছি, ততদিন ধরেই চিনি। তা ধরুন, দশ বছর তো হলই।'

'লোকটিকে আপনার কেমন লাগে?'

'ভালোই তো লাগে। গায়ে পড়ে একটু উপদেশ-টুপদেশ দেন ঠিকই, 'এটা খাবেন না, ওটা করবেন না' বলেন, তা সেও তো আমাদের ভালোর জন্যেই বলেন। না মশাই, লোকটি খারাপ নন, পরোপকারী সজ্জন সদালাপী মানুষ।'

'উনি কাউকে খুন করতে পারেন বলে আপনার মনে হয়?'

'সেইটে ভেবেই তো কূলকিনারা পাচ্ছি না। এটা ঠিকই যে, নকুলচন্দ্রকে উনি তুলে দিতে চাইছিলেন। ওর জল আর লাইটের কানেকশন যে কেটে দিয়েছিলেন, সেটাও মিথ্যে নয়। তা ছাড়া, নকুলের ডেডবডি তো কাল সকালে সিঁড়ির নীচে পড়ে থাকতে দেখা গেল, তার মাত্র দু-দিন আগে অর্থাৎ বিষ্যুতবার সকালে আমার বৈঠকখানা থেকে বেরিয়ে আসবার সময় উনি এমন কথাও বলেছিলেন যে, কিছুতেই যখন নকুলচন্দ্রকে তাড়ানো যাচ্ছে না, তখন দরকার হলে ওঁর ওই লোহার বল বসানো লাঠিটা দিয়েই উনি নকুলের মাথা ফাটিয়ে ছাড়বেন।'

'এটা আপনি গঙ্গাধর সামন্তকে বলেছেন?'

'না, এটা বলিনি। তবে কথাটা উনি আমাকে যেমন বলেছিলেন, তেমনি আরও দু-চারজনকেও বলে থাকতে পারেন। তাদের কেউ গঙ্গাধর সামন্তকে এটা জানিয়েছে কি না, বলতে পারব না।'

'ঠিক আছে। আর-কেউ যদি বলে থাকে তো বলুক, আপনার অন্তত এক্ষুনি এটা জানিয়ে কাজ নেই। না-না, পুলিশের কাছ থেকে কোনও তথ্য আমি আপনাকে গোপন করতে বলছি না। অন্য-কোনও সূত্রে এই খবরটা জেনে তারপর পুলিশ যদি আপনার কাছে এটার করোবরেশান চায়, তো তখন আপনাকে বলতেই হবে যে, হ্যাঁ, আপনার কাছেও অমন কথা সদানন্দ বলেছিলেন বটে। কিন্তু সেটা তো তারা এখনও চায়নি, তাই আপনারও আগ বাড়িয়ে কিছু বলবার দরকার নেই।'

'এটা বলছেন কেন?'

'এইজন্যে বলছি যে, সদানন্দের গলায় তা হলে ফাঁসটা আরও শক্ত হয়ে এঁটে যাবে। কৌশিক যে-পথটার কথা ভাবছে, সেইটে ধরে এগিয়ে তখন আর বিশেষ লাভ হবে না। সেইজন্যেই বলছি, আপাতত আপনি চুপ করে থাকুন। নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন যে, যাকে সাপ্রেশান অভ এভিডেন্স বলে, এটা মোটেই সেই পর্যায়ে পড়ে না।'

'কৌশিক কোন পথের কথা ভাবছে?'

ভাদুড়ীমশাই বললেন, 'সেটা এখন আপনার জেনে কোনও লাভ নেই। কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তর এখনও পাইনি।'

'কী প্রশ্ন?' যা-যা বলছেন, সব কিছুরই তো উত্তর দিয়ে যাচ্ছি।'

'একটা প্রশ্নের উত্তর পাইনি। সদানন্দবাবু যে আদৌ কাউকে খুন করতে পারেন, এটা আপনার বিশ্বাস হয়?'

'বড় ভাবনায় ফেললেন দেখছি।'

'বেশি ভাবনাচিন্তা করবেন না। ভাবনাচিন্তা না করে যা বলবেন, সেটাই আমার শোনা দরকার।'

পকেট থেকে প্যাকেটটা বার করে একটা সিগারেট ধরালুম। বুকের মধ্যে ধোঁয়া টেনে নিলুম অনেকটা। তারপর আস্তে-আস্তে ধোঁয়াটা ছেড়ে দিয়ে বললুম, 'দেখুন মশাই, নজিরের অভাব নেই। এমনিতে যাকে নেহাত নিরীহ গোবেচারা কি ভালোমানুষ বলে মনে হয়, সেও যে খুন করতে পারে, করেছে, এমন ঘটনার কথা আপনিও জানেন, আমিও জানি। শেষপর্যন্ত হয়তো আদালতে এই গঙ্গাধর সামন্তই প্রমাণ করে ছাড়বে যে, আমাদের সদানন্দবাবুও আসলে একেবারে সেই রকমের একজন মানুষ। ওপরে-ওপরে খুবই ভদ্র, খুবই শান্ত, খুবই নিরীহ, কিন্তু ভেতরে-ভেতরে যেমন নির্মম, তেমনি নিষ্ঠুর। কিন্তু তবু বলছি, না, সত্যিই যে উনি কাউকে খুন করতে পারেন, তা আমি বিশ্বাস করি না।'

কৌশিক বলল, 'বাস-বাস, এইটুকুই আমার জানবার দরকার ছিল। জানো মামাবাবু, লোকটিকে দেখে সত্যি আমার বড় মায়া হচ্ছিল। খালি মনে হচ্ছিল, লোকটা বোকা; বোকামি করে একটা জালের মধ্যে জড়িয়ে গেছে, এখন আর জাল কেটে বেরুতে পারছে না।'

আমি বললুম, 'কৌশিক সম্ভবত ঠিক কথাই বলেছে।'

কলিং বেল বেজে উঠল।

ভাদুড়ীমশাই বললেন, 'খুব সম্ভব গঙ্গাধর সামন্ত।'

॥ ১৩ ॥

গঙ্গাধব সামন্ত একা আসেননি, ডাক্তাব গুপ্তকেও নিয়ে এসেছেন। সুরেশ গুপ্ত যে ভাদুড়ীমশাইকে ভালোই চেনে, কালই তিনি সে-কথা বলেছিলেন। তবে তাঁকে দেখবামাত্রই 'আরে সুরেশবাবু, আপনি?' বলে ছুটে এসে ভাদুড়ীমশাই যে-ভাবে তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন, তাতেই বুঝতে পারলুম যে, এটা নেহাত চেনা-জানার ব্যাপার নয়, এককালে দুজনের সম্পর্ক রীতিমতো ঘনিষ্ঠই ছিল।

যে-ঘরে ভাদুড়ীমশাই থাকেন, এতক্ষণ আমরা সেই ঘরে বসে কথাবার্তা বলছিলুম। এবারে সবাই বাইরের ঘরে এসে বসা গেল। চৈত্রমাস, সারা দিন বেশ গরম গেছে, ভেবেছিলুম যে, বিকেলের দিকে ঝড় উঠতে পারে, কিন্তু ওঠেনি; একটু-একটু মেঘ জমছিল বটে, কিন্তু এলোমেলো হাওয়ার দাপটে সে-মেঘ স্রোতের মধ্যে নোঙর-ছেঁড়া নৌকোর মতো কোথায় যে ভেসে গেল তার ঠিক-ঠিকানা নেই, বিকেলবেলার আকাশ এখন আবার আয়নার মতো ঝকঝক করছে।

কাজের লোকটির হাত দিয়ে মালতী পাঁচ গ্লাস ঘোলের শরবত পাঠিয়ে দিয়েছিল। গঙ্গাধর সামন্ত তাঁর শরবতের গ্লাসে চুমুক দেবার আগে দু-গ্লাস জলও খেয়ে নিলেন। তারপর রুমাল বাব করে ঘাড় আর কপালের ঘাম মুছে বললেন, 'উঃ গরমে একেবারে মরে গেলুম।'

খানিক বাদেই জলখাবার এসে গেল। খেতে-খেতে যেমন কুশল-জিজ্ঞাসা আর পারস্পরিক বার্তা-বিনিময় চলতে লাগল, তেমনি অন্যরকমের টুকটাক কথাও হল কিছু-কিছু। তারপর ভাদুড়ীমশাই-ই একসময়ে বললেন, 'এবারে তা হলে পীতাম্বর চৌধুরি লেনের ওই ব্যাপারটার কথায় আসা যাক, কেমন? মিস্টার সামন্ত, আপনাকে যদি এই প্রসঙ্গে গোটা কয়েক প্রশ্ন করি, তা হলে তার উত্তর দিতে আপনার আপত্তি হবে না তো? তা যদি হয়, তো এখনই বলুন, সে-ক্ষেত্রে আর আপনাকে আমি বিব্রত করব না।'

সামন্ত বললেন, 'দেখুন মিস্টার ভাদুড়ী, এ-ব্যাপারে আমার তরফে যেটা বলবার কথা, সেটা

খোলাখুলি বলা-ই ভালো। সরকারি নিয়মকানুন তো আপনার জানাই আছে। আপনি খুব ভালোই জানেন যে, এসব ব্যাপার নিয়ে বাইরের কারও সঙ্গে কথা বলতে আমি বাধ্য নই, সাধারণত তা আমি বলিও না। তবে কিনা আপনার কথা আলাদা।'

ভাদুড়ীমশাই বললেন, 'কেন কেন, আমিই বা আর-পাঁচজনের থেকে আলাদা হলুম কিসে?'

গঙ্গাধর সামন্ত কিন্তু হাসলেন না। বললেন, 'কথাটা আমার নয়, আমার উপরওয়ালার। আপনি যে এই পীতাম্বর চৌধুরি লেনের ব্যাপারটা নিয়ে আমার সঙ্গে কথা বলতে চান, আপনার ভাগ্নের ফোন পাবার পরে এটা আমার উপরওয়ালাকে আমি সঙ্গে-সঙ্গেই জানিয়েছিলুম। জিগ্যেস করেছিলুম যে, এ-ব্যাপারে যে-সব তথ্য ইতিমধ্যে আমাদের হাতে এসেছে, আপনাকে তা আমি জানাতে পারি কিনা।'

'তিনি তাতে কী বললেন?'

'বললেন যে, নর্মালি উই ডোন্ট ডু দিস, তবে কিনা মিস্টার ভাদুড়ীর কথা আলাদা, হি হ্যাজ অলওয়েজ কোঅপারেটেড উইথ আস। সো গো অ্যাহেড অ্যান্ড টক টু হিম অ্যান্ড সি ইফ হি ক্যান হেলপ আস ইন এনি ওয়ে।'

'সব কথাই আমাকে খুলে বলতে বলেছেন তিনি?'

'তা-ই তো বললেন। আপনার কাছে নাকি কোনও কিছুই গোপন রাখবার দরকার নেই। বললেন যে, গিভ হিম অল দি ইনফর্মেশন অ্যান্ড ইন্টেলিজেন্স দ্যাট উই হ্যাভ উইথ আস; দেয়ার'স অ্যাবসলিউটলি নো নিড টু হোল্ড এনিথিং ব্যাক।'

'বাঃ,' ভাদুড়ীমশাই বললেন, 'তা হলে তো কোনও কথাই নেই। তা হলে শুরু করি, কেমন?'

সামন্ত বললেন, 'তার আগে এখানে আব-যাঁরা উপস্থিত আছেন, তাঁদেব একটা কথা জানিয়ে রাখি। ব্যাপারটা এখন যে-স্টেজে রয়েছে, তাতে কোনও-কিছুই ফাঁস হওয়াটা উচিত হবে না, হলে আমি তো বিপদে পড়বই, অন্য কিছু সমস্যাও দেখা দিতে পাবে। সুতরাং আপনারা আমাকে কথা দিন যে, যা-যা আমি বলব, তা শুধু আপনারাই জানবেন. আর কেউ নয়।'

সামন্ত যদিও 'আর-যাঁরা' 'আপনারা' ইত্যাদি সব শব্দ ব্যবহার করছিলেন, তবু বুঝতে আমার অসুবিধে হল না যে, তাঁর কথাগুলি আসলে একান্তভাবে আমাকেই বলা। আমি খবরের কাগজে কাজ কবি, তাই ভদ্রলোক সম্ভবত ভয় পাচ্ছেন যে, এই নিয়ে আমাদের কাগজে কিছু বেরিয়ে যেতে পারে।

বললুম, 'আপনারা কথাবার্তা বলুন, আমি বরং ঘণ্টাখানেকেব জন্যে একটু বাইরে যাই।'

ভাদুড়ীমশাই হেসে বললেন, 'আরে বসুন, বসুন।' তারপর সামন্তর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'নিশ্চিন্ত থাকুন; কিরণবাবু তো দীর্ঘদিন ধরে আমার সঙ্গে রয়েছেন, ফাঁস করতে হলে ঢের-ঢের এক্সপ্লোসিভ ব্যাপার উনি ফাঁস করে দিতে পারতেন। তা যখন করেননি, তখন এটাও করবেন না।'

সামন্ত একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'বাঁচালেন মশাই। ঠিক আছে, এবাবে তা হলে বলুন যে, আপনি কী জানতে চান।'

ভাদুড়ীমশাই বললেন, 'লাশ পরীক্ষা করা হয়েছে?'

'সে তো কালই হয়েছে।'

'রিপোর্টটা পাওয়া গেছে নিশ্চয়?'

'হ্যাঁ, তাও পেয়েছি।' সামন্ত বললেন, 'তবে গুপ্তসাহেব নিজেই যখন উপস্থিত রয়েছেন এখানে, তখন আমি আর এ-ব্যাপারে কিছু বলব না; যা বলবার উনিই বলুন।'

ডাক্তার গুপ্ত বললেন, 'শরীরটা চিৎ হয়ে পড়ে ছিল। ওইভাবে পড়ে যাবার ফলে যদি মাথা ফেটে থাকে, তা হলে মাথার পিছন দিকটা ফাটত।'

ভাদুড়ীমশাই বললেন, 'এমন যদি হয় যে, লোকটা উপুড় হয়ে পড়ে মাথা ফাটিয়েছিল, কিন্তু

পরে তার শরীরটাকে চিৎ করে দেওয়া হয়েছে?'

'সে-ক্ষেত্রে ফাটত মাথার সামনের দিক, অর্থাৎ কপালের দিক। কিন্তু এখানে দেখছি, মাথাটা সামনের দিকেও ফাটেনি, পিছনের দিকেও না। ফেটেছে একেবারে খুলির ওপরের দিকটা। ওই যাকে আমরা চাঁদি বলি।'

এসব কথা কালই আমরা শুনেছি। কৌশিকের কাছে ভাদুড়ীমশাইও নিশ্চিত শুনে থাকবেন। তবু তিনি এমন একটা ভাব দেখাচ্ছেন, যেন কিছুই জানেন না। বললেন, 'বটে? তা এ থেকে আপনার কী মনে হয়?'

'একটাই মাত্র কথা মনে হয়। সেটা এই যে, ওপর থেকে ভারী কিছু মাথার ওপরে পড়লে কিংবা ওপরথেকে ভারী কিছু দিয়ে কেউ মাথার ওখানে আঘাত করলে তবেই মাথার ওই জায়গাটা ও-ভাবে ফাটতে পারে। তা ওখানে তো মাথার ওপরে ফ্যান কিংবা ঝাড়লণ্ঠন ছিল না, তাই ওপর থেকে অমন কিছু খসে পড়বারও প্রশ্ন এ-ক্ষেত্রে উঠছে না। তা হলে আর এটাকে দুর্ঘটনা বলে কি হঠাৎ পড়ে গিয়ে মাথা ফাটবার ব্যাপার বলে মেনে নিই কী করে? একটাই মাত্র সিদ্ধান্ত এ-ক্ষেত্রে করতে পারি। সেটা হল ঃ ইট'স এ ক্লিয়ার কেস অভ মার্ডার।'

'সেটা কীভাবে করা হল বলে আপনার মনে হয়?'

'ভারী কিছু দিয়ে খুব জোরে ওর মাথায় আঘাত করা হয়েছিল। আঘাতটা কিন্তু একই লেভেলে সামনে কিংবা পিছনে দাঁড়িয়ে করা হয়নি, করা হয়েছিল একটু ওপর থেকে। একই লেভেলে দাঁড়িয়ে যে সেটা করা যায় না, তা অবশ্য নয়। যাকে আঘাতটা করা হচ্ছে, তার চেয়ে যদি যে আঘাত করছে তার হাইট আরও অন্তত ফুটখানেক বেশি হয়, তো একই লেভেলে দাঁড়িয়েও সেটা করা যেতে পারে। কিন্তু তেমন কোনও সম্ভাবনাকেও এ-ক্ষেত্রে আমল দিতে পারছি না।'

'একথা কেন বলছেন?'

ডাক্তার গুপ্ত বললেন, 'এইজন্যে বলছি যে, যাকে খুন করা হয়েছে, তার হাইট পাক্কা ছ'ফুট। একই লেভেলে দাঁড়িয়ে তার মাথার ওই জায়গায় যদি আঘাত করতে হয় তো খুনির অন্তত সাত ফুট লম্বা হওয়া দরকার। তা ওরকম লম্বা লোক আমেরিকান বাস্কেট-বল টিমে অনেক থাকতে পারে, আমাদের দেশে খুব বেশি খুঁজে পাওয়া যাবে না।'

কৌশিক বলল, 'আমি একটা কথা বলতে পারি?'

ডাক্তার গুপ্ত বললেন, 'নিশ্চয়, নিশ্চয়।'

কৌশিক বলল, 'ওই যে আপনি এক ফুট ব্যবধানের কথা বলছেন, ওটা তো কৃত্রিমভাবেও তৈরি করে নেওয়া হতে পারে?'

ডাক্তার গুপ্ত বললেন, 'একটু বুঝিয়ে বলো তো বাবা।'

কৌশিক বলল, 'ধরুন একই লেভেলে দাঁড়িয়ে মাথার ওইখানটায় আঘাত করে আমি যদি কাউকে মারতে চাই, তো তার জন্যে আমাকে সত্যি-সত্যি তার চেয়ে আরও এক ফুট বেশি লম্বা হতে হবে কেন? সে যদি একটা চেয়ারে বসে থাকে, আর আমি থাকি দাঁড়িয়ে, তা হলেই তো আমাদের দুজনের দৈর্ঘ্য এক হওয়া সত্ত্বেও, কি তার চেয়ে আমি ইঞ্চি কয়েক খাটো হওয়া সত্ত্বেও, কার্যত আমি তার চেয়ে অন্তত তখনকার মতো এক ফুট বেশি লম্বা হয়ে যাচ্ছি। কিংবা তাকে চেয়ারেই বা বসতে হবে কেন? সে না হয় দাঁড়িয়েই থাক। কিন্তু সে-ক্ষেত্রেও ওই এক ফুট আমি গেইন করতে পারব, যদি কিনা একটা টুলের ওপরে দাঁড়িয়ে আমি তাব মাথা ফাটাই।'

ডাক্তার গুপ্ত বললেন, 'ওয়েল ইউ হ্যাভ এ পয়েন্ট দেয়ার। এ ভেরি গুড পয়েন্ট ইনডিড। এদিক থেকেও ব্যাপারটা আমাদের ভেবে দেখা উচিত ছিল।'

গঙ্গাধর সামন্তকে একটু গম্ভীর দেখাচ্ছিল। তিনি বললেন, 'আমি যে এটা একেবারেই ভেবে দেখিনি, তা কিন্তু নয়। কিন্তু চেয়ারে বসে থাকার কথাটা এখানে খাটছে না। অত রাত্তিরে একটা

লোক ওখানে চেয়ারে বসে থাকবে কেন? আর টুলের ওপরে দাঁড়িয়েই বা খুন করবার দরকার কী, সিঁড়ির দু-ধাপ ওপরে দাঁড়িয়েই তো সেটা করা যায়। কী গুপ্তসাহেব, যায় না?

ডাক্তার গুপ্ত বললেন, 'যায় বইকী, নিশ্চয়ই যায়।'

সামন্ত বললেন, 'খুনি আর তা হলে অনর্থক টুল নিয়ে টানাটানি করতে যাবে কেন?'

ভাদুড়ীমশাই বললেন, 'ঠিক আছে, আপাতত এটাকে আমি খুন বলেই ধরে নিচ্ছি। তা সেটা কখন হয়েছে বলে আপনাদের ধারণা?'

ডাক্তার গুপ্ত বললেন, 'একেবারে একজ্যাক্ট সময় তো বলা সম্ভব নয়। লাশ পরীক্ষা করে মনে হচ্ছে, ঘটনাটা ঘটেছে মোটামুটি তিনটে নাগাদ। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে একটু মার্জিন তো রাখতেই হয় আমাদের, তাই একেবারে নিশ্চিত হয়ে যা বলা সম্ভব, সেটা এই যে, ব্যাপারটা ঘটেছে রাত দুটো থেকে চারটের মধ্যে।'

আমি বললুম, 'আড়াইটের আগে ঘটেনি।'

সামন্ত বললেন, 'একথা আপনি বলছেন কেন?'

'এইজন্যে বলছি যে, নকুল সেদিন রাত একটা নাগাদ বাড়ি ফিরেছিল বটে, কিন্তু চেঁচামেচি করেছিল দুটো পর্যন্ত।'

'কী করে জানলেন? আপনি কি তখন জেগে ছিলেন নাকি?'

'আমি জেগেছিলুম না, কিন্তু আমার মেয়ে জেগেছিল।...না-না, তার ইনসমনিয়া নেই, আসলে সামনেই তার বি.এ. ফাইনাল, তাই অন্তত রাত দুটো পর্যন্ত সে এখন লেখাপড়া করে। কখনও কখনও আড়াইটেও বেজে যায়। তার ঘরও একেবারে রাস্তার ধারেই। সেদিন সে ভেবেছিল যে, তিনটের আগে ঘুমোবে না। কিন্তু বাড়ি ফিরে নকুল সেদিন এমন হইচই লাগিয়ে দিয়েছিল যে, আমার মেয়ের পড়াশুনো একেবাবে মাথায় উঠে যায়। আলো নিবিয়ে সে শুয়ে পড়ে। তার আগে টেবিল-ক্লকে অ্যালার্মের কাঁটা ঘোরাতে গিয়ে দেখতে পেয়েছিল যে, রাত তখন দুটো পঁচিশ।'

সামন্ত বললেন, 'এই ব্যাপারে দেখছি সদানন্দবাবুর কথার সঙ্গে আপনার মেয়ের কথাটা মোটামুটি ট্যালি করে যাচ্ছে।'

বললুম, 'জানি। কাল সকালে আপনি এসে পৌঁছবার আগে সদানন্দবাবুও কথাটা আমাকে বলেছিলেন। পরে দেখলুম আপনার জেরার উত্তরেও উনি একই কথা বললেন, তা ছাড়া, আর-একটা কথাও বলেছেন উনি। সেটা এই যে, রাত তিনটে নাগাদ উনি একতলায় কোনও ভারী কিছু পড়ে যাবার শব্দ পান। কথাটা, যদ্দুর মনে করতে পারছি, আপনাকেও উনি বলেছেন। তাই না?'

সামন্ত তাঁর অ্যাটাশে-কেস খুলে একটা নোটবই বার করলেন। ওই যাতে স্টেনোরা ডিক্টেশান নিয়ে থাকেন, সেই রকমের ছোট-সাইজের খাতা আর কী। খুব দ্রুত তার কয়েকটা পাতা উলটে গিয়ে এক-জায়গায় হঠাৎ থেমে গেলেন তিনি। সেখানে যা লেখা ছিল, তার ওপরে চোখ বুলিয়ে নিলেন। তারপর বললেন, 'হ্যাঁ, কথাটা তিনি আমাকেও বলেছেন।'

ভাদুড়ীমশাই বললেন, 'একতলায় নকুল ছাড়া আর কে-কে থাকে যেন?'

বললুম, 'নকুলের বউ যমুনা, মেয়ে কমলি আর যমুনার দাদা বিষ্টুচরণ থাকে।'

ভাদুড়ীমশাই সামন্তের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এই যে রাত তিনটে নাগাদ একতলায় কিছু-একটা পড়ে যাবার শব্দ হয়েছিল, অন্তত হয়েছিল বলেই সদানন্দবাবু জানাচ্ছেন, এটা নিয়ে কি যমুনা আর তার দাদাকে কোনও প্রশ্ন করেছেন আপনি?'

সামন্ত বললেন, 'স্পেসিফিক্যালি যে এইটে নিয়ে কোনও প্রশ্ন করেছি, তা নয়। তবে অন্য অনেক প্রশ্ন তো করেছি, যমুনা আর বিষ্টুচরণ তার উত্তরও দিয়েছে। সে-রাতে যা হয়েছিল, উত্তরগুলো থেকে মোটামুটি তা আন্দাজও করা যায়। মানে একটা ছবি তার থেকে বেরিয়ে আসে ঠিকই।'

'যমুনা কী বলছে? সব কথা বলবার দরকার নেই, জরুরি পয়েন্টগুলোই শুধু জানতে চাইছি।'

'যমুনা বলছে, নকুলচন্দ্র রোজই দেরি করে ফিরত, সেদিনও দেরি করেই ফিরেছিল, তবে সেদিন তার ফিরতে-ফিরতে একটা বেজে গিয়েছিল কিনা, তা সে বলতে পারবে না। ফিরে যে অনেকক্ষণ চেঁচামেচি করেছিল, তাও ঠিক। তার ভাত ঢাকা দেওয়া থাকে, কিন্তু সেদিন আর সে ভাত-টাত খায়নি। বেশ কিছুক্ষণ চেঁচামেচি করে ঘরে ঢুকে ঘুমিয়ে পড়েছিল।'

'ভালো কথা। তারপর?'

'এই পর্যন্ত যা বলা হল, তার মধ্যে কোনও গোলমাল নেই। গোলমাল ঘটছে তার স্টেটমেন্টের শেষ-দিককার অংশটা নিয়ে।'

'সেটা কী?'

সামন্ত একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, 'যমুনা বলছে, রোজই রাত তিনটে থেকে সাড়ে তিনটের মধ্যে তার স্বামী একবার বাথরুমে যেত। তারপর বাথরুম থেকে ফিরে এসে আবার ঘুমিয়ে পড়ত। তবে কিনা বেশিক্ষণের জন্যে নয়। খানিকক্ষণ ঘুমিয়েই ফের উঠে পড়তে হত তাকে। খুচরো দোকানিরা সাত-সকালে পাইকিরি দরে মাছ কিনতে আসত, সেইজন্যেই বেশিক্ষণ ঘুমিয়ে থাকা চলত না।'

কৌশিক বলল, 'লোকটা রাত করে ফিরত, আবার উঠেও পড়ত সকাল-সকাল। তা হলে ঘুমোত কখন?'

'যমুনা বলছে, রাত্তিরে তো সাধারণত ঘণ্টা তিনের বেশি ঘুমোত না, তাই দুপুরবেলায় টানা আবার ঘণ্টা কয়েক ঘুমিয়ে নিত।'

ভাদুড়ীমশাই বললেন, 'তা এর মধ্যে গোলমালটা ঘটছে কোথায়?'

সামন্ত বললেন, 'সেদিনও রাত তিনটে নাগাদ লোকটা বাথরুমে গিয়েছিল কিনা, যমুনা সেটা বলতে পারছে না।'

ডাক্তার গুপ্ত বললেন, 'গিয়েছিল নিশ্চয়। খুনের সময় তো দুটো থেকে চারটের মধ্যে। তা সেইসময় ঘর থেকে ওকে টেনে বাইরে নিয়ে এসে তো আর কেউ খুন করেনি। আর খুনটা যে ঘরের মধ্যে করে তারপর শরীরটাকে বাইরে টেনে নিয়ে এসে সিঁড়ির তলায় ফেলে রাখা হয়নি, তাও তো ও-ঘরের বিছানাপত্র পরীক্ষা করেই বোঝা গিয়েছে। তা ছাড়া এটাও ভেবে দেখুন যে, ঘর থেকে ওকে টেনে নিয়ে গেলে কি ঘরের মধ্যেই খুন করে লাশটাকে টেনে বাইরে নিয়ে গেলে তো ওর বউই সেটা টের পেয়ে যেত। তা কিন্তু যমুনা টের পায়নি।...না মশাই, নির্ঘাত ও তখন বাথরুমে গিয়েছিল। তারপর বেরিয়ে এসে খুন হয়।'

কৌশিক বলল, 'বাথরুমে হয়তো ঢোকেইনি, সেখানে যাবার পথেই হয়তো খুন হয়েছে। তাও কিছু বিচিত্র নয়।'

ভাদুড়ীমশাই বললেন, 'যমুনা কী বলছে?'

সামন্ত বললেন, 'যমুনা বলছে, রোজই তো বাথরুমে যেত। তবে সেদিনও গিয়েছিল কিনা, তা সে জানে না। তার কারণ, রাত-দুপুরে নকুলের চিৎকার-চেঁচামেচিতে তার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু নকুল এসে ঘরে ঢুকে ঘুমিয়ে পড়বার পর সে নিজেও আবার ঘুমিয়ে পড়েছিল। ভোর পাঁচটায় সদানন্দবাবুর চিৎকার শুনে সে জেগে ওঠে, তার আগে আর তার ঘুম ভাঙেনি।'

ডাক্তার গুপ্ত ভাদুড়ীমশাইয়ের দিকে তাকালেন। বললেন, 'আপনার কী মনে হয়? যমুনা যা বলছে, সেটা সত্যি?'

ভাদুড়ীমশাই বললেন, 'সত্যি তো হতেই পারে, তবে মিথ্যে হওয়াও বিচিত্র নয়।'

'যমুনা কেন মিথ্যেকথা বলবে?'

'জেগে থাকলেও সে-কথা স্বীকার করা সম্ভব নয় বলেই বলবে। ধরুন, নকুল সেদিনও তার অভ্যেসমতো রাত-তিনটে নাগাদ একবার বাথরুমে গিয়েছিল। ধরুন, যমুনা সেটা টেরও পেয়েছিল।

তা আমরা এখন জেনে গেছি যে, নকুলের মৃত্যু ঘটেছিল মোটামুটি ওই সময়েই। তো যমুনা যদি স্বীকার করে যে, সে তখন জেগে ছিল, তা হলে প্রশ্ন উঠবে, ওই সময়ে তার স্বামীর মাথা ফাটল, লোকটা মেঝের ওপরে পড়ে যাবার ফলে শব্দও হল একটা, তা হলে জেগে থাকা সত্ত্বেও যমুনা কিছু টের পেল না কেন?'

সামন্ত বললেন, 'আমার ধারণা যমুনা মিথ্যে কথা বলেনি। সত্যি সে ঘুমিয়েই ছিল তখন, নইলে শব্দটা শুনে সে ছুটে আসত নিশ্চয়।'

ভাদুড়ীমশাই বললেন, 'আপনার ধারণা সত্যি হলে কি তদন্তের কোনও সুবিধে হয়?'

'হয় বইকী,' সামন্ত বললেন, 'ব্যাপারটাকে যে-ভাবে আমি রিকনস্ট্রাক্ট করেছি, সেটা তা হলে জোর পায়।'

কৌশিক বলল, 'কীভাবে রিকনস্ট্রাক্ট করেছেন, একটু বুঝিয়ে বলুন।'

॥ ১৪ ॥

সামন্ত বললেন, 'নকুলচন্দ্র যে রোজই রাত তিনটে থেকে সাড়ে তিনটের মধ্যে বাথরুমে যেত, আমার ধারণা সদানন্দ সেটা জানতেন। গভীর রাত, কেউ কোথাও জেগে নেই, খুন করবার পক্ষে এর চেয়ে চমৎকার সময় আর কী হতে পারে। আমার বিশ্বাস, সদানন্দ এর মধ্যে ঠিক করে ফেলেছিলেন যে, অনেক চেষ্টা করেও নকুলকে যখন তাড়ানো যাচ্ছে না, তখন তাকে খুনই করবেন তিনি। সেইজন্যেই সেদিন মোটামুটি তিনটে নাগাদ তাঁর দোতলার ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ির পাশে দাঁড়িয়ে তিনি অপেক্ষা করতে থাকেন। একতলার ঘর থেকে নকুল বেরিয়ে এল। বাথরুমে ঢুকল। বাথরুমের মধ্যে আলো জ্বলে উঠল। সদানন্দও তাঁর লোহার বল বসানো লাঠিটা হাতে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নিঃশব্দে কয়েক ধাপ নীচে নেমে এলেন। বাথরুমের আলো নিবিয়ে নকুল যখন সিঁড়ির পাশ দিয়ে তার ঘরের দিকে যাচ্ছে, ঠিক তখনই সদানন্দ তার মাথা ফাটিয়ে দেন। নকুল একটা চিৎকার করবারও সুযোগ পায়নি, মাথায় লাঠির বাড়ি পড়বার সঙ্গে-সঙ্গেই সে মেঝের ওপরে লুটিয়ে পড়ে।'

কৌশিক বলল, 'কাট! এই দৃশ্যটা আবার নতুন করে টেক করতে হবে। কিন্তু তার আগে স্ক্রিপ্টের এই অংশটা একটু অন্যভাবে লেখা দরকার।'

সামন্ত বললেন, 'তার মানে?'

কৌশিক বলল, 'মানে আর কী, ব্যাপারটা একেবারে ফিল্মের স্ক্রিপ্টের মতো লাগছে। এইখানে যদি "ক্যাঁত্যাচ" করে একটা দরজা খোলার সাউন্ড লাগিয়ে দেন, কি সদানন্দবাবু তার ঘর থেকে বেরিয়ে আসবার ঠিক আগেই যদি ক্যামেরা চার্জ করে দেখিয়ে দেন যে, একটা দেওয়াল-ঘড়ির ছোট কাঁটাটা তিনটের ঘরে এসে পৌঁছেছে, তো সে ভারী জমাট ব্যাপার হবে।'

সামন্ত বললেন, 'অর্থাৎ আমার থিয়োরিটা আপনার বিশ্বাসযোগ্য ঠেকছে না, কেমন?'

কৌশিক কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু ভাদুড়ীমশাই এমন কটমট করে তার দিকে তাকালেন যে, সে আর মুখ খুলল না।

ভাদুড়ীমশাই তখন সামন্তর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এসব ছেলেছোকরাদের বিশ্বাস-অবিশ্বাসে কিছু যায় আসে না, মিস্টার সামন্ত। আপনি যা বলছেন বলুন। নকুল তো মেঝের ওপর লুটিয়ে পড়ল। তারপর?'

সামন্ত বললেন, 'তারপর আর কী, যমুনা আর বিষ্টুচরণ যদি তখন জেগে থাকত, তা হলে মেঝের ওপর নকুলের পড়ে যাবার শব্দ শুনেই তারা যে-যার ঘর থেকে ছুটে আসত নিশ্চয়। কিন্তু কপাল ভালো সদানন্দবাবুর। দুজনেই তখন ঘুমিয়ে ছিল। নকুলচন্দ্রের পড়ে যাবার শব্দ তারা শোনেনি,

তাই ছুটেও আসেনি।'

'তারপর?'

'কাজ সমাধা করে সদানন্দ আবার নিঃশব্দে ওপরে যান; উঠে গিয়ে বেশ-খানিকক্ষণ সেখানে কাটিয়ে তারপর রোজকার মতোই পাঁচটা বাজবার খানিক আগে আবার নীচে নেমে আসেন। চিৎকারটাও করে ওঠেন তখনই। এমন একটা ভাব দেখান, যেন ডেডবডিটা এই তিনি প্রথম দেখলেন। বুঝতেই পারছেন, সবটাই একেবারে প্ল্যান-মাফিক ব্যাপার।'

কৌশিক বলল, 'কিন্তু সদানন্দবাবুর হাত থেকে লাঠি আর টর্চ তো পড়ে গিয়েছিল। ও-দুটো জিনিস কখন পড়ল, সেটাও ভেবে দেখা দরকার। বিশেষ করে লাঠিটা। তার কারণ, ওটাকেই আপনি মার্ডার-ওয়েপন বলে সন্দেহ করছেন।'

সামন্ত বললেন, 'সন্দেহ করবার কারণ নেই, তা তো নয়।'

আমি বললুম, 'কিন্তু সদানন্দবাবু তো বলছেন, কুসুমবালা, যমুনা আর বিষ্টুচরণের সামনেই ওই লাঠি আর টর্চ তাঁর হাত থেকে খসে পড়ে গিয়েছিল।'

সামন্ত বললেন, 'যমুনা আর বিষ্টুচরণ কিন্তু সে-কথা বলছে না। তারা বলছে, চিৎকার শুনে তারা যখন বেরিয়ে আসে, তখনই তারা নকুলের ডেডবডির পাশে টর্চ আর লাঠি পড়ে থাকতে দেখেছিল। কুসুমবালা অবশ্য সদানন্দের কথা সমর্থন করছেন। কিন্তু তিনি যে তাঁর স্বামীকে বাঁচাবার জন্যে সেটা করছেন না, এমন কথা কে বলবে।'

ভাদুড়ীমশাই চুপ করে আছেন। তাঁর দিকে তাকিয়ে আমি বললুম, 'আপনার ধারণাও কি তা-ই? অর্থাৎ স্বামীকে বাঁচাবার জন্যে কুসুমবালা মিথ্যেকথা বলছেন?'

ভাদুড়ীমশাই বললেন, 'সে তো হতেই পারে। স্বামীকে বাঁচাবার জন্যে স্ত্রী একটা মিথ্যেকথা বলবেন, এ তো খুবই স্বাভাবিক।'

আমি একেবারে নিবে গেলুম। দেখলুম, সামন্তমশাই হাসছেন। বিজয়ীর হাসি। বললেন, 'আপনি তাহলে আমার থিয়োরিটাই মেনে নিচ্ছেন তো?'

ভাদুড়ীমশাই বললেন, 'তাও কিন্তু মেনে নিচ্ছি না।'

এবারে সামন্তের নিবে যাবার পালা। বললেন, 'কেন?'

'কী করে মেনে নেব?' ভাদুড়ীমশাই বললেন, 'একে তো ওই লাঠিটাই যে মার্ডার-ওয়েপন, এখনও সেটা নিশ্চিতভাবে আমরা জানতে পারিনি, তার ওপরে, আবার আপনার থিয়োরির মধ্যে অন্য একটা ফাঁকও রয়েছে।'

'একটু বুঝিয়ে বলবেন?'

'বলছি। ফাঁকটা ছোট, কিন্তু ভাইটাল।'

ভাদুড়ীমশাই আবার একটা সিগারেট ধরালেন। চুপচাপ ধোঁয়া ছাড়লেন কিছুক্ষণ। তারপর আধাআধি যখন খাওয়া হয়েছে, তখন সেটাকে অ্যাশট্রেতে পিষে দিয়ে বললেন, 'মাত্র একটা কথাই আমরা নিশ্চিতভাবে জানি। সেটা এই যে, নকুলচন্দ্র মারা গিয়েছে মোটামুটি রাত তিনটেব সময়। মাথায় আঘাত করা হয়েছিল, তাতেই তার মৃত্যু ঘটে। সে মেঝের ওপরে পড়ে যায়। পড়ে যাওয়ার ফলে একটা শব্দ হয়েছিল। শব্দ শুনে যমুনা আর বিষ্টুচরণ ছুটে আসতে পারত। কিন্তু আসেনি। কেন আসেনি? না শব্দটা শুনতেই পায়নি তারা। কেন শোনেনি? না যে-যার ঘরে তারা দুজনেই তখন ঘুমিয়ে ছিল। কিন্তু তারা না-শুনলেও শব্দটা যে কেউই শোনেনি, তা কিন্তু নয়। সদানন্দবাবু শুনেছিলেন। নিজের থেকেই আপনাকে তিনি সেটা জানিয়েছেনও। তাই না?'

সামন্ত বললেন, 'তা জানিয়েছেন বটে।'

ভাদুড়ীমশাই বললেন, 'সত্যি বলতে কী, তিনি এটা জানিয়েছেন বলেই আমি একটু ধাঁধায় পড়ে গেছি। ধরা যাক, আপনি যা বলছেন, সেটাই ঠিক। অর্থাৎ সদানন্দবাবুই খুনি। তিনটের সময়

নীচে নেমে এসে সিঁড়ির দু'ধাপ ওপর থেকে তিনি নকুলচন্দ্রের মাথা ফাটিয়ে দেন। নকুলচন্দ্র মেঝেতে পড়ে যায়। শব্দ হয়। কিন্তু যমুনা আর বিষ্টুচরণ ছুটে আসে না। তাতেই সদানন্দবাবু বুঝে যান যে, তারা ঘুমিয়ে আছে। কিন্তু তা-ই যদি তিনি বুঝে গিয়ে থাকেন, তা হলে আর এমন কথা তিনি বলতে যাবেন কেন যে, দোতলা থেকে শব্দটা তিনি শুনেছিলেন? কেউ যখন শব্দটা শোনেনি, তখন তাঁরও তো ব্যাপারটা চেপে যাবার কথা। কিন্তু তিনি চাপলেন না। বললেন যে, শব্দটা শুনেছিলেন তিনি। অর্থাৎ প্রকারান্তরে স্বীকার করে বসলেন, বাড়ির মধ্যে সবাই যখন অঘোরে ঘুমোচ্ছে, তখন একা তিনি জেগে ছিলেন। কখন জেগে ছিলেন? না, খুনটা যখন হচ্ছে, তখনই। এ-যে আগ বাড়িয়ে ধরা দেবার ব্যাপার, এ-তো সদানন্দবাবুরও না-বোঝবার কথা নয়। খুনি কি কখনও এ-ভাবে আগ বাড়িয়ে ধরা দেয়? না মশাই, তাঁকে যে খুনি হিসেবে সন্দেহ করা হতে পারে, এটা বুঝেও এই যে তিনি নিজের থেকেই একটা ভাইটাল ইনফর্মেশান আপনাকে দিয়ে দিলেন, এতেই আমার একটু ধাঁধা লেগে যাচ্ছে। কী মনে হচ্ছে জানেন?'

'কী মনে হচ্ছে?'

'মনে হচ্ছে যে, ইউ আর বার্কিং আপ দ্য রং ট্রি।'

'অর্থাৎ আপনি বলতে চান যে, সদানন্দবাবু খুনি নন?'

'না, তাও আমি বলছি না। সদানন্দবাবুর মোটিভ ছিল, সুযোগও ছিল। সুতরাং তাঁকে তো আপনি সন্দেহ করতেই পারেন। কিন্তু আমার বলবার কথাটা এই যে, ও-দুটো জিনিস আর কারও ছিল কিনা, সেটাও আপনার খুব ভালো করে ভেবে দেখা উচিত। অর্জুন যেমন সবকিছু বাদ দিয়ে শুধু পাখিটাকেই দেখছিলেন...ভুল বললুম, পাখিরও সবটা তিনি দেখছিলেন না, দেখছিলেন শুধু পাখির মুণ্ডুটিকে, আপনিও তেমনি সবকিছু বাদ দিয়ে শুধু সদানন্দবাবুকেই দেখছেন। কিন্তু আপনি তো অর্জুন নন, আপনি পুলিশ-অফিসার গঙ্গাধর সামন্ত। আপনার উচিত তাই চারদিকে নজর রাখা।...না-না, সদানন্দকে সন্দেহ করে আপনি কিচ্ছু অন্যায় করেননি, তবে কিনা সন্দেহের জালটাকে এবারে আর-একটু ছড়িয়ে দিন।'

সামন্ত বললেন, 'কথাটা আপনি ঠিকই বলেছেন, কিন্তু সন্দেহ করবার মতো আর কাউকে তো এ-ক্ষেত্রে পাচ্ছি না। নকুলকে খুন করবার সুযোগ হয়তো যমুনারও ছিল, বিষ্টুচরণেরও ছিল। কিন্তু শুধু সুযোগ থাকাটাই যথেষ্ট নয়, একটা মোটিভও থাকা চাই। তা সেটা না ছিল যমুনার, না ছিল বিষ্টুচরণের।'

কৌশিক বলল, 'কিরণমামার কাছে আজই দুপুরে শুনলুম যে, রাত-দুপুরে বাড়ি ফিরে নকুল নাকি বউয়ের ওপরে খুব চোটপাট করত।'

সামন্ত আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এটা আপনি কোত্থেকে জানলেন কিরণবাবু?'

বললুম, 'সদানন্দবাবুই বলেছেন। পাড়ার আর পাঁচজনও যে ব্যাপারটা জানে না, তা নয়।'

কৌশিক বলল, 'চোটপাট নাকি রোজই করত। তা মারধোরও কি মাঝে-মাঝে করত না?'

সামন্ত বললেন, 'বাস, সেটাই অমনি খুন করবার মোটিভ হয়ে গেল? আর তা ছাড়া, যেভাবে খুন করা হয়েছে, তাতে মনে হয় না যে, এটা কোনও স্ত্রীলোকের কাজ।'

ডাক্তার গুপ্ত বললেন, 'তা হলে বাকি রইল বিষ্টুচরণ। তার কোনও মোটিভ থাকা সম্ভব নয়?'

একগাল হেসে সামন্ত বললেন, 'আদৌ সম্ভব নয়। আরে মশাই, যে-গোরু দুধ দিচ্ছে, তাকে সে কেন মারতে যাবে?' বিষ্টুচরণ গরিবঘরের ছেলে, চাকরি-বাকরি জোটাতে পারেনি, ভগ্নীপতির কাছে আশ্রয় মিলেছে, তাই দু-বেলা দু-মুঠো খেতে পাচ্ছে। নকুল যে মরল, এতে সেই আশ্রয়টাই তার ঘুচে গেল। না মশাই, ভগ্নীপতির মৃত্যুতে বিষ্টুচরণের কোনও স্বার্থসিদ্ধি হচ্ছে না, বরং সে বেঁচে থাকলেই তার লাভ ছিল।'

ভাদুড়ীমশাই বললেন, 'একেবারেই কি স্বার্থসিদ্ধি হচ্ছে না? যমুনা কি তার স্বামীর ব্যাবসা সামলাতে পারবে? আর কমলি তো নেহাতই শিশু। খোঁজ নিয়ে দেখুন, বোন আর ভাগনির অভিভাবক সেজে সে তার ভগ্নীপতির মাছের ব্যাবসাটা হাতাতে চায় কি না।'

গঙ্গাধর সামন্ত তাঁর দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটিকে দু-দিকে আন্দোলিত করে বললেন, 'সে গুড়েও বালি। ব্যাবসার জমা-খরচের খাতা আর অন্য সব কাগজপত্র আটক করেছি তো। তা সেখানে দেখছি, জমার ঘরে ঢুঢু। পুরোটা ধারের কারবার, আর সেই ধারের পরিমাণ হাজার পনেরো তো হবেই। আসলে নকুলচন্দ্রের মেজাজ যে ইদানীং খিঁচড়ে ছিল, সেটা এই জন্যেই। দেনার দায়ে লোকটার মাথার চুল পর্যন্ত বিকিয়ে যাবার উপক্রম হয়েছিল। ও-ব্যাবসা কে হাতাতে যাবে?'

ভাদুড়ীমশাই একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, 'মার্ডার-ওয়েপনের কোনও হদিশ হল?'

'পেয়েছি তো অনেক কিছুই। ইট, পাথর, নোড়া, রেঞ্চ, হাতুড়ি, বাটখারা। অর্থাৎ কিনা যা দিয়ে মাথা ফাটানো যায়, এমন বিস্তর জিনিস। তার ওপরে সদানন্দবাবুর ওই লাঠি তো আছেই। কালই সব পরীক্ষা করতে পাঠিয়ে দিয়েছি। মনে হয়, আগামীকাল বিকেল নাগাদ টেস্ট-রিপোর্ট পেয়ে যাব।'

'পেলে আমাকে জানাবেন, কেমন?'

'নিশ্চয় জানাব।'

গঙ্গাধর সামন্ত উঠে পড়লেন। ডাক্তার গুপ্তকে বললেন, 'আপনিও চলুন। আপনাকে আপনার বাসায় নামিয়ে দিয়ে আমি থানায় ফিরব।'

॥ ১৫ ॥

কুসুমবালার সঙ্গে কথা বলে আমাদের চেনা একজন উকিলকে আমি আগেই সব জানিয়ে রেখেছিলুম। সদানন্দবাবুর জামিনের ব্যাপার নিয়ে সোমবার সকালে তাঁর সঙ্গে কথা বলছি, এমন সময় কৌশিক এল। অবাক হয়ে বললুম, 'কী ব্যাপার?'

কৌশিক বলল, 'একবার থানায় যাব। কয়েকটা বিষয়ে মিস্টার সামন্তর সঙ্গে একটু আলোচনা করা দরকার। হাতে সময় ছিল, তাই ভাবলুম যে, আপনার সঙ্গে দেখা করে যাই। মামিমা, পারুল—ওরা সব ভালো আছে তো?'

'তা আছে। তবে এলেই যখন ওদের সঙ্গে একটু কথা বলে যাবে না?'

'আজ আর বসব না। পরে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করে নেব।'

কৌশিক উঠে পড়ল।

জামিনের ব্যবস্থা করা গেল না। সরকারি উকিল বললেন, একে তো এটা খুনের ব্যাপার, তার ওপরে আবার কী দিয়ে খুন করা হয়েছে, এখনও সেটা নিশ্চিতভাবে জানা যায়নি, পুলিশ তাই আশঙ্কা করছে যে, আসামিকে যদি এখনই জামিন দেওয়া হয়, তা হলে তদন্তের অসুবিধে হবে। এখনও যা সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি, তেমন কিছু-কিছু সাক্ষ্যপ্রমাণ এব ফলে লোপাট হয়ে যাওয়াও বিচিত্র নয়।

আমাদের উকিল বললেন, সদানন্দবাবু একজন মানী ব্যক্তি, তদন্তের অছিলায় এইভাবে তাঁকে হাজতে আটকে রাখা উচিত হচ্ছে না। তা ছাড়া এটাও আদালতকে বিবেচনা করে দেখতে হবে যে, ঘটনাস্থলে চব্বিশ ঘন্টার জন্যে পুলিশ-পাহারার ব্যবস্থা করা হয়েছে, সুতরাং সেখান থেকে সাক্ষ্যপ্রমাণ লোপাট হবার কোনও আশঙ্কাই নেই।

হাকিম দু-পক্ষের কথা শুনলেন; তারপর রায় দিলেন, আসামিকে আপাতত আরও তিন দিন থানা-হাজতে রাখা যেতে পারে; তবে আদালত আশা করছেন যে, পুলিশের তরফে বুধবারের মধ্যেই তদন্তের কাজ শেষ করা হবে, তারপরে আর তাঁরা জামিন দেবার ব্যাপারে কোনও আপত্তি তুলবেন না। সদানন্দবাবুর বয়েসের উল্লেখও করলেন তিনি; বললেন যে, এই বয়েসের একজন বৃদ্ধকে যে দীর্ঘকালের জন্য হাজতে আটকে রাখা চলে না, তাতে যে তাঁর স্বাস্থ্যভঙ্গ হতে পারে, পুলিশের সে-কথা উপলব্ধি করা উচিত।

দেবনারায়ণ ঘোষমশাই আমাদের উকিল। দুপুর দুটো নাগাদ আমার অফিসে ফোন করে তিনি এই খবর দিলেন। সব শুনে বললুম, 'বেস্পতিবার জামিনের ব্যবস্থা হবে তো?'

'তা হবে।' ঘোষমশাই বললেন, 'আজ হল না ঠিকই, তবে রায় শুনে মনে হয়, সেদিন আর কোনও অসুবিধে হবে না। আসামির বয়েস যে সত্তর, সেটা একটা মস্ত ফ্যাক্টর।'

'আসামি' শব্দটা খট করে কানে বাজল। বললুম, 'শনির থেকে বুধ। শুনলে মনে হয় মোটে তো পাঁচটা দিন। তা এই বয়েসে পাঁচ-পাঁচটা দিনও তো কম নয়। তার ওপরে আবার যা গরম পড়েছে।'

'কী আর করা যাবে বলুন। সবই কপালের ভোগ।'

ফোন নামিয়ে রাখলুম। তারপরেই মনে হল, কৌশিকের সঙ্গে গঙ্গাধর সামন্তর কী কথা হল, সেটা জানা দরকার। টেলিফোন অপারেটরকে মালতীদের বাড়ির ফোন-নাম্বারটা দিয়ে বললুম, 'এই নম্বরটা একটু ডেকে দাও তো।'

ফোন মালতীই ধরেছিল। বললুম, 'আমি কিরণদা। দাদা বাড়িতে আছেন?'

'তা আছে।'

'তাঁর সঙ্গে একটু কথা বলব। ঘুমুচ্ছেন না তো?'

'রাত্তিরেই দাদা ঘুমোয় না, তা দুপুরবেলায়! ধরুন, ডেকে দিচ্ছি।'

সেকেন্ড পাঁচেক বাদেই ভাদুড়ীমশাইয়ের গলা ভেসে এল। 'কী খবর?'

'খবর তো কৌশিকের কাছে। গঙ্গাধর সামন্ত ওকে কী বললেন?'

'পরে বলব। আপাতত জেনে রাখুন, সামন্ত মোটেই খারাপ লোক নয়। একটু একবগগা ঠিকই, নাক-বরাবর যা চোখে পড়ে, তা ছাড়া আর অন্য-কিছু দেখতে পায় না। বাট সার্টেনলি নট ওয়ান অভ দোস কনসিটেড অফিসারস। কোথায় ভুল হচ্ছে সেটা ধরিয়ে দিলে মেনেও নেয়। কৌশিকের সঙ্গে তো এখন পুরোপুরি কো-অপারেট করছে।'

'কৌশিক বাড়িতে আছে?'

'তাই থাকে কখনও? থানা থেকে একটা নাগাদ ফিরেছিল, তার আধঘণ্টার মধ্যেই আবার গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেছে। মারুতি নিয়েই বেরুচ্ছিল, তা আমি বললুম, গরমে একেবারে সেদ্ধ হয়ে যাবি, বরং তোর বাবার অ্যাম্বাসাডরটা নিয়ে যা।'

'কোথায় গেল?'

'বাগনান আর কোলাঘাট, দু-জায়গাতেই যাবে।'

'ওখানে আবার কী?'

'বাগনানের কাছেই যমুনার বাপের বাড়ি, আর নকুলদের বাড়ি হল কোলাঘাট থেকে মাইল কয়েক পশ্চিমে একটা গ্রামে। ব্যাপারটা বুঝলেন তো?'

'কিছুই বুঝলুম না।'

'যমুনা আর নকুলের আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে কৌশিক একটু কথা বলতে চায়।'

'ফিরবে কবে?'

'ফিরবে তো বলল কাল বিকেল নাগাদ। কিংবা তা যদি না পারে তো পরশু দুপুরে। চিন্তা

করবেন না, ও ঠিক-পথ ধরেই এগোচ্ছে।'

বললুম, 'আমি কি আপনার ওখানে একবার যাব?'

ভাদুড়ীমশাই সেকেন্ড তিন-চার চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, 'আজ তো সোমবার। মঙ্গল আর বুধ, দুটো দিন আমাকে একটু ভাবতে দিন। আপনি একেবারে বেস্পতিবার বিকেলে আসুন। মনে তো হয় তখন কিছু খবর দিতে পারব।'

ফোন নামিয়ে রাখলুম।

মঙ্গল আর বুধ, দুটো দিন যেন কাটতেই চাইছিল না। অফিস করলুম যথারীতি, কিন্তু কাজকর্ম যে বিশেষ করতে পারা গেল, তা নয়। শুধু অফিসের কাজ বলে কথা কী, কোনও কাজেই যেন ঠিক মন বসাতে পারছিলুম না। বাসন্তী সেটা বুঝতে পেরেছিল, দু-একবার প্রশ্নও করেছিল তা নিয়ে, কিন্তু স্পষ্ট কোনও জবাব না পেয়ে আর কিছু বলেনি। আমার শরীরটা দু-একদিন ধরে একটু অবসন্ন লাগছিল। বুধবার সকালে টেলিফোন করে ডাক্তার চাকলাদারকে সে-কথা জানাতে তিনি বললেন, 'আজ বিকেলে একটু তাড়াতাড়ি অফিস থেকে ফিরতে পারবেন?'

'তা কেন পারব না?'

'ঠিক আছে, তা হলে ছ'টা নাগাদ আমার চেম্বারে চলে আসুন। ব্লাড-সুগার বেড়ে যায়নি তো?'

'না মশাই, ওসব ঝঞ্ঝাট আমার নেই।'

'তাহলে হয়তো প্রেশার বেড়েছে। চলে আসুন, দেখে দেব অখন। তা ছাড়া আমারও দু-একটা কথা বলবার আছে আপনাকে।'

'কী কথা?'

'আসুন, তখন বলব।'

চাকলাদার ফোন নামিয়ে রাখলেন।

অফিস থেকে ফিরতে-ফিরতেই পাঁচটা চল্লিশ। জামা-কাপড় আর পালটানো হল না। মুখ-হাত ধুয়ে, কোনওক্রমে এক কাপ চা খেয়ে, পাশের গলিতে চাকলাদারের চেম্বারে যখন পৌঁছলুম, তখন ছ'টা পাঁচ।

প্রেশার দেখে চাকলাদার বললেন, 'ঠিকই আছে। মনে হচ্ছে এগজারশানের ব্যাপার। দু-দিন একটু বিশ্রাম নিন, সব ঠিক হয়ে যাবে।'

বললুম, 'বিশ্রাম তো নিতেই পারতুম, কিন্তু এখন কী করে নিই বলুন তো। সদানন্দবাবুর ব্যাপারটার একটা ফয়সলা হোক, তারপর নেওয়া যাবে।'

চাকলাদার বললেন, 'আমি যা বলতে চাই, তা-ও কিন্তু ওই পাঁচ নম্বর বাড়ির ব্যাপারেই।'

ভদ্রলোককে বড় গম্ভীর দেখাচ্ছিল। হাসিখুশি, বন্ধুবৎসল মানুষ; শুনেছি ছ'টা সাড়ে-ছ'টা নাগাদ তাঁর চেম্বারে রোজই কিছু-না-কিছু বন্ধুবান্ধব আসেন, আড্ডা চলে আটটা-ন'টা পর্যন্ত। আজ কাউকে দেখা গেল না। বললুম, 'কী ব্যাপার বলুন তো? কাউকে দেখছি না কেন?'

'আমিই ফোন করে সবাইকে আসতে বারণ করে দিয়েছি। বলেছি, শরীরটা ভালো যাচ্ছে না, চেম্বারে না বসে আজ একটু বিশ্রাম নেব।'

'শরীর সত্যি খারাপ নাকি?'

'না-না, ওসব কিছু নয়। আসলে আপনাকে এমন দু-একটা কথা বলতে চাই অন্যদের যা না-শোনাই ভালো।'

'কী কথা?'

ডাক্তার চাকলাদার একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন। মুখ নীচু করে কী যেন ভাবলেন। তারপর মুখ তুলে বললেন, 'এখুনি আমি বিস্তারিতভাবে কিছু বলব না, বলা উচিতও নয়। আমি ডাক্তার-

মানুষ, এমন কিছু করা বা বলা আমার ঠিক হবে না, যা কিনা আমাদের পেশায় আন-এথিক্যাল বলে গণ্য হয়ে থাকে। শুধু একটা কথা বলি। আপনি তো সদানন্দবাবুর বাড়ির একেবারে সামনেই থাকেন, আপনি একটু মিসেস বসুর ওপরে নজর রাখুন।'

'সদানন্দবাবুর স্ত্রীর ওপরে? কেন?'

'আর কিছু জিগ্যেস করবেন না, প্লিজ। শুধু যা বললুম, দয়া করে সেটা মনে রাখবেন।...মানে, আপনারা একটু সতর্ক থাকুন। হ্যাঁ, আপনারা সবাই। আমার ধারণা, কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে।'

চাকলাদারের কথাবার্তা আমার কানে কেমন যেন অসংলগ্ন ঠেকছিল। মনে হল, ভদ্রলোকের শরীর সত্যি ভালো যাচ্ছে না। বিশ্রাম সম্ভবত ওঁরই সবচেয়ে বেশি দরকার।

চলে আসবার আগে একবার জিগ্যেস করেছিলুম, 'কী হয়েছে, একটু খুলে বলুন তো মশাই।'

কিন্তু চাকলাদার আর একটা কথাও বললেন না।

চাকলাদার বলেছিলেন কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে। তা কিছু-একটা যে সেই রাত্রেই ঘটবে, তখন তা আমি কল্পনাও করিনি। খবর পাওয়া গেল ভোরবেলায়। না, আমাদের জন্যে তো ভদ্রলোক বড় উদ্বিগ্ন ছিলেন, আমাদের গলিতে কিন্তু কারও কিছু হয়নি। ক্ষতি যা হবার, তা চাকলাদারেরই হয়েছে। তাঁর চেম্বারের জানলা ভেঙে মাঝরাত্তিরে চোর ঢুকেছিল। চেম্বারে তো বিশেষ কিছু থাকবার কথা নয়, ছিলও না, তাই চোরও বিশেষ কিছু হাতিয়ে নিতে পারেনি। আমরা গিয়ে দেখলুম, চেম্বারের ঘরের মেঝের ওপরে একরাশ কাগজপত্র ছত্রাকার হয়ে পড়ে আছে। পুলিশ এসেছে। ডাক্তার চাকলাদার তাদের সঙ্গে কথা বলছেন। আমাকে দেখে বললেন, 'চলে যাবেন না, একটু বসুন, কথা আছে।'

পুলিশ চলে যেতে-যেতে আটটা বাজল। চাকলাদার আমাকে ভেতরের দিকের একটা ঘরে নিয়ে গেলেন। কাজের লোকটি এসে দু-কাপ চা দিয়ে গেল সেখানে। চাকলাদার বললেন, 'খান।

আমি বললুম, 'আজকাল আর আমি এই রকমের চা খাই না, সদানন্দবাবুর পরামর্শমতো স্রেফ হালকা লিকাব খাই।'

চাকলাদার বললেন, 'তা হলে ওটা খাবেন না, পালটে দিতে বলছি।'

বললুম, 'আরে দূর মশাই, আমি কি সদানন্দবাবুর মতো অত নিয়ম মানি? এটাই খেয়ে নিচ্ছি, পালটাতে হবে না।...কথাটা কী, সেইটে এবারে বলুন তো?'

'ও, হ্যাঁ,' চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে ডাক্তার চাকলাদার বললেন, 'আপনার কাছে মিঃ ভাদুড়ীর কথা অনেক শুনেছি। তা সেদিন তো আপনারা বলছিলেন যে, তিনি এখন কলকাতায়। তাই না?'

বললুম, 'হ্যাঁ। কেন বলুন তো?'

'শিগগিরই কি তাঁর কাছে আপনি যাবেন?'

'রবিবারে গিয়েছিলুম। আজ তো বেস্পতিবার, আজ বিকেলেও একবার যাব।'

'আজ অফিসে যাবেন না?'

'না। সদানন্দবাবুর জামিনের ব্যাপারটা আজ আবার উঠবে। মনে হচ্ছে আজ ওটা পেয়েও যাবেন উনি।'

'আপনি কি আদালতে যাবেন?'

'না-না,' আমি বললুম, 'আমার যাবার কিছু দরকার নেই। ভালো ল-ইয়ার দিয়েছি, যা করবার তিনিই করবেন। আমি বাড়িতেই থাকব। কেন থাকব, জানেন?'

'কেন?'

'হাজত থেকে উনি ফেরবার সঙ্গে-সঙ্গেই ওঁর সঙ্গে গিয়ে দেখা করব। যাতে না ওঁর মনে

হয় যে, পুলিশে ধরেছিল বলে আমরা ওঁকে অচ্ছুত ভাবছি, ওঁকে এড়িয়ে যাচ্ছি।'

'সে তো ভালোই।' চাকলাদার বললেন, 'তা হলে মিঃ ভাদুড়ীর ওখানে কখন যাচ্ছেন?'

'পাঁচটা নাগাদ বেরিয়ে পড়ব, তার আগে তো রোদ্দুরে সব তেতে থাকে।'

'আমিও আপনার সঙ্গে যাব তখন। ওঁর সঙ্গে আমার একবার দেখা করা দরকার।'

বললুম, 'আপনি ওঁকে কিছু বলতে চান?'

'হ্যাঁ, একটা কথা ওঁকে জানাতে চাই আমি। না-জানানো পর্যন্ত আমি শান্তি পাচ্ছি না।'

'বেশ তো, যাবেন। পাঁচটা নাগাদ আপনার এখানে চলে আসব আমি, তারপরে দুজনে মিলে বেরিয়ে পড়ব।'

চাকলাদারের বাড়ি থেকে বেরিয়েই বড় রাস্তা। দু-পা এগিয়ে বাঁ-দিকে মোড় নিয়ে পীতাম্বর চৌধুরি লেনে ঢুকলুম। দেখলুম, একটা থলে হাতে বিষ্টুচরণ বাজার করতে যাচ্ছে। কাপড়টা নোংরা, হাফ-হাতা শার্টটাও কাঁধের কাছে ছিঁড়ে গেছে। দেখে মায়া হল। ভগ্নীপতির আশ্রয়ে দু-বেলা দু-মুঠো খেতে পাচ্ছিল, এবারে মুশকিলে পড়বে।

॥ ১৬ ॥

বাড়ি ফিরে শুনলুম ভাদুড়ীমশাই ফোন করেছিলেন। একটু বাদে আবার করবেন। ঠিক ন'টায় ফোন বাজল। রিসিভার তুলে 'হ্যালো' বলতেই ওদিক থেকে প্রশ্ন ভেসে এল, 'আজ বিকেলে আসছেন তো?'

'তা যাচ্ছি। কৌশিক ফিরেছে?'

'পরশু ফিরতে পারেনি, কালও দুপুরে ফেরা হল না, ফিরেছে কাল রাত্তিরে। অনেক খবর। বিকেলে আসুন, তখন বলব। আজ অফিসে যাচ্ছেন?'

'না, ছুটি নিয়েছি।'

'শরীর খারাপ?'

'না,' হেসে বললুম, 'সদানন্দবাবু আজ জামিন পাচ্ছেন। তাঁকে রিসিভ করতে হবে তো।'

'অর্থাৎ আপনি ধরেই নিয়েছেন যে, তিনি নির্দোষ। তাই না?'

বললুম, 'ভাদুড়ীমশাই, আমার কাছে এটা দোষ-গুণ বিচারের প্রশ্ন নয়, বিপদের সময়ে বন্ধুর পাশে গিয়ে দাঁড়াবার প্রশ্ন। তা আপনি খুব ভালোই জানেন যে, আই অলওয়েজ স্ট্যান্ড বাই মাই ফ্রেন্ডস।'

'জানি বলেই তো কৌশিককে পাঠিয়ে দিয়েছিলুম। কিন্তু সে-কথা থাক। দুপুরটা যখন হাতে রয়েছে, তখন একটা কাজ করুন দেখি।'

'কী কাজ?'

'বলছি। গত শনিবার সকালে চিৎকারটা শুনেই আপনি ও-বাড়িতে ছুটে গিয়েছিলেন। তাই না?'

'হ্যাঁ, তা প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই গিয়েছিলুম।'

'গিয়ে যা দেখেছিলেন...মানে কে কোথায় দাঁড়িয়ে কিংবা বসেছিল, কে কী বলছিল কিংবা করছিল, ডিটেলসে সব লিখে ফেলুন। মানে ওই যাকে অকুস্থল বলা হয় আর কী, তার একেবারে হুবহু একটা রিপোর্ট আমি চাইছি। কিচ্ছু বাদ দেবেন না।'

'পারব কি?'

'খুব পারবেন। আপনার মেমরি যে সব কিছুকেই ধরে রাখে, তার পরিচয় আমি আগেও

পেয়েছি। নইলে কি আপনার রিপোর্টটার ওপরেই সবচেয়ে জোর দিতুম?'

'তার মানে? আরও কাউকে-কাউকে এটা লিখতে বলেছেন নাকি?'

'আবও তিনজনকে বলেছি। গঙ্গাধর সামন্ত, ডাক্তার গুপ্ত আর কৌশিক। সো কিবণবাবু, ইউ আর ইন গুড কম্পানি। কৌশিক তো ব্রেকফাস্ট করেই খাতা-কলম নিয়ে লিখতে বসে গেছে। ...তা হলে ছেড়ে দিই?'

'দাঁড়ান, দাঁড়ান, একটা কথা আপনাকে জিগ্যেস করা হয়নি।'

'কী কথা?'

'বিকেলে এক ভদ্রলোক আমার সঙ্গে আপনাব ওখানে যেতে চান। নিয়ে যাব?'

'ভদ্রলোকটি কে?'

'ডাক্তার চাকলাদার। বলছেন যে, আপনাকে কিছু জানাতে চান।...পাড়ার ডাক্তারবাবু তো, খবরটা তাই ওঁকেই আগে দিয়েছিলুম।'

'আই সি। উনি তা হলে ঘটনাস্থলে ছিলেন?'

'তা তো ছিলেনই। কৌশিক ওঁকে দেখেওছে ওখানে।'

'আমাকে উনি কী জানাতে চান? ..এনি আইডিয়া?'

'না, মশাই, কিচ্ছু আমার জানা নেই। শুধু বললেন যে, আপনাকে একটা কথা না বলা পর্যন্ত ওঁব শান্তি হচ্ছে না।'

'ঠিক আছে,' ভাদুড়ীমশাই বললেন, 'ওঁকে নিযে আসুন।'

লাইন কেটে গেল। রিসিভার ক্রেডলে নামিযে রাখা হযেছে।

কয়েকটা দিন হাজতবাসের ফলেই যে একটা লোকেব চেহারা আর চরিত্র কতটা পাল্‌টে যেতে পারে, সদানন্দবাবুকে না-দেখলে সেটা বিশ্বাস করা শক্ত হত। এ কাকে দেবনাবায়ণবাবু জামিনে ছাড়িয়ে আনলেন? বাড়িতে ফিবে এসেছেন। চাবটে নাগাদ এই খবব পেয়ে, বাসন্তীকে নিয়ে পাঁচ নম্বরের দোতলায উঠে 'কেমন আছেন সদানন্দবাবু' বলে যাঁব সামনে গিয়ে দাঁড়ালুম, আমাদেব চেনা সদানন্দবাবুব সঙ্গে তাঁর আকাশ-পাতাল ফারাক। শুকনো মুখ, চোখের কোলে কালি, মাথার প্রায সবটাই সাদা, মুখ নিচু করে যে মানুষটি বসে আছেন, বলতে গেলে তাঁকে আমরা চিনিই না। দেখে ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল। একই সঙ্গে বুঝতে পারছিলুম যে, তাঁর ব্যক্তিত্ব একটা মারাত্মক রকমের ঝাঁকুনি খেয়েছে, এটা সামলে উঠতে তাঁব সময় লাগবে। তা ছাড়া, জামিন পেযেছেন বটে, কিন্তু তাঁর চলাফেরা স্বাধীন নয়। আপাতত তাঁর কলকাতা ছেড়ে কোথাও যাওয়া চলবে না, তা ছাড়া রোজ একবার থানায় গিয়ে হাজিরা দিয়ে আসতে হবে।

মিনিট পনেবো ওখানে থেকে আমি বেরিযে এলুম। আসবার সময় নমস্কার করে বললুম, 'আজ আসি, পরে আসব।' সদানন্দবাবু তাতে প্রতি-নমস্কার তো কবলেনই না, একটু হাসলেন না পর্যন্ত। ফ্যালফ্যাল করে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

বাসন্তী বসে ছিল তার কুসুমদির পাশে। আমাকে উঠতে দেখে সেও উঠে পড়ল। বলল, 'সন্ধের দিকে আবার আসব কুসুমদি। ও এখন একটু বেরোবে, আমি ওর জামাকাপড় বার করে দিয়ে আসি।'

বাড়িতে ফিরে এসে বাসন্তী বলল, 'উঃ, কেমন যেন দম আটকে যাচ্ছিল আমার।'

বললুম, 'সে তো আমারও। কিন্তু তবু যেতে হবে। আগে তো তুমি রোজই যেতে, আমি যেতুম না। এখন থেকে আমিও রোজ যাব। কেন যাব, সেটা তুমি বুঝতেই পারছ।'

বাসন্তী বলল, 'সে তো পারছিই। এখন না গেলে কুসুমদি ভুল বুঝবেন। তা ছাড়া, দেখলে

তো এক শম্ভুবাবুর স্ত্রী ছাড়া আর-কেউ ও-বাড়িতে যায়নি।'

বললুম, 'সে তো দেখলুমই। তবে শম্ভুবাবু যাবেন। ভদ্রলোক অফিস থেকে এখনও ফেরেননি। ফিরে একবার যাবেন নিশ্চয়। নাও, এবারে চা করো, চা খেয়ে আমি বেরিয়ে পড়ব। দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

চা খেয়ে চাকলাদারের কাছে যেতে-যেতে পাঁচটা দশ বাজল। ভদ্রলোক তৈরি হয়েই বসেছিলেন। আমাকে দেখে বললেন, 'গ্যারাজ থেকে আমার মরিস-মাইনরটা এইমাত্র মেরামত হয়ে ফিরল। চলুন, ওটাতেই যাওয়া যাক। কেমন সারিয়েছে, সেটা বুঝতে পারা যাবে। চা খেয়ে বেরিয়েছেন তো?'

'তাতেই তো দেরি হয়ে গেল। গ্যাস ফুরিয়েছে, কেরোসিন নেই, তাই কাগজ পুড়িয়ে চা বানাতে হল, মশাই। ডবল সিলিন্ডার করে কী যে লাভ হল, বুঝি না। যা দেখছি, ফের সেই ঘুঁটে কয়লার ব্যবস্থা করতে হবে।'

চাকলাদার হাসলেন। বললেন, 'তা যা বলেছেন, চলুন বেরিয়ে পড়ি।'

যতীন দাস রোডে মালতীদের বাড়িতে পৌঁছতে-পৌঁছতে সওয়া ছ'টা বাজল। ওপরে উঠে দেখি, বসবার ঘরে আসর একেবারে জমজমাট। গঙ্গাধর সামন্ত এসে গেছেন। বাকি শুধু ডাক্তার গুপ্ত। সামন্ত বললেন, 'তিনিও এসে পড়বেন এবারে। আসবার পথে ওঁর বাড়িতে গিয়েছিলুম। শুনলুম, ওঁর মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে কার যেন অসুখ, সেখানে রোগী দেখে আর বাড়ি ফিরবেন না, সিধে এখানে চলে আসবেন।'

বলতে-না-বলতেই ডাক্তার গুপ্ত এসে গেলেন। ঘরে ঢুকে হাত থেকে স্টেথোসকোপটা নামিয়ে রেখে একটা সোফায় বসতে-বসতে বললেন, 'খুব দেরি হয়নি তো?'

ভাদুড়ীমশাই বললেন, 'আরে না। তা হলে সামন্তমশাই, শুরু করা যাক, কেমন? নকুলের ব্যাবসার কাগজপত্র যা সিজ করেছেন, সবই নিয়ে এসেছেন তো?'

কৌশিক বলল, 'কাগজপত্র তো বেশি নয়, খান তিনেক জমা-খরচের খাতা, আর কিছু রসিদ। সবই উনি এনেছেন। আমার ঘরে রেখে দিয়েছি। এতক্ষণ তো তারই ওপরে চোখ বুলোচ্ছিলুম। এখানে নিয়ে আসব?'

ভাদুড়ীমশাই বললেন, 'এখন আনবার দরকার নেই। যখন দরকার হয়, বলব।'

সামন্ত বললেন, 'সবই কিন্তু আজই আমি ফেরত নিয়ে যাব।'

'বেশ তো, নিয়ে যাবেন, একটা কুটোও আমি এখানে আটকে রাখব না। কিন্তু আগের কথাটা আগে হোক। যা-যা আটক করেছেন, তার মধ্যে মার্ডার ওয়েপন বলে কোনটা সাব্যস্ত হল?'

সামন্তমশাই একেবারে নিবে গেলেন। বললেন, 'কোনওটাই না।'

কৌশিক বলল, 'লাঠি দিয়ে যে মাথা ফাটানো হয়নি, সে তো আমি আগেই বুঝেছিলুম।'

গঙ্গাধর সামন্ত বললেন, 'কী করে বুঝলেন?'

কৌশিক বলল, 'বা রে, লাঠিটার এখানে ওখানে রক্ত লেগেছিল ঠিকই কিন্তু যে-জায়গাটা দিয়ে মারলে মাথা ফাটানো সম্ভব, সেই লোহার বলটার গায়ে এক ছিটেও রক্ত ছিল না। সেটা আমি শনিবার সকালেই লক্ষ করেছিলুম। আমার শুধু ভয় ছিল যে, অসাবধানে নাড়াচাড়া করার ফলে ওই লোহার বলেও না রক্ত লেগে যায়। তা আপনি সাবধানে ওটা হ্যান্ডল করেছেন, তাই রক্তও লাগেনি।'

গঙ্গাধর সামন্ত বললেন, 'লাঠিটাকে আমি মার্ডার ওয়েপন বলে সন্দেহ করেছিলুম ঠিকই, কিন্তু তাই বলে অসাবধান হব কেন? কোনওভাবে যাতে কোনও ট্যাম্পারিং না হয়, সেদিকে আমি কড়া নজর রাখি। দোষীর শাস্তি হোক, এটা আমি চাই নিশ্চয়। কিন্তু আমি সন্দেহ করছি বলেই একটা লোক দোষী আর আমারই ভুলে কিংবা অসাবধানতায় তার ফাঁসি হয়ে যাবে, এটা নিশ্চয়

চাই না।'

ভাদুড়ীমশাই বললেন, 'মারণাস্ত্র হিসেবে ওই লাঠিটা ছাড়া আর কী-কী যেন আটক করা হয়েছিল ও-বাড়ি থেকে?'

গঙ্গাধর সামন্ত বললেন, 'তার লিস্টি আমি মিঃ সান্যালকে দিয়েছি। আটক তো করেছিলুম অনেক-কিছুই। ইট, পাথর, নোড়া, হাতুড়ি, বাটখারা, রেঞ্চ, বিস্তর জিনিস।'

'অন্যগুলো কী কাজে লাগে, সে তো বুঝতে পারছি। বাটখারা দিয়ে কী হত?'

'বাটখারা যেমন একতলা থেকে অনেকগুলো পেয়েছি, তেমনি অন্তত একটা পেয়েছি দোতলা থেকেও। একতলায় এত বাটখারা কেন জিগ্যেস করেছিলুম। তা বিষ্টুচরণ বলল, ওগুলো মাছ ওজন করার কাজে লাগে;'

'লাগতেই পারে।' ভাদুড়ীমশাই বললেন, 'মাছের ব্যাবসা, বাড়িতেই খুচরো-দোকানিদের মাছ বিক্রি করা হত, তা বাটখারা তো লাগবেই। কিন্তু সদানন্দবাবুর তো কোনও ব্যাবসা ছিল না, তাঁর বাটখারা কী কাজে লাগত?'

আমি বললুম, 'সদানন্দবাবু কী ব্যাখ্যা দিয়েছেন, আমি জানি না, তবে কেন যে তিনি বাটখারা রাখতেন, সেটা জানি। আসলে আমরা সকলেই পুরোনো খবরের কাগজ কি অকেজো শিশিবোতল বিক্রি করি তো, তা ওসব যারা কেনে, তাদের বাটখারাকে সদানন্দবাবু বিশ্বাস করতেন না। বলতেন, "ওরা ডাকাত মশাই, ডাকাত, যেটাকে ওরা এক-কিলোর বাটখারা বলে চালায়, তার ওজন অন্তত বারোশো গ্রাম।" নিজের বাটখারা ছাড়া তিনি তাই ওসব জিনিস বিক্রি করতেন না। আমাকেও একটা বাটখারা কিনতে বলেছিলেন।'

ডাক্তার গুপ্ত হেসে উঠলেন। বললেন, 'ওরেব্বাবা, এ তো দেখছি ভীষণ হিসেবি লোক, এসব তো আমাদের মাথাতেই আসে না!'

ভাদুড়ীমশাই বললেন, 'যাক, যে-সব জিনিস আটক করেছিলেন, তার একটাও তাহলে পরীক্ষায় ওতরায়নি, কেমন?'

গঙ্গাধর বললেন, 'একটাও না। ছাদে যে জলের ট্যাঙ্ক রয়েছে, সেটার মধ্যেও লোক নামিয়েছিলুম। বাড়ির সামনে যে কর্পোরেশনের ডাস্টবিন রয়েছে, সেটাকেও হাঁটকে দেখতে ছাড়িনি। কিন্তু না, কিচ্ছু পাওয়া গেল না। মার্ডার-ওয়েপনটা একটা মিস্ট্রিই রয়ে গেল।'

আমি বললুম, 'তা তো হল, আপনি যে রিপোর্টটা দিতে বলেছিলেন, সেটা আমি লিখে এনেছি।'

ভাদুড়ীমশাই বললেন, 'কৌশিকের রিপোর্টও লেখা হয়ে গেছে। সামন্তমশাই, আপনি?'

'আমিও লিখে ফেলেছি।'

ভাদুড়ীমশাই আমাদের তিনজনের লেখা তিনটে রিপোর্ট নিয়ে সেন্টার-টেবিলে একটা পেপার ওয়েট চাপা দিয়ে রাখলেন। তারপর ডাক্তার গুপ্তের দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন, 'আপনারটাও দিয়ে দিন।'

ডাক্তার গুপ্ত কাঁচুমাচু মুখে বললেন, 'ইয়ে আমারটা এখনও লেখা হয়নি।'

গঙ্গাধর সামন্ত বললেন, 'আমাদের তিনটেই আপাতত পড়ে দেখুন।'

ভাদুড়ীমশাই বললেন, 'এখন নয়। রাত্তিরে নিজের ঘরে বসে ধীরেসুস্থে পড়ব। এখন বরং কৌশিকের কথা শুনুন।'

কৌশিক প্রথমে গিয়েছিল কোলাঘাটের মাইল কয়েক পশ্চিমে, রহমতপুর গ্রামে। সেখানকার কাজ শেষ করে সে বাগনানের কাছে বিষ্ণুহাটি গ্রামে যায়।

ডাক্তার গুপ্ত বললেন, 'হঠাৎ আবার ওসব জায়গায় যাবার দরকার হল কেন?'

গঙ্গাধর সামন্ত বললেন, 'নকুলচন্দ্র রহমতপুরের লোক আর বিষ্ণুহাটিতে হল যমুনার বাপের

বাড়ি। সোমবার সকালে মিঃ সান্যাল থানায় এসে আমার কাছ থেকে এই দুটো গাঁয়ের কথা জেনে গিয়েছিলেন।'

কৌশিক বলল, 'একবার ভেবেছিলুম সরাসরি পাঁচ নম্বর বাড়িতে ঢুকে বিষ্টুচরণকে জিগ্যেস করে জেনে নিই যে, ওরা কে কোথাকার লোক। কলকাতার লোক যে নয়, সে তো ওদের কথা শুনেই বুঝতে পেরেছিলুম। পরে মনে হল, বিষ্টুচরণকে জিগ্যেস করবারই বা দরকার কী, জেরার সময়েই মিস্টার সামন্ত সে-সব জেনে নিয়েছেন নিশ্চয়। তাই আর পাঁচ নম্বর বাড়িতে গেলুম না, একেবারে থানায় চলে গেলুম। তারপর আর কী, থানা থেকে ঠিকানা নিয়ে সেইদিনই বেরিয়ে পড়লুম কলকাতা থেকে।'

ডাক্তার গুপ্ত বললেন, 'বেরিয়ে পড়বার দরকার হল কেন, সেটা কিন্তু এখনও বুঝতে পারছি না।'

কৌশিক বলল, 'দরকার হল মামাবাবুর জন্যে। আপনারা তো গত রবিবার এখানে এসেছিলেন। সেদিন রাত্তিরে আপনারা চলে যাবার পরেই মামাবাবু আমাকে জিগ্যেস করেন যে, নকুলচন্দ্র কোথাকার লোক তা আমি জানি কি না। তা আমি বললুম, নকুলের সঙ্গে কথা বলবার সুযোগ তো আমার হয়নি, আমি তার ডেডবডিটাই দেখেছি মাত্র, তবে যমুনা আর বিষ্টুচরণের কথা শুনে মনে হল যে, তারা কলকাতার লোক নয়। তখন মামাবাবু বললেন যে, নকুল যদি বাইরের লোক হয়, তো যেখান থেকে সে কলকাতায় এসেছে, সেখানেও একবার যাওয়া দরকার; সেইসঙ্গে যমুনার বাপের বাড়িতে গিয়েও একটু খোঁজখবর করলে ভালো হয়।'

গঙ্গাধর সামন্ত ভাদুড়ীমশাইয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এমন কথা আপনার মনে হল কেন? খুন তো হয়েছে কলকাতায়। বাড়িওয়ালার সঙ্গে ভাড়াটের ঝগড়া, এ তো একেবারে স্ট্রেট কেস।'

ভাদুড়ীমশাই বললেন, 'ওপর-ওপর দেখলে সেটাই মনে হয় বটে। কিন্তু প্রথম থেকেই আমার মনে হচ্ছিল যে, অত স্ট্রেট কেস এটা না-ও হতে পারে। অর্থাৎ খুনটা কলকাতায় হয়েছে ঠিকই, কিন্তু তার কারণটাও যে কলকাতাতেই খুঁজে পাওয়া যাবে, এমন কথা তো নিশ্চিত হয়ে বলা যায় না।'

একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন ভাদুড়ীমশাই। তারপর বললেন, 'কজালিটি, অর্থাৎ কার্যকারণের ব্যাপারটা আপনারা সবাই বোঝেন। কারণ ছাড়া কার্য হয় না। কিন্তু কাজটা যেখানে হল, কারণটাকেও যে সেখানেই খুঁজে পাওয়া যাবে, এমন তো কোনও কথা নেই। সত্যি বলতে কী, সেইজন্যেই কৌশিককে আমি কলকাতার বাইরে গিয়ে একটু খোঁজখবর করতে বলেছিলুম।'

গঙ্গাধর সামন্ত বললেন, 'আপনি কি মনে করেন যে, খুনটা কেউ বাইরে থেকে এসে করেছে?'

ভাদুড়ীমশাই বললেন, 'আমি কী মনে করি না-করি, এখুনি তা বলছি না। বলা সম্ভবও নয়। তবে লক্ষণ যা দেখছি, তাতে মনে হয়, উই আর অন দ্য রাইট ট্র্যাক। কিন্তু সে-কথা থাক। কৌশিক কী বলছে, শুনুন।'

॥ ১৭ ॥

কৌশিক বলল, 'সোমবারে দুপুর ঠিক দেড়টার সময় আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ি। যা গরম, তাতে গাড়ি না-নিয়ে ট্রেনে গেলেই ভালো হত। কিন্তু আমি বুঝে গিয়েছিলুম যে, বিস্তর ঘোরাঘুরি করতে হবে, তাই গাড়িতেই যাই। একটু ঘুরপথে গিয়েছিলুম। পাছে ট্র্যাফিক-জ্যামে আটকে যাই, তাই বি. টি. রোড ধরে, দক্ষিণেশ্বরে গঙ্গা পেরিয়ে, খানিকটা এগিয়ে, বাঁদিকে টার্ন নিয়ে, লিঙ্ক রোড দিয়ে এন. এইচ. সিক্স ধরে এগোই। তাতে বেশ কয়েক মাইল বেশি কভার করতে হল বটে, কিন্তু

ট্র্যাফিক জ্যামে পড়তে হল না বলে বিকেল পাঁচটার মধ্যেই রহমতপুরে পৌঁছে গেলুম।'

ডাক্তার গুপ্ত বললেন, 'ওইখানেই তো নকুলদের বাড়ি, তাই না?'

কৌশিক বলল, 'হ্যাঁ। কুড়ি-পঁচিশ ঘর লোক নিয়ে ছোট্ট গ্রাম। মেচেদা ছাড়িয়ে এন. এইচ. সিক্স ধরে আরও খানিকটা এগিয়ে ডাইনে একটা কাঁচা রাস্তায় নেমে একটু ভেতরে ঢুকে যেতে হয়। বিশ্বাসদের বাড়িতে যাব বলতে একটা লোক আমাকে বাড়িটা দেখিয়ে দিল। তো সেখানে নকুলের এক ভাই থাকে। বড় ভাই। বয়েস মনে হল পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন। অবস্থা যে মোটেই সুবিধের নয়, সে তার জামাকাপড় আর চেহারা দেখলেই বোঝা যায়। নিজের থেকেই লোকটা সে-কথা বললও। নাম শুনলুম যুধিষ্ঠির।'

'সুতরাং যা বলল, তা যে মিথ্যে, এমন কথা ভাবা-ই চলে না।' ডাক্তার গুপ্ত বললেন, 'কিন্তু যুধিষ্ঠিরের অন্য সব ভাই, মানে ভীম অর্জুন আর সহদেব, তারা কোথায় থাকে?'

কৌশিক হেসে বলল, 'কথাটা নেহাত মন্দ বলেননি। নকুলের বাবার সম্ভবত পাঁচ ছেলেরই প্ল্যান ছিল, তবে নকুল অব্দি এগিয়েই তিনি মারা যান, ফলে সহদেব আর জন্মাতেই পারল না। চার ছেলের নাম অবশ্য মহাভারতের সঙ্গে মিলিয়েই রাখা। যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন আর নকুল। ভীম আর অর্জুন কোথায় থাকে, যুধিষ্ঠিরের তা জানা নেই। নকুলের খবরও বছর দশেক রাখে না। আগে-আগে মাঝেমধ্যে দাদাকে পাঁচ-দশ টাকা পাঠাত; বিয়ে করবার পর থেকে সেটা বন্ধ হয়ে যায়।'

গঙ্গাধর সামন্ত বললেন, 'নকুল যে মারা গেছে, এই খবর শুনে কী বলল?'

কৌশিক বলল, 'সেইটেই তো তাজ্জব ব্যাপার। বলল, 'তাই বুঝি? তা হবে।' মানে রি-অ্যাক্টই করল না। অথচ, নকুল তার ছোট ভাই। ভাবা যায়? কী হয়েছিল, তাও পর্যন্ত জিগ্যেস করল না।'

ডাক্তার গুপ্ত বললেন, 'তারপর?'

'তারপর আর কী, সেখান থেকে চলে এলুম। সন্ধে হয়ে গিয়েছিল, তাই সেদিন আর উজিয়ে আসিনি। উজিয়ে এলে লাভও হত না। রাত করে যদি বিষ্ণুহাটিতে পৌঁছতুম, তো যমুনার বাপের বাড়িটা নিশ্চয় খুঁজে পাওয়া যেত, তবে অসুবিধেয় পড়তুম রাত কাটাবার জায়গা নিয়ে। সেদিন তাই নদীর এ-পারে দাইনানেই রয়ে গেলুম আমি।'

'জায়গা পাওয়া গেল?'

'ওসব নিয়ে কোনও সমস্যা হয়নি।' কৌশিক বলল, 'হাওড়া আর মেদনিপুর, দুটো জেলার দুই এস. পি -কেই মামাবাবু ফোন করে দিয়েছিলেন তো; কোথায়-কোথায় যাব, তাও তাঁদের জানিয়ে দিয়েছিলেন। তা রহমতপুরেই দেখলুম, পুলিশের একজন লোক আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। দাইনান তো রূপনারানের ধারে। সে-ই সেখানে একটা বাংলোয় পৌঁছে দিয়ে গেল আমাকে।'

ডাক্তার গুপ্ত বললেন, 'তা রাতটা সেখানে কাটিয়ে তারপর মঙ্গলবার ভোরবেলাতেই নদীর এপারে বাগনানে চলে এলে?'

কৌশিক বলল, 'একেবারে ভোরবেলাতেই যে দাইনান থেকে বেরিয়ে পড়েছিলুম, তা নয়। দেখলুম, খাওয়াটা দাইনান থেকে চুকিয়ে যাওয়াই ভালো। বাগনানে পৌঁছলুম দেড়টা-দুটো নাগাদ। সেখানে প্রথমেই গেলুম থানায়। থানা-অফিসার বললেন, হাওড়ার এস. পি. তাঁকে সোমবারেই জানিয়ে রেখেছেন যে, আমি বাগনানে গিয়ে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করব। চমৎকার লোক, বললেন যে, দরকার হলে তিনি আমার সঙ্গে একজন লোক দিতে পারেন। বিষ্ণুহাটির পথের ডিরেকশান তো তাঁর কাছেই পেলুম। জিপও দিতে চাইলেন। আমি বললুম, বৃষ্টি তো আর হয়নি, রাস্তা জায়গায়-জায়গায় কাঁচা বটে, তবে কাদা-টাদা যখন নেই, একেবারে শুকনো খটখটে, তখন আর জিপ নেব না। আর তা ছাড়া পুলিশের জিপ নিয়ে গেলে অসুবিধে হতে পারে, ভয় পেয়ে লোকে হয়তো কথাই বলতে চাইবে না। আর, কেউ যদি না কথাই বলে তো খবর পাব কী করে?'

গঙ্গাধর সামন্ত বললেন, 'খবর পাওয়া গেল?'

কৌশিক বলল, 'তা গেল বইকী। মারাত্মক সব খবর। আসলে রহমতপুরে যে এক্সপিরিয়েন্স হয়েছিল, তাতে আমি একটু দমেই গিয়েছিলুম। ভেবেছিলুম যে, এখানেও ওই একই ব্যাপার হবে। তা কিন্তু হল না। বিষ্ণুহাটিতে গিয়ে পৌঁছবার পর ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই একটার-পর-একটা খবর পেতে লাগলুম। খবর তো নয়, তাজা এক-একটা বোমা।'

সামন্তমশাই নড়ে-চড়ে বসলেন। বললেন, 'তার মানে?'

'বলছি, সব বলছি।' কৌশিক তার পকেট থেকে একতাড়া কাগজ বার করে বলল, 'বুধবার অর্থাৎ গতকাল সারাটা সকাল নৌপালার বাংলোয় বসে এই রিপোর্ট তৈরি করেছি। যাবতীয় খবর রয়েছে এখানে। সব ডিটেলসে বলব?'

ভাদুড়ীমশাই বললেন, 'রিপোর্টটা আমি কালই পড়েছি। আপনারা আপাতত সংক্ষেপে সব শুনুন। রিপোর্টটা না হয় পরে সময় করে দেখে নেবেন।'

কাগজের তাড়া পকেটে পুরে কৌশিক বলল, 'সেই ভালো। খবরগুলো আপাতত সংক্ষেপে বলছি। আমার প্রথম খবর, বিষ্ণুচরণ আর যমুনার সম্পর্ক মোটেই মামাতো-পিসতুতো ভাইবোনের নয়।'

সামন্ত বললেন, 'সে কী!'

'ওদের বাড়ি একই গ্রামে। যমুনার চেয়ে বিষ্টু বছর চার-পাঁচেকের বড়, তাই দাদা বলত। ওসব মামাতো ভাইটাই স্রেফ বাজে কথা। যমুনার সঙ্গে বিষ্টুর বিয়ের কথাও হয়েছিল, কিন্তু সেটা ভেস্তে যায়।'

ডাক্তার গুপ্ত বললেন, 'কেন?'

কৌশিক বলল, 'সেটাই হচ্ছে দ্বিতীয় খবর। আপনাদের ধারণা বিষ্টুর অবস্থা খুব খারাপ, চাকরি-বাকরির চেষ্টায় কলকাতায় এসে সে তাই তার ভগ্নীপতির কাছে আশ্রয় নিয়েছিল।'

গঙ্গাধর সামন্ত বললেন, 'কথাটা ঠিক নয়?'

'মোটেই ঠিক নয়।' কৌশিক বলল, 'বিষ্টু খুবই ধনী পরিবারের ছেলে। গাঁয়ের লোকেদের কাছে শুনলুম, স্বনামে-বেনামে বিষ্টুর বাবার বিস্তর জমিজমা তো আছেই, তার সঙ্গে আছে তেজারতি ব্যাবসা। গয়নাগাঁটি বন্ধক রেখে তিনি গাঁয়ের মানুষকে টাকা ধার দেন। সুদের হার অসম্ভব রকমের চড়া, ফলে সুদে-আসলে মিলিয়ে অঙ্কটা যা দাঁড়ায়, তাতে বারো-আনা লোকের পক্ষেই আর পাওনাগণ্ডা মিটিয়ে তাদের গয়নাগাঁটি ফেরত নেওয়া সম্ভব হয় না, বিষ্টুর বাবা কেষ্টচরণের লোহার সিন্দুকে জমতে-জমতে সেগুলো পাহাড় হয়ে যায়।'

সামন্ত বললেন, 'বিষ্টু যে বড়লোকের ছেলে, নকুল তা জানত না? এ তো বড় তাজ্জব কথা। আরে মশাই, নকুল তো ওই গ্রামেরই জামাই। মাঝেমধ্যে শ্বশুরবাড়িতে যেতও নিশ্চয়। তা হলে সে এটা জানবে না কেন?'

'সেইটেই তো মজার ব্যাপার।' কৌশিক বলল, 'আপনি বলছেন, শ্বশুরবাড়িতে মাঝেমধ্যে যেত নকুল। মানে এটাই আপনার বিশ্বাস। তা বিশ্বাসটা যে একেবারে অবাস্তব, তা-ও নয়। কিন্তু গ্রামের লোকরা বলছে, সেই বিয়ের রাত্তিরে নকুল বিষ্ণুহাটিতে গিয়েছিল, তারপরে আর একবারও সে ও-মুখো হয়নি।'

ডাক্তার গুপ্ত বললেন, 'বলো কী হে?'

কৌশিক বলল, 'আমি কিছুই বলছি না। গাঁয়ের লোকেদের কাছে যে খবর পেয়েছি, সেটাই আপনাদের শোনাচ্ছি মাত্র।'

ডাক্তার গুপ্ত বললেন, 'নকুল কেন শ্বশুরবাড়ি যেত না, সেসব কথা কিছু জানতে পারলে?'

'জানবার চেষ্টা করেছিলুম। তবে যাকেই জিগ্যেস করেছি, সে-ই বলেছে যে, কেন যেত

না, তা সে জানে না।'

'যমুনার বাপের বাড়ির অবস্থা কেমন?'

'খুব খারাপ। নুন আনতে পান্তা ফুরোয় বলে একটা কথা আছে না? প্রায় সেইরকম।'

'বাপ-মা বেঁচে আছে?'

'বিয়ের সময় বেঁচে ছিল, তার কিছুদিন পরেই তারা মারা যায়। থাকবার মধ্যে ভিটের ওপরে একটা ঘর আছে। আর আছে একটা ভাই। তার সঙ্গে দেখা করেছিলুম। কাছেই একটা ইটখোলায় সে মজুর খাটে।'

'সে কিছু বলল?'

'ভগ্নীপতির নাম করতেই খেপে গেল সে। খেপবারই কথা। নকুল যখন শ্রীমানী মার্কেটের কাছে থাকত, বাপ মরবার পর যমুনার এই ভাই তখন নাকি সেখানে একবার গিয়েছিল। গিয়েছিল বাপের শ্রাদ্ধের জন্যে কিছু টাকা চাইতে। তা ভগ্নীপতি তাকে দূর-দূর করে তাড়িয়ে দেয়।'

ভাদুড়ীমশাই বললেন, 'নকুল যে শ্বশুরবাড়িতে যেত না কেন, সেটা আন্দাজ করা তা হলে শক্ত হবে কেন? বিয়ের রাত্তিরেই সে বুঝতে পেরেছিল নিশ্চয় যে, এদের অবস্থা খুবই খারাপ, সুতরাং বেশি মাখামাখি করাটা ঠিক হবে না, ওসব করতে গেলে এরা তার ঘাড়ে চেপে বসতে পারে। সম্ভবত সেইজন্যেই সে আর ও-মুখো হয়নি।'

ডাক্তার গুপ্ত বললেন, 'তা তো হতেই পারে।'

কৌশিক বলল, 'কারণ যা-ই হোক, নকুল তার শ্বশুরবাড়িতে সেই বিয়ের দিনের পরে আর একদিনও যায়নি। তবে গাঁয়ের লোকেদের কাছে শুনলুম, নকুল না-গেলেও যমুনা যেত। দু-মাস তিন-মাস অন্তর-অন্তরই যেত। যাওয়া তো খুব শক্ত নয়। হাওড়া থেকে রেলগাড়িতে উঠে বাগনানে নেমে পড়লেই হল। ওখান থেকে বিষ্টুহাটিতে বাসেও যাওয়া যায়, আবার সাইকেল-রিকশাও তো সব-সময়েই চলছে। বাপের বাড়িতে যেতে যমুনার তাই কোনও অসুবিধে ছিল না। যেত, বিষ্টুর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎও হত। গাঁয়ে এই নিয়ে কানাঘুষো হত না, এমনও নয়। যাই হোক, যমুনাও নাকি ইদানীং আর বাপের বাড়ি যেত না। অন্তত গত তিন বছরের মধ্যে যায়নি।'

ভাদুড়ীমশাই বললেন, 'বিষ্ণুচরণও তো গত তিন বছর ধরেই নকুলদের সঙ্গে রয়েছে, তাই না?'

সামন্ত তাঁর নোটবইয়ের পাতা চটপট উলটে বললেন, 'হ্যাঁ, ঠিক তিন বছর।'

ভাদুড়ীমশাই বললেন, 'দ্যাট এক্সপ্লেনস!'

ডাক্তার গুপ্ত বললেন, 'একটা কথার উত্তর কিন্তু এখনও পাইনি, বাবা। বিষ্টুচরণের সঙ্গে যমুনার তো বিয়ে হবার কথা হয়েছিল, ভেস্তে গেল কেন?'

'ভেস্তে গেল বিষ্টুর বাবার আপত্তিতে।'

'কী যেন নাম বললেন লোকটার? কেষ্টচরণ, তাই না?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ,' কৌশিক বলল, 'এ হল কেষ্টবিষ্টুর ব্যাপার। বিষ্টুর সঙ্গে মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে যমুনার বাবা গিয়েছিলেন কেষ্টচরণের কাছে। কেষ্ট তো শুনেই বোমার মতো ফেটে পড়লেন। একে তো যমুনার বাপ বংশে ছোট, তার ওপরে আবার তাঁর আর্থিক অবস্থাও যাচ্ছেতাই, ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলোয় না, কেষ্টচরণ নাকি তাঁকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেন, ওই শুধু ঘাড়ধাক্কাটা দিতেই যা বাকি রেখেছিলেন। তিনি বিশাল বড়লোক, অমন হা-ঘরের মেয়েকে ঘরে ঠাঁই দেবেন কেন? কাছাকাছি আর-এক গ্রামের এক ব্যবসায়ীর গলায় গামছা দিয়ে পঞ্চাশ হাজার টাকা বরপণ আর পঁচাশি ভরি গয়না নিয়ে তাঁর মেয়েকে তিনি পুত্রবধূ করে এনে ঘরে তুললেন।'

'তারপর?'

'তারপরে ঘটল এক ভয়ংকর ঘটনা। বিয়ের মাস ছয়েক বাদে এক সকালবেলায় দেখা গেল,

বিষ্টুদের বাড়ির ঠাকুরদালানের উঠোনে সেই নতুন বউয়ের রক্তাক্ত লাশ পড়ে রয়েছে, ওদিকে ঠাকুরঘরের ভেতর থেকে...।'

'বিগ্রহটি উধাও নিশ্চয়?' ডাক্তার গুপ্ত প্রশ্ন করলেন।

কৌশিক হাসল। বলল, 'বিগ্রহ তো এক্ষেত্রে একটি শালগ্রাম শিলা। কিছুকাল ধরেই মন্দিরে-মন্দিরে চোরের উৎপাত খুব চলছে বটে, যেমন বিগ্রহ তেমনি আনুষঙ্গিক অন্য নানা জিনিসও নেহাত কম উধাও হচ্ছে না, তবে কিনা এসব জিনিস চুরি হচ্ছে মূলত তার আর্ট-ভ্যালুর জন্যে, বিদেশে যার প্রচণ্ড বাজার-দর। কিন্তু শালগ্রাম-শিলার তো কোনও আর্ট-ভ্যালু নেই, অথচ আপনি ঠিকই ধরেছেন, সেই শিলাটিই এক্ষেত্রে হাপিস হয়ে গেল। তাজ্জব ব্যাপার, তাতে আর সন্দেহ কী! চোর যে কেন শালগ্রাম শিলা চুরি করতে গেল, সেটাই বুঝতে পারছি না।'

গঙ্গাধর সামন্ত বললেন, 'পুলিশ কেস হয়েছিল?'

কৌশিক বলল, 'তা হয়েছিল বইকী। তবে, তখন যিনি থানা-অফিসার ছিলেন, তিনি বললেন, এও আসলে চুরির ব্যাপার। বিগ্রহ চুরি করবার জন্যে চোর এসে মন্দিরে ঢুকেছিল, আর শেষ-রাত্তিরে ঘুম থেকে উঠে নতুন বউ গিয়েছিল পুজোর ফুল তুলতে। বাস, হঠাৎ সে চোরের সামনে পড়ে যাওয়াতেই এই বিপত্তি। তার মাথা না ফাটিয়ে চোরের কোনও উপায় ছিল না।'

'চুরি করবার মতো আর-কিছু ছিল সেখানে?'

'ছিল বইকী।' কৌশিক বলল, 'পঞ্চপ্রদীপটাই তো ছিল। তার প্রদীপের অংশটা পিতলের বটে, কিন্তু পিলসুজের অংশটা সোনার পাতে বাঁধানো। ছিল রুপোর বিস্তর বাসনও। চোর সে-সব ছুঁয়েও দেখেনি, বউটাকে মেরে স্রেফ শালগ্রাম শিলা নিয়ে সে পালিয়েছে।'

ভাদুড়ীমশাই বললেন, 'গ্রামের লোকেরা এই ব্যাপারে তোকে কী জানিয়েছে, সেটাও তা হলে এঁদের বল।'

কৌশিক বলল, 'গ্রামের লোকেরা বলে, বউকে মেরেছে বিষ্টুচরণই। বউটা বড়লোকের মেয়ে বটে, কিন্তু যেমন মোটা, তেমনি কালো, তাই মাথা ফাটিয়ে বিষ্টুই তাকে মেরেছে। ব্যাপারটা অবশ্য বেশিদূর গড়ায়নি। তার কারণ, কেষ্টচরণ একে বড়লোক, তায় পঞ্চায়েতের কর্তাব্যক্তি। তা ছাড়া কাকে কীভাবে তুষ্ট করতে হয়, তাও তিনি বেশ ভালোই জানেন। ফলে গোটা ব্যাপারটাই ধামাচাপা পড়ে গেল।'

সামন্ত বললেন, 'বউয়ের মাথা কী দিয়ে ফাটানো হয়েছিল?'

'তা কেউ জানে না। পুলিশও না।' কৌশিক বলল, 'যেমন পীতাম্বর চৌধুরি লেনের ঘটনায়, তেমনি হাওড়ার গ্রামের এই ঘটনাতেও মার্ডার-ওয়েপনের কোনও হদিশ নাকি মেলেনি।'

ভাদুড়ীমশাই বললেন, 'কেষ্টচরণের মন্দিরে নিশ্চয় নতুন শালগ্রাম শিলা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে?'

'তা তো হয়েছেই।'

'বাড়িতে ইঁদারা আছে?'

'নেই।'

'পুকুর আছে?'

'তা আছে।' কৌশিক বলল, 'পুকুর বললে কমই বলা হয়। বিরাট দিঘি।'

ভাদুড়ীমশাই আমার দিকে তাকালেন। হাসলেন একটু। তারপর বললেন, 'মুকুন্দপুরে মনসামূর্তির কথা মনে পড়ছে?'

'তা পড়ছে বইকী।' আমি বললুম, 'সেখানে তো মূর্তি দিয়েই মাথা ফাটানো হয়েছিল।'

'এখানেও সম্ভবত শালগ্রাম-শিলা দিয়েই মাথা ফাটানো হয়েছে।' ভাদুড়ীমশাই বললেন, 'দিঘিতে জাল ফেলে ভালোভাবে তল্লাশ চালালেই মনে হয় মার্ডার-ওয়েপনটা খুঁজে পাওয়া যেত।'

॥ ১৮ ॥

সবাই একেবারে চুপ। কেউ কোনও কথা বলছে না। প্রথম কিস্তির চা আর জলখাবার অনেকক্ষণ আগেই শেষ হয়েছে। এবার দ্বিতীয় কিস্তির চা নিয়ে মালতীদের কাজের লোকটি এসে ঘরে ঢুকল। হাত বাড়িয়ে ট্রে থেকে তাঁর চায়ের পেয়ালা তুলে নিলেন গঙ্গাধর সামন্ত। পেয়ালায় চুমুক দিয়ে বললেন, 'গোটা ব্যাপারটাই দেখছি অন্য-দিকে ঘুরে যাচ্ছে।'

কৌশিক বলল, 'মজাটা কী জানেন? বিষ্টুচরণের বাবার সঙ্গে আমি দেখা করেছিলুম। নিজের পরিচয় অবশ্য দিইনি। বলেছিলুম যে, কলকাতায় তাঁর ছেলের সঙ্গে আমার খুব চেনাশোনা, মাঝে-মাঝেই আমাদের দেখা-সাক্ষাৎ হয়। তাতে বিষ্টুচরণের বাবা যা বললেন, তাতে তো আমি অবাক। ভদ্রলোক আমাকে জিগ্যেস করলেন যে, বিষ্টু যেখানে থাকে, সেই হোটেলে তো খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা খুব ভালো নয়, সে কি এর মধ্যে নতুন কোনও হোটেলের সন্ধান পেয়েছে?'

সামন্ত বললেন, 'তার মানে? বিষ্টু যে গত তিন বছর ধরে নকুলের বাড়িতে রয়েছে, তার বাবা তা জানেই না?'

কৌশিক বলল, 'জানেন না বলেই তো মনে হল। ভদ্রলোকের ধারণা, বিষ্টু হোটেলে থাকে। কথায়-কথায় হোটেলটার নামও বললেন তিনি। মির্জাপুর এলাকার হোটেল। নাম 'শান্তিধাম'। বিষ্টুর নামে ফি মাসে তিনি ওই হোটেলের ঠিকানাতেই টাকা পাঠান। চিঠিও লেখেন ওই ঠিকানাতেই।'

সামন্ত বললেন, 'এখান থেকে একটা ফোন করতে পারি?'

ভাদুড়ীমশাই বললেন, 'বিলক্ষণ। কিন্তু তার দরকার হবে না। থানায় ফোন করে হোটেলে খোঁজ নিতে বলবেন তো?'

'হ্যাঁ।'

'কিচ্ছু দরকার নেই। আজ সকালেই কৌশিক ওখানে গিয়েছিল। হোটেলের ম্যানেজার বললেন, বিষ্টু ওখানে থাকে না, তবে হোটেলের ঘরটাও সে ছাড়েনি। প্রতি সোমবারে একবার করে সে হোটেলটায় যায়। চিঠিপত্র থাকলে নিয়ে আসে।'

'কিন্তু টাকা?' সামন্ত বললেন, 'বাবার কাছ থেকে তো নিয়মিত তার নামে টাকা আসে, হোটেলে তার হয়ে সে-টাকা রিসিভ করে কে?'

'সে-খবরও কি আর নেওয়া হয়নি ভাবছেন? টাকা রিসিভ করেন হোটেলের ম্যানেজার। তাঁকে 'লেটার অভ অথরিটি' দেওয়াই আছে। না, সামন্তমশাই, হোটেলে লোক পাঠাবার দরকার নেই। তবে হ্যাঁ, থানায় একটা ফোন বোধহয় করাই ভালো। জানিয়ে দিন যে, পীতাম্বর চৌধুরি লেনে যে-লোকটাকে আপনি পাহারায় রেখেছেন, এক্ষুনি লোক পাঠিয়ে তাকে একটা কথা বলে দেওয়া দরকার।'

'কী বলে দিতে হবে?'

'বলতে হবে যে, বিষ্টুকে সে যেন বাড়ি থেকে আপাতত বেরুতে না দেয়। কথাটা বলছি কেন জানেন? সাধারণত সোমবার-সোমবারে বিষ্টু ওই হোটেলটায় যায় বটে, কিন্তু বলা তো যায় না, হঠাৎ যদি সে আজ একবার যায় ওখানে, আর গিয়ে শোনে যে, তার সম্পর্কে ওখানে খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে, তাহলে সে যে ভয় পেয়ে গা-ঢাকা দেবে না, তার তো কোনও নিশ্চয়তা নেই। নাঃ, কথাটা আমার আগেই ভাবা উচিত ছিল।'

সামন্তমশাই উঠে গিয়ে ফোন করে ফের ফিরে এলেন। তারপর ধপাস করে তাঁর সোফাটায় বসে পড়ে বললেন, 'ওরেব্বাবা, এ তো দেখছি ভয়ংকর ব্যাপার। কেস তো একেবারেই ঘুরে গেল! আর আমি কিনা ভাবছি সদানন্দ বসুই কালপ্রিট, আর একটু চাপ দিলেই তাঁর কাছ থেকে কনফেশনটা আদায় করে নেওয়া যেত।'

ভাদুড়ীমশাই বললেন, 'আর একটু চাপ মানে? খানিকটা চাপ কি অলরেডি দিয়েছেন নাকি? পুরো পাঁচদিন তো ভদ্রলোককে একেবারে মুঠোর মধ্যে আপনি পেয়েছিলেন। কনফেশন আদায় করবার জন্যে থার্ড ডিগ্রির ব্যবস্থা করেননি তো?'

গঙ্গাধর সামন্ত বললেন, 'আরে না-না, আপনারা কি আমাদের অমানুষ ভাবেন নাকি? মারধরের কথা ভাবছেন নিশ্চয়? ওসব কিছু হয়নি। ওই আমাদের কনস্টেবল রামশরণ পাণ্ডেকে দিয়ে দু-চারটে চড়-থাপ্পড় মারাবার ব্যবস্থা করেছিলুম মাত্র, তাকে নিশ্চয়ই মারধর বলবেন না আপনারা? ওটুকু তো করতেই হয়।'

ভাদুড়ীমশাই বললেন, 'ছি-ছি, মানী লোক, বয়েসও হয়েছে সত্তর বছর, তাঁকে চড়-থাপ্পড় লাগাবার ব্যবস্থা করলেন? ছি-ছি, মিস্টার সামন্ত কাজটা মোটেই ভালো করেননি।'

সামন্ত কুণ্ঠিতভাবে বললেন, 'তা নিশ্চয় করিনি। কিন্তু কী করব বলুন, আমি তো ধরেই নিয়েছিলুম যে, এটা একেবারে 'ওপন অ্যান্ড শাট' কেস।'

কৌশিকের সবই ভালো, কিন্তু একটু মুখফোঁড়। গঙ্গাধর সামন্তের দিকে তাকিয়ে বাঁকা হেসে সে বলল, 'আজকাল খুব অ্যামেরিকান ক্রাইম-স্টোরি পড়ছেন বুঝি?'

গঙ্গাধর সামন্ত বললেন, 'কেন, কেন, একথা বলছেন কেন?'

কৌশিক বলল, 'না মানে মার্কিন গোয়েন্দা-গল্পে ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নিরা প্রায়ই ওরকম ধরে নেয় কিনা, তাই বলছি। তবে শেষপর্যন্ত অবশ্য দেখা যায় যে, তারা সাপ ধরতে গিয়ে ব্যাং ধরেছিল।'

সামন্ত বললেন, 'ঠাট্টা করছেন? করুন। ভুল যখন একটা হয়েই গেছে, তখন এই ধরনের কথা তো কিছু শুনতেই হবে। কিন্তু একটা কথা আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না।'

ভাদুড়ীমশাই বললেন, 'ভুল সকলেরই হতে পারে। আমিও বিস্তর ব্যাপারে বিস্তর ভুল করেছি। ভুল এক্ষেত্রে কৌশিকেরও হতে পারত। বিষ্ণুহাটিতে গেলেই যে নির্ভুল নিশানা মিলবে, ও-ই কি সেটা জানত নাকি? সত্যটা যে কী, সেটা তো আর ও হিসেব কষে বার করেনি, ভাগ্য ওকে সাহায্য করেছে, হি জাস্ট স্টাম্বলড অন ইট।'

বুঝতে পারলুম যে, সামন্তকে একটা মারাত্মক লজ্জার হাত থেকে বাঁচাবার জন্যেই ভাদুড়ীমশাই একথা বলছেন। নয়তো আমি ভালোই জানি যে, ভাদুড়ীমশাইয়েব প্রতিটি পদক্ষেপ একেবারে হিসেব কষে করা। তিনি ঠিকই বুঝতে পেরেছিলেন যে, সদানন্দবাবু খুনি নন, তাহলে বাকি থাকে যমুনা আর বিষ্টুচরণ। খুন করবার সুযোগ ছিল তাদেরও। শুধু খুনের কোনও মোটিভ তাদের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছিল না। সেই মোটিভের সন্ধানেই কৌশিককে তিনি রহমতপুরে আর বিষ্টুহাটিতে পাঠিয়েছিলেন।

ভাদুড়ীমশাই একটা সিগারেট ধরালেন। তারপর সামন্তকে বললেন, 'কোন কথাটা আপনি বুঝতে পারছেন না বলুন তো। দেখি বুঝিয়ে দিতে পারি কি না। পারব যে, এমন কথা বলছি না কিন্তু। তবে চেষ্টা করতে পারি।'

সামন্ত বললেন, 'বিষ্টুচরণের সঙ্গে যমুনার বিয়ের কথা হয়েছিল তা অন্তত দশ বছর আগে। অর্থাৎ এটা অনেক দিনের পুরোনো ব্যাপার। অথচ কার্যত দেখছি, সেই পুরোনো ব্যাপারের জের দশ বছর বাদেও মেটেনি। সত্যি কি এমন হতে পারে নাকি? হওয়া সম্ভব?'

ভাদুড়ীমশাই বললেন, 'কথাটা আপনি মন্দ বলেননি। এমন প্রশ্ন উঠতেই পারে। তবে কী জানেন, ব্যাপারটা পুরোনো হলেও প্রেমটা পুরোনো নয়। আগুনটা ধিকিধিকি জ্বলছিলই। জ্বলত না, যদি যমুনা মাঝে-মাঝেই বাপের বাড়িতে না যেত। কিন্তু সে যেত, আর গাঁয়ের লোকেরা যদি না মিথ্যে কথা বলে থাকে, তবে বিষ্টুচরণের সঙ্গে তখন দেখা-সাক্ষাৎ হত তার। অর্থাৎ প্রেমের আগুনটা একেবারে নিবে যাবার সুযোগই ইতিমধ্যে পায়নি। আর তারপরে তো বিষ্টুচরণ কলকাতাতেই চলে এল। কিছুদিন একটা হোটেলে কাটিয়ে তারপর উঠলও গিয়ে নকুলের বাড়িতে। ফলে এতদিন যা ধিকিধিকি করে জ্বলছিল, সেই আগুন একেবারে দাউদাউ করে জ্বলে উঠল।'

সামন্তমশাই বললেন, 'তা তো বুঝলুম, কিন্তু নিজের শালাটিকে তো দূর-দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছিল নকুল। তা হলে যমুনা যাকে মামাতো ভাই বলছে, সেই মামাতো শালাটিকে সে তার ঘাড়ে চেপে বসতে দিল কেন? তাকেও তো নকুল ঘাড়ধাক্কা দিয়ে তাড়াতে পারত। বলুন, পারত না?'

'তা পারত বইকী।' ভাদুড়ীমশাই বললেন, 'কিন্তু তাড়ায়নি কেন, তাও তো আপনার না বোঝবার কথা নয়। নকুলের জমাখরচের যাবতীয় খাতা তো আপনি সিজ করেছেন; আমি দেখতে চেয়েছিলুম বলে কৌশিকের হাত দিয়ে সেগুলো পাঠিয়েও দিয়েছেন আমার কাছে। তা আপনি নিজে কি সেগুলি একবারও পড়ে দেখেননি?'

সামন্ত বললেন, 'নিশ্চয় পড়েছি। কেন, ওর মধ্যে কিছু আছে নাকি?'

'আছেই তো। গত তিন বছর ধরে প্রত্যেক মাসের একেবারে পয়লা তারিখেই দেখবেন জমার ঘরে লেখা রয়েছে বি—৫০০.০০ টাকা। ওটার অর্থ বোধহয় আপনি বুঝতে পারেননি। বি মানে বিষ্টুচরণ। প্রতি মাসে সে তার খাইখরচা বাবদ নকুলের হাতে পাঁচশো টাকা তুলে দিত। থাকত মাছের আড়তের এক কোণে, খেতও এমন-কিছু হাতি ঘোড়া নয়, অথচ তারই জন্যে মাসে-মাসে লোকটা পাঁচশো টাকা দিয়ে যাচ্ছে। এমন হাতের লক্ষ্মীকে কেউ পায়ে ঠেলতে পারে? নকুলও পারেনি। তবে আমার ধারণা, টাকার লোভে বিষ্টুচরণকে সে তার বাড়িতে থাকতে দিয়েছিল বটে, তবে শেষের দিকে হয়তো একটু-একটু সন্দেহ করতেও শুরু করেছিল। চেঁচামেচির সেটাই সম্ভবত মস্ত কারণ।'

ভাদুড়ীমশাই একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন। সিগারেটটা নিবে গিয়েছিল। অ্যাশট্রেতে পিষে দিলেন সেটাকে। তারপর বললেন, 'আমার ধারণা, মাঝরাত্তিরে মত্তাবস্থায় বাড়িতে ফিরে চেঁচামেচি করবার সময়ে যমুনা আর বিষ্টুচরণের সম্পর্ক নিয়ে ইদানীং এমন দু-একটা কথাও সে হয়তো বলতে শুরু করেছিল, যাতে ওরা ভয় পেয়ে যায়। হয়তো তখন থেকেই ওরা নকুলকে সরিয়ে দেবার প্ল্যান আঁটতে থাকে। সদানন্দ যে নকুলকে তাড়াতে চাইছিলেন, জল আর লাইট কেটে দিয়েছিলেন, তাতে আরও সুবিধে হয়ে যায় ওদের। ওরা বুঝতে পারে, নকুল যদি খুন হয়, তা হলে সন্দেহটা সরাসরি সদানন্দবাবুর ওপরে গিয়ে পড়বে। সামন্তমশাই, ওরা যে ভুল বুঝেছিল, অন্তত আপনি তো সে-কথা বলতে পারেন না। আপনি যে সদানন্দ বসুকেই খুনি বলে ধরে নিয়েছিলেন, তাতে তো আর সন্দেহ নেই।...না-না, আমি আবার বলছি যে, আপনি অত লজ্জিত হবেন না। এ-ভুল আমারও হতে পারত। কেন হয়নি জানেন?'

ডাক্তার গুপ্ত বললেন, 'কেন?'

ভাদুড়ীমশাই বললেন, 'আমার যে ভুল হয়নি, তার মস্ত কারণ, সদানন্দ বসুর পক্ষে লাঠি দিয়ে যে একটা লোকের মাথা ফাটানো সম্ভব নয়, সেটা আমি বুঝতে পেরেছিলুম।'

'লোহারবল বসানো লাঠি দিয়েও না?'

'না, তাও নয়। জানি, আপনারা কী বলবেন। আপনারা বলবেন যে, বয়েস সত্তর হলেও সদানন্দ বসুর স্বাস্থ্য টসকায়নি। কিন্তু তাঁর চোখের কথাটা আপনারা ভুলে যাচ্ছেন কেন? কিরণবাবুর কাছেই শুনেছি যে, মাত্র কিছুকাল আগে ছানি কাটিয়েছেন সদানন্দবাবু, কিন্তু আগের মতো দৃষ্টিশক্তি এখনও ফিরে পাননি। এখন আপনারাই বলুন, যাঁর দৃষ্টিশক্তি বিশেষ ভালো নয়, আর স্বাস্থ্য মোটামুটি পোক্ত হলেও বয়েস অন্তত সত্তর, সেই মানুষের পক্ষে কি মাত্রই এক-হাতে লাঠি চালিয়ে কারও মাথা ফাটানো সম্ভব?'

সামন্ত বললেন, 'দু-হাতে চালাতে বাধা কোথায়?'

ভাদুড়ীমশাই বললেন, 'বাধা থাকত না, যদি কিনা তাঁর দুটোর বদলে তিনটে হাত থাকত। কিন্তু মুশকিল এই যে, যেমন আমাদের, তেমনি সদানন্দবাবুরও হাত মাত্র দুটি। তার মধ্যে একটা হাতে যদি টর্চ ধরে থাকতে হয়, তো লাঠি চালাবার জন্যে দুটো হাতের সাহায্য তিনি পাবেন কী করে?'

'সিঁড়ির আলো জ্বেলে রাখলে কিন্তু টর্চ জ্বালবার দরকার হয় না।'

'কিন্তু যাকে খুন করা হবে, তাকে সাবধান করে দেওয়া হয়। বাথরুমের দরজা খুলে বেরিয়ে আসবার আগেই নকুল যদি দেখে যে, সিঁড়ির উপরকার ইলেকট্রিক আলোয় সব একেবারে ঝলমল করছে, তা হলে দরজা থেকেই সে সিঁড়ির দিকে তাকাবে নিশ্চয়, আর তখনই সদানন্দবাবুকে দেখতেও পেয়ে যাবে। তখন আর তার মাথা ফাটানো অত সহজ হবে না।'

ডাক্তার গুপ্ত বললেন, 'কিন্তু এমন যদি হয় যে, সদানন্দের স্ত্রীও এর সঙ্গে জড়িত?'

ভাদুড়ীমশাই হেসে বললেন, 'অর্থাৎ কিনা অন্ধকারে যেই নকুলচন্দ্র বাথরুম থেকে বেরিয়েছে, কুসুমবালাও অমনি দোতলা থেকে সুইচ টিপে সিঁড়ির আলো জ্বেলে দিয়েছেন, আর সদানন্দ অমনি দু-হাতে চালিয়েছেন লাঠি? না মশাই, ইউ আর স্ট্রেচিং ইয়োর ইমাজিনেশান টু মাচ। একে তো কুসুমবালা বাতের রুগি, ভালো করে নড়াচড়াই নাকি করতে পারেন না, তার ওপরে আবার তাঁরও বয়স অন্তত পঁয়ষট্টি। দুই অ্যামেচার বুড়োবুড়ি মিলে এইভাবে গোটা ব্যাপারটাকে একেবারে কাঁটায়-কাঁটায় সিনক্রোনাইজ করে একজনকে খুন করেছে, একথা ভাবা-ই চলে না।'

সামন্ত বললেন, অর্থাৎ আপনি বলতে চান যে, বিষ্টুচরণই খুনি?'

ভাদুড়ীমশাই বললেন, 'তার পক্ষেও একাজ করা সম্ভব হয় না, যদি না সে যমুনার সাহায্য পায়। তা, খবর যা মোটামুটি জোগাড় হয়েছে, তাতে তো মনে হয়, যমুনা তাকে সাহায্য করতেই পারে।'

সামন্ত বললেন, 'ঠিক আছে আজই ওদের দুজনকে অ্যারেস্ট করে হাজতে ঢোকাবার ব্যবস্থা করছি।'

ভাদুড়ীমশাই বললেন, 'ওকাজ এখুনি করবেন না। আগে মার্ডার-ওয়েপনটা খুঁজে বার করা চাই। আপাতত ওদের কড়া পাহারায় রাখুন, গ্রেফতার করবার দরকার নেই। তা ছাড়া, নকুলের যে একটা দু-বছরের মেয়ে রয়েছে, তার কথাটাও ভাবুন। বিষ্টু আর যমুনাকে যদি হাজতে ঢোকান, তো ওই দুধের বাচ্চাটাকেও যে মায়ের কাছছাড়া করা যাবে না, সেটা কি ভেবে দেখেছেন?'

একজন এতক্ষণ একটিও কথা বলেননি। এককোণে বসে চুপচাপ অন্যদের কথা শুনে যাচ্ছিলেন। তিনি ডাক্তার চাকলাদার। এইবারে তিনি মুখ খুললেন। বললেন, 'মিস্টার ভাদুড়ীকে একটা কথা বলব বলেই আজ আমি এখানে এসেছি। ভেবেছিলুম, কথাটা একমাত্র উনিই জানবেন। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, আপনারা জানলেও ক্ষতি নেই। শুধু দয়া করে বলুন, কথাটা আপনারা আর-কাউকে জানাবেন না।'

ডাক্তার গুপ্ত বললেন, 'যদি বুঝি যে, কথাটা আর-কাউকে জানাবার দরকার নেই, তাহলে নাহক কেন জানাতে যাব? কী বলবেন, বলে ফেলুন মশাই।'

ডাক্তার চাকলাদার বললেন, 'একটু আগে কমলির কথা হচ্ছিল। আপনাদের ধারণা, ও নকুলের মেয়ে। সেটা ভুল ধারণা।'

গঙ্গাধর সামন্ত বললেন, 'কী বলছেন আপনি?'

'ঠিকই বলছি। যমুনা ও-মেয়ের মা হতে পারে, কিন্তু নকুল বিশ্বাস ওর বাপ নয়।'

॥ ১৯ ॥

গোটা ঘর একেবারে নির্বাক। গঙ্গাধর সামন্তের নোটবইটা তাঁর হাত থেকে খসে মেঝের ওপরে পড়ে গিয়েছিল। তবু যে তার শব্দ আমরা শুনতে পাইনি, তার কারণ আর কিছুই নয়, ডাক্তার অরুণপ্রকাশ সান্যালের এই ড্রয়িং রুমের গোটা মেঝেটাই পুরু কার্পেট দিয়ে মোড়া। নইলে নিশ্চয়

একটা পিন পড়লেও তার শব্দ তখন শোনা যেত।

ডাক্তার চাকলাদারের কথায় যে ধাক্কা লেগেছিল, সেটাকে সামলে নিয়ে ভাদুড়ীমশাই-ই প্রথম তাঁর মুখ খুললেন। বললেন, 'নকুল নয়? তা হলে কে ওর বাপ?'

'সম্ভবত বিষ্ণুচরণ।'

সামন্ত বললেন, 'প্রমাণ কী?'

'প্রমাণ তো কমলির মুখের ওপরেই লেখা রয়েছে।' ডাক্তার চাকলাদার বললেন, 'মেয়ের মুখের সঙ্গে বাপের মুখের এমন আশ্চর্য মিল বড়-একটা চোখে পড়ে না। শনিবার সকালে যখন পাঁচ নম্বর বাড়িতে যাই, মিলটা তখনই আমার চোখে পড়ে। মানে যমুনা যখন তার মেয়েকে কোলে করে আপনার পায়ের সামনে এসে আছাড় খেয়ে পড়েছিল। বিষ্টুচরণও তো সেই সময়ে দাঁড়িয়ে ছিল সেখানে। বিষ্টুর মুখের সঙ্গে কমলির মুখের মিলটা তবু আপনাদের চোখে পড়ল না? আশ্চর্য।

সামন্ত বললেন, 'ব্যাভিচার যে একটা মোটিভ, তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু মুখের মিলকে তো আর ব্যাভিচারের প্রমাণ হিসেবে আদালতে দাখিল করা যাবে না। আসামি পক্ষের উকিল বলবে, অমন একটু-আধটু মিল অনেকের সঙ্গেই অনেকের থাকতে পারে। ওসব মিল-টিলের কথা ছাড়ুন। নকুল যে কমলির বাপ নয়, তার এমন কোনও প্রমাণ কোথায়, আদালতে যা পেশ করলে আমাদের বোকা বনতে হবে না?'

ডাক্তার চাকলাদারকে দেখে মনে হল, তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত হননি। বললেন, 'ঠিক আছে, দরকার যদি হয় তো তেমন প্রমাণই আমি দেব। তাও আমার কাছে রয়েছে।'

সামন্তর ভুরু কুঁচকে গেল। বললেন, 'তাহলে সেটা প্রথম দিনই আমাদের দেননি কেন?'

প্রশ্নটার জবাব দিলেন চাকলাদার। সামন্তর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে তিনি ডাক্তাব সুবেশ গুপ্তের দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, 'কেন যে কিছু-কিছু কথা আমরা গোপন রাখি, একজন পুলিশ-অফিসারের পক্ষে তা বোঝা সম্ভব নয়। কিন্তু মিস্টার গুপ্ত, পুলিশের ডাক্তার হলেও আপনি ডাক্তার তো বটে, আপনি নিশ্চয় বুঝবেন যে, অনেক কথা জেনেও আমরা মুখ খুলতে পারি না, অন্য-কাউকে তার সামান্যতম আভাস দিতেও আমাদের এথিকসে বাধে। তা ছাড়া, এটা বিশ্বাসরক্ষার ব্যাপার। ..রোগী তার ডাক্তারকে বিশ্বাস করে...তাঁকে সে এমন অনেক কথা জানায়, যা হয়তো তার অতি আপনজনকেও সে জানায় না...মানে জানাতে তার সংকোচ হয়...কী হয় না?'

ডাক্তার গুপ্ত বললেন, 'হয় বইকী।'

'অথচ ডাক্তারের কাছে তার কোনও সংকোচ নেই। কেন নেই? না সে ধরেই নিয়েছে যে, ডাক্তারকে সে যা বলছে, আর-কেউ তা ঘুণাক্ষরেও কখনও জানবে না। আমরাও জানি যে, রোগী যা বলছে, তা আমাদের বিশ্বাস করে বলেই বলছে। অন্য কাউকে সেটা জানাবার কোনও প্রশ্নই নেই। জানালে সেটা ব্রিচ অভ ট্রাস্ট হয়ে দাঁড়ায়। কী, আমি ভুল বলছি?'

ডাক্তার গুপ্ত চুপ করে রইলেন, কোনও উত্তর দিলেন না।

চাকলাদার বললেন, 'কী হল, কিছু বলছেন না কেন? যা হোক কিছু বলুন।'

'কী আর বলব, বলবার তো কিছু নেই।' ডাক্তার গুপ্ত মাথা নাড়লেন, 'ইউ আর অ্যাবসলিউটলি রাইট। রোগী আপনাকে বিশ্বাস করে যা বলছে, তা কারও কাছে ফাঁস করবার কোনও প্রশ্নই উঠতে পারে না। ইট উইল বি হাইলি আনএথিক্যাল।...না-না, ওসব কথা কাউকে জানাতে আপনি বাধ্য নন।'

চাকলাদার বিষণ্ণ হাসলেন। বললেন, 'থ্যাঙ্ক ইউ, ডক্টর গুপ্ত। কিন্তু আমার সমস্যা তাতেই মিটছে না। আমি পড়েছি উভয়-সংকটে। আমি যা জানি...মানে আমার পেশেন্ট আমাকে যা বলেছে, আর তাকে পরীক্ষা করে যা আমি জানতে পেরেছি, তা বলাও অন্যায়, আবার না-বলাও অন্যায়। হয়তো না-বলার অন্যায়টাই আরও মারাত্মক।'

সামন্ত বললেন, 'বড্ড হেঁয়ালি হয়ে যাচ্ছে, ডক্টর চাকলাদার। একটু ঝেড়ে কাসুন দেখি।'

সামন্তর কথাটাকে গ্রাহ্যও করলেন না চাকলাদার। তাঁর দিকে একবার ফিরেও তাকালেন না। ভাব দেখে মনে হল যেন তাঁর কথাটা তিনি শুনতেও পাননি। ডাক্তার গুপ্তের দিকেই তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে বললেন, 'আর সেইজন্যেই এখন আমার মনে হচ্ছে যে, কমলিকে কোলে নিয়ে যমুনা যখন তার ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এল, আর তারপর যখন আমি শুনলুম যে, ও নকুলের মেয়ে, তখনই সব কথা আমার জানিয়ে দেওয়া উচিত ছিল। তা যদি জানাতুম, মিস্টার সামন্তর সন্দেহটা তা হলে নিশ্চয় তখনই অন্য দিকে ঘুরে যেত; আর কিছু না-হোক, তিনি বুঝতে পারতেন যে, নকুলকে খুন করবার মোটিভ একমাত্র সদানন্দবাবুরই নয়, অন্যদেরও থাকা সম্ভব। আর তা যদি তিনি বুঝতেন, তা হলে নিশ্চয় তড়িঘড়ি একজন বুড়োমানুষকে থানায় ধরে নিয়ে গিয়ে তাঁর কাছ থেকে কনফেশান আদায় করবার জন্যে তাঁকে চড়চাপড় লাগাবার ব্যবস্থা করতেন না।'

একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন চাকলাদার। তারপর বললেন, 'কথাটা আমার তখনই বলা উচিত ছিল। কিন্তু আমি বলিনি। কেন বলিনি? না পেশেন্টের রোগের ব্যাপারে যাবতীয় গোপনীয়তা আমাদের রক্ষা করতে হয়, ডাক্তারি পেশার সেটা একটা মস্ত শর্ত। সেই শর্তটাকেই আমি মান্য করে চলছিলুম। কিন্তু, ডাক্তার গুপ্ত, আমাকে মার্জনা করুন, কোনও শর্তই এখন আর আমি মান্য করতে পারছি না। আর তা ছাড়া, রোগটা যার, সে তো মারাই গেছে, এখন যদি তার একটা শারীরিক ক্রটির কথা আমি প্রকাশ করি, তবে অন্তত তার তাতে কোনও ক্ষতি হবারও আশঙ্কা নেই।'

কৌশিক বলল, 'কীসের ক্ষতি?'

চাকলাদার বললেন, 'লোকের কাছে উপহাসের, ঠাট্টা-বিদ্রুপের পাত্র হওয়াটাই কি একটা মস্ত বড় ক্ষতির ব্যাপার নয়? সত্যি বলতে কী, অনেকটা সেই কারণেও এসব ক্রটির কথা অনেকে গোপন করে রাখে, রাখতে বাধ্য হয়।'

সামন্ত আবার বললেন, 'বড্ড হেঁয়ালি হয়ে যাচ্ছে, বড্ড হেঁয়ালি হয়ে যাচ্ছে। ওসব আগড়ম-বাগড়ম বাদ দিয়ে এবারে কাজের কথায় আসুন তো। নকুল যে কমলির বাপ নয়, তার প্রমাণ কী?'

এক নিশ্বাসে বিস্তর কথা বলে ফেলে বোধহয় চাকলাদার একটু ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। আকস্মিক উত্তেজনাও বোধহয় তাঁর ক্লান্ত বোধ করবার একটা মস্ত কারণ। এতক্ষণে তিনি সামন্তর দিকে চোখ ফেরালেন। স্থির চোখে তাঁর দিকে তাকিয়েই রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর প্রতিটি শব্দকে পৃথকভাবে উচ্চারণ করে খুব শান্ত গলায় বললেন, 'শুধু কমলি কেন, কারও বাপ হওয়াই নকুল বিশ্বাসের পক্ষে সম্ভব ছিল না।'

সামন্ত বললেন, 'আমি প্রমাণের কথা বলছিলুম। আপনি প্রমাণ দিতে পারেন?'

ভাদুড়ীমশাই এতক্ষণ কোনও কথা বলেননি। চুপচাপ সব শুনে যাচ্ছিলেন। এবারে বললেন, 'তা যে উনি দিতে পারেন, সে তো আগেই বলেছেন।'

কৌশিক বলল, 'আপনার দেখছি অনেক কথাই মনে থাকে না, মিস্টার সামন্ত। রোজ ব্রাহ্মীশাক খেতে শুরু করুন; শুনেছি ওতে মেমারি খুব বেড়ে যায়।'

ভাদুড়ীমশাই তাঁর ভাগনেকে একটা মৃদু ধমক দিয়ে বললেন, 'আঃ, এসব কী হচ্ছে কৌশিক? ছেলেমানুষি কোরো না।'

গঙ্গাধর সামন্তও পালটা কিছু একটা বলবেন বলে কৌশিকের দিকে একবার জ্বলন্ত চোখে তাকিয়েছিলেন, কিন্তু ভাদুড়ীমশাই নিজেই যেহেতু ভাগনেকে ধমকে দিয়েছেন, তাই তিনি আর কৌশিককে কিছু বললেন না, চাকলাদারের দিকে চোখ ফিরিয়ে বললেন, 'মুখের কথায় তো চিঁড়ে ভিজবে না ডক্টর চাকলাদার, আমাকে কেস সাজিয়ে পাবলিক প্রসিকিউটরের হাতে তুলে দিতে হবে, আমি প্রমাণ চাই।'

চাকলাদার বললেন, 'প্রমাণ দিতে না-পারলে কি আর এসব কথা কেউ বলে? তা হলে শুনুন মিস্টার সামন্ত, নকুল তার শরীরের ব্যাপারে যা-কিছু পরীক্ষা করাবার, তা আমাকে দিয়েই করিয়েছিল। তার যে বাপ হবার ক্ষমতা নেই, সেই রিপোর্ট তাকে আমি দিয়েওছিলাম। রিপোর্টের ওরিজিন্যাল তার কাছে ছিল, আর কপিটা আমার ফাইলে। ওরিজিন্যালটা আপনারা নকুলের বাড়িতে খুঁজে দেখতে পারেন। তবে আমার ধারণা, সেখানে সেটা পাবেন না। আপনাদের কথাবার্তা যা শুনলুম, তাতে তো মনে হয় বিষ্টুচরণ অতি ধুরন্ধর ব্যক্তি, রিপোর্টটা সে নিশ্চয় গায়েব করেছে।'

সামন্ত বললেন, 'তল্লাশি চালিয়ে দু-চারটে প্রেসক্রিপশন, নার্সিং হোমের বিল আর টুকটাক কিছু ওষুধপত্রের ক্যাশমেমো পাওয়া গেছে, তবে অমন কোনও রিপোর্ট আমরা পাইনি।'

চাকলাদার বললেন, 'কী করে পাবেন, ওরা সেটা সরিয়ে ফেলেছে। আমার আরও একটা ধারণার কথা আপনাদের বলব?'

ভাদুড়ীমশাই বললেন, 'নিশ্চয় বলবেন। এব্যাপারে যা-কিছু আপনার মনে হয়, সবই খুলে বলবেন। যে লোকটি খুন হয়েছে, আপনি তার ডাক্তার, আপনার প্রতিটি কথাই আমাদের শোনা দবকাব।'

চাকলাদার একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন আবার। মনে হল, কথাটা বলতে তিনি একটু দ্বিধা বোধ করছেন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য দ্বিধাটা কাটিয়ে উঠলেন তিনি। বললেন, 'দেখুন, আমার ভুল হতে পারে, তবু ভেবে দেখলুম যে বলা-ই ভালো। আপনারা হয়তো জানেন না যে, কাল রাত্তিরে আমার চেম্বারে চোর ঢুকেছিল।'

সামন্ত বললেন, 'এঁরা না জানতে পারেন, কিন্তু আমি জানি। ভোরবেলায় আপনার ফোন পেয়ে তো আমি লোকও পাঠিয়ে দিয়েছিলুম আপনার চেম্বারে। ওই যাঃ, নকুলকে আপনি যে রিপোর্ট দিয়েছিলেন, সেটা তো পাঁচ নম্বর বাড়িতে আমরা পাইনি, কিন্তু তার একটা কপি তো আপনার কাছে আছে বলছিলেন, সেটাও কাল রাত্তিরে আপনার চেম্বার থেকে চুরি হয়ে যায়নি তো?'

চাকলাদার বললেন, 'চেম্বারে কোনও দামি জিনিস থাকে না। থাকবার মধ্যে ছিল কিছু কাগজপত্র, নোটবই আর ডায়েরি। চোর সেগুলো নেয়নি, তবে ড্রয়ার, আলমারি আর যাবতীয় কাগজপত্র যেভাবে হাঁটকে দেখেছে, তাতে মনে হয়, কিছু একটা খুঁজে বার করতেই সে এসেছিল। মিস্টার সামন্ত, ওইসব কাগজপত্র তো চেম্বারের মেঝেয় ছত্রখান হয়ে পড়ে আছে। ওর ওপরে, কি টেবিলের ওপরকার কাচের ঢাকনায় কি আলমারিব পাল্লায় কি অন্য কোথাও তাব আঙুলের ছাপ থেকে যাওয়া কিছু বিচিত্র নয়। আপনারা কি সে কথা ভেবে দেখেছেন?'

সামন্ত হেসে বললেন, 'আপনারা আমাদের কী ভাবেন বলুন তো? ফিঙ্গার প্রিন্ট নিয়ে চিন্তা করবেন না, ওব্যাপারে যা ইনস্ট্রাকশান দেবার, তা আমি দিয়ে এসেছি। দেখা যাক, কোনও দাগি চোরের আঙুলের ছাপের সঙ্গে মিলে যায় কি না।'

ভাদুড়ীমশাই বললেন, 'ডাক্তার চাকলাদার কোনও দাগি চোরের কথা ভাবছেন না। উনি ভাবছেন বিষ্টুচরণের কথা। ওঁর ধারণা, চেম্বারের কোথাও যদি আঙুলের ছাপ পেয়ে যান আপনারা, তো বিষ্টুর ফিঙ্গার-প্রিন্টের সঙ্গে সেটা মিলেও যেতে পাবে। কী ডাক্তাব চাকলাদার, আমি কি ভুল বলছি?'

চাকলাদার বললেন, 'মোটেই না। সব রিপোর্টেরই একটা কপি যে আমি ফাইল করে রাখি, বিষ্টু সেটা ভালোই জানত।'

সামন্ত বললেন, 'বটে?'

'কী করে জানত, বলি। বিষ্টুর একটু হাঁপানি-মতো আছে। অন্য সময়ে কষ্ট দেয় না বটে, তবে শীতকালে সেটা ওকে মাঝেমধ্যে ভোগায়। ওর ডাক্তার ওকে তাই ব্লাড টেস্ট করাতে বলেছিলেন। তাঁর অ্যাডভাইস অনুযায়ী বিষ্টু আমার ল্যাবরেটরিতেই টেস্টটা করিয়েছিল। তার রিপোর্ট আমি ওকে

দিয়েওছিলুম। কিন্তু সেটা ও হারিয়ে ফেলে। আমাকে সে-কথা বলতে আমি বলি, ঠিক আছে, সব রিপোর্টেরই তো একটা কপি আমি ফাইল করে রাখি, এটাও আছে, কপি দেখে নতুন করে একটা রিপোর্ট লিখে দিচ্ছি। তো আমার ধারণা, নকুলকে যে রিপোর্ট আমি দিয়েছিলুম, বিষ্টু জানত যে, সেটার কপিও আমার কাছে রয়েছে, আর সেই কপিটা গায়েব করবার জন্যেই কাল রাত্তিরে সে আমার চেম্বারে এসে ঢুকেছিল। অবশ্য আমার ধারণাটা ভুলও হতে পারে।'

'ঢুকল কী করে?'

'জানলার কাচ খুলে। চেম্বারে তো আর দামি কিছু থাকে না। তাই জানলায় আর গ্রিলও বসাইনি।'

সামন্ত বললেন, 'কপিটা গায়েব হয়ে যায়নি তো?'

চাকলাদার বললেন, 'নিশ্চিন্ত থাকুন, সেটা দোতলায় থাকে। শুধু ওই একটা কপি নয়, যাবতীয় রিপোর্টের কপি আমার দোতলার ঘরে রাখি। ফলে সেটা খোয়া যায়নি। দরকার হলে জানাবেন, তার একটা জেরক্স কাল সকালেই আপনাকে পাঠিয়ে দেব।'

সামন্ত বললেন, 'বাঃ কাজ তো তবে চোদ্দ-আনাই মিটে গেল। বাকি রইল শুধু মার্ডার-ওয়েপনটা খুঁজে বার করা। তা সেটারও একটা হদিশ নিশ্চয় শিগগিরই করে ফেলতে পারব।'

কথাটা তিনি এমনভাবে বললেন যেন যাবতীয় হদিশ এ-পর্যন্ত তিনিই করেছেন।

ডাক্তার গুপ্ত উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, 'ন'টা বাজতে চলল, এবারে তা হলে যাওয়া যাক।'

ভাদুড়ীমশাই বললেন, 'কাল আপনারা একটু সময় দিতে পারবেন?'

সামন্ত বললেন, 'কেন বলুন তো?'

'ব্যাপারটা নিয়ে আব-একবার বসবার দরকার ছিল।'

'এইখানে?' গঙ্গাধর সামন্ত যেন আঁতকে উঠলেন। 'না মশাই, আমরা সেন্ট্রাল ক্যালকাটার মানুষ, রোজ-বোজ অ্যাদ্দুর ঠেঙিয়ে আসতে পারব না।'

'এখানে আসতে হবে কে বলল?' ভাদুড়ীমশাই বললেন, 'খুন যেখানে হয়েছে, সেই জায়গাটা তো আমি এখনও দেখিইনি। তাই ভাবছিলুম যে, কাল বিকেল ছ'টায় আমরা কিরণবাবুর বাড়িতে বসব। আপনি যে-সব খাতা আর কাগজপত্র সিজ করেছেন, সেগুলোও না-হয় তখনই ফেরত দেওয়া যাবে। আজ সেগুলো আমার কাছেই থাক। কোনও আপত্তি নেই তো?'

গঙ্গাধর সামন্ত হেসে বললেন, 'কিচ্ছু না। তবে হ্যাঁ, একটা কথা। জলখাবারের ব্যবস্থাটা যেন এইরকম হয়।'

ভাদুড়ীমশাই বললেন. 'নিশ্চিন্ত থাকুন, ওটা এর চেয়ে ঢের ভালো হবে। কিরণবাবুর স্ত্রী বাসন্তীকে আমি অনেক কাল ধরে দেখছি তো, অমৃত যে কাকে বলে, কালই আপনারা বুঝতে পারবেন।'

এবারে আমার আঁতকে ওঠার পালা। একে তো বাড়িতে গ্যাস নেই, কালকের মধ্যে সিলিন্ডারটা পাব কি না তাও জানি না, তার ওপরে আবার দিন কয়েক বাদেই মেয়ের পরীক্ষা শুরু হবে, এই সময়ে বাড়িতে বৈঠক বসছে শুনলে বাসন্তী না খেপে যায়।

অরুণ সান্যাল আর মালতী এসে দাঁড়িয়েছিল। তাদের কাছে বিদায় নিয়ে আমরা নীচে নেমে এলুম। ডাক্তার গুপ্তকে নিয়ে সামন্ত তাঁর জিপে উঠলেন। আমি উঠলুম চাকলাদারের মরিস মাইনরে।

সেলফের চাবি ঘোরাতেই ইঞ্জিন গোঁ-গোঁ করে উঠল। চাকলাদার বললেন, 'ব্যাটা একেবারে বাঘের বাচ্চা! চলুন, মনটা হালকা হয়ে গেছে, একটু ঘুরপথে আজ বাড়ি ফিরব।'

'ঘুরপথে মানে?'

'পার্ক সার্কাস থেকে আর লোয়ার সার্কুলার রোড ধরব না, ডাইনে ঘুরে চার নম্বর ব্রিজ পেরিয়ে বাইপাস ধরব। তারপর স্টেডিয়ামের কাছে বাঁয়ে টার্ন নিয়ে বেলেঘাটা মেন রোড ধরে

শেয়ালদা ফ্লাই-ওভারে উঠলেই তো আমাদের পাড়ায় পৌঁছে যাচ্ছি?'

'ওরে বাবা, সে তো বিস্তর পথ।'

'পথ অবশ্যই বেশ কয়েক কিলোমিটার বেশি, তবে সময় লাগবে কম। একেবারে উড়ে চলে যাব। তা ছাড়া, গাড়ির মেরামতিটা কেমন হল, তারও একটা পরীক্ষা হয়ে যাবে।'

বাইপাসে পড়েই অ্যাকসিলেটারে চাপ বাড়ালেন চাকলাদার। পুরোনো আমলের গাড়ি, কিন্তু মনে হল যেন সত্যিই তার দু-পাশে দুটো ডানা গজিয়ে গেছে। পাস দেবার জন্যে পিছন থেকে একটা লরি ক্রমাগত হর্ন বাজিয়ে যাচ্ছিল, খানিক বাদে পিছনে তাকিয়ে সেটাকে আর দেখতে পেলুম না।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই পীতাম্বর চৌধুরি লেনে পৌঁছে গেলুম। সারাটা পথ চাকলাদার আর কোনও কথা বলেননি। এতক্ষণে তিনি মুখ খুললেন। রাস্তার একধারে গাড়িটা দাঁড় করিয়ে বললেন, 'নকুল বিশ্বাস যে একটা ভুল বিশ্বাস নিয়ে মারা গেল, সেটা ভেবে দেখেছেন?'

'অর্থাৎ?'

'বুঝতে পারছেন না?' তিক্ত হেসে চাকলাদার বললেন, 'বিষ্টুকে সে যমুনার মামাতো ভাই বলেই জানত। এদিকে সে নিজেকে পরীক্ষা করিয়ে জেনে গিয়েছিল যে, যমুনা বাঁজা নয়, আসলে তার নিজেরই নেই বাপ হবার ক্ষমতা। ফলে, যমুনা যখন প্রেগন্যান্ট হল, আর তারও কিছুকাল বাদে যমুনার মেয়ের মুখে যখন স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল বিষ্টুচরণের মুখের আদল, নকুল তখন ধরেই নিল যে, মামাতো-পিসতুতো ভাইবোনের মধ্যে একটা ইনসেসচুয়াস সম্পর্কের জন্যেই এটা হয়েছে। আরে মশাই, বিষ্টু যে যমুনার মামাতো ভাই নয়, এটাই সে জানত না।'

॥ ২০ ॥

বাসন্তীকে নিয়ে একটু ভয় ছিল। সামনেই পারুলের পরীক্ষা, এই সময়ে বাড়িতে একগাদা লোক আসছে, তাদের জন্যে খাবার তৈরি করতে হবে, হইচইও হয়তো নেহাত কম হবে না, তাই ভাবছিলুম যে, বাসন্তী না রেগে যায়।

অথচ সে-ই দেখলুম দারুণ খুশি। গ্যাস নিয়ে অবশ্য ভাবনা নেই, কাল বিকেলেই নতুন সিলিন্ডার দিয়ে গেছে, তবু ভাদুড়ীমশাই যে আজ আমাদের বাড়িতেই বৈঠক ডেকেছেন কাল রাত্তিরে বাড়িতে ফিরে বাসন্তীকে এই খবরটা দিয়ে একটু কিন্তু-কিন্তু করে বলেছিলুম, 'রাজি না-হলেই ভালো হত, তাই না?'

বাসন্তী তা-ই শুনে অবাক। গালে হাত দিয়ে বলল, 'সে-কী। চারুদা আসছেন, কৌশিক আসছে, এ তো দারুণ ব্যাপার। কদ্দিন যে চারুদাকে দেখিনি। কৌশিক অবশ্য মাঝেমধ্যে আসে, কিন্তু চারুদা এবারে অনেক দিন বাদে কলকাতায় এলেন। তুমি কিন্তু মালতী আর অরুণবাবুকেও আসতে বললে পারতে।'

বললুম, 'বলো কী, পারুল এখন রাতদিন তার বইয়ের মধ্যে মুখ গুঁজে পড়ে রয়েছে, লোক আরও বেড়ে গেলে ওর অসুবিধে হত না?'

বাসন্তী বলল, 'অসুবিধে হবে কেন, বরং সুবিধেই হত। মেয়েটা সারারাত পড়ে। কিন্তু অত পড়া ভালো নয়, বুঝলে? একটু গল্প-টল্পও করা দরকার।'

এবারে আমার অবাক হবার পালা।

ছ'টায় সকলের আসবার কথা। কৌশিককে নিয়ে ভাদুড়ীমশাই কিন্তু পাঁচটার মধ্যেই এসে গেলেন। এসেই হাঁক পাড়লেন, 'কই বাসন্তী, আমার প্রিয় পানীয়টি তৈরি আছে তো?'

ভাদুড়ীমশাইয়ের যা প্রিয় পানীয় শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায় তা হল 'বিল্ববাসিত তক্র'। অর্থাৎ কিনা বেলের সুবাসযুক্ত ঘোল। তা বাসন্তী সেই পানীয়ের পুরো দুটি গ্লাস ফ্রিজের মধ্যে ঢুকিয়ে রেখেছিল। উপর্যুপরি সেই গ্লাস দুটিকে নিঃশেষ করে ভাদুড়ীমশাই আমাকে বললেন, 'চলুন, চটপট এবারে ঘটনাস্থলটা একবার দেখে আসি।'

বাসন্তী বলল, 'বা রে, আপনি তো আপনার প্রিয় পানীয় পেয়েছেন, এবারে কৌশিককে তার প্রিয় পানীয় তৈরি করে দিতে হবে না?'

ভাদুড়ীমশাই বললেন, 'কৌশিকের তো এখন আমার সঙ্গে যাবার কোনও দরকার নেই। ও চা খাক, পারুলের সঙ্গে গল্প করুক। কিরণবাবু আমার সঙ্গে থাকলেই হবে। দেরি হবে না, মিনিট পাঁচ-দশের মধ্যে আমরা ফিরে আসছি।'

ভাদুড়ীমশাই আর আমি গিয়ে পাঁচ নম্বর বাড়িতে ঢুকলুম। সিঁড়ির তলাটা আজ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, কোথাও ধুলো-ময়লা নেই। মাছের সেই গন্ধও নেই কোনওখানে। ভাদুড়ীমশাই মিনিট কয়েক চুপচাপ সিঁড়ির সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর বললেন, 'চলুন, এবারে ফেরা যাক।'

বললুম, 'সদানন্দবাবু আর তাঁর স্ত্রী ওপরে রয়েছেন। তাঁদের সঙ্গে একবার কথা বলবেন না?'

ভাদুড়ীমশাই বললেন, 'দরকার কী।' তারপর সদর-দরজা পর্যন্ত গিয়ে হঠাৎ আবার বললেন, 'চলুন, ভদ্রলোককে একবার দেখেই যাই।'

ওপরে গিয়ে দেখলুম, সদানন্দবাবু তাঁর শোবার ঘরে চুপচাপ একটা ইজিচেয়ারে বসে আছেন। বললুম, 'কেমন আছেন সদানন্দবাবু?'

সদানন্দবাবু কোনও উত্তর দিলেন না। আমার সঙ্গে যে আরও একজন রয়েছেন, এটা দেখেও ইজিচেয়ার থেকে তিনি উঠে দাঁড়ালেন না পর্যন্ত। যেমন বসেছিলেন, তেমনি বসেই রইলেন।

বললুম, 'ইনি মিস্টার চারু ভাদুড়ী। বিখ্যাত গোয়েন্দা, ব্যাঙ্গালোরে থাকেন। দিন কয়েকের জন্যে কলকাতায় এসেছেন। আমার একজন বিশিষ্ট বন্ধু।'

সদানন্দবাবু ফ্যালফ্যাল করে আমাদের দিকে তাকিয়ে রইলেন, একটি কথাও বললেন না।

নীচে নামতে বিষ্টুচরণের সঙ্গে দেখা। সদর-দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের দেখে বলল, 'কী বিপদ, বলুন তো। কাল রাত্তির থেকে আমাকে বাইরে বেরুতে দিচ্ছে না। আজ সকালে বাজার করতে বেরুচ্ছিলুম, তা যে লোকটা পাহারায় রয়েছে, সে আমাকে আটকে দিল। বলল, 'বাহার জানেকা হুকুম হ্যায় নেহিঁ।' কমলির বেবিফুড ফুরিয়েছে, তাও বাইরে যেতে দিচ্ছে না। মেয়েটা কি না-খেয়ে মরবে নাকি?'

বললুম, 'বাইরে যাবার দরকার কী। সদানন্দবাবুর স্ত্রী যে কমলির জন্যে দু'টিন দুধ আনিয়ে রেখেছেন, তা তো আপনিও সেদিন শুনলেন। ওপরে গিয়ে তার একটা নিয়ে এলেই তো হয়।'

বিষ্টুচরণ বলল, 'তা তো হয়ই। কিন্তু আমার বোন যে আমাকে ওপরে যেতে দিচ্ছে না।'

বললুম, 'তাই তো, বড় মুশকিল হল দেখছি। তা এক কাজ করুন, কমলিকেই বরং ওপরে পাঠিয়ে দিন।'

ভাদুড়ীমশাইকে নিয়ে রাস্তা পেরিয়ে আমাদের বাড়িতে এসে ঢুকলুম। এ-বাড়ির সদর-দরজা সব সময় খোলাই থাকে। দোতলায় ওঠবার আগে একবার ঘুরে দাঁড়িয়েছিলুম; তখন চোখে পড়ল, বিষ্টুচরণ আবার তাদের বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু থানা থেকে যে পাহারাদারটিকে সেখানে মোতায়েন রাখা হয়েছে, বিষ্টুকে সে বাড়ি থেকে বেরুতে দিচ্ছে না।

ওপরে উঠে আমাদের বৈঠকখানা ঘরে এসে ঢুকলুম আমরা। বাসন্তী একটা ম্যাগাজিনের পাতা ওলটাচ্ছিল; বুঝলুম যে, তার রান্নাবান্নার পাট শেষ হয়েছে। আমাদের দেখে ম্যাগাজিনটা নামিয়ে রেখে সে উঠে দাঁড়াল। ভাদুড়ীমশাই বললেন, 'আরে বোসো, বোসো। ...কৌশিক কোথায়?'

বাসন্তী বলল, 'পারুলের ঘরে বসে গল্প করছে। ডেকে দেব?'

পাশের ঘর থেকে টুকরো-টুকরো কথা আর হাসির শব্দ ভেসে আসছিল। ভাদুড়ীমশাই মৃদু হাসলেন। তারপর বললেন, 'থাক ডেকে দেবার দরকার নেই। বাকি সবাই আসুন, তখন ডেকে দিলেই হবে।'

বাসন্তী বলল, 'তা হলে বরং একটু চা করি আপনার জন্যে?'

ভাদুড়ীমশাই বললেন, 'তারও এখন দরকার নেই। প্রায় ছ'টাই তো বাজে। ওঁরা এখুনি এসে পড়বেন। তখন চা দিলেই চলবে।'

মিনিট দশেকের মধ্যে ডাক্তার চাকলাদার এসে পৌঁছলেন। তার একটু বাদেই গঙ্গাধর সামন্ত আর ডাক্তার গুপ্ত। কৌশিককেও ডেকে পাঠানো হল।

এক প্রস্থ চা হয়ে যাবার পরে সামন্ত বললেন, 'এবারে তা হলে কাজের কথা শুরু হোক।'

ভাদুড়ীমশাই বললেন, 'আজ শুক্রবার। মার্চের আজ শেষ দিন, ৩১ তারিখ। নকুলচন্দ্র খুন হয়েছে গত শুক্রবার। গত শুক্রবার ছিল ২৪ মার্চ। কখন খুন হয়েছে? না রাত তিনটে নাগাদ। লাশ পরীক্ষা করে অন্তত সেই কথাই বলা হয়েছে। ইংরেজি মতে রাত বারোটার পরেই নতুন তারিখ শুরু হয়ে যায়। নকুল তাহলে ২৫ মার্চ খুন হয়। তার দু-ঘণ্টা বাদে সদানন্দবাবু দেখতে পান যে, তার ডেডবডিটা সিঁড়ির তলায় লুটিয়ে পড়ে আছে। অবশ্য সদানন্দবাবু যা বলছেন, তাতে মনে হয়, ও যে জ্যান্ত নকুল নয়, তার ডেডবডি, তা তিনি তখনও জানতেন না।'

গত রাত্রে যে-সব কথা হয়েছিল, আর সেইসঙ্গে প্রকাশ পেয়েছিল যে-সব নতুন তথ্য, তাতে গঙ্গাধর সামন্তর চিন্তাভাবনার পেন্ডুলামটি দেখলুম একেবারে বিপরীত বিন্দুতে গিয়ে পৌঁছেছে। তিনি বললেন, 'এতে আর মনে হওয়া-টওয়ার কী আছে, সদানন্দবাবু নিশ্চয় মিথ্যে কথা বলেননি।'

কৌশিকের এ-ও একটা মস্ত দোষ যে, সে হাসি চাপতে পারে না।

সামন্ত তার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'হাসছেন যে?'

কৌশিক বলল, 'হাসব না? দু-দিন আগেই যাঁকে আপনি চড়-চাপড় মারাবার ব্যবস্থা করেছিলেন, এখন তো দেখছি তাঁর সম্পর্কে আপনার ধারণা একেবারে উলটে গেছে।'

সামন্ত বললেন, 'সে তো আমি ভুল করেছিলুম। তা ভুলটা ঠিক-সময়ে শুধরেও নিয়েছি। তা-ই বা ক'জন করে? এখন তো বুঝতেই পারছি যে, এটা একটা ফ্রেম-আপ, নির্দোষ একটা মানুষের ঘাড়ে দোষ চাপাবার চক্রান্ত।'

কৌশিক আবার কিছু বলতে যাচ্ছিল, ভাদুড়ীমশাই কাল রাত্তিরের মতোই আবার তাকে মৃদু ধমক দিয়ে বললেন, 'কী হচ্ছে কৌশিক! যা বলছি, একটু মন দিয়ে শোনো। মিস্টার সামন্ত কাল বলছিলেন যে, চোদ্দো-আনা কাজই মিটে গেছে, বাকি মাত্র দু-আনা। কিন্তু সেই দু-আনার গুরুত্ব মোটেই কম নয়, হয়তো সবচেয়ে বেশি। কাজটা কী? না মার্ডার-ওয়েপনটা খুঁজে বার করতে হবে। যতক্ষণ না তার হদিশ করা যাচ্ছে, খুনির বিরুদ্ধে একটা ওয়াটার-টাইট কেসও ততক্ষণ দাঁড় করানো যাচ্ছে না। যা দিয়ে ওভাবে মাথা ফাটানো যেতে পারে, এমন জিনিস অবশ্য ও-বাড়ি থেকে বিস্তর আটক করা হয়েছে, কিন্তু ল্যাবরেটরির পরীক্ষায় তার একটাও যে ওতরায়নি, সেটা ভুলে যাচ্ছ কেন?'

কৌশিক চুপ করে রইল। চাকলাদার বললেন, 'মিস্টার সামন্ত কাল বলছিলেন যে, মার্ডার-ওয়েপনের একটা হদিশ শিগগিরই করে ফেলতে পারবেন।'

ভাদুড়ীমশাই বললেন, 'করে ফেলতে পারলে নিশ্চয় বলতেন আমাদের। মনে হচ্ছে, এখনও হদিশ করতে পারেননি। কিন্তু সে-কথা থাক। সেদিন সকালে পাঁচ নম্বর বাড়িতে যাঁরা গিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে একমাত্র ডাক্তার চাকলাদার ছাড়া বাকি চারজনকে—মানে কিরণবাবু, মিস্টার সামন্ত, ডাক্তার গুপ্ত আর কৌশিককে—আমি চারটে রিপোর্ট লিখে ফেলতে বলেছিলুম। এ-ও বলে দিয়েছিলুম

যে, ওখানে সেদিন যা-কিছু তাঁরা দেখেছেন কি শুনেছেন, রিপোর্টে সব ডিটেলসে লিখতে হবে। কে কোথায় দাঁড়িয়েছিল, কিংবা বসেছিল কিংবা কার কথায় কার কী প্রতিক্রিয়া হয়েছিল, তাও বাদ দেওয়া চলবে না। অর্থাৎ আমি চেয়েছিলুম যে, গোটা ব্যাপারটার একটা সর্বাঙ্গীণ বর্ণনা আপনারা আমাকে দিন। সেদিন সকালে ঘটনাস্থলে উপস্থিত না-থাকা সত্ত্বেও যাতে সবটা আমি ভিসুয়ালাইজ করতে পারি।'

কৌশিক বলল, আমি কিচ্ছু বাদ দিইনি মামাবাবু। যা-কিছু আমার চোখে পড়েছে সবই আমার রিপোর্টের মধ্যে আছে।'

সামন্ত বললেন, 'আমিও তো সবই জানিয়েছি আমার রিপোর্টে। কিছু বাদ পড়েছে বলে তো মনে হয় না।'

ভাদুড়ীমশাই আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনার সম্পর্কে আমার কোনও ভাবনা নেই। আপনার তো ওই যাকে বলে ফোটোগ্রাফিক মেমারি। যা-কিছু দেখেন শোনেন, সব একেবারে মাথার মধ্যে গেঁথে থাকে।'

বললুম, 'থ্যাঙ্ক ইউ। আশা করি সবই আমার রিপোর্টের মধ্যে আছে, কোনও-কিছু বাদ পড়েনি।'

ভাদুড়ীমশাই বললেন, 'তিনটি রিপোর্টই আমি খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে পড়েছি। একটা কথা বলতেই হবে, কারও কথার সঙ্গেই অন্য-কারও কথার বিশেষ পার্থক্য বিরোধ কিংবা অসঙ্গতি কোথাও নেই। সেটা খুবই ভালো কথা। অমন কোনও বিরোধ কি অসঙ্গতি থাকলে আমাকে ধাঁধায় পড়ে যেতে হত। ক্রমাগত ভাবতে হত কার কথাটা ভুল, এঁর না ওঁর। না, তেমন কোনও ধাঁধায় আমাকে পড়তে হয়নি। কিন্তু বিপোর্টগুলি পড়ে আমি যে খুব সন্তুষ্ট হতে পেরেছি, তা-ও নয়। কেন জানি না, কেবলই আমার মনে হচ্ছে, যা আপনারা লিখেছেন, তার মধ্যে কোথাও কিছু একটা ফাঁক রয়েছে, কিছু একটা ব্যাপার বাদ পড়েছে। এমন কোনও ব্যাপার, যাকে তিনজনের একজনও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বা উল্লেখযোগ্য মনে করেননি। কোনও তুচ্ছ বা মাইনর ব্যাপার। মানে এমন কোনও ব্যাপার, এই ঘটনাব সঙ্গে সরাসরি যাকে একটা কার্যকারণের সূত্রে গাঁথা যায় বলে কেউ কল্পনাই করতে পারে না। একটু ভেবে দেখুন তো, এমন কিছু কি সেখানে আপনারা দেখেছিলেন কিংবা শুনেছিলেন?'

'না, মামাবাবু।' কৌশিক বলল, 'কিছুই আমি বাদ দিইনি। সবকিছুই তুমি জানাতে বলেছিলে, তাই সবকিছুই আমাব রিপোর্টে আমি জানিয়েছি। এমনকী জায়গার একটা নকশা এঁকে সেটাও গেঁথে দিয়েছি আমার রিপোর্টের সঙ্গে।'

'তা দিয়েছিস ঠিকই,' ভাদুড়ীমশাই বললেন, 'কিরণবাবু আর মিস্টার সামন্তও খুঁটিনাটি কথা কিছু কম জানাননি। বাট আই জাস্ট কানট গেট রিড অভ দিস ফিলিং দ্যাট নান অভ ইউ টাচড অল দ্য পয়েন্টস, ইউ মিসড সামথিং সামহোয়্যার অ্যালং দি ওয়ে। এমন কিছু, যা এই কেসটার পক্ষে খুবই ভাইটাল।'

চুপ করে রইলুম। বারবার ভাবতে লাগলুম, কী বাদ দিয়েছি। কিন্তু অনেক ভেবেও কোনও কূলকিনারা করতে পারলুম না।

ভাদুড়ীমশাই একটা সিগারেট ধরালেন। ধোঁয়া ছাড়লেন কিছুক্ষণ। তারপর অনুযোগের সুরে বললেন, 'ডাক্তার গুপ্ত, আপনাকেও আমি কিন্তু একটা রিপোর্ট লিখে দিতে বলেছিলুম। আপনি সেটা আজও দিলেন না।'

ডাক্তার গুপ্ত লজ্জিত গলায় বললেন, 'লিখলে তো দেব। লেখাই হয়ে ওঠেনি।'

'সময় করে উঠতে পারেননি নিশ্চয়? আপনি যা ব্যস্ত মানুষ।'

ডাক্তার গুপ্ত বললেন, 'না-না, সময়ের ব্যাপারে নয়, কাগজ-কলম নিয়ে লিখতে বসেছিলুম ঠিকই। কিন্তু কী লিখব, সেটাই ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। এক ওই লাশ ছাড়া আর কোনও

কিছুই তো তেমন নজর করে দেখিনি। আর দেখবই বা কী করে? মন দিয়ে কিছু দেখবার কি শোনবার উপায়ই তো ছিল না।'

'কেন, উপায় না থাকার কী হল? রিপোর্ট পড়ে তো মনে হয় অন্যেরা অনেক কিছুই দেখেছেন। শুনেছেনও অনেক-কিছু।'

ডাক্তার গুপ্ত বললেন, 'তা হলে বুঝতে হবে, হয় ওঁদের সর্দি হয়ে নাক বুজে গিয়েছিল, আর নয়তো এমনিতেই ওঁদের ঘ্রাণশক্তি তেমন প্রবল নয়।'

ভাদুড়ীমশাই বললেন, 'তার মানে?'

'আরে মশাই, সে এক উৎকট গন্ধ। কোনও-কিছু দেখব অথবা শুনব কী, গন্ধের দাপটে যেন পাগল-পাগল লাগছিল। মনে হচ্ছিল, পালাতে পারলে বাঁচি, নয়তো অন্নপ্রাশনের ভাত পর্যন্ত মুখে উঠে আসবে। ওরে ব্বাপরে বাপ, কী গন্ধ, কী গন্ধ।'

ভাদুড়ী আমার দিকে তীব্র চোখে একবার তাকালেন। তারপর সামন্ত আর কৌশিকের দিকে। বললেন, 'কই, কারও রিপোর্টেই তো গন্ধের কথা নেই। কীসের গন্ধ?'

কৌশিক বলল, 'পচা মাছের। নকুলের তো মাছের ব্যাবসা, আর বাড়িতেই ছিল তার আড়ত। সেখানে মাছ পচে গিয়ে অতি উৎকট গন্ধ ছড়াচ্ছিল।'

শুনে দুই হাতে নিজের মাথাটাকে আঁকড়ে ধরে গুম হয়ে কিছুক্ষণ বসে রইলেন ভাদুড়ীমশাই। তারপর মিনিট কয়েক বাদে যখন নিজের শরীরটাকে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন, তখন দেখলুম, তাঁর মুখচোখের চেহারা একেবারে পালটে গিয়েছে। বললেন, 'আমারই ভুল হয়েছিল। যা-দেখেছেন, যা-শুনেছেন, শুধু তারই কথা লিখতে বলেছিলুম আমি, আর আপনারাও শুধু তা-ই লিখেছেন। গন্ধের কথাটা আপনারা কেউই বলেননি।...ডাক্তার গুপ্ত, আপনাকে অনেক-অনেক ধন্যবাদ। আপনি রিপোর্ট লেখেননি বটে, কিন্তু সবচেয়ে যেটা জরুরি খবর, শেষপর্যন্ত সেটা আপনার কাছেই পাওয়া গেল। এখন দেখা যাক, আমি যা-ভাবছি সেটা ঠিক কি না।'

কৌশিকের দিকে তাকালেন ভাদুড়ীমশাই। বললেন, 'হ্যাঁ রে কৌশিক, নকুলের বাড়িতে তার ব্যাবসাপত্রের যে-সব হিসেব, কাগজ আর রসিদ পাওয়া গেছে, সেগুলো নিয়ে এসেছিস তো?'

কৌশিক তার অ্যাটাশে-কেস খুলে সুতো দিয়ে বাঁধা কিছু কাগজপত্র, খানকয়েক পাতা আর দুটো ফ্ল্যাট ফাইল বার করে ভাদুড়ীমশাইয়ের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'এই নাও। এগুলো কিন্তু আজ মিস্টার সামন্তকে ফেরত দিতে হবে।'

কাগজপত্র আর খাতা একপাশে সরিয়ে রেখে ফ্ল্যাট-ফাইল দুটো টেনে নিলেন ভাদুড়ীমশাই। প্রথম ফাইলটায় রাখা কাগজপত্রগুলি দ্রুত একবার দেখে নিলেন। তারপর সেটাকে নামিয়ে রেখে হাতে তুলে নিলেন দ্বিতীয় ফ্ল্যাট-ফাইলটা। সেটাকে আর উলটে-পালটে দেখবার দরকার হল না। মুখের ভাব দেখে মনে হল যে, যা খুঁজছিলেন তিনি, ফাইলের একেবারে গোড়াতেই সেটা পেয়ে গেছেন। ফাইল থেকে সেটা তিনি খুলে নিলেন। একটা ক্যাশমেমো। সেটার ওপরে চোখ বুলিয়ে টেনে নিলেন জমা-খরচের খাতা। দুটোকে মিলিয়ে দেখলেন। তারপর আপন মনে বললেন, 'ও, এই তা হলে ব্যাপার।'

স্বগতোক্তিটা সামন্তও শুনতে পেয়েছিলেন। তিনি বললেন, 'কী ব্যাপার।'

ভাদুড়ী তাঁর কথার কোনও জবাব দিলেন না। কৌশিককে বললেন, 'হ্যাঁ রে, লাশ যেখানে পড়েছিল, সেখানে মেঝে থেকে যা-যা কুড়িয়ে এনেছিস, তার মধ্যে কিছু কাঠের গুঁড়োও তো দেখলুম। শুকনো নয়, ভিজে গুঁড়ো। ওগুলো ভিজল কী করে? মেঝের ওপরে কি জল ছিল নাকি?'

কৌশিক বলল, 'মেঝের ওপর জল পড়েছিল নিশ্চয়। আমরা যখন যাই, তখন দেখেছিলুম যে, জায়গাটা কাদা-কাদা মতন হয়ে আছে। ধুলোবালির ওপরে জল পড়ে তারপর শুকিয়ে গেলে যেমন হয় আর কি।'

ভাদুড়ীমশাই সামন্তের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কৌশিক যা বলছে, সেটা সত্যি?'

সামন্ত বললেন, 'এটা উনি ঠিকই বলেছেন। জায়গাটা দেখে আমারও মনে হয়েছিল যে, এরকম কাদা-কাদা হয়ে আছে কেন, কারও হাত থেকে জল পড়েছিল নাকি?'

ভাদুড়ীমশাই বললেন, 'জল পড়ে গিয়েছিল, তাই না? মানে সেইরকমই মনে হয়েছিল, কেমন?'

'হ্যাঁ, সেইরকমই মনে হয়েছিল।'

মস্ত একটা নিশ্বাস ফেললেন ভাদুড়ীমশাই। বললেন, 'তা হলে জেনেই রাখুন সামন্তমশাই, যা-নিয়ে আপনি খুব ভাবনায় রয়েছেন, সেই মার্ডার-ওয়েপনেরও একটা হদিশ হয়তো করতে পেরেছি। তবে কিনা, আমার অনুমানটা যদি সত্যি হয়, তবে যতই না কেন খুঁজে মরুন, সেই অস্ত্রটির সন্ধান আপনি কোনওদিনই পাবেন না।'

'কেন, কেন, পাব না কেন? সেটা যাবে কোথায়? এ তো আর রামানন্দ সাগরের টিভির রামায়ণের ওয়েপন নয় যে, শত্রুকে বিনাশ করেই মহাকাশে ভ্যানিশ করে যাবে। মার্ডার-ওয়েপনটা নিশ্চয় ডানা গজিয়ে উড়ে যাবার জিনিস নয়।'

'আমি কি বলছি যে, ওটা উড়ে গেছে?'

'তা হলে?'

'আরে মশাই, ওটা উড়ে যায়নি, গলে গেছে।'

সামন্ত তখনও হাঁ করে তাকিয়ে আছেন দেখে ভাদুড়ীমশাই বললেন, 'এখনও বুঝতে পারছেন না?'

ডাক্তার গুপ্তই আমাদের সকলের হয়ে কথা বললেন। 'উনি একা কেন, সম্ভবত আমরা কেউই কিছু বুঝতে পারিনি। অন্তত আমি যে পারিনি, এটা স্বীকার করতে আমার কিছু লজ্জা নেই।'

ভাদুড়ীমশাই বললেন, 'বেশ, তা হলে ঘটনাগুলোকে পরপর সাজিয়ে নিন। নকুল খুন হয় মোটামুটি রাত তিনটের সময়। ইংরেজি মতে ২৫ মার্চ, ইন দি আর্লি আওয়ার্স অব দ্য মর্নিং। খুন হবার ঘণ্টা কয়েক আগে শেয়ালদা আইস ডিপো থেকে পঁচিশ কেজি বরফ কেনা হয়েছিল। এই ক্যাশমেমোটাই তার প্রমাণ। ক্যাশমেমোর তারিখ দেখছি ২৪ মার্চ। জমাখরচের খাতায় ওই একই তারিখে বরফ কেনার টাকাটা লেখা হয়েছে। টাকার অঙ্কের পাশে লেখা রয়েছে, "বিষ্টুকে পঁচিশ কেজি বরফ খরিদ করিবার জন্য দেওয়া হইল।" খাতায় ওটাই শেষ এন্ট্রি।'

কৌশিক মৃদু-মৃদু হাসছিল। মনে হল, সে একটা কিছু আঁচ করেছে। আমি কিন্তু কিছুই আন্দাজ করতে পারছিলুম না। ডাক্তার গুপ্ত, চাকলাদার আর সামন্তর মুখ দেখে বুঝলুম, তাঁদের অবস্থাও আমার চেয়ে খুব-একটা ভালো নয়।

ভাদুড়ীমশাই একটা সিগারেট ধরালেন। বুকের মধ্যে খানিকটা ধোঁয়া টেনে নিলেন। তারপর গলগল করে সেটাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'এতক্ষণ যা বললুম, সেটা তথ্য, সেটা প্রমাণ করা যায়। এবারে এইসব তথ্যের ভিত্তিতে আমরা কয়েকটা ব্যাপার অনুমান করে নিতে পারি। প্রথমেই বলি, জমাখরচের খাতায় ওটাই যেহেতু শেষ এন্ট্রি, তাই মনে হয়, টাকাটা সেদিন অর্থাৎ ২৪ মার্চ বিকেল কিংবা সন্ধে নাগাদ বিষ্টুকে দেওয়া হয়। দুপুরে নকুল ঘুমোত, তা আমরা জানি। সম্ভবত ঘুম থেকে উঠে বিষ্টুকে সে টাকাটা দেয়, খাতায় সেটা লিখে রাখে, তারপর বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। বিষ্টু সম্ভবত তখন-তখনই বরফ কেনেনি। কিনেছিল বরফের দোকান বন্ধ হবার খানিক আগে। দোকানপাট দশটার পরে সাধারণত খোলা থাকে না। আমার ধারণা, দোকান বন্ধ হবার মুখে-মুখে বরফটা কিনে বিষ্টু বাড়ি ফিরে আসে। অভ্যেসবশত ক্যাশমেমোটা সে গেঁথেও রাখে ফ্ল্যাট-ফাইলে।'

ডাক্তার গুপ্ত বললেন, 'তারপর?'

ভাদুড়ীমশাই বললেন, 'নকুল কেন পঁচিশ কেজি বরফ কিনতে দিয়েছিল তা আপনাদের না বোঝবার কথা নয়। মাছের কারবারি বরফ কেনে মাছের ঝুড়িতে বরফ চাপা দেবার জন্যে। গরমে যাতে মাছ না পচে যায়। আর বিষ্টু যে টাকা পেয়েই বরফ কিনতে বেরিয়ে পড়েনি, যতটা সম্ভব দেরি করে বেরিয়েছিল, সেটার কারণও আমরা অনুমান করতে পারি।'

'কেন?'

'সে জানত যে, বরফ যত দেরি করে কিনবে, সেটা গলে গিয়ে আকারে ছোট আর ওজনে কম হয়ে যাবার সম্ভাবনা ততই কম। তাও সে নিশ্চিন্ত হয়নি, পানের দোকানে যেমন করে, সেইভাবে সে-ও সেই বরফের চাঙড়টাকে কাঠের গুঁড়ো দিয়ে ঢেকে রেখেছিল।'

'তারপর?'

'তারপর আর কী, নকুল তো মত্তাবস্থায় রোজই মাঝরাত্তিরে বাড়ি ফিরত। সেদিন ফিরল আরও দেরি করে। ফিরে খানিক চেঁচামেচিও করল, তারপর শুয়েও পড়ল যথারীতি। বিষ্টু কিন্তু ঘুমোল না। সে জেগে রইল। জেগে অপেক্ষা করতে লাগল, নকুল কখন বাথরুমে যায়, সেই মুহূর্তটির জন্য।'

ভাদুড়ীমশাই তাঁর সিগারেটে শেষ টান দিয়ে সেটাকে অ্যাশট্রেতে পিষে দিলেন। তারপর বললেন, 'নকুল মোটামুটি রাত তিনটে নাগাদ একবার ঘুম থেকে উঠে বাথরুমে যেত, কিন্তু সেদিন সে চেঁচামেচি করেছিল রাত দুটো পর্যন্ত। দুটোর পরে ঘুমিয়ে আবার তিনটে নাগাদ ঘুম থেকে ওঠা একটু অস্বাভাবিক ব্যাপার। তাই আমার ধারণা, নকুল সেদিন দুটোর পরে শুয়েছিল বটে, কিন্তু ঘুমোয়নি। ঘণ্টাখানেক শুয়ে থেকে তিনটে নাগাদ সে ঘব থেকে বেরিয়ে বাথরুমে ঢোকে। কিন্তু সে টের পায়নি যে, সে গিয়ে বাথরুমে ঢোকবার সঙ্গে-সঙ্গেই বিষ্টুও অন্ধকারে তার ঘর থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে সিঁড়ির দু-ধাপ ওপরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে, বাথরুম থেকে তার বেরিয়ে আসার মুহূর্তটির জন্যে। বাথরুমের আলো নিবিয়ে নকুল বাইরে বেরিয়ে আসবামাত্র সিঁড়ির ওপর থেকে বিষ্টু তার মাথা ফাটিয়ে দেয়। বেচারা নকুল! ব্রহ্মতালু ফেটে যাওয়ায় সে আর চিৎকারও করে উঠতে পারেনি; মুখ থেকে কোনও শব্দ বেরুবার আগেই সে মেঝের ওপবে লুটিয়ে পড়ে।'

সামন্ত বললেন, 'তা তো বুঝলুম, কিন্তু মাথাটা ফাটানো হল কী দিয়ে?'

ভাদুড়ীমশাই অবাক হয়ে সামন্তর দিকে তাকিয়ে বইলেন কিছুক্ষণ। মনে হল, সামন্ত যে ব্যাপারটা এখনও বুঝে উঠতে পারেননি, এটাই যেন তিনি বিশ্বাস করে উঠতে পারছেন না। কিন্তু কৌশিকের মতো তিনি আর ঠাট্টা করলেন না সামন্তকে। একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'মাথা ফাটানো হল বরফের একটা বিশাল চাঙড় দিয়ে, মাছের ওপরে চাপা দেবার জন্যে যা কেনা হয়েছিল, কিন্তু সে-কাজে যা ব্যবহার করা হয়নি বলেই ঝুড়ির সমস্ত মাছ সেদিন গরমে পচে যায়। তা নইলে "অমন উৎকট" গন্ধ ওখানে ছড়িয়ে পড়ত না।'

কৌশিক বলল, 'সিঁড়ির নীচে যে কাদা-কাদা হয়ে গিয়েছিল। সে তা হলে ওই বরফ-গলা জলের জন্যেই?'

ভাদুড়ীমশাই বললেন, 'নিশ্চয়ই। সিঁড়ির নীচে ধুলোময়লার সঙ্গে ওই যে কাঠের গুঁড়ো ছড়িয়ে ছিল, যার খানিকটা তুই ওখান থেকে কুড়িয়ে এনেছিলি, সে-ও আসলে বরফের চাঙড়টা যা দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছিল, সেই কাঠের গুঁড়ো।

কৌশিকের প্রশ্নের জবাব দিয়ে আবার গঙ্গাধর সামন্তর দিকে তাকালেন ভাদুড়ীমশাই। বললেন, 'কেন যে তখন বলছিলুম যে, মার্ডার-ওয়েপনটা উড়ে না-গেলেও গলে গিয়েছে, আশা করি সেটা এবারে আপনি বুঝতে পেরেছেন। হাজার চেষ্টা করেও অস্ত্রটা আর আপনি খুঁজে বার করতে পারবেন না।'

সামন্ত বললেন, 'তা না-পারলেও ক্ষতি নেই। অন্য যা-সব প্রমাণ আমাদের হাতে রয়েছে, তা-ই যথেষ্ট।'

এই কাহিনির ছোট্ট একটা পরিশিষ্ট রয়েছে। সেটা না-জানিয়ে আমি ঠিক শান্তি পাচ্ছি না। সেই রাত্রেই বিষ্টুচরণ ও যমুনাকে খুন ও তাতে সহযোগিতার দায়ে গ্রেফতার করা হয়, যমুনার মেয়ে কমলি অর্থাৎ কমলাকে নিয়ে তখন একটা সমস্যা দেখা দিয়েছিল। দু-বছরের বাচ্চা মেয়ে, তাকে কোথায় রাখা হবে। যমুনা ইচ্ছে করলে মেয়েকে সঙ্গে নিয়েই হাজতে যেতে পারত, তার তরফে সে-রকম দাবি তোলা হলে পুলিশেরও তা মেনে না-নিয়ে উপায় ছিল না। কিন্তু যমুনাই কমলিকে সঙ্গে নিতে রাজি হয়নি। মেয়েটা তা হলে কোথায় থাকবে। যমুনার মা-বাপ নেই, থাকার মধ্যে আছে একটা ভাই, তার অবস্থা ভালো নয়, সে কলকাতায় এসে দিদির কাছে আশ্রয় পায়নি, জামাইবাবু তাকে দূর-দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছিল, সে এখন ইটের ভাটায় মজুর খাটে। কমলিকে তার কাছে পাঠানো যায় কি না, জিগ্যেস করতে ঝাঁঝিয়ে উঠে যমুনা বলে, 'তার চেয়ে এক কাজ করুন, মেয়েটাকে আমার এই আঁশবটিতে কেটে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিন।' বলে সে আর দেরি করে না, বিষ্টুচরণের পিছন-পিছন হেঁটে গিয়ে পুলিশ ভ্যানে উঠে পড়ে।

ব্যাপার দেখে গঙ্গাধর সামন্ত বললেন, 'এ তো মহা ফ্যাসাদ হল মশাই, মেয়েটাকে তা হলে বরং সরকারি হোমে কি কোনও অনাথ আশ্রমে-টাশ্রমে পাঠিয়ে দিই। আপনারা কী বলেন?'

আমি আর শম্ভুবাবু চুপচাপ সব দেখছিলুম। শম্ভুবাবু বললেন, 'আমরা আর কী বলব?'

কুসুমবালা সম্ভবত দোতলায় সিঁড়ির রেলিঙের পাশে দাঁড়িয়ে সব শুনছিলেন। এই সময়ে তিনি নীচে নেমে আসেন। এসে গঙ্গাধর সামন্তকে বলেন, 'আপনি অনাথ-আশ্রমের কথা কী বলছিলেন?'

সামন্ত বললেন, 'কমলিকে কোথায় রাখা হবে, সেই কথা হচ্ছিল। ভাবছি ওকে আমাদের কোনও হোমে আর নয়তো মাদার টেরিজার আশ্রমে পাঠিয়ে দেব।'

কুসুমবালা বললেন, 'না। কমলি এ বাড়ি ছেড়ে অন্য-কোথাও যাবে না। ওকে আমি ওপরে নিয়ে যাচ্ছি, ও আমার কাছে থাকবে।'

ডাক্তার চাকলাদারকে নিয়ে ইতিমধ্যে আর একদিন ভাদুড়ীমশাইয়ের কাছে গিয়েছিলুম। কৌশিকও বাড়িতে ছিল। চাকলাদারকে দেখে সে বলল, 'শুনেছেন তো? আপনার চেম্বারে যে ফিংগার-প্রিন্ট পাওয়া গেছে, সেটা বিষ্টুরই। ওটা না পাওয়া গেলেও অবশ্য ক্ষতি ছিল না। সাক্ষ্যপ্রমাণ যেভাবে সাজিয়ে নিয়ে তারপর সামন্তর হাতে তুলে দিয়েছি, তাতে কেস একেবারে পাকা। ফাঁসি হয়তো হবে না, তবে যাবজ্জীবন হবেই।'

ভাদুড়ীমশাই বললেন, 'কালই ব্যাঙ্গালোরে ফিরছি। আপনারা সেই কবে গিয়েছিলেন, সে কি আজকের কথা? পারুলের পরীক্ষা শেষ হলে সবাই আর-একবার চলে আসুন। দেখতে পাবেন যে শহরটা কত পালটে গেছে।'

বিদায় নেবার সময় কৌশিকের হাত ধরে খুব ঝাঁকিয়ে দিয়ে চাকলাদার বললেন, 'যেমন মামা, তেমনি ভাগ্নে। নরাণাং মাতুলক্রমঃ।'

পরে রাস্তায় নেমে তাঁর মরিস মাইনরের দরজা খুলতে-খুলতে নিচু গলায় বললেন, 'অবশ্য নারীরাও অনেক সময় অন্তত চেহারায় তাদের মাতুলের মতো হতে পারে। তবে কিনা এই আমাদের বিষ্টুচরণের মতো গ্রাম-সম্পর্কের মামা হওয়া চাই।'

বাড়ি ফিরে দেখি, সদানন্দবাবু আমাদের বৈঠকখানা ঘরে বসে বাসন্তীর সঙ্গে কথা বলছেন। আমি তো অবাক। জামিনে ছাড়া পাবার পর থেকে আর রাস্তাঘাটে তাঁকে দেখাই যায়নি। কাজের মেয়েটিই বাজার করে দিত; মাদার ডেয়ারির দুধও এনে দিত সে-ই। রাস্তায় বার হওয়া তো দূরের কথা, সদানন্দবাবু শুনেছিলুম দোতলা থেকে নীচেই নাকি নামতে চান না।

আমি গিয়ে বৈঠকখানা ঘরে ঢুকতেই সদানন্দবাবু দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, 'অবাক হচ্ছেন তো?'

বললুম, 'তা যে একটু হইনি, তা নয়।'

সদানন্দবাবু বললেন, 'সব শুনেছি। কিন্তু কী যে বলব, বুঝতে পারছি না। যে-কটা দিন বেঁচে আছি, আপনার কাছে ঋণী হয়ে রইলুম।...একটা কথা; বউমা যা বললেন, তাতে বুঝতে পারছি, ভাদুড়ীমশাই কিছু নেবেন না। কিন্তু কৌশিকবাবুও তো কম দৌড়ঝাঁপ করেননি, অন্তত তাঁর ফি'টা তো দেওয়া দরকার।'

বললুম, 'কৌশিককেও কিছু দিতে হবে না। আমি তাকে জিগ্যেস করেছিলুম। তাতে সে বলল, এ-কেসটায় টাকা নিতে মামাবাবুর নিষেধ আছে। তবে কিনা ওর কিছু খরচাপত্তর তো হয়েছে, অন্তত সেটা যাতে নেয় তা আমি দেখব।'

সদানন্দবাবু চট করে তাঁর মুখটা নামিয়ে নিলেন। বুঝতে পারলুম, চোখে যে জল এসে পড়েছে, ভদ্রলোক আমাকে সেটা দেখতে দিতে চান না। আস্তে-আস্তে তিনি দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। তারপর সেখান থেকেই হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'যাবার আগে একটা অনুরোধ করে যাই। কমলি যে বিষ্ণুর মেয়ে, সেটা যেন কখনও প্রকাশ না পায়। নিতান্ত দরকার না হলে আদালতে যাতে ওর প্রসঙ্গটা না ওঠে, দয়া করে সেটাও একটু দেখবেন।'

বললুম, 'আমার আর চাকলাদারের ব্যাপারে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। তা ছাড়া গঙ্গাধর সামন্তকে বলব যে, কমলি হ্যাজ টু বি কেপ্‌ট আউট অভ দিস। সামন্ত তো মানুষ মোটেই খারাপ নন। কমলির ভবিষ্যতের কথা ভেবে তিনি এই অনুরোধটা নিশ্চয় রাখবেন।'

ফলে, সদানন্দ বসু আবার শেষরাত্রে ঘুম থেকে উঠে লোহার-বল-বসানো সেই লাঠিটা হাতে নিয়ে নতুন উদ্যমে শুরু করে দিয়েছেন তাঁর মর্নিং ওয়াক।

সোনার কাঁটা



নারায়ণ সান্যাল

কৈফিয়ত

'নাগচম্পা' উপন্যাস যাঁরা পড়েছেন তাঁদের কাছে দু-একটা কৈফিয়ত দেবার আছে। ওই উপন্যাসে ব্যারিস্টার পি. কে. বাসুর চরিত্রটা যখন আমি সৃষ্টি করি তখন আমি জানতাম না—তিনি 'উত্তম' অথবা 'অধম'। যদি জানতেম, তাহলে নিশ্চয় তাঁকে চিরকুমাররূপে চিহ্নিত করতেম না। অধম-এর এ ত্রুটি 'যদি জানতেম' চলচ্চিত্রের পরিচালক শ্রীদিলীপ মুখোপাধ্যায় সংশোধন করে নিয়েছিলেন। তাঁর সেই উত্তম প্রস্তাব আমি সর্বান্তঃকরণে মেনে নিয়েছি। ফলে এখন থেকে ধরে নিতে হবে বাসু-সাহেব বিবাহিত এবং তাঁর পঙ্গু স্ত্রী বর্তমান।

দ্বিতীয় কথা, 'নাগচম্পা' উপন্যাসে ওই বাসু-সাহেব চরিত্রটাকে আমি রূপায়িত করেছিলাম একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'ব্যোমকেশ বক্সী' চরিত্রটিকে সৃষ্টি করেছিলেন স্যার আর্থার কনান ডয়েল-এর বিশ্ববিশ্রুত গোয়েন্দা শার্লক হোম্‌স-এর ছায়া দিয়ে। শার্লক হোম্‌স-এর সহকারী ডাক্তার ওয়াটসনের ছায়া দিয়ে গড়া অজিতবাবুকেও পেয়েছে বাংলা সাহিত্য। গোয়েন্দা গল্প যে চপল লঘু সাহিত্য নয় এটা প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছেন শরদিন্দু। তাঁর সাহিত্য আমার শিল্প-প্রচেষ্টাকে নানাভাবে নানা যুগে প্রভাবিত করেছে। তাঁর 'ঝিন্দের বন্দী'তে বিদেশি কাহিনিকে খোলনলচে পালটে বাংলা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টায় আমি একসময়ে মুগ্ধ হয়েছিলাম। তার ফলশ্রুতি আমার 'মহাকালের মন্দির'। শুধু ভাব নয়, সেখানে শরদিন্দুর ভাষাও আমি অনুকরণ করবার চেষ্টা করেছি। আরও পরিণত বয়েসে লিখেছি 'আবার যদি ইচ্ছা কর'—সেখানে ভাষার বন্ধন আমি কাটিয়ে উঠেছিলাম। এবারেও শরদিন্দুবাবুর পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমি একটি বিদেশি গোয়েন্দাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছি বাংলা সাহিত্যে—যে-চরিত্রটি স্ট্যানলি গার্ডনার সৃষ্ট চরিত্র পেরি মেসন, বার অ্যাট-ল। গার্ডনারের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, তাঁর গোয়েন্দা-কাহিনির অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রহস্যমোচন হয়েছে আদালতের কক্ষে, ওকালতি প্যাঁচে।

ব্যোমকেশ চিরতরে অবসর নিয়েছেন। অজিতবাবুর কলম আজ স্তব্ধ। বাংলা সাহিত্যের একটা দিক ফাঁকা হয়ে গেল। সেই গুরুতর অভাবটা পূরণ করতে লব্ধ-প্রতিষ্ঠিত এবং শক্তিমান কোনও সাহিত্যিক অগ্রসর হয়ে আসছেন না। কিরীটি, পরাশর বর্মা প্রভৃতিরাও এখন আত্মগোপন করেছেন। যেন মনে হচ্ছে এই দশকের বাংলাদেশে খুন-জখম-রাহাজানি বুঝি সব বন্ধ হয়ে গেছে। ক্রিমিনালরা বুঝি সব কারাপ্রাচীরের ওপারে—মিসায় আটক পড়েছে!

ফলে এই অক্ষম প্রচেষ্টা—'পি. কে. বাসু সিরিজ'-এর অবতারণা। এই সিরিজে 'নাগচম্পা'কে প্রথম কাহিনি হিসেবে ধরে নিলে বর্তমান কাহিনি হচ্ছে দ্বিতীয় কাহিনি।

পি. কে বাসু যদি পাঠকদের মনোহরণে সমর্থ হন, তাহলে তাঁর পরবর্তী কিছু কীর্তিকাহিনি শোনানোর বাসনা রইল।

নারায়ণ সান্যাল

॥ এক ॥

ক্রিবরং-ক্রিং—ক্রিবরং-ক্রিং।

কোনও মানে হয়? দার্জিলিং-এর শীত। সকাল ছ'টা বেজে দশ। ছুটির দিন—দোসরা অক্টোবর, ১৯৬৮। গান্ধীজির জন্মদিবস। সব সরকারি কর্মচারী আজ বেলা আটটা পর্যন্ত ঘুমোবে—শুধু ওরই নিস্তার নেই। এই সাতসকালে টেলিফোনটা চিল্লাতে শুরু করেছে।

ক্রিবরং-ক্রিং—ক্রিবরং-ক্রিং।

লেপটা গা থেকে সরিয়ে খাটের ওপর উঠে বসে নৃপেন ঘোষাল—দার্জিলিং সদর-থানার দারোগা। দেখে, পাশের খাটে লেপের ফাঁক থেকে সুমিতাও একটা চোখ মেলে তাকাচ্ছে। ঘোড়া দেখলেই মানুষে খোঁড়া হয়। নৃপেন আবার সটান শুয়ে পড়ে বলে—দেখো তো?

সুমিতা লেপটা টেনে দেয় মাথার ওপর। স্বগতোক্তি করে একটা। দেখতে হবে না, রং নাম্বার।

অগত্যা আবার উঠে বসতে হয়। সুমিতা লেপের মায়া ত্যাগ করবে না। রং নাম্বার ধরে নিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারলে তো বাঁচা যেত। ডি-সির ফোন হতে পারে, পুলিশ সুপারের হতে পারে—কে জানে ট্রাঙ্ককল কি না। হাড় কাঁপানো শীত অগ্রাহ্য করে উঠে পড়ে নৃপেন। হাত বাড়িয়ে হুক থেকে গরম ড্রেসিং গাউনটা নামায়। গায়ে চড়াতে চড়াতে চটিটা পায়ে গলাতে থাকে।

সুমিতা মুখটা বের করে বলে, 'বেচারি! কেন ঝামেলা করছ। শুয়ে থাক। ও আপনিই থেমে যাবে। কোথায় কোন সিঁধেল চুরি হয়েছে--।'

'সিঁধেল চুরিই হোক, আর বউ-চুরিই হোক—আরও বারো ঘণ্টা এ নরক যন্ত্রণা আমাকেই ভোগ করতে হবে—।'

ড্রেসিং গাউনের ফিতেটা বাঁধতে-বাঁধতে ঘর ছেড়ে 'হল'-কামরায় পৌঁছনোর আগেই টেলিফোনটা দাঁত কিরমিরি করা বন্ধ করল।

'যা বাব্বা! ঠান্ডা মেরে গেলি?' মাঝপথেই দাঁড়িয়ে পড়ে নৃপেন।

অনেকক্ষণ বাজছিল অবশ্য। হয়তো ও পক্ষের মানুষটা ভেবেছে—যাকগে, মরুকগে—এখন আর ও লোকটা কী ভেবেছে তা নিয়ে নৃপেনের কী মাথাব্যথা? লোকটা যখন টেলিফোন নামিয়ে রেখেছে তখন নৃপেনের দায়িত্ব খতম। ঘরে ফিরে আসে সে। ড্রেসিং-গাউনটা খুলে আবার হ্যাঙারে টাঙিয়ে রাখে। হঠাৎ ওর দৃষ্টি চলে যায় কাচের জানলা দিয়ে উত্তর দিকে। অপূর্ব দৃশ্য। নির্মেঘ আকাশে কাঞ্চনজঙ্ঘার মাথায়-মাথায় লেগেছে আবীরের স্পর্শ। উদয়ভানুর প্রথম জয়টিকা। এ দৃশ্য দেখতে এতক্ষণে নিশ্চয় ভিড় জমেছে টাইগার হিলের মাথায়—দূর-দূরান্তর থেকে এসেছে যাত্রীদল, নৃপেনের কিন্তু কোনও ভাবান্তর হল না। স্ত্রীকে ডেকে জানাল না পর্যন্ত খবরটা। একটা হাই তুলল সে। জানলার পরদাটা টেনে নিয়ে উঠে বসল খাটে। লেপটা টেনে নিল আবার। নৃপেন ঘোষাল আজ একাদিক্রমে চার বছর আছে এই দার্জিলিং-এ। সে হাড়ে-হাড়ে জানে রোজ সকালে ভিখারি কাঞ্চনজঙ্ঘা মাথার ওই দগদগে ঘা-টা ব্যান্ডেজ খোলা কুষ্ঠ রুগির মতো সব্বাইকে দেখায়।

দার্জিলিং ওদের কাছে পচে গেছে। ঝাঁকার তলায় চেপটে যাওয়া টমেটোর মতো লাল ওই কাঞ্চনজঙ্ঘার রঙের খেলায় আর ওদের কোনও আকর্ষণ নেই। দু-বছর ধরে ক্রমাগত বদলির জন্য তদবির আর দরবার করে এসেছে। এতদিনে মা কালী মুখ তুলে চেয়েছেন। বদলির অর্ডার এসেছে। ময় ওর সাবস্টিট্যুট পর্যন্ত এসে হাজির। আজই ওর শেষদিন এই হতভাগা দার্জিলিং-এ। আর মাত্র বারো ঘণ্টা এ নরক-যন্ত্রণা ওকে ভোগ করতে হবে। ফোরনুনেই রমেন গুহ ওর কাছ থেকে চার্জ বুঝে নেবে। আঃ, বাঁচা গেল। বদলি হয়েছে খাস কলকাতায়—একেবারে লালবাজারে। বলা যায় একরকম প্রমোশনই। নৃপেন লেপের নীচে অবলুপ্ত হয়ে যায়।

সুমিতা বিজ্ঞতা প্রকাশ করে : 'দেখলে তো! বললাম রং নাম্বার।'

'কোথায় আর দেখলাম? লোকটা তো বিরক্ত হয়ে ছেড়েই দিল।'

'গরজ থাকলে ছাড়ত না। আর একবার ঘুমোবার চেষ্টা কর দিকিন। কাল রাত দুটো পর্যন্ত যা দাপাদাপি করেছ।'

তা করেছে। মালপত্র প্যাকিং হয়ে পড়ে আছে ঘর জুড়ে। ঘরে, হলকামরায়, করিডরে। নানান আকারের প্যাকিং কেস আর ক্রেটিং। চার বছরের সংসার, গুছিয়ে তোলা কি সহজ কথা? আজই ও-বেলায় নৃপেনরা নামবে। নামবে মানে কলকাতামুখো রওনা দেবে। মালপত্র যাবে ট্রাকে। হরি সিং-এর ট্রাক ঠিক এগারোটার সময় এসে দাঁড়াবে। ওরা যাবে জিপে। শিলিগুড়ি পর্যন্ত। তারপর ট্রেনে। রিজার্ভেশান করানোই আছে।

ওর সাকসেসার রমেন গুহ এসে পৌঁছেছে গতকাল। রমেন ছেলে ভালো, নৃপেন একথা স্বীকার করবে। টেলিগ্রাফিক ট্রান্সফার অর্ডার পেয়ে তৎক্ষণাৎ রওনা দিয়েছে। বস্তুত মাসের শেষদিনে। আর কেউ হলে অন্তত একটা দিন অপেক্ষা করত। মাসমাহিনাটা নগদে হাতে নিয়ে চেয়ার ছাড়ত। রমেন তা করেনি। বেচারি লাস্ট পে সার্টিফিকেট কবে পাবে কে জানে? হীরের টুকরো ছেলে। কাল দুপুরেই এসে পৌঁছেছে দার্জিলিং-এ। হোটেলে মালপত্র নামিয়ে এসে দেখা করেছিল নৃপেনের সঙ্গে। নৃপেন বলেছিল, 'আবার হোটেলে উঠতে গেলে কেন রমেন? এ ফ্ল্যাটে তো তিনখানা ঘর। অসুবিধে কিছুই হবে না। তুমি হোটেল ছেড়ে এখানে চলে এসো।'

রমেন গুহ রাজি হয়নি। জবাবে বলেছিল, 'কেন ঝামেলা বাড়াচ্ছ ভাই? তুমি বাঁধাছাঁদায় ব্যস্ত থাকবে, মিসেস ঘোষালও তাঁর বড়ি-আচারের বয়াম নিয়ে বিব্রত থাকবেন—এর মধ্যে উটকো গেস্ট—।'

বাধা দিয়ে সুমিতা বলেছিল, 'আমাদের কিছুমাত্র অসুবিধে হবে না। আমরা যদি ভাতে-ভাত খাই, আপনাকেও তাই খাওয়াব।'

'আমি তা খাব কেন?' জবাবে হেসে ও বলেছিল 'রীতিমতো বিরিয়ানি, পোলাও আর মুরগির রোস্ট চাই আমার। কলকাতায় বদলি হচ্ছেন। ইয়ারকি নাকি?'

একগাল হেসে সুমিতা বলেছিল, 'বেশ তাই খাওয়াব। হোটেলের ঘরটা ছেড়ে দিয়ে আসুন আপনি।'

রমেন মাথা নেড়ে আপত্তি জানিয়েছিল, 'আমারও বদলির চাকরি মিসেস ঘোষাল। শেষ দিনটা কীভাবে কাটে তা কি আমি জানি না? আপনার হাতে পোলাও মাংস নিশ্চিত খাব, তবে এখানে নয়। আপনারা কলকাতায় গিয়ে গুছিয়ে বসুন; আমি যখন সরকারি কাজে কলকাতায় ট্যুরে যাব, তখন ডবল ডি.এ. ক্লেম করব আর আপনার হাতে রান্না খাব। বুঝলেন?'

নৃপেন জিজ্ঞাসা করেছিল, 'কোথায় উঠেছ তুমি? কোন হোটেলে?'

' "হোটেল কাঞ্চনজঙ্ঘা"। ম্যাল-এর ওপাশে। চেন?'

'খুব চিনি। দার্জিলিং আমার নখদর্পণে। ওর ম্যানেজার তো একজন সিক্কি ভদ্রলোক, নয়? কী যেন নাম?'

'ম্যানেজারকে দেখিনি, তবে কাউন্টারে যে ছোকরা বসেছিল সে বাঙালি। মালপত্র নামিয়ে রেখেই আমি তোমার এখানে চলে এসেছি—।'

সুমিতা আবার বলে, 'বেশ হোটেলে রাত কাটাতে চান কাটান, রাত্রে কিন্তু আমার এখানেই খেতে হবে।'

'কেন খুটঝামেলা পাকাচ্ছেন শখ করে?'

'ঝামেলা নয় মোটেই। শুনুন, আমি আজ রাঁধব না। বাসনপত্রও সব প্যাক হয়ে গেছে। হোটেলে খাবার অর্ডার দেব। আপনার মুখ ফসকে যখন কথাটা বেরিয়ে গেছে তখন আজই আপনাকে খাওয়াব—ওই বিরিয়ানি পোলাও আর মুরগির রোস্ট। আজই। এখানেই—।'

রমেন তবু বলে, 'কিন্তু আমার শর্তটা ছিল অন্যরকম। হোটেলের রান্না নয়, আপনার শ্রীহস্ত-পক্ব—।'

বাধা দিয়ে সুমিতা বলে ওঠে, 'না, শর্ত মোটেই তা ছিল না। শর্ত ছিল আপনি যখন কলকাতায় গিয়ে ডবল ডি.এ. ক্লেম করবেন তখন আমার হাতের রান্না খাবেন। তাই নয়?'

রমেন হেসে ফেলেছিল : 'ঠিক কথা! আমারই ভুল!'

'ক্রিররং-ক্রিং—ক্রিররং-ক্রিং!'

আবার উৎপাত! এ তো মহা বখেড়া হল দেখা যাচ্ছে। নৃপেন কাতরভাবে সুমিতার দিকে তাকায়। সুমিতা উঠে বসে এবার। চিৎকার করে বলে—না, নৃপেনকে নয়, টেলিফোনকে—'মশাই শুনছেন! ঘণ্টা-ছয়েক পরে ফোন করবেন। ও. সি. সাহেব এখন ব্যস্ত আছেন, তখন থাকবেন না।'

যন্ত্রটা এ উপদেশে কান দিল না। একগুঁয়েমি চালিয়েই চলে 'ক্রিররং-ক্রিং।'

দুত্তোর নিকুচি করেছে! উঠে পড়ে সুমিতা। দুম-দুম করে পা ফেলে চলে আসে হল-কামরায়। টেলিফোনটা তুলে নিয়ে বলে, 'বলুন? হ্যাঁ, আছেন। না, ঘুমোচ্ছেন না। আপনি কোথা থেকে বলছেন?'

নৃপেন কর্ণময়।

'কাঞ্চনজঙ্ঘা হোটেল থেকে? মিস্টার গুহ বলছেন? না? কী! সে কী!!'

এবার খাট থেকে লাফ দিয়ে নেমে পড়ে নৃপেন। ড্রেসিং-গাউনটা গায়ে জড়াবার কথা আর মনেই থাকে না। সুমিতার কণ্ঠস্বরে এমন একটা কিছু ছিল যাতে নৃপেন দৌড়ে এসে বলে, 'কী হয়েছে সুমিতা?'

সুমিতা জবাব দেয় না। সে যেন পাথর হয়ে গেছে। শীতেই কি না বোঝা গেল না, সে রীতিমতো কাঁপছে। দ্রুতহাতে নৃপেন রিসিভারটা কেড়ে নেয়, বলে,'ও. সি. সদর বলছি। কে আপনি? ইয়েস! কী? কী বলছেন মশাই! অসম্ভব!!'

সুমিতা ইতিমধ্যে বসে পড়েছে সামনের চেয়ারখানায়।

দীর্ঘ সময় নৃপেন আর কিছু বলে না টেলিফোনে, শুধু শুনে যায়। তারপর বলে, 'কোনও কিছু ছোঁবেন না। ঘরটা তালাবন্ধ করে রাখুন। আমি পনেরো মিনিটের ভেতর আসছি।'

রিসিভারটা নামিয়ে রেখে সে ঘুরে দাঁড়ায়। সুমিতার মুখোমুখি। বলে, 'শুনলে?'

সুমিতা জবাব দেয় না। মাথাটা নাড়ে শুধু।

'কী হতে পারে বলো তো? হার্টফেল? থ্রম্বোসিস?'

'আমি, আমি এখনও বিশ্বাসই করে উঠতে পারছি না। কাল রাত্রেও ভদ্রলোক কত হাসি-মশকরা করে গেলেন। ওঁর এঁটো প্লেটটা পর্যন্ত এখনও—।'

নৃপেনের দৃষ্টি চলে যায় ডাইনিং টেবিলে। তিনটি ভুক্তাবশিষ্ট প্লেট। রমেন গুহর প্লেটে পাশাপাশি দুখানা ঠ্যাং। রাত পৌনে দশটা নাগাদ রমেন হোটেলে ফিরে যায়। আর আজ সকাল ছ'টা দশে সে-লোকটা বেঁচে নেই? ইম্পসিবল!

॥ দুই ॥

সকাল সাড়ে সাতটা। হোটেল কাঞ্চনজঙ্ঘার ম্যানেজারের ঘরে জমিয়ে বসেছিল নৃপেন। এখন আর ঘুম-ঘুম চোখ স্লিপিং সুট পরা নৃপেনবাবু নয়, ধরাচুড়া-সাঁটা দার্জিলিং সদর থানার জাঁদরেল ও. সি.। সমস্ত হোটেলটা সে ইতিমধ্যে মোটামুটি ঘুরে দেখেছে। তন্ন-তন্ন করে তল্লাশি করেছে দোতলার তেইশ নম্বর কামরাটা। রমেন গুহর মৃতদেহ এখনও অপসারিত হয়নি। ওর মৃত্যুশীতল পা দুটো দেখে নৃপেনের মনে পড়ে গেল একটু আগে দেখা একটা ডিনার প্লেটে পাশাপাশি শোয়ানো ভুক্তাবশিষ্ট

মুরগির ঠ্যাং-জোড়া। পুলিশ ফটোগ্রাফার এসে ফটো নিয়ে গেছে। দেহটা ময়না তদন্তের জন্য পাঠানো হয়নি এখনও। ইতিমধ্যে টেলেক্স চলে গেছে কলকাতায়, লালবাজার কন্ট্রোল রুমে। হয়তো রমেন গুহর পরিবারেও এতক্ষণে সংবাদটা পৌঁছে গেছে। যতক্ষণ না কেউ এসে পৌঁছচ্ছে ততক্ষণ দেহটা ঠান্ডা ঘরে রাখতে হবে। কেসটা আত্মহত্যাই—থ্রম্বোসিস টম্বোসিস নয়—যদিও এখনও কিছু নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না। তবু বড়কর্তার হুকুম ছাড়া দেহটা দাহ করাও চলবে না। সুবীর হেড-কোয়ার্টার্সে থাকলে ভালো হত। ছোকরার মাথাটা এসব বিষয়ে বেশ খেলে। দুর্ভাগ্যবশত সুবীর রায় দিন তিনেক আগে একটা তদন্তে কার্শিয়ঙে নেমেছে। সুবীর ওর অধীনে পোস্টেড বটে, তবে ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন বিষয়ে সে বিশেষ ট্রেনিং নিয়েছে। তুখোড় ছোকরা। এসব বিষয়ে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডকে টেক্কা দিতে পারে।

হার্টফেল যে নয়, কেসটা যে আত্মহত্যাই তা অনুমান করার যথেষ্ট কারণ আছে। মৃত রমেন গুহ আধশোয়া হয়ে পড়ে আছে তার খাটে; আর তার ডানহাতে ধরা আছে একটা কাচের গ্লাস। আশ্চর্য। গ্লাসটা কাত হয়ে যায়নি—বস্তুত নৃপেন যখন ওকে পরীক্ষা করে তখনও মৃতদেহের ডানহাতে বজ্রমুষ্ঠিতে ধরা ছিল ওই গ্লাসটা—ওই যে 'রিগর-মর্টিস' না কী যেন বলে। নৃপেনের দৃঢ় বিশ্বাস গ্লাসে তরল পানীয়ে কোনও তীব্র বিষ মিশিয়ে রমেন পান করেছে। বিষটা এতই তীব্র যে, তৎক্ষণাৎ ওর মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু হঠাৎ এভাবে আত্মহত্যা কেন করল রমেন? কই, গতকাল রাত্রেও তো সে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ছিল। যে-লোক মধ্যরাত্রে বিষপানে আত্মহত্যা করতে যাচ্ছে সে কি সন্ধ্যারাত্রে ওভাবে হাসি-মশকরা করতে পারে? কিন্তু হত্যাই বা হবে কী করে? রমেনের ঘর ছিল তালাবন্ধ। হোটেলে সে সবেমাত্র এসেছে। তার হাতের ঘড়ি, পকেটের পার্স পর্যন্ত খোয়া যায়নি। এখানে কেউ তাকে চেনে না, জানে না। কে, কোন উদ্দেশ্যে তাকে খুন করবে? তা ছাড়া তালাবন্ধ ঘরে সে ঢুকবেই বা কী করে?

'স্যার!'

'উঁ?' সংবিত ফিরে পায় নৃপেন দারোগা।

হাত দুটি গরুড় পক্ষীর মতো জোড় করে ওর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে হোটেলের ম্যানেজার। বিনীতভাবে বলে, 'মুর্দাকে এবার হটাবার হুকুম দিয়া যায় সাব। পূজা মরশুম। হমার সব বোর্ডার ভাগিয়ে যাবে!'

একটা বজ্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করে নৃপেন বলে, 'মুর্দা! ও লোকটা কে জানো? বেঁচে থাকলে ও আজ বসত আমার চেয়ারে। ও একজন দারোগা।'

ম্যানেজার যোগিন্দর কাপাডিয়া একটি তিনদুর্গ-আঁকা সবুজ টিন বাড়িয়ে ধরে। তার গর্ভে সাদা সিগারেট। যোগিন্দর গলাটা সাফা করে, মুর্দার যে জাত নেই এমন একটা দার্শনিক উক্তি করবে কি না বুঝে উঠতে পারে না।

পাশ থেকে ওর অফিস-ক্লার্ক মহেন্দ্র বলে, 'সে আমরা জানতাম স্যার। দেখুন দেখি, কী কাণ্ড হয়ে গেল!'

নৃপেন ত্রি-দুর্গ-আঁকা টিন থেকে একটি সিগারেট নিয়ে ধরায়। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলে, 'এখন বলো দিকিন—কে ওকে প্রথম ওই অবস্থায় আবিষ্কার করে?'

'রুম-বেয়ারা স্যার। বীরবাহাদুর। বেড-টি দিতে গিয়ে—।'

বাধা দিয়ে নৃপেন বলে ওঠে, 'নো সেকেন্ড হ্যান্ড স্টোরি প্লিজ। প্লিজ রুম-বেহারাকো বোলাও!'

শুধু রুম-সার্ভিসের বেয়ারা নয়, ডাক পড়ল অনেকেরই। ক্রমে-ক্রমে এল তারা এজাহার দিতে। কুক, হেডকুক, গেট-কিপার, কাউন্টার ক্লার্ক ইত্যাদি। টুকরো-টুকরো জবানবন্দি থেকে সংগৃহীত হল সম্পূর্ণ কাহিনিটা। হোটেল রেজিস্টার অনুযায়ী রমেন গুহ এসে পৌঁছয় পয়লা তারিখ বেলা বারোটায়। দোতলার তেইশ নম্বরে আশ্রয় নেয়। সাড়ে বারোটায় সে মালপত্র রেখে বেরিয়ে যায়।

ফিরে আসে রাত দশটায়। কোনও 'মিল' নেয়নি সে। এমনকী এক কাপ চা পর্যন্ত খায়নি। তার মৃতদেহ আবিষ্কৃত হয়েছে পরদিন সকাল ছ'টায়।

কাউন্টার-ক্লার্ক মহেন্দ্রর জবানবন্দি অনুসারে কাল দুপুরে একটি ট্যাক্সি চেপে রমেন গুহ আসে। শেয়ারের ট্যাক্সি। নিউ জলপাইগুড়ি থেকে এসেছে। ট্যাক্সিতে তিনজন লোক ছিল। তিনজনেই কাঞ্চনজঙ্ঘা হোটেলে ওঠে। দ্বিতলের পাশাপাশি তিনখানা সিংগল সিটেড রুম ভাড়া নেয়। অথচ ওরা তিনজন পৃথক যাত্রী। ওরা পরস্পরকে চিনত না।

বাধা দিয়ে নৃপেন প্রশ্ন করেছিল, 'তুমি কেমন করে জানলে ওরা পরস্পরকে চিনত না?'

'স্বচক্ষে দেখলাম স্যার। ট্যাক্সি থেকে মালপত্র নামিয়ে ট্যাক্সি ড্রাইভার এসে দাঁড়াল। ওঁরা তিনজনে ট্যাক্সি ভাড়ার এক-তৃতীয়াংশ দিলেন। তারপর আমার হোটেল-রেজিস্টারে পর পর নাম লেখালেন। ঠিকানা সব আলাদা। একজন হিন্দু, একজন মুসলমান, একজন খ্রিস্টান। '

'ঠিক আছে। এবার বলো—রমেন গুহর সহযাত্রী দুজন কত নম্বরে আছেন?'

মহেন্দ্র মাথা চুলকে বলে, 'সেইখানেই তো ঝামেলা হয়েছে স্যার। দুজনেই ইতিমধ্যে চেক-আউট করে বেরিয়ে গেছেন।'

'বল কি! কাল বেলা বারোটায় চেক-ইন করে আজ সকাল সাতটাতেই চেক-আউট?'

'দুজনেই নয় স্যার। মিস্টার মহম্মদ ইব্রাহিম চেক-আউট করেছেন কাল রাত সাড়ে আটটায় আর মিস ডিক্রুজা আজ ভোর পাঁচটায়।'

'মিস ডিক্রুজা। মেমসাহেব?'

'না স্যার। দিশি মেমসাহেব। দেখলে বাঙালি বলেই মনে হয়।'

'ভোর পাঁচটায়। অত ভোরে?'

'হ্যাঁ স্যার। টাইগার-হিলে সানরাইজ দেখতে গেলেন যে। বললেন আজই নামবেন। মালপত্র নিয়েই চেক-আউট করে বেরিয়ে গেলেন।

সন্দেহজনক। অত্যন্ত সন্দেহজনক। রমেন গুহ মারা গেছে রাত দশটার পরে। তেইশ নাম্বার ঘরে। আর ঠিক তার পাশের ঘরের বাসিন্দা কাকডাকা ভোরে হোটেল ছেড়ে দিল। পরবর্তী ঠিকানা না রেখে? অবশ্য মহম্মদ ইব্রাহিমকে সন্দেহ করার কিছু নেই। সে চেক-আউট করেছে রাত সাড়ে আটটায়—রমেন তখনও নৃপেনের বাড়িতে। বহাল তবিয়তে। মহম্মদ ইব্রাহিম আর মিস ডিক্রুজার স্থায়ী ঠিকানা দুটো নৃপেন লিখে নিল তার নোটবইতে। খোদা মালুম সেগুলো আদৌ সত্য কি না। কাউন্টার-ক্লার্ক ছোকরাটি বেশ চলতা-পুর্জা। অনেক খবর দিতে পারল সে ওই দুজনের সম্বন্ধে। ছোকরা লক্ষ করেছে অনেক কিছুই। মিস ডিক্রুজার বয়েস সাতাশ-আঠাশ, যদিও সাজে-সজ্জায় সে নিজেকে বাইশ-তেইশ বলতে চায়। সুন্দরী। চমৎকার ফিগার। বিজ্ঞের মতো বললে—ভাইট্যাল স্ট্যাটিসটিক্স হবে, এই ধরুন ৩৪-২৮-৩২। চুল ছোট, বব নয়। রং মাজা, ফরসা ঘেঁষা। খুব ভালো বাংলা বলতে পারে—নাম না বললে বাঙালি বলে ভুল হতে পারে। সিগারেট খায়। 'প্রফেশান'-এর ঘরে লেখা আছে 'হ্যাসিফ'। মিস কী করে গৃহকর্ত্রী হয় তা জানে না মহেন্দ্র। তবে সে তাতে আপত্তি করেনি। তার সঙ্গে ছিল একটা ভি. আই. পি-মার্কা সাদা স্যুটকেস। অপরপক্ষে মহম্মদ ইব্রাহিমের বয়স ত্রিশের ওপর, চল্লিশের নীচে। দীর্ঘকায়, বলিষ্ঠ গঠন। ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি ও গোঁফ আছে, চোখে চশমা। পাইপ খান। প্রফেশান—তাঁর বিবৃতিমতো—বিজনেস।

হেড-কুক সবিনয়ে নিবেদন করল খাবারে কোনওক্রমেই কোনও বিষাক্ত পদার্থ মিশে যেতে পারে না। তার যুক্তি প্রাঞ্জল : তাহলে তো হুজুর হোটেলসুদ্ধ লোক আজ মরে ভূত হয়ে থাকত।

নৃপেন ধমক দেয়, 'বাজে কথা বোলো না। কে বলেছে খাবারে বিষ ছিল? রমেন তোমার কিচেনের খাবার খায়নি। কিন্তু ওর ঘরে থার্মোফ্লাস্কে জল রয়েছে দেখলাম। গরম জল তুমি সাপ্লাই করেছিলে?'

হেডকুক সভয়ে নিবেদন করে, 'বোর্ডারের ঘরে থার্মোফ্লাস্কে জল থাকলে তা আমার কিচেন থেকেই সাপ্লাই হয়েছে নিশ্চয়ই। কিন্তু জল তো আমি স্রেফ কল থেকে নিয়ে গরম করেছি স্যার!'

'জানি, নর্দমা থেকে নাওনি। কিন্তু জলটা ওর ঘরে কে রেখে এসেছিল?'

'তার জিম্মেদারি আমার নয় হুজুর। রুম-সার্ভিস বেয়ারার কাজ ওটা।'

'হুঁ। কী নাম সেই রুম-সার্ভিসের বেয়ারার?'

'বীরবাহাদুর, স্যার।'

'বীরবাহাদুর কার নাম?'

কেউ সাড়া দেয় না।

নৃপেন প্রচণ্ড ধমক লাগায়, 'আধঘণ্টা থেকে ডাকছি, বীরবাহাদুর আসছে না কেন? এরা ভেবেছে কী, দারোগা খুন করে পার পাবে। সবক'টার মাজায় দড়ি বেঁধে চালান দেব আমি।'

একটা রীতিমতো শোরগোল পড়ে যায়। দু-তিনজন ছোটে বীরবাহাদুরের খোঁজে। যোগিন্দর কাপাডিয়া কী করবে ভেবে না পেয়ে আবার থ্রি-কাসলস-এর টিনটা বাড়িয়ে ধরে। নৃপেন আবার একটা সিগারেট নিয়ে ধরায়।

তিন-চারজনে ইতিমধ্যে পাকড়াও করে নিয়ে এসেছে বীরবাহাদুরকে। বেচারির পিতৃদত্ত নামের শেষ চিহ্নটুকু পর্যন্ত অবলুপ্ত। বীরত্ব এবং বাহাদুরি। নবমীর পাঁঠার মতো কাঁপতে-কাঁপতে, এসে দাঁড়াল দারোগা সাহেবের সামনে।

'তোমার নাম বীরবাহাদুর?'

'জি হ্যাঁ।'

'তোম বীর হ্যায় ইয়া বাহাদুর হ্যায়?'

বেঁটে লোকটা কী জবাব দেবে ভেবে পায় না।

অনেক জেরার পরে লোকটা হলফ খেয়ে বললে, 'সে থার্মোফ্লাস্কে বিষ-টিষ কিছু মেশায়নি। তার বিশ বছরের নোকরি। এমনটি এর আগে কখনও হয়েছে?'

'তুমি ফ্লাস্কটা নিয়ে কিচেন থেকে সোজা ওই তেইশ নম্বর ঘরে গিয়েছিলে, না কি ফ্লাস্কটা আর কারও হাতে ধরতে দিয়ে বিড়ি-টিড়ি খেয়েছিলে?'

'জি নেহি সাব। ম্যয় বিড়ি নেহি পিতা।'

'ধেত্তেরি। যা জিজ্ঞাসা করছি তার জবাব দাও। সিধে তেইশ নম্বরমে গয়া থা ক্যা?'

'জি সাব।'

'ঠিক আছে। এবার আজ সকালের কথা বলো। কখন তুমি প্রথম জানতে পারলে?'

বীরবাহাদুর যে বর্ণনা দিল তা সংক্ষেপে এই :

হোটেলের আইন অনুসারে রাত সাড়ে দশটার পর রুম-সার্ভিস বন্ধ হয়ে যায়। ভোর সাড়ে চারটের আগে আর রুম-সার্ভিস পাওয়া যায় না। টাইগারহিলে যাওয়ার বায়নাক্কা থাকায় প্রায় প্রতিদিনই কিছু-না-কিছু বোর্ডারকে ভোর সাড়ে চারটেয় বেড-টি দিতে হয়। তাই শেষরাত্রে অন্ধকার থাকতেই কিচেনটি কর্মব্যস্ত হয়ে পড়ে।

বাধা দিয়ে নৃপেন প্রশ্ন করে, 'রুম নম্বর চব্বিশে বেড-টির অর্ডার ছিল আজ?'

'জি নেহি। চব্বিশ মে থি বহু মেমসাব। উসনে বেড-টি নেহি লি-থি।'

নৃপেন মহেন্দ্রের দিকে ফিরে বললে, 'তবে যে তখন তুমি বললে—মিস ডিক্রুজা আজ সকালে টাইগার-হিলে গেছে?'

মহেন্দ্র আমতা-আমতা করে বললে, 'ইয়ে, টাইগার-হিলে যেতে হলে চা খেয়ে যেতে হবেই, এমন কোনও আইন নেই স্যার!'

'আমি জানি। বাজে কথা বলো না!' ধমক দেয় নৃপেন দারোগা। তারপর বীরবাহাদুরের

দিকে ফিরে বলে, 'তেইশ নম্বরে বেড-টির অর্ডার ছিল?'

'জি সাব। পৌনে ছে বাজে!'

ব্যাপারটা বিস্তারিত করে বুঝিয়ে দেয় বীরবাহাদুর। তেইশ নম্বরে ছিলেন এক দারোগা সাহেব। মানে যিনি মারা গেছেন। তিনি পৌনে ছ'টায় চা চেয়েছিলেন। বীরবাহাদুর ঠিক সময়ে চায়ের ট্রে নিয়ে ওঁর দরজার সামনে এসে নক করে। কেউ সাড়া দেয় না। অনেকক্ষণ ধরে ডাকাডাকি করে। তবু কেউ সাড়া দেয় না। ওই সময় ওদিককার খোলা বারান্দায় দাঁড়িয়ে এক সাহেব পাইপ খাচ্ছিলেন। তিনি বাহাদুরকে বলে ওঠেন, 'কেন হোটেলসুদ্ধ লোকের সুখনিদ্রায় বাধা দিচ্ছ বাবা? তোমার ওই কুম্ভকর্ণ-সাহেবের ঘুম যখন ভাঙবে তিনি নিজেই চা চাইবেন।' তখন বাহাদুর সেই পাইপমুখো সাহেবকে বলেছিল, 'এমন কাণ্ডটা ঘটলে ম্যানেজার রাগ করবেন স্যার। উনি ভাববেন, আমি মিছে কথা বলছি—সময়মত বেড-টি দিতে আসিনি আমি।' তখন সেই পাইপমুখো সাহেব বললেন, 'তুমি আমাকে সাক্ষী মেনো বাবা। আমি দরকার হলে আদালতে হলফ নিয়ে বলব—তোমার চেষ্টার ত্রুটি ছিল না।'

নৃপেন প্রশ্ন করে, উনি অত ভোরে ওই ঠাণ্ডার মধ্যে দাঁড়িয়ে কী করছিলেন?

'ওহ্ নেহি জানতা সাব!'

মহেন্দ্র ওপর-পড়া হয়ে বলে, 'ওই বারান্দা থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘার সান-রাইজ দেখা যায় স্যার। উনি বোধ হয়—।'

'তুমি চুপ করো!' ধমক দিয়ে ওঠে নৃপেন। তারপর বাহাদুরের দিকে ফিরে বলে, 'তারপর? বলে যাও—।'

বীরবাহাদুর তার জবানবন্দি শুরু করে। ঠিক ওই সময়েই নাকি সেই তেইশ নম্বর ঘরের ভেতর একটা অ্যালার্ম ক্লক বেজে ওঠে। পুরো এক মিনিট সেটা বাজে। তাতেও ঘরের ভেতর কোনও সাড়াশব্দ জাগে না। পাইপমুখো সাহেব এবার কৌতূহলী হয়ে নিজেই এগিয়ে আসেন। চাবির ফুটোয় চোখ লাগিয়ে বলে ওঠেন, 'আশ্চর্য, ঘরে আলো জ্বলছে!' এরপর উনি একটা দেশলাই জ্বেলে দরজার ওপর কার্ড আটকানো খোপটা দেখে বলে ওঠেন, 'রমেন গুহ! পুলিশের লোক নাকি?' বীরবাহাদুর জবাবে বলেছিল, 'জি সাব!' পাইপমুখো তখন বলেন, 'তবে তো আমার চেনা লোক মনে হচ্ছে। তুমি এক কাজ করো তো হে! কাউন্টারে গিয়ে এ ঘরের ডুপ্লিকেট চাবিটা নিয়ে এস। বীরবাহাদুর অগত্যা ট্রে-টা নামিয়ে রেখে একতলায় কাউন্টারে ফিরে যায়। কাউন্টার-ক্লার্ক মহেন্দ্র বাহাদুরকে একটা মাস্টার কি দেয়। সেটা নিয়ে বাহাদুর—।

'দাঁড়াও। দাঁড়াও—' এখানেই বীরবাহাদুরের জবানবন্দি থামিয়ে নৃপেন মহেন্দ্রর দিকে ফিরে প্রশ্ন করে—'মাস্টার কি' বস্তুটা কী?

'প্রতি ঘরের 'ডুপ্লিকেট কি' ছাড়াও আমার কাছে দুটো মাস্টার-কি আছে। তার একটা চাবি দিয়ে একতলার সব ঘর খোলা যায়। দ্বিতীয়টা দিয়ে দোতলার সব ঘর খোলা যায়।'

'আই সি! তা তুমি বাহাদুরকে ওই তেইশ নম্বর ঘরের ডুপ্লিকেট চাবিটা না দিয়ে ফস করে "মাস্টার কি" দিয়ে বসলে কেন?'

'তেইশ নম্বর ঘরের দুটো চাবিই ওই গুহ-সাহেব আমার কাছ থেকে নিয়ে রেখেছিলেন।'

'দুটো চাবিই তোমরা বোর্ডারকে দাও?'

'না স্যার। তবে আমি জানতাম ওই গুহ-সাহেব আপনার জায়গায় বদলি হয়ে আসছেন। তাই—।'

'বুঝেছি!' নৃপেন এবার বাহাদুরের দিকে ফিরে বললে, 'প্রসিড।'

বুঝতে অসুবিধে হল না বাহাদুরের। সে তার জবানবন্দির সূত্র তুলে নেয়।

মাস্টার-কি দিয়ে দরজা খুলে ওরা দুজনে ঘরে ঢোকে—বাহাদুর আর সেই পাইপমুখো সাহেব। দেখে, টেবিল ল্যাম্পটা জ্বলছে। টেবিলের ওপর মুখ বন্ধ করা একটা জলের ফ্লাস্ক, একটা হুইস্কির

বোতল, এক প্যাকেট ক্যাপস্টান সিগারেট, একটা দেশলাই, একটা অ্যাশট্রে আর একটা অ্যালার্ম ক্লক। রমেনের হাতে দৃঢ় মুষ্টিতে ধরা আছে একটা কাচের গ্লাস—তাতে ঈষৎ পীতাভ কিছু তরল পানীয়। সম্ভবত গরমজলে মেশানো হুইস্কি ছিল ঘণ্টাকতক আগে—তখন বরফ-ঠান্ডা। বীরবাহাদুর কোনওক্রমে চায়ের ট্রে-টা নামিয়ে রাখে। পাইপমুখোসাহেব রমেনকে পরীক্ষা করেন। নাড়ি দেখেন, কানের নীচে চোয়ালের তলায় কী একটা পরীক্ষা করেন। তারপর বাহাদুরের দিকে ফিরে বলেন, 'মারা গেছে। তোমার ম্যানেজারকে খবর দাও।' বাহাদুর হুড়মুড়িয়ে নেমে আসে নীচে।

'সে কী! ওই পাইপমুখোসাহেবকে ওই ঘরে একা রেখে?'

'জি হুজুর। ইয়ে তো বাতায়া ওহ্‌। কহা কি ম্যানেজারকো সেলাম দো।'

'সেলাম দেওয়াচ্ছি!' নৃপেন ঘুরে দাঁড়ায় যোগিন্দরের মুখোমুখি। বলে, 'কী মশাই, তবে যে বললেন মৃতদেহ আবিষ্কারের পরে ও ঘরে কেউ ঢোকেনি? ওটা তালাবন্ধ পড়ে আছে?'

যোগিন্দর আমতা-আমতা করে। মহেন্দ্র বলে, 'ইয়ে বাহাদুর নীচে এসে খবর দেওয়া মাত্র আমি দৌড়ে ওই ঘরে উঠে যাই। মিনিট তিন-চারের বেশি ওই বোর্ডার ভদ্রলোক ও ঘরে একা ছিলেন না।'

'থামো তুমি। হুঁঃ, তিন-চার মিনিট! চার মিনিট কি কম সময়? ওর ভেতর অনেক কিছু করে ফেলা যায়, বুঝেছ? সবক'টার মাজায় দড়ি বাঁধব আমি।'

যোগিন্দর সিগারেটের টিনটা বাড়িয়ে ধরবে কি না ভেবে পায় না। নৃপেনের আগের সিগারেটটা তখনও শেষ হয়নি।

'ওই পাইপমুখো কি হোটেলে আছেন, না কি তাঁকেও চেক-আউট করিয়ে দিয়েছ?'

মহেন্দ্র হাত কচলে বলে, 'না স্যার, উনি আছেন। একতলায় একটা ডাবল-বেড রুম নিয়ে আছেন। সস্ত্রীক।'

'দেখবে, যেন তিনি না ইতিমধ্যে কেটে পড়েন। তাঁকে খবর দাও—আমি দশ মিনিটের মধ্যে তাঁর ঘরে যাচ্ছি। তাঁর এজাহারটা নিতে হবে—।'

যোগিন্দরের ইঙ্গিতে একজন তখনই চলে গেল পাইপমুখোকে রুখতে।

'তারপর? ওপরে এসে কী দেখলে? না, তুমি নয়—বাহাদুর তুমি বলো। পাঁচ মিনিট পরে যখন তুমি ওপরে এলে তখন কী দেখলে? পাইপমুখো কী করছিলেন তখন?'

'তামাম কামরাঠো তালাশ করতা থা!'

'বাঃ-বাঃ-বাঃ। চমৎকাব!' নৃপেন দারোগা দগ্ধাবশেষ সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে যোগিন্দরের দিকে ফেরে। বলে, 'কী মশাই? আপনি অম্লানবদনে বললেন ঘরটা বরাবর তালাবন্ধ আছে। কেউ কিছু টাচ করেনি, ট্যাম্পার করেনি।'

যোগিন্দর তৎক্ষণাৎ সিগারেটের টিনটা বাড়িয়ে ধরে।

'দূর মশাই। সিগারেট নিয়ে কী করব? যা জিজ্ঞাসা করছি তার জবাব দিন।'

যোগিন্দর হাত দুটি জোড় করে বললে, 'স্যার, বাসু-সাহেবকে আমি বিশ বরিস ধরে জানি। নাম-করা ব্যারিস্টার। উনি কোনও কিছু ট্যাম্পার করতেই পারেন না।'

'বাসু-সাহেব। কে বাসু-সাহেব?'

'ওই যাঁকে বীরবাহাদুর পাইপমুখোসাহেব বলছে। ওঁর নাম পি. কে. বাসু আছে। উনি বহুবার আমার হোটেলে উঠেছেন। একদম শরিফ আদমি। এককালে ক্রিমিনাল ল-ইয়ার হিসাবে লাখ-লাখ টাকা কিচেছেন। এখন প্র্যাকটিস ছেড়ে দিয়েছেন।'

'লাখ-লাখ টাকা খেঁচার সঙ্গে গোয়েন্দাগিরির কোনও সম্পর্ক নেই, বুঝেছেন? যাক তাঁর সঙ্গে তো এখনই কথা বলব। তারপর কী হল বলুন?'

জবাব দিল মহেন্দ্র—'তারপর আর কী? আমরা ঘরটা তালাবন্ধ করে নেমে এলাম। আপনাকে

ফোন করলাম। ঠিক ছ'টা বেজে দশে।'

ইতিমধ্যে একজন বেয়ারা এসে দাঁড়ায়। তার হাতে একটা খালি ব্র্যান্ডির শিশি। নৃপেন সেটা হাতে নিয়ে জিজ্ঞাসা করে, 'খুব ভালো করে ধুয়েছিস তো?'

'হ্যাঁ স্যার, খুব ভালো করে বারবার ধুয়েছি।'

'ঠিক আছে। এবার আর একবার ওই তেইশ নম্বর ঘরে যেতে হবে। চলুন।'

তেইশ নম্বর ঘরে এসে নৃপেন স্বহস্তে ওই কাচের গ্লাস থেকে তরল পদার্থটি শিশিতে ভরে নিল। তারপর ঘরে তালা দিয়ে বেরিয়ে এল। নেমে এল নীচে। সকলকে বিদায় দিয়ে একাই চলে এল নির্দেশমতো একতলায় এক নম্বর ঘরে। সব ঘরেই ইয়েল-লক, ছিটকিনি নেই। অর্থাৎ দরজা ঠেলে বন্ধ করলে চাবি ছাড়া দরজা খোলা যায় না। এক নম্বর ঘরের দরজা খোলাই ছিল। ভারী পরদা ঝুলছে। নৃপেন খোলা দরজায় 'নক' করল। ভেতর থেকে আহ্বান এল ইয়েস। কাম ইন প্লিজ।

পরদা সরিয়ে নৃপেন প্রবেশ করল ঘরে।

ডাবল বেড বড় ঘর। একজন ভদ্রমহিলা বসেছিলেন একটা চাকাওযালা চেয়ারে। তাঁর হাতে একজোড়া উলের কাঁটা। উলের সোয়েটার বুনছিলেন। তাঁর মুখোমুখি একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক ড্রেসিং-গাউন পরে বসেছিলেন ইজিচেয়ারে। বোধ করি কী একখানা বই পড়ে শোনাচ্ছিলেন স্ত্রীকে। বইটা মুড়ে এদিকে ফিরে বললেন, 'বসুন। মিস্টার ঘোষাল আই প্রিসিউম? ও. সি. সদর?'

'হ্যাঁ, আপনাকে বিরক্ত করতে হচ্ছে বলে দুঃখিত।'

'নট দ্য লিস্ট, নট দ্য লিস্ট। বলুন কী ভাবে আপনাকে সাহায্য কবতে পারি। বাই দ্য ওয়ে, আপনার হাতে ওটা কী? ব্র্যান্ডি?'

'না। মৃতের হাতের গ্লাসে যে তরল পদার্থটা ছিল সেটা নিয়ে যাচ্ছি। কেমিক্যাল অ্যানালিসিস করাতে হবে।'

'ও। তা করান। তবে কী পাবেন তা আগেই বলে দিতে পারি। অ্যালকোহল, অ্যাকোয়া আব কে. সি. এন।'

' "কে. সিয়েন" মানে?'

'পটাসিয়াম সায়ানাইড!'

প্রৌঢ় ভদ্রলোকের এই বিদ্যে জাহির করবার প্রচেষ্টা দেখে নৃপেন মনে-মনে হাসে। কিন্তু ভদ্রলোকের চেহারায় এমন একটা আভিজাত্য আছে যে, সে প্রকাশ্যে হেসে উঠতে পারল না। বললে, 'আপনি ব্যারিস্টার মানুষ! নিশ্চয় বুঝবেন, অমন আপ্তবাক্যে কোনও কোর্টে কনভিকশন হয় না। এটা এভিডেন্স হিসেবে তখনই গ্রাহ্য হবে যখন কোনও বিশেষজ্ঞ রাসায়নিক তাঁর ল্যাববেটারিতে পরীক্ষা করে একটা রিপোর্ট দেবেন।'

'কারেক্ট। কোয়াইট কারেক্ট। এ ক্ষেত্রে অবশ্য বিশেষজ্ঞের রিপোর্ট সত্ত্বেও ওটা এভিডেন্স হিসেবে গ্রাহ্য হবে না।'

হাসি-হাসি মুখে বাসু-সাহেব তাকিয়ে থাকেন নৃপেন দারোগার দিকে। অর্থাৎ এবার তুমি জানতে চাও—কেন গ্রাহ্য হবে না? তা কিন্তু জানতে চাইল না নৃপেন। সে মনে-মনে রীতিমতো চটে উঠেছে এ ভদ্রলোকের অহেতুক মোড়লিতে। ওকে নীরব থাকতে দেখে বাসু-সাহেব নিজেই বলে ওঠেন—'কেন গ্রাহ্য হবে না জানেন?'

এতক্ষণে রুখে ওঠে নৃপেন, 'না, জানি না। জানতে চাইও না।'

বাসু-সাহেব কিন্তু রাগ করেন না। হেসেই বলেন, 'গ্র্যাটিস লিগ্যাল অ্যাডভাইস আমি দিই না, কিন্তু আপনার ক্ষেত্রে না হয় ব্যতিক্রমই করলুম। আপনার উচিত ছিল যে-সব সাক্ষীর সামনে ওই তরল পানীয়টা সংগ্রহ করেছেন তাঁদের উপস্থিতিতেই ওটা সিলমোহর কবা। ডিফেন্স কাউন্সিলারগুলো ভারি পাজি হয়, বুঝেছেন—তারা কিছুতেই মানতে চাইবে না বিশেষজ্ঞের রিপোর্টে

যে লিকুইডটার পরিচয় লেখা আছে সেটাই ওই মৃত ব্যক্তির হাতে পাওয়া গেছে। বলবে, সিল যখন করা নেই তখন অ্যাকিউসডকে ফাঁদে ফেলতে আপনি নিজেই ওতে কিছুটা হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিড মিশিয়ে দিয়েছেন! ইন ফ্যাক্ট আপনি ইচ্ছে করলে এখনও তা মেশাতে পারেন। তাই নয়?'

কর্ণমূল পর্যন্ত আরক্ত হয়ে ওঠে নৃপেনের।

'যাক ও কথা। আমার কাছে কী জানতে চান বলুন?'

অপমানটা গলাধঃকরণ করে নৃপেন আরও মরিয়া হয়ে ওঠে। বলে, 'আপনিই মৃতদেহটা প্রথম আবিষ্কার করেন?'

'নট এক্সজ্যাক্টলি। আমরা দুজন। আমি আর বীরবাহাদুর।'

'এবং তার পরেই আপনি বীরবাহাদুরকে নীচে যেতে বলেন?'

'অ্যাফার্মেটিভ!'

'আপনি কতক্ষণ ওই ঘরে একা ছিলেন?'

'পাঁচ থেকে সাত মিনিট।'

'ওই পাঁচ-সাত মিনিট ধরে আপনি ঘরটা তন্ন-তন্ন করে সার্চ করেছেন?'

'পাঁচ-সাত মিনিটে একটা ঘর তন্ন-তন্ন করে সার্চ করা যায় না। মোটামুটি তল্লাশি করেছিলাম।'

'কাজটা ভালো করেননি।'

মিসেস বাসু তাঁর হুইল চেয়ারটা চালিয়ে পিছনের বারান্দার দিকে চলে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ থেমে পড়েন এ-কথায়। বাসু-সাহেব হাসি-হাসি মুখেই বলেন, 'য়ু থিংক সো?'

রূঢ়তর কণ্ঠে নৃপেন বলে, 'হ্যাঁ, তাই মনে করি আমি। আপনি হয়তো কিছু ফিঙ্গারপ্রিন্ট নষ্ট করে ফেলেছেন তল্লাশ করতে গিয়ে।'

'করিনি। আমার হাতে গ্লাভস পরা ছিল। তা ছাড়া এসব কেস কীভাবে হ্যান্ডেল করতে হয় আমার জানা আছে।'

এবার আর আত্মসংবরণ করতে পারে না নৃপেন। রীতিমতো ধমকের সুরে বলে, 'না, আপনি অন্যায় করেছেন। আপনি ক্রিমিনাল ল-ইয়ার, ডিটেকটিভ নন! তবু ল-ইয়ার হিসেবে আপনার জানা থাকা উচিত যে, পুলিশ এসে পৌঁছনোব আগে কোনও কিছু পবীক্ষা করার অধিকার আপনার নেই!'

মিসেস বাসু শঙ্কাভরা দুচোখ মেলে বাসু-সাহেবের দিকে তাকালেন। তাঁর স্বামীকে তিনি ভালোমতোই চিনতেন। বাসু-সাহেবের সঙ্গে তাঁর চোখাচোখি হল। বোধ করি সেজন্যই কোনও বিস্ফোরণ হল না। বাসু-সাহেব শান্ত কণ্ঠে শুধু বললেন, 'লুক হিয়ার মিস্টার ও. সি. হেড-কোয়ার্টার্স! আমার অধিকার সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ সচেতন। হিয়ার্স মাই কার্ড! আপনি যা ভালো বোঝেন করতে পারেন।'

নৃপেন হাত বাড়িয়ে কার্ডটা গ্রহণ করে না। চেয়ার ছেড়ে সে উঠে দাঁড়ায়।

বাসু-সাহেব বলেন, 'আগেই বলেছি গ্র্যাটিস লিগাল অ্যাডভাইস দেওয়া আমার স্বভাব নয়। এক্ষেত্রে তবু দিতে বাধ্য হচ্ছি এজন্যে যে, রমেন গুহ ছিল আমার অত্যন্ত স্নেহভাজন।'

'রমেন গুহ আপনার পরিচিত?' প্রশ্ন করে নৃপেন।

বাসু-সাহেব সে প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বলেন, 'এটা যে আত্মহত্যা নয়, বরং একটা ফার্স্ট ডিগ্রি ডেলিবারেট মার্ডার তার অকাট্য এভিডেন্স আমি পেয়েছি। যেহেতু কেসটা রমেন গুহর, তাই কতকগুলো ক্লু আপনাকে দিতে চাই। আপনি কি দয়া করে বসবেন?'

নৃপেন বসে না। একগুঁয়ে ছেলের মতো দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়েই বলে, 'কী ক্লু?'

বাসু-সাহেব পাইপটা ধরালেন। বললেন, 'মাথা ঠান্ডা করে ব্যাপারটা শুনলেই কিন্তু আপনি ভালো করতেন। তাতে আপনার নেহাত আপত্তি থাকলে আমি বিপুলকেই সব কথা জানাব। আফটার অল, এটা রমেন গুহর কেস!'

'বিপুল! বিপুল কে?'

'ডি. সি. দার্জিলিং। বিপুল ঘোষ। তার স্ত্রী মণির মামা হই আমি।'

নৃপেন বসে পড়ে। পথে নয়, চেয়ারে। বলে, 'বলুন, কী বলবেন?'

'আপনি তদন্ত করে কী বুঝেছেন? এটা আত্মহত্যার কেস?'

'না। রমেনের আত্মহত্যার কোনও কারণ খুঁজে পাইনি আমি। গতকাল রাত্রি প্রায় দশটা পর্যন্ত সে আমার বাড়িতেই ছিল। দিব্যি স্বাভাবিক মানুষ। আমাদের সঙ্গেই রাত্রে খেয়েছে, হাসি-গল্প করেছে—হোটেলে ফিরে এসে সে তার স্ত্রীকে যে চিঠি লিখেছে তাতেও কোনও ইঙ্গিত নেই!'

'সুতরাং—?'

'কিন্তু ওকে এখানে কে হত্যা করতে চাইবে? ওর হাতঘড়ি, মানিব্যাগ পর্যন্ত খোয়া যায়নি!'

'রমেন গুহ দারোগা ছিল। যেখান থেকে ও বদলি হয়ে এসেছে সেখানকার কোর্টে এমন দশ বিশটা কেসে হয়তো তাকে সাক্ষী দিতে যেতে হত। অন্তত একডজন আসামি খুশি হবে লোকটা বেমক্কা মারা গেলে, নয়? তাদের মধ্যে অন্তত আধডজন পাকা ক্রিমিনাল! খুনি-ডাকাত-ওয়াগন-ব্রেকার-ব্ল্যাকমার্কেটিয়ার! তাদের মধ্যে কেউ—।'

'কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ ওর রুদ্ধদ্বার ঘরে মদের পাত্রে বিষ মিশিয়ে দেওয়ার সুযোগ পাবে কেমন করে? রমেন কাল বেলা বারোটায় হোটেলে ঢুকেছে, সাড়ে বারোটায় ঘরে তালা মেরে বেরিয়ে গেছে! ফিরেছে রাত দশটায়। এর মধ্যে তার ঘরে কেউ ঢোকেনি।'

'য়ু থিংক সো?'

'নিশ্চয়। আপনি হয় তো জানেন না, ও তার ঘরের দুটো চাবিই চেয়ে নিয়েছিল!'

'জানি। কিন্তু কেন? দুটো চাবি নিয়ে সে কী করবে? সে তো একা মানুষ!'

নৃপেন একটু ইতস্তত করে। তারপর বলে, 'আমি জানি না।'

'আই সি। জানেন না!'

আবার রুখে ওঠে নৃপেন, 'কেন, আপনি জানেন?'

'জানি। কিন্তু ও কথা থাক। তার আগে বলুন তো—বীরবাহাদুর ঠিক ক'টার সময় গরম জল ভরতি ফ্লাস্কটা ওর ঘরে রেখে আসে?'

নৃপেন আবার অস্বোয়াস্তি বোধ করে। বলে, 'আমি জানি না।'

'আই সি! জানেন না! সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায়। আমি জিজ্ঞাসা করে জেনে নিয়েছিলাম। রমেন যখন সাড়ে বারোটার সময় বেরিয়ে যায় তখনই বলে যায়, তার ঘরে যেন এক ফ্লাস্ক গরম জল রেখে দেওয়া হয়। ফ্লাস্কটা তার নিজের। এখন বলুন তো, দুটো চাবিই যখন রমেনের কাছে তখন বীরবাহাদুর কেমন করে ও ঘরে ঢুকল?'

এ সমস্যা অনায়াসে সমাধান করে নৃপেন। বলে, 'জানি, ওই মাস্টার-কি দিয়ে।'

'ও! জানেন! তাহলে আপনার ওই আগেকার স্টেটমেন্টটা তো ঠিক নয়। ওই যে বললেন—'বেলা সাড়ে বারোটা থেকে রাত দশটার মধ্যে ও-ঘরে কেউ ঢোকেনি!'

নৃপেন অসহিষ্ণুর মতো বলে ওঠে, 'কী আশ্চর্য! বীরবাহাদুর কেন বিষ মেশাবে? সে এ হোটেলে বিশ বছর চাকরি করছে—তার কী উদ্দেশ্য থাকতে পারে?'

'কারেক্ট! কিন্তু বীরবাহাদুর তার মাস্টার-কি দিয়ে যখন ঘরটা খুলেছিল, তখন আর কেউ কি ওই ঘরে ঢুকেছিল তার সঙ্গে?'

নৃপেন বিহ্বল হয়ে পড়ে। এ-জাতীয় অনুসন্ধান সে করেনি।

বাসু-সাহেব নিজে থেকেই বলেন, 'ঢোকেনি। আমি বীরবাহাদুরকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নিয়েছি। সে তালা খুলে একাই ঘরে ঢোকে। ফ্লাস্কটা নামিয়ে রেখে বেরিয়ে আসে। ঘরটা আবার তালাবন্ধ করে। পুরো এক মিনিটও সে ছিল না ওই ঘরে। সুতরাং আর কেউ কোনও সুযোগই

পায়নি।'

'তার মানে আপনি বলতে চান, বীরবাহাদুরই একমাত্র সন্দেহজনক ব্যক্তি?'

'আমি মোটেই তা বলছি না। কারণ আমার কাছে এভিডেন্স আছে—বীরবাহাদুর ছাড়াও অন্তত দুজন ওই ঘরে ঢোকবার সুযোগ পেয়েছিল, গতকাল বেলা বারোটার পরে এবং আজ সকাল ছ'টার আগে।'

ভ্রূ কুঞ্চিত হয় নৃপেনের। বলে, 'কী বলছেন। দুজন ওই ঘরে ঢুকেছিল?'

'ডিড আই সে দ্যাট? আমি বলেছি ঢোকবার সুযোগ পেয়েছিল।'

'অর্থাৎ তারা যে ঢুকেছিল তার প্রমাণ নেই?'

'আছে। একজন যে ঢুকেছিল তার একটা প্রমাণ আছে। দ্বিতীয়জনও খুব সম্ভবত ঢুকেছিল। কনক্লুসিভ প্রুফ নেই, কিন্তু অত্যন্ত জোরালো যুক্তি আছে।'

নৃপেন বুঝতে পারে, এ ভদ্রলোক সহজ মানুষ নন। উনি অনেক কিছু জেনে ফেলেছেন, বুঝে ফেলেছেন। চোখ তুলে দেখে মিসেস বাসু কখন অলক্ষ্যে চলে গেছেন ঘর ছেড়ে, পিছনের বারান্দায়। সাগ্রহে সে বলে, 'বলুন স্যার, কী প্রমাণ পেয়েছেন? বাই দ্য ওয়ে রমেন গুহকে আপনি কেমন করে চিনলেন?'

'আপনার দ্বিতীয় প্রশ্নটা আপাতত মুলতুবি থাক। প্রথম প্রশ্নটার জবাব দিই। একটা অনুমান, একটা প্রমাণ। অনুমানের কথাটাই আগে বলি। মহেন্দ্র আমার কাছে স্বীকার করেছে যে গতকাল রাত সাতটা নাগাদ বাইশ নম্বর ঘরের বোর্ডার মহম্মদ ইব্রাহিম এসে তাকে বলে যে, তার ঘরের চাবিটা ঘরের ভেতর থাকা অবস্থায় সে ভুল করে ইয়েল-লক-ওয়ালা দরজাটা বন্ধ করে ফেলেছে। মহেন্দ্র তখন ওকে মাস্টার-কি-টা দেয়। ইব্রাহিম মিনিট পাঁচেক পরে ফিরে এসে চাবিটা ফেরত দেয়। ফলো?'

'ইয়েস।'

'এনি কোশ্চেন?'

'কোশ্চেন। না, কোশ্চেন কীসের?'

'তাহলে আমিই প্রশ্ন করি। মহেন্দ্র মাস্টার কি টা কেন দিল? কেন ওই বাইশ নম্বর ঘরের ডুপ্লিকেট চাবিটা নয়?'

নৃপেন বলে, 'ও তো একই কথা।'

'আজ্ঞে না মশাই, মোটেই এক কথা নয়। মহেন্দ্র আমার কাছে স্বীকার করেছে, চেক-ইন করবার সময় রমেন যখন তার ঘরের ডুপ্লিকেট চাবিটা চেয়ে নেয়, তখন ইব্রাহিমও তার ঘরের ডুপ্লিকেট চাবিটা চেয়ে নেয়। একজনকে সেটা দিয়ে দ্বিতীয়জনের ক্ষেত্রে মহেন্দ্র সেটা প্রত্যাখ্যান করতে পারেনি।'

'সো হোয়াট. তাতে হলটা কী? ডুপ্লিকেট চাবিতেও বাইশ নম্বর ঘর খোলা যায়, মাস্টার-কিতেও খোলা যায়। ও তো একই ব্যাপার।'

'না। ডুপ্লিকেট চাবিতে শুধু বাইশ নম্বর ঘরের দরজা খোলা যায়, আর মাস্টার-কিতে দোতলার সবক'টা ঘর খোলা যায়। ইব্রাহিম ওই পাঁচ মিনিটের ভেতর তেইশ নম্বর ঘরে ঢুকে থাকতে পারে। তার আধঘণ্টা আগে কিন্তু বীরবাহাদুর ফ্লাস্কটা রেখে গেছে। ফ্লাস্কটা খুলে তার ভেতর একটা ক্রিস্টাল ফেলে বেরিয়ে আসতে বিশ থেকে ত্রিশ সেকেন্ড লাগার কথা।'

নৃপেন জবাব দিতে পারে না। অনেকক্ষণ পরে বলে, 'আশ্চর্য, মহেন্দ্র তো এসব কথা আমাকে বলেনি!'

'আপনি প্রশ্ন করেননি, তাই বলেনি। সে এখনও জানে না ব্যাপারটার ইমপ্লিকেশন। আপনার মতো সেও বিশ্বাস করে ডুপ্লিকেট চাবি আর মাস্টার কি একই কথা। দুটোতেই বাইশ নম্বর ঘর

খোলা যায়।'

একটা ঢোক গিলে নৃপেন বলে, 'আর আপনার দ্বিতীয় অনুমানটা স্যার?'

'দ্বিতীয়টা অনুমান নয়, আগেই বলেছি—সেটা এভিডেন্স। অকাট্য প্রমাণ। আসুন—।'

নৃপেনকে নিয়ে বাসু-সাহেব দ্বিতলে উঠে আসেন। তালা খুলে দুজনে ওই তেইশ নম্বর ঘরে ঢুকে পড়েন। রমেন গুহ একই ভাবে পড়ে আছে। বাসু-সাহেব পকেট থেকে একটা লোহার সন্না বের করলেন। এগিয়ে এলেন টেবিলটার কাছে। অতি সাবধানে সন্না দিয়ে অ্যাশট্রের গর্ভ থেকে উদ্ধার করলেন একটি দগ্ধাবশিষ্ট ফিলটার টিপ্‌ট সিগারেটের স্টাম্প। আগুনের ওপর ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে যেমনভাবে শিককাবাব ভাজা হয় তেমনি ভাবে সন্নাটা টেবিল-ল্যাম্পের আলোয় ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে দেখালেন। নৃপেন বিস্ফারিত নেত্রে দেখতে থাকে। কী দেখছে তা সে-ই জানে।

'দেখলেন?' প্রশ্ন করলেন বাসু-সাহেব।

নৃপেন আমতা-আমতা করে বললে, 'হুঁ।'

'কী দেখলেন?'

এবার নৃপেন বিরক্ত হয়ে বলে, 'কী আবার দেখব? সিগারেটের স্টাম্প। অ্যাশট্রের ভেতর আবার কী থাকবে?'

মাথা নাড়েন বাসু-সাহেব। বলেন, 'থাকে দারোগা-সাহেব, থাকে। চোখ থাকলে দেখবেন অ্যাশট্রের খোপে সিগারেটের স্টাম্পের মধ্যে লুকিয়ে বসে আছে একটি অভিসারিকা। তার নয়নে মদির কটাক্ষ, সর্বাঙ্গে উদগ্র যৌবন, বিম্বোষ্ঠে লিপস্টিক—বোধ করি ম্যাক্সফ্যাক্টার ভার্মিলিয়ান।'

নৃপেনের সন্দেহ জাগে, প্রৌঢ় ভদ্রলোকের কি মাথায় দু-একটা স্ক্রু আলগা। নাকি এই সাত-সকালেই মদ্যপান করেছেন? কিন্তু এতক্ষণ তো ওঁকে প্রতিভাবান গোয়েন্দার মতো মনে হচ্ছিল!

বাসু-সাহেব নৃপেনের দিকে চোখ তুলে চাইলেন। ওর বিহ্বল অবস্থাটা বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করলেন। আবার মাথা নাড়লেন। তারপর বললেন, 'একটা কথা খোলাখুলি বলব দারোগা-সাহেব?'

'বলুন স্যার।'

'আপনার কম্মো নয়!'

মিসেস ডি. সি-র মামা! কী বলতে পারে নৃপেন? একজন সিনিয়ার আই. এ. এস. যাঁকে মামা ডাকেন তাঁর অধিকার আছে এ কথা বলার। সংবিধানের কত নম্বর ধারায় ওটা বলা আছে নৃপেন তা ঠিক জানে না, কিন্তু এটুকু মনে আছে—কম্পিটিটিভ পরীক্ষা দেওয়ার সময় অ্যাব্রিভিয়েশান মুখস্থ করেছিল I.A.S. শব্দের বিস্তারিত রূপ In Anticipation of Sword! অর্থাৎ এমন একটি শাসকগোষ্ঠী যাঁদের তরোয়ালের প্রয়োজন নেই, যাঁরা হাতে মাথা কাটেন। বিপুল ঘোষ সেই আই. এ. এস. গোষ্ঠীর একজন সিনিয়ার অফিসার। দুদিন পরেই হয়তো ডিভিসনাল কমিশনার হবেন। এ ভদ্রলোক হচ্ছেন তাঁর বেটার হাফের মামা।

নৃপেন ঢোক গেলে।

বাসু-সাহেব ওর পিঠে একখানা হাত রেখে বলেন, 'দুঃখ করবেন না মিস্টার ঘোষাল। লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই। ক্রিমিনোলজি ইজ এ সায়েন্স। দারোগা মানেই ডিটেকটিভ নয়। আপনাদের আই. জি. ও এ ভুল করতে পারেন, যদি না তিনি ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশনে বিশেষ ট্রেনিং নিয়ে থাকেন। আমার পরামর্শ শুনুন, এ বিষয়ে অভিজ্ঞ কোনও লোক জানা আছে আপনার? থাকলে তাকেই পাঠান। কেসটা ঘোরালো। এসব কথা তো আর আমি বিপুলকে জানাতে যাচ্ছি না।'

নৃপেন মনস্থির করে। একেবারে আত্মসমর্পণ। বলে, 'অমন লোক আমার কাছেই আছে স্যার। আমার সেকেন্ড অফিসার সুবীর রায়। আজই তার কার্শিয়াং থেকে ফিরে আসার কথা। তাকেই পাঠিয়ে দেব আপনার কাছে—।'

'না, না—আমার কাছে নয়। আমি শীঘ্রই এ হোটেল ছেড়ে চলে যাব।'

'কেন স্যার? আর দু-একটা দিন—।'

'উপায় নেই ঘোষাল, আমি আজই চলে যাব অন্য একটা হোটেলে। ঘুম-এর কাছে। 'রিপোজ'-এ। পরশু তার উদ্বোধন। আমাদের সস্ত্রীক নিমন্ত্রণ আছে ওখানে।'

উনি যে 'আপনি' ছেড়ে 'তুমি' ধরেছেন এতে খুশিই হল নৃপেন। বললে, 'কিন্তু ওই "ম্যাক্সফ্যাকটার-ভার্মিলিয়ান" না কী যেন বললেন, ওটা কী?'

সিগারেটের স্টাম্পে কী দেখতে পেলেন আপনি?'

'প্রমাণ। এভিডেন্স! গতকাল রাত্রে এ ঘরে একজন অভিসারিকা প্রবেশ করেছিলেন। দেখছ না, টেবিল-এর ওপর পড়ে রয়েছে রমেনের সিগারেটের প্যাকেট—ক্যাপস্টান! এটা ফিলটার-টিপ স্টাম্প! রমেন যখন ঘরটা ভাড়া নেয় তখন এ অ্যাশট্রেটা নিশ্চয় শূন্যগর্ভ ছিল। সে ক্যাপস্টান খেয়েছে। না হলে আশট্রেতে ফিলটার-টিপ সিগারেটের স্টাম্প আসে কেমন করে? তা ছাড়া এই লাল স্পটটা? ওটা লিপস্টিকের চিহ্ন। ফরেনসিক এক্সপার্ট করোবরেট করবে—তুমি দেখে নিও। আর এই সূত্রেই বোঝা যাচ্ছে, কেন রমেন গুহ দুটো চাবিই চেয়ে নেয়, কেন সে কিছুতেই রাজি হয়নি তোমার বাড়িতে রাত্রিবাস করতে!'

নৃপেনের এখনও একবাঁও মেলে না।

'বুঝলে না? রমেন কিছু ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি ছিল না। মিস ডিক্রুজা ছিল কলগার্ল। রমেনের সঙ্গে তার ভালোই আলাপ হয়েছিল। ট্যাক্সিতে আসার পথে। ডুপ্লিকেট চাবিটা রমেন দিয়ে রেখেছিল ওই মিস ডিক্রুজাকে। বিশ্বাস না হয় মহেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করে দেখ—মিস ডিক্রুজা কাল সন্ধ্যাবেলায় যে লিপস্টিক ব্যবহার করেছিলেন সেটা ভার্মিলিয়ান রেড!'

নৃপেন বলে, 'এখানে আমার আর কিছু করণীয় আছে স্যাব?'

'আছে। দুটো কাজ। প্রথমত তেইশ নম্বর ঘরে যে ফ্লাস্কটা আছে ওটাও এভিডেন্স হিসাবে নিয়ে যাও। তবে এবার আর ভুল কবো না। সাক্ষী রেখে ওটা সিল করিয়ে নিও। আমার অনুমান ওই জলেও পটাসিয়াম সায়ানাইড পাওয়া যাবে। দু-নম্বর কাজ—ওই তেইশ নম্বর ঘরের দু-পাশের দুটি ঘর সার্চ করা। বাইশ নম্বরে ছিল ইব্রাহিম আর চব্বিশে মিস ডিক্রুজা। দুজনেই সন্দেহভাজন।'

নৃপেন বলে, 'ইব্রাহিম তো রাত সাড়ে আটটার সময় চেক-আউট করে বেরিয়ে যায়। তখন তো রমেন গুহ জীবিত।'

'আহ্! তুমি বড় জ্বালাও! বললাম না তোমাকে? রাত সাড়ে আটটায় সে হোটেল ত্যাগ করে বটে, কিন্তু রাত সাতটায় সে মাস্টার-কি নিয়ে দোতলায় উঠে গিয়েছিল। সে সময় ফ্লাস্কটা রাখা ছিল রমেনের টেবিলে।'

'আয়াম সরি! ঠিক কথা। আচ্ছা ওই দুটো ঘরই সার্চ করছি আমি; কিন্তু আপনিও সঙ্গে থাকলে ভালো হত না?'

'না, আমরা দার্জিলিং-এ এসেছি বেড়াতে। আমার স্ত্রী অনেকক্ষণ একা বসে আছেন নীচের ঘরে। ওঁর কাছেই আমি ফিরে যাব এখন। তুমি বরং যাওয়ার আগে আমাকে জানিয়ে যেও ওইদুটো ঘরে উল্লেখযোগ্য কিছু পেলে কিনা।'

বাসু-সাহেব নেমে এলেন একতলায়। নিজের ঘরে ফিরে এসে দেখলেন ওঁর স্ত্রী রাণী দেবী চুপ করে বসে আছেন চাকা-দেওয়া চেয়ারে। কোলের ওপর পড়ে আছে কণ্টকবিদীর্ণ অসমাপ্ত উলের সোয়েটারখানা। উলের গুলিটা পোষমানা বেড়ালছানার মতো হাত পা গুটিয়ে বসে আছে ওঁর পায়ের কাছে। বিষাদের মূর্তি যেন।

'অনেকক্ষণ একা-একা বসে আছো, নয়?'

রাণী দেবীর চমক ভাঙে। ম্লান হেসে বলেন, 'দারোগা বাবা বিদায় হল?'

'আপাতত। আবার আসবেন যাওয়ার আগে।'

'আমরা কখন "রিপোজ"-এ যাচ্ছি?'

'হয় আজ বিকেলে, নয় কাল সকালে।'

'তুমি বরং আগে একবার হোটেলটা দেখে এস। একেবারে দোর পর্যন্ত ট্যাক্সি যদি না যায়—।'

বাক্যটা উনি শেষ করেন না। প্রয়োজন ছিল না। মিসেস বাসু চলৎশক্তিহীনা। একটা মারাত্মক অ্যাকসিডেন্টে রাণী দেবীর পিঠের শিরদাঁড়া ভেঙে গেছে। উনি খাড়া হয়ে উঠে দাঁড়াতে পারেন না। বস্তুত ওই দুর্ঘটনার পর থেকেই বাসু-সাহেবের জীবন অন্য খাতে বইছে। প্র্যাকটিস ছেড়ে দিয়েছেন। এখন ওঁর একমাত্র কাজ পঙ্গু স্ত্রীকে সঙ্গদান করা। সন্তান একটিমাত্রই হয়েছিল ওঁদের। ওই দুর্ঘটনায় মারা যায়।

বাসু-সাহেব হেসে বলেন, খবর নিয়েছি। গাড়ি যাওয়ার রাস্তা আছে। না থাকলেও বাধা ছিল না। তোমাকে কোলপাঁজা করে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা আমার আজও আছে। বিশ্বাস না হয় তো বল এখনই পরখ করে দেখাই।'

এত দুঃখেও হেসে ফেলেন রাণী দেবী।

প্রায় মিনিট পনেরো পরে ফিরে এল নৃপেন। যথারীতি দরজায় নক করে ঢুকল ঘরে। বললে, 'মিস ডিক্রুজার ঘরে কিছুই পাওয়া গেল না স্যার; কিন্তু মহম্মদ ইব্রাহিমের ঘরে একটা জিনিস উদ্ধার করেছি। মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না। একটু দেখুন তো স্যার—।'

একটা কাগজের দলা। সেটা হাতের মুঠোয় নিয়ে বাসু-সাহেব বলেন, কোথায় পেলে এটা?

'বাইশ নম্বর ঘরে, ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে।'

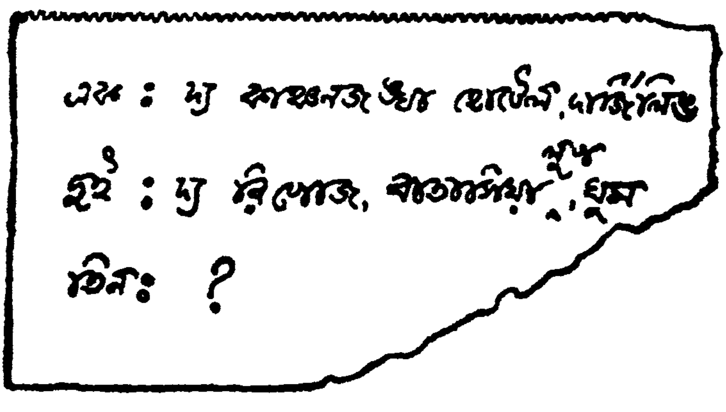
'কাল রাত্রে ইব্রাহিম ঘরটা ছেড়ে যাওয়ার পর ও-ঘরে নতুন বোর্ডার আসেনি?'

'না। তবে শুনলাম এখনই আসবে। একুশ নম্বর ঘরের বোর্ডার নাকি ওই ঘরে শিফট করছেন!'

চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েন বাসু-সাহেব। কাগজটা ওঁর মুঠিতে ধরাই থাকে। বলেন, 'কে ওই একুশ নম্বরের বোর্ডার?'

'নামটা জিজ্ঞাসা করিনি। তবে শুনলাম তিনি আর্টিস্ট। একুশ নম্বর ঘরের জানলা থেকে নাকি কাঞ্চনজঙ্ঘা ভালো দেখা যায় না, গাছের আড়াল পড়ে। তাই উনি বাইশ নম্বরে সরে আসতে চান। একটু আগে ঘরটা দেখে পছন্দ করে গেছেন। এখনই শিফট করবেন।'

'বুঝলাম।' ধীরে-ধীরে কোঁকড়ানো কাগজের দলাটা খুলে ফেলেন। কাগজটা মেলে ধরেন টেবিলের ওপর। হঠাৎ চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েন বাসু-সাহেব। চোখ দুটি বুজে যায়। রাণী দেবী ছিলেন পিছনেই। কৌতূহল দমন করতে পারেন না তিনি। ঝুঁকে পড়েন কাগজটার ওপর। তাতে কালো কালিতে লেখা ছিল :



॥ তিন ॥

দার্জিলিং-এর আগের স্টেশন, ঘুম। পৃথিবীর সর্বোচ্চ রেলস্টেশন। দার্জিলিং স্টেশনের চেয়েও তার উচ্চতা বেশি। ঘুমের অদূরে ওই খেলাঘরের রেললাইনটা জিলিপির প্যাঁচের মতো বার দুই পাক খেয়েছে—তার নাম বাতাসিয়া ডবল-লুপ। তারই পাশ দিয়ে একটা পাকা সড়ক উঠে গেছে ওপর দিকে—ও পথে যেতে পারে ক্যাভেন্টার্স অথবা কাঞ্চন ডেয়ারিতে কিংবা 'টাইগার হিল'-এ। এই সড়কের ওপরেই প্রকাণ্ড হাতা-ওয়ালা একটা বাড়ি। এককালে ছিল কোনও চা বাগানের ইউরোপীয় মালিকের আবাসস্থল। বর্তমানে এটাই 'দ্য রিপোজ' হোটেল। না, কথাটা ঠিক হল না—আজ নয়, আগামী কাল থেকে সেটা হবে রিপোজ হোটেল। আগামী কাল দোসরা তার উদ্বোধন।

মালিক শ্রীমতী সুজাতা মিত্র। সুজাতা বিবাহিতা—স্বামী কৌশিক মিত্র। শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের বি-ই। সিভিল ইঞ্জিনিয়ার। সুজাতার বাবা ডঃ চট্টোপাধ্যায়ও ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার। তিনি কী একটা আবিষ্কার করেছিলেন বলে শোনা যায়। সেই আবিষ্কারের পেটেন্টটা স্বনামে নেওয়ার আগেই সন্দেহজনকভাবে আকস্মিক মৃত্যু হয়েছিল ভদ্রলোকের। আবিষ্কারের সেই রিসার্চ-পেপারগুলো নিয়ে সুজাতা রীতিমতো বিপদের ভেতর জড়িয়ে পড়ে। এমনকী শেষ পর্যন্ত এক খুনের মামলায়। রিসার্চের কাগজগুলো হাত করতে চেয়েছিলেন একজন কুখ্যাত ধনকুবের—ময়ূরকেতন আগরওয়াল। তিনিই ঘটনাচক্রে খুন হন। কৌশিক এবং সুজাতা বিশ্রীভাবে জড়িয়ে পড়ে সেই খুনের মামলায়। বস্তুত ব্যারিস্টার পি. কে. বাসু এবং অ্যাডভোকেট অরূপরতনের যৌথ চেষ্টায় ওরা দুজনেই মুক্তি পায়। এর মধ্যে বাসু-সাহেবের ভূমিকাটাই ছিল মুখ্য। যাই হোক শেষপর্যন্ত প্রমাণিত হল আগরওয়ালের হত্যাকারীর নাম—নকুল হুই। সে ছিল আগরওয়ালেরই অধীনস্থ কর্মচারী এবং নানান পাপ কারবারের সাথী। সে-সব অতীতের ইতিহাস। 'নাগচম্পা' উপন্যাস যাঁরা পড়েছেন অথবা 'যদি জানতেম' ছায়াছবি যাঁরা দেখেছেন তাঁদের কাছে এসব কথা অজানা নয়।

মোট কথা ইতিমধ্যে সুজাতার সঙ্গে কৌশিকের বিয়ে হয়েছে বছরখানেক আগে। এখনও ঠিক এক বছর হয়নি। আগামী ৫ অক্টোবর, শনিবারে ওদের প্রথম বিবাহ-বার্ষিকী। বিয়ের পরে কৌশিক ডঃ চ্যাটার্জির ওই আবিষ্কারটা নিয়ে হাতে-কলমে কাজ করতে চায়; কিন্তু সুজাতা রাজি হতে পারেনি। ওই সর্বনাশা আবিষ্কারটা তার কাছে কেমন যেন অভিশপ্ত মনে হয়েছিল। তিনজন লোকের মৃত্যু ওই আবিষ্কারটার সঙ্গে জড়িত। প্রথমত ডঃ চট্টোপাধ্যায়ের রহস্যজনক মৃত্যু, দ্বিতীয়ত গুলিবিদ্ধ হয়ে ময়ূরকেতন আগরওয়ালের মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ড এবং তৃতীয়ত হত্যাকারী নকুল হুই-এর ফাঁসি। হ্যাঁ, আগরওয়ালের হত্যাকারী নকুল হুইকে শেষপর্যন্ত ফাঁসির দড়িতে ঝুলতে হয়। নকুল চেষ্টার ত্রুটি করেনি—সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত লড়েছিল—কিন্তু লোয়ার কোর্টের বিচার তিলমাত্র নড়েনি। অর্থলোভে সুপরিকল্পিতভাবে নকুল যে হত্যাকাণ্ডটা করেছিল তার জন্য বিচারক চরমতম দণ্ডই বহাল রেখেছিলেন।

তাই কেমন একটা অবসাদ এসেছিল সুজাতার। ওই রিসার্চের কাগজগুলো থেকে সে মুক্তি চেয়েছিল। নিজের কুমারী-জীবনের ওই অভিশাপকে বিবাহিত জীবনে টেনে আনতে চায়নি। কৌশিক ইঞ্জিনিয়ার। এসব ভাবালুতার প্রশ্রয় সে প্রথমটা দিতে চায়নি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেও মেনে নিয়েছিল। ফলে নগদ দেড় লক্ষ টাকায় ওই পেটেন্টটা ওরা বিক্রয় করে দিয়েছিল বিশিষ্ট ব্যবসায়ী জীমূতবাহন মহাপাত্রের কাছে। জীমূতবাহন হচ্ছেন অরূপরতনের পিতৃদেব। হয়তো অরূপের প্রতি কৃতজ্ঞতাও এ সিদ্ধান্তের পিছনে কাজ করে থাকবে।

সুজাতা তার সদ্য-বিবাহিত স্বামীকে বলেছিল, 'ওই নগদ দেড়লাখ টাকা নিয়ে এবার তুমি ঠিকাদারি ব্যাবসা শুরু করো।'

কৌশিক হেসে বলেছিল, 'তুমি যেমন ওই রিসার্চ পেপারগুলো থেকে মুক্তি চাইছিলে সুজাতা, আমিও তেমনি আমার ওই ডিগ্রিটা থেকে মুক্তি চাইছি আজ। আমি ভুলে যেতে চাই যে, আমি একজন সিভিল ইঞ্জিনিয়ার!'

সুজাতা অবাক হয়ে বলেছিল, 'ও আবার কী কথা? কেন?'

'ভারতবর্ষে ইঞ্জিনিয়ারের প্রয়োজন নেই। এদেশে ইঞ্জিনিয়ার, বৈজ্ঞানিক, ডাক্তার অথবা কারিগরি কাজ-জানা মানুষের আর কোনও দরকার নেই। এদেশের প্রয়োজন এখন শুধু রাজনীতিবিদ, ব্যারিস্টার আর আই. এ. এস. অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের।'

'হঠাৎ তোমার এই সিদ্ধান্ত?'

'দেখতে পাচ্ছ না দেশের হাল। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বৈজ্ঞানিকেরা এ দেশে অন্ন-সংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারছেন না। দলে-দলে দেশ ছেড়ে বিদেশে চলে যাচ্ছেন। ইহুদি হওয়ার অপরাধে নাৎসি জার্মানি যেমন আইনস্টাইনকে দেশত্যাগী করেছিল, বৈজ্ঞানিক হওয়ার অপরাধে আজ তেমনি প্রফেসর খোরানাকে ভারতবর্ষ দেশছাড়া করেছে।'

সুজাতা হেসে বলে, 'এ তোমার রাগের কথা। খোরানা নোবেল প্রাইজ পাওয়ার পর তাঁকে পদ্মবিভূষণ খেতাব দেওয়া হয়েছে।'

হো-হো করে হেসে উঠেছিল কৌশিক। বলেছিল, 'ভাগ্যে প্রফেসর খোরানা শিশির ভাদুড়ী কিংবা উৎপল দত্তের পদাঙ্ক অনুসরণ করেননি।'

'তুমি কী বলতে চাইছ বল তো?'

'আমি বলতে চাইছি ম্যাট্রিকে আমি তিনটে লেটার পেয়েছিলাম, স্টার পেয়েছিলাম, বি. ই-তে ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছিলাম। আমাদের স্কুল-ব্যাচের প্রত্যেকটি ভালো ছেলে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার অথবা বৈজ্ঞানিক হতে পেরেছে। যারা ওইসব কলেজে ঢুকতে পারেনি সেই সব ঝড়তি-পড়তি মালই গেছে জেনারেল লাইনে। তাদের একটা ভগ্নাংশ আজ আই. এ. এস. আর একটা ভগ্নাংশ আজ এম এল. এ।'

সুজাতা তর্ক করেছিল। বলেছিল—'তা তুমিও আই. এ. এস পরীক্ষা দিলে পারতে? তুমিও ইলেকশানে দাঁড়াতে পারতে।'

কৌশিক বিচিত্র হেসে বলেছিল, 'তুমিও যে মন্ত্রীদের মতো কথা বলছ সুজাতা। ছয় বছরের পাঠক্রম শেষ করে আই. এ. এস. পরীক্ষা না দিলে আমার ঠাঁই হবে না এ পোড়া ভারতবর্ষে? কিন্তু মুরারী মুখার্জির মতো একজন সার্জেন, বি. সি. গাঙ্গুলির মতো একজন ইঞ্জিনিয়ার অথবা খোরানার মতো একজন বৈজ্ঞানিক যতদিন ফিনান্স কমিশনার, অথবা চিফ সেক্রেটারি হতে না চাইছেন—।'

অসহিষ্ণু হয়ে সুজাতা বলে উঠেছিল, 'মোদ্দা কথাটা কী? তুমি কী করতে চাও? ওই দেড় লাখ টাকা ফিক্সড-ডিপোজিটে রেখে তার সুদের টাকায় আমরা গায়ে ফুঁ দিয়ে ঘুরে বেড়াব?'

'না। ব্যাবসাই করতে চাই আমি—।'

'আমিও তো তাই বলছি। ব্যাবসাই যদি করতে হয় তবে যে জিনিসটা জানো, বোঝ, তার ব্যাবসাই করা উচিত। আমি তো তোমাকে চাকরি করতে বলছি না; আমি বলছি ঠিকাদারি করতে—।'

'কোথায়? পি. ডাবলু. ডি. ইরিগেশান অথবা কোনও পাবলিক আন্ডারটেকিং-এ তো? সর্বত্রই তো ওই দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রদল শীর্ষস্থান দখল করে বসে আছেন। তাঁদের তৈলাক্ত করতে না পারলে—।'

'তবে কীসের ব্যাবসা করবে তুমি?'

'যে-কোনও স্বাধীন ব্যাবসা। যাতে কাউকে তোষামোদ করতে হবে না। আর সেটা এমন

একটা ব্যাবসা হবে যেখানে তুমি আমি দুজনেই খাটব। ইকোয়াল পার্টনার!'

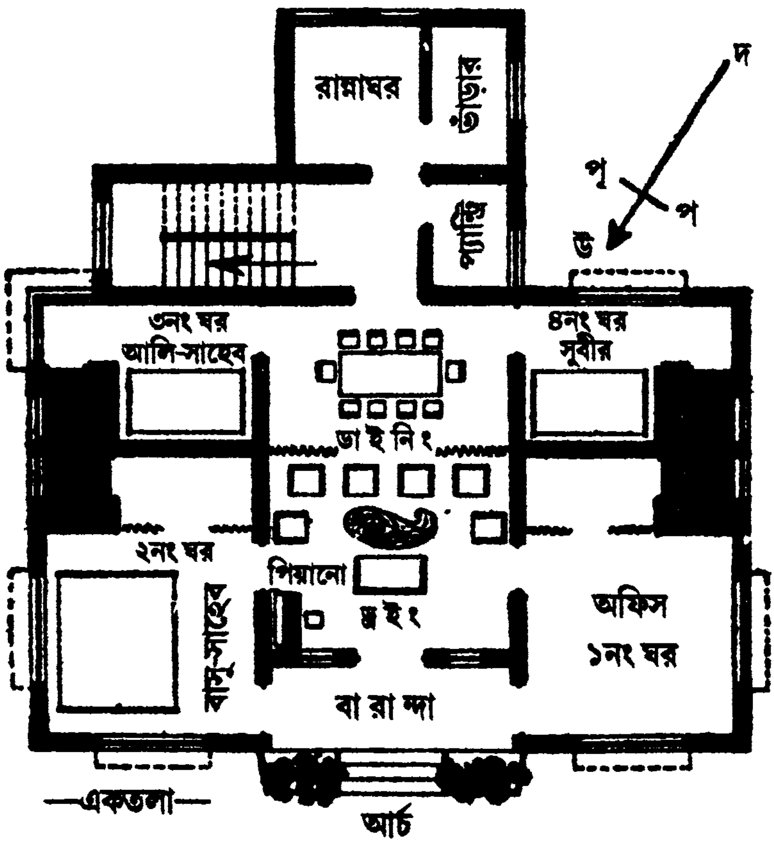
'যেমন?'

'ধরো, আমরা একটা হোটেল খুলতে পারি। তুমি কিচেন-এর ইনচার্জ। কী রঙের পরদা হবে, কী জাতের বেড-কভার হবে সব তোমার হেপাজতে। আর আমি রাখব হিসেব, ম্যানেজমেন্ট। সারাদিন দুজনে কাছাকাছি থেকে কাজ করব। সকালবেলা দুটো নাকে-মুখে গুঁজে ঠিকাদারি করতে বেরিয়ে যাব, আর রাত দশটায় ক্লান্ত শরীরে ফিরে আসব, তার চেয়ে এটা ভালো নয়?'

কথাটা মনে ধরেছিল সুজাতার।

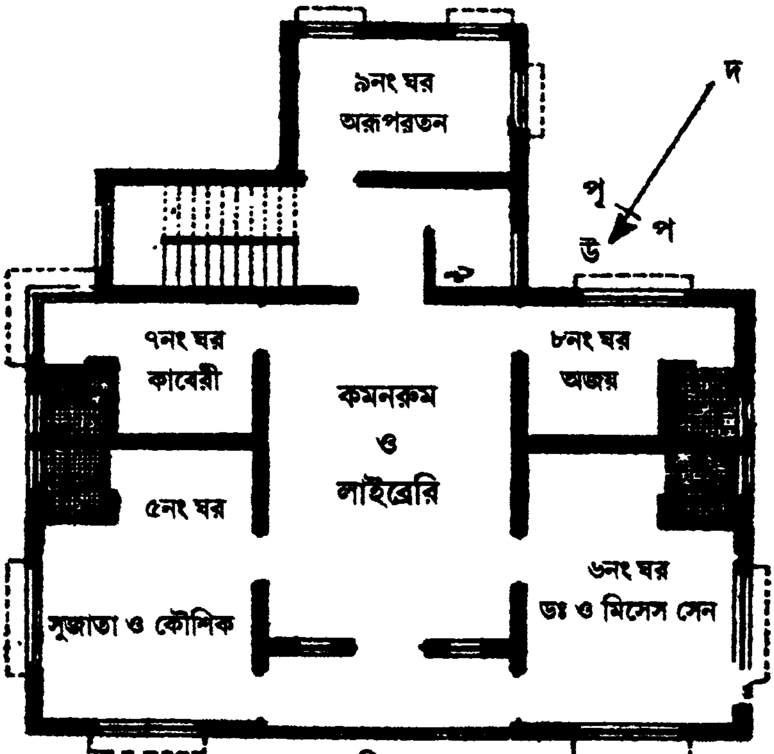
তারই ফলশ্রুতি এই 'দ্য রিপোজ'।

জমি-বাড়ি-ফার্নিচার, ফ্রিজ, কিচেন-গ্যাজেট এবং একটা সেকেন্ডহ্যান্ড গাড়ি কিনতেই খরচ হয়ে গেল লাখখানেক টাকা। বাকি টাকা ব্যাঙ্কে রেখে ওরা দুজনে খুলে বসেছে হোটেল-বিজনেস।



বাড়িটা দোতলা। চারটে ডাবল-বেড বড় ঘর এবং দুটি সিংগল-বেড। এ ছাড়া একতলায় বেশ বড় একটা ড্রয়িং-কাম-ডাইনিং রুম। কিচেন ব্লক, প্যান্ট্রি, স্টোর ইত্যাদি। রীতিমতো বিলেতি কায়দায় প্ল্যানিং। প্রায় প্রতিটি ঘরের সঙ্গেই সংলগ্ন স্নানাগার। কৌশিক নিজে দাঁড়িয়ে থেকে বাড়িটার মেরামতি করিয়েছে। গরম জলের গিজার বসিয়েছে। সুজাতা ম্যাচ-করা পরদা, বেড-কভার ইত্যাদি কিনেছে। আয়োজন সম্পূর্ণ, আগামীকাল 'রিপোজ'-এর উদ্বোধন। গোটা ছয়েক বিজ্ঞাপন মাত্র ছাড়া হয়েছে। দুজন সে বিজ্ঞাপনে সাড়া দিয়েছেন। আশা করা যায় পূজা মরশুমে ঘর খালি পড়ে থাকবে না।

দার্জিলিং-এর হইচই এড়িয়ে নিরিবিলিতে ছুটির ক'টা দিন কাটিয়ে যেতে ইচ্ছুক যাত্রী নিশ্চয় জুটবে। যে দুজন বিজ্ঞাপনে সাড়া দিয়েছেন তাঁদের একজন পুরুষ একজন স্ত্রীলোক। দুজনেই কলকাতাবাসী। মিস্টার নিজামুদ্দিন আলি এবং মিস কাবেরী দত্তগুপ্তা। দুজনেই জানিয়েছেন, বুধবার ২রা দুপুরে



—দ্বিতল—

ছোট রেলে ঘুম স্টেশনে এসে পৌঁছবেন। কৌশিক লিখেছিল, স্টেশনেই ওঁদের রিসিভ করা হবে। উদ্বোধনের দিন, প্রথম বোর্ডার—তাই এই খাতির।

উদ্বোধন আগের দিন। মঙ্গলবার। পয়লা। সকাল থেকেই কালীপদ আর কাঞ্চীকে নিয়ে সুজাতা শেষবারের মতো ঝাড়াপোঁছায় লেগেছে। কালীপদ মেদিনীপুরি—সমতলবাসী। চাকরির লোভে এসেছে এতদূর। রিপোজ-এর একমাত্র বেয়ারা। আর কাঞ্চী হচ্ছে স্থানীয় নেপালি মেয়ে। সামনের গ্রামটায় থাকে।

দুজন বোর্ডার অ্যাডভান্স পাঠিয়েছেন। এ ছাড়াও আরও তিনজন আসছেন আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে। ব্যারিস্টার পি. কে. বাসু সস্ত্রীক এবং অ্যাডভোকেট অরূপরতন। অরূপের জন্য দোতলার নয় নম্বর ঘরটা ঠিক করা আছে, আর বাসু-সাহেবের জন্য একতলার দু-নম্বর ঘরটা। মিসেস বাসুর পক্ষে একতলা ছাড়া উপায় নেই। আলি-সাহেবের জন্যে তিন নম্বর আর কাবেরীর জন্য দোতলার সাত নম্বর ঘরটা মনে-মনে স্থির করে রেখেছে সুজাতা। এখন ওঁদের পছন্দ হলে হয়।

বেলা দশটা নাগাদ কৌশিক গাড়িটা নিয়ে বেরিয়ে গেল কাঞ্চন ডেয়ারির দিকে। ওখান থেকে মাইল পাঁচেক। গাড়ি যাওয়ার রাস্তা আছে। কাঞ্চন ডেয়ারির মালিক মিস্টার সেন ওদের

পরিচিত। মিস্টার সেনের ভাইপো অজিত সেন কৌশিকের সহপাঠী। আপাতত ডজন-দুই-তিন ডিম, কিছু হ্যাম, সফটমিট আর মাখন নিয়ে আসবে। আলি-সাহেব হ্যাম খাবেন কি না জানা নেই। তাই দু-রকম মাংসের ব্যবস্থাই থাকল। ফ্রিজ আছে, নষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয় নেই। সুজাতা বলে দিয়েছে কাঞ্চন ডেয়ারির সঙ্গে যেন একটা অন-অ্যাকাউন্ট ব্যবস্থা করে আসে। একদিন অন্তর কতটা কী মাল লাগবে তার ফিরিস্তিও লিখে দিয়েছে। আজ বিকেলে সুজাতার একবার দার্জিলিং-এ যাওয়ার ইচ্ছে। কৌশিককে তাই বলে রেখেছে সকাল করে ফিরতে। কিছু টুকিটাকি বাজার এখনও বাকি আছে।

বাসু-সাহেব কাল দার্জিলিং থেকে ফোন করেছিলেন। সুজাতা অনুযোগ করেছিল—'আবার দার্জিলিং গেলেন কেন? সরাসরি এখানে এসে উঠলেই পারতেন?'

বাসু-সাহেব সকৌতুকে বলেছিলেন, 'নেমন্তন্নর গন্ধ পেয়ে আমি দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে যে আগেই এসে পৌঁছেছি।'

'তাতে কী? আপনি তো ঘরের লোক। রাণু মাসিমাও এসেছেন তো?'

'নিশ্চয়ই। তোমার "রিপোজ" পর্যন্ত ট্যাক্সি যাবে তো?'

'আসবে। আপনি এখনই চলে আসুন।'

'না সুজাতা, কাল আসছি। লাঞ্চ-আওয়ার্সের পরে। ভালো কথা, রমেন গুহকে মনে আছে? আমাদের নাট্যামোদী রমেন দারোগা?'

'খুব মনে আছে। কেন বলুন তো?'

'বিপুলের কাছে শুনলাম রমেন দার্জিলিং-এ বদলি হয়েছে। কাল-পরশুর মধ্যেই আসবে।'

'তবে তাঁকেও নিমন্ত্রণ করবেন আমার হয়ে। আমি থানায় ফোন করে খবর নেব। মিস্টার ঘোষ আর মিসেস ঘোষ কিছুক্ষণের জন্যে আসবেন বলেছেন।'

'জানি। কিন্তু বিপুল বোধহয় শেষ পর্যন্ত তোমার নিমন্ত্রণ রাখতে পারবে না। শুনছি গভর্নর-সাহেব স্বয়ং দার্জিলিং আসছেন। ফলে ডি. সি. সাহেবের সব স্যোশাল অ্যাপয়েন্টমেন্ট ক্যানসেল হয়ে যেতে পারে।'

কালীপদ এসে দাঁড়ায়। জানতে চায়, বড় ফুলদানিটা কোথায় থাকবে?

সুজাতা স্মৃতিচারণ থেকে বর্তমানে ফিরে আসে। ওর হাত থেকে চিনেমাটির ফুলদানিটা নিয়ে আঁচল দিয়ে মোছে। বলে, 'একতলায় ড্রইংরুমে, পিয়ানোটার ওপর। কাল সকালে মনে করে ওতে ফুল দিবি, বুঝলি?'

'আজ্ঞে, আচ্ছা।'

ঘড়ির দিকে নজর পড়ে। বেলা প্রায় দুটো। এতক্ষণে কৌশিকের ফিরে আসা উচিত ছিল। রান্নাবান্না সেই কখন হয়ে গেছে। সব ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে। সুজাতা আর অপেক্ষা করল না। কালীপদ আর কাঞ্চীকে খাইয়ে ছেড়ে দিল। কালীপদর ওবেলায় ছুটি। কোথায় বুঝি পাহাড়িদের রামলীলা হবে, তাই শুনতে যাবে। তা যাক। সুজাতাও তো দার্জিলিং যাবে। থাকবে না। হঠাৎ ঝনঝন করে বেজে উঠল টেলিফোনটা। কৌশিকই ফোন করছে।

সুজাতা প্রশ্ন করে, 'কী ব্যাপার? এত দেরি হচ্ছে যে?'

'আরে বোলো না। গাড়িটা ট্রাবল দিচ্ছে। মেরামত করাচ্ছি। ফিরতে সন্ধে হয়ে যাবে।'

'তার মানে ওবেলা দার্জিলিং যাওয়ার প্রোগ্রাম ক্যানসেল?'

'উপায় কী বলো। তুমি খাওয়া-দাওয়া মিটিয়ে নাও বরং।'

'তা তো বুঝলাম; কিন্তু তুমি কোথা থেকে কথা বলছ? দুপুরে খাবে কোথায়?'

'কাঞ্চন ডেয়ারি থেকে। সেন-সাহেবের অতিথি হয়েছি। বুঝলে? আমার জন্যে অপেক্ষা কোরো না।'

অগত্যা উপায় কী? সুজাতা একাই খেয়ে নিল। ক্রমে বেলা পড়ে এল। বিকেলের দিকে কোথা থেকে আকাশে এসে জুটল কিছু উটকো মেঘ। নামল বৃষ্টি। সন্ধ্যার আগেই ঘনিয়ে এল অন্ধকার। কৌশিকের ফোনটা আসার আগেই কালীপদকে ছুটি দিয়ে বসে আছে। আগে জানলে কালীপদকে ছাড়ত না। কাঞ্চী রাত্রে থাকে না। নির্বান্ধব পুরীতে চুপচাপ বসে রইল সুজাতা। জানলা দিয়ে দেখতে থাকে কার্ট রোড দিয়ে গাড়ির মিছিল চলেছে—ওপর থেকে নীচে আর নীচ থেকে ওপরে। বাতাসিয়া ডাবল লুপ দিয়ে একটা মালগাড়ি পাক খেতে-খেতে নেমে গেল।

ঘনিয়ে এল সন্ধ্যা। অন্যদিন হলে দার্জিলিং-এর আলোর রোশনাই দেখা যেত। পাহাড়ের এখানে-ওখানে জুলজুলে চোখ মেলে রাতচরা বাতিগুলো তাকিয়ে থাকে। নিত্য দীপাবলীর রূপসজ্জা। আজ আকাশ আছে কালো করে। ঝিরঝির করে সমানে বৃষ্টি পড়ছে। আঞ্চলিক পাহাড়ে বৃষ্টি। হয়তো দার্জিলিং খটখটে, হয়তো কার্শিয়াং রৌদ্রোজ্জ্বল—বৃষ্টি নেমেছে শুধু ঘুমের দেশে। এলোমেলো ঝোড়ো হাওয়ার খ্যাপামি। সুজাতা সব দরজা-জানালা বন্ধ করে দিয়ে এসে বসে। এমন রাতে আলো ফিউস হয়ে যাওয়া বিচিত্র নয়। সে কথা মনে হতেই বুকের মধ্যে ছাঁৎ করে ওঠে সুজাতার। এই নির্বান্ধব পুরীতে যদি অন্ধকারে তাকে একা বসে থাকতে হয়। তাড়াতাড়ি উঠে মোমবাতি আর দেশলাইটা খুঁজে নিয়ে হাতের কাছে রাখে। টর্চটাও। কালীপদটার যেমন বুদ্ধি। ঝড়জলে রামলীলার আসর নিশ্চয় ভেঙে গেছে। হতভাগাটা বাড়ি ফিরে এলেই পারে। কিন্তু ওরই বা দোষ কী? হয়তো আশ্রয় নিয়েছে কারও গাড়িবারান্দার তলায়। বৃষ্টিটা একটু না ধরলে সে বেচারি আসেই বা কী করে। পাহাড়ে বৃষ্টি, থাকবে না বেশিক্ষণ। দার্জিলিং-এর বৃষ্টি ওই অজাযুদ্ধ ঋষিশ্রাদ্ধের সগোত্র। আসতেও যেমন যেতেও তেমন। কিন্তু কই আজ তো তা হচ্ছে না। আবার নজর পড়ল দেওয়াল-ঘড়িটার দিকে। প্রতি আধঘণ্টা অন্তর সে সাড়া দেয়। জানিয়ে দিল রাত সাতটা। হঠাৎ বেজে উঠল আবার ফোনটা। গিয়ে ধরল সুজাতা। হ্যালো?

'রিপোজ?'

'হ্যাঁ, বলুন।'

'আমি 'হিমালয়ান মোটর রিপেয়ারিং শপ' থেকে বলছি। আপনাদের গাড়ি মেরামত হয়ে গেছে। লোক দিয়ে পৌঁছে দেব, না কি মিস্টার মিত্র দার্জিলিং থেকে ফেরার পথে নিয়ে যাবেন?'

'দার্জিলিং থেকে! উনি দার্জিলিং গেছেন কে বলল?'

'বাঃ! দার্জিলিঙেই তো যাচ্ছিলেন উনি। গাড়ি থেমে যেতে একটা শেয়ারের ট্যাক্সি ধরে চলে গেলেন।'

'ও! তা কী বলে গেছেন উনি?'

'বলেছেন তো উনি নিজেই নিয়ে যাবেন, তা রাত আটটার সময় আমার দোকান বন্ধ হয়ে যাবে—।'

'আমার মনে হয় আটটার আগেই উনি ফিরবেন। নেহাত না ফেরেন দোকান বন্ধ করার সময় পৌঁছে দিয়ে যাবেন।'

লাইনটা কেটে দিয়ে সুজাতা ভাবতে বসে—ব্যাপার কী? কৌশিক যদি একটা শেয়ারের ট্যাক্সি নিয়ে দার্জিলিং গিয়ে থাকে, তাহলে দুপুরে সে টেলিফোন করে মিছে কথা বলল কেন? আর দার্জিলিং গেলে সে নিশ্চয় সুজাতাকেও নিয়ে যেত। সেই রকমই তো কথা ছিল। কিন্তু ব্যাপারটা কী হতে পারে? হিমালয়ান মোটর রিপেয়ারিং শপটা আবার ও-দিকে—মানে দার্জিলিং যাওয়ার পথেই পড়বে, কাঞ্চন ডেয়ারির দিকে নয়। তাহলে? কিন্তু কৌশিক তো স্পষ্ট বলল সে কাঞ্চন ডেয়ারি থেকে ফোন করছে, মিস্টার সেনের বাড়িতে দুপুরে খাবে। এমন অদ্ভুত আচরণ তো কৌশিক কখনও করেনি এর আগে। সুজাতা শেষপর্যন্ত আর কৌতূহল দমন করতে পারে না। কৌশিক ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করার মতো মনের অবস্থা তার ছিল না। উঠে গিয়ে টেলিফোনটা তুলে নিল। কাঞ্চন ডেয়ারির

মালিক মিস্টার সেনকে ফোন করল। ফোন ধরলেন সেন-সাহেব নিজেই। সুজাতা সরাসরি প্রশ্ন করল আজ তাঁর সঙ্গে কৌশিকের দেখা হয়েছে কি না। সেন-সাহেব জানালেন—হয়েছে, দার্জিলিঙে। তাঁর অফিসে। কৌশিক ডিম-মাখন-মাংস ইত্যাদি খরিদ করেছে তাঁর দার্জিলিং-এর দোকান থেকে। সপ্তাহে দুদিন সাপ্লাই দিতেও তিনি চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন কৌশিকের সঙ্গে। তারপর সেন-সাহেবই প্রতিপ্রশ্ন করেন, 'মিস্টার মিত্র কি এখনও ফিরে আসেননি?'

'না। তাই তো খোঁজ নিচ্ছি। দার্জিলিং-এ বৃষ্টি হয়েছে নাকি?'

'আদৌ না। আমি তো এইমাত্র ফিরছি সেখান থেকে।'

সুজাতা স্থির করল কৌশিক ফিরলে প্রথমেই সে সরাসরি জানতে চাইবে—কেন এমন অযথা মিথ্যে কথা বলল সে! আরও এক ঘণ্টা কাটল। রাত সওয়া ন'টা। না কৌশিক, না কালীপদ।

শেষপর্যন্ত বাইরের পোর্চে একটা গাড়ি এসে দাঁড়াবার শব্দ হল। সুজাতা উঠে গেল সদর খুলে দিতে। এতক্ষণে আসা হল বাবুর। বেশ মানুষ যা হোক! হঠাৎ নজর হল—না, ওদের গাড়িটা নয়। একটা ট্যাক্সি। গাড়ি থেকে একটা স্যুটকেস আব একটা হাতব্যাগ নিয়ে একজন অচেনা ভদ্রলোক নেমে এলেন। ভদ্রলোক স্যুটের ওপর বর্ষাতি চাপিয়েছেন। বৃষ্টি তখনও হচ্ছে। টর্চ জ্বেলে 'রিপোজ'-এর সাইন-বোর্ডটা দেখলেন। ভাড়া মিটিয়ে দিলেন। ট্যাক্সিটা ব্যাক করল। ভদ্রলোক কলিং বেলটা টিপে ধরলেন।

সুজাতার ভীষণ রাগ হচ্ছিল কৌশিকেব ওপর। কোনও মানে হয়? রাত সওয়া ন'টা। কী করবে সে এখন? লোকটা অচেনা—এই নির্বান্ধব পুরীতে সে একা মেয়ে। ট্যাক্সিটাও চলে গেল!

দ্বিতীয়বার আর্তনাদ করে উঠল কলিংবেলটা।

উপায় নেই। দরজা খুলতেই হবে। তবে অনেক ঝড়-ঝাপটা এই বয়েসেই সয়েছে সুজাতা। ভয়ডর এমনিতেই তার কম। অকুতোভয়ে সে দরজা খুলে মুখ বাড়ায়। ওকে দেখে একটু হকচকিয়ে যান ভদ্রলোক। বলেন, 'মাপ করবেন এটা "রিপোজ" হোটেল তো?'

'হ্যাঁ। কাকে খুঁজছেন?'

'ব্যক্তিকে খুঁজছি না, খুঁজছি বস্তু।'

'বস্তু?'

'আশ্রয়। আমার নাম এন. আলি—আমার রিজার্ভেশান আছে এখানে।'

'ও আপনি! মিস্টার আলি! আসুন, আসুন—আপনার না আগামী কাল আসার কথা?'

'কথা তাই ছিল। একদিন আগেই এসে পড়েছি বিশেষ কারণে। অসুবিধে হবে না আশা করি?'

'অসুবিধে হবে। আমাদের নয়, আপনার। কিন্তু সে-কথা এখন চিন্তা করে লাভ নেই। এই বর্ষণমুখর রাত্রে আপনি আরাম খুঁজছেন না, খুঁজছেন আশ্রয়।'

আলি-সাহেব পাপোশে জুতোটা ঘষে ড্রইংরুমে প্রবেশ করেন। হেসে বলেন, 'বর্ষণমুখর রাত্রি। কথাটা কাব্যগন্ধী।'

সুজাতা কথা ঘোরানোর জন্যে বলে, 'ভিজে গেছেন নাকি?'

'বিশেষ নয়। ভালো কথা, আমার নামে যে ঘরটা বুক করা আছে, সেটা কি আজ এই "বর্ষণমুখর রাত্রে" ফাঁকা আছে?'

সুজাতা একটু অসোয়াস্তি বোধ করে। ঘুরিয়ে বলে, 'না থাকলেও শোওয়ার একটা ঘর পাবেন।'

'তার মানে হোটেল আপনার "উপচীয়মান"। পূজা মরশুম, তাই নয়?'

সুজাতা সত্যি কথাটা স্বীকার করবে কি না বুঝে উঠতে পারে না।

ভদ্রলোক ভিজে বর্ষাতিটা খুলে হ্যাট-র‍্যাকে টাঙিয়ে রাখেন। এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলেন, 'বেয়ারাদের কাউকে দেখছি না যে?'

'আসবে এখনই। কোথা থেকে আসছেন এত রাত্রে?'

'দার্জিলিং থেকে। আজই সকালে পৌঁছেছিলাম সেখানে।'

'তাহলে এই রাত করে বের হলেন যে? "রিপোজ" তো আপনি চিনতেনও না।'

'দার্জিলিং ওভার-বুকড। কোনও হোটেলে ঠাঁই নেই। ভাবলাম আপনারা একটা-না-একটা ব্যবস্থা নিশ্চয় করবেন। আচ্ছা, মিস্টার মিত্র কোথায়? আমার চিঠির জবাব দিয়েছিলেন তো সাম মিস্টার মিত্র।'

'হ্যাঁ, কৌশিক মিত্র। আমি মিসেস মিত্র।'

'আমি তা আগেই বুঝেছি। মিস্টার কৌশিক মিত্র কোথায়?'

'দোতলায। অফিসে কাজ করছেন। আসুন, আপনাব ঘবটা দেখিয়ে দিই—।'

আলি ইতস্তত করেন। আশা কবছিলেন কোনও বেযাবা এসে ওঁব ব্যাগটা নেবে।

সুজাতা বলে, 'স্যুটকেসটা এখানেই থাক। রুম-সার্ভিসেব বেয়ারা পৌঁছে দেবে। আপনি শুধু হাত-ব্যাগটা নিয়ে আসুন—।'

'প্রয়োজন হবে না। নিজেব ব্যাগ আমি নিজেই বয়ে নিয়ে যেতে অভ্যস্ত। ও-দেশে স্টেশনে এয়ারপোর্টে এমন কুলির ব্যবস্থা নেই। নিজের মাল নিজেকেই বইতে হয়।'

'আপনি বুঝি সদ্য বিদেশ থেকে ফিরেছেন?' চলতে-চলতে সুজাতা প্রশ্ন করে।

আলি সে কথা এড়িয়ে বলেন, 'আমি কিন্তু এখন এক কাপ চা খাব মিসেস মিত্র। বিকেলে চা জোটেনি।'

এতক্ষণে মনে পড়ে গেল সুজাতার। বৈকালিক চা-পান তার নিজেরও হয়নি।

ড্রইংরুম পাব হযে পরদা সরিয়ে ডাইনিং-রুম। তার ওদিকে বাড়ির পশ্চিম-কোণার তিন নম্বব ঘরটিতে পৌঁছল ওরা। সুজাতাই আগে ঢুকল ঘবে আলোর সুইচটা জ্বেলে দিতে। বললে, 'ওযাশ আপ কবতে চান তো গিজাবটা চালু করে দিন। মিনিট দশেকের মধ্যেই গরম জল পাবেন। আমি চা-টা পাঠিযে দেওয়ার ব্যবস্থা করি। মিস্টার মিত্রকেও খবরটা দিই। সরুন—।'

আলি ঘরে ঢোকেননি। দাঁড়িয়ে ছিলেন দরজার মুখে। বস্তুত দরজা আগলে। হঠাৎ হাসি-হাসি মুখে ভদ্রলোক বললেন, 'একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করব মিসেস মিত্র?'

একটু সচকিত হয়ে ওঠে সুজাতা। লোকটা অমন দবজা আগলে দাঁড়িয়ে আছে কেন? তবু সাহস দেখিয়ে স্বাভাবিক কণ্ঠেই বলে, 'বলুন?'

'এমন "বর্ষণমুখর রাত্রে" এই নির্বান্ধব বাড়িতে একেবারে একা থাকতে আপনার ভয় কবে না?'

হাত-পা হিম হয়ে গেল সুজাতাব। মনে হল পিঠের দিকে, ব্লাউজেব ভেতর কী যেন একটা সরীসৃপ কিলবিল করে নেমে গেল।

কার্ট-রোড দিয়ে গাড়ি যাচ্ছে। তাদের হেডলাইট বাঁকের মুখে জমাটবাঁধা অন্ধকাব স্তূপে আলোর ঝাঁটা বুলিয়ে যাচ্ছে ক্রমাগত। অন্ধকার তাতে একটুও কমছে না। গাড়ি বাঁক নিলেই আঁধাবে অবলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে দুপাশের আদিম অরণ্য। তা হোক, তবু ওই গাড়িগুলো মানবসভ্যতার প্রতিনিধি। ওর ভেতব আছে মানুষজন। সুজাতা একা নয়। কিন্তু কার্ট-রোড যে ওখান থেকে তিন-চারশো ফুট!

নিতান্ত ঘটনাচক্র। ঠিক এই মুহূর্তেই ড্রইংরুমে বেজে উঠল টেলিফোন। তার যান্ত্রিক কর্কশ শব্দটা জলতরঙ্গের মতো মিঠে মনে হল সুজাতার কাছে। না, সে একা নয়। তাকে ঘিরে আছে এই পৃথিবীর কোটি-কোটি মানুষের শুভেচ্ছা। ও তাদের সব্বাইকে এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছে না বটে, কিন্তু ওই তো ওদেরই মধ্যে একজন যান্ত্রিক দূরভাষণে ওর কুশল জানতে চাইছে। দুর্জয় সাহসে বুক বেঁধে সুজাতা বললে আগেকার শব্দটাই, 'সরুন!'

দরজা থেকে সরে দাঁড়ালেন আলি। সুজাতা ডাইনিং রুম পার হয়ে চলে এল ড্রইংরুমে। পিয়ানোটার পাশেই টেলিফোন স্ট্যান্ড। ড্রইং আর ডাইনিং রুম-এর মাঝখানে প্রকাণ্ড একটা পরদা। বর্তমানে সরানো। তাই তিন নম্বর ঘরের প্রবেশ পথে দাঁড়িয়েই দেখতে পাচ্ছিলেন আলি—শাড়ির আঁচল সামলিয়ে সুজাতা টেলিফোনটা তুলে নিয়ে সাড়া দিল ঃ 'রিপোজ'।

দার্জিলিং থেকে মণি-বউদি ফোন করছেন। ডি. সি. মিস্টার বিপুল ঘোষ, আই. এ. এস-এর স্ত্রী। জানালেন—সুজাতার নিমন্ত্রণ রাখতে আসা সম্ভবপর হচ্ছে না ওঁদের পক্ষে। গভর্নর দার্জিলিং-এ আসছেন। ফলে ডি. সি. ব্যস্ত থাকবেন। তা ছাড়া রেডিওতে নাকি খবর দিয়েছে সমস্ত উত্তরবঙ্গে আগামী দু-তিনদিন প্রবল বর্ষণ হতে পারে।

সুজাতা অপ্রয়োজনে দীর্ঘায়ত করল তার দূরভাষণ। নানান খেজুরে গল্প জুড়ে সময় কাটাল। লক্ষ করে আড়চোখে দেখল—আলি পায়ে-পায়ে এগিয়ে এসেছেন অনেকটা। তিনি এখন ড্রইং-ডাইনিং-রুম-এর সঙ্গমস্থলে। মুখ-হাত ধুতে ঘরে যাননি। বরং পাইপটা জ্বেলেছেন।

ঠিক এই সময়ই ফিরে এলে কালীপদ। কাক-ভেজা হয়ে। তাকে দেখে ধড়ে প্রাণ এল সুজাতার। টেলিফোনটা নামিয়ে রেখে বলল, 'জামা-কাপড় ছেড়ে ফেল। চায়ের জল বসা।'

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল আলি-সাহেবের। নিজের ঘরের দিকে পা বাড়াতেই সুজাতা বলে ওঠে, 'মাপ করবেন, তখন কী যেন একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলেন আপনি? টেলিফোনটা বেজে ওঠায় জবাব দেওয়া হয়নি।'

আলি হেসে বললেন, 'প্রশ্নটা এতক্ষণে তামাদি হয়ে গেছে।'

, 'ভুলে গেছেন?'

'যাব না? ডি. সি ও. সি গভর্নর!...তারপর কি আর কিছু মনে থাকে?'

নিজের ঘরের দিকে ফিরে গেলেন আলি।

রাত দশটায় ফিরে এল কৌশিক। বৃষ্টিতে ভিজে। গাড়ির কেরিয়ারে খাদ্যসামগ্রী নিয়ে। অভিমান-ক্ষুব্ধা সুজাতা কোনও কৌতূহল দেখাল না। জানতে চাইল না কেন এত রাত হল। কৌশিক নিজে থেকেই সাতকাহন করে কৈফিয়ত দিতে থাকে। বেশ বোঝা গেল—'হিমালয়ান মোটর রিপেয়ারিং শপ'-এর লোকটা কৌশিককে জানায়নি যে ইতিমধ্যে সে 'রিপোজ'-এ ফোন করেছিল।

রাত্রে খাবার টেবিলে কৌশিকের সঙ্গে পরিচয় হল আলি-সাহেবের। তিনজনে একসঙ্গেই খেতে বসেছিল। ডিনার টেবিলে। সেলফ-হেলপ পরিবেশন ব্যবস্থা। কৌশিক আলি-সাহেবকে বললে, 'আপনার নিশ্চয় খুব অসুবিধে হয়েছে। আমরা এখনও ঠিকমতো প্রস্তুত নই, বুঝেছেন? আগামীকাল থেকে হোটেল চালু হওয়ার কথা।'

আলি-সাহেব আলুভাজার প্লেটটা নিজের দিকে টেনে নিতে-নিতে বললেন, 'বুঝেছি। তাই বুঝি গাড়ি নিয়ে শেষবারের মতো বাজার করতে গিয়েছিলেন দার্জিলিং-এ?'

'না, না, দার্জিলিং-এ তো নয়। আমি গিয়েছিলাম কাঞ্চন ডেয়ারিতে। এদিকে—।'

'ও, তাই বুঝি! আমি প্রথমটায় ভেবেছিলাম—আপনি বুঝি দোতলার অফিসঘরে বসে কাজ করছেন। মিসেস মিত্রই আমার ভুলটা ভেঙে দিলেন। বললেন—না, উনি বাড়িতে একেবারে একা আছেন। চাকরটা পর্যন্ত নেই! আর আপনি নাকি বাজার করতে দার্জিলিং গেছেন।'

'দার্জিলিং! তুমি তাই বলেছ?' কৌশিক প্রশ্ন করে সুজাতাকে।

সুজাতা সে প্রশ্নের জবাব দেয় না। আলি-সাহেবকে বলে, 'আজ কিন্তু সংক্ষিপ্ত মেনু। এই তিনটেই আইটেম—আলুভাজা, ডিমভাজা আর খিচুড়ি।'

আলি হেসে বলেন, 'আজ আকাশের যা অবস্থা তাতে অন্যরকম আয়োজন হলে আপনাকে বেরসিকা ভাবতাম মিসেস মিত্র!'

কৌশিক বললে, 'সত্যি—কী বিশ্রী বৃষ্টি শুরু হল!'

আলি বিচিত্র হেসে বললে, 'বিশ্রী! সেটা আপনার দৃষ্টিভঙ্গির দোষ। বিরহকাতরা কোনও বিরহিনী হয়তো এমন রাতেই গান ধরেন "কৈসে গোঁয়াইবি হরিবিনে দিনরাতিয়া।" কী বলেন মিসেস মিত্র?'

সুজাতা মুখ টিপে বলে, 'আপনাকে কাব্যরোগে ধরেছে মনে হচ্ছে।'

'ধরবে না? আমার কাছে রাতটা যে মোটেই বিশ্রী নয়—আমার বারে-বারে মনে পড়ে যাচ্ছে এটা বর্ষণমুখর রাত্রি।'

কৌশিক সন্দিগ্ধভাবে দুজনের দিকে তাকায়। তার হঠাৎ মনে হয়—সুজাতা লজ্জা পেল। কেন? যেন কথা ঘোরাতেই সুজাতা বললে, 'মুশকিল হয়েছে কি আমার হেড কুক-এর প্রবল জ্বর হয়েছে।'

'কার? কালীপদর?' কৌশিক জানতে চায়।

সুজাতা বলে, 'হ্যাঁ। বৃষ্টিতে ভিজে।'

আলি বলেন, 'তবে তো খুব মুশকিল হল আপনার। কাল সকালেই সব বোর্ডাররা আসবেন তো?'

'সকালে না হয় সারাদিনে তো আসবেই।'

'তাহলে লোকজন আসার আগে আপনাকে জনান্তিকে একটা খবর দিয়ে রাখি মিসেস মিত্র। আমি ব্যাচিলার—নিজের রান্না নিজে করি। পিকনিকে গেলে বরাবর আমাকে রাঁধতে হয়েছে। প্রয়োজনবোধে আপনার হেড-কুকের অ্যাকটিং করতে পারি। ভাটপাড়া অথবা নবদ্বীপ থেকে কোনও পণ্ডিতমশাই নিশ্চয় আপনার বোর্ডার হয়ে আসছেন না?'

কৌশিক তাড়াতাড়ি বলে, 'না-না, তাব প্রয়োজন হবে না। আমিই তো আছি!'

'এখন আছেন। কাল সকালেই হয়তো আবার দার্জিলিং ছুটবেন...আই মিন কাঞ্চন ডেয়ারিতে!'

কৌশিক বিষম খেল।

॥ চার ॥

২ অক্টোবর, বুধবার। সন্ধ্যা।

ইতিমধ্যে বিপোজ-এ এসে হাজির হয়েছেন বেশ কয়েকজন। সুজাতা চোখে অন্ধকার দেখে। কাল রাত্রি থেকে যে বৃষ্টি শুরু হয়েছে তা থামার লক্ষণ নেই। এক নাগাড়ে বর্ষণ চলেছে। পাহাড়ে বৃষ্টি। কখন থামবে কেউ জানে না। রেডিওতে তো বলছে সহজে থামবে না। কালীপদ সেই যে শুয়েছে আর ওঠার নাম নেই। সারারাত প্রবল জ্বরে ছটফট করেছে বেচারি। ওদিকে কাঞ্চী আজ সকালে আসেনি—ওদের বস্তির ঘরে হুড়হুড় করে জল ঢুকছে হয়তো। সেই সামলাতেই ওরা হিমশিম। অথচ এদিকে একে-একে এসে উপস্থিত হচ্ছেন আবাসিকেরা।

সবার আগে এসেছেন মিস কাবেরী দত্তগুপ্তা। সকাল ছ'টায়। তখনও শয্যাত্যাগ করেনি সুজাতারা। কাল রাত্রে সুজাতার ভালো ঘুম হয়নি। কৌশিক হঠাৎ কেন একঝুড়ি মিথ্যে কথা বলল তাও কিছুতেই ভেবে পাচ্ছিল না। অপরপক্ষে কৌশিকও একটু গুম মেরে গেছে। খাওয়ার টেবিলে যে কথোপকথনটা হল সেটার কথাই ওর বারবার মনে পড়ে যাচ্ছে। ভাবছিল—সুজাতা কেন আলি-সাহেবকে প্রথম সাক্ষাতেই বলে বসেছিল—বাড়িতে সে একেবারে একা, চাকরটা পর্যন্ত নেই। আর আলি-সাহেব কেন অমন ইঙ্গিতপূর্ণ ভাষায় বললে, 'আমার বারে-বারে মনে পড়ে যাচ্ছে এটা বর্ষণমুখর রাত্রি।' সুজাতাই বা অমন রাঙিয়ে উঠল কেন হঠাৎ? কৌশিকের ভীষণ জানতে ইচ্ছে করছিল—সে এসে পৌঁছনোর আগে সুজাতা আর আলি নির্জন বাড়িতে কী নিয়ে কথাবার্তা বলছিল। আলি

যখন আসে তখন কি সুজাতা গান গাইছিল—"কৈসে গোঁয়াইবি হরিবিনে দিনরাতিয়া"। পাশাপাশি খাটে দুজনেই জেগে শুয়েছিল অনেক রাত পর্যন্ত। দুজনেই জেগে আছে। কেউই কিন্তু সাড়া দেয়নি। তারপর কখন দুজনে ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুম ভাঙল নীচের কলিং বেলটা আর্তনাদ করে ওঠায়।

'এই, নীচে কে যেন কলিং বেল বাজাচ্ছে। কাঞ্চী এসেছে বোধহয়'—কৌশিক সুজাতাকে ডেকে দেয়।

ধড়মড়িয়ে উঠে বসে সুজাতা। কাঞ্চী তো এত সকালে আসে না। নীচে নেমে আসে। দরজা খুলেই দেখে কাঞ্চী নয়—আগন্তুক একজন নতুন বোর্ডার। বছর পঁচিশ-ত্রিশ বয়েসের একজন মহিলা। চিকনের একটি শাড়ির ওপর গরম ওভারকোট। দেখতে ভালোই, সুন্দরীই বলা চলে। মেয়েটি বলে, 'আমার নাম কাবেরী দত্তগুপ্তা।'

'সুপ্রভাত! আসুন, আসুন! এত ভোরবেলা কোথা থেকে? আপনার না আজ দুপুরে আসার কথা?'

'তাই স্থির ছিল। রেলওয়ে রিজার্ভেশান পেলাম একদিন আগে। কাল এসেছি—।'

'কাল এসেছেন! রাত্রে কোথায় ছিলেন?'

'কার্শিয়াঙে। ওখানে আমার একজন বন্ধুস্থানীয় লোক আছেন। তাঁর বাড়িতেই রাত্রে ছিলাম। ভোরবেলা উঠেই একটা ট্যাক্সি নিয়ে চলে এসেছি। যা বৃষ্টি—।'

'আসুন, ভেতরে আসুন—আপনার জামা-কাপড় একদম ভিজে গেছে।'

কাবেরীর সঙ্গে কোনও বেডিং নেই। আছে একটা সুন্দর সাদা স্যুটকেস। কালীপদ অসুস্থ। ফলে সুজাতা আর কাবেরী দুজনে ভাগাভাগি করে সেটা টেনে নিয়ে আসে দোতলায়। কাবেরীর জন্যে নির্দিষ্ট ছিল দোতলার সাত নম্বর ঘরটা। সেটা পছন্দ হল কাবেরীর। ঘরে পৌঁছে কাবেরী বলল, 'আপনিই তো হোটেলের মালিক, তাই নয়?'

'আমি একা নই—আমরা। স্বামী-স্ত্রী। আজই খোলা হল হোটেলটা। পরে ভালো করে আলাপ করা যাবে। চা খাবেন নিশ্চয়। আমরাও এখনও খাইনি।'

'চা তো খাবই। একেবারে বাসি-মুখে রওনা হয়েছি—।'

'ঠিক আছে। মুখ হাত ধুয়ে নিন। গিজার আছে, গরম জল পাবেন।'

দুপুরে যে ট্রেনটা শিলিগুড়ি থেকে আসে, সেটা এসে উপস্থিত হল বেলা চারটেয়। বৃষ্টির জন্য। কাক-ভেজা হয়ে এসে উপস্থিত হলেন অরূপরতন মহাপাত্র। ছোট রেলের ট্রেনটা যে শেষ পর্যন্ত এসে পৌঁছবে এ ভরসাই নাকি ছিল না। প্রবল বর্ষণে অনেক জায়গায় ধস নেমেছে। তবে লাইন চালু আছে এখনও। অরূপরতনের জন্যে নির্দিষ্ট ছিল দোতলার নয় নম্বর ঘরটা। কিচেন-ব্লকের উত্তরে, সিঁড়ির পাশেই। অরূপ ঘুরে-ঘুরে বাড়িটা দেখলেন। প্রশংসা করলেন—যতটা না বাড়ির, তার চেয়ে বেশি তার রূপসজ্জাব। সুজাতার রুচিকেই তারিফ করলেন বারে-বারে। সুজাতা সারা বাড়িটা দেখিয়ে ওঁকে পৌঁছে দিচ্ছিল ওঁর সাত নম্বর ঘরে। হঠাৎ সিঁড়ির মুখে দেখা হয়ে গেল কাবেরীর সঙ্গে। সে নীচে নামছিল। সুজাতা ওঁদের পরিচয় করিয়ে দেয়ঃ মিস কাবেরী দত্তগুপ্তা, আজই সকালে এসেছেন। আর ইনি মিঃ অরূপরতন মহাপাত্র, অ্যাডভোকেট। আমাদের পারিবারিক বন্ধু।

কাবেরী কোনও কৌতূহল দেখাল না। মামুলি নমস্কার করল শুধু।

অরূপ প্রতিনমস্কার করে বললে, 'আপনাকে কোথায় দেখেছি বলুন তো?'

'আমাকে! কোথায়?' কেমন যেন চমকে ওঠে কাবেরী।

'মাপ করবেন, আপনি কি ক্রিশ্চিয়ান?'

'ক্রিশ্চিয়ান! না তো! এমন অদ্ভুত কথা মনে হল কেন আপনার?'

অরূপ হেসে বলে, 'আমারই ভুল তাহলে। আমার এক খ্রিস্টান বন্ধুর বিয়েতে একবার চার্চে

গিয়েছিলাম—বছরখানেক আগে। সেখানে একটি মেয়েকে দেখেছিলাম—।'

'না-না, আমার বংশের কেউ কখনও গির্জায় যায়নি। আপনি ভুল করছেন।'

কাবেরী তরতরিয়ে নেমে গেল সিঁড়ি দিয়ে।

অরূপ একটু হকচকিয়ে যায়। সুজাতাকে বলে, 'ভদ্রমহিলা কি অফেন্স নিলেন?'

'অফেন্স নেওয়ার মতো কোনও কথা তো আপনি বলেননি।'

'না, তা বলিনি। আমারই ভুল।'

সুজাতার মনে পড়ে গেল অনেকদিন আগেকার কথা। সেবারও অরূপরতন একজনকে দেখে বলেছিলেন, 'আপনাকে কোথায় দেখেছি বলুন তো?' আর সেবার কিন্তু অরূপের ভুল হয়নি।

বিকাল নাগাদ এসে উপস্থিত হলেন আর একজন আগন্তুক। আসার ঘণ্টাখানেক আগে দার্জিলিং থেকে একটা টেলিফোন করে জানতে চাইলেন—সিঙ্গল-সিটেড ঘর পাওয়া যাবে কি না। কৌশিক অবস্থা বেগতিক দেখে আপত্তি করেছিল, কিন্তু সুজাতা শোনেনি। সুজাতার মতে বোর্ডার হচ্ছে ওদের ব্যবসায়ের লক্ষ্মী। উদ্বোধনের দিনেই সে কাউকে প্রত্যাখ্যান করবে না—যতই কেন না অসুবিধে হোক। ফলে ঘণ্টাখানেক পরে একটা ট্যাক্সি নিয়ে এসে হাজির হলেন অজয় চট্টোপাধ্যায়। বৃদ্ধ। সরকারি অফিসার ছিলেন। বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত। বিপত্নীক। ছেলে-মেয়েরা বিবাহিত এবং জীবনে প্রতিষ্ঠিত। খেয়ালি মানুষ, মেজাজ একটু তিরিক্ষে। অবসরপ্রাপ্ত জীবনে তিনি ছবি এঁকে বেড়াচ্ছেন। পাহাড়ে এসেছেন ছবি আঁকতে। দ্বিতলের আট নম্বরে তাঁকে থাকতে দেওয়া হল।

বাসু-সাহেব সস্ত্রীক যখন এসে পৌঁছলেন তখন দিনের আলো মিলিয়ে গেছে।

বর্ষণক্লান্ত সন্ধ্যায় সবাই জমিয়ে বসেছেন ড্রইংরুমে। আলি-সাহেব, কাবেরী, অরূপ, অজয় চাটুজ্জে এবং কৌশিক। শুধু সুজাতা অনুপস্থিত। সে ছিল কিচেন ব্লকে। এতগুলি প্রাণীর রান্নার জোগাড় তাকে করতে হচ্ছে একা হাতে। কালীপদ শয্যাশায়ী। কাঞ্ছী আদৌ আসেনি। ডাইনে-বাঁয়ে তাকাবার অবসর নেই সুজাতার। কৌশিক একবার এসেছিল কোনও সাহায্য করতে হবে কি না জানতে; রূঢ়ভাবে সুজাতা তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। সুজাতার মেজাজ হঠাৎ এমন বিগড়ে গেল কেন কৌশিক কিছু আন্দাজ করতে পারে না। অতএব সেও গুটিগুটি এসে বসেছে ড্রইংরুমে।

বাইরের দিক থেকে পরদা সরিয়ে ঘরে ঢুকলেন বাসু-সাহেব, চাকা-দেওয়া চেয়ারে সহধর্মিণীকে নিয়ে। কৌশিক সকলের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দেয়, আর ওঁদের বলে, 'আর এঁদের পরিচয় উনি আমাদের মামা আর মামিমা। মিস্টার পি. কে বাসু, বার অ্যাট-ল আর মিসেস রাণী বাসু। লেডিজ অ্যান্ড জেন্টেলমেন। আমার একটা ঘোষণা আছে। এমন জমাট বর্ষার সন্ধ্যায় আপনাদের একটি সুখবর দিচ্ছি—আমাদের বাসু-মামুর ঝুলিতে অসংখ্য ইন্টারেস্টিং কেস-হিস্ট্রি আছে। উনি ছিলেন ক্রিমিনাল ল-ইয়ার। ফলে উনি যদি একটি গোয়েন্দা গল্প ফাঁদেন আমরা অজান্তে ডিনার টাইমে পৌঁছে যাব।'

আলি বলেন, 'ভেরি ইন্টারেস্টিং! আপনার ঝুলি ঝেড়ে অতীত দিনের কোনও একটা লোমহর্ষক কাহিনি বের করে ফেলুন বাসু-সাহেব—।'

বাসু-সাহেব একটা সোফায় সবেমাত্র গুছিয়ে বসেছেন। পাইপ আর পাউচটা বার করে লক্ষ করে দেখছিলেন—টোবাকোটা ভিজে গেছে কি না। অন্যমনস্কের মতো বলেন, 'উঁ! অতীত দিনের কোনও লোমহর্ষক কাহিনি? নো, আয়াম সরি—।'

'শোনাবেন না?' হতাশ হয়ে প্রশ্ন করে কৌশিক।

'না। অতীতের কথা থাক। Let the dead past bury it's dead! তবে তোমাদের একেবারে নিরাশও করব না। অতি সাম্প্রতিক কালের একটা লোমহর্ষক কাহিনি তোমাদের শোনাব—।'

'সে তো আরও ভালো কথা—' বলে ওঠে কাবেরী।

'উঁ? ভালো? তা ভালো-খারাপ জানি না—আজই—এই ধরো ঘণ্টা চোদ্দো আগে দার্জিলিং-এ একটা হোটেলে মৃতদেহ আবিষ্কৃত হয়েছে। আমি তার প্রত্যক্ষদর্শী।'

সবাই চমকে ওঠে খবরটা শুনে।

কৌশিক বলে, 'দার্জিলিঙের হোটেলে? কোন হোটেলে?'

'হোটেল—দ্য কাঞ্চনজঙ্ঘা! রুম নাম্বার টোয়েন্টি থ্রি! বাই দ্য ওয়ে—হোটেল কাঞ্চনজঙ্ঘার নাম আপনারা কেউ শুনেছেন?'

দৃষ্টিটা উনি বুলিয়ে নেন সোৎসুক দর্শকবৃন্দের ওপর।

সবাই স্তব্ধ হয়ে বসে আছে। কেমন যেন অসোয়াস্তি বোধ করে সবাই। কেউ কোনও জবাব দেয় না। শেষ পর্যন্ত আর্টিস্ট অজয় চাটুজ্জে গলাটা সাফ করে নিয়ে বলেন, 'আমি চিনি। ইন ফ্যাক্ট, ওখান থেকেই আসছি আমি। আমি কাল রাত্রে ওই হোটেলে ছিলাম, রুম নম্বর একুশে।'

'তাই নাকি! তা এত বড় খবরটা শোনেননি?' প্রশ্নটা পেশ করেন আলি-সাহেব।'

অজয়বাবু একটু নড়েচড়ে বসেন। বলেন, 'শুনব না কেন, শুনেছি। তাই তো চলে এলাম এখানে। ওখানে আর ছবি আঁকার পরিবেশ নেই। সওয়াল জবাব শুরু হয়ে গেছে!'

কৌশিক বলে, 'কী আশ্চর্য! এতক্ষণ তো আমাদের বলেননি কিছু?'

'কী বলব? এটা কি একটা বলার মতো কথা? আমরা এখানে এসেছি পাহাড় দেখতে, বেড়াতে, স্ফূর্তি করতে। তার মধ্যে দারোগা খুনের খবরটা জনে-জনে বলে বেড়াতে হবে, তার অর্থ কী?'

'দারোগা! যে লোকটা মারা গেছে সে কি পুলিশের দারোগা ছিল?' প্রশ্নটা আবার পেশ করেন আলি-সাহেব।

বাসু-সাহেব অরূপরতনের দিকে ফিরে বলেন, 'রমেন গুহকে মনে আছে অরূপ?'

'নাট্যামোদী রমেন দারোগা? আলবত। কেন কী হয়েছে তার?'

'রমেন বদলি হয়ে এসেছিল দার্জিলিঙে। গতকাল বেলা বারোটার সময় সে এসে ওঠে ওই হোটেল কাঞ্চনজঙ্ঘায়। আর আজ সকাল পৌনে ছ'টায় তার মৃতদেহ আবিষ্কৃত হয়েছে। তার নিজের ঘরে, রুদ্ধদ্বার কক্ষে। এ কেস অব পয়েজনিং! ওর ফ্লাস্কে কেউ পটাসিয়াম সায়ানাইড ফেলে গেছে!'

সকলে ঘনিয়ে আসে। বিস্তারিত জানতে চায় ঘটনাটা। যতদূর জানা ছিল বাসু-সাহেব আনুপূর্বিক বলে যেতে থাকেন। মাঝে-মাঝে পাদপূরণ করছিলেন রাণী দেবী। ইতিমধ্যে সুজাতাও মাঝে-মাঝে এসে দাঁড়াচ্ছে। আবার ফিরে যাচ্ছে রান্নাঘরে। রমেন গুহ সুজাতার বিশেষভাবে পরিচিত। বাসু-সাহেব সব কথারই উল্লেখ করলেন। কিন্তু জানালেন না দুটি সংবাদ। তেইশ নম্বর ঘরে অ্যাশট্রে থেকে উদ্ধার করা সিগারেটের টুকরোর কথা; আর বাইশ নম্বরের ওয়েস্ট পেপার-বাস্কেটের কাগজের কথাটা।

আলি-সাহেব বললেন, 'ওই মহম্মদ ইব্রাহিমের চেহারার কী বর্ণনা পেলেন?'

সন্ধানী দৃষ্টি মেলে বাসু-সাহেব বললেন, 'হাইট এবং স্ট্রাকচার এই ধরুন প্রায় আপনার মতো। তবে লোকটার দাড়ি ছিল এবং চোখে চশমা ছিল—।'

'আলি হেসে বললেন, ভাগ্যে আমার তা নেই! না হলে আপনারা হয়তো আমাকেই সন্দেহ করতেন। আমি তো কাল রাত্রে এসে পৌঁছেছি, ইব্রাহিম-সাহেব চেক-আউট করবার ঘণ্টাখানেক পরে।'

'এবং লোকটা পাইপ খেত।' পাদপূরণ করেন বাসু-সাহেব।

'পাইপ খেত! সেরেছে!' জ্বলন্ত পাইপটা নিয়ে আলি-সাহেব অভিনয় করেন—যেন তিনি অত্যন্ত বিড়ম্বিত, কোথায় পাইপটা লুকোবেন ভেবে পাচ্ছেন না।

কাবেরী বলে, 'মিস্টার আলি, আপনার ভয় নেই। বাসু-সাহেব নিজেও পাইপ খান।'

'থ্যাঙ্কু! থ্যাঙ্কু! ভাগ্যে মনে করিয়ে দিলেন!' আলি-সাহেব পাইপ টানতে থাকেন আবার।'

'আর মিস ডিক্রুজা?' এবার জানতে চায় অরূপ।

প্রশ্নকর্তার দিকে না তাকিয়ে বাসু-সাহেব সরাসরি তাকালেন কাবেরী দত্তগুপ্তার দিকে। যেন তারই একটা দৈহিক বর্ণনা দেখে-দেখে দিচ্ছেন সেইভাবে বলে গেলেন, হাইট—মাঝারি, রং—ফরসা, বয়স কত হবে? এই ধরুন সাতাশ-আঠাশ। সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী। মাপ নাকি—৩৪-২৮-৩২।

কাবেরীকে প্রথমটায় একটু নার্ভাস লাগছিল, কিন্তু শেষ বর্ণনাটায় সে খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে। রাণী দেবীকে বলে, 'মামিমা, একটু সাবধানে থাকবেন! মামা যেভাবে মেয়েদের দেখা মাত্র তাদের ভাইট্যাল স্ট্যাটিসটিক্স বুঝে ফেলছেন—।'

রাণী বললেন, 'উনি মিস ডিক্রুজাকে দেখেননি। শোনা কথা বলছেন!'

আলি-সাহেব রসিকতা করে, 'কী দাদা, কানে শুনেই এই! চোখে দেখলে—।'

বাধা দিয়ে রাণী বলে ওঠেন, 'উনি আর একটা কথা বলতে ভুলেছেন। মিস ডিক্রুজা ভার্মিলিয়ান রঙের লিপস্টিক ব্যবহার করে! তবে তোমার ভয় নেই কাবেরী, তুমি একাই তা করোনি, সুজাতাও তাই করে। ওই দেখ—।'

সুজাতা তখনই এসে দাঁড়িয়েছে পিছনের দরজায়।

চিত্রকর অজয় চাটুজ্জে এতক্ষণ কোনও কথা বলেননি। আপন মনে একটা ম্যাগাজিনের পাতা উলটে যাচ্ছিলেন। তাঁর দিকে ফিরে বাসু-সাহেব এবার বলেন, 'আচ্ছা চাটুজ্জেমশাই, আপনি কি একুশ নম্বর ঘরটা ছেড়ে আজ বাইশ নম্বরে আসতে চেয়েছিলেন?'

'উঁ?' চমকে বই থেকে মুখ তুলে অজয়বাবু বলেন, 'আমাকে বলছেন?'

প্রশ্নটা দ্বিতীয়বার পেশ করেন বাসু-সাহেব।

গুছিয়ে জবাব দেওয়ার জন্যেই প্রশ্নটা দ্বিতীয়বার শুনতে চাইলেন কি না বোঝা গেল না, চাটুজ্জেমশাই জবাবে বললেন, 'হ্যাঁ। চেয়েছিলাম। আমার একুশ নম্বর ঘর থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘার আনডিসটার্বড ভিয়ু পাওয়া যাচ্ছিল না, তাই—।'

'তাহলে শেষপর্যন্ত মহম্মদ ইব্রাহিমের ঘরটা নিলেন না যে?'

'ওই যে বললাম—আমি ও-ঘরে শিফট করার আগেই পুলিশে এসে ঘরটা তল্লাশি করল। ভাবলাম—"বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা"। মানে-মানে সরে পড়লাম ওখান থেকে—।'

'মহম্মদ ইব্রাহিম ঘরটা ছেড়ে যাওয়ার পর আপনি ওই ঘরটা দেখতে গিয়েছিলেন, নয়?'

'হ্যাঁ গিয়েছিলাম। দেখতে গিয়েছিলাম ও-ঘরের জানলা থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা কেমন দেখতে পাওয়া যায়। মিনিট-খানেক ও-ঘরে ছিলাম আমি। কিন্তু কেন বলুন তো?'

'আচ্ছা, মিস্টার চ্যাটার্জি, এমনও তো হতে পারে ওই এক মিনিটের ভেতর কোনও অপ্রয়োজনীয় জিনিস আপনি ওই ঘরের ওয়েস্ট-পেপার বাস্কেটে ফেলে দেন? যেমন ধরুন, খালি দেশলাইয়ের বাক্স, পুরোনো ক্যাশমেমো অথবা দলাপাকানো একটা কাগজ—।'

হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ান অজয় চাটুজ্জে। কৌশিকের দিকে ফিরে বলেন, 'আজ রাত হয়ে গেছে; কাল সকালেই আপনার বিলটা পাঠিয়ে দেবেন। আমি চেক-আউট করব!'

অরূপ বলে ওঠে, 'কী হল মশাই? রাগ করছেন কেন?'

'রাগ নয়, আমার এসব বরদাস্ত হয় না—এই গোয়েন্দাগিরি আর পুলিশি প্যাঁচ। আমি একটু আনডিসটার্বড থাকতে চাই। এখানেও সওয়াল-জবাব শুরু হয়ে গেছে—।'

রীতিমতো রাগ করেই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যান অজয়বাবু।

অরূপ একটু ঝুঁকে বসে। বাসু-সাহেবকে প্রশ্ন করে, 'কী ব্যাপার স্যার? ওই ইব্রাহিমের ঘরের ওয়েস্ট-পেপার বাস্কেটে কিছু মালঝাল পাওয়া গেছে নাকি?'

বাসু-সাহেব পাইপটায় কামড় দিয়ে বলেন, 'কী দরকার অরূপ ওসবের মধ্যে আমাদের যাওয়ার? আমরা এসেছি পাহাড় দেখতে, বেড়াতে আর ফুর্তি করতে। কী বলেন?'

'উঁ? ভালো? তা ভালো-খারাপ জানি না—আজই—এই ধরো ঘণ্টা চোদ্দো আগে দার্জিলিং-এ একটা হোটেলে মৃতদেহ আবিষ্কৃত হয়েছে। আমি তার প্রত্যক্ষদর্শী!'

সবাই চমকে ওঠে খবরটা শুনে।

কৌশিক বলে, 'দার্জিলিঙের হোটেলে? কোন হোটেলে?'

'হোটেল—দ্য কাঞ্চনজঙ্ঘা! রুম নাম্বার টোয়েন্টি থ্রি! বাই দ্য ওয়ে—হোটেল কাঞ্চনজঙ্ঘার নাম আপনারা কেউ শুনেছেন?'

দৃষ্টিটা উনি বুলিয়ে নেন সোৎসুক দর্শকবৃন্দের ওপর।

সবাই স্তব্ধ হয়ে বসে আছে। কেমন যেন অসোয়াস্তি বোধ করে সবাই। কেউ কোনও জবাব দেয় না। শেষ পর্যন্ত আর্টিস্ট অজয় চাটুজ্জে গলাটা সাফ করে নিয়ে বলেন, 'আমি চিনি। ইন ফ্যাক্ট, ওখান থেকেই আসছি আমি। আমি কাল রাত্রে ওই হোটেলে ছিলাম, রুম নম্বর একুশে।'

'তাই নাকি! তা এত বড় খবরটা শোনেননি?' প্রশ্নটা পেশ করেন আলি-সাহেব।'

অজয়বাবু একটু নড়েচড়ে বসেন। বলেন, 'শুনব না কেন, শুনেছি। তাই তো চলে এলাম এখানে। ওখানে আর ছবি আঁকার পরিবেশ নেই। সওয়াল জবাব শুরু হয়ে গেছে!'

কৌশিক বলে, 'কী আশ্চর্য। এতক্ষণ তো আমাদের বলেননি কিছু?'

'কী বলব? এটা কি একটা বলার মতো কথা? আমরা এখানে এসেছি পাহাড় দেখতে, বেড়াতে, স্ফূর্তি করতে। তার মধ্যে দারোগা খুনের খবরটা জনে-জনে বলে বেড়াতে হবে, তার অর্থ কী?'

'দারোগা! যে লোকটা মারা গেছে সে কি পুলিশের দারোগা ছিল?' প্রশ্নটা আবার পেশ করেন আলি-সাহেব।

বাসু-সাহেব অরূপরতনের দিকে ফিরে বলেন, 'রমেন গুহকে মনে আছে অরূপ?'

'নাট্যামোদী রমেন দারোগা? আলবত। কেন কী হয়েছে তার?'

'রমেন বদলি হয়ে এসেছিল দার্জিলিঙে। গতকাল বেলা বারোটার সময় সে এসে ওঠে ওই হোটেল কাঞ্চনজঙ্ঘায়। আর আজ সকাল পৌনে ছ'টায় তার মৃতদেহ আবিষ্কৃত হয়েছে। তার নিজের ঘরে, রুদ্ধদ্বার কক্ষে। এ কেস অব পয়েজনিং। ওর ফ্লাস্কে কেউ পটাসিয়াম সায়ানাইড ফেলে গেছে!'

সকলে ঘনিয়ে আসে। বিস্তারিত জানতে চায় ঘটনাটা। যতদূর জানা ছিল বাসু-সাহেব আনুপূর্বিক বলে যেতে থাকেন। মাঝে-মাঝে পাদপূরণ করছিলেন রাণী দেবী। ইতিমধ্যে সুজাতাও মাঝে-মাঝে এসে দাঁড়াচ্ছে। আবার ফিরে যাচ্ছে রান্নাঘরে। রমেন গুহ সুজাতার বিশেষভাবে পরিচিত। বাসু-সাহেব সব কথারই উল্লেখ করলেন। কিন্তু জানালেন না দুটি সংবাদ। তেইশ নম্বর ঘরে অ্যাশট্রে থেকে উদ্ধার করা সিগারেটের টুকরোর কথা; আর বাইশ নম্বরের ওয়েস্ট পেপার-বাস্কেটের কাগজের কথাটা।

আলি-সাহেব বললেন, 'ওই মহম্মদ ইব্রাহিমের চেহারার কী বর্ণনা পেলেন?'

সন্ধানী দৃষ্টি মেলে বাসু-সাহেব বললেন, 'হাইট এবং স্ট্রাকচার এই ধরুন প্রায় আপনার মতো। তবে লোকটার দাড়ি ছিল এবং চোখে চশমা ছিল—।'

'আলি হেসে বললেন, ভাগ্যে আমার তা নেই! না হলে আপনারা হয়তো আমাকেই সন্দেহ করতেন। আমি তো কাল রাত্রে এসে পৌঁছেছি, ইব্রাহিম-সাহেব চেক-আউট করবার ঘণ্টাখানেক পরে।'

'এবং লোকটা পাইপ খেত।' পাদপূরণ করেন বাসু-সাহেব।

'পাইপ খেত। সেরেছে!' জ্বলন্ত পাইপটা নিয়ে আলি-সাহেব অভিনয় করেন—যেন তিনি অত্যন্ত বিড়ম্বিত, কোথায় পাইপটা লুকোবেন ভেবে পাচ্ছেন না।

কাবেরী বলে, 'মিস্টার আলি, আপনার ভয় নেই। বাসু-সাহেব নিজেও পাইপ খান।'

'থ্যাঙ্কু! থ্যাঙ্কু! ভাগ্যে মনে করিয়ে দিলেন।' আলি-সাহেব পাইপ টানতে থাকেন আবার।'

'আর মিস ডিক্রুজা?' এবার জানতে চায় অরূপ।

প্রশ্নকর্তার দিকে না তাকিয়ে বাসু-সাহেব সরাসরি তাকালেন কাবেরী দত্তগুপ্তার দিকে। যেন তারই একটা দৈহিক বর্ণনা দেখে-দেখে দিচ্ছেন সেইভাবে বলে গেলেন, হাইট—মাঝারি, রং—ফরসা, বয়স কত হবে? এই ধরুন সাতাশ-আঠাশ! সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী। মাপ নাকি—৩৪-২৮-৩২।

কাবেরীকে প্রথমটায় একটু নার্ভাস লাগছিল, কিন্তু শেষ বর্ণনাটায় সে খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে। রাণী দেবীকে বলে, 'মামিমা, একটু সাবধানে থাকবেন! মামা যেভাবে মেয়েদের দেখা মাত্র তাদের ভাইট্যাল স্ট্যাটিসটিক্স বুঝে ফেলছেন—।'

রাণী বললেন, 'উনি মিস ডিক্রুজাকে দেখেননি। শোনা কথা বলছেন।'

আলি-সাহেব রসিকতা করে, 'কী দাদা, কানে শুনেই এই! চোখে দেখলে—।'

বাধা দিয়ে রাণী বলে ওঠেন, 'উনি আর একটা কথা বলতে ভুলেছেন! মিস ডিক্রুজা ভার্মিলিয়ান রঙের লিপস্টিক ব্যবহার করে! তবে তোমার ভয় নেই কাবেরী, তুমি একাই তা করোনি, সুজাতাও তাই করে। ওই দেখ—।'

সুজাতা তখনই এসে দাঁড়িয়েছে পিছনের দরজায়।

চিত্রকব অজয় চাটুজ্জে এতক্ষণ কোনও কথা বলেননি। আপন মনে একটা ম্যাগাজিনেব পাতা উলটে যাচ্ছিলেন। তাঁর দিকে ফিরে বাসু-সাহেব এবাব বলেন, 'আচ্ছা চাটুজ্জেমশাই, আপনি কি একুশ নম্বর ঘরটা ছেড়ে আজ বাইশ নম্বরে আসতে চেয়েছিলেন?'

'উঁ?' চমকে বই থেকে মুখ তুলে অজয়বাবু বলেন, 'আমাকে বলছেন?'

প্রশ্নটা দ্বিতীয়বার পেশ করেন বাসু-সাহেব।

গুছিয়ে জবাব দেওয়াব জন্যেই প্রশ্নটা দ্বিতীয়বার শুনতে চাইলেন কি না বোঝা গেল না, চাটুজ্জেমশাই জবাবে বললেন, 'হ্যাঁ। চেয়েছিলাম। আমার একুশ নম্বর ঘর থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘার আনডিসটার্বড ভিয়ু পাওয়া যাচ্ছিল না, তাই—।'

'তাহলে শেষপর্যন্ত মহম্মদ ইব্রাহিমের ঘবটা নিলেন না যে?'

'ওই যে বললাম—আমি ও-ঘরে শিফট কবার আগেই পুলিশে এসে ঘরটা তল্লাশি করল। ভাবলাম—"বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা"। মানে-মানে সবে পড়লাম ওখান থেকে—।'

'মহম্মদ ইব্রাহিম ঘরটা ছেড়ে যাওয়ার পর আপনি ওই ঘরটা দেখতে গিয়েছিলেন, নয়?'

'হ্যাঁ গিয়েছিলাম। দেখতে গিয়েছিলাম ও-ঘরের জানলা থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা কেমন দেখতে পাওয়া যায়। মিনিট খানেক ও-ঘরে ছিলাম আমি। কিন্তু কেন বলুন তো?'

'আচ্ছা, মিস্টার চ্যাটার্জি, এমনও তো হতে পারে ওই এক মিনিটের ভেতব কোনও অপ্রয়োজনীয় জিনিস আপনি ওই ঘরের ওয়েস্ট-পেপাব বাস্কেটে ফেলে দেন? যেমন ধরুন, খালি দেশলাইয়ের বাক্স, পুরোনো ক্যাশমেমো অথবা দলাপাকানো একটা কাগজ—।'

হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ান অজয় চাটুজ্জে। কৌশিকের দিকে ফিরে বলেন, 'আজ রাত হয়ে গেছে; কাল সকালেই আপনার বিলটা পাঠিয়ে দেবেন। আমি চেক-আউট করব!'

অরূপ বলে ওঠে, 'কী হল মশাই? রাগ করছেন কেন?'

'রাগ নয়, আমার এসব বরদাস্ত হয় না—এই গোয়েন্দাগিরি আর পুলিশি প্যাঁচ। আমি একটু আনডিসটার্বড থাকতে চাই। এখানেও সওয়াল-জবাব শুরু হয়ে গেছে—।'

রীতিমতো রাগ করেই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যান অজয়বাবু।

অরূপ একটু ঝুঁকে বসে। বাসু-সাহেবকে প্রশ্ন করে, 'কী ব্যাপার স্যার? ওই ইব্রাহিমের ঘরের ওয়েস্ট-পেপার বাস্কেটে কিছু মালঝাল পাওয়া গেছে নাকি?'

বাসু-সাহেব পাইপটায় কামড় দিয়ে বলেন, 'কী দরকার অরূপ ওসবের মধ্যে আমাদের যাওয়ার? আমরা এসেছি পাহাড় দেখতে, বেড়াতে আর ফুর্তি করতে! কী বলেন?'

দর্শকদলের ওপর একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নেন উনি। আলি কী একটা কথা বলতে গেলেন, তারপর কাবেরীর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই চুপ করে গেলেন হঠাৎ।

বাসু-সাহেব অরূপরতনকেই পুনরায় প্রশ্ন করেন, 'একটা কথা আমাকে বলো তো অরূপ—ওই নকুল হুইয়ের কেসটায় তুমি কি ডিফেন্স কাউন্সিলার ছিলে? কেসটার খবর আর আমি কিছু নিইনি।'

'না। আমি সরকার-পক্ষে ছিলাম।'

কৌশিক অবাক হয়ে বলে, 'সরকার পক্ষে! সে কী? মার্ডার কেস-এ তো পাবলিক প্রসিকিউটার থাকেন সরকার পক্ষে—।'

'তাই থাকেন।' বুঝিয়ে বলে অরূপ—'নকুল হুইয়ের কেসটায় আমাকে সরকার-পক্ষ থেকেই পি. পি.-র সহকারী হিসেবে নিযুক্ত করা হয়।'

'তাই নাকি? এ খবর তো বলনি আমাকে?' বাসু-সাহেব বলে ওঠেন।

'বলার সুযোগ পেলাম কোথায়? আপনি তো দীর্ঘদিন না-পাত্তা!'

'তাহলে তুমিই হচ্ছ নকুল হুইয়ের দু-নম্বর শত্রু?'

অরূপ অবাক হয়ে বলে, 'তার মানে? নকুল হুই তো মরে ভূত!'

'জানি। কিন্তু শুনেছি নকুল সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত লড়েছিল। এত মামলা লড়ার খরচ সে পেল কোথায়?'

আলি বাধা দিয়ে বলে ওঠেন, 'মাপ করবেন ব্যারিস্টার-সাহেব, নকুল হুই চরিত্রটা এখনও এসট্যাবলিশড হয়নি। আমরা কাহিনির ঠিক রসাস্বাদন করতে পারছি না।'

কৌশিক এবং অরূপ ভাগাভাগি করে পূর্ব-কাহিনির মোটামুটি একটা খসড়া পেশ করে। অরূপরতন উপসংহারে বলে, 'নকুল হুই লোকটাকে আমরা ঠিকমতো চিনতে পারিনি। দীর্ঘদিন ধরে সে আগরওয়াল ইন্ডাসট্রিস-এ বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। অনেক টাকা সে তলে-তলে সরিয়েছিল—যে-কথা শেষ পর্যন্ত জেনে যেতে পারেননি ময়ূরকেতন আগরওয়াল। নকুল থাকত নিতান্ত গরিবের মতো—কিন্তু বেশ পুঁজি জমিয়ে ফেলেছিল সে। এমনকী ওর ভাইকে নাকি আমেরিকা পাঠিয়েছিল খরচ দিয়ে! ভাইটিও দাদার উপযুক্ত! মার্কিন মুলুকে নাকি নামকরা গ্যাংস্টার হয়েছিল শেষ পর্যন্ত! সেই ভাই-ই ওর মামলার খরচ দেয়। শুনেছি ফাঁসির দিন মার্কিন-মুলুক থেকে ওর সেই ভাই চলে এসেছিল ভারতবর্ষে!'

বাসু-সাহেব নির্বাপিত পাইপটি ধরাতে-ধরাতে বলেন, 'কী নাম নকুলের ভায়ের? সহদেব নাকি?'

'হ্যাঁ, আপনি কেমন করে জানলেন?'

'জানি না। আন্দাজ করছি। এপিক্যাল ইনফারেন্স—মানে মহাভারতের ওইরকমই নির্দেশ। তা সেই সহদেব বাবাজীবনের দৈহিক বর্ণনাটা কী?' কাবেরীর দিকে ফিরে যোগ করেন, 'যাকে বলে ভাইটাল স্ট্যাটিসটিক্স আর কি।'

'আমি জানি না। সহদেবকে আমি স্বচক্ষে কোনওদিন দেখিনি।' বলে অরূপ।

সুজাতা এই সময় এসে ঘোষণা করে ঃ 'ডিনার রেডি!'

সভা ভঙ্গ হল।

আহারাদি মিটতে যার নাম দশটা। ইতিমধ্যে এক মুহূর্তের জন্যও বৃষ্টি থামেনি। ক্রমাগত বর্ষণ হয়ে চলেছে। খরস্রোতা উপলবন্ধুর জলধারা পাহাড়ের মাথা থেকে সর্পিল গতিতে ছুটে আসছে সমতলের সন্ধানে। বাতি এখনও জ্বলছে। যে-কোনও মুহূর্তে ইলেকট্রিক অফ হয়ে যেতে পারে। সুজাতা

ঘরে-ঘরে মোমবাতি রেখে এসেছে। আহারাদি মিটিয়ে যে যার ঘরে চলে গেছেন। কৌশিকও শুতে যাওয়ার উপক্রম করছে, এমন সময় উপস্থিত হলেন রাতের শেষ অতিথি।

আবার একটি ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল পোর্চে।

সুজাতা আর কৌশিক দরজা খুলে বেরিয়ে এল বাইরের বারান্দায়। ট্যাক্সি থেকে নেমে এলেন একজন মাঝ-বয়েসি ভদ্রলোক। গাড়ির ভেতর বসেছিলেন আর একজন সুবেশিনী সুন্দরী মহিলা। ভদ্রলোক নমস্কারের ভঙ্গিতে হাতদুটি এক করে বললেন, 'রাতটুকুর মতো তলায় একখানা করে বালিশ আর ওপরে একখানা ছাদ মিলবে?...আই মিন, আমি আমাদের মাথার কথা বলছি।'

কৌশিক প্রতিনমস্কার করে বলে, 'এমন দুর্যোগের রাত্রে কোন গৃহস্থ "না" বলতে পারে?'

গাড়ির ভেতর এক-গা-গহনা বলে ওঠেন, 'তুমি চুপ করো দিকিনি।'

কৌশিক আঁতকে ওঠে—'আমায় বলছেন?'

ভদ্রলোক একগাল হেসে বলেন, আজ্ঞে না, আমায়। 'ডায়ালগটা ছাড়তে একটু দেরি হয়েছে ওঁর...আই মিন, আপনার ডায়ালগের আগে ওঁর ডায়ালগ।...ইয়ে, উনি মানে আমার বেটার হাফ!'

ভদ্রমহিলা সে কথায় কর্ণপাত না করে এবার সরাসরি কৌশিককে প্রশ্ন করেন, 'এটা হোটেল তো?'

কৌশিক সম্মতিসূচক গ্রীবা সঞ্চালন করে।

'তবে গৃহস্থের কথা উঠছে কেন? ডবল-বেড রুম হবে?'

কৌশিক জবাব দেওয়ার আগেই ওপরের ধাপ থেকে সুজাতা বলে, 'হবে না।'

ভদ্রমহিলা সুজাতাকে আপাদমস্তক দেখে নেন একবার। তারপর তাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে কৌশিককেই পুনরায় প্রশ্ন করেন, 'অন্তত দুটো আলাদা সিঙ্গল-সিটেড?'

কৌশিক যেন শ্রুতিধর। সুজাতার দিকে ফিরে বলে, 'অন্তত দুটো আলাদা সিঙ্গল-সিটেড?

ভদ্রমহিলা ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন। কৌশিক নিরুপায় ভঙ্গিতে ভদ্রলোককে যেন কৈফিয়ত দেয়, 'উনি হলেন গিয়ে আবার আমার বেটার-হাফ।'

ভদ্রলোক এবং ভদ্রমহিলা অগত্যা সুজাতার দিকে তাকান।

সুজাতা একইভাবে বললে, 'হবে না।'

ভদ্রলোক শ্রাগ করলেন। সুজাতা তাঁকে উদ্দেশ করে বললে, 'তবে নীচে একখানা করে বালিশ এবং ওপরে একখানা পাকা ছাদ হতে পারে—।'

ভদ্রলাক চমকে তাকান সুজাতার দিকে।

সুজাতা পাদপূরণ করে : আই মিন, আমি আপনাদের মাথার কথা বলছি।

'এনাফ!' —সোৎসাহে ভদ্রলোক মালপত্র নামাবার উদ্দেশ্যে পিছনের কেরিয়ারটা খুলে ফেললেন। কৌশিক হাত লাগায়। সুজাতাও। এক-গা-গহনা শুধু নিজের ভ্যানিটি ব্যাগটা নিয়ে নেমে আসেন। মালপত্র টানাটানিতে তাঁর কোনও ভূমিকা ছিল না।

কৌশিক কাজ করতে-করতেই বলে, 'আপাতত আসছেন কোথা থেকে?'

'Scylla আর Charybdis-এর মধ্যবিন্দু থেকে—' মাল নামাতে-নামাতে জবাব দেন ভদ্রলোক।

'আজ্ঞে?' কৌশিক ব্যাখ্যা চায়।

"হর্নস অব এ ডায়লামা" বোঝেন? তারই কেন্দ্রবিন্দু থেকে। এদিকে কার্শিয়াঙের পথে এক বিরাট খাদ, ওদিকে দার্জিলিঙের রাস্তায় এক হোঁড়ল গর্ত। মাঝখানে স্যান্ডুইচ হয়ে পড়েছিলাম। অবস্থাটা বুঝতে পারছেন?'

'জলের মতো। মহারাজ ত্রিশঙ্কুর অবস্থা আর কী। ঘুম শহরের এই হাল হয়েছে তা আমরা এখনও টের পাইনি।'

'আমরা পেয়েছি। অস্থিতে-অস্থিতে। দার্জিলিং থেকে কলকাতা যাচ্ছিলাম। বাধা পেয়ে আবার ফিরে যাচ্ছিলাম দার্জিলিঙে। দুদিকেই রোড ক্লোজ্‌ড।'

খানকয়েক দশ টাকার নোট বের করে দিলেন তিনি ট্যাক্সি-ড্রাইভারকে, বললেন, 'তোড়ানি রাখ দো ভাইসাব,—তোমার অবস্থাও তো সসেমিরা! আপাতত ঘুমের রাজ্যে কোথায় ঘুমোবে দেখ!

একগাল হেসে ড্রাইভার ব্যাক করল ট্যাক্সিটা।

দ্বিতলের ছয় নম্বর ঘরটা খুলে দিল সুজাতা। এটা সাজানো নেই, ভাড়া দেওয়ার কথা ছিল না। এক-গা-গহনা এক নজর ঘরটা দেখে নিয়ে বললেন, 'ও রাম! পরদা নেই, বেড-কভার নেই, ড্রেসিং টেবিল নেই—গুদাম ঘর নাকি?'

কৌশিক আমতা-আমতা করে বলে, 'আজ্ঞে না। এটা সবচেয়ে ভালো ডবল-বেড রুম। আকাশ ফাঁকা হলে ঘরে বসেই কাঞ্চনজঙ্ঘার ভিউ পাবেন। তবে ইয়ে...এটা ভাড়া দেওয়ার কথা ছিল না। বেডিং পাঠিয়ে দিচ্ছি; কিন্তু পরদা বা ড্রেসিং টেবিল দিতে পারব না।'

ভদ্রমহিলা আড়চোখে একবার সুজাতাকে দেখে নিয়ে বললেন, 'ভাড়া বোধ করি পুরোই নেবেন?'

ভদ্রলোক তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'আহাহা, ভাড়ার কথা কাল হবে। ইয়ে, আপনাদের কিচেন বোধ করি ক্লোজ্‌ড হয়ে গেছে?'

কৌশিক সুজাতার দিকে একটা চোরা চাহনি নিক্ষেপ করে বলে, 'আজ্ঞে হ্যাঁ। রাত তো বড় কম হয়নি। সব ছুটি হয়ে গেছে। তবে হেড-কুক বোধ হয় এখনও জেগে আছে, নয়?' শেষ প্রশ্নটা সুজাতাকে।

সুজাতা দাঁতে দাঁত চেপে বললে, 'হেড-বেয়ারাও জেগে আছে মনে হয়।'

'অ!' কৌশিক ঢোক গেলে।

ভদ্রলোক সুজাতার দিকে ফিরে বলেন, 'লোকে খেতে পেলে শুতে চায়...আই মিন, শুতে পেলে খেতে চায়। হবে কিছু? শুকনো বিস্কুট অবশ্য এখনও কিছু আছে আমাদের সঙ্গে।'

সুজাতা বললে, 'ডবল-ডিমের অমলেট আর কফি হতে পারে।'

'এনাফ! এনাফ!' ভদ্রলোক খুশিয়াল হয়ে ওঠেন।

তাঁকে আবার থামিয়ে দিয়ে গহনা-ভারাক্রান্ত বলে ওঠেন, 'তুমি থামো!' তারপর কৌশিকের দিকে ফিরে বলেন, 'তাই বলে রাতের ফুল-মিল চার্জ করবেন না তো?'

সুজাতা যাওয়ার জন্য পা বাড়িয়েছিল। দ্বারের কাছে ফিরে দাঁড়িয়ে বলে, 'ফুল-মিলই চার্জ করা হবে। অসুবিধে থাকে তো দরকার কী? শুকনো বিস্কুট চিবিয়েই রাতটা কাটিয়ে দিন না?'

ভদ্রমহিলাও ঘুরে দাঁড়ালেন। দুই বেটার-হাফ দুজনকে দেখে নিলেন। দুই ওয়ার্স-হাফ কণ্টকিত হয়ে ওঠেন। ভদ্রমহিলা কৌশিককে প্রশ্ন করেন, 'হোটেলের ম্যানেজার কে?'

'ইয়ে, আমি!' কবুল করে কৌশিক।

'তবে সব কথায় উনি অমন চ্যাটাং-চ্যাটাং করছেন কেন?'

কৌশিক আমতা-আমতা করে বলে, 'উনি যে আমার এমপ্লয়ার, হোটেলের মালিক।'

ভদ্রলোক একগাল হেসে বলেন, 'আই ফলো।' স্ত্রীকে বলেন, 'এই তুমি যেমন আমার গার্জেন আর কি!' সুজাতাকে বলেন, 'তা ফুল-মিল চার্জই দেব। কিচেন যখন বন্ধ হয়ে গেছে তখন এক্সট্রা চার্জ দিতে হবে বইকী। আমার জন্যে এক প্লেট পাঠিয়ে দিন। আর ইয়ে...ওঁর যখন এত আপত্তি, উনি না হয় বিস্কুটই খাবেন রাত্রে।'

'থামো তুমি! ডাকাতের হাতে যখন পড়েছি, তখন নাচার!' মহিলা ক্ষুব্ধা।

'আমিও তো তাই বলছি—যাহা বাহান্ন তাহা তিপ্পান্ন। ও-সু-প্লেটই পাঠিয়ে দিন। আর কড়া দু-কাপ কফি।'

'না, এক কাপ কফি, এক কাপ চা। রাত্রে কফি খেলে ওঁর ঘুম হয় না!'

নিরুপায় ভদ্রলোক শ্রাগ করলেন শুধু।

সুজাতা নেমে আসে কিচেন-ব্লকে। ভদ্রলোক পকেট থেকে নামাঙ্কিত একটা আইভরি-ফিনিশড কার্ড বের করে কৌশিককে দেন। বলেন, 'আমার নাম ডঃ এ কে. সেন, প্রাইভেট প্র্যাকটিশনার। আপনার রেজিস্টারে কাল সকালে সই করে দেব। কেমন?

কৌশিকও নেমে আসে। পায়ে-পায়ে এসে হাজির হয় কিচেন ব্লকে। সুজাতা গুম মেরে আছে। কাল থেকেই তার কী যেন হয়েছে। কৌশিক ইতস্তত করে। ঘুরঘুর করে—সান্ত্বনাবাচক কী বলবে ভেবে পায় না। সুজাতা বলে, 'ডিমটা ফাটাও!'

ফর্ক দিয়ে ডিমগুলো ফাটাতে-ফাটাতে কৌশিক একটা স্বগতোক্তি করে, 'প্রমোশনই হল আমার। স্বাধীন ব্যাবসা! বিয়ের আগে ছিলাম হুজুরাইন-এর ড্রাইভার, বিয়ের পরে হলাম হেড-বেয়ারা।'

সুজাতা হাসল না পর্যন্ত।

ওরা ভেবেছিল কর্মব্যস্ত উদ্বোধনের দিনটার বুঝি এখানেই সমাপ্তি। ভুল ভেবেছিল। হেড-কুক অমলেট নিয়ে, আর হেড-বেয়ারা কফি ও চা নিয়ে দ্বিতলে যখন পৌঁছে দিয়ে এল, ভদ্রলোক তখন সৌজন্য দেখিয়ে বললেন, 'সো সরি! আপনাদের চাকর-বেয়ারা পর্যন্ত শুয়ে পড়েছে দেখছি। খুব কষ্ট দিলাম আপনাদের।'

সুজাতা অম্লান বদনে বললে, 'সঙ্কুচিত হওয়ার কী আছে? এক্সট্রা চার্জ তো সেই জন্যেই দিচ্ছেন।'

শুভরাত্রি জানিয়ে ওরা নিজেদের ঘরের দিকে পা বাড়ায়। ঠিক তখনই ঝনঝন করে বেজে উঠল টেলিফোনটা। ঘড়ির দিকে নজর গেল স্বভাবতই। রাত পৌনে এগারোটা।

দুজনেই নেমে আসে আবার। সুজাতাই তুলে নিল টেলিফোনটা : 'হ্যালো। "রিপোজ" হোটেল।...হ্যাঁ, আছেন। কোথা থেকে বলছেন?'

শুনে নিয়ে সুজাতা কৌশিককে বলে, 'তোমাকে খুঁজছে। ও. সি. সদর, দার্জিলিং।'

'থানা! কেন, কী হল আবার?' শঙ্কিত কৌশিকের প্রশ্ন।

'কী হল তা নিজের কানে শোনো!' রিসিভারটা হস্তান্তরিত করে সুজাতা পা বাড়ায়। যায় না কিন্তু। অপেক্ষা করে।

'কৌশিক মিত্র বলছি। কে বলছেন?'

'নৃপেন ঘোষাল। ও. সি. দার্জিলিং সদর। ব্যারিস্টার-সাহেব জেগে আছেন?'

'না, ঘুমোচ্ছেন। কেন, কী হয়েছে? ডেকে দেব?'

'না, থাক। তা হলে আপনাকেই বলি। সব কথা টেলিফোনে বলা যাবে না। আকারে-ইঙ্গিতে বলব—বুঝে নেবেন। শুনুন : ব্যারিস্টার-সাহেবের কাছে শুনেছেন নিশ্চয় আজ সকালে দার্জিলিং-এর একটি হোটেলে—।'

'হ্যাঁ জানি, কাঞ্চনজঙ্ঘায়—।'

প্রায় ধমক দিয়ে ওঠে নৃপেন ঘোষাল, 'প্লিজ ডোন্ট মেনশন এনি নেম। শুনুন। আশঙ্কা করার যথেষ্ট কারণ ঘটেছে যে, সন্দেহভাজন লোকটা এখন ঘুমে আছে, রিপোজ-এর কাছাকাছি। হয়তো রিপোজ-এর ভেতরেই। দ্বিতীয়ত, যে-ঘটনা দার্জিলিং-এ ঘটেছে, অনুরূপ একটি ঘটনা হয়তো ঘুমে ঘটতে যাচ্ছে। হয়তো রিপোজ-এর ভেতরেই। ফলো?'

কৌশিক অকপটে স্বীকার করে, 'না। আমি মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'পারছেন। বিশ্বাস করতে পারছেন না, তাই নয়?—না বোঝার কী আছে?'

'এমন সব অদ্ভুত কথা অনুমান করার হেতু?'

'সে-কথা টেলিফোনে বলা যায় না। শুনুন আজ রাত্রেও আপনাদের ওখানে ওই জাতীয়

ঘটনা ঘটতে পারে। খুব সতর্ক থাকবেন, বুঝলেন?'

কৌশিক বিহ্বল হয়ে বলে, 'একটু ধরুন। আমার স্ত্রীর সঙ্গে একটু পরামর্শ করে ফের আপনার সঙ্গে কথা বলছি।'

টেলিফোনের মুখে হাত চাপা দিয়ে অত্যন্ত সংক্ষেপে কৌশিক সুজাতাকে ব্যাপারটা জানায়। সুজাতা ওর হাত থেকে টেলিফোনটা নিয়ে তার মাউথপিসে বলে, 'মিসেস মিত্র বলছি। আপনার কথা আমরা বুঝতে পেরেছি। কিন্তু বড় ইনসিকিওর্ড বোধ করছি। কিছু করা যায়?'

ও-প্রান্ত থেকে ইতস্তত করে বলে, 'মুশকিল কী জানেন, কার্ট রোড ভেঙে গেছে। ঘুম আউটপোস্টে ব্যাপারটা আমি টেলিফোনে জানিয়েছি। ওরা ওয়াচ রাখবে। আপনারা ওখান থেকে পারতপক্ষে কোনও টেলিফোন কল ইনিশিয়েট করবেন না।'

মরিয়া হয়ে সুজাতা বলে, 'থানা থেকে কেউ এসে থাকতে পারে না, আজ রাত্রে?'

'ওখানকার লোকাল ফাঁড়িতে তেমন লোক কেউ নেই। আচ্ছা এক কাজ করছি। আমার একজন অফিসারকে পাঠাচ্ছি। মিস্টার পি. কে. বাসু, তাকে চেনেন। এখান থেকে জিপে বাতাসিয়া লুপ পর্যন্ত যাবে, বাকি পথ হেঁটে যাবে। আপনারা জেগে থাকবেন, যাতে কলিং বেল বাজাতে না হয়।'

'ধন্যবাদ। কী নাম বলুন তো তাঁর?'

'সুবীর রায়।'

ক্লান্ত অবসন্ন দেহে ওরা অপেক্ষা করতে থাকে। ঘড়ির কাঁটা টিকটিক করে এগিয়ে চলেছে। আর বাইরে একটানা ধারাপাত। আর কোথাও কোনও সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। বোর্ডাররা যে-যার ঘরে ঘুমে অচেতন। শেষ বাতি নিভেছে ডাক্তার সেন-এর ঘরে। তাও আধঘণ্টা হয়ে গেল। ড্রইংরুমের ঘড়িটা সাড়ে এগারোটায় ঢং করে সাড়া দিল। সারা ঘুম ঘুমে অচেতন।

কৌশিক বললে, 'যাও তুমি শুয়ে পড়ো। আমি জেগে আছি।'

সুজাতা জবাবে বলে, 'শুয়ে লাভ নেই। ঘুম হবে না। আর আধঘণ্টার মধ্যেই এসে পড়বেন মনে হয়।'

ওর অনুমানই ঠিক। রাত বারোটায় সদর দরজার কাচের ওপর একটা টর্চের আলোর সংকেত হল। নিঃশব্দে উঠে গেল কৌশিক। পাল্লাটা একটু খুলে প্রশ্ন করল, 'কে?'

'সুবীর রায়।'

'আসুন।'

আগন্তুক ভিজে বর্ষাতিটা খুলে ফেলে। দীর্ঘ বলিষ্ঠ চেহারা। বয়েস ত্রিশের কোঠায়। হাতে একটা অ্যাটাচি। ওদের ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে বললে, 'মিস্টার আর মিসেস মিত্র নিশ্চয়?'

কৌশিক ঘাড় নেড়ে জানায় ওর অনুমান সত্য।

'কোন ঘরে আমি থাকব দেখিয়ে দিন। কাল সকালে কথা হবে।'

'কিন্তু ব্যাপারটা কী?'

'কেন, ও. সি. বলেননি টেলিফোনে?'

'বলেছেন। সংক্ষেপে। টেলিফোনে তো সব কথা বলা যায় না। এমন আশঙ্কা করার কারণটা কী?'

'সেটা কাল সকালে বলব। আপনাদের জেগে থাকার কোনও প্রয়োজন নেই। যা করার আমিই করব। কিন্তু থাকব কোন ঘরে?'

'আসুন দেখিয়ে দিচ্ছি।'

কৌশিক ওকে ঘরটা দেখিয়ে দিল। একতলার চার নম্বর ঘর। সুজাতাও এল পিছন-পিছন। ঘরে ঢুকেই সুবীর দরজাটা বন্ধ করে দেয়। অ্যাটাচি কেসটা খুলে একটা ম্যাপ বের করে। বলে,

'এটা এ-বাড়ির প্ল্যান। আমরা আছি এই ঘরে। এবার বলুন—কে কোন ঘরে আছেন?'

কৌশিক অবাক হয়ে বলে, 'আমাদের হোটেলের প্ল্যান পেলেন কোথায়?'

সুবীর বিরক্ত হয়ে বলে, 'অবান্তর কথা বলে রাত বাড়ানোর দরকার আছে কি?'

কৌশিক আর প্রশ্ন করে না। উপস্থিত আবাসিকদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেয়, আর কে কোন ঘরে আছেন তা প্ল্যানে দেখিয়ে দিতে থাকে। সুবীর প্ল্যানের গায়ে নামগুলি লিখে নিল। তারপর বললে, 'গুড নাইট!'

অসহিষ্ণুর মতো কৌশিক বলে ওঠে, 'একটা কথা অন্তত বলুন—দার্জিলিঙে যে-ঘটনা ঘটেছে, তা হঠাৎ রিপোজ-এ ঘটতে পারে এমন ধারণা কেন হল আপনাদের?'

কাগজটা ভাঁজ করে পকেটে রাখতে-রাখতে সুবীর বললে, 'বিশে ডাকাতের নাম শুনেছেন?'

'বিশে ডাকাত। না, কে সে?'

'কিংবদন্তির বিশে ডাকাত! সে নাকি ডাকাতি করতে যাওয়ার আগে নোটিশ দিয়ে আগেইভাগেই জানিয়ে দিত। রমেনবাবুকে যে মেরেছে সে ওই বিশে ডাকাত-এর উত্তরসূরি। সে-ও অমন চিঠি লিখে জানিয়ে দিয়েছে তার সেকেন্ড টার্গেট আছে ঘুম-এ, ঘুম-এর রিপোজ হোটেলে!'

সুজাতা বলে, 'কী বলছেন আপনি? বিংশ শতাব্দীর কোনও ক্রিমিনাল এমন মূর্খামি করে?'

'তাই তো দেখা যাচ্ছে! মূর্খামি নয়—লোকটা ওভার কনফিডেন্ট। ইচ্ছা করেই সে এটা করেছে। খুনির একমাত্র উদ্দেশ্য প্রতিশোধ নেওয়া। যাকে প্রাণে বধ করবে তাকে আগেভাগে জানিয়ে না দিলে যেন তার তৃপ্তি হচ্ছে না। লোকটা অত্যন্ত পাকা ক্রিমিনাল। আমেরিকায় বাফেলো অঞ্চলে গ্যাংস্টার দলে তার নাম আছে। বেঙ্গল পুলিশের এই আমাদের সে মনে করে চুনোপুঁটি।'

'লোকটা কে তা আপনারা জানতে পেরেছেন?'

'অন্তত নামটা আন্দাজ করা গেছে। তার নাম সহদেব হুই।'

সুজাতার মুখটা ছাইয়ের মতো সাদা হয়ে যায়, বলে, 'সহদেব হুই! নকুল হুইয়ের ভাই?'

'হ্যাঁ। তাই আমাদের অনুমান।'

একটু ইতস্তত করে সুজাতা বলে, 'ওর সেকেন্ড টার্গেট কে জানেন?'

সুবীর হেসে ফেলে। বলে, 'না। সহদেব আমাকে বলেনি। তবে নকুল হুইয়ের মৃত্যুর জন্যে যারা দায়ী তাদের মধ্যেই কেউ একজন হবেন। আপনারা আন্দাজ করতে পারেন?'

কৌশিক গম্ভীর হয়ে বলে, 'পারি। ব্যারিস্টার পি. কে. বাসু!'

সুবীর হেসে বললে, 'তাও ভালো। আপনাদের মুখ দেখে আমি কিন্তু ভেবেছিলাম বুঝি আপনাদের দুজনের কেউ।'

॥ পাঁচ ॥

৩ অক্টোবর। বৃহস্পতিবার। বৃষ্টির বিরাম নেই। ক্রমাগত বর্ষণে চরাচর বিলুপ্ত। এদিকে আজ সকাল থেকে 'রিপোজ' রীতিমতো হোটেলে রূপান্তরিত হয়েছে। সকালবেলা আবাসিকেরা যখন প্রাতঃরাশ-টেবিল-এ এসে বসলেন তখন নবাগতদের সঙ্গে তাঁদের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার কথা মনে হল না কৌশিকের। কালীপদ খাড়া হয়েছে। জ্বর নেই তার। ভোরবেলা থেকে সুজাতার সঙ্গে হাতে-হাতে কাজ করছে। বৃষ্টি সত্ত্বেও কাঞ্চী এসেছে ভিজতে-ভিজতে। বর্ষাবিধ্বস্ত বস্তির একটি মর্মন্তুদ বর্ণনা সে সঙ্গে করে নিয়ে এসে ছিল, কিন্তু সুস্থির হয়ে শোনবার অবকাশ ছিল না সুজাতার। সে ক্রমাগত টোস্ট-পোচ-অমলেট আর হাফ-বয়েল বানিয়ে চলেছে ফরমায়েশ মতো। কাঞ্চী আর কালীপদ

পর্যায়ক্রমে পৌঁছে দিয়ে আসছে চা আর কফি। হোটেল জমে উঠেছে।

আবাসিকরা দেখলেন দুটি নতুন মুখ। ডাঃ সেন আর সুবীর রায়। মিসেস সেনকে অবশ্য দেখতে পেলেন না ওঁরা। তিনি তাঁর দ্বিতলের কামরা থেকে নামলেন না আদৌ। তাঁর ব্রেকফাস্ট কাঞ্চী পৌঁছে দিয়ে এল দ্বিতলের ছয় নম্বর ঘরে। বোধ করি এই সাতসকালে তাঁর যথোপযুক্ত প্রসাধন সারা হয়নি—তাই তিনি এই শম্বুকবৃত্তি অবলম্বন করলেন।

সকালে উঠে প্রথম সুযোগেই কৌশিক বাসু-সাহেবের সঙ্গে দেখা করে। গতকাল রাত্রে যে-তিনজন নবীন অতিথির আবির্ভাব ঘটেছে, তাদের সম্বন্ধে যাবতীয় সংবাদ দাখিল করে। বাসু-সাহেব শুনে বলেছিলেন : 'হ্যাঁ, সুবীর রায় নামটা আমার জানা। তাকে এ ঘরে নিয়ে এসো, আর অরূপকেও খবর দাও—সুজাতা বোধ করি রান্নাঘর ছেড়ে আসতে পারবে না, নয়?'

কৌশিক বলেছিল, 'এখন তার পক্ষে আসা সম্ভব নয়। তা হোক, আমিই তো রইলাম। এখানে যা কিছু আলোচনা হবে তা আমি তাকে জানিয়ে দেব।'

মিনিট দশেক পরে বাসু-সাহেবের ঘরে একটি গোপন বৈঠক বসল। অরূপরতন আর সুবীর রায় যোগ দিল তাতে। কৌশিক সুবীরকে পরিচয় করিয়ে দিল ওঁদের সঙ্গে। বেচারি স্থির হয়ে বসতে পারছিল না আলোচনা সভায়। তাকে বারে-বারে দেখে আসতে হচ্ছিল ঘরের চারপাশ। কেউ আড়ি পেতে শুনছে কি না। না, শুনছে না। ডাঃ সেন তাঁর উত্তমার্ধের সঙ্গে তাস খেলছেন নিজের ঘরে; আলি-সাহেব নিজের ঘরে একটি ইংরেজি ডিটেকটিভ উপন্যাসে বুঁদ। কাবেরী আর অজয়বাবু আছেন দোতলার উত্তরের বারান্দায়। কাবেরী বসে আছে একটি টুলে, উদাস ভঙ্গিতে আকাশপানে তাকিয়ে। অজয়বাবু ক্রেয়নে তাঁর একটি স্কেচ করছেন। দুজনে ভাব হয়ে গেছে বেশ।—সুন্দরী তন্বী কাবেরী দত্তগুপ্তা এবং বৃদ্ধ চিত্রকর অজয় চট্টোপাধ্যায়ের মধ্যে।

বাসু-সাহেব বললেন, 'মিস্টার রায়, আপনার কথা নৃপেন ঘোষাল আমাকে বলেছিল—।'

বাধা দিয়ে সুবীর বললে, 'আপনি স্যার আমাকে "তুমিই" বলবেন—।'

'তা না হয় বলব, কিন্তু—।'

কৌশিক আবার উঠে পড়ে। বলে, 'আমি বরং বাইরে গিয়ে বসি—।'

তাকে বাধা দিয়ে রাণী বলেন, 'না। তুমি থাক কৌশিক। আমিই বরং ব্যূহমুখে জয়দ্রথের ভূমিকায় থাকি। তেমন-তেমন কাউকে আসতে দেখলেই আমি গান ধরব—।'

হুইল-চেয়ারে পাক দিয়ে রাণী দেবী বের হয়ে গেলেন ঘর ছেড়ে বারান্দায়। ড্রইংরুমে যেখানে পিয়ানোটা বসানো আছে তার পাশের দরজার কাছে থামলেন তিনি—যাতে দুদিকেই নজর রাখা যায়।

বাসু-সাহেব বললেন, 'রিপোজ-এর বাসিন্দারা এখন স্পষ্টত দুটি দলে বিভক্ত। প্রথম দলে আছেন একজন ভালনারেবল। তিনি যে কে তা আমরা ঠিক জানি না, তবে সে দলের সভ্যসংখ্যা পাঁচ—রাণী, সুজাতা, কৌশিক, অরূপ আর আমি। দ্বিতীয় দলের মধ্যে আছেন একজন সুচতুর দক্ষ ক্রিমিনাল—তার রেঞ্জ হচ্ছে আলি, কাবেরী, ডাঃ অ্যান্ড মিসেস সেন এবং অজয় চট্টোপাধ্যায়।'

'এঁরা সবাই?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করে কৌশিক।

'সবাই নয়, এঁদের মধ্যে যে-কোনও একজন অথবা দুজন। নৃপেন এবং সুবীরের ধারণা—এবং আমিও তাদের সঙ্গে একমত—রমেন গুহর মৃত্যুর পিছনে আছে সহদেব হুই-এর হাত। প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ। ইব্রাহিম যদি স্বয়ং সহদেব হয় তবে সন্দেহ করতে হবে আলি এবং ডক্টর সেনকে। আর সহদেব যদি কোনও এজেন্ট লাগিয়ে থাকে তবে অজয়বাবুকেও নেড়েচেড়ে দেখতে হবে। অপরপক্ষে মিস ডিক্রুজা যদি রমেন গুহর মৃত্যুর সঙ্গে জড়িত থাকে তবে কাবেরী আর মিসেস সেনকেও সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া চলে না।'

অরূপ প্রশ্ন করে, 'প্রথমে বলুন তো—আপনারা কেন মনে করছেন রমেন গুহর মৃত্যুতেই

ব্যাপারটার যবনিকাপাত ঘটেনি? রিপোজ-এ আমাদের মধ্যে ওই ঘটনায় পুনরাভিনয় হওয়ার কথা আশঙ্কা করা হচ্ছে কেন?'

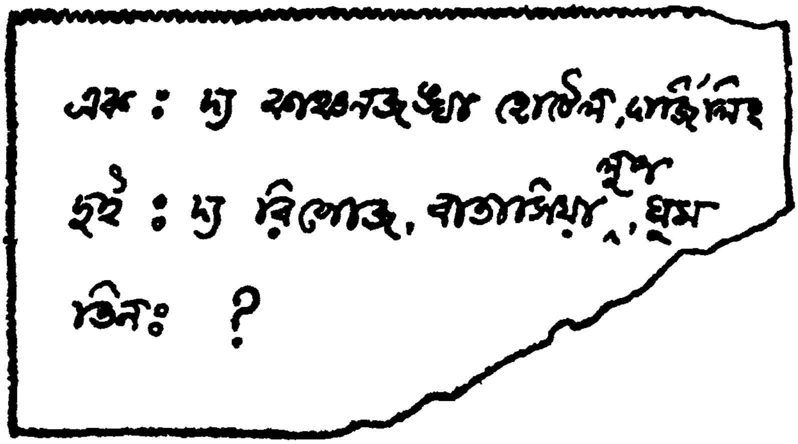
বাসু-সাহেব বললেন, 'কালকে সে-কথার কিছুটা ইঙ্গিত আমি দিয়েছি। ইব্রাহিমের পরিত্যক্ত ঘরটা সার্চ করতে গিয়ে নৃপেন একখণ্ড কাগজ পায় ওই ঘরের ময়লা-ফেলা কাগজের ঝুড়ি থেকে। কাগজটা আমার কাছে নেই—নৃপেন নিয়ে গেছে, না হলে তোমাদের দেখাতাম—।'

বাধা দিয়ে সুবীর বলে, 'কাগজখানা আমার কাছে আছে।'

'তোমার কাছে? নৃপেন দিয়েছে?'

'হ্যাঁ, এই দেখুন।'

অ্যাটাচি কেস খুলে কাগজখানা সে বাসু-সাহেবকে দেয়। সবাই ঝুঁকে পড়ে। হাতে-হাতে কাগজখানা ঘোরে। অবশেষে সেটি বাসু-সাহেবের হাতে আসে। তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কাগজটা পরীক্ষা করেন। আলোর সামনে সেটা ধরেন, যেন একশো টাকার নোট জাল কি না দেখছেন। কৌশিক লক্ষ করে দেখল, কাগজটা দলামচা করা হয়েছিল। কোঁচকানোর দাগ আছে। তার ওপরপ্রান্তে পারফোরেশনের চিহ্ন—যেন ফুটো-ফুটো করা নোটবইয়ের একটি ছেঁড়া পাতা। একটি প্রান্ত মসৃণ আর দুটি প্রান্তে যেন তাড়াতাড়ি ছিঁড়ে নেওয়ার চিহ্ন। কাগজটায় কালো কালিতে লেখা :



সুবীর বললে, 'বেশ বোঝা যাচ্ছে—রিপোজ-এ দ্বিতীয়বার হত্যা করলেও আততায়ীর প্রতিহিংসাপরায়ণতা নিবৃত্ত হবে না। সে তিন নম্বর হত্যার কথাও চিন্তা করছে!'

কৌশিক বললে, 'নকুল হুইয়ের মৃত্যুর প্রতিশোধের জন্যে যদি এ পরিকল্পনা করা হয়ে থাকে, তবে আমার মনে হয় আততায়ীর দু-নম্বর টার্গেট হচ্ছেন বাসু-সাহেব, তাই নয়?'

অরূপ বললে, 'তুমি আমিও হতে পারি। সুজাতা দেবীই বা কেন বাদ যাবেন? আমরা সকলেই নকুল হুইয়ের ফাঁসির জন্যে আংশিকভাবে দায়ী।'

'সে-কথা ঠিক।' কৌশিক মেনে নেয়।

বাসু-সাহেব চোখ বুজে আপনমনে পাইপ খাচ্ছিলেন। সুবীব বলে, 'আপনি স্যার কিছু ভাবছেন মনে হচ্ছে?'

বাসু-সাহেব চোখ মেলে তাকান। বিচিত্র হাসেন। বলেন, 'ভাবছি? হ্যাঁ, ভাবছি বইকী। ভাবনার কি অন্ত আছে? কিন্তু আজ এই পর্যন্তই—' উঠে দাঁড়ান তিনি, বলেন, 'দীর্ঘ আলোচনার কিছু নেই, এভাবে আমরা রুদ্ধদ্বার কক্ষে আলোচনা চালালে ও-পক্ষ সজাগ হয়ে যাবে। সো উই ডিজলভ।'

বেশ বোঝা গেল সকলেই এ সিদ্ধান্তে মর্মাহত। এত সংক্ষিপ্ত অধিবেশন হবে তা কেউ ভাবেনি। কিন্তু রায় দিয়ে বাসু-সাহেব উঠে পড়েছিলেন। গুটিগুটি বেরিয়ে এসে বসলেন বারান্দার একান্তে একটি ইজি-চেয়ারে। কৌশিক, অরূপ আর সুবীর একে-একে চলে গেল। রাণী দেবী তাঁর চাকা দেওয়া চেয়ারে পাক মেরে ঘনিয়ে এলেন বাসু-সাহেবের পাশে। ধ্যানস্থ বাসু-সাহেব বোধ করি তা টের পাননি। তিনি চমকে উঠলেন রাণী দেবীর প্রশ্নে : কী হল? এরই মধ্যে কনফারেন্স শেষ?'

'উঁ! হুঁ।' অন্যমনস্কের মতো জবাব দিলেন বাসু। মাঝে-মাঝে পাইপে টান দিচ্ছেন। কুণ্ডলী পাকিয়ে যে ধোঁয়াটা উঠছে তারই দিকে তাকিয়ে আছেন একদৃষ্টে।'

'কী ভাবছ বলো তো?' আবার প্রশ্ন করেন রাণী বাসু।

'ভাবছি? ওই রমেন গুহর মৃত্যু-রহস্যের কথাই ভাবছি। আর কী ভাবব?'

সহানুভূতির সুরে রাণী বলেন, 'কে খুন করেছে তার কোনও কূলকিনারাই করতে পারছ না, নয়?'

বিচিত্র হাসলেন বাসু-সাহেব। অনুচ্চকণ্ঠে বললেন, 'সেইটেই তো ট্র্যাজেডি রাণু। লোকটাকে আমি চিনতে পেরেছি। কে খুন করেছে, কেন করেছে, এখানেই বা কাকে খুন করতে চাইছে তা বোধহয় সব ঠিকমতোই জানতে পেরেছি আমি। অথচ আমার হাত-পা বাঁধা। সব জেনেও কিছু করতে পারছি না। ট্র্যাজেডিটা বুঝতে পারছ?'

বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন রাণী দেবী। স্তব্ধ বিস্ময়ে তিনি তাকিয়ে থাকেন তাঁর অদ্ভুত প্রতিভা স্বামীর দিকে। যাঁকে তিনি অত্যন্ত নিবিড় ভাবে চেনেন—অথচ সে লোকটা তাঁর সম্পূর্ণ অপরিচিত। তারপর যেন সংবিৎ ফিরে পেয়ে বলেন, 'খুনি কে তা তুমি জানো?'

মুখটা সূচলো করলেন বাসু-সাহেব। সম্মতি-সূচক গ্রীবা সঞ্চালন করলেন শুধু।

'সে এখানে আছে? এই রিপোজ-এ?'

একইরকম ভঙ্গি করেন উনি।

'আমাকে বলতে পারো না?'

এবার দুদিকে মাথা নাড়েন উনি।

'আমাকে না পারো, অন্তত সুবীরকে বলো, 'নৃপেনকে কিংবা বিপুলকে?'

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল বাসু-সাহেবের। বললেন, 'উপায় নেই রাণু। আমার হাতে যা এভিডেন্স আছে তাতে কনভিকশান হবে না। এখন কেউ আমার কথা বিশ্বাসই করবে না—বলবে পি. কে. বাসু একটা বদ্ধ পাগল। লোকটাকে হাতেনাতে ধরতে হবে—তার দ্বিতীয় খুনের প্রচেষ্টার পূর্বমুহূর্তে।'

'ব্যাপারটা রিস্কি হয়ে যাবে না?'

'তা কিছুটা যাবে। কিন্তু উপায় কী বলো? ওকে গিলটি বলে প্রমাণ করব কীভাবে? ওর দাড়ি, চশমা নেই—বীরবাহাদুর আইডেন্টিফিকেশান প্যারেডে ওকে চিনতে পারবে না। তা ছাড়া বীরবাহাদুর অথবা মহেন্দ্র ওকে দেখেছে মাত্র কয়েক মিনিটের জন্যে। একমাত্র যদি মিস ডিক্রুজাকে খুঁজে বের করতে পারি তবে হতে পারে। সে সারাদিন ইব্রাহিমকে দেখেছে। বাট হু নোজ—ডিক্রুজা ওর পাপের সাথী হতেও পারে, আবার নাও পারে।'

রাণী দেবী ঝুঁকে বললেন, 'কী ক্লু পেয়েছ তুমি?'

'নিজেই গোয়েন্দাগিরি করতে চাও? উঁ?'

'বলো না?'

'সুবীরের হাতে ওই "এক : দুই : তিন" লেখা কাগজখানায়। প্রথমবার আমি ভালো করে ওটা পরীক্ষা করিনি। এবার তীক্ষ্ণভাবে পরীক্ষা করেছি। ওর ভেতরেই সহদেব ভুল করে রেখে গেছে তার আত্মপরিচয়। বেচারি সহদেব হুই!'

'তবে তাকে ধরিয়ে দিচ্ছ না কেন?'

'ওই যে বললাম—যে-সূক্ষ্ম যুক্তির বিচারে আমি ইব্রাহিমকে শনাক্ত করছি, তাতে খুনি-আসামির কনভিকশান হয় না। আমাকে জানতে হবে মিস ডিক্রুজা ওর পার্টনার-ইন-ক্রাইম ছিল কি না। একমাত্র সেই পারবে ইব্রাহিমকে শনাক্ত করতে। সহদেবকে আমি খুঁজে পেয়েছি, এখন খুঁজছি মিস ডিক্রুজাকে—এই বিপোজ হোটেলেই।'

'হোটেল কাঞ্চনজঙ্ঘা থেকে বাহাদুর আর মহেন্দ্রকে আনানো যায় না?'

এ-প্রশ্নের জবাব দেওয়ার আগেই বাসু-সাহেব দেখলেন কৌশিক এগিয়ে আসছে ওঁদের দিকে।

'কী ব্যাপার? এমন উদভ্রান্ত দেখাচ্ছে কেন হে তোমাকে?'

'কেলেঙ্কারিয়াস কাণ্ড স্যার। এক নম্বর, টেলিফোন লাইনটা সকাল থেকে ডেড হয়ে গেছে। দু নম্বর : কার্ট রোডের সঙ্গে এ বাড়িটার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে— প্রকাণ্ড একটা ধস নেমেছে। আর তিন নম্বর—সুজাতা নোটিশ দিয়েছে তার ভাঁড়ারে ডিম মাংস রুটি মাখন সব বাড়ন্ত।'

বাসু সাহেব রাণী দেবীর দিকে ফিরে বলেন, 'এই নাও তোমার প্রশ্নের জবাব।'

'কী প্রশ্ন?' জানতে চায় কৌশিক।

'উনি দার্জিলিং থেকে আজ আবার দুজনকে নিমন্ত্রণ করে আনাতে চাইছিলেন। সে যাক, মন খারাপ কোরো না। যেমন করে হোক এ ক'দিন চালিয়ে নিতে হবে আমাদের। দু-তিন দিনের মধ্যেই সভ্যজগতের সঙ্গে নিশ্চয় যোগাযোগ করা যাবে।'

'রেডিওর খবর তিস্তা ব্রিজ ভেসে গেছে। মহানন্দা, তোরশা, টাঙ্গন, পুনর্ভবা, আত্রেয়ী সবাই [illegible] ফেঁপে উঠেছে। জলপাইগুড়ি, কুচবিহার মালদা—এক কথায় গোটা উত্তরবঙ্গে প্রচণ্ড বন্যা হয়েছে। হাজার হাজার মানুষ ভেসে গেছে—এত বড় বন্যা নাকি উত্তরবঙ্গে কখনও হয়নি।'

বেলা নটা নাগাদ বৃষ্টি মাথায় করেই কৌশিক বের হয়ে পড়ল। রেনকোট চড়িয়ে। গাড়ি চলবে না, পায়ে হেঁটে। স্থানীয় বাজারে কিছু পাওয়া যায় কি না খোঁজ নিতে।

অজয় চাটুজ্জে কাবেরীর স্কেচটা শেষ করে এনেছেন।

আলিও আগাথা ক্রিস্টি শেষ করে আনলেন প্রায়।

ছ'নম্বর ঘরে মিসেস সেন ক্ষুব্ধ। তৃতীয় এক কাপ চা চেয়ে তিনি প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন। কিচেন ব্লক থেকে কাঞ্চী এসে জানিয়ে গেছে, এখন আর চা পাঠানো সম্ভবপর নয়। প্রাতঃরাশের সময়সীমা অতিক্রান্ত। কিচেন এখন লাঞ্চের ব্যবস্থায় ব্যস্ত।

বাসু সাহেব গুটিগুটি এসে হাজির হলেন রান্নাঘরে : কী সুজাতা? আজ কী রান্না হচ্ছে?

'মাংস যা আছে এ বেলা হয়ে যাবে। মাংসই করছি। আলুসেদ্ধ এই নামল।'

হঠাৎ ওর কাছে ঘনিয়ে এসে বাসু সাহেব বললেন, 'একটা কাজ করো তো সুজাতা। চট করে একবার দোতলার সাত নম্বরে চলে যাও। কাবেরীর ঘরে। কাবেরী এখন ঘরে নেই কিন্তু ওর ঘর তালাবন্ধও নেই। কাবেরী উত্তরের বারান্দায় বসে ছবি আঁকাচ্ছে। ওর ঘরে গিয়ে চট করে ওর অ্যাশট্রেটা নিয়ে এসো তো—।'

'অ্যাশট্রে! অ্যাশট্রে কী হবে?'

তুমি তো আগে এমন ছিলে না সুজাতা। "কেন" এ প্রশ্ন তো আগে করতে না।'

'কিন্তু এদিকে আমার তরকারিটা--।'

'ওটা আমি দেখছি—।'

ওর হাত থেকে খুন্তিটা নিয়ে বাসু-সাহেব উনুনের ওপর বসানো তরকারির ডেকচিটায় মনোনিবেশ করেন।

খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে সুজাতা ওঁর অনভ্যস্ত হাতে খুন্তি নাড়া দেখে।

'হাসছ কেন?' রোষকষায়িত দৃষ্টিতে বাসু-সাহেব জানতে চান।

হাসি থামিয়ে সুজাতা গম্ভীর হয়ে বলে, 'অবজেকশান ইয়োর অনার। ইটস ইনকম্পিটেন্ট, ইররেলিভ্যান্ট অ্যান্ড ইমমেটিরিয়্যাল।'

বাসু-সাহেব হেসে ফেলেন। বলেন, 'অবজেকশান ওভাররুলড! যাও, ওপরে যাও।'

সুজাতা দু-মিনিটের ভেতরেই অ্যাশট্রেটা নিয়ে ফিরে এল। বাসু-সাহেব তার ভেতর থেকে গুটিতিনেক সিগারেটের স্টাম্প উদ্ধার করে বললেন, 'আশ্চর্য! কাল সন্ধ্যা পর্যন্ত এটা শূন্যগর্ভ ছিল। যাও, এটা রেখে দিয়ে এসো আবার।'

আরও মিনিট পনেরো পরে। বাসু-সাহেবের প্রস্থানের পরে আলি-সাহেব রান্নাঘরে এসে হাজির। প্রবেশপথে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আসতে পারি? অনধিকার প্রবেশ করছি না তো?'

সুজাতা চমকে ওঠে ঃ আসুন, আসুন। কী ব্যাপার? একেবারে হেঁসেলে?

'আপনাকে প্রথম সাক্ষাতেই বলেছিলাম মহিলাদের হেঁসেল সম্বন্ধে আমার কিছুটা পারদর্শিতা আছে।'

'তা বলেছিলেন। ধন্যবাদ। আমার সাহায্যের কোনও দরকার হবে না।'

আলি একটা টুল টেনে নিয়ে বসে পড়েন। বলেন, 'চার নম্বরে ওই যে লম্বামতন ভদ্রলোক এসে উঠেছেন, ওঁর নামটা কী বলুন তো?'

'মিস্টার রায়।'

'কী রায়?'

সুজাতা হেসে বললে, 'তা হলে রেজিস্টার দেখতে হবে। পুরো নামটা মনে নেই।'

'কখন এলেন উনি?'

'হঠাৎ ওঁর বিষয়ে এত কৌতূহলী হয়ে পড়লেন কেন?' সুজাতা প্রতি-প্রশ্ন করে।

একটু থতমত খেয়ে আলি বলেন, 'না-না, শুধু ওঁর সম্বন্ধে নয়, ছ'নম্বর ঘরের দম্পতির বিষয়েও আমার কৌতূহল আছে।'

'তা আমার কাছে কেন? ছ'নম্বরে গিয়ে আলাপ জমালেই পাবেন।'

আলি সে-কথার জবাব দেন না। আলুর ডেকচিটা টেনে নেন। তাতে ছিল সেদ্ধ করা আলু। আপনমনে আলুর খোসা ছাড়াতে থাকেন। আড়চোখে সুজাতা একবার তাঁকে দেখে নিল। বোঝা গেল যে-কোনও কারণেই হোক, আলি ভাব জমাতে চান। সুজাতার তাতে আপত্তি নেই। এবার সে নিজে থেকেই বলে ওঠে, মিস্টার আলি, এবার বলুন তো, আপনি প্রথম সাক্ষাতেই কেমন করে বুঝতে পেরেছিলেন যে বাড়িতে আমি একেবারে একা আছি? চাকরটা পর্যন্ত নেই?'

আলি-সাহেব জবাব দিল না। আপনমনে আলুর খোসা ছাড়াতে থাকেন। সুজাতা একটা প্লেটে কিছু তরকারি তুলে ওর দিকে বাড়িয়ে ধরে বলে, দেখুন তো, নুন-ঝাল ঠিক আছে কি না?

প্লেটে ফুঁ দিতে-দিতে আলি বললেন, 'একসঙ্গে এত লোকের রান্নায় আন্দাজ পাচ্ছেন না, তাই নয়? ছিল দুজনের ছোট্ট সংসার—হয়ে গেল রাবণের গুষ্টি।'

'রাবণের গুষ্টি! আপনি হিন্দুদের এপিক পড়েছেন দেখছি।'

'তা পড়েছি। ওই রামায়ণ না মহাভারতেই আছে না আর একটা কথা—। শত্রু এবং স্ত্রীর কাছে মিথ্যাভাষণে পাপ নেই।'

'হঠাৎ এ-কথা কেন?'

তরকারিটা ইতিমধ্যে ঠান্ডা হয়েছে। আলি পরখ করে বললেন, 'নুন-ঝাল ঠিক আছে।'

'তা তো আছে—কিন্তু হঠাৎ ও-কথা কেন বললেন?'

আলি হেসে বললেন, 'দেখুন, আমি ব্যাচিলার মানুষ। দাম্পত্য জীবনের খুঁটিনাটি অত জানি না। আচ্ছা, স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের কাছে হামেশাই মিছে কথা বলে, তাই নয়?'

'কেন ও-কথা বলছেন তাই আগে বলুন?'

'কতদিন বিয়ে হয়েছে আপনাদের?'

সুজাতা রাগ দেখিয়ে বললে, 'বলব না।'

আলি হাসেন। বলেন, নেহাত পীড়াপীড়ি করছেন তাই বলছি—পরশু রাতে আপনাদের কথাবার্তা শুনে আমার মনে হয়েছিল যে, বিকেলের দিকে দার্জিলিং যাওয়ার একটা প্রোগ্রাম আপনাদের করা ছিল, তাই নয়? মিস্টার মিত্র বললেন যে, কাঞ্চন ডেয়ারিতে গিয়ে উনি আটকে পড়েছিলেন। কথাটা উনি সত্যি বলেননি। পরশু সকালে উনি দার্জিলিঙেই গিয়েছিলেন।'

'আপনি কেমন করে জানলেন?'

'পরশু আমি ছিলাম দার্জিলিঙে। বেলা একটার সময় একটা চাইনিজ রেস্তোরাঁয় বসে লাঞ্চ সারছিলাম। আমার থেকে তিন টেবিল দূরে মিস্টার মিত্র দুপুরে ওখানে লাঞ্চ করেন। উনি নিশ্চয় আমাকে লক্ষ করেননি—।'

'দার্জিলিং-এ চাইনিজ রেস্তোরাঁ? আছে নাকি?'

'আছে। গ্রেনারির ঠিক উলটোদিকে। ''শাংগ্রি-লা'' তার নাম।'

'ওখানে বসে সে খাচ্ছিল?'

বিচিত্র হাসলেন আলি। বললেন, 'আপনি রাগ না করেন তো আরও কিছু নিবেদন করি। উনি একা খাচ্ছিলেন না—ওঁকে সঙ্গদান করছিলেন একজন বাঙালি ভদ্রমহিলা। বিবাহিতা, বয়স বছর ত্রিশ—আর ভয়ে বলব, না নির্ভয়ে বলব? ভদ্রমহিলা রীতিমতো সুন্দরী।'

সুজাতা আত্মসংবরণ করে কৃত্রিম হাসিতে ভেঙে পড়ে। বলে, 'ভয়ে বলতে যাবেন কোন দুঃখে? নির্ভয়েই বলুন। আপনি বোধ হয় ভুলে গেছেন মিস্টার আলি, আমবা বিংশ শতাব্দীর শেষপাদে বাস করছি। আমাব স্বামী কোনও সুন্দরী মহিলাব সঙ্গে লাঞ্চ সেবেছেন শুনলে আমি মূর্ছা যাব না।'

আলি একটা মোগলাই কুর্নিশ ঝেড়ে বলেন, 'বেগমসাহেবা মহানুভব। বিংশ শতাব্দীর শেষপাদের ঔদার্য সম্বন্ধে আমার ধারণা সীমিত। আচ্ছা ধরুন, যদি সংবাদ পান লাঞ্চান্তে আপনার কর্তা সেই সুন্দরী মহিলাটিকে একটা ''সোনার কাঁটা'' উপহার দিচ্ছেন?'

'সোনার কাঁটা? সেটা কী জাতীয় বস্তু?'

'ও-বস্তুটা আমিও এর আগে কখনও দেখিনি। একটা অলংকার। মেয়েরা খোঁপায় কাঁটা গোঁজে—লোহার, অ্যালুমিনিয়ামের, প্লাস্টিকের। কবরী বন্ধন যাতে শিথিল না হয়ে যায় তাই তার ব্যবহার—এই যেমন আপনি এখন কাঁটা গুঁজেছেন আপনার খোঁপায়। সোনার কাঁটাব মূল্য কবরীবন্ধনে নয়—।'

'কৃষ্ণা-কবরী-শোভা-বর্ধনে।' প্রশ্ন করে সুজাতা।

'অথবা রক্ত-কবরী-সোহাগ-বর্ধনে।' জবাব দেন আলি।

'সংবাদটা বিচিত্র!'

'সন্দেশটা বিস্বাদ না হলেই হল। ভরি তিনেক ওজনের অমন একটা সোনার কাঁটা মিস্টার মিত্রের পকেট থেকে যাত্রা শুরু করে তাঁর মিত্রাণীর খোঁপা বিদ্ধ করলে বেদনাটা অন্যত্র অনুভূত হওয়ার কারণ নেই! কী বলেন? আফটার অল আমরা বিংশ শতাব্দীর শেষপাদে বাস করছি!'

সুজাতা এবারও হেসে বলে, 'মিস্টার আলি, রামায়ণ তো আপনার পড়া। নিশ্চয় জানেন—রাবণের গুষ্টি শেষ হওয়ার পর বিভীষণ সিংহাসনে বসে—কিন্তু কোনও হিন্দুই সত্যবাদী বিভীষণকে শ্রদ্ধা করে না—তার পরিচয় ''ঘরভেদী বিভীষণ''।'

আলি এ জবাবের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। সামলে নিয়ে কী একটা কথা বলতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই দ্বারপথে কে যেন বলে ওঠে, 'এক্সকিউর্জ মি। ভেতরে আসতে পারি?'

'কে? ডক্টর সেন। আসুন। এখানে কী মনে করে?'

হাসি-হাসি মুখে ডঃ সেন ঢুকে পড়েন বান্নাঘরে। অনুনযেব ভঙ্গিতে সুজাতাকে বলেন, 'এক কাপ চা কি কিছুতেই হতে পাবে না, মিসেস মিত্র? আমাব বেটাব-হাফ, মানে ।'

স্ত্রৈণ ভদ্রলোকেব অবস্থা দেখে সুজাতাব করুণা হয। আলি এগিয়ে এসে বলেন, 'আপনাব সঙ্গে আমাব আলাপ হযনি। আমাব নাম এন আলি—আমি আছি তিন নম্ববে।'

'সো গ্ল্যাড টু মিট যু। একা আছেন, না সস্ত্রীক?'

'আজ্ঞে না। স্ত্রীব বালাই নেই। আমি কনফার্মড ব্যাচিলাব।'

'শুনে সুখী হলাম। বেঁচে গেছেন মশাই।'

আলি বলেন, 'কেন? আপনি যে মবে আছেন তা তো মনে হচ্ছে না। "কপোত-কপোতী যথা উচ্চ বৃক্ষ-চূড়ে" সকাল থেকে তো দিব্যি তাস পিটছেন।'

'আবে তাতেই তো হযেছে বখেড়া। এ পযন্ত আমাব বেটাব হাফ সাড়ে বাহান্ন টাকা হেবেছেন। মেজাজ খেপচুবিযাস। তাতেই তো চাযেব সন্ধানে এসেছি।'

আলি অবাক হযে বলেন, 'সাড়ে বাহান্ন টাকা। আপনি কি স্ত্রীব সঙ্গে স্টেকে তাস খেলছেন?'

'আলবত। স্টেক ছাড়া "ফিশ" খেলা যায নাকি।'

'তাই বলে স্ত্রীব সঙ্গে?'

'কেন নয? ওব বোজগাব আব আমাব বোজগাব আলাদা। জযেন্ট অ্যাকাউন্ট নেই। এমন কী I.TO-ফাইল নাম্বাব পর্যন্ত পৃথক।'

'এমনও হয নাকি?'

'আজ্ঞে! বে-থা তো কবেননি— কী ক'বে জানবেন।' অম্লান বদনে ডাক্তাব সাহেব ডেকচি থেকে একটি সেদ্ধ আলু নিয়ে মুখে পুবলেন।

সুজাতা হেসে বললে, 'ঠিক আছে ডাক্তাব সাহেব, আমি চা পাঠিয়ে দিচ্ছি। এক কাপ না দু-কাপ?'

'বানাতেই যখন হচ্ছে তখন আব এক কাপ কেন? যাহা সাড়ে বাহান্ন তাহা পঁযসট্টি। দু-কাপই হোক।' দ্বিতীয একটি বড় মাপেব আলু তুলে নিযে তাতে কামড় বসান ডাক্তাব সেন। বাঁ-হাতে এক চিমটে নুনও তুলে নেন।

সুজাতা বললে, 'আচ্ছা আপনি যান, আমি দু কাপ চা পাঠিযে দিচ্ছি।'

'থ্যাঙ্কু। থ্যাঙ্কু। না, না, কষ্ট কবে আব পাঠিয়ে দিতে হবে না। আমি অপেক্ষা কবছি। নিজেই নিযে যাব।'

সুজাতা হাসতে-হাসতে বলে, 'ততক্ষণে বোধ হয আমাব আলু সেদ্ধব ডেকচি খালি হযে যাবে।'

'আলু সেদ্ধ। ও আযাম সবি।' এঁটো আলুটা উনি ফেবত দিতে উদ্যত হন।

'এ কী কবছেন। ওটা আপনাব এঁটো।'

'এঁটো। ও আযাম সবি।' আলুটা কোথায বাখবেন উনি ভেবে পান না।

'এ কী! তুমি এখানে বসে আলু সেদ্ধ খাচ্ছ।' প্রবেশ কবেন মিসেস সেন।

'আমি! না, মানে, ইযে- ' হঠাৎ বাকি আলুটা মুখে পুবে দিয়ে ডাক্তাব সাহেব আলি সাহেবেব দিকে ফিবে বলতে চাইলেন, 'আমাব বেটাব হাফ', কিন্তু মুখে গবম আলু সেদ্ধ থাকায কথাটা বোঝা গেল না।

'চলে এসো ওপবে।' বীতিমতো ধমকেব সুবে ডাকেন মিসেস সেন।

'না, মানে তোমাব চা-টা—।'

'থাক। চা আব লাগবে না।'

সুজাতাব গবম জল তৈবিই ছিল। ইতিমধ্যে সে চা ভেড়েছে পট এ। বললে, 'চা যে হযে

গেছে ইতিমধ্যে।'

রুখে ওঠেন মিসেস সেন, 'বলছি লাগবে না! এক ঘণ্টা আগে চা চেয়েছি, এতক্ষণে শোনাচ্ছেন--হয়ে গেছে!'

সুজাতা ডক্টব সেনেব দিকে ফিবে বললে, 'না লাগে পাঠাব না। তবে আপনাব অর্ডাব অনুযাযী দু কাপ চা বানানো হযেছে। বিল-এ দু কাপ চাযেব দাম কিন্তু ঠিকই উঠবে ডাঃ সেন।'

'কাবেক্ট! তা তো উঠবেই। তবে এক কাজ করুন—আমাব কাপটা দিন, নিয়ে যাই। ওঁব যখন আব লাগবে না—।'

'থামো তুমি! উঃ, কী ডাকাতেব বাজ্যে এসে পড়েছি। দাম দেব আব চা খাব না। ইয়াবকি নাকি! তুমি এসো – ওবা বেযাবা দিযে পাঠিয়ে দেবে।'

ওযার্স হাফকে উদ্ধাব কবে ওপবে উঠে গেলেন মিসেস সেন।

॥ ছয় ॥

বেলা প্রায় এগাবোটা। নিজেব ঘবে বসে কাবেবী তন্ময় হযে একখানা ছবি দেখছিল ওবই ছবি। সিপিযা বঙে ক্রেযনে আকা। সদ্যসমাপ্ত। হঠাৎ দ্বাবেব কাছে প্রশ্ন হল, 'ভেতরে আসতে পাবি?'

সচকিত হযে কাবেবী লক্ষ করে দ্বাবপথে দাঁড়িযে আছেন চাব নম্বরের সুদর্শন ভদ্রলোক

'আসুন, আসুন! কী ব্যাপাব?'

'কৌতূহলটা দমন কবতে পাবলাম না। ছবিটা দেখতে পাবি?'

'দেখুন না। আপত্তি কীসেব?' ছবিখানা বাড়িযে ধবে কাবেবী।

সুবীব এগিয়ে বসে একখানা চেয়াবে। সমঝদাবেব মতো ওব ছবিখানা দেখতে থাকে কাছে ধবে দূবে ধবে। দু একবাব কাবেবীব দিকেও তাকায় তাবপব বলে, 'ছবিও সুন্দব, তবে অবিজিনালেব মতো সুন্দব নয়।'

কাবেবী একটু বাঙিযে ওঠে। কথা ঘোবাবাব জন্য বলে, 'আপনাব পবিচযটা কিন্তু আমি জানি না। আপনি তো আছেন ওই চাব নম্বরে?'

'হ্যাঁ। আমাব নাম সুবীব বায। আবে আপনাব সুটকেসটা তো চমৎকাব!'

ওপাশে বাখা সাদা বঙেব স্যুটকেসটা লক্ষ করে সে। বলে, 'এগুলোকেই ভি আই পি স্যুটকেস বলে, তাই নয?'

কাবেবী বলে, 'শখ কবে কিনেছি। যদিও আমি ভি আই পি মোটেও নই।'

'বেড়াতে এসেছেন বুঝি দার্জিলিঙে?' প্রশ্ন কবে সুবীব সিগাবেট ধবাতে ধবাতে।

'হ্যাঁ। ছুটিতে—।'

'অত সকালে কোথা থেকে এলেন?'

ভ্রূ কুঞ্চিত হল কাবেবীব। বলল, 'আপনি তো এলেন মধ্যবাত্রে—আমি কখন এসেছি তা জানলেন কেমন কবে?'

সুবীব মামুলি গলায বললে, 'সুজাতা দেবী বলছিলেন আপনি নাকি সেই কাক ডাকা ভোবে এলেন।'

কাবেবীও মামুলি গলায জবাব দিল, 'কাক-ডাকা ভোবই বটে। আমি পবশু বাত্রে কার্শিযাঙে হল্ট কবেছিলাম। বাত ভোব হতেই এখানে চলে এসেছি।'

'কার্শিযাঙে কোথায ছিলেন? হোটেলে?'

আবার সচকিত হয়ে ওঠে কাবেরী। বলে, 'কেন বলুন তো?'

'না, আমি ফেরার পথে কার্শিয়াঙে দু-দিন থাকব ভাবছি। তাই জানতে চাইছি কোন হোটেলে ছিলেন, তাদের ব্যবস্থা কেমন—।'

কাবেরী কৃত্রিম হাসিতে ভেঙে পড়ে। বলে, 'যদি কোনও হোটেল ছেড়ে রাত থাকতে বোর্ডার পালিয়ে বাঁচে সেটায় থাকবার কথা ভাবছেন ফেরার পথে?'

সুবীর বললে, 'তাহলে ধরে নিন ভুল করে সেটাতে উঠে যাতে নাকাল না হতে হয় তাই নামটা জানতে চাইছি। কার্শিয়াঙে কোন হোটেলে ছিলেন?'

কাবেরী আবার প্রশ্নটা এড়িয়ে বলে, 'আপনি যে পুলিশের মতো জেরা করছেন!'

'তাই করছি, কারণ পুলিশ বিভাগেই কাজ করি আমি। ক্রিমিনাল ইন্টেলিজেন্সে। এসেছি একটা খুনের তদন্তে। সেই প্রসঙ্গেই আমি জানতে চাইছি—পয়লা অক্টোবর রাত্রে আপনি কোথায় ছিলেন? রাত দশটার পর থেকে বাকি রাত?'

পকেট থেকে একটি নোটবুক বের করে বলে, 'এবার বলুন—।'

কাবেরীর মুখটা সাদা হয়ে যায়। ঠোঁট দুটো নড়ে ওঠে, কিন্তু কথা কিছু বলে না। ঠিক সেই মুহূর্তেই বিনা নোটিশে ঘরে ঢুকে পড়লেন অজয় চাটুজ্জে। সরাসরি কাবেরীকে বললেন, 'ও ক্রেয়নে ঠিক এফেক্টটা আসেনি, বুঝলে! আমি অয়েলে আর একখানা আঁকতে চাই। তোমার সময় হবে এখন?'

কাবেরী তৎক্ষণাৎ সামলে নেয় নিজেকে। বলে, 'সময় হবে না? কী বলছেন? নিশ্চয় হবে। এখনই বসবেন? চলুন—।'

এতক্ষণে অজয়বাবু সুবীরকে নজর করেন; বলেন, 'এঁকে তো ঠিক, মানে—।'

কাবেরী প্রথম সুযোগেই সুবীরের ট্রাম্প কার্ডখানা খুলে দেখায়। বলে, 'উনি ক্রিমিনাল ইন্টেলিজেন্স বিভাগের একজন অফিসার, মিস্টার সুবীর রায়। এসেছেন একটা খুনের তদন্তে।'

সুবীর ক্রুদ্ধ আক্রোশে কাবেরীর দিকে তাকায়।

চোখ থেকে চশমাটা খুলে কাচটা মুছতে-মুছতে অজয়বাবু বলেন, 'অ!'

'বসুন অজয়বাবু। আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করার আছে আমার।'

অজয় বসেন না। চশমাটা নাকে চড়িয়ে বলেন, 'কাঞ্চনজঙ্ঘা হোটেলের সেই দারোগার মৃত্যু-সংক্রান্ত প্রশ্ন নিশ্চয়?'

'হ্যাঁ, তাই। আপনি তো ওই হোটেলেই ছিলেন?'

'এসো কাবেরী—' অজয় প্রস্থানোদ্যত।

'আপনি আমার প্রশ্নের জবাব দেবেন না?'

'দেব। যখন কোর্টের শমন পাব, সাক্ষীর কাঠগড়ায় উঠে দাঁড়াব। তখন দেব। উঃ হরিবল্! এসো কাবেরী।'

কাবেরীর হাতটা ধরে অসংকোচে টানতে-টানতে নিয়ে চলেন অজয় চাটুজ্জে। পিছন থেকে সুবীর বলে, 'কাজটা কিন্তু ভালো করলেন না। কোর্টের শমন ছাড়াও পুলিশ অফিসারের প্রশ্নের জবাব দিতে হয়—।'

'হয়, জানি। কিন্তু তার একটা স্থান-কাল-পাত্র আছে। পথেঘাটে প্রথম সাক্ষাতেই অমন মোড়লি করার কোনও অধিকার পুলিশের নেই। বুঝেছেন?' ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন উনি।

বেলা সওয়া এগারোটা।

সুবীর এসে উপস্থিত হল আলি-সাহেবের ঘরে। দরজায় নক করে বললে, 'আসতে পারি?'

আগাথা ক্রিস্টিকে বালিশের ওপর উপুড় করে রেখে আলি বললেন, 'সচ্ছন্দে! ইন ফ্যাক্ট আপনার সঙ্গে আলাপ করতে যাব ভাবছিলাম। আমার নাম এন. আলি।'

সুবীর বললে, 'আমার নাম সুবীর রায়। ক্রিমিনাল ইন্টেলিজেন্সে আছি। এসেছি একটা খুনের তদন্তে।'

ভেবেছিল প্রতিপক্ষ হকচকিয়ে যাবে। তা কিন্তু গেলেন না আলি। হেসে বললেন, 'তাস খেলেন?'

'কেন বলুন তো?' ভ্রূকুঞ্চিত সুবীরের প্রশ্ন।

'প্রথম ডিলেই রঙের টেক্কা পেড়ে লিড দিচ্ছেন তো, তাই বলছি!'

'মানে?'

'আগাথা ক্রিস্টি পড়ছিলাম কি না—গোয়েন্দা গল্পে দেখেছি ডিটেকটিভরা সহজে আত্মপরিচয় দেয় না ওভাবে।'

'সকলের পদ্ধতি এক নয়। আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে পারি?'

'এ বিনয়ও ডিটেকটিভ-সুলভ নয়। নিশ্চয় করতে পারেন। করুন। আমি প্রস্তুত।'

'আপনি তো এখানে এসেছেন পয়লা তারিখ রাত সওয়া ন'টায়। কোথা থেকে এলেন?'

'দার্জিলিং থেকে।'

'দার্জিলিঙে কবে এসেছিলেন?'

'ওই পযলা তারিখ বেলা বারোটায়। একটা শেয়ারের ট্যাক্সিতে চেপে।'

'ওই ট্যাক্সিতে একজন পুলিশ অফিসার আর একজন ভদ্রমহিলাও এসেছিলেন?'

'না। কোনও পুলিশ অফিসার বা মহিলা ছিলেন না আমার সঙ্গে।'

'কোন হোটেলে উঠেছিলেন আপনি?'

'হোটেল কুন্ডুস। স্বনামেই উঠেছিলাম—হোটেল রেজিস্টার হাতড়ে দেখতে পারেন সত্য কি না।'

'কিন্তু এমনও তো হতে পারে—স্বনামে হোটেল কুন্ডুস-এ ঘর বুক করে আপনি বেনামে অন্য কোনও হোটেলে উঠেছিলেন?'

আলি হেসে ফেলেন। বলেন, 'যেমন ধরা যাক মহম্মদ ইব্রাহিম এই ছদ্মনামে হোটেল কাঞ্চনজঙ্ঘায়?'

'কেন নয়?'

'নয় এজন্যে যে, সেক্ষেত্রে অজয়বাবু এবং ব্যারিস্টার বাসু আমাকে তৎক্ষণাৎ চিনে ফেলতেন। ওঁরা দুজনেই ছিলেন ওই কাঞ্চনজঙ্ঘায়।'

'আপনি ভুলে যাচ্ছেন—মহম্মদ ইব্রাহিম হোটেলে ছিল মাত্র কয়েক মিনিট। চেক-ইন করেই সে বেরিয়ে যায়। ফিরে আসে রাত সাতটায় এবং এক ঘণ্টার মধ্যেই চেক-আউট করে বেরিয়ে যায়। রাত আটটায় দার্জিলিং থেকে রওনা হলে রাত ন'টার মধ্যে তার পক্ষে রিপোজ-এ এসে পৌঁছনো সম্ভব?'

আলি পাইপ ধরালেন। বললেন, 'তাই তো হিসেবে দাঁড়াচ্ছে। এক্ষেত্রে আপনি একটিমাত্র কাজ করতে পারেন। কাঞ্চনজঙ্ঘা হোটেলের রুম সার্ভিসের বেয়ারা বীরবাহাদুরকে এখানে নিয়ে আসুন। সে শনাক্ত করে যাক—ইব্রাহিম বা মিস ডিক্রুজা এখানে আছে কি না!'

সুবীর বলে, 'বীরবাহাদুর! ও নাম আপনি জানলেন কেমন করে?'

'এখানেই কারও কাছে শুনেছি বোধহয়। হোটেল রিপোজে তো দিবারাত্র এই গল্পই হচ্ছে। আসুন—।'

একটি সিগারেট তিনি বাড়িয়ে ধরেন সুবীরের দিকে। পাইপখোর তাহলে সৌজন্যের খাতিরেও

সিগারেট রাখে।

মোট কথা আলি-সাহেব বিন্দুমাত্র নার্ভাস হলেন না।

সাড়ে এগারোটায় সুবীর এসে হানা দিল ডক্টর সেনের ঘরে। সেখানেও বিশেষ কিছু সুবিধে হল না। কিন্তু একটা খটকা লাগে সুবীরের। ডক্টর সেনকে অফার করা সিগারেটের প্যাকেট থেকে মিসেস সেন অম্লান বদনে একটি সিগারেট নিয়ে ধরালেন। দিব্যি হুসহুস করে টানলেন এবং একবারও কাশলেন না। ডক্টর আর মিসেস সেন সুবীরকে অনেক পীড়াপীড়ি করলেন তাসের আড্ডায় যোগ দিতে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাজি করাতে পারলেন না। মিসেস সেন এ হোটেলের ব্যবস্থাপনার ভূয়সী নিন্দা করলেন এবং কথা প্রসঙ্গে জানালেন, 'ওঁর এক ভাই আছেন ম্যারিকায়, এক ভাই পশ্চিম জার্মানিতে। উনি নাকি ডক্টর সেনকে পইপই করে বলছেন চাটি বাটি গুটিয়ে বিদেশে পাড়ি জমাতে —কিন্তু ঘরকুনো ডাক্তার সেন কিছুতেই রাজি হচ্ছেন না দেশ ছেড়ে যেতে।'

মোট কথা সুবীর হালে পানি পেল না।

ঠিক বারোটার সময় সুবীর এসে হানা দিল বাসু সাহেবের ঘরে।

'এসো। আর কিছু ক্লু পাওয়া গেল?' প্রশ্ন করলেন বাসু।

'কিছু না। আপনি কিছু আন্দাজ করতে পারছেন?'

'পারছি। আন্দাজ নয়। অকাট্য প্রমাণ।'

ঘনিয়ে আসে সুবীর : 'বলেন কী স্যার? কে?'

'কে নয় সুবীর? কারা? দুজনকেই। ইব্রাহিম অ্যান্ড মিস ডিক্রুজা।'

সুবীর অবাক হয়ে যায়। দরজাটা বন্ধ করে ঘনিয়ে এসে বলে, 'নৃপেনদা অবশ্য আপনার খুব প্রশংসা করছিলেন, কিন্তু আপনি যে দুজনকেই— কী ব্যাপার বলুন তো?'

বাসু সাহেব নিভন্ত পাইপে অগ্নিসংযোগ করতে-করতে বলেন, 'আয়াম সরি। এখনই কিছু বলতে পারছি না। আগে জাল গুটিয়ে আনি—সবটা একসঙ্গে ভাঙব।'

হতাশ হয় সুবীর। বলে, 'তাহলে, মানে —আমি এখন কী করব?'

'তোমার অফিসিয়াল ইনভেস্টিগেশন চালিয়ে যাও।'

আজও সারাদিনে বর্ষণ ক্ষান্ত হল না। ক্রমাগত বৃষ্টি হয়ে চলেছে। কার্ট রোড দিয়ে গাড়ি যাতায়াত বন্ধ। টেলিফোন তো অনেক আগেই গেছে—এবার গেল ইলেকট্রিক। ব্যাটারি সেট রেডিও কারও কাছে নেই। রেডিওর শেষ সংবাদ যা পাওয়া গেল তাতে জানা গেছে যে, সমগ্র উত্তর বঙ্গ একটা ঐতিহাসিক দুর্যোগের কবলে পড়েছে। মিলিটারিকে ডাকা হয়েছে উদ্ধারের কাজে। তিস্তা ব্রিজ নিশ্চিহ্ন। আরও অনেক ব্রিজ ভেঙে গেছে। মহানন্দা, তিস্তা ফুলে ফেঁপে ডুবিয়ে দিয়েছে গ্রামের পর গ্রাম, জেলার পর জেলা।

সন্ধ্যার পর কালীপদ ঘরে-ঘরে মোমবাতি রেখে গেল। মিটমিটে আলোয় বাড়িটাতে একটা ভুতুড়ে ভাব এসেছে। সুবীর রায়ের পরিচয় জানতে আর কারও বাকি নেই। সকলেই যেন কিছুটা সতর্ক, সন্দিগ্ধ। একঘেয়ে বৃষ্টির মতো রিপোর্জ-এর জীবনযাত্রা বৈচিত্র্যহীন হয়ে পড়েছে একেবারে।

বৈচিত্র্য দেখা দিল রাত ঠিক আটটা তেত্রিশে।

তার ঠিক তিন মিনিট আগের কথা। কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে আটটায়। ড্রয়িংরুমের ঘড়িটা ঠিক

যখন 'ঢং' করে সময়টা ঘোষণা করল।

সুজাতা তখন ছিল রান্নাঘরে। একাই। রাতের রান্না করছিল সে একা। কালীপদ নিজের কাজে ব্যস্ত। কাঞ্চী বাড়ি চলে গেছে।

আলি-সাহেব নিজের ঘরে মোমবাতির আলোয় আগাথা ক্রিস্টির 'মাউসট্র্যাপ' গল্পের শেষ ক'টা পাতায় ডুবে আছেন।

সুবীর ছিল তার নিজের ঘরের সংলগ্ন বাথরুমে। গিজারের জল এখনও কিছুটা গরম আছে। সে হট বাথ নেওয়ার একটা চেষ্টা করছে। গরমজল আর পাওয়া যাবে না।

ডক্টর আর মিসেস সেন জোড়া মোমবাতি জ্বেলে পিশ খেলছেন। মিসেস সেন সারাদিনে প্রায় সওয়া শো-টাকা হেরে বসে আছেন!

কৌশিক একটা ছাতা আর টর্চ নিয়ে উঠেছে ছাদে। মই বেয়ে জল নিকাশী পাটাবটা সাফা করতে। গাছের পাতায় জল নিকাশী পাটাবটা আটকে গেছে।

বাসু-সাহেব তাঁর ঘরের সামনে উত্তরের বারান্দায় অন্ধকারে বসেছিলেন একটা ইজিচেয়ারে। শুনছিলেন গাছের পাতা থেকে টুপটুপ করে ঝরে পড়া বৃষ্টির শব্দ।

ঠিক তখনই 'ঢং' করে ড্রইংরুমের ঘড়িতে সাড়ে আটটা বাজল।

রাণী দেবী ছিলেন নিজের ঘরে। হুইল চেয়ারটা তাঁর ঘরের উত্তরের জানলার কাছে টেনে নিয়ে আপনমনে তিনি গান ধরলেন। এমন অকালবর্ষণের সন্ধ্যায় তিনি কিন্তু কোনও বর্ষা-সংগীত ধরলেন না। কী জানি কেন আপন খেয়ালে শুরু করলেন অতি পরিচিত একটা রবীন্দ্রসংগীত ঃ

'যদি জানতেম আমার কীসের ব্যথা তোমায় জানাতাম—।'

ঘরে-ঘরে বিচিত্র প্রতিক্রিয়া শুরু হল।

সুজাতা তার প্রেসার-কুকারের মুখটা খুলে দিল। সোঁ-সোঁ শব্দটা বন্ধ হল।

মিসেস সেন তাস ডিল করা বন্ধ করে প্রশ্ন করলেন, 'কে গাইছে বলো তো?'

বাসু-সাহেব দেশলাইটা জ্বালবার উপক্রম করছিলেন। থমকে গেলেন তিনি।

সুবীর বোধহয় গানটা শুনতে পায়নি। তার কলের শব্দ বন্ধ হল না।

অরূপ পায়চারি করছিল একতলার দক্ষিণের বারান্দায়। চট করে সে ঢুকে গেল হল-কামরায়। ডাইনিং হল-এ একটা মোমবাতি জ্বলছে। মাঝের পরদাটা টানা। তাই ড্রইংরুমটা আলো-আঁধারি। অরূপ কিন্তু ভ্রূক্ষেপ করল না। প্রায় হাতড়াতে-হাতড়াতে সে সরে এল ড্রইংরুমের উত্তর দিকের দেওয়ালের কাছে। বসল গিয়ে পিয়ানো'র টুলে।

গান যখন অন্তরায় পৌঁছল তখন পিয়ানোর মিঠে আওয়াজ যুক্ত হল কণ্ঠসংগীতের সঙ্গে। সমের মাথায় একবার থামলেন রাণী দেবী। কান পেতে কী শুনলেন। বুঝে নিলেন পিয়ানো বাজছে। চুপ করে রইলেন পুরো একটি কলি। পিয়ানো বেজে গেল শুধু। তারপর যুক্ত হল যন্ত্র-সংগীতের সঙ্গে কণ্ঠসংগীত। রাণী দেবী নিশ্চয় বুঝে উঠতে পারেননি কে এমন আচমকা সংগত করতে বসেছে—কিন্তু এটুকু বুঝে নিয়েছিলেন যে সংগতকার একজন দক্ষ যন্ত্রশিল্পী।

"কোথায় যে হাত বাড়াই মিছে ফিরি আমি কাহার পিছে
সব কিছু মোর হারিয়েছে পাইনি তাহার দাম।"

কৌশিক সচকিত হয়ে ওঠে। সংগীতের আকর্ষণে সে নেমে আসে মই বেয়ে। এসে নামে দোতলার বারান্দায়। সেখান থেকে সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় ওর নজরে পড়ল দক্ষিণের বারান্দার

ও-প্রান্তে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে। অন্ধকারে ঠিক বোঝা গেল না, মনে হল স্ত্রীলোক। কাবেরীই হবে নিশ্চয়। ঠিক তার ঘরের সামনেই। কৌশিক একটু ইতস্তত করে। তারপর অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে সে নেমে যায় একতলায়।

সংগীতের আকর্ষণে সস্ত্রীক সেনও উঠে এসে দাঁড়িয়েছেন উত্তরের বারান্দায়। গান শেষ হল। সংগীতমগ্না দ্বিতীয়বার শুরু করলেন স্থায়ীটা :

'যদি জানতেম আমার কিসের ব্যথা তোমায় জানাতাম—।"

ড্রইংরুমের ঘড়িতে তখন ঠিক আটটা বেজে তেত্রিশ।

হঠাৎ সমস্ত বাড়ি সচকিত করে একটা ফায়ারিং-এর শব্দ হল ড্রইংরুমে।

তৎক্ষণাৎ কে যেন ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে দিল ডাইনিং হল-এর মোমবাতিটা।

একটা চেয়ার উলটে পড়ার শব্দ। ওই সঙ্গে ভেঙে পড়ল একটা ফুলদানি। বিশ থেকে ত্রিশ সেকেন্ড। বাড়িসুদ্ধ সবাই এসে উপস্থিত হল ড্রইংরুমে। প্রায় একসঙ্গেই। অরূপরতন পড়ে আছে উপুড় হয়ে। তার পাশেই একটা ভাঙা ফুলদানি আর কিছু ছড়ানো ছিটানো গ্ল্যাডিওলাই। ডক্টর সেন হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। কৌশিক তার হাতের টর্চটা জ্বালল। ডক্টর সেন মুখ তুলে বললেন, 'থ্যাংক গড। গুলিটা কাঁধে লেগেছে। ফেটাল নয় বোধ হয়।'

এতক্ষণে সুবীর এসে পৌঁছল তার বাথরুম থেকে। তার গায়ে একটা তোয়ালের তৈরি ড্রেসিং গাউন। তার চুল বেয়ে জল ঝরছে। বললে, 'পাশেই দু-নম্বর ঘর। ওখানেই ওঁকে নিয়ে যাওয়া যাক।'

ধরাধরি করে অচৈতন্য অরূপকে ওরা নিয়ে গেল বাসু-সাহেবের ঘরে।

ডক্টর সেন একেবারে অন্য মানুষ। সমস্ত দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিলেন। সুজাতাকে গরম জল আনতে বললেন। আর সবাইকে বললেন, 'প্লিজ ক্লিয়ার আউট। ঘর ফাঁকা করে দিন।' স্ত্রীকে বললেন, 'আমার ডাক্তারি ব্যাগটা নিয়ে এসো চট করে।'

মিসেস সেন ভ্রূ কুঞ্চিত করে বলেন, 'কী দরকার বাপু ওসব খুনজখমের মধ্যে নাক গলাবার? তুমি চলে এসো।'

'শাট আপ।' গর্জন করে ওঠেন ডক্টর সেন। তারপর কৌশিকের দিকে ফিরে বললেন, 'আমার ব্যাগটা প্লিজ—।'

হ্যাঁ, ডাক্তার সেন মুহূর্তে বদলে গেছেন।

বারান্দার ও-প্রান্তে ইজিচেয়ারে গিয়ে ফের বসেছিলেন বাসু-সাহেব। সুবীর গটগট করে এগিয়ে আসে তাঁর কাছে। কঠিন স্বরে বলে, 'আপনিই এজন্যে দায়ী।'

'আমি। কেন? কী করে?'

'কেন তখন সব কথা খুলে বললেন না? হয়তো এ-দুর্ঘটনা রোখা যেত।'

বাসু-সাহেব বেদনাহত দৃষ্টিতে শুধু তাকিয়ে রইলেন। জবাব দিলেন না।

দুমদুম করে পা ফেলে সুবীর চলে গেল আবার।

রাণী দেবী হুইল চেয়ারটা নিয়ে এগিয়ে এলেন। সহানুভূতির সুরে বললেন, 'এ-দুর্ঘটনা এড়ানো যেত, তাই নয়!'

হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে ওঠেন বাসু-সাহেব : 'ইয়েস, ইটস মাই মিসটেক। আমি ভেবেছিলাম— আমিই বুঝি ওর টার্গেট। তাই প্রস্তুত হয়েই বসেছিলাম আমি। বুঝতে পারিনি ও অরূপকে—।'

পকেট থেকে একটা ছোট্ট কালো যন্ত্র বের করে দেখালেন স্ত্রীকে।

রাণী দেবী স্তম্ভিত হয়ে যান।

আধ ঘণ্টা পরে বাসু-সাহেব এসে দাঁড়ালেন রোগীর শিয়রে। অরূপের কাঁধের ওপর ব্যান্ডেজ বাঁধা। অরূপ তখনও অচৈতন্য। প্রশ্ন করলেন ডক্টর সেনকে, 'কী বুঝছেন?'

'বুলেটটা স্ক্যাপুলার খাঁজে আটকে আছে। বের করে দেওয়া দরকার—।'

'হাসপাতালের অপারেশান থিয়েটার ছাড়া সম্ভব হবে?'

'অসম্ভব! থাক, আপাতত বুলেটটা থাক। শকটা কাটিয়ে উঠুন। বেঁচে যাবেন। অন্তত মেডিকেল সায়েন্স এক্ষেত্রে যতটুকু করতে পারে তা আমি করব। নিশ্চিন্ত থাকুন।'

'থ্যাংকস।'

অন্ধকারের মধ্যে এগিয়ে এল সুবীর। বললে, 'কিছু মনে করবেন না ডক্টর সেন। আমি কয়েকটা খোলা কথা বলব। অরূপবাবুকে কে গুলি করেছে তা আমরা জানি না। কিন্তু আমাদের মধ্যেই কেউ একজন তা করেছে—। ইয়েস! এনি ওয়ান! আপনি-আমিও হতে পারি।'

'সো হোয়াট?' রুখে ওঠেন ডক্টর সেন।

'আপনি ওঁকে কী ওষুধ দিচ্ছেন, কী ইনজেকশান দিচ্ছেন সব একটা স্টেটমেন্টের আকারে লিখে যাবেন এবং মিসেস বাসুকে দেখিয়ে ওষুধ খাওয়াবেন, ইনজেকশান দেবেন—।'

'মিসেস বাসুকে। কেন? উনি কী বোঝেন ডাক্তারির?'

'সেজন্যে নয়, একমাত্র মিসেস বাসুই সন্দেহের অতীত।'

ডাক্তার সেন কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বাসু-সাহেব বললেন, 'ইয়েস ডক্টর সেন। টেক মাই লিগাল অ্যাডভাইস। সুবীর যা বলছে তাই করুন। মেডিক্যাল সায়েন্সে যতখানি সম্ভব আপনি করুন—ক্রিমিনাল জুরিসপ্রুডেন্সে যতখানি সম্ভব আমাকে করতে দিন—।'

শ্রাগ করলেন ডাক্তার সেন : 'অ্যাজ য়ু প্লিজ।'

॥ সাত ॥

পরদিন। চৌঠা অক্টোবর। শুক্রবার। সকাল।

সুবীরের ঘরে এসে হাজির হলেন আলি। পরদার বাইরে থেকে বললেন, 'ভেতরে আসতে পারি?'

সুবীর একটু অবাক হল, বললে, 'নিশ্চয়। আসুন মিস্টার আলি। কী ব্যাপার?'

আলি এসে বসলেন সামনের চেয়ারটায়। বললেন, 'আপনাকে কয়েকটা কথা বলতে এলাম।'

'বলুন?' ঘনিয়ে আসে সুবীর।

'দেখুন মিস্টার রায়, আপনি কাল যখন আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন তখন আমি জোভিয়াল মুডে জবাব দিয়েছিলাম। সত্যি কথা বলতে কি আমি বিশ্বাস করিনি যে, দার্জিলিং-এর ঘটনা এই রিপোজ-এ রিপিটেড হতে যাচ্ছে—ভেবেছিলাম এসব আপনাদের আষাঢ়ে কল্পনা। কিন্তু এখন আর সেটা ভাবা যাচ্ছে না। দু-নম্বর ঘটনা এখানে কাল রাত্রে ঘটে গেছে। ফলে এখন সিরিয়াসলি ব্যাপারটা আপনার সঙ্গে আলোচনা করতে চাই—।'

'করুন। আমি কর্ণময়।'

'প্রথম কথাই বলব যে, আমি জানি—আমি নিজে আপনার সন্দেহের তালিকায় আছি। আই নো ইট। শুধু আমি নই, আপনি হয়তো ডক্টর সেন, এমনকী বৃদ্ধ অজয়বাবুকেও সন্দেহের তালিকায় রেখেছেন; মিস ডিক্রুজার সন্ধানে আপনি কাবেরী দেবী অথবা মিসেস সেনকেও নজরে-নজরে রেখেছেন—তাই নয়?'

'বলে যান—।'

'আমার আশঙ্কা হচ্ছে আপনি—এ কেস-এর ইনভেস্টিগেটিং অফিসার—সমস্ত সম্ভাবনা তলিয়ে দেখছেন না, ফলে আপনার সন্দেহজনকের তালিকা থেকে একজন বাদ যাচ্ছেন, যাঁকে ঠিকমতো বাজিয়ে দেখা আপনার উচিত—আপনারা কয়েকটি ভুল পূর্বসিদ্ধান্ত করেছেন।'

'আর একটু পরিষ্কার করে বলুন—।'

'আপনারা ধরে নিয়েছেন—পয়লা অক্টোবর ইব্রাহিম নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশান থেকে শেয়ারের ট্যাক্সি চেপে রমেন দারোগা আর মিস ডিক্রুজার সঙ্গে দার্জিলিং-এ এসেছিল। তা তো না-ও হতে পারে? এমনও তো হতে পারে যে, রমেনবাবু আর মিস ডিক্রুজা নিউ জলপাইগুড়ি থেকে শেয়ারের ট্যাক্সিতে আসছিল আর ইব্রাহিম মাঝপথে ওই ট্যাক্সিতে ওঠে, ধরুন পাঙ্খাবাড়ি, কার্শিয়াঙ, সোনাদা কিংবা এই ঘুম-এই।'

'এমনটা মনে করার হেতু?'

'আপনাদের ধারণা যে, এই ট্যাক্সিতে আসার সময়েই রমেনবাবু আর মিস ডিক্রুজার মধ্যে ঘনিষ্ঠতা হয়—সেটা এতদূর নিবিড় হয় যাতে হোটেলে পৌঁছেই রমেনবাবু ডুপ্লিকেট চাবিটা চেয়ে নেয় এবং ডিক্রুজাকে সেটা দিয়ে দেয়। এক্ষেত্রে স্বতই ধরে নিতে হয়, ট্যাক্সিতে দুজনে বেশ নিভৃতে আলাপের সুযোগ পেয়েছিল। নিউ জলপাইগুড়ি থেকে একটা শেয়ারের ট্যাক্সিতে দুটি পুরুষ ও একটি মহিলা একসঙ্গে রওনা হলে এ জাতীয় ঘনিষ্ঠতা কখনও গড়ে উঠতে পারে দুজনের মধ্যে?'

'সো হোয়াট?'

'তাতে এ-কথাই প্রমাণিত হয় যে, ইব্রাহিম পয়লা তারিখ সকালে ওই ট্রেনে কলকাতা থেকে আসেনি। সে মাঝরাস্তায় ওই ট্যাক্সিতে উঠেছিল—।'

সুবীর বলে, 'কিন্তু মুশকিল কী হচ্ছে জানেন মিস্টার আলি—আমাদের সন্দেহের তালিকায় যে কজন আছেন, যেমন ধরুন ডক্টর সেন, অজয়বাবু এবং—।'

'আপনার ইতস্তত করার কিছু নেই—আমরা অ্যাকাডেমিক ডিসকাশন করছি, ফলে "এবং মিস্টার আলি"! আমি নিজেকে সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার শুভ-ইচ্ছা নিয়ে আপনার কাছে আসিনি; আমি শুধু বলতে এসেছি যে, সমস্যাটার আরও একটা দিক আছে, আরও একজনকে সন্দেহের তালিকায় আপনার রাখা উচিত।'

'আর একটু স্পেসিফিকালি বলবেন?'

'বলব। আমি এখানে এসে পৌঁছই পয়লা তারিখ রাত সওয়া ন'টায়। তখন এখানে মিসেস মিত্র একা ছিলেন। মিস্টার কৌশিক মিত্র ফিরে এলেন রাত দশটায় এবং এসেই তাঁর স্ত্রীকে কৈফিয়ত দিলেন যে, তিনি সমস্ত দিন ছিলেন কাঞ্চন ডেয়ারিতে, দার্জিলিং-এ তিনি আদৌ যাননি সারাটা দিন—।'

'তাতে কী হল?'

'অথচ আমি নিশ্চিত জানি—কৌশিকবাবু বেলা এগারোটার সময় ঘুম স্টেশনে একটা শেয়ারের ট্যাক্সিতে চেপে দার্জিলিং-এ যান। সারাটা দিন তিনি দার্জিলিং-এ কী করেছেন তা জানি না। কিন্তু এটুকু জানি যে, তিনি দুপুরে 'শাংগ্রি-লা' নামে একটি চীনা হোটেলে লাঞ্চ করেন—একা নন, তাঁর সঙ্গে ছিলেন একটি সুন্দরী মহিলা।'

'মহিলা। কে তিনি?'

'এ কাহিনির মিসিং লিংক। বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ। সুন্দরী। চমৎকার ফিগার। চুল ছোট, বব নয়। চেহারায় অবাঙালিত্বের ছাপ; কিন্তু চমৎকার বাংলা বলতে পারেন। মহিলাটি কে হতে পারেন তা মিসেস মিত্র আন্দাজ করতে পারছেন না, অথচ আমি স্বচক্ষে দেখেছি কৌশিকবাবু তাঁকে একটি "সোনার কাঁটা" উপহার দিচ্ছেন। আর যদি না আমার চোখ ভুল করে থাকে, মহিলাটির ভাইটাল স্ট্যাটিস্টিক্স ওইরকমই ৩৪-২৮-৩২।'

সুবীরের ভ্রূ কুঞ্চিত হয়। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সে দেখতে থাকে আলিকে। তারপর বলে, 'আপনি কেমন করে জানলেন?'

'আমি প্রত্যক্ষদর্শী। তিন টেবিল পিছনে আমি ওই রেস্তোরাঁতেই খাচ্ছিলাম। একা। ফলে কৌশিকবাবু আমাকে নজর করেননি। আর সুন্দরী সঙ্গিনী থাকায় আমি বারবার ওদিকে তাকিয়ে দেখছিলাম।'

সুবীর বললে, 'অ্যাকাডেমিক ডিসকাশনই যখন করছি তখন বলি—এমনও তো হতে পারে যে, আপনি আদ্যন্ত বানিয়ে বলছেন। আমার দৃষ্টি বিভ্রান্ত করতে।'

'কারেক্ট। সেটাও যেমন সম্ভব তেমনি এটাও সম্ভব যে, আমি আদ্যন্ত সত্য কথা বলছি। আমি কোনওভাবেই আপনার তদন্তকে প্রভাবিত করতে চাই না। আমি শুধু এ-কথা বলব যে, আমি তদন্তকারী অফিসার হলে এটার সত্যতা যাচাই করে দেখতাম। সত্যি হলে কৌশিককে সন্দেহ করতাম, আর মিথ্যে হলে আলিকে আরও সন্দেহের চোখে দেখতাম।'

সুবীর বললে, 'থ্যাংকস ফর দ্য টিপস!'

আরও আধঘণ্টা পরের কথা। সুবীর এসে উপস্থিত হল কৌশিকের ঘরে। বললে, 'কৌশিকবাবু, এতক্ষণ আপনাকে কিছু প্রশ্ন করা হয়নি, এখন আপনার স্টেটমেন্টটা নিতে চাই—।'

কৌশিক কী একটা হিসেব লিখছিল। খাতাটা বন্ধ করে বললে, 'বলুন?'

'ওই পয়লা তারিখ আপনি কোথায় ছিলেন? সকাল থেকে রাত্রি দশটা পর্যন্ত?'

কৌশিক চট করে জবাব দেয় না। প্রতি-প্রশ্ন করে, 'কেন বলুন তো?'

'আমি যদি বলি ওইদিন বেলা এগারোটা নাগাদ আপনি ঘুম স্টেশন থেকে একটা শেয়ারের ট্যাক্সি নিয়ে দার্জিলিং গিয়েছিলেন, সারাদিন দার্জিলিং-এই ছিলেন এবং সন্ধ্যাবেলা ফিরে এসে মিসেস মিত্রকে মিথ্যে কথা বলেছিলেন—আপনি কি অস্বীকার করবেন?'

এবারও সরাসরি জবাব দেয় না কৌশিক। বলে, 'কে বলেছে আপনাকে? সুজাতা?'

'কে আমাকে বলেছে সেটা বড় কথা নয়, আপনি আমার প্রশ্নের জবাবটা দেননি এখনও?'

কৌশিক তবুও সহজ হতে পারে না। এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলে, 'আপনার অভিযোগ সত্য।'

'আপনি দুপুরে শাংগ্রি-লাতে লাঞ্চ করেন। আপনার সঙ্গে একটি মহিলা আহার করেছিলেন—সুন্দরী। চমৎকার ফিগার। অবাঙালি, অথচ তিনি চমৎকার বাংলা বলতে পারেন। ট্রু?'

রীতিমতো চমকে ওঠে কৌশিক। বলে, 'আপনি কী বলতে চান? আমি...আমি রমেন দারোগাকে খুন করেছি?'

'আমি কিছু বলতে চাই না কৌশিকবাবু। বলবেন তো আপনি। আমি যা বলছি তা সত্যি?'

কৌশিক রুখে ওঠে, 'হ্যাঁ সত্যি। সো হোয়াট?'

'সেই মহিলাটি কে?'

'আমি বলব না।'

'আপনি আমার সঙ্গে সহযোগিতা করছেন না।'

'বেশ তাই। তারপর?'

সুবীর উঠে দাঁড়ায়। বলে, 'না, তারপর আর কিছু নেই। ধন্যবাদ।'

নিঃশব্দে উঠে চলে যায় সুবীর।

কৌশিকও উঠে পড়ে। তার মনে হয় এর মূলে আছে সুজাতা। কিন্তু সুজাতা কেমন করে আন্দাজ করল সে কাঞ্চন ডেয়ারিতে যায়নি—গিয়েছিল দার্জিলিং? সুজাতা কেমন করে জানবে সে

কোথায় কার সঙ্গে লাঞ্চ খেয়েছিল? পায়ে-পায়ে ও চলে আসে কিচেন-ব্লকে। ব্যাপারটার ফয়সালা হওয়া দরকার। কেমন করে সুজাতা জানতে পারল এ-কথা?

কিচেন-ব্লকে পরদার সামনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হল ওকে। ঘরের ভেতর দুজনে নিম্নস্বরে কথা বলছে। একজন সুজাতা, দ্বিতীয়জন কে? পুরুষকণ্ঠ। ভদ্রলোক তখন বলছিলেন, 'আপনি আমাকে ভুল বুঝেছেন সুজাতা দেবী, আমি তেমন কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে ও-প্রশ্ন করিনি।'

'তাহলে আমাদের বিবাহিত জীবন নিয়ে আপনার অত কৌতূহল কেন?'

'কী আশ্চর্য। আপনি অফেন্ডেড হচ্ছেন কেন? আমি শুধু জানতে চাইছি, অ্যারেঞ্জড ম্যারেজ যখন হয়নি তখন কতদিন ধরে আপনি কৌশিকবাবুকে চেনেন? এতে অফেন্স নেওয়ার কী আছে?'

'অফেন্স নিচ্ছি প্রশ্নটার জন্যে নয়, তার পিছনে যে-ইঙ্গিতটা আছে সেটায়। হ্যাঁ, আপনি যা জানতে চাইছেন তা ঠিক। মিস্টার মিত্র একবার মার্ডার কেসে অ্যারেস্টেড হয়েছিলেন—ওই রমেনবাবুই তাঁকে গ্রেপ্তার করেন। খবরটা কোথা থেকে সংগ্রহ করেছেন জানি না, কিন্তু সংবাদটা অসমাপ্ত—ওইসঙ্গে এটুকুও জেনে রাখুন আমিও ওই কেসে মার্ডার চার্জে অ্যারেস্টেড হয়েছিলাম। কিন্তু প্লিজ মিস্টার আলি, এসব আলোচনা আপনার সঙ্গে আমি করতে চাই না। আপনি এবার আসুন। আমাকে কাজ করতে দিন। আর...কিছু মনে করবেন না, এ কিচেন-ব্লকটা বোর্ডারদের জন্যে নয়, এটা হোটেলের প্রাইভেট অংশ। আমার সঙ্গে কথা বলার প্রয়োজন হলে কাঞ্চীকে দিয়ে খবর পাঠাবেন দয়া করে।'

কৌশিক নিঃশব্দ চরণে ফিরে যায় নিজের ঘরে।

আরও আট-দশ ঘণ্টা কেটে গেছে তারপর। সময় যেন থমকে আছে ওই অভিশপ্ত বাড়িটায়—যেখানে নতুন জীবনের সূত্রপাত করতে সদ্য-বিবাহিত একটি দম্পতি আনন্দের আয়োজন করেছিল। না, ভুল বললাম। সময় থমকে নেই। রুদ্ধ নিশ্বাসে সময় বয়ে চলেছে—ড্রইংরুমের পেন্ডুলাম-ওয়ালা ঘড়িটায় তার শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শোনা যায়। আর শোনা যায় নিরবচ্ছিন্ন ধারাপাতের শব্দ। বৃষ্টি এখনও পড়ছে—কখনও জোরে, কখনও ঝড়ো হাওয়ার খ্যাপামিতে, কখনও বা ইলসে-গুঁড়ির নৈঃশব্দ্যে। বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই। টেলিফোন যোগাযোগ নেই, ইলেকট্রিক কারেন্ট নেই—স্তব্ধ হয়েছে কার্ট রোড দিয়ে গাড়ির আনাগোনা। কোথাও কোনও মানুষজনের সাড়াশব্দ নেই। এমন কি পাখিটা পর্যন্ত ডাকছে না।

বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের বেষ্টনিতে জাহাজডুবির কজন যাত্রী আশ্রয় নিয়েছে জনমানবশূন্য একটা ছোট্ট দ্বীপে। সংখ্যায় ওরা মাত্র দশজন। চারদিকেই উত্তালতরঙ্গ সমুদ্রের লবণাক্ত বেড়াজাল—পালাবার কোনও পথ নেই। ওদের মুক্তির একমাত্র উপায় হয়তো ছিল সঙ্ঘবদ্ধতায়, বিশ্বাসে, পারস্পরিক সৌহার্দ্যে। অথচ এমনই দুর্ভাগ্য ওদের—ওরা কেউ কাউকে বিশ্বাস করতে পারছে না। ভদ্রতা বজায় রেখে একসঙ্গে হাসছে, কথা বলছে, খাচ্ছে, ঘুমোচ্ছে—অথচ প্রত্যেকেই প্রত্যেককে সন্দেহ করছে। ওরা জানে—ওদের মধ্যে আত্মগোপন করে আছে একজন নৃশংস খুনি—জাত ক্রিমিনাল। ওদেরই মধ্যে একজনকে খুন করবার জন্য সে অবকাশ খুঁজছে। কে কাকে—তা ওরা জানে না; কিন্তু ভুলতেও পারছে না সেই মারাত্মক তিন নম্বরের জিজ্ঞাসা চিহ্নটিকে।

কৌশিক ওর ঘরে চুপ করে বসেছিল। জানালা দিয়ে দৃষ্টি চলে গেছে ধারাস্নাত পাইন গাছগুলোর দিকে। সুজাতা ঘরেই আছে। কথাবার্তা হচ্ছে না ওদের। মন খুলে কেউ যেন কিছু বলতে পারছে না এ-ক'দিন। এমনিই হয়। প্রেমের ফুল যখন ফোটে তখন কুন্দর মতো সুন্দর হয়ে ফোটে; আর প্রেমের কাঁটা যখন ফোটে তখন শজারুর কাঁটার মতো সর্বাঙ্গে বিঁধতে থাকে। শজারুর কাঁটা না সোনার কাঁটা! শেষে কী মনে করে সুজাতা এগিয়ে এল পিছন থেকে। আলতো

করে একখানা হাত রাখল কৌশিকের কাঁধে। কৌশিক ফিরে তাকাল না। সুজাতার হাতের ওপর হাতটা রাখল।

'একটা কথা সত্যি করে বলবে?'

এবারও মুখ ঘোরাল না কৌশিক। একই ভাবে বসে বলে, 'বলো?'

'তুমি পয়লা তারিখ কাঞ্চন ডেয়ারিতে যাওনি, নয়?'

'যাইনি।'

'দার্জিলিঙে গিয়েছিলে?'

'হুঁ।'

'সেখানে শাংগ্রি-লাতে দুপুরে লাঞ্চ করেছিলে?'

'হুঁ।'

'তোমার সঙ্গে একটি মেয়ে খেয়েছিল, সে কে?'

কৌশিক নিরাসক্ত ভাবে বললে, 'প্রমীলা ডালমিয়া। আমার সহপাঠী কিশোর ডালমিয়ার স্ত্রী। শাংগ্রি-লাতেই হঠাৎ দেখা হয়ে গিয়েছিল।'

সুজাতা এক মুহূর্ত কী ভেবে নেয়। তাবপর ওর চুলের মধ্যে আঙুল চালিয়ে বলে, 'তা হলে সেদিন কেন মিছে কথা বললে আমায়?'

কৌশিক ম্লান হাসে। এতক্ষণে ওর দিকে ফিরে বললে, 'একটা ব্যাপার তোমার কাছে থেকে গোপন করতে—।'

'কী ব্যাপার?'

'তোমার জন্যে একটা জিনিস কিনতে দার্জিলিং গিয়েছিলাম।'

'জিনিস! কী জিনিস?'

অন্যমনস্কের মতো পকেট থেকে একটা গহনার কেস বের করে কৌশিক টেবিলেব ওপব বাখে। সুজাতা সেটা খুলে দেখে না। বলে, 'হঠাৎ গয়না কেন?'

শূন্যের দিকে তাকিয়ে কৌশিক বলে, 'কাল তোমাকে উপহাব দেব ভেবেছিলাম—কাল পাঁচই অক্টোবব।'

উদাসীনের মতো সুজাতা বলল, 'ও, হ্যাঁ—ভুলেই গেছিলাম।'

হঠাৎ পরদার বাইরে থেকে কে যেন বলল, 'ভেতবে আসতে পারি?'

কৌশিক প্যাকেটটা আবার পকেটে ভরে নিয়ে বলে, 'আসুন—।'

ঘরে ঢোকে সুবীর। একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসতে-বসতে বলে, 'ব্যাড লাক! ঘুম অঞ্চলেব সমস্ত টেলিফোন বিকল। দার্জিলিং থানার সঙ্গে যোগাযোগ করা গেল না।'

'তা হলে?'

'না, ব্যবস্থা একটা হয়েছে। ঘুম আউটপোস্ট থেকে একজন বিশেষ সংবাদবহ পাকদণ্ডী পথে আমার চিঠি নিয়ে এই বৃষ্টি মাথায় করেই দার্জিলিঙে চলে গেছে। আজ বাত্রের মধ্যেই সার্চ-ওয়াবেন্ট নিয়ে ও. সি. মিস্টার ঘোষাল হয়তো নিজেই এসে পড়বেন।'

সুজাতা প্রশ্ন করে, 'আপনি কি কিছুই আন্দাজ করতে পারছেন না?'

একটা সিগারেট ধরাতে-ধরাতে সুবীব বলে, 'এখনও ডেফিনিট হতে পারিনি। ইব্রাহিম যদি সহদেব স্বয়ং হয়, তবে মিস্টার আলি অথবা ডক্টর সেনের মধ্যে একজনকে বেছে নিতে হবে। আর ইব্রাহিম-ডিক্রুজা যদি পার্টনার-ইন-ক্রাইম হয়, তাহলে ডক্টর অ্যান্ড মিসেস সেন অথবা আলি-কাবেরী গ্রুপকে সন্দেহ করতে হয়। অজয়বাবু একটু রগচটা প্রকৃতির—কিন্তু তাঁকে সন্দেহ করার কোনও কারণ দেখছি না। আচ্ছা ভালো কথা—বাসু-সাহেব আমাকে বলেছেন যে তিনি ইব্রাহিম আর ডিক্রুজাকে নিশ্চিতভাবে স্পট করেছেন। আপনাদের কিছু বলেছেন তিনি?'

সুজাতা বলে, 'বাসু-সাহেব কখন কী ভাবছেন বোঝা মুশকিল; কিন্তু উনি আমার সাহায্যে একটা ছোট্ট তদন্ত করিয়েছিলেন—।'

'কী তদন্ত?'

'কাবেরী দেবীর ঘরের অ্যাশট্রেটা আমাকে দিয়ে আনিয়ে উনি কী যেন পরীক্ষা করেন।'

হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে পড়ে সুবীর। একটানে পরদাটা সরিয়ে দেয়। দেখা গেল পরদার ওপাশে ডক্টর সেন দাঁড়িয়ে ছিলেন। থতমত খেয়ে ডক্টর সেন বললেন, 'ইয়ে, আজ আর থার্ড কাপ চা পাওয়া যাবে না, না মিসেস মিত্র?'

ভ্রূ কুঞ্চিত করে সুজাতা বললে, 'চায়ের সন্ধানে এখানে?'

'না, মানে রান্নাঘরে আপনাকে দেখতে না পেয়ে—।'

'আসুন।' সুজাতা ডক্টর সেনকে নিয়ে নীচে নেমে গেল।

ও. সি. দার্জিলিঙের উপস্থিতি অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল অন্য একটি কারণে। কাল রাত্রেই সুবীর জানতে চেয়েছিল আসামীদের মধ্যে কার-কার কাছে আগ্নেয়াস্ত্র আছে। বাসু-সাহেব তৎক্ষণাৎ স্বীকার করেছিলেন, তাঁর কাছে আছে।

সুবীর প্রশ্ন করে, 'অরূপরতন যখন গুলিবিদ্ধ হয় তখন রিভলভারটা কোথায় ছিল?'

'আমার ডান হাতে। আমি রিভলভারটা হাতে নিয়ে বসেছিলাম ওই ইজিচেয়ারে। পশ্চিম-মুখো—।'

ভ্রূ কুঞ্চিত হয়েছিল সুবীরের। বলেছিল, 'কেন? রিভলভার হাতে বসেছিলেন কেন?'

'একটা প্রিমনিশান হয়েছিল আমার। মনে হচ্ছিল এখনই এই মুহূর্তেই একটা দুর্ঘটনা ঘটবে। আমি সহদেবের প্রতীক্ষা করছিলাম।'

বাসু একে-একে সকলের দিকে তাকিয়ে দেখেন—আলি, অজয়, ডাক্তার সেন, কৌশিক—সকলেই পাথরের মূর্তি। সুবীর বললে, 'আপনার রিভলভারটা দেখি?'

অম্লান বদনে বাসু-সাহেব হস্তান্তরিত করলেন আগ্নেয়াস্ত্রটা। বললেন, 'ওটা লোডেড।' সুবীর সেটা শুঁকে দেখল। চেম্বারটা খুলে কী যেন দেখল। যন্ত্রটার নম্বর নোটবুকে টুকে নিয়ে ফেরত দিল সেটা। তারপর এদিকে ফিরে বলল, 'আর কার কাছে রিভলভার আছে?'

কেউ জবাব দেয়নি।

'এ-ক্ষেত্রে বাধ্য হয়ে প্রত্যেকের মালপত্র আমাকে সার্চ করতে হবে।'

প্রতিবাদ করেছিলেন অজয় চট্টোপাধ্যায়। বলেছিলেন, 'আগে থানা থেকে সার্চ ওয়ারেন্ট করিয়ে আনুন, তারপর আমার বাক্স ঘাঁটবেন। তার আগে নয়।'

'কেন? আমি তো প্রত্যেকের বাক্সই সার্চ করতে চাইছি। আর কেউ তো তাতে আপত্তি করছেন না। আপনি একাই বা কেন—।'

'করছি। আমারও আপত্তি আছে।' বলেছিলেন আলি।

বাসু-সাহেব বলেছিলেন, 'সার্চ ওয়ারেন্ট ছাড়া তুমি হোটেল তল্লাশি করতে পার না।'

গুম মেরে গিয়েছিল সুবীর। আলি হেসে বলেছিলেন, অর্থাৎ অবজেকশান সাসটেইন্ড।

তাই সকালে উঠেই সুবীর চলে গিয়েছিল ঘুম আউটপোস্ট-এ। সেখানে গিয়ে জানতে পারে ঘুম অঞ্চলের সমস্ত টেলিফোন বিকল। বাধ্য হয়ে সে নাকি দার্জিলিঙে স্পেশাল মেসেঞ্জার পাঠিয়েছে। রাত্রের মধ্যেই ও. সি. দার্জিলিং এসে যাবেন। সার্চ-ওয়ারেন্ট আসবে। আর হয়তো কাঞ্চনজঙ্ঘা হোটেলের রুম-সার্ভিসের বেয়ারা বীরবাহাদুর। যে রিপোজ-এর আবাসিকদের দর্শন-মাত্র বলে দিতে পারে, মহম্মদ ইব্রাহিম অথবা ভিক্রুজা এখানে আছে কিনা।

সন্ধ্যাবেলায় সুবীর রায়ের আহ্বানে সকলে সমবেত হলেন ড্রইংরুমে। সুবীর নাকি সকলকে সম্বোধন করে কিছু জানাতে চায়। সবাই এসে গুটিগুটি বসেছেন ড্রইংরুমে।

দিনের আলো নিবে গেছে। গোটা তিন-চার মোমবাতি জ্বলছে ঘরের এ-প্রান্তে ও-প্রান্তে। এলোমেলো হাওয়ায় মোমবাতির শিখা কাঁপছে। সেইসঙ্গে কাঁপছে আতঙ্কতাড়িত আবাসিকদের অতিকায় ছায়ামিছিল।

গলাটা সাফ করে নিয়ে সুবীর বলে, 'অপ্রিয় সত্যটা অস্বীকার করে লাভ নেই—আমাদের মধ্যেই একজন আছেন যিনি মিস্টার মহাপাত্রের দুর্ঘটনার জন্যে দায়ী। রমেনবাবুর মৃত্যুর সঙ্গে তাঁকে যুক্ত করা যায় কি না সেকথা ঠিক এখনই বলা যাচ্ছে না, কিন্তু অরূপ মহাপাত্রকে যে লোকটা পিছন থেকে গুলিবিদ্ধ করে সে এখন বসে আছে এই ঘরেই—আমাদের মধ্যে আত্মগোপন করে। এ-যুক্তিতে আপত্তি আছে কারও?'

কেউ কোনও জবাব দেয় না।

সুবীর পুনরায় বলে, 'আপনারা এ-যুক্তি মেনে নিলেন। এবার আরও স্পেসিফিক্যালি বলি ঃ আমরা দশ-বারো জন আছি, তার মধ্যে মিসেস বাসুকে আমরা বাদ দিতে পারি। কারণ তাঁর অ্যালিবাই অকাট্য। তিনি নিজের ঘরে বসে গান গাইছিলেন—সে গান আমরা সবাই শুনেছি, গুলির শব্দের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত। দ্বিতীয়ত—ওয়েল, আর যুক্তির প্রয়োজন নেই, মিসেস বাসু অনারেবলি অ্যাকুইটেড। এগ্রিড?'

এবারও কেউ কোনও সাড়া দিল না।

'তাহলে বাকি রইলাম আমরা ন'জন। আসুন, এবার আমরা বিচার করে দেখি—এই ন'জন ঘটনার মুহূর্তে কে কোথায় ছিলেন, কারও কোনও অ্যালিবাই আছে কি না, একে-একে আপনারা বলুন—।'

'ন'জন বলতে?' প্রশ্ন করেন অজয়বাবু।

'মিস্টার কৌশিক মিত্র, মিসেস মিত্র, ডক্টর অ্যান্ড মিসেস সেন, মিস্টার অজয় চ্যাটার্জি, কাবেরী দেবী, মিস্টার আলি, মিস্টার বাসু এবং কালীপদ।'

'অ্যান্ড হোয়াই নট মিস্টার সুবীর রয়?' প্রশ্ন অজয় চাটুজ্জের।

আলি উৎফুল্ল হয়ে বলে, 'পার্টিনেন্ট কোশ্চেন! হিন্দু-দর্শনে দশমস্তমসি বলে একটা কথা আছে না?'

সুবীর হেসে বলে, 'আছে। বেশ আমরা দশজন। আমিই বা বাদ যাই কেন অঙ্কের হিসেব থেকে! তাহলে আমিই আগে কৈফিয়তটা দিই, আমি ছিলাম বাথরুমে। হট-বাথ নিচ্ছিলাম। গান আমি শুনতে পাইনি, তবে গুলির শব্দটা শুনেছি। জামা-কাপড় পরে বের হয়ে আসতে আমার মিনিট দুই দেরি হয়েছিল। আমিই বোধ হয় সবার শেষে ড্রইংরুমে এসে পৌঁছই। এবার আপনারা সবাই বলুন—কৌশিকবাবু?'

'আমি ছিলাম ছাদে। গান শুরু হতেই শুনতে পেয়েছিলাম। আমি তখন নেমে আসি।'

'ছাদে! ছাদ তো ঢালু ছাদ—' সুবীর প্রশ্ন করে।

'না, ঠিক ছাদে নয়, মই বেয়ে উঠে আমি রেনওয়াটার পাইপটা বন্ধ হয়ে গেছে কি না দেখছিলাম! দোতলায় নেমে এসে দেখি—দক্ষিণের বারান্দার ও-প্রান্তে একজন মহিলা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছেন। জানি না—তিনি কাবেরী দেবী অথবা মিসেস সেন! সুজাতা নয়, কারণ আমি তাকে মিট করি একতলায়, কিচেন-ব্লকের সামনে—।'

ওর বক্তব্যের সূত্র ধরে কাবেরী বলে ওঠে, 'ওখানে আমিই দাঁড়িয়েছিলাম। গান শুনছিলাম। আমি কৌশিকবাবুকে নেমে আসতে দেখেছিলাম। কৌশিকবাবুই কি না হলফ করে বলতে পারব না, কারণ আলো ছিল খুব কম। একজন পুরুষমানুষকে বর্ষাতি গায়ে এবং টর্চ হাতে দেখেছিলাম

মাত্র।'

ডক্টর সেন বলেন, 'অর্থাৎ আপনারা দুজন দুজনের অ্যালিবাই, কেমন?'

আলি বলে ওঠেন, 'ব্যারিস্টার-সাহেব কী বলেন? ওঁরা তো কেউ কাউকে চিনতে পারেননি। ইনি দেখেন নারী-মূর্তি, উনি দেখেছেন পুরুষ-মূর্তি। তাতে কী প্রমাণ হয়?'

বাধা দিয়ে সুবীর বলে, 'সে বিশ্লেষণ থাক। আপনি তখন কোথায় ছিলেন?'

'নিজের ঘরে। একটা ডিটেকটিভ গল্প পড়ছিলাম। আগাথা ক্রিস্টির "মাউসট্র্যাপ"।'

'অর্থাৎ আপনার কোনও অ্যালিবাই নেই?'

'আগাথা ক্রিস্টি আমার অ্যালিবাই।'

অজয় চট্টোপাধ্যায় চটে উঠে বলেন, 'এই কি আপনার রসিকতা করবার সময়?'

'কেন নয়? আমরা তো এসেছি বেড়াতে, ফূর্তি করতে, পাহাড় দেখতে—তাই নয়?'

সুবীব অজয়বাবুকে প্রশ্ন করে, 'আপনি কোথায় ছিলেন?'

'কে, আমি?' সচকিত হয়ে ওঠেন অজয় চাটুজ্জে। তারপর সামলে নিয়ে বলেন, 'আমি ইয়ে—আহ্নিক করছিলাম।'

'আহ্নিক! মানে?' প্রশ্ন করে সুবীর রায়।

আবার চটে ওঠেন অজয়বাবু ঃ 'আপনি হিন্দুর ছেলে, তাই আহ্নিক বোঝেন না। আলি-সাহেবকে জিজ্ঞাসা করবেন, উনি বুঝিয়ে দেবেন সন্ধ্যাহ্নিক বলতে কী বোঝায়।'

সুবীর এ-বক্রোক্তি গলাধঃকরণ করে ডাক্তার সেনকে বলে, 'আপনি কী বলেন?'

'ওই সন্ধ্যাহ্নিক বিষয়ে?' জানতে চান ডক্টর সেন।

ধমক দিয়ে ওঠে সুবীর, 'আজ্ঞে না। আপনারা দুজন তখন কোথায় ছিলেন?'

'তাস খেলছিলাম। উনি আর আমি। আমরা দুজন দুজনের অ্যালিবাই।'

আলি হেসে ওঠেন, 'অবজেকশান ইয়োর অনার। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই সাসপেকটেড। এক্ষেত্রে কি ওঁরা পরস্পরের অ্যালিবাই হতে পাবেন?'

মিসেস সেন চিৎকার কবে ওঠেন, 'সাসপেকটেড মানে? হাউ ডেয়ার য়ু—।'

সুবীর তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বলে, 'ব্যারিস্টার-সাহেব কাউকে কিছু প্রশ্ন করবেন?'

বাসু-সাহেব বলেন, হ্যাঁ, করব। তোমাকেই করব। আজ রাত্রে কি নৃপেন এখানে এসে পৌঁছতে পাববে?'

'তাই তো আশা করছি।'

'কাঞ্চনজঙ্ঘা হোটেলের বেয়ারা বীরবাহাদুরও কি আসবে?'

'হ্যাঁ, আসবে। আমাদের মধ্যে ইব্রাহিম অথবা মিস ডিক্রুজা আছে কি না সেটা আজ রাত্রেই জানা যাবে—' বলেই সুবীর একে-একে সকলের দিকে তাকায়। এ ঘোষণায় শ্রোতৃবৃন্দের কার মুখে কী অভিব্যক্তি হচ্ছে জেনে নিতে চায়। তারপর সে আবার বলে, 'আপনাদের সকলের সহযোগিতার জন্যে ধন্যবাদ। এবার আমাব একটি প্রস্তাব আছে। আমি একটা পরীক্ষা করতে চাই। আশা কবি সকলের সহযোগিতা পাব।'

'কী জাতের পরীক্ষা?' জানতে চান অজয়বাবু।

জবাবে সুবীর বলে, 'একটা কথা তো মানবেন যে, আমাদের মধ্যে অন্তত একজন মিথ্যে কথা বলেছেন। ঘটনার মুহূর্তে তিনি বাস্তবে ছিলেন অরূপবাবুর পিছনে। তিনি কে, তা আমরা জানি না—কিন্তু জানতে চাই। তাই আমার প্রস্তাব—আজ রাত ঠিক সাড়ে আটটায় আমরা প্রত্যেকে গতকালকার পজিসানে ফিরে যাব। ড্রইংরুমের ঘড়িতে সাড়ে আটটার শব্দ হতেই রাণী দেবী তাঁর ঘরে বসে ওই গানটাই গাইবেন। আমরা এইমাত্র আমাদের জবানবন্দিতে যে কথা বলেছি ঠিক তাই-তাই করে যাব আটটা তেত্রিশ পর্যন্ত। ঠিক আটটা তেত্রিশে আমি ড্রইংরুমে একটা ব্ল্যাঙ্ক ফায়ার

করব। আপনারা গতকালকের মতো সবাই ছুটে আসবেন ড্রইংরুমে।'

অজয়বাবু বলেন, 'তাতে কোন চতুর্বর্গ লাভ হবে?'

'যারা সত্যি কথা বলেছে, তারা গতকালকার আচরণ অনুযায়ী আজকেও কাজ করে যেতে পারবে। কিন্তু যে মিথ্যে কথা বলেছে, তার ব্যাপারটা গুলিয়ে যাবেই। সে এমন একটা কিছু করে বসবে যাতে সে ধরা পড়ে যাবে। এটা ক্রাইম-ডিটেকশানের একটি সাম্প্রতিক পদ্ধতি। অনেক সময়েই এতে সুফল পাওয়া গেছে। না কি, বলুন, বাসু-সাহেব?'

বাসু-সাহেব বলেন, 'হতে পারে। আমি ব্যাক-ডেটেড। আমি এ-পদ্ধতির কথা শুনিনি।'

আলি বলে ওঠে, 'আমি শুনেছি মিস্টার রায়, আগাথা ক্রিস্টির ''মাউসট্র্যাপে'' ঠিক ওই ধরনের একটা পরীক্ষার কথা আছে—।'

অজয়বাবু বলেন, 'দুর মশাই! তাই কি হয় নাকি? কাল যদি আমিই গুলি করে থাকি, তা হলে আজ কি আর সারা বাড়ি দাপাদাপি করে বেড়াব? আজ তো গ্যাঁটসে নিজের ঘরে বসে সীতারাম জপ করব!'

সুবীর বলে, 'তাই করবেন। তাহলে তো আর আপনার আপত্তি নেই?'

কাবেরী বলে, 'তবু একটা তফাত হবে কিন্তু মিস্টার রায়। আজ আর গানের সঙ্গে পিয়ানো বাজবে না।'

'বাজবে।' সুবীর ওকে আশ্বস্ত করে।

'বাজবে? কেমন করে? কে বাজাবে আজ?'

'আমি বাজাব। আমার ঘরে জলের কলটা খোলা থাকবে, কিন্তু আমি বাথরুমে থাকব না। আমি আজ অভিনয় করব অরূপরতনের চরিত্রটা। অর্থাৎ, গান অন্তরায় পৌঁছলে আমি পিয়ানো বাজাতে শুরু করব। আপনি, রাণী দেবী—গত কালকের মতোই এক লাইন আমাকে ''সোলো'' বাজাতে দেবেন। তারপর মিউজিকে যোগ দেবেন, কেমন?'

আলি বললে, 'আপনি পিয়ানো বাজাতে জানেন?'

'জানি।'

'অত ভালো?'

'রাত সাড়ে আটটায় এ-প্রশ্নের জবাব পাবেন।'

আলি বিজ্ঞের মতো মাথা নেড়ে বললেন, 'বুঝেছি, মহাভারতে আছে আত্মশ্লাঘা আত্মহত্যার নামান্তর!'

মিসেস সেন বলেন, 'আপনি কথায়-কথায় মহাভারত পাড়েন কেন বলুন তো?'

'মহাভারত আর রামায়ণ হচ্ছে আমার প্রিয় গ্রন্থ। আর বিভীষণ হচ্ছে আমার হিরো। মন্দোদরী বিভীষণকে নিকা করেছিল কি না ঠিক জানি না—সুজাতা দেবী বলতে পারবেন?'

আলোচনা প্রসঙ্গান্তরে যাচ্ছে দেখে সুবীর বলে ওঠে, 'থ্যাঙ্কু অল। রাত আটটা হয়েছে। এবার তাহলে আমরা সবাই প্রস্তুত হই।'

ডক্টর সেন বলেন, 'একটা কথা। আটটা তেত্রিশে ব্ল্যাঙ্ক ফায়ার শুনে আমরা সবাই ছুটে আসব, তারপর?'

সুবীর জবাবে বলে, 'তার পরেও আপনারা কালকের আচরণ করে যাবেন। আপনারা এসে দেখবেন, আমি ঠিক ওইখানে উপুড় হয়ে পড়ে আছি। অর্থাৎ, আমিই যেন অরূপবাবু। আপনি, ডক্টর সেন, আমাকে পরীক্ষা করে বলবেন, থ্যাঙ্ক গড! গুলিটা কাঁধে লেগেছে! ফেটাল নয়!'

ডক্টর সেন গম্ভীর হয়ে ঘাড় নাড়লেন।

'কিন্তু একটা কথা,' সতর্ক করে দেয় সুবীর, 'কোনও কারণেই আজ ওই তিন মিনিটের জন্যে আপনারা অন্যরকম আচরণ করবেন না। ঠিক কাল যা করেছেন তাই করবেন। অন্যরকম

আচরণ করতে বাধ্য হবে অবশ্য ক্রিমিনাল নিজে—।'

মিসেস সেন হঠাৎ হাততালি দিয়ে ওঠেন : 'গ্র্যান্ড আইডিয়া! খেলাটা জমবে—ঠিক পার্টিতে যেমন হয়।'

সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে।

রাত আটটা পঁচিশ।

বাসু-সাহেব রিভলভারটা নিয়ে উত্তরের বারান্দায় চলে গেলেন। বসলেন গিয়ে ইজিচেয়ারে। অরূপ অঘোরে ঘুমাচ্ছে। রাণী দেবী তাঁর হুইল চেয়ারে বসে আছেন জানলার দিকে মুখ করে—উৎকর্ণ হয়ে আছেন, কখন 'ঢং' করে বেজে উঠবে হলঘরের দেওয়াল-ঘড়িটা।

কৌশিক টর্চ নিয়ে মই বেয়ে ছাদে উঠে গেল। আলি-সাহেব পড়া বইয়ের শেষ ক'টা পাতা আবার পড়তে বসেছেন। কাবেরী উৎকর্ণ হয়ে বসে আছে তার বিছানায়—কখন শুরু হয় গান। সুজাতা রান্নাঘরে। ডক্টর সেন বললেন, 'কাল ঠিক সাড়ে আটটার সময় তুমি ডিল করছিলে—তাসটা ধরো!'

অজয় চাটুজ্জে আহ্নিকে বসেছেন। অন্তত আজকের রাতে।

আটটা আঠাশ। সুবীর রায়ের বাথরুমে কলের জল পড়তে শুরু করল।

দু-নম্বর ঘর।

রাণী দেবী নিজের মণিবন্ধে ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখলেন : আটটা উনত্রিশ।

'খুট' করে শব্দ হল পিছনে। রাণী হুইল চেয়ারটা ঘুরিয়ে অবাক হয়ে গেলেন। ওঁর থেকে হাত-তিনেক দূরে দাঁড়িয়ে আছে সুবীর রায়।

'কী ব্যাপার, আপনি?'

'আপনাকে আর গান গাইতে হবে না মিসেস বাসু—।'

'হবে না! সে কী? বাড়িসুদ্ধ সবাই যে আমার গান শুনতে—।'

'আপনার গান নয়, ওঁরা উদগ্রীব হয়ে আছেন সত্যিকারের রাণী দেবীর গান শুনতে।'

'মানে?'

'মানে এ সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। সহদেব হুই কে তা জানা গেছে!'

'আপনি জানেন?'

'জানি। আপনিও এখনই জানবেন—।'

দোতলায় সাত নম্বর ঘর।

কাবেরী বসেছিল খাটে। শুনল শুরু হয়ে গেল গান :

"যদি জানতেম আমার কীসের ব্যথা তোমায় জানাতাম।"

এক লাইন গান হতেই 'ঢং' করে সাড়ে আটটা বাজল। রাণী দেবী কয়েক সেকেন্ড আগেই শুরু করেছেন তাহলে। শুরু হতেই বেজে উঠল পিয়ানো। কালকের মতোই রাণী দেবী চুপ করে গেলেন। এক লাইন শুধু পিয়ানো বেজে গেল। তারপর শুরু হল যৌথসংগীত। কণ্ঠসংগীত আর যন্ত্রসংগীত। কাবেরী খাট থেকে নামল, ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল বারান্দায়। ঠিক কালকের মতো রেলিঙে ভর দিয়ে দাঁড়াল। গান তখন পৌঁছেছে সঞ্চারীতে :

"এই বেদনার ধন সে কোথায় ভাবি জনম ধরে,
ভুবন ভরে আছে যেন, পাইনে জীবন ভরে।।"

হঠাৎ সচকিত হয়ে কাবেরী লক্ষ করে, বিদ্যুৎগতিতে মই বেয়ে নেমে আসছে কৌশিক। দ্বিতলে সে মুহূর্তের জন্যও দাঁড়াল না কালকের মতো। যেন তাকে পিছন থেকে তাড়া করেছে উদ্যত পিস্তল এক খুনি আসামি! প্রাণপণে সে ছুটে নেমে গেল একতলায়। কী ব্যাপার? কৌশিক তো নিয়ম মানছে না! গতকালকার আচরণের পুনরাভিনয় তো সে করল না! চকিতে কাবেরীর মনে হল, তবে কি কৌশিক—।

কৌশিকের দোষ নেই। বেচারি নির্দেশমতো মই বেয়ে উঠে গিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু গান শুরু হতেই ওর কেমন যেন সব গুলিয়ে গেল। ওর মনে হল ইব্রাহিমের পরিত্যক্ত সেই 'এক ঃ দুই ঃ তিন' লেখা কাগজখানার কথা। ওর মনে হল—আততায়ী কাল যে-সুযোগ পেয়েছিল ঠিক সেই সুযোগ ওরা যৌথভাবে তাকে পাইয়ে দিচ্ছে! হুবহু এক পরিবেশ! খুনিটা কি এই সুযোগ নেবে না? যদি নেয়? কে তার তিন নম্বর টার্গেট?

ভেসে আসছে অস্ফুট সংগীত ঃ

"কোথায় যে হাত বাড়াই মিছে ফিরি আমি কাহার পিছে
সব কিছু মোর বিকিয়েছে, পাইনি তাহার দাম।"

কৌশিকের মনে হল এই মুহূর্তেই বুঝি তার সব কিছু বিকিয়ে যেতে বসেছে। হয়তো এতক্ষণে খুনিটা কিচেন-ব্লকে ঢুকে—।

সব কিছু ভুল হয়ে গেল কৌশিকের। সে বিদ্যুৎবেগে নেমে এল একতলায়।

আবার ওই দু নম্বর ঘর। রাণী দেবী আর সুবীর রায়। মুখোমুখি। রাণী রীতিমতো আতঙ্কতাড়িত। বলছে, 'এসব কী বলছেন আপনি? আমি-আমি কী দোষ করলাম?'

নেপথ্যে তখন শোনা যাচ্ছে গান এবং যন্ত্রসংগীত।

সুবীর বললে, 'দোষ করেছেন ব্যারিস্টার পি. কে. বাসু। প্রায়শ্চিত্ত করবেন তাঁর স্ত্রী—আপনি!'

পকেট থেকে একটা রিভলভার বের করল সুবীর।

রাণী আর্তনাদ করতে গেলেন, স্বর ফুটল না তাঁর কণ্ঠে।

কিচেন-ব্লকটা অন্ধকার। মোমবাতি নিবে গেছে ঝোড়ো হাওয়ায়। কৌশিক টর্চ জ্বেলে চারিদিক দেখল। সুজাতা কোথাও নেই। অস্ফুটে একবার ডাকল, 'সুজাতা!'

কেউ সাড়া দিল না।

কৌশিক ঘুরে দাঁড়ায়। ছুটে বেরিয়ে আসে দক্ষিণের বারান্দায়। পরদা সরিয়ে ঢুকে পড়ে ডাইনিং রুমে। সেখানেও কেউ নেই। কিন্তু ও কী, পিয়ানোর টুলে তো সুবীর রায় বসে নেই! অথচ কী আশ্চর্য, গান হচ্ছে—পিয়ানো বাজছে! যন্ত্রসংগীত আর কণ্ঠসংগীত যৌথভাবে ফিরে এসেছে স্থায়ীতে ঃ

"যদি জানতেম আমার কীসের ব্যথা— ।"

হঠাৎ কে যেন স্পর্শ করল ওর বাহুমূল। চমকে উঠল কৌশিক। দেখে, সুজাতা। ঠোঁটে আঙুল ছুঁইয়ে সুজাতা ওর বাহুমূল ধরে আকর্ষণ করছে। কৌশিক ওকে অনুসরণ করে এগিয়ে আসে। চার নম্বর ঘরের পরদা সরিয়ে সুজাতা প্রবেশ করল সুবীর রায়ের ঘরে। কৌশিক তার পিছন-পিছন। ঘর নিরন্ধ্র অন্ধকার—কিন্তু সেই ঘরই হচ্ছে সংগীতের উৎস। টর্চ জ্বালল সুজাতা ঃ টেবিলের ওপর একটা ব্যাটারি সেট টেপ রেকর্ডার চক্রাবর্তনের পথে গাইছে ঃ

"—তোমায় জানাতাম!
কে যে আমায় কাঁদায় আমি কি জানি তার নাম।।"

কৌশিক সুজাতার বাহুমূল ধরে এবার টানে। বলে, 'কুইক!'

'কী?'

'বাসু-সাহেব অথবা রাণী দেবী—।'

ওরা ছুটে বেরিয়ে আসতে চায়, ঠিক তখনই হল একটা ফায়ারিঙের শব্দ। ঠিক পাশের ঘর থেকে। কৌশিক দাঁড়িয়ে পড়ে—গুলিটা যেন তারই পাঁজরে বিঁধেছে!

সুজাতা শুধু বললে, 'শেষ হয়ে গেল!'

গুলির শব্দ শুনে সকলেই নেমে এসেছে। ডক্টর আর মিসেস সেন, কাবেরী, আলি আর অজয়বাবু প্রায় একইসঙ্গে প্রবেশ করলেন ডাইনিং রুম পার হয়ে ড্রইংরুমে। আলি টর্চ জ্বাললেন। আশ্চর্য! পিয়ানোর টুলে কেউ নেই। ভূতলেও নেই।

ঠিক তখনই চার নম্বর ঘর থেকে ছুটে বের হয়ে এল কৌশিক আর সুজাতা। কৌশিক বলল, 'কুইক! আসুন আপনারা—।'

ওরা হুড়মুড়িয়ে বের হয়ে এল উত্তরের বারান্দায়। টর্চের আলো পড়ল বাসু-সাহেবের চিহ্নিত ইজিচেয়ারে। সেটা ফাঁকা। এবার ওরা সদলবলে ঢুকে পড়ে বাসু-সাহেবের ঘরে।

ভাগ্যক্রমে ঠিক তখনই লাইট-কানেকশানটা ফিরে এল। আলোয় ঝলমলিয়ে উঠল 'রিপোজ'।

অরূপরতন শুয়েছিল বাসু-সাহেবের খাটে। বালিশে ভর দিয়ে মাথাটা তুলেছে সে। দু-হাতে মুখ ঢেকে রাণী দেবী নিথর হয়ে বসে আছেন তাঁর চাকা-দেওয়া চেয়ারে। ড্রেসিংরুমের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন ব্যারিস্টার পি. কে. বাসু। তাঁর হাতে উদ্যত রিভলভার।

আর মেঝেতে লোটাচ্ছে সুবীর রায়। রক্তে ভেসে যাচ্ছে সে।

হঠাৎ হুমড়ি খেয়ে পড়েন ডাক্তার সেন। পরমুহূর্তেই মুখ তুলে বলেন, 'থ্যাঙ্ক গড! গুলিটা পেলভিক বোনে লেগেছে—ফেটাল নয়!'

গতকালকার উক্তির সজ্ঞান অভিনয় নয়—অরিজিনাল ডায়ালগ।

সুবীরের জ্ঞান ছিল। যন্ত্রণায় সে কাতরাচ্ছে।

কৌশিক সবিস্ময়ে বাসু-সাহেবকে বলে, 'কী ব্যাপার?'

বাসু-সাহেব গম্ভীরমুখে বলেন, 'আস্ক সহদেব!'

'সহদেব! মানে?'

রিভলভারটা দিয়ে ভূলুণ্ঠিত সুবীর রায়কে নির্দেশ করে বাসু বলেন, 'সহদেব হুই। আর্চ গ্যাংস্টার, বাফেলো, ম্যারিকা!'

॥ আট ॥

৫ অক্টোবর, শনিবার।

ঝলমলে রোদ উঠেছে আজ। মেঘ সরে গেছে। গাঁইতি আর কোদাল নিয়ে গ্যাং কুলিরা নেমেছে কার্ট রোড মেরামত করতে। উৎপাটিত টেলিগ্রাম পোল আবার মাথা তুলে খাড়া হচ্ছে। মিলিটারি জিপ নাচতে-নাচতে চলতে শুরু করেছে, গর্তে-ভরা কার্ট রোড দিয়ে। অনেক কষ্টে অ্যাম্বুলেন্স ভ্যান এসে নিয়ে গেছে দুজন আহত মানুষকে রিপোজ থেকে হাসপাতালে।

আজ মেঘভাঙা সকালে সবাই আবার গোল হয়ে বসেছে ড্রইংরুমে বাসু-সাহেবকে ঘিরে। পবিচিত দলের মধ্যে যোগ হয়েছে একটি নতুন মুখ—দার্জিলিং থানার ও. সি. নৃপেন ঘোষাল। সে কোনও টেলিফোন পেয়ে আসেনি। রাস্তায় জিপ চলতে শুরু করা মাত্র নৃপেন চলে এসেছিল ঘুমে। খবর নিতে রিপোজের অবস্থা। নৃপেন প্রশ্ন করে, 'আপনি স্যার ঠিক কখন বুঝতে পারলেন?'

'একেবারে প্রথম সাক্ষাৎ মুহূর্তেই।'

'প্রথম সাক্ষাতেই!' চমকে ওঠে কৌশিক, 'কেমন করে?'

'মাবাত্মক একটা ভুল করে বসেছিল সুবীর, আই মিন সহদেব! দোসরা তারিখে বাত এগারোটায় সে নিজেই ফোন করে তোমাদের বলেছিল, আমি নৃপেন ঘোষাল, ও. সি. দার্জিলিং বলছি। তাবপর মধ্য রাত্রে এখানে আসবার আগে সে বাড়ির বাইরে টেলিফোনের লাইনটা ছিড়ে ফেলে, যাতে আমবা আর থানার সঙ্গে যোগাযোগ না করতে পারি—।'

কৌশিক বাধা দিয়ে বলে, 'সে তো বুঝলাম, কিন্তু আপনি কেমন করে বুঝলেন, ও জাল?'

'বলছি। পরদিন সকালে তার সঙ্গে আমার পরিচয় হল। প্রথম সাক্ষাতেই আমি ইব্রাহিমের সেই "এক ঃ দুই ঃ তিন" লেখা কাগজটার প্রসঙ্গ তুললাম। সুবীরবেশী সহদেব তখন একটা দুঃসাহস দেখিয়ে বসে। ও চেয়েছিল আমাদের—মানে, তোমাদের ভয় দেখাতে, ভয়ে নার্ভাস করে দিতে। বেড়াল যেমন খেলিয়ে নিয়ে ইঁদুরছানাকে মারে—তাই সে ওই "এক ঃ দুই ঃ তিন" লেখা কাগজখানা তোমাদের দেখাতে চাইল। আগে থেকেই সেটা ও নতুন করে লিখে এনেছিল। ও তাই কাগজখানা সকলকে দেখাবার লোভ সামলাতে পারল না। হয়তো ও আমাকে ওইভাবে ঠকাতে চেয়েছিল, পাছে আমি ওর আইডেন্টিটি কার্ড দেখতে চাই, তাই ওভাবে ওর অভিজ্ঞান অঙ্গুরীয় মেলে ধরেছিল আমাব কাছে—প্রমাণ করতে চেয়েছিল যে, ও নৃপেনের কাছ থেকে আসছে। আর তাতেই ও ধরা পড়ে গেল।'

সুজাতা বলে, 'কেমন করে? কাগজখানা তো আমবাও দেখেছি।'

'দেখেছ। কিন্তু তোমরা দেখেছ মাত্র একবার। আমি দেখেছি দুবার। আমার ক্রিমিনাল ল-ইয়ারের চোখ ভুল করেনি। কাগজখানা দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম—ওই লোকটাই সহদেব, ও নৃপেনের সহকারী সুবীর রায় নয়!'

'কেমন করে?'

'নৃপেন যে কাগজটা দেখিয়েছিল, সেখানা আর এই কাগজটা হুবহু এক। দুটোই চব্বিশ পাউন্ডের ব্যাঙ্ক-পেপার, একই কালো কালি, একই হস্তাক্ষর, একইভাবে ওপরদিকে পারফোরেটেড এবং ডান কোণায় ছেঁড়া। তবু একটি অতি সূক্ষ্ম তফাত ছিল। প্রথমবার দার্জিলিঙ শব্দটার শেষ অক্ষরটা ছিল "ঙ", দ্বিতীয়বার "ং"। ব্যস! চূড়ান্তভাবে ধরা পড়ে গেল সহদেব।'

সুজাতা আবার বলে, 'কিন্তু কেমন করে?'

'বুঝলে না? "ঙ" মুছে গিয়ে "ং" এল কেমন করে? ফলে এখানা নতুন করে লেখা—কে লিখেছে—নিঃসন্দেহে যে সেটা দাখিল করছে! কিন্তু দুটি কাগজের হস্তাক্ষর এক হয় কী করে?

অর্থাৎ ওই ইব্রাহিম, যে লোকটা পয়লা তারিখ কয়েক মিনিটের জন্যে ওই মাস্টার-কি দিয়ে তেইশ নম্বর ঘরে ঢোকবার সুযোগ পেয়েছিল! রানু, তোমার মনে আছে, আমি তখনই বলেছিলাম সহদেবকে আমি চিনতে পেরেছি, কিন্তু প্রমাণ এমন পাক্কা নয় যাতে খুনি আসামির কনভিকশান হতে পারে!

মিসেস সেন বলেন, 'ইস, তাই সব জেনেশুনে আপনি ঘাপটি মেবে বসেছিলেন।'

'ইয়েস ম্যাডাম! তাই সব জেনেশুনে আমি ঘাপটি মেরে বসেছিলাম। কিন্তু আমার ভুল কোথায হল জানো? আমি ভেবেছিলাম আমিই ওর সেকেন্ড টার্গেট—অরূপ নয়, ওখানেই সে আমাকে টেক্কা মেবেছে! কিন্তু তৃতীয়বার আমি আব ভুল করিনি—বুঝতে পেরেছিলাম, এবার ওর টার্গেট হচ্ছে বানু।'

কাবেবী প্রশ্ন করে, 'কেন? মিসেস বাসু কেন?'

'কারণ সহদেব জানত আমি সশস্ত্র আছি। ও বুঝতে পেরেছিল আমি ওর নাগালের বাইরে, গুলি করতে গেলে গুলি খেতে হতে পারে। তা ছাড়া ও জানত রানুর মৃত্যু আমার কাছে মর্মান্তিক যন্ত্রণাদাযক হবে, কারণ—।'

'কারণ?' সুজাতা জানতে চায়।

বাসু-সাহেব রাণীর দিকে ফিরে বলেন, 'সবার সামনে বলব?'

হতচকিত হয়ে রাণী বলেন, 'কী?'

'রানুকে আমি ভীষণ ভালোবাসি?'

সবাই হেসে ওঠে ওঁর ভঙ্গিতে। মিসেস বাসুও রাঙিযে ওঠেন। বলেন, 'ছাই বাসো। আচ্ছা, ওই লোকটা যখন আমাকে বলছিল যে, সে আমাকে খুন করতে চায়, তখন পবদাব আড়ালে দাঁড়িয়ে তুমি কী করে চুপ করে ছিলে? তুমি পারলে ওই খুনিটার সামনে আমাকে ওভাবে বসিয়ে বাখতে?'

বাসু-সাহেব মুখটা সুচালো কবেন। নীরবে মাথাটা নাড়েন সম্মতিসূচক ভাবে।

'তোমার একটুও মায়া হল না?'

'কই আর হল রানু? মিস ডিক্রুজাকে যখন খুঁজে পাওয়া গেল না, তখন একমাত্র অস্ত্র হচ্ছে ওর নিজমুখে কনফেশান। সেটা তোমার কাছে স্বীকাব কবাব আগে কি আব ওকে নিবস্ত্র করতে পাবি? যতই কেন না ভালোবাসি তোমাকে—আমি যে ক্রিমিনাল ল-ইয়াব!'

কৌশিক জানতে চায়, 'আচ্ছা সহদেবের প্ল্যানটা কী ছিল?'

'এখনও বুঝতে পারোনি? রাণী প্রথমবার যখন গানটা গায় তখন সহদেব ছিল তার নিজের ঘরে। চট করে সে গানটা টেপ-রেকর্ড করতে শুরু করে। তখনও ওর তৃতীয় এমন কি দ্বিতীয় খুনের পরিকল্পনাও করা ছিল না। গানটা রেকর্ড করার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল প্রয়োজনমতো আমাদের ভবিষ্যতে বিভ্রান্ত করা। মিনিটখানেক পরেই সহদেব শোনে অরূপ এসে পিয়ানো বাজাচ্ছে। মুহূর্তমধ্যে সে মনস্থির করে—বাথরুমের কলটা খুলে দেয় এবং অরূপকে গুলি করে বাথরুমে ঢুকে যায়। তারপর ধীরেসুস্থে সে তৃতীয় খুনের পরিকল্পনা করে। ও চেয়েছিল—দ্বিতীয়বার রাণীর গান টেপ-রেকর্ডে "তোমায় জানাতাম" শব্দটায় পৌঁছনো মাত্র সে রাণীকে গুলি করে ছুটে বেরিয়ে যাবে ড্রইংরুমে। ও যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখান থেকে পিয়ানোর টুলটা ফুট চারেক দূরে, পাশের ঘরে। তোমরা এসে ওকে দেখতে পেতে ড্রইংরুমে পড়ে থাকতে। পরে রাণীর মৃত্যুর তদন্ত যখন হত তখন ওর মোক্ষম অ্যালিবাই থাকত পিয়ানোর শব্দ। রাণী যে আদৌ গায়নি আর ও বাজায়নি তা কেউ কোনওদিন জানতে পারত না—একমাত্র রাণীই হতে পারত সে ঘটনার সাক্ষী; কিন্তু তৃতীয় হত্যাকাণ্ডের তদন্ত যখন হত তখন রাণীর এজাহার আর নেওয়া যেত না।

নৃপেন বলে, 'কিন্তু ওর টেপ-রেকর্ডার আর ডিসচার্জড রিভলভারটা তো আমরা তদন্তের সময় খুঁজে পেতাম। ও যে আদৌ পিয়ানো বাজাতে জানে না এটা প্রমাণ করতাম!'

'না, দারোগা-সাহেব, তা পেতে না। ওর পরিকল্পনা অনুযায়ী পেতে না। সে রাত দশটার মধ্যেই "থানায় যাচ্ছি" বলে বেরিয়ে যেত। তাকে আমরা সবাই পুলিশ অফিসার বলে মেনে নিয়েছিলাম—ফলে আমরা তাতে আপত্তি করতাম না। সহদেব অনায়াসে হাওয়ায় মিলিয়ে যেত!'

কাবেরী বলে, 'উঃ, কী ভীষণ!'

বাসু-সাহেব বলেন, 'তুমিই কিন্তু আমাকে সবচেয়ে বেশি ভুগিয়েছ কাবেরী!'

'আমি! ওমা, কেন? কী করে?'

'কার্শিয়াঙে তুমি আশ্রয় নিয়েছিলে বন্ধুস্থানীয় একজনের কাছে। রাত থাকতেই বাসিমুখে কেউ বন্ধুস্থানীয় লোকের বাড়ি ছেড়ে ট্যাক্সি নিয়ে বের হয় না। তাই অনুমান করতে অসুবিধে হয় না—একটা রাগারাগি নিশ্চয় হয়েছিল। অবশ্য "রাগ" শব্দটা বাংলা না সংস্কৃতে সেটা হলফ করে বলতে পারব না। ওটা "অভিমান"ও হতে পারে। তিনি "বান্ধবী" না "বন্ধু" তা জানা না থাকায় সঠিক কনক্লুশনে আসা যাচ্ছে না।'

কাবেরী একেবারে লাল হয়ে যায়।

বাসু-সাহেব তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গটা বদলে বলেন, 'তা ছাড়া এখানে ঘর ছেড়ে বাইরে যাওয়ার সময় নিজের ঘরটা তালাবন্ধ না করেও তুমি ব্যাপারটা গুলিয়ে তুলেছ। তুমি জানো না—তোমার ঘরে অ্যাশট্রের ভেতর সহদেব ক্রমাগত ফিলটার টিপট সিগারেটের স্টাম্প ফেলে গেছে।

'সে কী! কেন?'

'যাতে তোমাকে মিস ডিক্রুজা বলে আমি ভুল করি।'

'আপনি আমাকে তাই ভেবেছিলেন?'

'না ভাবিনি। অরূপ তোমাকে চার্চে দেখা একটি ক্রিশ্চিয়ান মেয়ের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলায় একটু বিভ্রান্ত হয়েছিলাম অবশ্য—কিন্তু ক্রমশ আমি বুঝতে পারলাম সহদেব নিজেই লুকিয়ে ওই সিগারেটের স্টাম্প ফেলে আসছে। তাই সহদেবকে বুঝতে দিয়েছিলাম যে, আমি ওর ফাঁদে পা দিয়েছি। তাকে তাই বলেছিলাম—মিস ডিক্রুজাকেও আমি শনাক্ত করেছি এই হোটেলে।'

নৃপেন বলে, 'মিস ডিক্রুজা তা হলে নিরপরাধ?'

'একটা অপরাধ সে করেছে। মেয়েটা ছিল কল-গার্ল। রমেনের সঙ্গে তার ব্যবস্থা হয়েছিল। তাই রমেন তোমার বাড়িতে রাতে থাকতে রাজি হয়নি। পয়লা তারিখ গভীর রাত্রে ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে মেয়েটা রমেনের ঘরে ঢোকে। হয়তো অনেকক্ষণ বসেও ছিল। সিগারেট যে খেয়েছিল তার তো প্রমাণই আছে। হয়তো তার চোখের সামনেই মদ্যপান করতে গিয়ে রমেন শুধু মারা যায়। মিস ডিক্রুজার একমাত্র অপরাধ—তৎক্ষণাৎ পুলিশে খবর না দিয়ে সে রাত ভোর হতেই পালিয়ে যায়।'

নৃপেন গম্ভীর স্বরে বলে, 'গুরুতর অপরাধ।'

বাসু-সাহেব বলেন, 'কিন্তু তার অবস্থাটাও বোঝো। বেচারি ডুপ্লিকেট চাবির সাহায্যে ঘরে ঢুকেছে—খুনের দায়ে সে নিজেই জড়িয়ে পড়ত। তা ছাড়া অমন মেয়ে নিশ্চিত মদ খায়—হয়তো একচুলের জন্যে সে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছে—যাকে বলে between the cup and the lips!'

অধিবেশন ভঙ্গ হলে নৃপেন বাসু-সাহেবকে জনান্তিকে বলে, 'আপনার সঙ্গে একটা প্রাইভেট কথা ছিল স্যার—।'

বাসু-সাহেব ওকে থামিয়ে দিয়ে বলেন, 'মনে আছে। আমি বলব।'

নৃপেন অবাক হয়ে বলে, 'মানে। কাকে কী বলবেন?'

'বিপুলকে তোমার সাবস্টিটুটের কথা তো? বলব আমি।'

নৃপেন যেন দাঁতের ডাক্তারের কাছে এসেছে! লোকটা কি অন্তর্যামী।

ঘণ্টাখানেক পরে।

সুজাতা কিচেনে ব্যস্ত। আজ পোলাও হবে। জবর খানার আয়োজন। কৌশিক নিঃশব্দে প্রবেশ করল পিছন থেকে। সুজাতা তখন কাজ করতে-করতে গুনগুন করে তান ভাজছিল: 'মেঘের কোলে রোদ হেসেছে বাদল গেছে টুটি—।'

'এতক্ষণে গান বেরিয়েছে গলায়?'

চমকে ঘুরে দাঁড়ায় সুজাতা। বলে, 'ও তুমি। আমি ভেবেছি—বিভীষণ!'

'বিভীষণ?'

সে-কথার জবাব না দিয়ে সুজাতা ঘনিয়ে আসে। বলে, 'এই, আজ না পাঁচই অক্টোবর!'

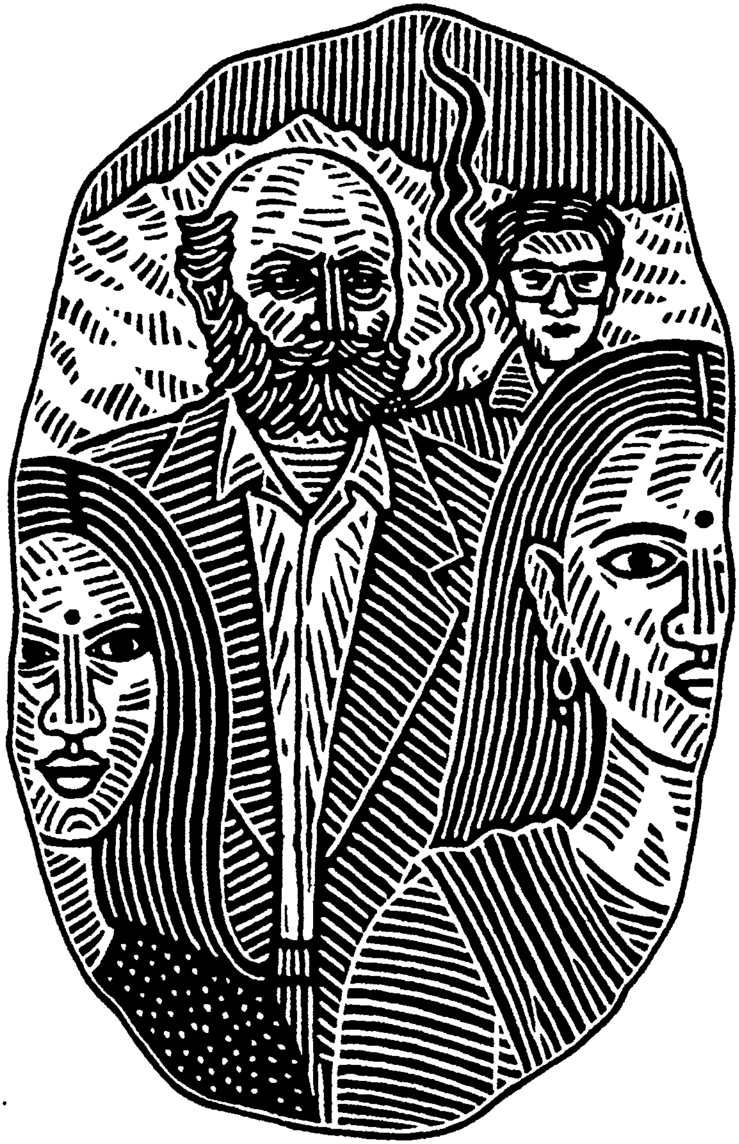
'হুঁ, তাই কী?'

'বা রে, আমার সেই সোনার কাঁটাটা?'

'ও, আয়াম সরি! ওটা আমার পকেটেই রয়ে গেছে, নয়?'

কৌশিক পকেট থেকে বের করে গয়নার বাক্সটা।

কিছু অলৌকিক



সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

এক ঃ ভূতের পাহাড়ে একটি সূর্যাস্ত

মে মাসের গরম আবহাওয়ায় যাঁরা জীবনধারণ অসহ্য মনে করেন, সময় ও টাকাকড়ি থাকলে তাঁদের পক্ষে বাণেশ্বরের চেয়ে ভালো জায়গা আর দুটি নেই। উত্তরপ্রদেশ ও নেপালের সীমান্তে এই তরাই অঞ্চলের পাহাড়ি জঙ্গল বসন্ত ও গ্রীষ্ম দুটি ঋতুতেই নিজস্ব সৌন্দর্যের জন্যে প্রসিদ্ধ। বসন্তে গাছে-গাছে ও ঝোপেঝাড়ে যে অজস্র লাল ও হলুদ ফুল ফোটার পালা শুরু হয়, গ্রীষ্মের শেষ দিনটি অবধি তাতে বিরতি পড়ে না। যে দিকে চোখ যায়, স্থির শব্দহীন ওই উজ্জ্বল রঙের মেলা ভ্রমণবিলাসী ও শান্তিকামীদের মন ভরিয়ে দেয় অপার্থিব কী এক সুখের স্বাদে এবং তার সঙ্গে যখন দূর সমতলের উচ্চণ্ড আবহাওয়া সইতে না পেরে পালিয়ে আসা হাজার-হাজার পাখি প্রতিটি সকাল-সন্ধ্যা কোরাসে গান গাইতে থাকে, মনে পড়ে যায় প্রখ্যাত এক ফারসি কবির অতিখ্যাত একটি লাইন ঃ 'স্বর্গ যদি কোথাও থাকে, সে এখানে—এখানে এবং এখানেই।'

সমুদ্রতল থেকে তিন-সাড়ে তিন হাজার ফুট উঁচুতে আছে বলে বাণেশ্বরের আবহাওয়া এই গ্রীষ্মে খুবই শান্তিদায়ক। রাতের দিকে বরং একটু শীত-শীতই লাগে। বিশেষ করে রাত তিনটের পর হিমালয়ের তুষারে ঢাকা উত্তর অঞ্চল থেকে একটা হাওয়া আসে শেষরাতের অতিথির মতন, সূর্য না ওঠা অবধি সে বেশ খানিকটা দাপট দেখাতে থাকে এবং তখন গায়ে কম্বল না চড়ালে রক্ষে থাকে না।

বাণেশ্বরের আরেকটি বড় আকর্ষণ ধর্ম। বাণেশ্বর-শিবের একটি খুব পুরোনো মন্দির আছে এখানে। সারা ভারত থেকে লক্ষ তীর্থযাত্রী বছরের একটি সময়ে এখানে এসে ভিড় জমান। সে সময়টা হল চৈত্রের শিবচতুর্দশী তিথি। তারপর কিছুদিন বাণেশ্বর চুপচাপ অনাথ পড়ে থাকে। স্থায়ী ছোট্ট বাজারটা আবার ফাঁকা-ফাঁকা দেখায়। কিছু সরকারি আপিস, কোয়ার্টার, একটা স্বাস্থ্যনিবাস, তিনটে ছোটবড় হোটেল আর ত্রিশ-বত্রিশটি বেসরকারি বাড়ি মিলে অল্পস্বল্প জীবনযাত্রার যা ভিড় ও চাঞ্চল্য, তা বিশাল আকাশ ও পরিব্যাপ্ত অরণ্যভূমিতে খুব একটা তরঙ্গ তুলতে পারে না।

তারপর গ্রীষ্মে আস্তে-আস্তে কিছু ভ্রমণবিলাসীর ভিড় দেখা যায়। কিন্তু তাঁরা অনেকেই টাকাকড়িওয়ালা মানুষ। কারণ এখানে জিনিসপত্রের দাম বড্ড চড়া। হোটেলভাড়া সাধারণ মানুষের পক্ষে ধরাছোঁয়ার বাইরে। এর একমাত্র কারণ বাণেশ্বরের ইউরোপীয় ঐতিহ্য—যা ব্রিটিশ আমলের সৃষ্টি। শিবমন্দির এলাকায় ধর্মশালা অবশ্য আছে। কিন্তু সেখানে সাধু-সন্ন্যাসীদেরই দাপট বেশি। আর, সারা ভারতে এটা বরাবর লক্ষ করার মতন ব্যাপার যে একমাত্র বাঙালিই সম্পূর্ণ ধর্মছাড়া কারণে অর্থাৎ নিছক ভ্রমণ ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যলিপ্সায় ঘরের বাইরে পা বাড়ায় এবং বাণেশ্বর কেন, এজন্যে আরও দুর্গম জায়গায় যেতে তার আপত্তি নেই। অন্য প্রদেশবাসীরা এরকম ধর্মহীন বা অর্থোপার্জনবর্জিত ভ্রমণের সচরাচর পক্ষপাতী নন। বাঙালি মানসিকতার বৈশিষ্ট্য এটাই।

বাণেশ্বরের পূর্বপ্রান্তে বয়ে চলেছে সারদানদী, ওপারে নেপাল। উত্তরদিকটা খুবই দুর্গম, খাড়া পাহাড়ের দেওয়াল নেমে গেছে ভয়ংকর খাদে, তারপর শুরু হয়েছে ঢেউখেলানো পাহাড় ও বনাঞ্চল, দূরে তুষারঢাকা পাহাড়গুলো পর্যন্ত বিস্তৃত। বাকি পশ্চিম ও দক্ষিণেও তেমনি পাহাড় ও জঙ্গল আছে—কিন্তু অনেক রাস্তাঘাট ও মাঝে-মাঝে উপত্যকা থাকায় দুর্গম নয়। এইসব রাস্তায় এখন বাস চলাচল করে নিয়মিত। কোথাও পাহাড়ি নদী থেকে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়, কোথাও সেনানিবাস ও সামরিক প্রশিক্ষণকেন্দ্র রয়েছে। কিন্তু কয়েক-শো বর্গমাইল পাহাড় জঙ্গলের পরিবেশে এসব মানুষোচিত স্পন্দন খুবই নগণ্য। এখনও প্রকৃতির দাপটই এখানে বেশিমাত্রায় প্রকট। আদিমতার বিস্তীর্ণ অন্ধকারময় সমারোহে ইলেকট্রিক বাল্বগুলো জোনাকির চেয়েও তুচ্ছ হয়ে পড়ে। পাহাড়ের গায়ে কোনও উজ্জ্বল সাদা বা হলুদ বাড়িও মনে হয় এই আদিমতার একটি অদ্ভুত ধরনের অংশ ছাড়া কিছু নয়।

আমার বৃদ্ধ সঙ্গী এবং বন্ধুটি, যাঁর নাম কর্নেল নীলাদ্রি সরকার, একজন খাঁটি প্রকৃতিবিদ। বাইনোকুলার ও আশ্চর্য একটি ক্যামেরা সবসময় তাঁর কাছে থাকে। নানা জাতের পাখি দেখা ও নোট করে যাওয়া তাঁর হবি। এক বিকেলে যখন আমরা 'গ্রিন ভিউ' হোটেল থেকে বেরিয়ে টনকপুর রোডে ঘুরছি, ডানদিকের লাগোয়া পাহাড়ের চূড়োয় পুতুল-পুতুল দুটি মেয়ের মূর্তি দেখতে-দেখতে তিনি বললেন—বুঝলে জয়ন্ত, এই হচ্ছে বাঙালির মানসিক বৈশিষ্ট্য। ওই যে মেয়ে দুটিকে দেখছ, বাইনোকুলার ছাড়াও এই বুড়ো চোখে দেখে আমি বলতে পারি—ওঁরা সেই বঙ্গললনাদ্বয়। ওঁরা এখন সৌন্দর্য ছাড়া আর কিছু দেখছেন না এবং নিছক সৌন্দর্যের খাতিরেই সবরকম বিপদ-আপদের তোয়াক্কা না করে অকুতোভয়ে এই ভূতের পাহাড়ে উঠে গেছেন।

বুড়োর ধারণা কখনও মিথ্যা হতে দেখিনি। তবু ব্যাপারটা বেশ অবাক লাগল। এখানে আসার পরই শুনে আসছি যে ওটা ভূতের পাহাড় নামে কুখ্যাত এবং পারতপক্ষে ওটাতে কেউ ওঠে না। অথচ এখন এই শেষবেলায় দুটি মেয়ে ওখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কেন? বাঙালি যতই সৌন্দর্যের পূজারী হোক, ভূতের ব্যাপারে সে আফ্রিকার আদিমতম গোষ্ঠীর চেয়ে কোনও অংশে পিছিয়ে নেই—এটা অস্বীকার করবে কোন মূর্খ?

কর্নেলের কাছ থেকে বাইনোকুলারটা নিয়ে চোখে রাখলুম। অমনি চমকে উঠলুম। চিনতে একটুও ভুল হল না। আরে, এঁরা তো আমাদের পাশের স্যুটেই গতকাল এসে উঠেছেন। অল্পস্বল্প আলাপও হয়েছে পরস্পর—তবে সেটা এই বুড়োর দৌলতে। ইনি যেখানে যান, আলাপ জমাতে তো দেরি করেন না—তা সে যে শ্রেণির লোক হোক না কেন।

বাইনোকুলারটা নামিয়ে রেখে বললুম—মাই ডিয়ার ওল্ড ম্যান, আপনি কি পূর্বজন্মে পক্ষিবিশেষ ছিলেন, যারা এক মাইল ওপর থেকেও পৃথিবীতে প্রাণীর নিস্পন্দ দেহ দেখতে পায়?

কর্নেল হাসতে-হাসতে বললেন—তুমি আমাকে শকুন বলতে চাও, জয়ন্ত?

—তা ছাড়া কী বলব?...বলে কপট গাম্ভীর্যে বাইনোকুলারটা ফিরিয়ে দিলুম ওঁর হাতে।—ওঃ! এইসব দিব্যদৃষ্টির অধিকারীদের কাছাকাছি থাকতেও বড্ড ভয় করে। মানুষের মনের ভেতরও তাঁদের দৃষ্টি হানা দিতে পারে বইকী।

—পারে।...কর্নেলের মুখ কৌতুকে উজ্জ্বল হল।—যেমন, এ মুহূর্তে শ্রীমান জয়ন্তের চিত্তচাঞ্চল্য আমি স্পষ্ট অবলোকন করতে পারছি। সে এই পক্ককেশ শ্মশ্রুবিশিষ্ট বুড়োকে ছেড়ে ভূতের পাহাড়ে উঠে যেতে চাইছে। তার তর সইছে না তো, আমার আপত্তি নেই, জয়ন্ত। চলে যাও। ওঁদের সঙ্গ দিয়ে আনন্দের মাত্রা বাড়িয়ে দিয়ে এসো। আর, দেখ জয়ন্ত, প্রকৃতির মধ্যে মানুষ একা গিয়ে পড়লেই নিঃসঙ্গ বোধ করে—সে হাঁপিয়ে ওঠে। কারণ আদিম সময় থেকেই মানুষ যূথবদ্ধ প্রাণী হয়ে বেঁচে আসছে। এই লক্ষ-লক্ষ বছরের অভ্যাস তার দেহের কোষে-কোষে—ক্রোমোসোমে অর্থাৎ জিনপুঞ্জে ডি এন এ অণুর মধ্যে রয়ে গেছে।

হাত তুলে চেঁচিয়ে উঠলুম—প্লিজ কর্নেল, প্লিজ। জেনেটিকস নিয়ে লেকচার শুরু করলে এই চমৎকার বিকেলটার কী পরিণতি ঘটবে, ভেবে আমি শিউরে উঠছি। তার চেয়ে দয়া করে চলুন, আজ আমরা দুজনেই ওই ভূতের পাহাড়ে উঠে যাই। তা ছাড়া, হে ধুরন্ধর গোয়েন্দা মহোদয়, পাহাড়ের ভূতঘটিত রহস্যও তো আপনার এবারকার ভ্রমণের সূত্রে একটা আশ্চর্য অভিজ্ঞতা হতে পারে।

কর্নেল একবার বাঁ-দিকের রাস্তার ওধারে দক্ষিণের ঢালু হয়ে যাওয়া জঙ্গল ও উপত্যকায় উড়ন্ত পাখির ঝাঁক দেখে নিয়ে বললেন—কিছু অসম্ভব নয়, জয়ন্ত। এটা আমার ভাগ্য কিংবা দুর্ভাগ্য বলতে পারো, যেখানে যাই, তোমাদের হিন্দু দেবতা নারদের ঢেঁকির মতন একটা-না-একটা ডেড-বডি আমার বাহন হয়ে ওঠে। হরিবল্ জয়ন্ত, হরিবল্। যেন এক ইটারনাল মার্ডারার আমার পিছনে সবসময় ওত পেতে ঘুরছে।

কর্নেলের মুখে আচমকা একথা বেরোতে শুনে আমার যেমন অবাক লাগল, তেমনি অজানা

আতঙ্কে গায়ের লোম খাড়া হয়ে গেল। কেন একথা বলছেন কর্নেল? এখানে এসে তেমন কি কোনও ভয়ংকর ঘটনার আভাস পেয়েছেন?

আরও আড়ষ্ট হয়ে দেখলুম, বুকে উনি ক্রস আঁকলেন। উদ্বিগ্ন হয়ে বললুম—হঠাৎ এসব কেন কর্নেল?

—ও কিছু না। ভূতের খাতিরে। যেখানে ভূত, সেখানেই মৃত্যুর গন্ধ। চলো জয়ন্ত, অবশেষে তা হলে আমরা ভূতের পাহাড়েই যাই। কিন্তু সাবধান বৎস, শ্যামলী ও জয়ন্তীর সঙ্গে কখনও প্রেম জমাতে চেষ্টা করবে না—কারণ তোমার ফিঁয়াসে বেচারি চন্দ্রাণীর কাছে তোমার দায়দায়িত্ব আমাকে বুঝে নিতে হয়েছে। ফিরে গিয়ে তোমার সম্পর্কে একটা সার্টিফিকেট আমার কাছে না পেলে সে সংশয়ে ভুগবে।

হো-হো করে হেসে উঠলুম ওঁর কথাব ভঙ্গিতে। তারপর 'আই অ্যাসিওর ইউ, ওল্ড ওয়াচডগ' বলে ওঁর একটা হাত নিলুম এবং ভূতের পাহাড়ে চড়া শুরু হল।

আমার প্রাজ্ঞ সঙ্গীর বয়েস ষাট পেরিয়ে গেছে। তবু মাঝে-মাঝে ওঁর শারীরিক ক্ষমতা দেখে তাক লেগে যায়। এই বত্রিশেই আমার কয়েকশো ফুট খাড়াই ভাঙতে হাঁফ ধরে যাচ্ছিল, আর উনি পাহাড়ি বাঘের মতন অনায়াসসাধ্য ক্ষিপ্রতা ও দক্ষতায় সবসময় অনেকটা করে এগিয়ে রয়েছেন। এখন যদি প্রশ্ন করি তা হলে উনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বার্মা রণাঙ্গনের কোন-কোন পাহাড়ে উঠেছিলেন, তার বর্ণনা শুরু করবেন। সর্বক্ষেত্রে ওই একটি বাক্যই তাঁর মূলধন : বাছা জয়ন্ত, কথাটা হচ্ছে 'অতীত অভিজ্ঞতা।' তবে কিনা এ জিনিসটা সব মানুষেরই আছে। স্বাভাবিক নিয়মেই মানুষ তা অর্জন করে। কিন্তু তাকে কাজে লাগাতে পারে কজন? যে পারে, তাকেই আমরা সবখানে জিতে যেতে দেখি। এখন, আমার কথা উঠলে বলব যে, আমি কর্নেল নীলাদ্রি সরকার প্রতিটি ব্যাপারেই সাধ্যমতো অতীত অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাবার চেষ্টা করি।

ওঁর এ স্বভাবটাও আমার এতদিনের জানা হয়ে গেছে যে কর্নেল বলে ডাকলে উনি খুবই খুশি হন। পদবিটা ওঁর সামরিক জীবনের স্মারক। কিন্তু মজার কথা, যোদ্ধা হিসেবে উনি কত বড় ছিলেন জানি না, প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটার বা গোয়েন্দা হিসেবে ওঁর কুশলতার কোনও তুলনা নেই। এটা ওঁর বর্তমান পেশা নয় মোটেও। নিছক হবি—বিরল জাতের পাখি খুঁজে বের করার হবির মতনই এটা খেয়ালি ঝোঁক। এজন্যে একটি পয়সাও কারও কাছে উনি দাবি করেন না।

যাই হোক, ভূতের পাহাড়ের দক্ষিণ কাঁধ দিয়ে দূর উপত্যকার ওদিক থেকে পড়ন্ত সূর্যের লালচে রোদ্দুর এসে পড়ে ওঁর মুখটা জ্বলজ্বল করছিল। খানিকটা ঝোপঝাড়ে ভরা খাড়াই অনেক কষ্টে ভেঙে এবার আমরা বেশ ঢালু ঘাসের জমি পেয়ে গেলাম। জমিটায় বড়-বড় পাথর ছড়ানো। তার ডাইনে অর্থাৎ উত্তরে ঘন গাছপালার জঙ্গল। ঢালুটা পেরিয়ে সোজাসুজি চূড়োয় ওঠা অসম্ভব—সামনে একটা গ্রানাইট দেওয়াল রয়েছে। তাই আমাদের ডাইনের জঙ্গলে ঢুকতে হল। এখানে ঢোকার পর আমরা শ্যামলী ও জয়ন্তীকে আর দেখতে পাচ্ছিলুম না। গাছের আড়াল দৃষ্টিতে বাধা দিচ্ছিল।

কর্নেল এক জায়গায় হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেলেন। তারপর কান পেতে কিছু শুনে বললেন—কাছাকাছি ওপিঠে কোথায় একটা ঝরনা আছে মনে হচ্ছে। নিশ্চয় সাধারণ ঝরনা নয়, পাতাল জলের ধারা। অর্থাৎ যাকে বলে প্রস্রবণ। এনি ওয়ে। জয়ন্ত, সম্ভবত, ওই ঝরনার জল স্বাস্থ্যকর। ফেরার পথে সময় থাকলে একবাব ওদিকটা ঘুরে যাব। আমার কাছে একটা হ্যাভারস্যাক রয়েছে। কিছু জল নিয়ে যাব।

তারপর আমার মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বললেন—হুম। তুমি অধৈর্য হয়ে পড়েছ। চলো, এখন আমরা চূড়োর ওদিকেই যাই।

ক্লান্তির জন্যে পরিহাসটা গায়ে মাখলুম না। তা ছাড়া ইতিমধ্যে আমি এক অদ্ভুত ভাবনায় অস্থির হয়ে উঠেছিলাম। এই পাহাড়টার নাম ভূতের পাহাড় কেন? শনশন করে হাওয়া বইছিল

আর নির্জন পাহাড়ি জঙ্গল জুড়ে কী যেন ধুন্ধুমার অদৃশ্য উপদ্রব চলছিল, ঠিক বোঝাতে পারব না এই অনুভূতিটা—মনে হচ্ছিল, জীবিতদের আবির্ভাবে যুগ-যুগান্তের বাসিন্দা অশুভ আত্মারা যেন চঞ্চল হয়ে উঠেছে। একটা আশ্চর্য ব্যাপার দেখলুম, এলাকার অন্যসব পাহাড় ও জঙ্গলের মতন এখানে কোনও গাছেই ফুল নেই, এখানে কোথাও কোনও পাখিও নেই। সচরাচর পাহাড়ি এলাকায় যে গিরগিটিজাতীয় প্রাণী সবসময় চোখে পড়ে, তারাও এখানে নেই। তখন আরও সচেতন দৃষ্টিতে পরখ করতে থাকলুম এবং টের পেলুম যে এক উদ্ভিদ ছাড়া দ্বিতীয় কোনও পার্থিব প্রাণী যেন এখানকার বাসিন্দা নয়! এ যে রীতিমতো অবিশ্বাস্য ব্যাপার!

পথ বলতে কিছু নেই। আন্দাজ করে এগোতে হচ্ছিল। জঙ্গলের পর বড়-বড় পাথরের টুকরো পেরিয়ে যেতেই আমরা ৪৫ ডিগ্রি কোণ বরাবর উঁচুতে ফের মেয়ে-দুটিকে দেখতে পেলুম। ওদের কথা কিছুক্ষণ ভুলেই গিয়েছিলুম যেন। এখন দেখামাত্রই দ্বিতীয় এক বিস্ময় জাগল। এরকম কষ্টসাধ্য চড়াই ভেঙে ও জঙ্গল ঠেঙিয়ে এই নির্জন কুখ্যাত পাহাড়ের চূড়োয় গিয়ে ওঠার ক্ষমতা ও সাহস ওবা পেল কোথায়? বিশেষ করে, দুটি বাঙালি মেয়ে ওরা—বয়েস বড়জোর পঁচিশের মধ্যেই। কোনও পুরুষ সঙ্গী নেই। মেমসায়েব হলে অবাক হতুম না নিশ্চয়। তাই কথাটা মনে আসার সঙ্গে-সঙ্গে কর্নেলকে বললুম—হ্যাল্লো ওল্ড ম্যান, নীচে থেকে যা ভেবেছিলুম, পাহাড়টা অত সাদাসিধে গোবেচোরা নয় দেখতে পাচ্ছি কিন্তু। এমন ঘোরপ্যাঁচওয়ালা জায়গায়, স্ত্রীলোক পা বাড়ান কোন সাহসে? বাপ্‌স! আমারই তো শ্বাসকষ্ট শুরু হয়েছে!

কর্নেল পা বাড়িয়ে বললেন—জয়ন্ত, কথাটা তুমি ঠিকই বলেছ। তবে শ্রীমতীদের তুমি তুচ্ছতাচ্ছিল্য কোরো না। ওরা দুটিতেই কিন্তু এক মাউন্টেনিয়ারিং ক্লাবের সদস্যা। গতবছর এমনি জুনে যে মহিলা অভিযাত্রীরা মানালিতে চড়েছিলেন, শ্যামলী ও জয়ন্তী সে-দলে ছিল।

এতক্ষণে সব টের পেয়ে গেলুম।—তাই বলুন। কিন্তু আশ্চর্য, এরই মধ্যে ওদের নাড়ীনক্ষত্র আপনাব জানা হয়ে গেছে দেখছি!

কর্নেল একটা শুকনো বেঁটে হলুদ গাছের গায়ে জড়িয়ে থাকা মোটা-মোটা একগুচ্ছ লতা আঁকড়ে ধরে একটা পাথরে উঠলেন। তারপর আমার দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন—চলে এসো।

এবার আমরা চূড়োর সীমানায় এসে গেছি। চূড়োটা হাতির পিঠের মতো দেখতে—লম্বায় বড় জোর বিশ গজ, চওড়ায় তার আদ্ধেক। কোথাও টাকের মতো নগ্ন পাথর রয়েছে, কোথাও শুকনো ঘাস। ততক্ষণে ওরা আমাদের দেখতে পেয়েছে। দুজনেই এদিকে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। মুখে চাপা হাসি ঝিলিক দিচ্ছে। প্রচণ্ড বাতাসে শাড়ি জড়িয়ে যাচ্ছে পায়ে। দেখে তাক লেগে গেল আমার। কর্নেল চেঁচিয়ে উঠলেন—কনগ্রাচুলেশান গার্লস!

দুজনেই হাত নেড়ে বলল—কনগ্রাচুলেশান কর্নেল।

দক্ষিণ-পশ্চিম কোনায় একটা বড় পাথর চূড়ো থেকে বেরিয়ে ছিল চাতালের মতন। তার ওপর গিয়ে বসে পড়লুম সবাই। কর্নেল আরামে বসে চুরুট বের করলেন। ওরা বাতাস বাঁচিয়ে সেটা জ্বালতে সাহায্য করল। এ বুড়োর সঙ্গে তরুণীদের কীভাবে অত খাতির জমে যায়, আজও আমার কাছে রহস্য।

শ্যামলীর হালকা ছিপছিপে গড়ন, মুখটা কিছু লম্বাটে, ডিমালো গাল ও সুচলো চিবুক। ওর চোখদুটোয় এক ধরনের নির্লিপ্ততা বা ঔদাসীন্যের ভাব আছে। খুব পাতলা ঠোঁট—তাই একটুখানি হাসিও জোরালো হয়ে ফোটে। আর জয়ন্তী ওর চেয়ে খানিকটা স্বাস্থ্যবতী অর্থাৎ অল্পস্বল্প মুটকি বলা যায়—অতটা ফরসাও নয়, চাপা রং। মুখটা ভারী ও ব্যক্তিত্বব্যঞ্জক, পুরু ভুরু, দৃষ্টিতে তীব্রতা আছে। ভরাট গাল, অর্ধবৃত্তাকার চোয়াল। তার গ্রীবা ও বাহুদুটোয় শক্তির আভাস মেলে। দুজনেই মোটামুটি সুন্দরী এবং পতঙ্গ আকর্ষণের মতন দীপ্তিময়ী।

শ্যামলী বলল, আজ কতগুলো পাখির ছবি নিলেন কর্নেল?

কর্নেল হাসলেন।—এ বেলা ক্যামেরাকে সে সুযোগ দিলুম কই? আমার তরুণ বন্ধুটি হঠাৎ তোমাদের আবিষ্কার করে খুব ধাঁধায় পড়ে গেলেন—যার ফলে...।

ব্যস্ত হয়ে কপট রাগে গর্জালুম—শাট আপ ওল্ড ম্যান। মোটেও তা ঘটেনি।

শ্যামলী ও জয়ন্তী হেসে উঠল। কর্নেল অপ্রস্তুত হবার ভান করে বললেন, তা হলে আমারই বোঝবার ভুল। যাই হোক, এই পাহাড়টা নাকি কুখ্যাত। এখানে অজস্র ভূতের আড্ডা। তাই কারও মনে ধাঁধা সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক বইকী।

জয়ন্তী বলল, ব্যাপারটা কী হয়েছে, তা হলে বলি কর্নেল।...

তাকে বাধা দিয়ে শ্যামলী বলল, দেখো জয়া, তোমার ওসব আজেবাজে কুসংস্কারের ঢাকঢোল আর না পেটালেও চলবে।

জয়ন্তী হাসতে-হাসতে বলল, কিন্তু তুমিই তো বললে যে...।

শ্যামলী রেগে গেল।—কী বললুম? বললুম যে ভূত দেখেছি—তুমিও দেখবে এসো?

জয়ন্তী বলল, ওভাবে বলোনি। স্বপ্নে দেখেছ বললে।

শ্যামলী বলল, হ্যাঁ, স্বপ্ন। নিছক দিবাস্বপ্ন। তবে সেজন্যেই কি তোমাকে এখানে টেনে এনেছিলুম?

জয়ন্তী বলল—না, তা আননি। বললে, এখান থেকে সূর্যাস্ত নাকি খুব সুন্দর লাগে। কিন্তু যাই বলো, তোমার আসল মতলব ছিল—স্বপ্নের ব্যাপারটা সত্যি কি না দেখতে আসা।

—হ্যাঁ, তুমি মনের লেখা পড়তে ওস্তাদ!

—কিছুটা। দেখ, আমাকে লুকিয়ে পার পাবে না। এখানে ওঠার পর সবসময় লক্ষ রেখেছি, তুমি অন্যমনস্ক হয়ে কী যেন খুঁজছ। আমি দিব্যি তখন টের পেয়ে গেলুম যে আসলে তুমি স্বপ্নের ব্যাপারটা নিয়েই কৌতূহলী এবং সূর্যাস্ত দেখার ছলে এনকোয়ারি করতে এসেছ। আর এ তো তোমার বরাবরকার স্বভাব। কেন? সেবার মুক্তেশ্বরের ওদিকে রাতদুপুরে বাংলোর পিছনে কীসের শব্দ শুনে ওই কনকনে ঠান্ডায় বেরিয়ে পড়তে আমাকে সাধাসাধি করেছিলে। অথচ বললুম—ঘুমের ঘোরে যা শোনার শুনেছ, ওটা সত্যি নয়। তোমার এই নাকগলানো অভ্যেস দেখে মনে হয়—গত জন্মে নিশ্চয় তুমি পুলিশের গোয়েন্দা-টোয়েন্দা ছিলে। বাণেশ্বরে এসে স্বপ্নে দেখবে একটা আস্ত জ্যান্ত মড়া—সেটা আবার এই ভূতের পাহাড়েই ডিগবাজি খেয়ে বেড়াবে, কী অদ্ভুত ব্যাপার!

আমরা দুজনে চুপচাপ ও হাঁ করে ওদের মুখের দিকে তাকিয়েছিলুম এতক্ষণ। দুটি স্ত্রীলোকের সংলাপ, তর্কাতর্কি, ভাবভঙ্গি বরাবর আমার কাছে জটিল হেঁয়ালি এবং দুর্বোধ্য। স্ত্রীলোক যে অপার রহস্যের আগার, তাতে কোনও ভুল নেই। দুজন জলজ্যান্ত পুরুষের সামনে এতক্ষণ ওরা যেসব নিয়ে কথা বলল, তা যত অদ্ভুত বা খাপছাড়া শোনাক—এটাই সম্ভবত স্ত্রীজাতির স্বাভাবিক রীতিনীতি। আমি ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে এবার সিগারেট ধরালুম। সূর্যাস্ত দেখতে থাকলুম।

এবার কর্নেল বললেন—বাই জোভ! স্বপ্নে জ্যান্ত মড়া! সে কী!

জয়ন্তী মুখ টিপে হেসে বলল—দিবাস্বপ্ন। তাও আবার গ্রীষ্মকালীন। কাজেই বুঝতেই পারছেন কর্নেল, বহু অদ্ভুত ব্যাপার দেখা যেতে পারে। কিন্তু শ্যামলীর কারবারই আলাদা। ওই যে বললুম, সবতাতে নাক-গলানো ওর চাই-ই। আবার বলে কী জানেন? ওর নাকি একটা সিক্সথ সেন্স আছে। ওই সিক্সথ সেন্সের জ্বালায় যে পড়েছে, সেই জানে পরিণতিটা কদ্দূর গড়ায়। ইতিমধ্যে আপনারা না এসে পড়লে ও নির্ঘাত সারা পাহাড় খোঁজাখুঁজি করে বেড়াবার জন্যে আমাকে সাধাসাধি করত। ওকে সামলানো আমার পক্ষে এত কঠিন হয়ে পড়ে সময়-সময়।

শ্যামলী মুখ গম্ভীর করে বসে ছিল। ওর কথা শোনার পর বলল—থাক, আর গার্জেনগিরি ফলাতে হবে না।

আমার মনে হল চেহারা দেখে শ্যামলীকে খুব হুল্লোড়বাজ সরল মেয়ে মনে হলেও আদতে

ও তার উলটো। বেশ চাপা ধরনের মেয়ে। এই চেপে রাখার প্রবণতার জন্যেই সম্ভবত ওর সুন্দর টানাটানা চোখ দুটোকে নির্লিপ্ত বা উদাসীন দেখায়।

তা কর্নেল বুড়োও আবার সবতাতে নাকগলানোর জন্যে প্রসিদ্ধ। ওঁর মুখে একটা চাঞ্চল্য লক্ষ করলুম এবার। বললেন—হুম। তা হলে জয়ন্তী, তুমি বলতে চাইছ যে আজ দুপুরে হোটেলে তোমরা দুপুরবেলা দুটিতে ঘুমিয়ে কাটিয়েছ। তারপর ঘুম ভেঙে উঠে শ্যামলী তোমাকে বলেছে, স্বপ্নে এই ভূতের পাহাড়ে একটা জ্যান্ত মড়া ডিগবাজি খাচ্ছিল। তারপর বলেছে, পাহাড়টায় চড়ে সূর্যাস্ত দেখা যেতে পারে। এবং তোমরা শেষ অব্দি বেরিয়ে পড়েছ, চড়েছ, তারপর তোমার ধারণা হয়েছে যে আসলে শ্যামলী তার স্বপ্নের সত্যতা পরীক্ষা করতেই এখানে এসে হানা দিয়েছে। এই তো?

জয়ন্তী সোৎসাহে মাথা দুলিয়ে বলল—হুবহু ঠিক। কর্নেল! সত্যি আপনার দক্ষতা আছে রিপোর্টিংয়ে।

কর্নেল আমাকে দেখিয়ে বললেন—কিন্তু হিয়ার ইজ এ রিয়্যাল রিপোর্টার। আশা করি, তোমাদের মনে আছে সেকথা। দৈনিক সত্যসেবকের প্রখ্যাত রিপোর্টার শ্রীমান জয়ন্ত চৌধুরী সামনাসামনি থাকতে, মাই ডিয়ার গার্ল, আমাকে ওই প্রশংসাটা দিও না। জয়ন্ত মনে-মনে তোমার মাথা কাটবে।

জয়ন্তী আমার দিকে কটাক্ষ করল।—উনিই যে তিনি তার প্রমাণ তো শুধু আপনার মুখের কথা। তাই বিশ্বাস না করে উপায় নেই। কিন্তু ওঁকে আমার মোটেও সেরকম মনে হচ্ছে না, কর্নেল!

কর্নেল বললেন, কেন, কেন?

জয়ন্তী ফিক করে হাসল!—রিপোর্টাররা সবসময় কৌতূহলী হবেন। সবসময় পেছনে লেগে থাকবেন। প্রশ্নে-প্রশ্নে জ্বালিয়ে মারবেন। আরও স্মার্ট হবেন। কিন্তু আপনার ভদ্রলোক দেখছি, নিতান্ত সাদাসিধে মানুষ। কথাই বলতে পাবে না। চুপচাপ, ভীতু-ভীতু মুখ, ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকেন খালি।

শ্যামলী ধমকাল, তুমি বড্ড বাচাল, জয়া। এবার আমাকে ছেড়ে ভদ্রলোককে নিয়ে পড়লে? নিজেকে কি তুমি ভি আই পি মনে করো? ভি আই পি হলে নিশ্চয় জয়ন্তবাবু তোমার পিছনে লেগে থাকতেন—তুমিও খুব প্লিজড হতে।

কর্নেল হো-হো করে হেসে উঠেছিলেন। বললেন—জয়ন্ত আসলে এবার মনমরা হয়ে আছে। পাহাড়-জঙ্গল এসব প্রাকৃতিক পরিবেশে একজন সুযোগ্য যুবকের পাশে একজন যুবতীকেই মানায়। তার বদলে এক বাহাত্তুরে ওল্ড ফুল?

জয়ন্তী সপ্রতিভ ভঙ্গিতে বলল, আহা! সে-ও কথা! জয়ন্তবাবু আর মন খারাপ করে থাকবেন না। আমরা আপনাকে সঙ্গ দেব। রাজি তো?

টের পেলুম, মেয়েটি সত্যি বাচাল এবং যেন একটু পুরুষালি টাইপের। অথচ ওর মুখে একটা ব্যক্তিত্বের ছাপ বেশ প্রখর। অধ্যাপিকা কিংবা দিদিমণিসুলভ গাম্ভীর্যের রেখা প্রকট হয়ে আছে। তাই বেশি কথা বললেও বেশ মানিয়ে যায়। শুধু বললুম, প্রস্তাবটা ভেবে দেখব।

জয়ন্তী খিলখিল করে হেসে উঠল। এই সময় লক্ষ করলুম, শ্যামলী কিন্তু বরাবর কেমন গম্ভীর আর অন্যমনস্ক হয়ে রয়েছে। মনে কী যেন চাপা চাঞ্চল্য আছে, তা দমিয়ে রাখার যত্ন ও কষ্ট ওর মুখে ছাপ ফেলেছে। খারাপ স্বপ্ন দেখলে অনেকে নাকি এরকম নার্ভাস হয়ে পড়ে। আমার এক বন্ধু তার ফিঁয়াসের মৃত্যু দেখেছিল স্বপ্নে, মেয়েটি থাকে বোম্বেতে—সে ক'দিন ধরে এমন উত্যক্ত হল যে অবশেষে বোম্বে মেলের টিকিট কেটে বসতে বাধ্য হল। তবে সে তো প্রেমজ অস্বস্তির ব্যাপার। শ্যামলী কার মড়া দেখল স্বপ্নে, জানতে ইচ্ছে করছিল।

কথাটা বলেই ফেললুম, বাই দ্য বাই, স্বপ্নে যার মৃত্যু দেখা যায়, তার নাকি আয়ু বাড়ে।

শ্রীমতী শ্যামলী নিশ্চয় কোনও আত্মীয়ের মৃতদেহ দেখে থাকবেন। কারণ আমরা স্বপ্নে সাধারণত প্রিয়জনকেই মরতে দেখি।

কর্নেল বাইনোকুলারে চোখ রেখে পাহাড়ের উত্তর-পশ্চিম গায়ে সম্ভবত পাখি খুঁজছিলেন। অন্যমনস্কভাবে শুধু বললেন, রাইট, দ্যাটস রাইট!

জয়ন্তী বলল, মাই গুডনেস! হ্যাঁরে শ্যামলী, কার মড়া দেখেছিস তা তো বলিসনি?

শ্যামলী বাঁকা ঠোঁটে বলল, ওসব ছাড়ো তো বাবা! এককথা নিয়ে ভ্যাজর-ভ্যাজর ভালো লাগে না। ওই দেখ, দিনমণি এবার ডুব দিলেন।

আমরা এবার সূর্যাস্তের দিকে ঘুরে বসলুম। অপূর্ব, অপূর্ব! দূর উপত্যকার ওদিকে পর্বতশ্রেণীর মাথায় একটা বিশাল লাল গোলক আস্তে-আস্তে নেমে যাচ্ছে। চারদিকে হালকা গোলাপ, হলুদ, সবুজ, নীল, সোনালি এক ব্যাপক বর্ণচ্ছটা ছড়িয়ে পড়ছে দীর্ঘ সব তুলির টানের মতন জ্যামিতিক সরলরেখায়, দিগন্তকে দেখাচ্ছে অলৌকিক শক্তিমান এক মহান সাধু। শবের মতন নিস্পন্দ শুয়ে আছেন তিনি, যেন স্বয়ং মহাকাল।

গ্রিন ভিউ হোটেলের দিকে যে প্রাইভেট রাস্তা উঠে গেছে, তার শুরুতে বড় সরকারি রাস্তার বাঁক। বাঁকের মুখে ডান হাতে অর্থাৎ দক্ষিণে কয়েক একর সমতল জমির ওপর একটা মোটামুটি বড় বাড়ি। বাড়িটা অবশ্য একতলা। পুরোনো ধাঁচের এইসব বাড়ি এখানে অনেক রয়েছে। কাঠ ও কাঁটা তারের বেড়া দিয়ে প্রাঙ্গণটা ঘেরা। ফুলবাগিচা আর দেশি-বিদেশি অনেক গাছ আছে। সবুজ ঝকঝকে লনে চেয়ার-টেবিল পেতে কয়েকজন পুরুষ ও স্ত্রীলোক বসে আছেন দেখলুম। গেটে বোগেনভিলিয়ার ঝাঁপি আছে। এখান অবধি এসেই কর্নেল বললেন, যদি আপত্তি না থাকে, আমি জয়ন্তী ও শ্যামলীকেই বিশেষভাবে বলছি, বাণেশ্বরের এক মহীয়সী মহিলার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে চাই। উনি ভীষণ খুশি হবেন। অন্যপক্ষে তোমরাও খুব খুশি তো হবেই—উপরন্তু একটি আশ্চর্য চরিত্রের সঙ্গে পরিচয় হবে। রিয়েলি, মিসেস মালহোত্রার কোনও তুলনা হয় না। এমন মিশুকে মহিলা আজকাল দুর্লভ।

জয়ন্তী উৎসাহ দেখাল। কিন্তু শ্যামলী বলল, আজ থাক। বরং আরেক সময় আসা যাবে।

জয়ন্তী ওর হাত ধরে টানল।—আয় না বাবা! এখানে ঘুরতেই তো এসেছি! প্রবাসে নিয়মটিয়ম কেউ মানে নাকি! বলা যায় না, নতুন চেনাজানা থেকে অনেক সময় অনেক কিছু মিলে যায়।

কর্নেল কী বলতে যাচ্ছিলেন, এমনসময় এক প্রৌঢ়া মহিলাকে দেখলুম চেয়ার ছেড়ে হনহন করে গেটের দিকে এগিয়ে আসছেন হাসিমুখে। কর্নেল আগে থেকেই হাত নাড়তে লাগলেন এবং চাপাস্বরে বললেন—মিসেস মালহোত্রা।

ইনি যে যৌবনে অসাধারণ সুন্দরী ছিলেন, তার ছাপ এখনও মুছে যায়নি। বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখার মতন চেহারা। কর্নেলকে ইংরেজিতে বলে উঠলেন, হ্যালো, হ্যালো! আসুন, আসুন! আপনারই অপেক্ষা করছি আমরা। ডঃ পট্টনায়ক তো অস্থির এদিকে—যা খেয়ালি মানুষ আপনি! বলা যায় না, কোথায় জঙ্গলে গিয়ে ওত পেতে বসে রয়েছেন!

তারপর আমাদের দিকে ঘুরে অত্যন্ত অমায়িক হেসে বললেন, কী কাণ্ড! এইসব কচি-কচি ছেলেমেয়ে নিশ্চয় কর্নেলসায়েবের পাল্লায় পড়ে হয়রান হয়েছে!

কর্নেল আমাদের সস্নেহে দেখে নিয়ে বললেন, আলাপ করিয়ে দিই। মিসেস সরোজিনী মালহোত্রা একসময় নৈনিতাল গার্লস কলেজের অধ্যক্ষা ছিলেন। এখন পাকাপাকিভাবে বাণেশ্বরের বাসিন্দা। আর এ হচ্ছে শ্যামলী সেন, ওর বন্ধু জয়ন্তী রায়—দুজনেই সেরা পাহাড়-চড়িয়ে। মানালি

অভিযানে ছিল। এ জয়ন্ত চৌধুরী—কলকাতার প্রখ্যাত দৈনিক সত্যসেবকের রিপোর্টার, প্রখ্যাত ব্যক্তি এখন।

মিসেস মালহোত্রা এসে শ্যামলী ও জয়ন্তীকে জড়িয়ে ধরলেন দু-হাতে। তারপর আমার দিকে ঘুরে বললেন—চলে আসুন, চলে আসুন! ওঃ, আমার কী সৌভাগ্য আজ! খুব জমে যাবে আসর! কর্নেল, আপনার কোনও তুলনা হয় না।

ধাড়ি মুরগি যেমন ছানা নিয়ে এগোয়, আমাদের নিয়ে ভেতরে ঢুকলেন মিসেস মালহোত্রা।

লনে অনেকগুলো খালি চেয়ার ছিল। আমরা বসে পড়লুম। মিসেস মালহোত্রা ছোটাছুটি করে বেড়াতে থাকলেন ব্যস্তভাবে। একজন লোক একটা ট্রেতে সাজিয়ে কোকাকোলার বোতল নিয়ে এল।

ততক্ষণে অন্ধকার সবে জমে উঠছে। বাড়ির সামনে বাতিটি জ্বলে উঠল। এবার মিসেস মালহোত্রা পরিচয় করাতে থাকলেন।—ইনি মিঃ অরিন্দম দ্বিবেদী—ইতিহাসের অধ্যাপক, থাকেন দিল্লিতে। ইনি মিঃ রঘুবীর জয়সোয়াল—রিটায়ার্ড পুলিশ সুপার, এখন জয়পুরের বাসিন্দা। আর ইনি হচ্ছেন প্রখ্যাত ফোরেনসিক এক্সপার্ট ডঃ সতীনাথ পট্টনায়ক—ওড়িশাব লোক, এখন দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে ফোরেনসিক বিভাগের লেকচারার। এখন আসতে বাকি রইলেন মিঃ মোহন পারেখ—বোম্বের বিখ্যাত ফিল্ম গায়ক। এবার আমার নবাগত বন্ধুদের পরিচয় করিয়ে দেবেন স্বনামধন্য কর্নেল এন সরকার।

কর্নেল তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে 'মাননীয় ভদ্রমহোদয়গণ ও ভদ্রমহিলারা' সম্বোধন করার পর পাঁচ মিনিট ধরে আমাদের তিনজনের সম্পর্কে গালভরা কিছু বাক্য বলে বসে পড়লেন।

তারপর উঠলেন ফের মিসেস মালহোত্রা।—ফ্রেন্ডস! আজকের আসবের প্রোগ্রাম আবার ঘোষণা করতে অনুমতি দিন। একটু পরেই আমরা নির্দিষ্ট জায়গায় যাব এবং প্রোগ্রাম অনুযায়ী কাজ করব। হ্যাঁ—আমাদের আজকের প্রোগ্রাম মিডিয়ামের মধ্যে অশরীরী আত্মা আনা। চমৎকার প্রোগ্রাম এবং রোমাঞ্চকর। তাই নয়?

কে জানে কেন, আমি শিউরে উঠলুম। চারপাশে সমর্থনসূচক সাড়া পড়ে গেল। কর্নেল প্রশংসা করে বললেন, ওয়ান্ডারফুল! মিসেস মালহোত্রার নতুনত্বের তুলনা হয় না!

তারপর একটুখানি নীরবতা জাগল। সেই সময় শুনলুম, আমার পাশ থেকে শ্যামলী ফিসফিস করে জয়ন্তীকে বলছে, তুই এসব বিশ্বাস করিস?

জয়ন্তী বলছে, নিশ্চয় করি।

—আমি করি না। সব ধাপ্পা। মিডিয়ামরা ধাপ্পা দেয়!

—বেশ তো! তুই মিডিয়াম হয়ে দেখ না। পারবি?

—নিশ্চয় পারব।—বলে শ্যামলী হাসল একটু। ফের বলল, মিডিয়াম ওদের নিশ্চয় ঠিক করা আছে। যে-সে নাকি মিডিয়াম হতেই পারে না। ওটাই তো চালাকি রে!

—চালাকি? বেশ—ওঁদের বলছি, তোকেই মিডিয়াম করে যেন।

—বলে দেখ। রাজি হবে না।

কর্নেল হঠাৎ ঘুরে বললেন, ইয়ে মিসেস মালহোত্রা, মিডিয়াম কে হচ্ছেন?

মিসেস মালহোত্রা ঘড়ি দেখে বললেন, আইডিয়াটা মিঃ পারেখের। উনিই তো মিডিয়াম হবেন বলেছিলেন। এখনও এসে পৌঁছলেন না—আশ্চর্য তো!

এবার শ্যামলী মুখ ফুটে বলে ফেলল, মিসেস মালহোত্রা, আমি মিডিয়াম হতে রাজি আছি।

তীক্ষ্ণদৃষ্টে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে মিসেস মালহোত্রা কী যেন দেখলেন। তারপর সস্নেহে হেসে বললেন, পরে কিন্তু শরীর ভীষণ খারাপ করবে।

—করুক না।—শ্যামলীর কণ্ঠস্বরে দৃঢ়তা ফুটে উঠল।

কর্নেল বললেন, হ্যাঁ, শ্যামলী পারবে। ওর শক্তি সাহস দুই-ই আছে। আমি সার্টিফাই করতে পারি।

মিসেস মালহোত্রা ঘড়ি দেখে একটু ইতস্তত করার পর রাজি হয়ে গেলেন—ঠিক আছে। কর্নেলের কথার ওপর কথা নেই। ফ্রেন্ডস, তা হলে আমরা আর মিঃ পারেখের জন্যে অপেক্ষা নাও করতে পারি। কী বলেন আপনারা?

সবাই সায় দিলেন। তখন মিসেস মালহোত্রা আবার ঘড়ি দেখে বললেন—কফি খেয়েই আমরা উঠব। ঠিক সাতটায় বসব।

আমার কী জানে কেন, খুব অস্বস্তি হতে লাগল। শ্যামলীর মিডিয়াম হতে চাওয়াটা পছন্দ হচ্ছিল না। জয়ন্তীও এবার চুপিচুপি ওকে নিবৃত্ত করছে শুনলুম। কিন্তু শ্যামলী জেদের সঙ্গে ফিসফিস করে বলল, ভ্যাট। সব বাজে। দেখি না কী হয়!

দুই : অশরীরী আত্মার আবির্ভাব

লম্বা-চওড়া আর বিলিতি ধাঁচে সাজানো ডাইনিং-হল পেরিয়ে শ্রীমতী মালহোত্রার স্টাডি বা পড়াশোনার ঘরে ঢুকলুম আমরা। আর সেইসময় বাইরে প্রচণ্ড মেঘগর্জন শোনা গেল। তারপর শুরু হল ভয়ংকর পাহাড়ি ঝড়। শ্রীমতী মালহোত্রার মুখে উদ্বেগ দেখা দিল।—ওই যাঃ! বেচারা পারেখ আর আসতে পারবে না!

ঝড়ে বাড়ির দরজা-জানলাগুলো বিকট শব্দে কাঁপছিল। উনি চেঁচিয়ে উঠলেন—সরযূ! লছমন! বদ্রী! তোমরা দরজা-জানলাগুলো বন্ধ করে দাও!

সব বন্ধ হলেও ঝড়ের শব্দ চাপা শোনাচ্ছিল। মেঘের গর্জনে বাড়িটা কেঁপে-কেঁপে উঠছিল মুহুর্মুহু। গৃহকর্ত্রীর মুখে উদ্বেগের ছাপটা আরও গাঢ় হতে দেখছিলুম। অরিন্দম দ্বিবেদী চাপাগলায় বললেন, বড় আশ্চর্য তো! হঠাৎ এমন প্রাকৃতিক উপদ্রব কেন?

রঘুবীর জয়সোয়াল একটু হাসলেন, হ্যাঁ, প্রকৃতিতে তোলপাড় শুরু হয়েছে। কারণ, কোনও অশরীরী আত্মা যেভাবেই হোক টের পেয়ে গেছে যে তাকে ডাকা হতে পারে!

এ কথায় বাকি সবাই চাপা হাসলেন। কিন্তু শ্রীমতী মালহোত্রা ক্ষুব্ধ হলেন।—মিঃ জয়সোয়াল, তুচ্ছতাচ্ছিল্য আপনি করতে পারেন বটে; কিন্তু বিজ্ঞানকে চমকে দেওয়ার মতো বহু ব্যাপার পৃথিবীতে এখনও আছে। এ-কথা মানেন তো?

ডঃ সীতানাথ পট্টনায়ক বললেন, তা তো আছেই! তবে আত্মার ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হতে পারে! মানসিক অবস্থার ওপর সবকিছু নির্ভর করে। হ্যালুসিনেশন বা ভ্রমদর্শন বলে একটা কথা আছে...

ওঁকে বাধা দিয়ে শ্রীমতী মালহোত্রা একটু হেসে বললেন, সবুর, সবুর! এ আসরে আমরা মোট আটজন লোক। এ কোনও নিছক ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হবে না—কারণ একই জায়গায় একইসঙ্গে আটজন মানুষ হ্যালুসিনেশনে ভুগবে না নিশ্চয়।

অরিন্দম দ্বিবেদী কুণ্ঠিত মুখে বললেন, তা হলে আত্মা যে আজ আসবেই, আপনি সিওর?

শ্রীমতী মালহোত্রা শ্যামলীর দিকে সস্নেহে তাকিয়ে বললেন, সবই নির্ভর করছে আমাদের এই সুইট মিডিয়ামটির ওপর। তোমার ভয় করছে না তো শ্যামলী?

শ্যামলীর মুখের দিকে তাকিয়ে আমি অবাক হয়ে গেলুম। ওর মুখে একটা জেদের ছাপ রয়েছে, সেজন্যেও নয়—তা বাদেও কী যেন আছে, রহস্যময় কিছু, এবং ওই চোখের দৃষ্টি আমার একটুও স্বাভাবিক মনে হল না। কেমন যেন তীক্ষ্ণ, গভীর উজ্জ্বল—অথচ দূরের নক্ষত্রের মতো

ওই দৃষ্টিপাত। যেন সে আমাদের মধ্যে থেকেও আমাদের একজন হয়ে নেই! নিজের মনের ভুল? কে জানে! আমার মধ্যে একটা অস্বস্তি জাগল।

আমি কর্নেলের দিকে তাকালুম। বুড়ো চোখ বুজে বসে রয়েছেন পাথরের মতো। শ্রীমতী মালহোত্রাও যেন শ্যামলীর মুখে আমার মতোই কিছু দেখলেন। তাই কোনও জবাব না পেয়েও ব্যস্তভাবে বলে উঠলেন, তা হলে আসুন, আমরা ওই টেবিলে গিয়ে বসি। তারপর ঘড়ি দেখে নিলেন। অস্ফুটস্বরে ফের বললেন, জাস্ট সাতটা পনেরো মিনিট। কুইক।

ঘরের মেঝে পুরোটা কাশ্মীরি কার্পেটে ঢাকা। ঠিক মধ্যিখানে একটা মেহগনি-রং বিশাল গোলটেবিল—তাতে কোনও ঢাকনা নেই। টেবিলের চারদিক ঘিরে অনেকগুলো চেয়ার। আমরা গিয়ে বসলে একটা বাড়তি হল। সেটা তফাতে সরিয়ে রাখলেন শ্রীমতী মালহোত্রা। বললেন—বদ্রীটার বুদ্ধিসুদ্ধি আর হবে না। বলেছিলুম ছ'টা চেয়ার রাখতে—রেখেছে ন'টা! ছয়কে নয় শোনে যে, তার কানের অসুখ হয়েছে।

বদ্রী সম্ভবত আমাদের পিছু-পিছু এসে ঘরে দাঁড়িয়েছিল। বয়েসে প্রৌঢ়, কিন্তু দেহের গড়নে শক্তি-সামর্থ্যের ছাপ স্পষ্ট। সে কাঁচুমাচু মুখে বলল, আমি ছ'টাই রেখেছিলুম মা। পরে সমঝে দেখলুম, ওনারা ন'জন হচ্ছেন, তাই...।

গৃহকর্ত্রী হেসে বললেন, তা হলে তোমার বুদ্ধির প্রশংসা করতে হয়। কিন্তু বাছা, আমরা তো ন'জন ছিলুম না—আটজন মোটে!

বদ্রী বলল, পারেখসায়েবকে নিয়ে ন'জন যে মা!

—বদ্রী, তুমি বুদ্ধিমান! কিন্তু এই দুর্যোগে উনি আর আসতে পারবেন কি? যাকগে। শোনো বদ্রী, তুমি বাইরের ঘরে গিয়ে অপেক্ষা করো। যদি দৈবাৎ পারেখসাহেব এসে পড়েন, ওঁকে ও-ঘরেই বসতে বলবে। কারণ আমাদের আসর শুরু হলে আর কাউকে ঢুকতে দেওয়া সম্ভব নয়।

বদ্রী মাথা নেড়ে চলে গেল। শ্রীমতী মালহোত্রা দরজার তালা খুলে ওকে যেতে দিলেন—তারপর ভালো করে আটকে দিলেন। তারপর উজ্জ্বল আলোটা নিভিয়ে একটা হালকা নীলাভ আলো জ্বাললেন। ঘরটা কেমন রহস্যে ভরে গেল যেন। নীলাভ আলোটা এত কম ওয়াটের যে কারও মুখ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না। এ-সময় সবগুলো মুখের দিকে আমি তাকালুম।

আমার ডাইনে বসেছে জয়ন্তী। সে তাকিয়ে আছে কর্নেলের দিকে। আমার বাঁয়ে বসেছেন কর্নেল নীলাদ্রি সরকার। তিনি শ্রীমতী মালহোত্রার দিকে তাকিয়ে আছেন। শ্রীমতী মালহোত্রা এখনও বসেননি—দাঁড়িয়ে আছেন। কর্নেলের বাঁয়ে ডঃ পট্টনায়ক। তিনিও গৃহকর্ত্রীকে দেখছেন। তাঁর বাঁ-দিকে রঘুবীর জয়সোয়াল—তাঁর দৃষ্টি শ্যামলীর দিকে, শ্যামলী তাঁর পাশের চেয়ারে এবং আমার চেয়ারের একেবারে উলটোদিকে আমার সামনাসামনি। শ্যামলী টেবিলে দৃষ্টি রেখেছে। শ্যামলীর বাঁয়ে শ্রীমতী মালহোত্রার চেয়ার—তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর বাঁয়ে অর্থাৎ জয়ন্তীর ডাইনে রয়েছেন অধ্যাপক দ্বিবেদী। তিনি যেন জয়সোয়ালকেই দেখছেন।

ঘরে স্তব্ধতা—কিন্তু বাইরে প্রকৃতি তোলপাড় হচ্ছে। মাঝে-মাঝে বাজ পড়ছে। মেঘ ডাকছে। ঝড়ের শনশন শাঁ-শাঁ শব্দে পাহাড় আর অরণ্য মুখর হচ্ছে। বাড়িটা থরথর করে কাঁপছে যেন। তারপর মনে হল, বৃষ্টি শুরু হয়েছে। পাহাড়ি ঝড়বৃষ্টির ভীষণতার কোনও তুলনা নেই। এসব সময় ধস নামে। সে বড় বিপজ্জনক কাণ্ড! অনেক বসতি গুঁড়ো হয়ে যায়। মানুষ চাপা পড়ে। রাস্তা পাথরের স্তূপে বন্ধ হয়ে যায়। আবার অনেক সময় রাস্তাও ধসে গিয়ে অতল খাদ সৃষ্টি হয়। এখনও নিশ্চয় তা হচ্ছে কোথাও।

শ্রীমতী মালহোত্রা বক্তৃতার ঢঙে বললেন—বন্ধুগণ! এবার আমাদের আসর শুরু হবে। তার আগে দু-চার কথা বলা দরকার। অবসরজীবনে প্রেততত্ত্ব নিয়ে পড়াশুনো করে আমার বদ্ধমূল ধারণা

হয়েছে যে মানুষের দেহ ধ্বংস হয়, কিন্তু আত্মা ধ্বংস হয় না। ভারতবর্ষের প্রাজ্ঞ দার্শনিকরা যে সত্য হাজার-হাজার বছর আগে জেনেছিলেন, পাশ্চাত্যের নিরীশ্বরবাদী দর্শন আর বিজ্ঞানের পাল্লায় পড়ে আমরা বিদগ্ধ শিক্ষিত সমাজ তা অস্বীকার করতে শিখেছি। আমিও একসময় তাই করেছি। কিন্তু এক দুর্ঘটনায় আমার স্বামী ডঃ মালহোত্রার মৃত্যুর পর এমন অনেক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা আমার হল, যার ফলে আমি প্রেততত্ত্ব নিয়ে গবেষণা শুরু করলুম। এখন কথা হচ্ছে—আত্মা দেহের মৃত্যুর পর থেকে যাচ্ছে। কিন্তু তার এ থাকাটা কীরকম? এর জবাব আমরা বিজ্ঞানের মাধ্যমেই পাচ্ছি। আপনারা জানেন, আলো শব্দ এসব হল একরকমের তরঙ্গ। একটা তরঙ্গের নির্দিষ্ট মাপে আমরা আলো দেখতে পাই বা শব্দ শুনতে পাই। কিন্তু আমাদের এমন কোনও ইন্দ্রিয় নেই, যা দিয়ে সেই নির্দিষ্ট মাপের বাইরে কোনও আলো বা শব্দ আমরা টের পেতে পারি। এখানেই আমরা অসহায়। এখন তা হলে দাঁড়াল, তরঙ্গতত্ত্ব। বিজ্ঞান আজ বলছে, আমাদের চিন্তা ভাবনাও একরকম তরঙ্গ —মস্তিষ্কে তার উদ্ভব। মস্তিষ্কের তরঙ্গ নিয়েই গড়ে উঠেছে প্যারা-সাইকোলজি শাস্ত্র। সব তরঙ্গেরই ধর্ম গতিশীলতা, অর্থাৎ স্থানান্তরে চলাচলে সমর্থ সে। তা হলে দাঁড়াচ্ছে—মস্তিষ্কের যে বিশেষ মাত্রার তরঙ্গ উঠল, তা চলতে শুরু করল মস্তিষ্কের কেন্দ্র থেকে। এই তরঙ্গ ইথারের মতোই সর্বব্যাপী। পৃথিবীর সকল মস্তিষ্কে গিয়ে কাঁপন তোলে। কিন্তু মুশকিল হয়েছে এই যে, আমবা এত নানা ব্যাপারে ব্যতিব্যস্ত থাকি, এত ঝঞ্ঝাট ও বৈষয়িক জটিলতায আমাদের দিন কাটাতে হয় যে নিজের মস্তিষ্কতরঙ্গ নিয়েই কূল পাইনে—অন্য বহিরাগত তরঙ্গের আঘাতে কী অনুভূতি আমাদের মধ্যে সৃষ্টি হল, খোঁজ রাখিনে। ধরুন, কোনও মানুষ মৃত্যুর মুহূর্তে তীব্রভাবে কিছু ভেবেছিল—হ্যাঁ, আবার বলছি 'তীব্রভাবে'। এই তীব্র তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে—প্রত্যেকটি মস্তিষ্কেব স্নায়ুকেন্দ্রে আঘাত হানল। আমরা যদি সজাগ ও অনুভূতিশীল হই, তা হলে তা টের পাব। যেমন আমি আমার স্বামীর মৃত্যু টের পেয়েছিলুম ষাট মাইল দূব থেকে। আমার মনে হয়েছিল— কে যেন আমার অতি প্রিয়জন আমারই নাম ধরে কিছু বলতে চাইছেন।...

বাইরে কোথাও ফের বাজ পড়ল এবং তাবপর আবছা শোনা গেল কে যেন দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে প্রচণ্ড। শ্রীমতী মালহোত্রা অস্ফুটস্বরে বলে উঠলেন, ওই বুঝি পারেখ এল!

কিন্তু দু-মিনিট অপেক্ষা করার পরও বদ্রী তাকে নিয়ে এল না বা বদ্রী নিজেও কোনও সাড়া দিল না। তা হলে কি আমাদের কানের ভুল?

শ্রীমতী মালহোত্রা ফের শুরু করলেন, হ্যাঁ, আমার ধাবণা, সবচেয়ে তীব্র মস্তিষ্কতরঙ্গ বা ব্রেনওয়েভগুলো মোটামুটি অনুভূতিশীল সচেতন মানুষরা ধরতে পারেন এবং ব্যাখ্যা করতে পারেন। এই তীব্রতা কখন থাকে? আকস্মিকভাবে যখন কোনও মানুষেব মৃত্যু হয়, তখন। তাই আমার বক্তব্য, আমাদের খুব পরিচিত কোনও মানুষ যদি আকস্মিক দুর্ঘটনায় অথবা কোনও ভাবে মারা গিয়ে থাকেন, তাঁর সেই মৃত্যুকালীন তীব্র ব্রেনওয়েভটা ধরতে পারলে তারই সূত্রে আমরা তাঁর আত্মাকেও আকর্ষণ করে আনতে পারব।

কর্নেল স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে বলে উঠলেন, রাইট, রাইট।

ডঃ পট্টনায়ক বললেন, খুবই যুক্তিসিদ্ধ।

জয়সোয়াল একটু হাসলেন মনে হল। অধ্যাপক দ্বিবেদী বললেন, তা হলে তো মিডিয়ামেরই পরিচিত কোনও মানুষের আত্মা হওয়া দরকার।

জয়ন্তী কী বলতে যাচ্ছিল, শ্রীমতী মালহোত্রা বললেন, ঠিক বলেছেন প্রফেসর দ্বিবেদী। এক্ষেত্রে শ্যামলীকেই মিডিয়াম করেছি যখন, তার পরিচিত কোনও আত্মা আনাই সহজ হবে। শ্যামলী, ডার্লিং। এমন কাকেও কি তোমার এ মুহূর্তে মনে পড়ছে—যিনি দুর্ঘটনায় অথবা ধরো, আততায়ীর হাতে হঠাৎ মারা পড়েছিলেন?

আমরা শ্যামলীর দিকে তাকালুম। সে অস্ফুটস্বরে শুধু বললে, হ্যাঁ।

জয়সোয়াল বললেন, একটা কথা। তাঁকে যদি আমরা সবাই না চিনি, তা হলে কীভাবে বুঝব যে শ্যামলী আমাদের ঠকাচ্ছেন না? তা ছাড়া, আমার যা জানা আছে—মিডিয়ামের মারফত আত্মা আসরে আসেন, কিন্তু তার জন্যে সেই আত্মা সম্পর্কে আসরের সবাইকে চিন্তা করতে হয়। এক্ষেত্রে আমাদের কি তা হলে নির্বাক দর্শকের ভূমিকায় বসে থাকতে হবে?

শ্রীমতী মালহোত্রা বললেন—আমার এ আসরের রীতি একেবারে অন্যরকম। কারণ, আমি বিজ্ঞানের সূত্র অনুসারে ব্যাপারটা ঘটাতে চাই। কাজেই আমাদের এক্ষেত্রে শ্যামলীর ওপরই নির্ভর কবতে হবে। আর—সে ঠকাচ্ছে কি না, তার প্রমাণ পেতে আমাদের অসুবিধে হবে না। আমরা তাকে প্রত্যেকে প্রশ্ন করব। মৃত মানুষের আত্মা যেহেতু সর্বচর এবং সময়ের বাঁধনে বাঁধা থাকে না, তাই জয়সোয়াল যদি ইচ্ছে করেন, তাঁর নিজের ছেলেবেলার কোনও ঘটনা সম্পর্কে আত্মা কিছু বলুক, তা অবশ্যই বলা উচিত। অন্তত আভাস দেওয়া উচিত। তা না হলে তো শ্যামলীর ওপর সন্দেহ জাগা স্বাভাবিক।

এ সময় জয়ন্তী আমার উরুতে আঙুলের চাপ দিল। বুঝলুম, ওর বক্তব্য—শ্যামলী এবার ঠেলাটা টের পাক।

তা ঠিক। শ্রীমতী মালহোত্রা ফাঁকি বা চালাকির দরজা বন্ধ কবে দিলেন। কে জানে কেন, অস্বস্তি হতে লাগল আমার। ওদিকে বাইরে প্রাকৃতিক দুর্যোগ সমানে চলেছে।

শ্রীমতী মালহোত্রা ঘড়ি দেখে বললেন—এবার আলো নেভাব। শ্যামলী, বাছা তোমার ভয় করছে না তো? এখনও বলো!

শ্যামলী মাথা দোলাল।

—ওক্কে! তা হলে আলো নিভলেই শ্যামলী তুমি তোমার সেই পরিচিত লোকটির সম্পর্কে চিন্তা শুরু কববে। খবরদার, অন্য কোনও চিন্তা নয়। শুধু—তাঁব কথা ভাববে। প্রথমে তাঁর চেহারাটা সামনে আনবে। তাবপর মনে মনে তাঁকে ডাকবে। তাঁর সম্পর্কে প্রত্যেকটি স্মৃতি ব্যবহার করবে। আশা করি, আব কিছু বুঝিয়ে বলার দরকাব নেই। এবার আমরাও বিমূর্তভাবে শ্যামলীর সেই আত্মাকে আহ্বান জানাব। প্লিজ, কেউ অন্যমনস্ক হবেন না।

তারপরই টেবিলের পাশে কোথাও সুইচ টিপে দিলেন উনি। আলো নিভে গেল। ঘরটা প্রায় অন্ধকারে ভরে গেল তক্ষুনি। আমার মনে হল, চোখ নামে কোনও ইন্দ্রিয় আমার নেই। শ্রীমতী মালহোত্রা শুধু একবার ফিস-ফিস করে বললেন, কেউ কোনও শব্দ নয়। নড়বেন না প্লিজ। শ্যামলীর পরিচিত আত্মাকে মনে-মনে ডাকুন।

দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল যেন। বাইরে ঝড়বৃষ্টি আর মেঘের তুমুল গর্জন—এখানে এই অন্ধকারে যেন ক'জন মানুষ হারিয়ে গেছে পৃথিবীর বিপুল জীবনধারা থেকে। নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে যেন।

কতক্ষণ কেটে গেল। ক্রমশ আমার মনে সেই অস্বস্তিটা বেড়ে যাচ্ছিল। একটা চাপা আতঙ্ক গলা শুকিয়ে কাঠ করে দিচ্ছিল। সত্যি কি কোনও আত্মার আবির্ভাব আসন্ন! চমকে উঠছিলুম, কার ঠান্ডা অতিঠান্ডা হাতের ছোঁওয়া পাচ্ছি না তো? কোনও বরফের হাত হিংস্রতায় নিঃশব্দতায় আমারই গলায় চেপে বসছে না তো? আবার প্রচণ্ড শব্দে বাজ পড়ল। বাড়িটা কেঁপে উঠল। তারপর শ্যামলীর ওখান থেকে কী একটা আবছা শব্দ হল।

তারপরই শ্যামলীর কণ্ঠস্বর শুনলুম। এ কণ্ঠস্বর যে শ্যামলীরই, তা অবশ্য বলা কঠিন। কেমন চাপা, নাকিস্বর, দুরারোগ্য রোগে ভুগছে এমন দুর্বল কারও গলা!—আমি...আমি কোথায় আছি?

আরও দুবার কথাটা শুনলুম। তারপর শ্রীমতী মালহোত্রাকে চাপাস্বরে বলতে শোনা গেল—মিসেস সরোজিনী মালহোত্রার ঘরে।

—কেন? এখানে কেন? এখানে কেন আমি? কেন—কেন—কেন?...

—তার আগে বলুন, কে আপনি?

—আমি...তাই তো! আমি কে? কে আমি? কে?

—স্মরণ করুন। ভেবে দেখুন, কে আপনি।

—মনে পড়ছে না। আমার মনে পড়ছে না। কিচ্ছু মনে পড়ছে না।

—এখানে আসার আগে কোথায় ছিলেন?

—কোথায় ছিলুম? আমি...আমি কোথায়...হ্যাঁ...ছিলুম পাহাড়ি খাদে।

—পাহাড়ি খাদে? ওখানে কেন বলুন তো?

—জানি না। কিচ্ছু জানি না। আমি জানি না।

—কোন পাহাড়ি খাদে? এ প্রশ্নটা করলেন অধ্যাপক অরিন্দম দ্বিবেদী।

—ভূতের পাহাড়ের পশ্চিমে। ভূতের পাহাড়ে—ভূতের পাহাড়ে...।

শ্রীমতী মালহোত্রার তীব্র চাপা কণ্ঠস্বর শোনা গেল।—কিন্তু কে? আপনি কে?

—আমার কষ্ট হচ্ছে, খুব কষ্ট হচ্ছে। কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে।

—কে আপনি...এ কণ্ঠস্বর জয়সোয়ালের।

—আমার ঘাড় ভেঙে গেছে। লাংস ফেটে গেছে। হার্ট গুঁড়ো হয়ে গেছে।

শ্রীমতী মালহোত্রা বললেন—আপনাকে ফেলে দিয়েছিল কেউ?

—ফেলে দিয়েছিল। ডেকে নিয়ে গিয়ে ফেলে দিয়েছিল। ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছিল!

—কে ফেলে দিয়েছিল? কী নাম তার?

—বলব না, আমি বলব না, কিছুতেই বলব না।

—কেন ফেলে দিযেছিল?

—আমি তাকে চিনতুম। এবাব সে ভয় পেয়েছিল। খুব ভয় পেয়েছিল।

এবার কর্নেল বললেন—কিন্তু আপনি কে?

—বলব না। বলব না। বলব না।

—না বললে আপনার হত্যাকারীকে শাস্তি দেওয়া যাবে না যে!

—কে? কে দেবেন শাস্তি? কে দেবেন তাকে শাস্তি? কে—কে?

—আমি কর্নেল নীলাদ্রি সরকার বলছি—আই প্রমিস।

—চিনি আপনাকে। খুব চিনি। চিনি—চিনি—চিনি...।

—তাই বলছি, বলুন কে আপনি?

—বলব? আমি বলব—বলব—বলব?

যেন সাতটি কণ্ঠ একসঙ্গে বলে উঠল, বলুন, বলুন!

—আমি...আমি মোহন পারেখ! মোহন—মোহন পারেখ।

ঘরের মধ্যে ভয়ংকর শব্দে বাজ পড়ল যেন। যেন সবাই একসঙ্গে অস্ফুটস্বরে বলে উঠলুম—মোহন পারেখ!

তারপর শ্রীমতী মালহোত্রা বললেন—অসম্ভব। মোহন পারেখ জীবিত। তার এখানে আসার কথা ছিল। ঝড়জলে আটকে গেছে হোটেলে। আপনি মিথ্যে বলছেন। আজ সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টাতেও সে ফোন করেছিল—ঝড়জলে বেরুতে পারছে না।

—এখন করল না কেন? কেন করল না? কেন ফোন করলুম না?

কয়েক মুহূর্তের স্তব্ধতা। তারপর আবার মেঘ ডেকে উঠল। একবার নয়—পরপর কয়েকবার। ঘর প্রচণ্ড জোরে কেঁপে উঠল। সেইসময় যেন আবছা কী একটা শব্দ শুনলুম। তারপর শ্রীমতী মালহোত্রা একটু চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, মিথ্যে। শ্যামলীর চালাকি। এমন চমৎকার আসরটা ভেস্তে দিল বোকা মেয়েটা!

তারপর চেয়ার নড়ার শব্দ হল। তারপরই সেই নীল আলোটা জ্বলে উঠল। প্রথমেই আমার

চোখ গেল শ্যামলীর দিকে। সে চেয়ারে হেলান দিয়েছে, মাথাটা একপাশে কাত হয়েছে, ডান হাতটা ঝুলছে এবং বাঁ-হাত উরুর ওপর পড়ে রয়েছে। অজ্ঞান হয়ে গেছে নাকি?

জয়ন্তী চেঁচিয়ে উঠল, শ্যামলী, শ্যামলী!

শ্রীমতী মালহোত্রা দাঁড়িয়ে ছিলেন। বিরক্ত হয়ে বললেন, ও মোটেও অজ্ঞান হয়নি। ও চালাকি করছে! আজকালকার মেয়েগুলোকে আমি তো কম চিনিনে? সব বিচ্ছু! ইস! কী চমৎকার সময় আজ পাওয়া গিয়েছিল। এই ঝড়বৃষ্টির রাতেই তো ওরা আসে!

জয়সোয়াল খুকখুক করে হেসে বললেন, মোহন পারেখ! মাই গুডনেস! ছোকরা শুনলে ক্ষেপে আগুন হয়ে যাবে!

অধ্যাপক উদ্বিগ্ন স্বরে বললেন, দেখুন, আমার মনে হচ্ছে, আপনারা ভুল করছেন। শ্যামলী হয়তো সত্যি অজ্ঞান অবস্থায় রয়েছে।

এই শুনে জয়ন্তী চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর ওর দিকে এগিয়ে গেল।—শ্যামলী! এই শ্যামলী!

এই সময় শ্রীমতী মালহোত্রা দেওয়ালের দিকে এগিয়ে বড় আলোর সুইচ টিপে দিলেন। উজ্জ্বল সাদা আলোয় ঘর ভরে গেল। তারপর দেখলুম জয়ন্তী শ্যামলীর কাঁধে হাত রেখে ফের একবার 'শ্যামলী' বলে ডেকেই ভাঙা গলায় বিস্ময়-আতঙ্ক মেশানো চিৎকার করে উঠল—এ কী! শ্যামলীর কী হয়েছে? ওর গা এত ঠান্ডা কেন? চেহারা এমন কেন?

কর্নেলের দিকে তাকালুম। ভুরু কুঁচকে তীব্র দৃষ্টিতে শ্যামলীকে দেখছিলেন উনি। এবার জয়ন্তীর কথার সঙ্গে-সঙ্গেই উঠে দাঁড়িয়ে অস্ফুটস্বরে বললেন, ওঃ জেসাস! শ্যামলীর চেহারা অমন কেন? না—না, এ অদ্ভুত—অবিশ্বাস্য।

এতক্ষণে ঠাহর হল। তাই তো! শ্যামলীর অত সুন্দর মুখটা ঠিক যেন বাঁদরের মুখের চেয়ে কুৎসিত দেখাচ্ছে। ওই মুখ কি মানুষের? যেন কোনও ভয়ংকর শক্তি ওর চেহারাকে যতটা পারে বীভৎস করে গেছে অন্ধকারের সুযোগে। মাথার চুল খাড়া হয়ে গেল। গায়ে কাঁটা দিল। অজ্ঞাত ভয়ে থরথর করে কেঁপে উঠলুম। শ্যামলীর দিকে তাকাতে সাহস পেলুম না আর।

কয়েক মুহূর্তের জন্যে সবাই স্তব্ধ হয়ে প্রচণ্ড বিস্ময় আর আতঙ্কে ওই বীভৎসতা লক্ষ করছিল। তারপর কর্নেল গম্ভীর স্বরে বলে উঠলেন—জয়ন্তী, তুমি সরে দাঁড়াও ওখান থেকে। ডঃ পট্টনায়ক, প্লিজ! একবার পরীক্ষা করে দেখুন তো শ্যামলীর কী হয়েছে?

শ্রীমতী মালহোত্রার মুখ ততক্ষণে সাদা হয়ে গেছে। ভয়ার্তস্বরে বললেন, তা হলে কি শ্যামলী সত্যি-সত্যি অভিনয় করেনি? কিন্তু মোহন পারেখ—না, না, সে অসম্ভব।

ডঃ পট্টনায়ক এগিয়ে গিয়ে প্রথমে শ্যামলীর নাড়ি দেখলেন। ওঁর মুখে বিস্ময় দেখলুম। তারপর হাতটা রেখে চোখের পাতা পরীক্ষা করলেন। তারপর ভাঙা গলায় একটু কেশে শান্তভাবে বললেন, কর্নেল, শ্যামলী মারা গেছে।

জয়ন্তী ডুকরে কেঁদে উঠল, তুই এ কী করলি শ্যামলী!

শ্রীমতী মালহোত্রা ওকে দু-হাতে ধরে তফাতে নিয়ে গেলেন। ধরা গলায় বললেন, ক্ষমা করো, তোমরা আমায় ক্ষমা করো। এ হবে আমি একটুও ভাবিনি। প্রেততত্ত্বের একটা বইতে অবশ্য সতর্ক করা হয়েছে—এ আগুন নিয়ে খেলা। সাবধানে আত্মাদের ডাকতে হয়। কিন্তু আমি সাবধান করে দিইনি ওকে। আমারই ভুলের জন্যে ফুলের মতন অমন কচি মেয়েটা...ওঃ ভগবান। এ আমি কী করলুম।

—শ্যামলী মারা গেছে? কর্নেল বলে উঠলেন।—সে কী! না—না—এ অবিশ্বাস্য!

জয়সোয়াল আস্তে-আস্তে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।—আপনার ভুল হচ্ছে না তো ডঃ পট্টনায়ক?

ডঃ পট্টনায়ক মাথা দোলালেন।—না। শ্যামলী আর বেঁচে নেই।

অধ্যাপকও উঠে দাঁড়ালেন।—কিন্তু, কী ভাবে মৃত্যু হল ওর? আপনারা কি বলতে চান কোনও প্রেতশক্তিই ওকে হত্যা করে গেছে?

জবাবটা দিলেন শ্রীমতী মালহোত্রা।—হ্যাঁ, কোনও দুষ্ট আত্মার আবির্ভাব ঘটেছিল ওর মধ্যে। মোহন পারেখ কখনও তার নাম হতে পারে না। নিজের নামটা সে বলতে চায়নি। কারণ, আপনারা বুঝতে পারছেন না—মোহন পারেখ যদি সত্যি আজ মারা গিয়ে থাকে, তা হলেও শ্যামলীর সঙ্গে ওর পরিচয় থাকা কী ভাবে সম্ভব?

জয়সোয়াল বললেন, তা হলে মানতে হয় সত্যি-সত্যি ভূত এসে মেরে গেল শ্যামলীকে? অ্যাবসার্ড। ইমপসিবল! আনবিলিভেবল!

কর্নেল ঘরের মেঝের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। মুখ তুলে শুধু বললেন—রাইট, রাইট! কিন্তু...না, না! আমার বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পাচ্ছে ক্রমশ।

—চারপাশে আমরা রইলুম জলজ্যান্ত এতগুলো মানুষ! আর ভূত এসে মারল? অসম্ভব?—জয়সোয়াল দৃঢ়স্বরে বললেন।

শ্রীমতী মালহোত্রা বললেন, কিন্তু ওর চেহারাটা দেখুন! মিঃ জয়সোয়াল, আপনি তো পুলিশ সুপার ছিলেন! অনেক মার্ডারড ডেডবডি দেখেছেন। শ্যামলীর ডেডবডিটা দেখেও কি বুঝতে পারছেন না কী ঘটেছে?

অধ্যাপক দ্বিবেদী ভীতস্বরে বললেন—ভয় পেয়ে মারা পড়েনি তো?

আমি এতক্ষণ কাঠ হয়ে বসেছিলুম। এবার সংবিৎ ফিরে এল। উঠে দাঁড়িয়ে বললুম—কর্নেল! আমার মনে হচ্ছে, ব্যাপারটা এখনই পুলিশকে জানানো দরকার। আফটার অল—এ একটা আকস্মিক মৃত্যু!

কর্নেল আমার দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে বললেন, রাইট, রাইট! আমার জ্ঞানবুদ্ধি লোপ পেতে বসেছিল, জয়ন্ত। এমন অদ্ভুত মৃত্যু আমি জীবনে কখনও দেখিনি। মিসেস মালহোত্রা, ওকে ফোনটা দেখিয়ে দিন—প্লিজ! আর—জয়ন্তী, তুমি আমার কাছে এসো। মিঃ জয়সোয়াল, আপনি জানলা খুলে দেখুন তো ঝড়বৃষ্টির অবস্থাটা কী। অধ্যাপক, আপনি এখানে সরে আসুন। ডঃ পট্টনায়ক, আপনি শ্যামলীর পাশেই থাকুন।

নির্দেশগুলো শুনতে-শুনতে আমি শ্রীমতী মালহোত্রার সঙ্গে দরজার দিকে এগিয়ে গেলুম। দরজার যা ব্যবস্থা, ভেতর থেকে টানলেই তালাবন্ধ হয়ে যায়। চাবি ছাড়া খোলা যায় না। শ্রীমতী মালহোত্রার ট্যাকে চাবির গোছা লক্ষ করলুম। দরজা খুলে ডাইনিং হলে ঢুকে উনি বললেন—ওই যে ফোন।

ডাইনিং হলে একা বদ্রী বসে ছিল। গৃহকর্ত্রীকে দেখে বলল, পারেখসায়েব তো আসেননি মা। একবার যেন কে দরজায় ধাক্কা দিল—খুললুম, কিন্তু কাকেও দেখতে পেলুম না।

শ্রীমতী মালহোত্রা তাকে কিছু বললেন না। গম্ভীর মুখে আবার স্টাডিতে ফিরে গেলেন। আমি ততক্ষণে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছি। এমন হতভম্ব যে ওঁকে বলতে ভুলে গেছি যে টেলিফোনটা যাকে বলে ডেড—নিষ্প্রাণ।

কয়েকবার টেপাটেপি করে বদ্রীকে ইশারায় ডাকলুম। সে কাছে এসে সেলাম দিয়ে বলল, লাইন পাচ্ছেন না হুজুর?

—না বদ্রী। মনে হচ্ছে, লাইনটা কেউ কেটে রেখেছে!

বদ্রী চমকে উঠে বলল, তাজ্জব! কে কাটবে লাইন? এই তো সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় পারেখজিকে ফোন করতে বললেন মাইজি। ফোন করলুম।

—পারেখজি? মানে—মোহন পারেখ?

—জি হাঁ সাহাব।

—পেলে ওঁকে?

—জরুর পেলুম। বললুম, মাইজি আপনার ইন্তেজার করছেন। তো পারেখজি বললেন, এখনই আসছি। তারপর তো ঝড় উঠল।

—বদ্রী, এসো, আমরা লাইনটা খুঁজে দেখি—ঘরেই কোথাও কিছু ঘটেছে নাকি!

বদ্রী ব্যস্ত হয়ে লাইনটা খুঁজতে শুরু করল। আমিও তার সঙ্গে পরীক্ষা করতে থাকলুম। অবশেষে হাত পাঁচেক দূরে একটা বড় আলমারির পিছনে আবিষ্কার করলুম, তারটা সুন্দর ভাবে কেউ দুভাগে কেটে রেখেছে!

বদ্রী চেঁচিয়ে উঠল—হায় রামজি! কে এমন কাজ করল?

বললুম, বদ্রী, ব্যস্ত হতে হবে না। শোনো, তুমি গিয়ে দরজাটা খুলে দেখো তো, ঝড়বৃষ্টি কমেছে নাকি।

বদ্রী সঙ্গে-সঙ্গে গিয়ে দরজা খুলে দিল। ঝড় কমেছে—শুধু ফোঁটা-ফোঁটা বৃষ্টি ঝরছে। আমিও ওর পিছনে দাঁড়িয়ে দেখে নিলুম। কিন্তু এক মুহূর্তও দাঁড়াতে সাহস হল না। ওই অন্ধকারে যেন আজ রাতে দলে-দলে অশরীরী আত্মা এসে অপেক্ষা করছে, কখন কার নাম ধরে ডাকা হবে। আতঙ্কে কাঠ হয়ে বললুম, দরজা বন্ধ করো বদ্রী। তারপর প্রায় দৌড়ে স্টাডির দরজায় হাজির হলুম। বোতাম টিপে দরজা খুলে দিলেন শ্রীমতী মালহোত্রা। তখন রুদ্ধশ্বাসে বললুম, কর্নেল, কর্নেল! কে ওঘরে ফোনের লাইনটা কেটে রেখেছে।

শ্রীমতী মালহোত্রা চেঁচিয়ে উঠলেন, হোয়াট? ফোনের লাইন কেটেছে?

ঘরের আর সবাই চমকে উঠলেন একসঙ্গে। কর্নেল চিন্তিত মুখে এক মুহূর্ত কী ভেবে নিয়ে বললেন, মিসেস মালহোত্রা। এখনই বদ্রীকে আলো দিয়ে থানায় পাঠান। এক মুহূর্ত দেরি নয়। জয়ন্ত, প্লিজ—বদ্রীর সঙ্গে যাও। আগাগোড়া সব জানাবে ওঁদের। কুইক!

আবার বেরিয়ে এলুম গৃহকর্ত্রীর সঙ্গে।

তিন : প্যাথোজেন ও ইলেকট্রনিক ঘড়ি

ঘুম ভাঙলে প্রথমে কয়েক মুহূর্ত কিছু টের পেলুম না যে কোথায় আছি। মাথাটা খালি লাগছিল। তারপর মনে পড়ল রাত তিনটেয় গ্রিন ভিউ হোটেলে ফিরে এসেছিলুম কর্নেলের সঙ্গে। কোনও কথা আর বলিনি পরস্পর এবং শুয়ে পড়েছিলুম।

মাথার কাছে হাতড়ে ঘড়িটা বের করলুম। দেখি, সাড়ে আটটা বাজে। তখন মুখ ঘুরিয়ে আমার বৃদ্ধ বন্ধুকে খুঁজলুম। ওঁর বিছানা খালি। এত পারেন বটে। যত রাতই জাগুন, বরাবর দেখেছি, ছ'টার পর আর বিছানায় কিছুতেই পড়ে থাকবেন না। প্রাতঃকৃত্য সেরেই বেড়াতে বেরোবেন এবং যথাসময়ে ফিরে আমাকে জেগে থাকতে দেখলে সলজ্জ হেসে বলবেন, সুপ্রভাত তরুণ বন্ধু! আশা করি, সুনিদ্রার কোনও ব্যাঘাত ঘটেনি।

পশ্চিমের জানলা খোলা ছিল। কাত হয়ে কিছুক্ষণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখতে থাকলুম। এখন উজ্জ্বল রোদ ঝলমল করছে। পাহাড় ও অরণ্য জুড়ে সবুজ হলুদ ও লাল রঙে আঁকা এক অপার্থিব আনন্দধারার ছবি আঁকা হয়েছে যেন। তাজা জীবনের ওই রূপে মৃত্যুর দুঃখ বা অশরীরী অশুভের কোনও আতঙ্ক নেই।

এবার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে সেই কুখ্যাত ভূতের পাহাড়ে চোখ গেল। সেখানেও রোদ ঝলমল করছে। এখন মনে হল, গত রাতে যা কিছু ঘটেছে সব একটা মারাত্মক দুঃস্বপ্ন ছাড়া কিছু নয়।

হাত বাড়িয়ে ঘণ্টার সুইচ টিপতে যাচ্ছি, দরজায় বেয়ারা হরিয়ার পরিচিত গলা শোনা গেল—বেড-টি এনেছি সাহাব!

—চলে এসো!

হরিয়া চা রেখে চলে গেল। ওকে জিগ্যেস করলুম না—এখন বেড-টি দিতে কে ফরমাশ করল। কর্নেল ছাড়া আর কে হবেন? নিশ্চয় বুড়ো তাঁর হাজার চোখের একটি দিয়ে সব দেখতে পাচ্ছেন আমি কী করছি না-করছি।

ধীরে-সুস্থে আধশোয়া অবস্থায় চা খেয়ে তারপর উঠে পড়লুম। বাথরুমে গিয়ে দাড়ি কাটতে-কাটতে রাতের সব ঘটনা এতক্ষণে চোখের সামনে ভেসে উঠল। শ্যামলীর মুখটা মনে পড়ল। অমনি সারা শরীর ভয়ে হিম হয়ে গেল। অধ্যাপক অরিন্দম দ্বিবেদী পুলিশ অফিসার মিঃ সতোশ খান্নাকে বলছিলেন,—যদি এ কোনও অলৌকিক বা ভুতুড়ে কাণ্ড হয়, তা হলে আমার ধারণা, বিকেলে ওই ভূতের পাহাড়ে চড়ার সময়ই দুষ্ট আত্মাটা শ্যামলীর পিছু নিয়েছিল।

তখন কথাটা গ্রাহ্য করিনি। এখন মনে হল, তাই ঘটেছে। তা ছাড়া আর কী ব্যাখ্যা হতে পারে শ্যামলীর মৃত্যুর? আর মোহন পারেখের ব্যাপারটা...

চিন্তায় বাধা পড়ল আমার বৃদ্ধ সঙ্গীর গম্ভীর কণ্ঠস্বরে।—সুপ্রভাত জয়ন্ত। আশা করি তোমার সুনিদ্রা হয়েছে।

উঁকি মেরে দেখি, কর্নেল আর জয়ন্তী ঘরে ঢুকেছেন কখন। আশ্চর্য, এতটুকু শব্দ হয়নি দরজার। জয়ন্তীর মুখটা ফোলা-ফোলা। চোখ দুটো কোটরে ঢুকেছে। শোকগ্রস্ত রুক্ষ চেহারা। বেচারার জন্যে দুঃখ হল। সে একটা চেয়ারে বসলে কর্নেল আমার উদ্দেশ্যে ফের বললেন—জয়ন্তের মেজাজের কাঁটা কি এখনও স্বাভাবিক ডিগ্রিতে পৌঁছয়নি? দুঃখিত বৎস, খুবই দুঃখিত। তোমাকে ওই পাহাড়ি জংলি টাট্টু বর্ষ্রীটার সঙ্গে ভূত-প্রেত অধ্যুষিত বাণেশ্বরে খানিকটা ছোটাছুটি করিয়েছিলুম গত রাত্রে। এজন্যে আমাকে ক্ষমা করো। তোমার মতো শক্তসমর্থ বুদ্ধিমান যুবক আর কোথায় পেতুম তখন?

কথার ভঙ্গি শুনে হেসে ফেললুম।—দাড়ি কাটার সময় কথা বলতে নেই। এ আমার গুরুজনের শিক্ষা। যাক গে। মোহন পারেখের পাত্তা পাওয়া গেল?

—হ্যাঁ।

চমকে উঠলুম।—হ্যাঁ মানে? শ্যামলীর কথা তা হলে সত্যি?

—নিখাদ সত্যি, জয়ন্ত। কিছুক্ষণ আগে ভূতের পাহাড়ের পশ্চিম খাদে ওর দলাপাকানো লাশটা পুলিশ খুঁজে পেয়েছে। কেউ সত্যি ওকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছিল।

তাড়াতাড়ি মুখ ধুয়ে বেরিয়ে এলুম। দাঁত ব্রাশ করা আর হল না। ঘরে ঢুকে নিজের বিছানায় বসে বললুম—আপনি স্বচক্ষে দেখে এলেন নাকি?

—দেখলুম।...কর্নেল চিন্তিত মুখে জবাব দিলেন।

—শ্যামলীর লাশের ময়নাতদন্ত এতক্ষণ নিশ্চয় হয়ে যাওয়া উচিত। কোনও খবর পাননি এখনও?

—ডঃ পট্টনায়ক মর্গে রয়েছেন। উনি রিং করবেন ন'টা নাগাদ। দেখা যাক।

—মর্গ তো সেই বাণেশ্বর-ইস্টের হাসপাতালে?

কর্নেল মাথা দোলালেন। জয়ন্তী আস্তে ভাঙা গলায় বলল—কী পাবে লাশে? কিছু না। আমাকে শ্যামলী বরাবর কুসংস্কারের ডিপো বলে ঠাট্টা করত। তাই যেন ওর এই কঠিন শাস্তি হল। ওর মাকে কী ভাবে মুখ দেখাব, ভেবে পাচ্ছি না।

বললুম, ওর আত্মীয়স্বজনকে টেলি করা হয়েছে তো?

কর্নেল বললেন, তুমি এইমাত্র ঘুম থেকে উঠেছ কি না। গতরাত্রে আরও কত ভয়ংকর ঘটনা

ঘটেছে, জানো না জয়ন্ত। বাণেশ্বরে আমরা আপাতত কয়েকটা দিন আটকে গেলুম। কারণ ফেরার পথ বন্ধ। টনকপুরের রাস্তায় বিরাট ধস নেমেছে। টেলিসংযোগ বিচ্ছিন্ন—সব পোস্ট উপড়ে গেছে। মেন ইলেকট্রিক লাইনও ছিঁড়েছে। তার ফলে এখন স্থানীয় বিদ্যুতের ওপর সামান্য ভরসা। লাধিয়া নদীর জলপ্রপাত থেকে জলবিদ্যুৎ যেটুকু হয় তার তিন ভাগ যায় সামরিক ছাউনিতে, এক ভাগ পায় বাণেশ্বরের অসামরিক বাসিন্দারা। লোডশেডিং না হয়ে যায় না আজ। বুঝলে জয়ন্ত, আপাতদৃষ্টিতে সমস্ত ব্যাপারটা যেন এক অদৃশ্য শক্তির মারাত্মক ষড়যন্ত্র!

বললুম, তা হলে অবশেষে আপনি এতদিনে অলৌকিকে বিশ্বাসী হলেন?

—হলুম মানে? আমি কি অলৌকিকে অবিশ্বাসী ছিলুম কখনও?

ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলুম আমার দীর্ঘ দিনের চেনা যুক্তিবাদী বিজ্ঞানী ও সর্বশাস্ত্রবিদ প্রাজ্ঞ বন্ধুটির দিকে। বলেন কী! অবশেষে এই বাণেশ্বরে এসে এক রাত্রেই ভীষণ ভাবে বদলে গেলেন ভদ্রলোক?

আমার মনের কথাগুলো যেন টের পেয়েই ধুরন্ধর গোয়েন্দাপ্রবর একটু হাসলেন। বললেন, বৎস জয়ন্ত, ধর্মসূত্রে আমি বরাবর একজন খ্রিস্টিয়ান, তা তো জানোই।

—কী মুশকিল! ভগবানে বিশ্বাস এক কথা, আর ভূতে বিশ্বাস অন্য কথা যে!

—জয়ন্ত, জয়ন্ত! খামোখা তর্ক করো না। আমি ভূত কথাটা বলিইনি। বলেছি, অদৃশ্য শক্তিব কথা। সবসময় পায়ে-পায়ে এই অদৃশ্য শক্তির খেলা তুমি কি লক্ষ করো না? ভুলে যেও না—আমাদের সামনে প্রতি মুহূর্তে রয়েছে এক অজানা ভবিষ্যৎ। যা ইচ্ছে করি, তা যে ঘটবেই তাব গ্যারান্টি আছে কি? সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটতে পারে—ওই বুঝি ডঃ পট্টনায়ক ফোন করছেন।

প্রতি স্যুটে ফোনেব ব্যবস্থা আছে গ্রিন ভিউ হোটেলে। ফোন বেজে উঠেছিল। কর্নেল হাত বাড়িয়ে ফোনটা ধরলেন—হ্যালো, কর্নেল সরকার বলছি!...হ্যাঁ!...মাই গুডনেস!...কী? রক্তে প্যাথোজেন? আর ইউ শিওর, ডক্টর?...ও। মাই!...হুঁ..আই এগ্রি...হুঁ..ঠিক আছে। চলে আসুন, অপেক্ষা করছি!...কে? মিঃ খান্না?...দ্যাটস রাইট। চলে আসুন।

কর্নেল ফোন রাখলেন। জয়ন্তী উদ্বিগ্নমুখে বলল, মর্গ থেকে ফোন করছিল নাকি?

কর্নেলকে অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল। বললেন, হ্যাঁ। শ্যামলীর মৃত্যুর কারণ তেমন কিছু বোঝা যায়নি। হঠাৎ হার্ট ফেল করেছে, এটুকুই বলা যাচ্ছে। আর রক্তে প্যাথোজেন নামে একরকম সাংঘাতিক জীবাণু পাওয়া গেছে। এসব জীবাণু জন্মায় ফুলগাছের গোড়ায় স্যাঁতসেঁতে মাটিতে। অনেক সময় ফুলদানিতে অনেকদিন ফুল রাখলে তার জলে এরা কলোনি গড়ে তোলে। রক্তের সংস্পর্শে গেলেই চোখের পলকে ঠিক পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণের মতো কোটি-কোটি কলোনি গড়ে তোলে। সম্প্রতি একটা মার্কিন মেডিক্যাল পত্রিকায় পড়ছিলুম, মিয়ামি হাসপাতালের সার্জিক্যাল ওয়ার্ডে পরপর অনেকগুলো অপারেশনের রুগি মারা পড়ে। ডাক্তাররা হতভম্ব। তদন্ত বোর্ড বসল। শেষঅব্দি গোয়েন্দা বিভাগ আসরে নামল। তবু রহস্যের মীমাংসা হল না। অবশেষে দুজন ছোকরা ডাক্তার মরিয়া হয়ে লেগে গেলেন। তারপর আবিষ্কার করলেন যে ওই ওয়ার্ডে একটা ফুলদানিই হচ্ছে অপরাধী! না—না জয়ন্ত, তাই বলে তুমি এ ঘরের ফুলদানি দুটোর দিকে নিষ্ঠুরভাবে তাকিও না। ওই পাহাড়ি অর্কিডে সাজানো টারিলাস ম্যারাইটাভিরাস গোষ্ঠীর ফুল অনেক কষ্টে আমি সংগ্রহ করেছি। প্রতি সকালে তুমি ঘুমিয়ে থাকার সময় ফুলদানি দুটোর জল পালটে দিই। জীবণুনাশক লোশন ঢেলে দিই। অতএব নির্ভয়ে থাকো। আর জয়ন্তী, ডার্লিং। ঘরে গিয়ে বিশ্রাম কবো কিছুক্ষণ। সেই ছ'টা থেকে অনেক ঘুরেছ এ বুড়োর সঙ্গে। যথাসময়ে তোমাকে ডাকব।

জয়ন্তী বেরিয়ে গেল। আমি বললুম—মোহন পারেখের ব্যাপারটা নিয়ে কিছু ভাবলেন?

কর্নেল বললেন—ভেবেছি। ও ঠিক আমাদের নীচের তলার স্যুটে ছিল। বেয়ারারা বলেছে, গতকাল দুপুর নাগাদ ও বেরিয়ে যায়। কাউকে কিছু বলে যায়নি। আর ফেরেওনি।

—কিন্তু বদ্রী বলল সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় ফোন করে ওকে এখানে পেয়েছিল।

—বদ্রীটা সম্ভবত কিছু জানে, গোপন করছে। তবে ওর ভুল হতেও পারে। কারণ, পুলিশের জেরায় ও কবুল করেছে যে পারেখের কণ্ঠস্বর ওর চেনা নয়। তা যদি সত্যি হয়, তা হলে কেউ ওসময় ওর স্যুটে ফোন ধরেছিল।

—কিন্তু স্যুটে তো ডিরেক্ট লাইন নেই। হোটেলের ম্যানেজার কী বলছেন? অপারেটারেরই বা বক্তব্য কী?

—ম্যানেজার কোনও খবর রাখেন না। অপারেটর মেয়েটি বলছে যে সে যথারীতি পারেখসায়েবের স্যুটে কানেকশন দিয়েছিল। কোনও বোর্ডার ঘরে না বাইরে, তার তো জানার কথা নয়। তবে সে দুপক্ষের যা সব কথাবার্তা শুনেছে, তাতে বদ্রীর কথা ঠিকঠাক মিলে যায়।

—অর্থাৎ ওই সময় পারেখের ঘরে কেউ ছিল?

—রাইট, রাইট।

—পারেখের ঘর তো রাত্রেই সার্চ করা হচ্ছিল। কিছু বোঝা গেছে?

—কিচ্ছু না। তেমন কোনও সন্দেহজনক ব্যাপার দেখা গেল না। তবে কিছু খোওয়া গেছে কি না, বলা কঠিন। বলতে পারত পারেখ নিজে।

—কিন্তু কর্নেল, মিসেস মালহোত্রার লাইন কাটল কে? বদ্রীকে আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।

—বদ্রীকে পুলিশও বিশ্বাস করে না। তাই গ্রেফতার করেছে। দেখা যাক।

এই সময় জয়ন্তী হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকল।—কর্নেল! কর্নেল! এ কী কাণ্ড! আমাদের ঘরে কেউ ঢুকেছিল—জিনিসপত্র হাতড়ে একাকার করে রেখেছে!

—সে কী! বলে কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন। তারপর আমার দিকে ঘুরে বললে—জয়ন্ত, এক মিনিট। আমি আসছি। তুমি তিনটে ব্রেকফাস্ট বলে দাও। খিদে পেয়েছে এবার।

ফোনে ব্রেকফাস্টের অর্ডার দিয়ে রাতের পোশাক বদলাচ্ছি, তখন কর্নেল ও জয়ন্তী ফিরলেন। বললুম, কী ব্যাপার?

কর্নেল একটু হাসলেন—ক্রমশ বোঝা যাচ্ছে, মোহন পারেখ বা শ্যামলীর হত্যাকারী ভূতপ্রেত হোক বা মানুষ হোক, একটা কিছু খুঁজে পাওয়ার জন্যে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছে। কী হতে পারে সেটা? এ সার্টেন থিং—কোনও একটা জিনিস, তা অপরের কাছে যত অনাবশ্যক বা তুচ্ছ মনে হোক, তার কাছে জীবনমরণ প্রশ্নে জরুরি। হ্যাঁ—এটা খুব স্পষ্ট হয়ে উঠছে। জিনিসটা যে কী, তা শ্যামলী আর মোহন পারেখই জানত। দুর্ভাগ্যক্রমে দুজনেই আজ মৃত।

এই সময় ডঃ পট্টনায়কের সাড়া পাওয়া গেল।—আসতে পারি কর্নেল সরকার?

কর্নেল দরজা খুলে বললেন—আসুন, আসুন। আপনারই অপেক্ষা করছি। এখন শুধু ব্রেকফাস্টপর্ব বাকি। আপনি ইচ্ছে করলে আমাদের সঙ্গে...

ডঃ পট্টনায়ক বসে পড়লেন। তারপর চিন্তিত মুখে বললেন—জীবনে অনেক মড়া ঘেঁটেছি। একসময় তো ডাক্তারিই পেশা ছিল। ভুবনেশ্বর মর্গের চার্জেও ছিলুম কিছুদিন। তারপর তো বিলেতে ফোরেনসিক ডিগ্রি নিয়ে এলুম। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডেও শিক্ষানবিসি করেছি। কিন্তু কর্নেল, শ্যামলীর ডেডবডি আমাকে এক অদ্ভুত রহস্যের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। মাথামুণ্ডু কিচ্ছু বুঝতে পারছিনে। এ এক আজব হেঁয়ালি!

—দয়া করে বিশ্লেষণ করুন, ডক্টর।

—মৃত্যুর কারণ কমন। আকস্মিক হৃৎপিণ্ড বন্ধ হয়ে যাওয়া। কিন্তু কেন বন্ধ হল হৃৎপিণ্ড? ওইরকম হঠাৎ বন্ধ হলই বা কেন? তার কোনও সূত্র বডিতে নেই। রক্তে অবশ্য প্রচুর প্যাথোজেন পাচ্ছি। কিন্তু প্যাথোজেন—প্রথম কথা, রক্তের সংস্পর্শ না পেলে দেহে ঢুকতে পারে না। দ্বিতীয় কথা—ঢুকলেও মৃত্যু ঘটাতে অন্তত সাত-আট ঘণ্টা সময় নেয়। এই সময়টার পর্ব ভাগ করা যায়।

প্রথমে শুরু হয় অস্বস্তি, মাথা ঘোরা, ঘুম-ঘুম ভাব। দ্বিতীয় পর্বে আক্রান্ত স্থান ফুলতে শুরু করে। বেদনা বাড়ে। জ্বর আসে প্রচণ্ড। চোখের তারা লাল হয়ে যায়। তৃতীয় পর্বে আরম্ভ হয় প্রলাপ বকা। খিঁচুনি। মুখে ফেনা জমে ওঠা। গলায় ঘড়ঘড় শব্দ। তারপর শ্বাসকষ্ট এবং আধ ঘণ্টার মধ্যেই হার্ট ফেল করে। এখন বলুন কর্নেল, প্যাথোজেন কীভাবে শ্যামলীর মৃত্যুর কারণ বলি?

কর্নেল বললেন, তা তো বটেই।

—অথচ ব্লাডে প্যাথোজেন রয়েছে। কী ভাবে এল এই জীবাণু? দেহে কোনও ক্ষত নেই শ্যামলীর।

—ইনজেকশনের কোনও চিহ্নও পাননি।

—পাইনি। সে তো আপনাকে ফোনেই বলেছি তখন।..ডঃ পট্টনায়ক একটু হাসলেন।—এই প্যাথোজেনই সমস্যার সৃষ্টি করেছে। তা না হলে মৃত্যুটার একটা ব্যাখ্যাই দেওয়া যেত—ভূতের হাতে মৃত্যু।

কর্নেল একটু নড়ে বসলেন।—আচ্ছা ডঃ পট্টনায়ক, শ্যামলীর কোনওরকম অসুখ-বিসুখের চিহ্ন কি পেয়েছেন বডিতে?

মাথা নাড়লেন ডঃ পট্টনায়ক।—কিছু পাইনি। সে সম্পূর্ণ সুস্থ ছিল—নীরোগ ছিল। এমন কোনও অবস্থা তার দেহে দেখিনি, যাতে কোনও অসুখের আভাস মেলে। অবশ্য, ওই প্যাথোজেনঘটিত প্রতিক্রিয়াটা বাদে।

—ডঃ পট্টনায়ক, এবার আমার প্রশ্নের জবাব দিন।

—বলুন।

—আমি যদ্দুর জানি, প্যাথোজেন দেহে ঢোকার পর কলোনি ফর্ম করতে শুরু করে সেকেন্ডে হাজার কোটি হিসেবে। এরকম চলে কমপক্ষে দু-ঘণ্টা। এই পর্যায়ের কলোনির চেহারা ঠিক গুচ্ছ-গুচ্ছ। পরের পর্যায়ের দু-ঘণ্টা সেকেন্ডে পাঁচশো কোটিতে দাঁড়ায়। এই কলোনির চেহারাও গুচ্ছ-গুচ্ছ—কিন্তু একটি করে বৃত্ত থাকে। একেকটি বৃত্তে এক কোটি করে গুচ্ছ। তৃতীয় পর্যায়ে কলোনি গড়ার গতি আরও মন্থর—সেকেন্ডে আড়াইশো কোটি। গুচ্ছ-বৃত্তগুলো এবার ঠিক বৃত্ত বলা যায় না—বলা যায় ডিম্বাকৃতি। চতুর্থ পর্যায়ে আবার গোড়ার মতো সরলরেখায় চলে। কিন্তু গুচ্ছগুলো অনেক বড়। গোড়ায় একটা গুচ্ছের মাপ থাকে এক বাই লক্ষ সেন্টিমিটার। শেষ ধাপে গুচ্ছের মাপ হয় এক লক্ষ সাতান্ন হাজার সেন্টিমিটারের কিছু বেশি।

ডঃ পট্টনায়ক হাঁ করে শুনছিলেন। এবার বললেন, ওয়ান্ডারফুল।

—হ্যাঁ। এ আমার সামান্য পড়াশোনার ফলাফল মাত্র। এখন তা হলে শুনুন ডঃ পট্টনায়ক। কারও দেহে প্যাথোজেন সংক্রামিত হলে এটা বের করা সম্ভব যে, ঠিক কোন জায়গা দিয়ে ওই মারাত্মক জীবাণু ঢুকেছে। প্রথম পর্যায়ের কলোনির চেহারা ও মাপ নিয়ে এবং দেহের যেখানে ওগুলো পাওয়া গেছে, সেখানে খুঁজলেই অবশ্য আমরা প্রথম আক্রমণের জায়গাটি দেখতে পাব।

কর্নেল থামতেই ডঃ পট্টনায়ক লাফিয়ে উঠলেন—তাই তো! তাই তো! এদিকটা তো ভাবিইনি।...বলে তিনি ফোন তুলে নিয়ে ব্যস্তভাবে বললেন, বাগেশ্বর-ইস্ট হ্যারিংটন হসপিটাল প্লিজ।

তারপর ফোনে কান রেখে আমাদের দিকে ঘুরে বললেন, এতক্ষণ ডেডবডিটার কী অবস্থা কে জানে?

জয়ন্তী বলে উঠল, কী অবস্থা মানে? ডেডবডি আমরা নেব যে।

আমি বললুম, টেলি-যোগাযোগ চালু করতে এক সপ্তাহ লেগে যাবে। শ্যামলীর আত্মীয়স্বজনের ভাগ্যে বডি পাওয়ার সম্ভাবনা নেই।

এই সময় ব্রেকফাস্ট এসে গেল।

ডঃ পট্টনায়ক লাইন পেলেন।—হ্যালো। হ্যারিংটন? ডঃ প্রসাদকে দিন।...ডঃ প্রসাদ, পট্টনায়ক বলছি। জরুরি ব্যাপার। ডেডবডিটা অ্যাজ ইট ইজ আছে তো?...আছে? প্লিজ—তাই রাখুন।...না, না। আমি এখনই যাচ্ছি। একটা ভুল...হ্যাঁ, যাচ্ছি।

ডঃ পট্টনায়ক উঠে দাঁড়ালেন।—কর্নেল, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ব্যাপারটা আমি ভাবিইনি আদতে। ঠিক আছে—চললুম।

কর্নেল বললেন, আমাকে মিসেস মালহোত্রার ওখানে পেয়ে যাবেন। এখনই বেরোব আমরা।

ডঃ পট্টনায়ক বেরিয়ে গেলেন ব্যস্তভাবে।...

সেই বিভীষিকার স্মৃতিজড়ানো ঘরটাতে কর্নেলের সঙ্গে ঢুকে আবার আমার অস্বস্তি জেগে উঠেছিল। ঘরের যেখানে যা ছিল, একটুও নড়চড় করা হয়নি। গত রাতের গোলটেবিল আর তাকে ঘিরে আটটা চেয়ার একই অবস্থায় আছে। পারেখ সাহেবের জন্যে বদ্রী যে চেয়ারটা রেখেছিল এবং শ্রীমতী মালহোত্রা যেখানে সরিয়ে রেখেছিলেন, সেটা সেখানেই আছে। রাতে পুলিশ এসে পড়ার পর থেকে বাড়িটা প্রকৃতপক্ষে কড়া পাহারায় রাখা হয়েছে।

আমার বিভ্রম ঘটছিল। মনে হচ্ছিল, ওই শূন্য চেয়ারটায় এখনও শ্যামলীকে যেন দেখতে পাচ্ছি—সেই বীভৎস কালচে মুখ একদিকে কাত হয়ে আছে। পুলিশ অফিসার শ্রীখান্না আর কর্নেল ঘরের জানলাগুলো খুলে দিলেন। ঘরের মধ্যে সকালের উজ্জ্বল আলো এসে ঢোকার সঙ্গে-সঙ্গে আমার অস্বস্তি খানিকটা দূর হল।

খান্না ঘরটার ভেতর চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, কর্নেল, আমার মনে হচ্ছে আততায়ী এই ঘরে আগে থেকেই লুকিয়ে ছিল। এতে কোনও ভুল নেই। এত সব বইয়ের শেলফ আর আলমারি চারদিকে। পিছনে ফাঁক যেটুকু আছে, একজন লোক কাত হয়ে দিব্যি দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। কেউ তাকে দেখতে পাবে না।

এই বলে তিনি শ্যামলীর চেয়ারের এক মিটার দূরে বড় আলমারির পিছনে দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়ালেন। কর্নেল বললেন, অবশ্য সবই অনুমান। এবং অনুমান কখনও সিদ্ধান্ত নয় মিঃ খান্না।

—তা যদি বলেন, আমি বলব, অনুমানটা যুক্তিসিদ্ধ।...খান্না সরে গিয়ে পাশের জানলার কাছে গেলেন।—জানলাগুলো সবই বন্ধ ছিল। কাজেই বাইরে থেকে কেউ যে কিছু ছুড়ে মারবে শ্যামলীর দিকে, তাও অসম্ভব।

কর্নেল একটু হেসে বললেন, ছুড়বেটা কী শুনি?

—ধরুন, কোনও বিষাক্ত সূচলো অস্ত্র। এমন সূক্ষ্ম অস্ত্র কি থাকতে পারে না কর্নেল?

—খুব পারে। বিদেশে পেশাদার এক হত্যাকারী একরকম যন্ত্র বানিয়েছিল। রিভলভারের মতো দেখতে। গুলির বদলে নল দিয়ে দু-ইঞ্চি সূক্ষ্ম ইঞ্জেকশানের সূচের মতো বিষাক্ত তীর ছুড়ে মারত। ভিকটিম সঙ্গে-সঙ্গে ঢলে পড়ত। এই বিষ কিন্তু আমাদের সভ্যজগতের জানাশোনা বস্তু নয়। ব্রাজিলের আমাজন নদের অববাহিকায় যে হাজার-হাজার বর্গমাইল জঙ্গল রয়েছে, সেখানকার জিভারো নামে এক আদিম জাত 'নাটেমা' নামে একরকম সুতীব্র বিষ তৈরি করে। তা সামান্য পরিমাণে তীরে মাখিয়ে তারা শিকার করতে অভ্যস্ত। সেই হত্যাকারী কীভাবে নাটেমা জোগাড় করেছিল কে জানে, তার অদ্ভুত ব্লো-গানের সাহায্যে দিব্যি হত্যার পর হত্যা চালিয়ে যাচ্ছিল। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের তো আক্কেল গুড়ুম...!

খান্না সোৎসাহে বাধা দিয়ে বলে উঠলেন, কর্নেল, কর্নেল! এক্ষেত্রেও যেন তাই হয়েছে অবিকল। কারণ, ডেডবডিতে আমাদের ডাক্তাররা আক্রান্ত হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে মারা পড়ার মতো কোনও জিনিস খুঁজে পাননি। এ সেই নাটেমার কাজ নয় তো?

কর্নেল হো-হো করে হেসে উঠেই গম্ভীর হয়ে গেলেন হঠাৎ! আপনমনে অস্পষ্ট স্বরে দুর্বোধ্য কী আওড়ালেন। তার মধ্যে দুটো শব্দ বোঝা গেল—'নাটেমা', 'প্যাথোজেন'।

খান্না তাঁকে অবাক হয়ে লক্ষ করার পর বললেন, এনিথিং সিরিয়াস, কর্নেল?

কর্নেল আবার স্বাভাবিক হয়ে গেলেন।—না, তেমন কিছু নয়। মিঃ খান্না, এবার আমাদের ডাইনিং হলে যেতে হবে।

—সে কী! আপনার এর মধ্যেই ডিটেল পরীক্ষা হয়ে গেল নাকি? বলেছিলেন, দিনের আলোয় ঘরটা খুঁটিয়ে দেখবেন!

—নাঃ, দেখার কিছু নেই।.. বলে কর্নেল ফের একটু হাসলেন।

—মিসেস মালহোত্রার বইয়ের সংগ্রহ দেখাটাই উদ্দেশ্য ছিল আসলে। কী কাণ্ড! শুধু প্রেততত্ত্ব, প্যারাসাইকলজি আর দর্শনের বইতে ভর্তি। সত্যি, ভদ্রমহিলার পাণ্ডিত্যের কোনও তুলনা হয় না! কী জয়ন্ত, তুমি মুখ বুজে রয়েছ যে? বলো—কিছু বলো।

বললুম, কী বলব? আমি যদি কর্নেল সরকার হতুম, তা হলে অন্তত এ ঘরে একটা ব্যাপার চোখ এড়িয়ে যেত না যে .।

কর্নেল আমাকে থামতে দেখে কৌতূহলী হয়ে বললেন, বলে যাও।

—দেওয়ালঘড়ির কাঁটা দুটো চলছে না। আটটা পাঁচ মিনিটে আটকে আছে।

খান্না দ্রুত নিজের ঘড়ি দেখলেন। তাঁর মুখে বিস্ময় ফুটে উঠল। কর্নেল মুখ তুলে ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে আছেন তো আছেনই। আমি এই রহস্যের আবিষ্কর্তা হিসেবে খুবই গর্বিত বোধ করছিলুম। মনে-মনে বলছিলুম, কী গোয়েন্দাপ্রবর? তা হলে অনেক ব্যাপার তোমারও চোখ এড়িয়ে যায় বটে তো?

খান্না রুদ্ধশ্বাসে বলে উঠলেন, ঘড়িটা বন্ধ দেখছি? রাত্রে তো লক্ষ করিনি আমরা।

এবার কর্নেল মুখ নামালেন। মুখটা দারুণ গম্ভীর। বললেন, হুম। ঠিক ওই সময়ই শ্যামলীকে মৃত অবস্থায় আমরা দেখতে পাই—অর্থাৎ তখনই মিসেস মালহোত্রা বড় আলো জ্বেলে দেন। আমি অভ্যেসমতো তখন নিজের ঘড়ির দিকে চোখ বুলিয়ে নিয়েছিলুম। তারপরই দেখছি, ওই দেওয়ালঘড়িটা বন্ধ হয়ে গেছে। ভারী আশ্চর্য তো!

খান্না ব্যস্তভাবে বললেন, মিসেস মালহোত্রা কিছু বলতে পারেন নাকি দেখা যাক। এক মিনিট—আসছি।

উনি ডাইনিং হলের দিকে দরজা খুলে বেরিয়ে গেলেন। রাত্রেই এ ঘরের চাবি উনি শ্রীমতী মালহোত্রার কাছে নিয়ে রেখেছেন।

কর্নেল ঘড়িটার দিকে আরেকবার তাকিয়ে সপ্রশংস স্বরে বললেন, তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, জয়ন্ত।

বললুম, তা হলে দেখুন, আপনার সঙ্গগুণে আমিও সহস্রাক্ষ হতে পেরেছি।

কর্নেল মিটিমিটি চোখে হেসে বললেন, তবে কী জয়ন্ত, জানো? চোখ দুটোই থাক, আর হাজারটাই থাক—খুব কাছে দেখলে সব জিনিসই ঝাপসা লাগে!

প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলুম, শ্রীমতী মালহোত্রা এসে পড়লেন।—কী ব্যাপার? ঘড়ি বন্ধ? সে কী? ঘড়ি তো কেউ বন্ধ করিনি আমরা! হঠাৎ বন্ধ হওয়ার কোনও কারণও তো নেই। ইলেকট্রনিক সিস্টেমে তৈরি একেবারে মডার্ন জিনিস! আমার পরলোকগত স্বামীর পার্টনার বিদেশ থেকে এনে উপহার দিয়েছিলেন। এত ভালো সার্ভিস কোনও ঘড়ি দেয় না!

কর্নেল বললেন, তা হলে ওটা ইলেকট্রিক কারেন্টে চলে মিসেস মালহোত্রা?

—হ্যাঁ...বলে শ্রীমতী মালহোত্রা ঘড়িটার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন। বিড়বিড় করে বললেন ফের—আশ্চর্য, পরম আশ্চর্য ঘটনা! ঠিক এ সময় অশরীরী আত্মাটা শ্যামলীকে মেরে

রেখে চলে যায় গত রাতে। আটটা পাঁচ...ঘড়ি দেখে নিয়েছিলুম তক্ষুনি...।

—কোন ঘড়ি?

—রিস্টওয়াচ।

কর্নেল তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ওঁর দিকে তাকিয়েছিলেন। বললেন, মিসেস মালহোত্রা, অনুগ্রহ করে আর একটা কথার জবাব দিন। আপনার চেয়ার থেকে ওই ঘড়িটা সোজা তাকালেই চোখে পড়ে। গত রাতে প্রথম আলো বা দ্বিতীয় আলোটা জ্বালার পর তো স্বভাবতই আপনার ওদিকে চোখ পড়া উচিত ছিল!

শ্রীমতী মালহোত্রা গম্ভীর মুখে বললেন, ছিল, অবশ্যই ছিল। কিন্তু কেন যে ওদিকে তাকাইনি, সেটা এখন বলা কঠিন। তবে একটা সহজ ও সঙ্গত কৈফিয়ত আমি দিতে পারি। প্রেতশক্তিতে যারই বিশ্বাস আছে, সেই পারে কর্নেল! সে আমাদের বিভ্রান্ত করে ফেলেছিল!

—কিন্তু আপনি তখন আলো জ্বেলেছিলেন কেন, তা আশা করি স্মরণ আছে মিসেস মালহোত্রা। আপনি শ্যামলীকে অবিশ্বাস করেই রেগে গিয়েছিলেন। অর্থাৎ প্রেতশক্তি সত্যি-সত্যি আসেনি এই বিশ্বাসেই আলো জ্বেলেছিলেন!

শ্রীমতী মালহোত্রা এবার চঞ্চল হয়ে উঠলেন, কিন্তু প্রেতশক্তি সত্যিই এসেছিল, অস্বীকার করতে পারেন? আপনিও তো ছিলেন কর্নেল। বলুন, আপনিও কি অভিভূত বা হতভম্ব হয়ে পড়েননি তখন? আপনিও কি অন্য কোনওদিকে তাকাবার সুযোগ পেয়েছিলেন?

কর্নেল হার মেনে বললেন, রাইট, রাইট। আই এগ্রি, ম্যাডাম। আলো জ্বলে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে একমাত্র শ্যামলীই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল বটে।

এইসময় মিঃ খান্না বলে উঠলেন, মাই গুডনেস! কর্নেল! মিসেস মালহোত্রা! ঘড়ির পিছনে ইলেকট্রিক তারটা কাটা রয়েছে যে!

এবার খান্নার দিকে চোখ গেল সবার। এতক্ষণ তিনি ঘড়ির কাছে দাঁড়িয়ে মুখ তুলে কী সব দেখছিলেন। আমরা গিয়ে দেখলুম, ঠিক তাই বটে।

কিন্তু শ্রীমতী মালহোত্রা সন্দেহাকুল হয়ে বললেন, তারটা জ্বলে যায়নি তো মিঃ খান্না?

—না ম্যাডাম। সুন্দরভাবে ধারালো কিছু দিয়ে কাটা হয়েছে!

শ্রীমতী মালহোত্রা যেন শিউরে উঠলেন।—ফোনের লাইনও অমনিভাবে কে কেটে রেখেছে! কেন—কেন কর্নেল? কী উদ্দেশ্যে ছিল সেই অশরীরী আত্মার?

অসহায় দেখাচ্ছিল ভদ্রমহিলাকে। কর্নেল বললেন, আপনার প্রেততত্ত্বে কী বলে জানি না। প্রেতশক্তি কি এমন কিছু করে? পড়েছেন এমন কোনও ঘটনার কথা?

শ্রীমতী মালহোত্রা উদ্বিগ্নমুখে জবাব দিলেন, কিচ্ছু অসম্ভব নয় ওদের পক্ষে। অনেক অদ্ভুত ঘটনার কথা নিশ্চয় পড়েছি।

খান্না সকৌতুকে বললেন, প্রেতশক্তি ছুরি ব্যবহার করেছে নাকি?

শ্রীমতী মালহোত্রা ক্ষুব্ধস্বরে বললেন, পার্থিব অস্ত্র ব্যবহার করার দরকারই হয় না ওদের। ইচ্ছে করলেই সব ঘটে যায়। বড় গাছ বিনা ঝড়ে আচমকা ভেঙে পড়ার কথা কি শোনেননি আপনারা? শোনেননি, সেবারে হঠাৎ ভূতের পাহাড়ের ওপর থেকে তিনশো টন একটা পাথর পড়ে গিয়েছিল দিনদুপুরে? বস্তুবাদী বিজ্ঞান বলবে এই-এই কারণে এটা ঘটেছে। কিন্তু কারণেরও কারণ থাকে।

কর্নেল অন্যমনস্ক হয়ে ছিলেন যেন। হঠাৎ বললেন, আচ্ছা মিসেস মালহোত্রা, আপনার ওই ঘড়িটার তো দেখছি পেন্ডুলাম নেই। কিন্তু টিকটিক শব্দ করতে তো বারণ নেই। রাত্রে আমরা তেমন কোনও শব্দ শুনিনি কিন্তু।

—না। ইলেকট্রনিক সিস্টেম থাকায় ওটা নিঃশব্দে চলে।

—ঘণ্টাও কি বাজে না?

শ্রীমতী মালহোত্রা চমকে উঠে বললেন, বাজে তো।

—কিন্তু গত রাত্রে আমরা ঘড়িটা বাজতে শুনিনি।

শ্রীমতী মালহোত্রার মুখ ছাইয়ের মতো সাদা হয়ে গেল।—তাই তো! হ্যাঁ—ঘড়িটা তো বাজেনি। আশ্চর্য, বড় আশ্চর্য! আমার তো একটু খেয়াল ছিল না!

এতক্ষণ ধরে এই ভ্যাজর-ভ্যাজর শুনে আমার কান গরম হয়ে উঠেছিল। তাই বললুম, আপনারা কথা বলুন, কর্নেল। আমি একটু বাইরে ঘোরাঘুরি করি ততক্ষণ।

কর্নেল বললেন, হ্যাঁ-হ্যাঁ। দেখ জয়ন্ত, বেচারা জয়ন্তী এতক্ষণ ওঘরে হাঁপিয়ে উঠেছে। তুমি ওকে সঙ্গ দাও। আমরা আসছি। মিঃ খান্না, ওকে দরজা খুলে দিন।

—ইন্টারলকিং সিস্টেমের এই এক জ্বালা!—বলে মিঃ খান্না দরজা খুলে দিলেন।

আমি ডাইনিং হলে গিয়ে জয়ন্তীকে খুঁজলুম। বা রে! গেল কোথায় সে? এতক্ষণ একা বসিয়ে রাখার জন্যে রেগে হোটেলে ফিরে গেল নাকি? দরজার বাইরে তিন-চারজন কনস্টেবল বসে ছিল। ভেতরে একজন সাব-ইন্সপেক্টর কোনার সোফায় বসে পুরোনো কাগজ পড়ছিলেন। এর আগেই আলাপ হয়েছে ভদ্রলোকের সঙ্গে। নাম ব্রিজেশ সিং। আমাকে দেখে বললেন—ওঁদের বেরোতে দেরি হবে নাকি চৌধুরী সাহাব?

—হতে পারে। ইয়ে মিঃ সিং, আমাদের সঙ্গের ভদ্রমহিলা কোথায় গেলেন বলুন তো?

ব্রিজেশ সিং হাসলেন।—স্ত্রীলোকেরা স্যার বড্ড সাম্প্রদায়িক। সুতরাং মিস রায়কে কিচেনের দিকে যেতে দেখেছি এবং সরযূর সঙ্গে কথা বলতে শুনেছি।

আমি একটু ইতস্তত করে ডাইনিংয়ের শেষ দিকে কিচেনের কাছে এগিয়ে গেলুম। ওখানে যেতেই জয়ন্তীর কণ্ঠস্বর কানে এল। ডাকব কি না ভাবছি, লছমন নামে বুড়ো চাকরটা পরদা তুলে বেরিয়ে এল। আমাকে দেখে সেলাম দিয়ে বলল, দিদিজিকে খুঁজছেন স্যার? সরযূর সঙ্গে গপসপ করছেন। ডেকে দিচ্ছি।

সে চলে গেল। তারপর জয়ন্তী বেরিয়ে এল। বললুম, রাগ করেননি তো? আপনি আমাদের সঙ্গে ওঘরে যেতে চাইলেন না—তো কী করব?

জয়ন্তী বলল, ওঘরে প্রাণ গেলেও যেতে পারব না। সব মনে পড়ে যাবে যে।

—না, আর যেতে বলতে আসিনি। চলুন, বাইরে লনে যাই।

—চলুন!

লনে কনস্টেবল আর কিছু পুলিশ অফিসার রয়েছেন। আমরা বাড়ির পিছন দিকে চলে গেলুম। সুন্দর ফুলবাগিচা আর গাছপালা আছে সেদিকটায়। একটা ফুলেভরা মেখুগাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরালুম। সেই সময় জয়ন্তী চাপা গলায় বলল, জয়ন্তবাবু, সরযূর কাছে একটা অদ্ভুত কথা আদায় করতে পেরেছি!

—কী বলুন তো?

জয়ন্তী কণ্ঠস্বর আরও চাপা করে বলল, টেলিফোন লাইনটা মিসেস মালহোত্রাকে ও নিজে হাতে কাটতে দেখেছে। আমাদের লনে বসিয়ে রেখে একবার বাড়ি ঢুকলেন, মনে পড়ছে—ছ'টা বা ওইসময় নাগাদ? তখনই নাকি সরযূ দেখে ব্যাপারটা। সে বলল, মাইজি স্রেফ পাগলি। স্বামীর মৃত্যুর পর থেকে অদ্ভুত-অদ্ভুত সব কাণ্ড করে আসছেন—মাথামুণ্ডু খুঁজে পায় না সরযূরা। তা, সরযূ কথাটা বদ্রীকে না বলে পারেনি। তখন বদ্রী ওকে আরেকটা অদ্ভুত ঘটনা শোনায়। মাইজি নাকি স্টাডিতে ঢুকে—।

—ইলেকট্রনিক ঘড়ির তার কেটেছেন, এই তো?

জয়ন্তী সবিস্ময়ে বলে উঠল, জানেন আপনি? কীভাবে জানলেন? আশ্চর্য তো!

চার ঃ শ্রীমতী মালহোত্রার কাণ্ড

জয়ন্তীর কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে-থাকতে এবার শ্রীমতী মালহোত্রার বাড়িটা দিনের আলোয় খুঁটিয়ে দেখছিলুম। আমরা আছি একেবারে দক্ষিণের শেষপ্রান্তে। ফুট পাঁচেক উঁচু পাঁচিলের নীচে ঝোপজঙ্গল এবং তারপর খাড়া নেমে গেছে পাথরের দেওয়াল। বোঝা গেল একটা ছোটখাটো পাহাড়ের মাথা সমতল করে বাড়ি ও সংলগ্ন প্রাঙ্গণটা গড়ে উঠেছিল কবে। পাহাড়টা উত্তরের বড় রাস্তার গা ঘেঁষে উঠেছিল। ওই দিকটা ছাড়া বাকি তিন দিকেই ঢালু বা খাড়া পাথরের দেওয়াল, কোথাও বা ফাটলে ঝোপঝাড় গাছপালা গজিয়ে রয়েছে। মনে হল, এ বেশ চমৎকার একটা দুর্গ!

জয়ন্তী যে বুদ্ধিমতী মেয়ে, তাতে কোনও ভুল নেই। সে সরযূর কাছে বাড়িটার ইতিহাস জেনে নিয়েছে। এ এক অপয়া বাড়ি নাকি। মালহোত্রা সায়েবের প্রবল আপত্তি ছিল কিনতে। এ নিয়ে স্বামী-স্ত্রীতে খুব ঝগড়াঝাঁটি হত। শেষ অবধি তিনি যখন গাড়ি দুর্ঘটনায় মারা গেলেন, তখন মাইজির কিনে ফেলতে অসুবিধে হল না। এদিকে কলেজেও রিটায়ার করার বয়েস হল। তখন সোজা এখানে এসে উঠলেন।

জয়ন্তী এইসব গল্প করার পর বলল, তা হলে দেখুন, আমার বদ্ধমূল ধারণা যে ওই ভদ্রমহিলাই শ্যামলীর মৃত্যুর কারণ। কর্নেলকে এটা কিছুতেই বোঝাতে পারলুম না।

বললুম, কর্নেল বড্ড একগুঁয়ে মানুষ। কিন্তু ঘড়ি আর ফোনের তার কাটার পর মিসেস মালহোত্রাকে আর সন্দেহ না করে উপায় নেই। তবে কী জানেন? একটা সঙ্গত মোটিভ (উদ্দেশ্য) সব ডেলিবারেট বা পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ডের পিছনে থাকে। শ্যামলীকে হত্যার উদ্দেশ্যটা কী, সেটাই এখন জানা যাচ্ছে না।

জয়ন্তী দৃঢ়কণ্ঠে বলল, আপনি যদি প্রেতশক্তিতে বিশ্বাস করেন, তা হলে হত্যার মোটিভ খোঁজার প্রশ্নই উঠবে না। জীবনে যারা অতৃপ্ত থেকে যায়, মৃত্যুর পর তারা জীবিত মানুষদের ওপর সুযোগ পেলেই প্রতিহিংসা চরিতার্থ করে। এক্ষেত্রে সুযোগটা করে দিলেন ওই ভদ্রমহিলা। কাজেই শ্যামলীর মৃত্যুর জন্যে উনিই দায়ী।

—কিন্তু ঘড়ি আর ফোনের তার কাটার উদ্দেশ্য কী?

জয়ন্তী তার ধারণার সপক্ষে যুক্তি দাঁড় করাতে খুব ব্যগ্র হল। বলল, আমি ব্যাপারটা যেভাবে বুঝেছি, আপনাকে বলি, শুনুন। মিসেস মালহোত্রার সঙ্গে প্রেতশক্তিদের যোগাযোগ আছে। উনি বলছিলেন যে, স্বামীর মৃত্যুর পর উনি থিওজফি বা প্রেততত্ত্বের চর্চা শুরু করেন, তা মিথ্যে। সরযূ সব বলেছে। ভূতপ্রেত নিয়ে ওঁর উৎসাহ তার অনেক আগে থেকে। এখনও অনেকে সন্দেহ করে ওঁর স্বামীর জিপ পাহাড়ি খাদে উলটে যাওয়ার পিছনে ওঁর কারসাজি ছিল। কোনও দুষ্ট আত্মাকে দিয়ে কাজটা করিয়েছিলেন ভদ্রমহিলা। যাই হোক, এটা এইসব পাহাড়ি এলাকার লোকেদের চিরাচরিত কুসংস্কার বলা যেত। কিন্তু গতরাত্রে যা ঘটতে দেখেছি, তাতে আমি কনভিন্সড। তর্ক করবেন না। এবার শুনুন—কীভাবে কী ঘটেছে।

হাসি লুকিয়ে বললুম—বলুন না, শুনে যাচ্ছি।

—সরযূ বলেছে, বোম্বের গায়ক ভদ্রলোক মোহন পারেখকে মাইজি পেটের ছেলের মতো ভালোবাসতেন। সরযূর ভয় হত, দুষ্ট আত্মারা তো তাদের স্বভাব অনুযায়ী বেছে-বেছে মাইজির প্রিয়জনদেরই মারবার তালে থাকবে। এ বেচারার আবার কিছু বিপদ না হয়! সরযূ ভেবেছিল, পারেখজিকে সতর্ক করে দেবে গোপনে। কিন্তু সুযোগ পায়নি। ব্যস, পারেখজিকে ভূতের পাহাড়ে ধাক্কা মেরে ফেলে দিল! এখন আমার ধারণা, হোটেলে থাকার সময় এই পারেখ ভদ্রলোক নিশ্চয় শ্যামলীর প্রতি মনে-মনে লোভী হয়ে পড়েছিলেন!

—কিন্তু তার প্রমাণ কী?

জয়ন্তী এদিক-ওদিক তাকিয়ে নিয়ে ফিসফিস করে বলল—আর লুকিয়ে লাভ নেই, আপনাকেই বলছি। শ্যামলীর সঙ্গে পারেখের আলাপ হয়ে গিয়েছিল। আমার নিষেধ কানে নেয়নি শ্যামলী। ওঁর ঘরে গিয়ে আড্ডা দিয়ে আসত।

—বলেন কী।

—হ্যাঁ। শ্যামলীর ওই একটা দুর্বলতা ছিল। ফিল্ম ওয়ার্ল্ডের বিখ্যাত লোকদের প্রতি ওর প্রচণ্ড মোহ ছিল।

—হুঁ, তারপর?

—তারপর যা হয়েছে, খুব সোজা। পারেখ খাদে পড়ে মারা গেলেন, কিন্তু মনের অতৃপ্ত বাসনা তো নষ্ট হওয়ার নয়। কাল সন্ধ্যার আগে কতক্ষণ সেই খাদের অত কাছে শ্যামলী দাঁড়িয়ে রইল। পারেখের আত্মা ওকে অমনি বাগে পেয়ে গেল। পিছু নিল। তাই স্বাভাবিক নয়?

জয়ন্তী যেভাবে গাম্ভীর্য ও গুরুত্বসহকারে কথাগুলো বলল, আমার মনে যেন একটা চাপা অস্বস্তি ঘুরে বেড়াতে শুরু করল। সত্যি কি প্রেতশক্তি বা অতৃপ্ত আত্মা বলে কিছু আছে? প্রকাশ্যে অন্যমনস্কভাবে বললুম—হুঁ, সেটা স্বাভাবিক।

জয়ন্তী দুঃখিত মুখে বলতে থাকল—জানেন? মানুষের মনে যেন কী আছে। যাকে ভালোবাসি কিংবা যার জন্যে মনে-মনে ভাবি, তার সঙ্গে যেন একটা অদৃশ্য মেন্টাল ওয়েভ বা ভাব-তরঙ্গের যোগাযোগ ঘটে। মিসেস মালহোত্রার থিওরি খুবই সত্য। প্যারাসাইকলজির ব্যাপারটা আমিও কিছুটা জেনেছি। একশো মাইল দূরে ধরুন কোনও প্রিয়জন আছেন—হঠাৎ এখানে আমার মনে অস্বস্তি জাগল তাঁর সম্পর্কে। পরে খবর এল—তিনি অসুস্থ বা মারা গেছেন—ঠিক ওই একই সময়ে। এরকম ঘটনা তো কত ঘটে আসছে!

—হ্যাঁ, শুনেছি।

—ঠিক এভাবেই মোহন পারেখের মৃত্যুর ব্যাপারটা নিশ্চয় শ্যামলী অবচেতন মনে টের পেয়ে থাকবে। তা না হলে একটা অদ্ভুত স্বপ্নের কথা কেন বলেছিল সে? আসলে স্বপ্ন কথাটা ওর বানানো। ও আমাকে ওর মনের গোপন অস্বস্তির কথাটা বলতে লজ্জা পেয়েছিল। তাই বানিয়ে যা-তা একটা বলে অবচেতন প্রক্ষোভ শান্ত করতে চেয়েছিল। এবং শেষ অবধি আর না থাকতে পেরে ভূতের পাহাড়ে গিয়ে হাজির হয়েছিল। তখন আপনারাও তো গিয়েছিলেন। কেমন অন্যমনস্ক মনে হয়নি ওকে?

—হ্যাঁ। ব্যাপারটা চোখ এড়ায়নি আমার।

—শুধু তাই নয়, ওকে কেমন অপ্রকৃতিস্থ দেখাচ্ছিল। যেন নিশির ডাকে চলে-আসা মানুষের মতো। কথা বলছিল যেন ঘুমের ঘোরে।

অতটা মনে হয়নি আমার। তবে জয়ন্তীকে সায় দিতে হল। বললুম, ঠিক, ঠিক।

জয়ন্তী সোৎসাহে বলল, আর ফেরার পথেই পড়বি তো পড়, একেবারে মিসেস মালহোত্রার পাল্লায়! কর্নেল সায়েব একটা উপলক্ষ মাত্র। তার ওপর দেখুন, প্ল্যানচেটের আসরও তখন একেবারে ঠিকঠাক পরিকল্পিত হয়ে রয়েছে। এগুলো সবই কি নিছক আকস্মিক যোগাযোগ বলে উড়িয়ে দেবেন?

—আপনি ঠিকই বলছেন জয়ন্তীদেবী। কিন্তু ফোন আর ঘড়ির তার...

বাধা দিয়ে জয়ন্তী বলল, প্রথমে ঘড়ির তার কাটার কারণ বলি। মিসেস মালহোত্রা শ্যামলীর মৃত্যুর সময় চিহ্নিত করেছিলেন। প্রেতশক্তির নির্দেশেই করেছিলেন। রাত আটটা পাঁচে...

চমকে উঠে বাধা দিলুম—আপনি তো আজ ওঘরে যাননি। কেমন করে জানলেন ঘড়ির কাঁটা আটটা পাঁচে থেমে আছে?

জয়ন্তী হাসল একটু।—গত রাতে ওঘরে ঢোকার সময় আমার চোখ পড়েছিল ঘড়িটার দিকে। তখন তো মোটে সাতটা প্রায়। তাই ঘড়িতে আটটা পাঁচ দেখে অবাক হয়েছিলুম। কিন্তু প্ল্যানচেটের

আসর বসবে—সব উত্তেজনা তাই নিয়ে। ফলে কথাটা বলতে ভুলে গিয়েছিলুম।

—আশ্চর্য, কেন যে আমি ওদিকে তাকাইনি।

—আপনার চোখ সারাক্ষণ ছিল শ্যামলীর দিকে।

হাসি পেল।—কে জানে! তা এবার ফোনের তার কাটার উদ্দেশ্য বলুন।

—মিসেস মালহোত্রা চাননি যে তক্ষুনি পুলিশ এসে হাঙ্গামা বাধাক। মতলব ছিল, ব্যাপারটা যে-কোনও ভাবে সামলাবেন ততক্ষণে।

—বা রে! পায়ে হেঁটে তো থানায় গিয়ে খবব দেওয়া যায়। একঘণ্টা দেরি হয় বড়জোর! নাঃ, আপনার এ ধারণাটার কোনও যুক্তি নেই জয়ন্তীদেবী। আমি বদ্রীকে নিয়ে পায়ে হেঁটে গিয়েছিলুমও বটে।

জয়ন্তী একটু ভেবে নিয়ে বলল, ঠিক বোঝাতে পারছি না। কিন্তু এটা স্পষ্ট যে মিসেস মালহোত্রা সময় চেয়েছিলেন—তা সে যে জন্যেই হোক। এবং পেয়েছিলেনও। প্রায় তিন ঘণ্টা পরে আপনারা পুলিশ নিয়ে এলেন!

—কিন্তু কর্নেলের মতো ধুরন্ধর লোক তো সাবাক্ষণ উপস্থিত ছিলেন। মিসেস মালহোত্রার তেমন কোনও উদ্দেশ্য থাকলে তা ব্যর্থ হয়েছে। মিঃ খান্নার চেয়ে কর্নেলের বুদ্ধিচাতুর্য বা অপরাধতত্ত্বের ব্যাপারে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অনেক বেশি জয়ন্তীদেবী।

জয়ন্তী ফের একটু ভেবে বলল, তা হলে বলব, কর্নেল সম্পর্কে মিসেস মালহোত্রার ধারণা হয়তো স্পষ্ট নয়। ওঁর সঙ্গে পরিচয় কতদিনের জানেন?

—শুনেছি। এখানে এসেই আলাপ হয়েছে ওঁদের। জয়ন্তী লাফিয়ে উঠল—আমার থিওরি কারেক্ট। ভদ্রমহিলা কর্নেলের পরিচয় জানেন না।

—বেশ। কিন্তু কিছুটা সময় কেন দরকার হয়েছিল মিসেস মালহোত্রাব, তা ভেবেছেন কি?

জয়ন্তী মাথা দুলিয়ে বলল, সেটাই বুঝতে পারছিনে। ফোনের তার কাটার আর কিছু উদ্দেশ্য মাথায় ঢুকছে না।

—তা ছাড়া, কাটা তার জোড়া দিলেই তো ফোন আবার চালু হয়ে যায়। ধরে নিচ্ছি, তাতেও কিছুটা সময় লাগছে। কিন্তু...নাঃ, আপনার এই ব্যাখ্যাটা মানা গেল না।

জয়ন্তী একটু চুপ করে থেকে বলল, অশরীরী আত্মাদের ব্যাপার বুঝতে পাবে একমাত্র তারাই, যাদের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ আছে। কে বলতে পারে, সরযূ যাকে তার কাটতে দেখেছিল তিনি সত্যি-সত্যি মিসেস মালহোত্রা নন—তাঁর চেহাবা ধরেছিল কোনও প্রেতশক্তি!

এই সময় লছমন নামে মিসেস মালহোত্রার লোকটা এল। সেলাম করে সবিনয়ে বলল, কর্নেল সাহাব আপনাদের সেলাম দিয়েছেন।

আমরা দুজনে তক্ষুনি এগিয়ে গেলুম। ডাইনিং হলে ঢুকে দেখি, রঘুবীর জয়সোয়াল, অধ্যাপক দ্বিবেদী আর ডঃ পট্টনায়ক কখন এসে পড়েছেন। শ্রীমতী মালহোত্রা ব্যস্তভাবে এদিক-ওদিক করছেন। কর্নেল আমাদের দেখে ঈষৎ হেসে চাপাস্বরে বললেন, এই যে জয়জয়ন্তী!

কর্নেলের বেমক্কা রসিকতায় জয়ন্তীর মুখটা লাল হয়ে গেল—আড়চোখে দেখলুম। বললুম, কর্নেল, আবার প্ল্যানচেটের আসর নাকি?

কর্নেল তক্ষুনি গম্ভীর হয়ে গেলেন—হুম! আপাতত চায়ের আসর। তোমরা বসে পড়ো।

একটু পরেই চা এসে গেল। চা খেতে-খেতে কর্নেল তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, লেডিজ অ্যান্ড জেন্টেলমেন! গত রাতে মিঃ খান্না যথারীতি প্রত্যেকের কাছে একটা করে বিবৃতি নিয়েছেন। কিন্তু ইতিমধ্যে আরও অনেক নতুন তথ্য আমরা জেনেছি, যেগুলো সমস্যার সৃষ্টি করেছে। অতএব আবার আপনাদের বিরক্ত করতে আমরা বাধ্য হব।

অধ্যাপক দ্বিবেদী বলে উঠলেন, অবশ্য, অবশ্য। এই অদ্ভুত হত্যাকাণ্ডের একটা ফয়সালা

করার জন্যে আমাদের প্রত্যেকেরই কষ্ট স্বীকার করা উচিত।

জয়সোয়াল মাথা নেড়ে বললেন, আই এগ্রি।

কর্নেল বললেন, আপনাদের স্মরণশক্তিকে সাহায্য করা হবে ভেবে আমরা হত্যাকাণ্ডের জায়গাতেই একে-একে ডাকব এবং কিছু প্রশ্ন করব।

অধ্যাপক খুশি হয়ে বললেন, ভেরি ওয়েল! তারপর নিশ্চয় আমরা এই নজরবন্দি দশা থেকে মুক্তি পাব!

উনি জোরে হাসলেন কথাটা বলার পর এবং তা নিশ্চয় শুকনো হাসি। ওঁকে সমর্থন করে জয়সোয়াল বললেন, যত খুশি প্রশ্ন করুন, আপত্তি নেই। এবং আমাকে সন্দেহ-ভাজন মনে না হলে আশা করি আমি যেন আগামীকাল নৈনিতাল পৌঁছে যেতে পারি! সেখানে আমার জরুরি অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে একটা।

মিঃ খান্না বললেন, কার্যত আপনারা স্যার আমাদের হাতে না হলেও প্রকৃতির হাতে এখন বন্দি। বেরোবার কোনও রাস্তা নেই।

ব্রিজেশ সিং হেসে বললেন, দ্বীপান্তরিত বলা যায়! কারণ বাণেশ্বরের সঙ্গে এখন বাইরেব সব সংযোগ আপাতত কয়েকদিনের জন্যে বিচ্ছিন্ন।

অধ্যাপক, জয়সোয়াল, জয়ন্তী আর আমি একসঙ্গে নড়ে উঠলুম। জয়ন্তী কাঁদো-কাঁদো স্বরে বলল, তা হলে শ্যামলীর খবর এখনও ক'দিন পাঠানো যাবে না? কর্নেল যে বললেন, আপনাদের বেডিও সিস্টেম আছে...।

খান্না বললেন, না। কোনও উপায নেই। দুঃখের বিযয, আমাদের যে বেতার ব্যবস্থা আছে, গত বাত থেকে তাও হঠাৎ বিগড়ে বসেছে। অনেক চেষ্টা করা হল মেরামতের। কিন্তু সব এখন অবধি ব্যর্থ। বাণেশ্বর সামরিক ছাউনি থেকে যে-কোনও সাহায্য পাব, তারও উপায় নেই। পথ ধসে অতল খাদ সৃষ্টি হয়েছে ওদিকে। এক উপায হচ্ছে হেলিকপ্টার। কিন্তু তাও আছে সামরিক ছাউনিতে।

জয়সোয়াল বললেন, কেন? সারদা নদী পেরিয়ে নেপালে ঢুকতে পারলে তো ঘুরপথে পৌঁছনো যায—কোঠাইকুণ্ড হয়ে ঝরকাহাট।

খান্না হাসলেন।—দেখে আসতে পাবেন সাবদা নদীর অবস্থা। প্রচণ্ড বন্যা বইছে। তা ছাড়া বাণেশ্বরেব পূর্ব সীমায় পাহাড় যা ধসেছে, নদী অবধি পৌঁছনোও অসম্ভব। তাও ধরে নিচ্ছি, কোনওরকমে নদী পেরোলেন—কিন্তু নেপালের ওই বর্ডারটা খাড়া পাহাড়। আস্ত পাথরের দেওয়াল উঠেছে তিন-চারশো ফুট উঁচু। কীভাবে ঢুকবেন নেপালে?

শ্রীমতী মালহোত্রাকে এতক্ষণ মুখ টিপে হাসতে দেখছিলুম। এবার হাত তুলে বললেন, এক মিনিট। মিঃ খান্না আর কর্নেল সরকারকে প্রশ্ন করছি, এতসব ঘটনা একইসঙ্গে ঘটার মধ্যে কি আপনারা এখনও নিছক আকস্মিকতা আছে বলতে চান?

কর্নেল তাকিয়ে থাকলেন মাত্র। খান্না বললেন, পুলিশশাস্ত্র সম্পূর্ণ নাস্তিকের শাস্ত্র মিসেস মালহোত্রা। এ শাস্ত্র অনুসাবে কার্যের পিছনে কারণ থাকবেই।

—তা হলে বলুন, একই সময়ে বেতারযন্ত্র বিগড়ে গেল কেন? যদি বা বিগড়ে গেল, সারানো সম্ভব হল না কেন?

—দেখুন ম্যাডাম, প্রকৃত ব্যাপারটা বর্ণনা করতে হলে আমাকে এখন সরকারের সমালোচনা করতে হয়। যে কোম্পানি ওই যন্ত্র সরবরাহ করেছিল, বাজারে তার প্রচুর বদনাম আছে। কিন্তু বেছে-বেছে তাকেই নেওয়া হল, এর কারণ দুর্নীতি ছাড়া কী? বেতারযন্ত্রটা বছরে সাত মাসই বিগড়ে বসে থাকে যখন-তখন। কাল রাতে হঠাৎ আবার বিগড়ানোর কারণ সম্ভবত ঘনঘন বজ্রপাত।

শ্রীমতী মালহোত্রা মাথা দুলিয়ে বললেন, তবু আপনারা ভাঙবেন তো মচকাবেন না! চোখে

আঙুল দিয়ে দেখালেই বা কী। অলৌকিক শক্তি যে এখনও মানুষের সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করছে, মানুষ অত জেনেও তা মানতে চায় না!

কর্নেল ঘড়ি দেখে বললেন, আমাদের দেরি করা উচিত নয়। মিঃ খান্না, তা হলে চলুন আমরা মিসেস মালহোত্রার স্টাডিতে যাই। মিঃ খান্না, আপনার স্টেনো ভদ্রলোক কি এসে গেছেন?

ব্রিজেশ সিং উঠে গিয়ে দরজার বাইরে কাকে ডাকলেন—জয়গোপাল! রাজেন্দ্রজিকে পাঠিয়ে দাও।

একটু পরে স্টেনোগ্রাফার ভদ্রলোক এলেন। চব্বিশ-পঁচিশ বছর বয়েসের সুন্দর এক যুবক। মুখে মিষ্টি হাসি। আমার খুব ভালো লাগল ভদ্রলোককে। হয়তো বাঘা-বাঘা বুড়োদের মধ্যে এতক্ষণে একজন তাজা যুবক দেখতে পেলুম, তাই।

স্টাডিতে ঢুকে গেলেন কর্নেল, খান্না আর সেই রাজেন্দ্র। দু-মিনিট এ-ঘরটা স্তব্ধ হয়ে থাকল। তারপর ও ঘরের দরজা খুলে খান্না মুখ বের করে ডাকলেন—মিঃ জয়সোয়াল, প্লিজ!

জয়সোয়াল সায়েব রাশভারী মূর্তি নিয়ে উঠে গেলেন। আমি সিগারেট ধরালুম। তারপর দেখি, জয়ন্তী উঠে গেল শ্রীমতী মালহোত্রার কাছে। উনি বসেছিলেন কোণের দিকে একটা চেয়ারে—সামান্য দূরে। জয়ন্তীকে উনি সস্নেহে জড়িয়ে ধরে জানলার কাছে গেলেন। তারপর দুজনের মধ্যে অস্ফুটস্বরে কথাবার্তা চলতে থাকল। মনে-মনে হাসলুম। শ্রীমতীর চেলা হওয়ার উপযুক্ত মেয়ে জয়ন্তী। নির্ঘাৎ এখন প্রেতশক্তি নিয়ে আলোচনা চলছে দুজনের মধ্যে। বিশেষ করে পুলিশের বেতারযন্ত্র বিগড়ানো ওঁদের তপ্ত কড়াইয়ে আরেকটি বিস্ফোরণ সৃষ্টি করেছে নিঃসন্দেহে।

অধ্যাপক দ্বিবেদী মনমরা হয়ে বসে ছিলেন। আমি ওঁর পাশে উঠে গেলুম। উনি খুশি হয়ে বললেন, আসুন, আসুন মিঃ চাউড্রি। দেখুন তো, এসব কী গড়বড় কাণ্ড হল! আগামী পরশু দিল্লিতে আমার এক বড় অনুষ্ঠানে ভাষণ দেওয়ার কথা আছে। ভেবেছিলুম, রওনা দেব! অথচ আটকে গেলুম। কবে যে রাস্তা খুলবে, তাও তো বলতে পারছে না কেউ!

লোকটিকে গত সন্ধ্যা থেকেই খুব নিরীহ মনে হয়েছিল। উনি যে আমাদের গ্রিন ভিউ হোটেলেই নীচের স্যুটে উঠেছেন, কর্নেলের কাছে শুনেছিলুম। বললুম, আপনি নিশ্চয় আমাদের আসার আগেই এসেছেন এখানে?

—আমি এসেছি তেসরা জুন। প্রতিবছরই ছুটির দু-একটা সপ্তাহ এখানেই কাটিয়ে যাই। এবার অবশ্য নানা প্রোগ্রামে দিন পাঁচেকের বেশি থাকা যেত না। তার মানে, আজ আটই জুন—আজই রওনা হতুম। তা ছাড়া...একটু হাসলেন অধ্যাপক।—তা ছাড়া এবার হোটেলের চার্জও প্রায় দেড়া বাড়িয়ে দিয়েছে। অত বেশি টাকা কোথায়, বলুন?

—মিসেস মালহোত্রার সঙ্গে আলাপ কি এখানেই হয়েছে?

—আবার কোথায় হবে?...অধ্যাপক একটু বিরক্ত হয়েই বললেন, গ্রিন ভিউতে গিয়ে প্রতি সিজনে ভদ্রমহিলা যেচে পড়ে সবার সঙ্গে আলাপ করে আসেন। বড্ড খামখেয়ালি।

পরক্ষণে জিভ কাটলেন। শ্রীমতী মালহোত্রা শুনলেন না তো? জয়ন্তীকে নিয়ে উনি মেতে উঠেছেন। অধ্যাপক এবার গলার স্বর চাপা করলেন—ওঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছে গত বছর জুনে। সেবারও এমনি প্ল্যানচেটের আসর বসিয়েছিলেন। তবে কোনও দুর্ঘটনা ঘটেনি। আর—আমিও অবশ্য সেই আসরে যোগ দিতে পারিনি। অসুস্থ হয়ে পড়েছিলুম ওইদিন।

—মিঃ জয়সোয়ালও কি বরাবর আসেন এখানে?

—না, এই প্রথম। বলছিলেন তো তাই-ই! কে জানে কেন, ভদ্রলোককে আমার কেমন রহস্যময় মনে হয়। আপনার হয় না?

—যা বলেছেন! কেমন যেন চাপা চালচলন।

—তার ওপর ওঁর মধ্যে একটা পুলিশি ঢঙের সবজান্তা ভাব আছে লক্ষ করেছেন? ওটা

আমার দু-চক্ষের বিষ। ও নাকি রিটায়ার্ড পুলিশ সুপার। হুঁ!

আবার সায় দিলুম—একটুও বেঠিক বলেননি স্যার!

স্যার শুনে অধ্যাপক আরও নরম হয়ে বললেন—আপনি একজন মডার্ন ইয়ংম্যান। আপনি ঠিক বুঝবেন, এইসব পুলিশ-টুলিশের মানেটা কী? স্রেফ মানুষের ব্যক্তিগত অধিকার অর্থাৎ জন্মগত স্বাধীনতার দাবিকে দমন করার জন্যেই তো রাষ্ট্র এদের পুষে রেখেছে। তাই না? ডঃ হেভাটরলভ গেটাসকিনটিকভের থিওরির কথা নিশ্চয় জানেন। রাষ্ট্র মানেই ব্যক্তির হাতের হাতকড়া। হাতকড়া-তত্ত্বের তিন নম্বর অধ্যায়ে তিনি বলেছেন...।

আমার মহাসৌভাগ্য, অধ্যাপকের হাত থেকে বাঁচাতে জয়সোয়াল বেরিয়ে এলেন এবং মুন্ডু বাড়িয়ে খাম্না ডাকলেন--।

—অধ্যাপক দ্বিবেদী, প্লিজ!

অধ্যাপক মুহূর্তে স্প্রিঙের মতো গুটিয়ে সুড়সুড় করে চলে গেলেন। ওঁর মুখ দেখে মায়া জাগছিল। জয়সোয়াল এসে আমার পাশে গম্ভীরমুখে বসে পড়লেন। বললুম, আচ্ছা ঝামেলায় পড়া গেল, স্যার!

জয়সোয়াল পকেট থেকে পাইপ বের করে বললেন, আপনার আবার কী ঝামেলা চাউড্রি? ইয়ংম্যান—তার ওপর ধুরন্ধর প্রাইভেট গোয়েন্দার সঙ্গী—মজাটা উপভোগ করে যান না চুপচাপ।

ওঁর কথার ভঙ্গিতে মনে-মনে খাপ্পা হলুম। তবে সেই ভাবটা লুকিয়ে মুখে হাসি ফুটিয়ে বললুম, যা বলেছেন। তবে মুশকিল কী জানেন, গোয়েন্দার পাল্লায় পড়ে আবার প্রাণে মারা না যাই এবার!

জয়সোয়াল ভুরু কুঁচকে বললেন, তেমন কি কোনও লক্ষণ দেখছেন?

—লক্ষণ কি আপনিও দেখতে পাচ্ছেন না?

—না তো!

—হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে প্রত্যেকেই কি ক্রমশ বেশি করে জড়িয়ে পড়ছি না?

—কী বলতে চান আপনি?

ওরে বাবা। এ যে ভারী কড়া ধাতের লোক। হবে নাই বা কেন? জাঁদরেল পুলিশ সুপার ছিল একসময়। আমতা-আমতা করে বললুম, কতদিন আটকে পড়ে থাকব আমরা, কোনও ঠিক নেই। কিন্তু বেশ বুঝতে পারছি, যতদিন থাকব—তত বেশি করে আমাদের প্রত্যেককে জিগ্যেসপত্তর করা হবে। প্রতিদিনই নতুন-নতুন প্রশ্ন গজাবে ওঁদের মাথায়, আর এমনি করে ডাকা হবে। জবাব দিতে হবে। হরিবল।

কথাটা বুঝলেন যেন জয়সোয়াল। পাইপের তামাকে আগুন জ্বেলে বললেন, ঠিক, তা ঠিক। আই এগ্রি।

—আপনি তো স্যার জয়পুরে থাকেন?

—হ্যাঁ। কেন?

—জয়পুরের আবহাওয়া এখন কীরকম বলুন তো?

—প্রচণ্ড গরম। বাঙালিবাবুরা কল্পনাও করতে পারবেন না।

—তা হলে তো স্যার, আপনার এখানে পুরো গ্রীষ্মকালটা কাটিয়ে যেতে আপত্তি থাকার কথা নয়। রাস্তার ধস ছাড়লেই বা কী!

—হোটেল ভাড়াটা দেবে কে? আপনার কর্নেল সায়েব দিতে রাজি থাকলে তো ভালোই।

বুঝলুম, লোকটার সঙ্গে জমবে না। এ বড্ড বদমেজাজি গোঁয়ার প্রকৃতির লোক। তাই চুপচাপ বসে থাকলুম। একটু পরে জয়সোয়াল নিজের মনেই বলে উঠলেন, হুঁ। গোয়েন্দাগিরি ফলানো হচ্ছে আমার ওপর। কেন যে এসব প্রাইভেট হ্যান্ডকে খাম্না পাত্তা দেয়, বুঝি না। আমি বলব কর্তৃপক্ষকে।

নিশ্চয় বলব, দেখবেন।

সবিনয়ে বললুম, আমাকে কি কিছু বলছেন স্যার?

জয়সোয়াল এতক্ষণে ফেটে পড়লেন।—বলছি। আপনার ওই নির্বোধ সঙ্গীটিকে বলবেন বলেই বলছি। বলবেন, ডিটেকশান অত সহজ নয়। আরে! ভিকটিম মেয়েটির পাশের চেয়ারে ছিলুম বলেই আমি ওকে অন্ধকারে দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ করে মেরে ফেললুম। বলে কী নির্বোধের মতো। চেনা নেই, জানা নেই—কোথায় কলকাতার এক বাঙালি। সামান্য এক লেড়কি! আর আমি হলুম রাজস্থানের রিটায়ার্ড পুলিশ সুপার মিঃ রঘুবীর জয়সোয়াল—যার দাপটে একসময় পাগলা হাতিরও মগজের অসুখ সেরে যেত। খান্নাটা ওর পাল্লায় পড়ে নির্ঘাত মরবে।

বলেই জয়সোয়াল সায়েব উঠলেন। গটগট করে বেরিয়ে গেলেন। যাওয়ার সময় ব্রিজেশ সিং ওঁর পাশে-পাশে এগিয়ে বলে এলেন—হোটেল ছেড়ে কোথাও গেলে আমাদের লোককে বলে যাবেন, স্যার। জাস্ট এ রুটিন ইন্সট্রাকশান।

জয়সোয়াল 'আচ্ছা' বলে জোর ধমক দিয়ে পরদা তুলে অদৃশ্য হলেন। লন থেকে ওঁর জুতোর শব্দ ভেসে আসতে থাকল।

ব্রিজেশ সিং চাপা হেসে আমার দিকে এগিয়ে এলেন। বললেন, মেজাজ খুব খারাপ হয়ে গেল কেন জয়সোয়ালজির? নিশ্চয় কর্নেল সায়েব কোথাও জোর ঘা দিয়েছেন, বুঝলেন মিঃ চাউড্রি?

বললুম, তাই তো মনে হচ্ছে। আচ্ছা মিঃ সিং, ওঁকে কি এই প্রথম দেখলেন আপনি—নাকি আগে পরিচয় ছিল?

—এই প্রথম। তবে পুলিশ বিভাগে ওঁর প্রচণ্ড নাম আছে শুনেছি।

—উনি আমাদের হোটেলেই উঠেছেন, জানতুম না। তাহলে তো আগেই আলাপ করে ফেলতুম।

—খবরদার, খবরদার! বড্ড বদরাগী মানুষ। কক্ষনো ঘাঁটাতে যাবেন না কিন্তু?

ব্রিজেশ সিং একটু দাঁড়িয়ে থেকে লনের দিকে বেরোলেন। তারপর অধ্যাপককে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল। উনি মেজাজ খারাপ করে বেরোচ্ছেন না, তা ওঁর মুখের হাসি দেখেই বোঝা যাচ্ছিল। খান্না যথারীতি ডাকলেন—মিসেস মালহোত্রা প্লিজ!

অধ্যাপক আপনমনে হাসতে-হাসতে বেরিয়ে গেলেন পরদা তুলে। আমাদের দিকে ঘুরেও তাকালেন না। শ্রীমতী মালহোত্রা স্টাডিতে গিয়ে ঢুকলে জয়ন্তী আমার কাছে এসে বসল। বললুম, খুব প্রেতচর্চা করা হচ্ছিল যেন?

জয়ন্তী একটু হাসল।—হ্যাঁ। কিন্তু আমি অবাক হচ্ছি যে আপনাকেও এখানে বসে ডাকের অপেক্ষা করতে হচ্ছে কেন? ভেবেছিলুম—কর্নেলের অন্তরঙ্গ সঙ্গী আপনি, নিশ্চয় ওঁদের টেবিলে থাকবেন ওঁদের সঙ্গে।

—অবাক আমি একটুও হইনি, তা বলব না। তবে আমার বৃদ্ধ বন্ধুটির অনেক কাজই আমার কাছে রহস্যময়।

—তার মানে আপনাকেও নিশ্চয় সন্দেহের আওতায় রাখা হয়েছে?

—সেটা মোটেও অস্বাভাবিক নয়।

—তা হলে আমাকেও তাই রাখা হয়েছে?

—বললুম তো, সেটাই নিয়ম এসব ক্ষেত্রে।

—কিন্তু শ্যামলীকে আমি...বলেই ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে যেন প্রচণ্ড অভিমানে থেমে গেল জয়ন্তী।

ডাকলুম—জয়ন্তী।

—বলুন।

—মিসেস মালহোত্রার সঙ্গে কথা বলতে আপনার ভয় হচ্ছিল না তো?

—কেন? কীসের ভয়?...বলেই জয়ন্তী যেন সামলে নিল। পরক্ষণে একটু হেসে ফের বলল, আপনারা তো কাছাকাছি ছিলেন! আসলে কী জানেন, ভদ্রমহিলা খুব অমায়িক সাদাসিধে মানুষ। শুধু একটু-আধটু পাগলামিই যা করেন মাঝেমধ্যে। কথা বলে আরও বুঝলুম, উনি অনেকসময় অবসেসনের ঘোরে অনেক কিছু করেন, পরে জ্ঞান হলে খুব পস্তান।

—অবসেসনের রুগি? বলেন কী!

—হ্যাঁ। আমি তো সোজা ফোন আর ঘড়ির তার কাটার কথা জিগ্যেস করে বসলুম। তখন উনি...

বাধা দিয়ে বললুম, সর্বনাশ! আপনি ওঁকে বলে দিলেন?

—ক্ষতি কী? জয়ন্তী বেপরোয়া হয়ে জবাব দিল।—তা উনি কী বললেন জানেন? হ্যাঁ—আমার হাত দিয়েই পরলোকের বাসিন্দারা এ কাজটি করিয়েছে। তাদের কী উদ্দেশ্য ছিল আমি জানি না। যাই হোক, পরে যখন সব মনে পড়ল, তখন বেশ ভয় পেয়ে গেলুম। তবে এবার নিজের মুখেই স্বীকার করব। আমি বললুম, হ্যাঁ, তাই করুন। তখন উনি বললেন—শুধু এটাই নয়, এমন অনেক কাজ উনি সময়-সময় করে ফেলেন, যার কোনও মাথামুণ্ডু নেই। একবার নাকি বাগানে রাত্তিরবেলা নিজের শাড়ি পুঁতে রেখে এসেছিলেন। সরযূ সেটা পরে আবিষ্কার করে। সরযূও এ কথাটা আমাকে বলেছিল। তখন আপনাকে বলতে ভুলে গিয়েছিলুম।

—অবসেসনের রুগিরা এ কাজ করে বটে।

—তা হলে জয়ন্তবাবু অবসেসনে থাকা অবস্থায় উনি কাউকে মেরে ফেলতেও তো পারেন?

—খুব পারেন। কর্নেল একটা ঘটনার কথা বলেছিলেন। তাতে এক অবসেসনের রুগি নিজের স্ত্রীর গলা টিপে খুন করেছিল। পরে তার আর কিচ্ছু মনে ছিল না।

জয়ন্তী আঁতকে উঠল।—সর্বনাশ! তা হলে তো এ ভদ্রমহিলার কাছ থেকে দূরে থাকাই নিরাপদ।

হেসে বললুম, আপনি তো পাহাড়ে-চড়া খেলোয়াড় মেয়ে! আপনার গায়ের জোরে বুড়ি পারবেন না—নিশ্চিন্ত থাকুন।

এইসময় শ্রীমতী মালহোত্রা হাসতে-হাসতে বেরিয়ে এলেন। এত ঝটপট! খান্না ডাকলেন—জয়ন্তবাবু আসুন।

কর্নেলের সঙ্গে অনেকবার অনেক হত্যাকাণ্ডের তদন্তে উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য হয়েছে। কিন্তু কখনও আমাকে বাইরের লোকের মতো প্রশ্ন করা হয়নি—কিংবা বাইরে বসে থাকতেও হয়নি। এবার এমন কাণ্ডের অর্থ খুঁজে পাচ্ছিলুম না। একটু অভিমানও হয়েছিল। তবু সেটুকু চেপে সপ্রতিভ ভঙ্গিতে স্টাডিতে ঢুকলুম।

খান্না বললেন, বসুন। আপনার নাম ঠিকানা পেশা ইত্যাদি বলুন।

বললুম। স্টেনো ভদ্রলোক লিখে নিলেন। টেবিলের অন্য পাশে কর্নেল গম্ভীরমুখে বসে রয়েছেন। আমার দিকে তিনি তাকাচ্ছেন না।

খান্না বললেন, আপনাকে শুধু একটিমাত্র প্রশ্ন করব, জয়ন্তবাবু।

—বেশ তো। করুন না।

গত রাত্রের ভূতের আসরে যখন আলো একেবারে নিভিয়ে দেওয়া হয়, তারপর থেকে আবার আলো জ্বলে ওঠার মধ্যে—অর্থাৎ যতক্ষণ ঘরটা অন্ধকার ছিল, আপনি কি আপনার চেয়ার ছেড়ে একমুহূর্তের জন্যেও উঠেছিলেন?

এ তো বড় অদ্ভুত প্রশ্ন! আমি ঘাবড়ে গেলুম। খান্না আমার তাকানো দেখে কিছু টের পেয়ে আবার বললেন, দয়া করে জবাব দিন।

দৃঢ়কণ্ঠে বললুম, না।

আমার বৃদ্ধ ঘুঘুটি এবার ডেকে উঠলেন, হুম জয়ন্ত! সত্যি-সত্যি না?

বললুম, আমার উঠতে ইচ্ছে করছিল। কারণ শ্যামলীর কণ্ঠস্বরে আমার সন্দেহ জেগেছিল।

—কিন্তু তুমি ওঠোনি?

—না।

—কেন?

—এখন বলা কঠিন। হয়তো ভেবেছিলুম, যদি সত্যি ভূতপ্রেত হয়, আমার ক্ষতি করতে পারে—কিংবা উঠতে গেলে চেয়ারে শব্দ হবে, কারও সঙ্গে ধাক্কা লাগতেও পারে!

—হুম! তা হলে শ্যামলীর গলার স্বর শুনে তোমার সন্দেহ হয়েছিল?

—হ্যাঁ, মনে হচ্ছিল, অন্য কেউ কথা বলছে।

বুড়ো ঘুঘু ঘাড় নাড়লেন। তারপর খান্নার দিকে তাকালেন। খান্না বললেন, একটা মূল্যবান সূত্র দেওয়ার জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ, জয়ন্তবাবু। ঠিক আছে, চলুন—আপনাকে পৌঁছে দিই!

বেরিয়ে দেখি পাশাপাশি বসে জয়ন্তী আর মিসেস মালহোত্রা গল্প করছেন। খান্না জয়ন্তীকে ডাকলেন। জয়ন্তী ভীতু মুখে চলে গেল।

আমি শ্রীমতী মালহোত্রার পাশে গিয়ে বসলুম। উনি সস্নেহে বললেন, আপনার সঙ্গে ভালো করে আলাপই হয়নি। বসুন, বসুন। মা ও ছেলের কিছুক্ষণ আলোচনা করা যাক। বাণেশ্বরে বুঝি এই প্রথম আসা হল?

—হ্যাঁ, প্রথমই। কিন্তু এসেই পড়ে গেলুম ঝামেলায়!

—না, না! সব ঝামেলা মিটে যাবে। কিচ্ছু ভাববেন না! কেউ তো টের পাচ্ছে না আসল ব্যাপারটা কী। পেলেও মানতে চায় না। দেখবেন, এর ফলে কী হয়? এই তো সবে শুরু। কমিউনিকেশন বন্ধ, বেতার বিগড়েছে, মানুষ মরল—এরপর আরও সাংঘাতিক ব্যাপার হবে। আমি দিব্যচক্ষে সব দেখতে পাচ্ছি। সব—স-ব...।

বলতে-বলতে হঠাৎ বুড়ি করলেন কী, নিজের শাড়ির আঁচলটা ফরফর করে ফেড়ে ফেললেন। বাধা দেওয়ার ফুরসতই পেলুম না। ওঁর চোখের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেলুম। অস্বাভাবিক দৃষ্টি। ঠোঁট কাঁপছে। তারপর উনি ছাইদানি আর টেবিলটা উলটে দিলেন। আমি বাধা দিতে গিয়েই টের পেলুম, হাত দুটো একেবারে ইস্পাতের তৈরি। এক ধাক্কায় ছিটকে পড়লুম মেঝেয়। জোর চোট লাগল।

শ্রীমতী মালহোত্রা এবার কোনার দিকে শান্তভাবে এগোচ্ছেন। মেঝে থেকে উঠেই চেঁচিয়ে ডাকলুম—মিঃ সিং। সরযূ। লছমন!

ব্রিজেশ সিং বাইরে থেকে দৌড়ে এলেন। লছমন আর সরযূও এসে গেল। শ্রীমতী মালহোত্রা তখন কোনের একটা সুন্দর পুতুল তুলে আছাড় দিতে যাচ্ছেন। ব্রিজেশ সিং ধরে ফেললেন। কিন্তু এখন ওঁর গায়ে অসুরের শক্তি। ব্রিজেশও পড়ে গেলেন মেঝেয়। বুড়ি তখন বিড়বিড় করে কী বলছেন। পুতুলটা হাতে ধরা। এবার সরযূ দৌড়ে ভেতরে কোথাও গেল। তারপর একটা তাতানো লাল লোহা এনে বুড়ির সামনে ধরে চেঁচিয়ে বলল, মাইজি! হোঁশমে আইয়ে। অমনি বুড়ি চোখ বের করে পড়ে গেলেন। এবার আমরা জানতে পারলুম, ভদ্রমহিলার সম্ভবত উৎকট হিস্টিরিয়া রোগ আছে এবং বরাবর তার প্রকোপ সামলাতে সরযূদের প্রাণান্ত হয়। লছমন ব্রিজেশ সিং আর আমাকে সেইসব কথা ইনিয়েবিনিয়ে শোনাতে শুরু করল। সরযূ তখন মাইজিকে সামলাচ্ছে।

লছমন বলল, দো সাল আগে মালহোত্রাজি অ্যাকসিডেন্টে মারা যাওয়ার পর থেকেই মাইজির এই আজব রোগ হয়েছে। দাওয়াইপানি করার কথা বললে মাইজি তেড়ে মারতে আসবেন। লেকিন, আসলি বাত হচ্ছে—মাইজির পেটের মধ্যে কীভাবে বাণেশ্বরের ভূতটা ঢুকে গেছে।...

পাঁচ ঃ যুক্তি, সম্ভাবনা ও জয়সোয়ালজি

মালহোত্রা বুড়িকে নিয়ে ওরা ভেতরে শোওযার ঘরে চলে গেলে আমি বেরোলুম। ঘরের ওই পরিবেশে এবার দম আটকে আসছিল। বাইরে লনে কিছুক্ষণ পাযচাবি করলুম। কিন্তু জয়ন্তী বা কর্নেলরা কেউ বেরোচ্ছেন না। ব্যাপার কী? জয়ন্তীকে অতক্ষণ ধরে প্রশ্ন করা কেন? মুহূর্তে আমার মাথায় একটা আবছা সন্দেহ ভেসে এল। জয়ন্তী বা শ্যামলীর পিছনের কথা তো কিছুই জানি না। এমনও তো হতে পারে যে মোহন পারেখের সঙ্গে প্রণয়ঘটিত কোনও ঘটনার জের এই বাণেশ্বর অবধি ধেয়ে এসেছিল এবং পরিণামে পারেখ আব শ্যামলীর মৃত্যু ঘটল।

সন্দেহটা মাথায় দিব্যি ভেসে বেড়াতে থাকল। কলকাতার সাউথ পার্ক লেনের সেই দু-বোন মিতা-রিতার কেসটা মনে পড়ে যাচ্ছিল। ওরা একজনকেই ভালোবাসত। তারপর ছোটবোন রিতা পরিণামে নিজের সহোদর দিদি মিতাকে হত্যা করতে কুণ্ঠিত হয়নি। বিহারে এমনি এক পাহাড়ি অঞ্চলে বেড়াতে গিয়ে ঠিক একই ঘটনা ঘটেছিল। কথামতো আগে গেল দু-বোন, তারপব ওদেব প্রণয়ী। রিতা এক সন্ধ্যায় পাহাড় থেকে ধাক্কা দিয়ে খাদে ফেলে দিল সেই যুবকটিকে। ফিবে এসে সেই রাতেই পটাশিয়াম সায়নাইড দিয়ে দিদিকে হত্যা করল। এবং আত্মহত্যার ঘটনা বলে রটাল। একটা চিঠিও পাওয়া গেল মিতার বিছানার তলায়। আত্মহত্যার কারণ খুবই স্বাভাবিক। প্রণয়ীর মৃত্যুর পর তার বেঁচে থাকার কোনও অর্থ খুঁজে পাচ্ছে না, তাই বিষ খেল। ওদিকে প্রণয়ীর মৃত্যুটা আকস্মিক দুর্ঘটনা বলে সবাই মেনে নিয়েছে। কাজেই রিতা সবদিক থেকে নিরাপদ হল। প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে তার কোনও অসুবিধেই হল না।

কিন্তু আমার সঙ্গের বুড়ো ঘুঘুটির চোখ এড়িয়ে যাওয়া অনেকের পক্ষেই অসম্ভব। ঘটনাচক্রে তিনি তখন সেই পাহাড়ি স্বাস্থ্যনিবাসে এক বন্ধুকে দেখতে গেছেন। কোথাও কোনও আকস্মিক মৃত্যুর গন্ধ পেলেই উনি তো একেবারে চঞ্চল হয়ে ওঠেন!

যাই হোক, সে কেসের কথা খবরের কাগজে বিস্তারিতভাবে প্রকাশ হয়েছিল। ধুরন্ধর কর্নেল নীলাদ্রি সরকার হত্যাকারীকে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন। রিতার বয়েস বিবেচনা করে তার যাবজ্জীবন জেল হয়ে যায়। জেলে মাঝে-মাঝে দেখা করে আসতেন কর্নেল। ফিরে এসে বলতেন, মেয়েটি অনুতপ্ত হয়েছে এতদিনে।...

বাণেশ্বরের ঘটনার সঙ্গে সেই ঘটনার একটা মোটামুটি মিল আছে, তা এতক্ষণে হঠাৎ আবিষ্কার করে আমি ভীষণ চঞ্চল হয়ে উঠলুম। কর্নেল কি মিতা-রিতাব কেসটা ভুলে গিয়েছিলেন?

জয়ন্তীকে এখনও জেরা করা হচ্ছে দেখে আমার মনে হল, কর্নেল নিশ্চয় কেসটা ভোলেননি। অমনি গা শিউরে উঠল। তারপর ক্রমশ মন খারাপ হতে থাকল। জয়ন্তী কি রিতা? জয়ন্তী অত ভালো মেয়ে—অমন সরল, নিরহঙ্কার, আর দয়ালু! মনে-মনে তার মুখের দিকে তাকালুম। কোথাও একবিন্দু পাপের ছায়া দেখতে পেলুম না। না, না—আমি ভুল করছি। তা ছাড়া মোহনকে না হয় ভূতের পাহাড় থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলা সহজ হল, শ্যামলীকে কীভাবে মারল সে? অতগুলো লোকের মধ্যে, অন্ধকার হলেও, চেয়ার থেকে উঠে গিয়ে হত্যা করার মতো দক্ষতা, চাতুর্য আর নার্ভ তার যে নেই, আমি এতে নিঃসন্দেহ। কর্নেল বলেছেন, এ কাজ কোনও প্রচণ্ড শক্তিধর ক্ষুরধারবুদ্ধিসম্পন্ন অভিজ্ঞ হত্যাকারীর। সে প্রেত হোক, আর মানুষই হোক, তার শক্তি অতি সাংঘাতিক। তা ছাড়া, প্যাথোজেন বা নাটেমা নামক আদিম জিভারো ইন্ডিয়ানদের ব্যবহৃত বিষ কোথায় পাবে জয়ন্তী? যদি বা পায়, সে তো অন্য কোথাও অন্য কোনও সুযোগে তা ব্যবহার করতে পারত। এমনকী তা বাদেও কোনও পর্বতাভিযানে গিয়ে শ্যামলীকে খুব সহজেই সে ধাক্কা দিয়েই তুষারখাদে ফেলে মারতে পারত। ধরা যাক, যেভাবে মোহনকে মেরেছে সেভাবে তাকেও মারতে পারত ভূতের পাহাড়ে গিয়ে। কেউ কোনও সন্দেহ করত না। কারণ দুজনেরই পাহাড়ে চড়ার সার্টিফিকেট আছে। জয়ন্তী

কৈফিয়ত দিত, পশ্চিমের খাড়াই বেয়ে চূড়ায় ওঠার চেষ্টা করছিল তারা—হঠাৎ দুর্ঘটনা ঘটেছে। খুবই স্বাভাবিক কৈফিয়ত হত।

কিন্তু আরেকটা যুক্তি মনে ভেসে এল। সেটাও কর্নেলের। হত্যাকারী যেই হোক, শ্যামলীকে হত্যা করেছে সে আকস্মিক সিদ্ধান্তে।

কথাটা বারবার নাড়াচাড়া করে দেখলুম। হ্যাঁ, ঠিক তাই-ই বটে। কারণ ওই পরিবেশে শ্যামলীকে হত্যা করার ঝুঁকি ছিল—অন্ধকার থাকলেও ঝুঁকিটা খুব সামান্য নয়। হত্যাকারী মরিয়া হয়ে ঝুঁকিটা নিয়েছিল, তা বোঝা যায়। মার্ডার-উইপন বা হত্যার অস্ত্র যাই হোক, হত্যা করার মতলব যদি আগেই পরিকল্পিত হয়ে থাকে, তা হলে এতগুলো লোকের মধ্যে তা ব্যবহার না করে অন্যখানে শ্যামলীকে একা পেয়ে দিব্যি কাজে লাগানো যেত না কি? বিশেষ করে জয়ন্তীই যদি হত্যাকারী হয়, তা হলে তো তার সুযোগের জন্যে প্ল্যানচেটের আসরে আসতে হবে কেন?

স্বাভাবিক হতে বাধা অবশ্য নেই। ধরা যাক, জয়ন্তী মোহনকে খাদে ধাক্কা দিয়ে ফেলেছে এবং শ্যামলী আড়াল থেকে দেখেছে, তারপর হঠাৎ প্ল্যানচেট আসরের সুযোগ পেয়ে প্রিয় বান্ধবীর কীর্তি ফাঁস করতে চেয়েছে—এতে জয়ন্তী বিপদ বুঝেই শ্যামলীকে কোনও অজ্ঞাত অস্ত্রে হত্যা করেছে।

আবার দেখলুম, জয়ন্তীর দিকে সন্দেহের পাল্লাটা ভারী হয়ে যাচ্ছে।

তখন হাল ছেড়ে দিয়ে কিছুক্ষণ সিগারেট খেলুম এবং পায়চারি করলুম। হ্যাঁ এবং না'র দোলায় অস্থির হতে থাকলুম। খানিকটা আগে হলুদ গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে জয়ন্তী প্রেতশক্তিকে হত্যাকারী প্রমাণের জন্যে উঠে পড়ে লেগেছিল কেন? সে সুশিক্ষিতা আধুনিকা। আমার অবাক লাগছিল তার মতামত। অবশ্য শ্যামলী গতকাল বিকেলে ভূতের পাহাড়ে ওকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলে বিদ্রূপ করছিল বটে। তা হলেও আজ জয়ন্তী যেন ভূতপ্রেত দিয়ে তার আত্মরক্ষার জন্যে নিছক একটা সাফাই গড়ে তুলছিল আমার কাছে। নাঃ, ভূতে আমার এখন এই উজ্জ্বল দিনের বেলায় একটুও বিশ্বাস নেই। চমৎকার ঝিরঝিরে বাতাস দিচ্ছে। চারদিকে স্পষ্টতার মধ্যে কোনও অশুভ শক্তির কোনও চিহ্ন নেই।

সিগারেট শেষ হলে একটা সিদ্ধান্ত নিলুম। জয়ন্তীর সঙ্গে যতটা পারি ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা শুরু করব। দরকার হলে ফ্লার্টিং করব—এমনকী ওকে চুমু খেতে চেষ্টা করব, বুকে টানব। দেখা যাক, এতে কতখানি ফল পাওয়া যায়। নিপুণ প্রেমের অভিনয় দিয়ে, অবশ্য জানি না (ও যদি সত্যিকার হত্যাকারী হয়) কতখানি সিদ্ধিলাভ সম্ভব হবে। অন্তত এটুকু বলতে পারি, বহুদিন ধরে ধুরন্ধর এক গোয়েন্দার শিষ্যত্ব নিয়ে যা কিছু শিখেছি, তা ঠিক-ঠিক প্রয়োগ করতে পারলে কিছুটা কাজ হবেই।

হাসি পেল। প্রেমের অভিনয় করতে গিয়ে সত্যি-সত্যি প্রেমে পড়ে যাব না তো? তা হলে আবার উলটো বিপদ হবে। জয়ন্তীর মধ্যে একটা মারাত্মক টান আছে—এমনিতেই তার খপ্পরে পড়েছি আজ সকাল থেকে। ওকে না দেখে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলুম না অতক্ষণ? মনকে বললুম—শক্ত হবি ব্যাটা। খবরদার, বেশিদূর এগিয়েছ কি মরেছ।

আর আমার প্রেমিকা চন্দ্রাণীর (সে এখন কলকাতায়; এম. এ. পরীক্ষার ফল না বেরোলে কোথাও নড়বে না) উদ্দেশে বললুম—চন্দ্রা, এখন দিনকতকের জন্যে আমাকে ছুটি দাও। মানুষ যেমন মাঝে-মাঝে নিজের ঘর ছেড়ে অন্যের ঘরে ক'দিন বেড়াতে যায়, তেমনি আমিও তোমার-আমার নিজস্ব ঘর থেকে অন্য একটি ঘরে বেড়িয়ে আসি। বাইরে বেড়াতে গেলেই তো নিজের ঘর কিছু পর হয়ে যায় না।

তখনও কর্নেলদের কোনও পাত্তা নেই। ব্যস্ত হয়ে ডাইনিং হলে উঁকি মেরে চলে এলুম। তারপর একেবারে গেট পেরিয়ে রাস্তায় উঠলুম। অন্যমনস্কভাবে হোটেলের দিকে চলেছি, হঠাৎ দেখি রাস্তার ধারে বেমক্কা গজিয়ে ওঠা পিরামিডের মতো তিনকোনা প্রকাণ্ড ন্যাড়া পাথরের কাছে দাঁড়িয়ে

জয়সোয়ালজি পাইপ টানছেন। সূর্য এখন প্রায় মাথার ওপর, তাই পাথরটার উত্তরধারে ছায়া সেঁটে গেছে। ওই একফালি ছায়ায় ভদ্রলোক আপনমনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। পিঠটা পাথরে ঠেকিয়ে একটু বাঁকাও হয়েছেন। আমি এই বদমেজাজি প্রাক্তন পুলিশ ডিক্টেটরেব পাল্লায় পড়া বাঞ্ছনীয় মনে করলুম না। কিছুক্ষণ আগে যেভাবে রেগেমেগে বেরিয়ে এসেছেন, বলা যায় না—এখন সেই রাগটা আমার ওপর ঝেড়ে বসতে পারেন পুরোপুরি।

এড়িয়ে যাচ্ছি, হঠাৎ উনি হাত তুলে ডাকলেন—চাউড্রিজি! প্লিজ কাম হিয়ার!

গলার স্বর একেবারে অন্যরকম এখন। তবু ভয়ে-ভয়ে কাছে গেলুম।—এখনও হোটেলে ফেরেননি স্যার।

—নাঃ। জাস্ট থিংকিং—ভাবছি। আসুন চাউড্রিজি!

এখানে ওইভাবে দাঁড়িয়ে প্রাক্তন পুলিশ সুপারটি কী ভাবছেন, জানতে কৌতূহল হচ্ছিল। আমি কাছে গেলে পা বাড়ালেন। তারপর আমার একটা হাত নিয়ে বললেন—আমার মেজাজ সময়ে-সময়ে লোকে বড্ড বিগড়ে দেয়। তখন সামনে যাকে পাই, কড়া কথা বলে বসি। আপনি আমার ছেলের বয়েসি চাউড্রিজি, দয়া করে কিছু মনে করবেন না।

ব্যস্তভাবে বললুম—না, না। কী যে বলেন, স্যার।

—দেখুন, আমি সেই বাইশ বছর বয়েসে ব্রিটিশ আমলে পুলিশের চাকরি নিয়েছিলুম। নিজের যোগ্যতায় সামান্য সার্জেন্ট থেকে অবশেষে পুলিশ সুপার হয়েছিলুম। অজস্র মেডেল আর পুরস্কার পেয়েছি জীবনে। কত মারাত্মক সব কেসের অপরাধীদের খুঁজে বের করেছি—সে এক দীর্ঘ রোমাঞ্চকর অধ্যায় ছিল জীবনের। আমার চোখে চোখ পড়লেই গলগল করে অপরাধীরা সব কবুল করে যেত। আপনি রাজস্থানে যান। তামাম স্টেট আমাব নাম শুনলে এখনও বলে উঠবে—হ্যাঁ, পুলিশ সুপার একজনই ছিল—সে জয়সোয়ালজি। এখন আমার অবসরজীবন। আজ দশ বছর অবসর নিয়েছি। বয়েস হয়েছে। ছোটাছুটি বা কোনও ঝামেলা বিলকুল পছন্দ হয় না, পারিও না। কিন্তু বড় কষ্ট হয় চাউড্রিজি, বুঝলেন? কোন জমানা ছিল—আর আজ কোন জমানা এল। শাসন চালাবার যোগ্যতা নেই, বুদ্ধিসুদ্ধি নেই, সব আলুর কারবারি ঢুকেছে প্রশাসনে। আর পুলিশ প্রশাসন? ছ্যা-ছ্যা। অযোগ্য নির্বোধ কতকগুলো লোক ঘুরে বেড়াচ্ছে। পুলিশ শুনলেই একসময় লোকের পিলে চমকে উঠত। আর আজ? পুলিশের প্যান্ট খুলে লোকেরা লেজ খুঁজে দেখে।

হো-হো করে হেসে উঠলুম।

জয়সোয়ালজি বললেন, হাসবেন না, হাসবেন না। হাসির কথা নয়। খুবই দুর্ভাবনার কথা চাউড্রিজি। পুলিশকে যদি ভয় না করল, তো প্রশাসন চলবে কেমন করে? তাই তো এই অরাজক অবস্থা সারা দেশে। দুর্নীতি আর খুনজখম হু-হু করে বেড়ে গেছে। এত ক্রিমিনাল বেড়ে যাওয়ার কারণ কী জানেন? লোকে পুলিশকে আর ভয় করে না। দেখছে, এরা আসলে কাকতাড়ুয়া—খড়ের মূর্তি। তালপাতার সেপাই সব। হাতে খেলনার বন্দুক-পিস্তল। যান—পরীক্ষা করে দেখুন, গুলি বেরোয় না—বেরোয় গুলতির গুল।

আবার হাসি এল, কিন্তু সামলে নিলুম। কড়া ধমক খাওয়া বিচিত্র নয়। বললুম—ঠিক বলেছেন স্যার। আমাদের পশ্চিমবঙ্গে তো তাই ঘটছে। বাচ্চা ছেলেরা পুলিশের হাত থেকে বন্দুক-পিস্তল কেড়ে নিয়ে কেটে পড়ছে।

জয়সোয়ালজি জোর নড়ে উঠলেন—বিলকুল তাই ঘটছে। আরে। তুমি হচ্ছ কি না পুলিশ। ব্রিটিশ ট্র্যাডিশনের বীরত্ব, তেজ, শক্তি, সাহস তোমার রক্তে থাকবে গাঁথা। তা কি না, হাতে অমন সাংঘাতিক অস্ত্র থাকতে তুমি ভ্যাবলার মতো মার খাচ্ছ? পশ্চিমবঙ্গের ব্যাপার দেখতে-দেখতে আমি পাগল হয়ে যাই চাউড্রিজি। ছ্যা-ছ্যা-ছ্যা। যার হাতে আগ্নেয়াস্ত্র তাকে কিনা সামান্য ছুরি দিয়েই কাহিল করে মারছে? আমি হাসব না কাঁদব ভেবে পাই না, যখন দেখি, বন্দুক-পিস্তলের সঙ্গে শেকল লটকানো

রয়েছে। সব বাঘ এখন গিদ্ধড় হয়ে গেছে চাউড্রি। আমার হাত নিশপিশ করে। দিক না একদিনের জন্যে পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ কর্তার দায়িত্ব আমার কাঁধে—মাত্র একদিন, বুঝলেন? দেখবেন—সব শালা শায়েস্তা হয়ে গেছে!

সায় দিলুম—যা বলেছেন, স্যার।

—এই খান্নাটাকে কী ভাবছেন? ও তো একটা বুদ্ধুর বুদ্ধু। পুলিশ ইন্সপেক্টর হয়েছে নেহাত খুঁটির জোরে। ও একজন কনস্টেবল হওয়ারও যোগ্য নয়। তা ছাড়া, কিছু মনে করবেন না চাউড্রি, আপনার কর্নেল ভদ্রলোকের ব্যাকগ্রাউন্ড আমি জানি না—উনি চোখের সামনে যা দেখছেন, তা ছেড়ে দিয়ে তফাতে ঘুরতে যাচ্ছেন। কোনও-কোনও মানুষের স্বভাব অবশ্য এমনিই হয়। আপনার কর্নেল কি ডিটেকটিভ ডিপার্টে ছিলেন?

জবাব দিলুম—না, না। উনি মিলিটারির লোক।

জয়সোয়ালজি পথের মধ্যে দাঁড়িয়ে পড়ে ঘোঁতঘোঁত করে পুলিশি হাসি হাসলেন।—শখের গোয়েন্দা?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। ওঁর অনেক হবির মধ্যে এটাও একটা।

জয়সোয়ালজি আমার দিকে ট্যারা চোখে তাকিয়ে বললেন—আপনার ওই বৃদ্ধ ভদ্রলোককে বলে দেবেন, খুনোখুনি হবির মধ্যে পড়ে না। আগুন নিয়ে খেলার সামিল। আরে বাবা, ডিটেকশান বিদ্যা যদি অতই সহজ আর অশিক্ষিত-পটুত্বের ব্যাপার হত, তা হলে আর ট্রেনিং এবং অভিজ্ঞতার দরকার হত না!...

হোটেলের গেটে এসে পড়েছিলুম, তাই বাঁ-দিকে ঘুরছি—জয়সোয়ালজি আমার হাত ধরে টানলেন।—লাঞ্চের এখনও ঢের দেরি আছে। চলুন না, একবার নেপাল বর্ডার অবধি ঘুরে দেখে আসি, কী অবস্থা। আমি যখন বললুম, সারদা নদী পেরিয়ে নেপাল হয়ে বেরোনো যায়, খান্না কী জবাব দিল শুনলেন তো? আমি বাজি রেখে বলছি—ব্যাটা ওদিকে কখনও পা বাড়ায়নি। ওদিকটা আমার চেনা।

প্রস্তাবটা ভালো মনে হল। রাস্তা করে মেরামত হবে ঠিক নেই। কালই যদি দরকার বুঝি, ঘুরপথে বেরিয়ে যাওয়ার সুযোগ পেলে ছাড়া উচিত হবে না। খুব বেশিদিন থাকাও যাবে না। ছুটি ফুরিয়ে যাবে। তাই ওঁর সঙ্গে পা বাড়ালুম। বললুম—কত দূর জায়গাটা?

জয়সোয়ালজি জবাব দিলেন—বেশি না, এক কিলোমিটার মাত্র। খান্নার কথা আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। সারদা নদীতে এই বেমরশুমে বন্যা হয়ে গেল—মাত্র এক রাতের ঝড়বৃষ্টিতে? ব্যাটা বড্ড ফাঁকিবাজ। আসলে আমাদের ভয় দেখাচ্ছে।

টনকপুর রোড ঘুরে বাঁ-দিকে চলে গেল। আমরা সে রাস্তা ছেড়ে সরু একটা পায়ে-চলা রাস্তায় নামলুম। দু-ধারে ঘন জঙ্গল। রাস্তাটা একটা পাহাড়ের গায়ে উঠে গেছে। চড়াইয়ে ওঠার পর লক্ষ করলুম, আশেপাশের পাহাড়গুলোতে অজস্র ধসের চিহ্ন রয়েছে। নীচের উপত্যকার ওপর ধস নেমে সেখানেও অনেক গাছপালাকে মিশমার করে ফেলেছে। মনে হচ্ছে, যেন কোনও মহাকায় দানব হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে প্রকৃতির সাজানো ঘরসংসার লণ্ডভণ্ড করে আবার কোনও গুহার অন্ধকারে গিয়ে লুকিয়ে পড়েছে।

লক্ষ করলুম, কড়া ধাতের মানুষ হলে কী হবে, জয়সোয়ালজিরও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখার চোখ আছে। কারণ, মাঝে-মাঝে দাঁড়িয়ে পড়ছেন এবং আগুনফুলের উজ্জ্বলতায় ভরা গাছগুলোর দিকে তাকিয়ে অস্ফুটস্বরে তারিফ করছেন। একস্থানে পাথরের ওপর ঝরনাধারার মতো অজস্র হলুদ অর্কিডের গুচ্ছ, ডগায় আশ্চর্য সুন্দর লাল ফুল ফুটে রয়েছে। উনি দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন। তারপর সস্নেহে ঝুঁকে অর্কিডগুলোর গায়ে হাত বুলিয়ে দিলেন। তারপর বললেন—চাউড্রিজি কি বিবাহিত?

সলজ্জ হেসে জবাব দিলুম—না স্যার।

জয়সোয়ালজি বললেন—করবেন না। খামোখা প্রবৃত্তির বশে ঘরে দুশমন ডেকে এনে কী ফল?

—আপনি কি বিবাহিত, স্যার?

জয়সোয়ালজি ঘাড় নেড়ে বললেন, নো-ও-ও! আপনি পাগল হয়েছেন চাউড্রি? জীবনে সবকিছুকে আমি বিশ্বাস করতে রাজি—ওই একটি বাদে। স্ত্রীলোক! বলবেন, কেন এ-কথা বলছি? বলছি স্রেফ আমার অভিজ্ঞতা থেকে। পৃথিবীতে যতরকম অপরাধ ঘটে থাকে, তার শতকরা নিরানব্বইটির পিছনে কোনও-না-কোনওভাবে স্ত্রীলোকের প্রভাব আছেই। স্ত্রীলোক সম্পর্কে খ্রিস্টানধর্মের ইশারা আপনাব মালুম হচ্ছে না? অ্যাডামকে স্ত্রীলোকই তো জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেতে প্ররোচিত করেছিল। শয়তান প্রথম চেষ্টাতেই কৃতকার্য হয়েছিল ইভের ওপর। অ্যাডাম পুরুষ মানুষ। তাকে শয়তান নোযাতে পারেইনি। আর, আমাদের হিন্দুশাস্ত্র দেখুন। সেখানেও বলছে—নারী নরকের দ্বার। তাই ঈশ্বরসাধনার প্রতিবন্ধক সে। ব্রহ্মচর্য ছাড়া ঈশ্বর পাওয়া যায় না। তবে দেখুন চাউড্রিজি, ঈশ্বর-টিশ্বর অনেক বড় কথা। আমি সামান্য মানুষ। আমি জানি, স্ত্রীলোক নিয়েই সাতকাণ্ড রামায়ণ আব অষ্টাদশপর্ব মহাভারত। ওঁকে সায় দিয়ে বললুম—ট্রয়ের যুদ্ধ, ওদিকে আরবের মুসলমানদেব কাববালার যুদ্ধ—সবই স্যাব, স্ত্রীলোকেব কাবণে ঘটেছিল নাকি। এমনকী কোনও-কোনও পণ্ডিত বলেছেন, মোহেনজো-দড়ো সভ্যতার পতনের মূলেও স্ত্রীলোক। আব স্যাব, আমাদের বাঙালিমতে বলা হয, স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী।

জয়সোয়ালজি আমার কাঁধে অন্তরঙ্গভাবে হাত বেখে বললেন, বাঙালি খুব বুদ্ধিমান জাত। টেগোবকে তাই নোবেল প্রাইজ দিয়েছিল বিলিতি পণ্ডিতবা।

—টেগোবও স্যাব স্ত্রীলোকেব ব্যাপাবটা এক বিয়েতেই বুঝে ফেলেছিলেন। তাই স্ত্রীর অকালমৃত্যুব পর বাকি জীবন আর বিয়েই করলেন না। বুড়িয়ে খটখটে হযে একা-একা মারা গেলেন। তবু কোনও স্ত্রীলোককে পাত্তাই দিলেন না!

জয়সোয়ালজির চোখ পিটপিট করছিল উত্তেজনায। এবার চাপা গলায় বললেন—মোহন পারেখটা বোকার মতো ওই স্ত্রীলোকের প্যাঁচে পড়েই মাবা গেছে, বুঝলেন চাউড্রি? আমি জানি।

চমকে উঠে বললুম—আপনি জানেন?

—নিশ্চয় জানি। মানে—প্রত্যক্ষদর্শী নই। কিন্তু এ আমার একরকম জানাই বলতে পাবেন। খান্নাটা বড্ড ভুল করছে।

—ব্যাপারটা জানতে খুব কৌতূহল হচ্ছে, স্যার।

জয়সোয়ালজি হাঁটতে-হাঁটতে বললেন—দেখুন, বরাবর আমার মেথড অফ ডিটেকশান হচ্ছে, প্রথম মুহূর্তেই ইনটুইশান বা সহজাত বোধ যা বলে, তার দিকে মনোযোগ দাও। শ্যামলী মেয়েটি মারা গেছে শোনার সঙ্গে-সঙ্গে আমার ইনটুইশান বলে দিল—মিসেস মালহোত্রার দিকে লক্ষ রাখো!

—কিন্তু স্যার...।

—ওয়েট, ওয়েট। মোটিভ পরে খুঁজবেন। প্রথমে দেখুন হত্যার চান্সটা কার বেশি ছিল? শ্যামলীর কাছাকাছি ছিল যে, তারই। এখন, ওর ডাইনে ছিলুম আমি, বাঁযে মিসেস মালহোত্রা। কেমন?

—হ্যাঁ স্যার।

—এখন দেখুন, আমি জানি যে আমি হত্যা করিনি। তা ছাড়া, যুক্তিশাস্ত্রের বিচারে আমিই যখন ডিটেকশন করছি অর্থাৎ হত্যাকারীকে খুঁজছি, তখন আমি নিজে হত্যাকারী নই। তা হলে দেখলুম, বাকি রইলেন মিসেস মালহোত্রা। কিন্তু তিনি কেন খুন করবেন? হ্যাঁ—এ একটা প্রশ্ন। অনেক ভাবলুম। ভেবে দেখলুম, ভদ্রমহিলা প্রেততত্ত্ব চর্চা করেন। ওঁর বদ্ধমূল ধারণা, প্রেতকে মিডিয়ামের দেহে আনা যায়। তাই শ্যামলীর মধ্যে প্রেতাত্মা আসুক, এই জেদ ওঁর ছিল। বলুন, এমন অবস্থায় ভদ্রমহিলার এই জেদ থাকা উচিত কি না?

—ঠিক বলেছেন স্যার। গোঁড়া বিশ্বাসী মানুষ তার বিশ্বাসকে সত্য প্রমাণের জন্যে সবসময় জেদ ধরে বসে থাকে।

—আপনি বুদ্ধিমান, চাউড্রি। তার ওপর আমরা এতগুলো হোমরাচোমরা সব মানুষ বসে আছি আসরে। আমাদের তাক লাগাতে পারলে মিসেস মালহোত্রার মস্ত জয় হয়ে যায়! এদিকে আমরা সবাই প্রায় অবিশ্বাসী। কাজেই ভদ্রমহিলা প্রায় বাজি ধরে বসেছিলেন। সাইকোলজিকাল পয়েন্ট থেকে ভেবে দেখুন চাউড্রিজি, এ ছিল মিসেস মালহোত্রার জীবনের এক চরম সঙ্কটময় মুহূর্ত। হেরে গেলে সে এক বড় অসম্মানের কথা, বড় লজ্জার কথা ওঁর জীবনে!

—ঠিক স্যার, আপনার যুক্তি অসাধারণ।

জয়সোয়ালজি এবার গোঁফে তা দিয়ে বললেন—এমন সঙ্কটময় মুহূর্তে, এমন একটা মানসিক উদ্বেগের সময়ে, মিসেস মালহোত্রা দেখলেন যে শ্যামলী অভিনয় করছে। অর্থাৎ তামাশা করছে!

—অভিনয় করছে?

—বিলকুল! আপনি কি বিশ্বাস করবেন, শ্যামলীর মুখ দিয়ে ভূতে কথা বলছিল? এই বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের যুগে, যখন মানুষ গ্রহান্তরে পাড়ি দিচ্ছে, তখন আপনি ওইসব আদিম কুসংস্কারকে আঁকড়ে ধরে বসে থাকবেন?

—মোটেও না, স্যার। ভূতটুত ছেলেভুলোনো গল্প ছাড়া কী?

—হ্যাঁ, মিসেস মালহোত্রা টের পেলেন যে শ্যামলী তাঁর বিশ্বাস নিয়ে তামাশা করছে। বলবেন—কেমন করে টের পেলেন? পেলেন—যখন দেখলেন, জলজ্যান্ত মোহন পারেখকে ভূত বানাচ্ছে শ্যামলী।

—কিন্তু মোহন সত্যি তো তখন মৃত!

—মৃত হলেও তখন সে সবার কাছে জীবিত। কারণ কেউ জানত না যে, সে পাহাড়ের খাদে পড়ে মারা গেছে। মোহন মালহোত্রা ফ্যামিলির নাকি খুব ন্যাওটা ছিল শুনলুম। মিসেস মালহোত্রা নিঃসন্তান। এক্ষেত্রে মোহনের মৃত্যু জেনেও উনি চুপচাপ বসে থাকবেন, এটা যুক্তিসঙ্গত মনে হয় আপনার?

—না স্যার।

—মোহনের মৃত্যু কীভাবে হল, পরে আসছি সে-কথায়। এখন দেখুন, যেই মিসেস মালহোত্রা টের পেল যে বাঙালি মেয়েটি তাঁকে নিয়ে তামাশা করছে, অমনি তাঁর মাথায় বিস্ফোরণ ঘটল। চাউড্রি, এ হচ্ছে মিসেস মালহোত্রার আকস্মিক সিদ্ধান্ত!

মুহূর্তে কর্নেলের ওই একই কথা মনে পড়ে গেল। আকস্মিক সিদ্ধান্তেই হত্যাকারী শ্যামলীকে খুন করেছে। আমি জয়সোয়ালজির মুখে কর্নেলের উক্তি এবং যুক্তির প্রতিধ্বনি শুনে শুধু অবাক নই, অভিভূত হলুম। জয়সোয়ালজি সত্যি ঝানু অভিজাত পুলিশ অফিসার! ওঁর যুক্তি, মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, পটভূমির খুঁটিনাটি অবস্থা বিচার এবং সম্ভাবনাতত্ত্বের সার্থক প্রয়োগ দেখে চমৎকৃত হয়ে বললুম—অপূর্ব ডিডাকশান আপনার! এদিকটা কেউ ভাবছেন না।

—এবার প্রশ্ন ওঠে, মার্ডার-উইপনটা তা হলে কী ছিল? চাউড্রিজি, মিসেস মালহোত্রা কেন, পৃথিবীর যেখানে যারাই প্রেততত্ত্ব, ব্ল্যাক আর্ট, ব্ল্যাক ম্যাজিক, ডাইনিতত্ত্ব বা উইচক্র্যাফ্‌ট, এক্সরসিজম বা ঝাড়ফুঁক, তুকতাক ইত্যাদি আদিম সংস্কার নিয়ে চর্চা করে—তাদের অদ্ভুত-অদ্ভুত সব জিনিস সংগ্রহ করে রাখতে হয়। কেন রাখতে হয় জানেন? মানুষকে তাক লাগাবার জন্যে। কারণ, বাস্তবিক তো পৃথিবীতে কোনও অলৌকিক ব্যাপার মাথা খুঁড়লেও ঘটতে দেখা যায় না। যা আপাতদৃষ্টিতে অলৌকিক মনে হয়, তার পিছনে বাস্তব কারণ ও যুক্তি থাকেই। তাই অসহায় ও মরিয়া হয়ে তারা বিচিত্র জিনিস জোগাড় করে রাখে। উদ্দেশ্য—অগত্যা ম্যাজিক দেখিয়ে বিশ্বাস উৎপাদন। এর জন্যে দরকার হলে তারা হত্যাতেও কুণ্ঠিত হয় না। রাজস্থানের এক গ্রামে এক তথাকথিত ডাইনি নিজের

শক্তি দেখাতে কী করেছিল শুনুন। বশীকরণ, তাড়ন, মারণ, উচাটন ইত্যাদি প্রাচীন ভারতীয় ডাকিনীবিদ্যার কথা আশা করি আপনার জানা আছে। একটা লোক তার শত্রু নিপাতের জন্যে সেই ডাইনিকে ধরল। তখন ডাইনি করল কী, মারণমন্ত্রের অনেকরকম তুকতাকের ভড়ং করল। কিন্তু কার্যত সে সেই ভিকটিমের বাড়িতে রাতের অন্ধকারে গিয়ে চুপিচুপি তার ছাতুর মধ্যে বিষ মাখিয়ে এল। ছাতুখোর লোকটার ভোরে ছাতু খেয়ে কাজে যাওয়া অভ্যাস ছিল। যাই হোক, সে এক অদ্ভুত বিষ। লোকটা ক্রমশ পেটের অসুখে মারা পড়ল। চাউড্রি, আদিম যুগের লোকেরা অদ্ভুত সব বিষের সন্ধান রাখে—আজকের চিকিৎসাবিজ্ঞান তা কল্পনাও করতে পারে না। আপনি যান আফ্রিকার জঙ্গলে, কিংবা অস্ট্রেলিয়া, কিংবা দক্ষিণ আমেরিকার আমাজনের জঙ্গলে—দেখবেন, আদিম অধিবাসীরা কতরকম আশ্চর্য বিষের সন্ধান রাখে। তা মডার্ন চিকিৎসাবিজ্ঞানে হেঁয়ালির সৃষ্টি কববে।

মনে পড়ে গেল কর্নেলের মুখে শোনা প্যাথোজেন এবং নাটেমার কথা। প্যাথোজেন তো একালের আবিষ্কার, কিন্তু নাটেমা দক্ষিণ আমেরিকার জংলি জিভারো জাতির আবিষ্কৃত বিষ! এত তথ্য জয়সোয়ালজির জানা! আবার ওঁর বুদ্ধিমত্তা ও অভিজ্ঞতার প্রতি শ্রদ্ধায় নুয়ে পড়লুম। বললুম—খুব ইন্টারেস্টিং স্যার। বলুন।

জয়সোয়ালজি দম নিয়ে বললেন—মিসেস মালহোত্রাও আসলে সেই প্রিমিটিভ উইচক্রাফ্‌টের চর্চা করেন। নানা দেশ ঘুরেছেন শুনেছি। ওঁর পক্ষে তেমন কোনও আদিম এবং আমাদের অজ্ঞাত মাবণাস্ত্র জোগাড় করা মোটেও অসম্ভব নয়। রাজস্থানে ডাকিনীবিদ্যাব প্রভূত চর্চা আছে গ্রামাঞ্চলে। কত কেস যে আমি ধরেছি, ইয়ত্তা নেই। একবার একটা কেস ধরলুম। একেব পর এক এলাকাব বাচ্চারা অদ্ভুত একটা রোগে মারা পড়ছে। ডাক্তারবা ব্যতিব্যস্ত। বোগটা ধরতেই পাবছেন না'.

বলেই উনি থেমে গেলেন। কেন থামলেন খুঁজছি, দেখি উনি বাঁদিকে তাকিয়ে বয়েছেন। কিছু লক্ষ করছেন যেন। বাঁদিকে নীচে জঙ্গলেভরা একটা উপত্যকা। আমাব চোখে কিছু পড়ল না। তাই বললুম—আর কদ্দুর স্যার?

জয়সোয়ালজি বললেন, এসে গেছি। সামনের বাঁক ছাড়ালেই দেখতে পাব।

হাঁটতে-হাঁটতে উনি বারবার পিছু ফিরে সেদিকে তাকাচ্ছেন দেখে আর চুপ করে থাকা গেল না। বললুম—কী স্যার?

জয়সোয়ালজি ভুরু কুঁচকে গম্ভীর হয়ে বললেন—চাউড্রি, ওই অধ্যাপক ভদ্রলোককে আপনার কেমন মনে হয়?

—ভালোই। কেন বলুন তো?

—তখন মোহন পারেখের মৃত্যুর ব্যাপারটা বলতে গিয়ে বলা হয়নি। এবার শুনুন। মোহনকে ভূতের পাহাড় থেকে সম্ভবত ওই অধ্যাপকই ধাক্কা মেবে ফেলে দিয়েছিল।

চমকে উঠে বললুম, সে কী।

—এ-কথা কেন মাথায় এসেছে, জানেন? আমার সঙ্গে যতটুকু আলাপ হয়েছে, অধ্যাপক দ্বিবেদী ভীষণ সেকেলে রুচির মানুষ। বিশেষ করে খুব নীতিবাগীশ। ফিল্মের লোকেদের প্রতি ওর প্রচণ্ড রাগ। মোহন পারেখের সম্পর্কে ভীষণ নিন্দে করছিল গতকাল। বলছিল, এবাই দেশটাকে জাহান্নামের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

—বলেন কী।

—হ্যাঁ। বলছিল, মোহন নাকি মেয়েছেলে দেখলেই বাঘের মতো হালুম করে ঝাঁপ দেয়। ঘোঁত ঘোঁত করে হাসলেন জয়সোয়ালজি। ফের বললেন, অধ্যাপক বলছিল, ওই মোহন নাকি কত মেয়ের সর্বনাশ করেছে সংখ্যা নেই। ওর ফাঁসি হওয়া দরকার। মোহনেব নিন্দে করার সময় অধ্যাপকের মুখে আমি একটা ক্রূর অভিসন্ধি লক্ষ করেছিলুম। দেখার পর, ভীষণ অস্বস্তি হচ্ছিল।

—কিন্তু দেখে তো মনে হয় বড্ড নিরীহ ভীতু মানুষ।

—কার পেটে কী আছে, বলা কঠিন। চেহারা দেখে কি খুনি চেনা যায় চাউড্রি?...বলে উনি চুপ করে গেলেন হঠাৎ, ফের নীচের উপত্যকায় কী দেখলেন।

বাঁকের কাছে এসে মুখ খুললেন—দেখুন চাউড্রি, নীচের ওই জঙ্গলে মনে হচ্ছে, অধ্যাপককে দেখছিলুম।

হৃৎপিণ্ডে খিল ধরে গেল অজানা ভয়ে, বললুম, অ্যাঁ! অধ্যাপক?

—সেইরকম মনে হল। ব্যাটা গতিক বুঝে সারদা পেরিয়ে নেপালের দিকে কেটে পড়ার মতলব করেনি তো?

—কিন্তু পুলিশ যে সবাইকে চোখে-চোখে রেখেছে?

জয়সোয়ালজি রেগে গিয়ে বললেন, খান্নার পুলিশকে আর পুলিশ বলবেন না চাউড্রি! ওতে একটা বিরাট গৌরবোজ্জ্বল ট্র্যাডিশনকে অপমান করা হয়! এই যে আমি বা আমরা দুজনে চলে এলুম, এখন দিব্যি পালাতে পারি—কে দেখছে?

ঘাবড়ে গিয়ে বললুম—আমাদের পালাবার কোনও কারণ নেই স্যার!

—নিশ্চয়ই নেই। কিন্তু ডিসিপ্লিন ইজ ডিসিপ্লিন!

—সত্যি, পুলিশ আজকাল বড্ড নিষ্ক্রিয়।

কথাটা বলার পরই লক্ষ করলুম, সামনে পূর্বে বিশাল খোলামেলা আকাশ—নীচে বিরাট একটা নদী। প্রচণ্ড বেগে স্রোত বয়ে যাচ্ছে। ওপারে নেপালের পাহাড় রোদে ঝলমল করছে। কিন্তু খান্না ঠিকই বলেছিলেন, দুরন্ত খাড়া ওইসব পাহাড়। নদীর গা ঘেঁষে সোজা দেওয়ালের মতো উঠে গেছে হাজার-হাজার ফুট উঁচুতে। নদীর স্রোতেও অজস্র গাছ ভেসে যাচ্ছে দেখলুম। ডাইনে দূরে প্রচণ্ড জলকল্লোল শোনা যাচ্ছিল। জয়সোয়ালজি বললেন, জলপ্রপাত আছে ওখানটায়। ওই দেখুন, কেমন ধোঁয়া হয়ে রয়েছে! ওগুলো আস্ত মেঘ।

আমাদের পায়ের কয়েক গজ তফাতে ধস নেমেছে। নদীগর্ভ পর্যন্ত খাড়া দেওয়ালের মতো নেমে গেছে এই পাহাড়টা। বাঁ-দিকের উপত্যকা থেকেও একটা পাহাড় উঠেছে নদীর ধার অবধি। এই পাহাড় দুটোর মধ্যে এক গভীর খাদ। তলার দিকে তাকানো যায় না।

মিনিট দশেক চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকার পর ঘড়ি দেখলেন জয়সোয়ালজি। তারপর বললেন, চলুন, ফেরা যাক। নেপাল হয়ে যাওয়া দেখছি সত্যি অসম্ভব। তবে খান্নাটা পরের মুখে ঝাল খেয়েই বলছিল, তা আমি হলফ করে বলতে পারি।

আবার ফেরা শুরু হল। এবার উনি বেশ খানিকটা গম্ভীর। কিছুদূর আসার পর ডাইনে সেই উপত্যকার দিকে জীবজন্তুদের একটা চলার পথ নেমে গেছে যেখানে, সেখানে এসেই আচমকা জয়সোয়ালজি বললেন—চাউড্রি, চলে আসুন তো!

তারপর ওই ঢালু পথ বেয়ে পাহাড়ি বাঘের মতো দৌড়ে নামতে শুরু করলেন জয়সোয়ালজি। আমি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে ওঁকে অনুসরণ করার চেষ্টা করলুম। ঘুরে-ঘুরে পথটা নীচে নেমেছে। দু-ধারে ঝোপঝাড় আর বড়-বড় গাছ। পাথরও ছড়িয়ে রয়েছে সবখানে। একটা বাঁকে গিয়ে ওঁকে হারিয়ে ফেললুম। তখন চাপা গলায় ডেকে উঠলুম—জয়সোয়ালজি! জয়সোয়ালজি!

সামনে কোথাও ঝোপের ওপাশ থেকে আওয়াজ এল—শাট আপ।

ধমক খেয়ে ঢোঁক গিললুম। তারপর এগিয়ে গিয়ে দেখি, উনি একটা বড় পাথরের আড়াল থেকে নীচে কী লক্ষ করছেন। কাছে গেলে ঠোঁটে আঙুল রেখে চুপ করতে ইশারা করলেন।

কাছে গিয়ে সেদিকে তাকিয়ে কয়েক মুহূর্ত বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে থাকলুম। অধ্যাপক অরিন্দম দ্বিবেদী!!

তা হলে সত্যিই এই জাঁদরেল পুলিশকর্তার ধুরন্ধর দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে পারেননি ভদ্রলোক। কিন্তু এখানে কী করতে এসেছেন? সারদা পেরিয়ে নেপালের দিকে পালানোর মতলবে নয় তো?

নিশ্চয়। তা ছাড়া আর কোনও কারণ থাকতে পারে না।

কিন্তু উনি স্রেফ খালি হাতে এসেছেন। পরনে যথারীতি ঢোলা পাতলুন, জগঝম্প গলাবন্ধ শেরোয়ানিজাতীয় কোট। ওই বেশে কি সাঁতার দিতে পারবেন ভদ্রলোক?

দেখলুম, অধ্যাপক একটা প্রকাণ্ড ওক গাছের গুঁড়ির আড়ালে লুকিয়ে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছেন। তা হলে আমাদের দেখতে পেয়েছেন নির্ঘাত। কিন্তু উনি যেভাবে দাঁড়িয়েছেন, আমরা ওঁকে পুরোপুরি দেখতে পাচ্ছি।

জয়সোয়ালজি এবার শিকারি বাঘের মতো গুড়ি মেরে বসে পড়লেন। দেখাদেখি আমিও বসলুম। তখন উনি ফিসফিস করে বললেন—আপনি বাঁ-দিক ঘুরে ব্যাটাকে ঘিরে ফেলুন, আমি ডানদিক ঘুরে যাচ্ছি। সাবধান, যেন ও দেখতে না পায়।

কথামতো আমি গুড়ি মেরে, কখনও বুকে হেঁটে, পাথর আর ঝোপঝাড়ের আড়ালে এগোতে শুরু করলুম। জয়সোয়ালজিও ডানদিকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আর যেই ওঁকে ফের দেখতে গেছি, অমনি পা হড়কে সড়সড় কবে একেবারে গড়াতে-গড়াতে গিয়ে অনেকটা নীচে পড়লুম। তারপর পোশাক থেকে ধুলোমাটি খড়কুটো ঝাড়তে-ঝাড়তে তাকিয়ে দেখি ওক গাছটা ফাঁকা। জয়সোয়ালজি গুম হয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে। কাছে গেলে বললেন।—পালিয়েছে! ব্যাটা অসম্ভব ধূর্ত।...

ছয় ঃ ভূতের পাহাড়ে সাইরেন

সেদিন বিকেল নাগাদ আমার সব অভিমান জল করে দিয়ে গোয়েন্দাপ্রবর বিছানার পাশে বসে আমাব হাত ধবলেন এবং বললেন, জয়ন্ত ডার্লিং! এবার আমরা যথারীতি বেড়াতে বেরবো। আশা করি, একপ্রস্থ চমৎকার স্যুট তুমি পববে। পশ্য, পশ্য! বাইবে কী চমৎকাব দৃশ্যরাজি! এ বুড়োর মনেও আজ বং ধবেছে।

ভালো করে তাকিয়ে দেখি, কর্নেল যেন কোনও উৎকৃষ্ট হোটেলের জাঁকালো পার্টিতে চলেছেন! বাটনহোলে একটি লাল গোলাপও গুঁজেছেন। সবিস্ময়ে বললুম, অস্যার্থ?

—ডার্লিং! প্রকৃতির কাছ থেকেই তো মানুষ সবকিছু শিখেছে! এমন কিছু দেখাতে পারবে না—যার মূল আইডিয়ার জন্য প্রকৃতির কাছে মানুষ ঋণী নয়। সুতরাং, যদি তোমার চোখ থাকে এবং মাথার ধূসর পদার্থবিশেষে কোনও সৌন্দর্যবোধ থাকে, তাহলে দেখবে এই ডিসকমিউনিকেটেড বাণেশ্বরের প্রকৃতি সমস্ত ধ্বংসযজ্ঞের পর আবার কী নতুন সাজে সেজেছেন! লুক—জাস্ট লুক!

জানলা দিয়ে তাকিয়ে অভিভূত হয়ে গেলুম। রাতের ঝড়বৃষ্টির পর অনেকদিনের মালিন্য ধুয়ে-মুছে চারপাশে এক উজ্জ্বল বর্ণসমারোহ জেগে উঠেছে। দুপুর অবধি অতটা লক্ষ করিনি। কারণ, জয়সোয়ালজির যুক্তি এবং অধ্যাপকের কাণ্ড নিয়ে যথেষ্ট বিপর্যস্ত ছিলুম। এখন উঠে কোনও কথা না বলে তাড়াতাড়ি সেজে নিলুম।

কর্নেল সেই অবসরে পাশের ঘরে গেলেন—অবশ্যই জয়ন্তীর খোঁজে। আমি যখন কর্নেলের দেখাদেখি বাটনহোলে ফুলদানি থেকে একটা গোলাপ তুলে নিয়ে গুঁজছি, উনি ফিরে এসে বললেন, চমৎকার জয়ন্ত! অপূর্ব দেখাচ্ছে তোমাকে!

—জয়ন্তী যাচ্ছেন তো?

কর্নেল হাসলেন।—জয়ন্তীর কথা তুমি জিগ্যেস করবে, জানি। কিন্তু খুবই দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি বন্ধু, শ্রীমতী জয়ন্তী তাঁর ঘরে নেই।

—মেয়েটার সাহস তো বড্ড! একা কোথায় বেরলো?

—স্ত্রীলোকের গতিবিধির খবর দেবদূতরাও টের পান না। যাকগে, জয়ন্ত, এ নিয়ে দুঃখ

করো না। চলো, এই বুড়োই আজ তোমাকে চাঙ্গা রাখবে।

কপট রাগ দেখিয়ে বললুম, জয়ন্তীর জন্যে আমার বয়ে গেছে! ওর ঘরে আজ কে কীসব খোঁজাখুঁজি করেছিল, সেজন্যেই আমার মাথাব্যথা।

কর্নেল মৃদু হেসে বললেন, মাথা ব্যাথায় কোনও লাভ নেই, বন্ধু। চলো, আমরা রওনা দিই!

সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় ম্যানেজার শিবপ্রসাদের সঙ্গে দেখা হল। কর্নেল বাও করে বললেন, গুড আফটারনুন প্রসাদজি!

—গুড আফটারনুন, স্যার! আপনার কাছেই যাচ্ছিলুম।

—বলুন।

—মিস রায়ের ঘরে আজ যে ঢুকেছিল বা জিনিসপত্র হাতড়েছে, তাকে আমাদের বেযাবা হরিয়া দেখেছে স্যার! কিন্তু ওর কথা বিশ্বাস হচ্ছে না।

—তাই বুঝি? কে সে?

—প্রফেসর দ্বিবেদী।

কর্নেল হো-হো করে হেসে উঠলেন। আমি হতভম্ব হয়ে গেলুম। বললুম—প্রফেসর দ্বিবেদী জয়ন্তীর ঘরে ঢুকেছিলেন? সে কী?

শিবপ্রসাদ কী বলতে যাচ্ছিলেন, কর্নেল আমার হাত ধরে টানলেন—ওকে মিঃ প্রসাদ! আপনাকে যথেষ্ট ধন্যবাদ!

—স্যার, যাই বলুন, এটা তো হোটেলেব সুনামের পক্ষে ক্ষতিকর। কাজেই আমি ভাবছি, ভদ্রলোককে ডিবেক্ট চার্জ কবব। কী জবাব দেন, শোনা দরকার।

—প্লিজ মিঃ প্রসাদ! ছেড়ে দিন। আমি অধ্যাপকের সঙ্গে কথা বলে দেখবখন। এ নিয়ে আর উত্তেজিত হবেন না! ব্যাপারটা চেপে যান।

বলে কর্নেল, ম্যানেজার আর আমি নীচে এলুম। লাউঞ্জের শেষপ্রান্ত অবধি আমাদের এগিয়ে দিয়ে গেলেন ম্যানেজার। পথে নেমে বললুম, এ তো ভারি অদ্ভুত ব্যাপার, কর্নেল! অধ্যাপক দ্বিবেদী আরেক কাণ্ডও কবেছিলেন। শুনুন—।

আমাকে বাধা দিয়ে বৃদ্ধ গোয়েন্দা বলে উঠলেন, জয়ন্ত, জয়ন্ত! ব্রিলিয়ান্ট! আজকের পশ্চিম আকাশটা লক্ষ করছ? চলো, আজও আমরা ওই ভূতের পাহাড়ে গিয়ে সূর্যাস্ত দেখব। পা চালিয়ে চলো! কুইক!

এই বলে আমার হাত ধরে সত্যি-সত্যি কুইক মার্চ করে চলতে থাকলেন কর্নেল। চড়াই-উতরাইয়ের রাস্তা। হাঁফ ধরে যাচ্ছিল আমার। অথচ ওঁর যেন এতটুকু পরিশ্রম হচ্ছে না। একসময় বললুম, এত তাড়া তো একটা টাঙ্গা কবে নিলেই হত!

কোনও জবাব পেলুম না। ভূতের পাহাড় সামনে দেখা যাচ্ছিল। এত ছোটাছুটির পর ওই পাহাড়ে উঠতে পারব কি না আমার সন্দেহ হচ্ছিল। বড় রাস্তা ছেড়ে আগের দিন যেখানে উঠতে শুরু করেছিলুম, সেখানে এসে কর্নেল এতক্ষণে মুখ খুললেন।—জয়ন্ত, এবার তোমায়-আমায় কিছুক্ষণের জন্যে ছাড়াছাড়ি হবে।

অবাক হয়ে বললুম, তার মানে?

—তুমি কালকের চেনা পথ ধরে চূড়োয় উঠবে। আমি উত্তরদিকটা ঘুরে উঠতে চাই। কোনও ভয় নেই বৎস! সূর্যের আলো থাকতে ভূতরা আক্রমণ করবে না। নেহাত যদি করে বসে, আশা করি আত্মরক্ষা করতে পারবে। ওকে?

—কিন্তু ব্যাপারটা কী?

—কিচ্ছু না। জাস্ট এ গেম—চিলড্রেন্‌স গেম! দেখো জয়ন্ত, মাঝে-মাঝে শিশু হয়ে যাওয়ার মতো নির্মল আনন্দ আর কিছুতে নেই! ওতে বয়েস কমে যায়। আচ্ছা, অ'রিভোয়া!

অর্থাৎ আবার দেখা হবে, বিদায়! বুড়ো ধীরে-সুস্থে পাহাড়ের ঢালু গা বেয়ে উত্তর দিকে এগোলেন। আমি সেই চেনা জায়গাগুলো পেরিয়ে পাহাড়ের পুবগায়ে চড়া শুরু করলুম। ঝরনা ডাইনে রেখে বড়-বড় গাছগুলোর ভেতর দিয়ে একটু এগোতেই চোখে পড়ল একটা পাথরের আড়ালে কী যেন নড়ে উঠল। অমনি গা শিরশির করে উঠল। হৃৎপিণ্ডে একটা অস্থিরতা জাগল। এ পাহাড়ের নাম ভূতের পাহাড় যখন, তখন নিশ্চয় কিছু অদ্ভুত ঘটনা লোকে এখানে ঘটতে দেখেছে। এখন কথা হচ্ছে, পাথরের আড়ালে একটা কিছু নড়তে আমি দেখেছি। কী হতে পারে সেটা? জন্তুজানোয়ার নয় তো? সূর্য পাহাড়ের ওপাশে নেমে গেছে। এপাশটা তাই ইতিমধ্যে বেশ ছায়া-ছায়া হয়ে পড়েছে। তাতে ঘন গাছপালা থাকায় দৃষ্টি বাধা পাচ্ছে এবং গাছের তলায় আবছা অন্ধকারও জমে রয়েছে। থমকে দাঁড়িয়ে দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করলুম। মিনিটখানেক পরে বুঝলুম, পাথরের ওপাশে একটা জ্যান্ত কিছু অবশ্যই আছে এবং সেটা আবার নড়ল।

এক মুহূর্ত ইতস্তত করে পকেট থেকে বিপদ-আপদের সঙ্গী রিভলভারটা বের করলুম। গুলি পোরা ছিল না। সুতরাং অস্ত্রটা আঘাত হানাব জন্য তৈরি করে নিতে বেশ সময় লাগল। অবশ্য, অটোমেটিক রিভলভার। পরপর পাঁচবার গুলি ছোড়া যায়। দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার পক্ষ থেকে সেবার এক দুর্দান্ত আন্তর্জাতিক স্মাগলিং চক্র ধরে দেওয়ার পুরস্কারস্বরূপ সরকার আমাকে এই অস্ত্রের লাইসেন্স দিয়েছিলেন।

এবার পা টিপে-টিপে এগোলুম সেদিকে। জায়গায়-জায়গায় পাথব থাকায় বাধা পাচ্ছিলুম। তবে ঢালু বলে উঠতে অসুবিধে হচ্ছিল না। হাত দশেক ডাইনে ঘুরে এবার পাথরটার সোজাসুজি পৌঁছুলুম। পবক্ষণে অবাক হয়ে গেলুম। জয়ন্তী!! এ যে জয়ন্তী!!

এত অবাক যে অন্তত এক মিনিট হাঁ করে তাকিয়ে বইলুম ওর দিকে। কিন্তু ওকী করছে সে? হেঁট হয়ে একটা কিছু করছে—তার ফলে ওব শরীরটা ঝাঁকুনি খাচ্ছে। হ্যাঁ, এই নাড়াচাড়াটাই আমাব চোখে পড়েছিল বটে।

পা টিপে-টিপে এগিয়ে গিয়ে দেখি, সে একরাশ নুড়িপাথর নিয়ে যেন খেলা করছে। এই পাহাড়ের খাঁজ মতো জায়গায় ওইরকম অজস্র নুড়ি-পাথর জমে থাকতে দেখেছি। সম্ভবত বৃষ্টির সময় যখন পাহাড়ের গা বেয়ে জল গড়ায়, তখন মাটি ধুয়ে যাওয়ার ফলে ছোট-ছোট পাথরের টুকরো নেমে এসে খাঁজগুলোতে আটকে থাকে। যুগ-যুগ ধরে এইরকমটি ঘটে এসেছে এবং বৃষ্টিধারা ও বাতাসের আঘাতে পাথরগুলো মসৃণ হয়ে উঠেছে।

কিন্তু এই জনমানুষহীন ভুতুড়ে পাহাড়ে একা জয়ন্তী কি ওই ছেলেখেলা করতেই এসেছে? বিশেষ করে প্রেতশক্তিতে তার বদ্ধমূল বিশ্বাস আছে—তা ছাড়া তার একমাত্র অন্তরঙ্গ বন্ধু ও সাথী এই দূব প্রবাসে ওইভাবে ভয়ংকর মৃত্যু বরণ করেছে, এত কাণ্ডের পরও কী সাহসে সে এখানে একা এল?

ওকে চমকে দেওয়ার ইচ্ছে ছিল না। তাই জুতোয় সামান্য শব্দ করলুম। কিন্তু সে এত তন্ময় যে তা টেরও পেল না। তখন একটু কেশে উঠলুম।

এবার সে সাঁৎ করে ঘুরল এবং উঠে দাঁড়াল। পরক্ষণে তার মুখে অপ্রস্তুত হাসি ফুটে উঠল। সে হাত দুটো ঝাড়তে-ঝাড়তে বলল—বাব্বা! আমি ভাবলুম বুঝি অধ্যাপক দ্বিবেদী!

এ কথায় আরও অবাক হয়ে বললুম—ওঁর বদলে শ্রীমান জয়ন্ত চৌধুরী! কিন্তু হঠাৎ ওই নিরীহ ভদ্রলোকের কথাই বা ভাবলেন কেন বলুন তো?

জয়ন্তীকে নার্ভাস দেখাচ্ছিল। বলল—আমি আসার একটু আগে দূর থেকে ওঁকে উঠতে দেখেছিলুম। আপনার সঙ্গে দেখা হয়নি?

—না তো!

জয়ন্তী পা বাড়িয়ে বলল—চলুন, ওপরে যাই। আজও সূর্যাস্ত দেখা যাক।

—চলুন।

একটু পরেই জয়ন্তী অদ্ভুত কৌশলে আমাকে ছাড়িয়ে কত সহজে অনেকটা ওপরে ওঠে গেল। ওর পক্ষে এ অবশ্য স্বাভাবিক। পাহাড়ে চড়ায় ওর দক্ষতা আছে। ওপর থেকে সে ঘুরে ডাকল আমাকে।—তাড়াতাড়ি আসুন। সূর্য ডুবে যাবে যে।

চুড়োয় যখন উঠলুম, তখন যথারীতি হাঁপাচ্ছি। হাঁপ সামলানোর পর জয়ন্তীর কাছাকাছি এগিযে বসে পড়লুম। তারপর বললুম—ওখানে কী করছিলেন জয়ন্তী দেবী?

জয়ন্তী পশ্চিমে মুখ ফিরিয়ে বসেছিল। একটু চমক লক্ষ করলুম ওর মুখে। কিন্তু নিস্পৃহ কণ্ঠস্বরে বলল, ওঠার পথে এমন সুন্দর নুড়িগুলো দেখলুম। অমনি বালিকাসুলভ খেয়াল জেগে উঠল।

—তা হলে বলব, আপনি নিশ্চয় বাল্যজীবনটা গ্রামেই কাটিযেছেন?

—ঠিক তাই। একেবারে অজ পাড়াগাঁয়ে। কিন্তু এ প্রশ্ন কেন?

—শহরের মেয়েদের বাল্যজীবনে ধুলোপাথর নিয়ে খেলা সম্ভব নয়, তাই!

—আপনি গোয়েন্দার উপযুক্ত শিষ্য জয়ন্তবাবু!...বলে জয়ন্তী এবাব হালকা ভঙ্গিতে হেসে উঠল।

সিগারেট ধরিয়ে বললুম—তা হঠাৎ একা-একা বেরিযে পড়লেন যে। কর্নেল আসবাব সময় আপনার ঘরে গিয়ে খুঁজেছিলেন আপনাকে।

—কর্নেল সায়েব এসেছেন নাকি? কোথায় তিনি?

—এই পাহাড়ের নীচে দুজনের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়েছে। তারপর তাঁর খবর এ পর্যন্ত পাইনি।

হঠাৎ জয়ন্তী পশ্চিমে একটু ঝুঁকে নীচের দিকে তাকিয়ে রইল। তাবপর চাপা গলায বলল, দেখুন তো জয়ন্তবাবু, ওই যে নীচেব খাড়াই পাথরের মাথায় ছোট্ট চাতালে, ওই লোকটা কে?

ওর নির্দেশমতো ঝুঁকে দেখি পাহাড়ের পশ্চিম ঢালে খাড়া দেওয়ালের নীচে অন্তত তিনশো ফুট দূরত্বে জয়সোয়ালজি দাঁড়িয়ে আছেন—একা। অবাক হয়ে বললুম—সর্বনাশ! ওখানে পৌঁছলেন কীভাবে ভদ্রলোক?

জয়ন্তী বলল, জানেন? ওখানেই মোহন পারেখকে কেউ ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছিল। আরও একটু ঝুঁকলে ব্যাপারটা টের পাবেন। কিন্তু সাবধান, মাথা ঘুরে যাওয়ার চান্স আছে।

বাপ্‌স! সেই অতল খাদের শূন্যতার কোনও তুলনা হয় না! সত্যি মাথা ঘুরে যাওয়ার দশা হল। সামলে নিয়ে সরে এলুম। বললুম—ওই খাদে পারেখজিকে ফেলে দিয়েছিল তা আপনি কীভাবে জানলেন?

জয়ন্তী চোখ নামিয়ে একটু হাসল—গোয়েন্দা সায়েবের শিষ্য তা হলে আমার দিকে সবসময় কড়া নজর রেখেছেন, বলুন?

ওর ওই কটাক্ষ আর হাসিতে যৌবনের উগ্র ঝাঁজ ছিল। পলকে আড়ষ্ট হয়ে বললুম, ছি, ছি! কী যে বলেন! জাস্ট একটা কৌতূহল। কারণ আমিও জানি না, কোন খাদে পারেখজির বডি পাওয়া গেছে।

জয়ন্তী হয়তো বিশ্বাস করল আমার কথা। বলল, আজ সকালে যখন আপনি ঘুমোচ্ছিলেন, কর্নেলসায়েবের সঙ্গে আমি আপনার প্রক্সি দিয়ে বেড়িয়েছি, তা জানেন কি?

—তাই বলুন। আমি ভাবলুম...।

জয়ন্তী চাপা দুষ্টুমি করে ব্যস্তভাবে বলল, বলুন, বলুন। ভাবলেন যে আমিই পারেখজিকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছিলুম!

ওর চোখে চোখ রেখে বললুম, আপনি তা পারেন জয়ন্তী।

জয়ন্তীর চোখ দুটো জ্বলে উঠল।—পারি মানে?

প্রেমিকের আবেগ এসে গেল আমার কণ্ঠস্বরে।—পাবেন। যেমন—এ মুহূর্তে মনে হচ্ছে আমাকেও কোন অতল খাদে ফেলে দিয়েছেন এবং আমি রক্তাক্ত হয়ে ধুঁকছি!

জয়ন্তী কথাটা বুঝল। কিন্তু অভিনয়টা ধরতে পারল না। তাই অমনি মুখটা লাল হয়ে উঠল। সে একটু ঘুরে গিয়ে বলল, আমার কি অত সাহস বা শক্তি আছে? সামান্য মেয়ে আমি।

—আপনি অসামান্যা, জয়ন্তী। যত দেখছি আপনাকে, অবাক হচ্ছি।

—কেন শুনি?

—কোনও কৈফিয়ত দিতে পারব না। তবে আমার এই অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণ আমার বৃদ্ধ বন্ধুটির চোখ এড়ায়নি। আজ শ্রীমতী মালহোত্রার ঘরে উনি আমাদের কী বলে সম্ভাষণ করেছিলেন, মনে পড়ছে?

জয়ন্তী সুন্দর হেসে অস্ফুটস্বরে বলল, জয়জয়ন্তী।

আমার সংকল্প ছিল যে সুযোগ পেলে হাতের চেটো নিতে কার্পণ্য করব না। বিশেষ করে এই নির্জন পাহাড়ের চূড়া, পশ্চিমে চমৎকার একটা অস্তরাগ, এবং এই যুবতী মেয়েটি মিলে আমার মধ্যে একটা হঠকারিতার উপদ্রবও সৃষ্টি করছিল। তাই খেলার ছলে ওর হাতের চেটো নিলুম, কী প্রতিক্রিয়া হবে জানতুম না, একটা রিস্ক নিতে হল বইকী—কিন্তু আশ্চর্য, জয়ন্তী চুপ করে থাকল। এবার ওকে চাপাস্বরে ডাকলুম—জয়ন্তী?

—উঁ?

—আপনি আমাকে গোয়েন্দার শিষ্যটিষ্য বলবেন না, প্লিজ।

জয়ন্তী ঘুরে সুন্দর হাসল আবার।—তবে কী বলব?

—মিতা।

—কারণ?

—কারণ দুজনের একই নাম।

এই সময় সূর্য ডুবে যাচ্ছিল। সেই রাঙা আলোয় জয়ন্তীকে বড় সুন্দর দেখাল। আরও একটু হঠকারিতায় আমি তাকে মৃদু আকর্ষণ করলুম, জয়ন্তী বাধা দিল না। এবার ওর মুখের দিকে ঝুঁকে চুমু খাওয়ার জন্যে যেই মুখ নামিয়েছি, পিছনে কোথায় কর্নেলের কাশির শব্দ আর সম্ভাষণ শুনতে পেলুম।—গুড ইভনিং জয়ন্ত, গুড ইভনিং জয়ন্তী!

দুজনে ছিটকে দু-পাশে সরে গেলুম তক্ষুনি। জয়ন্তী আমার দিকে কপট ক্রোধে একটু কটাক্ষ করল। ঘুরে দেখি, উত্তরের ঝোপের ডগায় কর্নেলের টুপি দেখা যাচ্ছে। বাহাত্তুরে বুড়ো! মনে-মনে ওঁর মুন্ডুপাত করতে-করতে উনি এসে গেলেন।

বেরোবার সময় শরীরের কোথায় বাইনোকুলার আর ক্যামেরা লুকিয়েছিলেন জানি না, এখন দেখি সুদৃশ্য ইভনিং স্যুটের ওপর বেখাপ্পা হয়ে ওই জিনিস দুটো ঝুলছে। বোঝা গেল, ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানতে ছাড়ে না!

—যাকগে, জয়জয়ন্তী তা হলে পর্বতশীর্ষে। ব্র্যাভো! ওয়ান্ডারফুল!...বলে বুড়ো কাছের পাথরের চাতালে পা ঝুলিয়ে বসলেন।

জয়ন্তী অপ্রস্তুত অবস্থায় ছিল। এবার বলল, আপনি কি উত্তর দিক হয়ে উঠলেন?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু ওদিকটা যে ভীষণ খাড়া।

—তাতে কী? ওঠার একটা গোপন পথ আমি আবিষ্কার করেছি। ওই পথে মোড় নিয়ে ওই নীচের খাদের চাতালে যাওয়া যায়—যেখানে এখন মিঃ রঘুবীর জয়সোয়াল রয়েছেন।

বলে কর্নেল বাইনোকুলারটা চোখে নিয়ে কিছুক্ষণ জয়সোয়ালকে দেখলেন।

জয়ন্তী বলল, আমরা অনেক আগেই দেখেছি ভদ্রলোককে। ওখানে কী করছেন উনি?

আমি বললুম, রিটায়ার্ড পুলিশ সায়েব তদন্ত করতে গেছেন।

কর্নেল হেসে উঠলেন।—তবে তদন্ত করতে আরও অনেকে এখন এই ভূতের পাহাড়ে চড়েছেন মনে হচ্ছে।

জয়ন্তী চমকে উঠে বলল, আর কে?

—মিসেস মালহোত্রা আর অধ্যাপক অরিন্দম দ্বিবেদী। ভদ্রমহিলা আছেন একেবারে খাদের তলায়। তাই খালি চোখে ওঁকে দেখা কঠিন। আর অধ্যাপক আছেন জয়সোয়ালজির অন্তত একশো ফুট নীচে একটা খোঁদলে।

বললুম, মিসেস মালহোত্রা খাদে কী করছেন? সর্বনাশ! অবসেসনের অবস্থায় ওখানে চলে যাননি তো?

জয়ন্তী বলল, অধ্যাপকমশায়ই বা খোঁদলে কী করছেন?

কর্নেল গম্ভীর হয়ে বললেন, মনে হচ্ছে, প্রত্যেকেই ব্যস্ত হয়ে খোঁজাখুঁজি করছেন যে পরপর এই দুটো হত্যাকাণ্ডের পিছনে সত্যি-সত্যি কী ব্যাপার আছে?

বললুম, তার মানে, মিসেস মালহোত্রাও প্রেতের হাতে মৃত্যু সম্পর্কে নিঃসন্দিগ্ধ নন?

কর্নেল বললেন, এ ছাড়া আর কিছু ব্যাখ্যা দিতে পারছিনে, জয়ন্ত। যাকগে, এখন সূর্যাস্তের প্রতি আমাদের দৃষ্টি ফেরানো উচিত নয় কি? দেখো তো, কত পবিত্র, কত মহান এক ঐশ্বরিক প্রকাশ ওই প্রাকৃতিক রূপ। বৎস জয়ন্ত, বৎসে জয়ন্তী, এখন আমরা কিছুক্ষণের জন্যে সবরকম পার্থিব কলুষতা ভুলে যাই এসো। ওই দিব্য আলোর মধ্যে জীবনের গভীর আনন্দ খুঁজে নিই।...

বসে থাকতে-থাকতে শিগগির সন্ধ্যার অন্ধকার এসে গেল। ভারতের সমতলে আমরা সূর্যাস্তের পরও বেশ কিছুক্ষণ যে অপূর্ব শান্ত আলো দেখি অর্থাৎ যাকে বলা হয় গোধূলিকাল, এইসব উঁচু পাহাড়ি এলাকায় তার নামমাত্র নেই। খুব শিগগির রাত্রি এখানে হানা দেয়। তবে আমরা একটা পাহাড়ের মাথায় বসে আছি বলে নীচের দিকটা যখন ঘোর কালো ছায়ায় ঢেকে গেছে, এখানে তখন সামান্য আবছা ধরনের আলো ছিল। জয়ন্তী এবার বলে উঠল—নামতে অসুবিধে হতে পারে। এখন ফেরা যাক, কী বলেন কর্নেল?

কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন হঠাৎ। তারপর বললেন—প্লিজ জয়ন্তী, আর একটুখানি তোমাদের আটকে রাখতে চাই। আমি ফেরা না অবধি তোমরা দুজনে অপেক্ষা করো, এই আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ।

বুড়োর কথা বলার ধরনই ওইরকম। বললুম—আবার কোথায় যাবেন?

—একটুখানি দরকার আছে। কোনও প্রশ্ন করো না, জয়ন্ত।

জয়ন্তী বলল, আপনি কি ওঁদের কারও সঙ্গে আলাপ করতে যাচ্ছেন?

কর্নেল একটু হেসে বললেন, তুমি বুদ্ধিমতী জয়ন্তী। আমি জয়সোয়ালজির কাছেই যাচ্ছি। আর জয়ন্ত, তোমাকে আরেকটা কথা বলতে চাই। মন দিয়ে শোনো।

—বলুন।

—আমি চলে যাওয়ার পর প্লিজ, একটুখানি কান তৈরি রেখো। যদি আমার কোনও ডাক শোনো, তক্ষুনি চেঁচিয়ে সাড়া দেবে এবং শব্দ লক্ষ করে দৌড়ে যাবে। কেমন?

আমার গা শিউরে উঠল। ব্যাপার কী? কিন্তু জানি, খুঁটিয়ে কোনও জবাব এখন উনি দেবেন না। তাই বললুম—ঠিক আছে।

—আশা করি তোমার দুটো কানই সম্পূর্ণ সুস্থ, জয়ন্ত?

—নিশ্চয় সুস্থ।

—তবু বলছি, অতিরিক্ত আত্মপ্রত্যয় মানুষকে অনেক সময় ঠকায়। তাই দরকার হলে এই যুবতীটির কানের প্রতি নির্ভর করবে। জয়ন্তী, তুমি কী বলো?

জয়ন্তীও এই দায়িত্ব পেয়ে খুশি হল যেন। বলল, দেখুন কর্নেল, পর্বতাভিযানে আমাদের কানই সবসময় বড় সহায়। সামান্য শব্দ থেকে আঁচ করতে হয়, কোথাও ধস নামতে যাচ্ছে কি না, কিংবা তুষারঝড় আসছে কি না।

কর্নেল খুব উৎসাহী হয়ে বললেন, এক্সেলেন্ট! এটা আমি ভাবিইনি। ওক্কে বন্ধুগণ, অ রিভোয়া!

উনি যেপথে উঠে এসেছিলেন, অর্থাৎ উত্তরদিকে, ঝোপঝাড় ঠেলে দ্রুত অদৃশ্য হলেন! তারপর আমার অস্বস্তি হতে থাকল। কেন অতক্ষণ ধরে কান নিয়ে অত কথা বললেন কর্নেল? এখন মুশকিল হচ্ছে, এখানে প্রচণ্ড জোরে দক্ষিণের বাতাস বইছে। ক্রমশ বাতাসটা বেড়েও যাচ্ছে। এ অবস্থায় উত্তরের কোনও শব্দ শুনতে পাওয়া অসম্ভব নয় কি? কথাটা এতক্ষণে মাথায় এল। তা ছাড়া উনি গেলেন উত্তরের খাড়াইয়ে নীচের দিকে। ওখান থেকে কোনও চিৎকার শোনা যাবে কি না সন্দেহ আছে।

কথাটা জয়ন্তীকে বলতে সে বলে উঠল, তাই তো। চলুন, আমরা এগিয়ে উত্তরের খাড়াইয়ের মাথায় কোথাও বসি।

দুজনে এগিয়ে গেলুম। এই সময় টের পেলুম, বাতাসটা জোর বেড়ে গেছে। সোজা দাঁড়িয়ে থাকা যেমন কঠিন, পা বাড়ানোও তাই। তায় ঘন রিঙ্গেল ঝোপে ভর্তি জায়গাটা। ঝোপে ঢুকতে গিয়ে জয়ন্তী বলল, কী কাণ্ড! আমরা নিশ্চয় কেউ টর্চ আনিনি?

অস্বস্তি বেড়ে গেল সঙ্গে-সঙ্গে। টর্চ আনার কথা মাথায় আসেনি। কিন্তু কর্নেলের কাছেও তো টর্চ আছে বলে মনে হল না। ঘাড় নেড়ে জবাব দিলুম—নাঃ।

অবশ্য ও বুড়োর কথা আলাদা। উনি এক অলৌকিক প্রাণী বলা চলে। এই সময় আরও মনে হল, এসব পাহাড়ে নাকি অজগর, শঙ্খচূড় আর চন্দ্রবোড়া সাপের খুব উৎপাত আছে। এ কী মুশকিলে ফেলে গেল বুড়ো। পাছে সাপের কথায় জয়ন্তী আঁতকে ওঠে, ওকে কিছু বললুম না।

কিন্তু ওর সাহসের পরিচয় পেয়ে ততক্ষণে অবাক আমি। দিব্যি রিঙ্গেল ঝোপের ভিতরে ঢুকে গেল জয়ন্তী। তারপর ডাকল—চলে আসুন শিগগির।

পুরুষমানুষের আঁতে লাগল নিশ্চয়। লম্বা পা ফেলে এগিয়ে ওকে ছাড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলুম; তখন জয়ন্তী খপ করে আমার হাত ধরল।—আস্তে মশাই, আস্তে। কখনও পাহাড়ে চড়ার ট্রেনিং নিয়েছেন কি? আমাকে ফলো করুন তা হলে। নয়তো পড়ে গিয়ে ঘাড় ভাঙবেন।

অন্ধকারে ওর চাপা খিলখিল হাসি শোনা যাচ্ছিল। প্রকৃতির সবচেয়ে বিস্ময়কর সৃষ্টি যে নারী, তা এমন করে কখনও টের পাইনি। ওকে মনে হচ্ছিল রহস্যময় এক শক্তি—যা আমাকে কোনও ভয়ংকর বিনাশ অথবা আনন্দময় এক পূর্ণতায় পৌঁছে দিতে চলেছে।

অবশ্য এই আবেগ সামলে নিতে হচ্ছিল। কারণ, সময় ও পরিবেশ প্রেমের অনুকূল নয় এখন। একটু পরেই জয়ন্তী দাঁড়াল। বলল, এই পাথরটায় বসা যেতে পারে। কিন্তু সাবধান, সামনে ঝুঁকবেন না।

অন্ধকারে দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করে টের পেলুম, একটা চ্যাটালো দশ বর্গফুট আন্দাজ পাথর ঝোপের শেষ প্রান্তে উঁচু হয়ে রয়েছে। জয়ন্তীর দৃষ্টিশক্তি যে বিস্ময়কর, তাতে আর সন্দেহ রইল না। আমার হাতটা ছেড়ে দেয়নি সে। টেনে বসিয়ে দিল পাশে। তারপর আমার দিকে ঘুরে কিছু বলতে চেষ্টা করল। সেই সময় ওর শ্বাসপ্রশ্বাসের আশ্চর্য সুন্দর গন্ধ এসে লাগল—আমার সারা মুখে সেই বিচিত্র গন্ধটার ঝাপটানিতে একটা প্রচণ্ড তোলপাড় সৃষ্টি করল। এবার স্থানকাল ভুলে ঝটপট ওকে চুমু খেয়ে ফেললুম। জয়ন্তী আলতো ধাক্কা দিয়ে বলল, যাঃ, এখন অসভ্যতা করে না।

বুঝতে পারছিলুম, অন্ধকারে ও কতখানি রাঙা হয়ে উঠেছে। আমি প্রেমিকের গলায় ডাকলুম—জয়া!

জয়ন্তী হাসল।—আমার ডাকনামটা কীভাবে জানতে পারলে, শুনি?

—গতকাল বিকেলে এখানে শ্যামলী ওই নামে তোমাকে ডেকেছিল।

জয়ন্তী অমনি আমার মুখে হাত চাপা দিল।—চুপ! এখন শ্যামলীর কথা বলো না।

না—শ্যামলী মানেই এক বীভৎস মৃত্যু। এখন ওর স্মৃতি সহ্য করা যাবে না। এই বিচিত্র সময়টা বিস্বাদ হয়ে পড়বে। আমি ওর কাঁধে হাত রেখে বললুম—দেখ জয়া, তোমার হাতে আমার কান দুটোরও জিম্মা দিলুম। কারণ আমি এখন কিছুক্ষণ অন্য জগতে ঢুকে পড়তে চাই। তুমি কিন্তু শুনতে পেলেই আমাকে বলবে!

জয়ন্তী হয়তো হাসল।—উঁহু। আমি তো গোয়েন্দামশায়ের শিষ্য নই। সে দায় তোমার!

ঠিক সেই সময় বাতাসটা ঘুরে গেল এবং এলোমেলো বইতে থাকল। তারপরই আমার চোখ গেল পশ্চিমের আকাশে। ওদিকের কয়েক হাজার ফুট উঁচু পাহাড়গুলোর ওপর কিছু আগেও অনেক নক্ষত্র দেখেছি, এখন তাদের একটাও নেই এবং খুবই কালো মেঘের ব্যাপকতা ঘনিয়ে উঠেছে। তারপর আচমকা বিদ্যুৎ ঝিলিক দিতে দেখলুম। সর্বনাশ! কালকের মতো ঝড় উঠবে নির্ঘাত! জয়ন্তীও বলে উঠল—এই রে! কী হবে?

জয়ন্তীর কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে প্রচণ্ড গর্জন করে উঠল মেঘ। বাতাস একেবারে উলটোদিকে ঘুরল। দেখতে-দেখতে চারপাশের পাহাড় ও জঙ্গলে তোলপাড় শুরু হয়ে গেল। মনে হল, লক্ষ-লক্ষ হাতি হঠাৎ খেপে গিয়ে দৌড়ে আসছে। আবার ভয়ংকর শব্দে মেঘ ডাকল। থরথর করে কাঁপতে থাকল এই পাহাড়টা। তারপরই এসে পড়ল ঝড়।

সেই ভয়াবহ তাণ্ডবের বর্ণনা দেওয়ার সাধ্য আমার নেই। দুজনে দুজনকে শক্ত করে ধরে বসে আছি, তা না হলে ছিটকে পড়ব মনে হচ্ছে। জয়ন্তী ভয়ার্ত স্বরে বলল—জয়ন্ত, আমাদের এখনই এখান থেকে নেমে যাওয়া দরকার। বৃষ্টি শুরু হলেই কিন্তু ধস নামার সম্ভাবনা।

কর্নেলের জন্যে রাগ হল। বললুম—বুড়োর পাল্লায় পড়ে বেঘোরে প্রাণটা যাবে দেখছি। এখন কী করা যায়, বুঝতেও তো পারছিনে! ওঁকে বরং চেঁচিয়ে ডাকি, কী বলো?

জয়ন্তী বলল, হ্যাঁ। তা ছাড়া কোনও উপায় নেই। সাড়া যদি পাও, বলে দাও, আমরা নেমে যাচ্ছি।

ডাকবার জন্যে মুখের কাছে হাত তুলে চোঙ বানিয়েছি, অমনি সে এক অদ্ভুত আর অমানুষিক আওয়াজ শুনতে পেলুম। সঙ্গে-সঙ্গে শরীরের রক্ত হিম হয়ে পড়ল। জয়ন্তী রুদ্ধশ্বাসে বলে উঠল—ও কীসের আওয়াজ? কীসের আওয়াজ জয়ন্ত?

আঁ—উ—উ—উ! আঁ—উ—উ—উ! কতকটা সাইরেনের মতো—বিপদজ্ঞাপক কাঁপা-কাঁপা সুর, কিংবা কোনও গুহার ভেতর কোনও প্রাগৈতিহাসিক প্রাণী যেন ওই দানবীয় ডাক ছাড়ছে।

এদিকে মুহুর্মুহু বাজ পড়ার বিরাম নেই। দূরে একটা দাবানল দেখা গেল পাহাড়ের মাথায়। ঝড়ের ভয়ংকর শব্দে এই পাহাড়টা কেঁপে-কেঁপে উঠছে। মনে হচ্ছে, এই কুখ্যাত পাহাড়ের যুগযুগান্তকালের ভূতপ্রেতের দল যেন জেগে উঠেছে। তারা দল বেঁধে অমানুষিক কণ্ঠে চিৎকার করছে আঁ—উ—উ—উ! আঁ—উ—উ—উ!

আর এক মুহূর্তও এখানে নয়। বললুম—গোল্লায় যাক বুড়ো। জয়ন্তী, ওঠো—কুইক!

জয়ন্তী উঠে পড়ল। আমরা দুজনে সামনে ঝুঁকে হাত ধরাধরি করে সেই ওঠার পথটা অনুমান করে এগিয়ে গেলুম। একখানে ঢালু পেতেই নামতে শুরু করলুম। মাঝে-মাঝে বিদ্যুৎ ঝিলিক দিচ্ছিল। পথ আন্দাজ করতে অসুবিধে হচ্ছিল না। পিছনে ভুতুড়ে আওয়াজটা সমানে শোনা যাচ্ছিল। এবার সেই উঁচু গাছের জঙ্গলের কাছাকাছি আসতেই জয়ন্তী হঠাৎ বলে উঠল—জয়ন্ত, এক মিনিট!

আমার হাত ছেড়ে দিয়ে সে যেন একটা লাফ দিল সামনে। তারপর তাকে অদৃশ্য হতে দেখলুম। অমনি আরও ভয় পেয়ে ডেকে উঠলুম—জয়া, জয়া!

বিদ্যুৎ ঝলক দিল। তখন দেখতে পেলুম, জয়ন্তী সেই নুড়িগুলোর কাছে হাঁটু দুমড়ে বসে রয়েছে। আমি আন্দাজে সেদিকে এগোতেই ওর সঙ্গে ধাক্কা লাগল। সে আমার হাত ধরে টানল—আর নয়। চলে এসো!

তারপর সে অদ্ভুত ক্ষিপ্রতায় প্রায় দৌড়তে শুরু করল জঙ্গলটার মধ্যে। এখানে জমি কিছুটা সমতল। তারপর ঘাসে-ভরা ঢালু জমিটা পেরিয়ে একেবারে নীচে গিয়ে পৌঁছলুম আমরা। সেখান থেকে আবার এক দৌড়ে সোজা পাকা রাস্তায় ওঠা গেল।

এবার জয়ন্তী দাঁড়াল। নীচে ঝড়ের প্রকোপ কিছু কম। একটা বড় প্রশ্বাস পড়ল দুজনের। জয়ন্তী বলল, সেই ভুতুড়ে আওয়াজটা আর কিন্তু শোনা যাচ্ছে না।

কান পাতলুম—ঠিক তাই বটে। কিন্তু এবার বাতাসে কিছু ঠান্ডা ভাব টের পাওয়া যাচ্ছে। বৃষ্টি আসবে নির্ঘাত। বললুম, কর্নেলের জন্যে অপেক্ষা করে লাভ নেই, জয়া। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে কুকুরের মতো ভেজার চেয়ে চলো আমরা হোটেলে ফিরে যাই।

জয়ন্তী বলল, কিন্তু কী ভাববেন উনি?

—যা খুশি ভাবুন। আমি আর এক মুহূর্ত এখানে থাকতে রাজি নই।

—যাব?

ওর হাত ধরে টানলুম।—পাগল। কর্নেলকে তুমি চেনো না। উনি একাই একশো।

অগত্যা জয়ন্তী পা বাড়াল। কিছুটা যাওয়ার পর সে বলল, ওই বিকট আওয়াজ কীসের বলে মনে হল তোমার?

—সম্ভবত ওদিকের সামরিক ছাউনিতে সাইরেন বাজাচ্ছিল। ঝড়ের জন্যে হুঁশিয়ারি দিচ্ছিল।

—ভ্যাট! সে ছাউনি কমপক্ষে সাত মাইল দূরে। আওয়াজটা কিন্তু ভূতের পাহাড়ের পশ্চিম গায়ে উঠছে মনে হল আমার।

—বেশ, তুমিই বলো ও কীসের আওয়াজ?

—তুমি তো অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাস করো না। বলে কী হবে?

—বিশ্বাস করছি, অন্তত তোমার খাতিরে।

জয়ন্তী আমার গালে মৃদু ধাক্কা দিয়ে বলল, এই দুঃসময়ে অত প্রেমের বাতিক কেন তোমার? শোনো—এবার বুঝলুম, কেন ওটাকে সবাই ভূতের পাহাড় বলে।

—হুঁ। ঝড়ের সময় সম্ভবত ওই আওয়াজ শোনা যায়, তাই। তো ইয়ে, জয়া—এবার বলো তো, ওই নুড়িগুলোর রহস্য কী? কেন ওখানে তুমি হঠাৎ ঝাঁপ দিলে?

জয়ন্তী একটু চুপ করে থাকার পর বলল, বলব। চলো, আগে হোটেলে পৌঁছই ভালোয়-ভালোয়।

—ভালোয়-ভালোয় কেন?

—সাবধানে চারিদিকে লক্ষ রেখে এগোচ্ছ তো? আমার ক্রমশ একটা অন্যরকম অস্বস্তি হচ্ছে।

—ভয় নেই, আমার কাছে আত্মরক্ষার ভালো ব্যবস্থা আছে। এই দেখো।

জয়ন্তীর একটা হাত আমার প্যান্টের পকেটে এগিয়ে দিলুম। অস্ত্রটা পরখ করে দেখে সে বলল—ব্যাপারটা তোমাকে বলা যেতে পারে। কর্নেল আমাকে অধ্যাপক দ্বিবেদীর দিকে নজর রাখতে বলেছিলেন। আজ বিকেলে সাড়ে তিনটে নাগাদ ওঁকে বেরোতে দেখে আমি পিছু নিলুম। দেখি, উনি ভূতের পাহাড়ের দিকে চলেছেন। আমি নীচের একটা বাঁকে গাছের আড়াল থেকে দেখলুম, পাহাড়ের গায়ে বড় গাছের জঙ্গলটার ভেতর থেকে বেরিয়ে উনি সেই খাঁজটার কাছে গেলেন।

তখন আমিও পাহাড়ে চড়া শুরু করলুম। এসব পাহাড় আমার কাছে হাতের চেটোর মতো। দু-তিন মিনিটে জঙ্গলের শেষ দিকটায় গিয়ে উঁকি মেরে দেখি, অধ্যাপক নুড়িগুলো ঘাঁটছেন। একটু পরে উনি হাত ঝাড়তে-ঝাড়তে চলে এলেন। পাথরের আড়ালে লুকিয়ে পড়লুম। দেখলুম, উনি ঝরনার দিকে চলে গেলেন—উত্তর দিকে। তখন আমি বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর নুড়িগুলোর কাছে গেলুম। খাঁজের গর্তে একগাদা নুড়ি জমে রয়েছে। ব্যাপারটা বুঝতে পারলুম না। আমি ওগুলোর তলা অবধি সাফ করেছি, তুমি গিয়ে হাজির হলে। যাই হোক, ততক্ষণে রহস্যটা ধরা পড়েছে। অধ্যাপক একটা খাম লুকিয়ে রেখে গেলেন। তুমি এসে পড়ায় খামটা নেওয়া হল না।

অভিমানী স্বরে বললুম, তুমি তো অদ্ভুত জয়া। আমাকে অবিশ্বাস করলে! আশ্চর্য তো! আমি...।

কথা আটকে গেল ক্ষোভে। জয়ন্তী আমার কাঁধে হাত রেখে বলল, বিশ্বাস করো, অত ভেবে কিছু করিনি! আমি এমন হতভম্ব হয়ে পড়েছিলুম যে কর্নেলকে জানানোর আগে কাউকে বলা উচিত হবে কি না ভেবে পাইনি। বেশ তো, এখন তো বললুম।

—খামটা ফেরার পথে নিয়ে এলে তা হলে?

—হুঁউ।

—কই, দেখি।

—এখানে নয়, হোটেলে ফিরে দেখাব।

—না, জাস্ট একবার ছুঁয়ে আঁচ করে দেখি না, কী আছে?

—একটা হালকা খাম। চিঠিফিটি আছে হয়তো।

—জয়া, একবার প্লিজ ছুঁতে দাও! কই, কোথায় রেখেছ?

—ভ্যাট! কাতুকুতু লাগছে।

—কোথায় রেখেছ, বলোই না বাবা!

—বুকে। মেয়েরা যেখানে গোপনীয় জিনিস রাখে!

জেদের বশে ওর ব্লাউজের ভেতর হাত ঢোকাতে যাচ্ছি, আচমকা পিছনে কর্নেলের গম্ভীর আওয়াজ এল—জয়ন্ত, অসভ্যতা করে না।

আচমকা ওই আওয়াজ শুনেই ছিটকে সরে দাঁড়িয়েছিলুম। কর্নেল এগিয়ে এসে বললেন, জয়ন্তী, শিগগির খামটা দাও! তুমি বড্ড অসাবধানী।

জয়ন্তীও চমকে উঠেছিল।—কর্নেল!

—হ্যাঁ, খামটা দাও। আর দেখো, বৃষ্টি আসছে। তিনজনেই এবার দৌড়তে শুরু করি।

জয়ন্তী বুকের ভেতর থেকে বের করে জিনিসটা দিল। পকেটে পুরেই কর্নেল বললেন, কুইক মার্চ।

হ্যাঁ, ঝড়টা কমে এসেছে—কালকের মতো ভয়ংকর ঝড় আজ আর হল না, কিন্তু বৃষ্টির গন্ধ ভেসে আসছে বাতাসে। আমরা তিনজনে জোর কদমে হোটেলের দিকে এগিয়ে গেলুম।

লাউঞ্জে ডঃ সীতানাথ পট্টনায়ক আর মিঃ খান্না বসেছিলেন। কর্নেলকে দেখে খান্না বললেন, কতক্ষণ থেকে অপেক্ষা করছি আপনার।

কর্নেল একটু হেসে বললেন, তাই বুঝি! এক মিনিট—আমি এই কচি বন্ধু দুটিকে বিদায় দিয়ে এক্ষুনি আসছি।

ঘরে এসে আমি ও জয়ন্তী ক্লান্তভাবে বসে পড়লুম। বাইরে তখন জোর বৃষ্টি শুরু হয়েছে। কর্নেল বললেন, আবার আমি কিছুক্ষণের জন্যে বিদায় নিচ্ছি। অ রিভোয়া জয়জয়ন্তী, অ রিভোঁয়া। তোমাদের সময় আনন্দময় হোক।

উনি বেরিয়ে গেলে জয়ন্তী আমার দিকে তাকাল। আমিও তাকালুম ওর দিকে। দুজনেই

খামটার কথা ভাবছি, তাতে কোনও ভুল নেই।

একটু পরে দুজনেরই একসঙ্গে ফোঁস করে দুটি দীর্ঘশ্বাস পড়ল। তারপর জয়ন্তী আমার বিছানায় গড়িয়ে পড়ে বলল, কফি বলে দাও জয়ন্ত। বড্ড ক্লান্ত।

ফোনটা তুলে রুম সার্ভিসের নম্বর ডায়াল করতে থাকলুম। বৃষ্টির সুন্দর শব্দে এখন বাণেশ্বরের রহস্যময় আরেকটি রাত মুখর হয়ে উঠেছে।...

সাত ঃ গুহার মধ্যে একটি হাত

সে রাতে জয়ন্তী আর আমি ঘরে বসেই ডিনার খেলুম। তারপর দশটা বাজল, বারোটা বাজল—তখনও গোয়েন্দাপ্রবরের পাত্তা নেই। দুজনে অবশ্য গল্পগাছা এবং একটু-আধটু ফস্টিনস্টি করে কাটাচ্ছিলুম। তবে জয়ন্তী আমাকে বেশিদূর এগোতে দেয়নি। যাই হোক, বারোটার পর হাই তুলে ঢুলুঢুলু চোখে এবং ঘুমজড়ানো গলায় ও বলেছিল, আমি বুড়োর বিছানায় শুয়ে পড়ছি। খবরদার, বিরক্ত করবে না কিন্তু। চেঁচামেচি করে হোটেল মাথায় করব বলে দিচ্ছি।

—বেশ, করব না। কিন্তু কর্নেল ফিরলে কি তোমার ঘরে গিয়ে শুতে বলব?

—হুঁউ। কারণ, গত রাতটা প্রাণের দায়ে একা কাটিয়েছি। আজ আর নয়, বাব্বা! আজ প্রাণভরে ঘুমুতে চাই।

বলেই সে শুল তো সঙ্গে-সঙ্গে মড়া হয়ে পড়ল। আমারও ঘুম পাচ্ছিল। শুয়ে পড়েছিলুম। তারপর কখন কর্নেল ফিরেছেন, ঘড়ি দেখিনি, প্রায় ঘুমের ঘোরে দরজা খুলে দিয়েছি এবং তক্ষুনি টলতে-টলতে ফের বিছানায় গড়িয়ে পড়েছি। কর্নেল, আমার অনুমান, জয়ন্তীর ব্যাগ হাতড়ে ওর ঘরের চাবি নিয়ে বেরিয়ে গেছেন এবং বাইরে থেকে আমাদের ঘরটা লক করে দিয়েছেন।

সকালে জয়ন্তী আমাকে ওঠাল, তখন সাতটা। জীবনে এত সকালে ওঠার অভ্যাস নেই। ওকে তেড়ে ধমক দিলুম। কিন্তু ও আমাকে কাতুকুতু দিতে থাকল। সেই সঙ্গে কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, ইস! কী চান্স না গেছে তোমার!

ক্ষিপ্ত মেজাজের দরুন কথাটা অসভ্যতা বলেই ধরে নিলুম এবং নিজের চরিত্রের বলিষ্ঠতা সম্পর্কে ওকে একটা কড়া বক্তৃতা শোনাতে হুড়মুড় করে উঠে বসলুম। বললুম, দেখো জয়া, তুমি আমাকে চিনতে ভুল করছ! আমার মেয়েবন্ধুর সংখ্যা ছাত্রজীবন থেকে এ অবধি খুব কম নয়। কতবার একসঙ্গে বাইরে কাটিয়ে এসেছি দল বেঁধে। লিমিট রেখে কীভাবে অন্তরঙ্গতা বজায় রাখা উচিত—সে সেন্স আমার আছে।

জয়ন্তী আমার মুখে হাত চেপে বলল, চুপ! বেড-টি বলেছি। ওই শোনো, দরজায় নক করছে। কিন্তু হায়, ওই অমৃত আপাতত বরাতে নেই! কারণ, দেখে এসেছি দরজা বাইরে থেকে লক করা। কর্নেল ছাড়া এ কাজ আর কার সাহস হবে?

কিন্তু কী আশ্চর্য, দরজা খুলে গেল এবং বেড-টির ট্রে নিয়ে হাসিমুখে ছোকরা বেয়ারাটি ঢুকে বলল, সেলাম সাব, সেলাম মেমসাব!

জয়ন্তী ভুরু কুঁচকে বলল, দরজা লক করা ছিল না?

—জি না মেমসাব।

—সে কী! এই একটু আগে আমি দেখলুম, দরজা লকড।

আমি বললুম, করিডোরে কাকেও দেখলে এইমাত্র?

—জি হাঁ। কর্নেল সাহাব নেমে গেলেন।

আমরা পরস্পর তাকাতাকি করে একটু হাসলুম। বেয়ারা ট্রেটা রেখে চলে গেল। চায়ের

কাপ তুলে নিয়ে জয়ন্তী বলল, আমি কিন্তু আজকাল বাসিমুখে বেড-টি খাইনে। খাওয়া উচিত নয়। অস্বাস্থ্যকর। তবে একসময় খেতুম, ভারি ভালো লাগত। তুলনা হয় না।

চায়ে চুমুক দিয়ে বললুম, হ্যাঁ, তুলনা হয় না বটে। তাই স্বাস্থ্য মানি না। আমি তো এভারেস্টের চূড়োয় ওঠবার অ্যামবিশান নিয়ে জন্মাইনি।

জয়ন্তী চোখে ও ঠোঁটে ঝিলিক তুলে বলল, বাসিমুখে আর কী খেতে ভালো লাগে বলো তো?

—সিগারেট।

—ভ্যাট। বলতে পারলে না।

—চুমু?

জয়ন্তী হাসতে-হাসতে অন্যদিকে মুখ ঘোরাল। শুধু বলল, যাঃ।

—তোমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলছ নিশ্চয়?

—না বাবা, না। ও কথা মোটেও নয়। আমি বলতে চাইছিলুম, বাসিমুখে কখনও পেস্ট খেয়ে দেখেছ? ছেলেবেলায় আমি খেতুম।

—এই রামোঃ। পেস্ট খেতে? ছ্যা, ছ্যা।

জয়ন্তী হাসতে-হাসতে আমার হাঁটুতে খানিকটা চা ফেলে দিল।

বাথরুমে প্রাতঃকৃত্য ইত্যাদি সেরে নিতে আমার ঘণ্টাখানেক লেগেছে। বেরিয়ে দেখি, জয়ন্তীর বদলে আমার বন্ধুবর বসে রয়েছেন। স্বভাবমতো বাও করে বললেন—সুপ্রভাত জয়ন্ত ডার্লিং। আশা করি, আজও সুনিদ্রার কোনও ব্যাঘাত ঘটেনি?

গম্ভীর হয়ে বললুম, ঘটবার চান্স ছিল। তবু ঘটতে দিইনি।

—তুমি কি আমার ওপর ক্রুদ্ধ হয়েছ জয়ন্ত?

—বিলক্ষণ। আপনার কি এতটুকু বৈষয়িক বুদ্ধি-সুদ্ধি নেই যে জয়ন্তীকে এ-ঘরে রেখে চলে গেলেন। ওকে জাগিয়ে নিজের ঘরে পাঠানো উচিত ছিল না কি? এবং তার ওপর দরজা লক করে গেলেন। ভেতরে যে একজন শক্তসমর্থ যুবক, আর একজন স্বাস্থ্যবতী যুবতী রয়ে গেল—তারা সদ্যপরিচিত এবং সম্পূর্ণ অনাত্মীয়, তাও খেয়াল করলেন না?

কর্নেল অপ্রতিভ মুখে বললেন, তুমি ঠিকই বলেছ, জয়ন্ত। ঘাট মানছি। এখন এসো, ঝটপট ব্রেকফাস্ট সেরে নিই। অর্ডার দেওয়া হয়ে গেছে। জয়ন্তীও আসছে। তারপর তোমাদের সামনে একটা চমৎকার দলিল পেশ করব। আজ সারাদিন তোমাদের নিয়ে কাটাতে কোনও অসুবিধে নেই।

চুল আঁচড়াতে-আঁচড়াতে বললুম, দলিল? মানে, সেই খামটা তো?

—খামটা পরে। এ দলিল আমার তৈরি।

জয়ন্তী এসে গেল। হালকা নীল শাড়ি, হাতকাটা ব্লাউজের দু-ধারে ঝুলছে দুটি সরল আর নগ্ন বাহু জোরালো নিয়নবাতির মতো উজ্জ্বল। তার বুকের এই উদ্দীপ্ত প্রগলভতা এর আগে লক্ষ করিনি। মনে হল, দুরধিগম্য পাহাড়ের বিপদসঙ্কুল চূড়া জয়ের চেয়ে সম্ভবত পুরুষ-মানুষকে জয়ের গর্ব আনন্দ আর তৃপ্তি আজও মেয়েদের অনেক-অনেক বেশি। এবং এ সবের চাপে মেয়েরা যেন একটু স্বার্থপরও হয়ে ওঠে। অন্তত শ্যামলীর মৃত্যুর পরিপ্রেক্ষিতে জয়ন্তীর আচরণ চুলচেরা বিচার করলে এই স্বার্থপরতাটাই টের পাওয়া যায়। সত্যি, মেয়েদের রহস্যময়তার কোনও তুলনা নেই।

জয়ন্তীর দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছি দেখে কর্নেল বললেন, ইয়ে, জয়ন্ত, জয়ন্তীর মধ্যে এবেলা আমরা নতুন কিছু নিশ্চয় প্রত্যক্ষ করছি। তবে দেখো, মানুষের যা কিছু সৌন্দর্য-চেতনা, তা আজও প্রকৃতির নিয়মের বাইরে নয়।

বক্তৃতা থামিয়ে দিল ব্রেকফাস্টের ট্রে। আমরা নিঃশব্দে খেতে বসলুম। খাওয়ার পর কর্নেল বললেন—ততক্ষণ তোমরা এই কাগজগুলো পড়ে ফেলো। আমি একবার লাউঞ্জে যাই। ডঃ পট্টনায়ক এসে পড়বেন। ওঁকে নিয়েই ফিরব।

পকেট থেকে কয়েক শিট ভাঁজ-করা কাগজ হাতে গুঁজে দিয়ে কর্নেল বেরিয়ে গেলেন। আমি আর জয়ন্তী পাশাপাশি বসে তা পড়া শুরু করলুম।

হাতের লেখা কর্নেলেরই।...

*(১) **শ্রীমতী সরোজিনী মালহোত্রা ঃ** ৭ জুন অর্থাৎ শ্যামলীর মৃত্যুর দিন সকাল আটটায় গ্রিনভিউ হোটেলে মোহন পারেখের সঙ্গে দেখা করেন। একঘণ্টা ছিলেন পারেখের ঘরে। হিস্টিরিয়াব রুগি। সরযূ লছমন আর বদ্রীর বর্ণনা অনুসারে দু-বছব আগের জুনে স্বামীর জিপ দুর্ঘটনায় মৃত্যুর পর থেকে এই রোগ হয়েছে। ডঃ পট্টনায়কের মতেও, রোগটা অভিনয় নয়। ভদ্রমহিলার নার্ভের অবস্থা চরমের দিকে এগোচ্ছে। এখন থেকে চিকিৎসা করা দরকার। নয়তো ভবিষ্যতে উন্মাদ রোগের সম্ভাবনা আছে। মাঝে-মাঝে অদ্ভুত কাণ্ড করেন। ৮ জুন সকালে তার কিছু নমুনা আমরা পেয়েছি। ফিটের সময় বিড়বিড় করে একটা নাম উচ্চারণ কবেন। মহাবীর সিং। জ্ঞান হওয়ার পর প্রশ্ন কবলে বলেন—ও নামে কাকেও চিনি না। সরযূ, লছমন, বদ্রীও চেনে না। প্ল্যানচেটের আসর গত বছর প্রথম এক রাত্রে বসিয়েছিলেন। অধ্যাপক দ্বিবেদী, জয়সোয়াল বা মোহন পারেখ কেউ ছিলেন না সে আসরে। যাঁরা ছিলেন, তাঁরা এবার বাণেশ্বরে আসেননি। তবে সে-আসর ব্যর্থ হয়েছিল। আত্মা আসেনি। মিডিয়ামটি নাকি খুবই ভীতু প্রকৃতির ছিলেন, তাই আসেনি—এ হল শ্রীমতী মালহোত্রার মত।*

*(২) **শ্রী হরিহরপ্রসাদ মালহোত্রা ঃ** সরোজিনীর স্বামী। বড় ব্যবসায়ী ছিলেন। কিন্তু এক অতর্কিত লোকসানের ধাক্কায় ক্রমশ ব্যবসা ভাঁটার দিকে যায়। আব সামলাতে পাবেননি। একদিন নৈনিতাল থেকে দিল্লি যাওযার পথে জিপ দুর্ঘটনায় মাবা পড়েন। জিপটা খাদে গড়িয়ে পড়ে। সঙ্গে কেউ ছিল না। একা নিজেই ড্রাইভ করছিলেন নাকি। অন্তত তাঁর স্ত্রীব এই বর্ণনা। মন্তব্য তথ্য খুব সামান্য। রাস্তা ও বেতার যোগাযোগ চালু হলে বিস্তারিত তথ্য নৈনিতাল পুলিশের পক্ষে জানা সম্ভব হত। শ্রীমতী মালহোত্রাও অনেক কথা সম্ভবত গোপন করছেন।*

*(৩) **শ্রী মোহন পারেখ ঃ** বোম্বের প্রখ্যাত ফিল্ম গায়ক। মালহোত্রার বন্ধুর ছেলে। ছেলেবেলা থেকে ওঁদের সঙ্গে পরিচয় ও যোগাযোগ ছিল। মালহোত্রার মৃত্যুর দিন সে ঘটনাচক্রে নৈনিতাল যায়। পথে জিপ দুর্ঘটনা ঘটতে দেখে এবং দুঃসংবাদ তাঁর মুখেই শ্রীমতী মালহোত্রা পান। হোটেলে তার ঘরে একটি টেলিগ্রাম পাওয়া গেছে। শ্রীমতী মালহোত্রা তাকে অবিলম্বে বাণেশ্বরে আসতে বলেছেন। টেলিগ্রামের ডেসপ্যাচ তারিখ তেসরা জুন। পারেখ পৌঁছোয় ৬ জুন রাত্রে। ৭ জুন দুপুরে সে বেরিয়ে যায়। আর ফেরেনি। ভুতের পাহাড়ের পশ্চিম খাদে তার লাশ আবিষ্কৃত হয় ৮ জুন ভোর ৬টায়। মন্তব্য ঃ হঠাৎ তাকে শ্রীমতী মালহোত্রার টেলি করার কারণ কী? উনি তেমন কোনও কৈফিয়ত দিচ্ছেন না। বলছেন, ওকে দেখতে ইচ্ছে করছিল। বিশ্বাস হয় না।*

*(৪) **শ্রীমতী শ্যামলী সেন ঃ** ৭ জুন সকালে মোহন পারেখের সঙ্গে লাউঞ্জে আলাপ। শ্যামলী ওর খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়ে। জয়ন্তী বিরক্ত হয়েছিল। পারেখের ঘরেও গিয়েছিল শ্যামলী। জয়ন্তী এতে রাগ করে ওপরে চলে আসে। একটু পরেই শ্যামলী ফেরে। অভ্যাসমতো জয়ন্তীর ঘুম এসেছিল। ঘুমজড়ানো চোখে দেখে, শ্যামলী বিছানা ঠিকঠাক করছে। (ব্যাপারটা সিগনিফিকান্ট) তারপর শুয়ে পড়ে সে। জয়ন্তী ঘুম ভাঙে আড়াইটে*

নাগাদ। তখন দেখে, শ্যামলী বিছানায় নেই। সে ভাবে, পারেখের ঘরে গেছে। আধঘণ্টা পরে শ্যামলী আসে। অপ্রকৃতিস্থ চেহারা। জয়ন্তীর মনে সন্দেহ হয়, মোহন পারেখ ওকে বাগে পেয়ে নিশ্চয় একটা কিছু করেছে। জয়ন্তী প্রশ্ন করলে শ্যামলী জবাব দেয়, একটা বিচ্ছিরি স্বপ্ন দেখে মন খারাপ হয়েছিল। তাই বাইরে লনে পায়চারি করছিল এতক্ষণ। স্বপ্নটার কথা আমরা ওইদিনই ভূতের পাহাড়ে শুনেছি। সাড়ে তিনটেয় দুজন বেরোয়। শ্যামলী সারাক্ষণ অন্যমনস্ক ছিল। মন্তব্য ঃ মিডিয়াম হওয়ার সময় পারেখের আত্মা ওর মুখ দিয়ে যা-যা বলেছিল—তা অবিকল এখানে নোট করা হল।..

('আমি তাকে চিনতুম।' এই বাক্যটার তলায় লাল কালির দাগ। প্রশ্ন ঃ কে কাকে চিনতে পেরেছিল?)

*(৫) **অধ্যাপক অরিন্দম দ্বিবেদী ঃ** ৩ জুন এসেছেন। ৭ জুন মোহন পারেখ চলে যাওয়ার পর নাকি মোহন পারেখের ঘরে ঢোকেন। বেয়ারাদের সাক্ষ্য। দুপুরে লাঞ্চের সময় হোটেলে ছিলেন না। বলছেন এক মাইল দূরে জলপ্রপাত দেখতে গিয়েছিলুম। ফেরেন বিকেল তিনটে নাগাদ। তারপর পোশাক বদলে বেরিয়ে যান। শ্রীমতী মালহোত্রার কথামতো চারটেয় পৌঁছন ওঁর বাড়ি। লনে চেয়ার পেতে অপেক্ষা করছিলেন ভদ্রমহিলা। ৮ জুন সকালে জয়ন্তীর ঘরে ঢুকেছিলেন। বলছেন, শ্যামলীর আত্মীয়স্বজনকে খবর পাঠানোর ব্যাপারে 'বেচারা' বাঙালি মেয়েটিকে সাহায্য করা যায় কি না জানতে গিয়েছিলেন। দরজা খোলা ছিল। ঢুকে দেখেন কেউ নেই, তখন কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে চলে আসেন। অথচ জয়ন্তী বলছে, দরজা লক করা ছিল। ৯ জুন বিকেলে আমি ভূতের পাহাড়ে পশ্চিমের খাদের একটা ছোট চাতালে ওঁকে আবিষ্কার করি। কী করছিলেন? জবাবে বলছেন—বেচারি পারেখ কীভাবে কোথায় পড়ে মারা গিয়েছিল, দেখার কৌতূহল ছিল। কিন্তু জয়ন্তী যে খামটা উদ্ধার করেছে, তা উনিই লুকিয়ে রেখেছিলেন ভূতের পাহাড়ের পূর্বদিকের খাঁজে। এ খাম কোথায় পেলেন? (খামে আছে একটি ছবির নেগেটিভ প্রিন্ট।) খামের প্রশ্নে উনি আকাশ থেকে পড়লেন! জয়ন্তী ভুল দেখেছে। উনি নুড়ির ওখানে যানইনি। মন্তব্য ঃ স্পষ্টই মিথ্যা বলছেন। কী উদ্দেশ্যে?*

*(৬) **শ্রী রঘুবীর জয়সোয়াল ঃ** ৬ জুন এসেছেন। (বেশ সিগনিফিক্যান্ট) ৭ জুন বেরিয়ে যান দুপুর বারোটায়। ফেরেন একেবারে চারটে নাগাদ। সাড়ে চারটেয় যান মালহোত্রা ভবনে। মোহন পারেখের সঙ্গে পরিচয় নেই কস্মিনকালে। বেরিয়েছিলেন সামরিক ছাউনির উদ্দেশ্যে। সেখানে এক মেজর তাঁর বন্ধু নাকি। ওখানেই খাওয়া-দাওয়া করেন। (এর সত্যতা যাচাই আপাতত রাস্তা চালু না হওয়া অবধি অসম্ভব) শ্রীমতী মালহোত্রার সঙ্গে পরিচয় এখানে আসার পরেই। ভূত-প্রেত ও ভগবানে আস্থা নেই। তাঁর মতে, হত্যাকারী শ্রীমতী মালহোত্রা ছাড়া আর কেউ নয়। উদ্দেশ্য? রাস্তা চালু হলে ব্যাকগ্রাউন্ড স্টোরি পাব। জয়সোয়ালজির মতে, শ্রীমতী মালহোত্রার ওই হিস্টিরিয়া নিছক ভান। (জাঁদরেল পুলিশকর্তার পক্ষে এ-সব মতামত স্বাভাবিক) আজ পশ্চিমের খাদে গিয়েছিলেন সরেজমিনে তদন্তে। সেখান থেকে শ্রীমতী মালহোত্রাকে আবিষ্কার করেন নীচের খাদে। এর অর্থ—হত্যাকারীর সেই চিরন্তন মানসিকতা। হত্যাকাণ্ডের জায়গায় আবার যাওয়ার প্রচণ্ড কৌতূহল থাকে। না গিয়ে কিছুতেই পারে না। (শ্রীমতী মালহোত্রা কিন্তু স্বীকার করেছেন যে সম্পূর্ণ সজ্ঞানে আজ খাদে গিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য? কৌতূহল এবং শোক। বাছা পারেখের জন্যে দু-ফোঁটা চোখের জল ফেলতে গিয়েছিলেন।)...*

এবার সাত নম্বর লোকটির নাম দেখে আমি আকাশ থেকে পড়তে-পড়তে চেঁচিয়ে উঠলুম—আরে, এ কী!

জয়ন্তীও চমকে উঠেছিল। পরক্ষণে সে ফিক করে হেসে উঠল। বলল,—সুপার এক্সেলেন্ট! হিপ হিপ হুররে! তারপর ঝুঁকে পড়ল কাগজটার দিকে।

(৭) শ্রী জয়ন্ত চৌধুরী : ঘটনার সময় অর্থাৎ ৭ জুন রাত্রে প্ল্যানচেটের আসরে ঘর অন্ধকার হওয়ার পর সে চেয়ার ছেড়ে উঠেছিল কি? বলেছে, উঠিনি। অথচ আমার ধারণা, সে উঠেছিল এবং শ্যামলীর দিকে এগোচ্ছিল। আমার হাতে ওর খসখসে কোটের ছোঁওয়া লেগেছিল। খামচে ধরতে যাচ্ছি, নিঃশব্দে পাশ কাটিয়ে এল—কারণ টের পেয়েছিল যে আমি অন্ধকারেও সজাগ ও সতর্ক রয়েছি। (মন্তব্য : ওরকম খসখসে কোট কারও গায়ে ছিল না তখন।)

জয়ন্তী অবাক চোখ তুলে বলল, কী খুদে গোয়েন্দামশাই? ব্যাপারটা কী খুলে বল তো?

আমি গুম হয়ে বললুম, ভ্যাট! সব গুল।

—কর্নেলের ভুল হবে, বলতে চাও?

—আলবাৎ হবে। উনি তো দেবতা নন।

জয়ন্তী একটু চুপ করে আমার দিকে তাকিয়ে থাকার পর বলল—কে জানে! তোমাকে আমার বড্ড রহস্যময় লাগে!

—লাগা উচিত। প্রেমিক হিসেবে নিজেকে আমি খুব রহস্যময় মনে করি।

—থাক। আত্মপ্রশংসায় কাজ নেই। তারপর কী লিখেছেন কর্নেল, দেখি। আমরা আবার কাগজে চোখ রাখলুম।...

কিছু বাড়তি তথ্য : (১) প্ল্যানচেটেব সময় অন্ধকাবে জয়সোয়ালজির চেয়ার অন্তত এক মিনিট খালি ছিল। আমি হাত বাড়িয়ে এটা টের পেযেছিলুম। সত্যিকাব ভূত কি না দেখতে চেষ্টা করছিলেন নাকি? (২) ডাইনিং হলে কফি খাওয়ার সময় অর্থাৎ আসরের আগে অধ্যাপক দ্বিবেদী আর শ্যামলী পাশাপাশি বসেছিল। তখন ওরা চাপা গলায় কিছু আলোচনা করছিল। অধ্যাপকের উচ্চারিত একটা শব্দ কানে এসেছিল আমার—সাবধান। (৩) স্টাডিতে শ্যামলীর ঠিক পিছনের বুকশেলফটার তলায় খুবই সূক্ষ্ম কালো একটা চুলের মতো জিনিস পাওয়া গেছে। কতকটা বিষাক্ত পতঙ্গের হুলের মতো দেখতে। ডঃ পট্টনায়কের পরীক্ষা এখনও শেষ হয়নি। সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতির অভাব। (৪) শ্যামলীর মাথার পিছন দিকে বোলতার হুল ফোটানোর মতো একটা স্পট আছে। ওখানেই প্যাথোজেন প্রথম ঢোকে। (৫) ডঃ পট্টনায়ক বলছেন, প্যাথোজেনের সঙ্গে এক ধরনের অজ্ঞাত রাসায়নিক জিনিসও দ্বিতীয়বার পরীক্ষায় পাওয়া গেছে। জিনিসটার অদ্ভুত ক্রিয়াশীলতায় প্যাথোজেনের কলোনি ফর্ম করার ক্ষমতা হাজার গুণ বেড়ে যায়।

আর পড়া হল না। কর্নেল এসে পড়লেন। এসেই কাগজগুলো ছোঁ মেরে প্রায় কেড়ে নিলেন—যথেষ্ট হয়েছে। আমরা এবার বেড়াতে বেরোব। ওঠো তোমরা। নীচে ডঃ পট্টনায়ক অপেক্ষা করছেন।

উঠে দাঁড়িয়ে বেজারমুখে বললুম, আমার নামে ওসব কী লিখেছেন, শুনি?

কর্নেল মুচকি হেসে আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন, এখন কোনও কথা নয়, ইয়ংম্যান। চলো, বেরিয়ে পড়া যাক।

হোটেলের লনে গিয়ে দেখি, একটা জিপ আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে। কর্নেল ইশারা করলে আমি আর জয়ন্তী লক্ষ্মী ছেলে-মেয়ের মতো পিছনের দিকে ঢুকে বসলুম। কর্নেল আর পট্টনায়ক বসলেন সামনে। ড্রাইভারের পোশাক দেখে বোঝা যাচ্ছিল, গাড়িটা পুলিশের।

স্টার্ট দিয়ে টনকপুর রোডে পৌঁছলে জয়ন্তী আমার দিকে তাকাল। অর্থাৎ কোথায় যাওয়া হচ্ছে এভাবে? মাথা নাড়লুম—কে জানে! যমের বাড়ি যে নয়, তা নিশ্চিত। গত পরশু রাতের ভয়ংকর দুর্যোগে বাণেশ্বর যদি বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে থাকে, তা হলে তার সব রাস্তারই গড় দূরত্ব

নিশ্চয় কমে গেছে। টনকপুর রোডের কোথায় ধস নেমেছে জানি না, তবে জিপের গতি দেখে মনে হল খানিকটা দূরেই হবে।

মাইলটাক রাস্তার আঁকিবুকি গোলকধাঁধা ঘুরে একটা অন্তত হাজার পাঁচেক ফুট উঁচু পাহাড়ের গায়ে গাড়ি উঠল। তারপর ফের এক চুলের কাঁটার মতো বাঁকের কাছে গিয়ে থেমে গেল। ডাইনে খাড়া পাথরের দেওয়াল, বাঁয়ে অতল খাদ। তাকিয়ে গা শিরশির করে উঠল। কর্নেল বললেন—তা হলে নেমে পড়া যাক।

সবাই নামলুম। জিপটা যেখানে ব্রেক কষেছিল, সেখানে বাঁয়ে খাদের ওপর রাস্তার কিনারা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা প্রকাণ্ড হলদু গাছ। কাজেই ছায়া ছিল। কর্নেল আমার ও জয়ন্তীর হাত ধরে সস্নেহে বললেন, ডঃ পট্টনায়ক, চলে আসুন।

বাঁকের ওপারে কয়েক গজ এগিয়ে থমকে দাঁড়ালুম সবাই। এই ভয়ংকর ধসের চেহারা কল্পনা করতে পারিনি। বনেদি এই হাইওয়েটা হঠাৎ কেউ যেন পাহাড়ের গা থেকে ধারালো কোনও অস্ত্রে চেঁছে সাফ করে ফেলেছে—ঠিক দাড়ি কামানোর মতো। ওপারে রাস্তাটা দেখা যাচ্ছে অন্তত সিকি মাইল দূরে। নীচে বয়ে চলেছে একটা প্রবল জলস্রোত। উত্তর থেকে এসে ধসের খাদ ঘুরে একটা প্রকাণ্ড শাখাপথ তৈরি করে ফেলেছে সে। অজস্র গাছ উপড়ে পড়ে রয়েছে ইতস্তত।

ধ্বংসের এই দৃশ্য বিস্ময় এনেছিল প্রত্যেকের চোখে। একটু পরে ঠাহর হল, মানুষ তাই বলে ভড়কে যাওয়ার তো প্রাণী নয়। ওপারে অসংখ্য লোক রাস্তাটা আবার গড়ে তুলতে চেষ্টা করছে। পোশাক দেখে বোঝা গেল, ওরা সামরিক বাহিনীর লোক। অনেকগুলো এক্সক্যাভেটার, ডোজার, ক্রেনও দেখতে পেলুম। এতদূর থেকে নীচে সবকিছু পোকার নড়াচড়া বলে ভুল হতে পারে।

কিন্তু এইসব দেখাতেই কি নিয়ে এলেন কর্নেল? ওঁর দিকে তাকালুম। একটু হাসলেন।—দেখলে তো জয়ন্ত? অন্তত পনেরো দিনের আগে এখান থেকে বেরোনো যাবে না। তবে যদি অন্য ব্যবস্থা হয়ে যায় ইতিমধ্যে, তো মঙ্গল।

আমি কোনও জবাব দিলুম না। জয়ন্তী শিউরে উঠে বলল, সর্বনাশ! তা হলে কী হবে!

কর্নেল জবাব দিলেন, খুব সম্ভব হেলিকপ্টার নামবার জায়গা আজই করে ফেলবেন বাণেশ্বর কর্তৃপক্ষ। গতকাল থেকে মিলিটারি হেলিকপ্টার খুব ঘোরাঘুরি করছে, নামতে পারছে না। বাণেশ্বর ইস্টের এয়ারস্ট্রিপটা সারদা নদী পুরো খেয়ে ফেলেছে। ওখানেই একটা পাহাড়ের মাথায় গাছপালা সাফ করা হচ্ছে। যাক গে, এবার আমরা নির্দিষ্ট জায়গায় যাব। ডঃ পট্টনায়ক, আপনিও তো পথ চেনেন—আপনিই লিড নিন।

পথ! এখানে পথ কোথায়? চারদিকে খুঁজছি দেখে ডঃ পট্টনায়ক বললেন, চলে আসুন জয়ন্তবাবু!

খাদের দিকে রাস্তার কিনারায় একটা সাত-আট ফুট উঁচু পাথর রয়েছে। ডঃ পট্টনায়ক পাথরটার কাছে গিয়ে হঠাৎ এক লাফ দিলেন। তারপর উনি অদৃশ্য। আমি হতবুদ্ধি হয়ে ইতস্তত করছি দেখে কর্নেল পিছন থেকে ঠেলে দিলেন। প্রথমে ভড়কে গিয়েছিলুম। কিন্তু পড়ে গিয়ে দেখি একটা মোটামুটি চওড়া জায়গায় দাঁড়িয়ে গেছি। ফুট চারেক নীচে এটা একটা চাতাল। তারপর পাথরের চাঁই ধাপে-ধাপে নেমে গেছে গভীর খাদটার দিকে। লাফিয়ে-লাফিয়ে নামা শুরু হল। আন্দাজ একশো ফুট নামার পর দেখি ডঃ পট্টনায়ক একটা গুহার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন।

আমার পরে নামল জয়ন্তী, তারপর কর্নেল। ডঃ পট্টনায়ক পকেট থেকে একটা টর্চ বের করে বললেন, সাবধানে আমাকে অনুসরণ করুন সবাই।

গুহার দরজাটা ফুট পাঁচেক উঁচু, চওড়ায় ফুট তিন-সাড়ে তিন হবে। অস্বস্তি হল একটু। ঘুরে কর্নেলের দিকে তাকালুম। কর্নেল এগিয়ে যেতে ইশারা করলেন। ডঃ পট্টনায়ক ভেতর থেকে

ডাকছিলেন, কই, চলে আসুন আপনারা।

এই সময় লক্ষ করলুম, গুহার দরজার কালো স্লেটপাথরে অজস্র নাম সই করা রয়েছে। সব দ্রষ্টব্য পুরোনো জায়গায় এমন কাণ্ড চোখে পড়ে। যারা বেড়াতে যায়, তারাই নাম লিখে রেখে আসে। কাজেই, এই গুহাটা অনাবিষ্কৃত রহস্যময় কোনও গুহা নয়। তবে দু-ধারে ঝোপঝাড় গাছপালা কিছু ছিল, ঝড়ে-বৃষ্টিতে ধস নেমে সেগুলো সাফ হয়ে গেছে। মাটি বলতে যা কিছু ছিল, সেদিন রাতে প্রকৃতি সব ধুয়ে-মুছে ফেলেছেন। কাজেই মাটির সন্তান ওই উদ্ভিদও মাটির অনুগামী হতে বাধ্য হয়েছে।

আঁশটে গন্ধ সব গুহাতেই পাওয়া যায়। নাকে রুমাল দিয়ে এগোলুম। মাথা নিচু করে যেতে হচ্ছিল। ভেতরটা প্রচণ্ড অন্ধকার। দম আটকে আসছিল। আন্দাজ পনেরো থেকে কুড়ি ফুট যাওয়ার পর ডঃ পট্টনায়ক বললেন—বাঁয়ে ঘুরতে হবে।

মোড় নিতেই মনে হল এবার একটা চওড়া জায়গায় এসে পড়েছি। ডঃ পট্টনায়ক চারদিকে আলো ফেলছিলেন। ঠিক তাই। ছাদটা অন্তত ফুট নয়েক ওপরে—ভেতরটা কমপক্ষে পনেরো ফুট চওড়া। টুকরো কাগজ, বাদামের খোসা, চকোলেটের প্যাকেট, আর একটা ছেঁড়াখোড়া কম্বলও পড়ে থাকতে দেখলুম টর্চের আলোয়। এবার কর্নেল বললেন, জয়ন্তী, তা হলে এবার খুঁজে দেখা যেতে পারে।

জয়ন্তী বলল, ডঃ পট্টনায়ক, টর্চটা দিন, প্লিজ।

আমি জয়ন্তীর দিকে তাকিয়ে আছি তো আছি! টর্চটা ঝলসে উঠছে বারবার, আর ওর মুখেচোখে একটা তীব্রতা লক্ষ করছি। আর ক্ষোভে অভিমানে মনে জ্বালা ধরে যাচ্ছে! আশ্চর্য, জয়ন্তী আমাকে কত কথা লুকিয়েছে তা হলে! এই গুহার ব্যাপারটা তো বলেনি আমাকে—বলেছে, ওই ধুরন্ধর বুড়োটাকে! ঠিক আছে—এত গোপনীয়তা যখন আমার সঙ্গে, তখন আর ভাব করে কাজ নেই। আড়ি, তোমার সঙ্গে আড়ি, জয়ন্তী! মনে-মনে ওকে একশো আড়ি দিলুম।

এ সময় আমার কাঁধে কর্নেলের হাত পড়ল।—কী জয়ন্ত! খুব বোকা বানিয়ে ফেলেছি কি? প্লিজ, ডার্লিং, একটু ধৈর্য ধরো।

জয়ন্তী হাঁটু দুমড়ে কাগজের টুকরোগুলো কুড়োচ্ছিল। অস্ফুটস্বরে বলল—আর কি পাব খুঁজে? ৬ তারিখ দুপুরের ব্যাপার, আজ ৯ তারিখ! তিন দিন!

বলতে-বলতে হঠাৎ সে কোণেব দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। উত্তেজিত স্বরে বলল ফের, পেয়ে গেছি! এই যে! তারপর দলাপাকানো একটুকরো কাগজ কুড়িয়ে নিয়ে কর্নেলের দিকে হাত বাড়াল।

কর্নেল সেটা নিয়ে পকেটে পুরলেন। তারপর অকারণ চেঁচিয়ে বললেন—তা হলে ফেরা যাক। ডঃ পট্টনায়ক, আপনি আগে—তারপর জয়ন্ত, তার পিছনে জয়ন্তী, শেষে আমি।

কিন্তু চওড়া জায়গা থেকে সরু সুড়ঙ্গে পৌঁছে দেখি, আমি সবার পিছনে। আমার আগে জয়ন্তী, তার আগে কর্নেল, এবং ডঃ পট্টনায়ক সবার আগে। তারপরই ডঃ পট্টনায়ক ঘোষণা করলেন—যাঃ! সুইচ বিগড়ে গেল টর্চের। সাবধানে এগোন।

কেউ কোনও জবাব দিল না। জয়ন্তীকে ছুঁয়ে আন্দাজ করে পা বাড়াচ্ছিলুম। দম আটকে যাচ্ছিল আবার। আগে জানলে কক্ষনো ঢুকতুম না এখানে।

তারপর মনে হল, হাত বাড়িয়ে জয়ন্তীকে আর পাচ্ছি না। আসার সময় বাঁ-দিকে বেঁকে গিয়েছিল সুড়ঙ্গ—এবার তা হলে ডাইনে ঘুরতে হবে। ভাবলুম—ওদের ডাকি। কিন্তু পাছে ওঁরা ভাবেন যে ভয় পেয়ে গেছি, আঁতে ঘা লাগল। তাই সাহস করে ডাইনের দেওয়ালে হাত রেখে এগোলুম। মনে হচ্ছিল, আমি কিছুটা পিছিয়ে পড়েছি। ওঁদের পায়ের শব্দ আবছা শোনা যাচ্ছে। এই সময় ডাইনে মনে হল পথটা ঘুরেছে। যেই ঘুরতে গেছি, অমনি টের পেলুম কী একটা আমার কোটের পকেটে ঢুকেছে। আঁতকে উঠে চেঁচালুম—কর্নেল, কর্নেল!

ভেবেছিলুম, নির্ঘাত পাহাড়ি গুহার অজগর ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু আশ্চর্য সেই জিনিসটা সঙ্গে-সঙ্গে পকেট থেকে বেরিয়ে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আরও অবাক কাণ্ড, কর্নেলদের সাড়া পেলুম না। তখন আমার অবস্থা শোচনীয়। হাত-পা থরথর করে কাঁপছে—শরীর হিম, গলা শুকনো কাঠ। আবার চেঁচিয়ে উঠলুম, কর্নেল। ডঃ পট্টনায়ক। জয়ন্তী!

এবার সামান্য তফাতেই ডঃ পট্টনায়কের সাড়া পাওয়া গেল।—এই যে, এদিকে জয়ন্তবাবু!

তারপর, অবাক কাণ্ড, ডঃ পট্টনায়কের বিগড়ে যাওয়া টর্চটা জ্বলে উঠল। আলো দেখাচ্ছিলেন উনি। আর পিছন ফিরে তাকালুম না। দৌড়ে সঙ্গ ধরলুম। তখন পট্টনায়ক বললেন, হঠাৎ থেমে গিয়েছিলেন নাকি?

কোনও জবাব দিলুম না।

বাইরে বেরিয়ে শ্বাস-প্রশ্বাস পড়ল স্বাভাবিকভাবে। মনে-মনে নাক-কান মলে গুম হয়ে ওঠা শুরু করলুম সবার আগে। পিছনে জয়ন্তী ও কর্নেলের হাসির শব্দ শুনলুম।

ওপরে গিয়ে হলদু গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে মাথা ঠান্ডা করছি, কর্নেলরা এসে গেলেন। জয়ন্তী চাপা হেসে বলল, কী হয়েছিল তোমার? পিছিয়ে পড়েছিলে কেন?

জবাব দিলুম না। সিগারেট বের করে ধরালুম। সেই সময় কর্নেল মৃদু হেসে কাছে এলেন।—ডার্লিং জয়ন্ত, আশা করি ভীষণ ভয়ের ব্যাপার কিছু ঘটেনি!

আর চুপ করে থাকা গেল না। রেগেমেগে বলে উঠলুম, আজ থেকে এই শেষ। আর কক্ষনো আমাকে কোথাও যেতে ডাকবেন না।

কর্নেল নিরীহ মুখে বললেন, আহা, অত রাগ কি তোমার মতো ছেলের শোভা পায়, জয়ন্ত? তুমি একটা জিনিয়াস ছেলে। তোমার সাহস আর শক্তির পরিচয় এর আগে তো কম পাইনি। হঠাৎ তুমি মিছিমিছি ভয় পেয়ে যাবে, এ তো ভাবতেই পারিনি আমরা?

এ একটা অদ্ভুত ব্যাপার, বুড়োর ওপর রাগ করে থাকা কিছুতেই যায় না। ওই কথাগুলো এমন গুরুত্ব দিয়ে বললেন যে, মনে হল উনি সত্যিই আমার জন্য সহমর্মিতা অনুভব করছেন। তাই রাগ খানিকটা কমিয়ে দিয়ে বললুম, থাক, খুব হয়েছে। আমি কচি খোকা নই।

কর্নেল চাপা গলায় বললেন, কী? হয়েছিল কী বলো তো?

গজগজ করে জবাব দিলুম, অনেক কিছুই। প্রথমত—আপনি ঘোষণা করলেন যে সবার পিছনে থাকবেন। অথচ পরে দেখি, আমাকে কনুইয়ের গুঁতো মেরে পিছনে ঠেলে দিলেন। দ্বিতীয়ত—ডঃ পট্টনায়কের টর্চ আচমকা বিগড়ানোর ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য। আপনাদের একটা ষড়যন্ত্র ছিল এর পিছনে। আমাকে নিয়ে মজা করতে চেয়েছিলেন। বলুন, এটা আমার পক্ষে অপমানজনক কি না। বলুন, এরপরও আপনাদের সঙ্গে ঘোরা আমার উচিত কি?

কর্নেল বিব্রতমুখে বললেন, আ ছিঃ-ছিঃ! ওকথা বোলো না জয়ন্ত।

ডঃ পট্টনায়ক একটু তফাতে দাঁড়িয়ে মৃদু-মৃদু হাসছিলেন। এবার কাছে এসে বললেন—চেঁচিয়ে উঠেছিলেন কেন জয়ন্তবাবু?

বললুম, দেখুন ডঃ পট্টনায়ক, ওই গুহার মধ্যে একটা অজগর-টজগর আছে, তাতে কোনও ভুল নেই।

—অজগর? কর্নেল আমার দিকে তাকালেন। পট্টনায়কও বিস্মিতমুখে তাকিয়ে রইলেন।

—হ্যাঁ। তা ছাড়া আর কী হতে পারে? আমার কোটের পকেটে মুখ ঢুকিয়ে দিয়েছিল সাপটা।

জয়ন্তী খিলখিল করে হেসে উঠল। এবং আশ্চর্য, কর্নেল আর ডঃ পট্টনায়কও হো-হো করে হেসে উঠলেন। সে-হাসি আর থামতে চায় না। আমি এক লাফে তক্ষুনি গাড়িতে উঠে বসলুম। ড্রাইভার বলল, ক্যা হুয়া সাহাব?

—কুছ নেহি। বলে গম্ভীর মুখে বসে রইলুম।

একটু পরে তিনজনে গাড়িতে ঢুকলেন। ঢুকেই কর্নেল আমার দিকে ঘুরে বললেন—তোমার ভুল হচ্ছে না তো জয়ন্ত? ওটা কি সাপ ঢুকছিল, নাকি কারুর হাত?

জবাব দিলুম না। কিন্তু কথাটা শুনেই আঁতকে উঠলুম। হৃৎপিণ্ডে এক ঝলক রক্ত উপচে উঠল।

কর্নেল হাসতে-হাসতে বললেন, সাপ হোক, আর হাতই হোক, ওটা যে খুবই নিরীহ বস্তু, তাতে আমাদের সন্দেহ নেই। ধরমবীর স্টার্ট দাও। তাড়াতাড়ি ফেরা দরকার। আর ডঃ পট্টনায়ক, তা হলে আমাদের অনুমান হুবহু সত্য বলে প্রমাণিত হল। তাই না?

লাঞ্চের পর হোটেলের বাইরে লনে গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে আগাগোড়া সবটা ভাবছিলুম। ভাবতে-ভাবতে টের পেলুম, প্রকৃত ব্যাপারটা কী ঘটেছে। গুহায় কর্নেলের পিছনে থাকার কথা চেঁচিয়ে বলে দেওয়া এবং আমাকে পিছনে ঠেলে দেওয়ার কারণ, কর্নেল জানতেন কেউ ওই কাগজটা হাতাতে চেষ্টা করবে। অর্থাৎ গুহার মধ্যে আগে থেকে কেউ লুকিয়ে ছিল কোথাও, কর্নেল জানতেন। কিন্তু তাকে হাতেনাতে ধরলেন না কেন উনি? যেন মজাটা আমার সঙ্গে নয়, তাঁর সঙ্গেই করলেন। সুতরাং, একটা ব্যাপার এতে স্পষ্ট। এই গুপ্ত লোকটিকে কর্নেল হাতেনাতে ধরতে চান না। স্বভাবমতো তার সঙ্গে লুকোচুবি খেলতে চান।

কিন্তু দুটো তীব্র প্রশ্ন সামনে ভেসে এল। এক ঃ সে-ই কি শ্যামলী ও পারেখের হত্যাকারী? দুই ঃ ওই কাগজে কী আছে?

প্রথম প্রশ্নটাব দিকে আলাদা করে তাকাতে গিয়ে রক্তে খিল ধরে গেল! ওরে বাবা! তা হলে তো সে অনায়াসে আমাকে খুন করতে পারত—ঠিক যে উপায়ে শ্যামলীকে খুন করেছে!

অথচ কর্নেল বলেছেন যে 'সেই হাতটা খুবই নিরীহ বস্তু!' কেন?

এই সময় জয়ন্তী হাসতে-হাসতে বেরিয়ে এল। আমার কাছে এসে বলল, কী ছোট গোয়েন্দামশাই, মনে-মনে খুব ঝাল ঝাড়া হচ্ছে কারও ওপর—তাই না?

বললুম—বয়ে গেছে! সিগারেট খাচ্ছি দেখতে পাচ্ছ না? তা ছাড়া যা গরম পড়েছে! হাওয়া নিচ্ছি গায়ে।

জয়ন্তী আরও কাছ ঘেঁষে দাঁড়াল। তারপর বলল, বুঝতে পারছি, তুমি আমার ওপর ভীষণ রেগে আছ। কর্নেলের আদেশের অবাধ্য হওয়ার ক্ষমতা ছিল না। আমাকে ভুল বুঝো না, জয়ন্ত।

—ঠিক আছে। আমি তো অবাধ্য হতে বলিনি কাউকে।

—কিন্তু এই চমৎকার পরিবেশে তোমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এখন অবাধ্য হতে ইচ্ছে করছে। এবার অনায়াসে জবাব দেব, প্রশ্ন করো।

ওর সুন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে অভিমান পুষে রাখা গেল না। বললুম, ওই কাগজটার কী ব্যাপার?

—ব্যাপার সত্যি বড্ড অদ্ভুত। তবে প্রথমে অতটা বুঝতে পারিনি বলে গুরুত্ব দিইনি এবং ভুলেও গিয়েছিলুম। ৬ তারিখে আমি আর শ্যামলী ওই গুহা দেখতে গিয়েছিলুম। আরও অনেক ট্যুরিস্ট ছিল ওখানে। বেশ ভিড় ছিল। অনেকে মোমবাতি হাতে নিয়ে ঢুকেছিল, তাই আলোর অভাব ছিল না। গুহার গায়ে আশ্চর্য সুন্দর সব ছবি আছে। অজন্তার মতো ফ্রেস্কো ছবি। তারপর কী হল শোনো। ভিড়ের মধ্যে কে শ্যামলীর হাতে একটা ভাঁজকরা কাগজ গুঁজে দিল। আমি দেখিনি, একটু পরেই শ্যামলী বলল সে-কথা। তখন দুজনে সেই অল্প আলোয় কাগজটা খুব পড়ার চেষ্টা করলুম। মোমের আলোগুলো নড়াচড়া করছিল। সেই ফাঁকে যতটা পড়া যায়, পড়লুম। লেখা আছে ঃ 'মোহন

পারেখ আসছে। সে একজন সাংঘাতিক লম্পট। ওর সঙ্গে মিশলে বিপদে পড়বেন। সাবধান।' আমরা তো অবাক। শ্যামলী বরাবর নির্বিকার, নির্লিপ্ত থাকতে চায়। কিছু গ্রাহ্য করা ওর স্বভাব নয়। দলাপাকিয়ে কাগজটা ফেলে দিয়েছিল। তারপর ও নিয়ে আমরা আর বিশেষ আলোচনা করিনি। ভুলেই গিয়েছিলুম।

—আমাকে বললে জানি না কোন মহাভারত অশুদ্ধ হত!

—কর্নেল বুড়ো নিষেধ করেছিলেন বলতে। বলেছিলেন, জয়ন্তকে নিয়ে একটু মজা করতে চাই।

বলে জয়ন্তী আমার হাত ধরে টানল।—চলো। ঘরে যাওয়া যাক। কী বাতাস এখানটায়!

লন পেরিয়ে লাউঞ্জে ঢুকলুম। দেখলুম, কর্নেল, ডঃ পট্টনায়ক আর ব্রিজেশ সিং কোণের দিকে বসে গম্ভীর হয়ে কী সব আলোচনা করছেন। আমরা সিঁড়ি বেয়ে ওপরে চলে গেলুম। ওপরের করিডোরে অধ্যাপক দ্বিবেদীর সঙ্গে দেখা হল। ভদ্রলোককে খুব মনমরা মনে হচ্ছিল। আমাদের দেখে একটু হাসলেন। কিন্তু কিছু বললেন না। আস্তে-আস্তে পাশ কাটিয়ে নেমে গেলেন। জয়ন্তী মুখ টিপে হাসল। সিঁড়ির দিকে ভদ্রলোক অদৃশ্য হলে সে বলল, ভদ্রলোক ওপরে ঘুরঘুর করে বেড়াচ্ছিলেন কেন, বুঝতে পারছ? সেই খামটার জন্যে।

ঘরের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলুম। তারপর বললুম, খামের মধ্যে একটা নেগেটিভ ছবি আছে, কর্নেল বলছিলেন। তুমি জানো ছবিটা কীসের বা কার?

জয়ন্তী মাথা দোলাল।

—জানলেও তো বলবে না। ঠিক আছে, বোলো না। তুমি তো এখন গোয়েন্দাপ্রবরের প্রধান শিষ্যা। আমি কোথাকার কে।

জয়ন্তী তেড়ে এল।—এই! আর ঝগড়া নয়। এবার কিছুক্ষণ দিবানিদ্রার ব্যাপার আছে।

—তা তুমি নিজের ঘরে যাও না।

জয়ন্তী গাল ফুলিয়ে বাচ্চা মেয়ের মতো বলল, তাড়িয়ে দিচ্ছ?

ওর দু-কাঁধ ধরে মুখের ওপর ঝুঁকে বললুম, তা কি পারি? কিন্তু একটা কথা—তুমি যেভাবে দিবানিদ্রার প্রতি আসক্ত, তোমার যে ভুঁড়ি ও চর্বি হয়ে যাবে জয়া। তখন আর পাহাড়ে চড়তে পারবে?

জয়ন্তী ক্লান্ত ও বিষণ্ণভাবে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, শ্যামলী নেই। আর আমার পাহাড়ে চড়া হবে না, জয়ন্ত। ওর টানেই আমি মাউন্টেনিয়ারিংয়ের নেশায় পড়েছিলুম।

এতক্ষণে ওকে সত্যিকার আদর করতে-করতে বললুম, ঠিক আছে। এবার লক্ষ্মী মেয়েদের মতো—বনেদি বাঙালি মেয়েদের ভঙ্গিতে স্রেফ কুলবধূ হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করো। কেমন?

ও মৃদু ধাক্কা দিয়ে একটু সরে বলল, বধূ হই আর যা হই, তুমি কিন্তু বিশেষ আশা করে বসো না। কারণ, আশা অনেক সময় শুধু ছলনায় ফুরিয়ে যায়।...

আট : আবার অশরীরী আত্মার আবির্ভাব

কর্নেলের আর পাত্তা নেই সে বেলার মতো। বিকেলে অগত্যা জয়ন্তী আর আমি বেড়াতে বেরোলুম। মোল্লার দৌড় মসজিদ—আমাদের ওই ভূতের পাহাড়। স্বীকার না করে উপায় নেই, অত সুন্দর পাহাড় আর এলাকায় দুটি নেই। তা ছাড়া কী এক গভীর রহস্যময় আকর্ষণ আছে যেন ওটার, বারবার যেতে ইচ্ছে করে। ভয় পেলেও ভালো লাগে ওখানে গিয়ে বসে থাকতে। চারদিকের দৃশ্যাবলীর তো তুলনাই নেই।

আমরা আজ প্রস্রবণটা আবিষ্কার করে ফেললুম। তারপর অনেকটা ঘুরপথে চুড়োর দিকে উঠতে শুরু করলুম। উত্তরে খাড়াই ভেঙে ওঠা সম্ভব ছিল না। কিন্তু অভিজ্ঞা জয়ন্তী কর্নেলের আবিষ্কৃত পথটা খুঁজে বের করল। আমার একটু কষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু জয়ন্তী অক্লেশে উঠে যাচ্ছিল আর আমার অসহায় দশা উপভোগ করছিল।

এক জায়গায় খানিকটা ঢালু চাতাল টালি বা করোগেট শিটের চালের মতো নেমে গেছে। আমাকে দাঁড় করিয়ে রেখে জয়ন্তী তরতর করে সেখানে চলে গেল। তারপর ঘুরে-ফিরে এদিক-ওদিক দেখে হাত ইশারায় ডাকল। খুব সাবধানে গেলুম ওর কাছে। গিয়ে দেখি, চাতালটার সব জায়গায় ছোট-বড় অনেক গর্ত আছে। গর্তগুলোর ব্যাস কমপক্ষে এক ফুট থেকে দেড় ফুট। গভীরতা আন্দাজ তিন থেকে চার ফুটের কম নয়। মনে হল, কারা যেন শামিয়ানা খাটাবার জন্যে প্রকাণ্ড সব খুঁটি পুঁতেছিল—কিংবা ইঞ্জিনিয়াররা এখানে কোনও কারখানা বানাবার জন্যে কংক্রিট থাম তৈরি করতে চেয়েছিল—অর্থাৎ একটা বাড়ির আয়রন স্ট্রাকচারের আয়োজন করা হয়েছিল। পরে যেন কোনও কারণে তা বাতিল করা হয়েছে, কিন্তু গর্তগুলো রয়ে গেছে।

অবাক হয়ে বললুম—এ-গর্তগুলো কীসের হতে পারে? ভারী অদ্ভুত তো।

জয়ন্তী বলল—ভূতের পাহাড়ে সবই অদ্ভুত হবে, এতে আশ্চর্য কিছু নেই।...বলে সে হাঁটু দুমড়ে একটা গর্তের কিনারায় বসল। তারপর মাথা নামিয়ে গর্তের ধারে কান পাতল।

আমি হাঁ করে তাকিয়ে আছি। জয়ন্তীর বালিকাপনা দেখছি।

সে হাত তুলে ডাকল—এই, শোনো। এখানে কান পাতো।

—কেন? বলে ওর কথামতো বসে পড়লুম। তারপর কান পাততেই একটা অদ্ভুত চাপা আওয়াজ পেলুম। টেলিগ্রাফের খুঁটিতে কান পাতলে একধরনের শোঁ-শোঁ আওয়াজ শোনা যায়। কিন্তু এই গর্তের আওয়াজ একেবারে অন্যরকম। ভুতুড়েই বলা যায় বরং। মনে পড়ে গেল সন্ধ্যায় ঝড়ের সময় যে বিকট আঁ—উ—উ—উ শুনেছিলুম, অবিকল তারই একটা খুদে নমুনা। মনে হল, পাহাড়ের ভেতরে গভীর কোনও জায়গায় কোনও প্রাগৈতিহাসিক প্রাণী আটকে পড়ে একটানা গর্জন করছে।

জয়ন্তী বলল—তা হলে একটা রহস্যের সমাধান হল। আওয়াজটা কোত্থেকে আসছিল বোঝা গেল। এখন বাতাস কম, তাই গর্তে কান না লাগালে শোনা যায় না। কিন্তু বাতাস বাড়লে আওয়াজও বাড়ে। আর ঝড়ের সময় কী ঘটে, তা তো কাল সন্ধ্যায় শুনেছি আমরা। প্রচণ্ড বাতাসের স্রোত গর্তের ওপর দিয়ে যাওয়ার সময় ভয়ংকর হুইসিল হয়ে বেজে ওঠে।

বললুম—হ্যাঁ, তাই বটে। কিন্তু গর্তগুলো কীসের বল তো?

জয়ন্তী কিনারায় পাথর খামচানোর চেষ্টা করতেই তা সুরকির মতো গুঁড়ো হয়ে গেল। অমনি হেসে উঠল সে।—আরে, এই পাথর আসলে মুচমুচে হয়ে রয়েছে। বেলেপাথর আছে একধরনের। সহজেই গুঁড়ো করা যায়। এই চাতালটা স্রেফ সেই জাতের পাথরের, বুঝেছ? সম্ভবত সারা শীতকাল উত্তরের প্রচণ্ড বাতাসের ধাক্কায় এইসব গর্তের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু এলাকার লোকেরা বড্ড বোকা তো। এসে কেউ ব্যাপারটা বোঝবার চেষ্টা করেনি কখনও।

বললুম—সব কিংবদন্তিরই উদ্ভব প্রাচীন যুগে। সময় এগিয়ে যায়, কিন্তু কিংবদন্তি টিকে থাকে। যাক গে, চলো—ওপরে গিয়ে বসি।

একটু পরেই সেই রিঙ্গেল ঝোপগুলো পেরিয়ে আমরা চুড়োয় উঠলুম। আজ কিন্তু চারদিকে তাকিয়ে জনপ্রাণীটি দেখতে পেলুম না।

হঠাৎ জয়ন্তী বলল—বাঃ! হেলিকপ্টার যে। দেখো, দেখো।

উত্তরপূর্ব দিকে একটা হেলিকপ্টার দেখলুম। সেটা একটু পরেই একটা উঁচু পাহাড়ের আড়ালে অদৃশ্য হল। বললুম—প্যাড তৈরি হয়ে গেছে তা হলে।·নেমে পড়ল মনে হচ্ছে।

জয়ন্তী অন্যমনস্কভাবে বলল—তা হলে বাইরের সঙ্গে যোগাযোগ এতক্ষণে চালু হল বলা

যায়। কিন্তু এবার আমার সামনে ভয়ংকর এক সময় আসছে। শ্যামলীর বাড়িতে খবর দিতে হবে। কেমন করে মুখ দেখাব ওঁদের কাছে! ওর বডিটারই বা কী হবে?

ওর চোখদুটো জলে ভরে উঠল। ওকে সান্ত্বনা দিতে ব্যস্ত হলুম।

কিছুক্ষণ পরে পশ্চিম আকাশে আজও মেঘের আভাস লক্ষ করে নীচে নামলুম। পথে যেতে-যেতে বাতাস বেড়ে গেল হঠাৎ। হোটেলে পৌঁছে দেখি, কর্নেল ব্যস্তভাবে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন। বললেন—এখন ঘরে নয়। আমরা শ্রীমতী মালহোত্রার বাড়িতে যাব। আর সবাই চলে গিয়েছেন। আমি তোমাদের নিয়ে যাব বলে দাঁড়িয়ে আছি।

জয়ন্তী বলল—কিন্তু এই ঝড়ের মধ্যে!

—ঝড় কোথায়? এমন আবহাওয়া এখানে এখন প্রতিদিনই পাবে। চলো, দেরি করা যাবে না।

তিনজন পথে নামলুম যখন, তখন আকাশের অবস্থা ভয়াবহ। ঘড়িতে সময় সবে ছ'টা কুড়ি। শ্রীমতী মালহোত্রার বাড়ির গেটে ঢোকার সময় প্রচণ্ড শব্দে কোথায় বাজ পড়ল। তারপর শুরু হল মেঘগর্জন। বাতাসও খেপে গেল। আমরা সোজা গিয়ে ডাইনিং হলে ঢুকে পড়লুম।

ভেতরে চাপা আলো জ্বলছে। কোনার সোফায় বসে আছেন ডঃ পট্টনায়ক, আর এক অচেনা ভদ্রলোক। মাঝামাঝি জায়গায় একটা চেয়ারে চুপচাপ গম্ভীর মুখে বসে রয়েছেন রঘুবীর জয়সোয়াল। আর অধ্যাপক দ্বিবেদী ও শ্রীমতী মালহোত্রা ডাইনিং টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে চাপাস্বরে কী সব আলোচনা করছেন।

আমাদের দেখে শ্রীমতী মালহোত্রা মৃদু হেসে আপ্যায়ন জানালেন। আমরা তিনজনে গিয়ে বসলুম ডঃ পট্টনায়কের কাছে। অচেনা ভদ্রলোকটির বয়স সত্তরের কম নয়। সাদা চুল, আর মস্ত গোঁফ। তিনি কর্নেলের দিকে বাও করে বললেন—হ্যাল্লো।

কর্নেলও বললেন—হ্যাল্লো!

কিন্তু আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন না ভদ্রলোকের। এই সময় শ্রীমতী মালহোত্রাকে কিচেনের দরজায় ঢুকতে দেখলুম। অধ্যাপক পায়চারি শুরু করলেন। ঘরে অস্বাভাবিক স্তব্ধতা। ব্যাপারটা কী?

বাইরে যথারীতি প্রচণ্ড ঝড় আর মেঘের তাণ্ডব চলেছে। অস্বস্তিতে মনে-মনে অস্থির হচ্ছিলুম। জয়ন্তীর মুখে একটা উৎকণ্ঠা জড়িয়ে আছে মনে হল। সে মুখ নিচু করে নিজের কড়ে আঙুলে কিছু দেখছে।

কিচেন থেকে গৃহকর্ত্রী বেরিয়ে এলেন। সঙ্গে লছমন আর সরযূ। ওদের হাতে ট্রে। নিঃশব্দে সকলের সামনে ট্রে ধরলে প্রত্যেকে কাপ তুলে নিলেন। সরযূ চমৎকার কফি করে।

যতক্ষণ কফি খাওয়া হল, কেউ কোনও কথা বললেন না। এই সময় দরজায় কে ধাক্কা দিচ্ছে মনে হল। লছমন এগিয়ে যাচ্ছিল, শ্রীমতী মালহোত্রা কড়া স্বরে বলে উঠলেন—লছমন। বরাবর বলেছি না, রাত্রিবেলা ওভাবে কক্ষনো ঝোঁকের মাথায় দরজা খুলবে না। চলে এসো। ও কেউ না—এমনি আওয়াজ। ও কিছু না।

ডঃ পট্টনায়ক বললেন—এমনি আওয়াজ! বলেন কী মিসেস মালহোত্রা!

—হ্যাঁ। বিশ্বাস না হলে দরজা খুলে দেখতে পারেন আপনারা। ঝড়ের রাত্রে বরাবর এমন হয়। সে রাতে বদ্রী যদি নিষেধ মেনে দরজা না খুলত, কোনও বিপদ ঘটত না।

কর্নেল একটু হেসে বললেন—আমার মনে হয় ম্যাডাম, আপনার ও-দরজার কপাটের গঠনে ত্রুটি আছে। আমরা পরীক্ষা করে দেখেছি। জোরে বাতাস বইলে অমন শব্দ হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

শ্রীমতী মালহোত্রা গম্ভীর হয়ে গেলেন।—আপনি অভিজ্ঞ মানুষ কর্নেল। অনেক ব্যাপারে আপনার মতামতের মূল্য আছে নিশ্চয়। কিন্তু মনে রাখবেন, অপ্রাকৃত শক্তির অস্তিত্ব সহজে উড়িয়ে

দেওয়া যায় না। যাক গে, প্রায় সাতটা বাজে। এবার আমরা আসরে গিয়ে বসতে পারি।

আসর। আমি জয়ন্তীর দিকে সপ্রশ্ন তাকালুম। জয়ন্তী চোখ নামাল। মুখটা উৎকণ্ঠায় ভরে আছে এখনও।

শ্রীমতী মালহোত্রা পা বাড়িয়ে বললেন—প্লিজ, আপনারা আর দেরি করবেন না। এমন সময় তো প্রতিদিন পাওয়া যাবে না। প্রাকৃতিক দুর্যোগের এই চমৎকার সুযোগ আমাদের ব্যর্থ হতে দেওয়া উচিত নয়।

তা হলে আবার অশরীরী আত্মার কারবার। অস্বস্তিটা বেড়ে গেল। এসব হচ্ছেটা কী! কর্নেলের দিকে তাকালুম। উনি বললেন—চলো জয়ন্ত। জয়ন্তী, ওঠো। ডঃ পট্টনায়ক। আপনার মাননীয় বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে আসুন তাহলে।

স্টাডির চাবি আজ শ্রীমতী মালহোত্রার কাছে। তিনি দরজা খুলে দিলেন এবং একধারে দাঁড়িয়ে কপাটটা আটকে থাকলেন। সেদিনকার মতো। আমরা একে-একে ঢুকে পড়লুম।

সেই মারাত্মক ঘর আর সেই আটটা চেয়ার, মধ্যে সেই গোলটেবিলটা। পকেটে হাত ভরে রিভলভারটার অস্তিত্ব অনুভব করলুম। কিন্তু যদি সত্যি আজও কোনও মারাত্মক ঘটনা ঘটে, আমি কি এই অস্ত্রটা দিয়ে তা আটকাতে পারব?

অবিকল সেদিনকার মতো বসে পড়লুম সবাই। আমার ডাইনে রইল জয়ন্তী, বাঁ-দিকে কর্নেল। আর শ্যামলীর চেয়ারে বসলেন সেই আগন্তুক ভদ্রলোক। ওই বুড়োই কি আজকের আসরের মিডিয়াম?

উজ্জ্বল আলোটা নিভিয়ে তক্ষুনি হালকা নীল আলো জ্বাললেন শ্রীমতী মালহোত্রা। তারপর দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে সেদিনকার মতো বক্তৃতা শুরু করলেন।—বন্ধুগণ! আজ আমার দীর্ঘ সারগর্ভ বক্তৃতার প্রয়োজন আশা করি হবে না। আজকের আসরে যিনি মিডিয়াম হতে চান, তিনি ডঃ সীতানাথ পট্টনায়কের বন্ধু—অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল হরগোবিন্দ সিং। উনি আজ বিকেলেই হেলিকপ্টারে সরকারি ত্রাণ দফতরের প্রতিনিধি হিসেবে বাণেশ্বরে এসে পড়েছেন। আমার মতোই ওঁর প্রেতচর্চার আগ্রহ খুব প্রবল, তা আমি ডঃ পট্টনায়কের কাছেই শুনেছি। শোনামাত্র আমার মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে। আপনারা জানেন, খুব সূক্ষ্ম সংবেদনশীল মন ও অনুভূতির প্রখরতা যাঁদের আছে, একমাত্র তাঁরাই মিডিয়াম হওয়ার উপযুক্ত। স্থূল মন, অনুভূতির বালাই নেই, সূক্ষ্ম গভীর ভাবনা ভাবতে অপটু, এমন কোনও মানুষের পক্ষে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বস্তুপ্রবাহে ভাসমান সেই বিমূর্ত চিন্তাতরঙ্গ ও চেতনা—যা বস্তুর নিয়ম মেনে চলে না, তা ধরা সম্ভবই নয়। আনন্দ ও আশার কথা, আমাদের নবাগত বন্ধু মিঃ সিং একজন শৌখিন মিডিয়াম হিসেবে অনেকখানি অভিজ্ঞতা রাখেন। জানি না, এই আকস্মিক যোগাযোগের পিছনে আমাদের বিপরীত জগতের সেই অশরীরী বাসিন্দাদের কতখানি হাত আছে—তবে ডঃ পট্টনায়কের কাছে ওঁর পরিচয় পেয়েই আমি সঙ্গে-সঙ্গে এই আসরের প্রস্তাব দিয়েছিলুম। এখন কথা হচ্ছে, আজ এই আসরের মুখ্য উদ্যোক্তা হিসেবে আমি প্রস্তাব করছি, হতভাগিনী শ্যামলী সেনের আত্মাকে উনি আজ আহ্বান করুন।

অধ্যাপক দ্বিবেদী বলে উঠলেন—কিন্তু উনি তো চিনতেনই না শ্যামলীকে।

জয়সোয়ালজি ঘোঁতঘোঁত করে হাসলেন শুধু।

কর্নেল বললেন—তাও তো বটে।

শ্রীমতী মালহোত্রা কী বলতে যাচ্ছিলেন, মেজর জেনারেল ভদ্রলোক একটু কেশে বিনীতভাবে বললেন—শ্যামলী সেন আমার সুপরিচিতা। মানালি অভিযানের সময় আমি ওঁর দলকে ট্রান্সপোর্টের ব্যাপারে সাহায্য করেছিলুম। জয়ন্তীদেবীর আশা করি মনে আছে?

জয়ন্তী কিছু বলতে ব্যস্ত হওয়ামাত্র কর্নেল আমার পায়ের ওপর দিয়ে একটা পা বাড়িয়ে জয়ন্তীর পায়ে মৃদু ধাক্কা দিলেন—ব্যাপারটা আমি আর জয়ন্তী ছাড়া কেউ টের পেল না। জয়ন্তী অমনি আমতা-আমতা করে বলে উঠল—হ্যাঁ, হ্যাঁ—আপনিই তো। মনে আছে বইকী। খুব মনে

আছে।

কিন্তু জয়ন্তীর চোখের বিস্ময়টুকু আমার চোখ এড়িয়ে গেল না।

শ্রীমতী মালহোত্রা বললেন—তা হলে এবার আলো নেভাই। অনুগ্রহ করে কেউ যেন কোনও শব্দ করবেন না। রেডি—ওয়ান...টু...থ্রি...।

আলো নিভে যাওয়ার মুহূর্তে জয়সোয়ালজিকে অস্ফুটস্বরে বলতে শোনা গেল—পাগলামি।

ঘন অন্ধকারে চুপচাপ বসে আছি তো আছি। কোনও শব্দ নেই ঘরে। কিন্তু বাইরে ঝড় ও মেঘের হাঁকডাক সমানে চলেছে। ভয়ে বুক টিপটিপ করছিল। আজও কোনও অঘটন ঘটবে না তো? কর্নেল কেন এসব ঘটতে দিচ্ছেন? আমার অস্বস্তিটা বেড়ে যেতে লাগল ক্রমশ। কিন্তু না—এখন অন্য কোনও ভাবনা নয়, শ্যামলীর কথা ভাবা উচিত। তার আত্মাকেই আজ আনা হবে। কাজেই স্থির মনে তার কথা ভাবা যাক।

ভাবতে গিয়ে সে রাতের সব ঘটনা আগাগোড়া মনে পড়তে লাগল। হ্যাঁ, আমি এত অবাক হয়েছিলুম যে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েছিলুম ঝোঁকের বশে। ভূতপ্রেতে একতিল বিশ্বাস আমার নেই। তাই পরীক্ষা করে দেখতে যাচ্ছিলুম, যদি সত্যি ভূত-প্রেত শ্যামলীকে ভর করে থাকে তা হলে আমার এই গতিবিধি টের পাবে এবং অবশ্যই এর একটা প্রতিক্রিয়া ঘটবে। কিন্তু ধুরন্ধর কর্নেলের জন্যে সেটায় বাধা পড়েছিল। আমার কোটে টান পড়া মাত্র ছিটকে নিঃশব্দে চেয়ারে এসে বসেছিলুম। আজ কিন্তু সে ঝোঁক আর আমার নেই।...আচ্ছা, একটা কথা—আমার বাঁ-দিকে ছিলেন কর্নেল, তাঁর বাঁ-দিকে ডঃ পট্টনায়ক। তা হলে ডঃ পট্টনায়ককে ডিঙিয়ে কীভাবে কর্নেল টের পেলেন যে জয়সোয়ালজির চেয়ার খালি?...হ্যাঁ, কর্নেলও চেয়ার ছেড়ে উঠেছিলেন তা হলে। কেন উঠেছিলেন? আমি যেজন্যে কৌতূহলী হয়েছিলুম, উনিও কি সেজন্যেই?...আর একটা কথা, শ্যামলী কি ইচ্ছে করেই অমন বিকৃত দুর্বল স্বরে কথা বলছিল?

আমার চিন্তাসূত্রকে মুহূর্তে বিচ্ছিন্ন করে দিল একটা ভাঙা খ্যানখেনে স্বর। সেই মুহূর্তে বাজ পড়ল বাইরে কোথাও। ঘরটা জোরে কেঁপে উঠল। টেবিলটাও একবারের জন্যে নড়ে গেল যেন।—আমি আছি...আমি আছি...আমি আছি।...এই ঘরে আছি। এই বাড়িতে আছি। এই পাহাড়ে আছি। জঙ্গলে আছি। রাস্তায় আছি...। আছি...আছি...আছি...।

ও কি মেজর জেনারেল হরগোবিন্দ সিংয়ের কণ্ঠস্বর? অসম্ভব। 'আছি' শব্দটা ক্রমাগত শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে উচ্চারিত হতে থাকল। মনে হল সারা অন্ধকার ঘরে আটকে-পড়া কী একটা শক্তি পাখির মতো ডানা ঝাপটাচ্ছে। আই একজিস্ট...আই একজিস্ট।

(এখানে একটা কথা বলা দরকার, বাগেশ্বরে অন্য লোকের সঙ্গে কিংবা শ্রীমতী মালহোত্রার বাড়িতে আমরা সবাই ইংরেজিতে কথা বলেছি বা বলি। মিডিয়ামও তাই ইংরেজিতেই কথা বলবে, এটা স্বাভাবিক। শ্যামলীও বলেছিল।)

এবার ভেসে উঠল শ্রীমতী মালহোত্রার কণ্ঠস্বর।...হু আর ইউ? কে তুমি?

অন্তত তিনবার প্রশ্নের পর জবাব শোনা গেল—আমি শ্যামলী, আমি শ্যামলী, আমি শ্যামলী...।

বোঝা যাচ্ছিল প্রশ্ন না করলে অশরীরীর কথা কিছুতেই থামবে না। প্রশ্ন করতে শুনলুম জয়ন্তীকে।—শ্যামলী, শ্যামলী। তোকে কে মেরেছে রে?

—তুই কি জয়ন্তী, তুই (ইউ) জয়ন্তী, তুই কি জয়ন্তী?

—হ্যাঁ, আমি জয়ন্তী। তোকে কি মোহন পারেখের আত্মা খুন করেছিল সে রাতে?

—বলব না, বলব না, বলব না...।

—শ্যামলী, বল, তাকে আমরা শাস্তি দেব।

জয়ন্তীর এই কথার সঙ্গে-সঙ্গে শ্রীমতী মালহোত্রাও প্রশ্ন করলেন—কে মেরেছিল মোহন

পারেখকে? তার সঙ্গে অধ্যাপক দ্বিবেদীর ভীতু গলার প্রশ্ন যোগ দিল—বলুন, বলুন, মোহন পারেখ কাকে চিনতে পেরেছিল? কে সে?

শ্রীমতী মালহোত্রা অমনি চাপা গলায় গর্জালেন—চুপ! কেউ কোনও প্রশ্ন নয়। শুধু আমাকে প্রশ্ন করতে দিন।

ওদিকে এইসব হট্টগোলের মধ্যে কিন্তু সমানে সেই খ্যানখেনে স্বরের আওয়াজটা একটানা শোনা যাচ্ছে—বলব না, বলব না, বলব না...।

শ্রীমতী মালহোত্রা তীক্ষ্ণস্বরে বললেন—শ্যামলী, মোহন পারেখ কাকে চিনতে পেরেছিল?

—মহাবীর সিংকে...মহাবীর সিংকে...মহাবীর সিংকে.. ।

—কীভাবে মোহনের মৃত্যু হল?

—ফোনে ডেকেছিল। ভূতের পাহাড়ে যেতে বলেছিল।

—কেন?

—নিষ্পত্তি করতে চেয়েছিল। টাকা দেবে বলেছিল। ফোটো চেয়েছিল।

—বোঝা যাচ্ছে না। খুলে বলো!

—বলব না, আর বলব না।

—প্লিজ, শ্যামলী!

—পারেখ সাহস করে ফোটো নিয়ে যায়নি সঙ্গে। আমার কাছে রাখতে দিয়েছিল।

—কার ফোটো, শ্যামলী? কার ফোটো?

সে-কথার জবাব নেই। শ্যামলীর আত্মা বলে উঠল—ভূতের পাহাড়ে পারেখ গেল। আমাকে জানিয়ে গেল। আপনাকে জানাতে বললুম—সে আপনার বাড়ি হয়ে গেল। আপনি ছিলেন না। সুমিত্রাজিব বাড়ি গিয়েছিলেন। তখন আমি চুপিচুপি ওকে অনুসরণ করে ব্যাপারটা দেখতে গেলুম। পাথবেব আড়ালে বসে দেখলুম, মহাবীর সিং ধাক্কা মেরে পারেখকে ফেলে দিল। আমি ভয় পেযে পালিযে এলুম। জয়ন্তীকে বললুম না—ও আমাকে খুব বকবে বলে ভয় হল। জয়ন্তীকে আমার গার্জেন বলে সমীহ করতুম।...তাবপর...।

আচমকা জোরালো টর্চ জ্বলে উঠল, সেইসঙ্গে কর্নেলের গর্জন শোনা গেল—খবরদার মহাবীর সিং!

টর্চের আলোয় দেখা গেল, মেজর জেনারেল সেই মুহূর্তে উঠে দাঁড়িয়েছেন এবং তাঁর ডাইনের চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন রঘুবীর জয়সোয়াল—আব মেজর জেনারেল চোখের পলকে তাঁর বুকে ঘুষি মারলেন। জয়সোয়ালজি চেয়ারসুদ্ধ পড়ে গেলেন সশব্দে। অমনি উজ্জ্বল আলো জ্বলে উঠল ঘরে।

তারপর ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দেখি, বুকসেলফ আর উঁচু আলমারির পিছন থেকে একটি করে লাফ দিয়ে বেরিয়ে এলেন মিঃ খান্না আর ব্রিজেশ সিং। দুজনের হাতেই রিভলভার। খান্না জয়সোয়ালজির জামার কলার ধরে হ্যাঁচকা টানে দাঁড় করালেন।

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে এসব ঘটে গেল।

এবার দেখলুম, কর্নেল আর ডঃ পট্টনায়ক মেঝেয় কী খুঁজে বেড়াচ্ছেন ব্যস্তভাবে। জয়ন্তী আর আমি হাঁ করে তাকিয়ে আছি—চেয়ার থেকে ওঠার কথা ভুলেই গেছি। ওদিকে শ্রীমতী মালহোত্রা এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দিলেন। তখন চার-পাঁচজন পুলিশ এসে ঢুকে পড়ল। তারপর জয়সোয়ালজিকে ধরল। তখন খান্না ওঁর হাতে একটা হাতকড়া পরিয়ে দিলেন। জয়সোয়ালজি একটা কথাও বললেন না।

তা হলে জাঁদরেল রিটায়ার্ড পুলিশ সুপার রঘুবীর জয়সোয়ালই হত্যাকারী! আমি সন্দিগ্ধদৃষ্টিতে জয়ন্তীর দিকে তাকালুম। আর এতক্ষণে জয়ন্তীর যেন সংবিত ফিরল। সে উঠে দাঁড়িয়ে ফিসফিস

করে বলল—চলো জয়ন্ত, আমরা বেরিয়ে ওঘরে যাই। আমার বুক কাঁপছে।

দুজনে বেরিয়ে ডাইনিং হলের কোনায় সোফায় গিয়ে বসে পড়লুম। কী বলব পরস্পর, ভেবেই পাচ্ছিলুম না। আমি চুপচাপ সিগারেট টানতে থাকলুম, জয়ন্তী একবার অস্ফুটস্বরে বলল—ভীষণ মাথা ধরেছে, তারপর মাথাটা হেলিয়ে বসে রইল। বাইরে ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে শুনতে পাচ্ছিলুম। মাঝে-মাঝে মেঘ ডেকে উঠছে।

একটু পরে স্টাডির দরজা খুলে গেল। প্রথমে ব্রিজেশ সিং ও সেই পুলিশবাহিনী জয়সোয়ালজিকে নিয়ে বেরোলেন। ডাইনিং হল পেরিয়ে সদর দরজা খুলে ওঁরা বৃষ্টির মধ্যেই অদৃশ্য হলেন। পরক্ষণে গাড়ির শব্দ শোনা গেল। আসামি নিয়ে ওঁরা থানায় চলেছেন।

এবার বেরোলেন হাসিখুশি মুখে অধ্যাপক অরিন্দম দ্বিবেদী। খুব চঞ্চল দেখাচ্ছিল ভদ্রলোককে। হনহন করে এসে আমাদের পাশে বসে পড়লেন। তারপর একটু কেশে বললেন—কথাটা হচ্ছে, আমি সব টের পেয়েছিলুম, জানেন? কিন্তু প্রাণের ভয়ে বলিনি। বললেই বা কে বিশ্বাস করত বলুন? ওরে বাবা, রিটায়ার্ড পুলিশসুপার—অত দাপট আছে নামের। থানা আমাকে পাত্তা দিত ভাবছেন? উলটে আমাকেই খুনি সাব্যস্ত করে কেস সাজাত। বাপ্‌স্‌! রক্ষে করো বাবা।

জয়ন্তী হঠাৎ উঠল।—এই, কফি বলে আসি সরযূকে। আর দেখি ট্যাবলেট পাই নাকি।

সে কিচেনের দিকে চলে গেলে অধ্যাপক ফিসফিস করে বললেন—জয়ন্তী দেবী কিন্তু আমার ব্যাপারটা টের পেয়েছিলেন, জানেন?

তাকালুম ভদ্রলোকের দিকে। তাতে যেন উনি ঘাবড়ে গেলেন। থতমত খেয়ে ফের বললেন—বরাবর মিঃ চাউড্রি, শিক্ষক হিসেবে আমার একটা কঠোর আদর্শ আছে। সেটা মেনে চলি। দুর্নীতি বা অন্যায় দেখলেই সাধ্যমতো বাধা দেওয়ার চেষ্টা করি। কিন্তু বুঝতেই পারছেন, আমার শারীরিক সামর্থ্য ততটা নেই। তাই অনেক সময় পিছিয়ে আসতে হয়। যেমন ধরুন, মোহন পারেখের ব্যাপারটা...।

বললুম, মোহন পারেখকে আপনি চিনতেন নাকি?

—আলবাত চিনতুম। ও তো মাস্তানটাইপ ছোকরা, মশাই। দিল্লিতে এসে গত বছর যা সব কাণ্ড করেছিল, ভাবতে পারবেন না। আর আজকালকার মেয়েগুলোর কী ব্যাপার দেখুন। ছ্যা ছ্যা ছ্যা। পারেখকে দেখলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে তক্ষুনি। তা বুঝলেন মিঃ চাউড্রি? মিসেস মালহোত্রা যখন কথায়-কথায় সেদিন আমাকে বললেন, এবারও প্ল্যানচেটের আসর করব এবং মোহন পারেখ মিডিয়াম হবে—তাকে আনতে টেলি করেছি, আমার খুব রাগ হল। খবর নিলুম, গ্রিন ভিউয়ে ওর জন্যে ঘর বুক করা হয়েছে। জয়ন্তী দেবী আর শ্যামলী দেবীর মতো দুটি ফুলের মতো মেয়েকে পারেখ সামনে পেলে কী ঘটবে, ভাবতে বুক কেঁপে উঠল। ভাবলুম, ওঁদের সতর্ক করে দেওয়া দরকার। সোজাসুজি সামনাসামনি বললে তো অপমানিত হওয়ার ভয়। তাই লাধিয়া নদীর ধারে একটা গুহার মধ্যে সুযোগ পেয়ে একটা চিরকুট লিখে দিলুম।

বাধা দিয়ে বললুম—জানি। আরও জানি, আজ ওই গুহার অন্ধকারে আমার পকেটে হাত ঢুকিয়েছিলেন। চিরকুটটা আবার কী হাঙ্গামায় ফেলে ভেবে ওটা খুঁজতে গিয়েছিলেন।

অধ্যাপক হাসলেন।—জানেন? তা কাণ্ড দেখুন। একালের মেয়েদের সত্যি বোঝা যায় না, মশাই। সেদিন ওটা পেয়ে ওরা মোটেও চমকালেন না, ভয় পেলেন না। বরং উলটে আমাকে দেখিয়ে-দেখিয়ে পারেখের সঙ্গে মেলামেশা শুরু করলেন। আমার আবার ওই এক বাতিক। যাঃ, বেটাচ্ছেলে কখন নিষ্পাপ মেয়ে দুটোর সর্বনাশ করবে, কে জানে। খুব তক্কে-তক্কে রইলুম। দেখলুম, পারেখের সঙ্গে শ্যামলী দেবীরই জমে উঠেছে। জয়ন্তী দেবী যেন অভিমানে দূরে-দূরে ঘুরছেন। ৭ তারিখ বেলা এগারোটা নাগাদ পারেখের ঘরের দিকে নজর রেখেছি, দেখলুম বেটা বেরিয়ে এসে লাউঞ্জে গিয়ে দাঁড়াল—তারপর শ্যামলী এল নেমে। আমি ওঁদের ঢলাঢলি দেখেই বুঝলুম, আজই সর্বনাশটা ঘটবে।

তাই অমনি পারেখের ঘরে ঢুকে ওয়াডবোবের পিছনে লুকিয়ে থাকলুম। যদি সত্যি দেখি, বেটা মেয়েটির সর্বনাশ করতে যাচ্ছে—তা হলে আমার একদিন কী ওর একদিন! কান পেতে অপেক্ষা করছি, এমন সময় দুজন ঢুকল। তারপর চাপা গলায় বলা শুরু হল। শুনেই পিলে চমকে গেল আমার। এ যে সম্পূর্ণ অন্য একটা ব্যাপার নিয়ে আলোচনা চলছে! পারেখ বলছে, মহাবীর সিং নামে একজনের সঙ্গে ও ভূতের পাহাড়ে দেখা করতে যাচ্ছে—খুব গোপনীয় ব্যাপার। আর এই খামটা ওঁকে দেয়। খামটা খুব দামি। লুকিয়ে রাখতে হবে। ফোনে পারেখ জেনেছে, মিসেস মালহোত্রা এখন বাড়ি নেই। তা হলে তাঁকেই দিত। শ্যামলী বলল—সকালে তো উনি এসেছিলেন, তখন দিলেন না কেন খামটা? পারেখ বলল—তখন দেওয়ার কোনও প্রশ্ন ওঠেনি। তা ছাড়া ওটা বিশেষ করে শ্রীমতী মালহোত্রাকে সে দেওয়ার কথা ভাবতেও পারে না। যাই হোক, শ্যামলীকে তার ভালো লেগেছে। তাকে সে বিশ্বাস করে বলেই রাখতে দিচ্ছে। শ্যামলী খামটা বুকে ভরে ফেলল দেখলুম। তারপর দুজনে বেরিয়ে গেল। এবার আমার অবস্থা বুঝুন। বেরোব কীভাবে? দরজা তো লক করে দিয়ে গেল। মনে পড়ল, ঠিক তিনটেয় সুইপার আসে ঘর সাফ করতে। সর্বনাশ।

—তা হলে ওইদিন আপনি তিনটে অবধি পারেখের ঘরে বন্দি থাকলেন?

—হ্যাঁ। কী দুরবস্থা বুঝুন। কর্নেলকে মিথ্যে বলতে হল যে জলপ্রপাত দেখতে গিয়েছিলুম।

—বেরোলেন কীভাবে?

—পারেখের বিছানায় শুয়ে সময় কাটাচ্ছিলুম। (মশাই, বেটাচ্ছেলে মরে নরকেই গেছে।) সেই সময় ওর বিছানার তলায় যা-সব ছবি পেয়েছিলুম, ছ্যা-ছ্যা। খিদে ভুলিয়ে দিয়েছিল।

—আহা, বেরোলেন কী করে?

—দরজা দিয়ে। সুইপার ঢুকল হোটেলের চাবিতে দরজা খুলে। আমি বেরিয়ে গেলুম। ব্যাটা হাঁ করে তাকিয়ে রইল। ভাবল, পারেখের কুটুম্ব হবেন। যাক গে, খুনি ধরা পড়ল। এখন দেখা যাক, বিচারে কী হয়। দেখবেন—প্রমাণাভাবে বেকসুর খালাস হয়ে যাবে। আজকাল তো বিচার নয়—প্রহসন। প্রহসন।

এতক্ষণে কর্নেল নীলাদ্রি সরকার, মেজর জেনারেল হরগোবিন্দ সিং, ডঃ সীতানাথ পট্টনায়ক, শ্রীমতী সরোজিনী মালহোত্রা আর খান্না সায়েব বেরোলেন। ডঃ পট্টনায়কের হাতে একটা কাগজের মোড়ক।

তারপর জয়ন্তী আর সরযূ বেরিয়ে এল কিচেন থেকে—দুজনেরই হাতে ট্রে। সরযূ চলে গেল। জয়ন্তী কফি তৈরি করতে থাকল। কর্নেলরা এসে ভিড় জমালেন।

আমি কর্নেলের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলুম। প্রথামতো তাঁর এবার একটি দীর্ঘ ভাষণ দেওয়ার কথা। রহস্যের সমাধান ও চুলচেরা বিশ্লেষণ থাকবে তাতে।

একটু পরেই কফিতে চুমুক দিতে-দিতে কর্নেল বললেন—জয়ন্ত উসখুস করছে। ওর দু-চোখে কৌতূহল ক্রমশ তীব্র হচ্ছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই হত্যাকাণ্ডে বিশেষ কোনও রহস্য নেই। এত প্রাঞ্জল ব্যাপার আমার অভিজ্ঞতায় এই প্রথম।

তা হলে একেই বলে সাতকাণ্ড রামায়ণ পড়ে সীতা কি রামের মাসি? প্রাঞ্জল ব্যাপার মানে? এমন জটিল গোলমেলে ধাঁধায় ভরা হত্যাকাণ্ড কে কোথায় শুনেছে? আমি অবাক হয়ে তাকালুম ওঁর দিকে।

কর্নেল বললেন—প্রথম কথা, শ্রীমতী মালহোত্রার বিশ্বাসে আমি আঘাত করতে চাইনে—যা ঘটেছে, উনিও জানেন। আমি শুধু সংক্ষেপে তথ্যগুলো সাজিয়ে দিতে চাই। আমাদের দ্বিতীয় মিডিয়াম যে উদ্দেশ্যে অভিনয় করেছেন, শ্যামলীও তা করেছিল। উদ্দেশ্য, প্রেতাত্মার অছিলায় একটি হত্যাকাণ্ড ফাঁস করে দেওয়া। শ্যামলী সম্ভবত হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিল। প্রচণ্ড ভয়ও পেয়েছিল। এই বিদেশে তারা দুটি মাত্র মেয়ে, চারপাশে অনাত্মীয়, সদ্য চেনা মানুষ। আজকাল পুলিশেও লোকের

বিশ্বাস নেই। তাই তার পক্ষে এই বিভ্রান্তি খুবই স্বাভাবিক। অবশ্য জয়ন্তীকে সে বলতে পারত। বলেনি, পাছে জয়ন্তীর যা অতি-সাহসী চালচলন এবং বেপরোয়া মনোভাব—সে হইচই বাধিয়ে বসে এবং পরিণামে মহাবীরের হাতে তারা বিপদগ্রস্ত হয়। আবার, শ্রীমতী মালহোত্রাকেও সে বলেনি। সেও একই কারণে সম্ভবত। আমার ধারণা, মোহন পারেখ বিস্তারিত তথ্য তাকে জানায়নি। তাই শ্যামলী ঠিক বুঝে উঠতে পারেনি, কী করা উচিত। সে সময় নিচ্ছিল ভাবতে—অথবা এড়িয়ে যেতে চাইছিল। ভেবেছিল, থাক, নাক গলিয়ে লাভ নেই।

জয়ন্তী বলে উঠল—ঠিক তাই। সেদিন আপনাদের সঙ্গে আসতে-আসতে সে বলেছিল, পরদিনই ভোরের বাসে চলে যাবে। জায়গাটা অসহ্য লাগছে। আমি অবাক হয়েছিলুম। কিন্তু ও যা অভিমানী আর জেদী, তাই হ্যাঁ না কিচ্ছু বলিনি।

কর্নেল বললেন—ঘটনাচক্রে শ্রীমতী মালহোত্রার প্ল্যানচেটের আসরে উপস্থিত থাকার সুযোগ পেল। তখন সুযোগটা কাজে লাগাতে চাইল। ভাবল, প্রেতের ঘাড়েই দায়টা চাপাবে। খুবই স্বাভাবিক শোনাবে হত্যাকাণ্ডের খবর। সে যদি নিপুণ অভিনয় করতে পারে, হত্যাকারীও ভয় পেয়ে ভাববে, প্রেতেরই কীর্তি! এ সবই অনভিজ্ঞ শ্যামলীর বালিকাসুলভ আচরণের পরিচয়। সে ভাবল—এমনিভাবে বিবেকদংশনের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবে, আবার মাথাও বাঁচাতে পারবে। কী বলেন ডঃ পট্টনায়ক?

ডঃ পট্টনায়ক বললেন—আপনার হাইপোথিসিস যুক্তিসিদ্ধ কর্নেল।

—আমার ধারণা, হত্যাকারীর নামটা সে হয়তো বলত না। অতটা সাহস তার ছিল না। সে বারবার 'বলব না' বলছিল মনে পড়ছে? কিন্তু হত্যাকারী তো অন্তর্যামী নয়। সে আর এক সেকেন্ডও রিস্ক নিতে চাইল না। ভাবল, আর এক মুহূর্তে নামটা বলে ফেলবে শ্যামলী। তাই সে জিভারোদের প্রথায় বিষাক্ত হুল ওর মাথায় বিঁধিয়ে দিল। হত্যাকারীও ভাবল, বাঃ! চমৎকার হল। প্রেতের ঘাড়েই চলে যাবে হত্যাকাণ্ডটা। কারণ, এই অদ্ভুত বিষের কথা আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান জানবে কেমন করে? বিশেষ করে শ্যামলীর মুখের বীভৎসতা আশা করি মনে পড়ছে আপনাদের। মৃতের মুখের অমন চেহারা আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের কাছে একেবারে অপরিচিত সিম্পটম! কাজেই ডাক্তাররা হাল ছেড়ে বলবেন, মৃত্যুর কারণ দুর্জ্ঞেয়। তার মানে—প্রেতের হত্যাকাণ্ড বলে বিশ্বাস করানো তখন বেশ সহজ হয়ে উঠবে!

ডঃ পট্টনায়ক বললেন—দেখুন না, অজ্ঞাত কিছু ইঞ্জেকশান দেওয়া হয়েছে বুঝতে পেরেছিলুম। অথচ সেই চিহ্ন খুঁজতে স্বভাবত আমরা দেহের অন্যান্য অংশে খুঁজেছি। মাথা খুঁজিইনি। যখন কর্নেল বললেন, প্যাথোজেনের প্রথম পর্যায়ের কলোনি কোথায় রয়েছে—তখনই মাথায় সূচের সূক্ষ্ম দাগ চোখে পড়ল। কারণ মাথাতেই সেই কলোনির খোঁজ পেয়ে গিয়েছিলুম।

কর্নেল বললেন—এই মহাবীর সিং ওরফে জাল পুলিশ সুপার রঘুবীর জয়সোয়াল উদয়চাঁদ ঝুনঝুনওয়ালা—যে ছিল হরিপ্রসাদ মালহোত্রার ব্যবসায়ের পার্টনার, সে একসময় দক্ষিণ আমেরিকায় ছিল। ওর আদি কীর্তির কথা কাস্টমস, সি-বি-আই, আর বোম্বে পুলিশের নথিভুক্ত হয়ে রয়েছে। শ্রীমতী মালহোত্রার কাছে এসব তথ্য আমরা জানতে পেরেছি। ওর খপ্পরে পড়ে দেনায় ডুবে যেতে থাকেন হরিহরজি। তখন ওরই পরামর্শে নির্বোধের মতো বিস্তর বেআইনি পথে টাকা রোজগারের চেষ্টা করেন। এর ফল হল আরও গুরুতর। উলটে মহাবীর সিং তাঁকে ব্ল্যাকমেল শুরু করল। তখন হরিহরজি একদিন ঝোঁকের মাথায় আত্মহত্যা করলেন। জিপসুদ্ধ ঝাঁপ দিলেন দিল্লি থেকে নৈনিতাল আসার পথে এক পাহাড়ি খাদে।

...এবার এখানে একটা কথা উল্লেখ করা দরকার। সরোজিনী দেবী উচ্চশিক্ষিতা মহিলা—নৈনিতাল গার্লস কলেজের অধ্যক্ষা। কিন্তু স্বামীর সঙ্গে বরাবর তাঁর বনিবনা ছিল না। স্বামীর কারবার এবং চালচলন মোটেও পছন্দ করতেন না। তিনি থাকেন নৈনিতালে, হরিহরজি দিল্লিতে। তিনি ভুলেও আনকালচার্ড স্বামীর কাছে যেতেন না। স্বামী আসতেন কদাচিৎ। তাই স্বামীর পার্টনারটিকে তিনি

জানতেন না—চিনতেনও না। এমনকী স্বামীর ব্যবসায়ে অত সব গুরুতর কাণ্ডেরও খবর রাখতেন না।

...এবার আসি মোহন পারেখের প্রসঙ্গে। মোহন হরিহরজির বাল্যবন্ধুর ছেলে। আজীবন মালহোত্রা পরিবারে তার যাতায়াত ছিল। নিঃসন্তান স্বামী ও স্ত্রী দুজনের কাছেই সে স্নেহাস্পদ হয়ে উঠেছিল। বোম্বেতে ভাগ্যান্বেষণে গেলে মোহনকে বরাবর হরিহরজি টাকা পাঠাতেন। সরোজিনীও কখনও-সখনও পাঠাতেন। হরিহরজি যখন ক্রমাগত উদয়চাঁদ বা মহাবীরের হাতে শোষিত হচ্ছেন, তখন স্ত্রীকে ভয়ে বা সংকোচে সব জানাতে না পেরে পুত্রাধিক প্রিয় মোহন পারেখকে এক দীর্ঘ চিঠিতে তা জানিয়ে দিলেন এবং আত্মহত্যার সঙ্কল্পটাও গোপন রাখলেন না। সে চিঠি আমরা পেয়েছি সরোজিনী দেবীর কাছে। যাই হোক, চিঠি পেয়ে তক্ষুনি প্লেনে দিল্লি এল মোহন। এসে শুনল, হরিহরজি নৈনিতাল রওনা হয়ে গেছেন। উর্ধ্বশ্বাসে মোহনও রওনা হল। তখন দেরি হয়ে গেছে। পথে জিপ দুর্ঘটনা দেখতে পেল সে। নৈনিতাল পৌঁছে সরোজিনীকে সব জানাল। তারপর বলল, পিতাজির এই অসহায় মৃত্যুর প্রতিশোধ সে নেবেই। কিন্তু তখন কোথায় সেই উদয়চাঁদ ঝুনঝুনওয়ালা? দিল্লি থেকে বেমালুম গায়েব হয়ে গেছে...।

..অবশেষে মোহন শরণাপন্ন হল বোম্বের এক প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সির। দিনে দিনে এজেন্সি তাকে উদয়চাঁদের তথ্য জানাল। তখন সে দিল্লিতেই জয়পুরের রিটায়ার্ড পুলিশ সুপার রঘুবীর জয়সোয়াল সেজে বাস করছে। কিন্তু তার আদি অকৃত্রিম নাম মহাবীর সিং। অনেক বছর আগে আন্তর্জাতিক চোরাকারবারচক্রের সঙ্গে জড়িত থাকায় বোম্বেতে তার জেল হয়। কয়েদি হিসেবে থাকার সময় জেলের পোশাকপরা তার একটা ছবি জেলকর্তৃপক্ষ সরকারি প্রয়োজনে তুলে রেখেছিলেন। ডিটেকটিভ এজেন্সি সেই ছবির নেগেটিভ ঘুষ দিয়ে কীভাবে হাতায় এবং মোহনকে দেয়। সেই সঙ্গে মোহনকে এজেন্সি জানাল, মহাবীর সিং জেল থেকে পালিয়ে গিয়েছিল। পুলিশ তাকে খুঁজছে—পাত্তা পায়নি। যাই হোক, এতদিনে সে দিল্লিতে নিজেকে জয়পুরের রিটায়ার্ড পুলিশ সুপার বলে পরিচয় দিয়ে বাস করছিল। আসল রঘুবীর জয়সোয়াল কবে মারা গেছেন।

এবার শ্রীমতী মালহোত্রা চোখের জল মুছে বললেন, আমার স্বামীর পার্টনারকে কখনও আমি দেখিনি। ওর ওই জাল নামগুলো মোহন আমাকে পরে সব জানিয়েছিল। কিন্তু বেচারা মোহন নিজেই এক লোভে পড়ে গেল। ওর মাথায় ফিল্ম প্রোডিউস করার ঝোঁক চেপেছিল। তাই মালহোত্রাজির মৃত্যুর প্রতিশোধ নেওয়ার ছলে শুরু করল রঘুবীর জয়সোয়ালকে ব্ল্যাকমেলিং।

জয়ন্তী বলল, ব্ল্যাকমেলিং?

অধ্যাপকও বললেন, কী কাণ্ড?

কর্নেল বললেন, হ্যাঁ, মোহন ওর কাছে টাকা আদায় শুরু করল। সেই নেগেটিভ থেকে পজিটিভ প্রিন্ট দেখিয়ে সহজেই কাবু করল তাকে।

জয়ন্তী বলল, ৭ জুন দুপুরে ভূতের পাহাড়ে তা হলে মোহন পারেখ টাকা আনতে গিয়েছিল?

—হ্যাঁ। টাকা আনতে তো বটেই, হয়তো আরও কোনও প্রলোভন দেখিয়েছিল মহাবীর। একটু বেশি সাহস দেখিয়ে ফেলেছিল মোহন পারেখ। ফলে প্রাণ হারাতে হল। মহাবীর মরিয়া হয়ে উঠেছিল এবার।

· মেজর জেনারেল হরগোবিন্দ সিং বললেন, মিসেস মালহোত্রা, আপনি তো উদয়চাঁদ ওরফে মহাবীরকে কখনও দেখেননি। কিন্তু এখানে কেমন করে চিনেছিলেন ওকে? মোহনকেই বা তার আসার অত আগে টেলিগ্রাম করেছিলেন কেন? কেমন করে জানলেন মহাবীর ওরফে জয়সোয়াল এখানে আসবে?

শ্রীমতী মালহোত্রা বললেন, এখানকার সবক'টা হোটেলে বাইরের লোক সিজনে বেড়াতে এলেই আমি যেচে গিয়ে আলাপ করি। আমন্ত্রণ করে আসি। এ আমার বরাবরকার অভ্যাস। সোসাইটি

ছাড়া আমার দম আটকে যায়। এমনকী কারা-কারা আসবেন, অগ্রিম কারা ঘর বুক করেছেন—সে খোঁজও নিই। গ্রিন ভিউ হোটেলে খোঁজ নিতে গিয়ে দেখি, এক রিটায়ার্ড পুলিশ সুপার রঘুবীর জয়সোয়াল অগ্রিম বুক করেছেন দিল্লি থেকে। অমনি চমকে উঠি। মোহনকে টেলি করে দিই তক্ষুনি। মোহন এসে পৌঁছায় ৬ জুন রাত্রে। ৭ জুন সকালে ওর সঙ্গে পরামর্শ করি। ঠিক হয় যে প্ল্যানচেটের আসর বসাব এবং মোহনকে মিডিয়াম করে ওর মুখ দিয়ে মহাবীর সিংয়ের কীর্তি ফাঁস করে দেব। ডিটেলস সব বলে যাবে মোহন। আমার স্বামীর আত্মা যেন কথা বলছেন মিডিয়ামের মুখ দিয়ে—এভাবেই সব আয়োজন করেছিলুম। কিন্তু মোহন—বেচারা মোহন। বেটা আমার!

বলতে-বলতে হঠাৎ কেমন অস্বাভাবিক হয়ে গেল শ্রীমতী মালহোত্রার দৃষ্টি। নাসারন্ধ্র কাঁপতে থাকল। তারপর দু-হাতে মুখ ঢেকে ফেললেন। তারপরই উঠে দাঁড়ালেন। বিকৃত গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন, আমি ওর কলজে উপড়ে খাব। ওর চোখ দুটো গেলে দেব। ওর নাড়িভুঁড়ি টেনে বের করে ফেলব।

জয়ন্তী ওঁকে ধরতে যাচ্ছিল, তার আগেই উনি আমাকে সোফাসুদ্ধ উলটে ফেলে দিলেন। তারপর ঘরময় ছোটাছুটি শুরু করলেন। দমাদ্দম সব ভাঙচুর করতে থাকলেন।

কয়েকটি সেকেন্ডে এই উপদ্রব ঘটে গেল। তখন লছমন আর সরযূ দৌড়ে এসে ওঁকে ধরল। অধ্যাপক, মেজর জেনারেল আর আমিও গিয়ে যোগ দিলুম। শ্রীমতী মালহোত্রা অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন। সরযূ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

ওঁকে ধরাধরি করে সবাই ওঁর শোওয়ার ঘরে নিয়ে গেলুম। ডঃ পট্টনায়ক শুশ্রূষা করতে ব্যস্ত হলেন।

বাইরে বেরিয়ে কর্নেল বললেন, মানুষের জীবনে এমন কত ট্র্যাজেডি যে ঘটে! হতভাগিনী শ্রীমতী মালহোত্রার পরিণতি ভাবতে আমি শিউরে উঠছি। আমি ডাক্তার নই জয়ন্ত, কিন্তু অভিজ্ঞতার বিচারে টের পেয়ে গেছি, ভদ্রমহিলা বাকি জীবন এভাবেই বেঁচে থাকবেন। সারাজীবন স্বামীর সঙ্গে বনিবনা ছিল না—বুঝতে পারেননি কী হারাচ্ছেন। একদা স্বামীর ওই নিষ্ঠুর আত্মহত্যার ঘটনা তাঁর অবচেতনে তীব্র আঘাত দিল। তারপর এই বার্ধক্যের নিঃসঙ্গতায় ক্রমশ টের পেলেন, কী থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। তখন ধীরে-ধীরে দীর্ঘসঞ্চিত অতৃপ্তি, আত্মগ্লানি, অনুশোচনা আর ক্রোধ একসঙ্গে বিষাক্ত স্ফোটকের সৃষ্টি করল অবচেতনে। আমরা যা দেখছি, তা তারই কিছু প্রকাশ মাত্র। কিন্তু না—এর জন্যে উনি নিজেও হয়তো দায়ী নন। কিছুটা দায়ী মহাবীর সিংও বটে। আর কিছুটা দায়ী অন্য একজন—তাকে, আমি এক অলৌকিক শক্তিই বলব। এই প্রচ্ছন্ন গভীরতর নেপথ্যচারী শক্তি যেন মানুষের প্রকৃত গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করছে আবহমানকাল। তার হাত থেকে মানুষের মুক্তি নেই। হ্যাঁ জয়ন্ত, কিছু অলৌকিক আছেই আড়ালে।

কর্নেল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। আমি ও জয়ন্তী কোনও কথা বললুম না। একটু পরে গ্রিন ভিউয়ের লনে পৌঁছে কর্নেল জয়ন্তীর দিকে ঘুরে বললেন, ইয়ে জয়ন্তী ডার্লিং, শুনে খুশি হবে যে, মেজর জেনারেল হরগোবিন্দজি তাঁর হেলিকপ্টারে শ্যামলীর বডিটা দিল্লি পৌঁছে দিতে রাজি হয়েছেন। বিশেষ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় বডিটা এখন ডাঃ প্রসাদের জিম্মায় রয়েছে। তা ডার্লিং, আমার এই তরুণ বন্ধুটির মনে কষ্ট হলেও উপায় নেই, কাল সকালেই তোমাকে শ্যামলীর বডি নিয়ে মেজর জেনারেলের সঙ্গে হেলিকপ্টারে রওনা হতে হবে। তৈরি হয়ে থেকো।

রাত্রি ছিল পিশাচের



কবিতা সিংহ

সোমনাথ গাড়ি ড্রাইভ করছিল। শীতের সন্ধ্যা। শ্যামবাজারের মোড়টা ধোঁয়াশায় আবছা হয়ে আছে। দুপাশের দোকানের আলোগুলো দূর থেকে লালচে দেখাচ্ছে। ড্যাশবোর্ডের খানিকটা আলো চলকে পড়েছে সোমনাথের টানা ছাঁদের মুখে। সোমনাথ শিশিরের সঙ্গে কথা বলছিল। শিশির ওর পাশের সিটে বসে শুনছিল মন দিয়ে।

রীতিমতো ঠান্ডা পড়েছে। তার ওপর গাড়ি শ্যামবাজারের মোড় পেরিয়ে যখন একটু ফাঁকায় বরানগরের দিকে ছুটল, তখন বাতাসের ঠান্ডা ছুরিতে শরীরের খোলা অংশগুলো যেন কেটে-কেটে যাচ্ছিল। শিশির তার গরম শালটা গলার চারপাশে ভালো করে জড়িয়ে নিয়ে বলল, আচ্ছা সোমনাথ, এতদিন তোর সঙ্গে আলাপ, এর আগে তো তুই কোনওদিন আমাকে অশনি চৌধুরীর বাড়িতে নিয়ে যাসনি। আজ হঠাৎ অশনি চৌধুরীর বাড়ি আমাকে জোর করে টেনে নিয়ে যাচ্ছিস কেন?

সোমনাথ বলল, কারণ আছে। না হলে সত্যি কথা বলতে কি, অশনিদা তো তেমন মিশুকে প্রকৃতির মানুষ নন। উনি সবার সঙ্গে তেমনভাবে মিশতেও পারেন না। আমার সঙ্গে ওঁর ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠবার পরেই তাই তোর সঙ্গে ওঁর পরিচয় করিয়ে দিইনি।

শিশির বলল, আমরা যখন প্রেসিডেন্সিতে থার্ড ইয়ারে-টিয়ারে পড়ছি, অশনি চৌধুরী তখন পড়ছেন ইউনিভার্সিটিতে। ফাইনাল ইয়ারে। খুব ভালো স্পোর্টসম্যান ছিলেন, তাই না?

সোমনাথ বলল, হ্যাঁ, ব্লু ছিলেন। তারপর এম. এ. পাশ করে বিলেতে যান। আরও পড়াশুনো করেন। কিন্তু ফিরে এসে ওই নিজের লাইব্রেরিতেই পড়ে থাকেন। আর মাঝে-মধ্যে দেখবি ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে। দেশের প্রায় সমস্ত লার্নেড সোসাইটির মেম্বার। আর অ্যানথ্রপলজি, থিয়জফি এবং অকাল্ট সায়েন্সের সমস্ত সেমিনার ওঁর অ্যাটেন্ড করা চাই-ই। দারুণ ভালো শিকারি আর অ্যাডভেঞ্চার করার বাতিক আছে। বহু বিষয়েই অশনিদার ইন্টারেস্ট। আর অঢেল সময়ও পান হাতে। চৌধুরী প্যালেসের ছেলে ভাই। পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে থাকেন। আমাদের মতো তো চাকরি করে দিন গুজরান করতে হয় না।

শিশির বলল, কিন্তু আজ আমাকে হঠাৎ আটকালি কেন? দিব্যি তো তোদের বাড়ি থেকে দুপুরের খাওয়ার নেমন্তন্ন সেরে পালাচ্ছিলাম।

বা রে, আমি অশনিদাকে ফোনে বলেই নিয়েছি। উনি বললেন, শিশিরকে আজ আমাদের বাড়ি নিয়ে এসো। উনি তো এমনি তোকে নামেও চেনেন, পরিচয়ও জানেন। তুই যে আমার সেই ইস্কুলবয়েসের বন্ধু, তাও তো ওঁর অজানা নয়। তবে আজ কেন এই বিশেষ আমন্ত্রণ সেটা তোকে খুব শর্টে বলে রাখি। আজ অবশ্য অশনিদার ওখানে তোর ভূমিকা মুখ্য নয়। কিন্তু তোর পরামর্শ, তোর সঙ্গও আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করবে।

বরানগরের প্রায়ান্ধকার অঞ্চল দিয়ে গাড়িটা যাচ্ছিল। দুপাশে শুকনো পাতা পোড়া আর কাঁচা নালার গন্ধ। সোমনাথ বলল, আসলে ব্যাপারটা খুব গভীরে। তোকে শর্টে গল্পটা বলি।

—বেশ কিছু বছর আগের কথা বলছি। এম. এ. পরীক্ষা দিয়ে আমি বাবার সঙ্গে আসানসোলের একটি কয়লাখনিতে গিয়েছিলাম। জায়গাটার কাছাকাছি একটি চমৎকার হেল্‌থ রিসর্ট ছিল, সেখানে ওঁদের কয়লাখনির অফিসারদের জন্যে কয়েকটি লাক্সারি বাংলো ছিল। সেখানেই আমরা আস্তানা গেড়েছিলাম। আসলে জায়গাটির প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্যেই আমাদের যাওয়া। কিন্তু আর একটি অন্তর্নিহিত কারণও ছিল। সেটা হল, ওই খনি অঞ্চলের বিশেষ-বিশেষ কয়েকটি 'পিট'-এ নানারকম অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটছিল। কয়েকটি পরিত্যক্ত 'পিট'-এ অশরীরী সব মূর্তি দেখা যেত। বহু শ্রমিককে টেনে নিয়ে যেত সব অপচ্ছায়া। অনেকে মারাও যেত। এইসব ঘটনা পর্যবেক্ষণ করার জন্যে, বাবার বন্ধু মনীশকাকু কয়েকজন বিশেষজ্ঞকেও নেমন্তন্ন করেছিলেন। তাঁদের সঙ্গে এসেছিলেন অশনিদা। এ ছাড়া আর-একটি ছেলেকেও দেখতাম। কোথাকার যেন জমিদারের ছেলে। চেহারাটি ভারী সুন্দর। নাম শোভন। সে-ও এসেছিল মনীশকাকুর সঙ্গে 'তার জ্যাঠামশায়ের বন্ধুতার সূত্রে।

শোভনের চেহারাটি ছিল একটু কবি-কবি ধরনের। বেশ ভাবপ্রবণ আর একা-একা ঘুরে বেড়াতে ভালোবাসত সে। আমাদের সঙ্গেও আলাপ হয়েছিল। কিন্তু নেহাতই ভাসা-ভাসা আলাপ। অশনিদাকে শোভন খুব পছন্দ করত। একবার অশনিদার খুব বিপদ ঘটল। তাঁকে সারাদিন কোথাও পাওয়া গেল না। সবাই হন্যে হয়ে খুঁজতে লাগল। ক্রমশ রাত ঘনিয়ে এল। অশনিদার আর কোনও পাত্তা নেই। শেষ পর্যন্ত সবাই সন্দেহ করতে লাগল যে অশনিদা নিশ্চয়ই কোনও দুর্ঘটনায় পড়েছেন। তখন শোভন একটা অদ্ভুত কাণ্ড করে বসল। সে সামনের খালি জমির মাটিতে একটা কাঁচা ধরনের ম্যাপ এঁকে নিল খনি-অঞ্চল আর পিট-এর। তারপর তার ওপর হাত রেখে চোখ বন্ধ করে বসল। সেই হাত আস্তে-আস্তে চলতে শুরু করল। চলতে-চলতে একটা পিট-এর কাছে এসে থামল। ও তখন উঠে একটা দু-ডালওয়ালা গাছের শাখা নিয়ে, তার দুটি ডাল ধরে হাঁটতে লাগল মোহাবিষ্টের মতো। আমরাও ওর পিছন-পিছন চললাম। খানিকক্ষণ বাদে মনে হতে লাগল গাছের ডালটা ওকে আকর্ষণ করছে যেন। এভাবেই ছুটতে-ছুটতে ও একটা খনির শেষপ্রান্তের পিটের মুখে এসে দাঁড়াল। অশনিদাকে পাওয়া গেল সেই পিট-এ। তলায় পড়েছিলেন তিনি। মাথায় গুরুতর আঘাত লেগেছিল। কোনও জ্ঞান ছিল না। পরে জানা যায় একটি অশরীরী ছায়া তাঁকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল পিটের দিকে। একটা লোহার সিঁড়িও দেখিয়ে দিয়েছিল। সিঁড়িটা খানিক দূর গিয়ে আর নেই। পুরো সিঁড়িটাই ছিল জং-ধরা। অশনিদা নামতে যেতেই হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে। তিনি ভেতরের একটা খাঁজে আটকে ছিলেন বলেই একদম তলায় পড়ে যাননি।

—এই ঘটনার পর থেকেই আমরা তিনজন খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে গিয়েছিলাম। ওই বিশেষ দিনটি ছিল চব্বিশে নভেম্বব। সেই থেকে অশনিদা বলতেন চব্বিশে নভেম্বর আমার পুনর্জন্মের দিন। আমরা ওই দিনটিতে তিনজনে একসঙ্গে গল্প করে খাওয়া-দাওয়া করে কাটাতাম। একবার শোভন ভারতের বাইরে ছিল, তখন ও টেলিগ্রাম করে পাঠিয়েছিল। আর-একবার দিল্লি ছিলাম। মনে আছে, প্লেনে এসে অশনিদাব বাড়িতে দিনটি উদযাপন করে গিয়েছিলাম। আজও সেই দিন।

শিশির হেসে বলল, তা ভাই তোদের তিনজনের এই ঘনিষ্ঠ ভাব-সম্মেলনের দিনে হঠাৎ আমাকে কেন?

কারণ আছে রে। অশনিদাই সব বলবেন। এই যে আমরা এসে পড়লাম। এই যে, সামনেই দেউড়ি।

সোমনাথের গাড়িটা তখন বাঁক নিয়ে একটা মস্ত বন্ধ দেউড়ির সামনে দাঁড়িয়ে হর্ন দিচ্ছে। দেউড়ির মাথার আলোটা জ্বলে উঠতেই দেখা গেল দুপাশে শানাই ঘর, রোশনচৌকি বসানোর জায়গা। দেউড়ির ওপর মস্ত-মস্ত জোড়া সিংহ-দাঁড়ানো। দেউড়ির লোহার গেট খুলে যেতেই গাড়ি ঢুকল ভেতরে। সেলাম করে দাঁড়াল দারোয়ান।

লম্বা ড্রাইভ দিয়ে এগিয়ে গাড়ি দাঁড়াল গাড়ি-বাবান্দার তলায়। নানারকম অর্কিড আর লতাপাতায় সাজানো সিঁড়ির ধাপ দিয়ে উঠে গেল দুজনে। ভেতরে কাচের দরজা পেরিয়ে দীর্ঘ লাউঞ্জ। তারপর মস্ত বসবার হল। বিশেষ আবলুশ-কাঠের চওড়া সিঁড়ি—অর্ধচন্দ্রের মতো উঠে গেছে দোতলায়। তার প্রথম ধাপেই দাঁড়িয়ে আছে একটি বিনীত চেহারার প্রবীণ লোক।

কী শ্রীমন্তদা, অশনিদা কোথায়?

হাতজোড় করে শ্রীমন্ত বলল, নমস্কার দাদাবাবু। উনি আপনাদের জন্যে ওপরে অপেক্ষা করছেন। যান, চলে যান।

শিশির মুগ্ধ হয়ে দেখছিল। বিরাট বাড়ি। ঝাড়লণ্ঠন মূর্তি কিউরিওতে সারা বাড়িটা যেন একটা মিউজিয়ামের চেহারা নিয়েছে। কার্পেটের নরম আচ্ছাদনী দেওয়া সিঁড়িতে পা ডুবিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে ওপরে উঠে এল দুজন। সোমনাথ আর শিশিরের পিছন-পিছন শ্রীমন্তও আসছিল।

সোমনাথ বলল, নীচে যখন গাড়ি দেখলাম না, তখন মনে হয় শোভন এসে পৌঁছয়নি।

শ্রীমন্ত পিছন থেকে বলল, শোভনদাদাবাবু আজ আর আসবেন বলে তো মনে হয় না দাদাবাবু। আমি দুবার ফোন করেছিলাম। একবার তো কেউ ফোন ধরলই না। আর একবার ফোন করতে আমাদের দাদাবাবুর নাম করে ডাকলাম। তাতে কে একজন যেন বলল,—উনি খুব ব্যস্ত আছেন, এখন ফোন ধরতে পারবেন না।

সোমনাথ অবাক হয়ে বলল, সে কী? কী বলছ তুমি শ্রীমন্ত?—অশনিদার নাম করার পরে এই কথা বলল?

হ্যাঁ দাদাবাবু! আমি বরং যাই, আপনাদের জন্যে একটু কফি নিয়ে আসি।

সোমনাথ আর শিশির সিঁড়ি দিয়ে উঠে ঘরের পর ঘর, করিডোরের পর করিডোর পেরিয়ে চলল। এতরকম পুরোনো আসবাব, পেন্টিং, ধাতুর জিনিসপত্র, ভারী-ভারী ফার্নিচার, যে শিশিরের মাথা গুলিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু সারা বাড়িতে একটি-দুটি ভৃত্য ছাড়া আর কোনও জনপ্রাণীর চিহ্ন নেই।

সোমনাথ বলল, এ বাড়ির এই মহলটা অশনিদা মিউজিয়াম করে দেবেন বলে সাজাচ্ছেন। পরিবারটি এখন খুবই ছোট হয়ে গেছে ওঁদের। ওঁর তিন বোনের বিয়ে হয়ে গেছে। সবাই বিদেশে। দাদা-বউদি মারা গেছেন বহুদিন হল। ভাইপো নিশানাথ আমেরিকায় পড়াশুনো করছে। ফিরতে এখনও বছর চারেক দেরি। এখানে আছেন শুধু অশনিদা আর পিসিমা। অশনিদার বাবা-মাও মারা গেছেন ছোট বয়সে।

অশনিদা বিয়ে করেননি?

এখনও করেননি। পিসিমা তো রোজ এইসব নিয়ে রাগারাগি করেন।

একটা ঝুলন্ত বারান্দা পেরিয়ে দুজনে আর-একটা মহলে এসে পৌঁছল। সুন্দর একটি লতাপাতায় ঢাকা বারান্দা। কাচের শার্শি বন্ধ করে জায়গাটি ঘিরে আপাতত ঘরের মতো করে নেওয়া হয়েছে। লতাপাতা আর অর্কিড দিয়ে সাজানো চমৎকার জায়গাটি। গোল-গোল জাপানি ফানুসের মতো আলো জ্বলছে। রট আয়রনের সুন্দর-সুন্দর বসার জায়গা। তাতে রঙিন-রঙিন ভেলভেটের গদি লাগানো। একটিতে বসেছিলেন অশনিনাথ।

শিশির আর সোমনাথকে ইশারায় বসতে বললেন তিনি। শিশিরের মনে পড়ে গেল বহুদিন আগে দেখা অশনিনাথের সেই দৃপ্ত চেহারাটি। দীর্ঘ, ছিপছিপে, টানটান। তীক্ষ্ণ নাক। একটু বসা, টানা-টানা চোখ। জোড়া ঘন ভ্রূ। এখন কপালের চুলগুলি ঈষৎ সরে গিয়ে প্রশস্ত কপাল সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মুখের রেখাগুলি আরও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। আরও মহিমময়। চকিতে শিশিরের মনে পড়ল সেই ইউনিভার্সিটি ব্লু পেয়ে, রিসেপশনে দাঁড়ানো, সাদা স্যুট পরা, ছেলেমানুষি মুখটা। সে মুখটি যেন এই পরিশীলিত মুখের মধ্যে হারিয়ে গেছে। অশনিনাথ বললেন—শিশির এসো, অনেক গল্প শুনেছি তোমার সোমনাথের কাছে। আজ দুপুরে সোমনাথকে ফোন করতে ও যখন বলল, তুমি আছ ওখানে, তখনই ওকে বলে দিয়েছিলাম তোমাকে ধরে আনতে।

শিশির হেসে বলল, অশনিদা আমি আপনার দারুণ অ্যাডমায়ারার। আপনাকে সোমনাথ নিশ্চয়ই সে-কথা বলেছে।

অশনিনাথ মাথা নেড়ে অল্প হাসলেন। একটি চন্দন কাঠে খোদাই-করা টেবিলের চারপাশে বসবার আসন তিনজনের। বাইরে গাঢ় ঠান্ডা। মেঘলা আঁধার। ভেতরটা বেশ গরম। আরাম লাগছিল বেশ। অশনিনাথের পরনে কালো ভেলভেটিনের একটি হাউস কোট। সোমনাথের পরনে হালকা বিস্কিট রঙের সাফারি স্যুট, গলায় চেনে বাঁধা একটি ব্রোঞ্জের ওঁ কার। শিশিরের পরনে সাদা ধুতি পাঞ্জাবি আর পেস্তা রঙের একটি কাশ্মীরি শাল।

সোমনাথ বলল, অশনিদা, শুনলাম শ্রীমন্ত শোভনকে ফোন করেছিল।

অশনিনাথ বললেন, হ্যাঁ, ও একবারও নিজে ধরেনি। তুমি একবার ট্রাই করো না, সোমনাথ।

পাশেই একটি ব্রোঞ্জের ত্রিপয়ে সেকেলে মডেলের পিতলের ফোন আর রিসিভার রাখা ছিল। সোমনাথ ফোন করল।

হ্যালো। শোভন সান্যালকে একটু ডেকে দিন না?

কী বললেন? উনি ব্যস্ত? আসতে পারবেন না?

উনি নেই?...আশ্চর্য, কতরকমের কথা বলছেন আপনি?—ধেৎ।

ফোনটা খটাং করে রেখে দিল সোমনাথ। তার ভ্রূ দুটি বিরক্তিতে জুড়ে গেল একটু। অশনিনাথের দিকে তাকিয়ে সে বলল, আমি স্পষ্ট শুনলাম, প্রচুর লোকজন কথা বলছে ব্যাকগ্রাউন্ডে। যে লোকটি ফোন ধরেছিল, তার তো দেখলাম কোনও কথারই ঠিক নেই।

অশনিনাথের ভ্রূ দুটি চিন্তায় ঈষৎ জুড়ে গেল। ইতিমধ্যে কফি এসে গেল।

শ্রীমন্তর ট্রে থেকে কফি নিয়ে সিপ করতে-করতে অশনিনাথ বললেন—দ্যাখো শিশির, আজকের এই দিনটা আমরা তিনজনে কখনও মিস করি না। এই দিনে কলকাতায় থাকা সত্ত্বেও শোভন এল না, এটা কী করে সম্ভব হল বলো তো?

সোমনাথ বলল, অশনিদা, বরং সমস্ত ঘটনাটা শিশিরকে খুলেই বলা যাক। আপনিই বলুন বরং—।

শোনো শিশির, সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে অশনিনাথ বললেন, শোভন সান্যাল ছেলেটি বয়েসে সোমনাথেরও কিছু ছোট। ওর ভেতর দারুণ একটা সাইকিক পাওয়ার আছে। একবার—।

সোমনাথ বাধা দিয়ে বলল, সে-কথা আমি শিশিরকে আগেই বলেছি, অশনিদা। আপনাকে সেভ করার সেই কাহিনি—।

অশনিনাথ বললেন, বেশ, তারপর থেকেই বলি, শোনো—ওদের পরিবারের অনেক পূর্ব-পুরুষেরও সাইকিক পাওয়ার ছিল। তবে ওদের পরিবারটা যাকে বলে ক্রমশ লুপ্ত হয়ে আসছে। ওরা হল, লক্ষ্মীপুরের রাজ ফ্যামিলির বংশধর। সাতপুরুষ আগে থাকতেই ওদের বংশের লতাপাতা কমতে শুরু করে। বহুধারা নদীর মতো এক-একটি ধারা শুকিয়ে যেতে থাকে। আর সেই নির্বংশ পরিবারের ধনরত্ন ক্রমশ বর্তাতে থাকে ওদের বংশে। আমি আর সোমনাথ লক্ষ্মীপুরে কয়েকবার গেছি। পাহাড়, নদী, ঝরনা আর বনে ঘেরা ভারী সুন্দর জায়গাটি। চোখ জুড়িয়ে যায়। তা, লক্ষ্মীপুরের সান্যাল বংশে তন্ত্রের একটা ধারা চলতে-চলতে ওদের পিতৃপুরুষ পর্যন্ত এসে থমকে দাঁড়ায়। এক পুরোহিত পরিবারের সঙ্গে ওদের পুরুষপরম্পরায় শত্রুতা ছিল। সেই পরিবারের লোকেরা ওদের বংশের অনেককে অপঘাত মৃত্যুর শিকার করেছে। কিন্তু সেই পরিবারটির শেষ বংশধর মারা যায়, শোভনের ঠাকুর্দার বন্দুকের গুলিতে। শোভনের বাবা অবনীভূষণ সান্যাল বিদেশি শিক্ষায় মানুষ। তিনি বৈজ্ঞানিক বিশ্বাসের দ্বারা, লজিক দ্বারা পরিচালিত। তার কাকাও তাই। ওঁরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছিলেন। কারণ ওই পুরোহিত পরিবারটি নানাভাবে সান্যাল পরিবারকে দোহন করছিল। পুরোহিত পরিবারের সমস্ত পুরুষ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার আনন্দে, শুনেছি শোভনের দাদু নাকি তাঁর জমিদারিতে বিরাট মুক্তির উৎসব করেছিলেন।

শোভন যখন জন্মাল দেখা গেল—ছোটবেলা থেকেই তার মধ্যে নানা ধরনের অলৌকিক শক্তির প্রকাশ ঘটছে। শোভনের মৃগীরোগ ছিল। ও মাঝে-মাঝে অজ্ঞান হয়ে যেত। খুব দুর্বল চেহারার ছেলে ছিল শোভন। একবার ওদের লক্ষ্মীপুরের চোরাবালির ওপরে শোভন বেড়াতে-বেড়াতে ডুবে গিয়েছিল প্রায়। সঙ্গে ছিল ওর কাকা। সে সময়ে এক পাহাড়ি জাতের শিকারি ওকে উদ্ধার করেছিল। শিকারিটির নামটি ভারী অদ্ভুত—'শারমা'। এই লোকটি কোন দেশীয় ঠিকঠাক বলা সম্ভব নয়। তবে লোকটি বলে যে ও কামরূপ কামাখ্যার সাধক, আর ওর চেহারাতেই 'মোঙ্গল' ছাপ যথেষ্ট প্রবল। এই শিকারিটি ক্রমশ শোভন আর শোভনের কাকার ওপর প্রভাব বিস্তার করতে লাগল। আমিও শারমাকে শোভনের বাড়িতে অনেকবার দেখেছি। ক্রমশ দেখা গেল শারমার আসল পেশা শিকার

নয়, গুরুগিরি। রীতিমতো বিদেশেও ঘুরে এসেছে সে। বিরাট লটবহর শিষ্য-সামন্ত নিয়ে ঘোরাফেরা করে। টাকা-পয়সার সোর্সও যথেষ্ট লোকটার।

কিন্তু শোভনদের পরিবারে, এখন আমি যত পর্যবেক্ষণ করছি ততই দেখছি, রীতিমতো কালসাপ হয়ে ঢুকেছে এই 'শারমা'। ওদের পরিবারে ঢোকার পর থেকে এই 'শারমা'র শিষ্য বনে, তার পায়ে লুটিয়ে পড়তে লাগল সবাই। ওর বাবা মারা গেলেন অস্বাভাবিকভাবে। কাকিমা মারা গেলেন তারপর। কাকাও ওর হাতের মুঠোয় সম্পূর্ণভাবে চলে গেলেন। ওর মাও মারা গেলেন কিছুদিন পরে। শোভনের দিদির সব কটি ছেলেমেয়ে টুপটাপ ঝরে পড়ল কিছুদিন বাদে-বাদে। এখন প্রায় বাড়ি খালি। ওর নিরীশ্বরবাদী কাকার সঙ্গে শোভনও চব্বিশ ঘণ্টা তন্ত্রমন্ত্র আরম্ভ করেছে শুনলাম। কিছুদিন আগে খবর পেলাম ওব কাকার বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছে। বিশাল সম্পত্তি নিয়ে তিনি নয়ছয় করতে আরম্ভ করেছেন। শোভন যে এভাবে শারমার খপ্পরে পড়বে তা আমরা ভাবিনি। অবশ্য ও চিরকালই কোমল মনের ছেলে। শোভনকে ভালোবাসে একটি ফুলের মতো মেয়ে। তার নাম সুরভি। সেই সুরভির সঙ্গেও শোভন আর সম্পর্ক রাখে না। আমাকে এড়িয়ে যায়। সোমনাথের সঙ্গেও কথা বলে না।

সোমনাথ কফির পেয়ালাটা নামিয়ে রেখে বলল, অথচ আপনার মনে আছে অশনিদা, শোভন প্রথম-প্রথম শারমাকে একদম সহ্য করতে পারত না। ওর প্রাণ বাঁচানো সত্ত্বেও বলত, শারমা কাকাকে জাদু করেছে।

অশনিনাথ বললেন, কেন? তোমার শোভনের ছোটপিসিকে মনে নেই? শারমাকে একেবারেই দেখতে পারতেন না। তিনি কেমন হয়ে গিয়েছিলেন শেষের দিকে?

সোমনাথ বলল, অপূর্ব সুন্দরী ছিলেন পিসিমণি। বয়েস বেশি না। শোভনের চেয়ে বড় জোর বছর-পাঁচেকের বড় হবেন। বেশির ভাগ সময়েই বিদেশে থাকতেন। এক্সপেরিমেন্টাল সাইকোলজিব ডক্টরেট। শারমা এলে বাড়িসুদ্ধ সবাইকে উপুড় হয়ে পড়তে দেখলে রেগে যেতেন। শারমাকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করতেন না বলে শোভনের কাকার সঙ্গে কত ঝগড়াঝাঁটি হয়ে গিয়েছিল তাঁর। শারমা এসব দেখে শুধু বলেছিল, ওকে একবার আমার আস্তানায় পাঠিয়ে দিয়ো শুধু। আস্তানা মানে ওর বিভিন্ন শিষ্যর বাড়ি। সেবারে বোধহয় শারমা এসে উঠেছিল গড়িয়ার কোনও ধনী লোকের বাড়ি। একদিন অনেক ভুলিয়ে-ভালিয়ে পিসিমণিকে নিয়ে যাওয়া হল শারমার আস্তানায়। ব্যস! সেখানে যে কী ঘটল কে জানে। পিসিমণি আর ফিরলেন না। তিনি ওই কুৎসিতদর্শন আধবুড়ো লোকটাকে বিয়ে করে বসলেন। এবং ওর কাছেই রয়ে গেলেন। মাস ছয় বাদে উনি মারা যান। শারমা বলে, ওঁর ভাব-সমাধি হয়েছিল। শোভনের কাকা বলেন যে, উনি দিব্যোন্মাদ হয়েছিলেন।

শিশিরের মুখ দিয়ে অজান্তেই বেরিয়ে এল; কী সর্বনাশ!

অশনিনাথ রঙিন গালার কাজ করা চুরুটের বাক্স থেকে একটি চুরুট বের করে বললেন, সর্বনাশই বটে। আমার কেমন যেন ধারণা এবার শোভনকে ঘিরেই বিপদটা ঘনিয়ে উঠছে। শোভনকে আমাদের বাঁচাতে হবে।

শিশির বলল, অশনিদা, একটা ছোট প্রশ্ন করি আপনাকে—আচ্ছা এই শোভনের বাবার মৃত্যু হয়েছিল কী করে?

শোভনের বাবা শেষপর্যন্ত এই শারমার বিরোধী ছিলেন। তিনি বিশ্বাসই করতেন না যে, শারমার কোনও অলৌকিক শক্তি আছে। শারমা তাঁর ওপর শেষপর্যন্ত দারুণ ক্রুদ্ধ হয়ে যায়। লক্ষ্মীপুরের কাছাকাছি একটি তন্ত্রপীঠ আছে। মহাকঙ্কালী নাম জায়গাটির। সেখানে একটা উঁচু পাহাড়ের ওপর একটি মন্দির আছে। চারপাশে জঙ্গল। জঙ্গলের মধ্যে-মধ্যে বড়-বড় পাথর। লোকে বলে এই পাথরগুলো নাকি মহাকঙ্কালীর দান। এই মহাকঙ্কালীটি যে কী তা এখনও আবিষ্কৃত হয়নি। যার যেমন বিশ্বাস সে তেমনভাবে মহাকঙ্কালীকে ব্যাখ্যা করে। সিঁদুরমাখা অদ্ভুত একটা পাথর। কেউ

বলে কালী, কেউ বলে শিব, কেউ বলে ধর্মঠাকুর, আবার কেউ বলে আদিবাসীদের কোনও দেবতা। 'টাঁড়'। সেখানে নরবলিও হত শোনা যায়। হঠাৎ অমাবস্যার রাতে শোভনের বাবার মতো অবিশ্বাসী লোক কেন যে এই মহাকঙ্কালীর মন্দিরে গিয়েছিলেন তা কেউ জানে না। কঙ্কালী মন্দিরের থেকে নীচে ঝাঁপিয়ে পড়ে তিনি মারা যান। শারমা বলে তাকে অবিশ্বাস করার জন্যই এইভাবে তাঁর মৃত্যু হয়। কিন্তু আমার ধারণা তাঁকে মন্দির থেকে ঠেলে ফেলে দেওয়া হয়েছিল হয়তো। তিনি পরদিন সকাল পর্যন্ত বেঁচেছিলেন। একজন গ্রামবাসী কাঠ কুড়োতে গিয়ে তাঁকে আবিষ্কার করে। তখন তিনি শুধুমাত্র বলতে পেরেছিলেন, পাহাড়ের মতো ছাগল...।

সোমনাথ বলল, কথাটার কোনও মানে হয় না! কিংবা হয়তো লোকটা ভুল শুনেছিল...।

অশনিনাথ বললেন, যদি ভুল শুনে থাকে তাহলে আমাদেরই দুর্ভাগ্য বলতে হবে। কিন্তু যদি ঠিক শুনে থাকে তাহলে একদিন না একদিন এর অর্থ আমরা খুঁজে পাবই! আচ্ছা একটা কাজ করলে হয় না? চলো না আজ আমরা শোভনের নাকতলার বাড়িতে যাই।

শিশির বলল, হ্যাঁ সেই-ই ভালো। আজ যাওয়ার একটা ছুতো থাকবে।

অশনিনাথ শিশিরের মুখের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, কথাটা তুমি মন্দ বলোনি শিশির। সে-ই ভালো। চলো, ডিনার খেয়ে এখনই বেরিয়ে পড়ি।

সোমনাথ বলল, এত রাতে সেই নাকতলা পেরিয়ে আপনি যাবেন অশনিদা? আমার কেমন লাগছে।

অশনিনাথ বললেন, জানো শিশির, সোমনাথ আসলে ভয় পাচ্ছে। ও ভাবছে যদি শোভনের ওখানে আমি অপমানিত হই!...নাও সোমনাথ, আমার মান-অপমানের চেয়ে শোভনের ভালো-মন্দের প্রশ্নটা অনেক জরুরি। একটি পিয়ানোর মতো সুশব্দের ঘণ্টা বাজালেন অশনিনাথ। শ্রীমন্ত এসে দাঁড়াল ঃ দাদাবাবু, খাবার ঘরে চলুন, সব রেডি।

রাতের অন্ধকার গাঢ় হয়ে উঠেছিল আকাশের জমাট বাঁধা মেঘে। এই মেঘলা ভেদ করে মাঝে-মাঝে উঠছিল শীতের হাওয়া। অশনিনাথের হিস্পানো গাড়িটা সেই চাপ-চাপ অন্ধকার চিরে ছুটছিল ময়দান দিয়ে। হঠাৎ জানলার ওঠানো কাচে বিন্দু-বিন্দু বৃষ্টির ছাট এসে লাগল। সোমনাথ বলল, বৃষ্টি নামল। অবশ্য ভাবনার কারণ নেই। শ্রীমন্ত তিনটে ছাতা আর ওয়াটার প্রুফ দিয়ে দিয়েছে সঙ্গে।

অশনিনাথ বললেন, একে ভূত চতুর্দশীর রাত তায় বৃষ্টি। শীতটা তো এমনিই বেশ পড়েছে। তায় বৃষ্টিতে রীতিমতো জাঁকিয়ে উঠবে মনে হয়।

সোমনাথ বলল, অশনিদা আপনার তো সবদিকে বেশ খেয়াল থাকে। আজকাল তো আমরা কেউ আর বাংলা তারিখের হিসেব রেখে চলি না! কী শিশির, তুমি চল নাকি?

শিশির বলল, সোমনাথ, তোদের পাড়ায় কি কালী পুজো-টুজো হয় না, নাকি?

সোমনাথ বলল, হ্যাঁ-হ্যাঁ, তা তো হয়। সত্যি সেটা খেয়াল করিনি তো।

অশনিনাথ হেসে বললেন, আসলে ভূত চতুর্দশীর দিন পিসিমার দৌলতে এখনও আমায় চোদ্দো শাক খেতে হয় কিনা? তাই মনে আছে।

ময়দান পেরিয়ে গাড়ি তখন মধ্যবিত্ত পাড়ার মধ্যে দিয়ে চলেছে।

শিশির বলল, আচ্ছা নাকতলার কোন জায়গায় শোভনের বাড়ি?

—নাকতলায় ঠিক নয়। পেরিয়ে গিয়ে আরও দূর। ওদের অরিজিনাল বাড়ি পার্ক স্ট্রিটের কাছাকাছি। অসলো স্ট্রিটে। এই নাকতলার বাড়িটা একটা অতি পুরোনো বাগানবাড়ি ধাঁচের। প্রায় শ'খানেক বছর বয়েস হবে। শোভনের কোনও প্রপিতামহ-টহ তৈরি করেছিলেন। বাড়িটা তো ভেঙে

পড়ে যাচ্ছিল। আমবা মাঝেমধ্যে গেছি। পিকনিক-টিকনিক হত। আসলে নাকি তন্ত্র সাধনার জন্যে করা।

সোমনাথ বলল, আরে, আপনার কথায় হঠাৎ মনে পড়ে গেল। একদিন, এই কয়েক মাস আগেই, আমি শোভনদের ওই বাড়িটার সামনে দিয়ে ব্যবসার কাজেই ড্রাইভ কবে যাচ্ছিলাম। সঙ্গে অনেক বাইরের লোক ছিল,—দেখছিলাম বাড়িটায় মিস্ত্রি লেগেছে। বিনোভেট হচ্ছে। শোভন বোধহয় এখন থেকে ওই বাড়িতে পাকাপাকিই থাকবে স্থির করেছে।

ক্রমশ গাঢ় অন্ধকার দুপাশে চেপে আসছিল। বৃষ্টির বেগ বাড়ছিল। জলের ধারা আছড়ে পড়ছিল জানলার কাচে। উইন্ড-স্ক্রিনের ওপর ওয়াইপার না চালালে সামনের পথ দেখা যাচ্ছিল না। দুপাশে এখন খোলামেলা জমি। একটি দুটি ছোটখাটো বাড়ি বা ছাউনি ছড়ানো রয়েছে। অন্ধকারে ডুবে আছে চারিদিক। অশনিনাথ বললেন—ডান দিকটা একটু লক্ষ রেখো সোমনাথ। সেই উঁচু ইটখোলার চিমনির পাশ দিয়ে শোভনদের বাড়িতে যাওয়ার রাস্তা।

সোমনাথ বলল, হ্যাঁ অশনিদা, আমি লক্ষ রাখছি। খানিকদূর এগোতে জটবাঁধা অন্ধকারের গায়ে আলো পড়তেই ইটখোলার তলার দিকটা আলোকিত হয়ে উঠল। অশনিনাথ তাঁর 'হিস্পানো'টা দ্রুত ঘুরিয়ে নিলেন। গাড়িটা দ্রুত চলল দুপাশের আগাছাভরা ফাঁকা মাঠ পেরিয়ে খোয়ার রাস্তা ধরে। সামনের অন্ধকারের মধ্যে খানিকটা জায়গা কূর্ম পৃষ্ঠের মতো উঠে দাঁড়িয়ে আছে। তার ওপর একটি-দুটি আলোর বিন্দু।

ওই তো শোভনদের বাড়ি।

গাড়ি আরও কাছে যেতেই দেখা গেল কতকগুলো গাড়ি পরপর দাঁড়িয়ে আছে। শোভনের বাড়িটাও দেখা গেল। শিশিরের মনে হল উঁচু দেয়ালঘেরা দুর্গের মতো একটি বাড়ি। ওপরে মসজিদের ডোমের মতো গোল একটা গঠন। তার মাথায় উঁচু একটি শূন্যের মতো স্ট্যান্ডে জ্বলছে নীলচে বেগুনি একটি আলো। আলোটি তেমন জোরালো নয় বলে দূর থেকে দেখা যায়নি।

সোমনাথ অবাক কণ্ঠে বলল, আরে! সেই খোলামেলা বাগানবাড়িব এ কী চেহারা দাঁড়িয়েছে অশনিদা?

অশনিনাথ বললেন, সত্যিই তো। এ যেন মিডলইস্টের মস্ত দুর্গেব মতো চেহারা নিয়েছে।

একটু তফাতে একটা ঝুপসি অশ্বত্থ গাছের তলায়- গাড়িটি প্রায় লুকিয়েই রাখলেন অশনিনাথ। মৃদু নিশ্বাস ছেড়ে গাড়িটা থামল। সেই শব্দটুকুও হারিয়ে গেল বৃষ্টির ঝমঝম ধ্বনিতে। ছাতা মাথায় বর্ষাতি গায়ে জড়িয়ে নামল তিনজন। তাতে শরীর বাঁচল বটে, কিন্তু পা ডুবে গেল নরম ঠান্ডা কাদায়। পাশেই পিছনের কম্পাউন্ডের উঁচু দেওয়াল। দেওয়াল ধরে-ধরে সামনের বন্ধ গেটের কাছে পৌঁছল তিনজনে। গেটের মুখে কুলুপ লাগানো। বারবার নক করার পর গেটটি অল্প খুলল। বর্ষাতি-পরা দারোয়ান সেই ফাঁক দিয়ে গলা বাড়িয়ে প্রশ্ন করল, কার্ড দেখান।

অশনিনাথ গায়ের জোরে গেটটি আরও উন্মোচিত করে বললেন, কী বাজে কথা বলছ? আমি অশনিনাথ চৌধুরী, শোভনের বাড়ি ঢুকতে আমার কোনও কার্ড লাগে না। দারোয়ানকে এক ঠেলা দিয়ে সরিয়ে অশনিনাথ বললেন—এসো সোমনাথ, শিশির এসো।

রোগাটে চেহারার লম্বা মানুষটার একটি ঠেলায় যে এতদূর ছিটকে পড়বে দারোয়ানটা তা সে নিজেই ভাবেনি। উঠে দাঁড়াতে-না-দাঁড়াতেই অশনিনাথরা দ্রুতপায়ে বাগানের পথ পেরিয়ে ঢাকা প্যাসেজে গিয়ে উঠলেন। প্যাসেজটা দীর্ঘ লম্বা হয়ে গেছে বড় হলের দিকে। প্যাসেজের মুখটা লম্বা একটা টানেলের মতো। বাড়ির ভেতরে যাওয়ার এই একমাত্র দরজাটা এত সংকীর্ণ করে বানানো হয়েছে কেন তা কে জানে? আর দূরে সেই দরজার মুখে বসে আছে একটা দীর্ঘ চেহারার বীভৎস মানুষ। তার শরীরটা সম্পূর্ণ বেঢপ। হাত-পাগুলো লম্বা, পেকাল। মুখটা যেন একটা নরমুণ্ডের ওপর চামড়ার আস্তর লাগানো। লোকটি কেমন অদ্ভুত ভঙ্গিতে বসে আছে। নিগ্রো না মোঙ্গল ঠিক বোঝা

যায় না। মুখের পুরু অন্ধকার দিয়ে গড়া ঠোঁট দুটি ঈষৎ হাঁ করা। ভেতর থেকে বেরিয়ে আছে হলদে উঁচু দাঁতগুলো। চোখের দৃষ্টিটা নিম্নমুখী। তাতে কোনও জ্যোতি নেই। ঠান্ডা লালচে একটা রং। তার মধ্যে কালো-কালো ভাবলেশহীন দুটি অক্ষিতারা। নিষ্ঠুর কালো ঠান্ডা মৃত্যুর মতো সেই নিম্নমুখী চোখ দেখলে কিন্তু বোঝা যায় লোকটি অদ্ভুতভাবে যেন অলক্ষ্য থেকেই ওদের লক্ষ করছে। সে লক্ষের আর যেন কোনও অবধি নেই। খানিকক্ষণ থিতিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল শিশিররা। এমনকি অশনিনাথও। তারপর, আবার সোজা হয়ে হেঁটে এগিয়ে গেলেন তিনি। তাঁর সঙ্গে এগোল শিশির আর সোমনাথ। যতই লোকটির কাছাকাছি আসতে লাগল ওরা ততই কেমন যেন একটা পচা গন্ধ নাকে এসে লাগতে শুরু করল। ওদের এগিয়ে আসতে দেখে দু-হাত ছড়িয়ে রুখে দাঁড়াল লোকটা। মনে হল যেন একটা বিরাট শকুন জাতীয় পাখি ডানা বিস্তার করে উড়ে আসছে। লোকটা মাটিতে না শূন্যে, বুঝতে-না-বুঝতেই অশনিনাথ এক ধাক্কায় তাকে সরিয়ে হটিয়ে ওদের নিয়ে ভেতরে চলে গেলেন। ভেতরে গিয়েই সামনে পড়ল একটি অদ্ভুত চেহারার লোক। লোকটি বোধহয় চীনা। আধো-আধো ইংরেজিতে লোকটা বলল, আপনারা কোথায় যেতে চাইছেন?

অশনিনাথ বললেন, শোভন সান্যালকে ডেকে দিন। বলুন, অশনিনাথ চৌধুরী ডাকছেন।

লোকটি পিছনের দরজাটি আটকে রেখে বলল, উনি এখন ব্যস্ত আছেন। আসতে পারবেন না।

অশনিনাথ সঙ্গে-সঙ্গে সতেজে বললেন, উনি যদি না আসতে পারেন তাহলে আমরা, ভেতরে চলে যাব।

সোমনাথ ইতিমধ্যে পরদার ফাঁক দিয়ে হয়তো শোভনকে একপলক দেখে থাকবে। সে হঠাৎ ডেকে বসল, শোভন,—শোভন, এদিকে শুনে যাও।

শোভন তাড়াতাড়ি পরদা সরিয়ে বেরিয়ে আসতেই চীনা লোকটি অভিযোগের সুরে নিচু গলায় তাকে কিছু বলল। শোভন তার উত্তরে চাপা গলায় কিছু বলতেই সে পরদা তুলে ভেতরে চলে গেল।

শিশির এই প্রথম শোভনকে দেখল। রোগা ছোটখাটো ফরসা ছেলেটি। নরম মোলায়েম। কিন্তু কেমন যেন অন্যমনস্ক ভঙ্গি তার। ভাবলেশহীন চোখ-মুখ। অশনিনাথ আর সোমনাথের দিকে তাকিয়ে খুব পোশাকি ভঙ্গিতে বলল, আরে আপনারা?

—হ্যাঁ, অবাক হলে নাকি,—ইনি শিশির, সোমনাথের ছোটবেলার বন্ধু।

হাতজোড় করে নমস্কার করে চাপা গলায় শোভন বলল, খুব খুশি হলাম আপনার সঙ্গে আলাপ করে।

শিশিরের কিন্তু শোভনের ভাবভঙ্গির আড়ো-আড়ো ছাড়ো-ছাড়ো ভাব দেখে কখনওই মনে হচ্ছিল না যে, শোভন অশনিনাথ বা সোমনাথের অত ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

হঠাৎ অশনিনাথ বললেন, শোভন, এত করে মনে করিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও তুমি আজ আমার ওখানে গেলে না। আজকের তারিখটার কথা মনে আছে তোমার?

শোভন হ্যাঁ-না-র মাঝামাঝি একটা উত্তর যেন দেওয়ার চেষ্টা করল। সোমনাথ সঙ্গে-সঙ্গে বলল, আচ্ছা শোভন, প্রায় বছরখানেক হল তুমি আর তেমন যোগাযোগ রাখছ না কেন? আমরা কি কোনও কারণে তোমায় কোনওরকম আঘাত দিয়েছি?

শোভন কোনও কথার উত্তর না দিয়ে দুজনের মুখের দিকেই ফ্যালফ্যাল করে তাকাল।

অশনিনাথ আবার তীব্রকণ্ঠে বললেন, শোভন, এ কী পোশাক পরেছ তুমি?

শোভনের পরনে খয়েরি রঙের পাঞ্জাবি আর লুঙ্গি।

পোশাকের কাপড়গুলি মাড়ে খড়খড় শব্দ করছে।

শোভনের চোখের দৃষ্টিটা ক্রমশ যেন কেমন স্বচ্ছ হয়ে উঠতে লাগল। সে বলল, বসুন,

বসুন আপনারা। দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? ঘরের দেয়াল ঘেঁষে রাখা সারি-সারি চেয়ারের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে শোভন বলল।

প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে ভেতর থেকে বেরিয়ে এল অদ্ভুত একটি লোক। লালচে-বাদামি ত্বক চকচক করছে তৈল মসৃণতায়। মুখটি বড়। একটা থলথলে চামড়ার থলির মতো। তাতে পুঁতির মতো দুটি চোখ তেরছা করে বসানো। ভ্রূ প্রায় নেই বললেই চলে। চোখের ওপরের পাতার মাংস ভারী হয়ে ঝুলে পড়েছে। তলায়ও দুটি কমলার কোয়ার মতো মাংসের পুঁটুলি। ফোলা গাল চোয়ালের পাশ দিয়ে ঝুলছে। মোটা-মোটা কালো ঝোলা দুটো ঠোঁট। পরনে জমকালো পোশাক। ঘোর খয়েরি রঙের ওই একই ধরনের পোশাক, তবে সমস্তটাই মূল্যবান সিল্কের। লোকটির চারপাশের আবহাওয়াটাই এমন অদ্ভুত ধরনের যে কাউকে বলে দিতে হয় না যে এ-ই শারমা। শারমা এসে শোভনকে স্পর্শ করে দাঁড়াতেই শোভন যেন নিজের সেই ভাবলেশহীন আত্মবিস্মৃতির জগতে ফিরে গেল। শারমা কেমন যেন গান গাওয়ার মতো মন্ত্রমুগ্ধ কণ্ঠে বলল, তুমি কি ভুলে গেলে শোভন, এখুনি আমাদের উৎসব আরম্ভ হবে! উৎসবে তোমাকে দরকার।

শারমাকে যেন অস্বীকার করেই অশনিনাথ বললেন, সে কী, তোমার এখানে উৎসব হচ্ছে, আর তুমি আমাদের নেমন্তন্ন করোনি, শোভন?

শোভন কী যেন একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিল। তার কথার ওপরই শারমা আবার বলল, চলো শোভন, অতিথিরা অপেক্ষা করছেন। ওঁদের পরে কোনওদিন আসতে বলে দাও।

শোভন কলের পুতুলের মতো শারমার পিছন-পিছন ঘুরে গেল। পরদা সরিয়ে সে ঢুকল পরের ঘরে। পরদা পুরোটা উঠে যেতেই দেখা গেল, পরের ঘরটিতে বেশ কয়েক জোড়া জুতো আর একটি লম্বা ধরনের বেতের ঝাঁপি রাখা আছে। তারও পরের ঘরটিতে কোনও পরদা নেই। সে ঘরের অনেকখানিই দেখা যাচ্ছে। সার-সার খাওয়ার টেবিল। তাতে স্তূপাকারে নানারকম আহার্য সাজানো। স্ত্রী-পুরুষেরা ঘোরাঘুরি করছেন সে ঘরে। বেশ কয়েকজনকেই দেখা গেল। তা অন্তত জনা-কুড়ি তো হবেই।

সোমনাথ বলল, চলুন অশনিদা। শোভন তো আমাদের রীতিমতো অপমানই করল। আমরা এবার ফিরে যাই। আর কখনও যদি শোভনের সঙ্গে...।

সোমনাথের কথা শেষ হতে-না-হতেই অশনিনাথ হঠাৎ শোভনকে লক্ষ করে চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, চলো শোভন, আমি তোমার অতিথিদের সঙ্গে একটু আলাপ করি।

শারমা বা শোভন অশনিনাথকে বাধা দেওয়ার আগেই তিনি অতিথিদের ঘরে চলে গেলেন। সোমনাথ আর শিশিরও চলে এল তাঁর পিছু-পিছু। হঠাৎ ওদের সামনে এসে পড়ল বেশ কয়েকজন স্ত্রী-পুরুষ। নানা দেশের মানুষের এমন মিশ্র ভিড় শিশির এর আগে কখনও দেখেনি। সোমনাথ হঠাৎ শিশিরকে ঠেলা দিয়ে বলল, ওই মেয়েটিকে দ্যাখ। কী অপূর্ব সুন্দরী!

সুন্দরী?

শিশির দেখতে লাগল। বীভৎস মুখের বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদেরই তো ভিড় বেশি। তার মধ্যে খয়েরি জোব্বা ধরনের একটি ঢোলা পোশাক পরে পানীয়ের গ্লাস হাতে দাঁড়িয়ে আছে একটি মেয়ে। তাকে দেখলে মনে হয় এত ভঙ্গুর সৌন্দর্য যেন আর হয় না। পৃথিবীর কোনও পাপ যেন কখনও স্পর্শ করতে পারে না তাকে। এমন একটি মেয়েকে এই শারমার দলে দেখে আঘাত পেল শিশির। ঠিক তখনই যেখানে জুতো রাখা ছিল সেদিক থেকে কেমন একটা ছটফট শব্দ উঠে এল। শারমা শোভনকে সামলাতেই ব্যস্ত ছিল। দীর্ঘ লাফ দিয়ে অশনিনাথ ছুটে গেল সেই আওয়াজ লক্ষ করে। মেয়েটির হাত চলকে পানপাত্রটা পড়ে যেতেই তীব্র দেশি মদের গন্ধ উঠতে লাগল চারিদিক ছাপিয়ে। পানপাত্রটা তুলতে গিয়ে পোশাকে জড়িয়ে পড়ে গেল সে। কনুইয়ের ভাঁজে ঝোলানো সোনার তারে বিনোনো তার ছোট্ট পার্সটা পড়ে গেল সবার অলক্ষ্যে মাটিতে। সোমনাথ তাড়াতাড়ি সেটা তুলে মেয়েটিকে

দিতে গিয়ে দেখে মেয়েটি যেন কর্পূরের মতো উবে গেছে। অশনিনাথের ফেটে পড়া চিৎকার শুনে সোমনাথ আর শিশির ছুটল তাঁর কাছে। তিনি তখন সেই দীর্ঘ ঝাঁপির ঢাকনাটা তুলে ধরে চিৎকার করে বলছেন, শোভন, এ কী—এ কী?

শিশির তাড়াতাড়ি এসে সোমনাথের সঙ্গে উঁকি মেরে দেখল ঝাঁপির ভেতরে শোয়ানো রয়েছে একটা মৃতদেহ। দেহটি কোনও দরিদ্র পশ্চাৎপদ জাতির মানুষের। হঠাৎ যেন একটি ফুঁয়ে সমস্ত বিদ্যুৎবাতি নিভে গেল। তালগোল পাকানো অন্ধকারে সারা বাড়িতে জেগে উঠল একটা বিশৃঙ্খলা।

সৌভাগ্যবশত শিশির সোমনাথ আর অশনিনাথ খুব কাছাকাছিই ছিলেন। অশনিনাথ চাপা গলায় বললেন, শিগগির বেরিয়ে চলো। গাড়িতে গিয়ে উঠি। অশনিনাথ ও সোমনাথ তো ভালো স্পোর্টসম্যান। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল ধুতি-পাঞ্জাবি-পরা শিশিরও কোনও অংশেই কম নয়। ছুটে গিয়ে লম্বা প্যাসেজ পেরিয়ে বাগানের পথ দিয়ে আধখোলা গেট ছাড়িয়ে তারা ছুটতে লাগল। ঝুপসি বটগাছটার তলায় এসে গাড়ির লক খুলে দ্রুত স্টার্ট নিলেন অশনিনাথ। শিশির আর সোমনাথ উঠে পড়ে গাড়ির দরজা বন্ধ করবার আগেই গাড়ি খোয়া রাস্তায় উঠে পড়ল। শব্দহীন ছুটন্ত নেকড়ের মতো এক লাফে উড়ে গিয়ে যেন ধরে ফেলল বড় রাস্তা।

খানিকটা ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে যখন লোকালয়ের মধ্যে এসে পড়ল গাড়িটা, তখন যেন খানিকটা সংবিত ফিরে পেল সবাই। অশনিনাথ বললেন, গলা একবারে শুকিয়ে গেছে, কোথায় একটু গলা ভেজানো যায় বলো তো সোমনাথ!

সোমনাথ বলল, এখন তো রাত প্রায় সাড়ে বারোটা, পানের দোকানও বন্ধ হয়ে গেছে অশনিদা। কোথাও কিছু পাবেন না।

হঠাৎ অশনিনাথ গাড়িটি বাঁকিয়ে ঢুকলেন পাশের একটি সরু রাস্তায়।

সোমনাথ বলল, হঠাৎ এ রাস্তায় কেন অশনিদা?

অশনিনাথ বললেন, হঠাৎ মনে পড়ল এ রাস্তায় একটা ছোট্ট আশ্রম আছে। আর কালীমন্দির। পিসিমার গুরুপুত্রের আশ্রম। চলো, ওখানেই যাই। একটু জল যদি পাওয়া যায়।

সোমনাথ বলল, এত রাতে এই বর্ষায় ওঁরা কি জেগে আছেন?

শিশির হেসে বলল, তুমি আবার ভুল করলে সোমনাথ, কাল কালীপুজো না। নিশ্চয়ই আশ্রমে এখন পুজোর আয়োজন চলছে।

অশনিনাথ বললেন, কিন্তু কী আশ্চর্য, হঠাৎ এই আশ্রমের কথাটা আমার স্মরণে এলই বা কী করে? সেই কবে, কলেজে পড়ার সময় পিসিমার সঙ্গে ওঁর গুরুদেবের জন্মতিথিতে এসেছিলাম। তারপর এই কাছাকাছি বড় রাস্তা দিয়ে কত জায়গায় কতবার গেছি, একবারও তো স্মরণে আসেনি এই জায়গাটার কথা। শোভনের বাড়িতেই তো কতবার গেছি। আশ্চর্য!

শিশিরের কথাই ঠিক। আশ্রমের সামনে গাড়ি থামতেই বাগানের মাঝখানে ছোট-ছোট কুটিরগুলিতে কর্মব্যস্ততা লক্ষ করা গেল। টিউবওয়েলের কাছে জল ভরছিল কেউ। অশনিনাথ তাড়াতাড়ি গিয়ে জলপান করলেন। সোমনাথ আর শিশিরও জল খেল আকণ্ঠ। আশ্রমকর্তা এখন অতিবৃদ্ধ। অশনিনাথ তাঁর কাছে গিয়ে পরিচয় দিতেই তিনি কাছে টেনে নিলেন তাঁকে। শিশির আর সোমনাথ গালিচায় বসল। কিছুক্ষণ বসার পর হঠাৎ অশনিনাথ স্বামীজিকে প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা আজ রাত বারোটা থেকে কি কোনও বিশেষ যোগ পড়েছে?

যোগ? কই না তো? কোনও শুভযোগ তো পড়েনি বাবা।

আচ্ছা, যদি বলি কোনও অশুভ যোগ?

স্বামীজি হঠাৎ চমকে উঠলেন। ভালো করে তাকালেন অশনিনাথের দিকে। মনে হল তিনি যেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওদের তিনজনের কপাল দেখছেন। তারপর কম্পিতগলায় বললেন, ওসব কথা উচ্চারণ করাও পাপ। যাও, মন্দিরে গিয়ে মায়ের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে এসো। একটা ঘর খুলে

দিচ্ছি, আজকের রাতটা থেকে যাও এখানে। আজ রাতে আর তোমরা আশ্রমের বাইরে যেও না বাবা।

অশনিনাথ উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, উপায় নেই। ফিরতে হবে স্বামীজি। আমাদের এক বন্ধুর খুব বিপদ। আপনি যখন বলছেন, তখন মায়ের আশীর্বাদ নিয়েই যাই।

স্বামীজি বললেন, বেশ, তাই যাও।

অশনিনাথ, সোমনাথ আর শিশির যখন গাড়িতে উঠছেন, তখন একজন সন্ন্যাসী সেবক এসে ওঁদের কিছু প্রসাদী ফুল, আর মিষ্টি সমেত মোড়ক দিলেন।

গাড়ি স্টার্ট নিল।

অশনিনাথ সোমনাথ আর শিশিরকে উদ্দেশ করে বললেন, সাহস আছে, আবার ফিরে যাওয়ার?

সোমনাথ বলল, কোথায়?

শোভনের বাড়ি।

কেন থাকবে না।

তোমরা বিশ্বাস করবে না জানি, তবু বলি, আমাদের বন্ধু শোভনের এখন ঘোরতর বিপদ।

সে কী? কী বিপদ?

সোমনাথ বলল, আজ রাতে একটা অশুভ যোগ আছে। শুনলে তো। হয়তো সেটা মাঝরাত থেকেই শুরু। তাই শারমা অত তাড়াহুড়ো করছিল। ওই মৃতদেহটা তো তোমরা দেখলে। কোনও দরিদ্র, অভাগা চণ্ডালের মৃতদেহ। হয়তো লোকটাকে খুনই করা হয়েছে। আজ রাতে শবসাধনার কোনও ব্যাপার ছিল কিংবা এখনও আছে। শারমা আজ রাতের কাণ্ডকারখানাতে যদি সফল হয় তাহলে শোভন হয়তো আমাদের কাছ থেকে চিরকালের মতো দূরে চলে যাবে। শোভনকে আমাদেব বাঁচাতেই হবে সোমনাথ—শিশির।

শিশির হতবাক হয়ে গিয়েছিল খানিকটা। একটু থেমে সে বলল, নিশ্চয়ই! কিন্তু বাঁচাবার উপায়টা কী?

অশনিনাথ বললেন, উপায় একটাই শিশির। শোভনকে ওর বাড়ি থেকে, ওই পরিবেশ থেকে তুলে আনতে হবে। যাকে সাদা কথায় বলে, কিডন্যাপ করা। জিনিসটা হয়তো বেআইনি হবে। কিন্তু তা ছাড়া যে আর কোনও উপায় নেই শিশির। শোভন ওদের পরিবারেব শেষ বংশধর। যে-কোনও মূল্যেই ওকে বাঁচাতে হবে। আমি ভুলতে পারি না যে, শোভনও একদিন আমাকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছিল।

সোমনাথ বলল, চলুন অশনিদা এখুনি ফিরে যাই। কালী-টালি জানি না, তবে একটা শুভশক্তিকে তো সর্বদাই বিশ্বাস করি। আমরা তো কোনও অন্যায় করছি না। সুতরাং সেই শুভশক্তি আমাদের সঙ্গে ঠিকই থাকবে।

অশনিনাথের নিঃশব্দ হিস্পানো একটুও ঝাঁকুনি না দিয়ে সুপার ভাবে বেঁকে আবার উড়ে চলল পুরোনো পথ দিয়ে।

বৃষ্টি থেমে গেছে। একটা হাড়-কাঁপানো হাওয়া। ওপরে কালো নিশ্ছিদ্র আকাশে থমথম করছে অন্ধ মেঘের দল। সেই ঝুপসি বটগাছ তলায় একটা চকচকে কালো বাঘের মতো লুকিয়ে পড়ল হিস্পানোটা। আবার নামলেন অশনিনাথ। সোমনাথ আর শিশিরও নামল। অশনিনাথ বললেন, একেবারে অস্ত্রহীন নই কিন্তু। সঙ্গে একটা ছোট্ট কোল্ট আছে। সুতরাং জীবন্ত কিছু বিপদ এলে যুঝে যেতে পারব। আবার সেই উঁচু দেওয়ালের গা ঘেঁষে হেঁটে যাওয়া। হাঁটতে-হাঁটতে গেট। গেট

বন্ধ। উঁচু পাঁচিল ডিঙনো ছাড়া আর কোনও উপায় নেই। আবার দেওয়াল ধরে-ধরে বাড়ির রান্নাঘর চাকরদের ঘরের দিকে পৌঁছল ওরা। সমস্ত বাড়ির কোথাও জীবনের চিহ্ন নেই। আলো নেই। অন্ধকারে দাঁড়ানো সার-সার গাড়িগুলোও উধাও।

চাপা গলায় অশনিনাথ বললেন, যদ্দূর মনে পড়ে পিছনের কিচেন গার্ডেনের দিক দিয়ে একটা খিড়কি পথ ছিল। একটু এগিয়ে দেখা গেল, খিড়কিটিও বন্ধ। কিন্তু ঈষৎ নিচু হওয়ায় টপকে পেরোনো সম্ভব হল। বাগানের মধ্যে দিয়ে বাড়িতে পৌঁছে চারিদিকে আবার ঘোরা। কোনও দরজা, কোনও জানলাই খোলা নেই। শেষ পর্যন্ত পিছনের একটি বাথরুমের কাচের জানলার খানিকটা রিভলভার দিয়ে ঠুকে ভেঙে ফেললেন অশনিনাথ। তারপর ভেতরে হাত ঢুকিয়ে ছিটকিনিটা টেনে খুলে ফেললেন। বাথরুমের জানলা দিয়ে ভেতরে ঢুকে পা থেকে জুতো খুলে ফেললেন তিনি। সোমনাথ আর শিশিরও খুলল! তারপর আস্তে-আস্তে হেঁটে একটি বড় করিডোরে গিয়ে পড়ল তারা। ইলেকট্রিকের মিটারবক্সটাই পাগলের মতো খুঁজছিলেন অশনিনাথ। পুরোনো বাড়িতে সদরের পাশেই ছিল সেটা। সোমনাথ বলল, আজকাল অনেকে সিঁড়ির তলায় মিটারবক্স করে।

অশনিনাথ বললেন, আমার যদ্দূর ধারণা ওরা মেন অন করেনি। মেন সুইচটা সম্ভবত যেখানে ডেডবডিটা রাখা ছিল তারই কাছে-পিঠে কোথাও।

অন্ধকারে সোমনাথ একবার লাইটার জ্বালাল! লাইটারের আলোয় তারা সামনেই দেখতে পেল খাওয়ার হলটা। দ্রুত হলটা পেরিয়েই সেই ছোট ঘরটি। ঘরের কোণেই ইলেকট্রিকের মিটারবক্স। সোমনাথ ছুটে গিয়ে সুইচ অন করে দিতেই সারা বাড়িটা আবার আলোয় ঝলমল করে উঠল।

কিন্তু কোথাও কেউ নেই। সেই ঝাঁপিটিও খালি। তাতে কোনও মৃতদেহ নেই।

ওরা আবার খাওয়ার ঘরে এল। খাওয়ার ঘরে সারি-সারি টেবিল সাজানো। ঘরের মাঝখানে একটি বড় টেবিল। সব টেবিলেই সেই অদ্ভুত খয়েরি রঙের কড়কড়ে মাড় দেওয়া কাপড় পাতা! মাঝের টেবিলে অদ্ভুত সাংকেতিক নকশায় খাবাব সাজানো। ভার-ভার মাংস। নানারকমের মাংস। আব বড়-বড় মাটির পাত্রে চোলাই দেশি মদ রাখা। পাশে পানপাত্র সাজানো। এমন খাওয়ার জায়গায় দৃষ্টিকটুভাবে যেন শোভা করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে মড়ার খুলি আর বাহু ও পায়ের সাদা হাড়।

অশনিনাথ সমস্ত ঘরটা ঘুরে-ঘুরে লক্ষ করতে লাগলেন। শিশিরের মনে হল অশনিনাথ খুব গভীরভাবে কী যেন ভাবছেন। অনেকক্ষণ পরে তিনি বললেন, রক্ত—রক্ত দিয়ে এইসব কাপড় ছোপানো হয়েছে।

সোমনাথ চমকে উঠে বলল, সে কী?

হ্যাঁ, আর এইগুলো খুব জটিল তান্ত্রিক প্যাটার্ন! এই যে, যেভাবে খাবারেব পাত্রগুলো সাজানো হয়েছে। আর এই সব লতা-পাতা, ফণিমনসা, গোলা সিঁদুর এসব নানারকম তান্ত্রিক অনুষ্ঠানে লাগে। চলো, আমরা সারা বাড়িটা ঘুরে দেখি। আমার যেন কেমন মনে হচ্ছে, ওদের কোনও তান্ত্রিক অনুষ্ঠানের কোনও ইনার সার্কেলে শোভনকে অভিষিক্ত করার ব্যাপার ছিল আজকে। যে করেই হোক শোভনকে আমাদের বাঁচাতে হবেই।

সোমনাথ বলল, এক কাজ করা যাক, শিশির, চলো আমরা দুজন নীচের তলায় দুদিকে যাই। অশনিদা, আপনি দোতলাটা দেখুন।

অশনিনাথ বললেন, ঠিক আছে।

তিনি ছুটে দোতলার সিঁড়ির দিকে চলে গেলেন। শিশির আর সোমনাথ দুদিকে ছড়িয়ে পড়ল। মিনিট দশেকের মধ্যেই আবার খাওয়ার ঘরে ফিরে এল শিশির আর সোমনাথ। নীচের তলায় কোনও জনপ্রাণীর চিহ্নও নেই। ওরা দোতলার সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠল। সিঁড়ির মুখেই অশনিনাথ। তিনি বললেন, দোতলায়ও কেউ নেই। চলো, তিনতলায় যাওয়া যাক।

তিনতলায় তো একটা ফাঁকা গম্বুজের মতো দেখছিলাম, ওখানে কি কোনও লোকের থাকার সম্ভাবনা আছে অশনিদা?

চলোই না। এতটা যখন এলাম, তিনতলাটাও একটু হয়ে যাই। তিনজনে অপেক্ষাকৃত সরু খাড়া সিঁড়ি বেয়ে তিনতলায় উঠল। সরু ঘোরানো প্যাসেজ পেরিয়ে গেলে ঘর। ঘরের ওপরটা ঠিক ডোমেরই মতো, কিন্তু অন্ধকার। ভেতরে হাতড়ে-হাতড়ে সুইচ বোর্ডের আলোগুলো জ্বেলে দিতেই সারা ডোমটা ঝলমল করে হেসে উঠল। তিনজনেই ওপর দিকে তাকিয়ে সবিস্ময়ে দেখল আসলে এটা একটা অবজারভেটরি। একটা অতিকায় টেলিস্কোপ বসানো আছে। ঘরেব মেঝের ওপর নানা ধরনের চিহ্ন আর দাগ টানা আছে। দেওয়ালের গায়ে সার-সার সাজানো বই আর প্রাচীন পুঁথি। ডোমের ভেতরের দেওয়ালের রং রাত্রি-নীল। তার গায়ে কিছু-কিছু তফাতেই মারকারি আলোর গুচ্ছ লাগানো।

অশনিনাথ বললেন, আমার কেমন সব আবছা স্মৃতির কথা মনে পড়ছে। আমি মাঝে শোভনদের লাইব্রেরিতে পড়াশুনো করতে যেতাম। ওখানে আলাদা একটা পুরোনো ধুলোপড়া কোণ মতো জায়গায়, একটা পুরোনো আলমাবিতে...হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়ছে, আলমারিটা নাকি পঞ্চাশ-ষাট বছর খোলাই হয়নি। শোভনরা নাকি ওটার অস্তিত্বই ভুলে গিয়েছিল। ওর কোনও তান্ত্রিক পূর্বপুরুষের পুঁথিপত্র ছিল। আমি আলমারিটা খুলে তার মধ্যেকার পুঁথিপত্রগুলো খানিকটা উলটে-পালটে দেখেছিলাম। ঝুরঝুরে সব পুঁথি। পিশাচতন্ত্রের নানারকম সাধনা কর্মকাণ্ডের কথা ভরতি।...কিন্তু তখন আমি আর তেমন কোনও ইন্টারেস্ট নিইনি। আমার অন্য কাজ ছিল। সব মনে পড়ছে...এইসব চিহ্ন, এইসব সংকেত...সত্যি!

সোমনাথ বলল, তার মানে অশনিদা আপনি বলতে চান...

অশনিনাথ বললেন, হ্যাঁ, আমি বলতে চাই আজ একটা ইভল দিন। অশুভ সময়। আজ পৈশাচিক কাজকর্মের উপযুক্ত কোনও মুহূর্ত। শোভনের চরম সর্বনাশ ঘটে যেতে পারে কিন্তু। আমি তো বুঝতে পাচ্ছি না ওরা শোভনকে সরিয়ে ফেলল কোথায়? এই টেলিস্কোপটার মধ্যে দিয়ে একটু আকাশ দেখতে চাই। যদি কোনও বিশেষ সংকেত খুঁজে পাই।

শিশির বলল, আকাশ তো মেঘে মোড়া।

অশনিনাথ বললেন, তবু একবার দেখি না। এত ভালো টেলিস্কোপ দেখে আমার খুবই লোভ লাগছে। মনে হচ্ছে এটার স্ট্রেংথ কতটা দেখি।

অশনিনাথ টেলিস্কোপটার দিকে এগোলেন।

ঠিক তখনই অদ্ভুত ধরনের একটা বাসি গন্ধে সারা গোল গম্বুজ ঘর ভরে উঠল। মনে হতে লাগল উজ্জ্বল মারকারি আলো কেমন যেন হালকা নাইলনের ধাঁচের বাষ্পীয় আবরণে ঘিরে গেছে। যেমন রৌদ্রালোকিত কোনও জায়গায় হালকা মেঘের ছায়া পড়লে অদ্ভুত লাগতে থাকে। অশনিনাথ এগিয়ে গিয়ে টেলিস্কোপটির মুখের ঢাকনিটা খুলতে গেলেন। তখন সেই বাসি গন্ধটা ক্রমশ বাড়তে লাগল। এবং ক্রমশ মারকারি ল্যাম্পের উজ্জ্বলতা আরও কমে আসতে লাগল। অশনিনাথ আপনিই ঘরে ফিরে এলেন টেলিস্কোপটা ছেড়ে। তিনি এসে দাঁড়ালেন সোমনাথ আর শিশিরের পাশাপাশি। গন্ধটাকে এবার ক্রমশ চেনা যাচ্ছিল। পচা জীবজন্তুর গন্ধ। পচা গলিত মাংসের। গন্ধ যত বাড়ছিল তত কমছিল আলোর তেজ। আর ক্রমশ বাড়ছিল অদ্ভুত একটা ঠান্ডা। এই ঠান্ডা যেন পৃথিবীর শৈত্য নয়, পৃথিবীর বাইরের কোনও অলৌকিক লোকের অস্বাভাবিক মৃত শৈত্য।

হঠাৎ শিশির বলল, দেখুন, দেখুন অশনিদা, ঘরের ওই দিকটায় দেখুন।

দেখা গেল ঘরের কোণে হঠাৎ ঘোর ছাই রঙের একটা গোলার মতো বস্তু যেন শূন্য থেকে তৈরি হয়ে এসে ঘুরতে লাগল। ঘুরতে-ঘুরতে বস্তুটি ক্রমশ যেন আয়তনে বাড়তে লাগল। এত

দূর থেকেও মনে হচ্ছিল বস্তুটি যেন কুৎসিতের একটা মূর্ত প্রতীক। যা কিছু নোংরা যা কিছু কদর্য, সবই যেন আস্তে-আস্তে ঢুকে যাচ্ছে ওই গোল বলের মতো বস্তুটির ভেতরে-ভেতরে। ঘরের মধ্যেকার সেই গন্ধ অসহনীয় হয়ে উঠেছিল। দাঁতে দাঁত লাগছিল অস্বাভাবিক ঠান্ডায়। অথচ বস্তুটা দ্রুত গড়ে উঠতে-উঠতে সরে যাচ্ছিল ঠিক নীচে নামবার একমাত্র দরজাটার কাছে।

দেওয়ালের গা-ঘেঁষে তিনজন দাঁড়িয়েছিল তিন টুকরো মাংসের তালের মতো। পরস্পরের শরীরের কাঁপুনি সঞ্চারিত হচ্ছিল পরস্পরের শরীরে। শিশির অপলকে তাকিয়েছিল সেই অবিশ্বাস্য গঠিত হয়ে উঠতে থাকা ভয়ংকর অতিমানবিক বস্তুপুঞ্জের দিকে। অশনিনাথ আর সোমনাথেরও অবস্থা তাই-ই।

আস্তে-আস্তে সমস্ত ঘরটা গাঢ় অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে গেল। মারকারি বাল্বগুলির ভেতরে-ভেতরে আলোর বিন্দুপ্রমাণ জ্যোতি ম্লান হয়ে ঘিরে রইল প্রায় না জ্বলাবই মতো। ক্রমশ সারা ঘর যেন একটা অন্য জগতে রূপান্তরিত হতে লাগল। সে জগতের সঙ্গে যেন স্বাভাবিক মানুষেব কোনও যোগই নেই।

সেই বস্তুপুঞ্জ তখন বৃহৎ বিশাল হয়ে শুধু দরজা কেন, ডোমের অনেকখানি উঁচু পর্যন্ত গড়ে উঠে দবজার সমস্ত প্রস্থটাকে অধিকার করে ফেলেছে। এবং মনে হচ্ছে যেন অদৃশ্য একটা ছেনি, টুকরো-টুকরো করে ছেনে গড়ে তুলছে একটি আকার। অন্ধকারে আকারটা ফিকে নীলচে একটা আভা বিকিরণ করছে। আভাটা সরোম, আর গাঢ় ছাইরঙা অন্ধকার মেশানো।

ক্রমশ তৈরি হয়ে উঠল বড়-বড় ঠেলে বের হয়ে আসা দুটো চোখ। চোখের আবার রংটা ঈষৎ নীলচে। তাতে কোনও দৃষ্টি নেই। স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল ফোলা-ফোলা এবড়ো-খেবড়ো নাক। নাকেব তলায় মাংসল দুটি ঠোঁট। সেই লোল ঠোঁটেব ফাঁক দিয়ে ঝিলিক দিতে লাগল হলুদ-হলুদ দাঁতেব সারি।

ক্রমশ গড়ে উঠতে লাগল হাত, হাতের ফোলা-ফোলা বাঁকা-বাঁকা অর্ধগলিত আঙুল। আঙুলেব মুখে সুচলো নখ আর দীর্ঘ ন্যুব্জ হাঁটু। স্পষ্ট হয়ে ওঠা সেই মূর্তিকে এবার চেনা যাচ্ছে।

শারমার সেই প্রভুভক্ত দ্বাররক্ষীটি। কিন্তু সে তো এত বড়, এত বিশাল, এত বীভৎস ছিল না।

অশনিনাথ বললেন, ও কোনও জীবন্ত মানুষ নয়, পিশাচ,—ও পিশাচ. শারমা আজ রাতে একটা পিশাচকে জাগিয়ে তুলেছে, যাতে আমাদের ক'জনকে শেষ করে দেওয়া যায়।

শিশির বুঝতে পারল তার শবীবের ভেতরটা বাঁশ পাতাব মতো থরথর করে কাঁপছে। সে দেখল মূর্তিটা এবার শূন্যে দুলতে-দুলতে তাদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। সেই ভযংকর ভাবলেশহীন চোখের স্থির অক্ষিগোলকের তলায় সাদা-সাদা দুটি শূন্যতা, আর সেই হলুদ ছত্রখান দাঁতের দুপাশে লোল দুটি ঠোঁটের পুরু-পুরু বিস্তার। সোমনাথের দাঁতে দাঁত লেগে যাওয়ার শব্দ উঠছিল অন্ধকারে। সে নিজেকে সংবরণ করার আপ্রাণ চেষ্টা করতে-করতে বলল, অশনিদা, গুলি করুন, গুলি।

অশনিনাথ ভয়ার্ত চাপাকণ্ঠে বললেন, গুলি করলেও কোনও কাজ দেবে না. এখানে গুলির কোনও মূল্য নেই।

· বেশ, তাহলে আপনি রিভলভারটা আমাকে দিন।

শিশির বুঝতে পারল, সোমনাথের হাতে অশনিনাথ তাঁর রিভলভারটি তুলে দিলেন।

অন্ধকারে প্রখর বিদ্যুৎচমক খেলে রিভলভার গর্জে উঠল। কিন্তু সেই ভয়ংকর মূর্তি যেন বাতাসে কাঁপতে-কাঁপতে ক্রমাগত এগিয়েই আসতে লাগল। মনে হল ঘরের হাওয়ায় পাশবিকতার প্রগাঢ় ছায়া যেন আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। আর সেই ভয়ংকর মূর্তি উঁচু হয়ে ছাদের মাথায় গিয়ে ঠেকেছে প্রায়।

অশনিনাথ চাপা গলায় শিবস্তোত্র আবৃত্তি করার চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু কোনও শব্দ যেন তাঁর মাথায় এল না। এত পরিচিত, এত কণ্ঠস্থ সব দেবস্তোত্র, দেব-দেবীর নাম হাওয়ায় হারিয়ে যেতে লাগল। স্মৃতি থেকে মুছে যেতে লাগল।

দুটো ভয়াল হাত তার বিশাল-বিশাল করতল, তার স-নখর আঙুলগুলোর সুচলো কালো-কালো নখ যেন ভেসে উঠল ওদের তিনজনের গুটিসুটি মারা, অন্ধকারে সিঁটিয়ে থাকা শরীরের ওপর। তখনই অন্ধকারে হঠাৎ ঝকঝক করে উঠল সোমনাথের গলার চেনে ঝোলানো ধাতব ওঁ-কারটি। সেদিকে শিশিরের মতো অশনিনাথেরও চোখ পড়ে গেল। তিনি হঠাৎ সোমনাথের গলা থেকে চেনটা টেনে নিয়ে বিড়বিড় করে বলতে লাগলেন সেই স্তোত্রটি, সেই অসতো মা সদগময়ো তমসো মা জ্যোতির্গময়...সেই আলোক প্রার্থনার বাণী। তারপর ছুঁড়ে মারলেন ঝুঁকে-পড়া সেই ছায়ার ওপর।

সঙ্গে-সঙ্গে অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। টুকরো-টুকরো হয়ে খসে পড়তে লাগল সেই ভয়ংকর দীর্ঘ মূর্তির শরীর। হাওয়ায় মিশিয়ে যেতে লাগল টুকরোগুলো। ক্রমশ গন্ধ কমতে লাগল এবং আলোর বাল্‌বগুলির ভেতরে ফিরে আসতে লাগল ঈষৎ জ্যোতি। আস্তে-আস্তে জ্বলে উঠল আলোকগুচ্ছ। ঘরের বাতাস হয়ে উঠল হালকা, স্বাভাবিক।

তিনজন ভয়ার্ত বুদ্ধিভ্রংশ মানুষ কিছুক্ষণ হতবাক হয়ে থেকে প্রায় একসঙ্গেই শক্তি সংগ্রহ করে, পাগলের মতো ছুটল সিঁড়ির দিকে। সোজা নেমে গিয়ে ছুটে উঠে পড়ল গাড়িতে।

গাড়ি ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল অশনিনাথের বাড়ির দিকে।

অশনিনাথের বারান্দায় আধশোয়া অবস্থায় বসেছিল সোমনাথ আর শিশির। অত রাতেও শ্রীমন্ত উঠে গরম কফি বানিয়ে এনে দিয়েছে! উঠে বসে সেই কফিটুকু পান করার মতোও যেন শক্তি নেই তাদের। অশনিনাথের চোখের তলায় গভীর কালো ছায়া। কফির পেয়ালায় ধীরে লম্বা চুমুক মেরে তিনি বললেন, আঃ বাঁচলাম। বলো সোমনাথ, এবার তাহলে আমরা কী কবব? শিশির তুমিও কিছু বুদ্ধি দাও।

কফির পেয়ালাটা হাতে তুলে নিয়ে শিশির বলল, কিন্তু অশনিদা, আজ সন্ধে থেকে যেসব ঘটনা ঘটল এসব ঘটনা তো আমার নাগালের বাইরে।

অশনিনাথ বললেন, তাহলে তোমার মতো যুক্তিবাদী মানুষও স্বীকার করে নিচ্ছে তো অলৌকিকের অস্তিত্ব।

শিশির বলল, স্বীকার না করে আর উপায় কোথায়? কিন্তু অশনিদা, আপনাকে আমার একটা অনুরোধ আছে। যখন আপনি আমাকে এই ব্যাপারে জড়িয়েই ফেলেছেন, আমাকে আপনাদের সঙ্গে রাখুন। আমি এ ঘটনা শেষপর্যন্ত দেখতে চাই।

অশনিনাথ বললেন, শিশির, আসলে আমাদেরও লোকবলের দরকার। আর এসব ঘটনা সবাইকে সবসময় বিশ্বাস করে বলাও সম্ভব হয় না। তুমি সোমনাথের বন্ধু, এই জন্যেই তোমাকে এনেছি। তুমি নিশ্চয়ই আমাদের সঙ্গে থাকবে। কিন্তু এ ব্যাপারে বিপদের ঝুঁকি...আজ জানলাম প্রচণ্ড। দ্যাখো শিশির, আমি আর সোমনাথ আগে ভেবেছিলাম কেবল ড্রাগ অ্যাডিকশন করে এইসব কাণ্ড ঘটাচ্ছে শারমা। কিন্তু এখন দেখছি ড্রাগ অ্যাডিকশন আর খুন ছাড়াও সত্যি পিশাচতন্ত্রের ব্যাপারও এর সঙ্গে জড়িয়ে গেছে।

শিশির বলল, সবরকম ঝুঁকি নিতে আমি রাজি আছি অশনিদা। আর লোকবল? লোকবলের দরকার হলেও আমি আপনাকে অতি বিশ্বস্ত কর্মী দিয়ে সাহায্য করতে পারব।

সোমনাথ কফির পেয়ালাটা নামিয়ে রেখে বলল, আমার মাথা এখনও বনবন করে ঘুরছে অশনিদা। আমি একটু ঘুমিয়ে নিতে চাই এখন।

অশনিনাথ বললেন, কিন্তু ঘুমোনোর সময় তো নেই সোমনাথ। সমস্ত ব্যাপারটা আমি যতটা

আন্দাজ করেছি তা তোমাদের বুঝিয়ে বলি একটু। দ্যাখো, আজ ভূত-চতুর্দশী। কাল বিকেল পর্যন্ত চতুর্দশী থাকবে। আজ শারমা কোনও বিশেষ অনুষ্ঠান করছিল, যাতে শোভনকে পিশাচতন্ত্রে দীক্ষিত করা যায়। কাল বিকেল থেকে অমাবস্যা পড়ছে। কাল বিকেলে হবে আসল দীক্ষার অনুষ্ঠানের গোড়াপত্তন। কাল বিকেলের আগে যদি শোভনকে উদ্ধার করে না আনতে পারি, তাহলে শারমা শোভনকে শেষ করে দেবেই। শোভনকে আর আমরা ফেরাতে পারব না। তাই যেভাবেই হোক শোভনকে খুঁজে বের করতেই হবে।

শিশির বলল, কলকাতা পুলিশের অত্যন্ত দক্ষ অফিসার আছেন। এ ব্যাপারে আপনি তাঁদেব সঙ্গে যোগাযোগ করুন না কেন অশনিদা?

সোমনাথ পকেট থেকে সিগারেটেব প্যাকেট আর লাইটার বের করতে গিয়ে হঠাৎ একটা উজ্জ্বল সোনালি বস্তু তুলে ধরল।

আবে সেই সুন্দরী মেয়েটির পার্সটা যে আমার কাছেই থেকে গেছে।

অশনিনাথ তাড়াতাড়ি ব্যাগটা সোমনাথের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে বললেন, দেখি, দেখি, এটার মধ্যে যদি কোনও হদিশ পাওয়া যায়।

পার্সটা খুলতেই তাব মধ্যে ঝকমক করে উঠল একটি মূল্যবান পাথর বসানো হার। একটি ছোট কার্ড। পিছনে এন্টালির একটি ঠিকানা লেখা। কার্ডটি পার্ক স্ট্রিটেব ফুলের দোকানের। আব একটি তাবিজ ও কিছু খুচরো টাকা।

অশনিনাথ বললেন, যাদেব কেউ নেই, সত্যিই তাদের ভগবান আছেন। যাও সোমনাথ তুমি এখন নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ো। কাল ভোবে আমি তোমায় উঠিযে দেব। তুমি এন্টালিব এই বাড়িতে গিয়ে এই মেযেটিব খোঁজ করবে। বলবে, ব্যাগটা তুমি ওকে ফেবত দিতে এসেছ। কারণ এই তাবিজটা দেখেই আমি বুঝতে পারছি এই ব্যাগ হাবিয়ে মেয়েটিরও এখন পাগলেব অবস্থা। সে যে-কোনও মূল্যে ব্যাগটি ফেরত চায।

সোমনাথ বলল, ঠিক আছে। তাই হবে।

অশনিনাথ বললেন, যাও এবাব একটু ঘুমিয়ে নাও তোমবা। কাল সকাল থেকে আবাব ঘোবতব খাটুনির মধ্যে গিয়ে পড়বে।

সকালবেলার হালকা আলোয় শিশির ঘুম থেকে জেগে উঠতেই দেখল অশনিনাথ তাব বিছানাব পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। হাতে তাঁব সদ্যফোটা গোলাপের একটি তোড়া।

শিশির ধড়মড় করে উঠে বসে পড়ে বলল, ব্যাপাব কী?—তারপর পাশেব বিছানায তাকিযে দেখল সোমনাথ তখনও পড়ে-পড়ে ঘুমোচ্ছে। সোমনাথকে তুলে দিযে অশনিনাথ বললেন, হাতমুখ ধোও। সুন্দর করে সাজো। আজ তোমাকে প্রেমিকের অভিনয় করতে হবে।

সোমনাথ থতমত খেয়ে বলল, মানে?

হ্যাঁ। এই গোলাপের তোড়া আজ সকালবেলায় তোমার জন্যে বেছে-বেছে বাগান থেকে তুলে এনেছি। এটা নিয়ে তুমি মেয়েটির সঙ্গে দেখা করতে যাবে। ব্যাগ ফেরত দেবে কিন্তু তাবিজটা দেবে না। বলবে, সম্ভবত আমার কাছে থেকে গেছে। চাপ দিয়ে শোভনের ঠিকানাটা জোগাড় করবে যাতে শোভনকে আমরা নিয়ে আসতে পারি অমাবস্যার পৈশাচিক অনুষ্ঠান ঘটার আগে।

সোমনাথ বলল, অভিনয় যদি সফল না হয়?

হতেই হবে। কারণ তোমার অভিনয়ের ওপর শোভনের জীবন-মরণ নির্ভর করছে। কোনওক্রমে যদি মেয়েটিকে আমার কাছে একবার নিয়ে আসতে পার। আর শিশির, তোমারও কাজ আছে। আমার সঙ্গে তোমায় শোভনদের কলকাতার বাড়ি যেতে হবে। সেখানে বোধহয় এখন ওর কাকাও নেই। বাড়ি আছে ম্যানেজারবাবুর হেপাজতে। আমাদের পিশাচতন্ত্রেব সেই পুরোনো পুঁথিগুলো উলটে-পালটে দেখতে হবে।

সোমনাথ উঠে বসল ঃ আমি তাহলে দ্রুত চলে যাই। এই কার্ডে লেখা ঠিকানায় আমি চলে যাব। গিয়ে মেয়েটির সঙ্গে যোগাযোগ করতে চেষ্টা করব। আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করব কখন?

সন্ধের আগে। সূর্য যেন না ডোবে।

অশনিনাথ বলল, চা খেয়ে যাও, শ্রীমন্ত সব রেডি করেছে।

চায়ের সরঞ্জাম আর ব্রেকফাস্ট নিয়ে শ্রীমন্ত তখনই ঢুকল। তার হাতে সকালের খবরের কাগজ।

চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে-দিতে অশনিনাথ কাগজ উলটোচ্ছিলেন। হঠাৎ চমকে উঠে বললেন, এই যে, আমি জানতাম,—এই ঘটনাই ঘটবে। নাকতলা পেরিয়ে ধানখেতের পাশে একটা মৃতদেহ পাওয়া গেছে। লোকটি স্থানীয় শ্মশানের ডোম। মৃতদেহটি এত তাড়াতাড়ি কী করে পাওয়া গেল কে জানে? কাল মাঝরাতের আগে তো দেহটা ফেলা হয়নি।

শিশির বলল, কাগজের অফিসে ফোন করুন না।

অশনিনাথ বললেন, ফোন করে আর কী হবে? নিশ্চয়ই কোনও-না-কোনও ভাবে খবরের কাগজে খবরটা পৌঁছে গেছে। লোকটাকে শ্বাসরুদ্ধ করে খুন করা হয়েছিল।

শিশির বলল, খুন?

হ্যাঁ, একটা বিশ্বাস আছে যে, চণ্ডাল, ডোম, বাগদি এইসব জাত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন ব্রাহ্মণরা যাদের ছোট জাত বলে এসেছে এতদিন, তাদের মৃতদেহ নিয়ে শবসাধনা করলে নাকি সহজে সফল হওয়া যায়।

সোমনাথ বলল, একটা বাজে কুসংস্কারের জন্যে নিরপরাধ লোকটিকে প্রাণ দিতে হল।

অশনিনাথ বললেন, এই তো কাগজে লিখেছে, এই দরিদ্র লোকটিকে যে কেন শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করা হল তা কেউ বুঝতেই পারছেন না।

শিশির বলল, আচ্ছা অশনিদা, কাল যাকে সেই গম্বুজ-ঘরে দেখলাম, তার দেহ পাওয়া যায়নি?

অশনিনাথ বললেন, সেই দেহ? যে দেহ বহুদিন আগে মৃত? সে তো কবে গলে বাতাসে মিশে গেছে! শবসাধনা করে শারমা ওই দেহে পিশাচ জাগিয়েছিল। সে পিশাচ তো কাল শেষ হয়ে গুঁড়িয়ে গেছে। আর তাকে পাওয়া যাবে না। হয়তো একবছর, দু-বছর, দশবছর ধরে ওই পিশাচ ক্রীতদাস ওই গলিত দেহে বন্দি হয়েছিল।

যাক নষ্ট করার সময় নেই আর। আমি চললাম। সোমনাথ উঠে পড়ল।

শিশির বাড়িতে ফোন করে দিল। সে বাড়ি হয়ে অশনিনাথের সঙ্গে শোভনদের লাইব্রেরিতে যাবে।

সোমনাথ প্রথমেই গাড়ি নিয়ে পার্ক স্ট্রিটের সেই ফুলের দোকানটিতে গেল। আসলে আজ যে কাজে সে যাচ্ছে সে কাজের জন্যে মানসিক প্রস্তুতি নেওয়ার দরকার ছিল তার। একটি অচেনা মেয়েকে নিষ্পাপ প্রেমের কথা বলে অভিনয় করার চেয়ে তার ওপর যদি একশোটা গুণ্ডার মহল্লা একা নেওয়ার আদেশ দিতেন অশনিনাথ তাহলে বোধহয় সে ব্যাপারটা তার পক্ষে আরও অনেক সহজ হত।

সোমনাথের দীর্ঘায়ত সুন্দর চেহারা, তার পোশাকের পারিপাট্য, মস্ত গাড়ি দেখে সমীহভরে উঠে এলেন স্বয়ং দোকানের মালিক। সোমনাথ ভাবল গোলাপ তোড়ার সঙ্গে একগুচ্ছ গ্লাডিওলি পেয়ে গেলে মেয়েটি হয়তো আরও প্রসন্ন হয়ে উঠতে পারে। দোকানের একজন কর্মচারী যখন ফুলগুলি তোড়া বেঁধে দিচ্ছিল তখন সে দোকানের মালিকের সঙ্গে আলাপ করতে আরম্ভ করল। তার প্রেমের অভিনয়ের রিহার্সাল যেন এই ফুলের দোকান থেকেই শুরু হল।

একটা সিগারেট ধরিয়ে সোমনাথ বলল, আচ্ছা, সম্প্রতি একজনকে আপনি আপনার দোকানের কার্ড দিয়েছিলেন কি?

অনেককেই তো দিয়েছিলাম!

না, মানে একটি মেয়ে—মানে আমি তার কথাতেই আপনার দোকানে এলাম!

কে বলুন তো?

খুব সুন্দরী, তেইশ-চব্বিশ বছর বয়েস হবে—মেয়েটির ধরুন...মানে খুব নিষ্পাপ চেহারা। আর হাতে বোধহয় একটা সোনার তারের ছোট্ট হাত ব্যাগ।

ও হ্যাঁ-হ্যাঁ মনে পড়েছে। হ্যান্ডব্যাগটার জন্যে তো বটেই। নিষ্পাপ চেহারাটার জন্যেও বটে! বুঝতে পেরেছি। সঙ্গে একজন বেশ বয়স্কা মহিলা ছিলেন। উনি একঝাড় রজনীগন্ধা কিনতে চাইছিলেন। কিন্তু সেই ভদ্রমহিলা বারবার করে বলছিলেন লাল ফুল কেনবার জন্যে। আমার ফুলগুলো ওঁর খুব পছন্দ হয়েছিল বলে আমি ওঁকে আমার কার্ডটা দিয়েছিলাম। তাতে একটু হেসে বললেন, ঠিক আছে, যতদিন আপনাদের শহরে থাকব, ততদিন নিশ্চয়ই ফুল কিনতে আসব!...কিন্তু তারপর আর আসেননি। তাহলে উনিই আপনাকে আমার দোকান দেখিয়ে দিয়েছেন?—ভালো।

সোমনাথ বলল, হ্যাঁ! ওঁর জন্যেই ওই ফুল নিয়ে যাচ্ছি।—ফুলের গুচ্ছটা বুকের কাছে ধরে সোমনাথ হঠাৎ বলল, আচ্ছা, আপনার কি সত্যিই মনে হয়, মেয়েটি খুব নিষ্পাপ?

দোকান মালিকের ঠোঁটে মৃদু হাসি ফুটে উঠল। তিনি বোধহয় সোমনাথের অসহায় অবস্থাটা কিছুটা বুঝতে পারলেন। বললেন, সত্যিই, আমি আন্তরিকভাবে মনে করি তিনি খুব নিষ্পাপ।

সোমনাথ যখন ড্রাইভ করে চলল, তখন স্পষ্ট বুঝতে পারল মেয়েটির চেহারাটি তার অন্তঃস্থলে এত পরিষ্কারভাবে অঙ্কিত হয়ে গেছে যে সে যেন ছবির মতো সেই মুখখানি দেখতে পাচ্ছে। ছিপছিপে কোমল একটি শরীর। ফুটন্ত ফুলের মতো একটি মুখ। হাতে একটা পানপাত্র নিয়ে কেমন যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

এন্টালির সেই বাড়িটির কাছে এসে গাড়িটা রাখল সোমনাথ। মস্ত ব্যারাক বাড়ি। গোটা কুড়ি ফ্ল্যাট আছে।

কার্ডে ফ্ল্যাট নাম্বার দেওয়া ছিল। ফ্ল্যাট নাম্বার মিলিয়ে-মিলিয়ে তিনতলায় উঠে গেল সোমনাথ। দরজার সামনে নেমপ্লেটে লেখা আছে মিসেস এন. কে. কাপুর।

সোমনাথের বুকের কাছে দু-গুচ্ছ টাটকা ফুলের তোড়া। তবু সে ডোরবেল বাজানোর আগেই পকেটে হাত দিয়ে নিজের অটোমেটিকটাকে আন্দাজ করে নিল।

বেল বাজাতেই ম্যাজিক আই-এর স্বচ্ছ কাচটা ঈষৎ ঘোর হয়ে এল। তারপরে দরজা খুলে গেল।

দরজার মুখে যেন দরজা আড়াল করে দাঁড়িয়ে পড়লেন এক বিশালদেহী মহিলা। এঁকে সেদিন রাত্রে শোভনদের সেই পার্টিতে দেখেছিল সোমনাথ। মনে পড়ল তাঁর বিশাল চেহারা। কদর্য একটি মুখ। মুখের চামড়ায় অদ্ভুত সব কুঞ্চন। ঘোলাটে চোখে বয়স্কা মহিলার অনুচিত কামার্ত দৃষ্টি। সোমনাথ বলল, মিসেস কাপুর, আমাকে চিনতে পারছেন?

মিসেস কাপুর বললেন, আপনাকে কোথায় দেখেছি বলুন তো?

সোমনাথ বলল, কেন মনে পড়ছে না কোথায় দেখেছেন?

মহিলা ঘুম-ঘুম চোখে ভ্রূকুঞ্চিত করে অনেক ভাববার চেষ্টা করলেন, তারপর বললেন—কোনও বন্ধুর বাড়িতেই বোধহয়...।

সোমনাথ মাথা নেড়ে বলল, হ্যাঁ, বন্ধুই, বন্ধুই তো!

মহিলা ফুলের তোড়া দেখে এবার এগিয়ে এলেন। আসতেই ভক করে একটা গন্ধ পেল সোমনাথ। সে স্পষ্ট বুঝতে পারল মহিলা ঈষৎ অপ্রকৃতিস্থ। তাই ঠিক ধরতে পারছেন না, সোমনাথকে কেন্দ্র করে ঠিক কী ঘটেছিল। এইটুকুই তাঁর স্মৃতিতে আছে যে কোনও বন্ধুবান্ধবের বাড়িতে বন্ধু হিসেবেই সোমনাথকে দেখেছিলেন। সোমনাথ গোলাপের গুচ্ছটি পরম অনিচ্ছায় মিসেস

সোমনাথ উঠে বসল ঃ আমি তাহলে দ্রুত চলে যাই। এই কার্ডে লেখা ঠিকানায় আমি চলে যাব। গিয়ে মেয়েটির সঙ্গে যোগাযোগ করতে চেষ্টা করব। আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করব কখন?

সন্ধের আগে। সূর্য যেন না ডোবে।

অশনিনাথ বলল, চা খেয়ে যাও, শ্রীমন্ত সব রেডি করেছে।

চায়ের সরঞ্জাম আর ব্রেকফাস্ট নিয়ে শ্রীমন্ত তখনই ঢুকল। তার হাতে সকালের খবরের কাগজ।

চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে-দিতে অশনিনাথ কাগজ উলটোচ্ছিলেন। হঠাৎ চমকে উঠে বললেন, এই যে, আমি জানতাম,—এই ঘটনাই ঘটবে। নাকতলা পেরিয়ে ধানখেতের পাশে একটা মৃতদেহ পাওয়া গেছে। লোকটি স্থানীয় শ্মশানের ডোম। মৃতদেহটি এত তাড়াতাড়ি কী করে পাওয়া গেল কে জানে? কাল মাঝরাতের আগে তো দেহটা ফেলা হয়নি!

শিশির বলল, কাগজের অফিসে ফোন করুন না।

অশনিনাথ বললেন, ফোন করে আর কী হবে? নিশ্চয়ই কোনও-না-কোনও ভাবে খবরের কাগজে খবরটা পৌঁছে গেছে। লোকটাকে শ্বাসরুদ্ধ করে খুন করা হয়েছিল।

শিশির বলল, খুন?

হ্যাঁ, একটা বিশ্বাস আছে যে, চণ্ডাল, ডোম, বাগদি এইসব জাত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন ব্রাহ্মণরা যাদের ছোট জাত বলে এসেছে এতদিন, তাদের মৃতদেহ নিয়ে শবসাধনা করলে নাকি সহজে সফল হওয়া যায়।

সোমনাথ বলল, একটা বাজে কুসংস্কারেব জন্যে নিরপরাধ লোকটিকে প্রাণ দিতে হল।

অশনিনাথ বললেন, এই তো কাগজে লিখেছে, এই দবিদ্র লোকটিকে যে কেন শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করা হল তা কেউ বুঝতেই পাবছেন না।

শিশির বলল, আচ্ছা অশনিদা, কাল যাকে সেই গম্বুজ-ঘরে দেখলাম, তাব দেহ পাওযা যাযনি?

অশনিনাথ বললেন, সেই দেহ? যে দেহ বহুদিন আগে মৃত? সে তো কবে গলে বাতাসে মিশে গেছে! শবসাধনা করে শারমা ওই দেহে পিশাচ জাগিয়েছিল। সে পিশাচ তো কাল শেষ হয়ে গুঁড়িয়ে গেছে। আর তাকে পাওয়া যাবে না। হযতো একবছর, দু-বছব, দশবছর ধরে ওই পিশাচ ক্রীতদাস ওই গলিত দেহে বন্দি হয়েছিল।

যাক নষ্ট করার সময় নেই আর। আমি চললাম। সোমনাথ উঠে পড়ল।

শিশির বাড়িতে ফোন করে দিল। সে বাড়ি হয়ে অশনিনাথের সঙ্গে শোভনদের লাইব্রেরিতে যাবে।

সোমনাথ প্রথমেই গাড়ি নিয়ে পার্ক স্ট্রিটের সেই ফুলের দোকানটিতে গেল। আসলে আজ যে কাজে সে যাচ্ছে সে কাজেব জন্যে মানসিক প্রস্তুতি নেওয়ার দরকার ছিল তার। একটি অচেনা মেয়েকে নিষ্পাপ প্রেমের কথা বলে অভিনয় করার চেয়ে তার ওপর যদি একশোটা গুণ্ডার মহল্লা একা নেওয়ার আদেশ দিতেন অশনিনাথ তাহলে বোধহয় সে ব্যাপারটা তার পক্ষে আরও অনেক সহজ হত।

সোমনাথের দীর্ঘায়ত সুন্দর চেহারা, তার পোশাকের পারিপাট্য, মস্ত গাড়ি দেখে সমীহভরে উঠে এলেন স্বয়ং দোকানের মালিক। সোমনাথ ভাবল গোলাপ তোড়ার সঙ্গে একগুচ্ছ গ্লাডিওলি পেয়ে গেলে মেয়েটি হয়তো আরও প্রসন্ন হয়ে উঠতে পারে। দোকানের একজন কর্মচারী যখন ফুলগুলি তোড়া বেঁধে দিচ্ছিল তখন সে দোকানের মালিকের সঙ্গে আলাপ করতে আরম্ভ করল। তার প্রেমের অভিনয়ের রিহার্সাল যেন এই ফুলের দোকান থেকেই শুরু হল।

একটা সিগারেট ধরিয়ে সোমনাথ বলল, আচ্ছা, সম্প্রতি একজনকে আপনি আপনার দোকানের কার্ড দিয়েছিলেন কি?

অনেককেই তো দিয়েছিলাম।

না, মানে একটি মেয়ে—মানে আমি তার কথাতেই আপনার দোকানে এলাম।

কে বলুন তো?

খুব সুন্দরী, তেইশ-চব্বিশ বছর বয়েস হবে—মেয়েটির ধরুন...মানে খুব নিষ্পাপ চেহারা। আর হাতে বোধহয় একটা সোনার তারের ছোট্ট হাত ব্যাগ।

ও হ্যাঁ-হ্যাঁ মনে পড়েছে। হ্যান্ডব্যাগটার জন্যে তো বটেই। নিষ্পাপ চেহারাটার জন্যেও বটে! বুঝতে পেরেছি। সঙ্গে একজন বেশ বয়স্কা মহিলা ছিলেন। উনি একঝাড় রজনীগন্ধা কিনতে চাইছিলেন। কিন্তু সেই ভদ্রমহিলা বারবার করে বলছিলেন লাল ফুল কেনবার জন্যে। আমার ফুলগুলো ওঁর খুব পছন্দ হয়েছিল বলে আমি ওঁকে আমার কার্ডটা দিয়েছিলাম। তাতে একটু হেসে বললেন, ঠিক আছে, যতদিন আপনাদেব শহরে থাকব, ততদিন নিশ্চয়ই ফুল কিনতে আসব!...কিন্তু তারপর আর আসেননি। তাহলে উনিই আপনাকে আমার দোকান দেখিয়ে দিয়েছেন?—ভালো।

সোমনাথ বলল, হ্যাঁ! ওঁর জন্যেই ওই ফুল নিয়ে যাচ্ছি।—ফুলের গুচ্ছটা বুকের কাছে ধরে সোমনাথ হঠাৎ বলল, আচ্ছা, আপনার কি সত্যিই মনে হয়, মেয়েটি খুব নিষ্পাপ?

দোকান মালিকের ঠোঁটে মৃদু হাসি ফুটে উঠল। তিনি বোধহয় সোমনাথেব অসহায় অবস্থাটা কিছুটা বুঝতে পারলেন। বললেন, সত্যিই, আমি আন্তরিকভাবে মনে করি তিনি খুব নিষ্পাপ।

সোমনাথ যখন ড্রাইভ করে চলল, তখন স্পষ্ট বুঝতে পাবল মেয়েটির চেহারাটি তার অন্তঃস্থলে এত পরিষ্কাবভাবে অঙ্কিত হয়ে গেছে যে সে যেন ছবির মতো সেই মুখখানি দেখতে পাচ্ছে। ছিপছিপে কোমল একটি শরীব। ফুটন্ত ফুলের মতো একটি মুখ। হাতে একটা পানপাত্র নিয়ে কেমন যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

এন্টালিব সেই বাড়িটির কাছে এসে গাড়িটা রাখল সোমনাথ। মস্ত ব্যারাক বাড়ি। গোটা কুড়ি ফ্ল্যাট আছে।

কার্ডে ফ্ল্যাট নাম্বার দেওয়া ছিল। ফ্ল্যাট নাম্বাব মিলিয়ে-মিলিয়ে তিনতলায় উঠে গেল সোমনাথ। দরজাব সামনে নেমপ্লেটে লেখা আছে মিসেস এন. কে. কাপুর।

সোমনাথের বুকের কাছে দু-গুচ্ছ টাটকা ফুলের তোড়া। তবু সে ডোরবেল বাজানোব আগেই পকেটে হাত দিয়ে নিজের অটোমেটিকটাকে আন্দাজ করে নিল।

বেল বাজাতেই ম্যাজিক আই-এব স্বচ্ছ কাচটা ঈষৎ ঘোর হয়ে এল। তারপরে দরজা খুলে গেল।

দরজার মুখে যেন দরজা আড়াল করে দাঁড়িয়ে পড়লেন এক বিশালদেহী মহিলা। এঁকে সেদিন রাত্রে শোভনদের সেই পার্টিতে দেখেছিল সোমনাথ। মনে পড়ল তাঁর বিশাল চেহাবা। কদর্য একটি মুখ। মুখের চামড়ায় অদ্ভুত সব কুঞ্চন। ঘোলাটে চোখে বয়স্কা মহিলার অনুচিত কামার্ত দৃষ্টি। সোমনাথ বলল, মিসেস কাপুর, আমাকে চিনতে পারছেন?

মিসেস কাপুর বললেন, আপনাকে কোথায় দেখেছি বলুন তো?

সোমনাথ বলল, কেন মনে পড়ছে না কোথায় দেখেছেন?

মহিলা ঘুম-ঘুম চোখে ভ্রূকুঞ্চিত করে অনেক ভাববার চেষ্টা করলেন, তারপব বললেন—কোনও বন্ধুর বাড়িতেই বোধহয়...।

সোমনাথ মাথা নেড়ে বলল, হ্যাঁ, বন্ধুই, বন্ধুই তো!

মহিলা ফুলের তোড়া দেখে এবার এগিয়ে এলেন। আসতেই ভক করে একটা গন্ধ পেল সোমনাথ। সে স্পষ্ট বুঝতে পারল মহিলা ঈষৎ অপ্রকৃতিস্থ। তাই ঠিক ধরতে পারছেন না, সোমনাথকে কেন্দ্র করে ঠিক কী ঘটেছিল। এইটুকুই তাঁর স্মৃতিতে আছে যে কোনও বন্ধুবান্ধবের বাড়িতে বন্ধু হিসেবেই সোমনাথকে দেখেছিলেন। সোমনাথ গোলাপের গুচ্ছটি পরম অনিচ্ছায় মিসেস

কাপুরের হাতে তুলে দিয়ে বলল, আপনার জন্যে এনেছি। আমার বাগানের ফুল। আর আর এই গ্ল্যাডিওলিটা—

বুঝেছি বুঝেছি,—চন্দ্রার জন্যে তো?—দিন, আমাকে দিন। চন্দ্রা এখন খুব ব্যস্ত আছে। ও আজ কারও সঙ্গে দেখা করবে না। এবার সোমনাথ একটু নির্লজ্জ হওয়ার চেষ্টা করল। বলল, বেশ তো চন্দ্রার সঙ্গে দেখা করার কী দরকার। আপনি তো আছেন। একটু আপনার সঙ্গেই কথা বলি।

মিসেস কাপুর বোধহয় এবার একটু প্রসন্ন হলেন। দরজাটা ছেড়ে দিয়ে বললেন, আসুন আসুন, ভেতরে আসুন।

সোমনাথ তাঁর পিছন-পিছন ভেতরে ঢুকল। সরু প্যাসেজের ওপর একই সারিতে তিনটি ঘর। কোণে রান্নাঘর। বাক্সের মতো একটি জায়গা। যে ঘরটিতে সোমনাথকে নিয়ে ঢুকল মহিলাটি সে ঘরটি খুব সাদা-মাটাভাবে সাজানো। কোণে একটি টেবিলের ওপর রাখা ফুলদানিতে শুকনো ফুলের গোছা। সেদিকে তাকিয়ে মিসেস কাপুর বললেন, আসলে ফ্ল্যাটে থাকবারই তো সময় পাচ্ছি না। তাই ফুলগুলোও বদলানো হয়নি। আপনি বসুন, একটু চায়ের ব্যবস্থা করি।

সোমনাথ চুপচাপ বসে রইল। মোটা-মোটা পরদা টাঙানো ধুলোর গন্ধ ভরা ঘর। সারা ফ্ল্যাটে থমথমে একটা আবহাওয়া, মানুষের কোনও সাড়াশব্দ নেই। মনে হয় এখুনি যেন এই মুহূর্তে কোনও একটা ঘর থেকে বেরিয়ে আসবে শারমার কোনও লোক। কিংবা কোনও অলৌকিক প্রচ্ছায়া। কিন্তু সেই মেয়েটিই বা কোথায়? সে কি সত্যিই এই ফ্ল্যাটে আছে? নাকি অন্য কোথাও থাকে সে। এ ফ্ল্যাটে কেবল এই পিশাচিনীর সঙ্গে সে একলা।

সোমনাথ উঠে দাঁড়িয়ে ঘরের মধ্যে পায়চারি করল খানিকটা। তারপর উঁকি মেরে দেখল রান্নাঘরে গ্যাস জ্বালিয়ে মিসেস কাপুর নিজেই চা বানাচ্ছেন।

হঠাৎ পাশের ঘরের পরদা দুলে উঠল। সেই পরদার পাশ দিয়ে দেখা গেল চন্দ্রাকে। সে সোমনাথকে দেখতে পায়নি। মিসেস কাপুরের দিকে তাকিয়ে বলল, আন্টি, আমি চা খেতে পাবি তো?

সোমনাথ দ্রুত এসে বাইরের ঘরের চেয়ারে যেমন বসেছিল তেমনি বসে পড়ল। গুনগুন করে গান গাইতে-গাইতে ঘরে ঢুকল চন্দ্রা, তারপর চমকে চুপ করে দাঁড়াল। সে সোমনাথকে দেখে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল।

সোমনাথ তাকে দেখে উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করে বলল, আমি আপনাকেই খুঁজছিলাম।

আমাকে? কেন? আমি তো আপনাকে চিনতে পারছি না।

আমাকে আপনি আগে দেখেননি?

চেনা-চেনা মনে হচ্ছে বটে। কিন্তু কোথায় দেখেছি বলুন তো?

সোমনাথ খুব রহস্য করে বলল, হয়তো পূর্বজন্মে! যাক দয়া করে বসুন। আপনার সঙ্গে আমার বিশেষ দরকার আছে।

আমার সঙ্গে আপনার আবার কীসের দরকার থাকতে পারে?

একজন বন্ধুর, একজন বন্ধুর সঙ্গে কীসের দরকার থাকতে পারে বলুন?

আপনি আমার বন্ধু?

হাসল চন্দ্রা। ম্লান চন্দ্রকিরণের মতো একটি হাসি। মনে হয় যেন এই জগতে কারও কাছ থেকেই তার যেন কোনও কিছুই চাইবার নেই।

হ্যাঁ, আপনি ঠিকই বুঝবেন,—আমি আপনার কত বন্ধু।

কীসে বুঝব?

হঠাৎ সোমনাথ যেন জাদুকরের ভঙ্গিতে নিজের বুকপকেট থেকে সেই ব্যাগ বের করল।

আনন্দে-উল্লাসে অধীর হয়ে হাত বাড়াল চন্দ্রা।

আপনি ওটা এনেছেন? ফিরিয়ে এনেছেন তাহলে? বাঁচলাম আমি। হ্যাঁ, এবার মেনে নিচ্ছি। আপনি সত্যিই আমার বন্ধু।

ইতিমধ্যে ট্রে-তে করে চা আর বিস্কুট নিয়ে ঢুকলেন মিসেস কাপুর। সোমনাথ তাবিজটি পকেটে পুরে রাখল। চন্দ্রাকে দেখেই গনগনে মুখে বললেন, এ কী তুমি এখানে বেরিয়ে এসেছ কেন, চন্দ্রা?

চন্দ্রা উল্লসিত-কণ্ঠে বলল, আন্টি, এই দেখুন, আমি আমার ব্যাগটা ফিরে পেয়েছি। শারমা এঁকে দিয়ে আমার কাছে ব্যাগটা পাঠিয়ে দিয়েছেন!

মিসেস কাপুর এবার যেন অন্য দৃষ্টিতে তাকালেন সোমনাথের দিকে।

ও-ও, আপনি আগে বললেই পারতেন যে আপনি শারমার কাছ থেকে এসেছেন। তাহলে আর,—।

সোমনাথ বুঝতে পাবল ঈশ্বর মুখ তুলে চেয়েছেন। সে বলল, আপনারা আর বলবার সময় দিলেন কই? যাই হোক, আমি বলছিলাম আজ সন্ধ্যায় আপনারা কী করছেন?

কেন আজ সন্ধ্যায় তো আমাদের শারমার সঙ্গে যাওয়ার কথা। আপনি যাচ্ছেন না?

সোমনাথ কথার উত্তর দেওয়ার আগেই চন্দ্রা বলল, না শারমা বলেছিলেন, তাবিজটা না পাওয়া গেলে আজ সন্ধ্যায় আবার নতুন করে তাবিজ করাতে হবে—তারপর...।

সোমনাথ বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ—আজ সন্ধ্যার ব্যাপারটা ঠিকই আছে মিসেস কাপুর। আপনারা ওখানেই যাবেন। আমারই বলতে ভুল হয়ে গেল। আমি আসলে বলতে চাইছিলাম আজ দুপুরে আপনারা কোথায় যাবেন?—যদি কোনও অ্যাপয়েন্টমেন্ট না থাকে তাহলে আমার সঙ্গে বেরোতে পারেন!

মিসেস কাপুব অবাক হয়ে বললেন, আমি না হয় বেবোতে পারি। অ্যাকচুযালি আমার তো আব কোথাও যাওয়ার বাধা নেই। কিন্তু চন্দ্রা কী কবে যাবে? চন্দ্রাব পক্ষে তো আজ কোথাও যাওয়া সম্ভব না। এ কথা আপনি আমাদেব লোক হয়ে কী কবে বলছেন? কিন্তু আপনি বলছিলেন না বাইরে যাবেন! চলুন, এবার আপনাব সঙ্গে আমি বেরোতে পারি। আমার কিছু জিনিসপত্র সওদা করতে হবে। একটু অর্থপূর্ণভাবে সোমনাথের দিকে তাকিয়ে বললেন, আজকের রাতের উপকরণ সব, বুঝলেন তো। বাজার ঘুরলেও মেলে না।

সোমনাথের সমস্ত উৎসাহ কে যেন জল ঢেলে নিভিয়ে দিল। সে ক্ষীণগলায় বলল, নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, বলুন কোথায় যাবেন?

মিসেস কাপুর বললেন, আপনি একটু বসুন, আমি তৈরি হয়ে নিই।

মিসেস কাপুর অন্য ঘরে চলে যেতেই সোমনাথ অসহায়ভাবে চন্দ্রার দিকে তাকাল। তাকাতেই তার মনে হল চন্দ্রাব চোখ দুটি সজল একটা আকুতিতে টলটল করছে। চোখের মধ্যে যেন কিসেব একটা প্রশ্ন এবং কিসের একটা গভীর প্রার্থনা।

সোমনাথ হঠাৎ চাপাগলায় বলল, আপনাকে আমি কিছু বলতে চাই।

চন্দ্রা মৃদুকণ্ঠে বলল, কী বলবেন বলুন।

সোমনাথ কথাটা বলেছিল তার অন্তঃস্থলের একটা আবেদন থেকে। কিন্তু কেন বলেছিল তা তার নিজেরই মনের সচেতনে ছিল না। সোমনাথ তাই থতমত খেয়ে বলল, ফুলগুলো আপনার কেমন লাগল?

চন্দ্রা বলল, আমার সবচেয়ে ভালো লাগে গ্ল্যাডিওলি আপনি কী করে জানলেন?

সোমনাথ হেসে বলল, জানেন না, আমি হাত গুনতে জানি?

হঠাৎ চন্দ্রার সমস্ত মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। তারপর তাতে ছড়িয়ে পড়ল আবির। রুদ্ধকণ্ঠে

বলল, দেখুন তো আমার হাতটা। আপনি সত্যিই কেমন হাত গুনতে পারেন আমি তার প্রমাণ পেতে চাই।

সোমনাথের করতলে নিজের করতলটি জোর করে মেলে দিল চন্দ্রা। সোমনাথ তার হাতটা দেখতে যাবে এমন সময় করিডোরে মিসেস কাপুরের শাড়ির খসখস শব্দ উঠতে লাগল। সোমনাথ তাড়াতাড়ি চন্দ্রার হাতটা সরিয়ে দিয়ে বলল, আমাকে বন্ধু বলে বিশ্বাস করেন তো?

চন্দ্রা বলে ফেলল, হ্যাঁ।

তাহলে বলি আপনাকে, মিসেস কাপুরকে বাজারে পৌঁছে দিয়ে আমি এখুনি আবার ফিরে আসছি। আসলে আপনার তাবিজটা অশুদ্ধ হয়ে গেছে। ওটা আমি এখন আনিনি। কেবল ব্যাগটাই এনেছি।

ইতিমধ্যে ঘরে ঢুকে পড়লেন মিসেস কাপুর। হেসে বললেন, চলুন মিস্টার—কী বলব। আপনার নাম তো আমি ঠিক জানি না!

সোমনাথ হেসে বলল, সোমনাথ চ্যাটার্জি।

আচ্ছা আচ্ছা! চলুন তাহলে।

সোমনাথ বলল, আচ্ছা চন্দ্রা দেবী তাহলে যাই!

মিসেস কাপুরকে বড়বাজারে নামিয়ে দিয়ে সোমনাথ যখন আবার এন্টালির ফ্ল্যাটে ফিবে এল তখন চন্দ্রা তার ফ্ল্যাটে একা। সে ইতিমধ্যে স্নান সেরেছে। ভিজে চুলগুলি ঘন-কালো। চকচক করছে। মাথার চুলের স্তূপে একটি জবার মালা জড়ানো। পরনে একটি খড়খড়ে খয়েরি ধাঁচের কাপড়ের ম্যাক্সি। সেটা দেখেই সোমনাথের গা শিরশির করে উঠল। কারণ সে বুঝতে পারল এটা রক্তে ভেজানো। ঘরের এককোণে একটি ফ্লাওয়ার ভাসে সে সযত্নে গ্ল্যাডিওলিগুলো সাজিয়েছে। সব মিলিয়ে চন্দ্রাকে দেখলে মনে হয় যেন সে নিজেকে একটা উৎসর্গের জন্য প্রস্তুত করছে।

সোমনাথের মনের মধ্যে ঝলক দিয়ে উঠল শোভনের স্মৃতি। না জানি শোভনকে নিয়ে কী করছে শারমা। তাকেও কি এমনি কোনও পৈশাচিক উৎসর্গের মধ্যে দিয়ে নিয়ে যাবে ওরা। কে জানে? একসময় সোমনাথ, সবাই যেমন কিছুটা কৌতূহলে এবং কিছুটা খেলার ছলে করে, তেমনিভাবে কিরোর বই-টই ওলটাত। আজ যে সেই ফাঁকি দেওয়া বিদ্যে কিছুটা কাজে লেগে যাচ্ছে তাতেই সে মহাখুশি। চন্দ্রা সোমনাথের মুখোমুখি বসে সাগ্রহে তার হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, দেখুন, দেখুন তো এ কি স্বাভাবিক হাত?

সোমনাথ বলল, হঠাৎ একথা বলছেন কেন?

চন্দ্রা বলল, আপনি দেখুন না। আমি সাধে শারমার কাছে আসিনি। আপনি দেখুন না আমার লাইফ-লাইনটা।

সোমনাথ চন্দ্রার কোমল সুছাঁদ করতলটি দু-হাতের মধ্যে ধরে ভালো করে দেখতে-দেখতে সত্যিই তার বিস্ময় চাপতে পারল না। মাত্র একটুখানি এগিয়েই হঠাৎ ওর সমস্ত জীবনরেখাটাই ফুরিয়ে গেছে। তারপর অনেকটা শূন্যতা। তারপর আবার জীবনরেখাটা ফিরে এসে চলে গেছে বহুদূর পর্যন্ত। এই অদ্ভুত ছেদ কেন? এ তো অবধারিত মৃত্যুচিহ্ন। এতখানি ফাঁক—এ তো থাকার কথা নয়!

চন্দ্রা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলতেই চোখ তুলল সোমনাথ। চন্দ্রা হেসে বলল, বুঝেছি, বুঝেছি, আপনার চোখেও তাহলে ব্যাপারটা ধরা পড়েছে? জানেন, আমি জানি, একুশ বছর তিন দিন আমার পরমায়ু। আমার বয়েস কাল একুশ বছর পূর্ণ হয়েছে। একুশ বছর একদিন আমার বয়েস। আপনিই বলুন এখনও যদি না আমি পাগল উম্মাদ হয়ে উঠি তাহলে আর কবে হব?

সোমনাথ চন্দ্রার মুখের দিকে সপ্রশ্ন চোখে তাকাল।

চন্দ্রার চোখ দুটি ছলছলে। মুখের রেখায়-রেখায় একটা অপূর্ব পবিত্রতা। কিন্তু সত্যিই যদি চন্দ্রার পরমায়ু আর মাত্র দুদিন হয় তাহলে...।

সোমনাথ হেসে উঠল এবার।

সত্যি, সত্যি আপনি এইসব হোকাস-পোকাসে বিশ্বাস করেন?

চন্দ্রা ফ্যাকাসে মুখে বলল, আমি শারমাকে বিশ্বাস করি। উনি যা বলেন তা অক্ষরে-অক্ষরে মিলে যায়।

অর্থাৎ শারমা আপনাকে মৃত্যুর ভয় দেখিয়ে কাতর করে রেখেছে?

না, মৃত্যুর ভয় দেখিয়ে কাতর করে রাখলে আমি শারমার কথা মেনে নিতাম না সোমনাথবাবু। তিনি আমায় পথ দেখিয়েছেন। বাঁচার পথ—।

বাঁচার পথ?

হ্যাঁ, আপনি এমন একটা ভান করছেন যেন কিছু জানেন না।

সোমনাথ বুঝতে পারল গভীর দুশ্চিন্তায় তার অভিনয়ে ভুল হতে শুরু করেছে। তার সবই জানা উচিত ছিল।

সে তবু আন্দাজে ঢিল ছুড়ল। সে বুঝতে পারছিল এই পরমায়ু সংক্রান্ত কোনও ব্যাপারেই শারমার কাছে হয়তো আজ সন্ধ্যায় যাচ্ছে চন্দ্রা। আর সেই জন্যেই সারাদিন ধরে সে নিজেকে প্রস্তুত করে তুলছে। জবার মালায়, উপবাসে, রক্তে ভেজা পোশাক পরে। তাই বলল—

না সে কথা বলছি না, বলছি, যে এত দুরূহ সব ব্রত পালন-টালন আপনাকে করতে হবে, আপনার তাতে কত কষ্ট হবে বলুন,—আমি সেই কথাই বলছিলাম।

চন্দ্রা বলল, কষ্ট? কষ্ট কী বলছেন! অনন্ত জীবনের জন্য অনন্তকালের জন্যে ভগবানের জগৎ থেকে শয়তানের জগতে চলে যাচ্ছি। এ জন্যে মনস্থির কবতে আমার কম সময় লাগেনি। তিন মাস ধরে ক্রমাগত ভেবেছি, আর ভেবেছি। আমি ভেবেছি, শোভনবাবু ভেবেছেন, আরও যাঁদের শারমা আশ্রয় দেবেন তাঁরাও ভেবেছেন।

সোমনাথ খুব গম্ভীর সবজান্তার ভঙ্গি করে বলল, সত্যিই তো। ভাববারই তো কথা। আমিও ভাবছি! আমিও যে শেষপর্যন্ত কী করব...।

শারমার কাছে গিয়ে আশ্রয় নিন, আর কী করবেন? কী-বা করার আছে?

আচ্ছা, শোভনেরও তো এই একই ব্যাপার, তাই না?

হ্যাঁ, ওঁদের পরিবারে তো মৃগী রোগ আছে। তাই মৃগীর পূর্ণ লক্ষণ দেখা দিয়েছে। আজকাল যখন-তখন অজ্ঞান হয়ে যান। বংশে তো বাতি দেওয়ার মতো কেউ রইল না। তাই শারমা বলেছেন, যদিও শোভনবাবু সন্তানের মুখ হয়তো দেখতে পাবেন না, কিন্তু তিনি তাঁর নিজের পরমায়ু অনন্ত করে নেবেন।

সোমনাথের ভেতর একটা অজানা ভয় থরথর করে কাঁপতে লাগল। অনন্ত কালের জন্য ভগবানের রাজত্ব ছেড়ে শয়তানের রাজত্বে প্রবেশ? সে কী ভীষণ জীবন্ত নরক। এই নরক থেকে এই নিষ্পাপ মেয়েটিকে কি কিছুতেই উদ্ধার করা যায় না? কিংবা শোভনকে বের করে আনা যায় না?

হঠাৎ তার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল, সে বলল, চলুন আজ শারমার ওখানে যাওয়ার আগে আমি কালীঘাটের কাছ থেকে আপনাকে টাটকা কিছু জবা এনে দিই।

চন্দ্রা বলল, না না, ফুল লাগবে না। ফুল নিয়ে কী হবে। শারমা কালীঘাটের ফুল তো আরওই নেবেন না।

সোমনাথ তখন পাগলের মতো অস্থির হয়ে উঠেছে চন্দ্রাকে ফ্ল্যাটের বাইরে নিয়ে যাওয়ার জন্য। সে বলল, না, আপনাকে নিয়ে আজ আমি একটু বেরোবই, আমার একটা কথা আপনি দয়া করে রাখুন!

চন্দ্রা একটু অবাক হয়ে বলল, কী কথা? বলুন?

আমার একজন অত্যন্ত পরিচিত লোক আছেন। তিনি খুব ভালো কর-কোষ্ঠী বিচার করেন। আপনি তাঁকে একবার আপনার হাতটা দেখান। তাহলে হয়তো তিনি হাতের রেখার অন্য কোনও অর্থ বলে দেবেন।

চন্দ্রা হাসল। অদ্ভুত হতাশ আর করুণ একটা হাসি।

আর মাত্র দুদিন পরমায়ু আমার। এখন আর আমার নতুন কোনও ঝুঁকি নেওয়ার সময় নেই। তা ছাড়া, আমি কম লোককে হাত দেখাইনি, সোমনাথবাবু। আমার পরমায়ুর অভাব থাকতে পারে। কিন্তু টাকার অভাব নেই।

সোমনাথ হঠাৎ তীব্র আবেগের বশবর্তী হয়ে চন্দ্রার দুটো হাত নিজের অঞ্জলিতে তুলে নিল। তারপর বলল, একটি অনুরোধ রাখুন আমার। আমায় দয়া করুন। আমি আপনাকে ভালোবাসি!

চন্দ্রা আস্তে-আস্তে নিজের হাতটা সোমনাথের হাত থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, কী—কী বলছেন আপনি?

সোমনাথ হাঁটুগেড়ে বসে চন্দ্রার কোলের ওপর ভেঙে পড়ল।

চন্দ্রা আস্তে-আস্তে সোমনাথের মাথাটি তুলে দিতে-দিতে বলল, বেশ, চলুন। দেখুন এখন ঘড়িতে তিনটে বাজে। আমায় কিন্তু সন্ধে পাঁচটার সময় এই ফ্ল্যাটে ফিরিয়ে দিতে হবে। না হলে আমার মৃত্যু আর কিছুতেই রোধ করতে পারবেন না আপনি। মনে রাখবেন আমার জীবন নিয়ে কিন্তু আপনি ছিনিমিনি খেলছেন।

সোমনাথ উঠে পড়ল। উৎফুল্লমুখে বলল, চলুন! এই পোশাকেই চলুন। আমার বন্ধু কিছু মনে করবেন না। তাঁর কাছেই আপনার তাবিজটা আছে।

চন্দ্রা বলল, বেশ, আমি তাহলে পাশের ঘর থেকে আমার হাত ব্যাগটা নিয়ে আসি। মনে রাখবেন, ডায়মন্ডহারবারের কাছে, হীরাপুর গ্রামের শৈবাল কুটিরে আমাকে সন্ধে সাতটার মধ্যে পৌঁছতে হবেই।

চন্দ্রা পাশের ঘরে চলে গেলে সোমনাথ তীব্র একটা লাফ দিয়ে উঠে টেলিফোনের ডায়াল ঘুরিয়ে শোভনদের বাড়িতে ফোন করল! সৌভাগ্যবশত একবারেই লাইন পাওয়া গেল। এবং এক্সটেনশন ধরে লাইব্রেরিতে লাইন নিয়ে পেয়ে গেল অশনিনাথকে। চাপা গলায় বলল, আজ সন্ধে সাতটায় হীরাপুর গ্রামের শৈবাল কুটিরে শারমা যাচ্ছে। কিন্তু তার আগে আপনার কাছে ওই চন্দ্রা নামের মেয়েটিকে নিয়ে যেতে চাই। আপনি তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে আসুন।

ওদিক থেকে অশনিনাথ বললেন, যেমন করে পারো মেয়েটিকে নিয়ে আমার কাছে চলে এসো। কিছুতেই ছেড়ো না। শোভনকে বাঁচানো চাই-ই।

চন্দ্রার পায়ের শব্দ পেয়ে সোমনাথ তাড়াতাড়ি ফোনটা রেখে দিল।

চন্দ্রা বলল, কাকে ফোন করছিলেন?

সোমনাথ বলল, দেখছিলাম আমার সেই বন্ধুটি বাড়িতে আছে কি না? কারণ হাতে তো আমাদের নষ্ট করার মতো সময় নেই একদম।

অশনিনাথের বাইরের ঘরটিতে বসে চন্দ্রা, মুগ্ধ হয়ে পুরোনো আমলের জিনিসপত্রগুলো দেখছিল। সোমনাথ তার দৃষ্টি অনুসরণ করে বড়-বড় ড্রাগন এনগ্রেভ করা চায়না ভাস, ভারী পরদা, পুরু সোনালি ফ্রেম দেওয়া তেলরঙা ছবি, বড়-বড় আয়না, ঝাড়-লন্ঠন এইসব দেখছিল। স্বপ্নাশ্রিতের মতো চন্দ্রা বলল—জানেন, এই বাড়িটা দেখে আমার নিজের ছোটবেলার কথা খুব মনে পড়ছে।

আমি যেন ছোটবেলায় এমনি ধরনের কোনও বাড়িতে ছিলাম। কিন্তু সে বাড়ি এখানে নয়। অনেক দূর। সেখানে বন আছে। পাহাড় আছে। বালিয়াড়ি আছে।

আমার যদ্দূর মনে পড়ে আমার মায়ের খুব অসুখ ছিল। তিনি সবসময় বিছানায় পড়ে থাকতেন। আর আমি আমার আয়ার হাত ধরে-ধরে একটা বিরাট বাড়িতে একা-একা ঘুরে বেড়াতাম। আমাদের মস্ত বড় বাগান ছিল। বাগান না বলে মাইলের-পর-মাইল জোড়া বিরাট জায়গায় অজস্র গাছপালার ছোটখাটো একটা জঙ্গলই বলা যায়। আমাদের ওই বিরাট বাড়িতে আমার মায়ের ওই একলা শুয়ে-থাকা আর অন্যমহল থেকে সামান্য দু-একজন আত্মীয়স্বজনের মাকে দেখে যাওয়া— এইসব দেখতে-দেখতে আমার মাথা ঝিমঝিম করত। আয়ার হাত ধরে বনের মধ্যে দিয়ে বেড়াতে-বেড়াতে আমি যেন দেখতে পেতাম একটা অদ্ভুত চেহারার লোক আমাকে বনজঙ্গলের ভেতর দিয়ে উঁকি মেরে দেখছে! চোখাচোখি হতেই হঠাৎ যেন অদৃশ্য হয়ে যেত। আয়া আমাকে খুব ভালোবাসত। কিন্তু সে অত নির্জন বাড়িতে কিছুতেই থাকতে পারত না। ছটফট করত। বলত—আমি এবার ঠিক চলে যাব। তোর বাবা গেছে, তোর মামারা গেছে—কেউ থাকতে পারেনি। এ বাড়িতে যে থাকবে সে-ই মরবে। তোর মা, অমন ফুলের মতো মানুষটা! দেখিস বেশি দিন আর বাঁচবে না। ঠিক চলে যাবে।

সেই সময় একদিন আমাদের ম্যানেজারবাবু একজন জ্যোতিষী নিয়ে এসেছিলেন। যদ্দূর মনে পড়ে, সে মায়ের হাত দেখে, আমার হাত দেখে বলেছিল—আমাদের নাকি অনেক পরমায়ু। কিন্তু জানেন, মা-কে শেখানো কথা বলা হয়েছিল। কিচ্ছু সত্যি না। লোকটা চলে যাওয়ার পর আয়া আমাকে বলেছিল। তারপর কী হল জানেন, সেই অদ্ভুত চেহারার লোকটা, যাকে আমি মাঝে-মাঝেই লতাপাতার আড়ালে দেখতে পেতাম—সবার নজর এড়িয়ে আমাদের বাড়ির ওপর তলায় একদম মায়ের ঘরের কাছে চলে এল। আমি কী একটা কাজে যেন মায়ের ঘরে গিয়ে পড়েছিলাম তখনই। দেখলাম লোকটা মায়ের বিছানার পাশে কার্পেটের ওপর হাঁটুগেড়ে বসে নির্নিমেষ চোখে মাকে দেখছে। মা তার কাছে নিজের হাতটি মেলে ধরেছেন। আপনি বিশ্বাস করুন সোমনাথবাবু, লোকটি দেখতে ঠিক শারমার মতো। শারমার এখন যা বয়েস, ঠিক সেই বয়েস। তবে পোশাক অন্যরকম। একটা আলখাল্লার মতো জিনিস পরা। থুতনি থেকে ঝুলছে কতকগুলো আলগা সাদা দাড়ি। লোকটা মাকে বলেছিল—তুমি মরে যাবে, ঠিক মরে যাবে। তাই বলছি, তোমার আত্মাটা দিয়ে দাও। তাহলে আমি তোমায় অনেক বছর পরমায়ু দিয়ে দেব।

আমাকে লোকটা প্রথমে দেখতে পায়নি। পিছন ফিরে ছিল। মা যেই বললেন—তুমি এখানে কেন? তুমি চলে যাও, চলে যাও এখান থেকে—

মায়ের কথা শুনেই শারমার মতো দেখতে লোকটা ফিরে তাকাল। ওঃ, সে কী অদ্ভুত চোখ লোকটার। যেন আমার সমস্ত ভেতরটা ধরে টান দিচ্ছিল। লোকটা আমাকে ডাকতে লাগল। এসো, এসো খুকি, এদিকে এসো, এই যে, দ্যাখো সুরমা, তোমার মেয়ের পরমায়ু দ্যাখো। তোমার ভগবানের রাজত্বের বিচারে মাত্র একুশ বছর! বেশ অন্তত ওর মুখ চেয়ে, ওর আত্মাটা আমাকে দিয়ে দাও! তুমি কি চাও তোমার মেয়ে অকালে এইভাবে মারা যাক?

আমার মা কেঁদে উঠেছিলেন। বলেছিলেন, তুমি যাও, যাও, শনিগ্রহ, যাও—হ্যাঁ, আমার মেয়ের শয়তানের জীবন পাওয়ার চেয়ে মরা অনেক ভালো। অনেক ভালো। জানেন, সেইদিন রাত্রেই আমার মা মারা যান। তারপর আমার কাকারা আমাকে নিয়ে গেলেন লক্ষ্ণৌ-এ। সেখানেই আমার জীবনের আঠেরোটা বছর কাটে। আবার ফিরে এলাম আমার বিষয়-আশয় বুঝে নেওয়ার জন্য। তারপরই শারমা নিজে এসে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। দেখুন, আমি কিন্তু রাজি হয়েছি। বাঁচার লোভ আমার প্রচণ্ড। এ লোভ আমি ছাড়তে পারব না সোমনাথবাবু।

সোমনাথ অবাক হয়ে চন্দ্রার মুখের দিকে তাকিয়ে চন্দ্রার জীবনের দীর্ঘ কাহিনি শুনছিল। হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠল।

সোমনাথ তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে ফোন ধরল। ফোনের ওপাশে অশনিনাথ কথা বলছিলেন। তাঁর কণ্ঠস্বরে চাপা উত্তেজনা। অশনিনাথ বললেন, সোমনাথ, এইমাত্র শিশির একটা পুরোনো পুঁথি খুঁজে পেয়েছে। মানুষের রক্ত দিয়ে লেখা পুঁথিটা। পুঁথিটায় অদ্ভুত সব ব্যাপার পাচ্ছি। পুঁথিটা শোভনদের পুরোহিত বংশের কোনও পূর্বপুরুষের। কিন্তু এর ভেতর শারমা বলে একজন টীকাকারের নামও পাচ্ছি। আমার কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছে সেই টীকাকার শারমা আর এই শারমার মধ্যে একটা যোগসাজস রয়েছে। এতে লেখা আছে কী করে মানুষের আত্মা শয়তানকে উৎসর্গ করতে হয়। খুব জটিল সব ক্রিয়া-প্রক্রিয়া। আমরা তার প্রতিষেধক কীভাবে নেওয়া যায় সেটাও লক্ষ রাখছি। সেজন্যেই কিছুটা দেরি হবে। তুমি কোনওক্রমে মেয়েটিকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে আটকে রাখো।

সোমনাথ ফোনটা নামিয়ে রেখে ফিরে এল।

চন্দ্রা ততক্ষণে অস্থির হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে।

কই, কী হল?—আপনার বন্ধু আসছেন না? আমি তো আর অপেক্ষা করতে পারছি না সোমনাথবাবু!

সোমনাথ বলল, কেন? কিছু দেরি হয়নি, এই তো দেখুন না ঘড়িতে মাত্র—

মাত্র সাড়ে-চারটে। আপনি ঠিক পাঁচটার মধ্যে আমাকে মিসেস কাপুরের ফ্ল্যাটে ফিরিয়ে দিয়ে আসবেন তো? কখনও পারবেন না সোমনাথবাবু। তা হয় না। আপনি আমায় ছেড়ে দিন। আমি এবার চলে যাই। আমি না হয় একটা ট্যাক্সিই ডেকে নিচ্ছি, আপনি কেবল আমার তাবিজটা ফিরিয়ে দিন।

সোমনাথ বলল, না না, আপনি একটু অপেক্ষা করুন। আচ্ছা এখন তো সাড়ে-চারটে আর আধঘণ্টা সময় আমায় দয়া করে দিন। আমি কথা দিচ্ছি আপনাকে আমি রকেট স্পিডে এন্টালিতে পৌঁছে দেব। ঠিক পৌঁছে দেব। চলুন আপনাকে একটু বাগানে নিয়ে যাই। অশনিনাথের বাগানটা দেখবার মতো। আর বাগানের শেষে গঙ্গার ঘাট। ওঁদের নিজস্ব ঘাট। ঘাটে ছোট বোট থাকে। বোটে একটু ঘুরিয়েও আনা যাবে আপনাকে...বেশি দেরি লাগবে না। ভয় পাবেন না। যদিও আপনার পরমায়ু সম্বন্ধে আপনার যে ধারণা, তা আমি বিশ্বাস করি না। তবুও আপনার দায়িত্ব এখন সম্পূর্ণ আমার হাতেই।

চন্দ্রা কেমন যেন সন্দিগ্ধ-চোখে সোমনাথের দিকে তাকাল। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, ঠিক আছে—চলুন।

সোমনাথ আর চন্দ্রা বাগানে নেমে যেতেই সোমনাথ শ্রীমন্তর সঙ্গে কথা বলার ছুতো করে একটু পিছিয়ে গিয়ে নিজের হাতঘড়িটা আধঘণ্টা পিছিয়ে নিল।

এই অন্যায়টা করার জন্য একটা গ্লানি তাকে স্পর্শ করছিল। কিন্তু শোভনকে তো শারমার কবল থেকে বাঁচাতেই হবে। তা ছাড়া, অশনিনাথ এই সরল, সহজ, নিষ্পাপ মেয়েটির মধ্যেও তো বিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে পারেন। শারমার সর্বনাশা কবল থেকে মুক্তি লাভের একমাত্র উপায়ই হল তাকে বোঝানো যে, শারমার পথ অনন্ত জীবনের পথ নয়। পৈশাচিক মৃত্যুর পথ। স্বাভাবিক মৃত্যুর পর যদি একটা দেহ বেঁচে থাকে, তাহলে সে দেহের বাঁচার উপকরণ অন্য দেহ-নিঃসৃত জীবন। রক্ত। মেদ মজ্জা।

বাগানের সবুজ ঘাসের আস্তরণ পেরিয়ে সোমনাথ সোজা এগিয়ে গেল বাগানের শেষ প্রান্তে রঙিন ছাতার তলায়। সেখানে বেতের চেয়ারে হেলান দিয়ে অন্যমনা হয়ে গঙ্গার দিকে তাকিয়ে ছিল চন্দ্রা।

শ্রীমন্ত ট্রে-তে করে গরম ক্রিম আর ফেনায়-ভরা দু-গেলাস এসপ্রেসো কফি এনে নামিয়ে দিল।

চন্দ্রা একবার বিরস চোখে কফির দিকে তাকিয়ে আবার চোখ ফিরিয়ে নিল গঙ্গার দিকে।

শ্রীমন্ত ফিরে এসে বলল, আপনাকে ফোনে ডাকছেন। সোমনাথ মিয়োনো গলায় চন্দ্রাকে বলল,—কফিটা খান, আমি এক্ষুণি আসছি...

অশনিনাথই ফোন করছিলেন। তিনি ব্যস্ত কণ্ঠে বললেন, আজ যে-জায়গায় ওদের মিট করার কথা সে-জায়গাটা কোথায় যেন সোমনাথ?

—ডায়মন্ডহারবারের কাছে। হীরাপুরের শৈবাল কুটিরে।

—শোনো সোমনাথ, আমাকে আর শিশিরকে এখুনি বেরিয়ে পড়তে হচ্ছে। কিছু জিনিসপত্র সংগ্রহ করতে হবে। ফিরতে-ফিবতে সন্ধে সাতটার কাছাকাছি হয়ে যেতে পারে। আমরা যদি তেমন দেরি দেখি তাহলে হয়তো সোজা ডায়মন্ডহারবারেই চলে যেতে পারি। তুমি কিন্তু মেয়েটিকে যেভাবে হোক আটকে রেখো। এমনও তো হতে পারে, যে শারমা মেয়েটিকে না পেলে আজকের পৈশাচিক ক্রিয়াকর্মটা বন্ধ করেও দিতে পারে—।

সোমনাথ উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, কিন্তু একটি মেয়ে, যার মাত্র দু-দিন পরমায়ু বাঁকি আছে, তাকে কি আটকে রাখাটা ঠিক হবে?

অশনিনাথ বললেন, যার সত্যিই মাত্র দু-দিন পরমায়ু, তার জন্যে মনের জোর তৈরি করা ছাড়া আমি তো আর কোনও উপায়ই দেখি না।

কিন্তু শারমা যে তাকে অনন্ত জীবন দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে—।

ওদিক থেকে অশনিনাথ চরম বিরক্তিতে বলে উঠলেন, আঃ, সোমনাথ, তুমি খামোখা উত্তেজিত হয়ে পড়ছ, দুর্বল হয়ে পড়ছ। তোমার কি খুব ভালো লাগবে যদি ওই সুন্দর পবিত্র মেয়েটি একটা রক্তপিপাসু, কামার্ত পিশাচিনী হয়ে যায়?

সোমনাথ বলল, কিন্তু আমি যে চন্দ্রাদেবীকে কথা দিয়েছি যে পাঁচটার মধ্যে ফিরিয়ে দেবই...

অশনিনাথ বললেন, যাক, তোমার সঙ্গে বাজে কথা বলারও এখন সময় নেই আমার। তুমি যা ভালো বোঝো করো।

টেলিফোন রেখে দেওয়ার শব্দ হল।

অপরাহ্ণের ছায়া ঘনিয়ে আসছে। গঙ্গার জল রঙিন হয়ে উঠছে। সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে একটা গাঢ় বিষাদ, একটা গভীর শান্তি। সোমনাথ দেখল, দূরে রঙিন ছাতার তলায় গা এলিয়ে বিষণ্ণ মুখে বসে আছে চন্দ্রা। চন্দ্রার মুখের দিকে তাকিয়ে মায়ায়, করুণায় সোমনাথের সারা মন যেন কেঁদে উঠল। সে লম্বা-লম্বা পা ফেলে এগিয়ে এল চন্দ্রার কাছে। বলল, চলুন, আপনার দেরি হয়ে যাচ্ছে।

চন্দ্রা গ্রীবা তুলে বলল, ক'টা বেজেছে?

সোমনাথ বলল, আমি আপনার কাছে মিথ্যে কথা বলেছিলাম। ঘড়ির সময় আধঘণ্টা পিছিয়ে রেখেছিলাম। এখন মিসেস কাপুরের কাছে এন্টালিতে যাওয়ার সময় নেই আর। আপনাকে আমি সিধে নিয়ে যেতে চাই হীরাপুরের শৈবাল কুটিরে।

চন্দ্রা চোখ বড়-বড় করে তাকাল।

কী বলছেন আপনি, সোমনাথবাবু? আপনি আমার এতখানি বিপদ জেনেও আমাকে ইচ্ছে করে মিথ্যে কথা বলছিলেন। কিন্তু কেন?

সোমনাথ বলল, আপনি বিশ্বাস করুন, এখনও পর্যন্ত আমি আপনার জন্যে যা-যা করেছি সবই আপনার ভালোর জন্যেই। কিন্তু এখন সত্যিই যখন উপায় নেই তখন কী আর বলব বলুন, আপনাকে নিয়ে গিয়ে তুলে দিতে চাই আমার বন্ধুর হাতে।

চন্দ্রা এবারে সবেগে উঠে দাঁড়াল।

আপনার বন্ধুর হাতে। অনেক হয়েছে সোমনাথবাবু। আপনি আমার প্রচুর উপকার করেছেন। আর দয়া করে উপকার করতে হবে না আমার। আমাকে আপনি সোজা শারমার কাছে পৌঁছে দিন।..তা ছাড়া, আপনাকে আর বিশ্বাস কী বলুন? নিজেই চলে যেতে চাই শারমার কাছে...আপনি যে কৌশল করে আমার তাবিজটা নিয়ে নিলেন এটাই আক্ষেপ রইল।

চন্দ্রা দ্রুতবেগে এগোতে লাগল। সোমনাথ তার পিছন-পিছন যেতে-যেতে বলল, চন্দ্রা দেবী! চন্দ্রা দেবী। আপনাকে আমি কথা দিচ্ছি, আমি ঠিক আপনাকে শৈবাল কুটিরে পৌঁছে দেব। দয়া করে এ বিশ্বাসটুকু আমার ওপর রাখুন।

চন্দ্রাকে নিয়ে নিজের স্পোর্টসকারে উঠল সোমনাথ। গাড়িটা উড়ে চলল রাস্তা দিয়ে।

অশনিনাথ আর শিশির পাশাপাশি বসে। গাড়ি ছুটছে ডায়মণ্ডহারবার রোড ধরে। সন্ধ্যার অন্ধকারে হেড লাইটের আলোটুকুই ঈষৎ পথ দেখাচ্ছে। হীরাপুর গ্রাম রাস্তার পাশের একটি বাঁকা মোড় ঘুরে খানিকদূরে চলে গেলে পাওয়া যাবে মনে হচ্ছিল। কিন্তু এই রাস্তায় এখন যেন গাড়ির মেলা লেগে গেছে। গাড়ির মেলা মানে অন্তত তিন চারটি বিশাল-বিশাল বিদেশি গাড়ি ওদের পাশ দিয়ে চলে গেল।

অশনিনাথ বললেন, বুঝতে পারলে তো, গাড়িগুলো সব চলেছে হীরাপুরের দিকে।

শিশির সোৎসাহে বলল, অশনিদা, ওদের পিছন-পিছন গেলে কেমন হয়?

খুব ভালো হয়। কিন্তু একটু স্পিড কমিয়ে দিয়ে যেতে হবে। যাতে সবশেষে পৌঁছয় আমাদের গাড়িটা। কারণ, সবাই নেমে ভেতরে না ঢুকে গেলে আমাদের পক্ষে নামাটা অত্যন্ত বিস্কি হয়ে দাঁড়াবে। আমাদের দেখলেই ওরা বুঝতে পারবে আমরা ওই দলের কেউ নই। এবং সেদিনের সেই গোলমালের নায়ক আমরাই। শারমার সেই পিশাচকে তো আমরাই সেদিন শেষ করে দিয়েছি। শারমা আমাদের দেখলে এর বদলা নেবেই।

শিশির বলল, কিন্তু অশনিদা ওই নারকীয় পুরাণে যা পড়লাম তা কি বাস্তবে সত্যি-সত্যি ঘটে?

ঘটে না?—অশনিদা গাড়ি ড্রাইভ করতে-করতে বললেন, আমি তো ছোটবেলায় গল্প শুনেছি, আমাদের দেশের বাড়িতে এক পূর্বপুরুষের একমাত্র সন্তানের মৃত্যু হয়। ছেলেটিকে যখন শ্মশানে দাহ করতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখন হঠাৎ এক তান্ত্রিক এসে হাজির। সেদিন নাকি ছিল এক ভীষণ ঝড় বাদলের রাত্রি। সেই তান্ত্রিক বললেন, যদি কেউ এই ঝড় আর হাওয়ার তোড় অস্বীকার করে নারকেল গাছের মাথা থেকে একটা ডাব পেড়ে আনে তাহলে আমি এই ছেলের শরীরে প্রাণ সঞ্চার করে দিতে পারি। এবং শোনা যায় সেই ডাব নিয়ে নিশি ডেকে-ডেকে সে রাতে তিনি সারা গ্রামে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। শেষপর্যন্ত একটি গরিব চাষির ছেলের প্রাণ নিয়ে বাঁচিয়েছিলেন ছেলেটিকে।

শিশির বড়-বড় চোখ করে তাকিয়ে রইল অশনিনাথের মুখের দিকে।

অশনিনাথ বললেন, ওই চন্দ্রা মেয়েটিকে যেমন আয়ু দেওয়ার লোভ দেখিয়েছে, তেমনি শোভনকেও বোধহয় আয়ু আর ক্ষমতা দেওয়ার লোভ দেখিয়েছে শারমা। আমার সেটাই দৃঢ় ধারণা। যাক, শেষপর্যন্ত দেখা যাক ব্যাপারটা কদ্দূর গড়ায়?

শিশির বলল, কিন্তু এই বিংশ শতাব্দীতে এসব ঘটনা যে সত্যিই ঘটতে পারে তা যেন বিশ্বাস হতে চায় না অশনিদা।

অশনিনাথ কিছু বললেন না। মৃদু হাসলেন শুধু।

চারদিকে অন্ধকার গাঢ় হয়ে আসছিল। হেড লাইটের আলোও সেই অন্ধকারে হলদেটে হয়ে

আসছিল। অশনিনাথ এবার গাড়ির স্পিড অনেকটা স্তিমিত করে আনলেন। বললেন, এবারে আমরা একটু পিছনে সরে যাই শিশির। দ্যাখো গাড়িগুলো ওই দূরে, বনের পাশ দিয়ে বেঁকে যাচ্ছে। দেখা যাক কতগুলো গাড়ি যায়। নিশ্চয়ই ওই রাস্তাটা বেঁকে গিয়ে শৈবালকুটিরের কাছে গিয়ে পড়েছে। আর মাত্র একটি গাড়িই বাকি ছিল। গাড়িটা বুলেটের মতো পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার পর রাস্তার পাশে হেডলাইট নিভিয়ে, গাড়ি থামিয়ে চুপচাপ বসলেন অশনিনাথ। শিশির বুঝতে পারল অশনিনাথ খানিকক্ষণ অপেক্ষা করতে চান। সেও চুপচাপ বসে রইল। জায়গাটা নিচু। স্যাঁতসেঁতে। জলা ধরনের। চারিদিকে কেবল লম্বা-লম্বা ঘাসওয়ালা মাঠ, আর-একটু দূরে ঝুপসি একটা জঙ্গল। আকাশের গাঢ় অন্ধকারে তারাগুলো একটু-একটু ঝিলমিল করছে। কিন্তু কুয়াশার পাতলা আবরণে ঝলমলে জ্যোতিটা স্পষ্ট নয়। এইভাবে কিছুক্ষণ স্থির থাকার পর অশনিনাথ গাড়িতে স্টার্ট দিলেন। গাড়িটা শব্দহীনভাবে চলতে শুরু করল। আস্তে বাঁক নিল। দূরে দেখা যাচ্ছে বিশাল প্রাসাদোপম একটি অট্টালিকা। অন্ধকার আকাশের সঙ্গে মিশে আছে। বাড়িটির সমস্ত আলোই নেভানো। নীচের তলায় মৃদু একটি-দুটি আলোর রেখা। বিদ্যুতের নয়। সম্ভবত লণ্ঠনের আলো। কিন্তু সেই আলোর আভা হলদেটে নয়। কেমন যেন নীলচে ধরনের। অশনিনাথ গাড়িটা অনেক দূরে থামালেন। তারপর ঝুপসি একটা গাছের ছায়ায় বাঁশ ঝাড়ের আড়ালে লুকিয়ে রাখলেন। গাড়ি থেকে নেমে হেঁটে চললেন তিনি। শিশির তাঁর পিছন-পিছন চলল। অশনিনাথ বললেন, শিশির, একটা কাজ করলে আমরা অনেকটা ঝুঁকি এড়াতে পারি। চল, আমরা মাঠের মধ্যে দিয়ে হাঁটি। এইভাবে হেঁটে আমরা শৈবাল কুটিরের পিছন দিয়ে ঢুকতে পারব।

শৈবালকুটিরের আবছা আকারটা চোখের সামনে রেখে কাঁপতে-কাঁপতে, শিশিরে ভেজা ঘাসের ওপর পা ফেলতে-ফেলতে দুজনে এগিয়ে চলল। শিশির স্পষ্ট বুঝতে পারল, শীতের কাঁপুনিটা কেবল বাইরে থেকেই নয়, ভেতর থেকেও তাকে কাঁপিয়ে দিচ্ছে। একটা ভয়ংকর অজানা ভয়। এত ভয় শিশির এর আগে আর কখনও পায়নি।

ক্রমশ শৈবাল কুটির যখন কাছে ঘনিয়ে এল অশনিনাথ বললেন, দ্যাখো পিছনের পাঁচিলটা অপেক্ষাকৃত নিচু। এখান দিয়ে ডিঙিয়েও যাওয়া যেতে পারে।

শিশির চাপা গলায় বলল, তা তো পারে, কিন্তু ভেতরে আবার ডালকুত্তা ছেড়ে রেখে দেয়নি তো?

অন্ধকারে হেসে উঠলেন অশনিনাথ।

না শিশির, তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো। শৈবালকুটিরে আর যাই হোক কোনও কুকুরের দেখা তুমি পাবে না। প্রাণী বলতে বেড়াল ছাড়া আর কিছু থাকা সম্ভব নয়।

শিশিরের শরীরটা কেমন যেন কেঁপে উঠল। পাঁচিল পেরিয়ে ওপাশে লাফিয়ে পড়লেন অশনিনাথ। ওপাশের পাথরের ওপর একটু শব্দ হল। শিশিরও লাফিয়ে পড়ল। অন্ধকারে সরু প্যাসেজ ধরনের জায়গাটিতে বড় কয়েকটি জানলা। জানলায় মোটা কাচ লাগানো। কাচের বাইরে মোটা লোহার জাল। জালের গায়ে বহু দিনের জমে-ওঠা ময়লা দিয়ে ভেতরের বিশেষ কিছুই দৃশ্যমান হয় না। তবু নড়াচড়া ছায়া শরীর দেখে মনে হচ্ছিল ভেতরে কিছু লোক গল্পগাছা, পানাহার করছে। অশনিনাথ মাথা ঝুঁকিয়ে খানিকক্ষণ লক্ষ করতে-করতে একটা ছিদ্র দেখতে পেলেন। তার মধ্যে দিয়ে দেখে বললেন, ওরা সব গাড়ির শোফারের দল। খাওয়া-দাওয়া আমোদ-প্রমোদে মেতে আছে। এসব ব্যবস্থা আগে থেকেই করে রাখা হয়েছে। এদিকে দাঁড়িয়ে থাকলে আমাদের কার্যসিদ্ধি হবে না শিশির। চলো, অন্যদিকে যাই। দুজনে মিলে ঘুরে-ঘুরে বাড়ির অন্য একটি পাশে গিয়ে পৌঁছল। এ পাশেও একটি সরু প্যাসেজ। প্যাসেজের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে একটি বোগেনভেলিয়ার লতা। লতার তলা দিয়ে মাথা নিচু করে যেতে গিয়ে দেখা গেল বেশ চমৎকার একটি গুহার মতো অন্ধকার আবেষ্টনী তৈরি হয়। সেই আবেষ্টনীর মধ্যে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াতেই সামনে পড়ল একটি জানলা।

এ জানলাটির পাল্লা খোলা। কিন্তু ভারী লোহার জালের আবরণে ঢাকা দেওয়া। জালের ওপাশে গাঢ় বেগুনি রঙের ভেলভেটের পরদা ফেলা রয়েছে। পরদার ওপাশে মানুষের কণ্ঠের একটা চাপা শোরগোলের আওয়াজ। অশনিনাথের অসীম দুঃসাহসই বলতে হবে, তিনি মাটি থেকে একটা শুকনো সরু ডাল কুড়িয়ে নিয়ে আস্তে-আস্তে ভেলভেটের পরদাটা কিছুটা ফাঁক করার চেষ্টা করতে লাগলেন। একচুল ফাঁক হতে দেখা গেল ঘরের ভিতর মৃদু উদ্ভাসিত আলো জ্বলছে। বাইরে গাঢ় অন্ধকার থাকায় ভেলভেটের পবদা কতটুকু সরল-না-সবল সেদিকে ভেতরের লোকের চোখে পড়ার কোনও কারণই নেই। সেই সরু ফাঁকের মধ্যে দিয়ে দেখা গেল এক বৃদ্ধা মহিলার মাথা। মাথার নকল চুলের কারিকুরি যেন চূড়ার মতো ওপর দিকে উঠে গেছে। তিনি যখনই পাশ ফিরেছিলেন তাঁর খাঁড়ার মতো উঁচু নাক আর সুচলো চিবুক দেখে মনে হচ্ছিল যেন এক ডাকিনীর মুখের পাশের অংশটা দেখা যাচ্ছে। সন্তর্পণে ঝোপের তলা দিযে বেরিয়ে আর-একটি জানলা পেলেন অশনিনাথ। সেই জানলার পাশে এক বিশাল নিমগাছ। জানলার পরদা আরও বেশি ফাঁক করা। ভেতরের বেশ খানিকটা অংশ দেখা যাচ্ছিল তার ভেতর দিয়ে। ঘরের মধ্যে বেশ কিছু স্ত্রী-পুরুষ দাঁড়িয়ে কিংবা বসে আছে। তাদেব বেশির ভাগই মূল্যবান পোশাক-পরিচ্ছদ পবা। এবং বেশির ভাগের চেহারাতেই বিকৃত ভোগের ছাপ। শরীর জরাগ্রস্ত এবং মুখের রেখায় অতৃপ্ত ভঙ্গি। হলের মাঝখানে পুরু কার্পেট বিছানো। কার্পেটেব ওপর সোনালি, রুপালি জরির কাজ। হলের শেষ প্রান্তে একটি উঁচু বেদি। বেদির ওপর অদ্ভুত লিপিতে কতকগুলি শ্লোক লেখা। শ্লোকগুলির অর্থ বোঝা যাচ্ছিল না। লিপিটাও অচেনা। অনেকটা জড়ানো-জড়ানো ব্রাহ্মী লিপিব কাছাকাছি। কার্পেটের মাঝখানে একটি উঁচু চৌকিতে একটি নগ্ন মৃতদেহ শোয়ানো আছে। তার ঠিক তলাতেই একটি বড় ডাবর জাতীয় বাসন। বাসনটির ভেতর খানিকটা তরল পদার্থ বয়েছে। অশনিনাথ চাপা গলায় বললেন, আর একটি খুন। পিশাচতন্ত্রের নামে আর একটি বলি!

শিশিবের সমস্ত শরীরেব মধ্যে দিয়ে ভয় চলাফেরা করছিল। সে দেখল, মৃতদেহটির কাছে শাবমা দাঁড়িয়ে আছে। তার পরনে রক্তবর্ণ আলখাল্লা। হাতে একটা দীর্ঘ জঙ্ঘা হাড়।

মন্ত্রোচ্চাবণ যত প্রবল হতে লাগল, ততই শারমার অনুচরেরা তার দুপাশের ধুনুচিতে ধকধকে অগ্নির মতো পদার্থে একরকম দুর্গন্ধময় গুঁড়ো ছুড়ে দিতে লাগল। ঘরটা ক্রমশ ভরে উঠতে লাগল ধোঁয়ায়। ধোঁয়ার নেশায় মানুষ ঢুলে পড়তে লাগল। ধোঁয়ায যে বিলক্ষণ মাদকতা আছে তা অশনিনাথ আর শিশিরের বুঝতে কষ্ট হল না। তাঁরা নাকে রুমাল চাপা দিয়ে সরে দাঁড়ালেন একটু। ছায়ান্ধকারের মধ্যে দিয়ে দেখা গেল কতকগুলি স্ত্রী পুরুষকে ধরে-ধরে নিয়ে আসা হচ্ছে। তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ দেখে মনে হয় কোনও বিশেষ উৎসর্গের জন্য তারা আলাদাভাবে প্রস্তুত হয়েছে। অশনিনাথ চাপা গলায় বললেন—ওই দ্যাখো, ওই যে ক্ষীণ চেহারার ন্যুব্জ মানুষটি—ওই-ই শোভন। ইসস্, কী চেহারা হয়েছে শোভনের। মনে হচ্ছে দেহে আব কোনও বল নেই। ধোঁয়ার আধিক্যে আবার সরে দাঁড়াতে হল তাঁদের। খানিকক্ষণ খোলা হাওযার নিশ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়ার পর, আবার জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখল সেই ডাবর থেকে হাতায় করে চরণামৃতের মতো পানীয় বিতরণ হচ্ছে। জানলার কাছে যারা বসেছিল তাদের মধ্যে কেমন যেন চঞ্চলতা।

শারমাও উত্তেজিত। তার সাঙ্গোপাঙ্গরাও। একটা পুরোনো দেওয়াল-ঘড়ির দিকে ঘন-ঘন তাকাচ্ছিল সবাই। যেন কারও অপেক্ষা করছে। কিংবা কোনও বিশেষ লগ্নের জন্য অপেক্ষা। শেষ পর্যন্ত শারমা কী যেন একটা আদেশ দিল। সঙ্গে-সঙ্গে সবাই উঠে পড়ল। ঘর থেকে দ্রুত বেরিয়ে চলল।

অশনিনাথ আর শিশির পায়ে-পায়ে এগিয়ে বাড়িটির সামনের দিকের অংশের প্যাসেজে পৌঁছল। এবার যে যার গাড়িতে উঠে পড়ল। এবং একটি-একটি করে গাড়িগুলি স্টার্ট নিতে থাকল।

অশনিনাথ একহাতে শিশিরের হাতটা মুঠিয়ে ধরেছিলেন। শেষ গাড়িটাও যখন ছেড়ে চলে গেল তিনি বললেন, দেখলে শিশির, এ যাত্রায় কিন্তু ওরা ড্রাইভারকে নিল না।

শিশির রুদ্ধ কণ্ঠে বলল, দেখলাম।

অশনিনাথ বললেন, চলো, আর দেরি নয়, আমরাও ওদের পিছু নিই।

গাড়ি স্টার্ট দিতেই শিশির বলল, অশনিদা একটা কথা, সেই মেয়েটিকে তো দেখলাম না। যার বাড়িতে আপনি সোমনাথকে পাঠালেন। সেই চন্দ্রা। তারও তো আজ আসার কথা ছিল, তাই না?

অশনিনাথ বললেন, ঠিক বলেছ, হ্যাঁ, চন্দ্রার তো আসার কথা ছিল। তার জন্যেই ওরা অত ছটফট করছিল। ওদের পৈশাচিক কার্যকলাপগুলো বোধহয় বিশেষ কোনও গ্রহের যোগে হয়। সেই সময়টাই বোধহয় উত্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছিল। তাই চন্দ্রাকে ছাড়াই ওরা রওনা হল। গাড়ির সমস্ত আলো নিভিয়ে দিয়ে বহু দূর থেকে একটি গাড়ির লাল টেল-লাইট লক্ষ করে এগিয়ে চলছিল অশনিনাথের গাড়ি।

অনাগত ভবিষ্যতের গর্ভে কী লুকিয়ে আছে তাই ভেবে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছিল শিশির।

চন্দ্রা সিটের প্রায় কিনারায় বসেছিল। উত্তেজনায়, ক্রোধে, হতাশায় তার চোখ মুখ যেন গজ-গজ করছে।

সোমনাথ মাঝে-মাঝে আড়চোখে তার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখছিল, কিন্তু চন্দ্রার সে-দিকে দৃষ্টি নেই। তার দৃষ্টি সামনে। রাস্তার দিকে। বারবার সে খালি প্রশ্ন করছিল, আর কতখানি পথ যেতে হবে?—আর কতদূর বাকি আছে?

সোমনাথের কিন্তু সত্যিই নিজেকে খুব অপরাধী মনে হচ্ছিল। অশনিনাথের ওপরও তাব রাগ হচ্ছিল। একটি মেয়ের জীবন-মৃত্যু নিয়ে এ-ভাবে ছিনিমিনি খেলাটা অশনিনাথের পক্ষে ঠিক হয়নি। আজ যদি সত্যিই চন্দ্রার জীবনে কোনও দুর্ভাগ্য নেমে আসে তাহলে সোমনাথ নিজেকেও যে দায়ী না করে পারবে না। কারণ চন্দ্রার সঙ্গে মিথ্যে স্তোকবাক্যের খেলায়, সেও তো ছিল অংশীদার।

চন্দ্রা হঠাৎ রাস্তার পাশের একটি পাথর ম্যাপ আঁকা বোর্ডের দিকে তাকিয়ে বলল, একটু রাখুন তো!—আমরা ঠিক আসছি কি না দেখি?

সোমনাথ গাড়ি থামাল। দুজনেই নেমে গেল। চন্দ্রা নকশার ওপর আঙুল রাখতেই মনে হল দুটি রাস্তার মধ্যবর্তী একটি অংশের দিকে কে যেন তার আঙুলটা টেনে নিয়ে যাচ্ছে। চন্দ্রা যেন কেমন স্বপ্নাশ্রিতের মতো গাড়িতে উঠল। তারপর বলল, রাস্তাটা আমি এবার চিনতে পেরেছি। চলুন, সোজা চলুন। যত তাড়াতাড়ি পারেন চলুন—।

সোমনাথ গাড়ির স্পিড বাড়াল। গাড়িটা উড়ে চলতে লাগল। চন্দ্রা উদগ্র চোখে গাড়ির সিটের কিনারায় খাড়া বসে।

সোমনাথ সোজা যাচ্ছিল, হঠাৎ চন্দ্রা বলল, এবার বাঁ-হাতি রাস্তা ধরুন—হ্যাঁ।

সোমনাথ বলল, সে কী? আপনি শৈবাল কুটিরে যাবেন না?

চন্দ্রা সে-কথার কোনও উত্তর না দিয়ে স্বপ্নাশ্রিতের মতো বলল, আপনাকে যা বলছি,—বাঁহাতি রাস্তাটা ধরুন না।

সোমনাথ সংকীর্ণ লাল ধুলো ওড়া বাঁহাতি রাস্তাটা নিল। খানিকটা যাওয়ার পর তার মনের মধ্যে অদ্ভুত একটা নিষেধ-এর বোধ কাজ করতে লাগল। সোমনাথের মনে হল সে একটা ভুল পথে, একটা বিপদের দিকে ক্রমশ চলে যাচ্ছে। এভাবে যাওয়া উচিত নয় তার। খানিকক্ষণ বাদে আস্তে করে সে আর-একটি রাস্তা ধরে আবার বড় রাস্তার ওপর উঠে এল।

চন্দ্রা ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলল, আপনি কিছুতেই আমার কথা শুনবেন না? সেই বড় রাস্তায় নিয়ে তুললেন আবার? আমার জীবনের প্রতি এতটুকুও মায়া নেই আপনার? সত্যি, আজ বুঝতে পারছি, একমাত্র শারমা ছাড়া আমার আর কোনও বন্ধু নেই। তিনিই আমার একমাত্র শুভার্থী।

খানিকদূর যাওয়ার পর রাস্তা আবার দু-ভাগ হয়ে বেঁকে গেল। একটি বাঁকের কাছে এসে চন্দ্রা বলল, এবার গাড়ি থামান। রাস্তার ছবি আঁকা বোর্ডটা আমাকে দেখতে দিন। সোমনাথ গাড়ি থামাল। চন্দ্রা বলল, দেখুন না নেমে, ঠিক রাস্তায় যাচ্ছি কি না?

সোমনাথ বলল, ঠিক রাস্তাতেই তো যাচ্ছি—।

না, যাচ্ছি না—।

সোমনাথ অগত্যা গাড়ি থেকে নামল। সে বোর্ডের গায়ে আঁকা রাস্তার দিক নির্ণয় করতে গিয়ে ঝুঁকে দেখতে পিছন ফিরতেই শুনতে পেল গাড়ি স্টার্ট নিচ্ছে। বড়-বড় লাফ দিয়ে ছুটে আসতে-না-আসতেই গাড়িটা ঘুরে গিয়ে তীব্রবেগে ছুটে চলল ফিরতি পথে।

সোমনাথ হতভম্বের মতো খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর হঠাৎ তার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। সে পাশের বাঁকা রাস্তা ক্রস করে সোজা অন্ধকার ঘাসজমিতে নেমে গেল। তার কেমন যেন মনে হল সোজা হেঁটে গেলে চন্দ্রা যে রাস্তা দিয়ে আবার এতটা এগিয়ে কোনও একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে যাবে, সে রাস্তাটায় গিয়ে পড়বে। সোমনাথ তাই অন্ধকার মাঠ ভেঙে আড়াআড়ি পথে দ্রুত হাঁটতে লাগল। এবং সত্যিই সে দেখল লালধুলোর একটা কাঁচা রাস্তার ওপর এসে সে দাঁড়িয়েছে। এইভাবে যে সময়টা গেল, তাতে অতদূর ব্যাক্ করে আবার ফিরে আসতে চন্দ্রার কিছুটা সময় লাগবার কথা। সোমনাথ সেই শীতে অন্ধকারে অসহায় দাঁড়িয়ে রইল। হঠাৎ সে দেখল লালধুলোর রাস্তা দিয়ে নয়, আরও দূরে মাঠের মধ্যে দিয়ে ক্রমশ ঢালুর দিকে তার স্পোর্টস কারটা অদ্ভুত গতিতে, ওঠানামা করতে-করতে, ঝাঁকানি খেতে-খেতে চলেছে। এবং সেইভাবে লাফাতে-লাফাতে হঠাৎ কোনও গাছ, ঢিবি বা বাড়িটাড়িতে ধাক্কা খেয়ে তার চোখের সামনে গাড়িটা উলটে গিয়ে দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠল।

সোমনাথ আর অপেক্ষা না করে পাগলের মতো পড়িমড়ি করে ছুটে চলল। স্পোর্টস কারটার জন্যে তার জ্বলন নয়। তার সমস্ত অন্তরাত্মা তখন ধ্বক-ধ্বক করে জ্বলছে চন্দ্রার অবস্থার কথা ভেবে।

অ্যাকসিডেন্টের জায়গায় পৌঁছতে-পৌঁছতে সোমনাথের মিনিট পনেরো লেগে গেল। গাড়িটার কাছে এসে সে পোড়া তেল, রেক্সিন আর তারের গন্ধ পাচ্ছিল। কিন্তু মানুষের পোড়া মাংসের গন্ধ নয়। গাড়ির আগুনের আলোয় জায়গাটা অন্ধকারের মধ্যে ভয়ংকর ধরনের আলোকিত হয়ে উঠেছিল। সেই আলোয় সে পাগলের মতো খুঁজতে লাগল চন্দ্রাকে। অনেকক্ষণ দেখার পরে সে লক্ষ করল কয়েক হাত দূরে একটি রঙিন স্কার্ফ পড়ে আছে। পাগলের মতো ছুটল স্কার্ফ লক্ষ করে। চন্দ্রারই স্কার্ফ। যে জায়গায় স্কার্ফটা পড়েছে, জায়গাটা কেমন যেন উঁচু হয়ে উঠে গেছে। যেন একটা খাড়াই দেওয়ালের মতো। সেখান থেকে পোশাকের একটা টুকরো যেন ঝুলতে দেখল সোমনাথ। কী কাণ্ড, এতদূর ছিটকে গেছে চন্দ্রা?—সোমনাথ সেই খাড়াই-এর ওপর দ্রুতপায়ে উঠে গেল। উঠে গিয়ে সে দেখল চন্দ্রার দেহটা একটা ঝোপের পাশে নীচে পড়ে আছে।

তাড়াতাড়ি ঢালুর দিকে নেমে যেতে গিয়ে, সোমনাথ সবিস্ময়ে লক্ষ করল জায়গাটা যেন একটা শুকিয়ে যাওয়া দিঘির মতো। কানা উঁচু একটা মস্ত বড় বাটি বসানো আছে যেন মাটিতে। নীচে নেমে গেছে তার তলা। সেই অনেক নীচে মধ্যদেশে আলেয়ার মতো ছোটাছুটি করছে নীলচে আগুন আর মানুষের চলমান ছায়া।

সোমনাথ আস্তে-আস্তে গড়িয়ে গিয়ে চন্দ্রার দেহটার পাশে গিয়ে পড়ল। চন্দ্রা তখনও অজ্ঞান। কপালে সামান্য রক্তের দাগ। গভীর হয়ে কাটেনি, কপালটা থেঁতলে গেছে শুধু। কিন্তু নিঃশ্বাস পড়ছে

খুব মৃদু। থেমে-থেমে। যেন জ্ঞানহীনতার অতল গর্ভের দিকে নেমে গেছে চন্দ্রা হঠাৎ।

চন্দ্রাকে পাশে রেখে সোমনাথ নীচের দিকে তাকাল। নীচে তখন আলোয় আলো হয়ে গেছে একেবারে মাঝখানের অংশটি। বড়-বড় মশালের মতো দণ্ডের মুখে জ্বলছে নীলচে শিখা ওঠা আলো। পিচ জাতীয় কোনও জিনিস পোড়ার গন্ধ উঠে আসছে সেখান থেকে। সে আলো আগুনের আলো নয়। অন্য কোনও ধরনের আলো। আলোর সেই মালার মাঝখানে ছোট উঠান মতো গোল জায়গাটিতে জড়ো হয়েছে অনেকগুলি স্ত্রী-পুরুষ। নীলচে আলোয় তাদের পরনের আলখাল্লা ধরনের পোশাকগুলো ঝলমল করছে। সেই অদ্ভুত ভিড়ের মাঝখানে একটি সিংহাসনের মতো বিরাট বেদি আনা হয়েছে। বেদির সামনে জ্বালানো হয়েছে মস্ত একটি কুণ্ড। কিন্তু সেই কুণ্ডে আগুন নেই। আছে অদ্ভুত সব কালোকালো চাঙড়। যা থেকে নীল, বেগুনি, সবুজাভ সব লকলকে শিখা উঠছে। ক্রমশ সেই বেদি ঘিরে, কুণ্ড ঘিরে শুরু হয়ে গেল নৃত্য। নৃত্যের সঙ্গে পান-ভোজন। প্রচুর খাদ্য-পানীয় রাখা ছিল পাশে। একজন বিশাল একটা জালা থেকে পাত্র ভরে-ভরে দিচ্ছিল। আর একজন বিশাল একটা বারকোশ থেকে চাঙড়-চাঙড় মাংস তুলে দিচ্ছিল। দু-হাতে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছিল উন্মাদ, নৃত্যপর মানুষগুলো। নাচতে-নাচতে অজান্তে তাদের শরীর থেকে আলখাল্লার আবরণ পড়ছিল খসে খসে। উলঙ্গ অর্ধো-লঙ্গদের সেই আচরণের মাঝখানে, সেই মধ্য বেদিতে হঠাৎ ধোঁয়ার আবরণ জমাট বাঁধতে আরম্ভ করল। একটা বিশাল অতিকায় মূর্তির আকার নিতে লাগল ক্রমশ।

এই অন্ধকার ঠান্ডা রাতে, অজানা একটি জলাভূমিতে অনৈসর্গিক ওই দৃশ্য দেখতে-দেখতে যেন মাথা ঘুরে উঠতে লাগল সোমনাথের। সে ঝিম ঝিম মাথায় আস্তে হাত বাড়িয়ে চন্দ্রাকে ধরে রইল তবুও।

প্রায় মাইল খানেক যাওয়ার পর দূরের গাড়িগুলির টেল লাইটের লাল আলোগুলো লাল লাল জোনাকির মতো রাস্তা ছেড়ে একটা অন্ধকার মাঠের মধ্যে ঢুকে পড়ল। হেড লাইটের আলো জ্বেলে-জ্বেলে নিশানা করে-করে গাড়িগুলি একে-একে থামল। সবাই গাড়ি থেকে নেমে পড়ল। বড় বড় বল্লমের মতো জিনিস, আরও নানারকম আসবাবপত্রও ধরে-ধরে নামাল ছায়া ছায়া স্ত্রী পুরুষেরা। তারপর চলল সামনের অন্ধকারের দিকে।

দূরে গাড়ি থামিয়ে আলো নিভিয়ে চুপচাপ বসে রইলেন অশনিনাথ। সবাই হঠাৎ যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট অপেক্ষা করার পর যখন মানুষজনের সাড়া শব্দ আর পাওয়া গেল না, আস্তে-আস্তে দুজনে নামল। হাঁটতে-হাঁটতে সাবধানে গাড়ি জাঙালের মধ্যে দিয়ে দুজনে এগোল উঁচু খাড়াই-এর দিকে। খাড়াই-এর মুখের কাছে এসে নীচের দিকে তাকিয়ে চাপা গলায় অশনিনাথ বললেন, এসো, এসো শিশির, ওই দ্যাখো, লোকগুলো কেন ম্যাজিকের মতো মিলিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ কেমন ঢালু হয়ে নেমে গেছে। এখন মনে পড়েছে এ জায়গাটা একটা পোড়ো শ্মশান। এই তলায় মড়া পোড়ানো হত। ওখান দিয়ে সরু একটা নালামতোও বয়ে গেছে। মড়া পোড়ার দুর্গন্ধ আর ওপরে উঠত না বা ঘুরত না। দুজনে পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে নীচের দিকে খানিকটা নেমে দেখতে লাগল নীচের ঘটনাগুলো। ওই তো সেই পলিত-গলিত লোকগুলো। স্ত্রীলোকগুলোও ওদের সঙ্গে রয়েছে। উন্মাদের মতো অঙ্গভঙ্গি করছে সবাই। মানুষ যদি তার সভ্য সুন্দর আবরণী থেকে বেরিয়ে এসে এমনি প্রাগৈতিহাসিক রূপ নেয়, তাহলে যেন মনে হয়, নরকই বুঝি আবার দৃশ্যমান হয়ে উঠল। মাঝখানের বেদির ওপর ক্রমশ একটা বিশাল ধূম্রময় আকার জমাট বেঁধে উঠতে লাগল ওদের চোখের সামনে। শারমাকে দেখা গেল। পাগলের মতো কুণ্ডের চারপাশে ঘুরছে। তার যেন কোনও জ্ঞানই নেই। ক্রমশ সেই বিশাল মূর্তিটি সুস্পষ্ট একটা আকার নিতে-নিতে পরিণত হল মহাকায় একটি ছাগমূর্তিতে। তার এক-একটি ক্ষুর যেন এক-একটি বিশাল থামের

মতো। সেইগুলো ক্রমশ ধাতব, শাণিত আলোময় হয়ে উঠতে লাগল। ছাগমূর্তির দাঁতগুলো হলুদ। বিশাল। চোখে লালচে ঘন আলো। সেই অর্ধনিমীলিত দৃষ্টিতে যেন পৈশাচিক একটা অভিব্যক্তি ফুটে আছে। সেই ছাগমূর্তির সামনে গিয়ে সবাই মাথা নুইয়ে শরীর দোলাচ্ছিল।

অশনিনাথ আর শিশির অজান্তেই পরস্পরের হাত মুঠিয়ে ধরে ফেলেছিলেন। দেখা গেল ক্রমে সেই উন্মত্ত নৃত্য শেষ হয়ে এল। অন্ধকারাচ্ছন্ন একটি স্থানে কিছু লোক জটলা করছিল। তাদের মধ্যে থেকে ধরে-ধবে নিয়ে আসা হল কয়েকজন মূর্তিকে। মূর্তি বলাই ভালো, কারণ অত্যধিক মাদক পানের জন্যই হোক, কিংবা অন্য কোনও কারণে, দুর্বলতাবশতই হোক তাদের কারও মধ্যেই কোনওরকম চৈতন্য আছে বলে মনে হচ্ছিল না। শরীরের ওপব কোনওরকম দখল ছিল না বলেই, যেন যেমন তেমন করে গা ছেড়ে দিয়েছিল তারা। শারমা একটি বিশাল আকারের পুরোনো বালিঘড়ি এনে সামনে রাখতেই সেই বিশাল ছাগমূর্তি তার ধাতব ক্ষুর নেড়ে-নেড়ে পাশবিক ভঙ্গি করে হেসে উঠল। তারপর একটি-একটি করে মানুষকে তার সামনে এনে ফেলা হল। এবং সে প্রত্যেকের মাথায ও সারা গায়ে তার সেই ক্ষুর বুলিয়ে দিতে লাগল। যখন এক-একজনকে সেই প্রক্রিয়ার পর তোলা হতে লাগল, তখন দেখা গেল তাদের মধ্যে আর সেই পতিত দলিত অবস্থা নেই। সবলে হেঁটে তারা যোগ দিল সেই নৃত্য-পানভোজনকারীদের দলে।

চাপা গলায় অশনিনাথ শিশিরকে বললেন, শিশির দ্যাখো, একেই বলে দীক্ষাদান। ওই মানুষগুলো এখন যে শক্তিতে বলীয়ান, সে-শক্তি হল পৈশাচিক শক্তি। ওই পৈশাচিক শক্তিলাভের জন্য, ওরা ওদের আত্মাকে চিরকালের মতো শয়তানের হাতে তুলে দিল। এখন ওরাও হয়ে উঠবে এক-একটি খুদে শয়তান। ওদের দিয়েই হবে পৃথিবীর ক্ষতি—।

হঠাৎ চাপা গলায় শিশিব বলল, অশনিদা, ওই দেখুন, সাবির শেষে ওরা কাকে আনছে?

অশনিনাথ তাকিয়ে দেখে বললেন, শোভন। শোভনকে আনছে শিশিব। কী ভয়ানক। শোভনকে একবার যদি ওরা দীক্ষিত করে ফেলে, তাহলে আর তো শোভনকে আমবা ফিবে পাব না শিশির।

শিশির হতাশ কণ্ঠে বলল, কিন্তু আমরা আর কী করতে পারি অশনিদা?

একটা কিছু, একটা কিছু করতেই হবে শিশির।

তাঁর হাত দুটি মুঠো হতে লাগল, খুলতে থাকল উত্তেজনায়। তিনি হঠাৎ বললেন, এসো, উঠে এসো শিশির। আমরা গাড়িতে উঠি। একটা কাজ করলে হবে। গাড়িটা সোজা চালিয়ে দেওয়া যাবে ওদের মাঝখান দিয়ে। তারপর আমরা দুজনে তুলে নেব শোভনকে। যা হয় হবে তাবপর।

শিশির উঠে পড়ল। বলল, চলুন, চলুন তাহলে।

দুজনে গিয়ে গাড়িতে উঠল। গাড়ি চালিয়ে ঢালু দিয়ে নামতে হবে। গাড়িব সামনের দুটি উজ্জ্বল, দুটি ছোট, মোট চারটি ফ্লাড আলো জ্বেলে, সোজা গাড়ি চালিয়ে দিলেন অশনিনাথ। অন্ধকার মাঠের মাঝখান দিয়ে, হঠাৎ তীব্র আলোর ঝরনা ঝরিয়ে ঝড়ের মতো ছুটে চলল অশনিনাথের 'হিস্পানো'। অন্ধকারের মধ্যে মৃদু আভা জ্বেলে যে নীলচে ধরনের অন্য আলো জ্বলছিল, তা যে এই তীব্র বিদ্যুতের পাশে কত নিষ্প্রভ, তা একপলকেই যেন প্রমাণিত হয়ে গেল। গাড়ি একপলকে নেমে গিয়ে সেই ভিড়ের শৃঙ্খলাকে যেন ছত্রখান করে দিল। নানারকম অনুষ্ঠানের সরঞ্জাম, মশাল, মড়মড় করে ভাঙতে-ভাঙতে গাড়ি এগোতে লাগল। সেই তীব্র আলোর বন্যায় শিশির স্পষ্ট দেখল নারী-পুরুষেরা—যেন সংকুচিত হয়ে অন্ধকারের দিকে ছুটে পালাচ্ছে। আর সেই বিশাল বেদির ওপর সেই ছাগমূর্তিও যেন কেমন আকুঞ্চিত হতে লাগল। তারপর আস্তে-আস্তে ভেঙে-ভেঙে, হাওয়ায় শূন্যে মিলিয়ে-মিলিয়ে যেতে লাগল।

অশনিনাথ দ্রুত ড্রাইভ করে গাড়িটা এনে ফেললেন অচেতন শোভনের পাশে। শোভনকে একটা বেদির ওপর ফেলে রেখে তার সঙ্গীরা ততক্ষণে এদিকে-ওদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে।

মাত্র কয়েক সেকেন্ডের জন্য থামল গাড়িটা, স্টার্ট দেওয়া অবস্থায় কাঁপতে লাগল গাড়ির ইঞ্জিন। থরথর শব্দ উঠতে লাগল গাড়ি থেকে। তার মধ্যেই শিশির নেমে পড়ে তাড়াতাড়ি তুলে নিল শোভনের দেহটা। গাড়ির পিছনের সিটে কোনওমতে ঢুকিয়ে দিয়ে নিজেও বসল পিছনের সিটে। অশনিনাথ এবার ফুল স্পিডে উড়িয়ে নিয়ে গেলেন গাড়ি। অগভীর জলার জলকাদা দুপাশে ছিটিয়ে এগিয়ে গিয়ে উঠলেন মাঠের আর-এক অজানা কিনারায়। সেখানে দেখলেন দুটি দেহ উপুড় হয়ে পড়ে আছে। একটি স্ত্রী-দেহ এবং একটি পুরুষের। শিশির বলল, ওদের তুলে নিলে হয় না অশনিদা?

অশনিনাথ বললেন, আমাদের এখন সময় নেই। তা ছাড়া ওরা যে শয়তানের অনুচর নয়, তাই বা কী করে জানলে? হয়তো আমাদের সঙ্গে পাঠাবার জন্য শারমা ওদের সাজিয়ে রেখেছে।

শিশির আর কিছু বলল না। হুশ করে গাড়ি বেরিয়ে সোজা গিয়ে পড়ল রাস্তায়।

অশনিনাথ আর শিশির জানতেও পারল না যে মাঠের ধারে পড়ে আছে সোমনাথ আর চন্দ্রা।

অশনিনাথ গাড়ি চালাচ্ছিলেন।

পিছনের সিটে গাড়িতে রাখা পুরু কম্বল দিয়ে নিরাবরণ শোভনকে মুড়ে নিয়ে চলেছে শিশির। গ্রামের-পর-গ্রাম, ধানখেত জঙ্গল ভেদ করে চলেছে গাড়ি। আস্তে-আস্তে ভোরের ছোঁয়া এসে লাগছে অন্ধকার কুয়াশা-মাখা আকাশের গায়ে। গাড়ি আস্তে একটি লোকালয়ে প্রবেশ করছে।

থানার কাছে এসে অশনিনাথ গাড়ি থামালেন। শিশিরকে গাড়িতে রেখে তিনি নেমে গেলেন থানায়। জায়গাটার নাম পাথর-পাড়া। গাড়ি এসে পৌঁছেছে বিহার বর্ডার পেরিয়ে সামান্য ভেতরে। পাথর-পাড়ার কাছাকাছিই যদ্দূর মনে পড়ছে তাঁর, ঘনশ্যামগড়। ঘনশ্যামগড়ে থাকে তাঁর বন্ধু দেবকান্ত রাও। দেবকান্ত ঘনশ্যামগড়ের রাজ-পরিবারের উত্তসূরী। পাথর-পাড়ার পুলিশ স্টেশনের ইন্সপেক্টর অফিস-ঘরেই ছিলেন। কী যেন একটা ডাকাতির তদন্ত সেরে তিনিও ফিরেছেন ভোর রাত্তিরে। অশনিনাথকে তিনি ঘনশ্যামগড়ের নিশানা দিয়ে দিলেন। অশনিনাথকে বললেন, তিনি যদি কোনও জরুরি খবর দিতে চান, তাহলে তাও দিতে পারেন টেলিফোন মাবফত। ঘনশ্যামগড়ের দুর্গবাড়িতে দেবকান্ত রাও-এর টেলিফোনও আছে। অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে অশনিনাথ ঘনশ্যামগড়ে ফোন করলেন। দেবকান্ত রাওই ধরলেন ফোন।

অশনিনাথ সংক্ষেপে তাঁকে জানিয়ে দিলেন যে, তাঁরা তিনজন ঘনশ্যামগড়ে দেবকান্ত রাও-এর আতিথ্য নিতে যাচ্ছেন। দেবকান্ত যেন তৈরি থাকেন।

দেবকান্ত রাও তো দারুণ খুশি। তিনি অশনিনাথের একজন বন্ধু এবং ভক্ত। তাঁর স্ত্রী উমা অশনিনাথের লতায় পাতায় ভগ্নি। কতদিন তিনি অশনিনাথকে ঘনশ্যামগড়ে কাটিয়ে যাওয়ার জন্যে অনুরোধ করেছেন। এই প্রথম বিনা নিমন্ত্রণেই তাঁকে পাওয়া গেল। সানন্দে অগ্রিম সাদর আহ্বান জানিয়ে রাখলেন দেবকান্ত রাও। ফোন ছেড়ে দেওয়ার আগে শেষ কথাটি অশনিনাথ যা বললেন, তাতে একটু চমকে গেলেন স্বয়ং ইন্সপেক্টরও।

শোন দেবকান্ত, আমাদের জন্যে কিন্তু কোনওরকম আমিষের ব্যবস্থা করবি না। আর হ্যাঁ, তোরা স্বামী-স্ত্রী আর তোদের বাচ্চাকেও কোনওরকম আমিষ দিবি না। এরপর কলকাতায় ট্রাঙ্ককল করে সোমনাথের জন্য, শ্রীমন্তের কাছে নির্দেশ রেখে ইন্সপেক্টরকে আব একপ্রস্থ ধন্যবাদ জানিয়ে অশনিনাথ সোজা গিয়ে গাড়িতে উঠলেন।

শিশির এবার বলল, আমরা এখন কোথায় যাচ্ছি অশনিদা।

ঘনশ্যামগড়। ওখানে আমার এক বন্ধু আছে, দেবকান্ত রাও। ওর গড়ে যাচ্ছি। চমৎকার গড়টা। একসময় সত্যিকার দুর্গ ছিল। অনেক বড়-বড় যুদ্ধ হয়েছে ওই গড় থেকে। এক বিশাল বাগান সমেত গড়টাকে দেখতে আছে আগের মতোই। দেবকান্ত নষ্ট হতে দেয়নি বনেদি আর্কিটেকচারকে। কিন্তু ভেতরটা মোটামুটি মডার্ন করে নিয়েছে। আমি একবার রাঁচি যাওয়ার পথে

কিছুক্ষণের জন্যে উঠেছিলাম ওর গড়ে। অপূর্ব বাগ-বাগিচা, অপূর্ব গড়। আর দেবকান্ত আর উমা দুজনে মানুষও খুব ভালো। বিদেশ থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ডিগ্রি নিয়ে এসেছে দেবকান্ত। উমাও ফার্মিং-এর কী সব ট্রেনিং নিয়ে ফার্ম করেছে। ওদের ওখানে গেলে টাটকা ডিম, মুরগি, পর্ক, ভেড়ার মাংস খুব ভালো খেতে পারতে। কিন্তু আজ সব বারণ।

শিশির সকৌতূহলে বলল, সে কী?

অশনিনাথ সামনের পাহাড়ে ওঠার আঁকাবাঁকা ফিতের মতো রাস্তাটির দিকে চোখ রেখে গাড়ি ড্রাইভ করতে-করতে বললেন, হ্যাঁ আমাদের আজকের সারাটা দিন আর সারাটা রাত শুদ্ধাচারে থাকতেই হবে। তার কারণ অমাবস্যার জের আজও শেষ হয়নি। আজ শারমা একবার শেষ চেষ্টা করবে।

অর্থাৎ?

অর্থাৎ, তোমার মনে আছে পরশু যে পিশাচ মূর্তি পেয়েছিল সে আমাদের কাউকে হত্যা করতে পারেনি বলে ক্রুদ্ধ। তাকে ভেঙে ফেলায় শারমার পাশবিক শক্তি অনেকটা খর্ব হয়েছিল। পরশু সেই খুন হওয়া নিষ্পাপ ডোমটির মৃতদেহের ওপর বসেও কোনওরকম শবসাধনা করার সুযোগ পায়নি শারমা। তা সত্ত্বেও কাল রাতে অমাবস্যার ভয়ংকর সময়ে আসল শয়তানকে নামাতে হয়েছে তাকে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস শয়তান যাওয়ার আগে একাধিক মানুষকে খুন করে গেছে—কারণ শয়তান নামিয়ে দীক্ষাদানের কাজও তো কাল পুরো করতে পারেনি শারমা। কথায় বলে—বার-বার তিনবার। দুবার চেষ্টা করে বিফল হয়েছে শারমা। আজ রাত্রে সে শেষ চেষ্টা করবে। পিশাচলোকের সবচেয়ে ভয়ংকর মৃত্যুদূতকে সে পাঠাবে আমাদের কাছে। আজও তার প্রথম ও প্রধান লক্ষ হল শোভন।

গাড়ি পাহাড়ের চূড়া থেকে নীচে নামার ঢালুপথে খানিকটা দূর এসে পৌঁছলে, ভোরের প্রথম গোলাপি আলোয় সামনের পাহাড়ের চূড়ায় দেখা গেল এক পাথরের দুর্গের গোল-গোল গম্বুজ।

শিশির মুগ্ধদৃষ্টিতে সেই ক্রমশ কাছে আসতে থাকা এবং ক্রমশ বড় হয়ে উঠতে থাকা দুর্গটিকে দেখতে লাগল। দুর্গের গেটের কাছে গাড়ি এসে পৌঁছতেই ভারী লোহার দরজা সরিয়ে ঢুকল গাড়িটা। দীর্ঘ সাজানো কেয়ারি-করা লতার বেড়া দেওয়া রাস্তা পেরিয়ে গাড়ি এসে প্রশস্ত গাড়িবারান্দার তলায় দাঁড়াল। শিশির আর অশনিনাথ লোকজনদের সহায়তায় শোভনের জ্ঞানহীন কম্বলে জড়ানো দেহটি তুলে ভেতরে নিয়ে গেলেন। গাড়ির আওয়াজ পেয়েই বোধহয় গৃহকর্তা সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছিলেন। নীচের তলার প্রশস্ত ড্রইং রুমের পাশের ছোট ঘরে শোভনের দেহটি একটি ডিভানে শুইয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন অশনিনাথ। শিশিরের প্রথম দর্শনেই গৃহকর্তা দেবকান্ত রাওকে খুব ভালো লেগে গেল। তাঁর চেহারা প্রায় অশনিনাথের বিপরীত। গোলগাল মিষ্টি ধরনের চেহারা। খুব লম্বা নন। মুখে একটা সুন্দর মাধুর্য আঁকা। হাসিখুশি ভাব। তাঁর পরনে সাধারণ চোস্ত পায়জামা আর পাঞ্জাবি। তার ওপর গাঢ় লাল রঙের জরির কাজ-করা জামিয়ার শাল। তাঁর পিছনে-পিছনে সিঁড়ি দিয়ে নামছিলেন উমা। উমার পরনে খুব ঢিলেঢালা ম্যাক্সি। মুখে কোনও প্রসাধন নেই। মাথার চুলগুলি এলো করে পিঠে ছড়ানো।

উমাই প্রথম কথা বললেন, এ কী অশনিদা, শোভনের কী হয়েছে? ওকে নীচের ঘরে শোয়াচ্ছেন কেন? ওপরে আমাদের ঘরে নিয়ে আসুন—ডাক্তারকে খবর দিয়ে দাও তাড়াতাড়ি—।

অশনিনাথ হাত তুলে বললেন, না উমা, ডাক্তারের দরকার হবে না। আর শোভনকে এখন আমরা ওপরে তুলব না। তোদের দুজনের সঙ্গে আমি কিছু জরুরি কথা বলে নিতে চাই।

দেবকান্ত বললেন,—আহা বলবে-বলবে, অশনিদা, আগে চা-টা খাও, একটু বিশ্রাম করো।

না, তোমাদের সঙ্গে কথা না শেষ করে আমি এ বাড়িতে জলগ্রহণ পর্যন্ত করব না।

এবার উমা এবং দেবকান্ত দুজনেই একটু অবাক হলেন। চারপাশে লোকজন দাঁড়িয়ে। অশনিনাথ বললেন,—চলো, ও ঘরে শোভন আছে। ওখানে বসেই নিরিবিলিতে আমরা কথাবার্তা সেরে নিই।

শিশির, দেবকান্ত ও উমাকে নিয়ে পাশের ছোট ঘরটিতে গিয়ে অশনিনাথ দরজা বন্ধ করে দিলেন। তারপর চারটি পুফে টেনে নিয়ে মুখোমুখি বসলেন চারজন।

দেবকান্ত বললেন, কী ব্যাপার অশনিদা, খুলে বলুন!

অশনিনাথ সংক্ষেপে সমস্ত ঘটনাটি উমা ও দেবকান্তকে বললেন।

উমা শুনে বললেন, অশনিদা, এই কাহিনি যদি আপনি না বলে আর কেউ বলতেন তাহলে আমি তা কখনও বিশ্বাসই করতাম না। কিন্তু এর সঙ্গে আমাদের এখানে জলগ্রহণ করার সম্বন্ধ কী?

শুধু জলগ্রহণ নয়, তোমাদের এখানে থাকাও আমাদের পক্ষে উচিত নয়। কারণ গত দুরাত শয়তানেব সঙ্গে সংগ্রাম করে-করবে, আমাদের দুজনের এবং সোমনাথের ভেতরে সব পবিত্রতা প্রায় দেউলে হয়ে এসেছে। এখন আমাদের চাই সতেজ পবিত্র আত্মার সাহায্য। সত্যি কথা বলতে কি তোমাদের দুজনের আত্মিক সাহায্য আমার দরকার। আজই আমাদের সংগ্রামের শেষ দিন। আজ সবচেয়ে ভয়ানক দিন। আজকের দিনটিতে যদি আমরা শোভনকে শারমার হাত থেকে রক্ষা করতে পারি তাহলে আর শারমার পক্ষে শোভনকে কবজা করার সুবিধা হবে না।

দেববকান্ত রাও বললেন,—তোমার কি সন্দেহ আছে অশনিদা যে আমি কিংবা উমা তোমাকে এই অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দেব?

না, তোমাদের আমি জানিয়ে রাখতে চাই যে আমরা যদি আজ রাত্রিটা এই বাড়িতে কাটাই, এবং তোমরা আমাদের সাহায্য করো, তাহলে কিন্তু তোমাদেরও শাবমার কুনজরে পড়তে হতে পারে। এবং সে তোমাদেব নানারকম ক্ষতিগ্রস্ত করতে পাবে। উমা হেসে বললেন, ক্ষতি? নাঃ, কোনও ক্ষতি আমাদের হবে না। ক্ষতি করার সাধ্য কি শাবমার। আমাদের এই দুর্গের চৌহদ্দিতে সে ঢুকতে পারবে ভেবেছেন আপনি? পাহাড়ের প্রান্তে-প্রান্তে আমাদের চৌকি বসানো, চারিদিকে পাহারাদার।

অশনিনাথ হাসলেন ঃ কিন্তু শারমা যদি এমন কোনও দূত পাঠায় যে দূতকে কোনও প্রহরীই আটকাতে পারে না? দেবকান্ত রাও বললেন, আমি ওসব হোকাস-পোকাসকে বিশ্বাসই করি না।

অশনিনাথ বললেন, কিন্তু আমি করি দেবকান্ত, আর সেই সঙ্গে একটা দৃঢ় বিশ্বাস আমার আছে যে, যে-কোনও অনৈসর্গিক বিপদের উদয়ই হোক না কেন, আমি ঠিক সে বিপদ কাটিয়ে উঠতে পারব।

দেবকান্ত রাও বললেন, পারো-না-পারো অশনিদা তোমাদের আমরা ছাড়ছি না।

অশনিনাথ বললেন, বেশ! আমরা থাকব! তবে একটা শর্তে! তা হল তোমাদের সবাইকে আমার কথা শুনে চলতে হবে। আমার একটি কথারও অন্যথা করতে পারবে না তোমবা। তোমরা মানে, তুমি বা উমাই শুধু নয়। শিশির, এবং জ্ঞান ফিরে এলে শোভনকেও। তবে শোভন হয়তো স্বইচ্ছায় কিছু শুনবে না। তার ওপর জোর খাটাতে হবে।

উমা হেসে বললেন, শুনব। শুনব অশনিদা! এবার শোভনকে নিয়ে চলুন ওপরে! আর আপনাদের জন্য চা-টা দিই।

অশনিনাথ মাথা নেড়ে বললেন, না কথাগুলো অত হালকাভাবে বললে চলবে না উমা। জাহাজের ক্যাপ্টেনের কথা যেভাবে নাবিকরা শোনে, যুদ্ধের সময় সেনাপতির নির্দেশ শোনে সৈনিকেরা, সেভাবেই আমার সবকথা শুনতে হবে তোমাদের।

দেবকান্ত রাও হেসে বললেন, এ আর কি নতুন কথা হল। চিরকালই তো তোমার কথা

ওইভাবেই শুনে এসেছি।

বেশ চলো তাহলে; ব্রেকফাস্ট করে নেওয়া যাক। কিন্তু শোভনের কাছে কে থাকবে?

আমাদের আয়া রানি থাকুক। ও আমার পুরোনো আয়া। আমাকে মানুষ করেছে।

উমা তাঁর আয়াকে ডেকে শোভনের কাছে বসিয়ে ওদের নিয়ে গেলেন বিশাল সুসজ্জিত ডাইনিং হলে। টেবিলে স্তূপাকার আহারবস্তু দেখে অশনিনাথ পিছিয়ে এলেন। বললেন—করেছ কী উমা?

উমা লজ্জিত কণ্ঠে বললেন, কী আর করেছি?

এই যে এতরকম আয়োজন, ডিম? পর্ক? লবস্টার?

কত কষ্টে লবস্টার জোগাড় করেছি। আমি জানি আপনি পছন্দ করেন। আপনারা আসছেন শুনে তাড়াতাড়ি আমার নিচু পাহাড়ির ফিশারি থেকে আনিয়েছি—।

অশনিনাথ বললেন, কেন? দেবকান্ত তোমাকে আমাদের খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে কোনও রেসট্রিকশানের কথা বলেনি?

কই না তো?

দেবকান্ত রাও মাথা চুলকে, অপ্রস্তুত হেসে বললেন, স্যরি, ভুল হয়ে গেছে!

অশনিনাথ বললেন, এসব সরিয়ে একেবারে বাড়ির বাইরে দিয়ে এসো। আমাদের জন্যে উমা তুমি নিজে গিয়ে চা, দুধ, পনির আর রুটি নিয়ে এসো। ইচ্ছে করলে সামান্য ফলও আনতে পারো।

উমা বললেন, এখুনি ব্যবস্থা করছি, আপনারা তাহলে পাশেব চা-ঘবে চলুন।

এরপর অশনিনাথ দ্রুত কাজে নেমে গেলেন। চা-খাবার খেয়ে সারা দুর্গবাড়িটা দেখতে বেরোলেন। অতি প্রাচীন বিশাল দুর্গ। দুর্গের ঘরের সংখ্যাই প্রায় দেড়শো। উইং আছে তিনটি। মূল প্রাসাদের নীচের তলায় দীর্ঘ লাইব্রেরি-ঘর। সেই বিশাল ঘরের চারিদিকে ঘেরা প্যাসেজ। প্যাসেজে টানা কাচ দেওয়া জানলা। লাইব্রেরি-ঘরটি সবে সারানো হয়েছে। রঙের শেষ-পোঁচ পড়েছে। ঘরটি খালি। বইপত্র সব সরিয়ে অন্যত্র রাখা হয়েছে। অশনিনাথ বিরাট হলঘরটি ঘুরে-ঘুরে দেখলেন। তারপর উমার দিকে তাকিয়ে বললেন, এ অঞ্চলে সবচেয়ে পবিত্র নদী কী?

সর্বতোয়া—স্বতোয়া বলে এখানকার লোক। আমবা পুজোর কাজে গঙ্গাজলের অভাবে স্বতোয়ার জলই ব্যবহার করি। সে-জল আমাদের এখানে মন্দিরে জালা ভরে-ভরে রেখে দেওয়া হয়।

অশনিনাথ বললেন, বেশ, উমা তোমার ওপর ভার দিলাম এই বড়ঘর দেওয়াল জানলা সমেত ধুয়ে, তার ওপর স্বতোয়ার জল ছিটিয়ে দেবে। তারপর সমস্ত জানলা-দরজা বন্ধ করে ধুনো গুগ্‌গুল দেবে ভালো করে। ঠিক ঘরের মাঝখানে একেবারে নতুন ব্যবহার না করা তোশক গদি পেতে বড় একটি বিছানা করবে। সবাই আজ নিরামিষ খাবে। তারপর শুদ্ধ বস্ত্রে স্নান সেরে সন্ধে থেকে এই ঘরে এসে ঢুকবে, সারা রাত আর ঘর থেকে কোথাও বেরোবে না। আর হ্যাঁ, চাকর-বাকরদের বলে দেবে সন্ধে থেকে তারা যেন তাদের মহলে চলে যায়। এবং টেলিফোনের লাইনও থাকবে না। কেটে দিতে হবে।

উমা বললেন, আর আমার মেয়ে অশনিদা। তাকেও কি আমাদের কাছে রাখব?

না-না। মেয়ে থাকুক ওপরে ওর বেডরুমে। আয়ার কাছে শোয় তো?

হ্যাঁ, আমার আয়া রানির কাছে!

খুব ভালো। তাই-ই শোবে। কিন্তু ওকে কোনও আমিষ দিও না?

না, চাকরদের বলে দিয়েছি। ফ্রিজ থেকে পর্যন্ত সব আমিষ খাবার বের করে দিয়েছি। আপনি কিছু চিন্তা করবেন না। আমি শুধু ভাবছি অন্য কথা।

কী?

অন্য সিকিউরিটি।

দেবকান্ত রাও বললেন, আমিও তাই ভাবছি। ভাবছি যে চাকর-বাকর অন্য বিল্ডিং-এ থাকলে যদি বিপদ-আপদ হয় তারা তো আসতে পারবে না। তা ছাড়া ফোনের লাইন ডিসকানেক্ট করে দিলে যদি—।

অশনিনাথ বললেন, তোমরা সিকিউরিটি দিয়ে সারা দুর্গ ঘিরে রাখো না। আমার কোনও আপত্তি নেই, কিন্তু যদি বলি এই ঘরের বাইরে চাকর-বাকর মোতায়েন রাখলে, তাদের জীবন আশঙ্কার সম্ভাবনা আছে, আমি সেই আশঙ্কা থেকে তাদের বাঁচাতে চাইছি, তাহলে?

দেবকান্ত বাও বললেন, তুমি যা বলবে, তাই-ই হবে অশনিদা।

অশনিনাথ বললেন, বেশ, তুমি তাহলে আমি যা-যা বলেছি অক্ষরে-অক্ষরে পালন করো। শিশির শোভনের কাছে থাক। আমি একটু বেরোব। আমি না ফেরা পর্যন্ত কিন্তু শোভন তোমাদের দায়িত্বে থাকছে। শোভনের কোনও ক্ষতি হলে আমি তোমাদের দায়ী করব। আমি সন্ধের আগেই ফিরে আসছি। শারমার ছল-চাতুরি থেকে সাবধান।

শিশির বলল, কিন্তু আপনি একা-একা কোথায় যাচ্ছেন অশনিদা, যদি কোনও বিপদে পড়েন আপনাকে কে দেখবে?

উমা বললেন, সত্যিই তো। অশনিদা আপনি বরং শিশিরবাবুকে সঙ্গে নিয়ে যান। আমি আর উনি শোভনের দেখাশুনো ঠিকমতোই করতে পারব। ভাববার কোনও কারণ নেই। হয় আমি, না হয় উনি কেউ-না-কেউ ওর কাছে থাকবই।

অশনিনাথ হেসে বললেন, বেশ! আমি তাহলে শিশিরকে নিয়ে যাচ্ছি।

শিশির অশনিনাথের সঙ্গে বেরিয়ে যাওয়ার সময় উমা বললেন, কিন্তু অশনিদা, সোমনাথের কী হল? কিংবা চন্দ্রাব?

অশনিনাথ বললেন, তোমরা একটা কাজ করো কলকাতায় আমার বাড়িতে ট্রাঙ্ককল করো। শ্রীমন্তকে বলে দাও যে, আমরা এই দুর্গে আছি। যদি সোমনাথের পক্ষে সম্ভব হয় তাহলে সোমনাথ যেন এখানেই চলে আসে—কিন্তু সঙ্গে কেউ থাকলে যেন না আসে।

উমা বললেন—বেশ। এখনই ট্রাঙ্ক বুক করছি।

শিশির আর অশনিনাথ বেরিয়ে পড়লেন।

অশনিনাথ উমাকে বিশেষ কতকগুলো গোপন নির্দেশ দিয়েছিলেন। উমা সেই অনুযায়ী লোকজন লাগিয়ে, স্বতোয়ার জলে বিশাল হলটি পরিষ্কার করে জানলাগুলো বন্ধ করে শার্শি লাগিয়ে দিলেন। শার্শির কাচের ফাঁকগুলিতে তুলো ও মোম দিয়ে আলাদা একটি আস্তরও দিয়ে দিলেন। প্রতিটি ভেন্টিলেটারে ঝোলালেন গুচ্ছ গুচ্ছ রশুন, পাতিলেবু আর বিশেষ একটি বনজ লতার পত্রমুকুল। ঘরের চার কোণে ধূপধুনোর প্রচুর আয়োজন রইল। একটি ফ্যামিলি খাটের আয়তনে ভারী গদি তোশক পাতালেন তিনি ঘরের মাঝখানে। মাত্রই কয়েকমাস আগে, অতিথিশালার জন্যে তৈরি হয়েছিল ওই গদি-তোশক। সদ্য-ধোয়া সাদা বিছানার চাদর দিয়ে মুড়ে, সেই উঁচু বেদির মতো শয্যার মাঝখানে তিনি স্তূপাকারে সাজিয়ে রাখলেন ধোপ-ভাঙা ওয়াড়-দেওয়া কিছু বালিশ। তারপর ঘর নিজে হাতে বন্ধ করে তালা দিয়ে যখন ওপরে গেলেন তখন দেবকান্ত রাও শোভনের ঘরের সামনে বসে বই পড়ছিলেন। তিনি বললেন,—অশনিদার নির্দেশমতো শোভনকে স্পঞ্জ করে মাথা ধুইয়ে সদ্য-ধোয়া পোশাক পরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ওর বোধহয় এবার জ্ঞান ফিরে আসছে।—তুমি কি ওর কাছে বসবে একটু?

উমা বললেন, আমি বসছি, তুমি বরং স্নান-টান সেরে এসো।

দেবকান্ত বললেন, সেই ভালো, আমি স্নানটা সেরে আসি। দেবকান্ত এগোতে যাবেন এমন

সময় তাঁদের খাস বেয়ারা ভরত এসে বলল, মা, আপনাকে নীচে একজন ডাকছেন।

আমাকে?

উমা অবাক হলেন।

কারণ উমাকে ডাকতে হলে নীচের পাহাড় থেকে সাতটি চৌকি পেরিয়ে তবেই তাঁর খাসমহলে পৌঁছতে পারা যায়। তবে যদি কোনও চেনাজানা লোক হয়, কিংবা লোকটি নীচের চৌকির পাহারাদারকে ঠিকমতো বোঝাতে পারে, যে সে কোনও কাজে আসছে, তাহলে আর তাকে আটক করা হয় না।

উমা দেবকান্ত রাওকে বললেন, তুমি বরং কলকাতায় অশনিদার বাড়ি ট্রাঙ্ককল বুক করো, আমি তাড়াতাড়ি দেখাটা সেরে আসছি।

দেবকান্ত বললেন, সেই ভালো।

উমা নীচে নেমে তাঁর নিজের ছোট বসবার ঘরে এসে খাসবেয়ারা জমীর সিংকে বললেন, কে লোকটি? নাম বলেছে কোনও?

জমীর সিং বলল, হ্যাঁ মা, বললেন, সোমনাথবাবু।

ওঃ, সোমনাথ, তা-ই—আচ্ছা, আচ্ছা, এখুনি আসতে বলো—।

উমা সোফায় নিশ্চিন্ত হয়ে এলিয়ে বসে পাশের ত্রিপয়ের ফুলদানিতে রাখা সদ্য ফোটা কার্নেশনগুলোকে হাত দিয়ে আদর করছিলেন। দরজার কাছে পাপোশে মোলায়েম পা ঘষার সঙ্গে সঙ্গে কোমলকণ্ঠে কেউ বলল, গুড মর্নিং শ্রীমতী দেও।

উমা চমকে তাকালেন। এ তো সোমনাথের কণ্ঠস্বর নয়। দরজার দিকে তাকিয়ে দেখলেন, পরদা তুলে দাঁড়িয়ে আছে মোটাসোটা, থলথলে শরীরের, মোঙ্গলীয় মুখের একটি প্রায়-প্রবীণ লোক। তার পরনে হালকা ব্রাউন রঙের বিলিতি স্যুট। উমা কিছু বলার আগেই হাসিমুখে লোকটি এগিয়ে এসে উমার মুখোমুখি সোফায় বসল।

উমা কী যেন বলতে যাচ্ছিল।

লোকটি উমার চোখে চোখ রেখে মৃদু হেসে কোমলকণ্ঠে বলল, মিসেস রাও, আমি বুঝতে পারছি, মিথ্যে পরিচয় দিয়ে আপনার কাছে এভাবে আসা আমার উচিত নয়। কিন্তু এ ছাড়া আপনার কাছে পৌঁছনোর কোনও উপায় ছিল না আমার। সত্যিকথা বলতে কি আপনার উপকারের জন্যেই এই পথ নিতে হয়েছে আমাকে। আমার নাম নিশা শারমা। আমি একটি তন্ত্র-সংস্থার সঙ্গে আছি। আমার কাজ মানব-কল্যাণ।

উমা ওষ্ঠ বিকৃত করে বলল, ছাই মানব-কল্যাণ, আমি আপনার সংস্থার কথা সব জানি।

না আপনি জানেন না। আপনি যা শুনেছেন তা যে সর্বৈব ঠিক তাই বা কী করে জানলেন? যারা অবিশ্বাসী, যারা বিপথগামী, তারা আমাদের কার্যকলাপ নিয়ে অনেকরকম অপপ্রচার চালিয়ে থাকে, এবং তারা যথাযোগ্য শাস্তিও পায়। মনে রাখবেন মিসেস রাও, সে শাস্তি আমরা দিই না, আপনা থেকেই তাদের ওপর শাস্তি এসে পড়ে।

উমার কেমন যেন শিথিল, বিমর্ষ লাগছিল নিজেকে। শারমার এই একটি কথায় সে যেন কেমন চমকে উঠল।

আপনি কি পাগল হয়ে গেছেন? আমার বাড়িতে বসে আপনি আমার বন্ধুদের সমালোচনা করছেন?

আহাঃ—উত্তেজিত হচ্ছেন কেন? বসুন, স্থির হয়ে বসুন উমাদেবী, আপনাকে আমি কিছু কথা বলতে এসেছি। বলেই চলে যাব। আপনি বুদ্ধিমতী। এসব কথা আপনার শোনা দরকার। এতবড় প্রাসাদের মালিকানা আপনাদের, পূর্বপুরুষদের এতবড় গৌরব ঐতিহ্য, আপনার সামান্য ভুলের ফলে তাকে মাটিতে মিলিয়ে দেবেন না? না-না-না, এমনটা হতেই পারে না উমাদেবী। আপনাকে আমি

উমাদেবীই বলছি। আপনি—আপনি জানেন না আপনি কী আশ্চর্য সুন্দর দেখতে। কী দুর্দান্ত ব্যক্তিত্ব আপনার। কী যৌবনশ্রী। আপনার মতো একজন মহিলা আমাদের সঙ্গে এলে আমরা তো জগৎ জয় করতে পারতাম। দেখুন আপনাকে এবার আসল কথাটা বলি—তার আগে আপনার ওই ত্রিপয়ে রাখা চকোলেটের বাক্সটা থেকে আমাকে একটা চকোলেট দিন না, উমাদেবী...।

উমা ডানহাতে ত্রিপয়ে রাখা কলিং বেলটা বাজাতে যাচ্ছিলেন, তার বদলে চকোলেটের বাক্সটার দিকে হাত বাড়ালেন। বাক্সটা স্বপ্নাশ্রিতের মতো এগিয়ে দিলেন শারমার হাতে। শারমা একটা চকোলেট মুখে পুরে দিয়ে এ গাল থেকে ও গাল করল। উমা দেখতে লাগলেন। কুশ্রী ঝোলা গাল। গালের ভেতরে চকোলেট। তাঁর গা গুলিয়ে উঠতে লাগল। তারপর শারমার চোখে চোখ রাখতেই তাঁর মাথাটা কেমন যেন ঘুরে উঠল। শারমা অদ্ভুত একটা হেসে বলল,—এই যে আপনার বাড়ির একটি জিনিস আমি গ্রহণ করলাম, এইতেই আপনার অধিকারের আওতায়—আপনার আওতার মধ্যে আমি ঢুকে পড়লাম।

উমার অদ্ভুত মনে হতে লাগল। তাঁর চোখের সামনে শারমার কুশ্রী চেহারাটা যেন ক্রমশ বদলে যেতে লাগল। উমার মনে হতে লাগল, যে লোকটা তাঁর সামনে বসে আছে, সে যেমন সুন্দর, তেমনই ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। তার কণ্ঠস্বর, কথা বলার ভঙ্গি, তার হাসি সব কিছুই যেন মোহময়, আকর্ষণীয়। এত সুন্দর করে যেন আর কাউকে কোনওদিন কথা বলতে শোনেননি উমা। শারমা বলে চলেছে—।

হ্যাঁ, কী বলছিলাম যেন, জানেন, আপনাদের বন্ধু শোভন, শোভনদের পরিবারটি ক্রমশ লুপ্ত হয়ে আসছে। সত্যি কথা বলতে কি শোভনই ওই পরিবারের শেষ বংশধর। ওর কাকা যখন আমার কাছে কেঁদে পড়লেন, ওকে যখন একবার আমি নির্ঘাত চোরাবালির মৃত্যু থেকে বাঁচালাম, তখন থেকেই ওর ওপর আমার মায়া পড়ে গেল। আপনিই বলুন না উমাদেবী, না হলে বনের মধ্যে শোভন চোরাবালিতে ডুবে যাচ্ছিল যখন, সেখানে আমি হঠাৎ কোথা থেকে এসে উদয় হলাম—তা সেই শোভন, যাকে আমি নতুন পরমায়ু, পূর্ণ স্বাস্থ্য, বাঁচার আনন্দ দিতে চাই, তাকে যদি কেউ ছল-ছুতো করে আমার কাছ থেকে সরিয়ে আনে, বলুন, তাতে কি তার ক্ষতি করা হয় না? আমি তো ডাক্তারেরই মতো। ডাক্তার যেমন রুগিকে সারিয়ে তোলার দায়িত্ব নেয়, আমিও তো তেমনি শোভনকে বাঁচিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব নিয়েছি। এ সবই আমার নিজের ইচ্ছায় নয়। আসলে কাজ করছেন সাক্ষাৎ 'কাল', 'নিশা'। তিনি যেখানে তাঁর ডানার ছায়া ফেলেন, সেখানে দু-রকম ঘটনাই ঘটতে পারে। তাঁর ইচ্ছেমতো শক্তি, ক্ষমতা সুখ-সম্পদ সব আসতে পারে, আবার ঘনিয়ে উঠতে পারে মৃত্যুর করাল ছায়া। যেমন আপনাদের সংসারে শোভনকে আপনারা আটকে রেখেছেন। কাল অমাবস্যার লগ্নে দু-একবার তাকে 'নিশা'—'কালের' পায়ে উৎসর্গ করার কাজে বাধা দিয়েছেন আপনার বিপথগামী বন্ধুরা। আজ এসেছে আপনার সংসারে অশান্তি, মৃত্যু, দুর্গ্রহ তাদের জন্য—আপনার আর এ থেকে উদ্ধার নেই।

উমা বোধ করতে লাগলেন তাঁর মনের মধ্যে ক্রমশ শারমার কথাগুলো ডুবে তলিয়ে যাচ্ছে। শারমার কথাগুলো দারুণ যুক্তিসঙ্গত। এখন মনে হচ্ছে, অশনিনাথ, শিশির এবং শোভন—এরাই উমার সংসারের চরম শত্রু এবং দুর্গ্রহ। বেশ ছিলেন উমা স্বামী, কন্যা নিয়ে। আজ সকালে উঠে তাঁর ফার্মে যাওয়ার কথা ছিল। তারপর তাঁদের ছোট্ট গার্ডেন হাউসে মিষ্টি একটা পিকনিক, সবই ভেস্তে গেল এই অনাহূত অতিথিদের জন্য। কিন্তু কেবল এই চিন্তাই মাথায় ঘুরছিল না উমার। এই সঙ্গে আর এক চিন্তাও ঘুরপাক খাচ্ছিল তাঁর মনের মধ্যে। সে চিন্তা হল ছোটবেলার এক অস্পষ্ট স্মৃতি। উমারা হলেন বিহারের আর এক পার্বত্য মহল্লার এক সর্দারের ঘরের মেয়ে। তাঁদের মহল্লায় এক ডাকিনী ছিল। বুড়ি থুড়থুড়ি ডাকিনী। সে যেদিকে তাকাত সেদিকেই কেমন যেন ক্ষতি হয়ে যেত। ক্ষতি এবং মহামারী।

ডাইনি থাকত দূরের একটা ফণিমনসার জঙ্গলে। কিন্তু কখনও-কখনও সে লোকালয়ে ভিক্ষে করতে আসত। উমার মা একবার বুড়িকে ভিক্ষে দিতে গিয়েছিলেন। উমার ঠাকুমা সঙ্গে-সঙ্গে বারণ করে দিলেন। বললেন, বউমা, ওকে ভিক্ষে দিও না। ওরা ডাইনি। ওদের সংসার থেকে কিছু দিতেও নেই, ওদের কাছ থেকে কিছু নিতেও নেই।

উমার মাথার ভেতর যখন প্রবল স্রোতের পিছন-পিছন সেই স্মৃতির ক্ষীণ স্রোতটা দুলতে লাগল, তখন সে শুনল, শারমা বার-বার খালি বলছে,—তাহলে এক কাজ করুন, আপনাদের স্বার্থে, শোভনের স্বার্থে, শোভনকে আমাদের কাছে ফিরিয়ে দিন। উমার মনে হল, ভারী সুন্দর, ভদ্র, কোমল এই মানুষটি। ইনি সত্যিই তাঁর পরিবারের ও শোভনের ভালো চান। সত্যিই তো বাড়তি ঝামেলা নিজেদের ঘাড়ে ঝুলিয়ে রাখার কী দরকার। শারমার কথামতো শোভনকে এদের হাতে তুলে দিলেই তো ভালো হয়।...তুলে দিলেই তো ভালো হয়...উমা যখন একথা ভাবতে শুরু করেছেন, তখনই হাসতে-হাসতে, লাফাতে-লাফাতে রানি-আয়ার হাত ছাড়িয়ে ঘরে ঢুকল তাঁর চার বছরের মেয়ে হাসি। খিলখিল করে হেসে সে চকোলেটের বাক্সের দিকে ছুটে এল।

এই বুঝি আপনার মেয়ে, আহা ভারী লাভলি তো! এসো-এসো খুকি চকোলেটের বাক্সটা মায়ের কাছ থেকে নিয়ে এসো তো! তাবপর, তুমি একটা খাবে, আর আমিও একটা খাব। কী বল?

হাসি চকোলেটের বাক্সটা তুলে শারমার দিকে এগোতে যাবে, হঠাৎ উমার মধ্যে বিদ্যুতের মতো একটা চেতনার ছুরি ঝনঝন করে তাঁকে কাটতে-কাটতে চলে যেতে থাকল। ওই চকোলেটের বাক্স ছুঁয়ে শারমা চকোলেট নিয়েছে,—উমার ফুলের মতো মেয়েকে সে ছোঁবে এখন। তারপর হাসিও চলে যাবে ওর কবলে। উমার গা ঘৃণায় রিরি করে উঠতে লাগল। সন্তানের মুখের দিকে তাকিয়ে তঁরে নিজস্ব বোধ, বৃত্তি-প্রবৃত্তির ঘুম ভেঙে যেতে লাগল ক্রমশ। উমা চমকিত হয়ে বেল বাজালেন। তাবপর কঠোরকণ্ঠে হাসিকে ডেকে বললেন, হাসি, শিগগির এদিকে চলে এসো। ও লোকটির কাছে কিছুতেই যেও না।

শারমা তখনও হাসছে।

কী হল?—কী হল উমাদেবী?

উমা তাকিয়ে দেখলেন, শারমার পিছনের দরজায় পরদা তুলে এসে দাঁড়িয়েছে জমীর সিং আর হাজারী সিং। উমা এক-হাতে মেয়েকে কোলের কাছে চেপে ধরে অন্য হাতে জমীর আর হাজারীকে ইশারা করে বললেন—এই লোকটাকে ভালো করে চিনে রাখো, এটাকে কক্ষনো আর আমাদের ঘনশ্যামগড়ের দুর্গের ত্রিসীমানায় ঢুকতে দেবে না।

তীরের বেগে উঠে দাঁড়াল শারমা।

কী বলছেন আপনি উমাদেবী?

কে উমাদেবী? আমি মিসেস রাও,—এক্ষুনি বেরিয়ে যান আপনি। আমার হাসির দিকে কু-দৃষ্টি দিচ্ছেন; এত বড় সাহস?

আমি কিন্তু আপনাদের বন্ধু?

বন্ধু?—বন্ধুদের নামে নিন্দে করতে এসেছিলেন আপনি, লজ্জা করে না আপনার? ছিঃ। আমি কী অপরাধই না করেছি। আমার ঘরে বসে আপনার কাছ থেকে আমাদের বন্ধুদের নিন্দে শুনেছি—ছিঃ—

জমীর আর হাজারী সিং-এর দিকে তাকিয়ে, শারমা দরজার দিকে এগোল। যাওয়ার আগে ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, শুনুন মিসেস রাও,—আপনার মেয়েটিকে আপনি খুব বেশি ভালোবাসেন তাই না?—আচ্ছা, ঠিক আছে, দেখা যাক কী করা যায়?

উমা তীব্র কণ্ঠে বললেন, ভগবান আমাদের সহায়। আপনার চেষ্টায় কোনও সুফল হবে

না জানবেন। আর আপনার ভয়ও আমি কবি না।

শারমা তীব্র দৃষ্টি হেনে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল।

সোমনাথের যখন জ্ঞান হল তখন চারিদিকে সকালের আলো ফুটে উঠছে। তার পাশেই উপুড় হয়ে পড়ে আছে চন্দ্রা। তার কপালের কাটা দাগটার রক্ত শুকিয়ে কালচে হয়ে গেছে। তার জ্ঞান নেই, না সে ঘুমিয়ে পড়েছে, সেটা বুঝতে পারছিল না সোমনাথ। একটু দূবে জ্বলন্ত গাড়িটাব ভগ্নাবশেষ পড়ে আছে। তখনও পোড়া তেলের গন্ধ ছড়িয়ে আছে ঘাসের ওপব। আস্তে-আস্তে উঠল সোমনাথ। নিজের ক্লান্ত শরীরটাকে টেনে-টেনে নিয়ে বাস্তার ওপরে গিয়ে দাঁড়াল। যদি কোনও গাড়ি বা ট্যাক্সি পাওয়া যায়। কিন্তু ওই গ্রামীণ রাস্তায় গাড়ি আর কোথায়। আস্তে-আস্তে শোভন, অশনিনাথ, শিশির, শারমা, মিসেস কাপুর এদের সকলের কথা মনে পড়তে লাগল সোমনাথের। তার জানতে ইচ্ছে করল এদের কী অবস্থা হয়েছে। শোভনকে উদ্ধার করা গেল কি না? কিন্তু চন্দ্রার দায়িত্বও তো এখন তারই ওপর। চন্দ্রাকে এখুনি চিকিৎসা করা দরকার।

সোমনাথ রাস্তা দিয়ে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে দেখল দূরে সবজি নিয়ে কলকাতাগামী ট্রাক যাচ্ছে একটি-আধটি। খানিকবাদে গ্রামীণ সরু রাস্তা দিয়ে একটি গোরুব গাড়ি আসতে দেখল। শবতের কুয়াশা আর নবোদিত সূর্যের লালচে রং লাগা সেই অদ্ভুত ভোরে সোমনাথের মনে হল গোরুব গাড়িটা যেন কোনও অলৌকিক লোক থেকে বেরিয়ে ক্রমশ তার দিকে এগিয়ে আসছে।

সোমনাথও এগিয়ে গেল। হাত নেড়ে থামাল গাড়িটা। তাবপরের কাহিনি সংক্ষিপ্ত।

গোরুর গাড়িটায় কেবল ছিল গাড়োয়ান। গ্রামে চালের 'বোরা' রেখে আসছে সে। সেই খালি গাড়িতে চন্দ্রার অচেতন দেহটাকে তুলে যতদূর শহরেব দিকে এগিয়ে যাওয়া যায় ততদূর চলল সোমনাথ। গাড়িটা কাছাকাছি পুলিশচৌকির কাছে এলে, চন্দ্রাকে গাড়িতে রেখে অশনিনাথকে ফোন করল সোমনাথ। ডায়মন্ডহারবাবের কাছাকাছি অঞ্চল থেকে যেমন ট্রাঙ্ককল হয় তেমন।

ফোন ধরল শ্রীমন্ত। না, অশনিনাথ, শিশির বা শোভন কেউ ফেরেনি। তবে অশনিনাথ সোমনাথকে জানাতে বলেছেন যে, তিনি ঘনশ্যামগড় যাচ্ছেন। সঙ্গে আছে শোভন আর শিশির। তিনি ঘনশ্যামগড়ে সন্ধ্যা পাঁচটার মধ্যে তাঁর সঙ্গে সোমনাথকে যোগাযোগ করতে বলেছেন। এবং বলেছেন, সোমনাথ যদি একা আসে, তাহলে বাধা নেই আসাব, কিন্তু সোমনাথ যদি সঙ্গে কাউকে নিয়ে আসে তাহলে ঘনশ্যামগড়ে সে যেন না আসে। টেলিফোনে এই অদ্ভুত ধরনের নির্দেশ পেয়ে সোমনাথ অবাক হল। সে স্পষ্ট বুঝতে পারল যে, ঘনশ্যামগড়ে চন্দ্রাকে নিয়ে যাওয়া বারণ তার পক্ষে।

কিন্তু চন্দ্রার দায়িত্ব যে কোনও বিবেকবান মানুষের মতোই তো সোমনাথের ঘাড়েই পড়ছে। সোমনাথ কী করে অসহায় মেয়েটার দায়িত্ব এড়ায়?

সে ফিরে গিয়ে কাছাকাছি হাসপাতালে নিয়ে তুলল চন্দ্রাকে। ক্ষতস্থানে ড্রেস করে সামান্য ব্র্যান্ডি খাওয়ানোর পর আস্তে-আস্তে তার জ্ঞান ফিরল। চন্দ্রা জ্ঞান ফিরতেই অবুঝের মতো তাকাল সোমনাথের দিকে।

সোমনাথ হেসে বলল, কী?—কোথায় আছেন বলুন তো?

চন্দ্রা বলল, আপনার কাছে।

পালাতে চেষ্টা করেছিলেন কেন?

পালাতে চেষ্টা করিনি, বাঁচবার চেষ্টা করেছিলাম। আমার জীবনের শেষ তো ঘনিয়ে আসছে।

হঠাৎ ছটফট করে উঠল চন্দ্রা।

আজ—আজ কত তারিখ বলুন তো?

সোমনাথ বলল, যাই হোক না, আপনি তো বেঁচে আছেন। চলুন নতুন জীবনের সন্ধানে আমরা দুজন কলকাতায় ফিরে না গিয়ে ঘুরে আসি বিহারের সুন্দর একটি জায়গায়।

চন্দ্রা উঠে দাঁড়িয়ে আস্তে-আস্তে সোমনাথের কাঁধে ভর দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে বেরিয়ে এল হাসপাতালের বাইরে। সোমনাথের কোটের ভেতর পকেটে ছিল হাজারখানেক টাকা। সে কাছাকাছি মোটর ট্যাক্সির আড্ডায় গিয়ে খোঁজ-খবর নিয়ে এক বিশ্বস্ত ড্রাইভারকে ধরল। ড্রাইভারটি দূরপাল্লার প্রাইভেট গাড়ি ভাড়া দেয়। ঘনশ্যামগড় বহুদিন যায়নি সোমনাথ। ঘনশ্যামগড়ের কাছাকাছি বিশাল শিল্প-শহর বিশালপুর। সেখানে সুন্দর-সুন্দর বিলাসবহুল হোটেল আছে অনেক। পাহাড়ের ওপর একটি হ্রদের ধারে ভারী সুন্দর নির্জন একটি হোটেল আছে। ট্যাক্সি ড্রাইভার বলল, সেই ড্রিমল্যান্ড হোটেলেই ওদের দুজনকে পৌঁছে দেবে সে।

ট্যাক্সিতে পাশাপাশি বসে চন্দ্রা বাইরের দিকে তাকিয়ে বলল, আঃ—মাথার ভারটা একটু-একটু করে কাটছে এবার। শরীরটা এত দুর্বল হয়ে পড়েছিল।

সোমনাথ বলল, শরীরের কী দোষ? সারারাত এই শীতে হিমে মাঠের মধ্যে পড়েছিলাম আমরা। বরং বলতে পারেন শরীরে আমাদের আসুরিক শক্তি আছে বলেই এত অত্যাচার সহ্য করার পরও নিমোনিয়ায় ভুগিনি।

চন্দ্রা বলল, কই আপনি তো বললেন না আজ কী বার?

সোমনাথ বলল, আপনার খেয়াল আছে অজ্ঞান হওয়ার পর ক'দিন চলে গেছে আপনার জীবন থেকে?

চন্দ্রা তার সুন্দর চোখ দুটি তুলে বলল, না তো।

সোমনাথ শান্তকণ্ঠে জেনে-শুনে একটা মিথ্যে কথা বলল।

একটি পুরো দিন।

চন্দ্রা হেসে উঠে বলল, সত্যি বলছেন?

হ্যাঁ, সত্যি বলছি। আপনার বয়েস এখন পুরো একুশ বছর চার-চারটি দিন।

চন্দ্রা যেন সোমনাথের এই একটি কথায় গুটি-কেটে বেরিয়ে আসা প্রজাপতির মতো রঙিন আর ফুল্ল হয়ে উঠল। সে দু-হাতে সোমনাথের হাত দুটি চেপে ধরে বলল, তাহলে আপনি সত্যি-ই বলছেন, আমি বেঁচে গেলাম। শারমার কথা মিথ্যে?

হ্যাঁ মিথ্যে! পরিষ্কার মিথ্যে।

আবার মেঘলা ছায়া পড়ল চন্দ্রার মুখে।

না কী শারমা আমাকে শয়তানের কাছে উৎসর্গ করে দিয়ে আমার পরমায়ু এনে দিল?

না-না-না। আপনি তো দ্রুত গাড়ি চালাতে গিয়ে অ্যাকসিডেন্ট করলেন। আপনাকে খুঁজতে এসে দেখলাম আপনি জ্ঞানহীন পড়ে আছেন। আর দেখলাম অনেক দূরে একটু নীচের দিকে শয়তানকে উৎসর্গ করার সেই সব ক্রিয়াকলাপ হচ্ছে। যখন সেসব হচ্ছিল তখন তো আপনি আমারই পাশে শুয়েছিলেন।

ট্যাক্সি এগিয়ে চলল। সোমনাথের একবারও মনে হল না যে চন্দ্রাকে মিথ্যে কথা বলে সে অন্যায় করেছে। ন্যায়-অন্যায়ের কোনও নির্দিষ্ট তুলাদণ্ড থাকে কী? চন্দ্রা যে মনের জোরেই তার সীমিত পরমায়ুর বাইরে চলে যেতে পারে, নতুন হয়ে উঠতে পারে।

বিহার বর্ডার পেরিয়ে ট্যাক্সি এসে পৌঁছল বিশালপুরের কাছাকাছি। তখন দুপুর গড়িয়ে এসেছে। 'ড্রিমল্যান্ড' হোটেলে যখন ট্যাক্সি এসে পৌঁছল, তখন বেলা তিনটে পঁয়তাল্লিশ। হ্রদের ঝকঝকে ময়ূরাক্ষি জলে বিশাল হোটেলের ছায়া পড়ে দুলছিল। ট্যাক্সিওয়ালাকে ভাড়া মিটিয়ে নামতেই সোমনাথকে ট্যাক্সিওয়ালা বলল, হোটেলের পেছনে দেখবেন চমৎকার ছোট-ছোট কটেজ আছে। লেক ওদিকে বেঁকে গেছে। চমৎকার জায়গা।

সোমনাথ আর চন্দ্রা দৃষ্টি বিনিময় করে হাসল।

শীত-বিকেলের রঙিন আলোয় ড্রিমল্যান্ড হোটেলে যেন সত্যিই সোনালি-রঙিন কল্পনার ছন্দ নেমে আসার আয়োজন চলছিল। সোমনাথ হোটেলের ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলে পিছনের বিরাট বাগিচার ধারে—একেবারে হ্রদের ওপর ছোট একটি কটেজ নিল। কটেজটিতে চূড়ান্ত আরামের আয়োজন। সুসজ্জিত কটেজে চন্দ্রাকে রেখে দুজন বেয়ারা মোতায়েন করে শহরে গিয়ে চন্দ্রার জন্য গোটা দুই ম্যাক্সি, তোয়ালে, অন্যান্য টুকিটাকি এবং নিজের জন্য পাঞ্জাবি-গেঞ্জি-পায়জামা কয়েক প্রস্থ কিনে কটেজে পাঠিয়ে দিয়ে সোমনাথ ঘনশ্যামগড়ে ট্রাঙ্ককল করল।

ঘনশ্যামগড়ে ট্রাঙ্ককল করে সোমনাথ দেবকান্ত রাওকে পেল। তাঁর কাছ থেকে অশনিনাথের নির্দেশ শুনে তার মন অপ্রসন্ন হল। প্রথম থেকেই অশনিনাথ চন্দ্রার ভালো-মন্দেব কথা এতটুকুও ভাবছেন না। সঙ্গে কেউ থাকলে যদি ঘনশ্যামগড়ের দুর্গে আশ্রয় পাওয়া সম্ভব না হয়, তাহলে সোমনাথ নিজেও সেখানে যাবে না। চন্দ্রাকে একা ফেলে কাপুরুষের মতো ঘনশ্যামগড়ে বন্ধু-বান্ধবের নিরাপদ আশ্রয়ে ডানামুড়ে বসে থাকার মতো চরিত্র সোমনাথের নয়।

সোমনাথ শুনল অশনিনাথ আর শিশির তখনও ফেরেনি। তারা শোভনকে রেখে বেরিয়ে গেছে। তবে অশনিনাথ বলেছেন, পাঁচটা নাগাদ ফিরবেন। সোমনাথ অগত্যা ফোন ছেড়ে দিল। পাঁচটার সময়ই এসে আবার না-হয় ফোন করবে। সত্যি কথা বলতে কি চন্দ্রার ব্যাপারে সোমনাথ একা-একা সমস্ত দায়িত্বটা মাথায় নেওয়ার ঠিক ভরসা পাচ্ছিল না।

সোমনাথ কটেজে ফিরে গিয়ে দেখল, চন্দ্রা স্নান সেরে নতুন পোশাক পরে লাউঞ্জে বসে হ্রদের জলে রঙিন সূর্যাস্ত দেখছে। সোমনাথকে দেখে হেসে বলল—নতুন পোশাকের জন্যে ধন্যবাদ। যান, স্নান-টান সেরে একটু রেস্ট নিন, আপনি আসবেন বলে এখনও চায়ের অর্ডার দিইনি।

সোমনাথ হেসে চন্দ্রার দিকে তাকাল। চন্দ্রার চোখ দুটি কোমল আভায় ভরে আছে। সদ্যোস্নাত ঈষৎ অসমতল গালে ঝকঝক করছে গোধূলির আভা। স্তরে-স্তরে সাজানো খোলা চুল কাঁধ ছাপিয়ে নেমেছে গাঢ় ভেলভেটিনের ম্যাক্সির ওপর। সোমনাথ চন্দ্রার দিকে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে বলল, এখনও তুমি আমাকে আপনি বলবে চন্দ্রা?

চন্দ্রা চোখ তুলে তাকিয়ে একবার চকিতে সোমনাথকে দেখে নিয়ে ঝট করে চোখটা নামিয়ে নিল। তার কোমল মুখে ফুটে উঠল মৃদু একটি হাসি।

সোমনাথ স্নান করতে চলে গেল।

সোমনাথ যখন সতেজ হয়ে ফিরে এল তখন সূর্যাস্তের শেষ রং লাল-লাল ছড় টেনে জেগে উঠেছে পশ্চিম আকাশের নীল মেঘের প্রান্তে-প্রান্তে। কুয়াশার হালকা একটি স্তর ধীরে জেগে উঠছে নীল-সবুজ শান্ত হ্রদের বুকে। দূরে লাল-হলুদ পালতোলা বোটের শান্ত সঞ্চরণ।

সোমনাথ দেখল টেবিলে চায়ের সরঞ্জাম এসে গেছে। সামান্য ক'টি বিস্কিট সঙ্গে।

সোমনাথ বলল, চন্দ্রা তোমার খিদে পায়নি? আমার তো খিদেয় পেট চুঁইচুঁই করছে। আর তুমিও তো কিছু খাওনি। তা ছাড়া অতটা কেটে গিয়েছিল তোমার কপাল। রক্তও তো কম পড়েনি। এখন হাই-টি খেয়ে নাও। পরে না হয় দেরিতে ডিনার খাওয়া যাবে।

বেয়ারাকে ডেকে অর্ডার দিল সোমনাথ। প্রন কাটলেট, হ্যাম-স্যান্ডউইচ, চিজ-ফ্রাই।

চন্দ্রা হাসল, তুমি জানলে কী করে আমি ঠিক এই আইটেমগুলোই খেতে ভালোবাসি?

গত জন্ম থেকে।

হাসল সোমনাথ। আস্তে-আস্তে চন্দ্রার কোমল করতলটি নিজের হাতে তুলে নিল সে। তার মনে হল এই হাতটির সঙ্গে সে যেন এই মেয়েটির সুখ-দুঃখ অতীত-ভবিষ্যৎ সবই নিজের হাতে তুলে নিল। সোমনাথের হঠাৎ মনে পড়ল—পাঁচটার সময় অশনিনাথ ঘনশ্যামগড়ে ফিরবেন। তখন তাঁকে ফোন করতে হবে। সোমনাথ তাড়াতাড়ি চায়ের টেবিল থেকে উঠে পড়ে চন্দ্রাকে বলল, এখুনি

একটা ট্রাঙ্ক বুক করে আসি চন্দ্রা।

কাকে?

অশনিনাথকে।

ও।

ট্রাঙ্ককল বুক করে যখন ফিরে এল সোমনাথ, চন্দ্রা তখন সবে চা ঢালার আয়োজন করছে। চা খেতে-খেতে চন্দ্রা বলল, তোমার বন্ধু কোথায়?

ঘনশ্যামগড়ে। এই বিশালপুর থেকে জায়গাটা খুব দূরে নয়।

তুমি যে আমার সঙ্গে থাকছ তাতে তোমার বন্ধু চটছেন না তো।

না-না। আমার বন্ধু তো তোমাকেও বাঁচাতে চেয়েছিলেন চন্দ্রা শারমার হাত থেকে। এবং তুমি শুনে খুশি হবে আমাদের মিশন সাকসেসফুল হয়েছে। শারমা শোভনকেও শেষপর্যন্ত শয়তানের রাজ্যে পাঠাতে পারেনি। শোভনকেও উদ্ধার করে আনা হয়েছে আমাদের আশ্রয়ে।

খেতে-খেতে চন্দ্রা বলল, সত্যি কী মোহেই না পড়েছিলাম। কী ভয়ংকর সব ঘটনা। আমি তো আজ চলেই যেতাম শয়তানের রাজত্বে। কালই তো আমার শেষ দীক্ষা ছিল। পরমায়ুর শেষ দিনও ছিল। মাঝে-মাঝে আমার কী মনে হচ্ছে জানো?

সোমনাথ হেসে বলল, কী? কী মনে হচ্ছে?

মনে হচ্ছে, এই যে তোমার সঙ্গে আসা, এখানে থাকা, এই সমস্তটা একটা স্বপ্ন নয় তো?

না, না, এটা কেন স্বপ্ন হবে? বরং এর আগেরটাই ছিল স্বপ্ন। দুঃস্বপ্ন।

ভেতরে সোমনাথের বেডরুম থেকে টেলিফোন বেজে উঠল।

সোমনাথ বলল, এখুনি আসছি চন্দ্রা, পাঁচ মিনিট।

কিন্তু কথা বলা শেষ করে ফিরে আসতে সোমনাথের দু-মিনিটের বেশি লাগল না। অশনিনাথের আশ্চর্য ব্যবহারে সোমনাথ মনে-মনে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ বোধ করছিল। সোমনাথের মুখের অভিব্যক্তির দিকে তাকিয়ে চন্দ্রা বলল, কী হল? কোনও খারাপ খবর নাকি?

সোমনাথ শুকনো হেসে বলল, না-না খারাপ খবর না। শোভনের জ্ঞান ফিরেছে। শোভন ভালোই আছে। কোনও চিন্তার কারণ নেই আর। অশনিদা তোমার বিপদ কেটে গেছে শুনে খুব আনন্দ করলেন। বললেন এই হোটেলেই কয়েকটা দিন কাটিয়ে দিতে।

চন্দ্রা বলল, তা-তো দেব। কিন্তু তারপর? তারপর কী হবে। অনন্তকাল ধরে তো আর আমরা এই ড্রিমল্যান্ড হোটেলে কাটিয়ে দেব না?

সোমনাথ বলল, কেন, আমার ওপর কি তুমি নির্ভর করতে পারছ না? চলো আমরা বাগিচায় একটু বেড়াই। এরপর সন্ধে নেমে গেলে তো ঘরের মধ্যে এসে বসতেই হবে। বেড়াতে-বেড়াতে আমার পরিচয় তোমাকে দিতে চাই।

চন্দ্রা উঠে দাঁড়াল। পাশাপাশি দুজনে হাঁটতে-হাঁটতে বাগিচার মধ্যে দিয়ে চলল। মাঝারি আকারের পাহাড়ের টিলায় উঠে গেছে বাগানটি। আঁকাবাঁকা পথ। পথের দুপাশে বনের মতো করে গাছপালা সাজানো। গাছপালার ফাঁকে-ফাঁকে একপাশে পাহাড়, একপাশে হ্রদ। হ্রদের জলে দিনের আলোর ঝিকিমিকি ক্রমশ কমে আসছে। টুপটাপ করে জ্বলে উঠছে মৃদু বিদ্যুতের আলো। ঘোরানো-ঘোরানো তরুবীথির দু-ধারে আলোর মালাগুলি দূরে-দূরে সাজানো।

কথা বলতে-বলতে চন্দ্রা আর সোমনাথ সেই তরুবীথির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। সোমনাথ তার কাজকর্ম বাড়ি-ঘর সংসার-পরিবার পছন্দ-অপছন্দের কথা বলে যাচ্ছিল। চন্দ্রা মন দিয়ে শুনছিল। কিন্তু ক্রমশ চন্দ্রার মনের পরদায় বারবার ফুটে উঠতে লাগল সেই অর্ধভুক্ত মাছ-মাংসের প্লেট ছড়ানো লাউঞ্জের টেবিলের ছবি। কেমন যেন শরীরের ভেতর থেকে একটা অত্যধিক আমিষ খাওয়ার বিবমিষা পাক মারতে থাকল। সে আস্তে-আস্তে চারিদিকে তাকাল। যে হ্রদ, যে পাহাড় উদ্যান তার এত ভালো

লাগছিল সেই উদ্যান হ্রদের ওপর থেকে ভালো লাগার রঙিন আস্তর যেন আস্তে-আস্তে উঠে যাচ্ছে। তার বদলে তাল-তাল অজানা অন্ধকার, দীর্ঘ-দীর্ঘ ভয়াল ছায়া যেন ডানা মেলে এগিয়ে এসে আস্তে-আস্তে ঘিরে ধরছে চন্দ্রাকে।

এই অন্ধকারের পদধ্বনি যেন সোমনাথও শুনতে পাচ্ছিল। ক্রমশ সেও নিশ্চুপ হয়ে গেল। তার মনে পড়ল ট্রাঙ্কে অশনিনাথের সঙ্গে তার শেষ কথোপকথনের কথা।

অশনিদা, আমি সোমনাথ বলছি!

কোথা থেকে?

বিশালপুরের ড্রিমল্যান্ড হোটেল থেকে বলছি!

তোমার সঙ্গে চন্দ্রা আছে?

হ্যাঁ, আছে।...অশনিদা, আমি ঘনশ্যামগড়ে যেতে চাই!

না। তুমি চন্দ্রাকে নিয়ে এখানে আসতে পারবে না।

অশনিদা আজ চন্দ্রার জীবনের শেষ দিন! অবশ্য তার নিজের বিশ্বাসমতে। তুমি তাকে একটু সাহায্য করবে না?

না। উপায় নেই। তুমি, আমি, শিশির—আমরা সব ক্লান্ত, ফাঁকা হয়ে গেছি। আমাদেব আব কোনও শক্তি নেই। ওই চন্দ্রা মেয়েটি আব শোভন তো 'মাইনাস-পাওয়ার' বলতে পাবা যায়। অথচ আজই হল আমাদের সংগ্রামের ভয়ংকর শেষ দিন। এ দিনের যুদ্ধ সব চেয়ে প্রচণ্ড। এ দিনের জন্যে আমাদের বিশেষ ধরনের প্রিকশান নিতে হচ্ছে। সুতবাং আমি এখুনি টেলিফোনের লাইন কেটে দিচ্ছি। তুমি চন্দ্রাকে নিযে সাবধানে থাকো। আব যত বিপদই আসুক তোমার জন্যে আমাব কোনও ভাবনা নেই। তবে আজ বাত্রের মধ্যে আর ঘনশ্যামগড়ের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করো না। ছাড়ছি—।

সোমনাথ নিজেব জন্যে সত্যিই কিছু ভাবে না। কিন্তু যাব জন্যে তার ভাবনা, যাকে সে ক্রমাগত মিথ্যে কথা বলে যাচ্ছে, যাকে সে নিজের দাযিত্বে শারমাব নারকীয় ক্রিয়াকলাপে শামিল হতে দেয়নি, তার সম্বন্ধে অশনিনাথ পরোক্ষে যা বললেন, তাতে তো তার ঘোব বিপদের ইঙ্গিত দিলেন।

চন্দ্রার পাশে-পাশে সোমনাথ এইসব চিন্তা-ভাবনায নিমগ্ন হয়ে চুপচাপ হাঁটতে-হাঁটতে চলে যাচ্ছিল।

খানিকক্ষণ বাদে চন্দ্রা কেমন যেন অদ্ভুতভাবে কেঁপে উঠল। তাবপর সোমনাথের দিকে ফিরে বলল, চলো, ভেতরে চলো, আমার ভালো লাগছে না। আমার কেমন যেন শীত-শীত করছে।

সোমনাথের এই ড্রিমল্যান্ড হোটেলের নির্জনে কেমন যেন একা অসহায লাগতে শুরু কবল। হাঁটতে-হাঁটতে যখন কটেজে ফিরে এল তারা তখন কটেজটাকে আর সুপার, মনোরম, আবামপ্রদ লাগল না তাদের। সদরে দাঁড়িয়েছিল দিনের দুটি বেয়ারা। তারা এখন বিদায় নেবে। রাতে এখানে বেয়ারাদের থাকার ব্যবস্থা নেই। রাতের প্রহরীরা একটু পরেই রোঁদে বেরোবে। সুতরাং কোনওরকম ভয়ের কোনও কারণ নেই। তা ছাড়া, এসব অঞ্চল অত্যন্ত সুরক্ষিত আর নিরাপদ। বাতের খাওয়ার জন্য সোজা কিচেনে হেড 'শেফ'-এর কাছে ফোন করে বলে দিলেই ডিনার সার্ভ করে যাবে। বেয়ারাবা চলে যাওয়ার পর সোমনাথ চন্দ্রাকে নিয়ে কটেজের ভেতর ঢুকে ভালো করে দরজা লক কবে দিল। দুজনে মিলে কাচের পাল্লা, ফ্রেঞ্চ উইন্ডো সব টেনে বন্ধ করে পরদা টেনে সমস্ত কটেজটা অন্তত নিরাপদ করে বসবার ঘরে এসে পাশাপাশি সোফায় বসল। মৃদু একটি শেডেড ল্যাম্প জ্বলছিল ঘরে। মেঝেয় নরম কার্পেটের ওপর সোফা-সেট পাতা। রেডিওগ্রামে বাজছিল রবিশঙ্করের সেতার। ছোট কটেজটি। মাঝখানে বসবার ঘর। দুপাশে দুটি বেডরুম। কটেজ ঘিরে বাইরের লাউঞ্জ। দুটি বেডরুমে দুজনের শোওয়ার আয়োজন। দুজনেই কিছুটা ক্লান্তিবোধ করছিল। চন্দ্রার পক্ষে কত দিন

হল কে জানে?

সোমনাথের পক্ষে তো দীর্ঘ তিনটি দিন ধরে যে-মানসিক চাপ পড়ছে তা মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছিল। দুজনে নিজেদের ভবিষ্যৎ জীবন, সুখ-দুঃখের কথা পরস্পরের মধ্যে বলাবলি করতে-করতেও কেমন যেন হঠাৎ-হঠাৎ থেমে যাচ্ছিল। হঠাৎ-হঠাৎ সামান্য খুটখাট শব্দেও কেমন যেন একটা চমকে-ওঠা ভয়। যেন কটেজের চারপাশে একটা ভয়ংকর অজানা কিছু আস্তে-আস্তে জাল গুটোতে-গুটোতে এগিয়ে আসছে।

চন্দ্রা উঠে রেডিওগ্রামটা বন্ধ করে দিল। তার ভালো লাগছিল না আর। সোমনাথ খানিকক্ষণ কলেজ জীবনের হাসির গল্প বলবার চেষ্টা করল। কিন্তু তাও জমল না। এভাবেই সময় এগোতে-এগোতে ঘড়িতে যখন দশটা বাজল তখন ডিনারের অর্ডার পাঠাল সোমনাথ। বিস্তারিত পদ। কাঁকড়া-নারকেল, কচ্ছপের ডিমের কষা, ভেটকির রোস্ট, মুরগির ফ্রাই, মাটন রেজালা আর সাদা ঘি-ভাত। খাওয়া-দাওয়ার পর্ব চুকতে-চুকতে রাত বারোটা বাজল। কফি খাওয়ার অজুহাতে রাত একটা। তারপরও চন্দ্রা সোমনাথের কাছ থেকে যেতে চাইছিল না।

সোমনাথ বুঝতেই পারছিল, চন্দ্রা অন্য কোনও কারণে নয়, কেবল ভয়ানক ভয় পাচ্ছে বলে সোমনাথকে ছাড়তে চাইছে না। সোমনাথ শেষ পর্যন্ত বলল, চন্দ্রা তুমি কেন এত নার্ভাস হয়ে যাচ্ছ? নার্ভাস হওয়ার মতো কোনও কারণ ঘটেছে কি?

চন্দ্রা ফ্যাকাসে মুখ তুলে বলল, না ঘটেনি। কিন্তু আমি কেন স্বস্তি পাচ্ছি না সোমনাথ। আমার বুকের ভেতরটা এত ধড়ফড় করছে কেন? আমার কেবল মনে হচ্ছে আমাদের বিপদ কাটেনি সোমনাথ। বিপদ যেন পায়ে-পায়ে এগিয়ে আসছে।

সোমনাথ আস্তে-আস্তে এগিয়ে এসে দু-হাতে চন্দ্রাকে জড়িয়ে ধরে বলল,—চন্দ্রা, চন্দ্রা, আমার এই দু-হাতের বেড়ার মধ্যে থেকে তোমাকে কেউ নিয়ে যেতে পারবে না চন্দ্রা। যাকে তোমার ভয়, সেই সাক্ষাৎ মৃত্যুদূতও না!

চন্দ্রার মুখে একটা তৃপ্ত হাসি ফুটে উঠল যেন।

সোমনাথের বুকে মাথা রেখে খানিকক্ষণ সে নিঃশব্দে চোখের জল ফেলল।

সোমনাথ বলল, চন্দ্রা এক কাজ করা যাক। আজকে আর রাতে আমবা নাই বা শুলাম। এসো আজ সারারাত আমরা এই ড্রইংরুমে জেগে; গল্প করে, বাজনা শুনে কাটিয়ে দিই। দাঁড়াও তোমাকে আমি ভালো করে, আরাম করে বসিয়ে দিই। সুন্দর নরম একটি গভীব সোফায় নরম-নরম কুশন দিয়ে তার মাঝখানে চন্দ্রাকে বসিয়ে ভেলভেটের কুইল্ট দিয়ে তার হাঁটু পর্যন্ত ঢেকে দিয়ে কার্পেটের ওপর তার হাঁটুতে গাল রেখে বসল সোমনাথ।

চন্দ্রা সোমনাথের মাথার চুলে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল কোমল ছোঁয়ায়।

আস্তে-আস্তে রেডিওগ্রামের সংগীত মূর্ছনা ছড়িয়ে পড়তে লাগল সারা ঘরে। সোমনাথের দু-চোখ ভরে ধীরে-ধীরে গভীর ঘুম এসে নামতে লাগল। সে প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল চোখ খুলে রাখার। কিন্তু তার মাথার ভেতর ক্লান্তি আর প্রগাঢ় ঘুমের মিশ্র একটা অনুভূতি এমনভাবে ঘুরতে লাগল যে সে কিছুতেই আর চোখ খুলে রাখতে পারল না। আস্তে-আস্তে গাঢ় ঘুমে মগ্ন হয়ে সে চন্দ্রার কোলেই ঢলে পড়ল।

চন্দ্রা সোমনাথকে লক্ষ করছিল ঘুম-ঘুম চোখে। কিন্তু সোমনাথ সত্যিই যখন গাঢ় ঘুমের কোলে ঢলে পড়ল, তখন চন্দ্রা আপন মনেই অদ্ভুত হেসে উঠল একটু। যেন নিজের অসহায় অবস্থার কথা ভেবেই এই হাসি। হঠাৎ চন্দ্রার চোখ পড়ল সামনের দেওয়ালে ঝোলানো ক্যালেন্ডারের দিকে। ক্যালেন্ডারের গায়ে সেদিনের তারিখের চারপাশে প্লাস্টিকের একটি ফ্রেম দেওয়া। ট্রেন্ড বেয়ারা সেদিনের তারিখের ওপর ঠিকমতো ফ্রেমটি টেনে দিয়েছে। তারিখ দেখে বার মিলিয়ে চমকে উঠল চন্দ্রা। তার মুখ থেকে সমস্ত রক্ত যেন নেমে গেল। তার দু-হাতের আঙুল কুঁকড়ে উঠল। তীব্রকণ্ঠে

সে বলল, সোমনাথ! সোমনাথ! তুমি জেনেশুনে আমাকে মিথ্যে কথা বলেছিলে? আমার মৃত্যুদিন চলে যায়নি তাহলে?—তাহলে আজই,—আজই সেই ভয়ংকর দিন?

সোমনাথের মাথাটা সোফার ওপর আলগোছে নামিয়ে রেখে চন্দ্রা উঠে দাঁড়াল। ঘরের মাঝখানে হেঁটে গেল সে। সঙ্গে-সঙ্গে হা—হা করে খুলে গেল সব দরজা-জানলা। ঘরের বিদ্যুৎকে যেন এক ফুঁয়ে নিভিয়ে দিল কে। নিজের অজান্তেই চন্দ্রা হেঁটে চলল কটেজের বাইরে।

ভেতরে যেন অনন্ত ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে রইল সোমনাথ।

অশনিনাথ আর শিশির গাড়িভরতি নানারকম সরঞ্জাম নিয়ে বিকেল সাড়ে-চারটেয় ঘনশ্যামগড়ে ফিরে এলেন। অশনিনাথকে শারমা সংক্রান্ত সমস্ত খবর দিলেন উমা। অশনিনাথ সব শুনে দেবকান্ত রাও-এর দিকে ফিরে বললেন, দেখেছ দেবকান্ত, আমার বোন বলে কথা, উমা যদি বুদ্ধি না খাটাত, তাহলে এতক্ষণে শোভনকে নিয়ে বহুদূরে চলে যেত শারমা।

দেবকান্ত সোফায় গা এলিয়ে বসে সব শুনছিলেন আর মিটিমিটি হাসছিলেন। তাঁর ভাবটা হল, তোমরা বলছ, বন্ধু মানুষ,—তাই সব শুনছি। কিন্তু এখনও ঠিক মেনে নিতে পারছি না। ইতিমধ্যে সোমনাথের ফোন এল। অশনিনাথ সোমনাথকে যা-যা বললেন তা উৎকর্ণ হয়ে শুনলেন সবাই। ফোন রেখে দিয়ে সোফায় এসে গা এলিয়ে বসতেই দেবকান্ত বললেন, সে কী, সোমনাথকে আমাদের দুর্গে আশ্রয় দেবেন না, অশনিদা?

সোমনাথকে দেব না কেন? কিন্তু ওর সঙ্গের মেয়েটিকে এখানে আনার বিপদ আছে। মেয়েটি যে কী, ভালো না খারাপ, শয়তান না দেবীর অংশ, তা তো এখনও জানি না। আজ রাতে কেবল শোভনই আমার চিন্তা-ভাবনা দখল করে আছে। আজ আমি আর অন্য চিন্তা মাথায় নিতে চাই না। ঠিক সাড়ে পাঁচটা বাজবে আর ফোনের লাইন কেটে দেব আমরা। হালকা কিছু খেয়ে নিয়ে লাইব্রেরি ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে বসব শোভনকে নিয়ে। চাকর-বেয়ারাদের বলে দিয়েছ তো উমা, ওদের বিল্ডিং-এ চলে যেতে?

দেবকান্ত বললেন, সে কী, চাকর-বেয়ারারা সত্যিই আমাদের মহলে থাকবে না?

আমি তো আগেই বলে দিয়েছি সে কথা। উমাকে বলেছি তোমার ঘনশ্যামগড় যেভাবে ঘেরা আছে, পাহারার ব্যবস্থা আছে, তাতে জাগতিক শত্রুর কোনও ভয় আমাদের নেই। আমাদের ভয় অন্য অতি-জাগতিক শত্রুর জন্যে।

টেলিফোন আসতেই অশনিনাথের কথার উত্তর না দিয়ে দেবকান্ত উঠে গেলেন।

অশনিনাথ শিশির আর উমাকে নিয়ে চলে গেলেন লাইব্রেরি-ঘরে। ঘরের চারিদিকে তাকিয়ে অশনিনাথ খুশি হলেন। তারপর তিনি দ্রুত কাজ শুরু করে দিলেন।

ঘরের মাঝখানের বিশাল শয্যাবেদিকে কেন্দ্র করে, সঙ্গে আনা অদ্ভুত ধরনের রঙিন গুঁড়ো দিয়ে একটি পাঁচকোণা বিশাল তারকা আঁকলেন। তারকার মাথায়-মাথায় সরার ওপর রাখলেন নানান রকম সামগ্রী। প্রতিটি সরার মাথায় রইল স্বতোয়ার জল-ভরা ঘট। ঘটের পর মাটির দীর্ঘ পিলসুজে তেল-ভরা বড়-বড় প্রদীপ। প্রদীপের পর কয়েকটি সাংকেতিক চিহ্ন। ঘরের কোণে-কোণে বড়-বড় ধুনুচি-ভরা ধুনো রাখা হল। ধুনোর জ্বালানির জন্য ছোবড়া আর কাঠকয়লা ধূপ-দীপ-ফুল দিয়ে সাজানো হল ভেতরের দেওয়াল। এসব করার পর অশনিনাথ শোভনের কথা জিগ্যেস করলেন। উমা বললেন, তাকে সুস্থ করে, পরিষ্কার পোশাক পরিয়ে শরবত খেতে দেওয়া হয়েছে।

অশনিনাথ বললেন, এবার তাহলে আমরা স্নান সেরে খেয়ে নিই। আর তোমার মেয়ে হাসি?

হাসিকে রানি খাইয়ে-দাইয়ে দেবে, রানি ওপরে নার্সারিতে থাকছে, আর রানির সঙ্গে থাকছে আর দুজন খাস চাকরানি।

অশনিনাথ ভ্রূ কুঞ্চিত করে বললেন, খাস চাকরানি? ক'দ্দিনের পুরোনো?

—বহুদিনের। রানিরই দুই ভাইঝি।

বেশ, তাহলে তারা থাকতে পারে। চলো, স্নান সেরে নিই।

স্নান সেরে খাওয়ার টেবিলে এসে বসল সবাই।

সামান্য আয়োজন, আলুসেদ্ধ, মাখন, গরম রুটি, কলা, ক্ষীর আর ফলের রস।

দেবকান্ত নিচু হয়ে খাচ্ছিলেন। কোনও কথা বলছিলেন না। উমা খানিকক্ষণ তাঁর মুখের গম্ভীরভাব লক্ষ করে বললেন, কী ব্যাপার? এত রাগ-রাগ ভাব কেন?

দ্যুৎ, এইসব নিরামিষ ছাতামাথা কখনও খাওয়া যায়?

উমা একটু অপ্রস্তুত হয়ে অশনিনাথের দিকে তাকিয়ে নিয়ে আবার দেবকান্তকে বললেন, না হয় একদিন অমন একটু নিরামিষ খেলেই—।

আসলে আমি এসব কিচ্ছু বিশ্বাস করি না।

অশনিনাথ চমকে তাকালেন। তাঁর ভ্রূ কুঞ্চিত হল নিমেষের জন্য। তারপর কী যেন গভীরভাবে ভেবে নিলেন তিনি। মুখের রেখাগুলি আবার কোমল হয়ে এল ঈষৎ। হেসে বললেন—দেবকান্ত তখন কে ফোন করছিল তোমায়?

দেবকান্ত চমকে তাকালেন অশনিনাথের দিকে। অশনিনাথ স্থির, পলকহীন দৃষ্টিতে তাকিয়েই রইলেন দেবকান্তর দিকে।

বলো? কে ফোন করেছিল? কী বলেছিল ফোনে?

দেবকান্তর চোখের দৃষ্টি আস্তে-আস্তে স্বাভাবিক হয়ে এল। তিনি বললেন, দুঃখিত অশনিদা। আমার যে মাথার মধ্যে কী হচ্ছিল কী বলব? শারমা ফোন করেছিল আমাকে। ফোনে ওই একই কথা বলছিল, যা উমাকে বলে গেছে। কিন্তু লোকটার গলার স্বর আর বলার ভঙ্গিটা এমন—।

অশনিনাথ বললেন, ওই জন্যেই বলছিলাম উমা, ফোনের লাইনটা কেটে দাও। সারা জগৎ থেকে আজ আমাদের লাইব্রেরি-ঘরটিকে ডিসকানেক্ট করে ফেলতে হবে। সিল করে রাখতে হবে। শারমা কণ্ঠস্বর দিয়েই দেবকান্তকে কতখানি বশীভূত করে ফেলেছে তোমরা লক্ষ করো।

উমা বললেন, আপনি তো অশনিদা ওকে দিব্যি অ্যান্টিডোট দিলেন।

অশনিনাথ বললেন, অর্থাৎ।

অর্থাৎ, আপনি ওর দিকে কীভাবে তাকিয়েছিলেন তা তো স্বচক্ষে দেখলামই আমি।

অশনিনাথ বললেন, ও কিছু না। খাওয়া-দাওয়া শেষ করে আর একপ্রস্থ পোশাক পরিবর্তন করে, চলো আমরা শোভনকে নিয়ে আজকের রাতের মতো লাইব্রেরি-ঘরে ঢুকি।

প্রথমে চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়ালেন অশনিনাথ।

ঘনশ্যামগড় দুর্গে এখন সন্ধ্যা সাতটা।

ঘরের মাঝখানের শয্যায় শোভন শুয়ে আছে। তার কাছে বসে আছে উমা, শিশির আর অশনিনাথ। ঘরের একদিকে জ্বলছে একটি একশো পাওয়ারের আলোর বাল্ব। বলতে গেলে বিশাল ঘরটি ঢেকে আছে আধো আলো-আঁধারিতে। ধুনুচিতে জ্বলছে ধুনো। তার ধোঁয়া পাকিয়ে-পাকিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে ওপরের ভেন্টিলেটার দিয়ে। পাঁচকোণা তারার পাঁচটি কোণে জ্বলছে অকম্প্রশিখা-প্রদীপ। শোভন ক্লান্তি আর আধো ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে যেন এলিয়ে আছে। কিন্তু বোঝা যায় বন্ধুদের মাঝখানে থাকার স্বস্তিটা আবার আস্তে-আস্তে ফিরে আসছে তার ভেতরে। একটি-দুটি কথা বলছে সবাই। সাধারণ কথা। ক্রমশ কথার সংখ্যা কমে আসতে লাগল। শিশির লক্ষ করল, সবাই কেমন যেন বাক্যহারা হয়ে যাচ্ছে। আস্তে-আস্তে বাইরে ঘরে-ফেরা পাখিদের কাকলি কখন যেন টুপটাপ স্তব্ধতায় ডুবে হারিয়ে গেল। গড়ের এই মহল ছেড়ে দূরে চলে গেল চাকর-বেয়ারারা। এমনিই বিশাল দুর্গটি নির্জন। তায় টিলার ওপর দুর্গ আর দুর্গসন্নিহিত বাগান ছাড়া কিছু নেই। পাহাড়ের গায়ে-

গায়ে ছোট-ছোট চৌকি। কেবল পেটাঘড়িতে মাঝে-মাঝে সময় সংকেত। এইমাত্র সাতটা বেজে গেল। চারিদিক বন্ধ থাকায় মনে হচ্ছে যেন কতদূর থেকে ভেসে আসছে ঘড়ির শব্দ।

শিশির কান পেতে শুনতে লাগল। শুনতে-শুনতে মনে হতে লাগল সে যেন নিস্তব্ধতার শব্দ শুনতে আরম্ভ করেছে।

শব্দহীন সেই শব্দ কানের ভেতর দিয়ে আরও গভীরে পৌঁছে অদ্ভুত একটা প্রতিধ্বনি তুলছিল।

বহুদূর থেকে যেন মাঝে-মাঝে ভেসে আসছিল রাত-পাখির ডাক। কখনও-কখনও পেঁচার চিৎকার।

ঘরের মধ্যে হঠাৎ শোভন কেমন থরথর করে কেঁপে উঠল, এলানো অবস্থা থেকে সোজা হয়ে বসে চারিদিকে তাকাতে লাগল সে। মনে হতে লাগল, যেন তার কাছে শিশির, অশনিনাথ, দেবকান্ত, উমা সবাই-ই কেমন অপরিচিত হয়ে গেছে। ক্রমশ বন্ধুত্বের ছোঁয়া, পরিচিতির আলো তার মুখের রেখা থেকে নেমে যেতে লাগল। যেন কেমন বিরুদ্ধ হয়ে উঠল সে। অস্ফুটস্বরে বলল, তোমরা আমায় বন্দি করে রেখেছ কেন? ছেড়ে দাও—যেতে দাও আমাকে!

দেবকান্ত বললেন, কোথায় যাবে তুমি শোভন?

অশনিনাথ ইশারায় বললেন, কোনও কথা বলে লাভ নেই, শুধু ওকে স্পর্শ করে বসে থাকতে হবে সবাইকে।

শিশির চাপা গলায় বলল, অশনিদা, এত যেসব সাবধানতা নিলেন, এতেও তো কিছু হল না। শারমা ঠিক টানছে শোভনকে।

অশনিনাথ বললেন, টানবেই তো। আমি তো তা জানতাম। দ্যাখো, শারমা আমাদের সকলের ওপরেই প্রভাব বিস্তার করছে। তোমায় বলি, আমি জানি লাইব্রেরি-ঘরের বাতাসের, শূন্যতার প্রতিটি 'আয়ন'কে যদি শুদ্ধ করতে পারতাম, তাহলে হয়তো শারমা আর তার দলের শয়তান সাধকেরা ওভাবে তাদের মিলিত আকর্ষণ, সম্মোহনী শক্তি পাঠাতে পারত না। হয়তো প্রতিটি 'আয়ন'কে সেভাবে শুদ্ধ করতে পারিনি। তবে আমাদের মানসিক শক্তি শোভনের চেয়ে অনেক গুণ বেশি বলে আমরা ওই টানের কোনওরকম বোধ পাচ্ছি না।

শোভনের কাছে সরে গিয়ে অশনিনাথ তাকে দু-হাতে প্রায় জড়িয়ে ধরে কানের কাছে সম্ভবত চণ্ডী থেকে কোনও শ্লোক আবৃত্তি করতে লাগলেন।

আস্তে-আস্তে শোভনের অস্থিরতা খানিকটা কমে এল।

তারপর আবার নিস্তব্ধতা। গলা-চাপা নিশ্চুপ সময়। শিশির হাতঘড়ির দিকে তাকাল। মনে হচ্ছিল যেন অনেকখানি রাত হয়ে গেছে। ঘড়িতে মাত্র ন'টা।

স্তব্ধতা যেন ক্রমশ গলা-চাপা হয়ে উঠতে লাগল। শিশির দেখল, হাঁটুতে থুতনি রেখে, এক হাতে শোভনকে ছুঁয়ে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন উমা। অশনিনাথ পদ্মাসন হয়ে স্থির বসে আছেন। তিনিও একহাতে ছুঁয়ে রেখেছেন শোভনকে। দেবকান্ত কেমন যেন অস্থির আড়মোড়া ভাঙছেন। ভ্রূ কুঞ্চিত করে অস্বাচ্ছন্দ্য প্রকাশ করছেন মাঝে-মাঝে। খানিক পরে দেবকান্ত বললেন, জানেন অশনিদা, এখন মনে হচ্ছে সঙ্গে বেশ একটা বইটই থাকলে ভালো হত।

সে কী?

চমকে উঠলেন অশনিনাথ।

আজ বইও চলবে না। আজ কেবল মনস্থির করে শুভচিন্তা, শুভভাবনা আর শোভন যাতে শয়তানের কুদৃষ্টি থেকে মুক্তি পায় তার জন্যে প্রার্থনা জানানো।

না, না, বই ছাড়া আমি থাকতে পারছি না। আমার গলা চেপে আসছে, ভয়ংকর অস্বস্তি হচ্ছে।

অশনিনাথ একটু গভীর দৃষ্টিতে তাকালেন দেবকান্তর দিকে। দেবকান্তর মুখের রেখা কঠিন

হয়ে উঠছে। চারদিকে তাকাচ্ছে সে, যেন সবাই তার পরম শত্রু।

অশনিনাথ ইশারা করে উমাকে বললেন, দেবকান্তকে ছুঁয়ে থাকতে।

উমা তাড়াতাড়ি দেবকান্তর গায়ে হাত ছুঁইয়ে হেসে বলল, কী, তুমি এত অস্থির-অস্থির করছ কেন? কী এমন অস্থির হওয়ার কারণ ঘটেছে?

দেবকান্ত হঠাৎ কেমন যেন রেগে গেলেন। রাগে ফুলতে-ফুলতে তিনি বললেন, কী যে লাগিয়েছ তোমরা সবাই মিলে। সারাদিন নিরামিষ খাইয়ে রাখলে। তার ওপর এইরকম একটা বন্ধ ঘরে সন্ধে থেকে বন্দি। আমার ইচ্ছে করছে এখুনি সব ভেঙেচুরে, ছিঁড়ে-খুঁড়ে পালিয়ে যাই।

অশনিনাথ তাড়াতাড়ি বোতলে রাখা বিশেষভাবে শোধনকরা জল ছোট গেলাসে ঢেলে উমার হাতে দিলেন। উমা জলটা দেবকান্তকে প্রায় জোর করে খাইয়ে দিয়ে বললেন পিপাসা পেয়েছিল খুব, তাই না? জানেন অশনিদা, আজকাল ওর একটু-একটু প্রেসারের ভাব দেখা দিচ্ছে।

অশনিনাথ বললেন, তাই নাকি দেবকান্ত?

শিশির অবাক ভয়ে দেখল, দেবকান্তর মুখ থেকে বিরক্তিব রেখাগুলি সব মুছে গেছে। মুখেব ভাবটি আবার সমাহিত, শান্ত।

এবার সবাই যেন আবার মনে-মনে একই সূত্রে গাঁথা হয়ে গেল। আবার যেন পুবোনো মনের টানগুলো ফিরে এল।

ঘড়ির টিক-টিক ক্রমশ এগোচ্ছে। দূরে পেটাঘড়িতে রাত বাবোটা বাজল।

হঠাৎ মনে হল ঘরের আলো ঈষৎ কমে যাচ্ছে। যেন কাবেন্ট-এর ইনটেনসিটিটা আস্তে আস্তে ফল করছে। লাইট ফিউজ হয়ে যাওয়াব মুখে।

এ লক্ষণ শিশির আর অশনিনাথের দিব্যি চেনা। হঠাৎ বাইরের ঘেবা বাবান্দাব নিস্তব্ধতা ভেঙে উঠে এল জুতোর মশমশ শব্দ। লাইব্রেরি ঘরেব দরজাব ঠিক সামনে এসে থামল শব্দটা। পরিষ্কার শোনা গেল সোমনাথেব গলা।

দেবকান্ত, দেবকান্ত, উমা, উমা, দবজা খোলো। আমাব ভীষণ বিপদ, ভেতরে ঢুকতে দাও—ঢুকতে দাও আমাকে।

চমকে উঠল শিশির। উঠে দাঁড়াল সে।

অশনিনাথ বললেন, কী হল শিশির, উঠে দাঁড়ালে কেন?

শিশিরের চোখের সামনে তখন কেবল ভাসছে বাইরের গাঢ় অন্ধকারের একটা ভয়াবহ ছবি, যেন এক অজানা আতঙ্ক এগিয়ে আসছে নীচের পাহাড় বেয়ে, সোমনাথের পিছন-পিছন। প্রায় আক্রান্ত অবস্থায় সোমনাথ দাঁড়িয়ে দরজা ঠেলছে। সোমনাথকে বাঁচাতেই হবে। সে বলল, দরজা খুলে দিই অশনিদা, দেখছেন না সোমনাথের বিপদ।

ও সোমনাথ নয়।

স্পষ্ট শুনছি সোমনাথ ডাকছে!

বাইরে থেকে দরজায় করাঘাত উত্তাল হয়ে উঠছিল। সোমনাথ পাগলের মতো আকুল হয়ে ডেকে যাচ্ছে—।

খোলো, দরজা খোলো উমা, দরজা খোলো দেবকান্ত, খোলো—।

এবার শিশিরের সঙ্গে দেবকান্তও উঠে দাঁড়ালেন।

অশনিনাথ দেখলেন, উমাও কেমন যেন ছটফট করছে। অশনিনাথ এবার চেঁচিয়ে উঠলেন,—আচ্ছা শিশির, দেবকান্ত, তোমরা কেবল গলা শুনেই বুঝে ফেলছ বাইরে সত্যিই সোমনাথ দাঁড়িয়ে আছে? সোমনাথ যদি সত্যিই বাইরে দাঁড়িয়ে থাকত, তাহলে সে সবার আগে আমাকে ডাকত। তা ছাড়া, সে একা বিপদে পড়ে ড্রিমল্যান্ড হোটেল থেকে পালিয়ে আসবে, এমন ধারণা আমার নয়। সে ভীরু নয়। সে ঠিক চন্দ্রাকে নিয়েই আসত। তোমরা একটু যুক্তি দিয়ে কথাটা ভাবছ না

কেন?

শিশির আচ্ছন্নের মতো অশনিনাথের দিকে তাকাল। আস্তে-আস্তে তার মাথার ভেতর যুক্তি ফিবে আসতে লাগল। দেবকান্তও কিছুটা শান্ত হল। শিশির আস্তে শোভনের পাশে বসে পড়ল। ঘরের আলোয় আবার ক্রমশ উজ্জ্বলতা ফিরে আসতে লাগল। বাইরে কণ্ঠস্বর ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে উঠতে লাগল। মনে হল, সোমনাথ যেন ক্রমশ-ক্রমশ সরে-সরে দূরে চলে যাচ্ছে। আস্তে-আস্তে চারিদিক আবার নিস্তব্ধ হয়ে গেল। ঘরের একটি মাত্র আলোর বাল্‌ব ফিরে এল নিজস্ব উজ্জ্বলতায়।

অশনিনাথ শান্ত হলেন কিছুটা। তিনি হেসে বললেন, উমা, দেবকান্ত, বুঝতে পারছি কী ভীষণ বিপদের মধ্যে আমরা আছি। এই বিপদে তোমাদের সাহায্য যে কত কাজে লাগছে, তা বলে বোঝানো সম্ভবপর নয়।

হঠাৎ ঘরের আলো আবার কেমন যেন ম্লান হয়ে আসতে লাগল। অশনিনাথ আক্রমণ হওয়ার আগেই তাড়াতাড়ি পঞ্চ তারকার বেষ্টনী থেকে বেরিয়ে গিয়ে ধুনুচির নিভন্ত আগুনে দিলেন বড়-বড় কাঠকয়লা। তার ওপর ফেলে দিলেন আঁজলা আঁজলা ধুনো। দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠল আগুন। কাঠকয়লাগুলো জ্বলে লাল টকটকে হয়ে উঠল। গন-গন করতে লাগল আগুন, কিন্তু কী আশ্চর্য বন্ধ ঘরের মধ্যে ধুনুচির স্তূপাকার কাঠকয়লাব গনগনে উত্তাপের আঁচ পেরিযে ঘবের মধ্যে কেমন যেন একটা অতি প্রাকৃত ঠান্ডা নামতে লাগল। মনে হতে লাগল ঠান্ডা থলথলে জেলির মতো একটা বস্তু জমে উঠছে মেঝের ওপর। আস্তে-আস্তে সেই জোলো ঠান্ডা যেন চেটে নিতে লাগল ধুনুচিব আগুনকে। আগুন মরতে-মবতে, কমতে-কমতে, বিদ্যুতের বাল্‌বেব সঙ্গে তাল রেখে একেবাবেই যেন মিলিযে গেল। যেতেই ঘবেব কোণের দিকেব একটা বন্ধ দরজা যেন খুলে গেল।

উমা চমকে উঠল ঃ অশনিদা, দবজাটা খুলল কী কবে?

অশনিদা চমকে তাকিযে দেখলেন, দবজা খুলে ঢুকছে ছোট্ট হাসি। হাসিব পরনে রাত-পোশাক। সে উমার দিকে দু-হাত বাড়িয়ে দিযেছে।

উমা লাফিয়ে উঠলেন ঃ হাসি, হাসি নীচে নেমে এল কী করে? নীচে আসার সিঁড়ির দরজাটা তো আমি নিজে বন্ধ করে এসেছি—হাসি,—হাসি, আয়, ওখানে দাঁড়াসনি, এখানে আমার কোলে আয়!

কিন্তু সেই গাঢ় অন্ধকারে হাসি একটা কাচ-কাচ নাইটড্রেস পরে কান্নার ভঙ্গিতে কেবলই হাত বাড়িয়ে যাচ্ছে।

উমা পাগলের মতো পঞ্চতারা থেকে বেরোতে চেষ্টা করতে লাগলেন। কী আশ্চর্য! দেবকান্ত কিন্তু এতটুকুও বিচলিত হলেন না। তিনি হাসির দিকে কিছুতেই যেতে দিলেন না উমাকে। বললেন, উমা, উমা, পাগলামি করো না, স্থির হও। একটু স্থির হও।

হঠাৎ দেখা গেল, ঘরের যে প্রান্তে হাসি দাঁড়িয়ে আছে তার আর একপ্রান্তে একটি গোল ছাইরঙের কোমল বস্তুপিণ্ড তৈরি হয়েছে। পিণ্ডটি থেকে ক্রমশ দুর্গন্ধ বেরোতে লাগল। হঠাৎ দেখা গেল পিণ্ডটি ঘূর্ণিপাক খেতে-খেতে ক্রমশ আকারে বিরাট হয়ে উঠছে। ক্রমশ পিণ্ডটি একটা নির্দিষ্ট আকার নিতে লাগল। বিরাট উঁচু, হিংস্র একটা রোমশ বেড়াল হয়ে উঠল সেটা। ছাইকালো অতীন্দ্রিয় সেই বেড়ালের চোখ দুটিতে বেগুনি-সবুজ অঙ্গার জ্বলছিল যেন। তার পায়ের নখে চমকাচ্ছিল ইস্পাতের কাঠিন্য। আস্তে-আস্তে সেই অতিকায় বেড়াল এগোতে লাগল হাসিকে তাক করে। হাসি যেন তাকে দেখে আরও শিউরে, আরও গুটিয়ে দু-হাত মেলে উমাকে ইশারা করতে লাগল। উমা ছুটে বেরিয়ে যাবেনই—দেবকান্ত আর শিশির প্রাণপণে ধরে রইলেন তাঁকে। অশনিনাথ কঠিনকণ্ঠে বললেন, ছিঃ উমা, হাসির একটা মিথ্যে মূর্তি দেখে তুমি দুর্বল হয়ে পড়লে! ও মূর্তি তো হাসির নয়। তোমার খেয়াল নেই হাসি ওই দরজা দিয়ে আসতেই পারে না? দরজা তো সিল করা। বন্ধ।

দ্বিতীয়ত, আমাদের দরজাও তো খোলা নেই। তৃতীয়ত, ওই মূর্তি কি সত্যিই হাসির? হাসি হলে তোমাকে ডাকত না। তোমার কাছে ছুটে আসত। হাসি হলে কেবল হাত বাড়িয়ে দিত না, মা মা করে ডাকত, হাসি হলে—ভালো করে লক্ষ করে দ্যাখো, তার ঠোঁট অমনি নীল, নিষ্ঠুরের মতো হত না। চোখে জ্বলত না ওইরকম ভয়ংকর সবুজ আলো। ও হাসি নয়—তোমাকে পঞ্চতারা থেকে বের করে এনে শারমার দলে শামিল করবার জন্যে ওই ভয়ংকর আয়োজন। তুমি স্থির হয়ে বোসো। এই চরণামৃতটুকু খাও। তারপর ভালো করে লক্ষ করতে থাকো।

উমা তাড়াতাড়ি চরণামৃতটুকু খেলেন। তারপর একহাতে দেবকান্ত এবং একহাতে শিশিরকে ধরে স্থির হয়ে বসলেন। তাঁর চোখের সামনে সেই বিরাট বেড়াল থাবা বাড়িয়ে আস্তে-আস্তে হাসিকে ধরল। তারপর দুটো মূর্তি ক্রমশ পরিণত হতে লাগল গোল একটা বিরাট বস্তুপিণ্ডে। বস্তুপিণ্ডটা আস্তে-আস্তে ক্ষয়ে ছোট হতে লাগল ক্রমশ। তারপর তিলমাত্র হয়ে মিলিয়ে গেল।

খানিকক্ষণ গাঢ় অন্ধকার। অন্ধকাবের মধ্যে টুকটাক আবার জ্বলে উঠল আগুনের ফুলকি। কাঠকয়লাগুলো একটু-একটু করে জ্বলে-জ্বলে লাল হয়ে উঠল আবার। আলোর বাল্বটাও উঠল জ্বলে।

অশনিনাথ বললেন, তাকিয়ে দ্যাখো উমা, হাসি যে দরজা খুলে ঢুকেছিল সে দরজা বন্ধই রয়েছে। হাসি আসলে নীচে আসেইনি।

উমার মুখ সাদা হয়ে গিয়েছিল আতঙ্কে। উমা বলল, অশনিদা এ কী ভীষণ ব্যাপার। এ আতঙ্কের কল্পনাই তো আমার মধ্যে ছিল না। কী ঘটে গেল বলুন তো?

ইতিমধ্যে আবার আলোর বাল্ব তার নিজস্ব জ্যোতি হাবাতে আরম্ভ করেছে। আস্তে-আস্তে বাল্ব থেকে সব আলো মুছে গিযে জ্বলতে লাগল কেবল তারটুকু। সেই অন্ধকারের মধ্যে বসে ওবা শুনল বাইরের নিস্তব্ধতা ঝোড়ো হাওয়ায় খানখান হয়ে ভেঙে যাচ্ছে। পেটাঘড়িতে একটা বাজার ঘণ্টা যেন সেই সাইক্লোনের শব্দ ভেদ করে বেজে গেল।

অশনিনাথ চাপা গলায় বললেন, এবাব প্রচণ্ড বিপদ, প্রচণ্ড বিপদ আসছে কিন্তু। এসো, মনোবল তৈরি করো। সবাই মিলে চেষ্টা করো। এ বিপদকে ভয়ংকর শক্তি দিয়ে রুখতে হবেই। রুখতেই হবে!

এক অন্ধকার ঘরে, পঞ্চতারার গণ্ডির মধ্যে বসে পাঁচজন মানুষ যেন সারা পৃথিবীর পরিচিত নিয়মেব গণ্ডির বাইরে চলে গেছে। অশনিনাথের কথায় হাতে-হাত বেঁধে-বেঁধে সবাই বসে গেলেন। এমন কি অর্ধশায়িত শোভনও। বাইরের প্রবল সাইক্লোনে যেন সারা লাইব্রেরি-ঘরটা কাগজের ঠোঙার মতো থরথর করে কাঁপতে লাগল। অশনিনাথ বললেন, শারমা এবার যাকে পাঠাচ্ছে তাকে সে গড়েছে একটা আত্মার সম্পূর্ণ শক্তিকে উৎসর্গ করে। এই আক্রমণ ঠেকানো কিন্তু সত্যিই আমাদের পক্ষে ভযানক কষ্টকর হযে পড়বে।

অশনিনাথের কথা শেষ হতে-না-হতেই ঝড়ের বেগ এবং হাওয়ার শব্দ এমন ভয়ানক বেড়ে উঠল যে লাইব্রেরি-ঘরের মুখ্য দরজাটা হাট হয়ে খুলে গেল। স্পষ্ট দেখা গেল খানিকটা বেগুনি ধরনের আলোর ঢেউ-এর মাঝখানে একটি ছায়ামূর্তি দুলতে-দুলতে ভেতরে ঢুকল, তারপর আছড়ে পড়ল মাটিতে। দরজাটা সঙ্গে-সঙ্গে আবার বন্ধ হয়ে গেল।

অশনিনাথ চাপা গলায় বললেন, শিশির এবার কিন্তু দরজা সত্যিই খুলেছে—

ঘরের মধ্যে এবার প্রবল শৈত্য প্রবাহ বইতে লাগল যেন। নিঃসীম অন্ধকার চারিদিক গ্রাস করে নিচ্ছে। এত চাপ-চাপ অন্ধকার শিশির এর আগে কখনও দেখেনি। সেই ঠান্ডাহিম অন্ধকারে ওরা পাঁচজন যেন জমে যেতে লাগল। পরস্পরের কাছাকাছি সরে এল সবাই। অশনিনাথ চাপা গলায় বললেন, শোভনকে সবাই মিলে ঘিরে ধরো। ছেড়ো না কিছুতেই।

সবাই যেন আঁকড়ে ধরল শোভনকে। হাতগুলি যখন পরস্পরের হাতে ঠেকতে লাগল তখন শিশিরের মনে হল থরথর করে কাঁপছে হাতগুলো। যেন পৃথিবীর শেষকণা তাপটুকুও নিংড়ে নিয়েছে

কেউ। চতুর্দিকে ক্রমশ ছড়িয়ে পড়তে লাগল এমনই মর্মান্তিক ঠান্ডা।

সেই ঠান্ডার মধ্যে ঘরের কোণে, যেখানে সেই আবছা ছায়ামূর্তিটা আছড়ে পড়েছিল, সেখানে দেখা গেল আবছায়া একটি বিন্দু। বিন্দুটি লাফাচ্ছে যেন। লাফাতে-লাফাতে ক্রমশ বড় হতে থাকল সেটি, খুব দ্রুত চেহারা পালটাতে-পালটাতে এক বিরাটাকৃতি অশ্বে পরিণত হল। সেই অশ্বের চেহারা কিন্তু ঘোড়ার মতো সৌন্দর্য কিংবা বীর্যমণ্ডিত নয়। কেমন যেন অদ্ভুত। অশ্বটি গড়ে ওঠা মাত্র সারা ঘর ভরে গেল আঁশটে একটা গন্ধে। মনে হল কে যেন অশ্বের পিঠে সওয়ার হয়ে আছে। সে অদৃশ্য, কিন্তু সে আছে। রেকাবে তার টান করা অদৃশ্য পা। লাগামও তার হাতে টান করে ধরা। একটানে ঘোড়া লাফিয়ে উঠল ওপরে। শূন্যে। তার পায়ের ক্ষুরগুলো শানানো ব্লেডের মতো ঝকঝক করছে। হাঁ করলে বড়-বড় হলদে দাঁত ঝলসে উঠছে। নাক দিয়ে বেরোচ্ছে নীল আগুন। চোখ দুটো ক্রোধে, ঘৃণায় খয়েরি আগুন ছড়াচ্ছে। ঘোড়াটি চক্কর শুরু করল। মাথার ওপর কড়িকাঠের চারিদিকে গোল হয়ে ঘুরতে লাগল ঘোড়াটি। সঙ্গে-সঙ্গে ছিটকে উঠল শোভন।

আমাকে ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও আমাকে—আমাকে ডাকছে—আমাকে নিতে এসেছে—ওরা আমাকে নিয়ে যাবে—।

অশনিনাথ শোভনকে দু-হাতে জড়িয়ে ধরে বললেন, না, শোভন না, তোমাকে আমরা সবাই আটকে রাখব।

ও মৃত্যু, ও মৃত্যু—সাক্ষাৎ মৃত্যু—ও আমায় ডাকছে—আমি ওর মুখ দেখতে পাচ্ছি—ওই আমার সব। ও-ই আমার সবকিছুর নিয়ামক—আমি যাই—আমি যাচ্ছি—।

উমা বললেন, শোভন, শোভন, লক্ষ্মীটি, আমার কথা শুনুন ভাই—শুনুন—।

শোভনের গায়ে যেন আসুরিক শক্তি। কিছু যেন শোভনকে মারাত্মক টানছে। শোভনের দেহটা পঞ্চতারার মধ্যে থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল একেবারে তারকার প্রান্তে। তার হাতের ধাক্কা খেয়ে একটি ঘট উলটে পড়ল। স্বতোয়ার পূত সলিল উপচে পড়ল। অশনিনাথ তাড়াতাড়ি দেবকান্তর হাতে শোভনকে তুলে দিয়ে উলটে পড়া ঘটটি নতুন করে ভর্তি করে দিলেন। ব্যর্থ চেষ্টা করলেন প্রদীপ জ্বালাতে। দেশলাই জ্বলল না। ইতিমধ্যে সেই মৃত্যু ঘোড়ার বেগ আরও বেড়েছে। গরম ভাপ এসে লাগছে সকলের গায়ে। গা জ্বলছে সকলের। শোভনের মুখ দিয়ে গাঁজলা বেরোচ্ছে। তার উচ্চারণ বিকৃত হয়ে যাচ্ছে। চারজন মিলে তাকে ধরে রাখতে পারছিল না। শেষপর্যন্ত সেই ভীষণ ঘোড়া নেমে এল অনেক নীচে। মনে হল তার ক্ষুরের আঘাতে মাথা ফেটে যাবে সবাইয়ের। সবাই মিলে শেষ পর্যন্ত শোভনের ওপর উপুড় হয়ে পড়ল।

অশনিনাথ পাগলের মতো চিৎকার করে অসতো মা সদ্গময়ো মন্ত্রটি উচ্চারণ করতে লাগলেন। সেই ভীষণ অশ্ব দ্রুত নেমে আসতে লাগল ছোঁ মারার ভঙ্গিতে—এক পলকের জন্য তখনই তারা মৃত্যুর মুখ দেখতে পেল। জ্ঞান হারাবার আগে সেই মুখ দেখে চমকে উঠলেন অশনিনাথ। চেনা মুখ। শিশিরও ভাবল এ মুখ কোথায় যেন দেখেছে—যেন চন্দ্রা মেয়েটির মুখের সঙ্গে একটা সাদৃশ্য আছে—।

নেমে আসা ঘোড়ার ভয়ংকর হ্রেষাধ্বনির পর আর কোনও সাড়াশব্দ উঠল না। সমস্ত ঘরে দুটি অচেতন দেহের ওপর নেমে এল কবরের স্তব্ধতা।

সোমনাথের যখন চেতনা হল তখন ঘরের আলো ধু-ধু করে জ্বলছে। দরজা-জানলা সব হাট করে খোলা।

চমকে উঠে দাঁড়িয়ে চারিদিকে তাকিয়ে সোমনাথ বুঝতে পারল চন্দ্রা কটেজে নেই। তাড়াতাড়ি ছুটে বেরোল। ভয়, হতাশা, অনুতাপ তার মধ্যে তখন পাগলের মতো পাক খেতে আরম্ভ করেছে।

খানিকটা চিন্তার পর সোমনাথ ড্রিমল্যান্ড হোটেলের মালিককে জাগিয়ে একটি গাড়ি ও কুশলী অভিজ্ঞ ড্রাইভার জোগাড় করল। আর কোনও পথ নেই। এবার তাকে ঘনশ্যামগড় দুর্গে যেতেই হবে। অশনিনাথ তার যত বড় বন্ধুই হোক না কেন, চন্দ্রার যদি ভালো-মন্দ কিছু হয় তাহলে তাঁকে জবাবদিহি করতেই হবে।

মধ্যরাত্রিব উঁচু-নিচু জঙ্গলের পথ অতিক্রম করে ঘনশ্যামগড়ের দিকে চলল তার ভাড়া করা গাড়িটি। এক ঘণ্টার মধ্যেই ঘনশ্যামগড়ে পৌঁছে যাওয়ার কথা। কিন্তু গাড়িটা যেন একই রাস্তায় পাক খেয়ে-খেয়ে ঘুরছে বলে মনে হতে লাগল তার। ঘড়িতে এক ঘণ্টা কখন অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। সোমনাথের রাগ ক্রমশ বাড়তে লাগল। এই কুশলী অভিজ্ঞ ড্রাইভার? লোকটা কি পাহাড়ি পথটথ সত্যিই জানে। বেরোবার সময় তো বলল সব ওর জানা আছে। নাকি নেশাটেশা করেছে লোকটা? হোটেলের ম্যানেজারের ওপরও রাগ হতে লাগল সোমনাথের। জেনেশুনে এমন একটা ড্রাইভারের হাতে তুলে দিল সোমনাথকে?

অন্ধকার পাহাড়ি রাস্তায় শৃগালের কান্না, পেঁচার আর্তস্বর শুনতে-শুনতে সোমনাথের কেমন ঝিম আসতে লাগল। হঠাৎ সমস্ত ঝিমকে বিদ্যুৎচমকের মতো চমকে দিয়ে তার সামনে দিয়ে ছুটে ওপর দিকে উঠে বাতাসে ফেটে পড়ল একটা ছাই বর্ণের অতিকায় উড়ুক্কু প্রাণী। ঠিক যেন অলৌকিক ঘোড়ার মতো।

সঙ্গে-সঙ্গে কেটে গেল সব ঘুম। সে চমকে তাকাল চারিদিকে। সামনের সিট থেকে ঝিমন্ত ড্রাইভার সোজা হয়ে বসে হেডলাইটেব আলোর কোনও নিশানা দেখে চমকে উঠে পরিষ্কার গলায় বলল,—ছি-ছি, আমি এ কী করছিলাম স্যার এতক্ষণ। এ তো ভুল রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছি আমরা। ইস, রাত শেষ হয়ে এল। চলুন, তড়িঘড়ি আপনাকে ঘনশ্যামগড়ে নিয়ে যাই।

এবার গাড়ি ছুটল নির্দিষ্ট পথে স-বেগে। ঘনশ্যামগড় দুর্গেব প্রথম চৌকির কাছাকাছি গাড়ি এসে পৌঁছতেই গাড়ির সামনে কী যেন একটা পড়তে ব্রেক কষল ড্রাইভার।

একটা মানুষ পড়ে আছে স্যার।

ধক করে উঠল সোমনাথের বুকটা। চন্দ্রা নয় তো?

সে গাড়ি থামিয়ে তাড়াতাড়ি নামল। হেডলাইটের আলোর বন্যায় পরিষ্কার দেখা গেল লোকটাকে। শারমা। শারমা উপুড় হয়ে পড়ে আছে। ছিন্নভিন্ন তার শরীর। তাকে হত্যা করা হয়েছে।

সোমনাথ গাড়িতে উঠে ড্রাইভারকে বলল, চলুন, জলদি ঘনশ্যামগড়।

প্রথম চৌকিতেই বাধা পেল সোমনাথ। পাহারাদার জানাল, ওপরে যেতে মানা আছে। রাত ভোর না হলে, আদেশ না পেলে, ছাড়তে পারবে না সোমনাথকে। সোমনাথ হতাশ হয়ে গাড়ির ভেতরেই চুপচাপ বসে রইল।

ভোরের পাখির ডাকে প্রথম ঘুম ভাঙল উমার। উঠে দেখল শোভন ঘুমোচ্ছে। নিশ্চিন্ত বোধ করল উমা। দেবকান্ত, অশনিনাথ আর শিশিরও ঘুমোচ্ছে। উঠে বসে উমা দেখল দূরে ঘরের কোণে একটি মানুষ পড়ে আছে। সে কী করবে স্থির করতে না পেরে অশনিনাথকে ডাকল।

অশনিনাথ উঠে কতকগুলি প্রক্রিয়া সেরে উমাকে বললেন, চলো উমা, এবার আমরা পঞ্চতারার আঁটান থেকে বেরোতে পারি।

দুজনে এসে দেখলেন একটি নারীদেহ উপুড় হয়ে পড়ে আছে। সে চন্দ্রা। অশনিনাথ নাড়ি ধরে দেখলেন, কোনও স্পন্দন নেই। চন্দ্রা মৃত। আত্মগ্লানিতে ভরে উঠল অশনিনাথের মন। সোমনাথকে আশা দিয়েও তিনি আশা পূরণ করতে পারলেন না। চন্দ্রা শেষ পর্যন্ত মারা গেলই। যাক, তবু মন্দের ভালো শোভন বেঁচেছে। কাল রাত্রে মৃত্যু স্বয়ং এসেছিল শোভনকে নিতে। মৃত্যুকে

জয় করেছে শোভন। মৃত্যুকে শারমা তৈরি করেছিল চন্দ্রার আত্মার সহায়তা নিয়ে। চন্দ্রার শরীর থেকে উপাদান সংগ্রহ করে গড়ে তুলেছিল মৃত্যুর পৈশাচিক আকৃতি। সেই মৃত্যু যখন শোভনকে অধিকার করতে পারল না তখন আর কাউকে না পেয়ে ফিরে গেল চন্দ্রারই কাছে। চন্দ্রাকেই করল নিহত। শোভন সুস্থ হয়ে উঠে বসল বিছানায়। শিশিব আর দেবকান্তও। ভয়ংকর রাত্রি কেটে গেছে। এখন শান্তি, স্বস্তি। উমা, শোভন, শিশির আর দেবকান্তকে বাইরে স্নান-খাওয়া করতে পাঠিয়ে দিয়ে অশনিনাথ চন্দ্রার দেহটি তুলে পঞ্চতারার মাঝখানে শোয়ালেন। চন্দ্রা যেন ঘুমোচ্ছে। তার চারপাশে জ্বেলে দিলেন সুগন্ধী দীপ। তাঁর দু-চোখ জলে ভরে এল। আহা, মেয়েটি আরও বেশি কিছুদিন বাঁচতে চেয়েছিল। চন্দ্রার প্রাণহীন দেহের সামনে অশনিনাথ স্থির হয়ে বসে আছেন, এমনসময় বিস্রস্ত সোমনাথকে নিয়ে ঢুকল উমা। দেবকান্ত, শিশির আর শোভন পিছনে দাঁড়িয়ে।

সোমনাথ চিৎকার করে উঠল বুক ফাটিয়ে ঃ অশনিদা, আপনি চন্দ্রাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিলেন—তাকে বাঁচানোর চেষ্টাও করলেন না একটুও। এখন সারাজীবন আমি কেবল নিজেকেই দায়ী করে যাব চন্দ্রার মৃত্যুর জন্য। আমি যে তাকে বড় মুখ করে বলেছিলাম—বাঁচাব, বাঁচাব...

সোমনাথ ছুটে গিয়ে চন্দ্রার বুকে মাথা রেখে লুটিয়ে-লুটিয়ে কাঁদতে লাগল। হঠাৎ শিশির দেখল, চন্দ্রার চোখের পল্লব থরথর করে কাঁপছে। সে কাছে এগিয়ে গেল ভালো করে দেখবার জন্য। ধূপের মৃদু ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে-পাকিয়ে উঠে আবছা করে দিচ্ছিল চন্দ্রার চারিদিক। না, সত্যিই চন্দ্রা চোখ মেলছে। তার ঠোঁট নড়ছে। সে যেন কী বলতে চাইছে।

তাড়াতাড়ি ছুটে এলেন অশনিনাথ। চন্দ্রাকে ভালো করে পরীক্ষা করলেন তিনি সোমনাথকে সরিয়ে দিয়ে। আস্তে-আস্তে চন্দ্রার দেহে প্রাণস্পন্দন ফিরে আসছে।

কিন্তু তা কী করে হয়?—তবে সেই ভয়ংকর মৃত্যু কার দিকে ছুটে গেল?

অস্ফুটকণ্ঠে অশনিনাথ বললেন, কে, কে মরল সেই মৃত্যু-পিশাচের আক্রমণে?

সোমনাথ চমকে উঠে বলল, রাস্তায় শারমার মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখেছি, ঘনশ্যামগড়ের প্রথম চৌকির কাছে।

অশনিনাথের মুখে আনন্দ ঝলসে উঠল।

—বুঝেছি। অল্পক্ষণের জন্য চন্দ্রার শরীরে প্রাণ ছিলই না বলতে গেলে। নাড়ি পাইনি তার ঘোর দুর্বলতার জন্যে। মৃত্যু তাহলে তার স্রষ্টাকেই চিরতরে শেষ করে দিয়ে গেছে।

রাতে খাওয়ার টেবিলে সেদিন বিপুল আয়োজন।

উমা আর দেবকান্ত সাধ মিটিয়ে আয়োজন করেছে। খেতে-খেতে হাসির খিলখিল হাসি শুনছিলেন অশনিনাথ। আজ সে তাঁর সুপারিশে খাওয়ার টেবিলে একটি আসন পেয়েছে।

শোভন বলল, অশনিদা, আপনি আজ সকালে কী একটি কথা বলতে-বলতে থেমে গিয়েছিলেন। আপনি বলছিলেন, শারমা নাকি আমাদের পুরোনো শত্রু। সে-কথা আপনি জানলেন কী করে?

অশনিনাথ বললেন, অনেক পুরোনো কুলজি ঘেঁটেছি শারমার ইতিহাস বের করতে। তোমাদের যে তান্ত্রিক গুরুবংশ ছিল, সে-বংশের একজন আসামের দুর্ভেদ্য অঞ্চলে যায় তন্ত্রসাধনা করতে। সেখানে তার যে ভৈরবী ছিল তার সন্তান হয় একটি। ভৈরবীর পদবি ছিল শারমা। তাই তোমরা যদিও ভেবেছিলে যে তোমাদের গুরুবংশ নির্বংশ হয়েছে, আসলে শারমারা পুরুষ-পরম্পরায় থেকে গিয়েছিল। শারমাদের তান্ত্রিক-সাধনা তিব্বতি ভাবধারায়। সেই ভাবধারাকে প্রবল করে তুলেছে শারমার অর্থ, বিদেশি শিক্ষা, অভিজ্ঞতা আর শাঁসালো মক্কেলরা। শারমা যখন জানতে পারল তোমার দাদুর গুলিতে তার শাখাবংশ নির্বংশ হয়েছে তখন রাগে, ক্রোধে, টাকার লোভে

ও বন্ধু সেজে গিয়ে তোমাদের বংশের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে লাগল। আসলে এটা শারমার পুরোনো রাগ।

উমা বলল, বাঃ, নতুন তথ্য জানা হল দেখছি একটি!

দেবকান্ত রাও বললেন, আর একটি নতুন খবর সোমনাথের কাছ থেকে শুনতে চাই—

সোমনাথ হেসে বললেন, চন্দ্রা হ্যাঁ-না বললে কী করে নতুন খবর দিই—চন্দ্রা, তোমার হাতের রেখা কী বলে?

চন্দ্রা সলজ্জ মুখে বলল, হাতের রেখা তো যা বলে তা সত্যিই বলে। আমি অল্পক্ষণের জন্যে হলেও প্রায় মরেই তো গিয়েছিলাম।

অশনিনাথ হেসে বললেন, প্রায় কেন? সত্যি-সত্যিই। মৃত্যুর শরীর তৈরি করতে গিয়ে তোমার শরীর থেকে প্রায় সব জীবনীশক্তিই নিংড়ে নিয়েছিল শারমা। ওর দৃষ্টি ছিল তোমার ওপর, ওর পূর্বপুরুষদের দৃষ্টি ছিল তোমার মা-দিদিমার ওপর। যাক, সব যখন মিটেই গেছে তখন তুমি মতটা দিয়েই দাও বাপু। সোমনাথকে চটপট বিয়ে করে ফেল।

দেবকান্ত রাও বললেন, আপনারা কি ভাবছেন এতেই সব নতুন খবর শেষ হয়ে গেল। আমার ঝুলিতে আর একটি নতুন খবর আছে যা শুনলে একজন এখুনি খাওয়া ছেড়ে লাফিয়ে উঠবে। রীতিমতো বুদ্ধি খরচ করে ব্যাপারটা ঘটাতে হয়েছে আমাকে।

—কে? কে? কে লাফিয়ে উঠবে?

সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল সবাই। সবারই চোখে সহাস্য কৌতূহল।

দেবকান্ত হাঁক দিলেন, কই? সুরভি, বেরিয়ে এসো তো?

অ্যান্টিরুমের লাল ভেলভেটের পরদা সরিয়ে বেরিয়ে এল সুরভি। শোভনের প্রেমিকা। এবং সত্যিই শোভন চেয়ার ছেড়ে একেবারে লাফিয়ে উঠল।

রুপোর টাকা



অদ্রীশ বর্ধন

শা সে. র. উ. ২—৮৭

জানলার ধারে প্যাকিংকেসটা টেনে নিয়ে নিশ্চুপ হয়ে বসেছিল ইন্দ্রনাথ। বর্ষা নেমেছে। অবিশ্রান্ত ধারায় কদিন ধরে বর্ষণের আর বিরতি নেই। অবিরাম, অবিরল ধাবায় নামছে বর্ষাসুন্দরী। অসমছন্দের সে বর্ষণ-সঙ্গীত শুনে-শুনে ইন্দ্রনাথেরও একঘেয়ে লাগতে থাকে।

প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের অন্তরের একটা নিগূঢ় সম্পর্ক আছে। প্রকৃতির সঙ্গীতের সুরে মানুষেব মনোবীণাও একই তারে বাঁধা। একের ঝঙ্কার অপরটিতে অনুরণিত হয়ে এসেছে সৃষ্টির সেই আদিম প্রভাত থেকে। তাই বুঝি আজ বাইরের মেঘ ভিড় করে এসেছে ইন্দ্রনাথের মনের আকাশেও। বাইরের স্তিমিত আলোয় ওর মনের দীপও বুঝি আজ নিষ্প্রভ। বাইরের ঝাপসা জলধারায় সজল ওরও অন্তর।

বর্ষার মৃত্যুশীতল অবসাদ যেন ধীরে-ধীরে ওর মনেও সঞ্চারিত হয়ে যেতে থাকে। ম্লান-বিষণ্ন দুই নয়ন-মণিকায় সুদূর অতীতের স্বপ্নালু স্মৃতির আবেশ ঘনিয়ে ওঠে। যৌবনের প্রভাতে কল্পনার কত অলীক জালবোনা আর স্বপ্ন-সৌধ ভঙ্গের সুখদুঃখবিধুর উষ্ণ সে অতীত। রুক্ষ জীবনের ধূসর পথপ্রান্তে ধূলার মাঝে তারা আজ পেতেছে আসন—সে-ধূলা তার জীবনের ব্যর্থতা, বেদনা আর বঞ্চনাব নির্মম আঘাতে রেণু-রেণু কল্পনার মর্মর মঞ্জিল বিরচিত। যার প্রতিটি অণু-পরমাণুতে মিশে আছে তার যৌবনের নিশ্বাস, বোবা কান্নার অদৃশ্য অশ্রু।...

বিবর্ণ, বিরং, পাণ্ডুর আকাশ আর নিরবচ্ছিন্ন বৃষ্টিধারার দিকে তাকিয়ে তাই বুঝি ইন্দ্রনাথেব দুই চোখ জ্বালা করে ওঠে।...

দরজায় আচমকা করাঘাত হতে চমক ভাঙল ওব।

ডাকপিওন। পুরু আর বিপুলায়তন একটা রেজিস্টার্ড প্যাকেট হাতে তুলে দিয়ে বিদায় নেয় সে।

প্যাকেটের ওপর চোখ পড়তেই ওর মুখের বিষাদকে ম্লান করে দিয়ে ফুটে ওঠে খুশির আভা। মৃগাঙ্কর চিঠি। বম্বে থেকে সে লিখছে।

বোম্বাই
এপ্রিল ১২, ১৯৫৭

ভাই ইন্দ্রনাথ,

বুঝতেই পারছি, আমার এ-চিঠি যখন তুমি পাবে, তখন হয় স্মৃতি রোমন্থন করছ ম্লান মুখে, আর না-হয় কাঁচি ধ্বংস করছ একমনে। দ্যাখো ইন্দ্র, বহুবার বলেছি তোমায়, আবার বলছি—সুখ, দুঃখ, আশা, বঞ্চনা নিয়েই মানুষের জীবন। সব স্বপ্নই কি ফসল ফলায়? সব জেনেশুনেও কেন যে তিলে-তিলে জীবনের এই মূল্যবান অধ্যায়টিকে নষ্ট করছ জানি না।

তোমার প্রতিভার এই অহেতুক আত্মহত্যা রোধ করতে না পেরে বাধ্য হয়ে নিতান্ত রাগের বশেই এসেছিলাম বোম্বাইয়ে—সাংবাদিকের জীবনকে বেছে নিয়ে। এখানে এসে একটা বিচিত্র ঘটনার আবর্তে জড়িয়ে পড়ি। ব্যাপারটা বেশ মজার হলেও ওর মধ্যে একটু রহস্যের গন্ধ পাওয়ায় তোমার সান্নিধ্য থেকে পাওয়া যৎসামান্য অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাবার চেষ্টা করেছিলাম। ফল পেয়েছি হাতে-হাতে। লিখতে-লিখতে আজ অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করছি, সত্যিই মম যৌবন-নিকুঞ্জে গাহে পাখি। কী, বুঝলে না তো? এ আমার নিছক রহস্যভেদ নয়, অর্জুনের মতো লক্ষ্যভেদ, আর...।

আচ্ছা, শোনোই তবে সে-কাহিনি...।

*

সন্ধে হয়ে এসেছিল। মালাবার হিলের ওপাশে সূর্য নেমে এসেছিল—আকাশকে রঙে-রঙে রাঙিয়ে ক্ষণেকের জন্যে স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিল আরব সাগরের বুকের উপর।

বোম্বাই নাগরিক-নাগরিকাদের বড় প্রিয় এই গোধূলি মুহূর্তটি। আকাশে-বাতাসে ফাগুনের উৎসব ওদের মনেও সুরের পরশ লাগায়। তাই প্রত্যেকেই গৃহকোণ ছেড়ে বেরিয়ে আসে পথে—আসে সাগরের তীরে, বসে শ্যাওলা-সবুজ পাথরের আনাচে-কানাচে অথবা বালুকা-চিক্কণ জুহু-চৌপাট্টির বেলাভূমিতে। সারাদিন কর্মমুখর সুদীর্ঘ প্রহরগুলো কাটাবার পর এই সংক্ষিপ্ত ম্লান মধুর গোধূলি মুহূর্তটি প্রতিজনেই লঘু রসালাপ আর ভ্রমণ-বিলাসে ভরিয়ে তোলে।

কিন্তু ছুটি নেই আমার—নেই সম্পাদক শেখর শর্মার। আর, বোধহয় এই কারণেই প্রতিদিন ঠিক এই সময়টাতেই বিশেষভাবে বিগড়ে থাকত শর্মাজির মেজাজ। বিশ বছর ধরে বিরতিবিহীন সম্পাদনায় সাফল্য অর্জন করেছেন তিনি, আর বিশ বছরের প্রতিটি সকাল-সন্ধ্যায় করুণ নয়নে শুধু সূর্যদর্শন করে নিষ্ফল রোষে আক্রমণ করেছেন ফাইলের স্তূপকে। সে রোষবহ্নি থেকে আমবাও নিষ্কৃতি পাইনি।

সেদিনও তিরিক্ষে মেজাজ নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। সটান এসে দাঁড়ালেন আমার টেবিলের সামনে।

প্রথমে আমি লক্ষই করিনি। লক্ষ করবার মতো অবসরও ছিল না। টেলিফোন যন্ত্রটির মাউথপিসের ওপর সপ্রেম দৃষ্টি রেখে মধুক্ষরা শব্দ প্রেরণ করছিলাম অপর প্রান্তে।

'সত্যিই কবি, তোমার প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের প্রশংসা যে কীভাবে শুরু করব, তা কিছুতেই ভেবে পাচ্ছি না...ভাবব না? তবে থাক...না, না, এ বিষয়ে এখনও বিন্দুবিসর্গও শুনিনি, তবে শুনব শিগগিরই...তাহলে আগামীকাল সন্ধে ছ'টায় আলেকজান্ড্রা ডকে...আরে, আমি তো থাকবই...সমস্যা তো সেটা নয়, কাল পর্যন্ত সময়টা যে কী মৃদুছন্দে কাটবে, তা ভাবতেও অসহ্য লাগছে।...বললাম, মৃদুছন্দে একটু কবিত্ব করলাম আর কী।...তাহলে কাল সন্ধেয় দর্শন পাচ্ছি, কেমন? আচ্ছা, তাহলে এখনকার মতো—।'

বলে, রিসিভার নামিয়ে রেখে মুখ তুলতেই ম্যানেজিং এডিটরের বরফ-কঠিন চোখে চোখ পড়ল আমার।

বেশ কিছুক্ষণ তুষার-রশ্মি বিকিরণ করল শেখর শর্মার চোখ দুটি। তারপর শ্লেষ-বঙ্কিম স্বরে বললেন, 'বটে। আজকাল তাহলে কবি নাম ধরেই ডাকাডাকি চলছে দেখছি।'

সসম্ভ্রমে বললাম, 'অনেকটা সময় বেঁচে যায় তাতে, তাই—।'

'একমাত্র সন্তানকে এমন মিষ্টি নামে আপ্যায়নের বৃত্তান্ত কি সোমেশ রায় শুনেছেন?'

'খুব সম্ভব না। অত্যন্ত কাজের মানুষ কিনা—।'

'খবরটা শুনলে আর-একটা কাজ তাঁর বাড়বে শুধু। জ্যান্ত তোমার চামড়া ছাড়িয়ে রোস্ট করবার সব আয়োজন সম্পূর্ণ করতে বেশি দেরি তাঁর লাগবে না। সামান্য একটা সাংবাদিক—মাস গেলে তিনশো টাকা যার রোজগার, সে কিনা—।'

'সত্যিই, মাইনেটা বড় অল্প স্যার।' তৎক্ষণাৎ একমত হই আমি। এ-প্রসঙ্গে আরও কিছু বক্তব্য ছিল আমার, কিন্তু সেরকম কোনও সুযোগ না দিয়ে ঝটিতি উত্তর দিলেন শেখর শর্মা, 'তোমার দাম ওর থেকে এক কানাকড়িও বেশি নয়। বুঝলে গোবর্ধন?'

'আজ্ঞে, আমার নাম—।'

'চোপরাও। মেয়েটা তাহলে সবই বলেছে তোমায়। হুম, এখন সব জলের মতো বুঝতে পারছি। মতলবটা এসেছে ওরই মাথা থেকে, তাই কিনা?'

'কবিতা একটা মস্ত সুখবর শোনাল স্যার। কিন্তু সে যাই শোনাক না কেন, আদেশ তো স্যার আপনার কাছ থেকেই নেব।'

এবার বোমার মতো ফেটে পড়লেন শেখর শর্মা।

'হাইস্কুল ম্যাগাজিন চালানোর মতো কতকগুলো নিরেট সাংবাদিক আমায় দিয়ে আবার তাদের মধ্যে থেকে একজনকে ডাকা হচ্ছে কিনা একটা মেয়ের মনোরঞ্জনের জন্যে।'

'তা যা বলেছেন স্যাব।' খুশি-খুশি স্বরে সায় দিই আমি।

খরখরে চোখে তাকাল শেখর শর্মা : 'বেশি কথা বোলো না ছোকরা। কথাটা হচ্ছে আমাদেব শ্রদ্ধেয় অন্নদাতাকে নিয়ে। সে খেয়ালটা থাকে যেন। এইমাত্র ফোনে জানালেন যে, হপ্তাখানেকেব জন্যে সোমেশ রায়ের স্টিমার-পার্টিতে তোমাকেও যেতে হবে। পার্টি পোর্ট ভিক্টোরিয়া, রত্নগিরি, মাঙ্গালোর ঘুরে আসবে। কাল সন্ধে ছ'টায় আঠারো নম্বর আলেকজান্দ্রা ডকে। কিন্তু সবই তো জানো বলে মনে হচ্ছে।'

'জানলেও আপনার মুখে শুনে বুঝছি খাঁটি খবরই দিয়েছে কবিতা।'

'বটে! নিছক সাগর-বিহাবের জন্যে যে তোমায় ডাকা হচ্ছে না, কাজের দায়িত্ব যথেষ্ট আছে, তা নিশ্চয় মেয়েটা বলতে ভুলে গেছে, তাই না?'

'তা স্যার, গেছে। নীরস কথাবার্তা ও মোটেই পছন্দ করে না কিনা. তা না—হলে—।'

'শা-ব্বাশ রিপোর্টার রোমিও।' বলেই চোখ পাকালেন শেখব শর্মা : 'হপ্তাখানেক হল সিলোন থেকে ডক্টর তারাপদ তরফদার ফিরেছেন। ভদ্রলোকের নাম তোমার অজানা নয়। তোমার কাজ হচ্ছে ও-দেশ সম্বন্ধে ডক্টরের মতামতগুলো কায়দা করে লিখে নেওয়া। বুঝেছ?'

'এ আর এমন কী কঠিন কাজ, স্যার।' বলি আমি।

'যতটা সহজ ভাবছ, ততটা সহজও নয়। এ যে শুধু ডিউটি নয়, সেইসঙ্গে সাগরবিহার, কাজেই—'শ্লেষের শেষ খোঁচাটুকু অনুক্ত রেখেই পেছন ফিরলেন শেখর শর্মা।

'একটা কথা স্যার, ইযে, কাল তাহলে আমার আর অফিসে আসার দরকাব নেই, কী বলেন?' তাড়াতাড়ি বলি আমি।

আবার খরখরে চোখে তাকালেন শেখব শর্মা।

'কে বললে দরকার নেই? এইমাত্র কবিত্ব করছিলে না সময়টা বড়ই মৃদুছন্দে যাবে? সেভাবে যাতে না যায়, তা আমি দেখব। যথাসময়ে কাল অফিসে হাজিরা দেবে, বুঝেছ?'

'বুঝেছি।' বেশ দমে যাই আমি। বড় কড়াপ্রকৃতির মানুষ শেখর শর্মা।

'আর একটা কথা,' টেবিলের কাছে এগিয়ে আসেন উনি : 'ইয়ে মানে, তোমার এই কবিতা রায়টিকে তো দেখতে-শুনতে মন্দ নয়, কী বলো?'

'তাই তো সবাই বলে স্যার।'

'দ্যাখো ছোকরা, মনটন দিয়ে কাজকর্ম করো একটু।' কোমল হয়ে আসে ওঁর বলি-অঙ্কিত রুক্ষ মুখ : 'জানোই তো দুনিয়াটা কতখানি কঠিন। এখানে চলতে গেলে কাঁটায় পা ছেঁড়ে প্রত্যেকের। তাইতেই হতাশ হয়ে শুধু কাব্যরচনা করলেই গোলাপ হাতের মুঠোয় আসে না। বুড়ো সোমেশ রায় আলট্রামাইক্রোস্কোপ দিয়ে ধুলো থেকে সোনা তুলেছেন; আর, চোখে টেলিস্কোপ আঁটলেও দুনিয়ায় টাকা ছাড়া আর কিছুই নজরে আসে না তাঁর। টাকা আর টাকা—এ ছাড়া কিছু ভাবেনই না তিনি।'

'আমিও অনেকটা সেইরকম শুনেছি স্যার।'

'জীবনে সর্বপ্রথম যে-রুপোর টাকাটি তিনি রোজগার করেছিলেন, আজও তা সযত্নে রেখে দিয়েছেন নিজের কাছে। তোমার প্রথম রোজগারের টাকাটা কোথায় শুনি?'

'কাকে যেন দিয়েছি, ঠিক মনে পড়ছে না।'

'পড়বে না। তোমার সঙ্গে সোমেশ রায়ের তফাত এইখানেই। যাই হোক, এ দুর্মুখ বুড়োটার কথা মনে রেখো। একজন ভালো রিপোর্টার সব জেনেশুনে পরে ভুল করে পস্তাক, তা আমি দেখতে চাই না।'

'ভালো রিপোর্টার স্যার?' উজ্জ্বল হয়ে উঠি আমি।

'তাই তো বললাম হে।'

হেসে ফেলি আমি। আরও খুশি-খুশি হয়ে ওঠে আগে থেকেই প্রসন্ন মেজাজটা।

এবার একটু সাহস করেই বলে ফেলি. 'মাইনের দিন কিন্তু স্যার পরশু।'

'ক্যাশিয়ারকে বলে দেব'খন।' বলে খসখস করে একটা কাগজে দু-ছত্র লিখে আমার হাতে তুলে দিলেন উনি ঃ 'টাকাটা কালকেই নিয়ে নিও, বুঝলে?'

'মাত্র পঞ্চাশ টাকা!' করুণ হয়ে ওঠে আমার চোখ ঃ 'আমি যে স্যাব একটা ভালোরকমের ডিনার সুটের কথা ভাবছিলাম!'

আবার তিরিক্ষে হয়ে ওঠে শেখর শর্মাব মেজাজ।

'যে-শার্ট আর প্যান্ট ধুতে দিয়েছ, তাই নিয়ে যাবে। ফালতু বাবুগিরির জন্যে তোমায় আমরা পাঠাচ্ছি না—তা যেন মনে থাকে।' বলে হনহন করে উনি সেঁধিয়ে গেলেন ওনার খুপরি-ঘরে।

কাজেই ঘবের মধ্যে রইলাম শুধু আমি। কাগজটা সান্ধ্য-দৈনিক। শেষ সংস্করণও পথে চলে গেছে অনেকক্ষণ। তাই হাতে আর বিশেষ কোনও কাজ ছিল না। বাইরের গোধূলি ক্রমশ ফিকে হয়ে হারিয়ে যাচ্ছিল সন্ধ্যার অবগুণ্ঠনেব অন্তরালে। অল্প-অল্প ছায়া দানা বেঁধে উঠছিল ঘরের কোণগুলিতে। রাস্তার ওপাশের গাছটায় স্তবকে-স্তবকে ফোটা হলুদ ফুলের আড়ালে দেহ লুকিয়ে দিনেব শেষ গান গাইছিল নাম-না-জানা একটা পাখি। আনমনে সেইদিকেই তাকিয়ে রইলাম আমি।

সেই ছায়া-ছায়া গোধূলি-সন্ধ্যাব সন্ধিক্ষণে অনেক কথাই ভিড় করে এল মনে। মনটা পিছিয়ে চলে গেল সেই দিনটিতে, যেদিন প্রথম দেখেছিলাম কবিতা রায়কে..।

গেছিলাম বান্দ্রার মাউন্ট মেবিতে। নিবাশ্রয় অনাথদের আশ্রয়-দানের জন্যে একটা সাহায্য রজনীর ব্যবস্থা কবেছিল বোম্বাই চলচ্চিত্র জগতের প্রখ্যাত নট-নটী ও সঙ্গীতশিল্পীরা। বেশ বড় অনুষ্ঠান। আর তাই শেখর শর্মা আমাকে পাঠিয়েছিলেন হরেকরকম মালমশলার সন্ধানে। প্রাচ্য-প্রতীচ্য কায়দায় সুসজ্জিত ঝলমলে তোবণের নীচে হাসিমুখে আগতদের মাঝে ফুল বিক্রি করছিল একটি তন্বী। মেয়েটিব একহাতে বেতেব সাজিতে ম্যাগনোলিয়া, রজনীগন্ধার গুচ্ছ, অপর হাতে রক্তগোলাপের কয়েকটি সুদৃশ্য বাটন হোল। হাত-মুখ, ঠোঁট-ভুরু-চোখ নেড়ে অপূর্ব ভঙ্গিমায় ফুল বিকোচ্ছিল সে। দেখেই থমকে দাঁড়ালাম। যদিও সুন্দরী ললনা দেখে থমকে দাঁড়ানোর অভ্যাস আমার কোনওদিনই ছিল না, তবুও এ-মেয়েটির চোখে-মুখে এমন কিছু একটা ছিল, যা দেখে আপনাহতেই স্তব্ধ হয়ে গেল আমাব চরণ-যুগল।

মেয়েটিকে ডানাকাটা পরী বলব না। রম্ভা-তিলোত্তমা-উর্বশী-মেনকাব মতো স্বর্গীয় সৌন্দর্য না থাকলেও সে সুন্দরী। ছিপছিপে একহাবা চেহারা, টুকটুকে ফবসা মুখ, ঘন কালো চঞ্চল দুটি চোখ, চুলগুলো টান করে পেছনে বাঁধা আব টানা-টানা দুই ভুরুর মাঝে রক্তচন্দন বিন্দুর মতো একটি কুমকুমের টিপ।

এই টিপ দেখেই মনে হল মেয়েটি মহারাষ্ট্রীয় নয় নিশ্চয। গুজরাট বা মহারাষ্ট্র প্রদেশের তরুণীদের টিপ অঙ্কন দেখেছি বিশেষ ধরনের এবং বিশেষ স্থানে। কিন্তু এ মেয়েটির কুমকুম-বিন্দু, বিশেষ করে ওর মুখের ঢলঢলে স্নিগ্ধ লাবণ্য দেখে মনে হল, বঙ্গললনা ছাড়া তো এমন চোখ-জুড়োনো শ্রী আর কোনও নারীর মুখে দেখিনি।

বড় ভালো লাগল মেয়েটিকে। জীবনে বহু সৌন্দর্যের সংস্পর্শে এসেছি, কিন্তু হৃৎপিণ্ড নামক দেহযন্ত্রটি কোনওদিন ভুলেও কোনওরকম চাঞ্চল্য দেখায়নি। আর সেই আশ্চর্য রকমের শান্ত যন্ত্রটাই হঠাৎ ওই তন্বী-সৌন্দর্য দেখে অত্যধিক মাত্রায় চনমনে হয়ে উঠে এমন দাপাদাপি শুরু করে দিলে যে, কেমন জানি চুম্বকের টানে পড়ে এগিয়ে গেলাম ওর দিকে।

মেয়েটির সামনে এসে দাঁড়ালাম বটে, কিন্তু ওর চন্দন-স্নিগ্ধ লাবণ্য আমার অশান্ত হৃদযন্ত্রকে

শান্ত করা দূরে থাক, বরং তার স্পন্দনবেগ রীতিমতো বাড়িয়ে তুললে। বোধ করি আমার বিমুগ্ধ-আনন দেখেই মিষ্টি করে একটু হাসল ও। আহা, মরি, মরি! সে তো হাসি নয়, যেন সুদৃশ্য শুক্তির ফাঁকে একসার দুধসাগরের সেরা মুক্তো ঝিলমিল করে উঠল, আর সে দুধ-মুক্তোর চাপা শুভ্রদ্যুতি রাঙা অধরের কোণে-কোণে আশ্রয় নিলে অপরূপ ভঙ্গিমায়।

আমি যদি কবি হতাম, তাহলে সেই মুহূর্তেই ওই অমল-ধবল কুন্দবরণ সুন্দর হাসি নিয়ে সৃষ্টি করতাম শ্রেষ্ঠ কাব্য।

মেয়েটি কিন্তু শুধু একটু হাসল। হেসে সুরেলা সুরে বললে ফুলের নামধাম আর দাম। দামটা যদিও একটু বেশিই বললে, কিন্তু বর্ণনভঙ্গি এমনই সরস, সুন্দর আর সুমিষ্ট যে, খুবই যুক্তিসঙ্গত মনে হল তা। তা ছাড়া, আমার এতদিন ধরে দিব্যি শান্ত থাকা হৃদযন্ত্রের দাপাদাপি আর সহ্য করতে না পেরে পকেট উজাড় করে সর্বস্ব তুলে দিলাম শিখরদশনার হাতে।

শিঞ্জিত-কাঁকন চঞ্চল-অঞ্চল বহু পরিচিত তরুণী আশপাশে ঘুরছিল ফুরফুরে প্রজাপতির মতো লঘুচরণে ও লঘুমনে। বোধ করি আমার মুগ্ধ নয়ন দেখেই ওদের মধ্যে একজন এগিয়ে এসে পরিচয় করিয়ে দিলে আমাদের।

আর, তা শুনেই নিমেষ মধ্যে স্থির হয়ে গেল আমার চঞ্চল চিত্ত। ফুলওয়ালি মেয়েটি অনাথ নয় মোটেই। সারা বোম্বাইতে হেন জন নেই যে, চেনে না ওর দোর্দণ্ডপ্রতাপ পিতৃদেবটিকে। পরিচয়-পর্ব সাঙ্গ হওয়ার আগেই আমার তখন চক্ষুস্থির। বুঝলাম, বড় বেশি আশা করে ফেলেছি আমি। রায় কনস্ট্রাকশন কোম্পানির চেয়ারম্যান সোমেশ রায় কোনওদিনই মার্জনা করবেন না আমার এ ধৃষ্টতা। জীবন-পথে আসা কোনও কাঁটাকে তিনি কখনও পাশ কাটিয়ে যাননি, দলে গেছেন দু-পায়ে। আর, তিনশো টাকা মাইনের যে-নগণ্য সাংবাদিক তরুণটি তাঁর একমাত্র কন্যাসন্তানের শুধু রূপসুধা পান নয়, জীবনসঙ্গিনী করারও স্বপ্ন দ্যাখে, তাকে যে তিনি অতি সহজে রেহাই দেবেন না, তা তখনই মর্মে-মর্মে উপলব্ধি করে ফেললাম আমি।

যাকে বলে হরিষে-বিষাদ—তাই হল আমার। মুহূর্তের দর্শনে আকাশকুসুম রচনা শুরু করে দিয়েছিলাম, তার পরমুহূর্তেই পতন ঘটল স্বর্গ থেকে মর্তে। তোমার কথাই মনে পড়ল তখন। তুমিও যা চেয়েছ, তা পাওনি, শুধু পেয়েছ আঘাতের পর আঘাত। তাই বাইরের জগত থেকে নিজেকে গুটিয়ে এনেছ নিজের অন্তরের কন্দরে, তাই চিত্তের কুহরে কুহরিছে সদা অতীত-দিনের কাহিনি। নিজেকে সেদিন আরও বেশি করে একাত্ম বোধ করলাম তোমার সঙ্গে।

কাজ নিয়ে গেছিলাম—তা শেষ না হওয়া পর্যন্ত আসার উপায় ছিল না। তাই থেকে গেলাম শেষ পর্যন্ত। অবশ্য যতক্ষণ ছিলাম, মেয়েটির মধুসঙ্গ দিয়ে হৃদয়ের ছোট-বড় সব ফাঁকগুলিই ভরিয়ে নিয়েছিলাম। তারপর উৎসব-চঞ্চল মণ্ডপ ত্যাগ করলাম আর মনে-মনে প্রতিজ্ঞা করলাম, এই প্রথম আর এই শেষ। কাশ্মীরি আপেলের আভা-আঁকা ও-মুখ ইহজীবনে আর দেখা তো দূরের কথা, ওর স্মৃতিও সজ্ঞান-নির্জ্ঞান মন থেকে বিসর্জন দেব চিরতরে।

এরপর অনেকদিন কেটে গেল। আর প্রতিটি দিনের প্রতিটি মুহূর্তে আমি অন্তরে-অন্তরে উপলব্ধি করছিলাম যে, সেদিনকার সন্ধ্যার সে সুখস্মৃতি কেটে-কেটে বসে গেছে এ-হতভাগ্যের মানসপটে। বুঝলাম, আমি প্রেমে পড়েছি।

প্রেম কারও জীবনে আনে শুধু আনন্দ—অমৃতময় আনন্দরসে ভরিয়ে তোলে তার অন্তর-পেয়ালা, আর কারও জীবনে আনে শুধু বেদনা, দুঃখ আর অশ্রু। সেই অবিস্মরণীয় সন্ধ্যার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত আমার মনে কোনও চিন্তা, কোনও সমস্যা ছিল না। কিন্তু তারপর থেকেই এক দুঃসহ চিন্তাভারে তিরোহিত হল আমার মনের শান্তি। শুধু দুটি পথ ছিল আমার সামনে। মেয়েটিকে স্মৃতি থেকে নিঃশেষে মুছে ফেলে কাজে ডুবে যাওয়া; ব্যর্থতার গ্লানি মনেপ্রাণে বয়ে নিয়ে যাওয়া জীবনের শেষ সন্ধ্যা পর্যন্ত। আর না হয় পুরুষকারকে অবলম্বন করে সংগ্রামে নেমে পড়া। যে-পত্রিকায় আমি

এখন সামান্য সাংবাদিক, মনপ্রাণ দিয়ে পরিশ্রম করলে হয়তো একদিন এইখানেই উচ্চতর পদের সঙ্গে যশ আর অর্থ সমাগমও নেহাত কিঞ্চিৎ হবে না। তখন এই দুই হাতিয়ারকে সম্বল করে স্বর্ণ-প্রাসাদ চূর্ণ করে রাজকন্যাকে জয় করে আনা এমন কিছু কঠিন কাজ হবে না আমার পক্ষে। আর এই শেষের পথটিই আমি বেছে নিলাম—যদিও দুস্তর এই পথ বহু বিঘ্নে বন্ধুর, তবুও পিছু হটে আসার কথা কিছুতেই ভাবতে পারলাম না।

কবিতা রায়ের মুখদর্শন না করার প্রতিজ্ঞা শেষ পর্যন্ত আর রাখতে পারিনি আমি। দেখা-সাক্ষাৎ পুরোদমেই চলছিল। কখনও গেলর্ড, কখনও লিবার্টি, কখনও জুহু, আবার কখনও বেসিন ফোর্টে মিলতাম আমরা। বন্ধুর মতো সহজ একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল আমাদের মধ্যে। তার আর আমার মধ্যে যে-দুস্তর ব্যবধান, তা সে মনেপ্রাণে উপলব্ধি করত। কিন্তু তবুও সে সমানে তার মিষ্টি হাসির অমৃত-সিঞ্চনে নিত্য সঞ্জীবিত করে চলেছিল আমার অন্তরের আনন্দ-উৎস। দিনের-পর-দিন দেখা-সাক্ষাতের আয়োজন করেছে সে নিজেই—অকুণ্ঠ, সহস্র, স্বচ্ছন্দ ব্যবহারে নিবিড়তর করে তুলেছে আমাদের পরিচয়। আর আজ সোমেশ রায়ের দেওয়া স্টিমার-পার্টিতে আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর মূলেও আছে সে। উদ্দেশ্য দ্বিবিধ। প্রথমত সাগরবিহার, দ্বিতীয়ত পুরুষসিংহ সোমেশ রায়ের সঙ্গে তাঁরই প্রাসাদতুল্য আধুনিক বজরাতে আমার আলাপ করিয়ে দেওয়া।

ভাবতেই গা শিরশির করে উঠল আমার। অথচ ভেবে পেলাম না বৃদ্ধ সোমেশ রায়কে এত বেশি ভয় পাওয়ার কী কারণ থাকতে পারে আমার। বংশমর্যাদার দিক দিয়ে নিতান্ত কম যাই না আমি। বোম্বাইতে না হোক, কলকাতায় আমার কুলপরিচয় দিলে এখনও সম্মান পাওয়া যায় সমাজের বনেদিমহলে। পক্ষান্তরে, শুধু সোনার বাট সাজাতে-সাজাতেই সন্ধে ঘনিয়ে এল সোমেশ রায়ের জীবনে। টাকা আর টাকা। টাকা ছাড়া দুনিয়াতে ভদ্রলোকের কাছে সত্য বস্তু আর কিছুই নেই। ঠাকুরদা মারা যাওয়ার পর যে-ক'টি কোম্পানির কাগজ পেয়েছিলাম, সেগুলো তো বৃদ্ধ সোমেশ রায়ের বিপুল অর্থ-সমুদ্রের তুলনায় নগণ্য ক'টি বিন্দু। অর্থ আর অর্থ! অর্থ ছাড়া প্রতিভার কোনও আদরই নেই তাঁর কাছে।

ধুত্তোর, কী আর করব এত ভেবে। আমাদের মোলাকাতের জন্য কবিতা যখন এত বড় একটা পার্টির আয়োজনই করে ফেলল, তখন যাবই আমি। অর্থ-সম্রাট সোমেশ রায়কে কেন যে লোকে এত ডরায়, তা দেখতে হবে স্বচক্ষে। শেখর শর্মা ঠিকই বলেছেন। ধনীদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার জন্যে নতুন ডিনার-সুটের কোনও প্রয়োজনই নেই আমার। যে-শার্ট-প্যান্ট আমি ধুতে দিয়েছি, তা নিয়েই—।

হঠাৎ শার্টের কথা ভাবতেই থমকে দাঁড়িয়ে গেল আমার এলোমেলো চিন্তা। যে-শার্ট-প্যান্ট আমি ধুতে দিয়েছি, তা তো সামনের শুক্রবারের আগে পাওয়ার কোনও সম্ভাবনাই নেই। ঘরেতেও ধোয়া জামাকাপড় নেই একটিও।

কী নিয়ে যাব আমি? লন্ড্রিতে আজ ধুতে দিলে শনিবারের আগে তো আর পাওয়ার উপায় নেই। নতুন শার্ট কেনারও কোনও প্রশ্ন ওঠে না। তাহলে ওই পঞ্চাশ টাকা থেকে যা উদ্বৃত্ত থাকবে, তা দিয়ে আর বেয়ারা-খানসামাদের কাছে ইজ্জত রক্ষা করা যাবে না। তাই তো, করি কী তাহলে?

মহা চিন্তায় পড়লাম আমি। অদূরে কাঠের পার্টিশন দেওয়া পায়রার খুপরির মতো ছোট্ট ঘরটায় শেখর শর্মা নির্দয় চোখে অগ্নিবৃষ্টি করছিলেন একটা প্রতিদ্বন্দ্বী পত্রিকার শেষ সংস্করণের সম্পাদকীয় প্রবন্ধে। ওঁর কাছে আরও কিছু চাইলে হয় না? কিন্তু দৃশ্যটি বিশেষ আশাপ্রদ মনে হল না। তারপরই হঠাৎ বিদ্যুৎচমকের মতো মনে পড়ে গেল ওয়ার্ডেন রোডে একটা চীনা লন্ড্রির সাইনবোর্ড। ও-পথে যেতে-আসতে বহুবার বোর্ডটা চোখে পড়েছে আমার। আঁকাবাঁকা চীনা কায়দায় তাতে লেখা আছে, সকাল আটটার মধ্যে ময়লা পোশাক দিয়ে গেলে সেইদিন তা পরিষ্কার করে ফেরত দেওয়া হয় সন্ধের সময়ে।

মহোপকারী চীনা ভদ্রলোকটির নামটাও মনে পড়ল আমার—হনলুলু স্যাম। মনে পড়ামাত্র আর অযথা দেরি করলাম না। টেবিল ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে সম্পাদকীয়তে তন্ময় শেখর শর্মাকে আর না ঘাঁটিয়ে বেরিয়ে পড়লাম বাইরে।

প্রোগ্রামটা মনে-মনে তৈরি করে নিলাম। প্রথমেই আশপাশের কোনও হোটেলে ঢুকে রাতের আহারটা সেরে নিয়ে যাব আমার ঘরে। সেখান থেকে সিধে হনলুলু স্যামের দোকানে—ময়লা পোশাকের প্যাকেটটা তার হাতে সঁপে দিয়ে ফিরব আপন শয্যায়; পরিপাটি নিদ্রা দেওয়া দরকার। বহুদিন আশা মিটিয়ে ঘুমোনোর সুযোগ পাইনি—আজ যখন পেয়েছি, তখন তার সদ্ব্যবহার করবই।

কিন্তু বোম্বাইয়ের মতো নিশীথ-নগরীতে সকাল-সকাল ঘরে ফেরা তো আর সহজ কথা নয়। হোটেলেই কয়েকজন সাংবাদিক বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে গেল। ছাড়া যখন পেলাম, তখন আর চীনা ভদ্রলোকের নিদ্রাভঙ্গ করা সমীচীন বোধ করলাম না। ময়লা পোশাকের প্যাকেটটা সুটকেসে পুরে মাথার কাছে রেখে অ্যালার্ম ঘড়িটার কাঁটা ভোর ছ'টায় ঘুরিয়ে রেখে টান-টান হলাম শয্যায়।

মনকে আশ্বাস দিলাম, স্টিমারে যেভাবেই হোক খেদ মিটিয়ে নিদ্রাদেবীর আরাধনা করব আমি।

পরের দিন সকাল ঠিক সাড়ে সাতটার সময়ে হনলুলু স্যামের কাউন্টারে এসে দাঁড়ালাম।

সুটকেস খুলে প্যাকেটটা কাউন্টারে রাখতে-রাখতে হাঁক দিলাম, 'আজই বিকেল সাড়ে পাঁচটায় চাই।'

'আজকেই পাবেন ঠিক, তবে সাড়ে পাঁচটায় কি সাড়ে সাতটায় তা বলতে পারছি না—আটটার আগে দেব ঠিকই।'

'উঁহু, ঠিক সাড়ে পাঁচটায়। কাঁটায়-কাঁটায় সাড়ে পাঁচটায় চাই সব ক'টা পোশাক।'

কাচের মতো স্বচ্ছ চোখে আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে নীরবে মাথা নাড়লে হনলুলু স্যাম।

মোক্ষম দাওয়াই দিলাম এবার। কড়কড়ে একটা দু-টাকার নোট কাউন্টারে রেখে বললাম, 'জলদি দেওয়ার আলাদা চার্জ—হবে না এবার?'

'হবে।' স্ফটিক-স্বচ্ছ চোখ দুটো চিকচিক করে ওর।

'শাবাশ।' অন্তরের সঙ্গেই স্যাম মহাশয়ের প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের প্রশংসা করে ফেলি। টাকাটা অবশ্য ডেলিভারি দেওয়ার সময়ে দিলেই চলত, তবুও ভাবলাম এ রকম পরিস্থিতিতে কর্তব্যনিষ্ঠ চীনাম্যানদের বিনাবাক্যব্যয়ে বিশ্বাস করা উচিত আমার। কথায় কখনও নড়চড় হয় না ওদের, তা কে না জানে।

ব্রাহ্মমুহূর্তে উঠেছিলাম সেদিন। উঠেই ঘুম-ঘুম চোখে ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিলাম। পাঁচখানা ধোয়া শার্ট, আনুষঙ্গিক ট্রাউজার, নেকটাই আর একখানা মাত্র কোট—এই বিপুল পোশাক-সম্ভার নিয়ে যাব আজ সোমেশ রায়ের আধুনিক বজরায়। নাই বা রইল নতুন ডিনার-সুট—তাতে কী আসে-যায়। কবিতা তো রইলই, তার মধুমুখ, তার মৃদু হাসি, তার সুধাভরা আঁখিই রইল আমার সব গর্ব আর আনন্দের উৎসে, রইল আমার না-থাকা সম্পদ-জৌলুসের পরিপূরক হয়ে—নাই বা থাকল সেথায় জমকালো পোশাকের চোখধাঁধানো পারিপাট্য। একগুচ্ছ রজনীগন্ধার মতো শুভ্রসুন্দর কবিতার কথা ভাবতেই মনটা বড় খুশি-খুশি হয়ে উঠল। হঠাৎ রবি ঠাকুরকে মনে পড়ে গেল। তাই 'আজি মোর দ্রাক্ষাকুঞ্জবনে পুঞ্জ-পুঞ্জ ধরিয়াছে ফল' আবৃত্তি করতে-করতে ঢুকলাম অফিসে।

আর তৎক্ষণাৎ আমার দ্রাক্ষাকুঞ্জবনের সব দ্রাক্ষারসই লুটেপুটে নিলেন শেখর শর্মা—আমাকে অত্যন্ত কঠিন একটা কাজে পাঠিয়ে। সারাদিন ওই এক কাজ নিয়েই ছুটোছুটি করে কাটল—খাওয়ার সময় পেলাম না। কাঁটায়-কাঁটায় সাড়ে পাঁচটার সময় সুটকেসটা আঁকড়ে সবে বন্দুকের গুলির মতো বেরোতে যাচ্ছি, এমন সময়ে সামনে দরজার পথ আটকালেন শেখর শর্মা।

বললেন, 'শুভেচ্ছা রইল ফুটো কাপ্তেন। এইমাত্র খবর পেলাম একজন বেজায়-সম্মানিত ভদ্রলোকও সঙ্গদান করবেন তোমাদের।'

'ডিউক অব এডিনবরা?'

'হুম। সোমনাথ মুখার্জি।'

'অ্যাঁ! সোমনাথ মুখার্জি?'

'হ্যাঁ, সোমনাথ মুখার্জি। তোমার-আমার একমাত্র অন্নদাতা প্রভু আর এ-পত্রিকার স্বত্বাধিকারী স্বয়ং সোমনাথ মুখার্জি। চোখের পাতা একটুও না কাঁপিয়ে যিনি অঙ্গুলি হেলনে আমাদের প্রত্যেককেই পথে বসাতে পারেন, অথচ যাঁর অসীম অনুগ্রহে এখনও দিব্যি বহাল তবিয়তেই রয়েছি আমরা। কাজেই, বুঝতেই পারছ, কত বড় সুযোগ তুমি পাচ্ছ। এ মহাসুযোগ চাঁদের আলোয় কবিতা আবৃত্তি করে নষ্ট না করে কাজে লাগিও, তাঁকে সম্মান দিও, তাঁর স্নেহ অর্জনেব চেষ্টার কসুর কোরো না। তারপর যখন অতিরিক্ত কাজের চাপে চোখ মুদব আমি—হপ্তাখানেকের মধ্যেই তা ঘটতে পারে—তখন আমাব এ-কাজের দায়িত্ব হয়তো তোমাকেই দিতে পারেন উনি।'

'কিন্তু ওঁর সঙ্গে দেখা করাব কোনও সদিচ্ছাই নেই আমাব।' মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি আমি।

'ননসেন্স! অন্ততপক্ষে তিনশোবার তাঁর সঙ্গে মুখোমুখি হয়েছি আমি, আর প্রতিবারই পরিতাপের অন্ত ছিল না আমার। যাকগে, না গেলেই তাহলে ভালো করতে হে। কোনওবকমে ঠান্ডা লাগিয়ে হুপিংকাফ তৈরি করে ফ্যালো, না হয় ডিসেন্ট্রি—তাহলেই তোমার জায়গায় আর একজনকে পাঠিয়ে দিচ্ছি আমি।'

'রাবিশ।'

'আজ বেম্পতিবার।'

'তাতে কী?'

'বেম্পতিবারের বারবেলা।'

'ফুঃ।'

'তার ওপর তেরো তারিখ। কী বুঝলে?'

'কিস্‌সু না। চললাম।'

'যত্ত সব—।'

বাকি কথাগুলো আর কানে ঢুকল না—ততক্ষণে আমি অফিস-ফেরতা পথচারীদের মধ্যে দিয়ে উল্কাবেগে ধেয়ে চলেছি হনলুলু স্যামের দর্শন অভিলাষে।

সবে অফিস ভেঙেছে তখন। ফুটপাতের জনস্রোত ঠেলে যখন বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছলাম, তখন বিরাট কিউ দাঁড়িয়ে গেছে শেডের তলায়। প্রাগৈতিহাসিক সরীসৃপের মতো সে-দীর্ঘ সারি দেখে বাসে চড়ার আশা ত্যাগ করে ভিড় ঠেলে ঊর্ধ্বশ্বাসে এগিয়ে চললাম ওয়ার্ডেন রোডের হনলুলু স্যামের ধৌতাগার অভিমুখে। ওখান থেকেই সিধে যাব আলেকজান্দ্রা ডকে। তারপর সমুদ্রের বুকে ভেসে পড়ব আমি আর কবিতা। কে জানে, হয়তো এই সাগর-বিহারই আমার জীবনের মোড় ফিরিয়ে দিয়ে সূচনা করবে নতুন অধ্যায়ের।

গোয়ালিয়র ট্যাঙ্ক রোড দিয়ে সবে কেম্পস কর্নারে পৌঁছেছি। চার রাস্তার মোড়—তাই যানবাহন দাঁড়িয়ে গেছে অনেক দূর পর্যন্ত। হিউজেস রোড দিয়ে আসা অত্যন্ত মূল্যবান একটা গাড়ির সামনে দিয়ে রাস্তাটা পেরোতে যাচ্ছি, এমন সময়ে আচমকা লাফিয়ে উঠল আমার হৃদযন্ত্রটি।

একেবারে কানের কাছে শুনলাম এক অতি পরিচিত মধু-কণ্ঠ: 'এই তো মৃগাঙ্ক!'

দেখি, গাড়ির জানলা দিয়ে বেরিয়ে রয়েছে কবিতার হাসি-হাসি মুখটি।

অহো, সে কী দৃশ্য! কালো চোখের সে-আলো দেখেই নিমেষে মুছে গেল আমার সারাদিনের ক্লান্তি। কিন্তু সে-মুহূর্তে এ-দৃশ্যটা না দেখলেই খুশি হতাম আরও। কিন্তু একেবারে চোখে-চোখে তাকিয়ে ফেলেছি—কাজেই না-দেখার ভান করা আর চলে না কোনওমতেই। অগত্যা একটা ট্যাক্সির পাশ দিয়ে এসে পৌঁছলাম জানলার পাশে—ও ততক্ষণে একটা দরজা খুলে ধরেছে।

মহা খুশিতে রনরনিয়ে ওঠে ওর স্বর, 'ভাগ্যিস দেখা হয়ে গেল! আমরাও চলেছি ডকে। উঠে পড়ো।'

উঠে পড়ো! ধোয়া পোশাক না নিয়েই! হিমশীতল একটা স্রোত শিরশির করে নেমে গেল মেরুদণ্ড বেয়ে। কী কুক্ষণেই হেঁটে এসেছিলাম। গাড়ির মধ্যে দেখলাম আরও জনাতিনেক বসে। এপাশে একজন বর্ষীয়সী বিধবা ভদ্রমহিলা আর ওপাশে দুজন পলিতকেশ পুরুষ। তাঁদের একজন যে সোমেশ রায়, তা না বললেও বুঝতে দেরি হল না আমার। আর, অপরজন সোমনাথ মুখার্জি স্বয়ং। পাশাপাশি বসে দুজন ধনকুবের; যেন দুটি সজীব ব্যাঙ্ক।

'কিছু মনে কোরো না,' আমতা-আমতা করি আমি, 'দারুণ জরুরি একটা কাজ সারতে হবে। পরে দেখা করব'খন।'

'চলেছ কোন দিকে?' শুধোয় কবিতা।

'ইয়ে—এই তো এই দিকে।'

'তবে উঠে এসো। গাড়ি ওদিক দিয়ে নিয়ে যাচ্ছি।'

লাখ টাকা দামের গাড়িতে চড়ে হনলুলু স্যামের দোকানের সামনে যাওয়ার দৃশ্য কল্পনা করেই শিউরে উঠলাম আমি।

বললাম, 'আরে না-না, কী দরকার মিছিমিছি এদিক দিয়ে যাওয়াব। তুমি চলে যাও—একটা ট্যাক্সি নিয়ে এখুনি আসছি আমি।'

ট্র্যাফিক পুলিশের এগোবাব নির্দেশ পাওযায় সোমেশ রায়েব গাড়িব ঠিক পেছনেব অধৈর্য ড্রাইভারটা অত্যন্ত অভদ্রভাবে হর্ন টিপতে শুরু কবে দিয়েছিল।

বিপন্ন সুরে বলি আমি, 'তুমি এগোও কবি।' সাৎ করে একটা গাড়ি গা ঘেঁষে বেবিযে গেল সামনে।

'সামনের ওই ব্লকটায় তোমার জন্যে দাঁড়িয়ে থাকব, বুঝলে?' মিষ্টি হেসে বলল। বাধ্যতা গুণটা বাস্তবিকই নেই ওর মধ্যে। তারপরেই হাত বাড়ায়, 'দাও তোমার সুটকেসটা, গাড়িতে রেখে দিচ্ছি।'

'আরে...ইয়ে...না...না।' প্রাণপণে আঁকড়ে ধরি আমি সুটকেসটা ঃ 'দরকার আছে যে, আমার কাছেই থাকুক না।'

মস্ত একটা লন্ড্রি-প্যাকেট নিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে সোমেশ রায়ের সামনে হাজির হওয়ার দৃশ্যটা কল্পনা করেই লাল হয়ে উঠি আমি। পেছনের হট্টগোল ততক্ষণে তুমুল হয়ে উঠেছে; ট্র্যাফিক কনস্টেবল নিজেও এগিয়ে এল এদিকে।

'ক্যায়া ঝামেলা সাব?' মাতৃভাষা প্রয়োগ করে নীল কুর্তা পরা মহারাষ্ট্রীয়।

'যাও কবি, এগোও তুমি।' অনুনয় ফুটে ওঠে আমার কণ্ঠে।

এবারে পেয়েছি আইনের সাহায্য। তাই আর অবাধ্যতার চেষ্টা করল না ও। তা ছাড়া আমার বিপন্ন মুখচ্ছবি দেখেও বোধ করি দয়া হল ওর। সিটের পেছনে হেলে পড়ে কনস্টেবলের মুখের ওপরেই দড়াম করে দরজাটা ও বন্ধ করে দিলে।

'বেশি দেরি কোরো না যেন!' হাসি মুখে বলে ও।

গাড়ি ততক্ষণে স্টার্ট নিয়েছে। কবিতার কথার উত্তরস্বরূপ কোনওরকমে একটা কাষ্ঠহাসি ঠোঁটের কোণে ফুটিয়ে তুললাম আমি। তারপরেই মূল্যবান সুটকেসটা আঁকড়ে ধরে সচল গাড়ি-

অরণ্যের মধ্য দিয়ে হর্নের বিকট শব্দ উপেক্ষা করে দ্রুত এগিয়ে চললাম অপর দিকের ফুটপাতে। মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্বন্ধে উর্দিপরা কয়েকজন ড্রাইভারের কটূক্তি শুনতে-শুনতে ওপাশে পৌঁছে জেট-গতিতে এগিয়ে চললাম হনলুলু স্যামের দোকানের দিকে।

ভেতরে ঢুকেই লাল কাগজের মেমোটা আছড়ে ফেললাম কাউন্টারের ওপর। তারপর সুটকেস রেখে স্ট্র্যাপ খুলতে-খুলতে জোর হাঁক দিলাম, 'কই হে, গেলে কোথায়? জলদি, জলদি করো—চটপট বার করো জামাপ্যান্টগুলো।'

ধীরে-সুস্থে পেছনের আলমারির ফাঁক থেকে যে-মূর্তিটি বেরিয়ে এল, সে হনলুলু স্যাম নয়। বয়েসের ভারে ন্যুব্জ এক চীনা বৃদ্ধ—নাকের ডগায় ধূমাচ্ছন্ন লেন্সের একটা ট্যারাবাঁকা চশমা। হনলুলু তাহলে দোকানে নেই—কাজে গেছে নিশ্চয়।

সুটকেস ততক্ষণে খোলা হয়ে গেছে। ডালাটা তুলে ধরে অধৈর্য স্বরে চেঁচিয়ে উঠলাম, 'হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলে কেন হে? জলদি বার করো প্যাকেটটা।'

কিন্তু চটপট কাজ না করার মহা গুণটি বোধহয় চীনা বুড়োর জন্মগত। তাই ধীরে-সুস্থে চশমার ধোঁয়াটে লেন্স দুটো জামার ঢলঢলে হাতায় মুছে তুলল লাল মেমোটা। তারপর র‍্যাকের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল অসহায় ভঙ্গিমায়।

'প্লিজ! প্লিজ!' মিনতিতে করুণ হয়ে ওঠে আমার স্বর : 'বাড়তি টাকা দিয়েছি এ জন্যে—হনলুলু স্যাম আমায় কথা দিয়েছে সাড়ে পাঁচটায় ডেলিভারি দেবে। দাও, দাও আমায়, দেখি—ধুত্তোর, কী যে ছাই লিখেছে, বুঝতেই পারছি না কিছু। আরে গেল যা, তুমি আবার হাঁ করে তাকিয়ে রইলে কেন—দ্যাখো না ওদিককার আলমারিতে।'

এমন ভর্ৎসনা মেশানো চোখে আমার দিকে তাকাল বৃদ্ধ, যার অর্থটা দাঁড়ায় 'শান্ত হও, শান্ত হও, এত হুটোপাটি কেন?' চশমার কাচদুটো আবার ধোঁয়াটে হয়ে উঠেছিল। সেইভাবেই আবার ধীবে সুস্থে এগিযে গিয়ে দাঁড়াল আলমাবিব সামনে। আর কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁত কিড়মিড় কবে মুণ্ডপাত করতে লাগলাম প্রায় অন্ধ স্থবিবটার। কিছুক্ষণ পরে বেশ বড় আকারের একটা প্যাকেট টেনে নিয়ে এগিয়ে এল ও। হাত থেকে তা ছিনিয়ে নিয়ে সুটকেসে পুরে স্ট্র্যাপ লাগাতে লাগলাম দ্রুত হাতে। তখনও লাল মেমোটা নাকের ছ'ইঞ্চি দূরে রেখে চোখের কসরত করছিল বুড়ো চীনেটি।

বেশ কিছুক্ষণ পর বলল ও, 'থ্রি লুপিজ।'

'দারুণ সস্তা রে!' বাংলায় মন্তব্য কবে চটপট বার করে দিই পাঁচ টাকার একটা নোট। তারপর ওর হাত থেকে রুপোর টাকা দুটো একবকম ছিনিয়ে নিযে পকেটে পুরতে-পুরতে ছুটলাম দরজার দিকে। চীনেটি ততক্ষণে জামার ঢিলে আস্তিন দিয়ে আবার চশমার কাচ মুছতে শুরু করেছে।

'জোরে হাঁটো' প্রতিযোগিতায় প্রথম হওয়ার মতো জোরে হেঁটে যখন গোয়ালিয়র ট্যাঙ্কের নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছলাম, দেখি, জমকালো গাড়িখানা পথের পাশেই দাঁড়িয়ে আমার জন্যে। উর্দিপরা ড্রাইভারের ঝকঝকে তকমা আঁটা নেপালি সহকারী বাইরেই দাঁড়িয়েছিল। হাঁপাতে-হাঁপাতে পৌঁছনোমাত্র সুটকেসটা হাত থেকে টেনে নিয়ে খুলে ধরল পেছনের দরজা। ক্ষণেকের জন্যে শ্বাস রুদ্ধ রেখে পরমুহূর্তেই উঠে পড়লাম ভেতরে। মাঝের কোলাপসিবল চেয়ার দুটোর একটায় বসেছিল কবিতা—অপরটা দখল করলাম আমি। ওর দিকে ফিরে বসলাম আমি—কবিতাও কাত হয়ে ফিরল আমার দিকে; তারপর শুরু হল আলাপ-পরিচয়।

'পিসিমা, ইনিই মৃগাঙ্ক, মৃগাঙ্ক রায়।' মাথা হেলিয়ে হালফ্যাশানি কায়দায় অভিবাদন জানালাম আমি। পেছনের সিটে স্থান অকুলান হওয়ার মূল কারণ বিপুলকায়া রাশভারী প্রকৃতির মহিলাটিও মাথা হেলালেন—তবে কঠোর চোখে।

'সোমনাথকাকাকে চেনো তো?' বলে চলে কবিতা, 'চিনবে বইকি, ওঁর কাগজেই তো কাজ করো তুমি।'

অন্নদাতা ভদ্রলোকের বরফ-ঠান্ডা মসৃণ চোখে চোখ রাখলাম আমি। সোমনাথ মুখার্জিকে দেখতে অনেকটা কুস্তিগীর পালোয়ানের মতো। তাঁর অত নামডাকের মূল কারণ অবশ্য তা নয়।

'নমস্কার স্যার।' একটু অস্বস্তির সঙ্গেই বলি আমি। ভদ্রলোকের চোখ দুটো যেন বরফ দিয়ে তৈরি একজোড়া ধারালো ছুরি।

'আর ইনি আমার বাবা। বাবা, ইনিই মিস্টার রায়।'

রোগা-রোগা ছোট্ট একটা হাত আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন সোমেশ রায়। মানুষটি সত্যিই খুব ছোটখাটো। প্রখ্যাত শিল্পপতির নাম করলেই যেরকম ছবিটি ভেসে ওঠে চোখের সামনে, সে ধরনের নয় মোটেই। ভাবলেশহীন শীর্ণ মুখ—কিন্তু চোখ দুটো বেশ স্বপ্নমদির। সে-চোখ দেখে কিছুতেই অনুমান করা যায় না যে, কী প্রখর ব্যক্তিত্ব ঘুমিয়ে আছে তাঁর ওই শান্ত-সুন্দর মণিকাব অন্তরালে। আর যে-বজ্রকঠিন ব্যক্তিত্বের সামান্য স্ফুরণমাত্রই প্রতিপক্ষের অর্ধেক সাহসই যায় উবে, তাব ছায়াও ছিল না তাঁর স্বপ্নাচ্ছন্ন দুই চোখে, ভাবলেশহীন প্রশান্ত মুখে। পক্ষান্তরে, পাশেই বিন্ধ্যাচলেব মতো আসীন মহিলাটি তাঁব চেয়েও অনেক বেশি ব্যক্তিত্ব ফুটিয়ে তুলেছিলেন তাঁব সর্ব অবযবে। ভদ্রমহিলা সে-বিষয়ে বেশ সচেতনও বটে।

সোমেশ বায়ই প্রথম কথা বললেন, 'খুব খুশি হলাম আপনাব সঙ্গে আলাপ কবে। কবিতা তো প্রায়ই আপনার কথা বলে আমায়।'

বিগলিত সুরে বললাম, 'আপনাদের পার্টিতে আমন্ত্রণ জানিযে আমাব যা উপকার করলেন—।'

'অফিসের কাজেই আসা হয়েছে নিশ্চয?' কীবকম যেন রুক্ষ স্বরে শুধোলেন সোমনাথ মুখার্জি।

একটু থতমত খেযে গেলাম আমি। কিছু বলাব আগেই কিন্তু সোমেশ বায উত্তব দিলেন, 'আরে তা তো আছেই। কাজ তো আব চব্বিশ ঘণ্টা নয। তা মিস্টাব বায়, তাবাপদ তবফদাব মানুষটা বড় চমৎকার। প্রবন্ধের বেশ কিছু খোরাক পেয়ে যাবেন ওঁর কাছে। কিন্তু কাজ নিযে এসেছেন বলে পার্টির আনন্দ থেকে দূরে থাকবেন, তা চলবে না—এমনকী সোমনাথ থাকলেও নয়।' বলে যুগপৎ আমার আর সোমনাথ মুখার্জির দিকে তাকিযে মুচকি হাসি হাসলেন সোমেশ বায।

প্রত্যুত্তরে আপনাহতেই একটু হাসি ফুটে উঠল আমার ঠোঁটে। মুখে বললাম, 'চেষ্টা করব, স্যার।'

অস্বস্তির ভাবটা কাটিয়ে দিব্যি সহজ হয়ে উঠলাম এরপর। বাস্তবিকই, সোমেশ রায় ধনকুবের হলেও মানুষ হিসেবে অতি চমৎকার।

গাড়ি তখন গ্রান্ট রোডের মোড় ঘুরেছে। সোমেশ রায় বললেন, 'আচ্ছা, পার্টিটা খুব নীবস, নিরানন্দ হয়ে যাচ্ছে না তো? আপনি কী বলেন, মিস্টাব বায?'

উত্তর দিল কবিতা, 'সে আর এমনকী নতুন ব্যাপার, বাবা। তাই না পিসিমা?'

'তাব শুরু তো দেখছি এখন থেকেই হল।' ফোঁস কবে বলে নাসিকা কুঞ্চন কবলেন পেছনের সিটের বিন্ধ্যাচলটি।

সোমেশ রায় বললেন, 'সে যাই হোক, মিসেস প্যাটেল তো আসছেনই।'

'মিসেস প্যাটেল!' ঘন ঝোপের মতো পুরু ভুরুজোড়া ওপরে তুললেন সোমনাথ মুখার্জি।

'ভুরু দুটো যে একেবারেই ওপরে তুলে ফেললে হে!' পরিহাস-তরল কণ্ঠে বলেন সোমেশ রায়ঃ 'ভদ্রমহিলা হিসেবে মিসেস প্যাটেলের জুড়ি মেলা ভার শুনেছি। স্বচক্ষেই দেখব তা। অনেকদিন সিলোনে ছিলেন। তাই ওখানকার হালচাল সম্বন্ধে ওঁর সঙ্গে আমার কিছু কথাবার্তা হওয়া দরকার। জানোই তো, নিছক ফুর্তির জন্যে এবার আমি বেরোচ্ছি না। ফিবে আসার আগে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দুটো প্রশ্নের উত্তর আমায় জানতে হবে। সিলোন গভর্নমেন্টের কাছ থেকে মানোয় নদীতে ব্রিজ তৈরির যে-কনট্র্যাক্টটা পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে—তা নিয়ে এখনও পর্যন্ত কিছুই স্থির করা হল না। তোমাকে

তো এ-বিষয়ে আগেই একবার বলেছিলাম না? কাজটা আদৌ শুরু করব কি না সেই চিন্তাই ঘুরছে এখন মাথায়। মিসেস প্যাটেল আর ডক্টর তরফদারের সঙ্গে দু-চার কথা কইলেই মনস্থির করে ফেলতে পারি।'

সোমনাথ মুখার্জি বললেন, 'শুনলাম, চুনীলাল দয়াভাইও নাকি এ-ব্যাপারে উঠে-পড়ে লেগেছে? তা যদি হয়, তাহলে কিন্তু তুমি বিশেষ সুবিধে করে উঠতে পারবে বলে মনে হয় না।'

'তোমার মনে হওয়াটা যে চিরকালই একটা আজব ব্যাপার, তা ভালো করেই জানি। দয়াভাই যে একটা পাকা জোচ্চোর, তা কে না জানে? আমি যদি উঠে-পড়ে লাগি, তাহলে দয়াভাইয়ের ক্ষমতা নেই কনট্র্যাক্টটা ছিনিয়ে নেয় আমার হাত থেকে। শুনলাম, সেই কারণেই আমি কী করি-না-করি তা জানার জন্যে খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে বেচারা। যদি মনে করি, তাহলে ওর খেলা আমি একেবারেই সাঙ্গ করে দিতে পারি।' বলে হাসলেন সোমেশ রায়। সে-হাসিতে এবার আমি স্বপ্নের ছায়াও দেখলাম না। বললেন, 'যাই হোক, এখনও তো ক'টা দিন রয়েছে হাতে। এ মাসের শেষ তারিখ পর্যন্ত সময় পাচ্ছি আমি।'

'আরও একটা প্রশ্নের কথা বলছিলে না?' বলেন সোমনাথ মুখার্জি।

'অ্যাসেম্বলির ইলেকশান। আমি দাঁড়াব কি না ভাবছি।'

'বাবিশ।' গবগর করে ওঠেন মিঃ মুখার্জি : 'এসব বাজে ঝামেলায় আবার মাথা গলাচ্ছ কেন?'

পিসিমা মুখ খুললেন এবার : 'আমিও তাই বলছিলাম। কী দরকার এসব বাজে ব্যাপার নিয়ে সময় নষ্ট করার?'

হাসিমুখে বললেন সোমেশ রায়, 'আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রত্যেক মানুষেরই অল্পবিস্তর থাকে। এই কারণেই তো দেশমুখকে সঙ্গে নিচ্ছি আমি। আইনজ্ঞ বটে, কিন্তু রাজনীতির প্রশ্ন উঠলে ক্রেমলিন থেকে হোয়াইট হাউস পর্যন্ত সব কিছুই নখের ডগায় ফুটিয়ে তুলতে পারেন।'

'দেশমুখ!' স্বরের তিক্ততা আর গোপন রাখেন না সোমনাথ মুখার্জি।

পেছনের বিন্ধ্যাচলটি সময় বুঝে আবার সরব হয়ে ওঠে : 'যত্ত সব আজেবাজে লোকের ভিড়।'

আমার কিন্তু মনে হল, কথাটি বিশেষ সুরে বলে যেন একটু বিশেষ চোখেই তাকালেন আমার দিকে। মনে-মনে একটু সঙ্কুচিত হয়ে পড়ি আমি।

'সাধারণ পার্টির একঘেয়েমি কাটিয়ে কতটা বৈচিত্র্যের আয়োজন করেছি দেখো।' বলে চলেন সোমেশ রায়, 'আর সেইজন্যেই তো আমন্ত্রণ জানিয়েছি অলোক ঘোষকে।'

'অলোক ঘোষকে। চমৎকার। কবিতার তো খুশি হওয়া উচিত এ-খবর শুনে।' বলে আবার খরখরে চোখে পিসিমা তাকালেন আমার দিকে—এবারও সে-দৃষ্টির তাৎপর্য বড় গূঢ়।

বুঝলাম, ওঁরা রায় কোম্পানির অন্যতম ডাইরেক্টর অলোক ঘোষের কথা বলছেন। সম্ভ্রান্ত ঘরের ছেলে অলোক ঘোষ—সামাজিক প্রতিষ্ঠা তাঁর যথেষ্ট। তাঁর সঙ্গে কবিতার বিয়ের গুজব একাধিকবার শুনেছি শহরের অভিজাতমহলে। কবিতার দিকে আড়চোখে তাকালাম আমি—ও কিন্তু দেখি নির্বিকারভাবে তাকিয়ে রয়েছে সিধে সামনের দিকে। ওর স্নিগ্ধ সুন্দর মুখ দেখে বোঝার উপায় নেই ওর মনের চিন্তাধারা।

গাড়ি তখন বোরিবন্দরের সার্কেলটা ঘুরছে।

হঠাৎ কথা কইলেন সোমনাথ মুখার্জি, 'সত্যিই আশ্চর্য।'

'কী আশ্চর্য?' শুধোন সোমেশ রায়।

'আশ্চর্য হচ্ছি এই জন্যে যে, আজকের দিনে তুমি এত লোককে হঠাৎ নিমন্ত্রণ করে বসলে কেন।'

'কেন, হয়েছে কী তাতে?'

'একে বেস্পতিবারের বারবেলা, তার ওপর ইংরেজি মাসের তেরো তারিখ।'

'বারবেলা! তেরো তারিখ! তাই তো হে, আমার তো একেবারেই খেয়াল ছিল না।'

পেছন ফিরে সোমেশ রায়ের মুখের অকস্মাৎ গাম্ভীর্য দেখে বেশ অবাক হয়ে গেলাম আমি।

মুচকি হাসলেন সোমনাথ মুখার্জি, 'আমার তো মনে হয় না তোমার তা খেয়াল ছিল না। তোমার দুর্বলতা তো আমার অজানা নয়।'

'দুর্বলতা? কী সব আজেবাজে বকছ? ওসব বাজে সংস্কার সোমেশ রায়ের নেই।' বলে একটু হাসলেন উনি। স্বপ্নাচ্ছন্ন চোখ দুটিতে খুশির আলো ঝিলিক দিয়ে ওঠে : 'যতক্ষণ পয়মন্ত রুপোটা পকেটে রয়েছে আমার, ওসব তুচ্ছ কারণকে না ডরালেও চলবে আমার।'

পয়মন্ত রুপো? কবিতার দিকে তাকালাম আমি।

'এই,' ফিক করে হেসে ফেলে ফিসফিস করে বলে ও, 'বাবাকে যেন ও-কথাটা আবার জিগ্যেস করে বোসো না। অবশ্য আমার অবর্তমানে সে-দুরবস্থা তোমার হবে না ঠিকই—তবে এখন চুপ।'

আলেকজান্দ্রা ডকের সামনে গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছিল। এখানে মস্ত বড় একটা স্টিমশিপ কোম্পানির হোমরাচোমরা শেয়ার-হোল্ডার ছিলেন সোমেশ রায়। ভেতরে জেটির কাছে গিয়ে দেখি বেশ ঝকঝকে একটা লঞ্চ ভাসছে জলে। আরও চারজন অভ্যাগতের সঙ্গে আলাপ হল সেইখানেই। কবিতাই সে পর্বটা চটপট সেরে দিলে।

শিবেন্দ্র দেশমুখের সঙ্গে আলাপ আমার আজকের নয়। শেখর শর্মার নির্দেশে বহুবার তাঁর সঙ্গে আমাকে দেখা করতে হয়েছে। পুরুষের মতো দশাসই চেহারা ভদ্রলোকের। কথাবার্তা কিন্তু খুব মোলায়েম।

বছর তিরিশ বয়স অলোক ঘোষের। ছিমছাম, মার্জিত চেহারা। ধরন-ধারণ ইংরেজি ঘেঁষা। পোশাক-পরিচ্ছদে কিন্তু উগ্র মার্কিনি ছাপ। মৃগাঙ্ক রায়ের সঙ্গে আলাপ করার কোনও আগ্রহই তাঁর ছিল না এবং তা গোপন করারও কোনও প্রচেষ্টা তিনি করলেন না।

বহু আয়াস সত্ত্বেও যে বয়েসে আর যৌবনের ঔজ্জ্বল্য ফুটিয়ে তোলা যায় না, সেই বয়েসে এসে পৌঁছেছিলেন মিসেস প্যাটেল। যৌবনকালে নিশ্চয় পরাশ্রয়ী লতাবিশেষ ছিলেন ভদ্রমহিলা। এখন অবশ্য কিছু অবাঞ্ছিত মেদের আবির্ভাবে সুডৌল দেহরেখাগুলি লোপ পাওয়ায় সুপুষ্ট আশ্রয়গুলোও হঠাৎ ভোজবাজির মতো মিলিয়ে গেছে। তাতে কিন্তু মোটেই দমেননি তিনি। পুরোদমে কিউটেক্স-লিপস্টিক-ম্যাক্স ফ্যাক্টর দিয়ে চেষ্টা করছেন পুরোনো অভ্যাস বজায় রাখার।

ডক্টর তারাপদ তরফদারকে দেখে কিন্তু অনেকটা শান্তি পেল আমার চোখ দুটো। চেহারা বটে তাঁর। লম্বায় সাড়ে ছ'ফুটের কম তো নয়ই—সেইসঙ্গে যেমনি চওড়া তাঁর বুকের ছাতি, তেমনি সুপুষ্ট তাঁর কাঁধের মাংসপেশি। সে-স্বাস্থ্য দেখে তরুণী তো দূরের কথা, অনেক পুরুষেরও মাথা ঘুরে যায়। রেশমের মতো একমাথা নরম ঢেউতোলা চুল, রাঙা মুখ আর পরনে ট্যুইডের মূল্যবান সুট। ভদ্রলোক কিন্তু যতবার কবিতা রায়ের দিকে হাসিমুখে তাকাচ্ছিলেন, ততবারই কীরকম যেন খচখচ করে উঠছিল আমার বুকের ভেতরটা। শুধু আমি কেন, সুপুরুষ অলোক ঘোষও বোধ করি অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছিলেন মনে-মনে; তাই মাপজোক করা সূক্ষ্ম হাসি আর মার্জিত কথার মধ্যে দিয়েও মাঝে-মাঝে প্রগলভ হয়ে ওঠার চেষ্টা করছিলেন কবিতার সঙ্গে।

সাদা পোশাক পরা নেপালি পরিচারক দুজন আমাদের মালপত্র তুলছিল লঞ্চে। ওদের কাজ শেষ হলে পর অভ্যাগতরা একে-একে উঠতে শুরু করলেন। আমার ইচ্ছে ছিল কবিতার ঠিক পাশের আসনটি দখল করা। কিন্তু তারাপদ তরফদার আর অলোক ঘোষ এদিক দিয়ে আমার চেয়ে আশ্চর্য রকমের তৎপর। আমাকে হতবুদ্ধি করে দিয়ে এমন ঝটিতি দুজনে এগিয়ে গেলেন যে, শুধু দীর্ঘশ্বাস

ফেলা ছাড়া গত্যন্তর রইল না আমার। যাত্রারম্ভেই প্রতিযোগিতার এই নমুনা দেখে অনুমান করে নিলাম, দুই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীকে নিয়ে শুরু হবে আমার সংগ্রাম। করুণ নয়নে একবার তারাপদ-অলোক বেষ্টিত কবিতাকে দেখে নিয়ে বসলাম মিসেস প্যাটেলের পাশে।

ফটফট শব্দে জল কেটে লঞ্চটা এগিয়ে চলল 'জলপরী' লেখা সোমেশ রায়ের বিরাট স্টিম-বজরার দিকে।

বজরার একপ্রান্তে দুপাশে ডানামেলা মস্ত বড় একটা জলপরীব হাসি-হাসি মুখের দিকে বিরস-বদনে তাকিয়ে বসেছিলাম, এমন সময়ে হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন মিসেস প্যাটেল।

'কী মজা। কতদিন যে স্টিমার-পার্টিতে আসিনি! ওঃ, সে যে কত যুগ হয়ে গেল তার হিসেব নেই!'

আশ্চর্য কী। মনে-মনেই বলি আমি। সাগর-বিহারে যাওয়ার বয়স বেশ কয়েক বছর আগেই ফেলে এসেছেন আপনি। মুখে বললাম, 'যাই বলুন, বড়লোক হওয়ার অনেক সুবিধে, তাই না?'

'সত্যি কথাই বলেছেন।' বলে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন মিসেস প্যাটেল : 'নিজের চেষ্টায় কোটিপতি হওয়ার মধ্যে যে-তৃপ্তি আছে, তার তুলনা নেই। আমাকে কিন্তু আপনার সব কথাই বলতে হবে—কিছুই তো জানি না আমি।'

'আমি!' প্রমাদ গনি আমি : 'মস্ত একটা ভুল করে ফেললেন মিসেস প্যাটেল। কোটি কেন, হাজারের ঘরে যাওয়ার ক্ষমতাও আমার নেই। সামান্য একজন রিপোর্টার আমি।'

'রিপোর্টার।' একটু ফিকে হয়ে আসে প্রৌঢ়ার হাসি। কিন্তু প্রশংসনীয় ক্ষিপ্রতার সঙ্গে পরমুহূর্তেই আবার সুর তোলেন : 'সে তো আরও চমৎকার। রিপোর্টার—তার মানে—তার মানে হাজার রকমের অভিজ্ঞতা জমিয়ে রেখেছেন আপনার ঝুলিতে। ও, ওয়ান্ডারফুল। আমাকে কিন্তু সব বলতে হবে।'

সপ্তদশী সুলভ 'আমাকে কিন্তু সব বলতে হবে' চপল সুরের অনুরণন প্রৌঢ়ার কণ্ঠে শুনে ভেতরে-ভেতরে বেশ সন্ত্রস্ত হয়ে উঠি আমি। বলি, 'নিশ্চয়। কাজের ঝামেলা না থাকলে এন্তার গল্প করা যাবে আপনার সঙ্গে, কী বলেন?'

'কাজেব ঝামেলা?' পেনসিল আঁকা ভুরু দুটো একটু ওপরে উঠে গেল।

'ইয়ে—মানে ডক্টর তরফদারের সঙ্গে আমায় একটু বসতে হবে বলেই আমার আগমন এখানে। ভদ্রলোক সিংহলে বেশ কিছুদিন ছিলেন তো—অভিজ্ঞতা ওঁর প্রচুর।'

বাঁকা ভুরুটা আবার নেমে এল স্বস্থানে। এবার লিপস্টিক-রঞ্জিত অধর বেঁকিয়ে হাসলেন মিসেস প্যাটেল।

'বটে। আপনি বোধ হয় জানেন না, ডক্টর তরফদার আমার বহুদিনের—ইয়ে—বন্ধু। সিংহলে থাকার সময়ে আমাদের পরিচয় হয়। ভদ্রলোক কথা বলেন সুন্দর, গল্পও জমাতে পারেন চমৎকার। তবে কী জানেন, ওঁর সব কথাই ধ্রুবসত্য বলে বিশ্বাস না করলেই বুদ্ধিমানের কাজ করবেন। একটু বেশি রকমের কল্পনাপ্রবণ কিনা, তাই।'

বলে, সুর্মা-আঁকা চোখ তুলে তাকালেন অদূরে তরফদারের পানে—সে-দৃষ্টিতে বন্ধুত্বের বাষ্পটুকুও দেখলাম না। তরফদার তখন অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে যুগপৎ হাত আর মুখ নেড়ে কোনও গূঢ় বিষয় বোঝাবার চেষ্টা করছিলেন কবিতাকে।

'জলপরী'-র ডেকে ক্যাপ্টেন দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল। লঞ্চ এসে দাঁড়াতেই কেতাদুরস্ত অভিবাদন জানালে সোমেশ রায়কে। সাদা ইউনিফর্ম পরা নেপালিরা আমাদের মালপত্র তুলতে লাগল ওপরে।

সবাই উঠে আসার পর বললেন সোমেশ রায়, 'ঠিক সাড়ে সাতটার সময়ে ডিনারের আয়োজন হয়েছে। আপনাদের মালপত্র ঘরে পৌঁছে যাওয়ার পর চলে আসুন সবাই স্মোকিংরুমে—গল্পগুজব করা যাবে। কী বলেন?'

'আর আমরা?' পেছন থেকে কবিতা বলে ওঠে, 'আমরা কি ডেকে দাঁড়িয়ে সমুদ্রের হাওয়া খাব?'

'আরে-আরে, তা কেন! মেয়েরাও তো আসবে।' বলে হাসলেন সোমেশ রায়, 'আমি ভাবলাম মেয়েরা বুঝি ব্যস্ত থাকবে অন্য কিছু নিয়ে!'

আসলে, মেয়েদের কথা তিনি একেবারেই ভুলে গেছলেন। ওঁর প্রকৃতিই এইরকম। নিজে পুরুষসিংহ, তাই অন্তরে-অন্তরে পছন্দ করেন পুরুষদেরই সান্নিধ্য।

মাথায়, পিঠে, দু-হাতে বিপুলায়তন সুটকেস, কিটব্যাগ ঝুলিয়ে একজন নেপালি এসে বিনীতভাবে আহ্বান জানালে আমায়। পিছু-পিছু এগিয়ে গেলাম আমি। সঙ্গে দেখি তরফদারও এলেন। দেখেই সন্দেহ হল হয়তো-বা একই ঘর ভাগাভাগি করে থাকতে হবে দুজনকে। আর, তার পরিণাম যে কী, তা না বললেও চলে। ওই পর্বত-প্রমাণ মালপত্র সমেত ভদ্রলোক বিনা বাক্যব্যয়ে ঘরের তিন-চতুর্থাংশ দখল করে নির্বিকারভাবে চতুর্থ কোণটিতে আমায় নিক্ষেপ করবেন।

সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে আসার পর নেপালিটা কিন্তু অতি কষ্টে একটু কাত হয়ে আমার সুটকেসটা নামিয়ে রেখে বাকি মালপত্র সমেত পাশের দরজা দিয়ে অদৃশ্য হল ভেতরের কেবিনে। তরফদারও গেলেন পেছনে। ভেতর থেকে শুনলাম নেপালি স্বর, 'আপকা কামরা।' তারপর বেরিয়ে এসে তুলে নিলে আমার সুটকেস। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম আমি। এক ঘরে একসঙ্গে থাকাটা মোটেই পছন্দ হয় না আমার।

ঠিক পরের দরজাটা খুলে ধরল নেপালিটি—সুটকেস ভেতরে রেখে জানালে এ-ঘর আমার।

'বাঃ চমৎকার। সব ঘরটাই আমার তো?'

'জি হাঁ সাব। জলপরীমে ফিফটিন বেডরুম হ্যায়।'

'বহুত আচ্ছা। জলপরী জিন্দাবাদ।'

'বাথরুম ইধার হ্যায়,' বলে পাশের ছোট্ট ঘরটা খুলে ধরল সে।

ভেতরে উঁকি মেরে দেখে তাজ্জব বনে গেলাম। মাইশোর গেস্ট হাউসের বাথরুমের মতো ঝকমক করছে ভেতরটা—নিষ্কলঙ্ক সিঙ্ক আর আয়নার ঝিলমিলে রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম।

হঠাৎ ওপাশের দরজাটা খুলে গেল—তারপরই দরজার ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এল তরফদারের ক্রুদ্ধ মুখ। পরক্ষণেই দড়াম করে দরজা বন্ধ করে অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

'দো আদমি কা বাথরুম, সাব। আপকাভি।' বলে বেচারি নিজেও যেন একটু অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতে থাকে।

মেজাজ গরম হয়ে উঠেছিল আমার। বললাম, 'সে-কথাটা ওদিককার সাবকে আগে ভালো করে সমঝে দিয়ে এসো—নইলে ও-বাথরুমে ইহজীবনেও ঢুকছি না আমি।'

বেরিয়ে যায় নেপালি-নন্দন। পাশের কেবিনে শুনলাম ওর কণ্ঠস্বর। তারপরই বাথরুমের লকে শব্দ হল ক্লিক এবং পরক্ষণেই ছোট দরজা খুলে সে ফিরে এল ঘরে। একগাল হেসে বললে, 'ঠিক হ্যায় সাব।'

'ঠিক হ্যায়। কেয়া নাম হ্যায় তুমহারা?'

'বলবাহাদুর।'

'বহুত আচ্ছা বলবাহাদুর—' বলে দু-টাকার একটা নোট তুলে দিলাম ওর হাতে। আর-একটু ছড়িয়ে পড়ে বাহাদুরের হাসি।

'উহু, সাব দরওয়াজা বন্ধ করকে চলা গ্যায়া। আপনি এদিক দিয়ে গিয়ে—।'

'ঠিক হ্যায়, ঠিক হ্যায়। ঠিক সময়ে স্নান সেরে নেব আমি, ঘাবড়াও মাত।'

নোটটা একবার উলটেপালটে দেখে নিয়ে টোকা মেরে সযত্নে পকেটে রেখে অন্তর্হিত হল বলবাহাদুর।

পোর্টহোলের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম কিছুক্ষণ। বাইরে নীল আকাশকে অস্পষ্ট করে ছায়া-ধূসর গোধূলি নেমেছিল বোম্বাই নগরীর ওপর— প্রাসাদ শীর্ষ বুকে নিয়ে যেন সমস্ত পাষাণপুরীটাই দুলছিল আরব সাগরের নীল কোলে। ভাবলাম, এই তো জীবন। নিশ্চিন্ত, নিরুদ্বেগ, নিরঙ্কুশ।

ঘরের মধ্যে আর-একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে পা বাড়ালাম বাইরে।

ওপরের ডেকেই মুখোমুখি হয়ে গেল সোমেশ রায়ের সঙ্গে। আমাকে দেখেই সোল্লাসে অভ্যর্থনা জানালেন উনি।

'আসুন, আসুন, চলুন সবাই মিলে স্মোকিংরুমে, গল্পগুজব করা যাবে।'

আগে থেকেই স্মোকিংরুমে এসে বসেছিলেন সোমনাথ মুখার্জি। শুধু বসেছিলেন না, উর্ধ্বমুখ হয়ে 'নোটিলস' আকারের একটা চুরুট থেকে সশব্দে এবং সবেগে ধূমোদগীরণ করছিলেন।

আমরা ঢুকতেই শুধোলেন উনি, 'কারেন্ট ম্যাগাজিনের প্যাকেটটা এনেছ, সোমেশ?'

'বলা বাহুল্য। কিন্তু এসেছ দু-দিন সমুদ্রের হাওয়া খেতে, এখানে ম্যাগাজিন পড়ার কী দরকারটা শুনি?' বলেন সোমেশ রায়।

'ও তুমি বুঝবে না। কারবার তো করো লোহালক্কড় নিয়ে—এসব ব্যাপারের কী বুঝবে হে?'

'শোনো কথা। আরে, এই তো সাংবাদিক ভায়া এসেছেন। ইনিও কী সঙ্গে ম্যাগাজিন এনেছেন বলতে চাও?'

'আনা উচিত ছিল।' গম্ভীর স্বরে বলেন সোমনাথ মুখার্জি।

'ইয়ে...মানে—' গলাটা একটু সাফ করে নিয়ে বলি আমি, 'এত তাড়াতাড়ি এলাম যে জামাকাপড় গুছোবারই সময় পেলাম না। তা না হলে—।'

দেশমুখ ঢুকলেন ঘরে।

'মিস্টার রায়, স্টিমার-পার্টির নাম করে এ যে একেবারে জাহাজে এনে ফেললেন দেখছি।'

'জাহাজ আর কোথায় বলুন!' খুশি-খুশি স্বরে বলেন সোমেশ রায়, 'দেখতে-শুনতে মোটামুটি মন্দ নয়—এই যা।'

'মন্দ নয়। এমন সুন্দরভাবে সাজানো, এত বড় বজরা তো আমি জীবনে দেখিইনি, তার ওপর—।'

'আপনার জাহাজি কথা এখন থাকুক, মিস্টার দেশমুখ।' বাধা দিয়ে বললেন সোমনাথ মুখার্জি : 'সোমেশের মাথায় একটা উদ্ভট খেয়াল ঢুকেছে। অ্যাসেম্বলির ইলেকশানে নামবার বদ মতলব কে যে ওর মাথায় ঢুকিয়েছে জানি না, কিন্তু ওর যে মুখে চুনকালি মাখাই সার হবে, সে-বিষয়ে কোনও সন্দেহই নেই আমার।'

'আমার কিন্তু তা মনে হয় না,' জবাব দিলেন দেশমুখ,'আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সাফল্যের ষোলো আনা সম্ভাবনাই রয়েছে ওঁর। আপনি নেমে পড়ুন মিস্টার, তারপর আমরা তো রইলামই।'

স্মিত মুখে বললেন সোমেশ রায়, 'এখনও তো পাকাপাকিভাবে কিছুই ভেবে উঠিনি। পরে এ-প্রসঙ্গে আরও কথাবার্তা আছে। আরে, ডক্টর তরফদার যে, আসুন-আসুন। তারপর বলুন, ঘর কীরকম পেলেন? মনের মতো হয়েছে তো?'

'ওয়ান্ডারফুল! স্টিম এঞ্জিনে চলে, অথচ ভেতরে-বাইরে জমিদারি বজরার কায়দায় সাজানো—এরকম জলযানে তো মশায় আমার আগমন এই প্রথম। আর এ জন্যে যে আপনাকে কী ভাষায় ধন্যবাদ দেব, তা ভেবে পাচ্ছি না, মিস্টার রায়।'

'আপনাকে কিন্তু এখানে আমন্ত্রণ জানানোর মূলে আমার উদ্দেশ্য আছে প্রচুর। এই যেমন ধরুন না কেন, সিংহলে একটা বড় রকমের কাজে হাত দেওয়ার ইচ্ছে আছে। সে-বিষয়ে আপনার পরামর্শ দারুণ প্রয়োজন। তা ছাড়া—।'

'সিংহল সম্বন্ধে যা কিছু জানি, তা যদি আপনার কোনও কাজে লাগে, তাহলে সত্যিই খুব খুশি হব আমি। অবশ্য আমার পরামর্শ কতটা কার্যকরী হবে, সে-বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে যথেষ্ট। আপনি ব্রিজ কনট্র্যাক্টের কথা বলছেন, না?'

'ধরেছেন ঠিক। খুব সিরিয়াসলি ভাবছি ব্যাপারটা।'

'কাজটা কিন্তু বেশ ঝুঁকির। কাজে নামার আগে অনেক কিছু খুঁটিনাটি ব্যাপার নিয়ে চিন্তা করা দরকার। কিন্তু তাতেও এর রিস্ক কমবে বলে মনে হয় না।'

'আপনার সঙ্গে আমিও একমত, ডক্টর।' বললেন অলোক ঘোষ। সবে ভেতরে এসে একটা কাউচ দখল করেছিলেন উনি।

'কিন্তু জানোই তো, ঝুঁকি আমি ভালোবাসি।' স্মিত মুখে বললেন সোমেশ রায়।

'তা জানি। কিন্তু তারও একটা সীমা আছে তো।' একটু ঝুঁকে পড়ে বললেন অলোক ঘোষ, 'আপনি যাই বলুন কাকাবাবু, এ ব্যাপারে কিছুতেই আপনার সঙ্গে আমি একমত হতে পারব না।'

'বার্মার লাইট হাউসের ব্যাপারেও হওনি।'

'সেক্ষেত্রে ভুল হতে পারে—কিন্তু এবার আর নয়। আবার বলছি আমি, এ ব্যাপারে নাক না গলানোই মঙ্গল। আপনি কী বলেন, ডক্টর?'

সিগারেটের জ্বলন্ত প্রান্তটার দিকে চোখ কুঁচকে তাকিয়েছিলেন তরফদার। বললেন, 'এ কনট্র্যাক্টে টাকা ঢালা মানেই তিন টেক্কার জুয়া খেলা। তিনটে টেক্কা পড়লেই লক্ষপতি—না পড়লেই ফকির। স্রেফ লাক—আর কিস্সু না।'

'লাক!' মৃদু হাসি ফুটে ওঠে সোমেশ রায়ের ঠোঁটের কোণে : 'লাক! আর এই একটিমাত্র শব্দকেই সম্বল করে রায় কনস্ট্রাকশন কোম্পানির এই জয়যাত্রা। সাঁইত্রিশ বছরেরও ওপর হল—তিন টেক্কা শুধু ঘুরে-ফিরে পড়ছে আমার দিকেই। লাক। কী বলেন? জীবনের দীর্ঘ সাঁইত্রিশটি বছর যে শুধু একটা লাকি পিসকে নিয়েই জীবন-যুদ্ধে জিতে এল, তার কী কখনও লাক-এর অভাব হয়?' বলে ঘড়ির পকেট থেকে বার করলেন চকচকে একটা রুপোর টাকা।

অলোক ঘোষ আর সোমনাথ মুখার্জি পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেললেন, তারপর মুখ ফিরিয়ে নিলেন অন্য দিকে। অপর তিনজন কিন্তু সাগ্রহে তাকিয়ে রইলেন মুদ্রাটির দিকে।

সস্নেহে টাকাটির দিকে তাকিয়েছিলেন সোমেশ রায়। ক্ষণেক পরে মৃদু স্বরে বললেন, 'আজ থেকে সাঁইত্রিশ বছর আগে রোজগার করেছিলাম টাকাটা—সেই আমার প্রথম উপার্জন। তখন আমার বয়স বছর এগারো হবে। বাবা ছিলেন রাজমিস্ত্রি। মাউন্ট মেরির ওপর মস্ত বড় একটা প্রাসাদ তৈরি হচ্ছিল—উনি সেখানেই কাজ করছিলেন। নিচ থেকে ইট আর টুকরো-টুকরো পাথর বয়ে আনার জন্যে একজন ছোকরার দরকার হওয়ায় বাবা আমায় কাজে লাগিয়ে দিলেন। পাহাড় ভেঙে-ভেঙে ইট বয়েছিলাম ওই অল্প বয়েসেই। মাথায় বোঝা চাপিয়ে ওপরে ওঠার সময়ে যে কী কষ্ট হত, তা বোঝাতে পারব না কিছুতেই। ঘাড় টনটন করত, শিড়দাঁড়াটা যেন ভেঙে পড়তে চাইত—দরদর ঘামের ধারায় ভিজে উঠত সর্বাঙ্গ। এইভাবে কাজ করলাম ক'দিন। তারপর পেলাম এই টাকাটা। সযত্নে তা বুকপকেটে নিয়ে বাড়ি ফিরলাম বাবার সঙ্গে। পথে কত আলো-ঝলমল রঙচঙে লোভনীয় জিনিস সাজানো দোকান হাতছানি দিয়ে প্রলুব্ধ করে তুললে আমায়। বাবাও জিগ্যেস করলেন, "কী করবি রে টাকাটা নিয়ে?" বললাম, "খরচ করব না বাবা। আমার কাছেই চিরকাল থাকুক এটা।" আছেও। তারপর সাঁইত্রিশ বছর কেটে গেছে, সঙ্গে-সঙ্গে ফিরেছে টাকাটা। জীবনের কত অবিস্মরণীয় মুহূর্তে এই টাকার সান্নিধ্য আমায় শান্তি দিয়েছে, এনেছে সাফল্য। একে সঙ্গে রেখে যে-আত্মবিশ্বাস, মনোবল পেয়ে এসেছি তার তুলনা নেই। ১৯১০ সালে কলকাতার টাঁকশাল থেকে পিঠে-বুকে ছাপ নিয়ে পথে বেরিয়েছিল ছোট্ট এই রুপোর টুকরোটি। কিন্তু ওর ক্ষমতা অসীম, অপরিমেয়, অবিশ্বাস্য। আমার জীবন তার প্রমাণ।'

স্বপ্নালু চোখে টাকাটার দিকে তাকিয়ে রইলেন বৃদ্ধ সোমেশ রায়। সাঁইত্রিশ বছরের একমাত্র সঙ্গী; রুক্ষ, ধূসর জীবনযাত্রার মূক সাক্ষী; বিপদে শক্তি, সাহস আর আত্মবিশ্বাসের একমাত্র উৎস। ব্রিটিশ-সম্রাট পঞ্চম জর্জের মুখচ্ছবি আঁকা অতি সামান্যদর্শন ছোট্ট একটি রুপোর টাকা।

তরফদার এগিয়ে এসেছিলেন টাকাটা হাতে নেওয়ার জন্যে, কিন্তু চকিতে হাত টেনে নিয়ে সোমেশ রায় তা রেখে দিলেন ঘড়ির পকেটে।

বললেন, 'আজও যে-কোনও সঙ্কুল পরিস্থিতিতে এর সাহচর্য আর সাহায্য আমাকে শুধু সাফল্যের পথেই নিয়ে চলেছে।'

'রাবিশ!' মন্তব্য করলেন সোমনাথ মুখার্জি।

'হতে পারে। কিন্তু শুনেছি চুনীলাল দয়াভাইয়ের অফিসে নাকি পাঁচ হাজার টাকার একটা অফার আছে সামান্য এই রুপোর টাকাটার জন্যে। রাবিশ, কী বলো, সোম?'

'চুনীলাল দয়াভাই ভালোভাবেই জানে তোমার মূর্খতা। তোমার মনের ওপর টাকা হারানোর প্রতিক্রিয়া যে কী নিদারুণ, তা তো তার অজানা নয়। আর সেই কারণেই পাঁচ হাজার কেন, ওব দ্বিগুণ টাকা দিতেও পেছপা হবে না তারা।'

'যথাসর্বস্ব দিলেও লাকি পিস্-এর ধারে-কাছে ঘেঁষার সাধ্য ওদের হবে না। যাক, চা এসে গেছে। আসুন, এক-একটা কাপ তুলে নেওয়া যাক।'

কাপে ঠোঁট ঠেকাবার আগে লক্ষ করলাম, উপস্থিত প্রত্যেকেরই দৃষ্টি স্থির হয়ে রয়েছে ঘড়ির পকেটের ওপর।

সাতটার সময়ে ডিনারের জন্যে সাজগোজ করার উদ্দেশে রওনা হলাম ঘরের দিকে। সিঁড়ির গোড়াতেই দেখা হয়ে গেল কবিতার সঙ্গে। গাঢ় সবুজ রঙের একটা ভেলভেটের ব্লাউজের ওপর উজ্জ্বল হলুদ রঙের একটা শাড়ি জড়িয়ে ধরেছে ওর শ্রীঅঙ্গ। আহা, সে বরতনু দেখে নিমেষে যেন স্নিগ্ধ হয়ে গেল আমার সর্ব অঙ্গ।

আমার মুগ্ধ রসনা তৎপর হওয়ার আগেই কলকলিয়ে উঠল কবিতা, 'কীরকম আক্কেল বলো তো তোমাদের? কারও আর পাত্তা নেই? কখন থেকে একজন দোসর খুঁজছি—একলা কি আর সূর্যাস্ত দেখতে ভালোলাগে?'

'খাঁটি কথাই বলেছ। আগে থেকেই দরখাস্ত দিয়ে রাখছি—জায়গাটা যেন আর কেউ বেদখল না করে। কবি, আজকের এ-পার্টিতে আমাকে এনে যা উপকার তুমি করলে, কোনওদিনই তা শুধতে পারব না।'

'তুমি খুশি হয়েছ তো?'

'শুধু খুশি। এরকম দুর্বল বিশেষণ ব্যবহার করছ কবি?'

'আমি জানতাম তুমি খুশি হবে। আমোদ-প্রমোদের হরেকরকম আয়োজন আছে জলপরীতে—বিস্তর খরচ করে বাবা তৈরি করেছিলেন শুধু এই কারণেই।'

'বজরার কথা মোটেই বলছি না আমি। একটা গাধাবোটেও যদি বেরোতাম তুমি আর আমি—আনন্দ আমার একতিলও কম হত না। জানোই তো—।'

সোমনাথ মুখার্জি আর অলোক ঘোষ পেছনে এসে পড়েছিলেন।

'কী মুশকিল!' চট করে সুর পালটে নেয় কবিতা, 'এতক্ষণ ধরে স্মোকিংরুমে কী করছিলেন বলুন তো? বাবা রুপোর টাকার কাহিনি শোনাচ্ছিলেন নিশ্চয়?'

'তা আর বলতে!' বলেন মিঃ মুখার্জি।

বললাম, 'আমি কিন্তু গল্পটা শুনে খুব খুশি হলাম। ওঁর মনের গঠনের নতুন একটা পরিচয় পেলাম। ইট-পাথরের বোঝা মাথায় নিয়ে চড়াই বেয়ে ওঠার সে-দৃশ্য—।'

'বেচারা!' স্মিত মুখে বলল কবিতা, 'খারাপ লাগার মতো গল্প তো নয় ওটা। একবার শুনলেই

ভালো লাগে। কিন্তু বারবার ওই একই কাহিনি যদি তোমার কানের কাছে দিবানিশি শোনানো হয়, তাহলে তোমার অবস্থাটা কীরকম দাঁড়ায় ভাবো তো? বিশ বছর ধরে একই কাহিনির পুনরাবৃত্তি কি খুব চমৎকার লাগে শুনতে? মাঝে-মাঝে তাই তো ভাবি, ভগবান, দাও না কেন টাকাটা হারিয়ে।'

'আমিও,' সায় দেন অলোক ঘোষ : 'বিশেষ করে সিংহল-গভর্নমেন্টের ব্রিজ কনট্র্যাক্ট নেওয়ার মতো দুঃসাহস যখন তিনি দেখান, তখন ভাবি, চুলোয় যাক ওই চাঁদির চাকতিটা।'

'তবেই হয়েছে,' ছোট-ছোট চোখ নাচিয়ে বলেন সোমনাথ মুখার্জি, 'সোমেশ তাহলে হার্টফেল করবে।'

'তা যা বলেছেন,' সায় দেন অলোক ঘোষ। তারপর যা বললেন, তা আর কানে ঢুকল না আমার। উর্ধ্বশ্বাসে কেবিনের দিকে যেতে-যেতে আমি তখন কল্পনার চোখে দেখছি কবিতার পাশে সুট পরে দাঁড়িয়ে সাগরের বুকে সূর্যাস্তের রঙিন দৃশ্য।

আমার অনেক আগেই স্মোকিংরুম থেকে বেরিয়ে পড়েছিলেন তরফদার। করিডর দিয়ে যেতে-যেতে শুনলাম কেবিনের মধ্যে উচ্চগ্রামে স্বর চড়িয়ে তাঁর সঙ্গীত-সাধনা। শুনে খুশি হলাম। কিন্তু নিজের কেবিনে ফিরে বাথরুমের দরজা খুলতে গিয়ে দেখি, তা ভেতর থেকে বন্ধ। খটাখট শব্দ-তরঙ্গ তুললাম আর আদ্য-শ্রাদ্ধ করতে লাগলাম তরফদারের। আর পাঁচজনের সুবিধে-অসুবিধের কথা মোটেই ভাবেন না, কীরকম ভদ্রলোক ইনি?

উত্তর সঙ্গে-সঙ্গেই পেলাম। ভাবেন না সত্যিই। ওঁর একঝলক রুক্ষ দৃষ্টিই বললে তা।

নিষ্ফল রাগে ফুলতে-ফুলতে পেছন ফিরেছি, এমন সময়ে ঘরে ঢুকল বলবাহাদুর।

ঢুকেই এক লম্বা সেলাম ঠুকে বললে, 'বহুত দেরি হো গ্যায়া সাব। আসুন, আপনাকে ডিনার-সুট পরিয়ে দিই।' বলে সুটকেস খুলে বার করল একমাত্র কোটটা।

জীবনে ডিনার-সুট পরার জন্যে ভ্যালের সাহায্য নিইনি—নেওয়ার সৌভাগ্যই হয়নি। বনেদি বংশের মধ্যবিত্ত বাঙালি ঘরের ছেলে আমি—সাহেব-ঘেঁষা আভিজাত্যের স্বাদ বলতে গেলে এই প্রথম নিচ্ছি। বলবাহাদুরের কথায় তাই যেন কানে সুধাবর্ষণ হল। পরক্ষণেই মেজাজটা তিরিক্ষে হয়ে উঠল তরফদারের স্বার্থপরতা মনে পড়তে।

বললাম, 'বাপু হে, কোট এখন থাক। আগে গিয়ে ওপাশের সাবকে বাথরুম থেকে চটপট বার করে দাও দিকি—তাহলেই বুঝব তোমার কেরামতি।'

খুবই স্মার্ট বলতে হবে বলবাহাদুরকে। মুখের কথা খসতে-না-খসতেই উধাও হল সে বাইরে। পরমুহূর্তেই বাথরুমে শুনলাম কথা কাটাকাটির শব্দ। তারপরই কড়াং করে বন্ধ হল বাথরুমের ওপাশের দরজা, আর চকিতে ঘরের মধ্যে আবির্ভূত হল বলবাহাদুর।

সাঁ করে ওর পাশ দিয়ে বাথরুমে ঢুকে সজোরে কড়াৎ করে টেনে দিলাম ওপাশের লকটা। শব্দটা যতটা জোরে হলে আমার মনোভাবটা পুরোপুরি প্রকাশ পেত, ততটা জোরে না হওয়ায় একটু মনঃক্ষুণ্ণ হলাম যদিও।

ফিরে এসে পিঠটা চাপড়ে দিয়ে বললাম, 'শাবাশ বাহাদুর, কিন্তু আজ আর তোমায় কোনও কষ্ট দেব না। ভ্যালের কাজটা আর-একদিন তোমার কাছে শিখে নেব'খন, কী বলো?'

'দরকার হলেই কলিংবেল টিপবেন,' বলে অন্তর্হিত হল বাহাদুর।

ক্ষিপ্র হাতে শার্ট খুলতে শুরু করলাম আমি। সূর্যাস্ত যদি দেখতেই হয়, আর কয়েক মিনিটের জন্যেও যদি কবিতাকে নিরালায় পেতে চাই, তাহলে আর একটা মুহূর্তও নষ্ট করা চলে না। ভোরবেলা উঠে বিশ মিনিটের মধ্যে স্নান করে, দাড়ি কামিয়ে, পোশাক পরে অফিস যাওয়ার যে-রেকর্ড আমার ছিল—তাও আজ ভাঙবার জন্যে উঠে-পড়ে লাগলাম আমি।

দাড়িটা নিখুঁতভাবে কামানো হল কি না হাত বুলিয়ে দেখছি, এমন সময়ে আবার দরজার নবটা বাজাতে শুরু করলেন তরফদার। বহুক্ষণ ধরে বেশ ধৈর্যের সঙ্গে খটাখট-সঙ্গীত শোনালেন তিনি—আর ফটকিরি ঘষতে-ঘষতে তন্ময় হয়ে উপভোগ করতে লাগলাম সে-সুর-লহরী।

'যতই লম্ফঝম্প করুন না কেন—দরজা আর খুলছি না।' বিড়বিড় করে বলি আমি।

'ধুত্তোর।' তারপরেই স্তব্ধ হল নব-সঙ্গীত।

ওপাশের লক যেমন তেমনি রেখে চটপট বেরিয়ে এলাম বাথরুম থেকে। বার করলাম হিরের বোতামগুলো। পুরোনো আমলের যদিও, তবুও মূল্যবান সন্দেহ নেই। ঠাকুরদাব মৃত্যুর পর বোতাম ক'টা আমার হাতেই তুলে দিয়েছিল ঠাকুমা। আজকের এই অভিজাত মহলে সে-বোতাম যে এমনভাবে কাজে লেগে যাবে, তা ভাবিনি।

লঘু সুরে শিস দিতে-দিতে লন্ড্রির বিরাট প্যাকেটটা খুলতে লাগলাম। হনলুলু স্যাম জিন্দাবাদ—শেষ পর্যন্ত শপথ সে রেখেছে। যেদিন দেওয়া, সেদিনই ধোওয়া—এ-বিজ্ঞাপনের যাথার্থ হাতেনাতে প্রমাণ করে দিয়েছে স্যামমশায়। বাস্তবিকই চীনাম্যানদের গুণের অবধি নেই। দেখতে অমন বেঁটেখাটো হলেও যে-বিদ্যুৎশক্তি লুকিয়ে আছে ওদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে, তা কি আর বাইরে থেকে দেখে বোঝা যায়? না, বোঝা যায় পেস্তাচেরা চোখের কুতকুতে চাহনি দেখে ওদের অভ্রভেদী সততা? দারুণ বিশ্বাসযোগ্য ওরা—যা বলবে তা করবেই। আঙুলের টান দিয়ে সুতোটা ছিঁড়ে ফেললাম, তারপর সন্তর্পণে খুললাম প্যাকিং পেপারটা।

আর দেখলাম, প্রথম স্তরেই রয়েছে টকটকে লাল-সাদা ডোরাকাটা একটা ম্যানিলা।

জীবনের সঙ্কটময় মুহূর্তগুলিতে কেন যে অতি সহজ জিনিসও বুঝতে এত দেরি লাগে, তা ভেবে অবাক হয়ে যাই। বেশ কিছুক্ষণ হাঁ করে বসে থেকেও বুঝলাম না আমার ব্যক্তিগত পোশাকের সারিতে এ-বিচিত্র বস্তুটার প্রবেশের স্পর্ধা হল কেমন করে। তারপরই একটানে ম্যানিলাটা নিক্ষেপ করার পর এমন গাঢ় নীল রঙের একটা শার্টের সম্মুখীন হলাম—যা জীবনে দেখার দুর্ভাগ্য আমার হয়নি। এরপর যেন কুচকাওয়াজ করে পরপর বেরিয়ে এল সবুজ পুলওভার, ময়লা একটা অন্তর্বাস, একজোড়া বেজায় ঝলমলে নাইলন মোজা, গোটা কয়েক পশুপাখি আঁকা নেকটাই—ব্যস! আর কোনও শার্টের চিহ্নই দেখলাম না!

অবশ হয়ে বসে পড়লাম মেঝের ওপর।

এ-লন্ড্রি আমার নয়।

এই সামান্য ব্যাপারটা এত দেরিতে মাথায় এলেও এর পরই অতি মাত্রায় সক্রিয় হয়ে উঠল চিন্তাশক্তি। ঢেউ-উত্তাল দরিয়ায় আজ আমি বড় নিঃসঙ্গ—বড় একলা। সঙ্গে শুধু একটি সুটকেস—সে-সুটকেসে সবই আছে, নেই শুধু ডিনার টেবিলে বসার উপযুক্ত অন্তত একটা সাদা শার্ট। রঙচঙে ম্যানিলা আর তার সহোদরদের শ্রীঅঙ্গে চাপিয়ে ডাইনিং হলে ঢুকেছি—এ-কথা কল্পনা করতেই শিউরে উঠলাম। অথচ আর মিনিট পনেরো পরেই পড়বে খাওয়ার ঘণ্টা। টেবিলে উপস্থিত হবেন আমার দুই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী—দুজনেই সঙ্গে এনেছেন দুটি সংক্ষিপ্ত বস্ত্রশালা।

চোখ ফেটে বুঝি-বা জল গড়িয়ে পড়ে এবার। ভেবেছিলাম, এই সাগর-বিহারকে পুরোপুরি কাজে লাগিয়ে জয় করব কবিতা রায়ের অভিভাবকদের চিত্ত—এমন ছাপ ফেলব তাঁদের মনে যে, আমার বরনারী আমারই থেকে যাবে জীবনের শেষ সন্ধ্যা পর্যন্ত। কিন্তু সাগর-যাত্রার প্রথম সন্ধ্যায় এ কী দুর্দৈব? সাদা শার্টবিহীন মৃগাঙ্ক রায়ের ক্ষমতা কোথায় প্রতিপক্ষবাহিনীর বিদ্রুপ-হাসিকে উপেক্ষা করার? প্রতীচ্য-রীতি-অনুরাগী সোমেশ রায়ের বিরাগ দৃষ্টির সামনে সাধ্য কি তাঁর স্নেহ অর্জন করার?

অসহায় অবস্থায় আত্মসমর্পণ করলাম দুরন্ত ক্রোধের কবলে। প্রায়-অন্ধ চীনে স্থবরটাই আমার এই দুরবস্থার জন্যে দায়ী। পেতাম যদি বুড়োকে হাতের কাছে—অন্ধত্ব তার ঘুচিয়ে দিতাম ইহজন্মের মতো।

মূর্খ! অসতর্ক মুহূর্তে এমন একটা সাংঘাতিক ভুল সে করে বসল, যার ফলে বহু বছর ধরে বহু পরিশ্রমে অর্জিত চীনাদের সুনাম নিমেষে ধূলিসাৎ হয়ে গেল জগৎবাসীর কাছে। শুধু যে দুর্নামই কুড়োলে তা নয়, ও জাতটারও অবলুপ্তির সূচনা এঁকে দিলে ওই নিরেট চীনে বুড়োটা। কেন না, পৃথিবী চীনে শূন্য করার কাজ শুরু করব আমিই স্বয়ং—আর তা শুরু হবে হনলুলু স্যামের দোকানঘর থেকেই।

কিন্তু হুহু করে সময় বয়ে যাচ্ছে। প্রবীণ এক চীনেম্যানের কবর রচনার পরিকল্পনায় সময় নষ্ট করা উচিত হচ্ছে না মোটেই। কিছু একটা করতেই হবে। কিন্তু করি কী? আবহাওয়া তো দেখছি চমৎকার—শুধু যা জলপরীই এদিকে-ওদিকে সামান্য হেলেদুলে ভেসে চলেছে। সমুদ্রপীড়ার ছল করে বার্থ আশ্রয় করলে কেমন হয়? কিন্তু তাহলে তো কবিতাকে আবার সঁপে দিতে হবে তরফদার-অলোক ঘোষের যুগ্ম দাঁড়ায়। উঁহু, তা হবে না। শার্ট একটা চাই-ই। যেভাবেই হোক, যেমন করেই হোক, চুরি করে হোক, ডাকাতি কবে হোক, শার্ট একটা জোগাড় করতেই হবে আমায়।

জলপরীতে সমাগত অভ্যাগতদের মধ্যে কি এমন কেউ নেই যে, যিনি এই সঙ্কট-মুহূর্তে আমায় কিছু সাহায্য করতে পারেন? দেশমুখ অবশ্য পারেন। কিন্তু দেশমুখেব একটা শার্টে অনায়াসে সেঁধিয়ে যাবে দু-দুটো মৃগাঙ্ক রায়। কিন্তু অপর অভ্যাগতদের কাছেও তো আমাব এ দুরবস্থার কথা বলা সম্ভব নয় কিছুতেই। অবশ্য কবিতাকে বলা চলতে পারে, কিন্তু তাতে কোনও সুরাহা তো হবে না। তাকে বললে সহানুভূতি পাওয়া যাবে প্রচুর—কিন্তু শার্ট নয়। তাহলে? তাহলে বাকি থাকে শুধু বলবাহাদুর। দু-টাকার কড়কড়ে নোট যখন দিয়েছি ওকে, তখন প্রতিদান পাব নিশ্চয়।

ঘণ্টা বাজালাম। অন্তর্বাস পরে নিতে-নিতেই এসে পড়ল নেপালি-নন্দন। ভেবে দেখলাম, এবকম পরিস্থিতিতে অকপট সরলতাই হল শ্রেষ্ঠ পন্থা।

বললাম, 'বাহাদুর, সর্বনাশ হয়ে গেছে।' লাল, নীল, সবুজ রঙেব বিচিত্র সমাবেশ দেখিয়ে বলি, 'চীনে ব্যাটা আমার জামাকাপড় সব পালটে দিয়েছে। সাদা শার্ট একটিও নেই।'

'চীনেরা লোক খুব খারাপ।' মন্তব্য প্রকাশ করে বলবাহাদুর।

'নিঃসন্দেহে। এ বিষয়ে কোনও সন্দেহই থাকতে পারে না। এ নিয়ে তোমার সঙ্গে পবে কথা বলা যাবে'খন। কিন্তু আপাতত, বাহাদুর, কী পরে ডিনারে যাই বলো তো? সাদা শার্ট হবে নাকি দু-একটা?'

নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল বলবাহাদুব। ওর মুখভাব দেখেই বুঝলাম, 'সাব'-এর পরার উপযুক্ত স্নো-হোয়াইট শার্ট রাখার স্পর্ধা সে রাখে না। ইচ্ছে হল, একটা-একটা করে মাথাব চুলগুলো সব টেনে ছিঁড়ে ফেলি, আর না হয় ডাক ছেড়ে কাঁদি কিছুক্ষণ। অমল-ধবল কামিজ পরে ডিনার খাওয়াব রেওয়াজ আমার ঊর্ধ্বতন কোনও পুরুষের কখনও ছিল না—আর বংশের সে-ঐতিহ্য ভঙ্গ করাব কোনও সদিচ্ছাই আমার নেই। কিন্তু কবিতা তা জানে বলেই আগে থেকে একাধিকবার আমায় মনে করিয়ে দিয়েছে, জন্মাবধি বোম্বাই শহরে মানুষ বৃদ্ধ সোমেশ রায়ের প্রতীচ্য-প্রীতি আর তাঁর উগ্র সাহেবিয়ানা। গণ্যমান্য অভ্যাগতদের সামনে ডিনার টেবিলে সাদা শার্ট না পরে গেলে তাঁব মনে কতখানি বিরাগ-বিতৃষ্ণা সঞ্চারিত হবে, তা ভেবে চিন্তিত হলাম না মোটেই; কিন্তু তার ফলে কবিতারাণীর আশা যে ইহজন্মের মতো ত্যাগ করতে হবে, তা ভাবতেই হৃৎকম্প উপস্থিত হল আমার।

আমার শুকনো মুখ আর সজল চোখ দেখে বুঝি বলবাহাদুরের মনেও করুণার উদ্রেক হল। নিজে থেকেই 'জরা কোশিশ করনা পড়েগা সাব' বলে উধাও হল সে।

মনে হল, শার্ট তো নয়, যেন আমেরিকা আবিষ্কার করতে বেরোল সে। ঘরময় অনর্থক দাপাদাপি না করে পোশাক-পারিপাট্য যতটা সম্ভব এগিয়ে রাখার উদ্দেশেই আগে জুতো-মোজা পবে ফেললাম। কিন্তু শার্ট? রামধনু-রঙিন ম্যানিলা পরে ডিনার টেবিলে অনুকম্পা-দৃষ্টির সামনে উপস্থিত হওয়ার চাইতে বিরহী যক্ষের মতো শার্ট বিরহে অশ্রু বিসর্জন করব ঘরে বসে-বসে। আর সেই

সুযোগে মহা আনন্দে অনবগুণ্ঠিতা কবিতা-সুন্দরীর রূপসুধা পান করে আমার প্রতিদ্বন্দ্বীরা বিচরণ করবে সুখের সপ্তম স্বর্গে?

এসব পরিস্থিতিতে উপযুক্ত সতর্কতা যে রীতিমতো প্রয়োজন, তা হয়তো নেপালি-তনয়ের চোখ দেখেই বুঝেছিলাম। তাই চকিতে আলো নিভিয়ে দিয়ে অতি সন্তর্পণে দরজা খুলে উঁকি মারলাম বাইরের প্যাসেজে। কারও চিহ্নও দেখলাম না। নেপালি-সুতই বা গেল কোথায়?

তারপরেই করিডরের শেষপ্রান্তের দরজাটা আস্তে-আস্তে খুলে গেল—বেরিয়ে এল একটি মূর্তি। সামনে-পেছনে সাবধানী দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে লোকটি পা টিপে-টিপে এগিয়ে এল করিডর দিয়ে। বাহাদুর যে নয়, তা বুঝলাম চলার ধরন দেখেই। কেবিনের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময়ে দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখে নিলাম লোকটিকে। আরও একটু এগিয়ে একটা স্টেটরুমের দরজা খুলে ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেল মূর্তিটা।

হতাশভাবে বসে পড়লাম বার্থের ওপর। বিনবিন করে ঘাম ফুটে উঠতে লাগল কপালে। বলবাহাদুর কি শেষপর্যন্ত মহাপ্রস্থানের পথে যাত্রা করল? তাবপরেই দরজায় অস্পষ্ট শব্দ শুনে চমকে উঠে দেখি ওর হাসি-হাসি মুখ। তড়াক করে লাফিয়ে উঠলাম আমি। আগে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে জ্বাললাম আলোটা।

জয় জগদীশ্বর! নেপালি-নন্দনের হাতে ঝকমক করছে বকের পালকের মতো ধবধবে সাদা একটা শার্ট।

চোখের সামনে যেন গজমুক্তা দেখছি, এমনিভাবে জুলজুল চোখে তাকিয়ে রইলাম তুষার-শুভ্র শার্টটার দিকে।

বলবাহাদুর বললে, 'দিন, দিন, বোতামগুলো লাগাই তাড়াতাড়ি।' বলে নিজেই ঠাকুবদাব হিরের বোতাম লাগাতে বসল বোতাম-ঘরে : 'খুব বড় হবে না, কী বলেন?'

হঠাৎ কীরকম যেন মনে হল আমার।

একটু কঠিন স্বরেই শুধোই, 'শার্টটা আনলে কোত্থেকে?'

'আনলাম।' সংক্ষিপ্ততর জবাব আসে ওদিক থেকে : 'নিন, পরে ফেলুন।'

'সামান্য একটু ঢিলে হচ্ছে যদিও, তবুও শার্ট তো, তাহলেই হল। বাঃ, কলারটাও তো দেখছি বেশ ফিট করে গেল গলায়। কপাল, বুঝলে বাহাদুর, সবই কপাল। উঃ, কলারটা তো দারুণ শক্ত হে!' ক্ষিপ্রহাতে টাইয়ের গ্রন্থি রচনা করতে-করতে বলি।

'বাঃ, বেশ মানিয়েছে সাব।' ঘাড় বাঁকিয়ে দেখে-শুনে প্রশংসিকা দিয়ে দেয় বাহাদুর।

একটা নোট ওর হাতে গুঁজে দিয়ে বলি, 'দ্যাখো বৎস, শার্টটা যেখান থেকেই আনো না কেন, আবার ফিরিয়ে দিতে হবে, বুঝেছ?'

'জরুর।'

'বহুত আচ্ছা। একটা টাকাও দেব সেইসঙ্গে—ধোয়ার খরচ হিসেবে। সততার জয় সর্বত্র, বুঝলে বাহাদুর, অন্যায়কে কখনও প্রশ্রয় দিতে নেই।'

'জি সাব।'

'নিজে যদি সৎ থাকো, তাহলে সারা দুনিয়া এসে লুটিয়ে পড়বে তোমার পায়ে।' নেপালি-নন্দন ততক্ষণে দরজার বাইরে এক পা দিয়েছে : 'আরে, ইয়ে শার্টটা এল কোত্থেকে তা বলে গেলে না?'

'আনলাম।' বলে মুচকি হেসে অন্তর্হিত হল সে।

ধুত্তোর, কী আর করা যায়। বেপরোয়া পরিস্থিতির একমাত্র সমাধান হল নিজেই বেপরোয়া হয়ে যাওয়া। চটপট ট্রাউজারের মধ্যে দু-পা গলিয়ে ফেললাম—ওয়েস্ট কোট আর কোট চাপানো শেষ হতে-না-হতেই প্যানট্রিবয় বিউগ্‌লে একটা নাম-না-জানা ইংরেজি সুর বাজাতে শুরু করে দিলে।

বাথরুমের দরজায় আবার খটাখট শব্দ-সঙ্গীত সৃষ্টি করছিলেন তরফদার। তাই, প্রথমে সবক'টা আলো নিভিয়ে দিয়ে নিঃশব্দে খুলে দিলাম লকটা, তারপরেই তিরবেগে উঠে এলাম ওপরের ডেকে কবিতার সন্ধানে।

আমাকে দেখেই স্ফুরিত অধর আর ঘনকৃষ্ণ আঁখিযুগলে ভর্ৎসনা আর অভিমানের এক বিচিত্র মিশ্রণ ফুটিয়ে তুলল ও।

শুধু বলল, 'সূর্য অনেকক্ষণ ডুবে গেছে।'

'জানি। কিন্তু—' দু-আঙুল দিয়ে অস্থিরভাবে কলারটা টানাটানি করতে-করতে বলি, 'কিন্তু কী করব, সবাই মিলে ষড়যন্ত্র করে দেরি করে দিল আমার।'

'তা তো বলবেই। দুরাত্মার ছলের অভাব হয় কখনও?'

'তা যা বলেছ,' আনমনা হয়ে বলি আমি। ভাবছিলাম, শার্টের প্রকৃত অধিকারীর গলাটা নিশ্চয় ইস্পাত দিয়ে তৈরি। এরকম শক্ত আর ধারালো কলার কি রক্তমাংসের মানুষের পক্ষে পরা সম্ভব?

'কী ব্যাপার বলো তো? সুস্থ আছ তো?'

'নিশ্চয় নয়। তুমি যে মূর্তিমতী উষসী, তা তো আমার অজানা নয় হে ভুবনমোহিনী উর্বশী—তবুও তোমায় দেখেই কেমন জানি বোঁ করে ঘুরে গেল মাথাটা।'

উঠে দাঁড়াল কবিতা : 'ডাইনিং সেলুনে দ্বিতীয়বার ঘুরিও সেটা। খাবার টেবিলে দেরি হওয়া মোটেই পছন্দ করেন না বাবা।'

কবিতার ডানদিকের আসনটাই নির্ধারিত হয়েছিল আমার জন্যে—দেখেই বেশ খুশি-খুশি হয়ে উঠল মনটা। বাঁ-দিকে বসেছিলেন সোমনাথ মুখার্জি স্বয়ং। এমন নিখুঁত আসন পবিকল্পনা লক্ষ কবে নিমেষের মধ্যে চাঙ্গা হয়ে উঠলাম আমি। এক মুহূর্ত আগেই হাবুডুবু খাচ্ছিলাম হতাশার সমুদ্রে—কিন্তু এখন আর আমায় পায় কে। পরস্মৈপদী শার্টের প্রসাদ যে এত সুমধুর তা তো জানতাম না!

খাওয়ার শুরুতেই সোমেশ রায় প্রস্তাব করলেন, তরফদার সিংহলে তাঁর প্রবাসী জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা শোনান গল্পচ্ছলে। ভাবলাম, গেল বুঝি এবার খাওয়ার সব আনন্দটাই মাটি হয়ে। কিন্তু তরফদার ভদ্রলোক অন্যান্য ব্যাপারে যতই অশিষ্ট অভদ্র হোন না কেন—কথা বলার ব্যাপারে সত্যই অতুলনীয়। সুন্দরভাবে গুছিয়ে সামান্য ঘটনাকেই গল্পের আকারে পরিবেশন করে আসর জমাতে দক্ষ পুরুষ তিনি। কলম্বোতে একটা ইংরেজি দৈনিকের সহকারী সম্পাদক থাকার সময়ে তাঁর অ্যাডভেঞ্চার, কান্দির একটা হাসপাতালে টাইফয়েডে শয্যাশায়ী থাকার সময়ে বিভিন্ন চরিত্রের সংস্পর্শে আসার সুযোগ টিকাটিপ্পনী দিয়ে বেশ চমৎকারভাবেই বলে গেলেন তিনি। কোকেলাই, বাটিকালোয়া, ভাঙ্গালা, আরিপু প্রভৃতি ছোটখাটো বন্দরে কত দুর্ধর্ষ প্রকৃতির নাবিকের সঙ্গে, কত দুর্দান্ত কোকেন, আফিমের চোরাকারবারীদের সঙ্গে তাঁর আলাপ জমেছিল—তা শুনতে-শুনতে পুলকে-ভয়ে-রোমাঞ্চে শিউরে উঠল সবাই। জীবনে বিঘ্ন এসেছে বহু, আর তা জয় করতে গিয়ে শিখেছেন প্রচুর, দেখেছেন অনেক। জীবনের মূল সংজ্ঞা অন্তরে-অন্তরে উপলব্ধি করেছেন দীর্ঘকাল ধরে বন্ধুর পথে চলার মধ্যে দিয়ে।

কফি না আসা পর্যন্ত একাই আসর সরগরম করে রাখলেন তরফদার—তারপর শুরু হল লঘু রসালাপ। বহু কণ্ঠের গুঞ্জরন ছাপিয়ে হঠাৎ সোমেশ রায়ের উচ্ছ্বসিত স্বর ভেসে এল প্রত্যেকের কানে। মিসেস প্যাটেলকে উদ্দেশ করে বলছিলেন তিনি।

'সাঁইত্রিশ বছর। দীর্ঘ সাঁইত্রিশ বছর ধরে পকেটে-পকেটে ঘুরছে টাকাটা। জীবনের সঙ্কটময় মুহূর্তগুলিতে ওর স্পর্শ আমায় দিয়েছে শক্তি, সাহস, উদ্যম, প্রেরণা আর সাফল্য। ছোট্ট একটা রুপোর টাকা—উনিশশো দশ সালে আলিপুর মিন্টে যার জন্ম—।'

ফিক করে হেসে ফেলল কবিতা : 'সেরেছে! আবার লাকি পিস-এর গল্প ফেঁদেছে বাবা।'

'থ্রিলিং!' বললেন মিসেস প্যাটেল। সেইসঙ্গে উৎসাহসূচক লিপস্টিক রাঙানো একটু হাসি ঃ 'টাকাটা আপনার কাছেই আছে তো?'

'নিশ্চয়।' বলেই ওয়েস্ট কোটের পকেট থেকে চকচকে একটা রুপোর টাকা বার করে আনলেন তিনি ঃ 'সাঁইত্রিশ বছরের একমাত্র বন্ধু আমার এই লাকি পিস।' বড়-বড় চোখে ক্ষণেক তাকিয়ে রইলেন তালুর ওপর রাখা টাকাটার দিকে। তারপর, খুব থেমে-থেমে বললেন, 'একী! এ তো আ-আমার টাকা নয়!'

থমথমে স্তব্ধতা নেমে এল সেলুনের মধ্যে।

কবিতাই প্রথম কথা বলল, 'কী বলছ বাবা, এ টাকা তোমার নয়?'

'না! এতে ছাপ রয়েছে ১৯৩৪ সালের।' বলে ঠন করে টেবিলের ওপর টাকাটা ছুড়ে দিয়ে সবক'টা পকেট হাতড়ালেন। তারপর শূন্য দু-হাত টেবিলের ওপর রেখে মুখ অন্ধকার করে বসে রইলেন ক্ষণকাল।

বেশ কিছুক্ষণ পরে বললেন অত্যন্ত মৃদুস্বরে, 'ভাবছেন, খুবই সামান্য ব্যাপার এটা—কিন্তু আদতে তা নয় মোটেই। জানি না, কী জাতীয় রসিকতা এটা। রসিক পুরুষটি যেই হোক না কেন, তাঁকে আমি ক্ষমা করতে পারছি না কিছুতেই। কিন্তু তবুও আমি সব ভুলে যেতে রাজি আছি যদি এই মুহূর্তে তিনি স্বীকার করেন সব কিছু। বলুন—' গলা কেঁপে ওঠে ওঁর, 'বলুন, এ কার রসিকতা?'

উৎকণ্ঠিত চোখে প্রত্যেকের মুখের ওপর একে-একে দৃষ্টি বুলিয়ে নিলেন উনি। কেউই কথা বলল না। কঠিন হয়ে এল সোমেশ রায়ের স্বপ্নালু চোখ।

বললেন, 'তাহলে রসিকতা নয়। একটা বদ উদ্দেশ্যই রয়েছে এর পেছনে।'

'কী আজেবাজে বকছিস, সমু? তিলকে তাল করে তুলিসনি।' বাধা দিয়ে বলেন স্থূলকায়া পিসিমা।

'সেটা আমিই বুঝব ভালো।' ইস্পাতের মতোই কঠিন শোনাল তাঁর স্বর। তারপর চেষ্টা করে একটু ফিকে হাসি হেসে বললেন, 'তা তুমি মন্দ কথা বলোনি, দিদি। পার্টিটা নষ্ট করা উচিত হবে না আমার।'

থমথমে ভাবটা একটু লঘু হল। মিসেস প্যাটেল অবশ্য সুযোগটা যথা ব্যবহার করতে দ্বিধা করলেন না। কণ্ঠে দরদ ঢেলে বললেন, 'আশ্চর্য! আপনার কোনও কর্মচারীর কাণ্ড নয় তো এটা?'

'আপনার ধারণা ভুল, মিসেস প্যাটেল।' তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন সোমেশ রায় ঃ 'আমার সঙ্গে ওরা অনেক দিন আছে। তবুও, জলপরী থেকে নামার আগে প্রত্যেককে তন্নতন্ন করে পরীক্ষা করব আমি নিজে। যাক, এ অপ্রীতিকর প্রসঙ্গ এখন এখানেই বন্ধ থাকুক। ভালো কথা—আর কারও কিছু হারিয়েছে?'

নিস্পন্দ হয়ে গেল আমার হৃদযন্ত্র। শার্ট! কারও মুখে এখুনি প্রকাশ পাবে একটা শার্টের রহস্যজনক অন্তর্ধানের কাহিনি। আর, তার পরিণাম ভাবতেই বিন্দু-বিন্দু ঘাম জমে উঠল আমার কপালে।

কিন্তু কারও জিহ্বাকেই তৎপর হতে দেখলাম না। তাহলে চুরির খবর এখনও প্রকাশ পায়নি। আবার শুরু হল আমার শ্বাসপ্রশ্বাস।

'তাহলে এ-প্রসঙ্গ বন্ধ থাকুক এখানেই।' বললেন সোমেশ রায়।

'এক মিনিট!' দাঁড়িয়ে উঠলেন দেশমুখ ঃ 'টেবিল ছেড়ে ওঠার আগে আমার একটা প্রস্তাব আছে। তুচ্ছই হোক আর মূল্যবানই হোক, একটা জিনিস হারিয়েছে মিস্টার রায়ের। কাজেই সন্দেহভাজন এখন আমরা প্রত্যেকেই। তাই, আমার ইচ্ছে প্রথমেই সার্চ করা হোক আমায়। আমার তো বিশ্বাস এ-প্রস্তাবে কারওরই আপত্তি থাকতে পারে না।'

'কী বাজে বকছেন?' কঠিন স্বরে বললেন সোমেশ রায় ঃ 'এ-প্রস্তাব শোনার মতো ধৈর্য

আমার নেই।'

তরফদার বললেন, 'মিস্টার দেশমুখ কিন্তু কিছুই অন্যায় বলেননি। আমার তো মনে আছে, কলম্বোর ব্রিটিশ এম্ব্যাসিতে একবার গৃহস্বামিনীর একটা হিরের নেকলেস হারায়। অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তির সমাবেশ হয়েছিল সেখানে—তবুও তৎক্ষণাৎ আমাদের প্রত্যেককেই ছোট একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে সার্চ করা হল তন্নতন্ন করে।' বলে উঠে দাঁড়ালেন উনি ঃ 'মিস্টার দেশমুখের প্রস্তাব আমি সমর্থন করছি।'

'রাবিশ! এভাবে কিছুতেই অপমানিত হতে দেব না আমার অতিথিদের।' অনড় থাকেন সোমেশ রায়।

এবারে কথা বললেন অলোক ঘোষ, 'আপনাকে স্যার কিছুই করতে হবে না। নিজেরাই যদি নিজেদের সার্চ করে সন্দেহের কাঁটা থেকে মুক্তি পাই, তাহলে খুশি হব প্রত্যেকেই। এতে অপমানিত হওয়ার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। মহিলারা যদি অনুগ্রহ করে সেলুনে অপেক্ষা করেন, তাহলে—।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও পিসিমা, মিসেস প্যাটেল আর কবিতা বেরিয়ে গেল বাইরে। চটপট কোট আর ওয়েস্ট কোট খুলে ফেললেন দেশমুখ।

'আপনাদের মধ্যে একজন এগিয়ে আসুন। আমার পালা শেষ হলে আপনাদেব আমিই দেখব'খন।

অলোক ঘোষই এগিয়ে এলেন সবার আগে। অতি কষ্টে বুকের ধুকধুকুনি সংযত করে আমিও খুললাম আমার কোট আর ওয়েস্ট কোট। শার্টটিও যে গায়ে ভালো করে ফিট করেনি, তা কী আর কারও চোখ এড়িয়েছে! দেশমুখ নির্দোষ প্রমাণিত হবার সঙ্গে-সঙ্গে মহা উৎসাহে শুরু করলেন অপবেব অঙ্গতল্লাস।

কিন্তু এত কিছু করেও ফল হল না কিছুই। আগাগোড়া শূন্য দৃষ্টি মেলে এমনভাবে টেবিলে বসে বইলেন সোমেশ রায যেন এ ছেলেখেলায় কোনও আগ্রহই নেই তাঁর। কপালেব ঘাম মুছতে-মুছতে শূন্য হাতে তাঁর পাশে এসে বসলেন দেশমুখ।

'খুশি তো? বেশ, আমার একান্ত অনুরোধ এ বিশ্রী ব্যাপার নিয়ে আর কোনও কথা নয়। চলুন, এখন বাইরে যাওয়া যাক।' বলে উঠে দাঁড়ালেন সোমেশ রায়।

সেলুনে গিয়ে দেখি ব্রিজখেলার উদ্দেশ্যে সোৎসাহে দুটো টেবিল জোড়া লাগাবার কাজ তদারক করছেন পিসিমা। বাড়তি হচ্ছিল শুধু একজনই। কিন্তু প্রত্যেকেরই আন্তরিক ইচ্ছে যে, বাদ দেওয়া হোক তাকেই। শেষ পর্যন্ত ভারিক্কি চালে অলোক ঘোষকেই বাড়তি হিসেবে গণ্য করলেন পিসিমা—আর বেশ খুশি মনেই চকিতে অদৃশ্য হয়ে গেলেন ভদ্রলোক।

এরপর পার্টনার নেওয়ার পালা। সভয়ে লক্ষ করলাম, আমার ঠিক বিপরীত দিকেই বসেছেন পিসিমা স্বয়ং। এমনভাবে বসেছেন যেন ব্রিজখেলার আবিষ্কর্ত্রী তিনিই। আর, কার্যত দেখলাম তাই বটে।

তাস ফেটে দিলাম আমি। মেদ-থলথল বিশাল বাহু সঞ্চালন করে তাস ক'টি তুলে নিয়ে আমার দিকে তাকালেন পিসিমা। শুধু তাকালেন তো নয়, যেন দৃষ্টিশরে বিদ্ধ করলেন।

তারপরেই এল কড়া আদেশ, 'তাস গুনুন। এই হল প্রথম নিয়ম। আপনি কোন নিয়মে খেলেন মিস্টার রায়?'

'নিয়ম?' ক্ষীণস্বরে পুনরাবৃত্তি করি আমি ঃ 'তা তো জানি না। আমি তো শুধু খেলি।'

চট করে বললেন উনি, 'আমরা নড়েচড়ে খেলব।'

'ইয়ে—ঠিক বুঝতে তো পারলাম না।' কাঁচুমাচু মুখে বলি আমি।

'বলা হচ্ছে যে, মাঝে-মাঝে পার্টনার পালটাব আমরা।'

'ওঃ, তাতে আমি রাজি!' আন্তরিকভাবেই বলি আমি।

এমন শক্ত চোখে আমার দিকে উনি তাকালেন যে-চোখ এড়াতে গিয়ে আমায় তাকাতে হল অন্য দিকে। আর, তাইতেই চোখাচোখি হয়ে গেল যাঁর সঙ্গে, তাঁকেই আজ সন্ধ্যায় ডিনারের ঠিক আগেই দেখেছিলাম আধো-অন্ধকার করিডরে। হঠাৎ রাশি-রাশি চিন্তা ভিড় করে এল মাথায়। পিসিমার দু-নম্বর কানুন মনে হল যেন মাইলখানেক দূর থেকে ভেসে আসছে। অবশ্য, সে-স্বরলহরী অচিরেই এসে পৌঁছল একেবারে কানের গোড়ায়।

বেশ কিছুক্ষণ খেলার পর পিসিমা বুঝলেন যে, অনভিজ্ঞ শুধু আমি একা নই, উপস্থিত প্রত্যেকেই। অসাধারণ তাঁর সহ্যশক্তি, কিছু তবুও তিন-তিনবার পার্টনার বদল করার পরও যখন দেশমুখই বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন তাঁর আবিষ্কৃত নিয়ম-কানুনের বিরুদ্ধে, তখন হাতের তাস টেবিলে আছড়ে ফেলে সচল বিন্ধ্যাচলের মতো সেলুন ত্যাগ করলেন তিনি। জলপরীর ঘড়িতে তখন পর-পর ছ'বার ঘণ্টাধ্বনি হচ্ছে। তাই শুনে বেশ কিছুক্ষণ হিসেব করে এবং নিজের ঘড়ি দেখে জানলাম ছ'টা ঘণ্টাধ্বনির অর্থ রাত এগারোটার সময়-সঙ্কেত।

অলোক ঘোষ আর তরফদার দুজনেই তখন বেজায় ব্যস্ত কবিতাকে নিয়ে। মনে হল, রাত এগারোটার আগে কন্দর্প দুজনের জিহ্বাযুগল অসাড় হবে না কোনওমতেই। কবিতা কিন্তু আড়চোখে ইশারা করে দিলে আমায়—তারপর হাসি মুখে দুজনকেই শুভরাত্রি জানিয়ে এগিয়ে এল আমার দিকে।

ফিসফিস করে বললে, 'শালটা আনছি—একটু অপেক্ষ করো, বুঝলে? সূর্যাস্ত সম্বন্ধে বেশ কিছু আলোচনা আছে তোমার সঙ্গে।'

হাতে বিশেষ কোনও কাজও ছিল না তখন। কাজেই সানন্দে সায় দিলাম কবিতার প্রস্তাবে। শালটা গায়ে জড়িয়ে একটু পরেই ও ফিরে এলে দুজনে এগিয়ে গেলাম ডেকের এক নিরালা কোণে পাশাপাশি রাখা দুটো ডেক চেয়ারের দিকে।

নিস্তরঙ্গ আরব সাগরের ওপরে দুলে-দুলে এগিয়ে চলেছিল জলপরী। চাঁদের স্নিগ্ধ আলো অপরূপ সুষমা এনেছিল ধীর-স্থির-শান্ত জলে। যেন লক্ষ মণিদীপদীপ্ত অঞ্চল চঞ্চল দেহে টেনে সমুদ্রের কল্লোল-সঙ্গীত শুনতে-শুনতে প্রবাল-পালঙ্কে সুপ্তির অঙ্কে ঢলে পড়েছে অযুত জলকন্যা। মৃদুমন্দ বাতাসে মধ্যে-মধ্যে সে-অঞ্চলে জাগছিল বিলোল-হিল্লোল। চারদিক নিশ্চুপ নিথর—দিক হতে দিগন্তে প্রসারিত সে অসীম, অনন্ত, অব্যয় শান্তির সঙ্গে তুলনা হয় না কোনও কিছুর সঙ্গেই।

মুগ্ধ হয়ে গেছলাম আমি। কল্পনাপ্রবণ বাঙালি নাকি অল্পেতেই প্রকৃতির সৌন্দর্যে হারিয়ে ফ্যালে নিজেকে। দেশ ছেড়ে সাত সমুদ্দর তেরো নদী আর তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে রাজকন্যার পাশটিতে বসে আরব সাগরের বুকে দুলতে-দুলতে আবেশ লাগল আমার চোখেও। মুগ্ধ অন্তর থেকে তাই শুধু একটি শব্দই বেরোল, 'অপূর্ব!'

'তোমার ভালো লেগেছে?' শুধোয় কবিতা।

নিরর্থক প্রশ্ন। ভালো যে লেগেছে, তা না জিগ্যেস করলেও চলে। তবুও সেই আদম আর ইভের সময় থেকে যুগ-যুগ ধরে মুগ্ধ পুরুষের আঁখিতে মায়া সিঞ্চন করার পর এই প্রশ্নই করে এসেছে প্রিয়ংবদারা। এ-প্রশ্নের বাঙ্ময় উত্তর নেই—আছে হৃদয় দিয়ে উপলব্ধির পালা, আছে আঁখির কালো মণিকা দিয়ে শব্দের অতীত সুরকে ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস।

আমিও তাই কথা বলে আর হৃদয়তন্ত্রীতে রণিত সুর-হারানোর কারণ হলাম না। কতক্ষণ চুপ করে পাশাপাশি বসে রইলাম দুজনে।

তারপর শুধোলাম এক সময়, 'সূর্যাস্ত সম্বন্ধে কী যেন বলছিলে না? কীরকম লাগল তোমার?'

'মন্দ কী। তবে আমার আবার চাঁদকেই ভালো লাগে বেশি।' বলে বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে ও। তারপর শুধোয়, 'কী ভাবছ তুমি?'

'ভাবছি নয়। ঈশ্বরের কাছে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা জানাচ্ছি। মধ্যবিত্তের পর্যায়ে নেমে আসুক কবিতা রায় আর তার ফ্যামিলি, আর শ-দুই টাকা মাইনের হেডমাস্টার হয়ে যান সোমেশ রায়। সত্যি কথা বলতে কী কবি, বান্দ্রার চ্যারিটি শো-তে তোমার আমার প্রথম পরিচয়ের পরের মুহূর্ত থেকেই সমানে প্রার্থনা জানিয়ে চলেছি আমি।'

হেসে ফেলল কবিতা।

'স্কুলে গিয়ে সময় নষ্ট করার মতো সময় সারা জীবনেও পাননি বাবা। কাজেই বৃথাই শক্তিক্ষয় করছ তুমি।'

একঝলক ঠান্ডা হাওয়া ভেসে আসে সাগরের বুক থেকে। উঠে দাঁড়িয়ে চেয়ারের ওপর থেকে র‍্যাপটা তুলে নিয়ে জড়িয়ে দিলাম ওর ঊর্ধ্বাঙ্গে। ওর আঙুলের ছোঁয়া লাগল আমার আঙুলে। হঠাৎ কী হল, হাতখানা সরিয়ে ওর উষ্ণ কোমল আঙুলগুলি আলতো করে ধরলাম আমার মুঠির মধ্যে। সে-ছোঁয়ায় বুঝি সোনার কাঠির জাদুপরশ লাগল দুজনের মনের মণিকোঠায়—তাই দুজনে দুজনের মুখের দিকে চেয়ে বসে রইলাম চুপ করে।

তারপর যেন বাতাসের সুরে বললাম, 'কবি!'

'বলো।'

কিন্তু শেষ পর্যন্ত বলা আর হল না। আবার নৈঃশব্দ।

একটু পরে কবিতাই শুধোয়, 'বাবাকে কীরকম লাগল তোমার?'

'সত্যিকারের পুরুষসিংহ উনি। কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে আমার মতামতের কী মূল্য বলো? হোমরা-চোমরা অভ্যাগতদের মতামত শুনলেই তিনি খুশি হবেন বেশি।'

'ভুল ওইখানেই করলে মৃগ। কোটিপতি হলেও সামান্য রাজমিস্ত্রির সন্তান তিনি—তা সোমেশ রায় কখনও ভোলেন না। সমাজের অভিজাত মহলে মেশবার জন্যে আজ তিনি সাহেবিয়ানা রপ্ত করেছেন—কিন্তু একদিন যে দিনরাত পরিশ্রম করেও মাসান্তে কুড়িটা টাকাও রোজগার করতে পারেননি—তা উনি ভোলেন না কখনও।'

'কিন্তু সে তো বহু বছর আগেকার কথা।'

'বিয়ের ক'বছর আগে পর্যন্ত এই অবস্থা ছিল ওঁর।'

লক্ষ মাণিকের দীপ্তি জড়ানো সাগর জলের অশান্ত কল্লোল-সঙ্গীতে সুর মিলিয়ে এমন সুরে কথাটা ও বললে যে, হঠাৎ যেন কীরকম হয়ে গেলাম আমি। বসন্ত-বায়ুর কত স্পন্দন-কম্পন, নিশ্বাস-উচ্ছ্বাস আর আভাসগুঞ্জন মৌন বেদনায় হারিয়ে যাচ্ছিল নীরব নিশীথের অশ্রুত সঙ্গীত-ঝঙ্কারে। তাই আর চুপ করে থাকতে পারলাম না, দু-হাতে ওর হাতটা চেপে ধরে বললুম, 'কবি, তুমি কী কিছুই বোঝোনি?'

'বুঝেছি। যেদিন প্রথম তোমায় দেখেছিলাম, সেদিনই।'

'কবি।'

'আমি জানতাম। এতদিন প্রতীক্ষা করছিলাম কখন তুমি নিজে তা বলবে।'

ঠিক এই সময়ে একটুকরো মেঘের আড়ালে মুখ লুকোলে চাঁদ। আমিও যেন সংবিৎ ফিরে পেলাম।

বললাম, 'না কবি, এ আমার দুরাশা। কোনওদিনই রাজি হবেন না তোমার বাবা।'

'কিন্তু রাজি তাঁকে করাতেই হবে।'

'তুমি বুঝছ না, এ-কথা শোনামাত্র উনি সোজা আদেশ দেবেন জ্যান্ত অবস্থায় আমায় একটা ফার্নেসে ঢুকিয়ে দিতে।'

'তোমার সঙ্গে আমাকেও ঢোকাতে হবে তাহলে।'

'কবি! আশ্চর্য। কিন্তু এ কি অন্তর থেকে বললে তুমি?'

'তুমি যে জন্যে আশ্চর্য হচ্ছ তা আমি বলতে চাইছি না। বিয়ে আমি তোমাকেই করব, এই কথাই বলতে চাই আমি।'

'আমিও তা চাই। ধনীকন্যাদের বিয়ে করাব পরই অর্থপিশাচ হয়ে যেতে দেখেছি অনেককে। আমি কিন্তু একটি কানাকড়িও নেব না তোমার বাবার কাছ থেকে, এমনকী কোনও চাকরিও নয়।'

'মিছে ভেব না—কোনওটাই পাবে না তুমি।'

'কিন্তু কবি, আমি তো তা বলতে চাই না। আমি বলতে চাই - আমি বলতে চাই—।'

'থাক, শুধু চাইলেই হবে না। সক্রিয় হতে হবে, যেমনটি আমি চাই।'

'অর্থাৎ?'

'অর্থাৎ, বাবার কাছে গিয়ে সবকিছুই বলতে হবে তোমায়। পারবে?'

'আলবাৎ। ইয়ে...নিশ্চয়। এবার দেখা হলেই কথা পাড়ব।'

'কী বলবে? গুড মর্নিং, না গুড ইভনিং?'

'ঠাট্টা হচ্ছে? কিন্তু এক লাইন শুনলেই তো উনি বলবেন জলপরী ছেড়ে জলে নেমে যেতে।'

'মোটেই না। বাবার প্রকৃতিই নয় ওরকম। তোমার প্রস্তাব যদি ওঁর মনঃপূত না হয়, তাহলে তুমি যা ভাবছ, সেরকমটি কিছুই করবেন না উনি। বুদ্ধি আর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে মানুষের হৃদয়ের তল পর্যন্ত দেখে নেওয়ার ক্ষমতা ওঁর আছে বলেই জীবনে এত উন্নতি করতে পেরেছেন কারও সাহায্য না নিয়েই। লোক চিনতে বেশি দেরি ওঁর হয় না।'

'তাহলে কলির সত্যবান মৃগাঙ্ক রায়ের জয় তো অবশ্যম্ভাবী।'

'আহা রে, সাক্ষাৎ যুধিষ্ঠির আর কি! ওই বচনটুকুই শুধু সার!'

'তার মানে? বলো না কী করতে হবে?'

'কিছু না করলেই বাধিত থাকব। শুধু এমনভাবে ওঁর সঙ্গে মানিয়ে চলবে যেন তোমার ভেতর পর্যন্ত দেখার সুযোগ পান উনি। মোট কথা, খুব সহজ হয়ে উঠবে, বুঝেছ?'

'তাহলে আরও বছর কয়েকের মতো নিশ্চিন্ত থাকতে পারো।'

'তোমার মুন্ডু! সাধে কি আর বলি—যাই হোক, শোনো বাক্যবাগীশ, আমি যেমন তোমায় ভালোবাসি—ঠিক তেমনি বাবাও ভালোবাসেন আমায় সমস্ত অন্তর দিয়ে। কাজেই যেভাবেই হোক, তোমাকে তাঁর প্রিয়পাত্র হতেই হবে। তাঁর অমতে কিছুতেই সুখী হব না আমি এ-বিয়েতে।'

'খুবই স্বাভাবিক।'

'তার ওপরে হতচ্ছাড়া ওই টাকাটা হারিয়ে যাওয়ায় একেবারেই মন ভেঙে গেছে ওঁর।'

সেকেন্ড কয়েক একটা নতুন চিন্তা করে নিই। তারপর বলি, 'কবি, ইন্দ্রনাথের নাম শুনেছ?'

'তোমার বন্ধু তো? অনেকবার ওঁর গোয়েন্দাগিরির গল্প তো আমায় শুনিয়েছ। কেন বলো দিকি?'

'জানোই তো, সব বাঁশে বংশলোচন হয় না। তাই অনেকদিন ধরে ইন্দ্রনাথের শাগরেদি করেও যেরকম জড়দগব ছিলাম, সেই রকমটিই রয়ে গেছি—।'

'তা না বললেও চলত।'

'কিন্তু চেষ্টা করলে ওর অভিজ্ঞতাকে হয়তো আমিও কাজে লাগাতে পারি।'

'তাতে লাভ?

'রুপোর টাকা উদ্ধার।'

লাফিয়ে উঠল কবিতা : 'দি আইডিয়া! এতক্ষণ একথা বলোনি কেন?'

'বলতে আর দিচ্ছ কই। ধরো, টাকাটা খুঁজেপেতে বার করে ফেললাম—তাহলেই

পুরস্কারস্বরূপ তোমায় তখন অনায়াসেই চাইতে পারব, কী বলো?'

'শুধু কি তাই? সেই সঙ্গে পিসিমা আর জলপরীকেও উনি গছিয়ে দেবেন তোমার হাতে।'

'তবেই সেরেছে। ইয়ে-মানে—আমি বলছি কী, জলপরী রাখার মতো সঙ্গতি কই আমার?'

'ওসব বাজে কথা এখন থাকুক। শোনো,' বলে আরও একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে ও। বলে, 'এসো, আমরা দুজনেই একসঙ্গে তদন্ত করি এ ব্যাপারে। প্রথম কাজ তো সন্দেহভাজনদের জেরা, তাই না?'

'তাহলে প্রথমে তোমাকে দিয়েই শুরু করা যাক। তুমিই তখন বলছিলে না, টাকাটা হারিয়ে গেলে খুশি হতে খুবই?'

'খবরদার, কী বলতে চাও তুমি?'

'এই দ্যাখো, চট করে চটে গেলে কাজ এগোয় কী করে?'

'চটব না? তোমাকে আর ভাবতে হবে না, আমি বলছি। পিসিমাকেও অনাযাসে বাদ দিতে পারো তুমি।'

'ওভাবে পটাপট বাদ দিতে থাকলে গোয়েন্দাকেও তল্পিতল্পা গুটোতে হবে।'

'আলবাত দেব। এসব ব্যাপারে মেয়েদের সহজাত বোধশক্তি গোয়েন্দাদের চেয়েও অনেক বেশি কার্যকরী। মিস্টার তরফদার—কোনও মোটিভ নেই। মিস্টার দেশমুখ—তোমার কী মনে হয়?'

'একে আইনজ্ঞ, তার ওপর রাজনীতিজ্ঞ। চালচলন বেশ দুর্বোধ্য আর রহস্যময়।'

'আমারও তাই মনে হচ্ছে। সবার আগে নিজের দেহ সার্চ করানোর জন্যে বড় বেশি আগ্রহ দেখেছিলাম। খুবই সন্দেহজনক।'

'কিন্তু যাই বলো, তোমার বাবা কিন্তু ভারি চমৎকার মানুষ। পাছে অতিথিদের আত্মসম্মানে ঘা লাগে, তাই কিছুতেই রাজি হচ্ছিলেন না দেশমুখের প্রস্তাবে।'

ফিক করে হেসে ফেলল কবিতা।

'বাবার সৌজন্যবোধ দেখে এতটা মুগ্ধ না হলেই বুদ্ধিমানের কাজ করতে। টাকা-চোর যে চোরাই মাল নিয়ে টেবিলে আসেননি—তা উনি ভালো করেই জানতেন। অতখানি দুঃসাহস চোরের থাকবে না জেনেই চূড়ান্ত আতিথেয়তা দেখাতে কুণ্ঠিত হননি বাবা। কিন্তু রুপোর টাকা ওঁর যেভাবেই হোক চাই। আর, সেজন্যে জলপরী থেকে নামার আগে প্রত্যেকের কলজে চিরে দেখতেও ইতস্তত করবেন না উনি। তারপর ধরো অলোক ঘোষকে। বাবাকে সিংহলের ব্রিজ কনট্র্যাক্ট থেকে দূরে রাখার জন্যে তাঁর আগ্রহ লক্ষ করেছ তো?'

'হুম। অলোক ঘোষকে তো তাহলে রেহাই দেওয়া চলে না কোনওমতেই। ভালো কথা, মিসেস প্যাটেলকে কীরকম মনে হয় তোমার?'

'ওঁর সম্বন্ধে তো কিছুই জানি না আমি।'

'ভদ্রমহিলার অবস্থা কিন্তু খুব সচ্ছল নয়। আমাকে বলছিলেন নিজেই। আমার অবস্থাও অবশ্য তাই।...ও হ্যাঁ, আমাকে যেন আবার বাদ দিও না।'

'ননসেন্স! পরের জিনিস নেওয়ার মতো নীচ তুমি নও।'

'তা—ইয়ে—ঠিকই বলেছ।' গলার কলারটা আবার যেন বড় শক্ত মনে হল।

হতাশ হয়ে পড়ে কবিতা : 'কিন্তু কোনও লাভই তো হল না। একটা সূত্রও যদি পেতাম।'

'তা অবশ্য পেয়েছি।'

'কী বললে?'

'একজন অভ্যাগতকে তুমি একেবারেই বাদ দিয়েছ। রুপোর টাকা চুরি করার পেছনে সোমনাথ মুখার্জিরও তো মোটিভ থাকতে পারে?'

'মোটেই না—ভুল ধারণা তোমার।'

'হবেও বা। আচ্ছা, করিডরের শেষের কেবিনটা তোমার বাবার, তাই না?'

ঘাড় নেড়ে সায় দিল কবিতা।

বললাম, 'ডিনারের ঠিক আগেই দেখলাম স্বয়ং সোমনাথ মুখার্জি চোরের মতো পা টিপে-টিপে বেরিয়ে আসছেন কেবিনটা থেকে। তাঁর ধরন-ধারণ কেমন যেন অদ্ভুত মনে হল। দেখলাম, চুপিসাড়ে করিডর পেরিয়ে উনি ঢুকে গেলেন নিজের কেবিনে।'

'কী বলছ তুমি?'

'যা দেখেছি। ভদ্রলোক আমার অন্নদাতা, হর্তাকর্তা বিধাতা। এ ব্যাপার যদি ফাঁস করে দিই—তাহলে খুবই খুশি হয়ে উঠবেন আমার ওপর, কী বলো?'

'কী করবে তাহলে?'

'জানি না। অদ্ভুত সঙ্কুল পরিস্থিতিতে এসে পড়েছি। তোমার বাবাকে যদি সব বলি, তাহলেই সোমনাথ মুখার্জি এমন একটা সাফাই গাইবেন যে, আমি যে একটা নিরেট মূর্খ, তা প্রমাণিত হয়ে যাবে সঙ্গে-সঙ্গেই। আমার মতে, আগে সোমনাথ মুখার্জিকেই সবকিছু খুলে বলা ভালো।'

'তোমার চাকরিও খতম তাহলে।'

'আশ্চর্য নয়। কিন্তু সত্যের মূল্য চিরকালই এইরকম। তা ছাড়া, দৈনিকের অভাব এদেশে নেই, কাজেই—।'

'যা ভালো বোঝো করো।'

'ভালো কি না জানি না। তবুও বুক ঠুকে দেখা যাক ধোপে টেকে কি না প্ল্যানটা। সোমনাথ মুখার্জি যে আসলে একজন পাকা ক্রিমিন্যাল, এইটাই প্রথম সমঝে দিতে চাই তাঁকে। ঘরের মধ্যে কী করছিলেন উনি—তাহলেই তা জানতে পারব। পারলে এখনই দেখা করতাম ওঁর সঙ্গে।'

উঠে দাঁড়ালাম দুজনে।

কবিতা বলল, 'তাহলে মনে থাকে যেন, এ-কেসের দায়িত্ব দুজনেরই সমান। তুমি শার্লক হোমস আর আমি ডক্টর ওয়াটসন। ওয়াটসন হিসেবে আমাকে তো অনায়াসেই চালিয়ে দেওয়া যায়, কী বলো?'

'শুধু ওয়াটসন। স্বয়ং কনান ডয়েল বললেও অত্যুক্তি হয় না।'

'সত্যি? তাহলে আমার ব্রেন আছে বলো? আমি কিন্তু ব্রেনওয়ালা পুরুষদের ভালোবাসি খুবই।'

'আর, আমি বাসি তোমায়। কবি, সত্যিই কি পাব তোমার বরমাল্য? আমার যেন মনে হচ্ছে স্বপ্ন দেখছি।'

'কিন্তু আমি দেখছি না। চললাম। গুডনাইট অ্যান্ড গুড লাক।'

সৌভাগ্য-সূর্য যে আমার মধ্যগগনে, তার প্রমাণ পেলাম তৎক্ষণাৎ। স্মোকিংরুমে গিয়ে দেখি, 'নোটিলাস' আকারের চুরুট কামড়ে ধরে তন্ময় হয়ে ধূম্রজাল নিরীক্ষণ করছেন সোমনাথ মুখার্জি। আমাকে দেখে খুব খুশি হলেন বলে মনে হল না—আমি কিন্তু তা উপেক্ষা করে বেশ আয়েস করে বসলাম পাশের কাউচে।

'বাইরের আবহাওয়া কত পরিষ্কার দেখছেন?' একটু নড়েচড়ে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করি আমি।

'দেখেছি।' নিস্পৃহ স্বর সোমনাথ মুখার্জির।

'দিব্যি ফুর্তিতে ছিলাম সবাই—যত ঝামেলার সূত্রপাত হল ওই টাকাটা হারিয়ে গিয়ে। আপনি কী বলেন?'

'ঠিক কথা।'

বলে, চুরুটে লম্বা একটা টান দিয়ে ওঠবার উদ্যোগ করলেন তিনি।

'এক মিনিট স্যার,' বাধা দিয়ে বলি আমি : 'আপনি প্রবীণ, অভিজ্ঞ, তাই আপনার কাছে

কিছু পরামর্শ চাই আমি।'

'বটে?'

'ধরুন এমন একটা সূত্র আমাদের একজন পেয়েছে, যা—ইয়ে—টাকা-চোরকে খুঁজে বার করার কাজে লাগতে পারে খুবই। তাহলে তা মিস্টার রায়ের কাছেই জানানো উচিত হবে আমাদের, তাই নয় কি? আপনি কী বলেন স্যার?'

'এ বিষয়ে কোনও দ্বিমতই থাকতে পারে না।'

'মহাসঙ্কটে পড়েছি আমি। ডিনারের ঠিক আগেই ঘরের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়েছিলাম—ঘরের আলো অবশ্য নেভানো ছিল। হঠাৎ দেখলাম মিস্টার রায়ের কেবিন থেকে একটি মূর্তি বেরিয়ে এসে করিডর পেরিয়ে ঢুকে গেল নিজের কেবিনে। লোকটার হাবভাব কীরকম অদ্ভুত মনে হল আমার।'

'তাই নাকি?'

'এরকম পরিস্থিতিতে আপনি পড়লে কী করতেন স্যার?'

'সোমেশ রায়কে সবকিছুই খুলে বলতাম নিশ্চয়।'

'কিন্তু স্যার, সে-মূর্তি তো আপনারই।'

প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যবসায়-মহলে মধ্যে-মধ্যে সোমনাথ মুখার্জির মুখকে তুলনা করা হয় ড্রাগনের মুখের সঙ্গে। ভদ্রলোকের বরফ-ঠান্ডা দৃষ্টি আমার ওপর পড়তে এ-উপমার যাথার্থ উপলব্ধি করলাম অন্তরে-অন্তরে।

শুধোলেন, 'অফিসে ওরা কত মাইনে দেয় আপনাকে?'

সংযত স্বরে বললাম, 'ব্ল্যাকমেল করার কোনও ইচ্ছে আমার নেই, স্যার।'

দপ্ করে জ্বলে উঠল বৃদ্ধ সোমনাথ মুখার্জির দুই চক্ষু।

'কে বলেছে আপনাকে ব্ল্যাকমেলেব কথা? আমি শুধু বলতে চাই যে, অফিসের ওরা আপনাকে যা দেয়, তার উপযুক্ত আপনি নন মোটেই। কেন না, আপনার মতো নিরেট আহাম্মক আমি জীবনে আর দুটি দেখিনি। সোমেশ রায়ের টাকা আমি নেব কী জন্যে?'

'তা তো জানি না স্যার।'

'কেউই জানে না। ওর ঘরে আমি গিয়েছিলাম ঠিকই—ওর একটা জিনিসও আমি সরিয়েছি, কিন্তু নিতান্ত অদরকারি সে-জিনিসটা। যদিও সব কথা বলার কোনও দরকার দেখি না—তবুও শুনে রাখুন। ভ্যালে রাখা নিয়ে বহু বছর ধরে সোমেশের সঙ্গে আমার তর্ক-বিতর্ক চলছে। পোশাক পরার সময়ে ভ্যালে রাখা পছন্দ করে ও—আমি কিন্তু একদম দেখতে পারি না তা। নিজের পোশাক যদি নিজেই না পরতে পারলাম—তাহলে খাইয়ে দেবার জন্যেও তো দরকার অন্য লোকের। কিন্তু সন্ধেবেলা সুটকেস খুলে দেখি, তাড়াতাড়িতে একটা ড্রেস-টাইও আনা হয়নি সঙ্গে।'

'টাই না নিয়েই সুটকেস গুছিয়েছেন?' ফস করে বলে ফেলি আমি। কোটিপতিদেরও পোশাক বিভ্রাট ঘটে তাহলে।

'একটিও না। অথচ ডিনার টেবিলে টাই না পরে গেলে অপদস্থর চূড়ান্ত হতে হবে। তাই, এ-কথা ওর কানে না তুলে ওর অজান্তে ওরই একটা টাই নেওয়া স্থির করলাম। জানতাম হরেকরকম টাই আছে ওর কাছে—তাই ও বাথরুমে গেলে চুপিসাড়ে একটা টাই নিয়ে ফিরে এলাম নিজের ঘরে। ভেবেছিলাম, কাউকে বলব না এ-কথা—কিন্তু যখন তা আর হল না, তখন এও বলে রাখি—অনায়াসেই এ-কথা আপনি সোমেশের কানে তুলতে পারেন।'

মনে-মনেই বলি, 'গভীর জলের মাছ!' কিন্তু পরক্ষণেই মনে পড়ে গেল আমার শার্ট-বৃত্তান্ত। মুখে বললাম, 'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন স্যার। কথা দিচ্ছি, এসব কথা আর কেউই শুনতে পাবে না।'

'যথা অভিরুচি।' বলে উঠে দাঁড়ালেন সোমনাথ মুখার্জি।

'আর এক মিনিট, স্যার। ডক্টর তরফদারের ইন্টারভিউ নেওয়ার দায়িত্ব কি এখনও রইল আমার ওপর? মানে—আপনার কাজে এরপরও বহাল রইলাম কি না জানতে চাইছি।'

বেশ কিছুক্ষণ স্থির চোখে তাকিয়ে রইলাম পরস্পরের দিকে। প্রথমে চোখ সবিয়ে নিলেন মিঃ মুখার্জিই।

বললেন, 'ওহো, সেই প্রবন্ধটার কথা বলছেন বুঝি? ঠিক আছে, সে-ভার আপনার ওপরেই রইল।'

বলে, ধীরপদে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন তিনি। আর পেছন থেকে তাঁর মন্থর চলন-ভঙ্গির দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসি ফুটে উঠল আমার ঠোঁটে। আমি আপন মনেই থেমে-থেমে পুনরাবৃত্তি করি, 'কে বলেছে আপনাকে ব্ল্যাকমেলের কথা?'

কেবিনে ফেরার পথে দেখি ফাঁকা হয়ে গেছে চাঁদের আলোয় ধোওয়া জলপরীর ডেক। ঘরে এসে চটপট কোট, টাই খুলে ফেললাম, তারপর টান মেরে নিজেকে মুক্ত করলাম বেয়াড়া আকারের শার্টের কবল থেকে। নিচু একটা সেট্টির ওপর হিরের বোতাম সমেত শার্টটা ছড়িয়ে রেখে এসে বসলাম বার্থের ওপর। সিলিংয়ের আলোয় ঝিকমিক করতে লাগল হিরেগুলো। সে-দ্যুতি দেখে মনে হল ধার করা শার্টের শোভা বাড়িয়ে লজ্জায় অভিমানে ঝিলকিয়ে উঠছে রায় বংশের ঐশ্বর্য।

কাল সকালে উঠেই বাহাদুরকে দিয়ে শার্টটা ফেরত দিতেই হবে। ভাবতে-ভাবতে লম্বমান হলাম শয্যায়। আজকের সোনালি সন্ধ্যা আমার জীবনে সৃষ্টি করল এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়ের। কবিতা তাহলে সত্যিই আমায় ভালোবাসে। যা এতদিন স্বপ্ন ছিল, সে ভিরু ইচ্ছাটাকে এতদিন অতি সঙ্গোপনে লালন করে এসেছি মনের গহনে, তা তাহলে সত্যি হয়েছে। জীবনে যে এত সুধা আছে তা তো জানতাম না। সুখ, শুধু সুখ—আনন্দের অমৃত-সলিলে অবগাহন করেও এত সুখ পায় কেউ.. ।

ভালো কথা, টাকাটা যেভাবেই হোক খুঁজে বার করতে হবে। কিন্তু সরাল কে? সোমনাথ মুখার্জির কৈফিয়ত মোটেই সন্তোষজনক নয়। অবশ্য সত্যি হওয়াও বিচিত্র নয়। দারুণ দরকারের সময়ে আমারও তো শার্ট ছিল না। ও ভদ্রলোকেরও সে-অবস্থা হওয়াটা মোটেই আশ্চর্যের ব্যাপার নয়। কিন্তু আর সকলে? অলোক ঘোষ, দেশমুখ, মিসেস প্যাটেল? প্রত্যেকেই সন্দেহ জাগিয়ে তুলেছে। বড় গোলমেলে ব্যাপার দেখছি...প্রমাণ নেই...কিন্তু...তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

আচমকা ঘুম ভেঙে গেল। ঘর অন্ধকার। দেখতে পেলাম না কিছুই, তবুও সমস্ত সত্ত্বা দিয়ে উপলব্ধি করলাম ঘরের মধ্যে আবির্ভাব ঘটেছে দ্বিতীয় ব্যক্তির।

'কে?'

ঘুম জড়ানো চোখে জড়িত স্বরে শুধোই আমি।

ছোট্ট একটা শব্দ—খুলে গেল দরজা। তড়াক করে লাফিয়ে নেমে পড়লাম বার্থ থেকে। চকিতে আলো জ্বেলে দিয়ে তাকালাম করিডরে। অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে দেখলাম করিডরের শেষপ্রান্তের সিঁড়িটার দুটো-তিনটে ধাপ একসঙ্গে টপকে বেগে ওপরে উঠে যাচ্ছে একটা কালো ছায়া। পেছন ফিরে চাদরটা গায়ে জড়িয়ে, স্লিপারটা পায়ে গলিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটলাম সেদিকে।

. কিন্তু চাদর আনতে আর স্লিপার পায়ে গলাতে গিয়ে যে-সময় নষ্ট করেছিলাম—তার খেসারত দিতে হল সঙ্গে-সঙ্গেই। ওপরের ডেকে পৌঁছে জনপ্রাণীর চিহ্ন দেখলাম না ধারে-কাছে।

ঘুম তখন একেবারেই ছুটে গেছে চোখ থেকে—তবুও যে কী করা উচিত, তা ভেবে না পেয়ে বোকার মতো দাঁড়িয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। তারপর রেলিংয়ের পাশ দিয়ে আস্তে-আস্তে এগোতে লাগলাম গলুইয়ের দিকে। আর তারপরেই আচমকা থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম আমি।

যে-দৃশ্য দেখে দাঁড়ালাম, তা কিন্তু জাহাজের ডেকের ওপর নয়, জলপরী থেকে খানিক দূরে

সাদা আশ্চর্য শান্ত সমুদ্রের ওপর। আরব সাগরের জলে দুলতে-দুলতে দ্রুতগতিতে দূর হতে দূরে ভেসে যাচ্ছিল—একটা শার্ট!

অবিশ্বাস্য, কিন্তু তবুও তা সত্যি! আর—এ কী! এ আমার কল্পনা, না চক্ষুভ্রম? ভাসমান শার্টটার ধবধবে বুকে দুধ-সাগরের শুক্তি-মুক্তোর মতো ঝিকমিক করছে ঠাকুরদার হিরের বোতাম না?

দূরে, দূরে, আরও দূরে ভেসে চলল শার্টটা—আর ঠাকুরদাব একমাত্র উত্তরাধিকারী জলপরীর রেলিংয়ে ভর দিয়ে বিচ্ছেদ-করুণ নয়নে তাকিয়ে রইল সেদিকে।

হঠাৎ ঠিক পেছনেই একটা স্বর শুনে ধক করে উঠল হৃদযন্ত্রটা।

'কী ব্যাপার, বেড়াচ্ছেন নাকি?'

ঘুরে দাঁড়ালাম।

ডাইনিং সেলুনের ঠিক দরজার কাছে বসে একটা কালো ছায়ামূর্তি, জ্বলন্ত সিগারেটের লাল অগ্নিপ্রান্তটি স্থির হয়ে ছিল মুখের সামনে।

'মিস্টার দেশমুখ যে!' সত্যিই আশ্চর্য হয়ে যাই আমি।

'ধরেছেন ঠিকই। ভারি সুন্দর রাত, না?'

'কতক্ষণ আছেন এখানে?'

'ঘণ্টা দেড়েক তো বটেই! এমন সুন্দর রাতে ঘরে বসে থাকতে মোটেই ভালো লাগে না আমার।'

'আচ্ছা, একটু আগেই এদিকে কে দৌড়ে এল বলুন তো?'

'কে?'

'আমার কেবিনে ঢুকেছিল লোকটা—পিছু নিয়ে এদিকে দৌড়ে এলাম। কিন্তু কাউকে তো দেখতে পাচ্ছি না।'

'ব্রোমাইড আছে ঘরে? থাকলে, এক ডোজ খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়ুন, স্নায়ুগুলো শান্ত হবে, ভালো ঘুম হবে।'

'কিন্তু—।'

'ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে আপনাকে ছাড়া দ্বিতীয় কোনও প্রাণী আমি দেখিনি।'

'সারাক্ষণ এখানেই ছিলেন তো? কিন্তু সিগারেটটা তো দেখছি এইমাত্র ধরিয়েছেন।' বলি আমি।

'আপনার দুর্ভাগ্যক্রমে এটা আমার তিন নম্বর সিগারেট।' বললেন দেশমুখ ঃ 'আপনি যদি আমি হতাম, তাহলে এত রাতে গোয়েন্দাগিরি অভ্যাস করতাম না ভদ্রসন্তানের ওপর। বাজে ছেলেমানুষি করবেন না মশায়। এখানে এসে পর্যন্ত লক্ষ করছি কেউ বা কারা একটা বিশ্রী ঝামেলার সৃষ্টি করেছে নিতান্ত অকারণে। এসবের মধ্যে আমি নেই। শহরের হট্টগোল আর হাড়ভাঙা খাটুনি থেকে দূরে সরে এসেছি শুধু স্বাস্থ্যের খাতিরে—তাই নিরালায় এসে বসেছিলাম এখানে। কথা নেই বার্তা নেই কোত্থেকে আপনি উড়ে এসে শুধু আমার শান্তি ভঙ্গ করেই ক্ষান্ত হলেন না, ফট করে আমার সিগারেট সম্বন্ধে একটা নোংরা ইঙ্গিতও করে ফেললেন।'

'মাপ করবেন। আমি শুধু—।'

'শুধু কী?'

'বলতে চাই যে, সমুদ্রের শোভা দেখতে-দেখতে আপনি এমনই তন্ময় হয়ে গেছিলেন যে, লোকটাকে একেবারেই খেয়াল করেননি।'

'ঘরে গিয়ে ঘুমোন—মাথা ঠান্ডা হবে।'

'তা যাচ্ছি।' বলে সরে পড়ি আমি।

চটপট পা চালিয়ে কেবিনে এসে উদ্বিগ্ন চোখে তাকালাম এদিকে সেদিকে। আমার শঙ্কা অমূলক নয়—উধাও হয়েছে শার্টটা। সেইসঙ্গে ঠাকুরদার সুখের হিরের বোতামও। ঠাকুমা এ-কথা শুনলে না জানি কী ধারণাই করে বসবে আমার সম্বন্ধে!

বার্থের কিনারায় বসে পড়ে মাথায় হাত দিয়ে এইসব কথাই ভাবতে লাগলাম। না বলে শার্ট আনাটা নিশ্চয় কারও মনঃপূত হয়নি। তাই—কিন্তু কে তিনি? শার্টের একমেবাদ্বিতীয়ম সত্ত্বাধিকারী নিশ্চয়। তল্লাশি চালানোর সময়ে নিজের শার্ট চিনতে পেরে এই কাণ্ডটি করেছেন। কিন্তু ভদ্রলোকটি কোনজন? কাল সকালেই বলবাহাদুরকে বেশ কিছু সিলভার টনিক দিয়ে আদায় করতে হবে নামটা।

হাই তুললাম সশব্দে। ব্রোমাইড না খেলেও ঘুমের কোনও অভাব আমার হবে না। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটাই যেন বড় গোলমেলে। মাঝরাতে না বলেকয়ে কারও কেবিনে ঢুকে শার্ট চুরি কবাটাই প্রথমত বেজায় বিসদৃশ ব্যাপার। তারপর অত কষ্ট করে নেওয়া শার্ট সাগর-জলে বিসর্জন দিয়ে কী পুণ্যলাভ হল জানি না। সোমেশ রায়ের রুপোর টাকার সঙ্গে কি এ আজব ব্যাপারের কোনও সম্পর্ক আছে?

শুধু প্রশ্ন আর প্রশ্ন। ধুত্তোর—মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে আমার। কিন্তু দেশমুখ যে ডাহা মিথ্যে বলেছে, তা দিনের আলোর মতোই সুস্পষ্ট। আবার একটা হাই উঠল। সতৃষ্ণ নয়নে তাকাই উষ্ণ বার্থটার দিকে। তারপর আলোটা নিভিয়ে দিয়ে এসে স্লিপাব ছেড়ে শুয়ে পড়ি বার্থে।

পরের দিন সকালে বাথরুমের ভেতব তরফদারের গলা ছেড়ে গান গাওয়ার শব্দে ঘুম ছুটে গেল আমার। ভদ্রলোকের গলা অবশ্য খুব খারাপ নয়—চারদিক আঁটা বাথরুমে ঝরনা জলে স্নান কবার ফুর্তিতে সে-গলা আরও খুলে গেছিল।

ঘড়িতে দেখি সাড়ে আটটার ঘর ছুঁই-ছুঁই করছে ছোট কাঁটাটা। উঠি-উঠি করেও উঠতে আর ইচ্ছে হল না। মধুর আলস্যে রিমঝিম করছিল দেহ-মন—চেতনাব দিক হতে দিগন্ত পরিব্যাপ্ত হয়েছিল তারই আমেজে। চুপ করে শুয়ে তাই তাকিয়ে রইলাম পোর্টহোলের পাতলা পরদাটার দিকে—সকালের ফুরফুরে হাওয়ায় অল্প-অল্প দুলছিল সেটা। ফাঁক দিয়ে চোখে পড়ল বাইরের ঝকঝকে নীল আকাশ—কাঁচা বোদের সোনালি আলোর প্রসাধন-লাবণ্যে উজ্জ্বলতর তার সৌন্দর্য। মৃদু ছন্দে দুলতে-দুলতে মসৃণ গতিতে ভেসে চলছিল আমাদের জলপরী। মনে হল, হঠাৎ কি যাদুমন্ত্রবলে নিরুদ্বেগ, নিশ্চিন্ত, নিঃসীম শান্তিঘেরা কোনও এক স্বপনপুরীতে এসে পড়েছি আমি।

বড় মিষ্টি একটা সুখের পরশ পাচ্ছিলাম অন্তরে—বড় মোলায়েম সে-অনুভূতি। যেন খুব আনন্দের একটা অধ্যায় হঠাৎ খুলে গেছে আমার জীবনে—ও, হ্যাঁ, কবিতা। আমায় ভালোবাসে সে। তার কাছে আমি শপথ করেছি টাকাটা খুঁজে বার করার। ফুটফুটে চাঁদের আলোয় পাশে কবিতাকে নিয়ে কাজটা যতটা সহজ ভেবেছিলাম, এখন মনে হল ততটা সহজ নয় নিশ্চয়। যেই নিক না কেন, টাকাটার মূল্য সম্বন্ধে বেশ ওয়াকিবহাল সে। আর, সুযোগ পেলেই বেশ কিছু রজতখণ্ডের বিনিময়ে তাকে হস্তান্তরিত করতে সে দ্বিধা করবে না মোটেই। কিন্তু কে সেই চতুর-চূড়ামণি?

. সোমনাথ মুখার্জির কথা মনে পড়ল। ভদ্রলোকের ভুল করে টাই না-আনার আষাঢ়ে গল্পটা যেন কেমনতরো। রাত দেড়টার সময়ে শান্তি আর সৌন্দর্যের উপাসক দেশমুখকে মনে পড়ল নির্জন ডেকের ওপর। ভদ্রলোক দীর্ঘ অভ্যাসের ফলে কাঁচা মিথ্যাকেও এমন সহজ-সুন্দরভাবে পরিবেশন করেন যে, ধরার ক্ষমতা তাঁর অতি প্রিয়জনেরও থাকে না। মনে পড়ল, গভীর রাতে শার্ট-চোর আগন্তুকের কথা—কিন্তু সত্যিই কী কেউ এসেছিল আমার ঘরে? স্বপ্ন নয় তো?

একলাফে নেমে পড়লাম বার্থ থেকে—তন্নতন্ন করে খুঁজলাম কেবিনটা। কিন্তু সাদা শার্টের

চিহ্নও দেখলাম না কোথাও—শুধু চোখধাঁধানো লাল-সবুজ-নীল ম্যানিলা পুলওভার যেন নীরবে বিদ্রুপ করতে লাগল আমায়। তাহলে কাল রাতের ব্যাপারটা স্বপ্ন নয় মোটেই। এই মুহূর্তে না জানি দূর হতে বহু দূরে কোনও এক অজানা অচেনা রোমান্টিক বন্দর অভিমুখে ভেসে চলেছে ঠাকুরদার শখের হিরের বোতাম। কোনও বিজন দ্বীপের নরখাদক-গৃহিণী এবার তা সানন্দে ধারণ করবে নাক অথবা কানের ফুটোয়। ঠাকুমা শুনলে কী মনে করবে আমার সম্বন্ধে?

সেই মুহূর্তে অবশ্য ঠাকুমার মনে করা-করি নিয়ে খুব বিশেষ উদ্বিগ্ন ছিলাম না আমি। গোয়েন্দার চরিত্রে অভিনয় করতে যখন চুক্তিবদ্ধ হয়েছি, তখন কাজ শুরু করতেই হবে যেমন করেই হোক। পলাতক শার্টের মালিকের নাম জানাই হবে আমার সর্বপ্রথম কাজ।

ঘণ্টা বাজিয়ে ডাকলাম বলবাহাদুরকে। তখনও সমানে ছপাৎ-ছপাৎ শব্দে স্নান-সুখ উপলব্ধি করে চলেছিলেন তরফদার ভদ্রলোক—কাজেই খটাখট বাদ্যসঙ্গীতটা একবার শুনিয়ে দিলাম বাথরুমের দরজায়। কাজ অবশ্য বিশেষ কিছুই হল না, তবে মনটা একটা তৃপ্তি পেল, এই যা।

ভেতরে ঢুকল বাহাদুর—কিন্তু আকর্ণবিস্তৃত হাসিটুকু না নিয়েই। বেশ চিন্তিত মনে হল ওকে।

'সেলাম সাব, বহুত তকলিফ আজ।' শুকনো মুখে শুরু কবে ও : 'টাকা চুরি গেছে তো আমাদের আর বিপদের শেষ নেই। আপ কুছ মাংগতা তো জলদি বাতাইয়ে।'

ওর চোখে চোখ রেখে শুধোলাম, 'শার্টটা কোত্থেকে এনেছিলে?'

'জি হাঁ।' নিমেষে উদাসীন হযে যায় ও।

'আজই ফেরত দেবে তো ওটা?'

'জি হাঁ।'

'দিতে আর হবে না—কাল রাতে ঘর থেকে চুরি গেছে শার্টটা।'

'জী হাঁ।'

বিস্ময় নেই, আগ্রহ নেই, উৎকণ্ঠা নেই। তাহলে কি বুঝব শার্টবৃত্তান্তের কিছুই অজানা নয় ওর? না, নিছক নেপালিসুলভ অহেতুক জেদে কিছু না জানাব ভান করছে? অপলক চোখে তাকালাম ওর দিকে—নিষ্পলক চোখে সেও তাকাল আমাব দিকে।

হতাশ হয়ে পড়লাম। চলতে-চলতে হঠাৎ নিরেট পাথরের দেওয়ালের সামনে হোঁচট খেলে যেমন হয়, তেমনি নিরাশ সুরে বললাম, 'বাহাদুর,.খবরটা কিন্তু খুবই দরকারি। শার্টটা তুমি কার কাছ থেকে এনেছ তা আমায় জানতেই হবে।'

বার্থের দিকে তাকাল বাহাদুর, তারপর একে-একে বাথরুমের দরজা, পোর্টহোল, সিলিংয়ের ওপর দৃষ্টি ঘুরিয়ে এনে চোখ বাখল আমার ওপর। বলল, 'ভুল গ্যয়া।'

'কী বললে?' দপ করে জ্বলে উঠি আমি : 'দ্যাখো, ওসব চালাকির চেষ্টা আমার কাছে কোরো না বলে রাখছি। কোত্থেকে এনেছিলে ভালো চাও তো বলে ফ্যালো চটপট।'

'ভুল গ্যয়া।' উত্তর এল।

আশ্চর্য এই খর্বকায় নেপালিগুলো। অতি কষ্টে সামলে নিই নিজেকে।

'এক মিনিট আগেও তো বলছিলে শার্টটা আজই ফেরত দিয়ে আসবে। কোথায় ফেরত দেবে তা না জানলে কাকে দিয়ে আসবে শুনি?'

'ভুল গ্যয়া।' বলে ও।

বাংলা আর নেপাল মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রইল বেশ কিছুক্ষণ। একজনা কটমট করে অগ্নিদৃষ্টি মেলে রইল তাকিয়ে—অপরজন শুধু নির্বিকারভাবে নিরীক্ষণ করতে লাগল তার জ্বলন্ত চক্ষু।

প্রথমে আমিই চোখ ফিরিয়ে নিলাম। মেজাজ খারাপ করে কোনও লাভ নেই। ধৈর্য, তিতিক্ষা, সহিষ্ণুতা আর মিষ্টি কথা দিয়ে দেখা যাক কার্যোদ্ধার হয় কি না। পর মুহূর্তেই কাজে প্রয়োগ করলাম সবক'টা কৌশলই।

ও বলল, 'বাথরুমের দরজায় চাবি দেওয়া সাব? বহুত খারাপ, বহুত খারাপ।'

'তা যা বলেছ,' বলি আমি ঃ 'যাই হোক, তোমাতে-আমাতে ঝগড়া না করাই ভালো। কাল যা উপকার করেছ, তারপর তো অন্তত নয়ই।'

নিরুত্তরে আমার কোটটার ওপর সবেগে ব্রাশ চালাতে থাকে বাহাদুর।

বিদ্যুতের মতো একটা মতলব ঝলসে উঠল স্নায়ুতন্ত্রীতে।

বললাম, 'কালকের বিপদের কথা তো তুমি জানোই। কাল আরেকজনও এ-বিপদে পড়েছিলেন। শুনলাম, টাই আনতে একেবারে ভুলে গেছেন মুখার্জি সাহেব।'

একটু বিরতি। পরম নিষ্ঠার সঙ্গে ব্রাশ চালাতে থাকে বাহাদুর।

'শুনলাম, পোশাক পরতে গিয়ে উনি দেখলেন যে, সবক'টা টাই ফেলে এসেছেন বাড়িতে।'

কোটটা নামিয়ে রাখল বাহাদুর।

বলল, 'মোখার্জি সাবকা বহুত টাই হ্যায়'।

'তাই নাকি?' এমন ভান করি যেন দারুণ ভুল করে ফেলেছি আমি ঃ 'তাহলে তো বিলকুল বাজে কথাই শুনেছি আমি। অনেক টাই এনেছেন তাহলে?'

'বড় একটা বাক্স দেখলাম। দশ-বিশটা তো হবেই।'

'তুমি জানলে কী করে?'

'ওঁকে যে আমিই পোশাক পরিয়ে দিয়েছিলাম।'

পাছে মুখের ভাব ধরা পড়ে যায়, তাই ঘুরে দাঁড়ালাম আমি। দারুণ খবর! সোমনাথ মুখার্জির কৈফিয়ত তাহলে সত্যিই কপোলকল্পিত। ইন্দ্রনাথের শাগরেদি করা সার্থক হয়েছে এতদিনে। রিপোর্টার না হয়ে গোয়েন্দা হলেই দেখছি উন্নতি ছিল অনেক।

শার্টের মালিকানা নিয়ে আর মাথা ঘামালাম না।

আনমনা হয়ে পোর্টহোলের মধ্যে দিয়ে বাইবেব নীল আকাশ দেখতে-দেখতে শুধোলাম, 'পোর্ট ভিক্টোরিয়া কখন পৌঁছচ্ছি বাহাদুর?'

'পৌঁছচ্ছি না,' জবাব এল তৎক্ষণাৎ।

'কী বলছ?' চমকে উঠি আমি।

'বড়া সাবকা বহুত গোসসা হো গ্যায়া সাব। সকাল থেকেই বড় ঝামেলা চলছে সবার ওপর।' ওপর থেকে ঘণ্টাধ্বনি ভেসে এল।

'আভি যা রহা সাব।' বলেই সাঁৎ করে অদৃশ্য হয়ে গেল ও বাইরে।

আবার টোকা দিলাম বাথরুমের দরজায়—কোনও সাড়াশব্দ নেই। ধাক্কা দিলাম, নব ধরে বেশ কিছুক্ষণ ঝাঁকানি দিলাম, কিন্তু কোনওরকম প্রত্যুত্তরই পেলাম না ওদিক থেকে। দারুণ রাগ হয়ে গেল। এক ঝটকায় দরজা খুলে বেরিয়ে পাশের দরজায় বেশ সানন্দেই নক করলাম কয়েকবার।

খট করে খুলে গেল দরজা, ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এল তরফদারের হাসি-হাসি প্রসন্ন মুখ।

'গুড মর্নিং মিস্টার রায়,' মধুক্ষরা স্বরে বললেন উনি ঃ 'বলুন, কী করতে পারি আপনাব জন্যে?'

বেশ সংযত স্বরে শুরু করি আমি, 'বাথরুমটায় আপনার-আমার ফিফটি-ফিফটি শেয়ার আছে, কী বলেন?'

'নিশ্চয়-নিশ্চয়,' হাসি মুখে ঘাড় নাড়তে থাকেন ভদ্রলোক ঃ 'এ-কথা আর বলতে—যখন খুশি, যেভাবে খুশি আসতে পারেন আপনি।'

এবার আমার সংযম ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়—অতি কষ্টে সামলে নিই নিজেকে।

দাঁতে দাঁত দিয়ে বলি কোনওমতে, 'দয়া করে চাবিটা তাহলে খুলবেন কি?'

'ও-হো। বড় দুঃখিত, সত্যই বড় দুঃখিত। একেবারেই মনে ছিল না আমার। এক মিনিট।'

বলেই আমার মুখের ওপরেই দড়াম করে বন্ধ করে দিলেন দরজা।

চটপট ফিরে এলাম কেবিনে। বাথরুমের দরজায় ক্লিক শব্দ হওয়ামাত্র একলাফে হাজির হলাম ভেতরে।

বললাম, 'আপনার সঙ্গে আজ আমার কিছু কথা আছে।'

'বটে?' ভুরু তোলেন তরফদার : 'তা কথা তো হবেই। এত কাছাকাছি যখন রয়েছি, তখন ইচ্ছে না থাকলেও উপায় কোথায় বলুন।'

'আমিও তাই বলি। যাই হোক, আমাদের পেপারের তরফ থেকে আপনার সঙ্গে কিছু আলোচনা করার আছে আমার।'

'ওয়ান্ডারফুল! আপনি তাহলে প্রেস থেকে এসেছেন?'

'একটা দৈনিক পত্রিকায় কাজ করি।'

'তাই নাকি! সিলোনে কিন্তু এরকম হয় না।'

'কীরকম হয় না?'

'অভ্যাগত হিসেবে প্রেসম্যানদের আমন্ত্রণ জানানো। আশ্চর্য! অদ্ভুত!'

'জিহ্বা সংবরণ করে বিস্ময় প্রকাশ করার সুযোগ আমার কাজ না শেষ-হওয়া পর্যন্ত দেব আপনাকে। আর, আপাতত নিরালা বাথরুমে একলা স্নান করার ইচ্ছে প্রেসম্যানদেরও থাকে।'

'ওহো, আমি যাচ্ছি।' একটু তপ্ত স্বরেই বলেন তরফদার।

'চমৎকার।' বলে ওঁর পেছনেই কড়াং করে টেনে দিলাম লকটা।

ডাইনিং সেলুনে গিয়ে দেখি একসঙ্গে প্রাতরাশ খেতে বসেছেন মিসেস প্যাটেল আর দেশমুখ। দেখে মনে হল, বেশ গভীর একটা আলোচনা চলছে দুজনের মধ্যে। আমার সদ্য-নিদ্রোত্থিত আর দাড়ি-গোঁফ কামানো পরিষ্কার চকচকে মুখ দেখে ওঁরা যে খুব খুশি হয়েছেন, তা মনে হল না।

বললাম, 'গুড মর্নিং। আজ দেখছি প্রত্যেকের দেরি হয়েছে।'

'বেজায়।' সায় দেন মিসেস প্যাটেল।

সায় দিয়ে বলি, 'অর্ধেক রাত পর্যন্ত জেগে থাকলে দেরি হওয়া স্বাভাবিক। রাত করে ঘুমোনো মানেই বেলা করে ব্রেকফাস্ট খাওয়া, কী বলেন মিস্টার দেশমুখ?'

মিসেস প্যাটেল শুধোন, 'মিস্টার দেশমুখ রাত জেগেছিলেন নাকি?'

'রাত প্রায় দেড়টার সময়ে ওঁর সঙ্গে আমার ঠোকাঠুকি লেগে যায় ডেকের ওপর।' নিরীহ স্বরে হাসি-হাসি মুখে বলি আমি।

'আপনার তাতে খুশি হওয়াই উচিত মশায়।' অপ্রসন্নভাবে বলেন দেশমুখ। তারপর উদ্দেশ করেন মিসেস প্যাটেলকে : 'মাঝরাতে কে যেন ঘরে ঢুকেছে এইরকম একটা দুঃস্বপ্ন দেখে ডেকের ওপর ছুটোছুটি শুরু করে দিয়েছিলেন ভদ্রলোক। বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ঘরে পাঠাতে কম বেগ পেতে হয়নি আমার।'

ফিক করে অষ্টাদশীর হাসি হাসলেন মিসেস প্যাটেল। তারপর বড়-বড় চোখ করে বললেন, 'তাহলে খুব মজার-মজার স্বপ্ন দেখেন বলুন! ভারি আশ্চর্য তো! আমায় কিন্তু সবকিছুই বলতে হবে। ভালো কথা, আজ আমার একটু মার্কেটে যাওয়ার দরকার ছিল, ভাবছি কার সঙ্গে যাব।'

'আর ভাববেন না।' বলি আমি।

'বাঁচালেন আপনি—অনেক ধন্যবাদ।' হাসেন মিসেস প্যাটেল।

'আ—আমি বলতে চাই যে,' তাড়াতাড়ি বলি আমি, 'মোটেই পোর্ট ভিক্টোরিয়া যাচ্ছি না আমরা।'

'তার মানে?' প্রায় চেঁচিয়ে ওঠেন দেশমুখ : 'তবে চলেছি কোথায়?'

বললাম, 'আমাকে জিগ্যেস করে কোনও লাভ নেই, মিস্টার দেশমুখ। এইটুকুই শুধু বলতে পারি যে, পোর্ট ভিক্টোরিয়ার অনেক আগেই পৌঁছে যাওয়া উচিত ছিল আমাদের।'

'কিন্তু এসবের অর্থ কী?' উত্তেজিত হয়ে ওঠেন দেশমুখ।

অলোক ঘোষ ঢুকলেন সেলুনে। দুধের মতো ধবধবে সাদা শার্টটা দেখে নিজের অজান্তেই ভাবি ভদ্রলোকের কেবিনটা কোন দিকে। দেশমুখ কিন্তু তৎক্ষণাৎ খবরটা জানিয়ে দিলেন ওঁকে।

'সত্যি কথাই শুনেছেন।' বলেন অলোক ঘোষ, 'পোর্ট ভিক্টোরিয়া কেন, কোনও পোর্টের দিকেই যাচ্ছি না আমরা। কাল রাত থেকেই জলের ওপর চরকির মতো পাক দিচ্ছে জলপরী।'

'চরকির মতো পাক দিচ্ছে জলপরী!' পুনরাবৃত্তি করেন দেশমুখ।

'হ্যাঁ। স্রেফ হাওয়া খাচ্ছি আর কী। আরও কতদিন যে খাব, তা জানি না!'

'বুঝলাম না।' হতবুদ্ধি হয়ে যান রাজনীতিবিদ ভদ্রলোক।

মৃদু হাসলেন অলোক ঘোষ।

'সোমেশ রায়কে আমরা ভালো করেই চিনি। অত্যন্ত মূল্যবান একটা জিনিস খোয়া গেছে তাঁর। কাজেই, এ-জাহাজের প্রতিটি কর্মচারী, এমনকী অভ্যাগতদেরও ভ্যাকুম ক্লিনার দিয়ে সার্চ না করা পর্যন্ত পোর্টে নামতে দেওয়ার মতো আহাম্মক তিনি নন।' দেশমুখের দিকে শক্ত চোখে তাকিয়ে বলে চলেন অলোক ঘোষ : 'প্রত্যেককেই বলছি, টাকাটা সত্যিই যদি কেউ নিয়ে থাকেন, ফিরিয়ে দিন। না হলে, এ বছরে আর বোম্বাই ফিরতে হবে না কাউকে।'

উঠে দাঁড়ালেন দেশমুখ।

'এ কী অত্যাচার! সোমেশ রায়ের মনের অবস্থা আমিও বুঝছি। কিন্তু যারা চোর নয়, তাদের এ জাতীয় নিগ্রহ শুধু অন্যায় নয়, বেআইনিও।' বলে তিনিও শক্ত চোখে তাকালেন অলোক ঘোষের দিকে : 'সোমবার সকালের মধ্যেই আমাকে বোম্বাই ফিরতে হবে—মিঃ রায়কে জানিয়ে দেবেন তা।' বলে লম্বা-লম্বা পা ফেলে বেরিয়ে গেলেন সেলুন থেকে।

মিসেস প্যাটেল বললেন, 'আশ্চর্য! আশ্চর্য!' তারপর তিনিও অনুসরণ করলেন দেশমুখকে।

অলোক ঘোষ তাকালেন আমার দিকে—আমি তাকালাম তাঁর দিকে। তারপর একটু সাহস সঞ্চয় করে বলে ফেলি আমি, 'আমার মনে হয় একজন প্রথম শ্রেণির গোয়েন্দা আনা উচিত এখন।'

ভাবলেশহীন স্বরে বললেন অলোক ঘোষ, 'নিশ্চয় নয়। নিজের সমস্যা নিজেই সমাধান করার মতো যোগ্যতা মিঃ রায়ের আছে।'

তারপর সব চুপচাপ।

প্রাতরাশ শেষ হলে পর বেরোলাম কবিতার সন্ধানে। খোলা ডেকে চোখধাঁধানো রোদে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম ওকে।

'আশ্চর্য!' দেখামাত্র উচ্ছ্বাস জাগে আমার।

'তার মানে?' সন্দিগ্ধ চোখে তাকায় ও।

'যখন দূরে থাকি, ভাবি না-জানি কত সুন্দরী তুমি। কিন্তু যখনই কাছে পাই, দেখি যা ভেবেছিলাম তার চাইতেও অনেক বেশি তোমার সৌন্দর্য। তাই বলছিলাম—।'

'থাক, আর বলতে হবে না। কোথায় ছিলে এতক্ষণ?'

'উদরদেবকে শান্ত করছিলাম! তোমার বুঝি হয়নি এখনও?'

'অনেক আগেই।'

'শাবাশ।'

'শার্লক হোমস ছিলেন কর্মবীর, তোমার মতো বাক্যবীর ছিলেন না। একসঙ্গে গোয়েন্দাগিরির

চুক্তি তো হল কাল—এদিকে সব খবর না শুনতে পেয়ে যে দম আটকে মরতে চলেছি। সে-খেয়ালটা নেই?'

'কুছ পরোয়া নেহি। আমি তোমায় বাঁচাব।'

সোমনাথ মুখার্জির সঙ্গে সাক্ষাৎকারের কাহিনিটা বললাম ওকে। টাই প্রসঙ্গও বাদ গেল না। বলবাহাদুরের দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটাও সরস করে শুনিয়ে দিলাম। শুনে কপাল কুঁচকে ওঠে ওর।

অবিশ্বাসের সুরে বলে, 'তুমি বলছ কী, মৃগ? সোমনাথকাকা বাবার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু।'

'বেশি ঘনিষ্ঠতাই তো বিপজ্জনক। ভালো কথা, তোমার বাবার খবর কী?'

'সারারাত ঘুমোতে পারেননি উনি। শুনে অবাক হলাম না মোটেই। সাঁইত্রিশ বছর পর এই প্রথম লাকি পিস না নিয়ে রাত্রিযাপন—আশ্চর্য কী। এ ব্যাপারে তুমি যে স্বেচ্ছায় তদন্ত শুরু করেছ তা বলেছি ওঁকে। তোমার বন্ধু গোয়েন্দা শিরোমণি ইন্দ্রনাথের শাগরেদি করে তুমিও যে একটা ছোটখাটো গোয়েন্দা হয়ে উঠেছ, তাও বলেছি। এমন সুন্দর করে বললাম যে, আগাগোড়া বেশ মন দিয়ে শুনলেন বাবা।'

'এই তো চাই। আশীর্বাদ করছি প্রিয়ে, আমার সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলেই চিরকাল এমনি করেই যেন স্বয়ং সরস্বতী অধিষ্ঠিতা হন তব জিহ্বাগ্রে।'

'বড় যে পুলক দেখছি আজ, ব্যাপার কী?'

ব্যাপার কী, তা বলার আগেই স্বয়ং সোমেশ রায় এসে হাজির হলেন আমাদের মাঝে।

উসকোখুসকো চুল, চোখের কোণে রাত জাগার ক্লান্তি-চিহ্ন। বুঝলাম, সত্যিই বড় মানসিক অশান্তিতে রয়েছেন উনি।

'এই যে মিস্টার রায়, কবিতার কাছে শুনলাম আপনি নাকি এই বিশ্রী ব্যাপারে আমায় সাহায্য করতে উঠে-পড়ে লেগেছেন?'

'লেগেছি ঠিকই। কিন্তু আমার ক্ষমতা এমন কিছু বেশি নয় যে—।'

'রাবিশ! অন্তত আমার চেয়ে এসব ব্যাপারে আপনার অভিজ্ঞতা অনেক বেশি, আর সেই কারণেই আপনার সাহায্য আমার এখন খুবই দরকার। তা ছাড়া'—আশপাশে দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বলেন আবার : 'তা ছাড়া অভ্যাগতদের সবাইকেও তো এসব কথা বলা চলে না। কিন্তু আপনি—ইয়ে তুমি আমার ছেলের মতো। আমার পুরো আস্থা রইল তোমার ওপর।'

শেষের শব্দ ক'টি শুনেই বুঝলাম কবিতার কথাই ঠিক। সোমেশ রায়ের সৌজন্যবোধের অন্তরালে যে কী পরিমাণ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি প্রচ্ছন্ন আছে, তা আগে থেকে জানা না থাকলে প্রথম আলাপে বুঝে ওঠার সাধ্য কারওরই নেই।

বললাম, 'আপনার কথা শুনে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছি, স্যার। কিন্তু একটা প্রশ্ন। টাকাটা উদ্ধার করার জন্যে আপনি নিজে কি কিছু করেছেন?'

'জলপরীর প্রত্যেক কর্মচারীকে জেরা করেছি নিজে। খানসামারাও বাদ যায়নি। প্রত্যেকের দেহ তল্লাশ হয়েছে—ঘরগুলোও বাদ যায়নি। কিন্তু ওদের কাউকেই সন্দেহ হয় না আমার। দিনের বেলায় এক ফাঁকে অভ্যাগতদের মালপত্রগুলোও পরীক্ষা করা হবে। যদিও আতিথেয়তায় কোনও ত্রুটি হতে দেওয়া পছন্দ করি না আমি, তবুও এ ব্যাপারের গুরুত্ব ওসব সেন্টিমেন্টের চেয়ে অনেক বেশি—কাজেই কাউকেই বাদ দেব না আমি। ক্যাপ্টেনকে আদেশ দিয়েছি, কোনও পোর্টের ধারে-কাছেও যাবে না জলপরী। খাবারদাবার, কয়লা যা আছে তাতে পাঁচদিন পর্যন্ত দিব্যি চলে যাবে। দরকার হলে ততদিন পর্যন্ত এইভাবেই ভেসে বেড়াব আমি।'

'চমৎকার ব্যবস্থা।' বলি আমি।

'এ ছাড়া, বোর্ডে এইমাত্র একটা নোটিশ দিয়ে এলাম—লাকি পিস যে ফেরত দেবে, তাকে নগদ চার হাজার টাকা পুরস্কার তো দেবই, উপরন্তু সবরকম জিজ্ঞাসাবাদের হাত থেকেও রেহাই

দেওয়া হবে। ওপরে মোটা-মোটা করে "জরুরি" লিখে দিয়েছি। চোর যদি তুমি ধরো, তাহলে টাকাটা তোমারই হবে।'

'কিন্তু স্যার, টাকা তো আমি নেব না।' টাকা শব্দটার ওপর যতটা জোর দেব ভেবেছিলাম, ততটা না হওয়ায় একটু ক্ষুণ্ণ হই আমি।

'রাবিশ। কেন নয় শুনি? ও সামান্য টাকায় আমার কোনও ক্ষতিই হবে না। চার হাজার টাকার বিনিময়ে মনের যে-শান্তি আমি ফিরে পাব, তার তুলনায় ও-টাকা কিছুই নয়। আর যতক্ষণ তা না পাচ্ছি—আমার মতো অসুখী আর দুনিয়ায় নেই।'

চট করে কবিতা বলে উঠল, 'বাবাকে সব বলোই না।'

'কী বলবে?' চকিত হয়ে ওঠেন সোমেশ রায়।

'ও যা জেনেছে, তা শুনলে অবাক হয়ে যাবে বাবা। বিশ্বাস করা যায় না—।'

'কী মুশকিল। এখনও পর্যন্ত তা জানাওনি আমায়? বলো, বলো, কোথায় আমার টাকা?' উত্তেজিত হয়ে ওঠেন বৃদ্ধ সোমেশ রায়।

বললাম, 'সবই বলব। কিন্তু তার আগে আমায় শুধু এক মিনিট সময় দিন। আমি—।'

'শুধু এক মিনিট? ঠিক আছে—দিলাম। কিন্তু শুধু এক মিনিট—মনে থাকে যেন? এ উদ্বেগের মধ্যে বেশিক্ষণ আর রেখো না আমায়।'

'না স্যার, এখুনি আসছি।' বলে তাড়াতাড়ি পা চালাই আমি।

সোমনাথ মুখার্জির কেবিনে গিয়ে বলবাহাদুরকে জিগ্যেস করে জানলাম, অত্যন্ত দেরিতে শয্যা ত্যাগ করেই তিনি প্রাতরাশ খেতে গেছেন ডাইনিং সেলুনে।

সন্ধানী চোখে চারদিক দেখে নিই আমি। তারপর শুধোই, 'টাইগুলো গেল কোথায় বাহাদুর?'

'সুটকেসে চাবি দিয়ে রেখেছেন। চাবি সাবের পকেটে।'

মনে-মনে একটু হেসে নিয়ে গেলাম ডাইনিং সেলুনে, একটা টেবিল দখল করে, ধূমায়িত কফির দিকে তাকিয়ে চুরুট টানছিলেন তিনি।

'গুড মর্নিং, স্যার।' বললাম আমি।

'গুড মর্নিং। বড় দেরি করে ব্রেকফাস্ট খান দেখছি।' এমন সুরে বললেন যেন এরকম গর্হিত অভ্যাস আর দুনিয়ায় নেই।

বললাম, 'ব্রেকফাস্ট অনেক আগেই সেরে নিয়েছি, স্যার। এখন এলাম আপনার সঙ্গে কিছু কথা বলতে—অবশ্য যদি কিছু মনে না করেন।'

'আর, যদি মনে করি?'

'তাহলেও আমায় বলতে হবে।' দৃঢ়স্বরে বলি আমি।

চুরুটটা নামিয়ে কঠিন চোখে আমার দিকে তাকালেন সোমনাথ মুখার্জি।

'আমার কর্মচারীদের মধ্যে সবচেয়ে বাচাল আর সবচেয়ে অসহ্য হলেন আপনি।'

'কী করব বলুন। যা ন্যায়, তাই শুধু করতে চাই আমি।'

'যারা ভাবে, শুধু ন্যায় করবার জন্যেই তাদের জন্ম—তাদের মতো নিরেট মূর্খ দুনিয়ায় আর নেই। কী মতলব এবার শুনি।'

'গতরাতে আপনাকে কথা দিয়েছিলাম, যা জেনেছি, তা সোমেশ রায়কে বলব না। কিন্তু আমার এ-শপথ রক্ষা করা আর সম্ভব হবে না স্যার।'

'বটে। কেন হবে না শুনি?'

'টাই সম্বন্ধে আপনার গল্পটার জন্যে। গল্পটা যে সত্যি নয়, তা আমি জেনেছি।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ, স্যার। আপনি বললেন, সোমেশ রায়ের ঘরে টাই আনতে গেছলেন আপনি। আমার

মতে ওটা একটা আক্ষরিক ভুল। কেন না আপনি সেখানে টাই নয়, টাকা আনতেই গেছলেন।'

ন্যাপকিনটা আছড়ে ফেলে উঠে দাঁড়ালেন সোমনাথ মুখার্জি।

বললেন, 'আমার সঙ্গে বাইরে আসবেন কি?'

'নিশ্চয়, স্যার।' ওঁর পেছন-পেছন বেরিয়ে এলাম ডেকে ঃ 'সত্যিই বড় দুঃখিত, স্যার। কিন্তু কী করব—।'

'আমিও—আপনার জন্যে। সোমেশ রায় কোন দিকে আছে, জানেন?'

'নীচের ডেকে।'

সেইদিকেই ফিরলেন সোমনাথ মুখার্জি ঃ 'ভালো কথা, ডক্টর তরফদারের ব্যাপার নিয়ে আপনার আর মাথা ঘামানোর দরকার নেই। আমার কাগজের সঙ্গে আপনার আর কোনও সম্পর্ক রইল না।'

'ধন্যবাদ স্যার।' মৃদু হেসে বললাম।

বললাম বটে, কিন্তু ভেতরে-ভেতরে দমে গেলাম খুবই। প্রেমের শুরু আর চাকরির সারা—অপূর্ব যোগাযোগ।

নীচের ডেকে অধীর আগ্রহে কবিতার সামনে পায়চারি করছিলেন সোমেশ রায়। আমাদের দেখেই উৎকণ্ঠিত চোখে তাকালেন আমাব পানে। তারপব যেন কিছুই হয়নি, এমনি ভাব দেখিয়ে পরিত্যক্ত চেয়ারটায় বসে পড়ে পা নাড়াতে লাগলেন ঘন-ঘন।

কিন্তু সোমনাথ মুখার্জিই প্রথমে কথা বললেন, 'সোমেশ, তোমায় কিছু বলতে চাই আমি।'

'বেশ তো, বলে ফ্যালো।'

'এই অর্বাচীন ছোকরাটার ধারণা, তোমার টাকাটা আমিই সরিয়েছি।'

'রাবিশ!' মুখ দেখে মনে হল আমার সম্বন্ধে ধারণাটা তাঁর ফিকে হয়ে আসছে দ্রুত ঃ 'রাবিশ! তুমি যে নেবে না তা আমি জানি।'

'কিন্তু—ইয়ে,' মুখ লাল হয়ে ওঠে সোমনাথ মুখার্জির ঃ 'আমি—আমি,' একটা ঢোঁক গিলে তাড়াতাড়ি বলে ফেলেন, 'সত্যি কথা বলতে কী সোমেশ, টাকাটা আমিই নিয়েছি।'

তড়াক করে লাফিয়ে উঠলেন সোমেশ রায়।

'কী বললে? আবার বলো!'

'আরে শোনো-শোনো, উত্তেজিত হয়ো না। এ একটা নিছক পরিহাস ছাড়া আর কিছু নয়।'

'পরিহাস! এই বয়েসে পরিহাস! ভীমরতি ধরেছে তোমার? যাক, কোথায় আমার টাকা?'

'আমার কথাটা শোনো আগে। টাকাটার সঙ্গে তোমার মনের কী সম্পর্ক, তা জানার জন্যেই সরিয়েছিলাম ওটা। প্রায়ই শুনি এ-টাকা হারালে নাকি একেবারেই ভেঙে পড়বে তুমি। কিন্তু আমাব তা বিশ্বাস হয় না। কিন্তু তোমার মতো একজন শক্ত পুরুষের মনের ওপর সামান্য একটা টাকার অর্থহীন কুসংস্কারের যে কোনও প্রভাবই থাকতে পারে না তা প্রমাণ করবার জন্যেই গতকাল সন্ধ্যায় তোমার ঘরে চুপিসাড়ে ঢুকে টাকাটা পালটে রেখেছিলাম আমিই।'

'ক্রিমিন্যাল—হাড়ে-হাড়ে তুমি একটা পাকা ক্রিমিন্যাল। প্রথম থেকেই আমি তা জানি। কিন্তু—।'

'তুমি যে এ ব্যাপারে এত গুরুত্ব দেবে, তা তো কল্পনাও করতে পারিনি আমি। এই সম্পর্কেই কয়েকটি কথা বলতে চাই তোমায়। সোমেশ, টাকাটা যে তোমার কী ক্ষতি করেছে, তা বোঝো না কেন? কোনও পুরুষের উচিত নয় এরকম বাজে একটা কুসংস্কারের ওপর জীবনের সাফল্যের ভিত গাঁথা। তোমার তো নয়ই। এই তুচ্ছ কারণে কেন এত অশান্তি ভোগ করছ বলো তো? এই শিক্ষাই দিতে চেয়েছিলাম তোমায়—।'

'তোমার নীতিকথা সংক্ষিপ্ত করে টাকাটা বার করবে কি?'

'ঘরে আছে, এনে দিচ্ছি। যাক, কোনওরকম মন-কষাকষি রইল না তো, সোমেশ?'

'থাকবে—যদি না মুখটা বন্ধ করে টাকাটা বার করো তাড়াতাড়ি।'

কেবিনের দিকে গেলেন সোমনাথ মুখার্জি। আর ডেকের এদিক থেকে ওদিকে পায়চারি করতে লাগলেন সোমেশ রায়। ভেতরে-ভেতরে তিনি যে কতখানি উত্তেজিত হয়েছিলেন, তা তাঁর অস্থিরতা থেকেই প্রকাশ পাচ্ছিল। আত্মদমন ওঁর চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য—কিন্তু সেই মুহূর্তে তার চিহ্নও দেখলাম না ওঁর মধ্যে।

'বুড়ো খোকা কোথাকার!' আপনমনেই গজরাতে থাকেন উনি ঃ 'হল কী ওব? কচি খোকাব মতো এ কী বাবহার পবিহাস। শুনলে তো তুমি, বলে কিনা নিছক পরিহাস!'

সান্ত্বনার ছলে বলে কবিতা, 'কেন উত্তেজিত হচ্ছ বাবা। টাকা তো তুমি পেয়েই যাচ্ছ। মনে রেখো কিন্তু এ জন্যে সমস্ত বাহবাটুকুই মৃগাঙ্কব পাওনা।'

'ভারি চালাক ছেলে। এখুনি চেক লিখে দিচ্ছি আমি।'

'এখন থাকুক স্যার,' প্রতিবাদ জানাই আমি ঃ 'এরকম পরিস্থিতিতে ওসব ঝামেলা করবেন না। পরে হবে'খন।'

'রাবিশ! পাকা চোরের মতো—ছি-ছি, কী বিশ্রী ব্যাপার! ছুঁচো কোথাকার। এইজন্যেই কোনওদিনই ওকে আমি বিশ্বাস করে উঠতে পারিনি।'

'বাবা! কী বলছ তুমি! উনি তোমার সবচেয়ে বড় বন্ধু।' আহত স্বরে বলে কবিতা।

ঠিক সেই মুহূর্তেই ফিরে এলেন সোমনাথ মুখার্জি। আর সেই প্রথম দেখলাম তাঁর সুবিখ্যাত ড্রাগন-মুখে উত্তেজনার রক্তিম উচ্ছ্বাস।

'সোমেশ, আমি সত্যিই একটা গর্দভ।'

'হাবভাব তো সেইরকমই। টাকা কোথায়?'

নীরবে ডান হাতটা এগিয়ে দিলেন সোমনাথ মুখার্জি। অধীর আগ্রহে সোমেশ রায়ও হাত বাড়ালেন। আর তাঁর প্রসারিত হাতের তালুতে টুপ করে তিনি ফেলে দিলেন নীল রঙের অশোক স্তম্ভের ছাপওলা একটা কাগজখণ্ড—দাবিমতো ভারত সরকারের এক টাকা দেওয়ার অঙ্গীকারপত্র।

'শয়তান!' সিংহের মতো গর্জে উঠলেন সোমেশ রায়।

ক্ষীণ স্বরে জবাব দিলেন সোমনাথ মুখার্জি, 'টাকাটা যেখানে রেখেছিলাম, সেখানে হাত দিয়ে পেলাম এটা।'

আর একটিও কথা বললেন না সোমেশ বায়। নোটটা দলা পাকিয়ে নিক্ষেপ করলেন ডেকের ওপর। মুখ তাঁর এমনই টকটকে লাল হয়ে উঠেছিল যে, মনে-মনে বেশ শঙ্কিত হয়ে উঠি আমি।

আবার বলেন সোমনাথ মুখার্জি, 'কী বলব ভেবে পাচ্ছি না সোমেশ। লাখ টাকার বিনিময়েও এ ব্যাপার আমি ঘটতে দিতাম না। কিন্তু—।'

'ক্ষমা! অনুতাপ!' গরগর করে ওঠেন সোমেশ রায় ঃ 'ওসব কে শুনতে চায়? আমি চাই আমার টাকা—ব্যস, আর কিছু না।'

'নিছক রসিকতা করতে গিয়ে—।'

কথাটা আর শেষ হয় না—বোমার মতোই ফেটে পড়েন সোমেশ রায ঃ 'রসিকতা! পরিহাস! বাঃ, চমৎকার! চমৎকার! এই কথাই ভাবছে আরও একজন—চোরের ওপব যে বাটপাড়ি করেছে। যেখান থেকে শুরু করেছিলাম—ঘুরে-ফিরে সেইখানেই এসে দাঁড়ালাম আবার।'

'একটু শুধু তফাত রইল,' বললেন সোমনাথ মুখার্জি ঃ 'তোমার পাশে এবার আমিও দাঁড়ালাম। তুমি আমি দুজনেই খুঁজে বার করব এ-চোরকে। তাই আমি আরও দু-হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করছি চোরকে যে ধরবে তার জন্যে।'

'তাতে কাজ হবে না কিছুই।' বললেন সোমেশ রায় ঃ 'চার হাজারে যদি কোনও সুরাহা

না হয়, তাহলে ছ'হাজারেও হবে না। কিন্তু কোনও উপায় তো আর দেখছি না আমি।' বলেই ঘুরে দাঁড়ালেন আমার দিকে ঃ 'তোমার কী মনে হয়? আর কোনও সূত্র-টুত্র আছে?'

করুণ স্বর শুনে মনে-মনে বেশ খুশি হই আমি।

বললাম, 'হ্যাঁ, এখনও একটা আছে।'

'আছে?' নিমেষে উজ্জ্বল হয়ে ওঠেন তিনি।

'হ্যাঁ, আছে। খুব সামান্য যদিও, তবুও ওই নিয়েই কাজ করতে চাই। ভালো কথা, প্রয়োজনমতো সব কিছু করার অনুমতি চাইছি, স্যার। যেমন ধরুন না কেন, অভ্যাগতদের ঘর তল্লাশি, অবশ্য তাঁদের অজান্তেই।'

'যা খুশি করবে, কোনও আপত্তি নেই আমার।' বলে সোমনাথ মুখার্জির দিকে ফিরলেন তিনি ঃ 'ছেলেটি আমায় সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে সোম।'

'ও এক আশ্চর্য ছেলে হে।' জবাব আসে তৎক্ষণাৎ।

'সত্যিই তাই। ঠিক পাঁচ মিনিটের মধ্যে ও পাকড়াও করে এনেছে তোমায়। তাই, দু-নম্বর চোরটাকেও ধরার সুযোগ ওকেই দিচ্ছি আমি।'

'বাবা!' ঈষৎ ভর্ৎসনা মেশানো সুরে বলে কবিতা।

ডেকের ওপর থেকে দলা পাকানো নোটটা তুলে নিলাম আমি।

বললাম, 'নোটটা আমার কাছেই রইল, স্যার। আর একটা কথা, মিস্টার মুখার্জি, টাকাটা যে আপনার কাছেই ছিল, তা কি আর কেউ জানে?'

'তা—হ্যাঁ, জানে বইকি। পাছে আমার মোটিভের অন্য অর্থ দাঁড়ায়, তাই শুরুতেই আমি অলোক ঘোষকে সব বলে রেখেছিলাম।'

'কখন বলেছিলেন?'

'গতকাল সন্ধ্যায়—টাকাটা নেওয়ার একটু আগেই। লাকি পিস যে আমার কেবিনেই আছে, তাও ওকে পরে বলেছিলাম।'

চোখের সামনে গত রাতের একটা দৃশ্য ভেসে উঠল—ব্রিজের আসর বসেছে দুটো টেবিলে। সবাই আছেন সেখানে, নেই কেবল অলোক ঘোষ।

সোমেশ রায় বললেন, 'আর-একটা কথা, রায়। জানি না তোমার কাজে লাগবে কি না খবরটা। সকালে শুনলাম গত বুধবার চুনীলাল দয়াভাইয়ের সঙ্গে একসঙ্গে লাঞ্চ খেয়েছিলেন মিসেস প্যাটেল। দয়াভাই যে আমার পুরোনো শত্রু, তা তো জানোই। আর আমার লাকি পিসটা পাওয়ার জন্যে ওরা যে কিছুই করতে কুণ্ঠিত নয়—তাও জানি।'

'কার কাছে শুনলেন এ-খবর?'

'অলোক ঘোষের কাছে।'

মৃদু হেসে বলি, 'পয়েন্টটা খুবই দরকারি। যাই হোক স্যার, কথা দিচ্ছি, আমার যথাসাধ্য করব আমি।'

'তা যে করবে, তা বিশ্বাস করি। ভুলো না—ছ'হাজার টাকা তোমার পকেটে যাওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে।'

মনে-মনে বলি, তার চাইতেও অনেক বেশি। মুখে বলি, 'ঠিক আছে, স্যার।' বলে, কবিতার পানে একটু হেসে এগিয়ে গেলাম ওপাশে। পেছন থেকে ডাক দিলেন সোমনাথ মুখার্জি।

'ভালো কথা, রায়। সময় পেলে ডাক্তার তরফদারের প্রবন্ধটা না হয় লিখেই ফেলো। কেদার শর্মা আশা করে রয়েছে তো।'

অল্প হেসে বললাম, 'ধন্যবাদ, স্যার।' কবিতা এসে পড়ায় দুজনে মিলে এগিয়ে গেলাম রেলিংয়ের ধারে।

প্রথমেই শুধোল ও ঃ 'ও-কথার মানে কী, মৃগ?'

'চাকরিটা আবার ফেরত দিলেন। কিছুক্ষণ আগেই পথে বসিয়ে দিয়েছিলেন আমায়—এখন দেখছি আবার ভালোবাসতে শুরু করেছেন। অহো, বিচিত্র এই সংসার! যাক, কতদূর এগোলে তুমি?'

'এক পা-ও নয়।'

'জানতাম আমি। আগে বোসো, তারপর বলো কী বলবে।'

'আমি আবার কী বলব?' দুটো ডেক-চেয়ারের একটা দখল করে বলে কবিতা।

'দুজন যুবক-যুবতী একত্র হলে যা বলে, তাই। তুমি বলবে, যৌবন-প্রভাতে এলে তুমি শশাঙ্ক সমান, কী তব প্রার্থনা। আর আমি বলব, ফুলের কঙ্কন গড়ি সাজাইব তোমায়, অশোকের কিশলয়ে গাঁথি দিব হার, মঞ্জুমালিকাখানি জড়াইব ভালে কবরী ঘেরিয়া, অশোকের রক্তকান্তে চিত্রি পদতল, কহিব—আমি তব মালঞ্চের হব মালাকার।'

'বড় যে উচ্ছ্বাস দেখছি! কী একটা নতুন সূত্রের কথা বলছিলে, তার কী হল?'

'চুলোয় যাক সূত্র। এখন কথা হচ্ছে প্রেমের—।'

'প্রেম ছুটে যাবে তোমার, বাবার সামনে এ-কথা বললে। বলো, কী সেই সূত্র?'

'কী আবার, একটা শার্ট।'

'শার্ট!'

'টাই প্রসঙ্গ শেষ হয়েছে, এবার শুরু হোক শার্ট-বৃত্তান্ত।' বলে, সব কথা খুলে বললাম ওকে। হনলুলু স্যামের লন্ড্রিতে আমার অভিযান, জলপরীতে এসে প্যাকেট খোলার পর আমার মানসিক অবস্থা, বলবাহাদুরের সাহায্য, রাত্রে চুরি, পরদিন সকালে বাহাদুরের একগুঁয়েমি—সবই পরপর বলে গেলাম।

শেষ হলে পর কবিতা শুধোল, 'শার্টটা কার বলে মনে হয় তোমার?'

'অলোক ঘোষের। ভদ্রলোকের সঙ্গে একটা ছোটখাটো ওয়ার্ড্রোব এসেছে বলেই তো মনে হল আমার।'

'মৃগ, অলোক ঘোষ কিন্তু—।'

'সত্যি-মিথ্যে জানি না, যা মনে হল তা বললাম। আপাতত আমার প্রথম কাজই হল বলবাহাদুরকে চাপ দিয়ে আসল খবরটা পেট থেকে টেনে বার করা।'

'নেপালিগুলো বড় একগুঁয়ে হয় কিন্তু।' বলে ও।

'খাঁটি কথাই বলেছ। কিন্তু দেখা যাক কার ধৈর্য এবার বেশি।'

'তোমার।'

'তোমাকে ভালোবাসাই তো তার একটা প্রমাণ।' বলেই সিধে সটকান দিই কেবিনের দিকে।

কিন্তু আমায় নিরাশ হতে হল। আমার অটল অধ্যবসায়, প্রযত্ন আর ধৈর্য সম্বন্ধে কবিতার আর আমার স্থির বিশ্বাসকে টলিয়ে দিয়ে অনড় হয়ে রইল নেপালি-নন্দন বলবাহাদুর। একটা শব্দও বার করতে পারলাম না ওর মুখ থেকে। পাক্কা পনেরো মিনিট ধরে সম্ভাব্য সবরকম পন্থা প্রয়োগ করলাম অসীম নিষ্ঠার সঙ্গে—কিন্তু সবকিছুই নির্বিকার মুখে সহ্য করে মাউন্ট এভারেস্টের মতো অটল হয়ে রইল ও। মিনতি, তোষামোদ, চাকরি যাওয়ার ভয়—সবই হল ব্যর্থ। কুতকুতে মঙ্গোলিয়ান চোখে রহস্য-ঘেরা তিব্বতের যাবতীয় রহস্য ফুটিয়ে তুলে শান্তভাবে শুধু তাকিয়ে রইল আমার পানে—শার্টের প্রকৃত অধিকারীর নাম শেষ পর্যন্ত আঁধারেই থেকে গেল। ঠিক এই সময়ে লাঞ্চের বিউগল্ বেজে উঠতেই হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

বললাম, 'এখনকার মতো ছেড়ে দিচ্ছি বটে, কিন্তু মনে রেখো, এত সহজে ছাড়ছি না তোমায়।'

'জি হাঁ সাব।' বলে এত কাণ্ডের পরেও নির্লজ্জভাবে একটু হেসে সরে পড়ল ও।

ডাইনিং সেলুনের দরজার সামনেই পায়চারি করছিল কবিতা।

'কিছু হল?' সাগ্রহে শুধোয় ও।

'বলবাহাদুরের চরণে কোটি প্রণাম আমার।' বলি আমি।

'কিছুই বলল না?'

'দারুণ একগুঁয়ে।'

'বাবার হাতে ছেড়ে দাও না?'

'না। এ-কাজ আমি একাই শেষ করতে চাই—কারণ না বললেও চলবে নিশ্চয়।'

'কিন্তু তাহলে কী করবে ঠিক করলে?'

'যা সব গোয়েন্দাই করে। ধৈর্য ধরো, ধৈর্য ধরো, প্রিয়ে—।'

'ধুত্তোর! ধৈর্যের নিকুচি করেছে—গোয়েন্দাগুলোই এইরকম।'

'বলেছ ঠিকই। অনেকদিন আগে একজন ফরাসি ডিটেকটিভের একটা প্রবন্ধ পড়েছিলাম—তখন না বুঝলেও এখন তার সারমর্ম হাড়ে-হাড়ে উপলব্ধি করছি। লেখক ভদ্রলোক আরও একটা কথা বলেছিলেন। গোয়েন্দাদের অন্যতম প্রধান হাতিয়ারই হচ্ছে লাক।'

'তোমার মোটেই তা নেই।'

'পক্ষান্তরে, কাল রাতের ঘটনা থেকেই প্রমাণিত হচ্ছে যে, দুনিয়ার সেরা লাকি মানুষ এখন আমিই।'

সোমেশ রায় উঠে এলেন নীচ থেকে।

'কী করছ এখানে?' রুক্ষস্বরে শুধোন উনি।

'তদন্ত।' বেশ গম্ভীরভাবে চট করে উত্তর দিই।

'করো, কিন্তু ফলাফল যেন ভালো হয়।' তর্জনী নেড়ে বলেন উনি।

'আশা আছে তা হবেই।' বলে সবাই মিলে ঢুকলাম সেলুনে।

গত রাতের প্রাণচঞ্চল খুশি-উচ্ছল পরিবেশের চিহ্নও পেলাম না আজকেব টেবিলে। প্রত্যেকেই নিঃশব্দে প্লেটের খাদ্য জঠরে প্রেরণ করে চললেন। এমনকী টাকা ফিরে না-পাওয়া পর্যন্ত সমুদ্রের হাওয়া খাওয়ার যে-অর্ডিন্যান্স জারি করেছেন সোমেশ রায়—তার বিরুদ্ধেও টুঁ শব্দটি করলেন না কেউ।

খাওয়া শেষ হলে পর লক্ষ করলাম, তরফদার গিয়ে ঢুকলেন স্মোকিংরুমে। পিছু-পিছু আমিও এলাম—এসে বসলাম ঠিক তাঁব বিপরীত দিকের চেয়াবটায়। তারপর কেস খুলে অফার করলাম একটা সিগারেট।

সন্দিগ্ধভাবে সিগারেটটা তুলে নিলেন তরফদার—অগ্নিসংযোগও করলেন সেইভাবে। যদিও সিগারেটটা অত্যন্ত দামি, তবুও ভদ্রলোকের মুখ দেখে মনে হল, যা ভয় করেছিলেন তিনি তাই হয়েছে।

বললাম, 'আপত্তি না থাকলে আমাদের ইন্টারভিউ এখানেই শুরু করে দেওয়া যাক, কী বলেন?'

'যথা অভিরুচি। কিন্তু নোটবই কই আপনার?'

'নোটবই? ওহো—শুনুন। শুধু নভেল-নাটকের রিপোর্টাররাই সঙ্গে নোটবুক নিয়ে বেড়ায়—সবাই নয়।'

প্রতিবাদের সুরে বলেন তরফদার, 'কিন্তু আমি বলব এক, আর আপনি লিখবেন আর-এক—তা চলবে না।'

'ঘাবড়াবেন না। ভগবান দু-দুটো টেপ-রেকর্ডারের মতো কান আমায় দিয়েছেন।'

'কী শুনতে চান বলুন তাহলে।'

'খুব ছোট্ট, অথচ যা দিয়ে বেশ জোবালো হেডলাইন লেখা যায়, এইরকম কিছু হলেই ভালো হয়।'

'কিন্তু আমার স্টাইল তো সেরকম নয়। ও ধবনেব সস্তা কায়দা দু-চক্ষে দেখতে পারি না আমি—অত্যন্ত বাজে রুচির পরিচয় ওটা। ওসব থাক। সিংহলবাসীদেব সম্বন্ধে কিছু বলি শুনুন। সত্যিই আশ্চর্য মানুষ ওরা—প্রশংসা করাব মতো।'

'তারপর?' নিস্পৃহ স্বরে শুধোই আমি।

শুরু করলেন তরফদার। নিঃসন্দেহে কথা বলার একটা আশ্চর্য ক্ষমতা আছে ভদ্রলোকের। ছোটখাটো ঘটনাকে কেন্দ্র করে তাঁর অভিজ্ঞতা সরসভাবে সাজিয়ে-গুছিয়ে বলে চললেন তিনি—আমি শুধু মধ্যে-মধ্যে দু-একটি প্রশ্ন দিয়ে অব্যাহত রাখলাম তাঁর কথাব স্রোত। মিনিট দশেক কেটে গেল—আর, তারপরেই—জলপরীর সেকেন্ড অফিসার ঢুকলেন ঘরে।

'আপনাব চিঠি, মিস্টার রায়।' বলে একটা খাম তুলে দিলেন আমার হাতে।

'এক মিনিট!' বলে খুলে ফেললাম খামটা।

ওয়্যারলেসে খবর পাঠিয়েছেন কেদার শর্মা বোম্বাই থেকে।

'ইন্টারভিউয়ের আর দরকার নেই। টেলিগ্রামে খবর পেলাম এইমাত্র। স্বভাব-চরিত্র খুবই খারাপ ভদ্রলোকেব। কলম্বোর বাঙালিসমাজ থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন শুধু তাঁর শার্টের জন্যে।'

আবার শার্ট!

'কী ব্যাপার? খুব দরকাবি চিঠি নাকি?' শুধোন তরফদার।

'তেমন কিছু নয়। আপনি আবাব শুরু করুন।'

শুরু হল বটে, কিন্তু আমার আর মন বইল না সেদিকে। ইন্টাবভিউয়ের উৎসাহ নিভে গিয়ে তখন আবাব টাকা-অনুসন্ধান পর্ব মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে মগজে। শার্ট! কলম্বোব বাঙালি-সমাজ নাকি ভদ্রলোকেব শার্ট পছন্দ করে উঠতে পারেননি। কিন্তু কেন?.. তবফদারের শার্টগুলো পরীক্ষা করে দেখলেই বোধহয় এ-প্রশ্নের সদুত্তর পেতে পারি...তবে...।

'এর বেশি তো আর কিছুই বলার নেই আমার। আশা করি, এতেই হবে?' কাহিনির উপসংহার টানেন তরফদার।

'নিশ্চয়। প্রচুর বলেছেন আপনি। এতেই হবে।' আন্তরিকভাবেই বলি আমি। তারপর দাঁড়িয়ে উঠে বলি, 'সিংহলকে এত ভালোবাসা সত্ত্বেও কেন যে ছেড়ে এলেন, তা ভেবে সত্যিই অবাক হয়ে যাই আমি।'

কপাল কুঁচকে ওঠে তরফদারেব। সন্দিগ্ধ স্ববে বলেন, 'হঠাৎ টেলিগ্রাম পেলাম, বাবার খুব শরীর খারাপ। সেই যে এলাম, সংসারের নানা ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ায় আর যাওয়া হল না ওদিকে। তবে ইচ্ছে আছে, শিগগিরই স্থায়ীভাবেই ফিরে যাব ওদেশে।'

'যাওয়া উচিত।' বলে সেলুন ছেড়ে বেরিয়ে পড়ি আমি।

যাচ্ছিলাম কেবিনের দিকেই। পরিস্থিতি দ্রুত পালটে যাচ্ছে—আলোব নিশানাও যেন পাচ্ছি। এখন নির্জনে বসে ধীর মস্তিষ্কে কিছু চিন্তার দরকার। সিঁড়িব প্রথম ধাপে পা দিতেই মুখোমুখি হয়ে গেলাম বলবাহাদুরের সঙ্গে।

তৎক্ষণাৎ টানতে-টানতে নিয়ে এলাম ওকে আমার কেবিনে।

'ফরমাইয়ে সাব?' নিরীহভাবে বলে ও।

তর্জনী নাড়তে-নাড়তে নাটকীয় কায়দায় শুরু করি আমি, 'শার্টটা তরফদার সাহেবের?'

'জি হাঁ। কে বললে আপনাকে?' কথাটা বলে যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফ্যালে ও।

'যে-ই বলুক। মোটের ওপর তোমার আর কোনও বিপদ নেই। এখন বলো দিকি কী করে সরিয়েছিলে শার্টটা?'

'ও-সাহেবের দুটো শার্ট আর আপনার একটাও নেই। উনি যখন-তখন গালিগালাজ করতেন আমায়—তাই ও-ঘর থেকে একটা শার্ট এনে দিয়েছিলাম আপনাকে। কেন করব না বলুন?'

'আলবাত করবে। একশোবার করবে। কিন্তু এ-কথা আমায় আগে বলোনি কেন?'

'কাল রাত প্রায় বারোটার সময়ে উনি ডেকে পাঠিয়েছিলেন আমায়। আমি নাকি তাঁর একটা শার্ট চুরি করে আপনাকে দিয়েছি। আমি অবশ্য স্বীকার করিনি কিছুই। কিন্তু উনি বললেন, নিয়েছি বেশ করেছি, কিন্তু শার্টটা কার, তা যদি কাউকে না বলি, তাহলেই নগদ পঞ্চাশ টাকা বকশিস দেবেন উনি। সঙ্গে-সঙ্গে রাজি হলাম আমি।' মুখ অন্ধকার হয়ে গেল ওর : 'পঞ্চাশটা টাকা আমার গেল।'

'টাকা পাওনি তুমি?'

'একটা টাকা শুধু আগাম দিয়েছিলেন।'

'কই, দেখি সে-টাকাটা।'

কড়কড়ে একটা ব্যাঙ্ক নোট আমার হাতে তুলে দেয় বাহাদুর।

শুধোলাম, 'এই টাকাটাই দিয়েছিলেন উনি?'

'জি হাঁ সাব।'

পকেট হাতড়ে স্যামের দোকান থেকে পাওয়া একটা রুপোর টাকা বার করলাম। উলটে-পালটে দেখে দিয়ে দিলাম ওর হাতে।

'তোমার টাকাটা আমার কাছেই রইল বাহাদুর। আর শোনো, আজ থেকে কিন্তু আমরা দোস্ত। রাজি?'

'জি হাঁ, সাব।' দন্তপংক্তি বিকশিত করে নেপালি-নন্দন।

'বেশ, তাহলে যা বলি মন দিয়ে শোনো। তোমার বড়সাহেব, সোমেশ রায়, রুপোর টাকাটা খুঁজে বার করার ভার আমাকেই দিয়েছেন। আর, আমার দোস্ত হলে তুমি—কাজেই আমাদের কোনও কথা তরফদার সাহেবের কাছে বলবে না, কেমন? যদি বলো, বিপদের শেষ থাকবে না—চাকরিটিও যাবে।'

'বুঝেছি।'

'বেশ। তরফদার সাহেবের বাকি শার্টটা আমি একবার দেখতে চাই বাহাদুর।'

'উঁহু। সুটকেসে চাবি দিয়ে রেখেছেন উনি।'

'জানতাম। তবুও ঘরটা একবার পরীক্ষা করতে হবে। চট করে দেখে এসো দিকি, ওঘরে কেউ আছে কি না।'

বাথরুমের ভেতর দিয়ে ওপাশে গেল বাহাদুর—সেকেন্ড কয়েক পরেই ফিরে এসে জানালে, কেউ নেই।

'চমৎকার।'

করিডরে পাহারায় রাখলুম বাহাদুরকে। তারপর পালাবার পথ হিসেবে বাথরুমের দরজা খুলে রেখে তন্নতন্ন করে পরীক্ষা করলাম ঘরটা। কিন্তু পেলাম না কিছুই। মস্ত বড় একটা সুটকেসে তালা লাগানো ছিল। দেখেই বুঝলাম, ধূর্ত শিরোমণি তরফদার শার্টটিকে ওর মধ্যে বন্দি করে রেখে তবে কেবিন ছেড়ে গেছেন বাইরে।

হতাশ হয়ে কেবিনে ফিরে এসে ডাকলাম বাহাদুরকে। সব শুনে ও বলল, 'সুটকেসটা খুলতে চান?'

'খুললে তো ভালোই হয়।' বলি আমি।

'আমার মনে হয় টাকাটা ওর মধ্যেই আছে।'

'অসম্ভব নয়।'

'বড় শক্ত তালা।'

'তাও লক্ষ করেছ? শাবাশ! আচ্ছা, দেখা যাক, সবুরে মেওযা ফলে। শার্ট তো ওঁকে পরতেই হবে—তখন দেখব।'

বাইরে ঘণ্টা বেজে উঠতেই সবেগে প্রস্থান করল বাহাদুর।

বার্থে বসে নতুন পরিস্থিতিগুলো ভালো করে ভেবে নিলাম। গত রাতে তাহলে তরফদারের শার্ট পরেই ডিনার খেয়েছি আমি। সুতরাং রাতের আগন্তুক যে তরফদার স্বযং—সে বিষয়ে কোনও সন্দেহই আর থাকছে না। নিজের জিনিস ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কী অভিনব পন্থা। ওঁর পিছু ধরেছি তা বুঝেই নিজের ঘরে ঢোকবাব সাহস আর ভদ্রলোকের হয়নি। আর সেই কারণেই শার্টটা ফেলে দিয়েছেন সাগরের জলে। কিন্তু সামান্য একটা সাদা শার্ট নিয়ে কেন ঝামেলা, বুঝলাম না। সোমেশ রায়ের রুপোর টাকার সঙ্গে কি এর কোনও সম্পর্ক আছে? নিশ্চয় আছে—অন্তত আমার তো মনে হয় তাই।

কেবিন থেকে বেরিয়ে ওপরের ডেকে এলাম। জনপ্রাণীর চিহ্ন দেখলাম না আশপাশে।

ও-পাশের ছায়া-ছায়া কোণের ডেক-চেয়ারটায় গা এলিয়ে দিয়ে বসলাম আরাম করে। সমস্যাটা কিন্তু অদ্ভুত একটা পরিস্থিতিতে এসে দাঁড়িয়েছে এখন। তরফদারের সুটকেসটা খুলতেই হবে আমায়—কিন্তু কী করে?

ডেকের ওপর ভারী-ভারী পায়ের শব্দ শুনলাম—পাশ দিয়ে চলে গেলেন দেশমুখ। ভদ্রলোক আমার দিকে ফিরেও তাকালেন না—কথাও বললেন না। খুব চিন্তিত মনে হল ওঁকে। দেখে আবার চিন্তার আবর্ত পাক দিয়ে ওঠে মাথার মধ্যে। ভুল সূত্র নিয়ে সময় নষ্ট করছি না তো! দেশমুখ, অলোক ঘোষ, মিসেস প্যাটেল—প্রত্যেককেই সন্দেহ হয় আমার। কিন্তু—।

কিন্তু না। আপাতত শার্ট-সূত্রই অনুসরণ করব আমি—দেখাই যাক না কোথায় পৌঁছই। তবফদারের ব্যাগের ভেতর কী আছে তা আমায় দেখতেই হবে। শখের গোয়েন্দারা এ-ক্ষেত্রে কী করত? তালাটা ভাঙত নিশ্চয়। উঁহু, সে বড় নিষ্ঠুর পদ্ধতি। ওর চাইতে চাবিটা সংগ্রহ করা ভালো। কিন্তু করি কী করে?

পুরো বিশ মিনিট কেটে গেল এই একই চিন্তায়—তারপরই চকিতে একটা মতলব এল মাথায়। তৎক্ষণাৎ চেয়ার ছেড়ে এগোলাম—স্মোকিংরুমের দরজায় পৌঁছে দেখি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসছেন তরফদার।

বললাম, 'আপনার প্রবন্ধর কথাই ভাবছিলাম এতক্ষণ। এ সম্পর্কে একটা ফোটোগ্রাফ দরকার আমার।'

ত্রস্তে উত্তর দেন তরফদার, 'না, না, ওসব পছন্দ হয় না আমার।'

'আপনার ফোটোর কথা বলছি না আমি। সিলোনে থাকার সময়ে কোনও ফটো তোলেননি ওখানকার?'

'তা তুলেছি। ঠিক আছে, পরে দেব'খন।'

হাসিমুখে বললাম, 'কিছু মনে করবেন না, প্রবন্ধটা লিখতে-লিখতে উঠে এলাম শুধু ফোটোর জন্যেই।'

মুহূর্তের জন্যে স্থির চোখে আমার দিকে তাকালেন তরফদার। তারপর বললেন, 'বেশ তো, আসুন আমার সঙ্গে।'

কোনও কিছু যাতে চোখ এড়িয়ে না যায় সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রেখে পিছু নিলাম ভদ্রলোকের।

দরজার সামনে পৌঁছে উনি একগোছা চাবি বার করলেন পকেট থেকে। আর চেষ্টাকৃত অনাগ্রহ চোখে তাকিয়ে রইলাম আমি।

বললেন, 'সুটকেসে সবসময়ে চাবি দিয়ে রাখি আজকাল। যেভাবে জিনিসপত্র চুরি যাচ্ছে—বিশ্বাস হয় না কাউকেই।'

'তা যা বলেছেন।' সায় দিই আমি।

সুটকেসের ওপর ঝুঁকে পড়লেন তরফদার এবং পরক্ষণেই ছিলেছেঁড়া ধনুকের মতো ছিটকে উঠলেন, 'এ কী!'

দেখি, অতবড় তালাটা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে ঝুলছে সুটকেসের আংটা থেকে।

রাগে লাল হয়ে ওঠে ভদ্রলোকের মুখ : 'এ কী জঘন্য ব্যাপার। কী বিশ্রী কাণ্ড। এর একটা হেস্তনেস্ত আমি আজই করব—ঢের হয়েছে, আর না। একদল চোরের মাঝে এভাবে থাকা কোনও ভদ্রসন্তানের শোভা পায় না।' ক্ষিপ্র হাতে সুটকেসের ভেতরটা পরীক্ষা করতে থাকেন উনি।

'কিছু হারিয়েছে নাকি?' সহানুভূতির সুরে শুধোই আমি।

'মনে তো হচ্ছে না।' একটু ঠান্ডা হন ভদ্রলোক : 'কিন্তু কিছু হারানোটা বড় কথা নয়—সব কিছুর সীমা আছে। সোমেশ রায়ের সঙ্গে আজই একটা বোঝাপড়া হয়ে যাবে আমার।' একটা খাম বার করে বললেন, 'ফোটোগুলো এর মধ্যেই আছে। আপনার যেগুলো দরকার নিয়ে বাকিগুলো ফেরত দিয়ে যান, কেমন?'

'নিশ্চয়,' কিন্তু যাওয়ার কোনও চেষ্টা করি না আমি। অনেক আশা নিয়েই বলি, 'আপনি বরং মিস্টার রায়কে ডেকে নিয়ে আসুন—আমি আপনার জিনিসগুলোর ওপর নজর রাখছি।'

স্থির চোখে তরফদার তাকালেন আমার দিকে। আমার কল্পনা কি না জানি না, কিন্তু স্পষ্ট মনে হল যেন ওঁর ঠোঁটের কোণ ছুঁয়ে-ছুঁয়ে গড়িয়ে পড়ল অত্যন্ত নিগূঢ় প্রকৃতির কুটিল এক হাসি।

'অনেক ধন্যবাদ। মিস্টার রায়কে আমি এ-ঘরেই ডেকে পাঠাচ্ছি। আপাতত ঘর ফাঁকা রেখে বাইরে যাওয়ার কোনও ইচ্ছে আমার নেই—এমনকী আপনার আগ্রহ থাকলেও নয়।'

আপনার আগ্রহ থাকলেও নয়।

এ-কথার অর্থ? আমি যে ওঁর পেছনে গোয়েন্দাগিরি শুরু করেছি, তা কি জেনে ফেলেছেন, না, স্রেফ আন্দাজের ওপর ঢিল ছুড়লেন অন্ধকারে?

'ইয়ে—তা তো ভালোই।' আমতা-আমতা করে সরে পড়ি আমি।

ঘরে এসে আবার নতুন করে ভাবতে বসি।

'আপনার আগ্রহ থাকলেও নয়', একথা বলার অর্থ?

সুটকেসের তালাটাই বা ভাঙল কে? তাহলে শুধু তরফদারকেই সন্দেহ করা চলে না এ ব্যাপারে—আরও অনেকেই ওত পেতে রয়েছেন সুযোগের প্রতীক্ষায়।

একটা বই নিয়ে শুয়ে পড়লাম বার্থে। মনটা কিন্তু রইল পাশের কেবিনে।

পুরো এক ঘণ্টা কেটে গেল—কোনও সাড়াশব্দ পেলাম না ওদিকে। তরফদার তাহলে সত্যিই ঘর পাহারা দিতে বসেছেন।

অবসাদে, ক্লান্তিতে, বিশেষ করে বহুদিন পরে কিছু চর্ব-চোষ্য-লেহ্য-পেয় উদরস্থ করার ফলে বেশ ঘুম-ঘুম পাচ্ছিল। দিবানিদ্রার অভ্যাস যদিও ছিল না, তবুও সেদিনের সেই নিশ্চিন্ত অপরাহ্ণের তন্দ্রা-জড়ানো আবেশ বড় মধুময় মনে হল আমার কাছে। কেদার শর্মার দাঁতখিঁচুনি নেই, নেই উর্ধ্বশ্বাসে ছুটোছুটি করে সন্ধের আগেই কাগজ বার করার গুরুদায়িত্ব—আছে শুধু জলের মৃদু ছলছল-সঙ্গীত, এঞ্জিনের গুঞ্জরন আর ফুরফুরে হাওয়া। আর সেইসঙ্গে নির্ঝঞ্ঝাট, নিরুপদ্রব, অনাবিল শান্তির কোলে ধীরে-ধীরে গা এলিয়ে দেওয়া।

*

ঘুম ভাঙল দরজায় নক করার শব্দে।

ধড়মড় করে উঠে দেখি, ওপরের ডেকের একজন কর্মচারী।

'আপনাকে ওপরে ডাকছেন।' বিনীতভাবে জানালে সে।

আমাকে ডাকছেন? আবার কী হল? রুপোর টাকা নিয়ে নতুন কোনও জটিলতার সৃষ্টি, না টাকাটার স্বস্থানে প্রত্যাবর্তন? তাড়াতাড়ি চুলটা আঁচড়ে নিয়ে ছুটলাম ওপরে।

সিঁড়ির গোড়াতেই দেখা হয়ে গেল পিসিমার সঙ্গে।

'এই যে, তোমাকেই খুঁজছিলাম। ব্রিজের টেবিলে একজন কম পড়ল বলে ডাকলাম তোমায়। অসুবিধে হল না তো?'

বুঝলাম ফাঁদে পড়েছি। অসহায়ভাবে তাকালাম এদিক-ওদিক।

'আ-আমি ভাবলাম বুঝি দারুণ দরকারি কিছু।' তোতলাতে শুরু করি আমি।

'ও।'

'তা ছাড়া, ইয়ে—আমি না খেললেই কিন্তু ভালো হত। জানেন তো কী বিশ্রী খেলি আমি।'

'অভ্যাস করলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি তোমায় কতকগুলো পয়েন্ট শিখিয়ে দেব'খন।'

'তাহলে তো ভালোই হয়। কিন্তু, ইয়ে—একটা জরুরি কাজ রয়েছে হাতে। তা ছাড়া, আমি তো ভালো দেখতেও পাই না।'

'তা আমি আগেই লক্ষ করেছি। গতকাল যখন সাহেব ফেলা উচিত, পট করে তুমি সেখানে দশ ফেলে দিয়েছিলে। চোখ খারাপ তো কী হয়েছে, টেবিলটা আলোর নীচেই রাখব'খন। চলে এসো।'

'তাহলে তো খুবই ভালো হয়।' আত্মসমর্পণ করি আমি।

আমার কীসে ভালো হয়, আর কীসে খারাপ হয়, তা দেখার ধৈর্য পিসিমার ছিল না। আমাকে যে কায়দা করে বাগে এনে ফেলেছেন, এইটাই তাঁর সবচেয়ে বড় তৃপ্তি। তাঁর মতে যদিও আমি আদর্শ ব্রিজ-খেলোয়াড় নই, তবু একটি কারণে আমায় খুব পছন্দ করেন উনি। নিত্য নতুন নিয়ম বিনা প্রতিবাদে মেনে নেওয়ায় আমার ওপর খুব খুশি ছিলেন তিনি। সচল বিন্ধ্যাচলের পিছু-পিছু সেলুনে ঢুকতে-ঢুকতে বিপন্নভাবে তাকালাম আশপাশে কবিতার আশায়। কিন্তু ধারে-কাছে ওর চিহ্নও দেখলাম না। মুখ অন্ধকার করে একটা টেবিলে বসেছিলেন অলোক ঘোষ আর সোমনাথ মুখার্জি—সদ্য-কেনা বন্দি ক্রীতদাসের মতো তাঁদের মুখচ্ছবি দেখে মনে-মনে বেশ হৃষ্ট হলাম আমি। জাঁকিয়ে বসলেন পিসিমা—শুরু হল খেলা। সে-দীর্ঘ যন্ত্রণার আর বর্ণনা দেব না। প্রত্যেক হাতের তাস শেষ হওয়ার পর খেলা থামিয়ে প্রত্যেকের ভুল-ত্রুটি শুধরে দিতে লাগলেন পিসিমা। আর আমি মুগ্ধ বিস্ময়ে লক্ষ করতে লাগলাম তাঁর আশ্চর্য সৃজনী-প্রতিভা আর প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব।

ডিনারের বিউগল বাজার কিছুক্ষণ আগে কবিতা এসে মুক্তি দিল আমাদের। পিসিমা অগ্নিশর্মা হয়ে উঠেছিলেন আমার ওপর—আমার অজ্ঞতার ফলে যে তিনি ডুবতে বসেছেন, তা প্রতি দু-মিনিট অন্তর সরবে ঘোষণা করছিলেন প্রত্যেকের কাছে।

বাইরে এসে বললাম, 'আমার ওপর দারুণ চটেছেন উনি—ওঁর সব সিগন্যাল গুলিয়ে ফেলেছি আমি।'

হাসিমুখে কবিতা সায় দেয়, 'মাঝে-মাঝে পিসিমা সত্যিই বড় অসহ্য হয়ে ওঠে। তুমি না খেললেই পারতে।'

'খেলার কোনও ইচ্ছেই ছিল না আমার—কতটা সময় নষ্ট হল বলো তো। এতক্ষণে অনেকটা কাজ এগিয়ে যেত আমার।'

'তার মানে? অনেক কিছুই জেনে ফেলেছ মনে হচ্ছে?'

'তা জেনেছি।' বলে তরফদার সম্পর্কে কেদার শর্মার বেতার-বার্তা আর তরফদারের

সুটকেসের তালা ভাঙার কাহিনি শুনিয়ে দিলাম ওকে।

সব শুনে ও বললে, 'তাহলে এখন তোমার কাজের প্রোগ্রাম কী শুনি?'

'পরে বলব, হাতে একদম সময় নেই এখন।' বলে তাড়াতাড়ি ফিরে আসি কেবিনে।

বাথরুমের দরজা ঠেলে দেখি ওপাশ থেকে চাবি লাগানো। জোরে কয়েকবার নক করে আর ডেকেও কারও সাড়া পেলাম না ওদিকে। অগত্যা ওপাশ দিয়ে গিয়ে দরজা খোলা ছাড়া কোনও উপায় আর দেখলাম না।

তরফদারের কেবিনের সামনে দাঁড়িয়ে দরজায় নক করতে গিয়েও হাত নামিয়ে নিলাম। ভাবলাম, এই তো সুযোগ। কাজেই নিঃশব্দে দরজা খুলে পা টিপে-টিপে ঢুকলাম ভেতরে।

কেবিনের আধো-আলো আধো-আঁধারের মাঝে মালপত্র ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ল না। কিন্তু ঘরের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত যেতেই হঠাৎ যেন স্তব্ধ হয়ে গেল আমার হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া।

পোর্টহোলের ঠিক নীচেই একটা সেট্রির ওপর অন্ধকারের মধ্যেই দেখলাম ধবধবে সাদা একটা বস্তু—তরফদারের শার্ট।

সবে শার্টটায় হাত দিয়েছি—হঠাৎ বাথরুমে অস্পষ্ট একটা শব্দ শুনে চমকে উঠলাম আমি। চকিতে শার্টের ওপর থেকে হাত সরিয়ে নিলাম বটে—কিন্তু ওই ছোট্ট মুহূর্তটাতেই মস্ত এক আবিষ্কার করে ফেললাম। পরক্ষণেই বাথরুমের দরজায় আবির্ভূত হলেন তরফদার স্বয়ং।

'একী! কী করছেন আপনি এখানে? ঘরে ঢোকার আগে দরজায় নক করা যে সাধারণ ভদ্রতা, তাও কি আপনাদের পেশায় শেখায় না?'

কাঁচুমাচু মুখে বলি, 'মাপ করবেন, ওদিক থেকে নক করে কারও সাড়া না পেয়ে এদিক দিয়ে বাথরুমের দরজাটা খুলতে যাচ্ছিলাম—আপনি যে চুপ করে ভেতরে বসে আছেন, তা কী করে জানব?'

দাড়ি কামাতে-কামাতে বেরিয়ে এসেছিলেন ভদ্রলোক—এখন আবার সেফটি রেজারখানা তুলে নিয়ে বললেন, 'আমি ঘরে বসে থাকি কি দাঁড়িয়ে থাকি—তা আপনার দেখার দরকার নেই। ভবিষ্যতে ঘরে ঢোকার আগে নক করে ঢুকলেই খুশি হব আমি।'

তরফদারের বাক্যবাণগুলো কানে ঢুকলেও মাথা পর্যন্ত আর পৌঁছচ্ছিল না। ভদ্রলোকের সব রহস্যই জেনে ফেলেছি আমি—কিন্তু তবুও আমার নাটকীয় দৃশ্যলোভী মনটা তৎক্ষণাৎ কিছু করতে রাজি হল না। আধো-অন্ধকার একটা কেবিনে দুজনের মধ্যে বোঝাপড়ার চাইতে সোমেশ রায় এবং আরও কয়েকজনের সামনে ধাপে-ধাপে ক্লাইম্যাক্সে পৌঁছে মুখোশ খোলার দৃশ্য ভাবতেই পুলকিত হয়ে উঠলাম আমি।

বললাম, 'মাপ করবেন—সত্যিই খুব অন্যায় হয়ে গেছে।'

'এ কী অত্যাচার বলুন তো?' তবুও ফুলতে থাকেন ভদ্রলোক : 'প্রথমে ভাঙল সুটকেসের তালা। তারপর বলা নেই কওয়া নেই ভূতের মতো ঘরে ঢুকে পড়লেন আপনি—এ সব কী?' পিছু-পিছু এসে আমার পেছনেই দড়াম করে বন্ধ করে দিলেন দরজাটা।

করিডরে আসার পর কিন্তু অবিমিশ্র আনন্দে চনমন করে উঠল দেহমন। এত সহজে যে রহস্যের সমাধানে পৌঁছনো যাবে তা বিশ্বাস করা চলে না, কিন্তু তবুও সেটা সত্যি। সত্যিই ধড়িবাজ বটে তারাপদ তরফদার, কিন্তু গোয়েন্দাপ্রবর মৃগাঙ্ক রায় যে ধড়িবাজ-শিরোমণি, তা এবার ভদ্রলোক টের পাবেন হাড়ে-হাড়ে। রুপোর টাকা যে কোন গোপন কন্দরে সুপ্তিময়, তা আর অজানা নয় আমার কাছে।

কিন্তু এই চাঞ্চল্যকর নাটক মঞ্চস্থ করার আগে সোমেশ রায়ের সঙ্গে কিছু কথা বলার দরকার। পা টিপে-টিপে করিডরের শেষে এসে নক করলাম ওঁর ঘরে। আর দরজা খুলেই কবিতাকে দেখে হৃদয়টা যেন ময়ূরের মতোই নেচে উঠল। অনুরাগিণী কন্যার মতোই বাবার ড্রেস-টাই বেঁধে দিচ্ছিল

ও। আমাকে দেখেই উত্তেজিত হয়ে উঠলেন সোমেশ রায়।

'কতদূর?' ঘাড় ফেরাতে গিয়ে নটটাই খাবাপ হয়ে যায় ওঁর।

'কাজ প্রায় শেষ।' খুশি-খুশি স্বরে বলি আমি।

'টাকাটা?'

'কোথায় আমি জানি—পাওয়ারই সামিল।'

'মোটেই নয়।' মুখটা আবার অন্ধকার হয়ে যায় ওঁর ঃ 'যাক, কোথায় আছে শুনি?'

'যথাসময়ে তা বলব। আজ ডিনার শেষ হলে ছোটখাটো একটা নাটকের অবতারণা করতে চাই। কফি শেষ হলে পর ডাইনিং সেলুন থেকে পিসিমা আর মিসেস প্যাটেলকে নিয়ে কবিতা তুমি বাইরে চলে যেও—ঘরে থাকব শুধু আমরা।'

'কী—এত বড় নাটকটা আমি দেখতে পাব না? না, আমি যাব না।'

'কবিতা—ও যা বলে শোন।' তিরস্কার মেশানো স্বরে বলেন সোমেশ রায়।

'কিন্তু বাবা—।'

'কবিতা!'

'বেশ, মৃগাঙ্ক যদি বেশি জানে বলে মনে করে, তবে তাই হবে।'

'নিশ্চয ও বেশি জানে—অন্তত আমাদেব চেয়ে তো বেশি।'

বললাম, 'কতকগুলো অপ্রীতিকর ব্যাপাব ঘটতে পারে—তাই মেয়েদের সেখানে থাকা সমীচীন নয় মোটেই। আর স্যার, আপনার সাহায্য তখন খুবই দরকার আমার। আমি যা-ই বলি না কেন, তৎক্ষণাৎ আপনি সায় দেবেন তাতে—ব্যস, বাকি যা করবার আমিই কবব।'

'নিশ্চয়, সে আর বলতে। তবে বাবা যদি একটু ইঙ্গিত দিয়ে রাখতে—'

'তা দিচ্ছি।' বলে কেদার শর্মার বেতাব-বার্তাটা তুলে দিই ওঁব হাতে ঃ 'পড়ে দেখুন।'

পড়লেন সোমেশ রায়।

'কার কথা হচ্ছে? তবফদাবেব নয নিশ্চয়?'

'হ্যাঁ, স্যাব, তরফদারেরই।'

'আশ্চর্য! এ যে কল্পনাও করতে পাবি না। কিন্তু ওর শার্টেব কথা কী লিখেছে, তা তো বুঝলাম না।'

'এখন বললে বিশ্বাস হবে না আপনার। ডিনাবের পর আমি নিজেই দেখিয়ে দেব আপনাকে।'

'চমৎকার!' আবও জেগে ওঠে সোমেশ রায়ের উৎসাহ ঃ 'এ ঝামেলা আজ রাতেই মিটে গেলে খুবই খুশি হব আমি। ক্যাপ্টেন এইমাত্র বলে গেল, এঞ্জিনে নাকি কী গোলমাল দেখা দিয়েছে—জলপরী তাই পোর্ট ভিক্টোরিয়ার দিকেই চলেছে। ভালো কথা, আজ দুপুরে তরফদার আমায় ঘরে ডেকে পাঠিয়ে বেশ খানিকটা লম্ফঝম্প করল। ওর সুটকেসের তালা নাকি কে ভেঙে রেখে গেছে। শুনে সহানুভূতি জানালাম। কিন্তু এর মূলে যে ক্যাপ্টেন, তা আর বলিনি।'

'ও-হো। তালাটা তাহলে ক্যাপ্টেন ভেঙেছে?'

'খুবই খারাপ সন্দেহ নেই। ও বললে যে, সরু একটা ছুরি দিয়ে অনায়াসেই খুলে ফেলবে তালাটা—কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ছুরি পিছলে যাওয়ায় ওই বিপত্তির সৃষ্টি হয়। এত বাড়াবাড়ি করাটা মোটেই পছন্দ হয়নি আমার।'

'কিছু পেয়েছে ও?' শুধোই আমি।

'কিস্‌সু না। তন্নতন্ন করে দেখেও কিছু পায়নি।'

'খুবই স্বাভাবিক,' হাসিমুখে বলি আমি ঃ 'আর-একটা কথা স্যার। আজকের ডিনারে আমি সাদা শার্টটা পরে হাজির হতে পারব না। যদি কিছু মনে না করেন—তাহলে সাধারণ পোশাক পরেই আসব।'

'দরকার হলে লুঙ্গি পরেও এসো, কোনও আপত্তি নেই আমার। শুধু টাকাটা আমায় পাইয়ে দিলেই হল।'

'তা দেব।'

আশ্বাস দিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ি আমি। বেরোবার আগে অবশ্য কবিতার স্ফুরিত অধরের কোণে ফোটা ছোট্ট হাসিটুকুর উত্তর দিয়ে যাই অপাঙ্গে চোখের ভাষা দিয়ে।

আসন্ন যুদ্ধজয়ের আনন্দ বুকে নিয়ে ফিরে এলাম কেবিনে।

সে-রাতে বেশ থমথমে হয়ে ওঠে ডিনার টেবিলের আবহাওয়া। টাকা-তদন্ত যে একটা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের কাছাকাছি এসে পড়েছে, তা যেন মনে-মনে প্রত্যেকেই উপলব্ধি করতে থাকে। একজন শুধু দেখলাম নির্বিকার। সিংহলে রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার গল্প অনর্গল বলে চললেন তবফদাব। দেখে ভদ্রলোকের বুদ্ধিমত্তার আর-একদফা প্রশংসা না করে পারি না আমি।

মেয়েরা ঘর ছেড়ে যাওয়ার পর নিথর নৈঃশব্দ নেমে আসে ঘরের মধ্যে। সিগারেটের শেষ প্রান্তের দিকে কিছুক্ষণ চোখ কুঁচকে তাকিয়ে রইলেন সোমেশ রায়।

তারপর বললেন, 'টাকা হারানোর প্রসঙ্গ আবার তুলছি, আশা করি কারও আপত্তি নেই। টাকাটা ফিরে পেলে শুধু আমি নই, আপনারাও যে কম খুশি হবেন না, তা আমি বিশ্বাস কবি। মিস্টার রায়—মৃগাঙ্ক রায়—এ ব্যাপারে তদন্ত করছিলেন আমারই অনুরোধে। শুনলাম, রিপোর্ট দেওয়ার জন্যে আজ তৈরি হয়েই এসেছেন উনি।'

যন্ত্রবৎ প্রত্যেকের মুখ ঘুরে গেল আমাব দিকে। সবার মুখের ওপব মসৃণ দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে মৃদু হাসলাম আমি।

তারপর বললাম, 'গৌরচন্দ্রিকা না করে গোড়া থেকেই শুরু করছি আমি। টাকাটা প্রথমে মিস্টার রায়ের কাছ থেকে যিনি নিয়েছিলেন, তাঁর উদ্দেশ্য ছিল শুধু পবিহাস করা।' চেয়ারে উসখুস করে উঠলেন সোমনাথ মুখার্জি—কিন্তু কারও নামোল্লেখ না করে আমি বললাম কীভাবে রসিক পুরুষটি টাকা আনতে গিয়ে দেখেন রুপোর টাকার জায়গায় বিরাজ করছে একটা এক টাকার নোট। বলে পকেট থেকে বার করলাম ব্যাঙ্ক-নোটটা।

'নোটটা একেবারেই নতুন। এর ক্রমিক সংখ্যা হল ঃ Y15/641525A। ব্যাঙ্ক থেকে নতুন নোট নিলে টাকাগুলো যে ক্রমিক সংখ্যা অনুসারে পরপর সাজানো থাকে, তা তো জানেনই।' পকেট থেকে আর-একটা নোট বার করি আমি ঃ 'এ-নোটটার ক্রমিক সংখ্যা হল ঃ Y15/641526A। দুটো নোটই যে এক লোকের কাছ থেকে এসেছে, তা অনুমান করে নেওয়া মোটেই কঠিন নয়, কী বলেন?'

'শাবাশ!' চিকচিক করে ওঠে সোমেশ রায়ের চোখ ঃ 'এ-টাকাটা পেলে কোত্থেকে?'

'দ্বিতীয় নোটটা ছোট্ট একটা কাজের পারিশ্রমিকস্বরূপ দেওয়া হয়েছিল বলবাহাদুরকে। দিয়েছিলেন উপস্থিত ভদ্রলোকদেরই একজন।' একটু থামলাম। সবাই নির্বাক। তারপর ঃ 'দিয়েছিলেন ডক্টর তরফদার।'

প্রত্যেকের দৃষ্টি ঘুরে গিয়ে স্থির হল তরফদারের ওপর। কিন্তু ভদ্রলোকের বেপরোয়া মুখভাবের প্রশংসা না করে পারলাম না।

মৃদু হেসে বললেন উনি, 'বোধহয় দিয়েছিলাম। কখন দিয়েছি যদিও তা মনে নেই। কিন্তু হয়েছে কী তাতে?'

দেশমুখ বাধা দিয়ে বললেন, 'এসব ছেলেমানুষির কোনও মানে হয়? আইনশাস্ত্রটা মোটামুটি ভালোই জানা আছে আমার। মিস্টার ডিটেকটিভকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে—।'

হাসিমুখেই বলি, 'এক মিনিট, মিস্টার দেশমুখ। আইনজ্ঞের প্রয়োজন এখনও আসেনি। এ-প্রমাণ যে যথেষ্ট নয়, তা আমিও জানি। কিন্তু এটুকু বললাম শুধু পরবর্তী ঘটনার মুখবন্ধ হিসেবে। সবার চোখে ডক্টর তরফদারকে দোষী প্রতিপন্ন করছে শুধু নোট দুটোর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কই নয়, করছে আরও অনেক কিছু এবং সবশেষে করছি আমি। কাজেই ডক্টর তরফদারকে আমি অনুরোধ করব উঠে দাঁড়াতে দেহ তল্লাশির জন্যে—অবশ্য মিস্টার রায়ের কোনও আপত্তি না থাকলে।'

'স্বচ্ছন্দে।' মাথা দুলিয়ে বেশ উল্লসিত স্বরে সম্মতি জানালেন সোমেশ রায় ঃ 'তাহলে ডক্টর তরফদার, অনুগ্রহ করে—।'

লাল হয়ে ওঠেন তরফদার।

তীব্র স্বরে প্রতিবাদ জানান তিনি, 'এ শুধু আমাকে অপমান করার চক্রান্ত। মিস্টার রায়, আমার বিনীত অনুরোধ, আতিথেয়তার সহজ নিয়মটি যদি জানেন, তাহলে—।'

'আমার আতিথেয়তাকে আপনিই অপমান করেছেন!' কড়া কণ্ঠে উত্তর দেন সোমেশ রায় ঃ 'আপনার সব কথাই আমি জেনেছি। উঠে দাঁড়ান।'

ধীরে-ধীরে উঠে দাঁড়ালেন তরফদার।

'প্রথমে কোট আর ওয়েস্ট কোট,' চটপট আদেশ দিই আমি, আর মনে-মনে অনুভব করি প্রতিহিংসার নিষ্ঠুর আনন্দ উল্লাস।

'ধন্যবাদ। আচ্ছা, এবার টাইটা। ঠিক আছে, আমি সাহায্য করছি আপনাকে।' দু-টানে টাইটা খুলে ফেলি—সেইসঙ্গে গোটা দুয়েক বোতামও।

তারপর বলি, 'ডাক্তার তরফদারের শার্টটা বাস্তবিকই অতুলনীয়। আর এ জন্যে প্রথমেই তাঁর প্রশংসা করে নিচ্ছি মুক্ত কণ্ঠে। এই বিশেষ রকমের শার্ট পরার জন্যেই সিংহলে যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করেছিলেন উনি। লক্ষ করে দেখুন, শার্টের কলারটা একটু অস্বাভাবিক রকমের শক্ত। বিশেষ করে প্রান্ত দুটো। অনেক স্টার্চ দিয়ে খুব কড়া করে ইস্ত্রি করলেও কলার কখনও এত শক্ত হয় না। আসলে আশ্চর্য রকমের শক্ত দুটো প্রান্তে আছে দুটো ছোট্ট পকেট—মুখদুটো অবশ্য নীচের দিকেই ঢাকা পড়ে রয়েছে। সদ্য ইস্ত্রি করা থাকলে কলারের বৈশিষ্ট্য কারওরই নজরে পড়ে না। আমারও পড়েনি। কিন্তু তদন্তের ফলে জানলাম, পকেট দুটোর সৃষ্টি ছোটখাটো কিন্তু মূল্যবান চোরাই মাল রাখার জন্যে। যেমন ধরুন না কেন, হিরের দুল, নাকছাবি, আংটি, ছোট করে ভাঁজ করা ব্যাঙ্ক নোট অথবা একটা রুপোর টাকা। অত্যন্ত শক্ত হওয়ার দরুণ ওপর থেকে দেখলেও কিছু ধরা যায় না—যেমন এখনও যাচ্ছে না। তা ছাড়া, পো বর্ণিত "The Purloined Letter"-এর মূল সূত্র অনুযায়ী তল্লাশির সময়ে চোখের সামনে থাকা জিনিসটাই চোখ এড়ায় সবার আগে, যেমন এড়িয়েছিল গতবার। কিন্তু এবার—' বলে কলারের ভেতর থেকে একটা রুপোর টাকা বার করে ফেলে দিলাম সোমেশ রায়ের সামনে। বিজয়োল্লাসে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে আমার স্বর—ক্লাইম্যাক্সে পৌঁছে গেছি—আর কী! মুখে বলি, 'আপনার লাকি পিস, স্যার।'

খুশির আলো জেগে ওঠে সোমেশ রায়ের স্বপ্নালু চোখে ঃ 'তোমার ঋণ যে কী করে শোধ করব—' বলতে-বলতে কাঁপা হাতে টাকাটা তুলে নিলেন। পরক্ষণেই দারুণ চিৎকারে চমকে উঠলাম আমি। টেবিলের ওপর টাকাটা আছড়ে ফেলে তড়াক করে লাফিয়ে উঠলেন তিনি।

'আবার রসিকতা। আবার পরিহাস আমার সঙ্গে!' দু-হাত নাড়তে-নাড়তে চিৎকার করে ওঠেন তিনি।

'কী—কী হল স্যার?' আমার বিজয়-গৌরব তখন নিষ্প্রভ প্রায়।

সিংহের মতো গর্জন করে উঠলেন সোমেশ রায় ঃ 'এ-টাকা আমার নয়। এতে ছাপ রয়েছে ১৯৪৬ সালের!'

'১৯৪৬ সালের!' তরফদারের মুখেও দেখি অকপট বিস্ময়ের প্রতিচ্ছবি।

মুহূর্তের মধ্যে তুমুল হট্টগোলে ভরে উঠল সেলুন। প্রত্যেকেই একসঙ্গে কথা বলতে শুরু করে দেন। কিন্তু গোলমাল ছাপিয়ে বিউগ্‌লের মতো বেজে ওঠে সোমেশ রায়ের তীক্ষ্ণ কর্তৃত্ব-ব্যঞ্জক স্বর। আমার দিকে ফিরে সবেগে তর্জনী নাড়তে-নাড়তে আমার মুণ্ডপাত করছিলেন তিনি।

'ডিকেটটিভ! তুমি আবার একটা ডিটেকটিভ! প্রত্যেকবার আশায় আনন্দে ভরিয়ে তুলছ আমায়। তারপর তুমি—তুমি—তুমি—।'

'দুঃখিত স্যার।' ক্ষীণ স্বরে কোনওমতে বলি। রীতিমতো ঘাবড়ে গেছিলাম আমি।

'দুঃখিত! এটা আবার কী ধরনের কথা হে ছোকরা? দুঃখিত! ফের যদি নতুন-নতুন টাকা আবিষ্কার করতে দেখি তোমায়—তোমার ছাল আমি ছাড়িয়ে নেব।' তারপর ফিরলেন তরফদারের দিকে—ভদ্রলোক তখন নিপুণ হাতে টাইটা বাঁধছিলেন ঃ 'আর আপনি! কী বলার আছে আপনার? কী সাফাই গাইবেন ঠিক করেছেন? ম্যাজিক শার্ট পরে কোনও সৎ ব্যক্তি ভদ্রলোকের আসবে আসে না—সিংহলে আপনার কীর্তিকলাপ সবই শুনেছি আমি। কী করে এ-টাকা গেল আপনার কাছে?'

ওয়েস্ট কোটটা পরতে-পরতে নিরুত্তাপ গলায় বললেন তরফদার, 'এক মিনিট।' বলে কোটটায় হাত গলাতে-গলাতে বললেন, 'এ রকম পরিস্থিতিতে সত্যি ছাড়া মিথ্যে বলে কোনও লাভ নেই। একটু মাথা ঠান্ডা করে ভাবলেই দেখবেন আসলে কোনও ক্ষেত্রেই চুরি হয়নি। প্রতিবারই একটা টাকার জায়গায় রাখা হচ্ছে আর-একটা টাকা—একে চুরি বলে না। তা ছাড়া লাকি পিসটা আপনার কাছে নিছক একটা প্রেজুডিস ছাড়া কিছুই নয়। কথাটা মনে রাখলেই ভালো করবেন।'

'তা নিয়ে আপনি মাথা না ঘামালে আরও ভালো করবেন।' বললেন সোমেশ রায়।

'গত রাত্রে আপনার কেবিনে গেছিলাম টাকাটা আনতে। শুধু একটা রসিকতা করবার উদ্দেশ্য ছিল আমার। দরজার কাছে হঠাৎ কার পায়েব শব্দ পেয়ে তাড়াতাড়ি লুকিয়ে পড়লাম বড় আলমারিটার আড়ালে। দেখি চুপিসাড়ে ঘরে ঢুকলেন মিঃ মুখার্জি। আপনার রুপোর টাকাটা নিজের পকেটে রেখে অন্য একটা টাকা রাখলেন আপনার পকেটে। ওঁর পিছু নিলাম আমি। নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে উনি ডিনার-সেলুনে এলে ঢুকলাম ওঁর কেবিনে। টাকাটা খুঁজে বার করতে বিশেষ বেগ পেতে হল না আমায়। তারপর মিঃ মুখার্জি যা করেছেন, আমিও তাই করলাম, অর্থাৎ টাকাব বদলে টাকাই রাখলাম। আজ সকাল পর্যন্ত টাকাটা আমার কাছেই ছিল। আমাদের এই তরুণ বন্ধুটি যেখান থেকে নতুন টাকাটা বার করলেন, ওইখানেই লুকোনো ছিল টাকাটা। টাকাসমেত শার্টটা তালা দিয়ে রেখেছিলাম সুটকেসে। কিন্তু আজ বিকেলে সে-তালা কে যেন ভেঙে রেখে যায়—মিঃ রায়কে আমি তা দেখিয়েছি। আমার বিশ্বাস, তখনই কেউ আবার পালটে রেখে গেছে টাকাটা!'

'রাবিশ! আপনি তাহলে বলতে চান তালা ভাঙার পরও টাকাটা আছে কি না তা যাচাই করে নেননি আপনি?' বললেন সোমেশ রায়।

'ওপর থেকে হাত দিয়েই বুঝেছিলাম একটা টাকা রয়েছে ভেতরে। কিন্তু সেটা যে আপনার লাকি পিস নয়, তা তো বুঝিনি তখন।'

পলকহীন চোখে ক্ষণকাল তাকিয়ে রইলেন সোমেশ বায়। তারপর মৃদু অথচ কঠিন স্বরে বললেন, 'আপনাকে ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না। অত্যন্ত ধড়িবাজ আপনি সন্দেহ নেই। এঞ্জিনে কী গন্ডগোল হয়েছে, তাই আমরা পোর্ট ভিক্টোরিয়ার দিকেই চলেছি। কাল সকালে পোর্টে পৌঁছলে আপনার মালপত্র নিয়ে নেমে গেলে খুশি হব আমি। আপনার মতো অভ্যাগতর সান্নিধ্য আমি বা আমার বন্ধুরা পছন্দ করেন না বলেই এ-কথা বলতে বাধ্য হলাম।'

'বেশ তো।' শান্তভাবে রাজি হন তরফদার।

'অবশ্য তার আগে আপনাকে আর-একবার সার্চ করা হবে। আচ্ছা, এখন চলুন বাইরে যাওয়া যাক।' বলে চেয়ার ঠেলে উঠে পড়লেন সোমেশ রায়।

ডাইনিং সেলুন থেকে বেরোবার সময়ে লক্ষ করলাম তরফদারের কনুই ধরে আটকে রাখলেন

দেশমুখ—ভদ্রলোকের আরক্ত মুখে বিবিধ ভাবের যে-বিচিত্র খেলা দেখলাম—তার কোনওটাই বিশেষ প্রীতিপ্রদ নয়।

বড় সেলুনে ঢুকেই পড়লাম কবিতার সামনে। সামনের টেবিলেই উদগ্রীব হয়ে বসেছিল ও। আমাকে দেখেই লাফিয়ে উঠে টানতে-টানতে নিয়ে এল বাইরে।

'বলো তাড়াতাড়ি সব। তরফদারকে এক হাত নিলে তো?'

'হায়রে কপাল।' করুণ স্বরে বলি আমি।

'তার মানে?' একটু ঘাবড়ে যায় ও।

'তরফদারকে আমি এক হাত নিয়েছি ঠিকই, আর তোমার বাবাও বেশ এক হাত নিয়েছেন আমায়। গোয়েন্দা না কচু—ওঃ কবি, সব ভেস্তে গেল।' বলে আগাগোড়া সব বললাম ওকে।

শেষ হলে পর ও শুধোল, 'কিন্তু বাবা কী বললেন, তা বললে না?'

'বললেন যে, ফের যদি নতুন-নতুন টাকা আবিষ্কার করি, আমার ছাল ছাড়িয়ে নেবেন তিনি। কবি, সেসময়ে যদি তাঁর জ্বলন্ত দৃষ্টি দেখতে—না, আর আমার দ্বারা কিছু হবে না।'

'দূর পাগল। এত সহজে ভেঙে পড়া কি পুরুষের শোভা পায়?' একটুও দমে না কবিতা: 'বাবা দুর্মুখ বটে, কিন্তু ওরকম মানুষ হয় না, তা তো বিশ্বাস করো। আর কোনও সূত্র নেই তোমার হাতে?'

'আছে, খুব সামান্য তা।'

'জানতাম, আমি জানতাম,' উৎসাহে প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে ও: 'কী সূত্র শুনি?'

'খুব বেশি ভরসা নেই ওতে। তরফদারের কাছে পাওয়া টাকাটা আমার কাছেই রেখেছি। দেখলাম— ,'

সোমেশ রায় আর সোমনাথ মুখার্জি বড় সেলুন থেকে বেরিয়ে সিধে এগিয়ে এলেন আমাদের দিকে।

'কী খবর হে গোয়েন্দাজি?' শ্লেষ-তীক্ষ্ণ স্বরে শুধোন সোমনাথ মুখার্জি:

'ওরকম অবজ্ঞা দেখিও না হে সোম,' বললেন সোমেশ রায়।

'ছেলেটার ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল। রকফেলারের চেয়েও অনেক বেশি টাকা ও শুধু মাটি খুঁড়েই তুলতে পারবে।'

'আমি খুবই দুঃখিত স্যার—' করুণ কণ্ঠে বলি আমি।

'ঘাবড়াও মাত। তাহলে আমাদের এখন অবস্থাটা কী? আগের চেয়েও দেখছি পরিস্থিতি খুবই জটিল হয়ে উঠেছে।'

সোমনাথ মুখার্জি বললেন, 'আমার কথা যদি শোনো তো বলি। ক্যাপ্টেনকে তোমার কীরকম মনে হয়? তরফদারের সুটকেস তো সে-ই খুলেছিল। তখন তো ও একলাই ছিল—তাই না?'

'রাবিশ। চিরকালই এমনি ভুল করো তুমি।'

'বেশ তবে তাই। কিন্তু এঞ্জিনই বা হঠাৎ খারাপ হল কেন? ফিরেই বা যাচ্ছি কেন?'

'রাবিশ। আজ নয়, দশ বছর ধরে ক্যাপ্টেনকে আমি দেখছি।' মাথা নাড়তে-নাড়তে বলেন সোমেশ রায়: 'ওসব বাজে কথা থাক। এমন ফাঁদে জীবনে আর পড়িনি। বেশ বুঝছি, বিরাট একটা ষড়যন্ত্র চলছে আমার বিরুদ্ধে। তরফদার তো সব কিছুই অস্বীকার করতে পারত? তা না করে সবার সামনে দোষ স্বীকার করাটা আমার তো অন্তত কীরকম লাগছে।'

কবিতা বলল, 'বাবা, মৃগাঙ্ক আর-একটা সূত্র পেয়েছে।'

'আমি জানতাম তা।' উত্তর এল তৎক্ষণাৎ, 'সূত্র আবিষ্কার করতে ছেলেটার জুড়ি মেলা ভার। এরপর যদি শুনি একজনের কানের ভেতর থেকে একটা টাকা বার করেছে, মোটেই অবাক হব না আমি। অবশ্য টাকাটা যে আমার হবে না—তা নিশ্চিত।'

'আর-একবার যদি সুযোগ দেন স্যার।' কোনওমতে বলি আমি।

'না দিয়েই বা উপায় কী? তুমিই এখন অগতির গতি—আর কেউ এমন নেই যার ওপর নির্ভর করতে পারি এ বিষয়ে। যাক, এবার কী সূত্র শুনি?'

'বেলা প্রায় আড়াইটের সময়ে তরফদারের সুটকেসের তালা ভাঙা হয়েছিল—তিনটের সময় আমরা তা জানতে পারি। দশ-পনেরো মিনিটের বেশি ঘরে ছিলেন না ক্যাপ্টেন—থাকতেও পারেন না। কাজেই, ক্যাপ্টেন বেরিয়ে যাওয়ার পর আর আমার তরফদারের ঘরে ফিরে আসার মধ্যের সময়টায় যে কী ঘটেছে, তা কেউ জানে না।'

'তুমি যদি জেনে থাকো তো ভনিতা ছেড়ে বলে ফ্যালো।'

'আমার শুধু অনুমান স্যার। ১৯৪৬ সালের যে-টাকাটা আমরা তরফদারের কাছে পেয়েছি, ওটা কার কাছে ছিল, তা আমি জানি।'

'কী! জানো তুমি?'

'হ্যাঁ, জানি। আজ সকালেই বলবাহাদুরকে আমি টাকাটা দিয়েছিলাম। তরফদারের কাছ থেকে যে-এক টাকার নোটটা বকশিশ পেয়েছিল—তারই বদলে দিয়েছিলাম রুপোর টাকাটা।'

'বলবাহাদুর! শাবাশ! এসো স্মোকিংরুমে। বলবাহাদুরকে শায়েস্তা করে দিচ্ছি আমি।'

সোমেশ রায়ের পিছু-পিছু এসে বসলাম স্মোকিংরুমে। বলবাহাদুরকে তলব পাঠানো হল তৎক্ষণাৎ।

একটু পরেই বলির পাঁঠার মতো কাঁপতে-কাঁপতে ঘরে ঢুকল ও। আমার তর্জন-গর্জনেব সামনেও ওর যে-বেপরোয়া হাসি অম্লান ছিল—এখন তার চিহ্নমাত্রও না দেখে বুঝলাম মনিবকে কীরকম বাঘের মতো ভয় করে সে।

টাকাটা ওর সামনে ধবে বললাম, 'আজ সকালে তোমায় এ-টাকাটা দিয়েছিলাম আমি। তারপর কী করেছিলে এটা নিয়ে?'

একদৃষ্টে টাকাটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল ও।

তারপর বলল, 'ফেরত দিয়েছিলাম।'

'কাকে?'

'তরফদার সাবকে।'

'সত্যি বলো বাহাদুর।' কঠিন কণ্ঠে বলি আমি।

'সাচ বোলতা সাব। তরফদার সাব বললেন আমি যখন আমার কথা রাখিনি, তখন টাকাটা ফিরিয়ে দিতে হবে। কিন্তু আপনি জানেন সাব তা সত্যি নয়। কিন্তু উনি গালিগালাজ করতে টাকাটা আমি ফিরিয়ে দিই।'

ব্যস, এই হল বাহাদুরের কাহিনি। বারবার ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে জিগ্যেস করলাম অজস্র প্রশ্ন—কিন্তু পরম নিষ্ঠার সঙ্গে ওই একই কাহিনি ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে উপহার দিতে লাগল সে। শেষে বিরক্ত হয়ে সোমেশ রায় বিদায় দিলেন ওকে।

'তাহলে?' শুধোন তিনি।

জোর গলায় বললেন সোমনাথ মুখার্জি, 'ব্যাটা ডাহা মিথ্যে বলে গেল।'

বললাম, 'কিন্তু আমার তা মনে হয় না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ও সত্যি কথাই বলছে। স্যার, তরফদারের স্বীকার-পর্বটা বেশ উদ্দেশ্যমূলকভাবেই অভিনীত হয়েছে।'

'কী উদ্দেশ্য শুনি?'

'তা আমিও সঠিক বলতে পারি না। শুধু বলতে পারি, টাকাটা এখনও ভদ্রলোকের কাছেই আছে।'

'কিন্তু ঠিক কোনখানটায় তা বলো?'

'সেইটাই তো জানতে হবে স্যার।' চকিতে আবার তৎপর হয়ে উঠি আমি ঃ 'কবিতা, তুমি চট করে গিয়ে তরফদারকে ভুলিয়ে সেলুনে এনে ব্রিজ খেলায় আটকে দাও। ওর ঘরটা তল্লাশ করতে হবে।'

'ঠিক বলেছ।' সোৎসাহে বলেন সোমেশ রায়। পরমুহূর্তেই কপাল কুঁচকে ওঠে ওঁর ঃ 'ঠিক অবশ্য তুমি আগাগোড়াই বলছ—কিন্তু প্রতিবারই ফলাফল দাঁড়াচ্ছে বিপরীত। আশা করি, এবার আসল টাকাটা বার করতে পারবে, কী বলো?'

'নিশ্চয়।' বলি বটে, কিন্তু ভেতরে-ভেতরে দমে যাই বেশ। সত্যিই তো, প্রতিবারই আশা দিয়ে নিরাশ করেছি ওঁকে। নাঃ, এবার আমায় সফল হতেই হবে। যেভাবেই হোক, যে-পথেই হোক।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও তরফদারকে তাসের টেবিলে বসতে দেখে আমি দৌড়লাম নীচে। কোনওরকম ইতস্তত না করে আলো জ্বেলে দিলাম তরফদারের কেবিনে—তারপর শুরু হল তল্লাশি-পর্ব। তন্ন-তন্ন করে খুঁজলাম। কার্পেটের তলায়, আলমারির কোণে, ব্র্যাকেটের পেছনে, জুতোর সুকতলার নীচে—কোথাও বাকি রাখলাম না। কিন্তু সবই বৃথা। রুপোব টাকার চিহ্ন দেখলাম না কোথাও। বাক্সর ঠিক নীচে এক টুকরো কুণ্ডলি পাকানো চ্যাপ্টা তার ছাড়া উল্লেখ্য আর কিছুই চোখে পড়ল না। নিতান্ত অদরকারি মনে হলেও নোটবুকে রেখে দিলাম তারটা।

হতাশ হয়ে আলোটা নিভিয়ে নিযে বাথরুমের মধ্যে দিয়ে এগোলাম নিজের ঘরের দিকে। এক-পা তরফদারের কেবিনে, আর এক-পা বাথরুমে সবে রেখেছি, এমন সময়ে কেবিনের দরজা গেল খুলে।

'কী খবব?' খুব মৃদু-মৃদু স্বরে বললেন একজন। দেশমুখ।

সরে পড়লাম। বাথরুম থেকে আমাব ঘরে আসার দবজাব চাবিটা নিঃশব্দে ঘুরিয়ে খুলে নিজেব ঘরে এসে আবার চাবি ঘুরিয়ে দিলাম আস্তে আস্তে। তারপর দরজাব নবের ওপব একটা হাত বেখে অন্ধকারের মধ্যে কান খাড়া কবে দাঁড়িয়ে বইলাম কিছুক্ষণ।

একটু পরেই অস্পষ্ট শব্দ শুনলাম বাথরুমে—তাবপবেই হাতের মুঠির মধ্যে খুব আস্তে-আস্তে ঘুরতে লাগল নবটা। মুঠি আলগা করে দিলাম আমি। ছোট্ট একটা ঝাঁকানি—দরজা বন্ধ। আবার পায়ের শব্দ পিছিয়ে গেল ওপাশের ঘরে।

সাহস করে এবার চাবি ঘুরিয়ে সামান্য ফাঁক করলাম দরজাটা—উঁকি মারলাম ওদিকে। তরফদারের কেবিনে মাঝে-মাঝে টর্চের আলোর ঝিলিক ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ল না।

বেশ কিছুক্ষণ ধরে খুঁজলেন দেশমুখ। তারপরেই হঠাৎ আলো নিভে অন্ধকার হয়ে গেল ঘর। দ্বিতীয় ব্যক্তি ঘরে এসেছে নিশ্চয়। কিন্তু কে? পরক্ষণেই দেশমুখের স্বর শুনেই বুঝলাম কে।

'মিসেস প্যাটেল!' মৃদু খসখসে স্বরে শুধোলেন উনি।

'মিস্টার দেশমুখ!' নারীকণ্ঠে উত্তর এল।

'বলুন কী করতে পারি আপনার জন্যে?' শ্লেষ-বঙ্কিম সুরে শুধোন দেশমুখ।

'এ-কেবিন আপনার?' একইরকম শ্লেষ-তীক্ষ্ণ সুরে শুধোন মিসেস প্যাটেল।

'না।'

'তাহলে কী করছেন এখানে?'

'আপনি যা করতে এসেছেন—তাই। টাকাটার সন্ধানে।'

'কিন্তু মিস্টার দেশমুখ—।'

'আস্তে। সব জানি আমি। শুনুন মিসেস প্যাটেল, আমাদের দুজনেরই স্বার্থ যখন এক তখন আসুন একসঙ্গেই কাজ শুরু করা যাক।'

'বুঝলাম না কী বলছেন।'

'বুঝছেন ঠিকই। আপনি টাকাটা খুঁজছেন চুনীলাল দয়াভাইয়ের জন্যে। কিন্তু আমি খুঁজছি

দেশের জন্য। আপনার উদ্দেশ্য অর্থলাভ—আমার উদ্দেশ্য সমাজসেবা। আগামী অ্যাসেম্বলির ইলেকশান থেকে যেভাবেই হোক সোমেশ রায়কে দূরে রাখাই আমার প্রধান উদ্দেশ্য। তাই পরের বুধবার সন্ধ্যা ছ'টা পর্যন্ত টাকাটা আমার কাছে রাখুন—তারপর নিয়ে গিয়ে যাকে খুশি দিন কোনও আপত্তি নেই।'

'কিন্তু মিস্টার দেশমুখ, টাকাটা তো আমি পাইনি।'

'তা জানি। যদি পাই টাকাটা—তাহলে এই চুক্তিই থাকবে আমাদের মধ্যে। রাজি?'

'রাজি। কিন্তু ওটা আছে কোথায় বলুন তো?'

'এ-ঘরে থাকাই স্বাভাবিক। বড় ধড়িবাজ এই তরফদার লোকটা। বোধ হয় শুনেছেন। ওর সঙ্গে আমার পাকাপাকি কথা হয়ে গেছিল এ সম্পর্কে। গত রাতে জলপরীর ডক থেকে সমুদ্রের জলে একটা শার্ট ছুড়ে ফেলার সময়ে ওকে ধরে ফেলি আমি। তখনই জেরার মুখে ও স্বীকার করে যে, লাকি পিসটা ওর কাছেই আছে। ঠিক হয়, পোর্ট ভিক্টোরিযাতে সে নগদ দু-হাজার টাকার বিনিময়ে আমার হাতে তুলে দেবে টাকাটা।'

নারীকণ্ঠ বলেন, 'আমি ভাবছিলাম, আমিও একটা দর দেব ওকে। ভারি ধূর্ত লোক তো—সবকিছুই সম্ভব ওর পক্ষে।'

'দেননি, ভালোই করেছেন। আজ সকালে সোমেশ রায় আব সোমনাথ মুখার্জি যখন ছ'হাজাব টাকার পুরস্কার ঘোষণা করলেন, তখনই হতভাগা অন্য সুব গাইতে শুরু করে। জাহাজ থেকে নামামাত্র আইনের প্যাঁচে ফেলে জেলে পোরাব ভয় না দেখালে ও তো সকালেই ফিবিয়ে দিয়ে আসত টাকাটা। আমি যা বলি, তা করি। সেটা জানে বলেই চুপ কবে যায় তখনকার মতো।'

'ডিনার টেবিলে অত স্বীকারোক্তি তাহলে সবই অভিনয?'

'বলা বাহুল্য। ওর চোখ দেখেই বুঝেছিলাম আমি। রিপোর্টার ছোকরাটাও লেগেছে ওর পেছনে। তাই টাকাটা অন্য কেউ সরিয়েছে, এইরকম একটা ধোঁকা দিয়ে ও নেমে যেতে চায পোর্টে। তারপব অন্য কারও হাতে ওটা সোমেশ রাযকে ফিরিয়ে দিযে ছ'হাজাব টাকা বোজগাব কবতে কতক্ষণই বা আর লাগে। কিন্তু আমাব দেহে এক বিন্দু রক্ত থাকতে আমি তা হতে দেব না। আসুন, খোঁজা যাক।'

'এ-দরজাটা দিয়ে কোথায যাওয়া যায় জানেন নাকি?' শুধোন নাবীকণ্ঠ।

'বাথরুমে। তার ওপাশে একটা কেবিন আছে—কিন্তু দরজায় চাবি দেওয়া।'

শুনে আর দেরি করলাম না। আশা মিটিয়ে আমায ঘরটাও তল্লাশ করার সুযোগ দিয়ে চলে এলাম ওপরের ডেকে।

ব্রিজের আসর তখন সবে ভাঙছে। পিসিমা ছাড়া আব কারও উৎসাহ নেই খেলায়। কবিতাকে ডেকে নিয়ে এলাম ঘরেব এক কোণে। কিন্তু কিছু বলার আগেই স্বয়ং সোমেশ রায় এগিয়ে এলেন আমাদের মাঝে।

'কী হল?' শুধোন উনি।

তরফদারের কেবিনে এইমাত্র যা শুনে এলাম, সব বললাম ওঁকে। শুনে রাগে লাল হয়ে উঠল ওঁর মুখ।

'চমৎকার! দেশমুখ আর ওই স্ত্রীলোকটাও কিনা—। জানতাম, এ-জাহাজে কাউকেই বিশ্বাস করা চলে না। ঠিক আছে, কাল সকালেই তরফদারের সঙ্গে ওরাও নেমে যাবে মালপত্র নিয়ে। কিন্তু তার আগে তিনজনকেই নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সার্চ না করে ছাড়ছি না আমি।'

'বাবা।'

'যা বললাম, তা করবই। ভালো কথা মৃগাঙ্ক, অবস্থা কীরকম বুঝছ এখন? তরফদার যদি টাকাটা রেখেই থাকে, কোথায় রেখেছে বলে মনে হয়?'

'আমি—।'

'আর-একটা সূত্র পেয়েছ, কেমন?'

'একটাও না।' বিষণ্ণভাবে বলি।

'একটাও না?' দাঁড়িয়ে উঠলেন সোমেশ রায়ঃ 'তাহলে আর কী—বেশ বুঝছি, ইহজীবনে আর ও-টাকার মুখ দেখতে পাব না আমি। তোমার সূত্র ফুরিয়ে যাওয়া মানেই আমার দফারফা হওয়া। রিপোর্টার হিসেবে তোমার জুড়ি না থাকতে পারে, কিন্তু বাবা ডিটেকটিভ হিসেবে—যাকগে, কী দরকার এসব কথা বলে। শুতে চললাম আমি।'

ওঁর পিছু-পিছু আমরাও বাইরের ডেকে এলাম। ওপাশের ছায়া-ছায়া একটা কোণে এসে দাঁড়ালাম দুজনে।

কারও মুখে কথা নেই। অনেকক্ষণ পর ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কবিতা বলল, 'তাহলে সত্যিই আমাদের আর কোনও আশা নেই, মৃগ?'

'খুব সামান্য একটা সূত্র আমি পেয়েছি, কবি। কিন্তু তা এতই তুচ্ছ যে, ওঁকে বলার সাহস হল না আমার। তরফদারের কেবিনে ছোট্ট একটা তারের কয়েল কুড়িয়ে পেলাম।'

'তাতে লাভ?'

'তা তো জানি না। কিন্তু তবুও ওই নিয়েই আজ সারা রাত আমি ভাবব। কোনওদিন এভাবে আর চিন্তা করিনি, করবও না। তোমাকে আমি কিছুতেই হারাতে পারব না কবি, কিছুতেই না, কিছুতেই না।'

'আমি তো তোমার মতো অমন করে বলতে পারি না, কিন্তু আমার মনের কথা তো তুমিও জানো, মৃগ।' সজল চোখে বলে ও।

সে-রাতে শোওয়ার আগে প্রতিজ্ঞা করলাম, ভোর হয় হোক, তবুও সূত্রের অর্থ না বার করে ঘুমোচ্ছি না। একে-একে তরফদারের ছোটখাটো মালপত্রগুলো চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল—আর মানসচোখে চুলচেরা দৃষ্টি নিয়ে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখতে লাগলাম তাদের। তারপর, নিজের অজান্তেই কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

প্রত্যেক মানুষের এমন একটা অবচেতন সত্তা আছে, যে কখনও ঘুমোয় না। বরং মানুষটার নিদ্রার সুযোগ নিয়ে সজ্ঞান মনের কঠিন সমস্যাগুলোর সমাধানে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এই কারণেই বোধহয় পরদিন সকালে যে-আনন্দ নিয়ে শয্যা ত্যাগ করলাম, সে-আনন্দ বোধ করি কলম্বাসও আমেরিকা আবিষ্কার করে পায়নি। দেরি হয়ে গেছিল খুবই। পোর্টহোল দিয়ে তাকিয়ে দেখি, দূরে পোর্ট ভিক্টোরিয়ার জেটি দেখা যাচ্ছে। জলপরী তাহলে নোঙর ফেলেছে।

বাথরুমের দরজায় চাবি ছিল না—তরফদারের ঘরের দরজাও দেখি দু-হাট করে খোলা। ঘর শূন্য—রাশি-রাশি মালপত্রের একটিও নেই।

ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি ঘণ্টা বাজিয়ে ডাকলাম বলবাহাদুরকে। শুনলাম, এখনও কেউ তীরে নামেনি।

'চট করে বড় সাহেবকে গিয়ে বলো—আমি না বলা পর্যন্ত কেউ যেন জলপরী ছেড়ে না যায়।' বলে তাড়াতাড়ি পোশাক পালটাতে শুরু করি আমি।

শার্টটার বোতাম আঁটছি—ঘরে ঢুকলেন সোমেশ রায়।

শুধোলাম, 'নতুন কোনও খবর আছে?'

'কিস্‌সু না।' বলে মুখ অন্ধকার করে বার্থে বসে পড়লেন উনি। ম্লান মুখ দেখে খুশিই হলাম—নাটকের ক্লাইম্যাক্সটা ভালোই জমবে দেখছি।

'সেকেন্ড অফিসার তরফদারের ঘর সার্চ করেছে সকালে—পোশাক পরার সময়েও তন্নতন্ন করে দেখেছে সবকিছু। মালপত্রগুলোও আবার পরীক্ষা করা হয়েছে। কিন্তু সবই বৃথা। টাকাটা হয় ওর কাছেই নেই, আর থাকলেও নির্ঘাত গিলে ফেলেছে ও।'

'ভদ্রলোক এখন কোথায়?'

'ডেকে, তীরে যাওয়ার অপেক্ষায় বসে। লঞ্চ তৈরি। দেশমুখ আর মিসেস প্যাটেলও যাচ্ছেন।'

'ওঁদেরও সার্চ করেছেন নাকি?'

'না। সবকিছুর একটা সীমা আছে। তা ছাড়া, ওঁরাও যে আমার মতোই অন্ধকারে, তা বিশ্বাস করি আমি। সকালে এসে ওঁরা বললেন যে, এখানেই নেমে যেতে চান দুজনে। তৎক্ষণাৎ রাজি হলাম আমি। আর ঝামেলা বাড়িয়ে কী লাভ বলো।'

'তা ঠিক।' সায় দিই আমি।

'কিন্তু তুমিই তো একটু আগে বলে পাঠালে যে, তুমি না আসা পর্যন্ত কেউ যেন জাহাজ ছেড়ে না যায়, তাই না?'

'হ্যাঁ স্যার, আমিই।' হাসিমুখে বলি আমি।

'তুমি—তুমি নতুন কোনও সূত্র পেয়েছ বুঝি?'

'মনে হচ্ছে।'

'শাবাশ। না, না, আবার বেশি আশা আমি করব না। নিরাশ হওয়ার আঘাত এবার আর সহ্য করতে পারব না আমি।'

'সামান্য একটু আলো দেখতে পেয়েছি, স্যার। তাই বেশি আশা না করাই ভালো।'

ঘর থেকে বেরোতে-বেরোতে সোমেশ রায় বললেন, 'সামান্যই হোক, আর অসামান্যই হোক, হাল ছেড়ো না কিছুতেই। আবার বলছি বাবা, টাকাটা যদি উদ্ধার করতে পারো—তোমার কোনও খেদ আমি রাখব না।'

'মনে থাকে যেন।' স্বগতোক্তি করি আমি।

ডেকে ওঠার সিঁড়িতেই দেখা হয়ে গেল কবিতার সঙ্গে। দু-চোখে ওর উদ্বেগের ছবি দেখে আশ্বাসের ভঙ্গিতে হাসলাম একটু। তারপর সবাই মিলে এগিয়ে গেলাম ডেকের মাঝখানে। সেখানে স্তূপীকৃত মালপত্রের মাঝে বসেছিলেন তরফদার, দেশমুখ আর মিসেস প্যাটেল।

সোমেশ রায় বললেন, 'বাধ্য হয়ে আজ এঁদের সঙ্গ আমায় হারাতে হচ্ছে।'

বললাম, 'ডক্টর তরফদারের সঙ্গে বিচ্ছেদের জন্যে নিজেকে আগে থেকেই শক্ত করে রেখেছিলাম। কিন্তু এঁরা—।'

কটমট করে দেশমুখ তাকালেন আমার দিকে। খবর পেয়ে সোমনাথ মুখার্জিও উদ্বিগ্ন মুখে উঠে এলেন ডেকে।

অল্প হেসে বললাম, 'চিরকালের মতো ছাড়াছাড়ি হওয়ার আগে ডক্টর তরফদারকে আমি শুধু একটা প্রশ্ন করতে চাই, স্যার।'

'নিশ্চয়। করে ফ্যালো।'

'ডক্টর তরফদার।' উঠে দাঁড়ালেন ভদ্রলোক।

মুখোমুখি দাঁড়িয়ে শুধোলাম আমি, 'ডক্টর তরফদার, ক'টা বাজে এখন?'

ধীরে-ধীরে সঙ্কীর্ণ হয়ে আসে তরফদারের দু-চোখ।

'বুঝলাম না।'

'আপনার ঘড়িতে এখন ক'টা বাজে, তাই জিগ্যেস করছি। অনেকবার ঘড়িটার সময় দেখতে দেখেছি আপনাকে। তাই শুধোচ্ছি, কী সময় এখন?'

খুব সহজভাবে জবাব দিলেন তরফদার, 'ঠাকুরদার আমলের ঘড়ি তো, মাঝে-মাঝে বড়

বেয়াড়া টাইম দিতে থাকে। কাল থেকে দেখছি একেবারেই বন্ধ হয়ে গেছে ঘড়িটা।'

'বন্ধ হয়ে গেছে? খুব খারাপ, খুব খারাপ।' বলে হাত বাড়িয়ে দিলাম আমি ঃ 'দিন আমায়—চালু করে দিচ্ছি আমি।'

চকিতে তরফদারের দু-চোখ ঘুরল ডাইনে আর বাঁয়ে—যেন জলপরী আর পোর্ট ভিক্টোরিয়ার জেটির মধ্যে ব্যবধানটুকু মেপে নিলেন মনে-মনে।

বললাম, 'কই দিন! পালাবার কোনও পথই নেই—বার করুন।'

'নিন না।' বলে পকেট থেকে বড় আকারের সেকেলে একটা পকেট-ঘড়ি বার করেন উনি। চেন থেকে খুলে বেশ হাসিমুখে আমার হাতে তুলে দিলেন ঘড়িটা—দেখে আবার দমে যাই আমি। সবই কি শেষে ভুল হল?

শক্ত আঙুলে ঘড়িটা চেপে ধরে দুরুদুরু বুকে পেছনের ডালাটা খুলে ফেললাম। ভেতরটা পাতলা কাগজ দিয়ে ঠাসা। টেনে তুলে ফেললাম কাগজটা।

আর দেখলাম, ঠিক নীচেই রয়েছে একটা রুপোর টাকা।

হাসিমুখে টাকাটা তুলে দিলাম সোমেশ রায়ের হাতে ঃ 'আশা করি, এবার ভুল হয়নি আমার।'

'শাবাশ। শাবাশ।' উল্লাসে চিৎকার করে ওঠে সোমেশ রায় ঃ 'এই আমার লাকি পিস। আমার জীবনের প্রথম উপার্জন। এই তো খুদে-খুদে সাঙ্কেতিক চিহ্নগুলো। শাবাশ মৃগাঙ্ক, শাবাশ।'

কবিতার দিকে তাকালাম ঃ খুশির আভায় চিকমিক করছে ওর দু-চোখ। ডালা বন্ধ করে ঘড়িটা ফেরত দিলাম তরফদারকে।

বললাম, 'কাজ শেষ করার পর মেন স্প্রিংটাকে উপেক্ষা করা মোটেই উচিত হয়নি আপনার। জানেন তো, বড় কাজের জিনিস এই মেন স্প্রিং। তাই না?'

'তাই বটে।' তখনও মৃদু হাসতে থাকেন তরফদার। বেপরোয়া ভঙ্গিমায় ঘড়িটা আমার হাত থেকে নিয়ে পকেটে রাখেন উনি। বলেন, 'মিস্টার রায়, এবার তাহলে যেতে পারি আমি? তবে দোহাই আপনার, চোর বদনামটা যাওয়ার আগে দেবেন না। আদতে কিছুই চুরি হয়নি আপনার।'

'কে বললে হয়নি?'

রাগে টকটকে লাল হয়ে উঠেছিল দেশমুখের মুখ। সবেগে দাঁড়িয়ে উঠে বললেন তিনি, 'মিস্টার রায়, এ-জোচ্চোরটাকে আমার হাতে ছেড়ে দিন। ওকে জেলে পাঠাবার সব বন্দোবস্ত আমি করেছি।'

মাথা নাড়তে-নাড়তে বললেন সোমেশ রায়, 'ন্যায়ের প্রতি আপনার এই নিষ্ঠা সত্যিই প্রশংসনীয়। কিন্তু আমার ইচ্ছে তা নয়। মিস্টার তরফদার, আমার অভিনন্দন জানবেন। ছেলেবেলায় লুকোচুরি খেলায় নিশ্চয় খুব পাকা খেলোয়াড় ছিলেন আপনি। যাক, আপনি এখন স্বচ্ছন্দে আসতে পারেন।'

'অনেক ধন্যবাদ সেজন্যে,' হাসি মুখে বলেন তরফদার ঃ 'সমুদ্রের ওপর ভালোই কাটল ক'দিন—সেজন্যেও রইল ধন্যবাদ।' দেশমুখের রক্তচক্ষুর ওপর চোখ পড়তেই ভদ্রলোকের মুখের হাসি মিলিয়ে গেল তৎক্ষণাৎ ঃ 'আপনার কাছে একটু অনুগ্রহ আশা করতে পারি কি মিস্টার রায়?'

'হুম। একটুও বিচলিত হননি দেখছি। বলুন কী চাই?'

'প্রথমে শুধু আমাকে পাঠিয়ে দিন তীরে—তারপর লঞ্চ ফিরে এলে এঁরা যাবেন'খন।'

বেশ খুশি-খুশি মন তখন সোমেশ রায়ের। তরফদারের বিচিত্র অনুরোধ শুনে হেসে ফেললেন তিনি।

'নিশ্চয়, নিশ্চয়, তাই হবে। অনেকগুলি রত্ন একসঙ্গে রাখা যেমন সমীচীন নয়—তেমনি আপনাদের তিনজনকেই একসঙ্গে লঞ্চে চাপানো বুদ্ধিমানের কাজ নয়। উঠে পড়ুন আপনি। আর আপনি মিস্টার দেশমুখ—' এগিয়ে গিয়ে রাজনীতিবিদ ভদ্রলোকের পথরোধ করে দাঁড়ান উনি ঃ 'যেখানে আছেন, ওইখানেই থাকুন।'

মালপত্রগুলো একজন নেপালিকে দেখিয়ে দিয়ে চটপট সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেলেন তরফদার। ফটফট শব্দে জলের ওপর মস্ত একটা অর্ধবৃত্ত কেটে জেটির দিকে এগিয়ে গেল লঞ্চটা। রেলিংয়ের ধারে গিয়ে শূন্যে মুঠি তুলে চিৎকার করে উঠলেন দেশমুখ, 'তোমায় দেখে নেব আমি জোচ্চোর কোথাকার।'

প্রত্যুত্তরে লঞ্চের এক কোণে দাঁড়িয়ে রুমাল উড়িয়ে হাসিমুখে বিদায় অভিনন্দন জানালেন তরফদার। অজানা অচেনা পথে ভাগ্যের অন্বেষণে আবার নতুন করে শুরু হল তাঁর পথ চলা।

মিসেস প্যাটেলের কণ্ঠস্বরে চমক ভাঙল। 'মিস্টার রায়, জানেন তো মত পরিবর্তন করা মেয়েদের স্বভাব। তাই ভাবছি, আপনার সঙ্গেই থেকে যাই। একসঙ্গে তাহলে বম্বে ফেরা যাবে।'

'আজ্ঞে না।' বিদ্রুপকঠিন স্বরে উত্তর দেন সোমেশ রায়ঃ 'এত কষ্টে পাওয়া টাকা আর-একবার হাতছাড়া করার কোনও ইচ্ছে আমার নেই।'

'তার মানে?' নিরুৎসাহভাবে তাকান প্যাটেল-গৃহিণী।

'আপনার আর মিস্টার দেশমুখের সঙ্গ বিষের মতোই অসহ্য মনে হচ্ছে—বলতে বাধ্য হলাম, কিছু মনে করবেন না। আপনার বন্ধু চুনীলাল দয়াভাইকে বলবেন সিলোন ব্রিজ কনট্রাক্ট আমি নেবই—ক্ষমতা থাকে তো ছিনিয়ে নিক আমার হাত থেকে। আর মিস্টার দেশমুখ—শুনে রাখুন, সামনের হপ্তাতেই অ্যাসেম্বলির ইলেকশানে নামার সব ব্যবস্থা আমি সম্পূর্ণ করছি। আপনার বর্তমান অবস্থাটা জেনে খুবই খুশি হলাম।'

'এসবের মানে কী?' রাগত স্বরে শুধোন দেশমুখ।

'আপনি ভালো করেই তা জানেন। শহরে সামান্য কাজ আছে সেকেন্ড অফিসারের—ঘণ্টাখানেকের মধ্যে লঞ্চ নিয়ে ফিরে আসবে ও। এলেই মিসেস প্যাটেলের সঙ্গে জলপরী ছেড়ে চলে যাবেন আপনি।'

বলে হাসিমুখে আমার দিকে ফিরলেন তিনি। দু-চোখে তাঁর অনাবিল আনন্দের প্রতিচ্ছবি। আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'ডিটেকটিভ-কাম-রিপোর্টার, শ্রীমৃগাঙ্ক রায়। কী বলো? এসো বাবা, সেলুনে এসো। তোমার-আমার মধ্যে ব্যাবসার সম্পর্কটা এবার চুকিয়ে ফেলা যাক। ভালো কথা সোম, চেকবইটা কাছে আছে তো?'

'আছে।' বললেন সোমনাথ মুখার্জি।

সোমেশ রায়ের পিছু-পিছু সবাই এসে ঢুকলাম বড় সেলুনে। কবিতাও এল সঙ্গে।

'সোম, তোমার দু-হাজার।' স্মরণ করিয়ে দেন সোমেশ রায়।

'জানি,' অনিচ্ছার সঙ্গে টেবিলে বসে লেখার উদ্যোগ করেন সোমনাথ মুখার্জি।

'এক মিনিট, স্যার।' বাধা দিয়ে বলি আমিঃ 'আপনার কাছে কোনও টাকা আমি চাই না।'

'তবে কী চাও?' শুধোল সোমনাথ মুখার্জি।

'ভালো একটা কাজ।'

'ও তার উপযুক্তও বটে।' প্রশংসিকা দিয়ে দেন সোমেশ রায়।

অনিচ্ছার ভাবটা একটু-একটু করে ফিকে হয়ে আসছিল মিঃ মুখার্জির মুখের রেখায়। বললেন, 'কিন্তু অফিসের ব্যাপারে নাকগলানো মোটেই পছন্দ করি না আমি।' বললেন বটে, কিন্তু মুখের ভাব দেখে মনে হল, নগদ দু-হাজারের বিচ্ছেদ-বেদনাও বড় কম নয় তাঁর কাছে।

বললাম, 'গত হপ্তায় সানডে ম্যাগাজিনের সম্পাদক চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন। আপনার মুখের একটা কথা পেলেই প্রমোশনটা হয়ে যায় আমার। মাসে তাহলে সাড়ে চারশোর মতো পাওয়া যাবে বলে মনে হয়।'

উঠে দাঁড়ালেন সোমনাথ মুখার্জিঃ 'আমি কথা দিলাম।' বলে সস্নেহে চেকবইটাও পকেটে রেখে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন সোমেশ রায় ঃ 'কাজের মতো একটা কাজ করলে বাবা। ভালো কাজ মানে ভবিষ্যতের পথ সোনা দিয়ে বাঁধানো। নগদ টাকার চাইতে অনেক ভালো।'

'আমিও তা বিশ্বাস করি স্যার,' মৃদু হেসে বলি আমি ঃ 'তা ছাড়া, আমি আবার বিয়ে করার কথা চিন্তা করছি।'

দাঁড়িয়ে উঠে সজোরে আমার কাঁধ চাপড়ে দিলেন সোমেশ রায়।

'চমৎকার! চমৎকার! এই তো চাই। আগে থেকেই তোমাদের কল্যাণ কামনা করে আশীর্বাদ করে রাখছি আমি।'

'তাহলে আপনার মত আছে?'

'একশোবার। বিয়ে মানেই ছন্নছাড়া তরুণের জীবন ঘড়ির কাঁটার মতো যথানিয়মে চলা। এর চেয়ে ভালো কাজ আর আছে? জীবনে বড় হওয়ার প্রেরণা, শক্তি আর সাহস—এসব কিছুব উৎসই তো স্ত্রী।'

'আমারও সেই বিশ্বাস, স্যার।' আন্তরিকভাবেই বলি আমি।

'অসংযম থেকে সংযম, যাযাবরের জীবন থেকে সংসার-জীবনের শ্রী, অন্যায় প্রলোভন থেকে ন্যায়েব প্রতি নিষ্ঠা—এসবই সম্ভব শুধু বিয়ের ফলেই।' বক্তৃতা শেষ করে আবার টেবিলের সামনে বসে পড়েন তিনি ঃ 'আর এই বিয়ের প্রথম যৌতুক হবে আমার ছোট্ট চেকটা।' একটু থেমে ঃ 'মেয়ে আশা করি ভালোই? রূপে-গুণে তোমার উপযুক্ত তো?'

'বরং আমিই তার উপযুক্ত নই।'

টেবিল চাপড়ে প্রাণ খুলে হেসে উঠলেন সোমেশ রায় ঃ 'বেশ কথা বলেছ বাবা, বেশ বলেছ। তবে কী জানো, আজকালকার এই মেয়েগুলোকে মোটেই পছন্দ হয় না আমার। অত্যন্ত অপব্যয়ী। সামান্য একটা টাকার মূল্য যে কতখানি, তা তো জানেই না, উপবন্তু—।'

'কিন্তু এ-মেয়েটি জানে। অন্তত জানা তো উচিত।'

'কে সে?'

'কবিতা।'

'এ কী!' লাফিয়ে ওঠেন সোমেশ রায়।

'চেকবইটা পকেটে রাখুন স্যাব। আমি যা চাই, তা আপনার টাকা নয়।'

টেবিলেব ওপব পেনটাকে সজোবে আছড়ে ফেললেন সোমেশ রায়।

'আমি—আমি কল্পনাই করতে পারিনি। কবিতা, এসবেব মানে কী?'

পাশে গিয়ে বাবার গলা জড়িয়ে ধরে কবিতা।

'বাবা, ছেলেবেলা থেকেই আমি যা চেয়েছি, তাই দিয়েছ তুমি। মৃগাঙ্ককে নিয়ে তুমি আব উত্তেজিত হয়ো না। আমার কথা রাখো।'

'কিন্তু—এ কী করে সম্ভব—ছেলেটির—ওর যে কিছুই নেই।'

'তুমি যখন বিয়ে করেছিলে, তোমার কী ছিল বাবা?' শুধোয় ও।

'ছিল আমার মস্তিষ্ক আর শক্ত দুটো হাত।'

'মৃগাঙ্করও তা আছে।'

সোমেশ রায় মুখ ফেরালেন আমার দিকে। একটু পরে আস্তে-আস্তে চেয়ারে বসে পড়ে বললেন, 'তোমাকে আমার ভালোই লাগে মৃগাঙ্ক। আর তাই তোমায় দুঃখ দেব না আমি। কিন্তু—কিন্তু তুমি কি পারবে? ঐশ্বর্যের মধ্যে মানুষ হয়েছে কবিতা। ওর জীবনযাত্রার মান অনেক উঁচু। তুমি কি পারবে সামলাতে?'

'আপনার আশীর্বাদ পেলে নিশ্চয় পারব!' বলি আমি।

সস্নেহে মেয়ের চিবুকটি নেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন সোমেশ রায়।

বললেন, 'একটু সময় দাও ভাববার। আচমকা কিছু করা উচিত নয়। কী বলো?'

বললাম, 'নিশ্চয়। ইতিমধ্যে—।'

'ইতিমধ্যে।' দরজার কাছে গিয়ে থমকে দাঁড়ালেন উনি। বেশ কিছুক্ষণ গভীর দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইলেন আমার পানে। তারপর বললেন, 'ইতিমধ্যে যে-অবস্থায় তুমি পৌঁছেছ, সেখান থেকে লাখ টাকা পেলেও রাজি হব না তোমায় টেনে আনতে।' বলে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

কবিতা বলল, 'দেখলে? আমার বাবা কত ভালো, দেখলে? এরকম মানুষকে ভালো না বেসে কেউ থাকতে পারে?'

'তোমাদের বংশের প্রত্যেকেই ওইরকম কবি। অনেকদিন ধরেই তা লক্ষ করে আসছি।'

'কিন্তু চিরকাল কি এমনি সুন্দর থাকবে তোমার ভালোবাসা? পুরুষের মন—।'

'তোমাদের মতো নয়। মানে—তোমাদের মতো অত সুন্দর নয়। জীবনের অত্যন্ত সঙ্কটময মুহূর্তে তোমার সাহায্য, তোমার প্রেরণা, তোমার প্রেম কোনওদিনই আমি ভুলতে পারব না। তুমিই আমার জীবনের প্রথম স্বোপার্জিত স্ত্রী।'

'মৃগ! সাবধান—কেউ এসে পড়তে পারে এদিকে।'

ভায়া ইন্দ্রনাথ, তাই বলছিলাম, এ শুধু আমার রহস্যভেদ নয়, অর্জুনেব মতো লক্ষ্যভেদ এবং বধূলাভ।

বম্বেতে ফিরেই লিখলাম এই চিঠি। পরের খবর পবের চিঠিতেই পাবে। অতএব, ধৈর্য ধরো!

ইতি—
তোমাব প্রিযতম
মৃগাঙ্ক বায়

চিঠিটা নামিয়ে রেখে চোখ তোলে ইন্দ্রনাথ। ওর টানা-টানা বিষাদ-মাখা দুই চোখে টলমল করে ওঠে আনন্দ-অশ্রু গোধূলির বিষণ্ণ আভায়।

তির্যক রেখা



সুখময় মুখোপাধ্যায়

লেখকের নিবেদন

এই বইয়ের কয়েকটি বিষয় সম্বন্ধে আমার কিছু বলার আছে।

প্রথমত, এর প্রথম খণ্ডের প্রথম চারটি পরিচ্ছেদে যথাক্রমে ব্যোমকেশ বক্সী, হুকা-কাশি, জয়ন্ত ও পরাশর বর্মা তাঁদের পাত্রমিত্রবর্গসমেত দেখা দিয়েছেন। বলা বাহুল্য এই চরিত্রগুলি আমার সৃষ্টি নয়। ব্যোমকেশের স্রষ্টা শ্রীযুক্ত ঁশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, হুকা-কাশির স্রষ্টা ঁমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য (অধ্যাপক), জয়ন্তের স্রষ্টা ঁহেমেন্দ্রকুমার রায় এবং পরাশর বর্মার স্রষ্টা শ্রীযুক্ত ঁপ্রেমেন্দ্র মিত্র। নিছক বৈচিত্র্যসৃষ্টির জন্যই বাংলা সাহিত্যের এই সব শ্রেষ্ঠ ডিটেকটিভদের আমি এ-বইয়ে একত্র সমবেত করেছি। আমার মতে, বাংলা ভাষায় মুষ্টিমেয় যে ক'টি সার্থক ডিটেকটিভ কাহিনি এ পর্যন্ত লেখা হয়েছে, তা পূর্বোক্ত চারজন লেখকের হাত দিয়েই বেরিয়েছে। এঁদের মধ্যে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায় ও প্রেমেন্দ্র মিত্র পরিচয়ের অপেক্ষা রাখেন না। কিন্তু মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের নাম এখনকার তরুণ পাঠকদের কাছে তেমন পরিচিত নয়। তার কারণ, তাঁর বইগুলি এতকাল ছাপা ছিল না। কয়েক মাস হল তাঁর 'সোনার হরিণ'-এর নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে, অন্যান্য বইগুলির নতুন সংস্করণও শীঘ্রই প্রকাশিত হবে বলে আশা করা যায়। ওই বইগুলি পড়লে সকলেই বুঝতে পারবেন মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য ডিটেকটিভ কাহিনি রচনায় কী অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দিয়ে গিয়েছেন।

আমার দ্বিতীয় নিবেদন এই যে, এই বইখানি সম্পূর্ণ মৌলিক; কোনও বিখ্যাত বা অখ্যাত বিদেশি কাহিনির ছায়া এর ওপর পড়েনি।

বন্ধুবর শ্রীযুক্ত তুলসী দাস ও প্রকাশক শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র সেনের যত্ন ও আগ্রহের ফলেই এই বইটি প্রকাশিত হল। এঁদের সঙ্গে আমার যে সুনিবিড় প্রীতির সম্বন্ধ, তাতে ধন্যবাদ জানানোর কোনও কথাই ওঠে না।

প্রথম খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের জবানি

ব্যোমকেশ অনেকক্ষণ ধরিয়া অসহিষ্ণুভাবে উসখুস করিবার পর অবশেষে হাঁক দিয়া বলিল, 'পুঁটিরাম! আর এক পেয়ালা চা দিয়ে যাও।'

আমি বলিলাম, 'ব্যাপার কী? এত ছটফট করছ কেন, আর এতবার চা খাওয়ারই বা দরকার পড়ছে কেন?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'তুমি আমার অসহায় অবস্থাটা বুঝতে পারছ না। একটা জটিল রহস্যের অর্ধেকটাব সমাধান করার পর তথ্যের অভাবে আর এগোতে না পারলে মানুষ এই রকমই ছটফট করে।'

আমি বলিলাম, 'সেটা যে বুঝতে পাবছি না তা নয়। কিন্তু এতে তোমার এত ঘাবড়াবার কী আছে? বিকাশকে যখন লাগিযেছ, তখন সে আজকালেব মধ্যেই সমস্ত খবর এনে হাজির করবে।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'বিকাশকে লাগিয়েছি। পুলিশও যথাসাধ্য চেষ্টা করছে। কিন্তু খবর যে আজকালের মধ্যেই আসবে, তার কোনও স্থিরতা নেই। খবর আসতে দুদিন লাগতে পারে, পাঁচদিন লাগতে পারে, দশদিন লাগতে পারে, একমাস লাগতে পারে, আবও বেশি সময় লাগতে পারে। ততদিন কিছু করার উপায় নেই। এইভাবে অনির্দিষ্টকাল অপেক্ষা করা আমার অসহ্য লাগে।'

ইহার আর কী উত্তর দিব? ব্যোমকেশ বর্তমানে যে-বহস্যের উদঘাটনে ব্যাপৃত রহিয়াছে ও যেসব প্রয়োজনীয় তথ্যের অভাবে তাহার কাজ এখন বন্ধ বহিযাছে, সেগুলির বিষয আমি ভালো কবিযাই জানি। সুতরাং ব্যোমকেশের অধৈর্যেব কারণ বুঝিতে কষ্ট হয় না। এ সম্বন্ধে অযথা আলোচনা না করিয়া তাহার মনকে যদি সাময়িক ভাবে অন্য দিকে চালিত করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে বরং কতকটা কাজ হয়। কিন্তু কীভাবে তাহা করা সম্ভব?

পুঁটিরাম চা লইয়া আসিল। টিপয়ে চা রাখিয়া সে ব্যোমকেশকে বলিল, 'একটি বাবু আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান। তিনি এই কার্ড দিয়েছেন।'

দেখিলাম কার্ডে লেখা আছে ঃ

শ্রীসজলকুমার সেন
অধ্যাপক,
বাংলা বিভাগ,
নিত্যানন্দ কলেজ।

ব্যোমকেশ কিছু বলিবার আগেই আমি বলিয়া উঠিলাম, 'তাঁকে ভেতবে নিয়ে এসো।'

পুঁটিরাম ঘরের বাহিরে গেলে ব্যোমকেশ আমায় বলিল, 'ব্যাপার কী? ভদ্রলোককে ভেতরে আনবার জন্যে তোমার এত আগ্রহ কেন?'

আমি বলিলাম, 'আগ্রহের কারণ তোমার মনের এই অবস্থা। ওঁর সঙ্গে কথা কইলে খানিকক্ষণ তুমি ভুলে থাকবে। ভদ্রলোক যদি কোনও নতুন রহস্যের সন্ধান দেন, তাহলে নিশ্চয়ই তুমি খানিকটা চাঙ্গা হয়ে উঠবে। এই ভেবেই ওঁকে ভেতরে ডাকলাম।'

সজলবাবু ভিতরে প্রবেশ করিলেন। বয়স তাঁহার বেশি নয়, ত্রিশের মধ্যেই। মাঝারি দৈর্ঘ্যের একহারা চেহারা। চেহারার মধ্যে বেশ একটা কমনীয়তার ছাপ আছে। আমাদের দুইজনকে করজোড়ে নমস্কার করিয়া তিনি চেয়ারে বসিলেন। বসিয়া বলিলেন, 'যে-কারণের জন্যে আপনার কাছে আজ

এসেছি, সেটার গুরুত্ব যে কতখানি, তা এখনও ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি। আপনার অমূল্য সময়ের খানিকটা হয়তো মিছিমিছি নষ্ট করে দিচ্ছি, এই ভেবে আমার অত্যন্ত কুণ্ঠা বোধ হচ্ছে।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'বিষয়টাব গুরুত্ব কতখানি, সে বিবেচনার ভার আমার ওপরেই ছেড়ে দিন। আপনার যা বলবার আছে, তা ভালো করে খুলে বলুন।'

সজলবাবু বলিতে আরম্ভ করিলেন।

'আমাদের আদি বাড়ি বর্ধমান জেলায়, কিন্তু দু-পুরুষ ধরে আমরা কলকাতাতেই আছি। বাবা রেলওয়ের বড় অফিসার ছিলেন। যেমন প্রচুর মাইনে পেতেন, তেমনি দু-হাতে খরচ করতেন। তাই তিনি কিছুই জমাতে পারেননি। আমাদের জন্যে তিনি বিশেষ কিছু রেখে যেতে পারেননি। তাঁর প্রধান শখ ছিল বাগান করা। এই জন্যে তিনি বালিগঞ্জের গ্রিনউড গার্ডেনসে বাড়ি ভাড়া করেছিলেন। বাড়িটার কম্পাউন্ড বেশ বড়; তার মধ্যে বেশ ভালোভাবেই বাগান করা চলে। বাবা করেছিলেনও তাই। পাঁচ বছর হল বাবা মারা গেছেন। আমরা দুই ভাই। দাদা আমাব চেয়ে বছর দশেকের বড়। বাবা তাঁকে রেলের চাকরিতে ঢুকিয়েছিলেন, তাঁর আগেকার তুলনায় পদোন্নতি হয়েছে, মাইনেও বেড়েছে। দাদা দশ বছর আগে বিয়ে করেছেন। বউদি দস্তুরমতো শিক্ষিতা, তিনিও চাকরি করেন—সরকারি চাকরি, মাইনে ভালোই পান।

'আমাদের জন্ম-কর্ম সব গ্রিনউড গার্ডেনসের বাড়িতেই। মাত্র ছ'মাস হল আমরা সে বাড়ি ছেড়ে আর একটা বাড়িতে এসেছি। গ্রিনউড গার্ডেনসের বাড়িটা বাবা পঞ্চাশ বছর আগে ভাড়া নিয়েছিলেন। তখন বাড়িটার যে-ভাড়া ছিল, তা তখনকার তুলনায় যথেষ্ট বেশি হলেও এখনকাব তুলনায় খুবই কম। রেন্ট-কন্ট্রোল আইনের দরুন বাড়িওযালা অনেক চেষ্টা করেও বেশি ভাড়া বাড়াতে পারেননি। যা হোক, পুবোনো বাড়িওয়ালা যতদিন বেঁচে ছিলেন, ততদিন এ নিয়ে বিশেষ ঝামেলা বাধেনি। তিন বছর আগে তিনি মারা যাওয়ার পর তাঁর ছেলে বাড়ির মালিক হয়ে গোলমাল শুরু করল। তার মতলব হল, আমাদেব উঠিয়ে দিয়ে এখনকার ভাড়ায় নতুন ভাড়াটে বসাবে। এ জন্যে সে আমাদের ওপরে নানাভাবে চাপ দিতে শুরু করল। আমরা প্রথম-প্রথম তাতে গ্রাহ্য করিনি। কিন্তু অনেকদিন বাড়িটার মেরামত হয়নি। বর্ষাকালে ছাদ দিয়ে জল পড়ত। তা ছাড়া, অনেকখানি অংশ একেবারে ঝুরঝুরে হয়ে পড়েছিল। আমবা যখন নতুন বাড়িওয়ালাকে মেরামতের কথা বললাম, সে বলল, "আপনারা বাড়ি ছেড়ে উঠে যান। আমি বাড়িটা ভেঙে নতুন করে তৈরি করব। কম্পাউন্ড টম্পাউন্ড আর রাখব না। সমস্ত জমিটা নিয়ে পাঁচতলা বাড়ি তুলে ফ্ল্যাট-সিস্টেমে ভাড়া দেব।" অবিলম্বে বাড়ি ছেড়ে না গেলে সে যে আমাদের নামে মামলা করবে, তাবও আভাস দিল। আমরা শান্তিপ্রিয় মানুষ। এমনিতেই বাড়িওয়ালার সঙ্গে ঝগড়া করতে আমাদের ভালো লাগছিল না। তা ছাড়া, মামলা-মোকদ্দমার ব্যাপারে আমাদের কোনও উৎসাহ নেই। আমরা তিনজনেই চাকরি করি, মামলার তদ্বির করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তা ছাড়া মামলায় শেষ পর্যন্ত যে-পক্ষই জিতুক না কেন, দু-পক্ষেরই টাকার শ্রাদ্ধ হয়। সেইজন্যে আমরা তিনজনে পরামর্শ করে ঠিক করলাম, ও বাড়ি ছেড়ে দেব। ছেড়ে দেওযার জন্যে বাড়িওয়ালার কাছে এক মাসের সময় চেয়ে নিলাম।

'কিন্তু ছেড়ে দিয়ে যাই কোথায়? যেমন-তেমন বাড়ি হলে আমাদেব চলবে না। কারণ, বাবার বাগান করার শখটা আমরাও উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি। বউদিরও এ-শখ আছে। বাবার মতো পয়সা আমাদের নেই—কিন্তু আমরা তিনজনে মিলে যা রোজগার করি, তাতে আমাদের বেশ ভালোভাবেই চলে যায়, তাই আমাদের বাগানের নেশা ছাড়তে হয়নি। সুতরাং আমরা যে-বাড়িতে যাব, তাতে বাগান করার মতো কম্পাউন্ড থাকা চাই। অথচ এই ধরনের বাড়ির যে-আকাল-কেঁড়ে ভাড়া, তা দেওয়ার ক্ষমতা আমাদের নেই। এ অবস্থায় কী করা যায়, তাই আমরা ভাবতে লাগলাম।

'ভাবতে-ভাবতে আর বাড়ি খুঁজতে-খুঁজতে যখন দিশেহারা হচ্ছি, এমন সময় বাংলা খবরের কাগজে এই বিজ্ঞাপনটা চোখে পড়ল ঃ

*

'দক্ষিণ কলিকাতায় বিস্তীর্ণ কম্পাউন্ড সমেত একটি একতলা বাড়ি ভাড়া দেওয়া হইবে। ভাড়া মাসিক দুই শত টাকা। নিম্নোক্ত ঠিকানায় বেলা ৮টা হইতে ১০টার মধ্যে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করুন।

শ্রীপীতাম্বর ঘোষাল

৮নং দিবাকর সাহা লেন, কলিকাতা-৬।'

'বিজ্ঞাপন দেখে অবিলম্বে আমি গিয়ে পীতাম্বরবাবুর সঙ্গে দেখা করলাম। পীতাম্বরবাবু বেশ সাদাসিধে মানুষ, কোনও চাল নেই। আমরা বাড়িটা ভাড়া নিতে চাই শুনে পীতাম্বরবাবু আমাকে অনেক প্রশ্ন করলেন—আমাদের পরিবারে কত জন লোক, আমরা কী করি, আদি বাড়ি কোথায় ইত্যাদি। জিজ্ঞাসাবাদ শেষ হওয়ার পরে তিনি বললেন, "আরও অনেকে ও বাড়ি নিতে চাইছে তবে আমার আপনাদেরই সবচেয়ে desirable পার্টি বলে মনে হচ্ছে। ঠিক আছে। আজ সন্ধে সাড়ে ছ'টার সময় আসুন, বাড়িটা দেখবেন। তারপর বাড়ি পছন্দ হলে নেবেনখন।"

'বাড়িটা লেকের কাছে—হেমন্ত ঘোষ রোডে। নম্বর ৩৯-এর বি। সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টার সময় আমি, দাদা আর বউদি সবাই মিলে বাড়িটা দেখতে গেলাম। খাসা বাড়ি। চারখানা ঘর, তার সঙ্গে রান্নাঘর, বাথরুম প্রভৃতি। প্রায় নতুন বাড়িই বলা চলে। মাত্র পাঁচ বছর আগে বাড়িটা তৈরি হয়েছে। যিনি তৈরি করেছিলেন, তাঁর কাছ থেকে পীতাম্বরবাবু বাড়িটা কিনেছেন মাত্র মাস ছয়েক আগে। বাড়ির কম্পাউন্ডের একপাশে একটি অপরূপ সুন্দর বাগান আছে। বিজ্ঞাপনে বাগানের কথা কিছু লেখা ছিল না। এই বাগানটাই আমাদের সবচেয়ে বেশি মুগ্ধ করল।

'বাড়ি, বাগান—সব কিছু দেখা হলে পীতাম্বরবাবু বললেন, "কী? বাড়ি পছন্দ হল?"

'দাদা বললেন, "বাড়ি তো পছন্দ হয়েছে। কিন্তু এত ভালো বাড়ি, তার সঙ্গে এত সুন্দর বাগান—এ আপনি মাত্র দুশো টাকায় ভাড়া দিতে চাইছেন কেন?"

'পীতাম্বরবাবু বললেন, "তাহলে মশায় আসল কথাটা খুলে বলি। আমি কলকাতায় থাকি না। ইউ. পি.-র মিরাট শহরে কন্ট্রাকটরি করি। অল্প বয়েসেই নিজের দেশ ছেড়ে ওদেশে গিয়েছিলাম—তখন আমি কপর্দকহীন। প্রথমদিকে প্রায় কুলিগিরি করে পেট চালাতে হয়েছে। তারপর নিজের চেষ্টায় ধাপে-ধাপে, একটু-একটু করে উঠেছি। এখন আপনাদের আশীর্বাদে পয়সাকড়ির কোনও অভাব নেই। কিন্তু এদিকে আবার বয়েস বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে দেশের জন্যে মন কেমন করতে শুরু করছে। সেইজন্যে ঠিক করলাম ও-দেশ থেকে একেবারে ব্যাবসা গুটিয়ে এনে এখানে এসে বসব। দিবাকর সাহা লেনের বাড়িটা আমার পৈত্রিক বাড়ি। ওখানে আমার দাদারা রয়েছেন—বিরাট সংসার। এর ওপর আমার সংসারটা ওখানে চাপলে বাড়িতে নিশ্বাস ফেলার জায়গা থাকবে না। তা ছাড়া, আমার বাগান করার শখ আছে। তা ওখানে হবে না। তাই এ-বাড়িটা কিনলাম। কিন্তু এখানে এসে বাস করা বোধহয় আমার কপালে লেখা নেই। এ-বাড়িটা কেনার সঙ্গে-সঙ্গেই ওখানে একগাদা মোটা টাকার সরকারি কন্ট্রাক্ট পেয়ে গেলাম। ব্যাবসাদার মানুষ। টাকার লোভটা ছাড়ি কী করে? তাই কন্ট্রাক্টগুলো নিতে বাধ্য হয়েছি। গভর্নমেন্টের একটা নতুন টাউনশিপ তৈরি হচ্ছে—তারই বাড়িঘর তৈরির কন্ট্রাক্ট। টাউনশিপ তৈরি শেষ হতে অন্তত পাঁচ বছর লাগবে—ততদিন আমার কাজও কিছু না কিছু থাকবে।

' "কাজেই আমার তো মশায় আপাতত কয়েক বছর এখানে আসা হচ্ছে না। আমি ঠিক করলাম, এ ক'বছর এ-বাড়ি খালিই পড়ে থাকবে। কিছু দিন বাড়ি খালিই পড়ে রইল। তারপর অল্প ক'দিন আগে আমার একজন আত্মীয় আমায় চিঠিতে জানাল যে, গভর্নমেন্ট এ-বাড়িটা রিকুইজিশন করার মতলব করছে। শুনে আমার হৃৎকম্প হওয়ার জোগাড়। কারণ, গভর্নমেন্ট বাড়ি রিকুইজিহন করলে কোন উটমুখো গভর্নমেন্ট অফিসার এখানে এসে অধিষ্ঠান হবে—তার হয়তো

একপাল কাচ্চাবাচ্চা—আমার এত সাধের বাড়ি আর বাগান একেবারে নষ্ট করে দেবে। তাই আমি তাড়াহুড়ো করে কলকাতায় ছুটে এলাম। উদ্দেশ্য, গভর্নমেন্ট বাড়ি রিকুইজিশন করবার আগেই এমন কোনও ফ্যামিলিকে বাড়িটা ভাড়া দিয়ে দেওয়া—যাদের লোক কম, কাচ্চাবাচ্চা নেই—এক কথায় যাদের থেকে বাড়ি-বাগান নষ্ট হওয়ার ভয় নেই। আপনাদের ফ্যামিলি ঠিক সেইরকম—তাই আপনাদেরই বাড়িটা দিতে চাই।"

'দাদা বললেন, "আপনার মনোমতো ভাড়াটেরা যাতে ভাড়া দেখে পিছিয়ে না যায়, সেইজন্যেই কি আপনি ভাড়াটা কম করে ধার্য করেছেন?"

'পীতাম্বরবাবু বললেন, "সে জন্যেও বটে, আর-একটা কারণেও বটে। আপনাদের কেবল বাড়িটাই ভাড়া দেব—বাগানটা নয়—বাগান আমারই দখলে থাকবে।"

'এ-কথা শুনে আমরা অবাক হয়ে গেলাম। বউদি বললেন, "সে কী? বাগানে আমরা হাত দিতে পারব না?"

'পীতাম্বরবাবু বললেন, "না-না! তা পারবেন না কেন? আসল কথা এই। বাগানটা গত ছ'মাস ধরে অনেক যত্ন করে তৈরি করা হয়েছে। এর প্ল্যান আমারই। আমার মালি এ ক'মাস ধরে অবিশ্রাম খেটে এটাকে গড়ে তুলেছে। আপনারা এর ফুলটুল মালির কাছ থেকে যত খুশি চেয়ে নিতে পারেন। তা ছাড়া কম্পাউন্ডের ওপাশে অনেকখানি খালি জমি পড়ে আছে। সেখানে আপনারা আপনাদের খুশিমতো বাগান করতে পারেন। আমার বক্তব্য এই যে, এই বাগানটার এখন যে-চেহারা আছে, সেটা যেন বদলানো না হয়।"

'আমরা তাতে রাজি হলাম। তখন পীতাম্বরবাবু বললেন, "আর একটা কথা। পাঁচ বছর বাদে আমি যদি কলকাতায় আসতে চাই তখন কিন্তু আপনারা দয়া করে বাড়িটা ছেড়ে দেবেন, এই কথা দিন।"

'আমরা এই শর্তে রাজি হয়ে দু-মাসের ভাড়া আগাম দিয়ে বাড়িটা নিলাম। পরের মাসের পয়লা তারিখেই গ্রিনউড গার্ডেনস ছেড়ে ও-বাড়িতে চলে এলাম। পীতাম্বরবাবু তখনও কলকাতায় ছিলেন। এর পরেও তিনি দিনকয়েক ছিলেন। যতদিন ছিলেন মাঝে-মাঝে তিনি আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। তারপর তিনি মিরাটে চলে গেলেন। আমাদের ঠিকানা দিয়ে গেলেন। তারপর থেকে আমরা প্রতি মাসে তাঁর কাছে মানি-অর্ডার করে টাকা পাঠাই।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'কিন্তু আপনার ঝামেলাটা কী, সে সম্বন্ধে তো আপনি এখনও কিছু বললেন না।'

সজলবাবু বলিলেন, 'এইবার সেই কথাই বলছি। ঝামেলাটা শুরু হয়েছে আমাদের এ-বাড়িতে আসবার পরদিন থেকেই। আমাদের পুরোনো বাড়িতে যে চাকরটা কাজ করত, তাকে এই বাড়িতে নিয়ে এসেছিলাম। সে রাত্রে বারান্দায় শুত। আমাদের আসার পরের পরেরদিন সকালে সে বলল যে, আগের দিন রাত্রিতে সে ভূত দেখেছে।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ভূত?'

সজলবাবু বলিলেন, 'হ্যাঁ! ভূত! সাদা কাপড় পরা ঘোমটা টানা একটা পেতনি। মাঝরাত্রিতে চাকরটা যখন একবার উঠেছিল, তখন সে নাকি পেতনিটাকে বাগানের মধ্যে চলাফেরা করতে দেখেছিল।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'হুঁ'। তার কথা শুনে আপনারা কী করলেন?'

সজলবাবু বলিলেন, 'আমরা তাকে অনেক করে বোঝাবার চেষ্টা করলাম যে, সে যা দেখেছে, তা তার চোখের ভুল। তারপর মালিটাকে ডেকে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলাম। সে বলল যে, সে কিছু দেখেনি। চাকরটা বুঝল কি না জানি না, তবে গোঁজ হয়ে রইল। তার পরেরদিন সকালে সে আমাদের কাছ থেকে দেশে টাকা পাঠাতে হবে বলে মাইনেটা চেয়ে নিল। তারপর বলল, কাল

রাত্রিতেও সে সেই পেতনিটাকে দেখেছে। আমরা তখন অন্য কথা বলছিলাম, তার কথায় কান দিলাম না। কিন্তু সেইদিন বিকেলে আমরা বাড়ি ফিরে দেখলাম সে তার জিনিসপত্র নিয়ে পালিয়েছে।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'তারপর আর পেতনিটাকে দেখা গিয়েছিল?'

সজলবাবু বলিলেন, 'তারপর আর কেউ দেখেছে বলে শুনিনি। কিন্তু ঝামেলার এইখানেই শেষ হল না। আজ মাস তিনেক ধরে একটা অদ্ভুত জিনিস লক্ষ করছি। আমাদের পাড়া দিয়ে আজকাল রোজ অসংখ্য নানা ধরনের লোক নতুন-নতুন যাতায়াত করছে। এটা খুবই আশ্চর্য ব্যাপার। একটেরে নিরিবিলি পাড়া, সদর রাস্তা থেকে বেশ খানিকটা দূরে, এত লোক তো এ পাড়ার মধ্যে দিয়ে যাবার আসবার কথা নয়। তা-ও লোকগুলো যে শুধু রাস্তা দিয়ে চলে যায় তা নয়, তারা প্রায়ই দাঁড়িয়ে যায়, বাড়িগুলোর দিকে তাকায়, খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে সব কিছু লক্ষ করে, আমি মাঝে-মাঝে রাস্তা দিয়ে চলবার সময় দেখতে পেতাম আমার কেউ পিছু নিয়েছে। প্রথমে ভাবতাম এ হয়তো আমার মনের ভুল। কিন্তু পরে দাদা-বউদির কাছে আমার ধারণার কথা বলাতে তাঁরা বললেন, তাঁরাও এ জিনিসটা অনুভব করেছেন। তার পরে আমাদের দু-একজন প্রতিবেশীর সঙ্গে এ নিয়ে আলাপ করলাম, তাঁরা বললেন, তাঁরাও এটা feel করেছেন।

'সে যাক, এসব ব্যাপার অস্বস্তিকর হলেও খানিকটা গা-সহা হয়ে এসেছিল। কিন্তু কিছুদিন হল এক নতুন আপদ এসে জুটেছে। দিন পনেরো আগে একদিন রবিবার সকালবেলায় বারান্দাতে দাঁড়িয়ে আছি, এমনসময় সদর দরজার সামনে একটি আধাবয়েসি ভদ্রলোক এসে দাঁড়ালেন। চেহারাটা তাঁর নাদুসনুদুস, চাউনি ভিজে বেড়াল ধরনের, বিরাট একজোড়া গোঁফও আছে। জামাকাপড় আধময়লা। ভদ্রলোক আমায় নমস্কার করে বললেন, "এই যে, হেঁ-হেঁ! রামচরণ বটব্যাল স্ট্রিটটা কোন দিকে বলতে পারেন?"

আমি বললাম, "আর-একটু এগিয়ে যান। বাঁয়ে পড়বে।"

'ভদ্রলোক চলে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ কী মনে করে আবার ঘুরে দাঁড়ালেন। বললেন, "হেঁ-হেঁ! অনেকখানি হেঁটে বড় থকে গেছি। বেজায় তেষ্টা পেয়েছে। একটু জল খাওয়াতে পারেন?"

'আমি তখন তাঁকে ভেতরে আসতে বললাম। তিনি এসে বারান্দায় একটা চেয়ারে বসলেন। বসে বললেন, "হেঁ-হেঁ অধীনের নাম শ্রীযুগলকিশোর পতিতুণ্ডি। নিবাস মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল চকহাটি গ্রামে।"

'আমি আমাদের চাকরকে ডেকে জল আনালাম। ভদ্রলোক জল খেলেন। কিন্তু তক্ষুনি উঠলেন না। তার বদলে তাঁর বাড়িতে কে-কে আছে, তাঁর ছোট মেয়েটি কিরকম দুষ্টু, কবে তাঁর ম্যালেরিয়া হয়েছিল, কী ওষুধ খেয়ে ভালো হয়, এইসব ব্যাপার সবিস্তারে বর্ণনা করতে লাগলেন, আর আমাদের দেশ, পরিবার, আর্থিক অবস্থা, চাকরি ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে নানারকম প্রশ্ন করতে লাগলেন। এতে আমার খুবই বিরক্ত লাগছিল, কিন্তু ধৈর্য ধরে ওঁর কথা শুনে আর প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ একটা জিনিস লক্ষ করলাম যে, লোকটা বকে চলেছে বটে, কিন্তু সেইসঙ্গে তার দৃষ্টি এদিক সেদিকে ঘুরছে, চারপাশের সব কিছু সে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখছে। আমার মনে হল এ কি চোরের দলের লোক, আমাদের বাড়ির সন্ধান নিতে এসেছে? যা হোক, আমার বিরক্তি বা সন্দেহ সেদিন মুখে প্রকাশ করিনি। লোকটা অনেকক্ষণ বকে আর বকিয়ে তারপর উঠল। ভাবলুম, আপদ গেল।

'কিন্তু এর দিন চার-পাঁচ বাদে একদিন সকালবেলায় বারান্দায় বসে খবরের কাগজ পড়ছি, এমন সময় হতভাগা আবার এসে হাজির। বলল, "হেঁ-হেঁ! এইদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম, ভাবলাম দাদার সঙ্গে দেখা করে যাই।"

'সেদিন আর বিরক্তি চাপবার চেষ্টা করিনি। লোকটা তবুও নাছোড়বান্দা। বসে আবার বকুনি শুরু করল। সেইসঙ্গে আগের দিনের মতো এদিক-সেদিকে চাওয়া। খানিকক্ষণ বকবার পর আমি বললাম, "কলেজের বেলা হয়ে যাচ্ছে।" এই বলে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। লোকটা তখন

উপায়ান্তর না দেখে "হেঁ-হেঁ! আপনার অনেক সময় নষ্ট করলাম।" বলে উঠল। তারপর বেরিয়ে গেল।

'এরও দিন তিনেক বাদে একদিন বিকেল তিনটের সময় কলেজ থেকে ফিরে এসে দেখি যুগলকিশোর আমার বারান্দায় বসে আছে। তার কাছে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের চাকর রঘু। যুগলকিশোর বলল, "হেঁ-হেঁ! আজ এসে দেখি দাদা নেই। তাই ভাবলাম একটু অপেক্ষা করি। তা যাক বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়নি।"

'আমি গম্ভীর হয়ে বললাম, "অপেক্ষা! কেন? আমার সঙ্গে কি আপনার কোনও দরকার আছে?"

'যুগলকিশোর এ-কথা শুনে একটু থতমত খেয়ে বলল, "দরকার? না, মানে, আপনি কি টোটকা ওষুধে বিশ্বাস করেন?"

'আমি বেজায় চটে বললাম, "বাজে কথা রাখুন। আপনার কোনও দরকার নেই তো খালি-খালি এসে আমার সময় নষ্ট করেন কেন?"

'যুগলকিশোর আমার রূঢ় কথা শুনে খুব অপ্রস্তুত হল বলে মনে হল না। তবে উঠে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে বলল, "ও, তাও তো বটে। হেঁ-হেঁ! আপনার অনেক সময় নষ্ট করে ফেলেছি। খেয়াল ছিল না।" এই বলে সে বেরিয়ে গেল।

'সেদিন রাত্রিতে খাওয়ার সময় দাদা-বউদির কাছে যুগলকিশোরের কথা বললাম। দাদা শুনে বললেন, "ও! সেই লোকটা। আরে সে তো আরও দু-দিন এ-বাড়িতে এসে আমায় জ্বালিয়ে গেছে। তখন তুই বাড়িতে ছিলি না।"

তার পরের দিন সকালে আমি চাকর-মালি দুজনকেই ডেকে বলে দিলাম, এরপর যুগলকিশোর এলে তারা যেন তাকে বাড়িতে ঢুকতে না দেয়।

'পরশুদিন কিন্তু ব্যাপারটা চরমে উঠল। বিকেলে আমি অনেকক্ষণ ধরে বেড়াই। সেদিন বেড়িয়ে সন্ধ্যার দিকে বাড়ি ফিরছি, এমন সময় দেখি আমাদের বাড়ি আর সাহিত্যিক উমাশঙ্কর মিত্রের বাড়ির মাঝখানে যে-সরু গলিটা, সেই গলি দিয়ে একটা লোক বেরিয়ে এল। তারপর আমায় দেখে প্রায় ছুটে পালিয়ে গেল। অস্পষ্ট আলোতেও তাকে চিনতে পারলাম। যুগলকিশোর। সে গলিটাতে কী করছিল, তা জানবার কৌতূহল হল। আমি গলির মধ্যে ঢুকলাম। দেখি গলির কাঁচা মাটির ওপরে একসার টাটকা পায়ের ছাপ; সেগুলো আমাদের বাগানের পাশের পাঁচিলটার ধারে একটা জায়গায় গিয়ে শেষ হয়েছে। ওই জায়গাটায় পাঁচিলের খানিকটা খসে গিয়ে একটা ফোকর সৃষ্টি হয়েছে, তার পাশেই বাগান। বাগানের পরে আমাদের বাড়ি। বাড়ির একটা জানলা খোলা, কাজেই এখান থেকে ভেতরের অনেকখানি দেখা যায়। বোঝা যায়, লোকটা এখানে দাঁড়িয়ে ফোকর দিয়ে আমাদের বাগানটা আর বাড়ির ভেতরটা অনেকক্ষণ ধরে দেখেছে।

'এতদিন যুগলকিশোরের উপদ্রব সহ্য করেছিলাম, কিন্তু এখন একেবারে অসহ্য লাগল। পরের দিন, অর্থাৎ, গতকাল সকালে থানায় গিয়ে ব্যাপারটা জানালাম। থানার দারোগা গম্ভীরভাবে আমার নালিশ লিখে নিয়ে বললেন, "ঠিক আছে। আমরা ব্যাপারটা দেখব। আবার যদি লোকটা এসে জ্বালাতন করে, তাহলে আমাদের খবর দেবেন।"

'থানা থেকে ফিরে এলাম। কিন্তু পুলিশের ওপর আমার খুব বেশি ভরসা নেই। আমার মনে হয়, আমরা এ-বাড়িতে আসার পর থেকে যেসব অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে—যেমন, ভূত দেখে আমাদের চাকরের পালানো, পাড়ার মধ্যে দিয়ে নিত্য নতুন গাদা-গাদা অচেনা লোকের যাতায়াত, সবশেষে, লক্ষ্মীছাড়া যুগলকিশোরের আবির্ভাব—তাদের মধ্যে একটা যোগসূত্র আছে—এগুলোকে আমি কিছুতেই বিচ্ছিন্ন বা তাৎপর্যহীন ঘটনা বলে মানতে পারি না। এর মধ্যে নিশ্চয়ই একটা রহস্য আছে আর সে-রহস্য ভেদ করা পুলিশের কাজ নয়। তাই উপায়ান্তর না দেখে আমি আপনার কাছে

এসেছি। আপনাকে সব কথা খুলে বললাম। আপনি কি মনে করেন না যে, ব্যাপারগুলোর মধ্যে একটা রহস্য আছে?'

ব্যোমকেশ অনেকক্ষণ চুপ করিয়া কী ভাবিল। তারপর ধীরে-ধীরে বলিল, 'রহস্য যে একটা আছে, তাতে কোনও সন্দেহই নেই। আচ্ছা, আপনাদের পাড়াটা কেমন?'

'খুবই ভালো। আমাদের প্রতিবেশীরা সবাই চমৎকার ভদ্রলোক, সকলেই শিক্ষিত, অনেকেই বেশ ধনী। কারও বিরুদ্ধে এ পর্যন্ত আমরা কিছু শুনিনি। আমাদের বাড়ির দুপাশে দুজন বিখ্যাত লোক থাকেন। একজন হলেন সাহিত্যিক উমাশঙ্কর মিত্র, আর একজন বিজ্ঞানী অম্বিকারঞ্জন কানুনগো। উমাশঙ্করবাবু থাকেন আমাদের ডানপাশে আর অম্বিকাবাবু বাঁ-পাশে। আপনি নিশ্চয়ই এঁদের নাম জানেন?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'এঁদের নাম নিশ্চয়ই জানি। তবে ব্যক্তিগতভাবে এঁদের কারও সঙ্গেই আমার পরিচয় নেই।'

সজলবাবু বলিলেন, 'মানুষ হিসেবে এঁরা দুজনেই বেশ interesting।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'কীরকম?'

সজলবাবু বলিলেন, 'যেমন ধরুন উমাশঙ্করবাবু। ভদ্রলোক দাবা খেলতে অসম্ভব ভালোবাসেন। দিনরাতই কারও না কারও সঙ্গে দাবা খেলছেন। আমার দাদারও দাবা খেলার নেশা আছে। তাই উমাশঙ্করবাবু সকাল সাড়ে ছ'টার সময় আমাদের বাড়িতে চলে আসেন। তারপর দাদার অফিস যাওয়ার সময় না হওয়া পর্যন্ত দুজনের খেলা চলে। ছুটির দিনে বেলা বারোটার আগে কেউ ওঠেন না। দাদার সঙ্গে খেলার পর উনি একটু দূরে ওঁর এক বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে খেলেন। তারপর সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত নিজের বাড়িতে বসে তাঁর আর-এক বন্ধুর সঙ্গে দাবা খেলেন।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'এত দাবা খেলে উনি লেখবার সময় পান কখন?'

সজলবাবু বলিলেন, 'লিখতে উনি পারতপক্ষে চান না। প্রকাশকরা বাড়িতে তাগাদা দিতে এলে উনি তাদের সঙ্গে দেখা না করে খিড়কির দরজা দিয়ে বেরিয়ে যান। তবুও যে ওঁর হাত দিয়ে লেখা বেরোয়, তার মূলে আছেন ওঁর স্ত্রী। তিনিই প্রকাশকদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন। দুপুরবেলায় খাওয়া-দাওয়ার পর উনি উমাশঙ্করবাবুকে তাঁর বসবার ঘরে ঢুকিয়ে বাইরে থেকে তালা বন্ধ করে দিয়ে চলে যান। বলে যান যে, যতক্ষণ না উমাশঙ্করবাবু দশ পাতা লিখে শেষ করবেন, ততক্ষণ তিনি তালা খুলবেন না। তারপর উমাশঙ্করবাবুর দশ পাতা লেখা শেষ হলে উনি তালা খুলে ঘরে ঢুকে লেখার পাতা গুনে নিয়ে তারপর তাঁকে ছেড়ে দেন।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ভারী মজার ব্যাপার তো! উনি বুঝি স্ত্রীকে খুব ভয় করেন?'

'খুব। তবে মাঝে-মাঝে আবার উনি রুখে দাঁড়ান। তখন দুজনের মধ্যে তুমুল ঝগড়া বেধে যায়। ষাট বছরের বুড়ো আর পঞ্চান্ন বছরের বুড়ির সে-ঝগড়ার সবটাই আমরা পাশের বাড়িতে থেকে শুনতে পাই। আমাদের তখন বেজায় অস্বস্তি হয়।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আর বিজ্ঞানী অম্বিকাবাবু?'

'উনি আর-এক ধরনের লোক। অম্বিকাবাবুকে আমাদের পাড়ার সবাই মাস্টারমশাই বলে। উনি নিজের বিষয় কেমিস্ট্রি ছাড়া আর প্রায় কিছুই জানেন না। ওঁর বাড়িটা তিনতলা। তার মধ্যে একতলাটায় উনি থাকেন। দোতলার সবটা জুড়ে ওঁর লাইব্রেরি আর তেতলার সবটা জুড়ে ওঁর ল্যাবরেটরি। ইউনিভার্সিটির চাকরি থেকে বছর কয়েক হল অবসর নিয়েছেন, এখন বেশিরভাগ সময় ল্যাবরেটরিতে বসে গবেষণা করেন। আমাদের বাড়ির সাবেক মালিক ওঁর বন্ধু ছিলেন। নতুন মালিক পীতাম্বরবাবুও ওঁকে খুব খাতির করেন। মাস্টারমশাই ফুল খুব ভালোবাসেন। বাড়িতে তাঁর অনেকগুলো ফুলদানি আছে। সেগুলো সবসময় তাজা ফুলে ভরা থাকা চাই। আমাদের মালি রোজ

সকাল-বিকেল ওঁকে বড় একটা সাজিতে করে ফুল দিয়ে আসে।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ওঁর স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক কীরকম?'

সজলবাবু বলিলেন, 'ওঁর স্ত্রী অনেকদিন মারা গেছেন। সন্তান বলতে একটি মাত্র মেয়ে। ওঁর কাছেই থাকে।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'মেয়েটি কী পড়ে? বিয়ে হয়নি এখনও?'

সজলবাবু বলিলেন, 'বিয়ে এখনও হয়নি। দু-বছর আগে ও বি. এ. পাস করেছে। তারপর আর পড়েনি। ওই এক আশ্চর্য মেয়ে। লেখাপড়া শিখেছে, গানও বেশ ভালো জানে। কিন্তু দিন-রাত্রি রান্না নিয়ে ব্যস্ত। একালের মেয়েদের রান্নার দিকে এতখানি ঝোঁক আমি আর কখনও দেখিনি। কেবল রান্না কেন, বাড়ির সব কাজ ও নিজেই করে—বাড়িতে কোনও ঝি-চাকর নেই।'

লক্ষ করিলাম, অম্বিকাবাবুর কন্যার উল্লেখ করিতে গিয়া সজলবাবুর কণ্ঠস্বর বেশ দ্রবীভূত হইয়া আসিল। ব্যোমকেশেরও ঠোঁটে চাপা একটুকরা হাসি খেলিয়া গেল। সেটা সামলাইয়া লইবার পর ব্যোমকেশ বলিল, 'পীতাম্বরবাবু যে বলেছিলেন, কম্পাউন্ডের খালি অংশটাতে আপনারা নিজেদের খুশিমতো বাগান করতে পারেন—তা কি আপনারা করেছেন।'

'করেছি। আমাদের চিরদিনের বাগান করার নেশা। পরের তৈরি বাগান দেখে আমাদের মন ভরে না। আমরাও বেশ ভালোই বাগান করেছি। অবশ্য একজন মালি না থাকলে বাগান সম্পূর্ণ successful হয় না। তাই আমরা পীতাম্বরবাবুর মালিকে দিয়ে আমাদের বাগানের কিছু কাজ করিয়ে নিই।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'এ জন্যে কি আপনারা তাকে কিছু টাকা দেন?'

সজলবাবু বলিলেন, 'না। এ-কাজ করার জন্যে আমরা তাকে দুবেলা খেতে দিই।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'অর্থাৎ তার মাইনে দিচ্ছেন পীতাম্বরবাবু, আর খাওয়া দিচ্ছেন আপনারা। মালিটা আছে কতদিন?'

সজলবাবু বলিলেন, 'ও বাড়ির পুরোনো মালিকের আমল থেকেই আছে। পীতাম্বরবাবু বাড়িটা কেনার পর ওকে কাজের লোক দেখে ওকেই রাখেন।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনাদের পুরোনো চাকর তো এ-বাড়িতে আসার দু-দিন পরেই পালিয়েছে। তাহলে আপনাদের যে-চাকরটা যুগলকিশোরের সঙ্গে কথা বলছিল, সে কবে কাজে বহাল হয়েছে?'

'ও বহাল হয়েছে পুরোনো চাকরটা চলে যাওয়ার দিন দশেক পরে।'

'কে ওকে জোগাড় করে দিয়েছে?'

'পীতাম্বরবাবু।'

ব্যোমকেশ সোজা হইয়া বসিল। তারপর বলিল, 'পীতাম্বরবাবু? কীরকম?'

সজলবাবু বলিলেন, 'আপনাকে তো আগেই বলেছি যে, আমরা এ-বাড়িতে আসবার পরে পীতাম্বরবাবু যে ক'দিন কলকাতায় ছিলেন মাঝে-মাঝে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। আমাদের সে চাকরটা যখন পালাল, তখন পীতাম্বরবাবু কলকাতাতেই ছিলেন। তার পালানোর দু-দিন পরে তিনি আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। তখন আমরা তাঁকে কীভাবে বাজে ভয় পেয়ে আমাদের চাকরটা চলে গেছে এবং চাকরের অভাবে আমাদের কত কষ্ট হচ্ছে তা বললাম। তিনি শুনে বললেন, "ঠিক আছে। কলকাতায় এসে আমি আমার কাজের জন্যে একটা চাকর রেখেছি। আমি তো ক'দিন বাদেই মিরাটে চলে যাব। তাকে আর নিয়ে যাব না, ওখানে আমার অনেক চাকর আছে। ওকেই আপনারা নিতে পারেন। লোকটাকে যদিও আমি অল্পদিন ধরে দেখছি, তাহলেও সে যে সৎ আর কাজের লোক তা আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি।" এর সাত-আট দিন বাদেই পীতাম্বরবাবু মিরাটে চলে গেলেন আর চাকরটাকে আমাদের কাছে দিয়ে গেলেন। লোকটা সত্যিই

বেশ কাজের। স্বভাব-চরিত্রও ভালো।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ওর কোনও বৈশিষ্ট্য কি আপনাদের নজরে পড়েছে?'

সজলবাবু একটু চুপ করিয়া রহিলেন। তারপর ধীরে-ধীরে বলিলেন, 'বৈশিষ্ট্য যে ওর কিছু নেই তা নয়। রোজ বিকেলের দিকে ও হঠাৎ খুব অস্বাভাবিক রকম চনমনে হয়ে ওঠে। তখন ওর কাজে যেমন খুব উৎসাহ দেখা যায়, তেমনি ফুর্তিটা খুব বেড়ে ওঠে। রাত সাড়ে সাতটা-আটটার সময় ওর এ ভাবটা কেটে যায়। তারপর আবার এর ঠিক উলটোটা হয়। তখন ও আর কোনও কাজই করতে পারে না। ঘুমিয়ে পড়ে। তখন ওকে তুলে খাওয়াতে অবধি আমাদের বেগ পেতে হয়। ভাগ্যিস রাত্রে আমাদের বিশেষ কাজ থাকে না। তা না হলে ওকে নিয়ে আমাদের অনেক অসুবিধে হত।'

এ-কথা শুনিয়া ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ কী ভাবিল। তাহার পর বলিল, 'আর কোনও বৈশিষ্ট্য নেই?'

সজলবাবু বলিলেন, 'আরও একটা বৈশিষ্ট্য আছে। ও ভারী পিটপিটে স্বভাবের। সর্বক্ষণ ঘর বারান্দা বাগান ঝাঁট দেয়, এমন কি রান্নাঘরের উনুনের ছাইগুলো অবধি বারবার টেনে বার করে পরিষ্কার করে। ছাই, ময়লা, ধুলো-বালি সব কিছু জঞ্জাল একটা টিনে জড়ো করে। টিনটা ভরতি হয়ে গেলে জঞ্জালগুলো মোড়ের ডাস্টবিনটাতে ফেলে দিয়ে আসে।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ওর এই অস্বাভাবিক পরিচ্ছন্নতা দেখে আপনাদের কিছু মনে হয়নি?'

সজলবাবু বলিলেন, 'তা হয়েছে। তবে ও নিজের থেকেই আমাদের বলেছে যে, বড়বাবু অর্থাৎ পীতাম্বরবাবু, ওকে দিনরাত বারবার করে বাড়ির জঞ্জাল সাফ করতে বলে গেছেন। অবশ্য পীতাম্বরবাবু যে সত্যিই এ-কথা বলেছেন তা আমাদের মালি দুখীরামও বলেছে। দুখীরাম বলেছে, পীতাম্বরবাবু তাকে ডেকে বলেছিলেন যে, বাড়িতে যে-ই থাকুক না কেন তাঁর বাড়ি সর্বক্ষণ পরিষ্কার থাকা চাই। সুতরাং দুখীরাম যেন সবসময় রঘুকে তাগাদা দিয়ে বাড়ি সাফ করায় এবং কোনও কারণে রঘু অক্ষম হয়ে পড়লে সে যেন নিজে এই কাজ করে। রঘুকে অবশ্য দুখীরামের তাগাদা দিতে হয় না। তবে সন্ধ্যার পরে যখন রঘু ঢুলতে শুরু করে, তারপর আর সে ঝাঁটপাট দেয় না। তাই রাত্রিতে দুখীরামই বারকয়েক বাড়ি ঝাঁট দেয় আর জঞ্জালগুলো ডাস্টবিনে ফেলে আসে।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'তাহলে আপনাদের বাড়িতে ভৃত্য শ্রেণির লোক বলতে এই রঘু আর দুখীরাম?'

সজলবাবু বলিলেন, 'না। করুণাও আছে। সে আমাদের cook। তবে whole-time নয়, part-time। দিনে সে একটা অফিসে পিওনের কাজ করে।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'সে কতদিন এসেছে?'

সজলবাবু বলিলেন, 'সে-ও আমরা এ-বাড়িতে আসার ক'দিন পরেই এসেছে। একদিন সকালে আমি আর বউদি বারান্দায় বসে আছি, এমন সময় সে এসে নমস্কার করে বলল যে, চন্দ্রমল আগরমলের একটা অফিসে সে পিওনের কাজ করে। সে বেশ ভালো রাঁধতে পারে। আমরা যদি তাকে অল্প মাইনে আর খাওয়া দিই, তাহলে সে সকাল বিকেল আমাদের রেঁধে দিতে পারে। আমাদের পুরোনো রান্নার লোক মাসআষ্টেক আগেই চলে গিয়েছিল। এতদিন বউদিই রাঁধছিলেন। তবে অফিস করে দু-বেলা রাঁধতে তাঁর খুব কষ্ট হচ্ছিল। তাই আমরা করুণাকে রাখলাম।''

ব্যোমকেশ বলিল, 'তার সম্বন্ধে কোনও কিছু না জেনেই?'

সজলবাবু বলিলেন, 'বউদি বললেন, ''আমি মানুষের মুখ দেখে বুঝতে পারি সে কেমন লোক। এ যে খারাপ লোক নয়, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।'' বউদি এই কথা বলায় আমি বা দাদা আর অমত করলাম না।'

এ কথা শুনিয়া আমি অতি কষ্টে হাসি চাপিলাম। ব্যোমকেশ বলিল, 'করুণার মধ্যে কোনও

বৈশিষ্ট্য আপনি লক্ষ করেছেন?'

সজলবাবু বলিলেন, 'করুণার বৈশিষ্ট্য বলতে একটা জিনিস আমার চোখে পড়েছে যে, ইদানীং ও যখন খুশি অফিসে যায়, যখন খুশি ফেরে। অর্থাৎ, অনেক দিন সে খুব দেরি করে অফিসে যায়, আবার অনেক দিন খুব সকাল-সকাল অফিস থেকে ফিরে আসে। আর-একটা জিনিস, ও রোজ অনেকগুলো করে চিঠি লেখে। কাকে লেখে, তা জানি না।'

সজলবাবুর কথা শুনিয়া ব্যোমকেশ চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল। সজলবাবু বলিলেন, 'ব্যোমকেশবাবু! আপনাকে তো সমস্ত ব্যাপার খুলে বললাম। এখন বলুন আপনার এ সম্বন্ধে কী মনে হয়?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'বলব। তবে তার আগে আমার একটা জিনিস জানা দরকার।'

'কী জিনিস?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'জানা দরকার—আপনাদের চাকর-রাঁধুনি-মালি এদের পায়ের তলা, গোড়ালি আর আঙুলগুলো কী ধরনের।'

ব্যোমকেশের কথা শুনিয়া সজলবাবু হতচকিত হইলেন। তারপর বিস্ময়পূর্ণ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এই আপনার জিজ্ঞাস্য?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'হ্যাঁ! এই!'

সজলবাবু ব্যোমকেশের কথা শুনিযা একটু চুপ করিয়া রহিলেন। তাবপর আস্তে-আস্তে বলিলেন, 'কিন্তু তাদের পায়ের তলা কীবকম, তা তো আমি কোনওদিন লক্ষ করিনি ব্যোমকেশবাবু।' তাঁহার কণ্ঠস্বরে একটা নৈরাশ্যের ভাব ফুটিয়া উঠিল।

ব্যোমকেশ বলিল, 'তাহলে এখন তা লক্ষ করুন। তাবপর—।'

ব্যোমকেশের কথা শেষ হইবার পূর্বেই বিকাশ ছুটিতে-ছুটিতে ঘরের মধ্যে প্রবেশ কবিল। প্রবেশ করিয়া সে হাঁফাইতে-হাঁফাইতে বলিল, 'স্যার! বংশীবদনের আস্তানার সন্ধান পেয়েছি।'

বিকাশের কথা শুনিয়া ব্যোমকেশ প্রায় লাফাইয়া উঠিল। তারপর বলিল, 'অ্যাঁ! বংশীবদনেব বাসার সন্ধান পাওয়া গেছে৷ দাঁড়াও, এক্ষুনি আমি বেবোচ্ছি।'

এই বলিয়া ব্যোমকেশ দ্রুতপদে ভিতরে চলিয়া গেল এবং দুই-এক মিনিটের মধ্যে জামা-কাপড় বদলাইয়া বাহিরে আসিয়া বলিল, 'অজিত।· আমি চললাম৷ কখন ফিরব তার ঠিক নেই। সত্যবতীকে বলে এলাম দেরি হলে সে যেন না ভাবে। তুমি কোথাও বেরিয়ো না। আমায় কেউ কিছু বলতে এলে তা note করে রাখবে। কোনও টেলিফোন কল এলে কী বলে শুনে রাখবে। কেউ আমার সঙ্গে দেখা করতে এলে বলবে আজ কাল দু-দিন দেখা হবে না। ভীষণ ব্যস্ত আছি।' তারপর সে সজলবাবুর দিকে ফিরিয়া বলিল, 'তাহলে ওই কথাই রইল।' বলিয়া সজলবাবুর উত্তবেব অপেক্ষা না করিয়া বিকাশকে লইয়া চলিয়া গেল।

ব্যোমকেশ প্রস্থান করিবার সঙ্গে-সঙ্গে সজলবাবুও চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং 'আচ্ছা। চললুম। নমস্কার।' বলিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

(অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের জবানি শেষ)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ব্যোমকেশ বক্সীর বাসা হইতে বাহির হইয়া অধ্যাপক সজলকুমার সেন হ্যারিসন রোড ধরিয়া হাঁটিয়া আমহার্স্ট স্ট্রিটের মোড়ে আসিয়া পড়িল। সেখান হইতে সে ৩বি নং বাসে চাপিল। চাপিয়া একেবারে নামিল বিবেকানন্দ রোড ও আমহার্স্ট স্ট্রিটের মোড়ে। সেখান হইতে মানিকতলা রোড ধরিয়া

সজলকুমার হাজির হইল ডাফ স্ট্রিটে।

ডাফ স্ট্রিটে পৌঁছাইয়া সজল একজন লোককে জিজ্ঞাসা করিল, 'আচ্ছা, মিঃ হুকা-কাশি এখানে কোন বাড়িতে থাকেন বলতে পারেন?'

লোকটি জিজ্ঞাসা করিল, 'বাড়ির নম্বর কত?'

'নম্বরটা ঠিক জানি না।'

'নম্বর না জানলে কি কলকাতায় বাড়ি খুঁজে পাওয়া যায় মশাই? কে হুকা-কাশি, আমি চিনি না।'

সজল আরও দুই-তিনজন লোককে জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু দেখা গেল কেহই হুকা-কাশিকে চেনে না। একজন আবার রসিকতা করিয়া বলিল, 'হুঁকা কাশি? তিনি আবার কে? তাঁর বুঝি হুঁকা টানলেই কাশি পায়—তাই এই নাম?'

সজল আর-একজন ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করিল। তিনি বলিলেন, 'হুকা-কাশি? অদ্ভুত নাম তো! কোথাকার লোক?'

সজল বলিল, 'জাপানের।'

'জাপানের? ও হো-হো। একজন জাপানি ভদ্রলোক ডাফ স্ট্রিটে থাকেন বটে। তাঁকে ওই দিক থেকে আসতে দেখেছি, কিন্তু কোনটা তাঁর বাড়ি তা তো বলতে পারব না মশাই।'

বিখ্যাত ডিটেকটিভ হুকা-কাশিকে তাঁর পাড়ার লোকরা চেনে না! দুই একজন তাঁহাকে লক্ষ করিযাছে তিনি জাপানি বলিয়া! ডিটেকটিভ হিসাবে এখানে তাঁহার কোনও খ্যাতি নাই! ইহাতে সজল খুবই বিস্মিত হইল।

যাহা হউক, ভদ্রলোক যে দিকের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়াছিলেন, সেইদিকে গিয়া সজল একটা লন্ড্রিতে জিজ্ঞাসা করিল, 'আচ্ছা! জাপানি ডিটেকটিভ মিঃ হুকা-কাশি এখানে কোন বাড়িতে থাকেন, বলতে পারেন?'

লন্ড্রির লোকেরা বলিল, 'একজন মিঃ হুকা-কাশির কাপড় আমরা কাচি, তবে তিনি ডিটেকটিভ কি না তা বলতে পারব না।'

'তাঁর বাড়িটা কোথায়?'

'ওই যে, তাঁর বেয়ারা অমৃত আসছে। অমৃত, এই ভদ্রলোক তোমার সায়েবকে খুঁজছেন। নিয়ে যাও এঁকে।'

অমৃত তখন বাজার করিয়া ফিরিতেছিল। সজল তাহার সঙ্গে-সঙ্গে গিয়া একটি ফটকওয়ালা বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিল। অমৃত সজলকে বৈঠকখানা ঘরে বসাইয়া বলিল, 'এজ্ঞে! আপনি বসুন। আমি ওনাকে খবর দিচ্ছি।' সজল অমৃতের হাতে তাহার কার্ড দিল।

অল্পক্ষণ পরে হুকা-কাশি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হুকা-কাশির বয়স হইয়াছে, তবে শরীরটি এখনও সম্পূর্ণ মজবুত। তিনি বলিলেন, 'অধ্যাপক সজলকুমার সেন? ঠিক চিনতে পারলাম না তো।'

সজল বলিল, 'আপনি আমায় চিনবেন না। আমিও এর আগে আপনাকে চোখে দেখিনি। তবে আপনার খ্যাতি শুনেছি, বইয়ে আপনার কথা পড়েছি।'

হুকা-কাশি বলিলেন, 'বইয়ে পড়েছেন? সে বইগুলো তো এখন আর পাওয়া যায় না। আর খ্যাতি? মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য বহুকাল মারা গেছেন, তারপর থেকে আমার কথা আর তো কেউই লেখে না। এখন আমাকে সবাই ভুলেই গেছে। সে যাক, যে-কারণের জন্যে আমার কুটিরে মশায়ের পদধূলি পড়েছে, সেটা কী তা জানতে পারি?'

সজল বলিল, 'একটা রহস্য আমি কিছুতেই ভেদ করতে পারছি না। আপনাকে তার কথা বলতে এসেছি, আপনি যদি দয়া করে এ সম্বন্ধে একটু পরামর্শ দেন।'

হুকা-কাশি বলিলেন, 'রহস্যভেদ? কিন্তু আমি তো গোয়েন্দাগিরি অনেক দিন ছেড়ে দিয়েছি মশাই।'

সজল বলিল, 'আপনি গোয়েন্দাগিরি ছেড়ে দিয়েছেন? নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে আপনি ঠাট্টা করছেন মিঃ হুকা-কাশি!'

'ঠাট্টা নয় সজলবাবু। সত্যিই আমি গোয়েন্দাগিরি ছেড়ে দিয়েছি। সেইজন্যেই এখন আমায আর বিশেষ কেউ চেনে না—এমনকি এ পাড়ায় যারা হালে এসেছে তারাও চেনে না।'

সজল বলিল, 'কিন্তু কেন আপনি গোয়েন্দাগিরি ছেড়ে দিলেন?'

হুকা-কাশি বলিলেন, 'আপনাদের ঋষিরা একটি সুন্দর কথা বলে গিয়েছেন, "অন্নচিন্তা চমৎকারা।" সেই চমৎকারা অন্নচিন্তাই আমাকে গোয়েন্দাগিরি ছাড়িয়েছে।'

সজল বলিল, 'তার মানে? ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না।'

হুকা-কাশি বলিলেন, 'বুঝতে কী করে পারবেন সজলবাবু? আপনারা আমার সম্বন্ধে যা কিছু জানেন, সমস্তই ১৯৩৯ সালের আগের ব্যাপার। তারপর থেকে আমাব জীবনে যে একের পর এক কত বিপর্যয় গেছে, তা তো আপনারা জানেন না।'

সজল বলিল, 'আপনার যদি আপত্তি না থাকে তো দয়া কবে সংক্ষেপে একটু বলুন না।'

হুকা-কাশি বলিলেন, 'না শুনে ছাড়বেন না? বেশ, তাহলে বলছি। ১৯৩৯ সালের গোড়ার দিকে মনোরঞ্জনবাবু মারা গেলেন—আমার কথা বাইরে প্রচার হওয়া বন্ধ হল। ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বরে যুদ্ধ বাধল। ১৯৪১ সালের ডিসেম্বরে জাপান যুদ্ধে নামল আর সঙ্গে-সঙ্গে বেচারা হুকা-কাশিকে যেতে হল ফাটকে।'

সজল সবিস্ময়ে বলিল, 'ফাটকে? কেন?'

'কারণ আমি জাপানি, ইংরেজদের শত্রু দেশের লোক। চার বছর ফাটকে আটক ছিলাম। এই চার বছর ইংরেজ সরকার আমার এই ডাফ স্ট্রিটের বাড়িটা দখল করে এখানে তাদের প্রচার অফিস বসিয়ে ভূতের নৃত্য চালিয়েছিল।' হুকা-কাশির কণ্ঠস্বরে বেশ খানিকটা তিক্ততা ফুটিয়া উঠিল।

তাহার পর হুকা-কাশি বলিলেন, '১৯৪৫ সালেব আগস্টে যুদ্ধ শেষ হল, আমিও ছাড়া পেলাম। কিন্তু শান্তি আমার অদৃষ্টে লেখা ছিল না। মাস কয়েক বাদে দেশ থেকে বউদির চিঠি এল—দাদার মারাত্মক অসুখ—অবিলম্বে যেন আমি দেশে চলে আসি। তখন আমার যা কিছু টাকাকড়ি ছিল, সব তুলে নিয়ে দেশে গেলাম। সে সময় টাকা বাইরে নিয়ে যাওয়ার কোনও বাধা ছিল না। দেশে গিয়ে প্রাণপণে চেষ্টা করলাম—চিকিৎসা করিয়ে দাদাকে সারিয়ে তুলতে। কিন্তু দাদা বাঁচলেন না। এক বছর বাদে তিনি স্ত্রী আর তিনটি বাচ্চা ছেলেকে রেখে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন। কিন্তু তাঁর চিকিৎসায় আমার যথাসর্বস্ব তখন খরচ হয়ে গেছে।

'দাদা মারা যাওয়ার পর অনেকে আমায় দেশে থেকে তাঁর সংসার প্রতিপালন করতে বললেন, কিন্তু আমার আর জাপানে থাকতে ভালো লাগছিল না। কারণ প্রথম যখন দেশ ছেড়েছিলাম, তারপর বহু বছর কেটে গেছে। ইতিমধ্যে দেশটা একেবারে বদলে গেছে। তার ওপর তখন সারা দেশটাতে ছড়িয়ে ছিল যুদ্ধে সদ্য পরাজয়ের গ্লানি। আমি যে এতকাল কলকাতায় থেকে মনে-প্রাণে বাঙালি হয়ে গেছি, তা জাপানে যাওয়ার পব ভালো করেই উপলব্ধি করেছিলাম। কিছুদিন যেতে না যেতেই ডাফ স্ট্রিটের এই বাড়িটাতে ফেরবার জন্যে আমার প্রাণ আইঢাই করতে শুরু করেছিল।

'এদিকে বউদি আর দাদার ছেলে তিনটিকে দেখবার আমি ছাড়া তখন আর কেউ নেই। ছেলে তিনটির একটি ছ'বছরের, একটি চার বছরের আর একটি দু-বছরের। আমি বউদি আর বাচ্চা তিনটিকে নিয়ে এখানে ফিরে এলাম। এখানে এসে তো বসলাম, কিন্তু পেট চলবে কেমন করে? আর ছেলে তিনটিকে মানুষই বা করব কেমন করে? রোজগারের চিন্তাই তখন প্রধান হয়ে দাঁড়াল।'

সজল বলিল, 'কেন মিঃ হুকা-কাশি? আপনি আবার আগেকার মতো রহস্যভেদ করার কাজ

নিতে লাগলেন না কেন? যাঁরা আপনাকে রহস্যভেদের জন্যে নিয়োগ করতেন, তাঁরা নিশ্চয়ই ভালো পারিশ্রমিক দিতেন। আগে তো রহস্যভেদ করাই ছিল আপনার একমাত্র জীবিকা।'

হুকা-কাশি বলিলেন, 'ধীরে, সজলবাবু, ধীরে। আমি যখন আবার এ দেশে ফিরলাম, তখন এখানে আমায় কে চেনে? যিনি আমার কথা লিখে বাইরে প্রচার করতেন, তিনি অনেক দিন আগে মারা গেছেন। তা ছাড়া এর আগের ক'বছরের কতক আমার কেটেছে ফাটকে, কতক জাপানে। এতদিন লোকের সামনে থেকে সরে আছি, লোকে আমাকে মন থেকে নিঃশেষে মুছে ফেলেছে। এখন আমাকে কে রহস্যভেদ করতে ডাকবে? ইতিমধ্যে এদেশে অনেক ভালো-ভালো নতুন গোয়েন্দা উঠেছেন। তারপর ব্যোমকেশবাবু এখানে সশরীরে বর্তমান রয়েছেন। এঁদের বাদ দিয়ে লোকে আমাকে রহস্যভেদের ভার দেবে কেন? পুলিশের সঙ্গেও আমার কোনওদিনই এমন কিছু দহরম-মহরম ছিল না যার জন্যে পুলিশ আমার সাহায্য নিতে আসবে। তা ছাড়া আমি যে সবরকমেরই রহস্যভেদ করার কাজে লাগি, তা-ও নয়। খুন-জখম সংক্রান্ত রহস্যের দিকে আমার কোনও আগ্রহ নেই।'

সজল বলিল, 'তাই তো! আপনি কোনও খুনের রহস্যের কিনারা করছেন, এমন কাহিনি তো আমি একটাও পড়িনি।'

হুকা-কাশি বলিলেন, 'তবেই বুঝতে পারছেন। চুরি-জোচ্চুরি সংক্রান্ত রহস্যের উদ্‌ঘাটন, অপহৃত মণিরত্নের উদ্ধার প্রভৃতি কাজেই আমি আত্মনিয়োগ করতাম, তা-ও কেবলমাত্র সেইসব কেসই নিতাম, যাতে কিছু মাথা খাটানো যায়। বাইরে পরিচয় নেই, প্রচার নেই, এরকম অবস্থায় এই জাতীয় কেস ক'টাই বা পাওয়া যায়, আর কী-ই বা তাতে রোজগার হয়? তাই জীবিকা নির্বাহের অন্য পথ দেখতে বাধ্য হলাম। বউবাজারের Foreign Language Teaching Institute-এ জাপানি ভাষা শেখাবার কাজ নিলাম। সে-কাজ এখনও করছি। কিন্তু এতে যে মাইনে পাওয়া যায়, তাতে আমার সব খরচ কুলোয় না। তাই রোজগারের আর-একটা উপায় দেখতে হল।'

এই বলিয়া হুকা-কাশি সজলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনি আমাদের রণজিৎবাবুকে জানেন?'

সজল বলিল, 'বা রে! আপনাকে জানি আর তাঁকে জানি না? তিনি তো আপনারই ছায়া।'

হুকা-কাশি বলিলেন, 'রণজিৎবাবুদের আগে বিরাট জমিদারি ছিল, তার সবই পাকিস্তানে পড়ে গেছে। এখানে ওঁদের বড় ব্যাবসাও ছিল, কিন্তু ওঁর বাবা অনেক টাকা লোকসান দেওয়ার ফলে তাও উঠে গেছে। অবশ্য এখনও ওঁদের বাড়ি, গাড়ি সবই আছে, কিন্তু নগদ পয়সার তেমন জোর নেই। এদিকে রণজিৎবাবু বিয়ে করেছেন, অনেকগুলি ছেলেপিলেও হয়েছে। তাই তাঁর অর্থের প্রয়োজন। রণজিৎবাবু সবরকমের খেলাধূলা আর সাঁতারে ওস্তাদ, তা আপনি জানেন বোধহয়?'

সজল বলিল, 'সে-কথা তো বইয়েই পড়েছি।'

হুকা-কাশি বলিলেন, 'কয়েক বছর হল আমি আর রণজিৎবাবু মিলে ভবানীপুরে ব্যায়াম আর সাঁতার শেখানোর একটা স্কুল খুলেছি। এতে রণজিৎবাবু কিছু-কিছু ব্যায়াম শেখান, তবে তিনি প্রধানত সাঁতারটাই শেখান—ছেলেদের লেকে নিয়ে গিয়ে। আর আমি শেখাই নানারকম ব্যায়াম আর আমাদের দেশের বিদ্যেটা।'

সজল বলিল, 'দেশের বিদ্যে?'

হুকা-কাশি বলিলেন, 'অর্থাৎ, যুযুৎসু। এই স্কুলটা থেকে আমাদের কিছু আয় হয়। এর ছাত্রের সংখ্যা দিন-দিন বাড়ছে। এ ছাড়া বাইরে থেকে আমাদের মাঝে-মাঝে সাঁতার আর ব্যায়ামের ফিট্‌স দেখাবার আমন্ত্রণ আসে। এই ফিট্‌স দেখিয়েও কিছু পয়সা পাওয়া যায়। এখন এরকম একটা আমন্ত্রণ এসেছে। আজই আমরা বেরিয়ে পড়ব। বিহারের বিভিন্ন শহরে আমাদের ফিট্‌স দেখাতে হবে।'

সজল বলিল, 'কখন রওনা হবেন?'

হুকা-কাশি বলিলেন, 'বিকেলের ট্রেনে। সে যাক, আপনি যখন এসেছেন তখন আপনার সমস্যার কথা বলুনই একবার। দেখি যদি আপনাকে কোনও পথের হদিশ দিতে পারি।'

সজল সমস্ত ব্যাপারটা ব্যোমকেশকে যেমনভাবে বলিয়াছিল সেইভাবেই হুকা-কাশিকে গোড়া হইতে শেষ পর্যন্ত বলিল, ব্যোমকেশের প্রশ্নের উত্তরে সে যে-সমস্ত কথা বলিয়াছিল সেগুলিও বাদ দিল না।

হুকা-কাশি শুনিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। সজল বলিল, 'কিছু বুঝতে পারছেন?'

হুকা-কাশি বলিলেন, 'ব্যাপারটা একেবারে ধরা-ছোঁয়ার অতীত নয়।'

সজল বলিল, 'আমি যা বললাম, তা ছাড়া আপনি আর কোনও কথা জানতে চান? আমাদের চাকর-মালি-রাঁধুনি—এদের সম্বন্ধে আপনি কিছু জানতে চান?'

হুকা-কাশি চিন্তা করিতে করিতেই বলিলেন, 'ওদের সম্বন্ধে—ওদের সম্বন্ধে তো আপনি সব কথাই বলেছেন। ভালো কথা—ওদের মধ্যে একজন একটু পেটরোগা—তাই না?'

এ-কথা শুনিয়া সজল অতিশয় বিস্মিত হইয়া বলিল, 'পেটরোগা? কই, সেরকম তো কিছু জানি না!'

হুকা-কাশি বলিলেন, 'ওঃ! জানেন না। আচ্ছা, খোঁজ নিয়ে দেখুন তো, নিশ্চয়ই ওদের মধ্যে একজন পেটরোগা।'

সজল বলিল, 'তাই যদি হয় তো আপনি সে-কথা জানলেন কেমন করে?'

হুকা-কাশি বলিলেন, 'মানে—আমি আপনার রহস্যটা সম্বন্ধে যতখানি বুঝেছি, তাতে আপনাদের চাকর-মালি-রাঁধুনিদের মধ্যে একজনকে পেটরোগা হতেই হবে।'

সজল এ-কথা শুনিয়া বিস্ময়ে একেবারে হতবাক হইয়া গেল।

ঠিক এই সময় বাহিরে একটা গাড়ি থামার শব্দ শুনা গেল। ক্ষণকাল পরেই ভিতরে যে-ব্যক্তি আসিয়া ঢুকিল, তাহার বয়স সজলের তুলনায় অনেক বেশি, কিন্তু চেহারাটি দেখিবার মতো। গৌরবর্ণ, দীর্ঘকায়, স্বাস্থ্যপুষ্ট চেহারা। সজলের বুঝিতে অসুবিধা হইল না যে, এ-ই রণজিৎ।

রণজিৎ হুকা-কাশিকে বলিল, 'এ কী, মিঃ হুকা-কাশি, আপনি এখনও নির্বিকারভাবে বসে আছেন। এদিকে আমাদের যে বিকেল চারটের সময় বেরোতে হবে।'

হুকা-কাশি বলিলেন, 'আমি তো একেবারে তৈরি। বউদি আর অমৃত জিনিসপত্রগুলোকে বাঁধাছাঁদা করছে।'

হুকা-কাশি সজলের সঙ্গে রণজিতের আলাপ করাইয়া দিলেন। সজল রণজিতের কাছেও তাহার সমস্যার কথা সংক্ষেপে বলিল। শুনিয়া রণজিৎ বলিল, 'আজ তো আমরা বেরিয়ে যাচ্ছি। আমরা ফেরবার পরে আর-একদিন আসবেন। তখন এ-বিষয়টা নিয়ে ভালো করে আলোচনা করা যাবে।'

সজল বলিল, 'আচ্ছা, আমি তাহলে এখন উঠি মিঃ হুকা-কাশি। বেলা প্রায় এগারোটা বাজে।'

হুকা-কাশি বলিলেন, 'হ্যাঁ। আপনার বাড়ি ফিরতে প্রায় বারোটা বাজবে। সকাল সাড়ে ছ'টার আগেই বাড়ি থেকে বেরিয়েছেন। তারপর এতক্ষণ বাইরে-বাইরে।'

সজল সবিস্ময়ে বলিল, 'সকাল সাড়ে ছ'টার আগে যে বাড়ি থেকে বেরিয়েছি, সে-কথা আপনি কী করে জানলেন?'

হুকা-কাশি বলিলেন, 'সে-কথা তো আপনার গায়েই লেখা আছে।'

সজল বলিল, 'গায়ে লেখা আছে! তার মানে?'

হুকা-কাশি বলিলেন, 'তার মানে এই। আপনি লেক অঞ্চলে থাকেন। ওখানে আমার এক বন্ধুও থাকেন। ন'টার সময় তিনি আমায় ফোন করেছিলেন। তিনি বললেন যে, সাড়ে ছ'টা থেকে ওই অঞ্চলে প্রচণ্ড বৃষ্টি নেমেছিল, আধ ঘণ্টাটাক আগে বন্ধ হয়েছে। আপনি যখন এখানে এলেন, তখন বেলা প্রায় দশটা বাজে। প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে কেউ খুব সাংঘাতিক দরকার ছাড়া বাড়ি থেকে বেরোয় না, বেরোলেও সঙ্গে ছাতা নেয়। কিন্তু আপনার সঙ্গে ছাতা নেই। অবশ্য ছাতাটা আপনি বৃষ্টি বন্ধ হওয়ার পরে কোথাও ফেলে আসতে পারেন। কিন্তু আপনার জামাকাপড় যেরকম শুকনো

আর পরিষ্কার রয়েছে, বেশি বৃষ্টির সময় ছাতা নিয়ে বেরোলে সেরকম থাকে না। অতএব আপনি বৃষ্টির সময়ে কখনওই বাড়ি থেকে বেরোননি—হয় তার আগে বেরিয়েছেন, না হয় পরে। বৃষ্টির পরে সাড়ে আটটা থেকে সওয়া ন'টার মধ্যে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আপনি অবশ্য দশটার আগেই এখানে পৌঁছোতে পারেন। কিন্তু ওই সময়ে ওই অঞ্চলের রাস্তাঘাট নিশ্চয়ই জল-কাদায় প্যাচপ্যাচ করছিল, কারণ তার আগেই দু-ঘণ্টা মুষলধারে বৃষ্টি হয়ে গেছে। আপনি হাওয়াইয়ান চটি পরে এসেছেন। বাড়ি থেকে ট্রাম বা বাসের স্টপেজটুকু আপনাকে হাঁটতেই হবে। চটি পরে জল-কাদায় প্যাচপেচে রাস্তা দিয়ে হাঁটলে জামার পেছন দিকে ছিট-ছিট কাদা লাগবে—খুব পা চেপে হাঁটলেও একটু না একটু লাগবেই। কিন্তু আপনার পাঞ্জাবির পেছনদিকে কাদার কোনও চিহ্ন নেই। এর থেকে বুঝলাম আপনি বৃষ্টির পরে নয়—বৃষ্টির আগে—অর্থাৎ, সকাল সাড়ে ছ'টার আগে বাড়ি থেকে বেরিয়েছেন।'

সজল হুকা-কাশির পর্যবেক্ষণ-শক্তির কথা আগেই বইয়ে পড়িয়াছিল, এখন তার প্রত্যক্ষ পরিচয় পাইয়া সে মুগ্ধ হইয়া গেল। হুকা-কাশি ও রণজিৎকে নমস্কার জানাইয়া সজল হুকা-কাশির বাড়ি হইতে বাহির হইয়া আসিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সজলকুমার সেনের জবানি

সকাল সওয়া ছ'টার সময় বাড়ি থেকে বেরিয়েছি। তারপর ব্যোমকেশ বক্সীর সঙ্গে দেখা করেছি, হুকা-কাশির সঙ্গে দেখা করেছি। সারা সকালটা এই করে কাটল, কিন্তু যে-রহস্যের কিনারা করার জন্যে ওঁদের দুজনের সঙ্গে দেখা করলাম, সে-রহস্য যেমন ছিল তেমনই রয়ে গেল। ওঁরা এমন দুটো জিনিস জানতে চাইলেন, যা আমি কোনওদিন লক্ষ করিনি। আর লক্ষ করলেই বা রহস্যভেদের পক্ষে যে কী সুবিধা হত, তা তো কিছুতেই বুঝতে পারছি না।

যাহোক, বেলা বারোটার সময় বাড়িতে ফিরে স্নান-খাওয়া করলাম। আজ ছুটি, সুতরাং কলেজ যেতে হবে না। খাওয়ার পর একটু ঘুম দিলাম। ঘুম থেকে উঠে চা-টা খাওয়ার পর ভাবলাম এখন কী করা যায়? ব্যোমকেশ বক্সী আর হুকা-কাশি অবশ্য খুবই বড় গোয়েন্দা। কিন্তু তাঁদের প্রশ্নের ধরন দেখে আমার মনে হল, তাঁরা এ ব্যাপারটাকে মোটেই 'সিরিয়াসলি' নিচ্ছেন না। যাহোক, তাঁরা আমাকে যে-দুটো বিষয় লক্ষ করতে বলেছেন, তা আমি লক্ষ করব। কিন্তু আপাতত আর কোনও অভিজ্ঞ গোয়েন্দার সঙ্গে এ ব্যাপারটা নিয়ে পরামর্শ করলে কেমন হয়?

হঠাৎ আমার মনে হল জয়ন্তর কাছে যাই না কেন? জয়ন্তর সঙ্গে অবশ্য আমার আলাপ নেই, কিন্তু মানিকের সঙ্গে আমার শুধু আলাপ নয়, অন্তরঙ্গতা আছে। আমি আর সে দুজনে একই সময়ে চৌরঙ্গির ওয়াই. এম. সি. এ.-র মেম্বার ছিলাম। দিনের-পর-দিন আমরা একসঙ্গে টেবল টেনিস, ব্যাডমিন্টন, ক্যারম, দাবা খেলেছি। যদিও মানিক আমার চেয়ে বয়েসে অনেক বড়, তবুও দিনের-পর-দিন খেলাধুলা মেলামেশার মধ্যে দিয়ে আমরা পরস্পরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে উঠেছিলাম। মানিকদের বাড়িতেও কতবার গেছি। তার বাবা, দাদা এঁদের সঙ্গেও আমার আলাপ হয়েছে। মানিকের মাধ্যমে আমি সহজেই জয়ন্তর কাছে যেতে পারি।

বিকেল সওয়া চারটের সময় বাড়ি থেকে বেরোলাম। বাগবাজারে মানিকদের বাড়ি পৌঁছতে প্রায় পাঁচটা বেজে গেল। সেখানে গিয়ে কিন্তু মানিকের দেখা পেলাম না। তার দাদা বাড়িতে ছিলেন। আমায় দেখে তিনি বললেন, 'সজল যে। এতদিন পরে?'

আমি বললাম, মানিকের খোঁজে এসেছি।

মানিকের দাদা বললেন, 'মানিকের খোঁজে এই বাড়িতে এসেছ? হায় ভগবান। মানিক তো আজকাল প্রায় সবসময় জয়ন্তর বাড়িতেই থাকে। মাঝে কিছুদিন তো চব্বিশ ঘণ্টাই ওর বাড়িতে থাকত। এখন জয়ন্ত সেরে উঠছে, তাই আজকাল ও দিনে একবার করে এ-বাড়িতে আসে। তবে রাত্তিরে সে ওখানেই থাকে।'

আমি বললাম, 'জয়ন্ত সেরে উঠছে? কেন, জয়ন্তর কী হয়েছিল?'

মানিকের দাদা বললেন, 'তা বুঝি জানো না? বিমল-কুমারের নাম শুনেছ? অ্যাডভেঞ্চারার বিমল-কুমার?'

আমি বললাম, 'নিশ্চয়ই শুনেছি।'

মানিকের দাদা বললেন, 'কী কুক্ষণেই না তাদের সঙ্গে মানিক-জয়ন্তর আলাপ হয়েছিল। বিমল-কুমারের কাজ হচ্ছে যত সব উদ্ভট, দুর্গম আর ভয়ানক জায়গায় গিয়ে যেচে বিপদ ডেকে আনা। মাসকয়েক আগে ওরা বোর্নিওর কাছে একটা অজানা দ্বীপে গিয়েছিল—সেখানে কী এক অদ্ভুত জন্তু আছে, তাদের দেখবার জন্যে। মাঝে-মাঝে ওরা মানিক, জয়ন্ত আর সুন্দরবাবুকেও সঙ্গে টেনে নিয়ে যায়, এবারেও গিয়েছিল। দ্বীপটাতে পৌঁছে অনেকখানি পায়ে হেঁটে যাওয়ার পর তবেই ওরা সেইসব জন্তুগুলোর আস্তানার সন্ধান পায়। তাদের দেখে আর ফটো নিয়ে ওরা ফিরে আসছে, এমনসময় দ্বীপের জংলি বাসিন্দারা ওদের আক্রমণ করে। ওইসব জংলিগুলো ওই জন্তুগুলোকে দেবতা বলে মনে করে। বিদেশি বিধর্মী এই লোকগুলো ওদের দেবতার বাসায় হানা দিয়েছে, ওদের কাছে এ অপরাধের ক্ষমা নেই। তাই তারা সদলবলে এদের ওপর চড়াও হল। জযন্তই দলের মধ্যে সবচেয়ে লম্বা-চওড়া বলে ওরই ওপর ওদের গায়ের ঝাল ছিল সবচেয়ে বেশি। তাই প্রথমেই ওরা জয়ন্তর মাথায় আর পায়ে মেরে দিল লাঠির ঘা। তারপর আমাদের বাবুরা বন্দুক ছুড়ে ওদের তাড়াল বটে, কিন্তু ততক্ষণে জয়ন্তর মাথা ফেটে গেছে, পা-ও ভেঙে গেছে। অবশ্য প্রাণের কোনও ভয় ছিল না। ওরা জয়ন্তকে নিয়ে জাহাজে ফিরে এল, তারপর দেশে ফিরল। দেশে ফেরবার পর জয়ন্ত অনেকদিন শয্যাশায়ী হয়েছিল, এখন সেরে উঠেছে—তবে এখনও তার বেশি চলাফেরা করা বারণ। তুমি যদি মানিকের সঙ্গে দেখা করতে চাও তো সোজা জয়ন্তর বাড়ি চলে যাও।'

মানিকের দাদার কাছ থেকে জয়ন্তর ঠিকানা নিয়ে আমি সেদিকেই রওনা হলাম। জয়ন্তর বাড়ি পৌঁছে কলিংবেল টিপতে জয়ন্তর চাকর মধু এসে দরজা খুলে দিল। আমি বললাম, 'মানিক আছে?'

মধু বলল, 'আছেন। আপনার নাম?'

আমি তাকে আমার কার্ড দিতে সে ওপরে উঠে গেল। খানিক বাদে মানিক নেমে এসে বলল, 'আরে সজল! তুমি হঠাৎ!'

আমি বললাম, 'আর ভাই, একটা গোলমেলে ব্যাপারের কিনারা করতে না পেরে তোমার কাছে এসেছি। তোমার বন্ধু জয়ন্তবাবু বোধহয় এ ব্যাপারে আমাকে সঠিক পরামর্শ দিতে পারবেন। তা তাঁর সঙ্গে আমার একটু আলাপ করিয়ে দেবে?'

মানিক বলল, 'জয়ন্তর সঙ্গে পরামর্শ করতে চাও? অবশ্য পরামর্শ করতে কোনও বাধা নেই। কিন্তু জয়ন্তর বেশি ওঠা-হাঁটা বা চলাফেরা করা বারণ। এ অবস্থায় পরামর্শ দেওয়ার বেশি আর কোনও সাহায্য ও করতে পারবে না। যাক, তুমি চলো, জয়ন্তর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। সুন্দরবাবুও ওপরে আছেন। পুলিশের চাকরি থেকে রিটায়ার করার পরে তিনি বেশিরভাগ সময় এখানেই থাকেন। তাঁর সঙ্গেও তোমার আলাপ করিয়ে দেব। চলো।'

মানিক আমাকে নিয়ে গেল দোতলায় জয়ন্তর শোওয়ার ঘরে। সেখানে ঢুকে দেখি জয়ন্ত তার সাতফুট লম্বা দেহ নিয়ে বিছানায় শুয়ে আছে। বিছানাব পাশেই একটা চেয়ারে বসে আছেন

সুন্দরবাবু, মানিক তাঁর পরিচয় না দিলেও তাঁর কুচকুচে কালো রং, আশ্চর্যরকমের খাঁদা নাক, প্রকাণ্ড চকচকে টাক আর সুবিশাল ভুঁড়ি দেখে আমি তাঁকে অনায়াসেই চিনে নিতে পারতাম।

মানিকের মুখে আমার পরিচয় শুনে সুন্দরবাবু বললেন, 'হুম। আপনি কলেজের প্রফেসর? এই অল্প বয়েসেই আপনি প্রফেসর হয়েছেন?'

মানিক বলল, 'কেন সুন্দরবাবু, আপনার বয়েস তো আরও অল্প। এই তো সেদিন আপনার দুধে-দাঁত ভেঙেছে।'

সুন্দরবাবু এ কথায় মহা খাপ্পা হয়ে বললেন, 'মানিক! আবার, আবার তুমি বাঁদরামি করছ?'

জয়ন্ত বলল, 'বসুন সজলবাবু। মানিক, তুমি মধুকে একটু চা-টা আনতে বলে দাও।'

মানিক চেঁচিয়ে বলল, 'মধু! আমাদের জন্যে তিন কাপ চা আর তিন প্লেট খাবার নিয়ে এসো। আর সুন্দরবাবুর জন্যে এক পিপে চা, এক গামলা খাবার। এর কমে ওঁর ভুঁড়ি ভরবে না।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'চোপরাও মানিক, ইস্টুপিড কোথাকার।'

মধু চা-খাবার নিয়ে এল। জলযোগ পর্ব শেষ হলে আমি বললাম, 'জয়ন্তবাবু, যে জন্যে আপনার কাছে এসেছি, সেটা এবার বলি। আমরা ছ'মাস হল বাড়ি বদল করেছি। নতুন বাড়িতে আসার পর থেকে এমন কয়েকটা ব্যাপার ঘটেছে, যার থেকে মনে হয় এগুলোর ভেতরে একটা রহস্য আছে। কিন্তু সেটা যে ঠিক কী তা বুঝে উঠতে পারছি না। আপনার কাছে সব কথা গোড়া থেকে খুলে বলছি, আপনি যদি শুনে এ সম্বন্ধে আপনার মতটা দয়া করে বলেন—।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'রহস্য? আপনিও রহস্যকে ল্যাজে বেঁধে এনেছেন? হুম! আমি এখন আর রহস্য-টহস্য মোটেই পছন্দ করি না।'

মানিক বলল, 'সুন্দরবাবু যে কেন রহস্য পছন্দ করেন না তা আমি জানি।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'কেন করি না বলো দিকি!'

মানিক বলল, 'রহস্যের পেছনে ছুটলে আপনার এই নধর সুগোল ভুঁড়িখানা চুপসে একেবারে চেপটে যাবে, তাই।'

সুন্দরবাবু চটেমটে বললেন, 'মানিক! আবার তোমার ইয়ারকি? এক চড়ে তোমায় শায়েস্তা করব।'

জয়ন্ত বলল, 'আঃ! কী কাণ্ড বাধিয়েছেন দুজনে?'

সুন্দরবাবু চুপ করলেন।

জয়ন্ত আমায় বলল, 'সজলবাবু, একটা রহস্যের সমাধানের হদিশ চেয়ে আপনি আমার কাছে এসেছেন। রহস্যের সমাধান করার আগ্রহ যে আমার চিরদিনের, তা বোধহয় আপনি জানেন। কিন্তু রহস্যভেদ করার জন্যে গোয়েন্দাকে শুধু মাথা খাটাতে হয় না, শরীরকেও খাটাতে হয়। অর্থাৎ, বিছানায় শুয়ে সব ব্যাপার শুনে তা নিয়ে ভাবলেই রহস্যভেদ করা যায় না। তার জন্যে গোয়েন্দাকে ঘটনার জায়গায় যেতে হয়, নিজের চোখে সব কিছু খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখতে হয় আর খোঁজখবর নিতে হয়। কিন্তু আমার এখন তা করার কোনও উপায় নেই। ক'মাস আমি একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে আছি। এখন সেরে উঠেছি বটে, কিন্তু ডাক্তাররা এখনও আমায় বেশি চলাফেরা করতে বারণ করেছেন। সারা দিনে মাত্র আধঘণ্টা ছাদে আস্তে-আস্তে পায়চারি করার অনুমতি পেয়েছি। আমি যাতে ডাক্তারদের কথার অবাধ্য না হই, সেদিকে মানিক আর সুন্দরবাবুর সবসময় সজাগ দৃষ্টি। এ অবস্থায় আপনাকে আমি খুব বেশি সাহায্য করতে পারব বলে মনে হয় না। তবুও আপনার সব কথা শুনতে আমার কৌতূহল হচ্ছে। আপনি বলুন।'

আমি জয়ন্তকে সব কথা বললাম।

জয়ন্ত শুনে চুপ করে ভাবতে লাগল।

সুন্দরবাবু আমায় বললেন, 'হুম! এমন আজেবাজে ব্যাপার তো কতই ঘটছে। এ নিয়ে এত

মাথা ঘামাচ্ছেন কেন, ইয়ে বাবু,—কী যেন আপনার নাম, ভুলে গেলুম।'

আমি বললাম, 'সজল—শ্রীসজলকুমার সেন।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'সজল? আপনার এরকম নাম কেন হল মশাই? আপনার চোখে বা শরীরের আর কোথাও তো এক ফোঁটাও জল দেখছি না।'

আমি বললাম, 'নাম মানুষের বাপ-মা নিজেদের খুশিমতো রাখেন। নামের সঙ্গে মানুষের মিল বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পাওয়া যাবে না।'

মানিক বলল, 'সুন্দরবাবু, আপনার নাম তো সার্থক, তাই না?'

সুন্দরবাবু ক্ষিপ্ত হয়ে বললেন, 'হ্যাঁ সার্থক! আলবাৎ সার্থক! একশোবার সার্থক! মানিক, তোমার মতো এরকম ডেঁপো আর বেয়াদব ছোকরা আমি আর কখনও দেখিনি!'

মানিক বলল, 'আহা, আপনি এত চটছেন কেন? কী সজল, আমি কি অন্যায় কিছু বলেছি?'

সুন্দরবাবু বললেন, 'না। তা বলোনি আবার! তোমার মতলব বুঝতে আমার বাকি নেই। অসভ্য বেল্লিক কোথাকার!'

জয়ন্ত তখনও ভাবছে দেখে আমি বললাম, 'জয়ন্তবাবু, আপনি কি আমায় আর কিছু জিগ্যেস করবেন?' ব্যোমকেশ বক্সী আব হুকা-কাশি আমাকে আমাদের চাকর-রাঁধুনি-মালিব সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলেন। সে-কথা মনে পড়াতে আমি জয়ন্তকে বললাম, 'আমাদের চাকর-মালি-রাঁধুনি এদের সম্বন্ধে আপনি কিছু জিগ্যেস করবেন?'

জয়ন্ত বলল, 'ওদেব বাড়ি কোথায বলতে পারেন?'

আমি বললাম, 'নিশ্চয়ই বলতে পারি। আমাদের চাকর রঘু—ওর বাড়ি ওড়িশাব কটক জেলার গজপতিপুর গ্রামে। আমাদের মালি দুখীরাম—তার বাড়ি পূর্ববঙ্গের ঢাকা জেলার তাঁতিপাড়া গ্রামে। আর আমাদের রাঁধুনি করুণা—ওব বাড়ি পশ্চিমবঙ্গেই—মেদিনীপুর জেলার বলরামচক গ্রামে।'

আমার কথা শুনে জয়ন্ত কোনও কথা না বলে বিছানার এক পাশ থেকে তাব নস্যদানটা তুলে নিয়ে এক টিপ নস্য নিল। তার একটু পরেই আবার একবার নিল। আব একটু পবে আবার।

জয়ন্তের বিভিন্ন কীর্তিকাহিনি যাঁবাই পড়েছেন, তাঁরাই জানেন যে জযন্ত কোনও কাবণে খুশি হলেই ঘন-ঘন নস্য নেয়। সুতরাং জয়ন্ত আমার উত্তরের মধ্যে রহস্যভেদের একটা কিছু সূত্র পেয়েছে, আর তাতেই খুশি হয়ে ঘন-ঘন নস্য নিচ্ছে, এতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু আমি তাকে যে খবর দিলাম, তার মধ্যে তো কোনও অসাধাবণত্ব নেই। তবে তার থেকে রহস্য সমাধানের চাবিকাঠি পাওয়া কী করে সম্ভব?

জয়ন্ত আর-এক টিপ নস্য নিয়ে সুন্দরবাবুর দিকে চেয়ে বলল, 'সুন্দরবাবু, আমি তো এখন সেরে উঠেছি। কাল যদি আমি মোটরে চড়ে এক ঘণ্টা সজলবাবুদের বাড়ি থেকে ঘুরে আসি, তাহলে নিশ্চয়ই আপনার কোনও আপত্তি নেই?'

সুন্দরবাবু মহা উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'হুম! আপত্তি নেই আবার! তোমার এই অবস্থা—আর তুমি এখন বালিগঞ্জে যাবে? তারপর সেখানে গিয়ে লাফালাফি দাপাদাপি করবে? তার চেয়ে বলো না কেন হিমালয়ে চড়বে? হুম! আমি তোমায় এখন এক পা-ও নড়তে দেব না। হুম। হুম!'

জয়ন্ত বেশ একটু মুষড়ে পড়ে আমার দিকে ফিরে বলল, 'হল না সজলবাবু। এ বড্ড কড়া শাসন।'

আমি বললাম, 'না। আপনার শরীরের যা অবস্থা তাতে এখন আপনার আমাদের ওখানে যাওয়ার কোনও কথাই উঠতে পারে না।'

ওদের সঙ্গে আর খানিকক্ষণ গল্পগুজব করার পরে আমি উঠলাম। মানিক আমাকে সদর দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিল।

(সজলকুমার সেনের জবানি শেষ)

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কৃত্তিবাস ওঝার জবানি

সন্ত্রাসের ছদ্মবেশে কালো ডানা ভাসে চারিধার,
ডুবন্ত চাঁদের জমি চষে শুধু মরি বারে বার;
প্যাঁচার ক্লেদাক্ত স্বেদে পরিপাটি গাথা রচি হায়,
জলদর্চি মেঘ দেখে ছত্রাকের স্বপ্ন ভেঙে যায়!

এ-কবিতা যে লেখে, সে অনায়াসেই মনের আনন্দে গড়গড় করে পড়ে যেতে পারে। কিন্তু যে শোনে, তার অবস্থা ভাবুন দেখি একবার!

বলা বাহুল্য এরকম কবিতা মাত্র একজনেরই হাত দিয়ে বেরোতে পারে। সে হচ্ছে বিখ্যাত গোয়েন্দা কবি পরাশর বর্মা।

আজ সকালে পরাশর আমায় চা খেতে নেমন্তন্ন করেছিল। চা এখনও আসেনি। পরাশরের বেয়ারা ভুবন রান্নাঘরে এখনও তার জোগাড়ে ব্যস্ত। কিন্তু আমি এ-বাড়িতে পা দিতে না দিতেই পরাশরের চারখানা কবিতার খাতা বাক্স থেকে বেরিয়েছে। যে ক'টা কবিতা এতক্ষণে শুনেছি তাতেই গা গুলোতে শুরু করেছে। চা-খাবার এখন গলা দিয়ে নামলে হয়।

যে-কবিতাটার চার লাইন ওপরে তুলেছি, সেটা দশ মিনিট ধরে পড়ার পর শেষ করে পরাশর বলল, 'কেমন লাগল?'

আমি যথারীতি বললাম, 'বেশ হয়েছে।'

পরাশর বলল, 'এ-কবিতার বৈশিষ্ট্য কিছু লক্ষ করলে?'

আমি বলবার আর কিছু খুঁজে না পেয়ে বললাম, 'এর লাইনগুলো খুব বড়-বড়।'

পরাশর বলল, 'তুমি ভাবছ আমি ছোট লাইনের চটুল ছন্দের কবিতা লিখতে পারি না?'

আমি সেরকম কিছু ভাবিনি, তা বলার আগেই পরাশর 'এটা শোনো তাহলে' বলে পড়তে শুরু করেছে,

'পরশুরাম!
ঝরছে ঘাম।
আলোর নাচ,
চিংড়ি মাছ।
ঘূর্ণিপাক
লাগায় তাক!'

এ-কবিতাটা শেষ করতে তার মিনিট বারো লাগল। এবার পরাশর কিছু বলার আগেই আমি বলে উঠলাম, 'বাঃ! এটা একেবারে খাসা হয়েছে।'

পরাশর খুশি হয়ে বলল, 'আচ্ছা, এবারে একটা গদ্য কবিতা শুনবে? শোনো—

তোমাকে আমি পেয়েছিলাম,
কালো নীলিমার মধ্যে,
কঠিন ঘুমের মধ্যে,
পাইথনের দাঁতের মধ্যে।
আজ তুমি ভেসে গেছ
হিমানীর আবর্তের টানে।

আমি বসে দাঁতে ঘষি দাঁত,
পরাভূত কবুতর!'

এইভাবে পরাশর দশ-বারো মিনিট ধরে এক-একটা কবিতা পড়ে চলে, আমি নিবিষ্টচিত্তে শোনার ভান করে মনে-মনে 'এক দুই দিন চার' গুনে চলি। তারপর পরাশর থামলে 'বেশ হয়েছে' 'তোফা হয়েছে' 'চমৎকার লিখেছ' এই জাতীয় একটা কিছু মন্তব্য মুখ দিয়ে বের করি। কখন যে এই যন্ত্রণা শেষ হবে। হায় রে!

ভুবন চা-টা নিয়ে এলে পরাশরের কাব্যপাঠে একটু ছেদ পড়ল। চা শেষ করে পরাশর আবার নতুন উদ্যমে শুরু করতে যাবে, এমনসময় কলিংবেলটা বেজে উঠল।

কে আবার এল দেখবার জন্যে আমি জানালা দিয়ে বাইরে মুখ বাড়ালাম। দেখি একজন সুদর্শন অল্পবয়সি ভদ্রলোক বাইরে দাঁড়িয়ে।

ততক্ষণে পরাশরের 'বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা' কাজ করে চলেছে। ভদ্রলোক কলিং বেল টেপবামাত্র দরজার ভেতর থেকে টেপ রেকর্ডে ধরা একটি কণ্ঠস্বর বেজে উঠেছে, 'কাকে চান?'

কাউকে দেখা যাচ্ছে না অথচ একটা গলার আওয়াজ কী করে শোনা যাচ্ছে বুঝতে না পেরে ভদ্রলোক একটু বিমূঢ়ভাবে বলেছেন, 'আজ্ঞে, মিঃ পরাশর বর্মাকে।' তাঁর সে কথা দরজার গায়ে লুকোনো রিসিভারে ধরা পড়ে আমাদের ঘরের লাউডস্পিকারে ধ্বনিত হয়ে উঠল।

তখন দরজার সেই কণ্ঠস্বর আবার বলল, 'নাম বলুন আপনার।'

ভদ্রলোক বললেন, 'সজলকুমার সেন।'

পরাশর বেজায় বিরক্ত হয়ে বলল, 'আঃ! কোথায় নিশ্চিন্ত মনে দুটো কবিতা পড়ে তোমায় শোনাব তা নয় কোথাকার কে এক সজলকুমার সেন জ্বালাতে এল। যাও বলে দাও আমি বাড়িতে নেই, এখন দেখা হবে না।'

আমি কি আর তা বলতে পারি? ভদ্রলোক এসে কথা বলতে শুরু করলে হয়তো পরাশর কবিতা পড়ায় ক্ষান্ত দেবে। তাই ওঁকে ওপরে নিয়ে আসব ঠিক করে নীচে নামলাম।

ততক্ষণে 'বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা'-র মহিমায় সদর দরজা আপনা থেকেই খুলে গেছে আর ভদ্রলোক কাউকে দেখতে না পেয়ে বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

আমি তাঁর পরিচয় আর প্রয়োজন জেনে নিয়ে ওপরে নিয়ে এলাম। পরাশরকে বললাম, 'পরাশর! ইনি নিত্যানন্দ কলেজের বাংলার প্রফেসর। কয়েকটা রহস্যজনক ব্যাপারের মানে বুঝতে না পেরে তোমার কাছে এসেছেন।'

ভদ্রলোককে সঙ্গে করে ওপরে নিয়ে আসায় পরাশর যে আমার ওপর বেজায় চটেছে তা ওর মুখ দেখে বুঝতে পারলাম। কিন্তু তাঁর পরিচয় জানতে পেরে ওর সে ভাব কেটে গেল। মহা উৎসাহে সে বলে উঠল, 'আপনি বাংলার প্রফেসর! বাঃ! ভালোই হল আপনি আসায়। কবিতার সেরা সমঝদার তো আপনারাই। আপনারা তো কবিতা নিয়েই পড়ে আছেন মশাই। বসুন! বসুন!'

ভদ্রলোক বসলে পরাশর বলল, 'আমার লেখা দু-একটা কবিতা আপনাকে পড়ে শোনাই। শুনে আপনি একটু দয়া করে বলুন আপনার কেমন লাগল।' এই বলে পরাশর পড়তে লাগল,

'চন্দন! স্বপ্নিল!
পিচ্ছিল! পঙ্কিল!
শিম নিম উড়ছে—
বনবন ঘুরছে।'

পরাশরের কবিতার কয়েক লাইন শুনেই ভদ্রলোকের চোখ ছানাবড়া। একে এই ধরনের কবিতা, তায় আবার শেষ হতে চায় না! পনেরো মিনিট ধরে পড়ে কবিতাটা শেষ করে পরাশর বলল, 'কেমন লাগল আপনার?'

ভদ্রলোক বললেন, 'মন্দ হয়নি।'

'মন্দ হয়নি? তার মানে খুব ভালো লাগল না? আচ্ছা, এটা শুনুন তাহলে।' এই বলে পরাশর আর-একটি 'অপূর্ব' কবিতা পড়তে শুরু করল। এটা শেষ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'এই কবিতাটা খুব চমৎকার হয়েছে।'

আমি কোনওরকমে হাসি চাপলাম।

পরাশর ততক্ষণে নতুন উৎসাহে আর-একটা কবিতা পড়া শুরু করেছে।

সেটা শেষ হলে ভদ্রলোক বললেন, 'আমি যে ব্যাপারটা সম্বন্ধে পরামর্শ করবার জন্যে আপনার কাছে এসেছি সেটা এইবার একটু সংক্ষেপে বলছি।'

'বলবেন। বলবেন। তার আগে আর দু-একটা কবিতা হয়ে যাক।' বলে পরাশর ওঁকে আর বলবার অবকাশ না দিয়ে আর-একটা কবিতা শুরু করে দিল।

আরও দুটো কবিতা শেষ হলে ভদ্রলোক বলতে শুরু করলেন। কিন্তু তাঁর কথা বেশিদূর এগোতে পেল না। পরাশর আবার নতুন কবিতা পড়তে আরম্ভ করল। তার ফলে কিছুক্ষণ ধরে এই ব্যাপার চলল যে, পরাশর একটা করে কবিতা পড়ছে, সেটা শেষ করে যেই সে একটু করে দম নিচ্ছে, সেই ফাঁকে ভদ্রলোক তাঁর কাহিনির খানিকটা বলে নিচ্ছেন।

এমনিভাবে ভদ্রলোক কোনওরকমে তাঁর কাহিনিটা শেষ করলেন। পরাশরও ততক্ষণে গোটা আঠেরো কবিতা শেষ করেছে। ভদ্রলোক থামার পরেও সে আরও গোটা দুই কবিতা পড়ল।

পড়ে যখন সে থামল, ভদ্রলোক তখন ওঠার জোগাড় করছেন। পরাশরের এতক্ষণে হুঁশ হল তাঁর দিকে ভালো করে তাকাবার।

ভদ্রলোক অপ্রতিভ হাসি হেসে বললেন, 'আপনার কবিতা শুনে বড়ই আনন্দ পেলাম মিঃ বর্মা।'

পরাশর বলল, 'সেটা আমার সৌভাগ্য।'

ভদ্রলোক বললেন, 'আমি যে ব্যাপারগুলো আপনাকে বললাম, সেগুলো বোধহয় আপনাকে ভালো করে বোঝাতে পারিনি।'

অত্যন্ত ভদ্রভাবে তিনি পরাশরকে জানিয়ে দিলেন যে, পরাশর তাঁর কথা মন দিয়ে শোনেনি, এতে তিনি খুবই দুঃখিত হয়েছেন।

পরাশর বলল, 'না-না, আমি সবই বুঝেছি।'

'সবই বুঝেছেন?' ভদ্রলোকের কণ্ঠস্বরে স্পষ্ট সন্দেহের আভাস।

পরাশর বলল, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ, সবই বুঝেছি। আপনারা আগে গ্রিনউড গার্ডেনসের এক বাড়িতে থাকতেন। সে-বাড়ির মালিক আপনাদের উঠে যেতে বলায় আপনারা লেক অঞ্চলের হেমন্ত ঘোষ রোডের একটা বাড়িতে উঠে আসেন। এ-বাড়ির মালিক পীতাম্বর ঘোষাল আপনাদের বাড়ি ভাড়া দেন, কিন্তু বাগানটা নিজের দখলে রেখে দেন। বাড়ি ভাড়া দেওয়ার কয়েক দিন বাদেই তিনি মিরাটে চলে যান। এ-বাড়িতে আসার দু-দিন পরেই আপনাদের পুরোনো চাকর ভূতের ভয় পেয়ে পালায়। আপনারা কিছুদিন যাওয়ার পর লক্ষ করেন যে, এ-অঞ্চলটাতে রোজই অনেক অচেনা লোক যাতায়াত করে। তারা শুধু আসে আর চলে যায় তা নয়, সবকিছু খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে লক্ষ করে। এদিকে আপনাদের বাড়িতে দিন পনেরো ধরে যুগলকিশোর পতিতুণ্ডি নামে একটা অচেনা সন্দেহজনক লোক আসতে শুরু করেছে। সে বারবার আসে, এমনকি আপনারা কেউ না থাকার সময়েও আসে আর আপনাদের বাড়ির সবকিছু লক্ষ করে।'

ভদ্রলোক বললেন, 'বাঃ! আপনি তো বেশ—।'

পরাশর তাঁকে কথা শেষ করতে না দিয়ে বলে চলল, 'আপনাদের বাড়ির দুপাশে থাকেন দুজন বিখ্যাত লোক। একজন সাহিত্যিক উমাশঙ্কর মিত্র, দাবা খেলতে অসম্ভব ভালোবাসেন, লিখতে

মোটেই চান না, তাঁর স্ত্রী জোর করে তাঁকে দিয়ে লেখান। স্ত্রীর তিনি খুব বাধ্য, তবে সময়-সময় খেপে গিয়ে তাঁর সঙ্গে ঝগড়া শুরু করে দেন। আর একজন বিজ্ঞানী অম্বিকারঞ্জন কানুনগো, নিজের বিষয় ছাড়া যিনি আর প্রায় কিছুই জানেন না। প্রায় সব সময়েই তিনি নিজের ল্যাবরেটরিতে বসে গবেষণা করেন। ফুল খুব ভালোবাসেন। দু-বেলা আপনাদের বাড়ির বাগান থেকে তাঁর জন্যে ফুল যায়। তাঁর মেয়ে সুশিক্ষিতা, সুগায়িকা, কিন্তু সর্বক্ষণ সে রান্নাবান্না নিয়ে ব্যস্ত।'

ভদ্রলোক বললেন, 'মিঃ বর্মা, সত্যিই আমি খুব খুশি হলাম। আপনি যে শুধু আমার সব কথা মন দিয়ে শুনেছেন তাই নয়, কোনও খুঁটিনাটি বিষয়ও আপনার নজরকে এড়াতে পারেনি।'

পরাশর কোনও কিছু একবার আরম্ভ করলে তাকে আর থামানো যায় না। সে তখন মহা উৎসাহে বলে চলেছে, 'আপনাদের বাড়িতে আছে একটি রাঁধুনি, একটি মালি, একটি চাকর। রাঁধুনিটি সকালে বিকেলে রাঁধে, দিনের বেলায় একটা অফিসে পিওনের কাজ করে। সে নিজে থেকেই একদিন আপনার কাছে এসে কাজ চেয়েছিল, আপনারা তাকে আগে থাকতে না চেনা সত্ত্বেও বহাল করেছেন। মালিটি বাড়ির সাবেক মালিকের আমল থেকে আছে। সে মাইনে পায় বাড়িওয়ালার কাছ থেকে, আর আপনারা আপনাদের বাগানের কাজ করার জন্যে তাকে খেতে দেন। চাকরটা বাড়িওয়ালার দেওয়া লোক, ও সারাদিন একরকম থাকে, কিন্তু বিকেল বেলায় খুব চটপটে আর ফুর্তিবাজ হয়ে যায়, সন্ধ্যার পরে সে ভাবটা কেটে যায়, তারপর ও ঘুমিয়ে পড়ে; তা ছাড়া, সে খুব পিটপিটে স্বভাবের, সারাদিন ঘর বারান্দা রান্নাঘর সাফ করে বেড়াচ্ছে। সব জঞ্জাল সে একটা টিনে জড়ো করে রাখে। টিনটা ভরতি হয়ে গেলে জঞ্জালগুলো রাস্তার মোড়ের ডাস্টবিনটাতে ফেলে দিয়ে আসা হয়।'

ভদ্রলোক বললেন, 'মি বর্মা, আপনি গোটা ব্যাপারটা শুনেছেন, বুঝেছেন, মনেও রেখেছেন। এখন যদি দয়া করে এই রহস্যের ওপর একটু আলোকসম্পাত করেন, তাহলে বড় ভালো হয়।'

পরাশর একটা হাই তুলে বলল, 'আমাকে আলোকসম্পাত করতে বলছেন? কিন্তু তার আগে আপনাদের যা করা উচিত ছিল, তা তো করে রাখেননি।'

ভদ্রলোক অবাক হয়ে বললেন, 'আমরা কী করিনি? কী করবার ছিল আমাদের, তা তো বুঝতে পারছি না।'

পরাশর তার কবিতার খাতার একটা পাতা ওলটাতে-ওলটাতে বলল, 'আর কিছু না করুন, জঞ্জালগুলোকে ওজন করলেও তো পারতেন?'

ভদ্রলোক হতভম্ব হয়ে বললেন, 'জঞ্জালগুলো ওজন করব? আপনি কি ওই টিনের জঞ্জালগুলোর কথা বলছেন?'

পরাশর বলল,

'জঞ্জাল ভরা টিন,
কানায়-কানায় যখন ভরিবে—
ওজন করিয়া নিন।'

ভদ্রলোক অত্যন্ত বিমূঢ়ভাবে বললেন, 'কিন্তু কেন?'

কিন্তু পরাশর তখন ভাবে এমন বিভোর হয়ে গেছে যে, ভদ্রলোকের কথা তার কানে ঢুকেছে বলে মনে হল না।

ভদ্রলোক তখন বলবার আর কোনও কথা খুঁজে না পেয়েই বললেন, 'আচ্ছা, দেখব এখন জঞ্জালগুলোর টিনটা ওজন করে একদিন—।'

পরাশর ভদ্রলোকের কথা শেষ হতে না হতেই বলে উঠল, 'এক দিন নয়, দিনের পর দিন। শুধু দিন নয়, রাতেও,—প্রভাতে মধ্যাহ্নে অপরাহ্নে সন্ধ্যায় ত্রিযামায়—

'দিবানিশি নিরন্তর
তুমি দাও কি মন্তর
জীবনের হাটের ভিড়ে
বাঁশি বাজে অনন্ত-র।'

পরাশর হঠাৎ অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে বলে উঠল, 'আঃ! New idea ! কৃত্তিবাস! পেন দাও! Quick !'

আমি তাকে ফাউন্টেন পেনটা এগিয়ে দিলে সে সেটা আমার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে খাতায় খসখস করে লিখতে লাগল।

ভদ্রলোক আমায় ফিসফিস করে বললেন, 'আমি তাহলে এই বেলা উঠি।'

আমিও ফিসফিস করে বললাম, 'হ্যাঁ, সেই ভালো। এখন ওর কবিতা লেখার মুড এসেছে। একটার পর একটা নতুন কবিতা লিখবে আর শোনাবে।'

ভদ্রলোক আর কালবিলম্ব না করে উঠে পড়লেন।

(কৃত্তিবাস ওঝার জবানি শেষ)

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সত্রাজিৎ সিংহরায়ের নাম কে না জানে!

কোটিপতির একমাত্র পুত্র তিনি। পিতা সম্প্রতি মারা গিয়াছেন; যে বিপুল সম্পত্তি ব্যাবসায় তিনি রাখিয়া গিয়াছেন, সত্রাজিৎই এখন তাহার একচ্ছত্র মালিক।

এহেন সত্রাজিৎ সিংহরায় সম্প্রতি বিলাত হইতে ফিরিয়াছেন। গিয়াছিলেন একা, ফিরিয়াছেন নবপরিণীতা পত্নীকে লইয়া। পত্নীটি আবার শ্বেতাঙ্গিনী।

দেশে ফিরিবার পরে সত্রাজিৎ আজ তাঁহার বাড়িতে এক বিরাট পার্টি দিতেছেন। শহরের প্রায় সমস্ত অভিজাত পরিবারই তাহাতে আমন্ত্রিত। আসিয়াছেনও তাঁহাদের অধিকাংশ। অতিথির সংখ্যা গনিয়া ওঠা যায় না।

আজ সত্রাজিতের বাড়ির ভিতরে গেলে দেখা যাইবে দামি স্যুট পরিহিত ভদ্রলোক এবং চোখ-ধাঁধানো শাড়িপরা মহিলারা পার্টি আলোকিত করিয়া বিরাজ করিতেছেন। অবশ্য মহিলাদের সাজপোশাক যতটা আড়ম্বরপূর্ণ, ততটা পর্যাপ্ত নহে—তাহা আবৃত করিয়াছে যতটুকু, প্রকট করিয়া তুলিয়াছে তাহার তুলনায় অনেক বেশি।

এই জাতীয় অভিজাত পার্টিতে যে শুধু আহারেরই আয়োজন করা হয় নাই, তাহা বলাই বাহুল্য। আনুষঙ্গিকেরও বন্দোবস্ত রহিয়াছে। তাই নিমন্ত্রিতদের অনেকেরই হাতে গ্লাস, এমনকি মহিলাদের হাতেও। চক্ষে অনেকেরই ফুটিয়া উঠিয়াছে রক্তিম আভা। দুই-একজনের কথাবার্তাতেও দ্রব্যগুণের প্রভাব ইতিমধ্যেই সঞ্চারিত হইয়াছে।

ইহাদের অন্যতম প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক উমাশঙ্কর মিত্র। তিনি হাত মুখ নাড়িয়া মহা উৎসাহে বলিতেছিলেন, 'কে বললে রাশিয়ায় বেগুন হয় না? আমি নিজের চোখে দেখেছি ওখানে বাঁধাকপির মতো বড়-বড় বেগুন ফলে।'

উমাশঙ্করবাবুর বক্তৃতা কতক্ষণ চলিত বলা যায় না, কিন্তু তাঁহার স্ত্রী আসিয়া পড়ায় তিনি একেবারে চুপ মারিয়া গেলেন। তাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে ইশারায় ডাকিয়া আড়ালে লইয়া গিয়া অনুচ্চ কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, 'পইপই করে তোমায় বারণ করেছি, তবু তুমি ওই ছাইপাঁশগুলো আবার গিলেছ? তোমাকে পার্টিতে আসতে দেওয়াই আমার ভুল হয়েছে। দাঁড়াও, আজ একবার বাড়ি চলো,

তারপর তোমায় মজা দেখাচ্ছি।'

সত্রাজিৎ সিংহরায় একেবারে সাহেব মানুষ। পার্টির সাহেবিয়ানা পুরাপুরি বজায় রাখা তাঁহার চাই-ই। তাই এ-পার্টিতে বলডান্সেরও আয়োজন রহিয়াছে।

যথাসময়ে সে-নাচ শুরু হইল। যাঁহারা বলেন এই জাতীয় নৃত্য আদিম রিপুর বহ্নিতে ঘৃতাহুতি দেয়, তাঁহারা নিশ্চয়ই যথেষ্ট পরিমাণে প্রগতিশীল নহেন। তবে আজিকার এই নাচে যাঁহারা অংশ গ্রহণ করিতেছেন, তাঁহাদের নৃত্যকলার প্রতি গভীর অনুরাগের কোনও প্রমাণও ইতিপূর্বে পাওয়া যায় নাই।

কলিকাতার অভিজাত সমাজের মুকুটমণি মিসেস স্বয়ম্প্রভা পালচৌধুরিও আজিকার এই পার্টিতে আসিয়াছেন।

তিনি কিন্তু এই নাচে অংশ গ্রহণ করেন নাই।

তাহার কারণ এই নয় যে, এই জাতীয় নৃত্যের প্রতি তাঁহার কোনও বিরাগ আছে। অতীতে তিনি অনেক বলডান্স নাচিয়াছেন। যে সময়ে তাঁহার দেহবল্লরী পুরুষদের প্রত্যেকটি রক্তকণিকাকে চঞ্চল করিয়া তুলিত, তখন তিনি কিছুই করিতে বাকি রাখেন নাই।

কিন্তু এখন আর ওসব করিবার উপায় নাই। কারণ বয়স হইয়াছে। শরীরে মেদও বাড়িয়াছে বিপুল পরিমাণে। তাহার ওপর শৌখিন ব্যক্তিদের দেহে যে-রোগ ঢুকিয়া থাকে সেই রোগ তাঁহার দেহেও ঢুকিয়াছে—ডায়াবিটিস।

কিন্তু মিসেস পালচৌধুরি পার্টিতে আসা ছাড়েন নাই। যে-কোনও পার্টিতে নিমন্ত্রণ হইলেই তিনি যথাসময়ে তরুণীকে লজ্জা দেওয়া সাজসজ্জা করিয়া ব্রেসিয়ারের উপর হ্রস্বতম ব্লাউজ পরিয়া সব চাইতে দামি জড়োয়া নেকলেসটা গলায় ঝুলাইয়া ড্রাইভাবকে গাড়ি বাহির কবিতে বলেন।

মিসেস পালচৌধুরির এই নেকলেসটা অত্যন্ত বিখ্যাত। ইহার দিকে চাহিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন নাই, এমন মহিলা খুব কমই আছেন।

সত্রাজিৎ সিংহরায়ের পার্টির বলডান্সে যোগ না দিলেও মিসেস পালচৌধুরি নাচের আসরে অনুপস্থিত ছিলেন না। খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া তিনি নাচ দেখিলেন। কিন্তু বেশিক্ষণ দেখা তাঁহার হইল না। কোথা হইতে যে একটা পাজি রোগ আসিয়া জুটিল!

ভ্যানিটি ব্যাগটা বগলে চাপিয়া এবং হাতে পানের বাটা লইয়া (অভিজাত এবং আধুনিক মহিলা হইয়াও পানের মতো সেকেলে নেশাকে তিনি ছাড়িতে পারেন নাই) মিসেস পালচৌধুরি বাথরুমের দিকে চলিলেন। ব্যাগ আর বাটা অপরের জিম্মায় রাখিয়া যাইতে তাঁহার ভরসা হয় না।

এই সময়ে বাথরুম হইতে কিছু দূরে বারান্দায় রেলিঙের ধারে দাঁড়াইয়া একটি স্যুট-পরিহিত লোক সিগারেট ফুঁকিতেছিল। মিসেস পালচৌধুরি তাহাকে লক্ষই করিলেন না। করিলে অনুভব করিতেন যে, স্যুট তাহাকে মানায় নাই, তাহার চেহারায় আভিজাত্যের কোনও ছাপই নাই।

ভ্যানিটি ব্যাগ এবং পানের বাটা বাথরুমের বাহিরে একটা টেবিলের উপর রাখিয়া মিসেস পালচৌধুরি বাথরুমের ভিতরে ঢুকিলেন। মিনিট দুয়েক পরে তিনি বাহির হইয়া আসিলেন। তারপর ব্যাগ ও বাটা টেবিল হইতে তুলিয়া লইয়া যেখান হইতে আসিয়াছিলেন সেইদিকেই আবার তিনি চলিলেন।

কয়েক পা অগ্রসর হইয়াছেন, এমন সময়ে তাঁহার বিপরীত দিক হইতে সেই লোকটা আসিয়া পড়িল। মুহূর্তের মধ্যেই তাহার সঙ্গে মিসেস পালচৌধুরির এমন একটা ধাক্কা বাধিল যে, তাঁহার বগল হইতে ব্যাগ আর হাত হইতে বাটা পড়িয়া গেল।

হেঁট হইয়া মিসেস পালচৌধুরি সে দুইটি বস্তু কুড়াইয়া লইলেন। তারপর পূর্বস্থানে প্রত্যাবর্তন করিয়া নাচ দেখিতে লাগিলেন।

একটু পরে তাঁহার ঘাড়টা একটু চুলকাইয়া উঠিল। ঘাড়ে হাত দিয়া কিন্তু তাঁহার আর চুলকানো

হইল না। তাহার পরিবর্তে...প্রথমে একটা অস্ফুট উপলব্ধি...তারপর...।

স্থান কাল পাত্র ভুলিয়া, আভিজাত্য ভুলিয়া, মিসেস পালচৌধুরি চিৎকার করিয়া উঠিলেন, 'আ—মার নেক—লেস!'

পুলিশ যথাসময়ে আসিয়া হাজির হইল। পুলিশ অফিসার মিসেস পালচৌধুরিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'পার্টিতে কোনও সময় আপনার খুব কাছাকাছি কেউ এসেছিল?'

মিসেস পালচৌধুরি অল্পক্ষণ ভাবিলেন। তাহার পর বলিলেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়ছে। সেই লোকটা! বাথরুম থেকে ফিরছি, এমনসময়ে কী জোরেই না আমায় ধাক্কা দিল। লোকটা একেবারে অভদ্র। ধাক্কা লাগার জন্যে sorry-ও বলল না, আমার ভ্যানিটি ব্যাগ আর পানের বাটা মাটিতে পড়ে গেছল—সেগুলো কুড়িয়েও দিল না: আমাকেই ওগুলো কুড়োতে হল।'

তাঁহার কথা শুনিয়া পুলিশ অফিসার তেঁতুল খাওয়ার মতো মুখভঙ্গি করিয়া বলিলেন, 'আর বলতে হবে না। আপনি যখন ভ্যানিটি ব্যাগ আর পানের বাটা কুড়োচ্ছিলেন, সেই সময়েই সে পেছন থেকে টুক করে আপনার নেকলেসটা খুলে নিয়েছে। এ নিশ্চয়ই সাত্যকি সাঁইয়ের দলের লোকের কাজ।'

মিসেস পালচৌধুরি বলিলেন, 'সাত্যকি সাঁই! সে আবার কে?'

পুলিশ অফিসার বলিলেন, 'তিনি একটি মহাপুরুষ। ভোজবাজির মতো হাতসাফাই করে গয়না চুরি করতে তাঁর জুড়ি নেই। শাগরেদগুলোকেও তেমনিভাবেই তিনি তৈরি করেছেন। আজকাল শাগরেদরাই চুরি করে। তিনি নিজে আড়ালে থেকে দল চালান আর চোরাই মালগুলো পাচার করেন।'

মিসেস পালচৌধুরি বলিলেন, 'আপনারা তাকে ধরছেন না কেন?'

পুলিশ অফিসার বলিলেন, 'আমরা তো ধরবার চেষ্টা করছি অনেক দিন ধরেই। কিন্তু ভাগ্য খারাপ, পারছি না। সে যাক, এখন আপনার নেকলেসটার একটা description দিন।'

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কলিকাতার পুলিশ কমিশনার তাঁহার খাসকামরায় বসিয়া সি. আই. ডি. বিভাগের অন্যতম অফিসার শিশিরকুমার হাজরার সহিত কথা বলিতেছিলেন।

তিনি বলিতেছিলেন, 'দ্যাখো শিশির, সাত্যকি সাঁইকে যত দিন না ধরতে পারছি, ততদিন আমার মনে শান্তি নেই। বাপ রে বাপ, কী accomplished criminal লোকটা! দু-বছর আগে তো ও সারা কলকাতা শহরে বেপরোয়াভাবে গয়না চুরি করে বেড়াত। আর তেমনি আশ্চর্য ওর চুরি করার কায়দা। শাগরেদগুলোকেও ও আচ্ছা training দিয়েছিল বটে।

'বছরের পর বছর ধরে লোকটা পুলিশকে কলা দেখিয়ে নিজের ব্যাবসা চালিয়ে যাচ্ছিল। আর আমরা কিছুই করতে পারছিলাম না। শেষটা আমি তোমার ওপর ওকে শায়েস্তা করার ভার দিলাম। তুমি ওর চেলা-চামুণ্ডাগুলোর অধিকাংশকেই ধরলে। ওর আড্ডাটাও ভেঙে দিলে। যে কারখানাটায় ও সোনা গলাত, সেটাও তুমি খুঁজে বের কবে তার লোকগুলোকে গ্রেপ্তার করলে।

'এইসব শ্রীমান তো আজ শ্রীঘরে বাস করছে, কিন্তু এদের সর্দার? সে তো আজও ধরা পড়ল না শিশির! এদিকে আমি খবর পেয়েছি হতভাগা সাত্যকি তার যে দু-একটা শাগরেদ বাইরে আছে তাদের নিয়ে এখনও কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। এখনও রোজই কলকাতার এখানে সেখানে গয়না চুরি হচ্ছে। এর মধ্যে কিছু চুরি যে সাত্যকির বা তার দলের লোকের কাজ, তা চুরির কায়দা দেখেই বোঝা যায়। সেদিন যে সত্রাজিৎ সিংহরায়ের বাড়ির পার্টি থেকে মিসেস স্বয়ম্প্রভা পালচৌধুরির নেকলেসটা চুরি হয়ে গেল, সেটা নিঃসন্দেহে ওদেরই কাজ। যদিও সাত্যকি এখন আগেকার তুলনায়

অনেক কম চুরি করতে পারছে, কিন্তু এটুকু করার সুযোগই বা সে পাবে কেন? কেন তাকে আমরা ধরতে পারব না?'

শিশির হাজরা বলিলেন, 'সাত্যকি এখনও ধরা পড়েনি বটে, তবে আমার মনে আশা আছে শীঘ্রই আমরা ওকে ধরব। হেমন্ত ঘোষ রোডের সঙ্গে তার যোগাযোগের খবরটা যদি সত্যি হয়—।'

'সত্যি কি মিথ্যে, সে তো তুমি দেখবে শিশির! আমি তোমার ওপরেই এ ব্যাপারটার সম্পূর্ণ ভার ছেড়ে দিয়েছি। যা করা দরকার বলে তুমি মনে করবে, তাই করবে। যেমন করে পারো তুমি হতভাগা সাত্যকিকে পাকড়াও করো। ওকে যদি আমরা ধরতে না পারি, তাহলে লজ্জায় মুখ দেখাতে পারব না।'

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

এই খণ্ডের আগাগোড়াই সজলকুমার সেনের জবানি

ডিটেকটিভ-চতুষ্টয়ের সঙ্গে আমার দেখা করার পর প্রায় দু-মাস কেটে গেছে। এই দু-মাসের মধ্যে আর কোনও নতুন ঘটনা ঘটেনি, লক্ষ্মীছাড়া যুগলকিশোরও আর আসেনি। কাজেই আমার আগেকার ব্যাপারগুলো সম্বন্ধে আগ্রহও স্বাভাবিকভাবেই অনেক কমে গেছে। রহস্য হয়তো তাদের মধ্যে একটা কিছু ছিল, কিন্তু সে-রহস্য যখন চাপা পড়ে গেছে, তখন আর তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ কী?

গোয়েন্দারা যেসব বিষয় জানার ওপর রহস্যের সমাধান নির্ভর করছে বলেছিলেন, সেগুলোর গুরুত্ব যে কী, তা আজ অবধি আমার মাথায় ঢোকেনি। তবুও ব্যোমকেশবাবু আর মিঃ হুকা-কাশি যা জানতে বলেছিলেন, তা জেনেছি। যা জেনেছি, তার মধ্যে অবশ্য অসাধারণ কিছুই নেই। তবু তাঁদের তা ফোনে জানিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছি, কিন্তু বারবার ফোন করে একবারও ওঁদের পাইনি। ওঁদের বাড়ির লোকদের কাছ থেকে জেনেছি যে, ব্যোমকেশবাবু বংশীবদনকে ধরার কাজে অত্যন্ত ব্যস্ত, বেশিরভাগ সময়ই তিনি বাড়িতে থাকেন না। আর মিঃ হুকা-কাশি এখনও কলকাতায় ফেরেননি। পরাশর বর্মা যা করতে বলেছিলেন, তা করা আমার পক্ষে আজ অবধি সম্ভব হয়নি। কারণ, আমাদের জঞ্জালের টিনটা আধমনের টিন। একসঙ্গে আধমন ওজন করার দাঁড়িপাল্লা জোগাড় করাই শক্ত। যদি বা জোগাড় করা গেল, সে-দাঁড়িপাল্লা আমায় সকলের সামনে দিয়েই বাড়িতে নিয়ে আসতে হবে, জঞ্জাল ওজনও করতে হবে সকলের সামনে। তার মানেই হচ্ছে রহস্যের সঙ্গে যারা জড়িত (যদি জঞ্জালের সঙ্গে রহস্যের কোনও যোগ থাকে), তাদের সাবধান করে দেওয়া। তা ছাড়া, এইভাবে প্রকাশ্য জায়গায় বসে-বসে জঞ্জাল ওজন করলে অন্য লোকের তো কথাই নেই, আমার দাদা-বউদিও মনে করবেন আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। কাজেই জঞ্জাল ওজন করা হয়নি। তবে আমি মাঝে-মাঝে ভরতি জঞ্জালের টিনটা হাত দিয়ে তুলে ওজন আন্দাজ করার চেষ্টা করেছি। বিভিন্ন সময়ে ওজনের কোনও তারতম্য বোধ করিনি। দু-দিন যেন টিনটা একটু ভারী ঠেকেছিল, তবে জঞ্জালের ওজন আধমনের কাছাকাছি বলেই সবসময়ে আমার মনে হয়েছে।

তা ছাড়া, এই দু-মাসের মধ্যে এমন আর-একটা ব্যাপার ঘটেছে, যার ফলে আমি এখন আর রহস্য নিয়ে খুব বেশি মাথা ঘামাতে পারছি না। সে ব্যাপারটা কী, তা এখন খুলে বলছি।

পরাশর বর্মার সঙ্গে দেখা করার দিন দুই পরের কথা। বিকেলে কলেজ থেকে ফিরছি।

অম্বিকাবাবু তাঁর সদর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে। অম্বিকাবাবুর বয়েস অনেক হয়েছে, রিটায়ারই করেছেন আজ বছর পাঁচেক হল। কিন্তু স্বাস্থ্যটি এখনও বেশ ভালো রয়েছে। তাঁর দীর্ঘ দেহ এখনও এতটুকু বাঁকেনি। অবশ্য চুল দাড়ি সব পেকে সাদা হয়ে গেছে।

বেশ সুন্দর একটি ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি আছে তাঁর। চোখে সবসময়েই কালো চশমা পরেন। পরনে সবসময়েই থাকে ধুতি আর পাঞ্জাবি।

আমি তাঁকে নমস্কার করলাম। অম্বিকাবাবু বললেন, 'কী সজল, ভালো আছ?'

আমি ওঁর ছাত্রের ছাত্র, এই জন্যে আমায় উনি 'তুমি' বলেন।

আমি বললাম, 'আজ্ঞে হ্যাঁ মাস্টারমশাই।'

উনি 'স্যার' সম্বোধনটা পছন্দ করেন না। তাই ওঁর ছাত্রেরা থেকে শুরু করে সকলে ওঁকে 'মাস্টারমশাই' বলেই ডাকে।

তারপর সেখানে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ তাঁর সঙ্গে গল্প করলাম। মাস্টারমশাই সারাদিন বিজ্ঞানের সাধনায় নিমগ্ন থাকলেও একবার গল্প করতে শুরু করলে তাতে একেবারে মেতে ওঠেন। খানিকক্ষণ গল্প চলার পর পেছন থেকে শুনি একটি মেয়েলি গলার আওয়াজ, 'বা রে। বাবা! তুমি প্রফেসর সেনকে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রেখেছ কেন? ভেতরে নিয়ে এসে গল্প করো না!'

মাস্টারমশাই বললেন, 'তাই তো, তাই তো। চলো সজল, ভেতরেই চলো।' তারপর ভেতরে ঢুকতে-ঢুকতে তিনি মেয়েকে বললেন, 'ইলা। আমার অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড আর সালফিউরিক অ্যাসিড ফুরিয়ে গেছে।'

ইলা বলল, 'অর্ডার পাঠিয়ে দিয়েছি বাবা। তারপর ফোনেও তাগাদা দিয়েছি। ওরা বলেছে কালই পাঠাবে।'

মাস্টারমশায়ের সঙ্গে ভেতরে গিয়ে আমি তাঁর বৈঠকখানা ঘরে বসলাম। ইলাও সঙ্গে-সঙ্গে এল। ইলা বলল, 'আমাদের কী সৌভাগ্য, প্রফেসর সেন আজ আমাদের বাড়ি এলেন।'

সৌভাগ্যটা যে কার, তাদের না আমার, সেটা ঠিক বুঝতে পারলাম না। ইলাকে যেদিন আমি প্রথম দেখেছি, সেদিন থেকেই সে আমার মনে দাগ কেটেছে। সে যে অসামান্য সুন্দরী তা নয়, কিন্তু তার চেহারা, কথাবার্তা, হাবভাব, সমস্ত কিছু মিলিয়ে এমন একটা কিছু আছে, যা পুরুষের মনকে টানে। সে আমার বউদির কাছে মাঝে-মাঝে আসে, সেই সময়ে আমার সঙ্গেও তার আলাপ হয়েছে। কিন্তু সে শুধু আলাপ মাত্র। আজকের মতো এমন অন্তরঙ্গতার সুরে ইলা এর আগে কোনওদিন আমার সঙ্গে কথা বলেনি। তাই মনে যেন আজ একটা নতুন কিছুর স্বাদ পেলাম। জীবনটা যেন আজ একটা নতুন তাৎপর্য নিয়ে দেখা দিল।

মাস্টারমশাই বললেন, 'ও এখানে আসবে কেন? আমিও যেমন পাগল, তুইও তেমনি পাগলি। আমি সবসময় পড়ে আছি ল্যাবরেটরিতে, আর তুই সবসময় আছিস রান্না নিয়ে।'

এতক্ষণে আমার ইলার পোশাকের দিকে নজর পড়ল। এর আগেও অনেকবার রাস্তায় দাঁড়িয়ে মাস্টারমশায়ের সঙ্গে কথা বলেছি, ইলা তখনও তার বাবাকে ডাকতে এসেছে, প্রতিবারই দেখেছি তার পরনে আটপৌরে কাপড়, আর তাতে রান্নাঘরের হলুদের দাগ। ইলা যে বেশিরভাগ সময়ই রান্নাবান্না নিয়ে ব্যস্ত থাকে, সে-কথা তার বাবার কাছে, আমার বউদির কাছে, আরও অনেকের কাছে শুনেছি। তাই ইলাকে রান্নার ছোপ-লাগা কাপড় ছাড়া আর কোনও পোশাকে আমি এতকাল কল্পনা করতে পারিনি। কিন্তু আজ ইলা দস্তুরমতো সেজেছে। নাইলনের শাড়ি পরেছে, স্লিভলেস ব্লাউজ পরেছে, স্নো, পাউডার, রুজ, লিপস্টিক এবং আর সব প্রসাধনদ্রব্য ব্যবহারের চিহ্নও ওর সর্বাঙ্গে সুস্পষ্ট। আমি সত্যিই আজ ইলাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম।

মাস্টারমশাই বললেন, 'যা, সজলের জন্যে একটু চা নিয়ে আয়।'

চা নিয়ে এসে ইলা আমাদের সঙ্গেই বসে গল্প করতে লাগল।

একটু বাদে মাস্টারমশাই বললেন, 'আচ্ছা সজল, আমি একটু ওপরে যাচ্ছি। আজ একটা নতুন এক্সপেরিমেন্ট করব। তোমরা বসে গল্প করো।'

মাস্টারমশাই চলে গেলেন। আমি আর ইলা বসে গল্প করতে লাগলাম। ইলার কথা বলার ধরন যে শুধু মধুর তা নয়, তার মধ্যে ঝরনার মতো একটি সহজ সাবলীলতা আছে। সত্যি, আমি ভাগ্যবান। ইলা আজ আমার কাছে বসে বন্ধুর মতো গল্প করছে।

গল্পের ফাঁকে এক সময় আমি ইলাকে বললাম, 'আচ্ছা, আপনি দিনরাত বাড়িতে বসে থাকেন? বেরোন না কখনও?'

ইলা বলল, 'বেরোব কী করে?

' "মন্দির-বাহির কঠিন কপাট।
চলইতে শঙ্কিল পঙ্কিল বাট।।" '

বৈষ্ণব পদাবলির লাইনও ইলার মুখস্থ! আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম। মুখে বললাম, 'কী যে বলেন? আপনার কঠিন কপাট থাকতে যাবে কীসের দুঃখে? আর চলার পথই বা শঙ্কিল পঙ্কিল হবে কেন?'

গল্প করতে-করতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। ইলা তখন একটু উসখুস করছে দেখে আমি বুঝলাম ওর রান্নাঘরে যাওয়ার সময় হয়ে গেছে। আমি উঠে পড়লাম।

বাড়িতে ঢুকলে বউদি বললেন, 'কী ঠাকুরপো, তোমাকে ঘণ্টা দেড়েক আগে দেখলাম কলেজ থেকে ফিরছ। তারপর মাস্টারমশায়ের বাড়ি ঢুকে গেলে। এতক্ষণ ওখানে বসে কী করছিলে?'

আমি বললাম, 'মাস্টারমশায়ের সঙ্গে গল্প করছিলাম।'

বউদি মুচকি হেসে বললেন, 'মাস্টারমশায়ের সঙ্গে—এতক্ষণ ধরে গল্প?'

দাদা একটা বই পড়ছিলেন, হঠাৎ যেন তাঁর বইয়ের প্রতি মনোযোগ খুব বেশি হয়ে পড়ল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পরের দিন বিকেলে আবার মাস্টারমশায়ের বাড়ি গেলাম। ঘণ্টা দুই সেখানেই কাটালাম। পুরো সময়টা যে মাস্টারমশায়ের সঙ্গে গল্প করে কাটাইনি, তা বলাই বাহুল্য।

তার পরের দিন আবার গেলাম। তার পরের দিনও গেলাম। তার পরের দিনও।

বিকেলটা আজকাল বেশ ভালোভাবেই কাটে। কাটতে চায় না শুধু সকালটা আর দুপুরটা।

এদিকে কলেজে গ্রীষ্মের ছুটি হয়ে গেছে। সারা দিন হাতে কোনও কাজ নেই। অন্য বছরে আমি এই সময়টাতে বই লিখি, কিন্তু এ বছরে আর তাতে মন লাগছে না।

সকালে বা দুপুরে মাস্টারমশায়ের বাড়ি যাওয়া যায় না, কারণ ইলা এ সময়টা রান্নাঘরে থাকে।

দাদা-বউদি খাওয়াদাওয়া সেরে ন'টার মধ্যেই বেরিয়ে যান। তারপর আমি সারাদিন বাড়িতে একা। ন'টা থেকে দশটা অবধি আমি বাগানের কাজ করি। দশটা থেকে এগারোটা পর্যন্ত বারান্দায় একটা ইজিচেয়ারে শুয়ে থাকি, শুয়ে-শুয়ে খবরের কাগজ পড়ি, বই পড়ি। তারপর এগারোটার সময় উঠে স্নান-খাওয়াদাওয়া করি। ভাত অবশ্য ততক্ষণ গরম থাকে না। করুণা সকালেই রান্নাবান্না সেরে নিজে খেয়ে নিয়ে আমার, রঘুর আর দুখীরামের ভাত চাপা দিয়ে অফিসে চলে যায়। ছুটির দিনে সকাল-সকাল গরম ভাত খাওয়ার চেয়ে দেরি করে ঠান্ডা ভাত খাওয়াই আমি পছন্দ করি।

একদিন সকাল দশটার সময় আমি বাগানের কাজ সেরে বারান্দায় ইজিচেয়ারে এসে শুলাম। খবরের কাগজ পড়া হয়ে গেছে। বই হাতের কাছে অনেকগুলো রয়েছে, কিন্তু বই পড়তে আর

ভালো লাগছিল না। তাই চুপচাপ শুয়ে রইলাম।

শুয়ে-শুয়ে চারদিকে তাকাতে লাগলাম। রঘু বারান্দা ঝাঁট দিচ্ছে। ওই এক আশ্চর্য লোক। সারাদিন খালি ঝাঁট দিয়ে যাবে। এতটুকু ক্লান্তিও আসে না।

বারান্দা ঝাঁট দিয়ে রঘু ঘরের মধ্যে ঢুকল। ঘরগুলো ঝাঁট দিয়ে, রান্নাঘর ঝাঁট দিয়ে রান্নাঘরের উনুনের ছাইগুলো তুলে নিয়ে রঘু সব জঞ্জাল একত্র করে টিনটাতে ফেলে দিল। এতখানি পরিশ্রমের ফলে রঘুর লম্বা-চওড়া শরীরটা একদম ঘেমে গেছে দেখলাম।

জঞ্জাল টিনে ফেলে দিয়ে রঘু হাঁক দিল, 'অ দুখীদা, একটা পান দেবে?'

ফটকের পাশের মালির ঘর থেকে দুখীরাম চেঁচিয়ে বলল, 'কী রে রঘো? পান খাবি? আয় আয়।'

দুখীরাম বেশ দক্ষ মালি। বয়েস তার চল্লিশ পেরিয়েছে। সারা দিনই সে বাগানে বসে কাজ করে। কাজের ফাঁকে-ফাঁকে পান সাজে। সেজে নিজে খায়, রঘুকে খাওয়ায়। দিনের বেলায় অনেকক্ষণ ঘুমোয়। তার চেহারাটাও বেশ লম্বা-চওড়া। তার ওপর লম্বা চুল আর দাড়ি রাখায় তাকে দেখায় ঠিক যাত্রা দলের নারদ মুনির মতো।

রঘুকে পান দিয়ে দুখীরাম সাজিতে ফুল ভরে নিয়ে মাস্টারমশায়ের বাড়ি গেল।

আমি বসেই থাকলাম। একটু বাদে উমাশঙ্করবাবু এসে হাজির হলেন। উমাশঙ্করবাবুর চেহারাটি বেশ মোটাসোটা, তিনি খুব বেশি লম্বা নন। তাঁর মাথা জুড়ে চকচক করছে প্রকাণ্ড টাক। আস্তে-আস্তে কথা বলেন তিনি। চাউনিটা তাঁর যেন কেমন একরকম, তার মধ্যে একটা সদা-সতর্ক, সদা-সন্দিগ্ধ ভাব।

তাঁর স্ত্রী আবার অন্য এক ধরনের। ভদ্রমহিলা অত্যন্ত রোগা, বাঙালি মেয়েদের তুলনায় বেশ লম্বা। চুল খুব বেশি, প্রায় গোড়ালি অবধি নেমে এসেছে। গলাটা তাঁর খনখনে, কথাও বলেন হাঁক-ডাক করে।

উমাশঙ্করবাবু বললেন, 'এই যে সজলবাবু। আমার চশমাটা বোধহয় এইখানেই ফেলে গেছি। আপনারা পেয়েছেন?'

উমাশঙ্কর কোনও কিছু পড়ার সময় ছাড়া চশমা পরেন না, চশমাটা ওঁর পকেটেই থাকে। আজ সকালে দাদার সঙ্গে দাবা খেলার সময় দাদা ওঁকে খবরের কাগজের একটা খবর দেখিয়ে ছিলেন, উমাশঙ্করবাবু সেটা পড়ার পর চশমা খুলে খাপের মধ্যে ভরে আমাদের খাটের ওপরেই রেখে দিয়েছিলেন। তারপর যাওয়ার সময় সেটা নিতে ভুলে গিয়েছিলেন। রঘু সেটা তুলে রেখে দিয়েছে।

রঘুকে ডেকে আমি উমাশঙ্করবাবুর চশমা আনিয়ে দিলাম। উমাশঙ্করবাবু তখনই উঠলেন না, এ-কথা সে-কথা বলতে লাগলেন।

নানা বিষয় নিয়ে আলোচনার পর আমি বললাম, 'আচ্ছা উমাশঙ্করবাবু, আপনি তো নানাধরনের বই লিখেছেন। কখনও ডিটেকটিভ গল্প লেখেননি কেন?'

উমাশঙ্করবাবু আমার কথায় একটু অস্বস্তিবোধ করে বললেন, 'ডিটেকটিভ গল্প? না-না, ওসব লিখলে মান থাকে না।'

আমি বললাম, 'কেন মান থাকবে না? এডগার অ্যালান পো, চেস্টারটন এঁরা কত বড় সাহিত্যিক—এঁরাও ডিটেকটিভ গল্প লিখেছেন। তা ছাড়া খালি ডিটেকটিভ গল্প লিখে যাঁরা নাম করেছেন, তাঁদেরও তো কেউ অশ্রদ্ধা করে না।'

উমাশঙ্করবাবু এ-কথার আর কোনও জবাব দিলেন না। ডিটেকটিভ গল্পের কথা উঠতে আমার চারজন বিখ্যাত ডিটেকটিভের সঙ্গে সাম্প্রতিক সাক্ষাৎকারের কথা মনে পড়ে গেল। আমি বললাম, 'আচ্ছা উমাশঙ্করবাবু। ব্যোমকেশ বক্সী, হুকা-কাশি, জয়ন্ত, পরাশর বর্মা এঁদের কোনও কীর্তিকাহিনি

আপনি পড়েছেন?'

উমাশঙ্করবাবু বললেন, 'না। এঁরা কে?'

আমি বললাম, 'এঁরা সকলেই নামকরা ডিটেকটিভ। আমার সঙ্গে এঁদের সম্প্রতি আলাপ হয়েছে। আপনার সঙ্গে কোনও ডিটেকটিভের আলাপ আছে?'

আমার কথা শুনে উমাশঙ্করবাবুর মুখ-চোখের ওপরে যেন একটা ছায়া নেমে এল। তিনি কোনওরকমে থেমে-থেমে বললেন, 'ডিটেক-টিভ? ন—না।'

এরপর আর আমাদের কথা জমল না। একটু বাদেই উমাশঙ্করবাবু উঠে নিজের বাড়িতে চলে গেলেন।

উমাশঙ্করবাবু চলে গেলে আমি ভাবতে লাগলাম ব্যাপার কী? এত বড় একজন সাহিত্যিক কোনও ডিটেকটিভের সঙ্গে পরিচয় আছে কি না জিজ্ঞাসা করায় এমন বিচলিত বোধ করলেন কেন?

একটু বাদে খুট করে একটা শব্দ হতে দেখি করুণা বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে। ও যে এতক্ষণ বাড়িতে ছিল তা টের পাইনি। এদিকে বেলা প্রায় এগারোটা বাজে।

করুণা এক মজার মানুষ। বয়েস পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে, একহারা লম্বাটে ধরনের চেহারা। রং বেশ কালো। লাজুক ধরনের লোক। কোনও দোষ ধরা পড়লে একরকমের অপ্রতিভ হাসি হাসে। যতক্ষণ বাড়িতে থাকে, যখনই ফুরসত পায় তখনই কী যেন লেখে।

করুণা আজকাল প্রায়ই দেরি করে অফিসে যায়। ও আমাদের বলেছে যে, চন্দ্রমল আগরমলের একটা অফিসে ও পিওনের কাজ করে। আমরা অবশ্য ওর অফিসে গিয়ে ওর কথা যাচাই করে দেখিনি। আমরা কারও কথায় চট করে সন্দেহ করি না। কিন্তু এ কীরকম মজার অফিস যে, পিওনরা যখন খুশি তখন কাজে যেতে পারে?

একটু বাদে উমাশঙ্করবাবুর বাড়ির থেকে ওঁর স্ত্রীর খনখনে গলার চড়া আওয়াজ শোনা গেল, 'এখনও চান হয়নি? সকাল থেকে কাজ নেই, কম্ম নেই, চান নেই, খাওয়া নেই, খালি দাবাখেলা আর দাবাখেলা। যত বুড়ো হচ্ছেন ততই আদিখ্যেতা বাড়ছে। নিষ্কম্মার ঢেঁকি একেবারে!'

উমাশঙ্করবাবুর তরফ থেকে কোনও সাড়াশব্দ শোনা গেল না।

ফটকটা খোলার শব্দ পেয়ে দেখি দুখীরাম ফিরে আসছে। দুখীরামের একটা লম্বা ঝুলওয়ালা খদ্দরের জোব্বা আছে। সেটা ও মাঝে-মাঝে পরে। আজও পরেছে।

আমি বললাম, 'কী দুখীরাম। তোমার বুঝি মাঝে-মাঝে জোব্বাটা গায়ে দেওয়ার শখ হয়?'

দুখিরাম একগাল হেসে বলল, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ দাদাবাবু। আমাদের আর এর বেশি কী শখ হবে?'

আমি বললাম, 'জোব্বাটা তুমি কতদিন আগে তৈরি করিয়েছ দুখীরাম?'

দুখীরাম বলল, 'তৈরি করাইনি তো দাদাবাবু। আমাদের পুরোনো কত্তাবাবু দিয়েছেন। আহা হা, অমন মানুষ আর হয় না। এটা ন'মাসে-ছ'মাসে পরি কি না, তাই এখনও ছেঁড়েনি।'

'পুরোনো কত্তাবাবু' মানে এ-বাড়ির সাবেক মালিক বিরাজবাবু। তাঁর প্রশংসায় দুখীরাম সর্বদাই পঞ্চমুখ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

যতই দিন যাচ্ছে, ততই ইলার সঙ্গে আমার ব্যবধানটা কমে আসছে।

একদিন ওকে সাহস করে 'তুমি' বলে ফেললাম।

এতে সে কিছুই মনে করেনি, বরং সানন্দ অনুমোদন জানিয়েছে।

ছলনায় ইলার জুড়ি বোধহয় পৃথিবীতে খুব কমই আছে। একদিন বিকেলে এসে দেখি ইলা

তার ঘরে বসে বই পড়ছে। আমি 'ইলা' বলে ডাকতেই সে গম্ভীরভাবে বলে উঠল, 'আমি এখন ব্যস্ত আছি।'

আমি তখন অত্যন্ত অপ্রস্তুত হয়ে বললাম, 'ও, আচ্ছা। আমি তাহলে চললাম।'

এই না বলে আমি যেই যাওয়ার জন্য পেছন ফিরেছি, অমনি ইলা বই-টই ফেলে দিয়ে খিলখিল করে হেসে উঠেছে।

ইলার সঙ্গে আমার মেলামেশা নিয়ে পাড়ায় যে একটা গুঞ্জন শুরু হয়েছে তা বেশ টের পাই।

আমার দাদা-বউদি অবশ্য আমার সাক্ষাতে এ সম্বন্ধে কিছুই বলেন না। বউদি কেবল দু-একটা রসিকতা করেন। দাদা গম্ভীর হয়ে থাকেন।

একদিন ইলার কাছে সিনেমায় যাওয়ার প্রস্তাব করলাম।

আমার কথা শুনে ইলা খুব গম্ভীর হয়ে গেল। তারপর বেশ উত্তপ্ত কণ্ঠে বলে উঠল, 'সিনেমা? না-না, সে কিছুতেই হতে পারে না। আপনার সঙ্গে আমি কোনওমতেই সিনেমায় যেতে পারি না।'

ওর জবাব শুনে আমি বেজায় অপ্রস্তুত হয়ে চুপ করে রইলাম। তারপর কিছুক্ষণ বাদে আস্তে-আস্তে অন্য কথা শুরু করলাম।

কিছুক্ষণ ধরে কথা চলবার পর ইলা বলে উঠল, 'তারপর? কবে যাচ্ছি?'

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, 'কোথায়?'

ইলা বলল, 'কোথায় আবার? সিনেমায়!'

আমি আরও অবাক হয়ে বললাম, 'বা রে! এই তো তুমি বললে সিনেমায় যাবে না।'

ইলা দিব্যি গম্ভীরভাবে বলল, 'বা রে! কখন আবার বললাম?'

তারপর ইলাকে সঙ্গে নিয়ে সিনেমায় গেছি—একদিন নয়, দু-দিন নয়, অনেক দিন।

এই হচ্ছে ইলা। বারবার ওর ছলনায় জব্দ হয়ে আমি মাঝে-মাঝে ওকে পালটা ছলনা করার চেষ্টা করি। যেমন একবার ঝগড়া নেই, ঝাঁটি নেই পরপর চারদিন ইলাদের বাড়ি গেলাম না। তারপর যেদিন গেলাম, ইলার ঘরে ঢুকতেই ও বলে উঠল, 'ভেবেছিলেন আপনার কাছে চিঠি পাঠাব? সাধ্যসাধনা করে বলব, "এতদিন আসেননি কেন? কী হয়েছে? আমার ওপর রাগ করেছেন? আজ আপনার আসা চাই-ই চাই। নইলে আমি মাথা খুঁড়ব।" তাই না? সে গুড়ে বালি মশাই। অত সহজে আমায় কাবু করা যায় না।'

এমনিভাবে দিনের পর দিন কেটে যায়। কবে কীভাবে ওর কাছে আসল প্রস্তাবটা করব, সেই কথাই এখন মনের মধ্যে দিনরাত জল্পনা করতে থাকি।

রোজই ভাবি আজ প্রস্তাব করব, কিন্তু ওর কাছে গিয়ে শেষ অবধি আর সাহস করে বলে উঠতে পারি না। অন্য কথা বলে চলে আসি।

এরই মাঝখানে একদিন একটা ব্যাপার ঘটল।

সেদিন বিকেলে যথাসময়ে ওদের বাড়ি গিয়ে দেখি ওর ঘর তালাবন্ধ।

ফিরে চলে আসছিলাম এমনসময় পেছন থেকে শুনলাম : 'সজল, শোনো।'

ইলাদের বাড়ির একতলা থেকে দোতলায় ওঠবার সিঁড়িতে একটা দরজা আছে। দোতলা থেকে তেতলায় ওঠবার সিঁড়িতেও আছে। মাস্টারমশাই মাঝে ক'বছর কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হয়ে গিয়েছিলেন। সেই সময় তিনি এ-বাড়ির একতলা, দোতলা ও তেতলা তিনটি পরিবারকে ভাড়া দিয়েছিলেন এবং দোতলা আর তেতলার ভাড়াটেদের সুবিধের জন্যে সিঁড়িতে দরজা তৈরি করে দিয়েছিলেন। ডাক শুনে পেছন ফিরে দেখি, দোতলার সিঁড়ির দরজায় মাস্টারমশাই দাঁড়িয়ে।

আমি ফিরে তাকাতে মাস্টারমশাই বললেন, 'ইলা আজ ওর এক বন্ধুর বাড়ি গেছে। তুমি একটু ওপরে এসো।'

ইলা বন্ধুর বাড়ি গেছে? এতদিন তো ও কোথাও যায়নি। ওর কোনও বন্ধু আছে বলেও কখনও শুনিনি। আমি আমার বিস্ময় চেপে রেখে মাস্টারমশায়ের সঙ্গে ওপরে উঠলাম।

মাস্টারমশায়ের সঙ্গে-সঙ্গে আমি তাঁর ল্যাবরেটরিতে গেলাম। মাস্টারমশাই যে ফুল কত ভালোবাসেন, তা তাঁর ল্যাবরেটরিতে গেলে বোঝা যায়। ল্যাবরেটরির মধ্যেই গোটা কয়েক ফুলদানি, সেগুলো টাটকা ফুলে ভরা। নানা ধরনের ফুল। তাদের গন্ধ অবশ্য ল্যাবরেটরির অ্যাসিড আর গ্যাসের গন্ধে চাপা পড়েছে, কিন্তু তাদের বর্ণবৈচিত্র্য মনকে একটা অপূর্ব তৃপ্তিতে ভরে তোলে।

আমি ফুলগুলোর দিকে তাকিয়ে আছি দেখে মাস্টারমশাই বললেন, 'অনবরত অ্যাসিড গ্যাস নিয়ে নাড়াচাড়া করে যখন মনটা হাঁপিয়ে ওঠে, তখন ফুলগুলো আমাকে নতুন প্রেরণা, নতুন শক্তি জোগায়। কিন্তু আজ আর ওদেরও ভালো লাগছে না। বোসো সজল।'

আমি বসলাম। মাস্টারমশায়ও বসলেন। তারপর খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি বললেন, 'আচ্ছা সজল, তুমি তো বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক, তুমি আমায় একটা কথা বলতে পারো?'

আমি বললাম, 'কী কথা মাস্টারমশাই?'

মাস্টারমশাই বললেন, 'সজল! রবীন্দ্রনাথের একটা গান আছে না—

জীবন যখন শুকায়ে যায়,
করুণাধারায় এসো।

এটা কি শুধুই কথার কথা? না, সত্যিই যখন জীবন শুকিয়ে যায়, তখন তাঁকে ডাকলে তিনি করুণাধারায় নেমে আসেন?'

মাস্টারমশায়ের এ-প্রশ্ন করার মানে আমি বুঝতে পারলাম না। কার জীবন শুকিয়ে গেছে? মাস্টারমশায়ের? কিন্তু তাঁর চেয়ে কার জীবন বেশি সার্থক হয়েছে? আজ তিনি একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ বিজ্ঞানী। শুধু দেশে নয়, বিদেশেও তাঁর খ্যাতি অপরিসীম। ভারত সরকার আসছে বছর তাঁকে পদ্মভূষণ উপাধি দেবেন বলে শুনেছি। তাঁর ছাত্রদের মধ্যেও অনেকে আজ কৃতী বিজ্ঞানী হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। বিজ্ঞানী গোষ্ঠীর বাইরেও অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁর ছাত্র। এঁদের মধ্যে আছেন মন্ত্রী, চিফ সেক্রেটারি, ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ কমিশনার—আরও অনেক উচ্চপদস্থ লোক। যখনই তাঁরা এ-পাড়ায় আসেন, মাস্টারমশায়ের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে প্রণাম করে যান। বিজয়া দশমীর রাত্রে মাস্টারমশায়ের বাড়ির সামনে সারি-সারি বিশিষ্ট লোকের গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকে। পারিবারিক জীবনেও মাস্টারমশায়ের কোনও অশান্তি নেই। তাঁর একটিমাত্র মেয়ে—সুদর্শনা, সুশিক্ষিতা, সুগায়িকা। তার বিয়ের জন্যে মাস্টারমশাইকে একটুও ভাবতে হবে না।

তবে? তবে কেন আজ মাস্টারমশাই আমাকে এমন একটা প্রশ্ন করলেন?

মাস্টারমশাই বোধহয় আমার মনের কথা বুঝতে পারলেন। তাই তিনি নিজের থেকেই আস্তে-আস্তে বললেন, 'আমার সারা জীবনের স্বপ্ন ব্যর্থ হয়ে গেছে সজল।'

এতক্ষণে আমি ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম।

আমি একটু সঙ্কোচের সঙ্গে বললাম, 'মাস্টারমশাই! আপনার কথা থেকে বুঝতে পারছি, আপনি যে-বিষয়টা নিয়ে experiment করছিলেন, সেটা successful হয়নি। এত যত্ন নিয়ে, এরকম মন-প্রাণ ঢেলে দিয়ে একটা জিনিস আবিষ্কার করার চেষ্টা করলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সফল হতে পারলেন না, এতে আপনার মন যে কতখানি ভেঙে গেছে, তা বুঝতে পারছি। আপনাকে সান্ত্বনা দেওয়ার ধৃষ্টতা আমার নেই। তবে একটা experiment সফল না হয় না-ই হল, আপনার অন্য আবিষ্কার তো রয়েছে। সেগুলোই তো আপনাকে চিরস্মরণীয় করে রাখবে। তা ছাড়া, আপনি এখনও আরও কতদিন গবেষণা করবেন, কত কিছু আবিষ্কার করবেন—তখন দেখবেন, আপনার আজকের এ-দুঃখ নিঃশেষে মুছে গেছে।'

মাস্টারমশাই আমার কথার জবাব না দিয়ে অপলক চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। পড়ন্ত দিনের আলোয় তাঁর গাম্ভীর্যভরা মুখখানা যেন বড় করুণ, বড় ম্লান দেখাতে লাগল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

এর পরের দিনের কথা বলছি।

ইলা আজ বাড়িতেই আছে। তার গলার আওয়াজ শুনতে পেয়েছি। আজ তার সঙ্গে দেখা হবে। কিন্তু বেলা পাঁচটার আগে নয়।

দুপুরটা যেন কাটতে চায় না।

খাওয়াদাওয়ার পরে একটু ঘুমোলাম। একটু বই পড়ার চেষ্টা করলাম। কিন্তু বইয়ে মন বসতে চায় না। অগত্যা বাইরের বারান্দাটায় এসে ইজিচেয়াবে শুয়ে চুপচাপ পড়ে থেকে সময় কাটাতে লাগলাম।

এমনি কবে বেলা তিনটে বাজল।

বাকি সময়টা কী করে কাটাই? এমন সময় দেখি সামনে দিয়ে দুখীবাম আসছে। অগত্যা ওকে ডেকে ওরই সঙ্গে গল্প করতে লাগলাম।

কথায়-কথায় এ-বাড়িব সাবেক মালিক বিরাজবাবুর কথা উঠল।

বিরাজবাবুর কথা উঠলে দুখীবাম আর থামতে চায় না। তিনি কত মহৎ ছিলেন, তাঁব নজর কতখানি উঁচু ছিল, কীরকম তিনি দানধ্যান কবতেন, সেসব কথা তার সবিস্তারে বলা চাই।

আমি বললাম, 'আচ্ছা দুখীবাম! বিবাজবাবুব কাছে তুমি কতদিন কাজ করেছ?'

দুখীরাম একটু বিমর্ষ হয়ে বলল, 'সে দুঃখের কথা বলেন কেন বাবু? আমি কাজে ঢোকার ছ'মাস বাদেই কত্তাবাবু বাড়ি বেচে দিলেন।'

আমি বললাম, 'কেন উনি বাড়ি বেচলেন দুখীরাম?'

দুখীরাম বলল, 'আয়ের তুলনায় খরচ বেশি ছিল ওঁর। লোক খাওয়ানোতে কম টাকা খরচ করতেন না। তার ওপর আত্মীয় কুটুম পুষ্যি এদেব পেছনে অনেক টাকা ঢালতেন। যে কেউ ওঁর সাহায্য চাইলে কম-সে-কম পাঁচশো টাকা তাকে দিতেন।'

বিরাজবাবুর কথা শুনে অবাক হলাম। আধুনিক যুগেও এরকম 'কোশল নৃপতি' আছে?

রঘু তখন ঝাঁট দিচ্ছিল। ঝাঁট দিতে-দিতে সে দুখীরামের কাছে এসে বলল, 'দুখীদা, আমাদের এ কত্তাবাবু কাউকে একটা পয়সা দেন না।'

'এ কত্তাবাবু' মানে পীতাম্বরবাবু। রঘুর কথায় বিরক্ত হয়ে দুখীরাম বলল, 'তোর যেমন কথা রঘো? মুনিব, মুনিব। তাঁর কাজের বিচার করার আমরা কে?'

রঘু এই জাতীয় বেফাঁস কথা প্রায়ই বলে ফ্যালে। কিন্তু ও কি সত্যিই অতখানি বোকা? ওর মুখ-চোখ দেখে তো তা মনে হয় না।

দুখীরাম আর রঘু চলে গেল। দুখীরাম গেল স্নান করতে, আর রঘু গেল টিনের জঞ্জাল ডাস্টবিনে ফেলতে।

করুণাও এখন বাড়িতে রয়েছে। আজ ও অফিস থেকে ফিরেছে বেলা একটার সময়। তাহলে ওর যেমন অফিসে যাওয়ার কোনও নির্দিষ্ট সময় নেই, তেমনি অফিস থেকে ফেরারও কোনও নির্দিষ্ট সময় নেই?

অফিস থেকে ফিরেই করুণা তার ঘরে বসে লিখতে শুরু করেছে। এত কী সে লেখে?

আমি একদিন কৌতূহল দমন করতে না পেরে তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'আচ্ছা করুণা, তুমি সারাক্ষণ কী লেখ এত?'

করুণা একটু চুপ করে থেকে তারপর সলজ্জভাবে বলেছিল, 'চিঠি।'

এ-কথা শুনে আমার মুখ থেকে নিতান্ত অসঙ্গত একটা প্রশ্ন আকস্মিকভাবে বেরিয়ে এসেছিল, 'চিঠি? কাকে?'

এর উত্তরে করুণা শুধু একটু অপ্রতিভ হাসি হেসেছিল।

এত চিঠি লেখে করুণা কাকে? বউকে? কিন্তু বউয়ের ওপর খুব টান থাকলেও বড় জোর রোজ একখানা চিঠি লিখতে পারে। অথচ করুণা রোজ খানদশেকের কম চিঠি লেখে বলে তো মনে হয় না।

করুণার কথা ভাবতে-ভাবতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ 'ঠক' করে একটা শব্দ হওয়াতে অন্যমনস্কতা ভাঙল। দেখি রঘু জঞ্জালের খালি টিনটা সশব্দে নামিয়ে রাখছে।

একটু বাদে দেখি রঘু এদিক-ওদিক তাকাতে-তাকাতে দুখীরামের ঘরের ভেতর ঢুকছে। দুখীরাম এখনও স্নান করছে। অন্য সময় দুখীবাম অল্পক্ষণের জন্যে বাইরে গেলেও ঘর তালাবন্ধ করে যায়। আজ দেখি ঘর খোলাই আছে।

আবার এ-কথা সে-কথা ভাবতে-ভাবতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ি। হঠাৎ উমাশঙ্করবাবুর বাড়ি থেকে দুটি উত্তেজিত কণ্ঠের আওয়াজ কানে আসায় আবেশটা ভেঙে গেল। বহুক্ষণ ধরেই ওঁদের কথা কাটাকাটি চলছিল, কিন্তু এতক্ষণ গলা চড়েনি। এখন দুজনেই খোঁচা খেয়ে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছেন, তাই গলাও পৌঁছে গেছে সবচেয়ে উঁচু পরদায়।

আজ উমাশঙ্করবাবুর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙেছে। তাই গলার জোর আজ তাঁরই বেশি।

স্পষ্ট শুনতে পেলাম তিনি বলছেন, 'যাও-যাও। বেশ করব আমি দাবা খেলব। তোমায় আমি থোড়াই কেয়ার করি।'

ওঁর স্ত্রী বললেন, 'তা তো এখন করবেই। কথায় বলে কাজের বেলায় কাজি, কাজ ফুরুলেই পাজি।'

'অত রোয়াব দেখাচ্ছ কেন।'

'বেশ করছি দেখাচ্ছি। আমার দেখাবার হক আছে তাই দেখাচ্ছি।'

'হক আছে না কচুপোড়া আছে, আমড়া আছে। বই আমি লিখি, টাকা আমি রোজগার করি, এ-বাড়ি আমার—সব কিছু আমার।'

'সব কিছু তোমার—না? আজ যে খুব বই, টাকা, বাড়ির কথা বলছ, এ সমস্তর গোড়াপত্তন কীসের থেকে হয়েছে? শুনি একবাব।'

'দ্যাখো, বাজে কথা বোলো না বলছি। বাজে কথা বললে তোমায় এ-বাড়ি থেকে দূর করে দেব।'

'কী, আমায় তুমি দূর করে দেবে? দাও না, কত বড় তোমার মুরোদ দেখি। আমি হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিতে পারি তা জানো? এত মান, এত সম্মান, এত মজা লুটছ, কোথায় থাকবে তখন এসব? হ্যাঁ। হ্যাঁ। আমি সব কথা ফাঁস করে দেব। দেশের লোক একবার জানুক তুমি আসলে কী চিজ। আমার আর কী ক্ষতি হবে?'

এর উত্তরে উমাশঙ্কর ক্রুদ্ধস্বরে কী একটা বললেন কিন্তু আমার আর তা শোনবার প্রবৃত্তি রইল না। আমি আমার ঘরে গিয়ে দরজা জানলা বন্ধ করে বসে রইলাম। ছি-ছি! কী আরম্ভ করেছেন এঁরা।

এর পরে মিনিট দশেকও কাটেনি, এমনসময়ে আমাদের বাড়ির ভেতরেই একটা চিৎকার শুনতে পেয়ে বাইরে এলাম। এসে দেখি দুখীরাম বেজায় চটে রঘুকে ধমকাচ্ছে, 'আমি ঘরে নেই

আর তুই শালা আমার ঘরের ভেতরে ঢুকলি! ইয়ারকির জায়গা পাসনি? হারামজাদা, আজ আমি তোর পিণ্ডি চটকাব।'

রঘু মিউমিউ করে কী একটা কৈফিয়ত দিতে গেল, কিন্তু দুখীরামের গলার জোরে তা চাপা পড়ে গেল।

এই চেঁচামেচিটা আমার মনে এত বিরক্তি জাগিয়ে তুলল যে, বলবার কথা নয়। দোষ অবশ্য রঘুরই, কিন্তু দুখীরামের রাগ যেন আর মিটছে না। এত রাগের কী কারণ আছে?

পাশের বাড়ির গলাবাজি তখন শেষ হয়েছে। তার বদলে নারী কণ্ঠের কান্নার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। অর্থাৎ ঝড় শেষ হয়ে এবার বৃষ্টি শুরু হয়েছে।

একটু বাদে দুখীরামেরও বকুনি শান্ত হল।

আমি অপ্রসন্ন মনে আবার বারান্দার ইজিচেয়ারে এসে শুলাম। একটা বই নিয়ে পড়ার চেষ্টা করতে লাগলাম।

খানিক বাদে দেখি দুখীরাম সাজিতে ফুল ভরে নিয়ে খালি গায়ে মাস্টারমশায়ের বাড়ির দিকে যাচ্ছে।

যাও বৎস। যেখানে তুমি যাচ্ছ, সেখানে আমিও যাব। তবে এখন নয়, একটু পরে।

রঘু বকুনি আর গালাগালি হজম করে চুপচাপ বাড়ির ভেতরে এসে ঝাঁটা হাতে নিল। ওর দিকে চেয়ে দেখি ওর চেহারা একেবারে বদলে গেছে। ও হাঁপাচ্ছে, এলোমেলোভাবে এদিক-সেদিক তাকাচ্ছে। অন্যদিন এ সময় ওর কাজে উৎসাহটা বেড়ে যায়, আজ কিন্তু ওর কাজে যেন একটুও মন নেই।

এমনসময় হঠাৎ আমার সদর দরজার দিকে নজর পড়ল। দেখি সামনের রাস্তা দিয়ে একজন লোক যাচ্ছে। আমাকে দেখেই সে তার গতিবেগ বাড়িয়ে দিয়ে হনহন করে চলে গেল।

কিন্তু একবার মাত্র দেখা সত্ত্বেও তাকে চিনতে আমার ভুল হল না।

যুগলকিশোর পতিতুণ্ডি।

আবার লক্ষ্মীছাড়া এসেছে! এতদিন তাকে না দেখে ভেবেছিলাম আর সে কোনওদিন এ-মুখো হবে না!

আমাদের থানার দারোগা বলেছিলেন তাকে আবার দেখতে পেলেই থানায় গিয়ে জানাতে। সুতরাং আমার এখনই থানায় যাওয়া উচিত।

না। এখন আমার অন্য কাজ আছে। আমার কাছে সে কাজের গুরুত্ব অনেক বেশি।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ঠিক করে ফেলেছিলাম আজই প্রস্তাবটা করে ফেলব। শেষ পর্যন্ত বরাতে যা-ই থাকুক না কেন...আজই!

ইলা যে রাজি হবে, তাতে আমার কোনও সন্দেহ ছিল না। কারণ, এতদিন ধরে ওর কথার ধরন, ওর চাউনি, ওর মান-অভিমান সমস্ত-কিছু এই সাক্ষ্যই দিয়েছে যে, ও আমায় পছন্দ করে, আমায় ও কাছে পেতে চায়।

মনে অনেক কষ্টে সাহস এনে, দ্বিধাসংকোচ কাটিয়ে, চোখকান বুজে শেষ পর্যন্ত প্রস্তাবটা করে ফেললাম।

ফল হল কিন্তু উলটো।

ইলা আমার কথা শুনে মিনিটখানেক চুপ করে রইল। তারপর আস্তে-আস্তে বলল, 'এখন দেখছি আপনার সঙ্গে আমার কোনওদিন আলাপ না হলেই ভালো হত।'

তার এ-কথায় মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। মর্মাহত হয়ে আমি বললাম, 'কেন ইলা? আমি কি কিছু অন্যায় বলেছি?'

ইলা বলল, 'অন্যায় বলেছেন কি না তা জানি না প্রফেসর সেন। তবে যা বলেছেন তা না বললেই ভালো হত।'

আমি বললাম, 'তুমি এই কথা বলছ ইলা? কিন্তু এতদিন আমার প্রতি তোমার মনোভাব আর আচরণ দেখে আমার ধারণা হয়েছিল যে, এতে তোমার মত আছে।'

অসহিষ্ণু স্বরে ইলা বলল, 'ওই তো মুশকিল। আপনাদের সঙ্গে একটু মেলামেশা করলে, একটু হেসে কথা বললেই আপনারা ধরে নেন—।'

আমি বললাম, 'এ কী একটু মেলামেশা, একটু হেসে কথা বলা? দিনের পর দিন তুমি আমাকে প্রশ্রয় দিয়েছ, আমাকে কাছে টেনেছ, আমার মনে আশা জাগিয়ে তুলেছ, আমায়—।'

ইলা গম্ভীর হয়ে বলল, 'থাক প্রফেসর সেন। এসব কথা আর ভালো লাগছে না।'

আমি আর কোনও কথা না বলে চুপ করে রইলাম।

এইভাবে চুপ করে বসেই অনেকক্ষণ কেটে গেল। তারপর আমার মনে হল আর বসে থেকে কোনও লাভ নেই। আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, 'ইলা! আমার স্বপ্ন আজ ভেঙে গেল। আমি চললাম। তবে তোমায় একটা কথা বলে যাই। আমি সারা জীবন তোমার জন্যে অপেক্ষা করব। যদি কোনও দিন তোমার মত বদলায়, আমায় জানিও। দরজা খোলাই রইল।'

ইলাদের বাড়ির সদর দরজা দিয়ে বেরিয়ে রাস্তায় এসে পড়লাম। এখন বাড়িতে যেতে আর ভালো লাগছিল না। তাই রাস্তা দিয়ে হেঁটে লেকে গিয়ে হাজির হলাম।

এই লেক! অন্যদিন আমার একে কত ভালো লাগে। আর আজ এত কুশ্রী মনে হচ্ছে। কাছাকাছি একটা পাখি ডাকছে, মনে হচ্ছে কী বিশ্রী আওয়াজ। চারধারে মানুষ আসছে যাচ্ছে, মোটর-গাড়ি হর্ন দিচ্ছে। অসহ্য! অসহ্য! কী বিরক্তিকব এই জীবনটা!

এক ঘণ্টার মধ্যেই যেন এই পৃথিবীর চেহারা একেবারে বদলে গেছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

এর পর ক'দিন কেটে গেছে।

আমাদের কলেজ আবার খুলেছে। কাজেই সারা দিনটা কাজের মধ্যে দিয়েই কেটে যায়। বিকেলে বেড়াতে বেরোই, ইতস্তুতভাবে এদিক-সেদিক ঘুরে, ফিরি একেবারে রাত্রে খাওয়ার সময়।

মনের বিরাট শূন্যতা কিন্তু কিছুতেই ভরাট হতে চায় না। এ ভরাট হওয়ার নয়।

এদিকে আর-একটা ব্যাপার ঘটেছে।

খড়দায় আমাদের এক পিসি থাকতেন, তিনি মাসখানেক হল মারা গেছেন। পিসির ছেলেপিলে ছিল না। তাঁর সব সম্পত্তি আমরাই পেয়েছি। সম্পত্তি বলতে কিছু নগদ টাকা আর বাড়িটা। বাড়িটা বেশ ভালো। বাড়ির লাগাও অনেকখানি জমি, বাগান, পুকুর। আর বাড়িটা গঙ্গার একরকম ধারেই।

পিসির সঙ্গে একজন বিধবা বামুনের মেয়ে থাকতেন। তিনি এক চিঠিতে আমাদের লিখেছেন, 'তোমরা অবিলম্বে তোমাদের বাড়িতে এসে বাস করো, উইলের প্রোবেট নেওয়া—সে যথাসময়ে হবে। আমি কোথাকার কেউ নই, এ-বাড়ি আর আগলাতে পারছি না। তোমরা এখানে এলে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে কাশী চলে যেতে পারি। কেউ না এলে আমি নড়তে পারছি না, কারণ এ-বাড়িতে গৃহদেবতা আছেন। বাড়িতে কেউ না থাকলে তিনি উপোসী থাকবেন।'

চিঠি পাওয়া অবধি আমাদের মধ্যে এ নিয়ে আলোচনা চলছে। দাদা বলেন, 'খড়দায় যাওয়াই

ভালো। সে-বাড়ি এ-বাড়ির তুলনায় অনেক বড়। তা ছাড়া মাস-মাস এতগুলো টাকা ভাড়া গুনতে হচ্ছে। সেটা তো বেঁচে যাবে।'

বউদি বললেন, 'সে-কথা একশোবার। তা ছাড়া আমাদের তো কোনও অসুবিধে হবে না। এক ঘণ্টার মধ্যেই আমরা খড়দা থেকে অফিসে পৌঁছতে পারব।'

খড়দায় যাওয়াতে ওদের দুজনেরই মত আছে। মত ছিল না খালি এতদিন আমার—ইলার কাছ থেকে দূরে চলে যেতে হবে বলে।

এখন কিন্তু আমার চেয়ে বেশি মত আর কারও নেই।

তাই শেষ পর্যন্ত সর্বসম্মতিক্রমে ঠিক হয়ে গেল যে, একমাস বাদেই আমরা এ-বাড়ি ছেড়ে দেব। পীতাম্বরবাবুকে এ-কথা জানিয়ে চিঠিও লেখা হল।

যাওয়ার কথা পাকা হয়ে গেলে বউদি রঘুকে ডেকে বললেন, 'রঘু! আমরা এ-বাড়ি ছেড়ে খড়দায় আমাদের নিজেদের বাড়িতে যাচ্ছি।'

বউদির কথা শুনে রঘু একটু বিমূঢ় হয়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, 'খড়দা—সে কোথায়?'

রঘুটা কি সত্যিই খড়দার নাম শোনেনি? না বোকা সাজছে?

বউদি বললেন, 'এখান থেকে বেশি দূরে নয়। রেলগাড়িতে চড়ে যেতে হয়।'

রঘু আবার ন্যাকার মতো বলল, 'কিন্তু কেন আপনারা সেখানে যাবেন? এ-বাড়ি তো ভালোই।'

বউদি হেসে বললেন, 'এ-বাড়ি যতই ভালো হোক, এটা ভাড়া বাড়ি আর খড়দার বাড়ি আমাদের নিজেদের বাড়ি। তোমাকেও আমরা সেখানে নিয়ে যাব রঘু।'

রঘু অন্যমনস্কভাবে ঘাড় নাড়ল।

করুণাকেও বলা হল আমরা খড়দায় যাচ্ছি। বউদি বললেন, 'তুমিও আমাদের সঙ্গে যাচ্ছ তো করুণা?'

করুণা বলল, 'খড়দায় যাব? সে কী করে হয় বউদি? খড়দায় গেলে আমার আপিসে যাওয়ার অসুবিধে হবে যে।'

করুণার কথা শুনে আমার হাসি পেল। যে-অফিসে যখন খুশি যাওয়া যায় আর যখন খুশি সেখান থেকে ফেরা যায়, সেই অফিসে যেতে অসুবিধে হবে বলে উনি খড়দা যাবেন না। আজ ক'দিন মাত্র সে সকাল-সকাল অফিসে যাচ্ছে। চিঠি লেখাও তার এখন কমেছে।

বউদি বললেন, 'অফিস তো আমাদেরও আছে করুণা।'

করুণা বলল, 'আপনাদের কথা আলাদা। আপনারা করেন বড় চাকরি। আপনাদের দু-এক দিন লেট হলেও কিছু যাবে আসবে না। আর আমি সামান্য পিওন। আমার যদি প্রায়ই লেট হতে থাকে, তাহলে চাকরি থাকবে না।'

আমার আবার হাসি পেল।

এমনি করে আরও ক'টা দিন কেটে গেল। খড়দায় যেতে আর দিন দশেক বাকি আছে। সে-দিনটা ছুটি ছিল। দুপুরবেলায় বারান্দায় ইজিচেয়ারে শুয়ে আছি, এমনসময় রঘু এসে আমার পা টিপতে শুরু করল।

রঘু এরকম প্রায়ই আমার পা টেপে, আপত্তি করলেও শোনে না।

পা টিপতে-টিপতে রঘু আমায় জিগ্যেস করল, 'আচ্ছা দাদাবাবু, কবে আমরা এ-বাড়ি ছেড়ে যাব?'

আমি বললাম, 'এই তো রঘু, আর ঠিক দশ দিন পরে।'

রঘু এর উত্তরে কিছু না বলে পা টিপতে লাগল। আরও খানিকক্ষণ পা টিপে তারপর সে উঠে ঝাঁটা হাতে নিল।

আমরা যেদিন খড়দায় যাব, তার দু-দিন আগে একটা ছুটি ছিল। সেদিন বউদি নিজের হাতে পুডিং তৈরি করছিলেন। হঠাৎ তাঁর চিনি কম পড়ে যাওয়ায় তিনি মুশকিলে পড়লেন। সেদিন আবার পাড়ার মুদির দোকানটা বন্ধ। তাই বউদি রঘুকে ইলাদের বাড়ি থেকে খানিকটা চিনি চেয়ে আনতে বললেন।

রঘু চিনি নিয়ে ফিরল প্রায় মিনিট পনেরো পরে। কিন্তু ফিরে যখন এল, তখন দেখলাম সে অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। তার মুখখানা লাল হয়ে গেছে, নিশ্বাস ঘন-ঘন পড়ছে। এ উত্তেজনার কারণ কী? তবে কি মোহিনী নারীর আকর্ষণ রঘুর মনে প্রভাব বিস্তার করেছে? কিন্তু তা কী হয়? কিন্তু হবে না-ই বা কেন? রঘু চাকর হলেও পুরুষমানুষ।

পরের দিন দুপুর থেকে রঘুর কোনও পাত্তা নেই। আমরা রাত অবধি তার জন্যে অপেক্ষা করে রইলাম, কিন্তু রঘু আর ফিরল না।

আমাদের কোনও জিনিসই সে নিয়ে যায়নি। তার নিজের জামাকাপড় বিছানা কিছুই নিয়ে যায়নি। আমাদের কাছে তার একমাসের মাইনে পাওনা। এভাবে না বলে কয়ে কোথায় গেল সে?

কিন্তু আমরা তো তার জন্যে বসে থাকতে পারি না। পরের দিন সকালে আমাদের যেতেই হবে। ঠিক হল যাওয়ার সময় থানায় খবর দিয়ে রঘুর খোঁজ করতে বলে যাব।

পরের দিন সকালবেলা। প্রথমে জিনিসপত্র ট্রাকে করে রওনা করে দেওয়া হল। আমরা তিনজন ট্যাক্সিতে করে শেয়ালদা যাব, সেখান থেকে ট্রেনে খড়দা। বাড়ি থেকে বেরোবার সময় উমাশঙ্করবাবু আর তাঁর স্ত্রী আমাদের বিদায় দিতে এলেন। প্রতিবেশীদের মধ্যেও অনেকে এলেন। অনেকে নিজেদের বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে আমাদের যাওয়া দেখতে লাগলেন। আমার খালি খেয়াল ছিল যাতে যাওয়ার সময় আমাদের বাঁ-পাশের বাড়িটার দিকে আমার দৃষ্টি না পড়ে সেই দিকে।

আমরা ট্যাক্সিতে চড়ার আগে দুখীরাম আমাদের তিনজনকে প্রণাম করে বলল, 'আপনারা চললেন? আপনাদের কাছে আমি মনের আনন্দে ছিলাম। জানি না আবার এ-বাড়িতে কারা আসবেন। তাঁরা কীরকম লোক হবেন কে জানে!'

আমরা দুখীরামকে আমাদের ঠিকানা দিয়ে বললাম যদি সে রঘুর দেখা পায় তাহলে যেন আমাদের কাছে পাঠিয়ে দেয়।

করুণা ভোরেই চলে গেছে। সে কাছের একটা বাড়িতে পার্ট-টাইম ভাত রাঁধার কাজ পেয়েছে।

ট্যাক্সিতে চড়তে যাব, এমন সময় দেখি মাস্টারমশাই আসছেন। আমাদের কাছে এসে তিনি দাদাকে বললেন, 'চললেন তাহলে?' তারপর আমার দিকে তাকিয়ে স্নেহভরা স্বরে বললেন, 'সজল! চললে বাবা?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ মাস্টারমশাই!' বলে আমি তাঁকে প্রণাম করে পায়ের ধুলো নিলাম। তারপর ট্যাক্সিতে চড়ে বসলাম।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ট্যাক্সিকে থানা হয়ে ঘুরে যেতে বলা হল। থানায় গিয়ে সব কথা বললাম। থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মী আমাদের ডায়েরি লিখে নিলেন। আমরা একবার দারোগাবাবুর সঙ্গে দেখা করতে চাইলাম। শুনলাম দারোগাবাবু আধ ঘন্টা বাদে আসবেন।

তখন আমি দাদা-বউদিকে বললাম, 'ঠিক আছে। তোমরা এখন চলে যাও। আমি এখানে

বসে অপেক্ষা করি। দারোগা এলে তাঁর সঙ্গে দেখা করে তারপর আমি যাব।'

দাদা-বউদি তখন চলে গেলেন। আমি দারোগাবাবুর জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

দারোগাবাবু ঠিক আধ ঘণ্টা বাদেই এলেন। যে-দারোগাবাবুর কাছে আমি যুগলকিশোর পতিতুণ্ডির বিরুদ্ধে নালিশ করেছিলাম, তিনি এখান থেকে বদলি হয়ে গেছেন। তাঁর জায়গায় ইনি এসেছেন। এঁকে আমি আমার বক্তব্য বললাম।

শুনে দারোগাবাবু বললেন, 'আপনাদের চাকর পালিয়েছে? কিছু জিনিসপত্র নিয়ে গেছে নাকি?'

আমি বললাম, 'না। আমাদের কোনও জিনিসপত্র তো নেয়ইনি, এমনকী নিজের জিনিসপত্রগুলো অবধি ফেলে রেখে গেছে। আমাদের কাছে ওর এক মাসের মাইনেও পাওনা আছে। ওর কোনও বিপদ-আপদ হয়ে থাকতে পারে। সেইজন্যেই আপনাদের ওর খোঁজ করতে বলছি।'

দারোগাবাবু বললেন, 'আপনাদের কাছে ওর কোনও ফটো আছে?'

আমি বললাম, 'না।'

দারোগাবাবু বললেন, 'তাহলে লোকটার চেহারার একটা description দিন।'

আমি রঘুর চেহারার বিশদ বিববণ দিলাম। বিবরণ শুনে দারোগাবাবু চোখ কপালে তুলে বললেন, 'Oh ! My God !' তারপর একটু থেমে তিনি নিজের মনেই বললেন, 'এ সাত্যকি সাঁই না হয়ে যায় না।'

আমি বললাম, 'সাত্যকি সাঁই কে?'

দারোগাবাবু বললেন, 'আপনি সাত্যকি সাঁইয়ের নাম শোনেননি?'

আমি ঘাড় নাড়লাম।

দারোগাবাবু বললেন, 'সাত্যকি সাঁই একটা অসাধারণ লোক। লোকটাব সম্বন্ধে যতদূর জানা গেছে সে ভদ্রঘরের ছেলে, বেশ শিক্ষিতও বটে। মেক-আপ নিতে আর অভিনয় করতে তার সমান ওস্তাদ খুব কমই আছে। সৎপথে থাকলে সে হয়তো খুব বড়ই হতে পারত। কিন্তু তার বদলে সে হাত পাকিয়েছে গয়না চুরিতে।'

আমি বললাম, 'গয়না চুরিতে?'

দারোগাবাবু বললেন, 'হ্যাঁ। গয়না চুরির ব্যাপারে তার চেয়ে বড় ওস্তাদ আর কেউ নেই। দোকানে গয়না দেখার অছিলা করে এক ফাঁকে সকলের চোখে ধুলো দিয়ে গয়না নিয়ে উধাও হওয়া, নকল চাবি দিয়ে আয়রন সেফ খুলে তার থেকে গয়না সরানো, পার্টিতে সকলের মাঝখান থেকে বড়লোকের বউ-ঝিদের গলার হার চুপিসারে খুলে নেওয়া—এসব তার কাছে জল-ভাত।

'এই সাত্যকি সাঁইয়ের একটা বিরাট দল ছিল। সে-দলের লোকেরা নানাভাবে গয়না চুরি করত, লুঠ করত, গয়নাপরা মেয়ে বা সোনার আংটি-বোতাম-পরা ভদ্রলোক একলা নির্জন রাস্তা দিয়ে রাত্রিতে গেলে তার কাছ থেকে সব কেড়ে-কুড়ে নিত। দলের এমন অনেক লোক ছিল, যারা সাত্যকিকে কোনওদিন দেখেইনি, সাত্যকি তার সহকারীদের মারফত তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখত। দলের সবাই মিলে এক-একটা দিন যা-কিছু গয়না পেত, রাত্রিতে সমস্ত সাত্যকির কাছে জমা হত। কলকাতায় সাত্যকির একটা বড় আড্ডা ছিল, সেখানে সে আর তার প্রধান assistant-রা থাকত। সেখানে তারা গয়নাগুলো রাতারাতি গালিয়ে নিয়ে সোনার বার তৈরি করে ফেলত। জহরতগুলো আলাদা করা হত। তারপর সাত্যকি সোনার বার আর জহরতগুলো চেনাশুনো খদ্দেরের কাছে বিক্রি করত, আর বিক্রি করে যে-টাকা পাওয়া যেত, সেগুলোর অর্ধেক নিজে নিয়ে বাকিটা তার দলের লোকদের মধ্যে ভাগ করে দিত।

'সাত্যকি সাঁইকে আজ অবধি পুলিশ ধরতে পারেনি। তার চেহারাও পুলিশের কোনও লোক দেখেনি। তার আসল নাম সাত্যকি সাঁই কি না, তাও জানা যায়নি।

'যা হোক, সাত্যকি সাঁইয়ের দলের উপদ্রব দিন-দিন বেড়েই চলছিল। অনেক চেষ্টা করেও যখন তাদের ধরতে পারা গেল না, তখন পুলিশ কমিশনার অভিজ্ঞ সি. আই. ডি. অফিসার শিশির হাজরার ওপর সাত্যকি আর তার দলবলকে ধরার ভার দিলেন। আপনি মিঃ হাজরার নাম শুনেছেন?'

আমি বললাম, 'না।'

দারোগাবাবু বললেন, 'এরকম দক্ষ আর পরিশ্রমী লোক আমাদের দেশের পুলিশ ডিপার্টমেন্টে খুব কমই আছে। তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করে সাত্যকির দলের অধিকাংশ লোককেই ধরে ফেললেন। তার আড্ডাটাও খুঁজে বের করে তিনি সে-আড্ডা একবারে ভেঙে দিলেন। যে-কারখানায় সাত্যকির চোরাই গয়না গালানো হত, সেটাও তিনি আবিষ্কার করলেন আর তার লোকগুলোকে গ্রেপ্তার করলেন। বিচারে এদের সবাইকারই জেল হল। কিন্তু পালের গোদা সাত্যকিকে তিনি ধরতে পারলেন না। সে এখনও গা ঢাকা দিয়ে আছে। তার দলের ক'জন লোকও এখনও ধরা পড়েনি।

'কিন্তু যদিও সাত্যকির দলের বেশিরভাগ লোক ধরা পড়েছে, তা হলেও এখনও কলকাতায় রোজই কিছু না কিছু গয়না চুরি হয়ে চলেছে। তার মধ্যে কতকগুলোর ধরন-ধারণ দেখে পুলিশ মনে করে, এগুলো সাত্যকির দলেরই কাজ। অর্থাৎ, পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে কোথাও তিনি লুকিয়ে বসে আছেন, আর তাঁর যে-ক'জন সহকারী ধরা পড়েনি, তাদের সাহায্যে এখনও কারবার চালিয়ে যাচ্ছেন।'

এই পর্যন্ত বলে দারোগাবাবু একটু থামলেন। তারপর বললেন, 'পুলিশের কোনও লোক সাত্যকিকে দেখতে পায়নি, তার ফটোও পুলিশ জোগাড় করতে পারেনি। তবে তাকে ভালোভাবে দেখেছে এমন লোকের কাছ থেকে আমরা তার চেহারার বিবরণ পেয়েছি। আপনাদের চাকর রঘুর চেহারার যে-বিবরণ আপনি এখন দিলেন, তার থেকে আমার মনে হচ্ছে যে, সাত্যকির চেহারার সঙ্গে ওর চেহারার বেশ মিল আছে।

'এর মধ্যে আর-একটা ব্যাপার আছে। পুলিশ ক'মাস আগে কোনও এক সূত্র থেকে খবর পেয়েছিল যে, সাত্যকি হেমন্ত ঘোষ রোডে আছে। আপনারাও হেমন্ত ঘোষ রোডে ছিলেন। সেখানেই রঘু আপনাদের কাছে কাজ করত।

'এ সমস্ত বিষয় থেকে আমার সন্দেহ হচ্ছে যে, হতচ্ছাড়া সাত্যকি এতদিন চাকর সেজে আপনাদের বাড়িতে ছিল। এখন আপনারা চলে যাচ্ছেন, তাই সেও ওখান থেকে কেটে পড়েছে।'

আমি বললাম, 'আমি তাহলে এখন উঠি?'

দারোগাবাবু বললেন, 'একটু অপেক্ষা করুন। আমার ওপর instruction দেওয়া আছে সাত্যকির সঙ্গে সম্পর্ক আছে এরকম খবর এলে সঙ্গে-সঙ্গে মিঃ হাজরাকে জানাতে। আমি এখুনি ওঁকে ফোন করছি। ওঁর হয়তো আপনাকে কিছু জিগ্যেস করার থাকতে পারে। আপনি বসুন।'

এই বলে দারোগাবাবু টেলিফোনের ডায়াল ঘোরালেন। তারপর ফোন তুলে বললেন, 'হ্যালো, লালবাজার? মিঃ হাজরাকে একটু দিন।'

একটু বাদে ওধারে মিঃ হাজরা ফোন ধরলেন। তাঁর সঙ্গে খানিকক্ষণ কথা বলে দারোগাবাবু ফোন রেখে দিলেন। তারপর বললেন, 'মিঃ হাজরা বলছেন এখুনি যদি আপনি একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করেন, তাহলে বড় ভালো হয়। বিষয়টা অত্যন্ত জরুরি বলেই তিনি আপনাকে এখন যেতে অনুরোধ করছেন। আপনার এখন যেতে কোনও অসুবিধে আছে?'

আমি বললাম, 'অসুবিধে থাকলেও বিষয়টা যখন জরুরি তখন আমি নিশ্চয়ই যাব। লালবাজারে তো?'

দারোগাবাবু বললেন, 'হ্যাঁ। লালবাজারে। তিন তলায়।'

আমি দারোগাবাবুকে নমস্কার জানিয়ে থানা থেকে বেরিয়ে পড়লাম।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

লালবাজারে যখন পৌঁছলাম তখন বেলা দশটা বেজেছে। মিঃ হাজরার কাছে কার্ড পাঠানোমাত্রই তিনি আমায় ডেকে পাঠালেন।

মিঃ হাজরা অত্যন্ত অমায়িক ভদ্রলোক। আমি তাঁর ঘরে ঢুকতে তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আসুন আসুন প্রফেসর সেন। আমাদের সবসময়েই চোর-ছ্যাঁচড় নিয়ে কারবার করতে হয়, আপনার মতো সম্মানিত ব্যক্তির পায়ের ধুলো এখানে খুব কমই পড়ে। সেদিক দিয়ে আমি আজ নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করছি। বসুন।'

আমি বসার পরে মিঃ হাজরা বললেন, 'সময় নষ্ট না করে সরাসরি কাজের কথায় আসা যাক। সাত্যকি সাঁই সম্বন্ধে আপনি কিছু শুনেছেন?'

আমি বললাম, 'আগে শুনিনি। আজ সকালে শুনেছি।'

মিঃ হাজরা বললেন, 'তার মানে আপনাদের থানার O. C.-র কাছে শুনেছেন?'

আমি বললাম, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

মিঃ হাজরা বললেন, 'Good. এখন তাহলে আসল কথা শুরু করতে পারি। আপনাদের থানার O. C. বলছিলেন আপনাদের নিরুদ্দিষ্ট চাকর রঘুর সঙ্গে সাত্যকির চেহারার যথেষ্ট মিল আছে। আপনি আমায় বলুন, রঘু কীভাবে আপনাদের বাড়ির চাকরিতে ঢুকল। তারপর, ও যে-সময়টা আপনাদের বাড়িতে কাজ করেছে, সেই সময়ে আপনারা যদি তার চালচলনের মধ্যে কোনও বৈশিষ্ট্য লক্ষ করে থাকেন, তা-ও বলুন। তারপর বলুন, আপনাদের বাড়ি থেকে ওর পালাবার ঠিক আগে কী ঘটেছিল?'

আমি সবকিছুই খুলে বললাম।

মিঃ হাজরা আমার কথা শুনতে-শুনতে শর্টহ্যান্ডে নোট নিয়ে যাচ্ছিলেন। আমার বলা শেষ হলে তিনি বললেন, 'বেশ। এবারে বলুন, রঘু যে-সময়টা আপনাদের বাড়িতে কাজ করেছিল, সে-সময়টা এমন কোনও ব্যাপার আপনাদের নজরে পড়েছিল কি না, যা আপাতদৃষ্টিতে রঘুর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট না হলেও রহস্যজনক?'

আমি বললাম, 'এ ধরনের ব্যাপার কিছু-কিছু যে আমাদের নজরে পড়েনি, তা নয়। আপনাকে সব কথাই বলছি। এই ধরনের রহস্যজনক ব্যাপার শুরু হয়েছে রঘুর চাকরিতে ঢোকার আগে থাকতেই।'

এই বলে কীভাবে আমরা হেমন্ত ঘোষ রোডের বাড়িতে এলাম, তারপর কী-কী ব্যাপার ঘটেছিল, কোন সব লোকদের সংস্পর্শে আমরা এসেছিলাম এবং কী ধরনের অভিজ্ঞতা আমরা লাভ করেছিলাম—সবকিছুই আমি বিশদভাবে বর্ণনা করলাম।

আমার বলা আর মিঃ হাজরার নোট নেওয়া শেষ হলে মিঃ হাজরা আমায় কয়েকটি প্রশ্ন করলেন। মিঃ হাজরা কথা আদায় করে নিতে ওস্তাদ। আমার বিবৃতিতে যে-সমস্ত বিষয় অনুল্লিখিত থেকে গিয়েছিল, সেগুলি তাঁর প্রশ্নের উত্তরের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ হল। অবশ্য একটা প্রসঙ্গ আমি সযত্নে গোপন রাখলাম। সে-কথা আমি কোনওদিন কাউকে মুখ ফুটে বলতে পারব না।

আমার সব কথা শেষ হওয়ার পর মিঃ হাজরা তাঁর টাইপিস্টকে ডেকে শর্টহ্যান্ডে নেওয়া নোটগুলো টাইপ করে আনতে বললেন। তারপর আমায় বললেন, 'প্রফেসর সেন, আপনি আমায় যা বললেন তা খুবই interesting, কিন্তু—।'

একটু থেমে মিঃ হাজরা তারপর আবার বলতে লাগলেন, 'আজ থেকে বছর আড়াই আগে আমরা সাত্যকি সাঁইয়ের দলের বেশিরভাগ লোককে গ্রেপ্তার করি। কিন্তু সাত্যকিকে ধরতে পারলাম না। সে যে কোথায় মিলিয়ে গেল, হাজার চেষ্টা করেও আমরা তার কোনও হদিশ পেলাম না।

অথচ সে যে চুপ করে নেই, তার প্রমাণ আমরা প্রায়ই পেতে লাগলাম। এমন সব গয়না চুরির খবর আসতে লাগল, যেগুলোর ধরন-ধারণ থেকে স্পষ্ট বোঝা গেল, এ তারই দলের লোকের কাজ। অর্থাৎ, সাত্যকি সাঁইয়ের দল ভেঙে যাওয়ায় সে আগেকার মতো ব্যাপক আকারে তার কাজ চালিয়ে যেতে পারছে না বটে, কিন্তু লোক-চক্ষুর আড়ালে থেকে ছোট স্কেলে সে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

'এইভাবেই বছর দেড়েক কেটে গেল। অবশেষে ছ'মাস আগে আমরা একটা কথা শুনতে পেলাম। আমাদের ইনফর্মাররা খবর সংগ্রহ করার জন্যে নিজেদের পরিচয় গোপন রেখে চোর-গুন্ডা-বদমায়েশদের সঙ্গে মেলোমেশা করে, তা নিশ্চয়ই জানেন। একদিন একজন ইনফর্মার বদমায়েশদের একটা আড্ডায় হঠাৎ একজনের কাছে শুনতে পেল যে, সাত্যকি সাঁই হেমন্ত ঘোষ রোডে আছে। যার কাছে শুনল, তার সঙ্গে একসময় সাত্যকির দলের যোগ ছিল—সুতরাং খবরটা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কিন্তু সাত্যকি হেমন্ত ঘোষ রোডের কত নম্বর বাড়িতে আছে, সে-খবর আমাদের ইনফর্মার লোকটার কাছ থেকে বের করতে পারল না। যা হোক, সে যেটুকু শুনেছিল, তা-ই আমার কাছে বলল। আমি তক্ষুনি একদল সাদা পোশাকের সি. আই. ডি. পুলিশকে হেমন্ত ঘোষ রোডে পাঠিয়ে দিলাম। তারা দিনের পর দিন হেমন্ত ঘোষ রোডে ঘোরাফেরা করে জানবার চেষ্টা করল সাত্যকি হেমন্ত ঘোষ রোডে আছে কি না এবং থাকলে কোথায় আছে। আপনি রোজ অসংখ্য নতুন-নতুন নানাধরনের লোককে আপনাদের রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে দেখেছিলেন বলেছেন। এরাই আমাদের সেইসব লোক। এরা বিভিন্ন দিন বিভিন্ন মেক-আপ নিয়ে আপনাদের রাস্তা দিয়ে যেত, তাই আপনি নানাধরনের অসংখ্য নতুন-নতুন লোককে দেখেছেন বলে মনে করেছেন।'

মিঃ হাজরা একটু থেমে তারপর বললেন, 'তারপর আমরা আরও কয়েকজন দক্ষ লোককে হেমন্ত ঘোষ রোডে পাঠালাম। এরা নানা অছিলা করে হেমন্ত ঘোষ রোডের বিভিন্ন বাড়িতে ঢুকে বাড়ির লোকদের সঙ্গে মিশে জানবার চেষ্টা করতে লাগল সাত্যকি সেখানে আছে কি না। বিশেষ করে হেমন্ত ঘোষ রোডে যাঁরা নতুন এসেছেন, তাঁদের কাছেই এইসব লোকরা বেশি করে যেতে লাগল আর সন্ধান নিতে লাগল।'

আমি বললাম, 'কই। আমাদের বাড়িতে তো আপনাদের কোনও লোক যায়নি?'

মিঃ হাজরা আমার কথা শুনে একটু মুখ টিপে হেসে বললেন, 'কে বললে যায়নি? যুগলকিশোর পতিতুণ্ডি তাহলে কে?'

এ-কথা শুনে আমি প্রায় লাফিয়ে উঠে বললাম, 'যুগলকিশোর পুলিশের লোক? আমি ভেবেছিলাম—।'

'একটা বদমায়েশ, তাই না? সেই pose-ই ও আপনাদের কাছে নিয়েছিল। অভিনয় করতেও ও একেবারে ওস্তাদ। ওর আসল নাম নিখিলেশ সান্যাল। এরকম দক্ষ লোক আমাদের লাইনে বেশি নেই। কিন্তু—' এই বলে মিঃ হাজরা উঠে একটা ফাইল বের করে বললেন, 'রিপোর্টগুলো সব এখানেই আছে। দেখা যাক নিখিলেশ আপনাদের বাড়ির সম্বন্ধে কী লিখেছে? আপনাদের বাড়ির নম্বর কত ছিল?'

আমি বললাম, '৩৯-এর বি।'

'৩৯-এর বি?' এই বলে মিঃ হাজরা ফাইলের কতকগুলো পাতা উলটে বললেন, 'হ্যাঁ, এই যে, এই তো পাওয়া গেছে। আপনাদের বাড়ি সম্বন্ধে নিখিলেশ রিপোর্ট দিয়েছে—আমি এ-বাড়িতে বিশেষভাবে অনুসন্ধান করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হচ্ছি যে-সাত্যকি সাঁই বা তার দলের কোনও লোক এ-বাড়িতে নেই।'

আমি বললাম, 'তাহলে?'

মিঃ হাজরা চিন্তান্বিত হয়ে বললেন, 'সেটাই তো আমি ভাবছি। অবশ্য নিখিলেশ যে ভুল করতে পারে না তা নয়। ও এখন এখানে নেই। আমরা একটা বিশেষ কাজে ওকে বোম্বাইয়ে পাঠিয়েছি। ও এখানে থাকলে একবার ওকে এ সম্বন্ধে জিগ্যেস করে দেখতাম।' তারপর মিঃ হাজরা ফাইলের অন্য পাতাগুলো ওলটাতে-ওলটাতে বললেন, 'অন্য সব বাড়িতে যারা গিয়েছিল তারাও একই রিপোর্ট দিয়েছে। এদের রিপোর্ট থেকে আমরা সিদ্ধান্ত করেছিলাম যে, সাত্যকি হেমন্ত ঘোষ রোডে নেই। কিন্তু এখন আপনি আসায় বোধহয় আমাদের সে সিদ্ধান্ত পালটাবার দরকার হবে।'

এমন সময়ে মিঃ হাজরার টাইপিস্ট আমার বিবৃতির যেসব নোট তিনি নিয়েছিলেন, সেগুলো টাইপ করে নিয়ে এল। তার একটা কপি আমার হাতে দিয়ে মিঃ হাজরা বললেন, 'পড়ে দেখুন আপনার বিবৃতি ঠিকমতো রেকর্ড করা হয়েছে কি না?'

আমি পড়ে বললাম, 'সব ঠিকই আছে।' এই বলে মিঃ হাজরার দিকে চেয়ে দেখলাম, বিবৃতির একটা অংশের দিকে তাঁর দৃষ্টি স্থিরনিবদ্ধ হয়ে আছে।

বললাম, 'এত মন দিয়ে কোন কথাটা পড়ছেন?'

মিঃ হাজরা ধীরে-ধীরে বললেন, 'প্রফেসর সেন, আপনার বিবৃতির এক জায়গায় আপনি বলেছেন, "যখন দেখলাম যুগলকিশোর বারবার এইভাবে আসছে আর জ্বালাতন করছে তখন আমরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠলাম। আমি থানায় গিয়ে এ সম্বন্ধে নালিশ করলাম। থানার দারোগা আমার নালিশ লিখে নিলেন—।" তা তো নেবেই, কারণ আপনাদের থানার দারোগার ওপর আমাদের নির্দেশ ছিল যে, কোনও সি. আই. ডি. পুলিশের বিরুদ্ধে কেউ কোনও নালিশ করলে সে তা বিনা বাক্যব্যয়ে গ্রহণ করবে, যাতে কেউ না বুঝতে পারে যে ওরা সি. আই. ডি. পুলিশ। প্রফেসর সেন, এর পরে যে আপনি বলেছেন, "তারপব আমি পরপর চারজন প্রাইভেট ডিটেকটিভের কাছে গিয়ে সমস্ত ব্যাপারটা জানালাম। কিন্তু তাঁরা যা বললেন, তাতেও এই রহস্যের সমাধানের কোনও হদিশ পেলাম না।" এই প্রাইভেট ডিটেকটিভরা কে, প্রফেসর সেন?'

আমি বললাম, 'এঁদের মধ্যে একজন হলেন ব্যোমকেশ বক্সী, দ্বিতীয়জন মিঃ হুকা-কাশি, তৃতীয়জন জয়ন্তবাবু, চতুর্থজন পরাশর বর্মা। আপনি এদের চেনেন মিঃ হাজরা?'

মিঃ হাজরা বললেন, 'চিনি। ব্যোমকেশবাবুর সঙ্গে আমি একবার কাজ করেছিলাম। জয়ন্তবাবুর সঙ্গেও আমার আলাপ আছে। আমাদের ভূতপূর্ব colleague সুন্দরবাবু আমাকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলেন। পরাশরবাবুর সঙ্গে দু-একটা পার্টিতে আমার দেখা হয়েছিল। কিন্তু ভদ্রলোক খুব খামখেয়ালি বলে ওঁর কাছে আমি বিশেষ ঘেঁষিনি। মিঃ হুকা-কাশির সঙ্গে অনেকদিন আগে আমার আলাপ ছিল, কিন্তু মাঝে বহু বছর তাঁর কোনও খবর পাইনি। তিনি যে বেঁচে আছেন, তা-ই এতদিন আমি জানতাম না। যাক, এইসব ডিটেকটিভরা আপনাকে কী বলেছিলেন, তা তো আপনি আমাকে বলেননি প্রফেসর সেন।'

আমি বললাম, 'সে-কথা আপনাকে বলার কি কোনও দরকার ছিল? আপনাদের তো প্রাইভেট ডিটেকটিভদের ওপরে তেমন আস্থা নেই বলেই জানি।'

মিঃ হাজরা বললেন, 'আপনার ধারণা ঠিক নয় প্রফেসর সেন। কতকগুলো ব্যাপারে প্রাইভেট ডিটেকটিভরা যা পারেন, পুলিশ তা পারে না। প্রাইভেট ডিটেকটিভরা যখন যা খুশি করতে পারেন, আমাদের মতন তাঁদের ওপরওলার হুকুমের অপেক্ষায় বসে থাকতে হয় না। অপরাধীর অপরাধের প্রমাণ আবিষ্কারের জন্যে তাঁরা না বলে চোরের মতো চুপিচুপি তার বাড়ি ঢুকতে পারেন, যা আমরা পারি না। তা ছাড়া, আমরা তদন্ত করি স্থূলভাবে—ঘটনাস্থলে হাজির হয়ে সবকিছু দেখি, লোকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে, জেরা করে, চাপ দিয়ে কথা আদায় করি, সন্দেহভাজন লোকদের গ্রেপ্তার করে চালান দিই, তারপর তাদের দিয়ে দোষ স্বীকার করাবার আর তাদের কাছ থেকে অন্য সব খবর আদায় করার চেষ্টা করি। আর প্রাইভেট ডিটেকটিভরা রহস্যভেদ করেন প্রধানত বুদ্ধি দিয়ে, আমাদের

পদ্ধতির তুলনায় তাঁদের পদ্ধতি সূক্ষ্মতর। তবে আমাদের দেশে মাথা খাটিয়ে মীমাংসা করবার মতো কেস ক'টা মেলে। তা ছাড়া পুলিশের যে সবরকম খবর জানবার অধিকার ও সুযোগ আছে, প্রাইভেট ডিটেকটিভদের তা নেই। এ জন্যে আমাদের দেশে প্রাইভেট ডিটেকটিভদের ক্ষেত্র একটু সংকীর্ণ। সে যাক, আপনি যাঁদের নাম করলেন, তাঁদের সকলেরই শক্তি সম্বন্ধে আমার গভীর শ্রদ্ধা আছে। এখন বলুন, কী তাঁরা বলেছিলেন আপনাকে?'

আমি তখন মিঃ হাজরাকে ব্যোমকেশ বক্সী, হুকা-কাশি, জয়ন্ত আর পরাশর বর্মার সঙ্গে আমার যে আলাপ হয়েছিল, তার বিশদ বিবরণ দিলাম এবং তাঁরা শেষকালে কোন বিষয়গুলি বিশেষভাবে জানতে চেয়েছিলেন, তা-ও বললাম।

লক্ষ করলাম, আমার কথা শুনতে-শুনতে মিঃ হাজরার চোখ দুটো ক্রমশই উজ্জ্বল হয়ে উঠতে লাগল। আমার কথা শেষ হলে তিনি বললেন, 'আশ্চর্য লোক এঁরা। সাত্যকি সাঁইকে ঘিরেই যে আপনাদের পাড়ার রহস্যটা ঘনীভূত হয়ে উঠেছে, তা না জেনেও কেবল আপনার কথা শুনেই এঁরা আসল জায়গায় ঘা দিয়েছেন!'

আমি সবিস্ময়ে বললাম, 'আসল জায়গায় ঘা দিয়েছেন? কই, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।'

মিঃ হাজরা বললেন, 'আপনি বুঝতে পারছেন না? জয়ন্তবাবু আপনার কাছ থেকে তাঁর প্রশ্নের উত্তর শুনে খুশি হয়ে নস্যি নিলেন কেন, তা আপনি বুঝতে পারেননি?'

আমি বললাম, 'না তো।'

মিঃ হাজরা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, 'আর তিনজন ডিটেকটিভ আপনাকে যা করতে বলেছিলেন তা করেছিলেন?'

আমি বললাম, 'সবটা করিনি। যেমন পরাশরবাবু আমায় বলেছিলেন জঞ্জালের টিন ওজন কবতে—শুধু একদিন নয় দিনেব-পর-দিন এবং বারবার। কিন্তু কী করে আমি তা করব? কবলে সবাই আমায় পাগল ভাবত। অত বড় দাঁড়িপাল্লাই বা পাব কোথায়? তাছাড়া সকলের সামনে বসে যদি ওগুলো ওজন করতাম, তাহলে বহস্যের সঙ্গে যারা জড়িত, তাদের সাবধান করে দেওয়া হত না? অবশ্য জঞ্জালগুলোর সঙ্গে রহস্যের যোগটা কী, তা আমি এখনও ঠিক বুঝতে পাবছি না।'

মিঃ হাজরা বললেন, 'তাহলে আপনি কিছুই করেননি?'

আমি বললাম, 'প্রায় কিছুই করিনি। তবে পরাশরবাবু আমাকে ও-কথা বলার পর কিছুদিন আমি ভরতি জঞ্জালের টিনটা হাত দিয়ে তুলে তার ওজন আন্দাজ করবার চেষ্টা করতাম।'

মিঃ হাজরা বললেন, 'চেষ্টা করে কী মনে হত?'

আমি বললাম, 'কী আবার মনে হবে? টিনটা আধমনি টিন। দিনে কোনওসময় টিনটা একেবারে ভরত না। একটু ভরলেই রঘু ডাস্টবিনে জঞ্জাল ফেলে আসত। রাত্রে বাড়ির জঞ্জাল, বাগানের জঞ্জাল, উনুনের ছাই, এঁটোকাঁটা সব এসে পড়ায় টিনটা প্রায় ভরে যেত। তখন টিনটা হাত দিয়ে তুলেও বোঝা যেত আধমনটাক জঞ্জাল আছে। জঞ্জালের পরিমাণের কোনও ইতরবিশেষ কখনও টের পাইনি। তবে দু-দিন রাত্রে টিনটা যেন একটু ভারী-ভারী ঠেকেছিল।'

এ-কথা শুনে মিঃ হাজরা বললেন, 'যে, দু-দিন আপনার টিন ভারী-ভারী ঠেকেছিল, সে দু-দিনের ব্যবধান কতখানি, তা আপনার মনে আছে?'

আমি বললাম, 'যতদূর মনে হচ্ছে দিন সাতেক। তবে জোর করে বলতে পারব না।'

মিঃ হাজরা বললেন, 'ব্যোমকেশবাবু যে আপনাকে বলেছিলেন আপনাদের চাকর-রাঁধুনি-মালি-এদের গোড়ালি, আঙুল আর পায়ের তলার বৈশিষ্ট্য লক্ষ করতে, তা কি আপনি করেছেন?'

আমি বললাম, 'করেছি। অবশ্য ওদের পায়ের তলা লক্ষ করা খুব সহজ নয়। গল্প করার অছিলায় ওদের কাছে বসিয়ে লক্ষ করতে হয়েছে।'

মিঃ হাজরা বললেন, 'কী লক্ষ করেছেন?'

আমি বললাম, 'রঘুর পায়ের তলাটা খুব শক্ত, তবে পাশগুলো বেশ প্লেন আর নরম। দুখীরামের পায়ের তলাটা যেমন খুব শক্ত, তেমনি তার পায়ের পাশটাও—বিশেষ করে গোড়ালি আর কড়ে আঙুল খুব বেশি কড়া পড়া। করুণার পায়ের তলাও শক্ত আর তার পায়ে সামান্য কড়াও আছে।'

আমার কথা শুনে মিঃ হাজরার চোখ দপ করে জ্বলে উঠল। তিনি বললেন, 'আর মিঃ হুকা-কাশি যা জানতে চেয়েছিলেন, তা আপনি জেনেছিলেন?'

আমি বললাম, 'জেনেছিলাম। আমাদের চাকর-রাঁধুনি-মালিদের মধ্যে সত্যিই একজন পেটরোগা ছিল। কিন্তু মিঃ হুকা-কাশি সে-কথা কী করে আন্দাজ করলেন, তা আমি এখনও বুঝতে পারিনি।'

মিঃ হাজরা অধীর আগ্রহে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে পেটরোগা ছিল?'

আমি বললাম, 'দুখীরাম।'

আমার কথা শুনে মিঃ হাজরা অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'দুখীরামের চেহারা কীরকম?'

আমি দুখীরামের চেহারার বিবরণ দিলাম।

দুখীরামের চেহারার বিবরণ শুনে মিঃ হাজরা ঘণ্টি বাজিয়ে আর্দালিকে ডেকে বললেন, 'এক্ষুনি গাড়ি বের করতে বলো, আর সার্জেন্ট জোন্‌সকে খবর দাও।'

মিনিট খানেক বাদেই আর্দালি এসে বলল গাড়ি তৈরি। সার্জেন্ট জোন্‌সও এসে স্যালিউট করে দাঁড়ালেন।

মিঃ হাজরা আমার দিকে চেয়ে বললেন, 'চলুন প্রফেসর সেন, এখুনি আমাদের যেতে হবে। একমুহূর্তও সময় নষ্ট করা চলবে না। এসো সার্জেন্ট।'

নবম পরিচ্ছেদ

কোথায় যেতে হবে, তা কিন্তু মিঃ হাজরা বললেন না। গাড়িতে চড়ে দেখি গাড়ি চলেছে দক্ষিণ দিকে।

মিঃ হাজরার ঘরে প্রথম যখন ঢুকেছিলাম, তখন বেলা দশটা। তারপর কথায় বার্তায় আড়াই ঘণ্টা কেটে গেছে। এখন বেলা সাড়ে বারোটা।

এতক্ষণ আমার ভাত খাওয়া হয়নি। স্নান অবশ্য সকালেই করে বেরিয়েছি। খড়দার বাড়িতে গিয়ে আমার ভাত খাওয়ার কথা ছিল। কখন সকালে চা-জলখাবার খেয়েছি, এখন বেজায় খিদে পেয়ে গেছে। তা ছাড়া, দাদা-বউদি নিশ্চয়ই আমার দেরি দেখে ভাবছেন।

মিঃ হাজরাকে আমার অসুবিধের কথা বললাম। তিনি শুনে বললেন, 'বাড়ি ফিরতে অবশ্য আপনার একটু দেরি হবে। এটুকু কষ্ট আপনাকে করতেই হবে। বুঝতেই পারছেন, ব্যাপারটা অত্যন্ত জরুরি। তবে আপনার দাদা-বউদি যাতে না ভাবেন, সে ব্যবস্থা আমি করে দিচ্ছি। আপনাদের খড়দার বাড়িটার একটু direction দিন তো, আর আপনার দাদার নামটা বলুন।'

আমি খড়দার বাড়ির নিশানা আর দাদার নাম বললে মিঃ হাজরা সোফারকে গাড়ি থামাতে বললেন। দেখি গাড়িটা ভবানীপুর থানার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। মিঃ হাজরা থানার ভেতরে ঢুকে গেলেন। একটু বাদে ফিরে এসে বললেন, 'খড়দার পুলিশ স্টেশনে জানিয়ে দিলাম আপনার দাদাকে বলে দিতে যে, আপনার ফিরতে একটু দেরি হবে। তিনি যেন আপনার জন্যে না ভাবেন।'

গাড়ি আবার চলল। একটু পরে দেখি গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে একটা বড় রেস্তোরাঁর সামনে।

মিঃ হাজরা গাড়ির দরজা খুলে বললেন, 'আসুন প্রফেসর সেন।'

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, 'ব্যাপার কী?'

'ব্যাপার কিছুই নয়। আসুন।' বলে আমাকে একরকম জোর করেই ভেতরে নিয়ে গেলেন। তারপর আমার জন্যে চিকেন কারি আর রাইস অর্ডার দিয়ে বললেন, 'নিন। খেয়ে নিন। না, না, কোনও কথা শুনছি না। কখন খাওয়া হয় কিছুই তো বলা যায় না।'

আমি খেলাম। মিঃ হাজরা আর সার্জেন্ট জোন্‌স মাত্র এক পেয়ালা করে চা খেলেন। আমার খাওয়া শেষ হলে বিল চুকিয়ে দিয়ে মিঃ হাজরা বললেন, 'এবার চলুন।'

তারপর আবার সবাই গাড়িতে উঠে বসলাম। একটু বাদে দেখি গাড়ি হেমন্ত ঘোষ রোডে ঢুকছে।

হেমন্ত ঘোষ রোডে আমাদের পুরোনো বাড়িটার সামনে গাড়ি থামল। মিঃ হাজরা গাড়ি থেকে নেমে বললেন, 'আপনাদের মালি দুখীরামকে ডাকুন একবার। তার সঙ্গে আমরা একটু কথা বলতে চাই।'

আমি ফটক খুলে বাড়ির ভেতরে ঢুকলাম। মালির ঘরটার সামনে গিয়ে দেখি ঘর তালাবন্ধ। দুখীরাম নেই।

আমি মিঃ হাজরাকে সে-কথা বললাম।

মিঃ হাজরা বললেন, 'নেই? ঠিক যা ভেবেছিলাম তাই!'

এমনসময় দেখি আমাদের সামনের বাড়ির শ্রীপতিবাবু তাঁর দোতলার বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছেন। আমাকে দেখে তিনি বললেন, 'একি সজলবাবু! আপনারা তো আজ সকালে চলে গেলেন। তারপর আবার এসেছেন যে?'

আমি বললাম, 'দুখীরামকে আমাদের একটু দবকার। সে তো নেই দেখছি। কখন বেবিয়েছে বলতে পারেন?'

শ্রীপতিবাবু বললেন, 'দুখীরাম? আপনারা বেরিয়ে যাওয়ার একটু পরে তাকে দেখেছিলাম মনে পড়ছে। তখন সে ফুল নিয়ে মাস্টারমশায়ের বাড়ি যাচ্ছিল। তারপর তাকে আর দেখিনি।'

এ-কথা শুনে মিঃ হাজরা বললেন, 'মাস্টারমশাই—মানে ডক্টর অম্বিকারঞ্জন কানুনগো? তাহলে চলুন প্রফেসর সেন, তাঁকেই একবার জিগ্যেস করে দেখি। তিনি হয়তো কিছু বলতে পারবেন।'

আমি এ-কথায় একটু বিব্রত বোধ করলাম। সেই অবিস্মরণীয় দিনটির পরে আর আমি মাস্টারমশায়ের বাড়ি যাইনি। আমি বললাম, 'মাস্টারমশায়ের বাড়ি গিয়ে আর কী হবে? উনি আত্মভোলা মানুষ, কোনও কিছু নিয়ে মাথা ঘামান না। উনি কিছুই বলতে পারবেন না।'

'উনি না পারুন, ওঁর বাড়ির লোকেরা পারতে পারে। আসুন প্রফেসর সেন।' এই বলে মিঃ হাজরা আমাকে একরকম জোর করে টেনে নিয়েই ঢুকে পড়লেন মাস্টারমশায়ের বাড়ির মধ্যে।

ইলা বাড়িতেই ছিল। সে বোধহয় আমার গলা শুনতে পেয়েছিল, কিন্তু আমি যে বাড়িতে ঢুকব, তা সম্ভবত ভাবতে পারেনি। বলা বাহুল্য, সেদিনের পরে ইলার সঙ্গে আমার আর কোনও কথা হয়নি। আমাকে দেখে ইলা মুখে জোর করে হাসি টেনে এনে বলল, 'ব্যাপার কী প্রফেসর সেন? আপনি হঠাৎ—এই সময়ে?'

আমি কিছু বলার আগেই মিঃ হাজরা বললেন, 'আমরা পাশের বাড়ির মালি দুখীরামের খোঁজে এসেছিলাম। তাকে পেলাম না। শুনলাম সে সকালে আপনাদের বাড়ি ফুল দিতে এসেছিল। তারপর তাকে আর কেউ দেখেনি। সে কোথায় গেছে বলতে পারেন?'

ইলা বলল, 'দুখীরাম? কই না তো। সে কোথায় গেছে তা আমরা কী করে জানব?'

মিঃ হাজরা বললেন, 'সে-কথা ঠিক। আচ্ছা ডক্টর কানুনগো কি বাড়িতে আছেন? আমি তাঁর সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।'

ইলা বলল, 'বাবার সঙ্গে তো দেখা হবে না। তিনি সকাল ন'টায় সামান্য কিছু খেয়ে নিয়েই ল্যাবরেটরিতে ঢুকেছেন। বলেছেন একটা খুব important experiment করবেন, সারাদিন ল্যাবরেটরি থেকে বেরোবেন না, কারও সঙ্গে দেখাও করবেন না। চার-পাঁচজন ভদ্রলোক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন, তাঁদের আমি ফিরিয়ে দিয়েছি।'

'তাঁদের কথা আর আমার কথা স্বতন্ত্র মিস কানুনগো। আমার duty হচ্ছে এ ব্যাপারে ডাঃ কানুনগোকে একবার জিগ্যেস করা। সে duty আমাকে করতেই হবে। আমি মাত্র একটা কথা জিগ্যেস করেই চলে যাব। আসুন প্রফেসর সেন। এসো সার্জেন্ট। বাড়িতে আর কেউ নেই তো? তাহলে আমরা নির্ভয়ে ওপরে উঠতে পারি।' এই বলে মিঃ হাজরা ওপরে উঠতে লাগলেন। আমি যন্ত্রচালিতের মতো তাঁর পেছনে-পেছনে চললাম। আমার পেছনে ছিলেন সার্জেন্ট জোন্‌স।

তেতলায় উঠে দেখি মাস্টারমশায়ের ল্যাবরেটরির দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। জানলাগুলোর শার্শিও বন্ধ। বাইরে থেকে আমরা দেখতে পেলাম মাস্টারমশাই চেয়ারে বসে একটা বিকার নিয়ে নাড়াচাড়া করছেন।

মিঃ হাজরা দরজায় একটা টোকা মেরে বললেন, 'ডক্টর কানুনগো! আপনার সঙ্গে আমরা একটু কথা বলতে চাই।'

মাস্টারমশাই কিন্তু দরজা খুললেন না। তিনি যেমনভাবে ছিলেন সেইভাবেই বসে রইলেন। তখন মিঃ হাজরা একটা শার্শির সামনে এসে চিৎকার করে বললেন, 'ডক্টর কানুনগো! আপনার সঙ্গে আমরা একটু কথা বলতে চাই।'

মাস্টারমশাই এতক্ষণে বাইরের দিকে তাকালেন। তিনি যেন হঠাৎ কীরকম বিব্রত হয়ে পড়লেন। তারপর চেয়ার ছেড়ে উঠে ল্যাবরেটরির লাগাও বাথরুমে ঢুকে পড়লেন।

মিনিট খানেক আমরা তাঁর জন্যে অপেক্ষা করলাম। কিন্তু মাস্টারমশাই আর ফিরে এলেন না।

হঠাৎ মিঃ হাজরা বললেন, 'জোন্‌স! বাড়ির পেছন' দিক থেকে কীরকম একটা শব্দ শোনা যাচ্ছে না?'

'হ্যাঁ! কেউ যেন ওপর থেকে নীচে নেমে যাচ্ছে।'

মিঃ হাজরা বললেন, 'প্রফেসর সেন, এ-বাড়িতে বাথরুমে মেথরদের ওঠবার ঘোরানো সিঁড়ি আছে?'

আমি বললাম, 'আছে।'

মিঃ হাজরা বললেন, 'তাহলে ডক্টর কানুনগো নিশ্চয়ই সেই সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে যাচ্ছেন। ব্যাপার কী? আসুন তো নীচে নেমে দেখি।' এই বলে মিঃ হাজরা সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলেন। তাঁর পেছনে আমরা। কিন্তু সিঁড়ির দরজাটা অবধি গিয়েই আমাদের থেমে যেতে হল। দেখি দরজাটা বন্ধ। বাইরে থেকে কে শেকল লাগিয়ে গেছে।

মিঃ হাজরা এই ব্যাপার দেখে ছুটে আবার ওপরে উঠে এলেন। এসে বললেন, 'জোন্‌স। তুমি এক্ষুনি নর্দমার পাইপ বেয়ে নীচে নামো। নেমে ডক্টর কানুনগোকে পাকড়াও করো।'

জোন্‌স আর কথাটি না বলে তক্ষুনি ড্রেন-পাইপ বেয়ে নামতে শুরু করলেন। আশ্চর্য ক্ষিপ্র গতি তাঁর।

মিঃ হাজরা কপালের ঘাম মুছে বললেন, 'ডক্টর কানুনগোকে আমরা শ্রদ্ধা করি। কিন্তু যিনি পুলিশকে দেখে এইভাবে পালান, তাঁকে আটক না করে আমাদের উপায় নেই। Duty is duty!'

আমি বললাম, 'কিন্তু ব্যাপার কী? মাস্টারমশাই এইভাবে পালালেন কেন?'

মিঃ হাজরা বললেন, 'সেটা আমাদের জানতে হবে।'

আমি বললাম, 'আর সিঁড়ির দরজাটা বন্ধ করল কে?'

মিঃ হাজরা বললেন, 'সেটা বোধহয় আমি বলতে পারি। যিনি একটু আগে আমাদের সঙ্গে কথা বলছিলেন, তিনি।'

আমি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে তারস্বরে প্রতিবাদ করে উঠলাম, 'ইলা? না-না, এ হতে পারে না। ইলা কোনও কিছুর মধ্যে থাকতে পারে না।'

মিঃ হাজরা আমার কথা বলার ধরন দেখে একটু অবাক হয়ে বললেন, 'ব্যাপার কী প্রফেসর সেন? আপনি অত উত্তেজিত হচ্ছেন কেন?'

আমি তার উত্তরে কিছু বলার আগেই পাশের গলি থেকে দু-জোড়া পায়ের দৌড়োনোর শব্দ শোনা গেল। বেশ বোঝা গেল একজন লোক ছুটে পালাচ্ছে, আর একজন তার পিছু-পিছু ধাওয়া করছে।

একটুবাদেই পুলিশ-হুইসলের তীক্ষ্ণ আওয়াজ ধ্বনিত হয়ে উঠল।

মিঃ হাজরা বললেন, 'জোন্‌স তাহলে ডক্টর কানুগোকে ধরেছে। কিন্তু ডক্টর কানুনগো কেন এমন—।'

তারপর দেখলাম চারদিক থেকে বহু পুলিশ কনস্টেবল ছুটে আসছে। কাছেপিঠে যে যেখানে ছিল, হুইসলের আওয়াজ পেয়ে সবাই চলে আসছে।

একটু বাদে দুজন কনস্টেবল এই বাড়িতে ঢুকে সিঁড়ির দরজা খুলে দিল। অবশ্য এতে তাদের একটু সময় লাগল, কারণ একতলা থেকে দোতলায় ওঠবার আর দোতলা থেকে তেতলায ওঠবার দুটো সিঁড়ির দরজাই বন্ধ ছিল। তাও আবার শুধু শেকল দেওয়া নয়, একেবারে তালাবন্ধ। তালা ভাঙতে কনস্টেবলদের খানিকটা দেরি হল। তারপর সিঁড়ির দরজা খুলে দিয়ে তারা মিঃ হাজরাকে সেলাম করে বলল, 'সার্জেন্ট জোন্‌স আপনাকে যেতে বলছেন।'

মিঃ হাজরা কনস্টেবলদের সঙ্গে-সঙ্গে যেখানটায় জোন্‌স মাস্টারমশাইকে ধরেছিল, সেইখানে গেলেন। তাঁর সঙ্গে আমিও গেলাম। গিয়ে দেখি জোন্‌স মাস্টারমশাইকে শুধু ধরেনি, তাঁকে হাতকড়াও পরিয়েছে।

মিঃ হাজরা বললেন, 'কী ব্যাপার, জোন্‌স?'

জোন্‌স বললেন, 'Very tough guy, sir ! অনেক ধস্তাধস্তি করে তারপব আমি ওকে বাগ মানাতে পেরেছি। But have you noticed the real thing, sir ?'

'Certainly I have,' বলে মিঃ হাজরা মাস্টারমশায়ের কাছে গিয়ে একটানে তাঁর মুখ থেকে দাড়িটা আর মাথা থেকে পরচুলোটা খুলে ফেলে বললেন, 'সাত্যকি সাঁই! এতদিনে তোমার খেল খতম হল।' তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন, 'দেখুন। একে চিনতে পারেন?'

আমি বিস্ময় বিহ্বল কণ্ঠে বললাম, 'এ তো দুখীরাম!'

দশম পরিচ্ছেদ

আমি স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে রইলাম। আশ্চর্য, এই সেই দুখীরাম। যদিও চুলগুলো ছোট-ছোট করে ছাঁটা আর দাড়ি গোঁফ কামানো, তাহলেও তাকে চিনতে কষ্ট হয় না।

আমার মনে হল, আমি যেন স্বপ্ন দেখছি। আমি বলে উঠলাম, 'তাহলে মাস্টারমশাই আর দুখীরাম একই লোক?'

দুখীরাম দাঁত কড়মড় করে আমার আর মিঃ হাজরার দিকে তাকাল। কী ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে এখন তার মুখখানা। আশ্চর্য। এই লোকটাকেই এতদিন আমরা—।

মিঃ হাজরা বললেন, 'প্রফেসর সেন। আপনি আমার সঙ্গে আসুন। আমাদের কাজ বাকি

রয়েছে। জোন্‌স! তুমি তোমার আসামিকে দ্যাখো। আর একজন কনস্টেবলকে দিয়ে ফোন করিয়ে দাও প্রিজন ভ্যান পাঠাবার জন্যে।' বলে তিনি দুজন কনস্টেবলের দিকে চেয়ে বললেন, 'তোমরা আমার সঙ্গে এসো।'

আমরা আবার মাস্টারমশায়ের বাড়িতে গেলাম। সেখানে তখন কেউ নেই। ইলার টিকিটিও কোথাও দেখা গেল না।

মিঃ হাজরা একতলার ঘরগুলোর সামনে গিয়ে দেখতে লাগলেন। ঘরগুলোর বেশিরভাগই তালাবন্ধ। মিঃ হাজরা আমায় বললেন, 'ডক্টর কানুনগোর শোওয়ার ঘরটা কোথায়?'

আমি ঘরটা দেখিয়ে দিতে তিনি তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। সেটাও তখন তালাবন্ধ ছিল। মিঃ হাজরা কনস্টেবলদের ডেকে বললেন, 'তোমরা তালা ভেঙে ফ্যালো।'

তালা ভাঙা হতে আমরা ঘরের ভেতরে গিয়ে ঢুকলাম। ঘরের জানলাগুলোও সব বন্ধ। কিন্তু খাটের ওপর শুয়ে ও কে?

মাস্টারমশাই!

মিঃ হাজরা কনস্টেবলদের ইঙ্গিত করে জানলা খুলে দিতে বললেন, তাবপব মাস্টারমশায়ের কাছে গিয়ে তাঁর নাড়ি হাতে নিলেন।

আমি চেঁচিয়ে বললাম, কী সর্বনাশ। মাস্টারমশাইকে কি ওরা খুন করে রেখে গেছে?'

মিঃ হাজরা হাত তুলে আমায় শান্ত হতে বললেন। তারপর বললেন, 'না। বেঁচে আছেন। ওঁকে মারেনি। অজ্ঞান করেছে। নকল ডক্টর কানুনগোকে দেখেই আমি বুঝেছিলাম যে, আসলকে ওরা বাড়ির মধ্যে গুম করে রেখেছে। প্রফেসব সেন! আপনি এখুনি গিয়ে একজন ডাক্তার ডেকে আনুন।'

আমি ডাক্তারকে নিয়ে যখন ফিরলাম, তখন ওদিকে প্রিজন ভ্যান এসে গেছে আর সাত্যকি সাঁইকে তাতে তোলা হচ্ছে।

ডাক্তারবাবু মাস্টারমশাইকে দেখে বললেন, 'ভযের কোনও কিছু নেই। কয়েক ঘণ্টা বাদে ওঁর জ্ঞান ফিরবে। কিন্তু ওঁকে অজ্ঞান করলে কে?'

মিঃ হাজরা বললেন, 'সে অনেক কথা ডক্টব। আচ্ছা, ওঁকে হাসপাতালে remove করলে বোধহয় ভালো হয়, তাই না?'

ডাক্তারবাবু বললেন, 'হাসপাতালে? কেন, ওঁর মেয়েই তো ওঁর দেখাশুনো করতে পারেন।'

মিঃ হাজরা বললেন, 'তাহলে তো ভালোই হত। কিন্তু সে কোথায় চলে গেছে। আমাদেরই বোধহয় তাকে খুঁজে—সে যাক। হাসপাতালেই তাহলে ওঁকে পাঠানো যাক। আমি already হাসপাতালে ফোন করে দিয়েছি।'

একটু বাদেই হাসপাতাল থেকে অ্যাম্বুলেন্স এসে পৌঁছল এবং মাস্টারমশাইকে নিয়ে চলে গেল।

মিঃ হাজরা তখন আমার দিকে ফিরে বললেন, 'প্রফেসর সেন! আপনিও এবার বাড়ি চলে যান। সারাদিন আপনার শরীর মনের ওপর কম strain হয়নি। এখন বাড়ি গিয়ে বিশ্রাম করুন। হপ্তাখানেক বাদে আপনি আমার সঙ্গে দেখা করবেন।'

একাদশ পরিচ্ছেদ

এক সপ্তাহ বাদে—৭ আগস্ট, ১৯৬৩ তারিখে আমি মিঃ হাজরার সঙ্গে দেখা করলাম।

মিঃ হাজরা আমাকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে বললেন, 'আপনাকে দুটি সুসংবাদ দিচ্ছি প্রফেসর

সেন। প্রথম, ডক্টর কানুনগোর জ্ঞান যথাসময়েই ফিরে এসেছে—উনি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। দ্বিতীয়, সাত্যকিকে গ্রেপ্তার করার পরে ওর জামাকাপড় তল্লাশ করে আমরা এমন কিছু কাগজপত্র পেয়েছিলাম, যার থেকে ওর সহকর্মীদের আস্তানার হদিশ পাই। তা পাওয়ার ফলে আমরা তার দলের সবাইকেই গ্রেপ্তার করতে পেরেছি।'

আমি বললাম, 'বাঃ! বেশ আনন্দের খবর!'

মিঃ হাজরা বললেন, 'কিন্তু একটি দুঃসংবাদও আছে। একজনকে আমরা ধরতে পারিনি।'

আমি বললাম, 'তিনি কে?'

মিঃ হাজরা বললেন, 'তিনি হচ্ছেন শ্রীমতী ইলা দেবী, ডক্টর অম্বিকারঞ্জন কানুনগোর কন্যা এবং—।'

মিঃ হাজরা একটু থেমে বললেন, 'এবং শ্রীল শ্রীযুক্ত সাত্যকি সাঁইয়ের স্ত্রী।'

আমি এ-কথা শুনে স্থান কাল পাত্র ভুলে চিৎকার করে উঠলাম, 'অ্যাঁ! এ কী বলছেন? ইলা—ইলা—সে সাত্যকি সাঁইয়ের মতো criminal-এর—না, না, আমি বিশ্বাস করি না! ইলা বিবাহিতা! না, না, এ সত্যি হতে পারে না, কখনও সত্যি হতে পারে না!'

মিঃ হাজরা বললেন, 'এ-কথা সম্পূর্ণ সত্যি, প্রফেসর সেন। তার প্রমাণ এই দেখুন—' বলে তিনি একখানা কাগজ আমার হাতে দিলেন।

যন্ত্রচালিতের মতো তাঁর হাত থেকে আমি কাগজখানা নিলাম। নিয়ে দেখি, সেটি স্পেশাল ম্যারেজ অ্যাক্ট অনুসারে সম্পাদিত একটি বিবাহের দলিল। বিবাহের তারিখ ২৯ জানুয়ারি, ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দ। বিবাহ রেজিস্ট্রি করেছেন স্পেশাল ম্যারেজের রেজিস্ট্রার কালীপদ সরকার। দলিলে পাত্র-পাত্রী হিসেবে যাঁদের সই আছে তাঁরা হলেন অনিলেন্দু মিত্র এবং ইলা কানুনগো। শেষের সইটিব হস্তাক্ষর আমার একান্ত পরিচিত।

আমার মাথা ঘুরতে লাগল। অতি কষ্টে নিজেকে সংযত করে ক্ষীণ স্বরে বললাম, 'কিন্তু অনিলেন্দু মিত্র—।'

'এটা দেখুন প্রফেসর সেন' এই বলে মিঃ হাজরা আমার হাতে আর-একখানা কাগজ দিলেন। দেখি তাতে লেখা আছে ঃ

> *গত ২৯ জানুয়ারি, ১৯৫৯ তারিখে আমি শ্রীযুক্ত অনিলেন্দু মিত্র ও কুমারী ইলা কানুনগোর বিবাহ রেজিস্ট্রি করেছিলাম। আজ আমায় লালবাজার পুলিশ স্টেশনের হাজতে সাত্যকি সাঁই নামে পরিচিত একটি বন্দিকে দেখানো হয়। আমার এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে, উক্ত অনিলেন্দু মিত্র এবং এই সাত্যকি সাঁই অভিন্ন লোক।*
>
> *শ্রীকালীপদ সরকার*
> *৪ আগস্ট, ১৯৬৩*

মিঃ হাজরা বললেন, 'বুঝতে পারছেন না? অনিলেন্দু মিত্রই ওর আসল নাম, আর সাত্যকি সাঁই ছদ্মনাম।'

আমি কপাল চেপে ধরে বসে রইলাম। নিজের মনোভাব গোপন রাখার কোনও চেষ্টাই আর করতে পারছিলাম না।

তখন মিঃ হাজরা তাঁর চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে আমার পিঠে হাত রেখে বললেন, 'এত ঘাবড়ে যাবেন না প্রফেসর সেন। Be steady. আপনি বিজ্ঞ লোক, আপনি যদি এত বিচলিত হন, তাহলে অন্য লোক কী করবে?'

আমি ক্ষীণ কণ্ঠে বললাম, 'আপনি সব কথা বুঝতে পারছেন না, মিঃ হাজরা।'

মিঃ হাজরা বললেন, 'আমি সব কথা জানি। সেদিন যখন আমি বললাম ইলা দেবীই সিঁড়ির দরজা বন্ধ করেছেন, তখন আপনি খুব বিচলিত হয়ে পড়লেন। এতে আমি একটু আশ্চর্য হলাম। তারপর এই ক'দিনে আমি আপনাদের হেমন্ত ঘোষ রোডের অনেক প্রতিবেশীর জবানবন্দি নিয়েছি। তাঁদের কাছ থেকেই আমি জানতে পেরেছি যে, আপনার সঙ্গে ইলা দেবীর সম্পর্ক এক সময়ে চরম ঘনিষ্ঠতার পর্যায়ে পৌঁছেছিল। তারপর মাস দেড়েক হল আপনাদের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে।'

আমি কোনও কথা না বলে চুপ করে রইলাম।

মিঃ হাজরা সহানুভূতি-ভরা কণ্ঠে বললেন, 'প্রফেসর সেন, আপনি কি অসুস্থ বোধ করছেন? তাহলে আর বসে থেকে কাজ নেই, বাড়ি চলে যান। বলেন তো আপনাকে গাড়ি করে বাড়ি পাঠিয়ে দিতে পারি।'

আমি তখন গলার স্বরকে সহজ করার চেষ্টা করে বললাম, 'না মিঃ হাজরা! আমি নিজেকে সামলে নিয়েছি। এখন আপনার কাছে আমি সব কথা শুনতে চাই। সব রহস্য আমার কাছে এখনও পরিষ্কার হয়নি।'

মিঃ হাজরা বললেন, 'পরিষ্কাব করে দিচ্ছি প্রফেসর সেন। সব কথাই আমরা জানতে পেরেছি। সাত্যকি সাঁই বাঁচবার আর কোনও উপায় নেই দেখে সব কথাই স্বীকার করেছে। যে দু-একটা কথা সে জানত না, তা আমরা ডক্টর কানুনগো আর রঘুর কাছ থেকে জানতে পেরেছি।'

আমি বললাম, 'রঘু? রঘুকে আপনারা কোথায় পেলেন?'

মিঃ হাজরা বললেন, 'রঘুকে যথাস্থানেই পেয়েছি। সে যাক, এখন সমস্ত ব্যাপারটার ইতিহাস আগাগোড়া শুনুন।'

মিঃ হাজরা বলতে লাগলেন ঃ

'ইলা ডক্টর অম্বিকারঞ্জন কানুনগোর একমাত্র সন্তান। শৈশবেই তার মা মারা গিয়েছিলেন। ডক্টর কানুনগো আত্মভোলা বিজ্ঞানী। গবেষণা আর অধ্যাপনা ছাড়া তিনি আর কিছুই জানেন না। মেয়েকে মানুষ করে তোলার ব্যাপারে তিনি একেবারেই মন দিতে পারেননি। তার ফলে অল্প বয়েস থেকেই ইলার চালচলন বিগড়োতে শুরু করে। অবশ্য মাথা ছিল বলে স্কুল-কলেজ-ইউনিভার্সিটির পরীক্ষাগুলো সে বরাবর পাশ করে গেছে, কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে সে ছিল বিপরীত পথের পথিক। যেসব স্কুল-কলেজে সে পড়েছিল, সেখানে খোঁজ নিয়ে এবং তার কোনও-কোনও সহপাঠিনীর সঙ্গে আলাপ করে আমি জানতে পেরেছি যে, কৈশোরেই তার একদল পুরুষ বন্ধু জুটেছিল, যাদের চাল-চলন একেবারেই ভালো ছিল না; বয়েস বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে তার এই ধরনের বন্ধুর সংখ্যাও ক্রমশই বাড়তে থাকে।

'অনিলেন্দু, ওরফে সাত্যকি, দুর্বৃত্ত হলেও ভদ্রঘরের ছেলে। সে শিক্ষাদীক্ষা পেয়েছে, আদবকায়দাও জানে। ঘটনাচক্রে ইলার সঙ্গে তার পরিচয় হয় এবং সে পরিচয় ক্রমশ ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয়। মেয়েদের পটাবার কায়দা সাত্যকি ভালো করেই জানত। সুতরাং ইলাকে সে সহজেই হাত করে নিল। সাত্যকি যে আসলে কী, তা ইলার কাছে সে গোপন করেনি। ইলা তার পরিচয় জানতে পেরে অখুশি হয়নি, বরং তার বিকৃত রুচির জন্যে সাত্যকির প্রতি তার আকর্ষণ আরও বেড়ে যায়।

'এই ক্রমবর্ধমান আকর্ষণের পরিণতি হয় দুজনের পরিণয়ের মধ্যে। কিন্তু সাত্যকি ইলাকে বিশেষ করে বলে দিল ইলা যাতে এই বিয়ের কথা কারও কাছে প্রকাশ না করে এবং কুমারী সেজেই থাকে। ইলাও তাতে রাজি হল। এরকম ব্যবস্থা হল তার কারণ—প্রথমত, ইলার বাবা দেশবরেণ্য ব্যক্তি, আদর্শবাদী অধ্যাপক। একজন অজ্ঞাতকুলশীল লোকের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে তিনি মোটেই প্রসন্নভাবে অনুমোদন করবেন না এবং জামাইয়ের আসল পরিচয় জানতে পারলে হয়তো মেয়ের

সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করবেন। তা যদি করেন, তাহলে ইলা বাপের বাড়ি, টাকাপয়সা এবং অন্যান্য সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হবে। দ্বিতীয়ত, কুমারী ইলার পক্ষে পুরুষদের আকৃষ্ট করা যতটা সহজ হবে, বিবাহিতা ইলার পক্ষে ততটা সহজ হবে না। ইলাকে দিয়ে পুরুষদের আকৃষ্ট করানোর দরকার যে সময়-সময় হবেই, তা সাত্যকি বুঝতে পেরেছিল।'

এই বলে মিঃ হাজরা একটু হাসলেন।

তারপর তিনি বলতে লাগলেন, 'সুতরাং ব্যাপারটা দাঁড়াল এই যে, সাত্যকি আর ইলাব বিয়ে হয়ে গেলেও সে-বিয়ে প্রকাশ্যে ঘোষিত হল না, সাত্যকির সঙ্গে তার শ্বশুরেরও পরিচয় হল না। স্ত্রীর সঙ্গে তার মিলন ঘটতে লাগল বিভিন্ন নির্জন স্থানে, গোপন মধুচক্রে। এককথায় সাত্যকি-ইলা স্বামী-স্ত্রী হলেও তারা পরকীয়া প্রেমিক-প্রেমিকার জীবনযাপন করে চলল।

'এইভাবেই বছর দুয়েক নির্বিঘ্নে কেটে গেল। তারপরেই ঘনিয়ে এল বিপদ। পুলিশ কমিশনার দুরাত্মা শিশির হাজরার ওপর সাত্যকিকে ধরার ভার দিলেন। ছোটলোকটা সাত্যকিব প্রধান-প্রধান শাগরেদদের গ্রেপ্তার করল, তার বড় আড্ডাটা ভেঙে দিল। এমনকি তার কারখানাটাও আবিষ্কার করে ফেলল। তারপর শয়তানটা ব্লাড হাউন্ডের মতো সাত্যকিকে খুঁজে বেড়াতে লাগল। সাত্যকি তখন বেগতিক দেখে কলকাতা ছেড়ে মিরাটে পালিয়ে গেল। সেখানে সে তার বহুদিনের বন্ধু পীতাম্বর ঘোষালের কাছে গা-ঢাকা দিয়ে বসে রইল। পীতাম্বর ঘোষাল লোকটার আসল নাম পীতাম্বর ঘোষালই বটে এবং সে কন্ট্রাক্টরও বটে, কিন্তু খুব বড় কন্ট্রাক্টর নয়। অবশ্য বেশ কিছু টাকা তার আছে। কীভাবে সে এই টাকা রোজগার করল, তা কেউ সঠিকভাবে বলতে পারে না। লোকটা নানারকম চোরাকারবার আর নিষিদ্ধ মাদকদ্রব্যের ব্যাবসা করে বলে মিরাটের পুলিশ সন্দেহ করে। সম্ভবত এইসব ব্যাপারেরই সূত্র ধরে সাত্যকির সঙ্গে তার প্রথম পরিচয় হয়।

'সাত্যকি প্রায় ছ'মাস মিরাটে ছিল। এই ছ'মাসের মধ্যে তাব লম্বা দাড়ি গজাল, চুল খুব বড় হযে গেল। তাব ফলে তার চেহাবাটা অনেকখানি বদলে গেল। মিরাটে চিবকাল বসে থাকলে তার চলবে না—তাকে কলকাতায় ফিরতে হবে, পুবোনো ব্যাবসা আবার শুরু করতে হবে। ও-কাজ ছেড়ে সে থাকতে পাববে না।

'সুতরাং চেহারা বদলে নিয়ে সাত্যকি দেশে ফিরল। ফিরে প্রথমে সে তাব যেসব সহকারী তখনও ধরা পড়েনি, তাদেব সঙ্গে দেখা কবল। সর্দার চলে যাওয়ায় তাদের অবস্থা হয়েছিল হালভাঙা পালছেঁড়া নৌকোর মতো—কাজকর্ম বিশেষ কিছুই তারা করতে পারছিল না। সাত্যকি তাদের শিখিয়ে দিল কোথায়-কোথায় তারা থাকবে, কীভাবে কাজ সাববে, পুলিশ এলে কীভাবে তাদেব পালাতে হবে ইত্যাদি।

'কিন্তু সাত্যকি নিজে থাকবে কোথায়? শুধু থাকার কথা ভাবলেই চলবে না, রোজকার সব চোরাই গয়না তার হাতে আসা চাই। তারপর তাকে সেগুলো গালিয়ে সোনার বার তৈরি করতে হবে, সোনার বারগুলো বিক্রি করতে হবে। এসব সে করবে কেমন করে? চারদিকে পুলিশ ঘুরছে তার খোঁজে। লক্ষ্মীছাড়া শিশির হাজরাও এখনও তাকে ধরার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

—কিন্তু সাত্যকি দমবার পাত্র নয়। অনেক ভেবে সে একটা প্ল্যান ঠিক করল। প্রথমে সে চিঠি লিখে তার বউকে ডেকে পাঠিয়ে একটা নির্জন জায়গায় তার সঙ্গে দেখা করল। তারপর তাকে তার প্ল্যান খুলে বলে সেটা কাজে পরিণত করে তোলার ব্যাপারে তার সাহায্য চাইল। ইলা তো সানন্দে রাজি। দীর্ঘকাল বিরহযন্ত্রণা ভোগ করার পর সে স্বামীর দেখা পেয়েছে, তার সুখ আর মঙ্গলের জন্যে সে কিছুই করতে পিছপাও নয়।

'সাত্যকির প্ল্যানের প্রথম অঙ্গ হচ্ছে তার স্ত্রীর খুব কাছে থাকা এবং এমনভাবে থাকা, যাতে কেউ তার পরিচয় আন্দাজ করতে না পারে। ইলাকে প্রথমে সে সেই ব্যবস্থা করতে বলল। ইলাও সে-ব্যবস্থা করল। সে তার বাবার কাছে ঘ্যানঘ্যান করতে লাগল যে, তার কলেজের পুরোনো মালি

দুখীরাম এখন বেকার হয়ে বসে আছে, তার একটা কাজ করে দেওয়া দরকার। পাশের বাড়ির বিরাজবাবুর মালি তো চলে গেছে, ওই কাজটা তাকে করে দাও না। তারপর একদিন সাত্যকি typical মালি সেজে এসে ডক্টর কানুনগোকে প্রণাম করে বলল যে, "ইলা দিদিমণি" বলেছে তার বাবা ওর জন্যে একটা কাজ জোগাড় করে দেবেন, যদি দেন তাহলে বড় উপকার হয়। তখন ডক্টর কানুনগো তাঁর বন্ধু বিরাজবাবুকে বলে সাত্যকিকে তাঁর মালির পদে নিযুক্ত করালেন।

'এদিকে ইলা বাড়ি থেকে ঝি-চাকরগুলোকে বিদায় করে দিল। দিয়ে বাড়ির সব কাজ নিজেই করতে লাগল। প্রথম-প্রথম এতে তার কষ্ট হতে লাগল, কিন্তু পরে সব সয়ে গেল। তবে কাজও খুব বেশি ছিল না। বাড়িতে মানুষ তো মোটে দুটি। সাত্যকি ওরফে দুখীরাম ইতিপূর্বে গোপন মিলনস্থানে বসে ইলাকে সোনা গালানো এবং তার থেকে বার তৈরি করার পদ্ধতি শিখিয়ে দিয়েছিল। এখন থেকে স্বামী-স্ত্রীর যুগ্ম প্রচেষ্টায় তাদের ব্যাবসাটা বেশ ভালোই চলতে লাগল। রাত্রে দুখীরাম রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ায়, তখন তার একজন শাগরেদ সাধারণ পথিকের মতো সেখান দিয়ে হেঁটে যায় এবং যাওয়ার সময় সেদিনকার চোরাই গয়নাগুলো প্যাক করা অবস্থায় দুখীরামকে দিয়ে যায়। দুখীরাম পরের দিন সেগুলো ইলাকে এনে দেয়। ইলা রান্নাঘরে বসে হাপরে সেগুলো গালায়। রান্নাঘরের মধ্যে একটা inner chamber ছিল, নিশ্চয়ই দেখেছেন। সেটা বাইরে থেকে দেখা যেত না। হাপরটা সেখানেই থাকত। রান্নাঘরে ইলা ছাড়া আর কেউ যেত না বলে তার গয়না গালানোর ব্যাপার কারও দেখতে পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না বললেই চলে। যা হোক, গয়নাগুলো গালাবার পর ইলা সোনাটাকে ছাঁচে ঢেলে বার তৈরি করত এবং বিকেলে দুখীরামকে সেগুলো দিত। সাতদিন অন্তর বারগুলো কেনার জন্যে দুখীরামের কাছে লোক আসত এবং বারগুলো নিয়ে তার দাম দিয়ে সে চলে যেত। এ লেনদেন রাত্রেই হত।'

আমি সবিস্ময়ে বললাম, 'কিন্তু কী করে ওরা এসব করত? আমরা তো এতদিন ওখানে ছিলাম। সেসময় ওরা যদি এসব ব্যাপার চালাত তাহলে কি আমরা টের পেতাম না?'

মিঃ হাজরা বললেন, 'ওদের কৌশল এত অদ্ভুত যে, আপনাদের চোখের সামনেই ওরা সব কাজ সারত, কিন্তু আপনারা কিছু বুঝতে পারতেন না। সে-কথায় পরে আসছি। এখন শুনুন।

'এদিকে বিরাজবাবুর বাড়িতে বসে কাজ করতে সাত্যকির অসুবিধে হচ্ছিল। কারণ বিরাজবাবু দিনরাত বাড়িতেই থাকেন, তাঁর স্ত্রী আছে, ছেলে-বউ, মেয়ে, আছে—কাজেই সেখানে সাত্যকিকে সবসময় খুব সাবধানে থাকতে হয়। এ-সমস্যার সমাধান করার জন্যে সে তার বন্ধু পীতাম্বর ঘোষালকে দিয়ে বিরাজবাবুর বাড়িটা কিনিয়ে নিল। কলকাতায় অত টাকা দিয়ে একটা বাড়ি কিনতে পীতাম্বরের তেমন মত ছিল না। কিন্তু সাত্যকি তাকে বোঝাল যে, ডক্টর কানুনগো যখন তাঁর পরবর্তী আবিষ্কারের পেটেন্টটা বিক্রি করে একটা মোটা টাকা পাবেন, তখন ইলা পীতাম্বরের কাছ থেকে বেশি দাম দিয়ে বাড়িটা কিনে নেবে। অবশ্য তার আগে সাত্যকি যতদিন এ-বাড়িতে থাকবে ততদিন পীতাম্বরকে ন্যায্য ভাড়া দেবে। তা সে দিয়েও ছিল। আপনারা ও-বাড়িতে থাকার সময় পীতাম্বরকে যে মাসে-মাসে দুশো টাকা ভাড়া পাঠাতেন, সেটা পীতাম্বরের বাড়তি লাভ।

'পীতাম্বর বাড়িটা কেনার পর সাত্যকি ছ'মাস একা বাড়িতে থেকে বেশ নির্ঝঞ্ঝাটে কাজ চালাল, কিন্তু তার পরেই তার আবার বিপদ দেখা দিল। তার শাগরেদটি রাত্রে আসার সময় নানারকম সূত্র থেকে খবর জোগাড় করে সেগুলো একটা কাগজে লিখে গয়না বোঝাই প্যাকেটটাতে ভরে সাত্যকিকে দিয়ে যেত। একদিন তার কাছ থেকে সাত্যকি খবর পেল যে, ও-বাড়িটা গভর্নমেন্ট তার কোন অফিসারের জন্যে রিকুইজিশন করতে চায়। সে এ-খবর পেয়ে একেবারে মাথায় হাত দিয়ে বসল। গভর্নমেন্টের কীরকম অফিসার আসবে এখানে কে জানে! হয়তো কোনও পুলিশ অফিসারই আসবে। যে-ই আসুক না কেন, তার সামনে বসে যে সাত্যকি নিজের কাজ চালিয়ে যেতে পারবে, এ আশা করা যায় না। বাড়িওয়ালার মালি হিসেবে যে তারা তাকে ও-বাড়িতে থাকতে

দেবে, তারও কোনও নিশ্চয়তা নেই। তাই সাত্যকি তক্ষুনি তার বন্ধু পীতাম্বরকে টেলিগ্রাম করে তাকে অবিলম্বে কলকাতায় চলে আসতে বলল। পীতাম্বর এলে সাত্যকি তাকে বলল, "গভর্নমেন্ট বাড়ি নেওয়ার আগেই এ-বাড়িতে একঘর ভাড়াটে বসিয়ে দাও। দেখো যেন তাদের লোকজন বেশি না হয়, কাচ্চাবাচ্চা না থাকে, আর সারাদিন যেন তারা বাইরে থাকে। এরকম family পাওয়া গেলে দুশো টাকা ভাড়াতেই তাদের বাড়িটা দিয়ে দাও।" পীতাম্বর তখন কাগজে বাড়ি ভাড়ার বিজ্ঞাপন দিল। বিজ্ঞাপন দেখে যেসব family বাড়িটা নেওয়ার জন্যে তার কাছে গেল, তাদের মধ্যে আপনাদের সঙ্গেই সাত্যকির পছন্দটা ঠিক মিলে যাচ্ছে দেখে আপনাদেরই সে বাড়িটা দিল। তবে দেওয়ার সময় আপনাদের বলে দিল বাগানটা সে নিজের দখলেই রাখবে। বাগানটা রাখা মানেই তার মালিটিকে রেখে দেওয়া। আপনারা এই শর্তেই রাজি হয়ে বাড়িটা নিলেন, পীতাম্বরও চলে গেল।

'কিন্তু পীতাম্বর যাওয়ার আগে একটা কাজ করে গেল। কলকাতায় সে এমন একটা চাকর পেয়েছিল, যার সঙ্গে সাত্যকির চেহারার মিল আছে। সে তাকে মিরাটে নিয়ে যাবে ভেবেছিল, কিন্তু সাত্যকি তাকে বলল, এই বাড়ির নতুন ভাড়াটেদের কাছে চাকরটাকে দিতে। পীতাম্বর তাতে রাজি হল। তখন সাত্যকি পরপর দুরাত সাদা কাপড় মুড়ি দিয়ে বাগানে পায়চারি করে আপনাদের পুরোনো চাকরকে ভূতের ভয় দেখিয়ে তাড়াল এবং তার ফলে পীতাম্বরের চাকর রঘু এসে আপনাদের কাজে বহাল হল।'

'রঘুকে সাত্যকি কাছে রেখেছিল একটা বিশেষ মতলবে। পুলিশের গোয়েন্দারা যদি কোনওদিন খোঁজ পায় সাত্যকি এ-বাড়িতে আছে, তবে এ-বাড়িতে এসে প্রথমেই দেখবে রঘুকে। তারা কেউই সাত্যকিকে কোনওদিন চোখে দেখেনি, কেবল তার চেহারার বিবরণ পেয়েছে। সেই বিবরণের সঙ্গে রঘুর চেহারার মিল দেখে তারা মনে করবে যে, রঘুই সাত্যকি। রঘুকে সন্দেহ করার অন্য কারণও যাতে থাকে, সাত্যকি তার ব্যবস্থা করেছিল। সে সারাদিন রঘুকে পান খাওয়াত এবং বিকেলে পানের সঙ্গে একটু কোকেন খাইয়ে দিত। কোকেন খেলে মানুষ প্রথমটা চটপটে আর ফুর্তিবাজ হয়ে ওঠে, তারপর সে এলিয়ে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। রঘুরও তাই হত, সেটা আপনারা লক্ষ করেছিলেন। কিন্তু এর কারণ না জানায় আপনারা মনে করেছিলেন রঘু বুঝি একজন বিচিত্র ধরনের লোক। তারপর পীতাম্বর আর সাত্যকির কথায় রঘু বারবার আপনাদের বাড়ি-ঘর ঝাঁট দিত। জঞ্জালগুলো টিনে জমাত, তারপর সেগুলো ডাস্টবিনে ফেলে আসত। এটাও আপনাদের কাছে অদ্ভুত লাগত। যা হোক, এই সমস্ত ব্যাপার থেকে রঘুকে সন্দেহজনক লোক মনে হওয়া মোটেই অসম্ভব নয়। তা ছাড়া রঘু এ-বাড়িতে নতুন এসেছে, কিন্তু দুখীরাম অনেক দিন ধরে—পুরোনো মালিকের আমল থেকে—আছে। সুতরাং কেউ যদি মনে করে যে, এ-বাড়িতে চাকরের ছদ্মবেশে একজন criminal আছে, তাহলে সে প্রথমে দুখীরামকে সন্দেহ না করে রঘুকেই করবে।

'সাত্যকি জানত যে, পুলিশের গোয়েন্দা এ-বাড়িতে এলে প্রথমে রঘুকেই সাত্যকি বলে মনে করবে। মনে করে তারা রঘুর ওপরই কিছুকাল নজর রাখবে, তারপর বুঝবে রঘু সাত্যকি নয়। তারপর তারা আর এ-বাড়ির দিকে লক্ষ রাখবে না। অর্থাৎ, নকল সাত্যকিকে সামনে রেখে আসল সাত্যকি রেহাই পেয়ে যাবে। সাত্যকির এই চাল ষোলো আনা সফল হয়, যখন নিখিলেশও প্রথমে রঘুকে দেখে সন্দেহ করেছিল যে, রঘুই সাত্যকি। কিন্তু রঘুর সঙ্গে কথাবার্তা বলে এবং তার কার্যকলাপ লক্ষ করে নিখিলেশ বুঝল যে, রঘু সাধারণ একটা চাকর ছাড়া আর কিছুই নয়। এটা বোঝার পর সে তার রিপোর্টেও রঘুর কথা লেখবার কোনও প্রয়োজন বোধ করেনি। নিখিলেশ দু-দিন হল কলকাতায় ফিরেছে। ওকে জিগ্যেস করেই এসব কথা জেনেছি। হ্যাঁ, আর-একটা কথা, একদিন নিখিলেশকে আপনি আপনাদের বাড়ির পাশের গলি থেকে বেরোতে দেখেছিলেন—তখন ভেবেছিলেন সে আপনাদের বাগান আর বাড়ির ভেতরটা দেখছিল, কিন্তু আসলে সে রঘুর কার্যকলাপ লক্ষ করছিল। যা হোক, নিখিলেশ তো রঘু সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়ে আপনাদের বাড়ি সম্বন্ধে clean report দিয়ে

চলে গেল, কিন্তু ও-বাড়িতে যে আসল চিজটি দাড়ি-গোঁফ-চুলের আড়ালে চেহারা লুকিয়ে বিরাজ করছে, এটা তার চোখে ধরা পড়ল না।

'রঘুকে যে সাত্যকি কোকেন খাওয়াত, তারপর তাকে দিয়ে দিনরাত বাড়ি-ঘর ঝাঁট দেওয়াত আর জঞ্জাল ফেলাত, সেটা শুধু রঘুকে অস্বাভাবিক দেখাবার জন্যে নয়। রোজ-রোজ দুখীরাম রাত্রে বাইরে যায়, এতে আপনারা সন্দেহ করতে পারেন। তা ছাড়া রাস্তা দিয়ে যদি সি. আই. ডি. পুলিশ ঘোরাফেরা করে, তাহলে দুখীরাম অত রাত্রে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকলে এবং হাতে করে একটা প্যাকেট নিয়ে বাড়ি ফিরলে নিশ্চয়ই তার সন্দেহ হত। তাই দুখীরাম এই বুদ্ধিটি করেছিল। ভেবে দেখুন, সারাদিন রঘু বারবার বাড়িঘর ঝাঁট দিত আর টিনভরতি জঞ্জাল ডাস্টবিনে ফেলে আসত। কিন্তু রাত আটটা সাড়ে আটটার পর যখন রঘু কোকেনের নেশায় বুঁদ হয়ে ঘুমিয়ে পড়ত তার পরেও তো একবার ডাস্টবিনে টিনভরতি জঞ্জাল ফেলা হত। সেটা ফেলত কে? দুখীরাম। তাহলে দেখুন রাত্রে জঞ্জাল ফেলতে যাওয়ার মধ্যে দুখীরাম বাইরে বেরোনোর চমৎকার একটি অজুহাত পেয়ে গিয়েছিল। জঞ্জাল ফেলার জন্যে যখন সে ডাস্টবিনের ধারে যেত, তার আগেই তার সহকারী এসে গয়না ভরতি প্যাকেটটি ডাস্টবিনের পাশের অন্ধকার জায়গাটাতে রেখে দিয়ে যেত। তারপর সে কাছাকাছি কোথাও দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করত। দুখীরাম গয়নার প্যাকেটটা জঞ্জালের খালি টিনে ভরে নিয়ে চলে যেত। তার সহকারীকে কোনও নির্দেশ বা টাকা দেওয়ার থাকলে সে তা একটা সিগারেটের টিনে ভরে সঙ্গে করে নিয়ে আসত এবং ডাস্টবিনের পাশেই রেখে যেত। যেতে-যেতে সে পেছন ফিরে দেখত সহকারী টিনটা নিচ্ছে কি না। যখন দেখত সে নিয়ে নিয়েছে, তখন বাড়ি ফিরে যেত এবং আপনারা কেউ লক্ষ করছেন কি না ভালো করে দেখে নিয়ে সে গয়নার প্যাকেটটা নিজের ঘরে পুরে জঞ্জালের টিনটা যথাস্থানে রেখে দিত।

'পরের দিন গয়নাগুলো সে স্ত্রীর কাছে দিয়ে আসত। আপনাদের চোখের সামনে দিয়েই সে সেগুলো নিয়ে যেত, কিন্তু আপনারা কেউ ধরতে পারতেন না! কীভাবে নিয়ে যেত জানেন? ফুলের সাজিতে ভরে। দলের অধিকাংশই জেলে। অন্যেরা সারাদিন যে-পরিমাণ উপার্জন করত, তা দুবার ফুলের সাজিতে ভরে নিয়ে যাওয়া সম্পূর্ণ সম্ভব। যদি কোনওদিন গয়নার পরিমাণ বেশি হত, তাহলে সেদিন সে তার ঝুলওয়ালা খদ্দরের পাঞ্জাবিটা পরে পকেটে বাড়তি গয়নাগুলো ভরে নিয়ে যেত। তবে তার দরকার বড় একটা হত না। ফুলের সাজিতে গয়নাগুলো ভরে দুখীরাম তার ওপরটা ফুল দিয়ে চাপা দিত, যাতে লোকে মনে করে সে বুঝি সাজিভরতি ফুলই নিয়ে যাচ্ছে।'

আমি বললাম, 'তা কী করে হবে? আমি তো দেখেছি মাস্টারমশায়ের বাড়ির ফুলদানিগুলো রোজই তাজা ফুলে ভরা থাকত। দুখীরাম যদি কম ফুল নিয়ে যেত, তাহলে তো তা সম্ভব হত না।'

মিঃ হাজরা বললেন, 'তা যাতে সম্ভব হয়, তার জন্যে ইলা দেবী রোজ বাজার থেকে তাজা ফুল কিনে আনতেন। যাক, এখন শুনুন—।

'ইলা দুখীরামের কাছ থেকে গয়নাগুলো নিয়ে সেগুলো গালাত, গালিয়ে সোনার বার তৈরি করত কোথায় জানেন? রান্নাঘরে বসে। ইলার দিনরাত রান্নাঘরে থাকার রহস্যটা এবার বুঝতে পারলেন তো? দেখুন তো, কী মজার ব্যাপার! এ-কথা কারও মাথায় ঢুকল না যে, যে-বাড়িতে মাত্র দুটি লোক, সে বাড়ির রান্নাঘরে দিনরাত এত কীসব রান্না হয়? সে যাক—।

'হপ্তায় শুধু একদিন দুখীরামকে একটু বেশি ঝুঁকি নিতে হত, যে, দিনটিতে দুখীরামের খদ্দের আসত তার কাছ থেকে সোনার বারগুলো কেনবার জন্যে। সেদিন দুখীরাম কী করত জানেন? শুনলে আপনি অবাক হয়ে যাবেন। প্রতিদিন ইলা যেসব সোনার বার তৈরি করত, সেগুলো দুখীরাম শ্বশুরবাড়ি থেকে ফেরার সময় ফুলের খালি সাজিতে করে নিয়ে আসত। তারপর হপ্তার যে-দিনটিতে খদ্দেরের সেগুলো নিতে আসবার কথা, সেদিন সন্ধ্যার সময় সেগুলো সে প্যাক করত এবং রঘু ঘুমিয়ে পড়ার

পর সেই প্যাকেটটা জঞ্জালের টিনের মধ্যে রেখে দিত, একেবারে সবচেয়ে নীচে। তারপর নিজে অন্যদিনের মতো দু-একবার বাড়ি ঝাঁট দিয়ে টিনটাকে ভরতি করে তুলত। দেখুন দেখি, কী মাথা। হাজার-হাজার টাকার সোনা খানিকক্ষণ ধরে সকলের চোখের সামনে পড়ে থাকত। কোথায়? না, একটা তুচ্ছ জঞ্জালের টিনে।'

আমি বললাম, 'বলেন কী?'

মিঃ হাজরা বললেন, 'ঠিকই বলছি। তারপর শুনুন। এই বিশেষ রাত্রিটিতে দুখীরাম টিনের জঞ্জাল ডাস্টবিনে ফেলে সোনার বার ভরতি প্যাকেটটা টিন থেকে সন্তর্পণে বের করে ডাস্টবিনের পাশে রেখে দিত। সেখানে তার খদ্দের আগেই তার দাম—নোটের প্যাকেট—রেখে দিয়ে গেছে। গিয়ে কাছেই বসে অপেক্ষা করছে। কোন হপ্তায় কতগুলো সোনার বার দেওয়া হবে, তা দুখীরাম আগে থাকতে খদ্দেরকে সাংকেতিক ভাষায় চিঠি লিখে জানিয়ে দিত। খদ্দেরও সেই অনুযায়ী দাম দিত। দুখীরাম সোনার বারের প্যাকেটটা নামিযে নোটের প্যাকেটটা নিয়ে বাড়ির দিকে যেত এবং খদ্দের সোনার বারের প্যাকেটটা যে নিয়েছে, সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হয়ে তবে বাড়ি ঢুকত।'

আমি বললাম, 'আচ্ছা, অনেক গয়নায় তো হিরে-জহরত থাকত। সেগুলো দুখীরাম কী করে পাচার করত?'

মিঃ হাজরা বললেন, 'গয়নার সোনা গালানোর পরে হিরে-জহরতগুলো আলাদা করে রাখা হত। দু-তিন মাস অন্তর সেগুলো নিয়ে দুখীরাম নিজে বেরোত এবং বিক্রি করে আসত। এ জন্যে তাকে অবশ্য বিরাট ঝুঁকি নিতে হত। কিন্তু এটুকু না নিয়ে তার উপায় ছিল না। তাবপর শুনুন।

'এমনিভাবে সকলের চোখের ওপবই ওদের কাববার নির্বিঘ্নে দিনের পব দিন ধরে চলছিল। পুলিশের গোয়েন্দা গন্ধ পেয়েও কিছু করতে পারেনি। কিন্তু হঠাৎ একদিন আপনি এক ঝামেলা বাধিয়ে বসলেন।'

বিস্মিত হয়ে আমি বললাম, 'আমি?'

'হ্যাঁ আপনি। একদিন রাত্রে দুখীরাম হঠাৎ দেখল যে, আপনি জঞ্জালের টিনটা হাতে করে তুলে দেখছেন!'

আমি বললাম, 'তাই নাকি? কিন্তু আমি তো কেউ দেখছে কি না ভালো করে দেখে নিয়েই তবে টিনটা তুলতাম।'

'এবার বোধহয় ততটা সাবধান হননি। দুখীরাম আপনাকে টিনটা তুলতে দেখে গোড়ায় ভাবল আপনি বুঝি সব ব্যাপার জেনে ফেলেছেন। কিন্তু পরে সে আপনার হাবভাব দেখে বুঝতে পারল আপনি কিছুই ধরতে পারেননি, নিছক খেয়ালের বসে টিনটা তুলেছেন। বলা বাহুল্য, পরাশর বর্মার কথা ওর জানা ছিল না। যা হোক, যদিও আপনি তখনও পর্যন্ত কিছু ধরতে পারেননি, তাহলেও টিনটা নিয়ে বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করলে হয়তো একদিন ধরে ফেলবেন, এই ভেবে দুখীরাম আপনার মনটাকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করল।'

আমি বললাম, 'কী ব্যবস্থা করল?'

মিঃ হাজরা বললেন, 'বলছি। কিন্তু আপনি আমার ধৃষ্টতা মার্জনা করবেন প্রফেসর সেন। আপনার মন অন্যদিকে ঘোরাবার জন্যে সাত্যকি ইলাকে আপনার পেছনে লেলিয়ে দিল। আগেই আপনাকে বলেছি না যে-সাত্যকির ইলাকে বিয়ের পরেও কুমারী সাজিয়ে রাখার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল, ইলা যাতে প্রয়োজন হলে পুরুষমানুষের মন ভোলাতে পারে? ইলা আপনার সঙ্গে কয়েকদিন হেসে কথা বলল, অন্তরঙ্গতা দেখাল, সিনেমায় গেল—অমনি আপনি ভাবলেন, স্বর্গ আপনার হাতের মুঠোর মধ্যে এসে গিয়েছে। ইলা ছাড়া আর সব কিছুই তখন আপনার মন থেকে মুছে গেল। এইভাবে কিছুদিন রোমান্সের সমুদ্রে ভাসবার পর একদিন আপনি ইলার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করলেন। ইলা আপনাকে প্রত্যাখ্যান করল। তখন আপনার মনে হল পৃথিবীটা অন্ধকার হয়ে গেছে। আপনার মন

তারপর তীব্র ব্যথায় ভরে রইল, অন্য কোনও দিকে আর আপনি মন দিতে পারলেন না। এইভাবে সাত্যকির আপনার চিন্তাকে অন্যদিকে ঘোরাবার প্ল্যান সফল হল।

'তারপর আপনারা হেমন্ত ঘোষ রোডের বাড়ি ছেড়ে দেওয়ার নোটিশ দিলেন। তাতে সাত্যকি-ইলার কোনও আপত্তি নেই। আপনি চলে গেলে তারা নির্ঝঞ্ঝাট হয়। কিন্তু গোল বাধাল রঘু।'

আমি বললাম, 'রঘু আবার কী গোল বাধাল?'

মিঃ হাজরা বললেন, 'প্রায় দু-বছর ধরে সাত্যকি ইলার পাশের বাড়িতে বাস করেছে আর রোজ দু-বেলা ইলার সঙ্গে দেখা করেছে। কিন্তু ওদের সম্পর্কের কথা বাইরের কেউ জানতে পারেনি। তার মানে এই নয় যে, এই দু-বছর ওরা ব্রহ্মচর্য পালন করেছে। আসলে চলত সব কিছুই, কিন্তু ওরা এমন সাবধানতা অবলম্বন করত যে, কেউ কিছুই টের পেত না। ওরা যখন একত্র হত, তখন সদর দরজা আর ইলার ঘরের দরজা-জানালা দুই-ই বন্ধ থাকত। বাড়ির মধ্যে আর থাকতেন কেবল ডক্টর কানুনগো, তিনি তেতলার ল্যাবরেটরিতে গবেষণায় মগ্ন। সুতরাং মুশকিল কিছুই ছিল না। কিন্তু আপনারা ও-বাড়ি ছাড়ার আগের আগের দিন ওরা যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করেনি। সদর দরজা আর ইলার ঘরের একটা জানলা সেদিন খোলা ছিল। তার ফলে রঘু যখন চিনি আনতে ইলাদের বাড়ি গেল, তখন সে সদর দরজা দিয়ে বিনা বাধায় ভেতরে ঢুকে গেল এবং ঢুকে গিয়ে ইলার ঘরের খোলা জানলা দিয়ে দেখতে পেল যে, ইলা আর দুখীরাম নিবিড় আলিঙ্গনে বদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

'ওরা দুজনেই রঘুকে দেখতে পেল। ইলা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে যেন কিছুই হয়নি, এরকম ভাব দেখিয়ে রঘুকে তার আসার কাবণ জিগ্যেস করল এবং রঘুর কথা শুনে তাকে চিনি দিল। কিন্তু রঘু চলে যাওয়ার পর ওরা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে ঠিক করল যে, রঘুকে অবিলম্বে সরানো হবে। কারণ, সে যা দেখেছে তা যদি সবাইয়ের কাছে বলে বেড়াতে শুরু করে, তাহলে চারদিকে হুলুস্থুল সৃষ্টি হবে এবং তারই সূত্র ধরে বেবিয়ে পড়বে দুখীরাম আসলে কে। তাই সেদিন রাত্রে সাত্যকি তার সহকারীকে রঘুকে এখান থেকে কীভাবে সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে, সে সম্বন্ধে নির্দেশ দিয়ে দিল।

'রঘু কিন্তু আসলে কাউকে কিছুই বলেনি। তবে সে ওই দৃশ্য দেখে অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। আপনি তার এই ভাবটা লক্ষ করেছিলেন। পরের দিন দুপুরে সাত্যকির একজন সহকারী এসে রঘুর কাছে তার দেশের লোক বলে নিজের পরিচয় দিয়ে তাকে গল্পে-গল্পে ভুলিয়ে তার বাসায় নিয়ে গেল এবং বিষ-মেশানো পান খেতে দিয়ে তাকে অজ্ঞান করে ফেলল। সেখানেই রঘু অজ্ঞান অবস্থায় তিন দিন পড়ে ছিল। বোধহয় ওদের মতলব ছিল পরে লাশ পাচার করবার পাকা ব্যবস্থা করে খুন করবে। কিন্তু সাত্যকি যেদিন ধরা পড়ে, সেদিনই ওর সেই সহকারীটাকে আমরা গ্রেপ্তার করতে পেরেছিলাম আর তার বাসার সন্ধানও পেয়েছিলাম। তাই সেখানে গিয়ে রঘুকে উদ্ধার করতে আমাদের বেগ পেতে হয়নি। তারপর রঘু একটু সুস্থ হয়ে উঠলে আমরা ওর জবানবন্দি নিয়েছি।

'এইবার আমাদের নাটকের শেষ অঙ্কে আসা যাক। সেদিন ইলা-সাত্যকির মিলন দৃশ্য শুধু রঘুই দেখেনি, আরও একজন দেখেছিলেন। তিনি ডক্টর কানুনগো। রঘু আসার একটু আগে তিনি ইলাকে একটা কথা বলবার জন্যে ওপর থেকে নীচে নেমে এসেছিলেন। আপনভোলা মানুষ, আসার সময় চটি পরতে ভুলে গিয়েছিলেন, খালি পায়ে আসার দরুন কোনও শব্দ হয়নি। নীচে নেমে এসে জানালা দিয়ে ওই দৃশ্য দেখে তিনি তক্ষুনি আবার ওপরে উঠে যান।

'ইলা যে বিপথে, তা ডক্টর কানুনগো এর আগেও আন্দাজ করতে পেরেছিলেন। একদিন তিনি হঠাৎ রান্নাঘরে ঢুকে পড়ে দেখেছিলেন যে, ইলা সেখানে বসে সোনা গালানোর মতো কী একটা করছিল, তাঁকে দেখেই তাড়াতাড়ি লুকিয়ে ফেলল।

'তার খানিকক্ষণ পরে ইলাকে ডেকে তিনি রান্নাঘরে বসে তখন সে কী করছিল, তা জিগ্যেস

করেন। ইলা তাঁর কথার জবাব না দিয়ে "আমায় এক্ষুনি একজন বন্ধুর বাড়ি যেতে হবে" বলে বেরিয়ে গিয়েছিল। ডক্টর কানুনগো সেদিন ইলার ব্যবহারে অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছিলেন। তাই সেদিন যখন আপনি এসেছিলেন, তখন তিনি আপনাকে বলেছিলেন, "আমার সারা জীবনের স্বপ্ন ব্যর্থ হয়ে গেছে।" আপনি ভেবেছিলেন তাঁর সাম্প্রতিক গবেষণাটি সফল না হওয়ার জন্যে তিনি এ-কথা বলেছেন। তা নয়। তাঁর একমাত্র সন্তান এই মেয়ে। সারাজীবন ধরে তিনি মেয়ের সম্বন্ধে যে স্বপ্ন দেখেছেন তা ব্যর্থ হয়েছে—এই কথাই তিনি বলতে চেয়েছিলেন। তিনি বেশ সুস্পষ্টভাবেই সেদিন বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁকে লুকিয়ে ইলা এমন একটা ব্যাপারের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে, যেটা মোটেই ভালো জিনিস নয়। তাঁর মেয়ে যে মানুষ হয়নি, এটা তিনি সেদিনই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন।

'এরপরে কিছুদিন ইলা খুব সাবধান হয়ে সোনা গালাত। সেদিনকার ব্যাপারটা ডক্টর কানুনগো তাই পরে ভুলে গিয়েছিলেন। কিন্তু এদিন তিনি যা দেখলেন, তা তাঁর মাথায় আগুন ধরিয়ে দিল। সেদিন বাকি সময়টা তিনি গুম হয়ে রইলেন। পরের দিন সকালে তিনি ইলাকে ডেকে বললেন যে, তিনি ইলার নোংরামি স্বচক্ষে দেখেছেন। এসব তাকে অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে এবং দুখীরাম যেন আর এ-বাড়িতে না ঢোকে। যদি সে ঢোকে তাহলে তিনি তাকে পুলিশে দেবেন। পুলিশ কমিশনার তাঁর ছাত্র, কাজেই দুখীরামের মতো scoundral-কে শায়েস্তা করা তাঁর পক্ষে একটুও কঠিন নয়। বলা বাহুল্য, ইলা এতে অত্যন্ত ভয় পেয়ে গেল। তার একটু পরে দুখীরাম যখন ফুল দিতে এল, তখন সে তাকে বাড়িতে ঢুকতে বারণ করে বিকেলে পুরোনো মিলনের স্থানে দেখা করতে বলল। দেখা হওয়ার পরে সে দুখীরামকে সব কথা খুলে বলল।

'দুখীরামও এতে খুব ঘাবড়ে গেল। একে পুলিশ তাকে ধরবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে, তার ওপর ডক্টর কানুনগোর মতো লোক যদি তার শত্রুতা করেন, তাহলে তার পক্ষে নিজেকে মুক্ত রাখা শক্ত হবে। সে তখন ঠিক করল পরের দিনই কলকাতার বাইরে কোথাও চলে গিয়ে দিনকতক গা ঢাকা দিয়ে থাকবে। কিন্তু ইলা তাকে ছাড়তে চাইল না। সেও তার সঙ্গে যেতে চাইল। সে বলল যে, পরের দিন সকালে সে ডক্টর কানুনগোকে ওষুধ খাইয়ে অজ্ঞান করে ফেলবে এবং তাঁর সব টাকাকড়ি (যা ইলার নামেই ব্যাঙ্কে জমা আছে) তুলে নিয়ে তারা দুজনে মিলে কলকাতা ছেড়ে চলে যাবে। দুখীরাম তাতে রাজি হল।'

'পরের দিন সকালেই ইলা ডক্টর কানুনগোকে চায়ের সঙ্গে মরফিন মিশিয়ে খাওয়াল। খেয়ে তিনি অজ্ঞান হয়ে গেলেন। একটু বাদেই দুখীরাম সাজিতে করে ফুল নিয়ে এসে হাজির হল। তারপর তারা দুজনে মিলে ডক্টর কানুনগোকে ধরে তুলে তাঁর ঘরে শুইয়ে বাইরে থেকে তালা বন্ধ করে দিল।

'দুখীরাম ইলাকে বলল যে, হেমন্ত ঘোষ রোডে প্রায়ই সি. আই. ডি. পুলিশ ঘোরে। তারা যদি দেখে যে, ইলা পাশের বাড়ির মালির সঙ্গে বাড়ি থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সিতে চড়ছে, তাহলে তারা হয়তো আসল ব্যাপারটা আঁচ করে ফেলবে। আর যদি সাত্যকি মালির রূপ ছেড়ে দাড়ি-গোঁফ কামিয়ে রাস্তায় বেরোয়, তাহলেও তারা হয়তো তাকে চিনে ফেলবে। কারণ, তার চেহারার বিবরণ তাদের সকলেরই জানা। ছদ্মবেশ ধরে বেরোনোও তার পক্ষে নিরাপদ নয়, কারণ দিনের বেলায় ছদ্মবেশের কৃত্রিমতা লোকের চোখে ধরা পড়ে যেতে পারে। ধরা পড়ার ভয়টা সাত্যকির বরাবরই অত্যন্ত বেশি। সাত্যকি প্রস্তাব করল যে, সে আর ইলা আলাদা-আলাদাভাবে হাওড়া স্টেশনে গিয়ে হাজির হবে, কিন্তু ইলা তাতে রাজি হল না। সে চায় স্বামীর সঙ্গে হাওড়া স্টেশনে যেতে।

'অবশেষে ইলা মাথা খাটিয়ে দুজনে একসঙ্গে পালাবার খুব সুন্দর একটা উপায় আবিষ্কার করল। ব্যাঙ্ক থেকে যখন সে টাকা তুলতে গেল, তখন সে ফেরার পথে একটা পরচুলোর দোকানে গিয়ে পাকা চুল আর পাকা ফ্রেঞ্চকাট দাড়ির পরচুলো কিনে নিয়ে এল। তারপর বাড়ি ফিরে সে

সাত্যকির চুলগুলো কাঁচি দিয়ে খুব ছোট-ছোট করে কেটে দিল। সাত্যকি তার লম্বা কালো দাড়ি আগেই কামিয়ে ফেলেছিল। সে এখন পরচুলোর চুল আর ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি লাগিয়ে; ডক্টর কানুনগোর জামাকাপড় পরে, চোখে তাঁর কালো চশমাটা পরে, তাঁর ল্যাবরেটরিতে গিয়ে বসে রইল। ঠিক হল একটু বেশি রাত হলে যখন লোকে পরচুলোকে পরচুলো বলে চট করে বুঝতে পারবে না, তখন তারা দুজনে ট্যাক্সি করে ও-বাড়ি ছেড়ে হাওড়া স্টেশনে চলে যাবে। রাস্তায় সি. আই. ডি. পুলিশ বা আর কেউ যদি তাদের যেতে দ্যাখে তাহলে সে ভাববে ডক্টর কানুনগো তাঁর মেয়েকে নিয়ে কোথাও যাচ্ছেন। ইলা ঠিক করেছিল তার বাবার মাথার শিয়রে একটা চিঠি রেখে যাবে, যাতে জ্ঞান হলেই তিনি সেটা পান। তাতে সে লিখবে, "আমি আমার স্বামীর সঙ্গে যাচ্ছি। আমার খোঁজ কোরো না।"

'প্ল্যান বেশ সুন্দরই হল, হয়তো কাজেও পরিণত হত, কিন্তু অসময়ে আমবা গিয়ে পড়ায় সমস্ত ভেস্তে গেল। ওড়বার আগেই পাখি ফাঁদে পড়ল। মজা দেখুন, রঘুর সঙ্গে নিজের চেহারার মিল থাকার জন্যেই সাত্যকি নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে তাকে আনিয়েছিল, কিন্তু সেই চেহারার মিলই ওর কাল হয়ে দাঁড়াল। কারণ, এই চেহারার মিল না থাকলে আমরা কেউই কল্পনা করতে পারতাম না যে, আপনাদের বাড়ির সঙ্গে সাত্যকির কোনও সম্পর্ক আছে।'

'কিন্তু শেষ সময়েও ইলা একটা খেল দেখাল। যখন দেখল যে, আমরা তার বারণ না শুনে ডক্টর কানুনগোর সঙ্গে দেখা করার জন্যে তেতলায় উঠছি, তখন সে দেখল সর্বনাশ আসন্ন। আগে থাকতেই ঠিক ছিল যে, বেগতিক দেখলে সাত্যকি বাথরুমে ঢুকে মেথরদের সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে পালাবে। আমরা যাতে সঙ্গে-সঙ্গেই সাত্যকির পিছু-পিছু ধাওয়া করতে না পারি, এইজন্যে ইলা আমাদের পেছনে-পেছনে এসে সিঁড়ির দরজা দুটো তালাবন্ধ করে দিয়ে চলে গেল। কী ধড়িবাজ মেয়ে! সাত্যকির উপযুক্ত সহধর্মিণী! তবে ইলা কল্পনা করতে পারেনি যে, আমাদের মধ্যে ড্রেন-পাইপ বেয়ে নামার মতো লোকও আছে। সিঁড়ির দরজা বন্ধ করেই সে নিজের বাড়ি থেকে পালাল। কোথায় পালিয়েছে, তা আমরা এই সাত দিনেও বের করতে পারিনি। তবে বের তাকে আমরা করবই। ডক্টর কানুনগোও আমাদের বলেছেন যে, ইলাকে যেন খুঁজে বের করে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়। মেয়ের মুখ তিনি আর দেখবেন না। সে তার অপরাধের শাস্তি পাক এই তাঁর ইচ্ছে।'

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

মিঃ হাজরার কথা শেষ হলে আমি শুকনো গলায় বললাম, 'সাত্যকির মতো এত বড় একটা অপরাধী তাহলে এবার ধরা পড়ল। এ জন্যে সব কৃতিত্ব আপনার, মিঃ হাজরা।'

মিঃ হাজরা বললেন, 'আমার নয় প্রফেসর সেন, আপনার!'

বিস্মিত হয়ে আমি বললাম, 'আমার?'

মিঃ হাজরা বললেন, 'হ্যাঁ। আপনার! যদিও আপনি রহস্যটাকে উলটোদিক থেকে দেখেছিলেন, তাহলেও যে শেষ পর্যন্ত রহস্যটা ভেদ হল আর রহস্যময় পুরুষটি ধরা পড়ল এ জন্যে সব কৃতিত্ব আপনিই দাবি করতে পারেন। আপনি যদি চারজন প্রাইভেট ডিটেকটিভের কাছে না যেতেন, তাহলে কোনওদিনই সাত্যকি ধরা পড়ত না।'

আমি বললাম, 'কিন্তু—।'

মিঃ হাজরা বললেন, 'প্রফেসর সেন, আপনি যখন চারজন ডিটেকটিভের কাছে গিয়েছিলেন, তখন আপনি ভেতরের ব্যাপার কিছুই জানতেন না। ভূত দেখে আপনাদের চাকরের পালানো, পাড়ায় নিত্যনতুন অচেনা লোকের আবির্ভাব, যুগলকিশোরের বারবার আপনাদের বাড়িতে এসে জ্বালাতন

করা—এই ধরনের কতকগুলো ব্যাপার ঘটতে দেখেই আপনি ধরে নিয়েছিলেন যে, এসবের মূলে একটা রহস্য আছে। আপনার অনুমান নির্ভুল। একটা কিছু রহস্য না থাকলে এত বিচিত্র ব্যাপার ঘটবে কেন? সেই রহস্য ভেদ করার আগ্রহ দিয়ে আপনি পরপর চারজন ডিটেকটিভের সঙ্গে দেখা করে তাঁদের সব কথা বলেছিলেন।

'আপনি যুগলকিশোরের সম্বন্ধে একটা প্রচণ্ড বিরূপ ধারণা নিয়ে ওঁদের কাছে গিয়েছিলেন। যুগলকিশোর, অর্থাৎ নিখিলেশ, ইচ্ছে করে তার চালচলনকে এমন বিরক্তিকর করে তুলেছিল যে, আপনি ধরে নিয়েছিলেন সে একটা বদমায়েশ লোক। কিন্তু সে সত্যিকার ডিটেকটিভ, সে কখনও আপনার মতো এইরকম ওপর-ওপর দেখে কোনও সিদ্ধান্তে আসতে পারে না। সবকিছু খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করে সমস্ত সম্ভাবনার কথা বিচার করে দেখাই তার অভ্যাস। এইসব ডিটেকটিভরা আপনাকে যেসব প্রশ্ন করেছিলেন, তাতে স্পষ্ট বুঝতে পারা যায় যে, যুগলকিশোর সম্বন্ধে আপনার ধারণার সঙ্গে তাঁরা একমত হতে পারেননি। তাঁরা যেভাবে চিন্তা করেছিলেন, সেটা আমি অনুমান করতে পাবি। তাঁরা ভেবেছিলেন, যুগলকিশোর কি সত্যিই একটা বদমায়েশ লোক? বদমায়েশ লোক যদি হয়, তাহলে সে কীসের জন্যে বাববার আপনাদের বাড়িতে আসা-যাওয়া করছে? যদি আপনাদের কাছ থেকে কিছু চাওয়া তার উদ্দেশ্য হত, তাহলে এতবাব সে এসেছে, এর মধ্যে সে নিশ্চয়ই তার উদ্দেশ্যের কথা প্রকাশ করত। তা যদি না হয়, তাহলে কী সে চায়? আপনারা মধ্যবিত্ত গৃহস্থ, নিশ্চয়ই দামি হীরে-জহরত আপনাদের বাড়িতে নেই, আর তা যদি থাকত, তাহলে প্রথমেই আপনাবা ভাবতেন যুগলকিশোর তার জন্যে এসেছে, সেই কথাই ডিটেকটিভদের কাছে আপনি বলতেন। টাকাও নিশ্চয় আপনারা ব্যাঙ্কে রাখেন। তাহলে আপনাদের কাছে এমন কিছু নেই, যার জন্যে একটা বদমাযেশ আকৃষ্ট হতে পারে। তবে কি আপনাদের বাগানে সাত ঘড়া মোহর পোঁতা আছে? এ ধরনেব ব্যাপার গল্পে ঘটতে পারে, বাস্তব জীবনে ঘটে না। এখনকার কালে কেউ একজায়গায় অতখানি সম্পদ পুঁতে রাখে না, কারণ চুরি হলে একসঙ্গেই সব যাবে; আর পোঁতারই বা দবকার কি, সেফটি ভল্টেই তো এসব জিনিস রাখা যেতে পারে।

'সুতরাং আপনাদের বাড়িতে একটা বদমায়েশকে আকৃষ্ট করার মতো কিছুই নেই। এ সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে ডিটেকটিভরা সিদ্ধান্ত করলেন যে, যুগলকিশোর বদমায়েশ নয়। তাহলে সে কী? নিশ্চয়ই গোয়েন্দা। গোয়েন্দা যখন, তখন কী সে খুঁজছে? আপনাদের ছোট বাড়িতে নিশ্চয়ই কোনও মাদকদ্রব্য তৈরির বা জাল নোট ছাপার কারখানা নেই। থাকলে আপনি তা টের পেতেন। তাহলে গোযেন্দা খুঁজছে কোনও অপরাধীকে, যে কোথাও লুকিয়ে গা-ঢাকা দিয়ে রয়েছে। এ পর্যন্ত তাঁদের কাছে বেশ পরিষ্কার হল। কিন্তু পরবর্তী প্রশ্ন এই যে, সেই ফেরারি অপরাধীটি কি আপনাদেরই বাড়িতে আছে? না-ও থাকতে পারে, কারণ কেবলমাত্র আপনাদেব বাড়িতেই যুগলকিশোরের মতো অচেনা লোকের আবির্ভাব ঘটেনি, সমস্ত পাড়াটাতেই দিনের পর দিন বহু অচেনা লোককে ঘোরাফেরা করতে দেখা গেছে। কিন্তু যদি ধরে নেওয়া যায় আপনাদেরই বাড়িতে সেই আততায়ীটি রয়েছে, তাহলে কোন ব্যক্তি সেই আততায়ী হতে পারে? আপনি বা আপনার দাদা বা আপনার বউদি সমস্ত সন্দেহের উর্ধ্বে, তা ছাড়া, আপনাদের মধ্যে যদি কেউ অপরাধী হতেন তাহলে আপনি নিশ্চয়ই ডিটেকটিভদের কাছে যেতেন না। অপরাধী নিজেদের সম্বন্ধে অতিনিশ্চিত হয়ে বাহাদুরি দেখাবার জন্যে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ডিটেকটিভের কাছে গেছে, এরকম কথা কোনও-কোনও গল্পের বইযে পড়া যায় বটে, কিন্তু এটা নিতান্তই বাজে কথা। সাধ করে নিজের বিপদ কেউ ডেকে আনে না। অতএব সেই অজ্ঞাতনামা অপরাধীটি যদি আপনাদেরই বাড়িতে থেকে থাকে, তবে সে নিশ্চয়ই আপনাদের বাড়ির বাকি তিনজন লোকের মধ্যে একজন। এই তিনজন হল, আপনাদের চাকর রঘু, মালি দুখীরাম এবং পার্ট-টাইম কুক করুণা।

'আমি অনায়াসেই বলতে পারি যে, ডিটেকটিভদের চিন্তাধারা অতঃপর এদেরই ওপর নিবদ্ধ

হল এবং চিন্তা করে এঁরা বুঝতে পারলেন যে, এদের সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহের কারণ আছে। প্রথমে রঘুর কথা ধরা যাক। সে আপনাদের বাড়িতে যেভাবে ঢুকেছে, তা বেশ খানিকটা অস্বাভাবিক লাগে। আপনাদের বাড়িওয়ালা সুদূর মিরাট থেকে ছুটে এলেন কলকাতার বাড়িটি ভাড়া দেওয়ার জন্যে, তারপর বাড়িটি আপনাদের দিলেন নিতান্ত কম ভাড়ায়। ও-বাড়িতে আসার সঙ্গে-সঙ্গে আপনাদের চাকর ভূতের ভয় পেয়ে পালাল। তখন নতুন চাকর দিল কে? না, আপনাদের সদাশয় বাড়িওয়ালা। দিয়েই তিনি মিরাটে চলে গেলেন। ব্যাপারটা কীরকম গোলমেলে লাগে না? তারপর দেখুন, রঘু দিনরাত বাড়িঘর ঝাঁট দিচ্ছে আর টিনের জঞ্জাল বাইরে ফেলছে। তারপর, বিকেলে ও হঠাৎ খুব চনমনে ফুর্তিবাজ কর্মঠ হয়ে ওঠে, আবার সন্ধের পরেই ঘুমিয়ে পড়ে। সবটাই অদ্ভুত। তারপর দেখুন দুখীরাম। ও-বাড়ি যারই দখলে থাকুক না কেন, দুখীরাম সবসময়েই সেখানে থাকছে। সাবেক মালিক বিরাজবাবুর আমলেও ছিল, নতুন মালিক পীতাম্বরবাবুর আমলেও ছিল, আবার আপনারা বাড়ি ভাড়া নেওয়ার পরেও সে আছে। পাছে আপনারা তাকে না রাখেন, যেন সেইজন্যেই পীতাম্বরবাবু আপনাদের বললেন, "বাড়ি আপনাদের দিলাম বটে, কিন্তু বাগান আমারই দখলে থাকবে।" তারপর দেখুন, বাড়ি পরিষ্কার রাখার জন্যে দুখীরামেরও আগ্রহ কম নয়। এর কারণ কী? শুধু কি মালিকের প্রতি loyalty? আপনাদের পুরোনো চাকর যে বাগানে ভূত দেখে ভয় পেয়ে পালাল, তাকে ভয় দেখাবার সবচেয়ে বেশি সুযোগ বাগানের মালি দুখীরামেরই ছিল, রঘু বা করুণা তখনও আপনাদের বাড়িতে আসেনি। সুতরাং তাকেও সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ আছে। তারপর করুণা। হঠাৎ একদিন সে এসে পড়ে নিজের থেকে চাকরি চাইল। অথচ এই ধরনের লোকের আজকাল demand এত বেশি যে, এদের দোরে-দোরে চাকরি খুঁজে বেড়াতে হয় না, চাকরিই এদের খুঁজে বেড়ায়। আর আপনারা লোকটার সম্বন্ধে কিছু না জেনেই তাকে কাজে বহাল করে বসলেন। তারপর দেখুন, লোকটা যখন খুশি অফিসে যায়, যখন খুশি অফিস থেকে ফেরে, আর রোজ রাশি-রাশি চিঠি লেখে। সুতরাং তাকে খুব সহজ লোক বলে মনে হয় না।

'এই থেকেই ডিটেকটিভরা সিদ্ধান্ত করলেন যে, আপনাদের চাকর-রাঁধুনি-মালির মধ্যে কারও না কারও নিশ্চয়ই গোলমাল আছে। অর্থাৎ, ওদের মধ্যে এমন অন্তত একজন লোক আছে যে চাকর class-এর লোক নয়, এখন আত্মগোপন করে চাকর সেজে বসে আছে এবং সম্ভবত এই লোকটিই সেই অজ্ঞাতনামা অপরাধী।

'কিন্তু কী করে সেই লোকটিকে ধরা যাবে? যাতে ধরা যায়, তার দুটি test নিতে আপনাকে বললেন দুজন ডিটেকটিভ—মিঃ ব্যোমকেশ বক্সী আর মিঃ হুকা-কাশি।

'ব্যোমকেশবাবু আপনাকে বললেন, "আপনাদের চাকর-রাঁধুনি-মালির পায়ের তলা আর তার আশপাশগুলো কী ধরনের, তা জানা দরকার।" এ-কথা বলার কারণ, আমাদের দেশের চাকর class-এর লোকদের সঙ্গে ভদ্রলোকদের পায়ের তলার চেহারার একটা সুস্পষ্ট পার্থক্য আছে। চাকর class-এর লোকেরা, যারা বাড়িতে কাজ করে, তারা সবসময়েই খালি পায়ে থাকে, তার ফলে তাদের পায়ের তলা খুব শক্ত হয়। আর ভদ্রলোকেরা প্রায় সবসময়েই জুতো পরে বলে তাদের পায়ের তলাটা নরম থাকে। কিন্তু তাদের মধ্যে যারা পা-ঢাকা জুতো পরে, তাদের গোড়ালিতে আর কড়ে আঙুলে কড়া পড়ে। আর যারা চটি পরে তাদের পায়ের পেছন দিকটা ফেটে যায়। এখন, আপনাদের রঘু-দুখীরাম-করুণা এরা যদি সত্যিই ভৃত্য শ্রেণির লোক হয়, তাহলে তাদের পা হবে এইরকম। রঘু আর দুখীরাম সবসময়েই খালি পায়ে থাকে, সুতরাং তাদের পায়ের তলা খুব শক্ত হবে, তাতে কড়া মোটেই থাকবে না। করুণা যখন বাড়িতে থাকে, রান্না করে—তখন সে খালি পায়েই থাকে, বছরের মধ্যে কিছুদিন সে নিশ্চয়ই দেশে কাটায়, সেখানে সে খালি পায়েই থাকে। কিন্তু সে অফিসে যায় জুতো পরে। সুতরাং তার পায়ের তলা শক্তই হবে, কিন্তু তার পায়ে অল্পস্বল্প কড়াও থাকবে। এখন এই তিনজনের কারও পায়ের নীচের অংশ যদি ঠিক যেরকম

হওয়া উচিত, সেরকম না হয়ে অন্যরকম হয়, বুঝতে হবে তিনি বর্ণচোরা। যেমন, এদের কারও পায়ের তলা যদি নরম হয় অথবা বয়ু দুখীরাম এদের মধ্যে কারও পায়ে যদি কড়া থাকে, তাহলে বুঝতে হবে, তিনি চাকর class-এর লোক নন, চাকর সেজে আপনাদের বাড়িতে রয়েছেন।

'তারপর ধরুন মিঃ হুকা-কাশির প্রশ্নটা। এর মধ্যে যে কতখানি subtlety আছে, তা আপনি ধরতে পারেননি। উনি বলেছিলেন, "আপনাদের চাকর-রাঁধুনি-মালির মধ্যে একজন পেটরোগা, তাই না?" এখন দেখুন, চাকরবাকরদের আমরা কী খেতে দিই? আমরা যা খাই, তাই কি তাদের দিই? না, তা দিই না। তাদের খেতে দিই মোটা চালের ভাত, ডাল, একটা ঘ্যাঁট, আর কোনওদিন পুঁটি জাতীয় একটা মাছের ঝোল, জলখাবার খেতে দিই মুড়ি আর শুকনো রুটি। তারপর আমরা যেসব খাবার খাই, সেগুলো বাসি হয়ে গেলে অনেক সময় তাদের দিই। এইসব জিনিস খেয়ে আপনি থাকতে পারবেন না, কিন্তু ওরা পাবে। এই খাওয়াতেই ওরা অভ্যস্ত। চাকর-বাকরদের হজম-শক্তি আমাদের তুলনায় অনেক বেশি, ওদের মধ্যে সাধারণত কেউ পেটরোগা হয় না। এ কাজ, এ খাওয়া পেটরোগা লোকরা stand করতে পারে না। এখন দেখুন, মিঃ হুকা-কাশি বেশ স্পষ্ট বুঝতে পারছিলেন, আপনাদের চাকরদের মধ্যে একজন বর্ণচোরা। কিন্তু ওই বর্ণচোরা লোকটি আগে যা খেতেন, আপনাদের কাছে তার চেয়ে অনেক খারাপ খাদ্য পাচ্ছেন। সুতরাং তিনি নিশ্চয়ই পেট-রোগা হয়ে পড়েছেন। আপনি কয়েকদিন চাকরদের খাওয়া খেয়ে দেখুন, আপনিও পেটরোগা হয়ে পড়বেন। সুতরাং এখন বুঝতে পারছেন তো, মিঃ হুকা-কাশির প্রশ্নের তাৎপর্যটা আসলে কী?

'তারপর ধরুন জয়ন্তবাবু। তিনি আপনাকে জিগ্যেস করলেন, "আপনাদের চাকর-রাঁধুনি-মালি—এদের বাড়ি কোথায়?" এ-প্রশ্ন করার অর্থ এই যে, কোনও অপরাধী যদি আপনাদের বাড়িতে চাকর সেজে থাকে, তাহলে সে কিছুতেই তার বাড়ির সঠিক ঠিকানা দেবে না—মিথ্যে ঠিকানা দেবে এবং এমনভাবে দেবে, যাতে কেউ সহজে যাচাই করতে না পারে, সে ঠিকানা সত্যি কি না। এখন, আপনাদের চাকর-রাঁধুনি-মালির মধ্যে কারও ঠিকানায় যদি একটু গন্ডগোল থাকে, তাহলে সন্দেহ করা যেতে পারে যে, সেই লোকটিই বর্ণচোরা। আপনি জয়ন্তবাবুর প্রশ্নের যে, উত্তর দিলেন, তা শুনে জয়ন্তবাবু খুশি হলেন। আপনাদের রাঁধুনি করুণার বাড়ি মেদিনীপুর জেলার বলরামচক গ্রামে, চাকর রঘুর বাড়ি কটক জেলার গজপতিপুর গ্রামে। সত্যিই ওদের ওখানে বাড়ি কি না, তা আমরা যে-কোনও মুহূর্তে যাচাই করে নিতে পারি। কিন্তু দুখীরামের কোথায়? না—ঢাকা জেলার তাঁতীপাড়া গ্রামে, অর্থাৎ পাকিস্তানে। সে-দেশের সঙ্গে আমাদের সদ্ভাব নেই। কাজেই সত্যিই সেখানে দুখীরামের বাড়ি কি না, তা যাচাই করবার কোনও উপায় নেই। তারপর আর-একটা ব্যাপার দেখুন। এটা কেন আপনাদের চোখে পড়েনি? পূর্ববঙ্গের কোনও লোক কারও বাড়িতে মালিগিরি করছে, এ কি আপনি আর কোথাও দেখেছেন? শুধু পূর্ববঙ্গ কেন, ওড়িশা ছাড়া অন্য কোনও জায়গার লোক মালির কাজ করছে, এ জিনিসও আপনি বাংলাদেশে খুব কমই দেখতে পাবেন। এখানে মালির কাজটা ওড়িয়াদের প্রায় একচেটে। আর দুখীরাম বাবাজি পূর্ববঙ্গের লোক অথচ মালি। এটা খুবই অসাধারণ ব্যাপার। এই দুটো কারণে জয়ন্তবাবুর দুখীরামের ওপরেই সন্দেহ হয়েছিল। কিন্তু আপনাদের ওখানে গিয়ে সবকিছু দেখার আগে তিনি কোনও মত প্রকাশ করা সঙ্গত বলে মনে করেননি।

'বাকি রইলেন পরাশরবাবু। তাঁর মনে একটা জিনিস বিশেষভাবে strike করেছিল—আপনাদের চাকরদের বারবার বাড়িঘর ঝাঁট দেওয়া আর জঞ্জালগুলো টিনে ভরে বাইরের ডাস্টবিনে ফেলে আসার ব্যাপারটা। তিনি সন্দেহ করলেন, আসলে বোধহয় জঞ্জালের মধ্যে দিয়ে কোনও কিছু পাচার করা হচ্ছে—এমন কিছু, যা প্রকাশ্যে চালান দেওয়া যায় না—যেমন চোরাই মাল বা নিষিদ্ধ মাদকদ্রব্য। এইসব জিনিসের ওজন জঞ্জালের চেয়ে ভারী, তা ছাড়া এগুলো জঞ্জালের মধ্যে রাখতে গেলে প্যাক করে রাখতে হবে, প্যাকেটেরও ওজন আছে। এইজন্যে তিনি আপনাকে জঞ্জালগুলো ওজন করতে বলেছিলেন—দিনের পর দিন, বারবার। অর্থাৎ ভরা টিনের মধ্যে যখন শুধু জঞ্জালই

থাকবে, তখন তার ওজন প্রতিবারই মোটামুটি এক হবে। কিন্তু যদি কোনও সময়ে টিনের ওজন অপেক্ষাকৃত ভারী হয়, তাহলে বুঝতে হবে তখন অন্য কোনও একটা জিনিস জঞ্জালের মধ্যে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। কিন্তু আপনি তাঁর নির্দেশের তাৎপর্য বুঝতে পারেননি।'

আমি বললাম, 'আমি তো কারও নির্দেশের তাৎপর্যই বুঝতে পারিনি। ওঁরা যদি একটু ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতেন, তাহলে আর কোনও গন্ডগোল থাকত না।'

মিঃ হাজরা বললেন, 'সে কোনও ডিটেকটিভই করেন না প্রফেসর সেন। সম্পূর্ণ রহস্যভেদ করার আগে যখন ওঁরা কোনও একটা point বুঝতে পারেন, তখন সেটা কখনওই ব্যাখ্যা করেন না। সবকিছু ওঁরা ব্যাখ্যা করেন একেবারে শেষে। আপনার উচিত ছিল ওঁদের নির্দেশের গুরুত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ না করে সে-নির্দেশ পালন করা। আপনি তা যে একেবারে করেননি, তা নয়। কিন্তু তাঁদের নির্দেশ অনুসারে চলে আপনি যা জানতে পেরেছিলেন, তা ওঁদের কিছু জানাননি। জানালে ওঁরা অনেক আগেই সমস্ত রহস্য ভেদ করে ফেলতে পারতেন। কিন্তু আপনি ওঁদের কিছু জানাননি, কারণ তখন আপনার মন অন্যদিকে চলে গিয়েছিল। Excuse me, Professor Sen.'

আমি মিঃ হাজরার কথায় অত্যন্ত অস্বস্তিবোধ করছিলাম। কথার মোড় অন্যদিকে ঘোরাবার জন্যেই আমি বললাম, 'আপনি বুঝি ওঁদের সঙ্গে আমার interview-এর কথা শোনামাত্রই সব বুঝে নিলেন?'

মিঃ হাজরা বললেন, 'হ্যাঁ। যখন আপনার কাছে জয়ন্তবাবুর প্রশ্ন আর তার উত্তর এবং সেই উত্তর শুনে জয়ন্তবাবুর খুশি হওয়ার কথা শুনলাম, তখনই দুখীরামের ওপর আমার সন্দেহ গিয়ে পড়ল। তারপর যখন শুনলাম কিছুদিন রাত্রে আপনি জঞ্জালের ভরা টিন হাত দিয়ে তুলে তার ওজন আন্দাজ করেছেন আর দু-রাত্রে টিনটা আপনার কাছে অন্য সময়ের তুলনায় ভারী ঠেকেছে, তখন আমার সন্দেহ বাড়ল। রাত্রিতে জঞ্জালের টিন নিয়ে কে বাইরে যায়? দুখীরাম। ওই দু-রাত্রির ব্যবধান আপনি বললেন হপ্তাখানেক। এর থেকে আমি সন্দেহ করলাম এক হপ্তা অন্তর ও সেই বস্তুটি বাইরে পাচার করে।

'তারপর আপনি যখন বললেন দুখীরামের পায়ের তলা খুব শক্ত অথচ তার পায়ের পাশ, গোড়ালি আর কড়ে আঙুলে খুব বেশি কড়া পড়েছে, তখন আমার দৃঢ় বিশ্বাস হল, দুখীরাম আসলে ভদ্রলোক class-এর লোক, মালি সেজে আছে। দু-বছর ধরে সে মালির কাজ করছে, এই দু-বছর সে সবসময়ে খালি পায়ে চলাফেরা করছে, তাই তার পায়ের তলা শক্ত হয়ে গেছে। কিন্তু দু-বছর আগে সে সবসময় জুতো পরত, তখন তার পায়ের পাশে, গোড়ালিতে আর কড়ে আঙুলে কড়া পড়েছিল, সেই কড়া এখনও রয়ে গেছে। কড়া একবার পড়লে আর যায় না। দুখীরাম যদি originally চাকর class-এর লোক হত, তাহলে ওর পায়ে কড়া পড়ত না।

'এবং আমি একেবার স্থিরনিশ্চিত হলাম যখন শুনলাম আপনাদের তিনজন ভৃত্যশ্রেণির লোকের মধ্যে একমাত্র দুখীরামই পেটরোগা। এর থেকে বুঝলাম উনি একটি বর্ণচোরা, সারা জীবন সুখাদ্য খেতে অভ্যস্ত, তাই আপনাদের দেওয়া চাকরের খাবার ওঁর পেটে সহ্য হচ্ছে না।'

আমি বললাম, 'কিন্তু আমাদের দেওয়া খাবার যদি দুখীরামের সহ্য না হত, তাহলে সে সেগুলো খেত কেন? তার তো তা খাওয়ার কোনও বাধ্যবাধকতা ছিল না। আমরা যখন তাকে বললাম যে, আমাদের বাগানের কাজ করার বদলে আমরা তাকে খেতে দেব, তখন সে তা refuse করলেই তো পারত।'

মিঃ হাজরা বললেন, 'তাই কখনও সে পারে। সাত্যকি এমনভাবে চলত, যাতে আপনারা মনে করতে না পারেন, সে সাধারণ একটা মালি ছাড়া আর কিছু। একটা সাধারণ মালিকে আপনারা সামান্য একটু কাজ করার বদলে পেটভরে খেতে দিতে চাইছেন, এ তো তার কাছে লোভনীয় প্রস্তাব। কত্তাবাবুর দেওয়া মাইনের থেকে তাহলে একটা পয়সাও খাওয়ার জন্যে তাকে খরচ করতে হবে

না। সাত্যকি মালি হিসেবে নিজের স্বাভাবিকতা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যে আপনাদের দেওয়া খাবার গপগপ করে গিলত আর তার ফলে পেটের গোলমালে ভুগত।

'সে যাক! গোড়ায় যা বলছিলাম, সেই কথায় ফিরে আসা যাক। আপনি যদি ওই চারজন প্রাইভেট ডিটেকটিভের কাছে না যেতেন, তাহলে সাত্যকি কোনওদিনই ধরা পড়ত না। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ প্রফেসর সেন, আপনি ওঁদের কাছে গিয়েছিলেন বলে আর ওঁদের নির্দেশ অনুযায়ী চলে যা জানতে পেরেছিলেন তা আমায় জানিয়েছেন বলে। অবশ্য আপনি বড় দেরি করে ফেলেছেন। আর-একটু দেরি করলে আর ওকে ধরা যেত না। আপনার কথা শোনার পর আমি বুঝতে পারলাম যে, আপনাদের দুখীরামটি বর্ণচোরা। সে দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে রঘুর সমান আর তার আসল চেহারাটা চুল-দাড়ি, গোঁফের আড়ালে অনেকখানি ঢাকা। সুতরাং সম্ভবত দুখীরামই সাত্যকি। আপনার কাছে তার চেহারার বিবরণ শুনে আমরা এই ধারণা দৃঢ় হল। তারপর আমি সঙ্গে-সঙ্গে তাকে ধরার জন্যে ছুটে গেলাম বলে শেষ পর্যন্ত তাকে ধরতে পারলাম।'

আমি খানিকক্ষণ চুপ করে রইলাম। তারপর বললাম, 'কতকগুলো ব্যাপার আমি আগে বুঝতে পারিনি। এখন পারছি। যেমন একদিন রঘু চুপিচুপি দুখীরামের ঘরে ঢুকেছিল। দুখীরাম ফিরে এসে রঘুকে তার ঘরে দেখে কুরুক্ষেত্র বাধিয়েছিল, তারপর রঘু খুব নিস্তেজ হয়ে পড়েছিল, হাঁপাচ্ছিল—।'

মিঃ হাজরা বললেন, 'দুখীরাম যে, রঘুকে বিকেলবেলায় পানের সঙ্গে কোকেন খাওয়াত, তা রঘু জানত না। সে শুধু এইটুকুই জানত যে, বিকেলের পানটা খেলেই তার ফুর্তি আসে। সেদিন সে দুখীরামের দেখা না পেয়ে তার ঘরে ঢুকে গিয়েছিল পানের সন্ধানে। এদিকে দুখীরামের ঘরে হাজার-হাজার টাকার সোনা থাকে—যদিও সেগুলো বাক্সয় তালাবন্ধ অবস্থায় থাকে, তাহলেও তার অনুপস্থিতিতে তার ঘরে কারও ঢোকা স্বভাবতই সে পছন্দ করত না। তাই রঘুকে সে সেদিন গালাগাল দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছিল, পানও খেতে দেয়নি। যে রোজ কোকেন খায়, সে একদিন কোকেন না পেলে অত্যন্ত নিস্তেজ হয়ে যায়। রঘু সেদিন তাই হয়ে পড়েছিল।'

আমি বললাম, 'আর-একটা কথা। রঘুকে বাইরে থেকে বেশ চালাক দেখাত, কিন্তু ও মাঝে-মাঝে বোকা-বোকা কথা বলত কেন?'

মিঃ হাজরা বললেন, 'ওটা কোকেনেরই প্রভাবে।'

আমি বললাম, 'দুটো বিষয় এখনও পরিষ্কার হল না।'

মিঃ হাজরা বললেন, 'কোন দুটো বিষয়?'

আমি বললাম, 'একদিন উমাশঙ্করবাবুর স্ত্রী উমাশঙ্করবাবুকে ভয় দেখিয়েছিলেন, "আমি সব কথা ফাঁস করে দেব।" "সব কথা" মানে কী? সেটা বোধহয় আপনারা জানেন না?'

মিঃ হাজরা বললেন, 'পুলিশ জানে না এমন ব্যাপার খুব বেশি নেই। উমাশঙ্করবাবুর গোপন রহস্যটির কথাও আমরা সবই জানি। সে রহস্যটা এই যে, যে-মহিলাটিকে সবাই উমাশঙ্করবাবুর স্ত্রী বলে জানে, তিনি ওঁর স্ত্রী নন।'

আমি সবিস্ময়ে বললাম, 'স্ত্রী নন?'

মিঃ হাজরা বললেন, 'না। আসলে ব্যাপারটা এই—উমাশঙ্করবাবু প্রথম যৌবনে বোম্বাইয়ে কেরানির চাকরি করতেন। তখনও তিনি লেখক হননি। সেই সময়ে বোম্বাইয়ের আর-এক বাঙালি ভদ্রলোকের সঙ্গে ওঁর বন্ধুত্ব হয়। তাঁর বাড়িতে উনি রোজই যেতেন। তার ফলে সেই ভদ্রলোকের স্ত্রীর সঙ্গে ওঁর আলাপ হয়। সেই আলাপ ক্রমে প্রেমে পরিণত হয়। ওই মহিলাই উমাশঙ্করবাবুর সৃষ্টি ও প্রেরণার উৎস খুলে দেন এবং ওঁকে নিয়েই তিনি তাঁর প্রথম উপন্যাস লেখেন। তারপর দুজনের প্রেম যখন চরম পর্যায়ে পৌঁছয় তখন উমাশঙ্করবাবু মহিলাটিকে নিয়ে কলকাতায় পালিয়ে আসেন এবং সকলের কাছে তাঁকে নিজের স্ত্রী বলে পরিচয় দেন। তখন হিন্দু মেয়ের ডিভোর্স করার

আইন ছিল না। এখন তা হয়েছে। কিন্তু এখন যদি ওই মহিলা পূর্বতন স্বামীর বিরুদ্ধে ডিভোর্সের মামলা করেন তাহলে কেলেঙ্কারির একশেষ হবে, কারণ, এত বছর ধরে সকলেই জেনে আসছে উনি উমাশঙ্করবাবুর বিবাহিতা স্ত্রী।

'সেই ভদ্রলোক এই স্ত্রীর আর কোনও খোঁজ করেননি। তিনি অন্য বিয়ে করে বহুদিন সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করছেন। কিন্তু উমাশঙ্করবাবুর ভারী ভয় যদি কোনওদিন আসল কথা ফাঁস হয়ে যায়! তাহলে তাঁর এত মানসম্মান ধুলোয় লোটাবে।'

আমি বললাম, 'সেইজন্যে সেদিন তিনি ডিটেকটিভের কথা শুনে অত ঘাবড়ে গিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ। আর সেইজন্যেই ঝগড়ার সময় ওঁর এই তথাকথিত স্ত্রী ওঁকে ভয় দেখান, "তোমার হাটে হাঁড়ি ভেঙে দেব।" কিন্তু তা কোনওদিন তিনি ভাঙেন না, কারণ ভাঙলে তো তাঁর নিজের হাঁড়িও ভাঙা যাবে। তবে এই মহিলা উমাশঙ্করবাবুর স্ত্রী না হলেও উনি উমাশঙ্করবাবুর জন্যে যা করেছেন, নিজের স্ত্রীও তা অনেক সময় করে না। উমাশঙ্করবাবুর প্রথম দু-তিনখানা বইয়ের পাবলিশার পাওয়া যায়নি। তখন এই মহিলা নিজের গয়না বিক্রি করে সেই টাকায় ওঁর বই ছাপিয়েছিলেন। তিনি যদি সেদিন তা না করতেন, তাহলে উমাশঙ্করবাবুর আজ এত নাম, এত টাকা--কিছুই হত না।'

আমি বললাম, 'ও! সেইজন্যেই উনি বলছিলেন, এ সমস্তর গোড়াপত্তন কীসের থেকে হয়েছে?'

মিঃ হাজরা বললেন, 'এ তো গেল একটা বিষয়। আর একটা বিষয় কী, যা এখনও পরিষ্কার হয়নি?'

আমি বললাম, 'করুণার ব্যাপারটা। করুণা কেন অত দেরি করে অফিসে যেত, সকাল-সকাল বাড়ি ফিরত, রোজ-রোজ রাশি রাশি চিঠি লিখত, তা আমি এখনও বুঝতে পারিনি।'

মিঃ হাজরা বললেন, 'এই ব্যাপারটা সম্বন্ধেও আমি এই ক'দিনে খোঁজ নিয়ে সব জেনেছি। করুণা একটি রত্ন। ও এ পর্যন্ত অনেক অফিসে কাজ করেছে, কিন্তু সব অফিসেরই কাগজ, পেন্সিল, কলম, খাতা, ফাইল এবং আর সব জিনিস চুরি করে বিক্রি করেছে, তারপর একদিন ধরা পড়েছে আর সেইসঙ্গে তার চাকরি গেছে। ও অনেক বাড়িতে পার্ট-টাইম রাঁধুনির কাজ করেছে। সেখানেও এটা সেটা চুরি করেছে, তার ফলে তারাও ওকে ছাড়িয়ে দিয়েছে। এইজন্যে ও দোরে-দোরে ঘুরে সবাইকে সেধে বেড়াত ওকে রান্নার কাজ দেওয়ার জন্যে, যেভাবে ও আপনাদের কাছে এসেছিল। আপনার বউদি তাঁর লোক চেনার ক্ষমতা সম্বন্ধে cock-sure বলেই কোনও খোঁজখবর না করে ওকে রেখেছিলেন, অন্য কেউ হলে খোঁজখবর নিয়ে ওর হাতটানের কথা জানতে পারত, আর ওকে রাখত না। আপনাদের বাড়িতে যখন ও ঢুকেছিল, তখন ও সত্যিই চন্দ্রমল আগরমলের অফিসে কাজ করত। কিন্তু কিছুদিন পরেই সেখান থেকে চুরির অপরাধে ওর চাকরি যায়। কিন্তু আপনাদের ও কিছু জানায়নি, পাছে আপনারা কেন চাকরি গেল তা অনুসন্ধান করে ওর চুরির কথা জানতে পেরে তাড়িয়ে দেন। এর পরেও ও যেন অফিস যাচ্ছে, এইভাবেই রোজ বেরোত, কিন্তু যখন খুশি বেরোত, যখন খুশি ফিরত। রোজ-রোজ ও যেসব চিঠি লিখত, সবই চাকরির দরখাস্ত। তবে ওর চুরির কথাটা চারদিকে এত ছড়িয়ে পড়েছিল যে, কোনও অফিসই ওকে চাকরি দিতে চাইত না। আপনারা ও-বাড়ি ছাড়ার কিছুদিন আগে ও একটা চাকরি জোগাড় করেছিল। তখন ও ঠিক সময়েই অফিসে যেত, ঠিক সময়েই ফিরত, চিঠিও লিখত না—সে আপনি লক্ষ করেছেন। তবু ভাগ্যি ভালো, লোকটা আপনাদের কোনও জিনিস সরায়নি।'

আমি বললাম, 'সে-কথা হলফ করে বলতে পারব না। ছোটখাটো জিনিসের হিসেব আমরা কেউই রাখি না।'

মিঃ হাজরা বললেন, 'তাই নাকি? সেটা মোটেই ভালো নয়। ভবিষ্যতে সব জিনিসের হিসেব

রাখবেন। আর চাকর রাখবার সময় ভালো করে খোঁজখবর নিয়ে রাখবেন। আর—আর—।'

এই বলে মিঃ হাজরা একটু হেসে বললেন, 'আর কেবলমাত্র মেয়েদের কথার ওপর ভরসা করে কোনও কাজ করবেন না।'

আমি বললাম, 'মিঃ হাজরা, অনেকক্ষণ হয়ে গেল আমি এসেছি। এইবার আমি উঠি।'

'উঠবেন? আচ্ছা!' বলে মিঃ হাজরা তাঁর চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর তিনি বললেন, 'আর-একটা কথা। আমি যখন সাত্যকি ওরফে দুখীরামের নকল দাড়ি-গোঁফ টেনে খুলে ফেললাম, তখন আপনি দুখীরামকে চিনতে পেরে সঙ্গে-সঙ্গে বলে উঠলেন, "তাহলে মাস্টারমশাই আর দুখীরাম একই লোক?" কী করে এ-কথা আপনি বললেন, প্রফেসর সেন? এরকম একটা আষাঢ়ে কল্পনা করতে আপনার বাধল না?'

আমি লজ্জিত হয়ে বললাম, 'না-না, মানে সেসময় এতটা হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম যে, কিছু চিন্তা করার ক্ষমতা ছিল না। যা হঠাৎ মনে হয়েছিল, তাই তখন মুখ দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল।'

মিঃ হাজরাকে নমস্কার জানিয়ে আমি তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে যাচ্ছি এমনসময় মিঃ হাজরা বললেন, 'প্রফেসর সেন, আপনার morose ভাবটা এখনও কাটেনি। আপনি কি খুবই আঘাত পেয়েছেন? অবশ্য পাওয়াই স্বাভাবিক। আপনার হৃদয়মন যার জন্যে উৎসর্গ করেছিলেন সে যে এমন তা জানতে পেরে আপনার মন তো ভেঙে যাবেই। কিন্তু—।'

এই বলে মিঃ হাজরা আমার হাত ধরে বললেন, 'নারী জাতিকে বিশ্বাস করে ঠকেনি এমন লোক জগতে বিরল, প্রফেসর সেন। যে-অভিজ্ঞতা আপনার একদিন হতই, তা এখনই হয়ে গেল। আপনার ভাগ্য ভালো, অল্পেই আপনি রেহাই পেয়েছেন।'

আমি কোনও কথা না বলে আস্তে-আস্তে বেরিয়ে এলাম।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

বিকেল হয়ে গেছে।

লালবাজার থানা থেকে বেরিয়ে আমি হাঁটতে-হাঁটতে ময়দানে এসে পড়লাম।

ময়দানের একটু ভেতর দিকে চলে গিয়ে একজায়গায় ঘাসের ওপরে বসলাম।

সব রহস্য পরিষ্কার হয়ে গেছে, কিন্তু আমার মনের মেঘ পরিষ্কার হল কই?

তিন মাস আগে আমি যা ছিলাম, আজও কি তাই আছি?

এই ক'মাসে যেন আমার মনের রাজ্যে একটা ভূমিকম্প এসে সমস্ত ওলটপালট করে দিয়ে গেছে।

হঠাৎ একটা বিদ্যুৎ চমকে উঠে আমার জীবনের আকাশকে আলোয় আলো করে তুলেছিল। তখন বুঝিনি এ-আলো ক্ষণিকের—একটু বাদেই নিভে যাবে—পড়ে থাকবে শুধু নিশ্ছিদ্র অন্ধকার।

ইলা! যেদিন তুমি আমায় প্রত্যাখ্যান করেছিলে, সেদিন আমি দুঃখিত হয়েছিলাম—কিন্তু নিজেকে রিক্ত, সর্বস্বান্ত বলে মনে করিনি, যেমন আজ করছি—তোমার সব কথা জানবার পরে।

প্রেমের ব্যর্থতা মর্মন্তুদ হলেও তার মধ্যে একটা মহিমা আছে। তার স্মৃতিকে অবলম্বন করে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেওয়া যায়।

কিন্তু প্রেম যখন ঘৃণায় পরিণত হয়, তখন তা হয়ে ওঠে এক দুর্বিষহ অভিশাপ।

এই অভিশাপের বোঝা আমায় সারা জীবন বয়ে বেড়াতে হবে।

আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়



বিমল সাহা

অমিতেশ তার সমুদ্র-সবুজ ফিয়াট গাড়িটা গ্যারেজে ঢুকিয়ে রেখে এসে সদর দরজার কলিংবেল টিপল। কলিংবেলের আওয়াজ ঘরের ভেতর পিয়ানোর টুংটাং শব্দ করে ছড়িয়ে গেল। কিছুক্ষণ। আবার অমিতেশের ব্যস্ত আঙুল চেপে ধরল কলিংবেলের সাদা বোতামটা। বেল বেজে যায়। দরজা খোলে না কেউ। লনের আলোয় ঘড়িটা দেখে নেয়। রাত একটা। ফিল রোডের চারপাশে নিথর স্তব্ধতা, মাঝে-মাঝে বিলিতি কুকুরের একটানা ডাক। রাত বেশি হয়েছে ঠিকই। তবে মাধুদি, মতিয়া আর বুড়ি আম্মার কেউ-না-কেউ এতক্ষণ দরজা খুলে দেয়ই। আবার কলিংবেলের বোতামে আঙুলটা জোরে চেপে ধরল। এক মিনিট। দু-মিনিট। একটানা পিয়ানোর টুংটাং শব্দের রেশ। দোতলার বারান্দায় আলো জ্বলে উঠল। বুঝল মাধুদি জেগে উঠেছে। কিন্তু না, এবারও কেউ আসছে না। দূরে মাঝেরহাট ব্রিজের ওপর দিয়ে একটা লরি মাটি কাঁপিয়ে প্রচণ্ড বেগে বেরিয়ে গেল। খালের এপারে পোর্টের রেলগাড়ির শান্টিং-এর রাত-জাগানো যন্ত্রণা।

মতিয়া দরজা খুলে দিয়েছে।

বিরক্তিভরা কণ্ঠস্বর ছড়িয়ে গেল, এতক্ষণ কী করছিলে তোমরা? বাড়িতে কি কেউ নেই?

মাজি এখনও বাড়ি আসেনি, বাবু!—মতিয়া কাঁপছে।

মাজি নেই তো তোমরা তো ছিলে।—বলতে-বলতে দোতলার সিঁড়ির মুখে বুড়ি আম্মার কান্না শুনে অমিতেশ দাঁড়িয়ে গেল। বুড়ি আম্মা কাঁদছে! ছেলেবেলা থেকে ও এ-বাড়িতে আছে। মা মারা যাওয়ার পর থেকে ওকে মানুষ করেছে বুড়ি আম্মাই। জড়িয়ে ধরে বুড়ি আম্মাকে জিগ্যেস করল, কাঁদছ কেন? কী হয়েছে?

বউরানি আর আসবে না, খোকাবাবু! আমি ঠিক জানি আর আসবে না।—হাপরের মতো ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে উঠছে বুড়ি আম্মার ন্যুব্জ শরীরটা।

কী বলছ তুমি? সুনীতা কোথায় গেছে? কেন আসবে না? ও তো প্রায়ই ক্লাব থেকে রাত করেই ফেরে। দেরি হচ্ছে হয়তো। নিশ্চয়ই আসবে। অত ভাবছ কেন?—অসংলগ্নভাবে অজস্র প্রশ্নের ঝড় ভেঙে পড়ল অমিতেশের গলা দিয়ে।

ওপরে এসো অমি, হয়তো সুনীতা আর আসবে না।

কে? মাধুদি! চমকে ওপরদিকে তাকায় অমিতেশ। ডাক্তার অমিতেশ সেন। প্রায়-চল্লিশ দৃপ্ত মানুষটা যেন এক আবেশে সাত বছরের শিশু হয়ে যায়। বুকের মধ্যে মৃদু-মৃদু ইথারের কাঁপুনি। ভয়? এরই নাম কি ভয়? কেমন একটা অবশতা দু-পায়ে জড়িয়ে ওঠে লতিয়ে-লতিয়ে। সিঁড়ির রেলিং ধরে দোতলার বেডরুমের দিকে এগোয়।

কাছে আসতেই মাধুদি অমিতেশকে ডানহাতে আঁকড়ে ধরে।

চলো শোবে চলো!

মাধুদির দৃপ্ত স্বরে মোহাচ্ছন্ন অমিতেশ। মুহূর্তে একটি জিজ্ঞাসা ছুড়ে দেয়, তোমরা সবাই এমন ভয় পেয়েছ কেন? সুনীতার তো আজ চোদ্দো বছর ধরেই বাড়ি ফিরতে এমন রাত হয়। ক্লাব, পার্টি, ড্যান্স, ফাংশান—এসব সেরে কোনদিন ও রাত বারোটার আগে বাড়ি ফেরে বলতে পারো মাধুদি? তবু তোমরা ভাবছ ও আসবে না।

চলো, সব বলছি। আমিও বাইরে গিয়েছিলাম। ফিরে এসে মতিয়া আর বুড়ি আম্মার মুখেই সব শুনে আমারও যেন কেমন মনে হচ্ছে সুনীতা বোধহয় চলে গেল।

দোতলার পুবদিকের বারান্দায় ইজিচেয়ারে শুয়ে পড়ল অমিতেশ। আকাশ জুড়ে চাঁদের আলো রুপোর পাতের মতো পড়ে আছে। রাতজাগা কোনও একটা পাখি বোধহয় ডানা ঝাপটিয়ে উড়ে গেল। শরতের মিঠে হাওয়া চোখের পাতায় একটু করে ঘুমের রেশ এনে দেয়। পাশে নাইট-গাউন পরে বসে মাধুদি। কতকগুলো স্নেহের আঙুল ক্লান্ত অমিতেশের মাথায় এলোমেলো ঢেউ তুলছে। মাধুদি। দূরসম্পর্কের পিসতুতো দিদি। জন্মের সময়েই মাধুদি মাকে হারায়। দু-চারদিনের মধ্যেই বাবাও

নাকি হার্টফেল করেন। সেই থেকে এ-বাড়িতেই মানুষ। বয়সে হয়তো বছর দশেকের বড়ই হবে মাধুদি। অথচ বরাবরই অমিতেশ তার নিঃসঙ্গ জীবনের যত হাসি-কান্না, ব্যথা-যন্ত্রণা সব কিছুরই ভাগ মাধুদিকে দিয়ে হালকা করেছে নিজেকে। মাধুদিও কী বিচিত্র! ছেলে পছন্দ করতে-করতে আর বিয়েই করা হল না তার। মেয়েদেব বয়েসে এমন একটা সময় হয়তো আসে যখন সেখানে আর কোনও অপরিচিত আগন্তুকের পদচিহ্নে কোনও ক্ষতের সৃষ্টি হয় না।

কী ভাবছ অমি?—মাধুদির স্বরে চমকে ওঠে অমিতেশ।

সুনীতা কি পালিয়ে গেল? না কি কেউ তাকে কিডন্যাপ করেছে? পুলিশে তো অন্তত একটা ফোন করা দরকার।

পুলিশ!—মাধুদি সেই নিশীথ রাতে প্রায় চিৎকাব করে ওঠে।

কেন, এতে ভয় পাওয়ার কী আছে?

কী বলছ অমি? আমাদের এত বড় বাড়ির নাম খবরের কাগজে উঠবে? লোকে বলবে অমিতেশ সেনের বউ পালিয়েছে? কত রং-বেরঙের খবর বানিয়ে গল্প বেরোবে? সোসাইটিতে, ক্লাবে, বারে, সবাই চোখ টেবিয়ে তাকাবে। না-না, দু একদিন দ্যাখো না। হয়তো সুনীতা ফিরে আসতে পারে। বলতে-বলতে অমিতেশের মাথায় হাত বুলিয়ে দেয় ঃ জামাকাপড় ছেড়ে এখন শুয়ে পড়ো। কাল ভোরে দেখা যাবে।

মাধুদি নিজেও এবাব দাঁড়ায়।

আ মরণ!

কে? কে ওখানে?—একইসঙ্গে অমিতেশ আব মাধুদি দুজনেই চেঁচিয়ে ওঠে, কে বললে এ-কথা? আ মবণ!—কে বললে?

লাফিয়ে উঠে দাঁড়ায় অমিতেশ। আলো জ্বালাব আগেই একটি ছাযা তরতব করে মিলিয়ে গেল ভেতরের লন আব সুইমিং পুলের পাশের ঝোপে। মাধুদি কাঁপছে। বোধহয হাত-পা অবশ হয়ে যাচ্ছে।

অমি—অমি!

ফিরে এল অমিতেশ। প্রায় সংজ্ঞা হারিয়ে আসা মাধুদিকে তাড়াতাড়ি দু-হাতে জড়িয়ে ধরল। কোনওরকমে তার ঘরে এনে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে বলল, তুমি ঘুমিয়ে পড়ো। কাল সকালেই সব শুনব। গুড নাইট।

দোতলার রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে রইল অমিতেশ। কিছুক্ষণ চোখ দুটো মেলে দিল দূরে নীলচে জলে-ভরা সুইমিং পুলের ওপর। চাঁদের রুপো-গলা আভায় জলের আঁধার টলমল। আশেপাশে ঝোপের ভেতর ভালুক-অন্ধকার। দূর্বাঘাসের লনের সবুজে, রাতেব নিঃশব্দ সংগীতে আর মনের চেপে রাখা চিন্তার রেশে অমিতেশ পিছিয়ে গেল পনেরো বছর আগের দিনগুলিতে।

আগস্টের ছ'তারিখ। বিকেল থেকেই প্রচণ্ড বৃষ্টি। কলকাতার অর্ধেক রাস্তা জলে ভাসছে। ট্রাম-বাস সব বন্ধ। ট্রাফিক জ্যাম্। (অমিতেশ বলত, ট্রাফিক থ্রম্বোসিস!)

কোনও-কোনও রাস্তায় আলো নেই। নিঃসাড় অন্ধকার। বিদ্যুতের সাদা-সাদা দাগ গোটা কালো আকাশ যেন ফেঁড়ে ফেলছে। সেদিনও এমনি দোতলার রেলিঙে দাঁড়িয়ে অমিতেশ। ভাবছিল, কেন এত দেরি করছে মালবিকা?

হ্যাঁ, সেদিন মালবিকাই ছিল তার সব।

মালবিকা। তার প্রথমা প্রিয়া। প্রথম সঙ্গিনী। সুনীতাদের নিউ আলিপুরের বাড়িতে একটা সান্ধ্য পার্টিতে প্রথম আলাপ। রেডিওগ্রামে সেসময়ের দুরন্ত মিউজিক বিল হেইলির রক-এন্-রোল।

সুনীতা, সুরিন্দর, অমৃত খান্না, তেজেশ, মীনা, রুমা, অবনীশ, গৌরীশ সবাই নাচছে। মাঝে-মাঝে দু-এক সিপ বিয়ার আর হুইস্কি। কোণের দিকে নন্দা রমানি, ভানু প্যাটেল, চিলতু, ওমপ্রকাশ, উমাশঙ্কর, রতি—ওরা স্ট্রিপ পোকার খেলছে। কেউ-কেউ মেঝেতে শুয়ে বোম-বোম আওয়াজে মাতোয়ারা। হঠাৎ নজরে এল অমিতেশের, বাইরে লনে একটি দোহারা শ্যামলা রঙের মেয়ে। একলা।

কাছে গিয়ে দাঁড়ায় অমিতেশ, আপনি এখানে একা? ডু ইউ ফিল বোর্‌ড?

ঠিক বলেছেন আপনি।—ঘুরে দাঁড়াল সেই অপরিচিতা। চোখ দুটিতে একটি নিঃসঙ্গ সকরুণ সুর। মুখের হাসিতে মেঘ ডুবে যায়।

অমিতেশও সায় দিল, আমারও বিশ্রী লাগছে। চলুন না, সামনের লনে বসে আপনার কথাই শুনি।

'আপনি' থেকে 'তুমি'তে এসেছিল মালবিকা। সুনীতারই বন্ধু।

তারপর কত দ্রুত দুটি মন একদিন আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে ষড়যন্ত্র-সংকুল এই মাটিতে এক হয়ে গেল, আজ আর তা মনে পড়ে না। বাবা বেঁচে থাকতেই মালবিকা এ-বাড়ির বউ হয়ে এল। (আমাদের সমাজে 'বউ' বলাটা হাস্যকর। বেটার হাফ। কিন্তু মালবিকা ফুলশয্যাব রাতে বারবার 'বউ' কথাটাই শুনতে চেয়েছিল। অমিতেশের আদরে ডুবে গিয়ে বারবার করুণ কান্নার মতো বলেছিল, আমি বোধহয় তোমার মিসফিট।)

এরপর অনেক মেঘ গড়িয়ে গেল। অনেক হাসি-কান্নায় ভরা রাত পেরিয়ে গেল।

এল সেই ভয়ংকর দিন। না-না—থাক। কী সব ভাবছে অমিতেশ। বলির আগেব মুহূর্তেব মৃত্যু-আতঙ্কে শিউরে ওঠা পাঁঠাব দুটি চোখের করুণ আর্তি ভেসে উঠেছিল সেই ভযংকব বাতে। কার চোখে?

যে-চোখ বুজলে অমিতেশ আদরে-আদরে ভিজিয়ে দিত, সেই চোখ ওকে সেই ভযংকব রাতে কী বলেছিল?

সেইদিনও সুনীতার বাড়িতে পার্টি ছিল। ওরা দুজনেই গিয়েছিল, মাধুদিও ছিল। রাত প্রায় একটা। তখন সুনীতাই দৌড়ে এল ঃ এইমাত্র তোমার একটা ফোনকল এসেছে, অমিতেশ। সিরিয়াস কেস। সুইনহো স্ট্রিটে। এই নাও ঠিকানাটা।

আমি গেলে মালবিকারা কার সঙ্গে ফিরবে?

কেন, আমার বুইকটা নিযে চলে যাবে।—সুনীতা বলল।

আমি তোমাব সঙ্গেই যাব। তুমি রোগী অ্যাটেন্ড করো—ততক্ষণ আমি গাড়িতেই বসে থাকব—।

মাধুদি এসে পাশে দাঁড়াল ঃ তা ছাড়া আমার মাথাটাও বড্ড ধবেছে।

বেশ। তাই হোক। মালবি?—দূরে দাঁড়িয়ে থাকা মালবিকার দিকে কথাটা ছুড়ে দিল।

ডোন্ট ওবি। আমি তো আর অচেনা কারও বাড়িতে বসে নেই। পার্টি শেষ হতেই ঠিক চলে যাব। সুনীতার গাড়িটা নিয়ে নেব।

মাধুদিকে নিয়ে অমিতেশ তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল সুইনহো স্ট্রিটে। বাড়িতে ফিরতে-ফিরতে রাত প্রায় এগারোটা। বারোটা। একটা। ঘড়ির কাঁটা ঘুরে চলল। তবুও আসছে না দেখে ফোন করল সুনীতাকে।

ঘুমের মধ্যে জড়িয়ে ওঠা স্বরে জবাব এল, সে কী? মালবিকা এখনও বাড়ি ফেরেনি? সে তো ঘণ্টা দুয়েক আগেই আমার বুইকটা নিযে বাড়ি চলে গেছে।

বলছ কী তুমি? মালবি তো একলা এত রাতে গাড়ি নিয়ে নিশ্চয়ই সারা কলকাতা ঘুরে বেড়াচ্ছে না! তবে, তবে কি তার কোনও বিপদ হল?—ফোনের ভেতর যেন কান্না গুলিযে ওঠে।

শিগগির পুলিশে খবর দাও।—ও-পাশ থেকে সুনীতা তাড়া দিল।

পুলিশে খবর দিল ডাঃ অমিতেশ। কিছুক্ষণের মধ্যেই হসপিটাল থেকে খবর এল, মালবির বডি পাওয়া গেছে ভাঙাচোরা গাড়ির ভেতরে। শি ইজ ডাইং। একমুহূর্ত দেরি না করে অমিতেশ হাসপাতালে ছুটল। মাধুদিও সুনীতাকে ফোন করে হাসপাতালে এল।

তদন্তে প্রকাশ পেল ধারালো দা জাতীয় কিছু দিয়ে মাথার পিছনের খুলি ফাটিয়ে দেওয়া হয়েছে। সারা গায়ে মুখে মদের গন্ধ। গাড়িটা আলিপুর রোডের এক বড় বাড়ির পাঁচিলে এসে ধাক্কা খেয়ে পড়েছিল।

গায়ের সমস্ত দামি অলংকার, আর পার্সের ভেতর রাখা শ'পাঁচেক টাকাও গায়েব। মরবার আগে মালবি শেষ কথা বলেছিল দুবার ঃ সুনীতা! সুনীতা!

মালবিকে হারিয়ে অমিতেশ একেবারে ভেঙে পড়েছিল। মন ও শরীর দুই-ই নাজেহাল। একদিকে মাধুদি অপরদিকে সুনীতার সেবার স্পর্শে আবাব নতুন করে হাসতে শুরু করল। আবার মনে হল, জীবনের গভীরে শোকই সব নয়—আনন্দও আছে, প্রেমও মানুষকে বাঁচার প্রেরণা জোগায়। বাড়ির সবকিছু ফেলে সুনীতা তার মনের নতুন আলো অমিতেশকে দিনরাত ছায়ার মতো ঘিরে রইল।

পনেরোটি বছর। সত্যি ভাবতেও আজ এই নিশীথ রাতে রোমাঞ্চ লাগে। পনেরো বছর আগে সুনীতা তার নতুন স্ত্রী হয়ে এ-বাড়িতে আসে। জীবনের এই ক'টি দিনে সে কোনও আশা করেনি, কোনও সুদূর কামনার বেড়াজালে নিজেকে জড়ায়নি। দিন যায়। মাস যায়। ক্রমে-ক্রমে মালবিকার অভাবের শূন্যতা ভরিয়ে দিল সুনীতা।

সুনীতার নিজের ভাবনা—নিরুদ্দেশের বেশ কিছু আগে

স্বপ্ন দেখছিল সুনীতা। মালবিকা শোবার ঘরে টেবিলে বসে কী যেন লিখছে। উলটোদিকের চেয়ারে হাঁটুমুড়ে বসে সে।

কী লিখছিস তুই? ডায়েরি? না আর কিছু?

আস্তে-আস্তে দূর থেকে ভেসে আসা গানের রেশের মতো মালবিকার স্বর ঃ লিখছি, লিখছি, কিছু লিখছি। শেষ হয়ে গেছে লেখা।—বলেই উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর ঢেউ-এর মতো দুলতে-দুলতে জানলা খুলে এলোমেলো হয়ে পিছন ফিরে লাফিয়ে পড়ল। দৌড়ে গেল সুনীতা ঃ মালবি? মালবি?

আমার লেখা শেষ হয়ে গেছে। আমি যাচ্ছি! যাচ্ছি!

ফিরে আয়, ফিরে আয় লক্ষ্মীটি।

আমার ফেরায় আর কী হবে?—তিনতলার জানলার নীচের বাতাসে শূন্যে হাঁটছে মালবিকা। মাথার পিছনের খুলি ফেটে গিয়ে হাঁ হয়ে রয়েছে। তার ভেতর দিয়ে লাল রক্তের ধারা ঝরঝর করে পড়ছে। মনে হচ্ছে বুঝি বা কোনও পাগল শিল্পীর লাল রঙের খেলা।

মালবি ফিরে আয়। তোর মাথার পিছনটা একদম ফেটে গেছে।

সুনীতার ডাকে তবুও মালবিকা আর উঠে আসছে না। সে হাওয়ায় দুলছে। পুবদিকের সুইমিং পুলের জলের ছায়ায় নেচে-নেচে, কখনও বা গাছের ফাঁক দিয়ে, কখনও বা দূরের ট্রামলাইনের তারের ওপর দিয়ে সার্কাসের মেয়ের মতো দুলে-দুলে মালবিকা আস্তে-আস্তে মিলিয়ে যেতে লাগল। মাঝে-মাঝে মুখ ঘুরিয়ে হাসছে। কচি মেয়ের হাসি। পুতুলের হাসি। শব্দহীন হাসি।

মালবি! ফিরে আয় সোনা আমার!—সুনীতা বোধহয় কাঁদছিল।

আর নয় সুনীতা, তুই-ই ওকে দেখিস।—মালবিকা হাঁটছে। শূন্যে হাঁটছে।

চারদিক হঠাৎ অন্ধকার হয়ে এল। কালো-কালো শকুনের দল তেড়ে আসছে উড়ন্ত মালবিকার

দিকে। ওকে ঠোকরাচ্ছে। শাড়ি, ব্লাউজ, সায়া সব ছিঁড়ে টুকরো-টুকরো। একটা নয়, দুটো নয়, শ'য়ে-শ'য়ে শকুন। চি-চি চিৎকার। মহাশূন্যের কালো অন্ধকারে এক রূপবতী নায়িকার পুতুল-হাসি। মালবিকার পিছনটা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাচ্ছে না সুনীতা। হাঁ-টা বড় হচ্ছে, বড়, বড়, আরও বড়। আর লাল রক্তের ধারা যেন নদী হয়ে উঠল। শকুনগুলো মাথার খুলিটাকে দু-ভাগ করে ফেলে তার ভেতরের ঘিলু, রক্ত, মাংস ঠুকরে-ঠুকরে চেটে নিচ্ছে।

সুনীতার ঘুম ভেঙে গেল এক বীভৎস যন্ত্রণায়। দম বন্ধ ভয়ে, আতঙ্কে শিউরে উঠল। চেঁচাতে গেল, পারল না।

এ কী, আমার গলায় কী হল? কথা বেরোয় না কেন?

কাশল সুনীতা। মাথার পিছন, বুক, পিঠ ঘেমে নেয়ে যাচ্ছে। বিছানা ছেড়ে লাফ দিয়ে উঠে জানলার ধারে গেল। কেউ নেই। ভোরের বাতাস। দু-একটা পাখি মিষ্টি গলায় ডেকে চলেছে। দূর থেকে কার রেডিওগ্রামে বিদেশি সুরের আলাপ।

শুধু লনের ওপর পাম গাছটায় বসা একটি শকুনের চোখ ওর দিকে তাকিয়ে।

সুনীতা তাড়াতাড়ি গিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়ায়। এ কী চেহারা হয়েছে তার? আয়নার ভেতরে আর-এক সুনীতা। চুল এলোমেলো, উচ্ছৃঙ্খল। পরনের নাইট গাউনের স্ট্র্যাপ খোলা। চোখের কোণে কালি। গালটার ফরসা রং মেটে-মেটে। চোয়াল ঠেলে যেন অনেকটা বয়েস বেড়ে গেছে।

আয়নার দিকে নিজের গালটা ফোলাল। ঠোঁট উলটে জিভ বের করে দেখল। চোখের কোলে হাত বোলাল। কপালের কোণে একটা পাকা চুল। তবে কি তার অনেক বয়েস হয়ে গেল। শরীরের ভাঁজে-ভাঁজে যৌবন বোধহয় গতায়ু। পনেরোটা বছর তো অমিতেশের সঙ্গে ওর বিয়েই হয়েছে। পনেরোটা বছর ধরে এই ঘর তার। এর জানলার পরদা, ক্যাবিনেট সেট, কোণের ফ্লাওয়ার ভাস— এমনকি মডার্ন পলিথিনের ইজিচেয়ারটি পর্যন্ত তার পছন্দ করা।

আয়নার ছবিটার সঙ্গে খেলা করতে ইচ্ছে হচ্ছে। জিভটা বের করে ভেঙিয়ে দিল। কী বিশ্রী ওই লম্বা ছুঁচলো জিভটা। গায়ে ফাটা-ফাটা দাগ। খেলা! শুধু-শুধু খেলা?

অমিতেশ বলে, সব খেলার পিছনেই একটা মোটিভ বা উদ্দেশ্য থাকে। মানুষের কোনও শারীরিক ক্রিয়াই মোটিভ ছাড়া হয় না। এখন যদি অমিতেশ হঠাৎ এ-ঘরে ঢুকে পড়ত, তবে ওকে এ-ভাবে দেখলে কী ভাববে? সত্যি কি সুনীতা পনেরো বছর পর মালবির মৃতদেহ খুঁজছে? এ-বাড়ির প্রতিটি ঘর তার চেনা, প্রতিটি মানুষ তার আপনজন। তবু—তবুও কেন তার মনে হয় সে যেন অপর এক বাড়িতে অন্য কারও স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে? স্বামীর আত্মীয় বন্ধু, দাস-দাসী সকলের সঙ্গে সে পনেরো বছর ধরে যেন শুধু আগন্তুকের মতো দেখাই করে চলেছে। কেন?

তবে, তবে কি মাধুদি?

অমিতেশকে সবসময় অদৃশ্য ছায়া দিয়ে আড়াল করে রেখেছে এই মাধুদি। মাধুদির বয়েস অমিতেশের চাইতে খুব বেশি নয়। রোগা, দোহারা, দৃপ্তময়ী চেহারা। গলার স্বর খুব জোরালো। কী বাড়িতে কী পার্টিতে সবসময়ে চেঁচিয়ে কথা বলাই মাধুদির স্বভাব। বোধহয় ধারণা, চেঁচিয়ে কথা না বললে কেউ শুনবে না। সবারই অমনোযোগের, অবহেলার পাত্র। মাধুদির চোখে-মুখে শরীরের ভাঁজে এমন এক পৌরুষ-কাঠিন্য ভাসে, যার ফলে অনেকেই মাধুদিকে ভুল বোঝে। তবু এই মাধুদিই সুনীতাকে এ-বাড়িতে সবার আগে আপন করে নেয়। প্রথম-প্রথম অমিতেশের মনের কোণে মালবির ব্যথাবিন্দুর স্মৃতির দেওয়াল ওকে কাছে যেতে দেয়নি। সেদিনের সেই সাধনায় মাধুদি সুনীতাকে দিয়েছে আশ্বাস।

অমিতেশ বিয়ের পর বহু বছর পরেও জানতে চাইত : মালবিকে সামান্য ক'টা টাকা আর গহনার লোভে কারা এমন নৃশংস ভাবে হত্যা করল? কোনও কিনারা হল না! তোমার কী মনে হয় সুনীতা?

আমার ধারণা আমাদের পার্টিতেই ওই ডাকাত দলের কেউ ছিল? হয় বেয়ারার বেশে, অথবা কোল্ড-ড্রিংক সাপ্লায়ারের লোকেদের মধ্যে কেউ থাকতে পারে। তারাই পরে সুযোগ বুঝে এই কাণ্ড করেছে।

দ্যাখো তো, তুমি পর্যন্ত কেমন সুন্দর একটি ক্লু পেয়ে গেলে।

সুনীতা ভয় পেত। চোখের তারায়-তারায় অজানা এক ভয়ের স্বাদ। ছুটে গিয়ে মাধুদিকে জড়িয়ে ধরত। সব বলত।

মাধুদি, ও যে আজ দশ বছরেও মালবিকে ভোলেনি। আমাকে তবে কেন এভাবে ওর জীবনে জড়িয়ে নিল? বলো, বলো মাধুদি! আমার দুর্বলতা অমিতেশকে ঘিরে অনেকদিন, এ-কথা ঠিক। কিন্তু মালবিকাকে বিয়ের পর আমি তো ওর জীবন থেকে অনেক দূরেই ছিলাম।

ব্যস্ত হোয়ো না সুনীতা।—সেই প্রথম মাধুদি ওকে জড়িয়ে ধরে নিজের ঘরে নিয়ে গেল। অনাবশ্যকভাবে আচমকা ওকে পুরুষের মতো জড়িয়ে আদর করল। সুনীতা সেই মুহূর্তে একটি স্নেহের হাতের পরশ পেয়ে যেন বেঁচে গেল।

এক-একসময় ওর মনে হত, মাধুদিই অমিতেশকে আড়াল করে রাখছে। বাড়ির সমস্ত গৃহস্থালি থেকে যত কিছু ফাংশান-পার্টি, এমন কী অমিতেশের দেখাশোনা, সবই মাধুদির।

ব্রেকফাস্টের টেবিলে সবাই সেদিন বসেছে। আম্মা খাবার দিয়ে দিয়েছে। কিন্তু অমিতেশ তখনও নীচে আসেনি। ওপর থেকেই চেঁচাচ্ছে, আমার ব্রাউন টাইটা কোথায়?

মাধুদি আর ও দুজনে চুপচাপ।

কী ব্যাপার বলো তো? তোমরা আমার ঘরে সবসময় জিনিসপত্তর নাড়াচাড়া করো কেন? —বলতে-বলতে ঘরের বাইরে সিঁড়ির ওপরে এসে দাঁড়াল অমিতেশ।

তোমার ড্রয়ারের ভেতর আছে।—কফির কাপে চামচ নাড়তে-নাড়তে মুখ নীচু করে জবাব দিল সুনীতা।

অমি, তোর কি রুচিজ্ঞান কমে যাচ্ছে?—প্রশ্নটা চেঁচিয়ে ছুড়ে দিল মাধুদি। অমিতেশ শান্ত। এই সকালবেলায় কেউ ব্রাউন টাই পরে। মর্নিং-এর বেস্ট অ্যাডজাস্টমেন্ট হল লাইট ইয়েলো।

একটু পরেই অমিতেশ খাওয়ার টেবিলে ফিকে হলুদ রঙের টাইটা পরে এসে বসল। মুহূর্তে নিজের অজ্ঞাতেই সুনীতার দু-চোখে এক ঘৃণার ছোবল খেলে গেল। কী জানি কেন, মাথার ভেতরটা ভীষণভাবে জ্বালা করতে লাগল। মাথাটা বোধহয় ছিঁড়ে যাবে। দপদপ করছে। মাথার যন্ত্রণা ছড়িয়ে গেল হাতের শিরায়-শিরায়। এক ঝটকায় কফির কাপ টেবিল থেকে ফেলে দিয়ে গটগট করে দোতলায় উঠে এল। কী মনে করে একবার তাকাল নীচের দিকে। মাধুদির ক্রুর হিংস্র চাউনি ওর দিকে। সুনীতাকে দেখিয়ে বোধহয় অমিতেশকে বলল, (প্রচণ্ড জোরে-জোরে) ডোন্ট ফিল পারটার্বড।

অমিতেশ ঘুরে দাঁড়াতে কোটটা গায়ে চড়িয়ে দিল। সিগারেটের প্যাকেট আর স্টেথিস্কোপটাও সামনে রাখল, বলল, সুনীতাকে আমি দেখছি। তুমি কোনও চিন্তা কোরো না।

মাজি!—বুড়ি আম্মার ডাকে চমক ভাঙল সুনীতার। এতক্ষণ যেন সে বিদেশি চলচ্চিত্র দেখছিল। নিজের হাতদুটো অস্থির চঞ্চল হয়ে নিজের গালে ঘুরতে-ঘুরতে গলার কাছে এসে থেমে গেল। এ কী! আবার সেই দমবন্ধ হয়ে যাওয়া যন্ত্রণা। কোথায় কীসের যন্ত্রণা, কিছুই বুঝতে পারে না। বুক, পিঠ, গলা সব ঘেমে উঠছে। গলার ভেতর এক ব্যথা আর আবেগের দলা গুলিয়ে উঠছে। চোখ দুটি ছোট হয়ে আসে, অব্যক্ত এক কাতরতায় হু-হু করে ওঠে বুকের ভেতরটা।

কী হল মাজি? শরীর খারাপ লাগছে? বাবুকে ফিরিয়ে আনব?—বুড়ি আম্মা পাশে এসে স্নেহময়ী মায়ের মতো দু-হাতে জড়িয়ে ধরে। বাইরে তখনও অমিতেশের গাড়ি স্টার্ট নেয়নি। মাধুদি ফিরে আসেনি যেন গেট থেকে।

ফিসফিসিয়ে বলে সুনীতা, না, বুড়ি আম্মা। আমার কিছু হয়নি। আমি নিজের ঘরে যাচ্ছি।

বুড়ি আম্মা স্বগতোক্তি করার মতো বলে চলল আস্তে-আস্তে : ডাইন, একদম ডাইন! নিজে বিয়ে-শাদি না করে খোকাবাবুকে নষ্ট করে দিচ্ছে!

অন্যদিন হলে সুনীতা হয়তো ধমকে দিত, কিন্তু তখন সেই মুহূর্তে বুড়ি আম্মাকে কিছুই বলল না।

রাত শেষ হতে চলল। আর দেরি করা উচিত নয়। সুনীতা যখন এখনও ফিরল না, পুলিশে খবর দেওয়া দরকার। তার আগে বুড়ি আম্মাকে ডেকে সবটা ভালোভাবে জেনে নিতে হবে। আস্তে-আস্তে মাধুদির দরজায় টোকা দিল অমিতেশ।

কে? অমি?

জেগে আছ?

ঘুম কি আসে?

কেন? তুমি তো আজ ক'বছর ধরে আমার কথা না শুনে স্লিপিং পিল খাচ্ছ—তাতেও ঘুম আসে না?

সুনীতার নিরুদ্দেশ হওয়া বা বাড়িতে এখনও ফিরে না আসাটা কি একটা দারুণ শকিং ব্যাপার নয়? আজ আর স্লিপিং পিল খাওয়ার জন্যে ইচ্ছেই করছে না।—বলতে-বলতে দরজা খুলে বাইরে এল মাধুদি।—আমি এখনও বুঝে উঠতে পারছি না, সুনীতা কোথায় যেতে পারে? তুমি যখন বারান্দায় তখন আমি ঘরে বসে অনেক জায়গাতেই ফোন করেছি, কিন্তু সুনীতা কোথাও যায়নি। তা ছাড়া আজ মাস ছয়েক তো সুনীতা শুধু ক্লাবে গিয়ে সন্ধের পর মদ আর নাচ নিয়েই থাকে।

অমিতেশ কিছু বলে না। নিশ্চুপ। কী যেন ভাবছে হয়তো।

মাধুদি বলে চলে (অন্যদিনের মতো চেঁচিয়ে নয়। আজ যেন কারও মন্ত্রে গলার স্বর স্বাভাবিক হয়ে এসেছে), আমার কথা তো শোনেও না। তুমি তো তোমার হসপিটাল, রিসার্চ আর পেশেন্ট নিয়েই আছ। ওর দিকে তো ভালো করে চেয়েও দ্যাখো না।

মাধুদি।

কী?

কয়েক মাস ধরে একটা জিনিস লক্ষ করেছিলে?

কী?

কারণে-অকারণে নিজের রাগকে সংযত করতে পারে না। বিশেষ করে আমার ওপর তোমার কোনও খবরদারি বোধহয় সুনীতা ঠিক পছন্দ করছিল না।

নিশীথ রাতের নিস্তব্ধতায় মাধুদির বুকের দপদপানি বোধহয় শোনা গেল। চোখের তারায় ভয়ের কাঁপন : কী বলছ অমি?

অমিতেশ থামেনি। সে তখনও বলছে, আজ ক'মাস আমি তোমাদের দুজনকেই লক্ষ করেছি। মনে হয় তুমিও বোধহয় চাও না, আমার ওপর আর কারও কোনও অধিকার এসে চেপে বসে। তাই না? মালবিও একদিন আমায় কেমন যেন এই আভাসই দিয়েছিল।

না—না—মিথ্যে কথা! এ হতেই পারে না। তোমাকে আমি স্নেহ করি ঠিক, কিন্তু সেটাকে আমাদের সমাজ এমন বিকৃতভাবে দেখবে, এ আমি ভাবতেই পারি না। অনেক অনাত্মীয়া মেয়েও তো কাউকে-কাউকে নিজের ভাইয়ের মতোই ভালোবাসে। আর আমি তো সত্যিই তোমার সম্পর্কে দিদি।—মাধুদি থামল। দূরে রেলগাড়ির ঝিকঝিক আওয়াজ। খানিকটা সাদাটে ধোঁয়া। পুলের ওপরে সারি-সারি আলো শকুন-চক্ষুর মতো দাঁড়িয়ে।

অমিতেশ স্তব্ধতা ভাঙল, কিছুদিন আগে ডাঃ শ্রীবাস্তব বলেছিলেন; একটু খেয়াল রেখো মাই

সন, সুনীতা বোধহয় মেন্টাল ব্যালান্স রাখতে পারছে না। কিন্তু কী করতে পারে সুনীতা? কোথায় বা যেতে পারে?

ওর ঘরটা ভালো করে দেখে আসি।

বেশ, তাই চলো।

দুজনে সুনীতার ঘরে এল। ঘরের কোণে ফুলদানিটায় ফুল নেই। জানলার পরদা আধময়লা। ক্যাবিনেটের সব ক'টি ড্রয়ার আধখোলা। বিছানার ওপর দুটো সুটকেশ খোলা। একটা শাড়ি, দুটো অন্তর্বাস (অত ময়লা জিনিস সুনীতা ঘরে জমিয়ে রাখে না!) পেটিকোট, প্যান্টিস। মেঝেতে দু-জোড়া চটি। একটা পাটি ওলটানো।

চারদিক ঘুরতে লাগল দুজনেই। কিছুই নজরে পড়ল না। ড্রেসিং টেবিলের ওপর এক টুকরো কাগজে একটি ফোন নম্বর ঃ বিউটি ক্লিনিক, ৯৫-৫৫৯৬। চিঠি লেখার প্যাড। একটি পাতা আধছেঁড়া। আর-একটি পাতা উলটে গেল মাধুদি। কলম দিয়ে একটি ছবি আঁকা। মুখটা প্রায় মালবিকার মতোই। হ্যাঁ, এই তো ছবির নীচে নাম লেখা ঃ মালবিকার মৃত্যু! ছবিতে চোখ দুটির জায়গায় দুটি ফুটো।

অমিতেশ ছবিটি নিয়ে আলোর কাছে গেল, ডাকল, মাধুদি, এদিকে এসো। এই দ্যাখো, ছবিটিতে চোখ এঁকেছিল সুনীতা। তারপর বোধহয় জ্বলন্ত দেশলাইয়ের কাঠি দিয়ে চোখের জায়গাটুকু আগুনে পুড়িয়ে ফুটো করে দিয়েছে।

কী সাংঘাতিক!—মাধুদি শিউরে উঠে অমিতেশের হাত আঁকড়ে ধরল। ডানাভাঙা পাখির থাবার মতো অসহায় মাধুদির হাত। অমিতেশের মনে হল, হাতটা এগিয়ে দিলে আরও জোরে চেপে বসবে মৃত্যুপথযাত্রী পাখির করুণ আর্তি নিয়ে।

ওরা দুজনেই একটা আতঙ্কের মতো, প্রেতের মতো, নীচে নেমে এল। চেঁচিয়ে ডাকল ঃ বুড়ি আম্মা, মতিয়া!

নিস্তব্ধ রাত্রির শেষ প্রহরে অত বড় বাড়িতে সেই আওয়াজ গমগম করে ফিরতে লাগল।

ওরাও বোধহয় ঘুমোতে পারেনি।

ডাক শেষ হতে না হতেই দুজনে বেরিয়ে এল।

বুড়ি আম্মা, তুমি আর মতিযা মাজিকে ঘর থেকে বেরোতে দেখোনি? গাড়িও তো ছিল না। আমি একটা গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছি সেই সকালে, আর একটা তো মাধুদি আমার বন্ধুর বিদেশ থেকে ফেরার পার্টিতে যাওয়ার জন্যে নিয়ে গিয়েছিল? তবে মাজি কীসেই বা গেল? তার জামাকাপড় তো সবই ঘরে রয়েছে—তবে কোথায় গেল?

মতিয়াই প্রথমে কথা বলল, দিদি বাইরে যাওয়ার পর মাজি আমাদের বললে তোরা নীচের ঘরের সদর দরজা বন্ধ করে দিয়ে কিচেন রুমে চলে যা। আমিও ঠিক তাই করলাম। হঠাৎ আমাদের পেছন দরজায় টকটক আওয়াজ। তাকিয়ে দেখি একটি ভিখারি কিসিমকা আদমি।

কাকে চাই?

একটা স্পেশাল পার্সেল আছে। এসেছে একটা বিলিতি কোম্পানি থেকে। মিসেস সেনের পার্সেল।

বুড়ি আম্মা লোকটার কথা শুনে ওপরে গেল। মাজিকে বলল, একটা লোক এসেছে পার্সেল নিয়ে তার জন্যে। মাজি বলে দিল, তোমরা নিয়ে নাও।

পার্সেলটা নিয়ে নিলাম লোকটার কাছ থেকে। মনে হল কোনও নামকরা সেন্ট হবে। তাই ছোট কাঠের বাক্সটা আমরা খুব ঝাঁকাতে লাগলাম।

এমনসময় মাজি জানতে চাইলেন কীসের পার্সেল এসেছে।

তখন রাত ক'টা? মাধুদি জানতে চাইল।

বড় জোর আটটা।—বুড়ি আম্মা বলল।—মতিয়া পার্সেলটা নিয়ে মাজির ঘরে দিয়ে এল।

তারপর সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে আসতে না আসতেই মাজির বীভৎস এক ভয়ার্ত চিৎকার। আবার দৌড়ে গিয়ে দেখে সুনীতা দেবীজির ঘর ভেতর থেকে বন্ধ। ভেতরে কীসের যেন দাপাদাপিব শব্দ। জিনিসপত্র ভাঙার শব্দ। আবার চিৎকার।

মাজি! মাজি!—মতিয়া চেঁচায় দরজা খুলে দেওয়ার জন্যে।

ভেতর থেকে গলা চেঁচিয়ে ওঠে, যা, নিজের কাজে যা! আমাকে এখন জ্বালাস নে।

মতিয়া নীচে নেমে এসে বুড়ি আম্মাকে মাজির রাগের কথা বলল। বুড়ি আম্মা বলল, রাগিস না মতিয়া। দেবীজির বোধহয় মেজাজটা ভালো নেই। দেখিস না, আজকাল রাতে মদ খেয়ে কীভাবে বাড়ি ফেরে। আমার তো ভয়ই করে। আবার নিজে গাড়ি চালায়। কী হবে জানি না বাপু। একটা লেড়কা লেড়কি থাকলে এসব কিছুই হয় না। তা কী হবার জো আছে। ডাইনটা সবসময়েই বাবুজিকে আগলে রেখেছে।

কে ডাইন?—ঘটনার মাঝে মাধুদি জানতে চাইল রাগতস্বরে।

মতিয়া বুঝল বেফাঁস কথা বলা হয়ে গেছে। সামনেই বুড়ি আম্মা ছিল। সে তাড়াতাড়ি বলল, আমি সেই মোটা নার্সটার কথা বলছিলাম।

বাজে কথা শোনার সময় নেই। বলো, তারপর কী হল?—অমিতেশ প্রায় ধমকে উঠল।

মতিয়া বলতে শুরু করে : আমি বললাম, চলো না, দেখে আসি। মাজি পড়ে গেল না তো? যেমনভাবে চেঁচিয়ে উঠেছে। আমরা দুজনে আবার সিঁড়ি বেয়ে দরজায় ধাক্কা দিলাম। কোনও সাড়া নেই। জোরে ঠেলা দিতেই দরজা খুলে গেল। ঘরের ভেতর জিনিসপত্র লন্ডভন্ড। দেবীজি কোথাও নেই। চেঁচিয়ে ডাকলাম, মাজি! মাজি! না, কোথাও নেই। বুড়ি আম্মাও ডাকল কয়েকবার। বাথরুম, দিদিজির ঘর, আপনার ঘরও দেখলাম। কোথাও না পেয়ে ভয়ে আমাদের গলা শুকিয়ে কাঠ।

মাধুদির চোখের সামনে ভাসতে লাগল মতিয়ার কথাগুলো।

অত রাতে বিরাট বাড়িতে সুনীতার অনুপস্থিতিতে ওরা দুজনে ভীষণ ভয় পেয়েছে। মতিয়া আর বুড়ি আম্মা দুজনে হাত ধরাধরি করে দোতলার সব ঘরেই খুঁজল : মাজি! মাজি!—প্রতিবাব ওদের গলার স্বর ভয়ে বিকল হয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি ওরা ঘর-বারান্দার সমস্ত আলো জ্বেলে দিল।

দাঁড়াও। কার পায়ের শব্দ যেন শোনা যাচ্ছে।—বুড়ি আম্মা থমকে গেল।

কোথায় শব্দ? ও তোমার মনের ভুল।

কী জানি বাপু! বাবুজি আর দিদিজি তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরলে বাঁচা যায়। মাজির রকমসকম আজ ক'দিনই যেন অদ্ভুত লাগছিল। আত্মহত্যা করেনি তো?

ও মা!—নাকি সুরে চেঁচিয়ে ওঠে মতিয়া।—মরলে তো আমরা লাশ দেখতে পেতাম। আচ্ছা, ওই লোকটাই বা এত রাতে কীসের পার্সেল দিয়ে গেল? চল তো, সেটাই খুঁজে দেখি।

আবার ওরা সুনীতার ঘরে এল। না, কোথাও খুঁজে পেল না সেই পার্সেল বা কোনও বাক্স। ওয়ার্ডরোবের পাল্লা খোলা। শাড়ি, ব্লাউজ, জামা, স্ল্যাক্স—সবই সাজানো। এমনকী টেবিলের ওপর বাইরে বেরোনোর ব্যাগটাও রয়েছে। শুধু কালো রঙের মাঝারি সাইজের ভ্যানিটি ব্যাগটা নেই।

তাড়াতাড়ি ওরা নীচে রান্নাঘরে ফিরে এল।

কোথায় যেতে পারে মাজি? কারণ বাইরে বেরোতে হলে তো আমাদের সামনে দিয়েই যেতে হবে। বাবুজিকে হাসপাতালে ফোন করে দিই।—সিঁড়ির নীচে টেলিফোনটা তুলতে গিয়ে দেখে, টেলিফোনের তার কাটা। সর্বনাশ! দুজনে ভয়ে জড়াজড়ি করে বসে রইল সেই থেকে।

মাধুদি, মালবিকার ছবিটা কার আঁকা বলে তোমার মনে হয়?

কেন? সুনীতা ছাড়া আর কে আঁকবে?

এত রাতেও যখন সুনীতা ফিরল না, তখন আমার কী মনে হচ্ছে জানো? ও কোথাও যায়নি। হয়তো আত্মহত্যা করেছে।

কী বলছ তুমি?—মাধুদি নতুন করে ভয় পায়। পনেরো বছর সুনীতা এ-বাড়িতে পাশাপাশি রয়েছে। কোনওদিনই তো মনে হয়নি ও অসুখী। তবে মাস ছয়েক ওর ব্যবহারটা যেন কেমন-কেমন। কথায়-কথায় অল্পেতে রেগে ওঠে। প্রায়ই অন্যমনস্ক থাকে। এমনকী পার্টিতেও নাচতে-নাচতে স্টেপিং-এ ভুল হয়ে যায়। কতদিন মিঃ বটব্যাল ও মিঃ কাপুর বলে উঠেছেন, কী হল মিসেস সেন? আপনার শরীর ভালো না?

মতিয়া।—অমিতেশের চিৎকারে তাল কেটে যায়।

জি বাবুজি।

একটা গ্লাস আর হুইস্কির বোতলটা নিয়ে আয়।

কী বলছ অমি? তোমার না মদ খাওয়া বারণ।—মাধুদি বলে।

ছেলেমানুষি কোরো না মাধুদি। আমার বয়েস এখন প্রায় চল্লিশ। আর ভালো লাগে না সবসময়ে তোমার এই খবরদারি। আমাকে একটু একা থাকতে দাও।

মাধুদি অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। কিছুক্ষণ পর বলে, পুলিশে খবর দেবে না? তুমিই তো পুলিশে খবর দেওয়ার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলে। বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনের বাড়িতেও যেতে পারে। সেখানে খোঁজ নেবে না?

কী করে খোঁজ নেব? টেলিফোনের তার তো কাটা। তা ছাড়া শুনছ না, একটা রহস্যময় লোক এসে একটা পার্সেল দিয়ে গেল, সুনীতা ভয়ে পেয়ে চেঁচাল, টেলিফোনের তার কাটা, আর তারপরই সুনীতা একদম হাওয়া। নিশ্চয়ই এ কোনও ষড়যন্ত্র অথবা—।

কী অথবা? বলো, থামলে কেন?

অথবা কোনও কিছুতে ভয় পেয়ে পালিয়ে আত্মহত্যা করতে যায়নি তো?

দূর থেকে ভেসে আসা সমুদ্রের চাপা গর্জনের মতো অমিতেশের কথাগুলো মাধুদির কানে বাজতে লাগল। হতেও পারে তাই।

মানুষের মন বিচিত্র, মাধুদি। এ-এক গহন বনের মতো। অন্ধকার, কালো, শব্দহীন। অসংখ্য ছোট-ছোট রাস্তা সেই জঙ্গলের ভেতর দিয়ে এলোমেলো ছড়িয়ে রয়েছে। কিন্তু এত অন্ধকার সেখানে যে, কোনও পথই চিনতে পারা যায় না। হঠাৎ যদি কোনও একটা হিংস্র জানোয়ার সেই আঁধার থেকে বেরিয়ে আসে, তখনই বোঝা যায় যে, ওদিকে কোনও পথের নিশানা আছে। বহু বিচিত্র শক্তি আমাদের মনের ভেতর খেলা করে। কখন যে কোন শক্তি আরেকটাকে দাবিয়ে দিয়ে ওপরে উঠে আসবে, কেউ বলতে পারে না। মনের অসংখ্য পথে চলতে-চলতে কখনও যায় পথটা হারিয়ে। তখন পুরোনো পথ খুঁজে না পেয়েই সব কেমন গুলিয়ে যায়...আর তখনই হয়তো আত্মহত্যার নেশায় পায়।

মাধুদি কিছুক্ষণ হাঁ করে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। কার জন্য কান্না পেল নিজেই বুঝতে পারল না মাধুদি। সুনীতার জন্যে? অমিতেশের জন্যে? চোখের জলে আশ্চর্য রকমের নরম হয়ে গেল মাধুদির স্বর, তুমি তাহলে গাড়িটা নিয়ে পুলিশে খবর দাও।

সেই ভালো।—অমিতেশ উঠে দাঁড়ায়। ঘড়িতে রাত প্রায় তিনটে।

আমার স্ত্রী রাত আটটার পর থেকেই নিখোঁজ।

সে কি ডাঃ সেন। কী ব্যাপার, ঝগড়াঝাটি করেছিলেন নাকি?—হাসতে লাগলেন পুলিশ অফিসারটি। প্রতিদিন হাজারটা নিরুদ্দেশের খবর শুনে ওঁরা অভ্যস্ত। তার ওপর ডাঃ সেনদের মতো

আপাব ক্লাস এলিটদের জীবনে এই ধরনের ব্যাপার তো প্রায়ই তাঁর নজরে আসে। শেষ পর্যন্ত দেখা যায় নেহাতই দাম্পত্যকলহের ব্যাপার।

আমার মনে হচ্ছে, আমার স্ত্রীর কোনও অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। তা ছাড়া কিছুকাল ধরে ও নিউরোসিসে ভুগছিল।

বলুন তো ব্যাপারটা।—কাগজ কলম হাতে নিলেন পুলিশ অফিসার।

আদ্যোপান্ত ব্যাপারটা বলে গেল অমিতেশ। বলা শেষ হলে জিগ্যেস করল, আমি একটা টেলিফোন করতে পারি? ডায়াল করল ৩৯৯।

আমার টেলিফোনের তারটা কেটে গেছে। দয়া করে তাড়াতাড়ি লোক পাঠিয়ে দিন। ১৩২২ নম্বর ফিল রোড। থ্যাঙ্ক ইউ।

কিন্তু এত রাতে কোন ইনভেস্টিগেটিং অফিসারকে পাঠাই বলুন তো?—পুলিশ অফিসারটি বেশ সমস্যায় পড়েছেন বলে মনে হল।

কেন, আমি তো রয়েছি।—ঘরের কোণে ইজিচেয়ারে শুয়ে রয়েছেন এক ভদ্রলোক। চোখের ওপর আলো আড়াল কবা রুমাল।

তুমি কি জেগে আছ নাকি। তা ছাড়া তোমার তো কাল অফ ডে।

তা হোক সমীর।—বলে ধীরে-ধীরে উঠে দাঁড়ালেন ভদ্রলোকটি।

কাছে এসে বললেন ডাঃ সেনের দিকে তাকিয়ে, আমাকে আপনি চিনতে পারছেন না ঠিকই, কিন্তু আমি আপনাকে জানি অনেকদিন থেকে। পনেরো বছর আগে আপনার প্রথম স্ত্রী মালবিকা দেবীর খুনের তদন্তের সময় আমি মিঃ মেননের সঙ্গে ছিলাম।

অ্যাঁ!—অমিতেশ একটু চমকে ওঠে।

আপনি ক্লান্ত। বাড়ি যান, আমি একটু পরেই যাচ্ছি আপনার বাসায়। সমীর, তুমি ততক্ষণ সর্বত্র ওয়ারলেসে খবর দিয়ে দাও। স্টেশন, এয়ারপোর্ট আর শহর থেকে বেরোবার আগে সব জায়গায় যেন ভালোমতো চেক করা হয়। সুনীতা দেবীর একটা ছবি পেলে ভালো হত।

আমি নিয়ে এসেছিলাম। কথায়-কথায় ভুলেই যাচ্ছিলাম।—পকেট থেকে পাসপোর্ট সাইজের ছবিটা বের করে দেয় অমিতেশ। তারপরই বাইরে যাওয়ার জন্য পা বাড়াল।

আমি না যাওয়া পর্যন্ত আপনি কোথাও যাবেন না।

যদি কোনও আর্জেন্ট কল আসে হাসপাতাল থেকে?—অমিতেশ দাঁড়ায়।

তাহলে যাবেন অবশ্য। ডক্টর'স হ্যান্ডস ক্যান সেভ এ ডাইং ম্যান।

অমিতেশ চলে যেতেই সমীর গুহ একেবারে যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল, কী ব্যাপার তোমার অজয়? কেসটা যেন তুমি ইচ্ছে করেই হাতে নিলে? বড় ঘরের কেচ্ছায় তোমার দেখি খুব ইন্টারেস্ট?

নো, ব্রাদার, নো। তুমি জানো না অনেক কিছুই। ডাঃ সেনের প্রথমা যখন মারা গেল তখন আমি মেননের আন্ডারে সামান্য একজন সাব-ইন্সপেক্টার। মালবিকা দেবীর মৃত্যুটা স্রেফ একটা অ্যাক্সিডেন্ট-কাম-ডাকাতি বলে চাপা পড়ে গেল। আমার ধারণা বরাবরই অন্য। বছর তিনেক হল আমি একটা নতুন ইনফরমারকে পেয়েছি। নাম বাবুরাম। মালবিকা দেবী যে গাড়িতে ওঠার আগেই খুন হয়েছিলেন, তাঁকে কোনও ডাকাত টাকাপয়সার লোভে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করেনি, তার প্রমাণ আমি পেয়েছি। ওই বাবুরামই সেদিনের চোর। দ্বিতীয়ত, ওই ছিল ডাঃ সেনের বর্তমান স্ত্রীর পেয়ারের চাকর। তৃতীয়ত, মালবিকাকে না দেখলে বোধহয় উনি সুনীতা দেবীকেই আগে বিয়ে করতেন।

কীসব বলছ তুমি?

বুঝলে সমীর, অজয় বোস কোনও বিষয়ে নিশ্চিত না হলে কোনও সিদ্ধান্ত নেয় না। বলতে পারো, এটা আমার জেদ। আমি পনেরো বছর আগেই ধরে নিয়েছিলাম মালবিকা মার্ডারের পিছনে

কোনও ক্রুর ষড়যন্ত্র আছে। কিন্তু কারও কোনও মোটিভ কিছু খুঁজে পাইনি। অমিতেশবাবুর এক অদ্ভুত দিদি আছেন। তাঁকেও সন্দেহ করেছিলাম, কিন্তু কোনও প্রমাণ পাইনি। ঘুরেফিবে সুনীতা দেবীকে আমার সন্দেহ হয়েছিল। কিন্তু দেখা গেল ছেলেবেলা থেকেই সুনীতা ও মালবিকা পরস্পরের অন্তরঙ্গ বন্ধু। একমাত্র অমিতেশকে নিজের কাছে পাওয়া ছাড়া আর কোনও মোটিভই ভাবা যায় না। এ ছাড়া বাবুরামের কথা একবারও সুনীতা দেবী তদন্তের সময়ে বলেননি। টাকাপয়সা সোনা-গয়না চুরি হওয়াতে পুলিশের নজর সম্পূর্ণ অন্য দিকেই ছিল। মেনন সাহেবকে এসব কথা বললে তিনি হেসেই উড়িয়ে দিতেন। বলতেন, হ্যালো, ইয়াং বয়, পুলিশের কাজটা রিয়ালিস্টিক, ওখানে নাটক নভেলের গল্প বানানো যায় না। তুমি বোধহয় খুব ডিটেকটিভ নভেল পড়ো? এইসব বলে একেবারে কেসটা শেষ পর্যন্ত চাপাই পড়ে গেল। কিন্তু আমি জানতাম, সময় একদিন আসবেই। দেখো, ভাগ্যচক্রে সেই বাবুরামই আজ আমার চেলা। সে-ই সব স্বীকারোক্তি করেছে। টাকা চুরি করেছে সে ঠিকই, কিন্তু মালবিকা দেবীকে আঘাত করার মতো সাহস তার কিশোর বয়েসে ছিল না। শুধু কোনও প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই বলেই সুনীতা দেবীকে গ্রেপ্তার করা যাচ্ছে না। কিন্তু এখন আবার শুনছি সুনীতা দেবীই নিরুদ্দেশ। এ-কেস আমিই তদন্ত করব। তুমি কেবল ইনসপেক্টর নিয়োগীকে সবসময় আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলে দাও।

বেশ। তাহলে এখুনি ডাঃ সেনের বাড়িতে চলে যাও। আমি ওয়ারলেসে সব জায়গায় ইতিমধ্যেই মেসেজ দিয়ে দিচ্ছি। তাড়াতাড়ি যাও। ওদিকে ভোর হয়ে আসছে।

অজয় বোস সমস্ত বাড়িটার আনাচকানাচ পর্যন্ত দেখে নিলেন। মাধুদি, বুড়ি আম্মা ও মতিয়ার সঙ্গেও কথা বলে ঘটনার আদ্যোপান্ত জেনে নিলেন। তারপর নীচে রান্নাঘরের কাছে বসে মতিয়াকে জিজ্ঞাসা করলেন, যে-লোকটি পার্সেল নিয়ে এসেছিল তাকে দেখলে চিনতে পারবে?

নিশ্চয়ই পারব। মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগের কথা। তা ছাড়া লোকটা আমার সঙ্গে অনেকক্ষণই তো কথা বলেছিল।

অজয়বাবু ফোলিওব্যাগ থেকে অনেকগুলি ছবি বের করলেন। আলোর নীচে সবগুলিকে সাজিয়ে রাখলেন। একটার পর একটা ছবি দেখিয়ে যেতে লাগলেন।

চিনতে পারছ?

না, এ না।

পরপর গোটা পনেরো ছবি দেখানোর পব চোখ-বসা কাঠির মতো চেহারার একটা লোকের ছবি দেখে মতিয়া চেঁচিয়ে ওঠে, এই, এই লোকটাই এসেছিল বাবুজি।

এ তো নেশাখোর লালু। তোমাদের বাড়ির কাছেই ওই বস্তিটায় থাকে। ওব পুলিশ রেকর্ড খুবই খারাপ। তুমি ঠিক বলছ মতিয়া?

হ্যাঁ, বাবুজি।—দৃঢ় স্বর মতিয়ার।

ঠিক আছে। চলুন, বাইরেটা এবার দেখে আসি।—ইন্সপেক্টর মিঃ নিয়োগী উঠে দাঁড়ালেন।

মাধুদি বললেন, অমির একটা আর্জেন্ট কল ছিল, ওকে চলে যেতে হয়েছে। চলুন, আমিই নিয়ে যাচ্ছি আপনাদের।

সে কী। দিস ইজ ভেরি ব্যাড। যাওয়ার আগে আমাদের একটু বলে যাওয়া তো উচিত ছিল। এত সকালে আর্জেন্ট কল। স্ট্রেঞ্জ।

সদর দরজা পেরিয়ে সবাই বাইরে এলেন। মেন গেট পর্যন্ত পাথর বিছানো রাস্তা। দু-ধারে কেয়ারি করা ফুলের বাগান। একটু দূরে সবুজ গালিচা, নরম ঘাসের লন। ভোরের রোদে গলে যাচ্ছে যেন। এক পাশে টেনিস কোর্ট। লন ঘিরে পামগাছের সারি। একেবারে কোণে নীল জলে

টলমল সুইমিং পুল। পুলের এক পাশে কাপড় ছাড়ার ছোট একটা ঘর। পাশে একটা টেবিলে বিদেশি পানীয়ের বোতল, ডিক্যান্টার, গ্লাসের বাহার।

দেখতে-দেখতে অবাক লাগছিল অজয় বোসের। এত সুখ, এত সমৃদ্ধি, এত প্রাচুর্য—তবুও তার নীচে কত কান্না, কত দীর্ঘশ্বাস, আর কত বঞ্চনার গোপন যন্ত্রণা।

জলের ওপর ওটা কী ভাসছে?—একটি সিপাই হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে। সঙ্গে-সঙ্গে দৌড়ে যান সবাই সেদিকে। কাছে গিয়ে দেখেন অজয়, একটি নারীদেহ জলে ডুবে ফেঁপে ফুলে ভাসছে!

সু-নী-তা!—বাঁশির তীক্ষ্ণ আওয়াজের মতো আতঙ্কের রেশ ঝরে পড়ল মাধুদির গলায়।—ওই তো সুনীতা! শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যাই করল! হা ভগবান।

তাড়াতাড়ি জল থেকে টেনে এনে পাড়ে রাখা হল মৃতদেহটিকে। সুনীতার মৃতদেহ। একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন অজয় বোস। পরনের পোশাকটি একটু অস্বাভাবিক। শরীরের ওপরে ছোট হাতকাটা, পেটকাটা জামরঙের ব্লাউজ। নীচের দিকে ছোট একটা শর্ট পরা। সাঁতার কাটতে হলে এরকম অদ্ভুত পোশাক পরবে কেন? মুখের কাছে নাকটা নিয়ে গেলেন। হ্যাঁ, মদের গন্ধ। হয়তো মেন্টাল ডিপ্রেশনে ভুগছিল। তারপর মদ খেয়ে নেশার ঝোঁকে সাঁতারের অর্ধেকটা পোশাক পরেই পুলে নেমে পড়েছিল। পরে হয়তো আর হুঁশ ফেরেনি, কিংবা সাঁতার কাটতে-কাটতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। তারপরই দম বন্ধ হয়ে মৃত্যু।

ব্লাউজের ভেতর থেকে একটি রেক্সিনের ছোট্ট ব্যাগ বেরিয়ে পড়ল। মিঃ নিয়োগী রুমাল দিয়ে জড়িয়ে ধরে সন্তর্পণে ছোট চেনটা ধরে টান দিতেই এক টুকরো কাগজ গড়িয়ে পড়ল।

অজয় বোস কাগজটা খুলে ফেললেন। তাতে লেখা : আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়। আমার মানসিক শান্তি নেই। আমি ...আমি....।

মৃতদেহটা ময়না তদন্তে পাঠিয়ে দিয়ে ইন্সপেক্টর নিয়োগী নিজের চেয়ারে এসে বসলেন, জানেন মিঃ বোস, আমার ধারণাটা ছিল কোনও সেনসেশনাল কেস হবে। আপনার সঙ্গে থাকাও রীতিমতো ভাগ্যের দরকার। কিন্তু শেষকালে একটা সাধারণ সুইসাইড কেস।

আপনি কী ভেবেছিলেন?

আমি ভেবেছিলাম মিসেস সেনের চেহারা তো খারাপ নয়, বরং ফিগারটা যে-কোনও ফিল্ম আর্টিস্টেরও হিংসার ব্যাপার। হয়তো কেউ কিডন্যাপ করেছে। মানে, আরও কিছু থ্রিলিং ব্যাপার, এই আর কী। জানেনই তো, মাঝেমধ্যে এরকম সেনসেশনাল কেস না পেলে দিনরাত চোর-পকেটমার নিয়ে দিন কাটাতে একঘেয়েমি আসে, তাই না?

ডাঃ সেনকে খবর পাঠিয়েছেন তো?

খবর পাঠানো হয়েছে অনেক আগেই। এমনকী ওঁর সঙ্গে ফোনে কথাও বলেছি। ব্লাউজের মধ্যে পাওয়া ব্যাগটার ভেতরের কাগজের লেখাটা সুনীতারই। তবে লেখার ধরনটা এলোমেলো আর বড্ড বেশি তাড়াতাড়ি লেখা। অমিতেশবাবুর দিদি কিন্তু বললেন যে, লেখাটায় সুনীতার লেখার ধাঁচ আছে ঠিকই, কিন্তু একটু অন্যরকম। তবে আত্মহত্যার আগে মানুষের মনে কোনও উন্মাদনা জাগে বোধহয়। তাই মানসিক বিকৃতিতে লেখাটাও একটু-আধটু পালটে যেতে পারে।

কাউকে পাঠিয়ে ওদের বাড়ি থেকে সুনীতা দেবীর লেখার কিছু স্পেসিমেন আনিয়ে এই লেখাটা সমেত হস্তরেখাবিশারদ মিঃ কৃষ্ণানের কাছে পাঠিয়ে দিন। যদি হাতের লেখা এক না হয়, তবে অন্যভাবে ভাবতে হবে। না হলে—।

না হলে আত্মহত্যাই ধরতে হবে। আমার মনে হয় কী জানেন, সুনীতা দেবী হয়তো বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর স্বামী তাঁর অপরাধের কথা জানতে পেরেছেন। না হলে গত ছ'মাস ধরে তাঁর

ব্যবহার সবার কাছেই খারাপ লাগত কেন—সবসময় অন্যমনস্ক ভাব, রাস্তাতেও নাকি দুবার দুর্ঘটনার হাত থেকে বেঁচে গেছেন। সেই মানসিক হতাশারই চরম ফল আত্মহত্যা।

হতে পারে। আচ্ছা, এখন তবে উঠি। কাল সকালের মধ্যেই করোনারের রিপোর্ট আর মিঃ কৃষ্ণানের হাতের লেখার মালিকানার ফয়সালাটা পাঠিয়ে দেবেন কিন্তু!

করোনারের রিপোর্ট ও হস্তলেখাবিশারদ মিঃ কৃষ্ণানের রিপোর্ট স্থির করল নেশার ঘোরে আত্মহত্যা করার উদ্দেশ্যেই মিসেস সুনীতা সেন সুইমিং পুলের জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন এবং জলে ডুবে মারা গেছেন।

অনেকেই ভাবল সুনীতা দেবীর মৃত্যুরহস্যের সমাপ্তি হল। কিন্তু তিন-চার দিন পর বাবুরাম এসে যদি লালুর মৃত্যুসংবাদ না জানাত, তাহলে হয়তো সবার মতোই অজয় বোসও এ-কাহিনির পরিসমাপ্তি টেনে দিতেন।

তুই ঠিক বলছিস, লালু মান্না মারা গেছে!

হ্যাঁ, স্যার। কোনও খবরের আশায় আগেই আমি সেই কাফেতে গিয়েছিলাম। গিয়ে দেখি খুব ভিড়। কী ব্যাপার? শুনলাম কিছুক্ষণ আগে ওখানে লালু সেই বাজে মেয়ে সুখীকে নিয়ে মদ খেতে গিয়েছিল। চেয়ারে বসে বকবক করতে-করতেই হঠাৎ লোকটা টেঁসে গেল। থানার লোকজনকেও দেখলাম। মড়া পোস্টমর্টেমে চলে গেছে।

চল তো, দেখে আসি।—অজয় বোস তাড়াতাড়ি মর্গের দিকে রওনা হলেন।

পুলিশ সার্জন মিঃ পাকড়াশী ওঁকে দেখে চেঁচিয়ে উঠলেন, আরে মিঃ বোস যে! ব্যাপার কী?

কিচ্ছু না! লালুর অটোপ্সির ফল কী?

অত্যধিক মাত্রায় আফিম সেবনই মৃত্যুর কারণ। লোকটা নাকি নামকরা গুন্ডা ও নেশাখোর। নেশার মাত্রা বোধহয় আজ একটু বেশি হয়েছে। ব্যস! শুনলাম ওর সঙ্গে নাকি একটি বাজে মেয়েও ছিল। নেশার ঘোরে আফিমের মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছে, আর তার ফলেই মৃত্যু! কিন্তু সামান্য একটা গুন্ডার মৃত্যুতে আপনি এত চিন্তিত কেন?

সে-কথা পরে বলব মিঃ পাকড়াশী।—অজয় বোস আর দাঁড়ালেন না। তাঁর নিজের হাত নিজেরই কামড়াতে ইচ্ছে করছে। যে-মুহূর্তে মতিয়া লালুর ছবি দেখে শনাক্ত করল, সেইদিনই লালুকে থানায় ধরে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করা উচিত ছিল। কীসের পার্সেল সে অত রাতে মিসেস সেনের বাড়িতে দিতে গিয়েছিল? কে-ই বা তাকে পাঠিয়েছিল? সব গোলমাল করে দিল সুনীতা দেবীর চিঠিটা। 'আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়।' এই ক'টি কথা আবার সব গুলিয়ে দিল। কিন্তু হস্তলেখা-বিশারদের রিপোর্টও তো বলল যে, ওই লেখাটা সুনীতা দেবীর অন্য লেখার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। তবে? তবে? তিনি কি সুনীতা দেবীর আগের হাতের লেখা দেখেছেন? ডাঃ সেনের বাড়ি থেকে যে-লেখাগুলো সুনীতা দেবীর স্পেসিমেন বলে দেওয়া হয়েছে, তা তো অন্যলোকের লেখাও হতে পারে। কে লিখতে পারে? মাধুদি? বুড়ি আম্মার গোপন সাক্ষীতে বোঝা গেল অমিতেশবাবু সবসময়েই মাধুদির ছায়ার বেড়াজালে আটকে থাকতেন। এমনও তো হতে পারে, মাধুদিই অস্বাভাবিক হিংসায় কোনওভাবে সুনীতাকে আত্মহত্যা করতে বাধ্য করেছে। তবু অজয় বোসের স্পেসিমেন লেখাটা মিলিয়ে দেখা উচিত ছিল।

উত্তেজনায় অজয় বোসের আঙুলগুলো ছটফট করতে থাকে।

লালুর মৃত্যুর সঙ্গে নিশ্চয়ই সুনীতা দেবীর আত্মহত্যার কোনও লিংক রয়েছে।

তাড়াতাড়ি বাবুরামকে ডেকে তিনি বললেন, সুখীর ঠিকানা জোগাড় করে তাকে খুঁজে বের করতে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সুখীকে নিয়ে হাজির হল বাবুরাম। নিজের বাড়ির ভেতর ঘরে নিয়ে সুখীকে বসাল। কোনও নিষিদ্ধ পল্লীর মেয়ে সুখী। বয়স প্রায় পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ হবে। চোখে-মুখে অনাচারের চিহ্ন। অজয়কে দেখে ভয়ে একেবারে কুঁকড়ে গেল।

ভয় নেই। যা জিগ্যেস করব, তাব ঠিক-ঠিক জবাব দেবে। লালুকে কতদিন থেকে জানো?

হুজুর, বেশি দিন না, বছর দুয়েক। আমাদের পাড়ায় ওর ঘাঁটি ছিল। একদিন রাতে আমার ঘরে কোনও লোক না আসায় চুপচাপ রাস্তায় দাঁড়িয়েছিলাম, হঠাৎ দেখি লালু রাস্তার কোণে পড়ে গিয়ে দাঁত-মুখ খিঁচোচ্ছে। শরীরটা কীরকম কুঁচকে-কুঁচকে উঠছে। নিয়ে এলাম নিজের ঘরে। বলল, একটু আফিম দাও। আমাদের বুড়ি ঝিটা আফিম খেত। তার কাছ থেকে একটু আফিম নিয়ে ওর মুখে দিতে অল্পক্ষণের মধ্যেই লোকটা সুস্থ হয়ে উঠল। সেই থেকেই ও আমার বাঁধা মানুষ।

তোকে মাসে কত করে দিত?

কী আর দেবে? উলটে মাঝে-মাঝে আমাকেই দিতে হত। ওর মনটা বড় সাদা ছিল গো বাবুজি।—বলে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে সুখী কাঁদতে লাগল।

লালু কিছুদিন আগেও তোকে কিছু দেয়নি?

তিন-চারদিন আগে হঠাৎ এসে সন্ধেবেলায় বললে, আব ভাবনা নেই সুখী, এবাব থেকে মাসে-মাসে তোকে কিছু টাকা দিতে পারব। এই নে, এটা খোল তো দেখি। বলে একটা ছোট কাঠেব বাক্স দিল।

কী দিল? কাঠের বাক্স?—অজয় চমকে উঠলেন।

হাঁ হুজুর। খুলে দেখি কাগজের মোড়কে কী যেন একটা ছোট জিনিস। পাতলা কাগজটা খুলে দেখি মাথার চুল আর একটা ছোট্ট আঙুল। ভয়ে তাড়াতাড়ি আবাব বন্ধ করে দিয়ে বললাম, এসব কোত্থেকে আনলি?

লালু শুধু বলল, তা দিয়ে তোর দরকার কী? আমাদের পাড়ায় এক মেমসাবকে রাত আটটার পরে গিয়ে যে-কোনও সময়ে এটা দিয়ে আসতে হবে। তার জন্যেই কুড়ি টাকা বকশিশ পেয়েছি। আর বাবুকে বলেছি, আপনি যা বলবেন তাই করব। এবার তো বাবুকে ভয় দেখিয়েই টাকা নিয়ে আসব।

তারপর কী হল?

পরে দেখলাম, ওর ভেতরে একটা সুন্দর কাগজে লেখা চিঠিও ছিল। সেটা বাক্সর ভেতবে রাখতে ভুলে গেছি।

চিঠিটা কোথায়?

আমার বাড়িতে বিছানার নীচে আছে।

মারা যাওয়ার দিন তোমার সঙ্গে কোথায় দেখা হল লালুর?

ওই 'বারে'ই। ক'দিনই বাড়ি আসে আব আমাকে দশ টাকার নোট ছুড়ে-ছুড়ে দেয়। আমি ভয়েতে জিগ্যেস করি, লালু, এত টাকা কোথায় পাচ্ছিস তুই? চুরি করিস না কি? লালু গালাগালি দিত। বলত, চুরি করব কেন? এ সেই বাবু দিচ্ছে। বলেছে রোজ দশটাকা করে দেবে। এমনকী দু-তিন দিন আফিমও কিনে দিয়েছে তাকে। আর বাবু নাকি বলেছে, এবার থেকে তোর ওষুধেরও পয়সা লাগবে না। যখন খুশি গেলেই বাড়িসুদ্ধ সবাইয়ের চিকিৎসা করবে বিনেপয়সায়। সারাজীবন। বুঝলি সুখী, তোর আমার দিন ফিরল।

এই বাবুটি কি ডাক্তার? তুমি তাকে দেখেছ?

তা আমি বলতে পারব না। তবে আমাকে বাবুর কাছে নিয়ে যাবে বলে ঠিক ছিল। কিন্তু এমন নেশাখোর লোকটা, ভাগ্য ফিরলে হবে কী, শেষ পর্যন্ত আফিমই লোকটাকে মারল।

সুখীর বাড়ি থেকে বাক্সের ভেতর পাওয়া চিঠিটা দেখে অনেক কিছু পরিষ্কার হয়ে গেল। লালু মারা যাওয়ার চার-পাঁচ দিন আগের একটা ওষুধের শিশি নিয়ে এসে তার গায়ের লেবেল থেকে ফার্মেসির নাম আর ক্রমিক সংখ্যাটি টুকে নিয়ে অজয় ইন্সপেক্টর নিয়োগীকে পাঠিয়ে দিলেন। ওষুধের প্রেসক্রিপশনটায় কী ছিল আর কোন ডাক্তারেব তা যেন ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই তাঁকে জানিয়ে দেওয়া হয়।

ঘরে পায়চারি করছেন অজয় বোস। পাইপে ধোঁয়া ছাড়ছেন মাঝে-মাঝে। কিছুতেই সব সূত্রগুলো এক জায়গায় এনে মেলাতে পারছেন না। এমনও হতে পারে, সুনীতা দেবী আত্মহত্যা করেছেন ঠিকই, কিন্তু কেউ তাঁকে দিনের পর দিন মালবিকা দেবীর হত্যার ব্যাপারটা জানিয়ে ভয় দেখিয়েছে। এমন কেউ নিশ্চয়ই আছে যাব কাছে নিশ্চিত প্রমাণ আছে যে, ডাঃ অমিতেশ সেনের প্রথম স্ত্রী মালবিকার মৃত্যুর জন্য সুনীতা দেবীই দায়ী। সে গত কয়েক বছর ধরে শিকারি বেড়ালের মতো তার শিকারকে নিয়ে খেলায় মেতেছে। খেলতে-খেলতে ভয়ে ও হতাশায় যখন সুনীতা দেবীর মন ক্লান্ত, তখনই চরম হতাশায় আত্মহত্যার পথই একমাত্র শান্তির পথ ভেবে নিয়ে সেই পথেই তিনি পা বাড়িয়েছেন। কিন্তু কে সে? লালুকেই বা কে টাকা দিচ্ছিল? লালুর মৃত্যু কি স্বাভাবিক? কে এই ডাক্তার? এই ডাক্তার কি অমিতেশ সেন? এত বড় ডাক্তার যার ফি বত্রিশ টাকা, সে নিয়মিত চিকিৎসা করছে একটি বস্তির গুন্ডাকে। সবই সম্ভব এ জগতে। ডাঃ সেনের দিদি এর পিছনে নেই তো? এমনও হতে পারে, ওরা দুজনে মিলে দিনের পব দিন (বুড়ি আম্মা ডাঃ সেনের মাধুদিকে 'ডাইন' বলে ভাবে) সুকৌশলে মানসিক যন্ত্রণার বেড়াজাল সৃষ্টি করে সুনীতা দেবীকে উন্মাদ করে দিয়েছিল।

শেষ পর্যন্ত কাটা আঙুল পার্সেলে পাঠিয়েছিল শুধু ভয়টাকেই বাড়াতে। বাক্সের ভেতরে নীল কাগজে লেখা চিঠিটাই বা কার?

ক্রিং-ক্রিং!...হ্যালো, কে?...নিয়োগী?...কী খবর?

অ্যাঁ কী বললেন? আর ইউ শিয়োর?—উত্তেজনায় গলা কাঁপতে থাকে অজয় বোসের ঃ আপনি হাসপাতালে গিয়ে লালুর ছবিটা ডাঃ সেনকে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করুন, লালুকে ডাঃ সেন চেনেন কি না? তারপর চলে যান তাঁর দিদির কাছে, তাঁকেও দেখান। সুখীর বাড়ির চিঠিটাও দেখাবেন। আর সুনীতা দেবীর ঘর সার্চ করে তাঁর হাতের লেখা কোনও কাগজ আনা চাই-ই। ডাঃ সেনের লেখা জোগাড় করতে কোনও কষ্ট হবে না। এ সমস্ত রিপোর্টই আজ সন্ধের মধ্যে চাই।

তাই হবে।—ওপাশ থেকে মিঃ নিয়োগী ফোন ছেড়ে দিলেন।

সারা দুপুর আজ কোথাও বেরোননি অজয় বোস। মাঝে-মাঝে ইন্সপেক্টর নিয়োগীকে ফোন করে যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করছেন। কিন্তু কিছুতেই তাঁকে ফোনে পাচ্ছেন না। সন্ধে হতে চলল, এখনও পাকা খবর কিছুই পাওয়া গেল না। সবচেয়ে বড় কথা, তেমন কোনও প্রমাণ বা সাক্ষী নেই যাতে সত্যিকারের খুনি আসামিকে ধরা যায়। সুনীতা দেবীর আত্মহত্যায় (যদি আত্মহত্যাই ধরে নেওয়া যায়) পিছনে সুপরিকল্পিত এক ষড়যন্ত্র আছেই। লালুর মৃত্যুই তাঁকে ঠিক পথ দেখিয়েছে। কিন্তু...।

মিঃ বোস! মিঃ বোস!—উত্তেজিতভাবে ঘরে ঢোকেন মিঃ নিয়োগী। আপনার কথামতো আগে ডাঃ সেনের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করি, কিন্তু তাঁকে কোথাও না পেয়ে তাঁর দিদির সঙ্গে দেখা করি। অমিতেশবাবুর মাধুদি যখন আমার কাছে এলেন, আমি প্রথমে তাঁকে চিনতেই পারিনি।

সে কী! এই তো মাত্র চারদিন আগেই তাঁর জবানবন্দি নিলেন।—হাসতে-হাসতে বললেন অজয় বোস।

যা বলছি তাই। বিশ্বাস করুন, আপনি গেলেও চিনতে পারতেন না। চোখ দুটো বসা। মাথার চুল রুক্ষ, এলোমেলো। এমনকী পরনের কাপড়টাও অবিন্যস্ত। আমার সামনে যখন এলেন তখন বেশ একটু টলছেন। দোতলার সিঁড়ি বেয়ে নীচে যখন এলেন, তখন বুকের আঁচল ধুলোয়। জড়ানো স্বরে বললেন, কে? পুলিশ! আবার কেন? সুনীতার কেস তো ক্লোজড ফরএভার।

আপনাকে একটা চিঠি দেখানোর জন্যে এসেছি। দেখুন তো কার হাতের লেখা? চোখ দুটো রগড়ে নিয়ে উনি লেখাটা পড়লেন ঃ সুনীতা দেবী, সাবধান। আপনি যে মালবিকাকে দা দিয়ে কুপিয়ে মেরেছিলেন, সেই খবর আমরা জেনেছি। এবার আপনার শাস্তি, অপমান, লোকলজ্জা আর শেষকালে ফাঁসির দড়ি। শুধু দিদির জন্যে কিছু করতে পারছি না। আপনার স্বামী সব জেনেছেন।—পড়া শেষ করে চেঁচিয়ে উঠলেন, না—না—আমি কিছু জানি না। আমাকে এরা পাগল করে দেবে। হায় ভগবান।

কী হয়েছে মাধুদি? আপনি কি অসুস্থ?

কে, কে বললে মাধুদি! না—না—আমি কারও দিদি নই। মিথ্যে কথা! মিঃ নিয়োগী, আজ তিনরাত আমার ঘুম নেই। সারা বাড়ি ঘুমোয়। আর আমার স্লিপিং পিল খেয়েও ঘুম হচ্ছে না। এ কী জ্বালা! মাথাটা ছিঁড়ে যাচ্ছে। উঃ।

তবুও মিঃ নিয়োগী চাপ দিলেন, এ লেখাটা কার?

কোনও জবাব দিলেন না মাধুদি। উদাস। আনমনা। নিরুত্তাপ, বরফ।

দেখুন তো, এই লোকটাকে চেনেন কি না?—লালুর ছবিটা দেখালেন মিঃ নিয়োগী।

না। এরকম কাউকে অন্তত দেখিনি। আপনি কী খুঁজতে এসেছেন মিঃ নিয়োগী? খুনি? হাঃ-হাঃ-হাঃ। অদ্ভুতভাবে পুরুষালি গলায় হেসে উঠলেন মাধুদি ঃ আজ ক'দিন ধরেই অনবরত ফোন আসছে আমার, তারা বলছে, মাধুদি, মালবিকাকে সুনীতা খুন করেছে। আর সুনীতাকে তুমিই অমিতেশের জীবন থেকে সরিয়েছ। আমার কাছে এর প্রমাণ আছে।

এ-কথা আমাদের জানাননি কেন?

আমি জানি সুনীতার আত্মহত্যাই প্রমাণ করল, পাপের শাস্তি মৃত্যু।

সুনীতা দেবীর ঘটনা আমরা এখনও মুছে দিইনি। এ-বিষয়েও আমরা নিশ্চিত সুনীতা দেবীকে খুন করা হয়েছে। তবে আসল খুনিকে ধরা খুব কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু আপনার অনুতাপের লক্ষণ দেখে মনে হচ্ছে—' মিঃ নিয়োগীর কথা শেষ হতে না হতেই টেলিফোনের আওয়াজ এল।

ক্রিং-ক্রিং-ক্রিং!

লাইনটা ধরুন ইন্সপেক্টর। নিশ্চয়ই তারা ফোন করছে।—মাধুদি সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে চাইলেন।

দাঁড়ান। জবাবটা আপনিই দিন। আমি বাকি কথাটা শুনব।

হ্যালো।—খুব ভয়ে-ভয়ে মাধুদি রিসিভারটা তুলে ধরলেন।

আস্তে-আস্তে মাধুদির হাত থেকে রিসিভারটা নিয়ে নিজের কানের কাছে নিয়োগী ধরলেন, শুনতে পেলেন ঃ মাধুদি সাবধান। আমি জানি তুমি অমিতেশকে ভালোবাসো, তাই তাকে আর কেউ গ্রাস করুক এ তোমার পছন্দ নয়। তুমিই সুনীতাকে হত্যা করেছ। তুমিই খুনি। এখুনি পুলিশের হাতে সব প্রমাণ পাঠিয়ে দিচ্ছি।—লাইন কেটে গেল।

মাধুদি হাঁ করে ওঁর দিকে তাকিয়ে। মিঃ নিয়োগী ধীরে-ধীরে বললেন, ওরা বলল আপনি খুনি।

অ্যাঁ, না—না—আমি কিছু জানি না। আমি খুনি নই। এই নিন একটা ডায়েরি। বলেই টিপয়ের নীচে রাখা ছোট একটা পুরোনো ডায়েরি ওঁর হাতে তুলে দিলেন। ফিসফিসিয়ে আধপাগলের মতো বলতে লাগলেন, পালান। পালান।

এই পর্যন্ত বলে মিঃ নিয়োগী থামলেন। উত্তেজনায় গলার স্বর থমথম করছে।

তা হলে আপনি সত্যিই পালিয়ে এলেন? ডায়েরিটা দেখি। অমিতেশের দেখা পেলেন না? রাতে সাদা পোশাকের পুলিশ ও সশস্ত্র পুলিশ দিয়ে ওঁর গোটা বাড়িটা ঘিরে রাখুন। আর প্রতি মুহূর্তে নজর রাখুন ডাঃ সেন যেন শহর ছেড়ে না পালান।

অজয় বোস ডায়েরিটা নিয়ে নিজের শোবার ঘরে ঢুকলেন। নীলাভ রঙের ছোট্ট মেয়েলি ডায়েরি। ওপরে গোটা-গোটা করে মেয়েলি হাতের লেখা, মালবিকা সেন। পরপর কয়েকটা পাতা উলটে গেলেন। নিজের বাড়ির কথা, স্বামীর কথা, কেনাকাটা, সিনেমার কথা। নিতান্তই ঘরোয়া।

২ মার্চ

খুব বৃষ্টি হচ্ছে। ভালো লাগছে না। অমিতেশ এখনও বাড়ি আসছে না কেন? আজকাল কী যে ছেলেমানুষি করে অমি। মাধুদির সামনেই জড়িয়ে ধরে। আদর করতে চায় ফাঁক পেলেই। আমিই বোধহয় সেকেলে হয়ে গেছি।

২৮ মার্চ

মাধুদিকে আজ কী সুন্দরই না লাগছিল! সত্যি, মাধুদি এত সুন্দর, তবুও বিয়ে করছে না কেন? কেবলই বলে, ছেলে পছন্দ হয় না। আজ সুনীতা এসেছিল। দুজনে খুব খানিকটা গল্প করলাম। ও শুধু খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে অমিতেশের খবরই জানতে চাইল। অমিতেশ আমাকে কী করে আদর করে, কী ভাবে রাতে আমরা পাশাপাশি শুই, কী ভাবে অমিতেশ...ও যে কী করে এসব কথা মুখে বলে, মেয়েটার লজ্জাও নেই। আর সুনীতাকে বাড়িতে ডাকব না। এতদিন পর আমার সঙ্গে দেখা হল, অথচ আমাদের মনের কথা হল না। সুনীতা একটু পালটে গেছে যেন।

শেষ কথাটির তলায় লাল দাগ দেওয়া।

১২ এপ্রিল

আজ আমাদের পিকনিক হয়ে গেল ডায়মন্ডহারবারে। অনেকদিন পর আমরা খুব আনন্দ করলাম। মিনি, কুলদীপ, সুরিন্দর, প্রতিম ওরাও এসেছিল। সুনীতা আর অমিতেশ আজ খুব হাসাল সবাইকে। সুরিন্দর তো ঠাট্টা করেই বলল, মালবিকা, তুমি কিন্তু ভারী অন্যায় করেছ। তোমার সঙ্গে পরিচয়ের আগে আমরা সবাই জানতাম অমিতেশ সুনীতাকেই লাইফ পার্টনার করবে।

কী জানি বাপু, তবে আমাকে বিয়ে করতে গেল কেন?

এরপর প্রায় প্রত্যেক পাতাতেই কোনও না কোনওভাবে সুনীতার কথা একটু-আধটু আছেই। যেমন,

*

আজ আমরা কেনাকাটা করতে গিয়েছিলাম। সুনীতা বেশি কিছু কেনেনি। অমিতেশকে বললাম, সুনীতার জন্যে কিনে দাও না কিছু! সুনীতা খুব চালাক মেয়ে জানো তো?

সত্যিই খুব চালাক, মালবিকা। অজয় মনে-মনে ভাবলেন। পনেরো বছর পর মালবিকা দেবীকে কল্পনা করে নিতে একটু কষ্ট হল অজয়ের।

৬ জুন

কী বিশ্রী গরম ছিল সারাদিন। পাশের বাড়ির রুমা আর টুটু এসেছিল বেড়াতে। ফুলের মতো দুটি শিশু। আদর করে ওদের জ্বালাতন করেছি। সুনীতাও এসেছিল দুপুরে। সুইমিং পুলে সাঁতার কাটলাম দুজনে। ও এখনও ভালো করে সাঁতার শেখেনি। তবে আমার পাল্লায় যখন পড়েছে আর বাড়ির ভেতর যখন সুইমিং পুল আছে তখন ওকে পাকাপোক্ত সাঁতারু মেয়ে বানিয়ে তবে ছাড়ব। সামনে আমাদের মাধুদির জন্মদিন। সুনীতাকেও কিছু দিতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু সুনীতা রাজি হল না। ও জানে, অমিতেশ ওকে বেশি পছন্দ করে না। আজ ডায়েরি লিখছিলাম ওর সামনে বসেই। সুনীতার কথাও লিখে ফেললাম, কিন্তু ও জানতে পারল না।

১৮ জুন

মাধুদি আজ কী বকবকই না কবল। অমিতেশের ছেলেমানুষি নিয়ে। অমিতেশ মাধুদির চেয়ে খুব বেশি ছোট নয়, অথচ মাধুদি এমন ভাব করেন যেন মাধুদিব কাছে অমিতেশ একটা দশ-বারো বছরেব ছেলে। কী বিশ্রী লাগে।

২০ সেপ্টেম্বর

পুজো আসছে। সবাই প্ল্যান আঁটছে বাইবে যাওয়াব জন্যে। অমিতেশের নাকি যাওয়াই হবে না। বলে, ডাক্তারদের ছুটি নেই, ইচ্ছে হলে তোমার বন্ধুর সঙ্গে ওয়ালটেয়ার ঘুরে এসো।

কী বোকা। দুধের স্বাদ কি আর ঘোলে মেটে। তা ছাড়া সুনীতা আজকাল অমিতেশ সম্বন্ধে বড় বেশি খোঁজখবর নেয়। আর অমিতেশ ঠিক ততটাই বিরক্তি দেখায় সুনীতার বিষয়ে।

৩ অক্টোবর

আজ মাধুদিকে নিয়ে বেরোব ভাবছিলাম, এমন সময়ে সুনীতা এসে গেল। অমিতেশ আসতে দেরি করায় আমরা দুজনেই বেরোলাম। পার্ক স্ট্রিটের এক রেস্টুরেন্টে কফি খেলাম, নাচলাম। পরে সিনেমা দেখলাম। সুনীতার সঙ্গে কথা বলে বেশ ভালো লাগে। কত ধীর আর স্থির। কোনও ব্যাপারে মাধুদির মতো তড়বড়ে ভাব নেই।

কত ধীর আর স্থির। অজয় মনে-মনে হাসলেন। ধীরে-ধীরে, সত্যিই মালবিকাকে মেরে ফেলতে সুনীতার অনেক সময় লেগেছিল। শেষ পর্যন্ত ও নিজেও মরল আরও তিনটে জীবন বিষিয়ে দিল। কবে সুনীতা প্ল্যান করেছিল? ঠিক কোন সময় থেকে সে মালবিকার স্বামী অমিতেশকে আপনার করে পেতে চেয়েছিল? ভাবতে-ভাবতে আরও কয়েকটা তারিখের ওপর নজর পড়ে অজয়ের।

*

৬ অক্টোবর

আজ রাতে আবার সুনীতার বাড়ি এলাম। দারুণ পার্টি আছে। অল্প-অল্প ব্র্যান্ডি, হুইস্কি আর বিয়ার চলছে। আমি কোল্ড ড্রিংকস নিলাম। অমিতেশ কলে গেছে। মাধুদি তার অনেকদিনের বন্ধু রাঘবনের সঙ্গে দেখা করতে গেছে। রাঘবন এলেই মাধুদিকে ছাড়তে চায় না। অথচ সুনীতা বলে, মাধুদি কখনও কাউকে বিয়ে করবে না, কারণ অমিতেশকে ছেড়ে যেতেই পারবে না। আমার খুব অবাক লাগে কথাটায়। এটা অবশ্য ঠিক যে, মাধুদি অমিতেশকে ভীষণ ভালোবাসে, আর ওকে আঁকড়ে ধরেই জীবনটা কাটাতে চায়, কিন্তু সেটা শুধু মাত্র ততদিন যতদিন না কাউকে বিয়ে করছে সে। আমি সুনীতাকে এই কথাটা বলি, কিন্তু সুনীতা মৃদু হাসে।

আমার মনে হয় আমিই ঠিক। তুমি অমিতেশের কতটুকু জানো সুনীতা! আমি তো সবই জানি।

ইস! কত নিশ্চিন্ত ছিল মালবিকা। কোনওদিনও ওর মনে স্বামী সম্বন্ধে কোনও সংশয় দানা বাঁধেনি। এমনকী বন্ধু সুনীতার ওপর কী অগাধ বিশ্বাস। অজয়ের মনে মালবিকার এক অদৃশ্য তৃপ্তিময় মুখের ছায়া ভেসে ওঠে। ডায়েরির প্রায় সব পাতাগুলোতে পৌঁছে গেছে অজয়। কয়েকটা পাতা শেষের দিকে সাদা রয়েছে। অক্টোবরের মাঝামাঝি তো মালবিকা দেবীর অ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল। বারবার সে স্বামীর, মাধুদির আর সুনীতার গল্প করেছে ডায়েরির পাতায়-পাতায়। শিশুরা একই গল্প শুনতে ও বলতে যেমন ক্লান্তি অনুভব করে না, মালবিকারও তেমন একই সুরে বারবার আবৃত্তি কবতে দ্বিধা নেই।

৮ অক্টোবর

বিকেলে সুনীতা হঠাৎ এসেছিল। বললাম, কীরে, তুই বিয়ে করবি না? কাউকেই তোর পছন্দ হয় না? উত্তরে হঠাৎ কেমন ইমোশনাল হয়ে উঠল সুনীতা, বলল, জীবনে ভালোবেসেছি একজনকে। ছ'বছর ধরে তার আশেপাশে ঘুরছি। হয়তো সে আমাকে ভালোও বেসেছিল, কিন্তু একদিন হঠাৎ এক অচেনা মেয়েকে দেখে তাকেই বিয়ে করে বসল। ছ'বছর অপেক্ষার এই পরিণাম। সে আমাকে এখন বলে, ছ'বছর ধরে সে আমাকে শুধু ঘৃণা করেই এসেছে। বুঝলাম না ও কার কথা বলতে চাইল। ওর ছলছল দুটি চোখের দিকে তাকিয়ে আর কিছু বলিনি।

৯ অক্টোবর

কাল আমাদের বিবাহবার্ষিকী। সকালে অমিতেশ আমাকে একজোড়া নতুন বেনারসী শাড়ি এনে দিয়েছে। বিকেলের দিকে সুনীতাকে দেখাতে গেলাম। শুধু তাই নয়, একটা শাড়ি সুনীতাকে দিয়ে দিলাম। ও কিছুতেই নেবে না। বলে, আমার তো আর বিবাহবার্ষিকী নয়। অমিতেশ জানলে ভীষণ রেগে যাবে। আমি জোর করেই দিয়েছিলাম। ওর বড় ডাইনিং হলটা দেবদারু পাতা আর বেলুনে সাজিয়েছে। সন্ধের পর আলো জ্বেলে দিতেই কী সুন্দর দেখাতে লাগল। বলল, তপেশ আজ একটা পার্টি দিচ্ছে। তোর কাছে আমিই যেতাম। তুই এ বেলা থেকেই যা। একেবারে রাতে ডিনার খেয়ে চলে যাস। আমি ফোন করে একটু পরে অমিতেশ আর মাধুদিকেও আসতে বলে দিচ্ছি। আমি বললাম, দেবদারু পাতাগুলো কী সুন্দর! কোত্থেকে আনলি এ-পাতা। কেন আমাদের বাড়ির লনের শেষ কোণে ছোট্ট

দেবদারু গাছটা দেখিসনি? আমি তো নিজেই দা দিয়ে কেটে নিয়ে এসেছি। আমি বললাম, ভাই আমারও কিছু দেবদারু পাতা কাল চাই। সুনীতা হাসল, কাল কেন। আজই পার্টির শেষে যাওয়ার আগে তুই আর আমি গিয়ে কিছু পাতা কেটে আনব'খন।

এরপর ডায়েরির পাতাগুলো সাদা। অজয়ের মানসচোখে ভাসতে লাগল না-বলা দৃশ্যটি। পার্টি শেষের পরে পরিকল্পিত দৃশ্যটি।

অন্ধকারে দেবদারু গাছের পাশে দুটি সুন্দরী মেয়ে।

কী সুন্দর! কচি-কচি পাতা, দেখেছিস?

আমি নিজেই দা দিয়ে ডাল কেটেছি।

কোনও চাকরকে ডাকলেই হয়।

তাতে আনন্দ নেই, থ্রিল নেই।

অনেক রাত এখন। এত বেশি ড্রিংক করিয়েছিস তুই, বাড়ি ফিরতে পারলে হয়।

দা নিয়ে আসব?

হ্যাঁ, একটা ধারালো ছোট দা .।

সুনীতা কি তবে সেই মুহূর্তেই প্ল্যানটা করে ফেলেছিল, না অনেক ভেবেচিন্তে ওদের বিবাহ-বার্ষিকীর আগে বাড়িতে পার্টি দিয়ে দেবদারু পাতার টোপ ফেলেছিল! দা আনার একটু ছুতো তো চাই। কে জানে। সুনীতার সেই গোপন কথা জানার আজ আর কোনও উপায়ই নেই।

সুনীতা আর মালবিকা হাসছে। খানিকটা নেশার ঘোরেও। আঁচল লুটোচ্ছে দুজনের। মালবিকা বলছে ঃ বেশ মজা লাগছে। বাড়িতে গিয়ে একগাদা পাতা নিয়ে অমিতেশকে চমকে দেব।

দে, আমাকে দে। আমি কাটছি।

অন্ধকারে খুব সাবধান! লনের আলোটা জ্বেলে দে।

আলো জ্বাললে সবাই দেখলে হাসবে।

পার্টি তো শেষ। কেউ তো নেই। সুনীতা, আমার ভয় করছে।

দুর। এই দ্যাখ, কেমন করে দা ধরতে হয়।

কোথায় তুই?

মালবিকা। আমি ঠিক তোর পেছনে।

হঠাৎ অন্ধকারে দা-টি কোথায় গিয়েছিল? পনেরো বছর আগে মালবিকা দেবীর মৃত্যুটা ডাকাতির ব্যাপার বলে সম্পূর্ণ চাপা দেওয়া হয়। আর তার ফলেই সত্যিকারের ঘটনা সেদিন কেউ জানেনি। অজয় সেদিন সামান্য সাব-ইন্সপেক্টর। তার সন্দেহের সূত্র ধরে কোনও তদন্ত এগোয়নি। আজ পনেরো বছর পরে এই ডায়েরিই প্রমাণ করে দিচ্ছে সুনীতা দেবীর মোটিভ। মানুষ খুন করার একটা উদ্দেশ্য থাকতেই হবে। আজ সেই উদ্দেশ্যের যবনিকা উঠল।

কী ভাবছেন?—মিঃ নিয়োগীর কণ্ঠস্বরে চমক ভাঙে অজয়ের। চেঁচিয়ে ওঠেন, পেয়েছি। পেয়েছি।—তারপর মিঃ নিয়োগীকে জড়িয়ে ধরে লাফাতে থাকেন ঃ পনেরো বছর ধরে সূত্রের সন্ধান করেছি, কিন্তু কিছুই পাইনি। আজ ডায়েরিই প্রমাণ করল সুনীতা দেবীই তাঁর পরম অন্তরঙ্গ বন্ধু মালবিকাকে খুন করেছিলেন। আর এ-ডায়েরি থেকে অমিতেশ সেটা যেদিন জেনেছেন, তখন থেকেই সুকৌশলে চিন্তা করেছেন কী করে সুনীতা দেবীর ওপর প্রতিশোধ নিতে পারেন। ভাবতে পারেন, শহরের নামকরা ডাক্তার, যাঁর হাতে শত-শত মানুষ প্রাণ ফিরে পাচ্ছে, সেই ডাক্তারই পনেরো বছর ধরে তাঁরই স্ত্রীকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছেন? ইটস ইউনিক। আর দেরি নয়। আপনি যে করেই হোক ডাঃ সেনের সঙ্গে যোগাযোগ করে জানতে চেষ্টা করুন উনি লালু মান্নার ছবিটা দেখে চিনতে পারেন কি না। যদি না চেনার কথা বলেন তবে বুঝতে হবে ডাঃ সেন ভয় পেয়েছেন। আর যদি সহজভাবেই

চিনে নেন, তাহলে বুঝতে হবে উনি বড় রকমের অপরাধী।

মিঃ নিয়োগীর কানে-কানে আর কয়েকটি নির্দেশ দিয়ে অজয় বোস বললেন, আপনি এইভাবে সব ব্যবস্থা করুন। আমি ঠিক সময় মতোই ডাঃ সেনের বাড়িতে যাচ্ছি।

শাড়ি, ব্লাউজ, এমনকী চটিটা পর্যন্ত পায়ে দিয়ে ফুল-আঁকা নরম বালিশে শুয়ে মাধুদি। চোখ দুটি বোজা।

ওটা ওর শোবার সময় নয়। তা ছাড়া শুতে যাওয়ার আগে বরাবরই নাইট-গাউন পরে মাধুদি।—খুব আস্তে-আস্তে কথাগুলো বললেন ডাঃ সেন। যেন গলার স্বর পেলে মাধুদি জেগে উঠবে, বেডরুমে পুলিশের লোককে নিয়ে আসায় বিরক্ত হবে।

অজয় বোস বিছানার কাছে এগিয়ে গেলেন। সরু-সরু পাখির পালক-আঙুলের একটিতে কালির ছোপ। তবে কি তিনি কিছু লিখছিলেন? টেবিলের দিকে তাকালেন, ছোট্ট বিলিতি টাইম পিস, একটা টেবিল ক্যালেন্ডার (ফুটফুটে মেয়ে স্কিপিং করছে), আধখোলা ফাউন্টেন পেন, তার নিব এবং মুখ কালিতে ভেজানো। শোবার আগে টেবিলে বসে নিশ্চয়ই কিছু লিখছিলেন। হয়তো কলমে কালি ছিল না, তাই দোয়াতে কলম ডুবিয়ে-ডুবিয়ে লিখছিলেন। কেন এত তাড়াতাড়ি করছিলেন? তবে কি খুব ভয় পেয়েছিলেন? কীসের ভয়? কে ভয় দেখিয়েছে? মিঃ নিয়োগীও বললেন, মাধুদির ক'দিন ঘুম নেই। পাগলের মতো চেহারা। তবে কি তাঁকেও মানসিক বিকৃতির পর্যায়ে এনে ফেলা হয়েছিল? হ্যাড শি গন ক্রেজি? কী এত তাড়া ছিল যে, পেনে নতুন করে কালি ভরার সময় পর্যন্ত ছিল না? মাধুদি কি তাড়াতাড়ি ঘুমোতে, স্বপ্ন দেখতে, বা মরতে চেয়েছিলেন? অসংখ্য প্রশ্ন অজয়ের মনে দাপাদাপি করতে-করতে মুখ ফুটে বেরিয়ে এল, কেন? কেন?

পাশে দাঁড়ানো অমিতেশ বলল, কেন আত্মহত্যা করল মাধুদি? কারণ, সুনীতা মরার আগে একটা চিঠি লিখে রেখে গেছে। সেই চিঠিটা লুকোনো ছিল। আজ আমিই সেটাকে ওর সামনে এনে দিই। সে-চিঠিতে স্পষ্ট লেখা যে, মাধুদিই সুনীতাকে আত্মহত্যায় প্ররোচিত করেছে।

চমৎকার।—অজয় বোস হাসলেন ঃ আপনি এটা কী করলেন? চিঠিটা পেয়ে তো আমাদের জানানো উচিত ছিল। এত বড় একটা সূত্র তো আমরা পেলে বর্তে যাই।

মাধুদি আমার কাছে এসে বলল, অমি, আজ ক'টা দিনরাত কোনও ঘুমের ওষুধেই ঘুম আসছে না। কী করি বল তো? আমি তো পাগল হয়ে যাব। তখন আমি বললাম, সুনীতাকে লেখা তোমার চিঠিটার ক'টা লাইন কেটে দাও, না হলে পুলিশ ওটা পড়লেই তোমাকেই সুনীতার আত্মহত্যার জন্যে দায়ী করবে। তারপরে ফরেন মেক-এর ভালো স্লিপিং পিলের নাম লিখে দিচ্ছি—কাউকে দিয়ে আনিয়ে নাও। বেশ আরামে ঘুমোতে পারবে। এই দেখুন সেই চিঠি।

অজয় মাধুদির চিঠিটা পড়তে লাগলেন ঃ

> *সুনীতা, তুমি আজ নেই। এ-চিঠি লেখার অর্থ নিজের মনটা পরিষ্কার করা। কী সুন্দর আমাদের সংসার ছিল বলো তো? তুমি, আমি আর অমিতেশ। তোমার ছেলেপুলের অভাবটা অবশ্য আমিও অনুভব করতাম। কিন্তু এসব কী হল বলো তো? পুলিশ অফিসার অজয় বোস আর মিঃ নিয়োগী প্রায়ই আসছেন। ভালো লাগে না। মালবিকার ডায়েরিটা আচমকা একদিন টেবিলে পেলাম। কে রেখে দিল, কোথেকে এল, কেউ বলতে পারল না। পড়তে-পড়তে ভয় পেলাম। তুমি—তুমিই কি তবে মালবিকাকে দা দিয়ে আঘাত করেছিলে? আমার মাথা ছিঁড়ে যাচ্ছে। যন্ত্রণা, ব্যথা। দপদপানি। বোধহয় পাগল হয়ে যাব।*

ফুলের মতো মেয়ে ছিলে তুমি। মালবিকার মৃত্যুর পর অমিতেশের ভেঙে পড়া মন ও শরীরকে কীভাবেই না বাঁচালে। অথচ...শেষ কয়েকটা মাস আমারও যেন কী হয়েছিল। অমিকে এক মুহূর্ত চোখের আড়াল করতে, পারিনি। বিশেষ করে ডায়েরিটা পড়াব পর। কোনও-কোনওদিন তুমি আর অমিতেশ যখন এক শয্যায়, তখনও আমি চুপি-চুপি চোরের মতো তোমাদের বেডরুমে দাঁড়িয়ে রয়েছি। এমন কী তোমাদের নিদ্রার দৃশ্য পর্যন্তও হয়তো দেখেছি। কেবলই ভয় হত, হয়তো ওই দুর্বল মুহূর্তে মালবিকার মতো অমিতেশকেও তুমি খুন করবে। তুমি লক্ষ করতে অমিকে ছেড়ে এক মুহূর্ত থাকতে চাইতাম না। বুড়ি আম্মা ও মতিয়া অমিতেশের পাশে ছায়ার মতো আমার থাকাটা ভালো চোখে দেখত না (ওরা বলত, ডাইন)। সবই আমি জানতাম, তবুও...। শেষ পর্যন্ত দেখতে পেলাম, কথায়-কথায় তুমি রেগে যাও। আমার ওপর ভীষণ বিরক্তি। অমিতেশকে একলা পাও না। ভাবতে, আমার নিশ্চয়ই কোনও অবৈধ ব্যাপার আছে অমিতেশের সঙ্গে।

নিঃসঙ্গ মনে ভাবতাম, আমাব এই গুপ্তচরের মতো অমিতেশকে নজরে রাখাটা ভালো দেখাচ্ছে না, কিন্তু আমি কেমন যেন আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলাম। একেই বোধহয় লোকে বলে অ্যালার্মিস্ট। সব কিছুর ভেতর খারাপটাই আগে ভাবা।

অথচ ডায়েরির ব্যাপারটা তোমাকে কিংবা অমিকে বলতেও পারিনি। তুমিও সারা বাড়িতে প্রায়ই কী যেন খুঁজে বেড়াতে। এখন মনে হচ্ছে, তুমিও এই ডায়েরি খুঁজতে। কিন্তু বিশ্বাস করো সুনীতা, আমি এসব কিছুই জানি না। কে ডায়েরিটা আমার টেবিলে রেখে দিল? বিশ্বাস করো, লক্ষ্মীটি, আমি নির্দোষ। আমি নির্দোষ। তুমি আত্মহত্যা করো, এ আমি একটুও চাইনি। সত্যিই চাইনি।

না চাইলেও তাই ঘটে গেছে। সুনীতা দেবীও নেই। মাধুদিও গেলেন। আগে লালু মান্নাও গেছে। সব ঘটনাই কি নিতান্ত দুর্ঘটনা? না, আর দেরি কবা নয়। ডাঃ সেন, আপনার প্যান্টের পকেটে কী আছে?

ভয় নেই, রিভলভার নেই।

রিভলভার আমারও নেই।—হাসতে-হাসতে অজয় বোস বললেন।

একটা ফোন করতাম ডাঃ সেন। নীচে যাবেন?

চলুন।—ডাঃ সেন ও অজয় বোস দুজনেই নীচের হলঘরটায় নেমে এলেন।

অজয় বোস মাধুদির ডেড বডি পোস্টমর্টেমে নিয়ে যাওয়ার জন্য থানায় ফোন করলেন। মিঃ নিয়োগীকেও তাড়াতাড়ি আসতে বললেন। ফিরে এসে দেখেন, অমিতেশ সোফায় বসে আছে।

আপনার পকেটে আমার স্ত্রীর ডায়েরিটা আছে। ওটা দিন। আমি ওটা মাধুদিকে পড়তে দিয়েছিলাম সুনীতার স্বরূপ জানাতে।

কিন্তু তাঁর শেষ চিঠি সে-কথা বলেনি অমিতেশবাবু।

এ-ডায়েরিটা আজ দু-দিন ধরে খুঁজে পাইনি। আপনি কী করে এটা পেলেন?

সে-কথা থাক। মালবিকার পুরোনো কাগজপত্তর ঘাঁটতে গিয়ে এই ডায়েরিটা আপনি যেদিন পেলেন, সেদিনই আপনার সন্দেহ হয়েছিল সুনীতার সম্বন্ধে। কিন্তু তখন বিয়ের সবে এক বছরও হয়নি। ইচ্ছে করলে এটা পুলিশকে দিতে পারতেন। পুলিশের পক্ষে সুনীতা দেবীকে গ্রেপ্তার করা সেদিনই হয়তো সম্ভব ছিল।

আপনাকে কী আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারেও কৈফিয়ত দিতে হবে? আমি এখুনি আমার স্ত্রীর ব্যক্তিগত সম্পত্তি চুরির দায়ে আপনার ওপরওয়ালাকে রিং করব, যদি না বলেন, এটা কী করে পেলেন।

মাধুদিই এটা পুলিশ ইন্সপেক্টর মিঃ নিয়োগীকে স্বেচ্ছায় দিয়েছিলেন।

মাধুদি!

হ্যাঁ, তাই। লালু মান্নার মৃত্যুর তদন্ত করতে গিয়ে মিঃ নিয়োগী আপনাকে খুঁজতে এসেছিলেন যখন, তখনই আপনার দিদি এটা তাঁকে দেন।

লালু তো আমার অনেকদিনের রোগী, সে কথা তো মিঃ নিয়োগীকে আমি বলেছি। লোকটা নেশাখোর। আফিমের ডোজ বেশি খেয়েই এই দুর্ঘটনা।—ডাঃ সেন খানিকটা সহজ হয়ে উঠল।

সুনীতা দেবীর মৃত্যু, লালুর মৃত্যু, এমনকী মাধুদির মৃত্যুও দুর্ঘটনা ছাড়া আর কী—।

সে তো একশোবার।—ডাঃ সেন জোরে বলে উঠল।

কিন্তু দুর্ঘটনা যখন প্ল্যানড ওয়েতে করা হয়, তখন আর তাকে দুর্ঘটনা বলা যায় না।—অজয় বোস ক্ষুব্ধ স্বরে বললেন, ডায়েরিটা আপনি কেন দিয়েছিলেন মাধুদিকে?

আমি তো বলেছি, সুনীতাকে মাধুদি খুব বেশি ভালোবাসত। সুনীতার মতো মেয়ে নাকি আর হয় না। পাশাপাশি ছ-সাত বছর একটা কুকুর থাকলেও মানুষের মন তার জন্যে আকুল হয়ে থাকে। তাই ডায়েরিটা দিয়েছিলাম মালবিকার মনের কথাগুলো বুঝতে, আর সুনীতার সত্যিকারের স্বরূপ দেখাতে।

আমি যদি বলি, এটাও একটা পরীক্ষা। আপনি চেয়েছিলেন, মাধুদির মনের ওপর একটা দারুণ প্রতিক্রিয়া হোক। জানতেন, আপনাকে উনি সবচেয়ে ভালোবাসেন সেই পাঁচ বছর বয়েস থেকে। ওর মনের কাছে আপনি এখনও দশ বছরের শিশু। এটুকু আপনি বুঝতেন বলেই আপনি এই চাল চেলেছিলেন। আপনাকে বাঁচানোর জন্যে মাধুদি দিনরাত আপনার সঙ্গে থাকার চেষ্টা করবে। সুনীতার সন্দেহ হবে। ভাববেন, আপনারা তাঁর খুনের কথা জেনেছেন। তিনি পালাতে চাইবেন কিংবা আত্মহত্যা করবেন। ঠিক তাই না?

আপনি ডিটেকটিভ না হয়ে মনস্তত্ত্ববিদ হলেই বোধহয় ভালো করতেন মিঃ বোস।

ডিটেকটিভরাও এক ধরনের মনস্তাত্ত্বিক। প্রতিটি অপবাধের পিছনে মানুষের মন কাজ করে। মনের কোন বাঁকা পথ ধরে অপরাধের ইচ্ছে এগিয়ে চলে, সেটা জানতে বা বুঝতে না পারলে অপরাধী ধরব কেমন করে? ডায়েরিটা সবার আগে সুনীতা দেবীর ঘরে তার সামনে আপনিই দিয়েছিলেন। সুনীতা দেবী ভেবেছিলেন, মালবিকার হত্যা-স্মৃতি পুলিশের খাতায় মুছে গেছে। ডায়েরিটা পড়ে তিনি দারুণ ভয় পেলেন। তারপর আসত ফোনে গোস্ট-কল। যে গোস্ট-কল থেকে দু-দিন আগে মাধুদিও রেহাই পাননি। তারপর একদিন একটা রক্তমাখা নতুন দা-ও তাঁর ঘরে রেখে দেওয়া হল। যেটা পরে সুনীতা দেবীর গডরেজের লকারে পাওয়া গেছে। আলমারির লকারে দা।

এসব কী যা তা বলছেন আপনি?—ডাঃ সেন উত্তেজিত হয়ে ওঠে।

রাগ করছেন কেন অমিতেশবাবু? উড়ো চিঠি, ডায়েরি, দা আর টেলিফোনের গোস্ট-কল দিনে-দিনে সুনীতা দেবীর মানসিক সুস্থতাকে একেবারে শেষ সীমানায় এনে দিল। যখন-তখন রাগে ফেটে পড়েন, রাতে অত্যধিক ড্রিংক করেন। নাচ আর পার্টিতে মশগুল থাকেন সবকিছু ভোলার জন্যে। ওদিকে মাধুদিও ডায়েরিটা পাওয়ার পর আপনাকে আগলাচ্ছেন। ফলে সুনীতা দেবীর মেন্টাল স্টেটটা ফেটে পড়ার শেষ স্তরে যখন পৌঁছেছে, তখনই লালুকে দিয়ে পার্সেল করে একটি কাটা আঙুল পাঠালেন। মাধুদি কোথায় কাটা আঙুল পাবেন? কিন্তু আপনি হাসপাতালের বড় ডাক্তার, আপনার পক্ষে একটা মড়ার কাটা আঙুল অ্যাম্পুটেট করে লুকিয়ে আনা কিছুই কষ্টকর নয়। তাহলে কে সুনীতা দেবীকে আত্মহত্যায় প্ররোচিত করেছে?

এসব আপনার বানানো গল্প। এর কোনও প্রমাণ নেই। লালুও তো বেঁচে নেই যে, আপনার গল্পটা মিথ্যে বলে প্রমাণ করে দেবে? এসব ষড়যন্ত্র। আমাকে হেয় করার মতলব।—রাগে মুখ-চোখ রক্তিম হয়ে ওঠে অমিতেশের।

লালুকে তো সেজন্যেই আপনি সরিয়ে ফেলেছেন। সুখীর সাক্ষ্যে প্রমাণ আছে যে, এক ডাক্তার তাকে নিয়মিত টাকা দিতেন। যে-কাঠের বাক্সটা ওকে দিয়ে সুনীতাকে পাঠিয়েছিলেন, সেটা লালু আগে বাড়িতে নিয়ে যায় খুলে দেখতে, ভেতরে কী আছে। আপনি যদি এক টাকা বকশিশ দিতেন তাহলে লালু সঙ্গে-সঙ্গেই ডেলিভারি দিত। কিন্তু যখন ঝোঁকের মাথায় আপনি তিরিশ টাকা বকশিশ দিয়ে ফেললেন, তখনই ওর লোভ হল। ভাবল নিশ্চয়ই খুব মূল্যবান জিনিস আছে। খুলে দেখল, একটা আঙুল আর একটা চিঠি। তাড়াতাড়িতে চিঠিটা ভেতরে রাখতে ভুলে গেল। সেটা এখন পুলিশের কাছে। লালু আবার আপনাকে ব্ল্যাকমেল করতে লাগল। তখন আপনি বেশি আফিম দিয়ে ওকে চিরদিনের মতো সরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন। নেশাখোর মানুষ, নেশার ঘোরে মাত্রাতিরিক্ত আফিম খেতেই শেষ।

কী প্রমাণ যে ওই চিঠিটা কাঠের বাক্সেই ছিল?

আছে বইকী। তা ছাড়া হাতের লেখাটাও আপনার। ভেবেছিলেন আপনার লেখা দেখেই সুনীতা বুঝবেন মালবিকা হত্যার আসল আসামিকে আপনি চিনতে পেরেছেন। সুনীতা পালাবেন। সুইসাইড করবেন। কিন্তু দেখুন দেখি কী ভবিতব্য। চিঠিটা না পেয়েই যদি পালাবেন তাহলে তাঁকে আত্মহত্যায় কে প্ররোচিত করেছিল? আপনি না মাধুদি?

সুনীতা নিজের বিবেক থেকে পালিয়ে বাঁচার জন্যেই আত্মহত্যা করেছে। সে তো তার স্বীকারোক্তিও রেখে গেছে। দিজ আর অল ফিকশানস।

মাধুদির মৃত্যু?

সে তো আপনি তার শেষ চিঠি থেকেই বুঝলেন। মাধুদিও তার বিবেকের শাসানি থেকে বাঁচার জন্যেই ঘুমের ওষুধটা বেশি মাত্রায় খেয়ে ফেলেছে। এটাও একটা অ্যাক্সিডেন্ট।

আপনি কি তবে বলতে চান, ডায়েরি থেকে সব জেনেশুনেও আপনি প্রায় আট বছর সুনীতা দেবীর সঙ্গে সংসার করেছেন? এ তো মানুষের পক্ষে অসম্ভব।—অজয় বোস অমিতেশের মনের কথা জানবার জন্য এই কথাটা ছুড়ে দিলেন।

মানুষের পক্ষে সব কিছুই সম্ভব। বিশেষ করে যারা ভগবানের বিচারে অর্থাৎ ন্যাচারাল জাস্টিসে বিশ্বাস করে। শয়তানের একদিন শাস্তি হবেই, আর ভালো যা তা একদিন পুরস্কৃত হবেই—এ-তথ্যে যারা বিশ্বাস করে তারা সব কিছুই সহ্য করতে পারে। আমাদের ধর্মেও সেই কথা। মহাভারতে দেখেননি কেমন করে সর্বশক্তিমান, সর্ববুদ্ধিমান মহান সেনানীরা একদিন সামান্য পাঁচটি ভাইয়ের কাছে পরাজিত হল। ধর্মের বিচারেই তো প্রতিশোধের কথা আছে। সেই প্রকৃতির প্রতিশোধেই আমি বিশ্বাসী। খুনির পরিণতি মৃত্যু। আইন তাকে ধরতে পারেনি হয়তো, কিন্তু মৃত্যুই তার অপরাধের সাজা দিয়েছে।—অমিতেশ সেনের মুখটা কেমন যেন বিচিত্র এক আলোয় ভরে গেছে। নিজের অপরাধের স্বপক্ষে কী বিচিত্র যুক্তি।

কিছুক্ষণের জন্য অজয়ও স্তব্ধ হয়ে গেলেন।

কিন্তু সুনীতা দেবী তো আত্মহত্যা করেননি। তাঁকে খুন করা হয়েছে। জলে ডুবিয়ে মারা হয়েছে।—ঘরের ভেতর বজ্রপাতের মতো শোনাতে লাগল অজয় বোসের কথাগুলো। এখানেই থামলেন না তিনি। আরও বললেন, সুনীতা দেবী পালিয়ে যাননি। সেদিন রাতে কারও কাছে বা কোনও হোটেলে বা ক্লাবে না গিয়ে গাড়ির ভেতরে বসে-বসে মদ খেয়েছেন আর এলোমেলোভাবে গঙ্গার পাড় দিয়ে, ময়দানের পাশ দিয়ে, গাড়ি নিয়ে বেড়িয়ে বাড়ি ফিরেছেন। পুলিশ প্যাট্রল দুবার সুনীতা দেবীকে সাবধান হয়ে গাড়ি চালাতে বলেছে। গাড়ির নম্বর সার্জেন্টের নোটবুকে পাওয়া গেছে। বাড়ি ফিরেই মারাত্মক ভুল করলেন তিনি। অন্ধকারে লনের কাছে আপনাকে দেখে বোধহয় শেষবারের মতো মানবিক মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচার আশায় আপনার কাছে ছুটে যান। সুনীতা তখন মদের নেশায় বেসামাল। ওঁকে টানতে-টানতে সুইমিং পুলের পাশে নিয়ে এলেন, তারপর জলের ভেতর

ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলেন। নেশার ঘোরে সাঁতার কাটেননি। কিছুক্ষণের মধ্যেই মরে ভেসে উঠলেন। তখন আপনি তাড়াতাড়ি শাড়িটা সরিয়ে ছোট প্যান্টটা পরালেন, বোঝাতে চাইলেন, উনি নিজেই সাঁতার কাটতে এসে আত্মহত্যা করেছেন। কিন্তু একবারও ভাবলেন না ব্লাউজটা থাকলে বেমানান লাগছে।

চুপ করুন। এসব বাজে কথা। এর কী প্রমাণ আছে?

প্রমাণ নেই ভাবলেই বা কী করবেন? কারণ, সুনীতা দেবীর স্বীকারোক্তিটা আপনি কোথায় রাখবেন?

অমিতেশ উঠে দাঁড়ালেন। দোতলার সিঁড়িতে ওঠার জন্য পা বাড়াচ্ছিলেন। অজয় বোস বাধা দিলেন, কোথায় যাচ্ছেন ডাঃ সেন? ছেলেমানুষি করে কোনও লাভ নেই। ওই শুনুন, বাইরে হর্ন বাজল। এখুনি মিঃ নিয়োগী এসে পড়ছেন। আপনি স্থির হয়ে বসুন।

তারপর?

তারপর আমি আপনাকে সুনীতা দেবীর হত্যার অপরাধে গ্রেপ্তার করব।

আপনার প্রমাণ কী?

আপনি যদি নিজে থেকে স্বীকার না করেন তবে আদালতে যথাসময়ে সপ্রমাণ হাজির থাকব। সুনীতা দেবী ঘড়ি পরে সাঁতার কাটতে নেমেছিলেন? তাও আবার ঘড়িটা ওয়াটারপ্রুফ নয়। সুনীতা দেবীর ভিজে শাড়ি-সায়া লনের কোণে লিটার বিনের ভেতর বালি-চাপা দিয়ে কে রেখেছিল? সুনীতা দেবী নিজে, না আপনি? হস্তলেখা-বিশারদকে সুনীতা দেবীর লেখার স্পেসিমেন, অর্থাৎ নমুনা, তো আপনিই দিয়েছিলেন, তাই না? কতকগুলো পুরোনো টুকরো কাগজে মার্কেটিং-এর হিসেব, অসমাপ্ত চিঠি, আপনাকে লেখা চিঠি—এসবই তো আপনি দিয়েছিলেন। যে-ক'টি লেখা দিয়েছিলেন সব ক'টিই আপনার নিজের লেখা। জানতেন 'আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়'—লেখাটি আদৌ সুনীতা দেবীর কি না এটা পুলিশ মেলাবেই। তাই সেই রাতেই সব তৈরি করে রেখেছিলেন, কারণ দুটো লেখা এক হওয়া দরকার, তাই না, ভারত বিখ্যাত ডাঃ অমিতেশ সেন?

এসব আপনি কী বলছেন অজয়বাবু? আপনার স্পর্ধা দেখে আমি খুব অবাক হয়ে যাচ্ছি। নিজেদের অপদার্থতা ঢাকার জন্যে আমার নামে দিব্যি একটা মিথ্যে কেস সাজিয়ে আমার কেরিয়ারটা আপনি নষ্ট করতে চান। হোয়াট ডু য়্যু ওয়ান্ট একজ্যাক্টলি?—উত্তেজিত স্বর ডাঃ অমিতেশ সেনের।

এত রাগ করছেন কেন? আমি তো আমার ডিউটি করতে এসেছি। পনেরো বছর ধরে যে অপরাধের প্ল্যান আপনি করেছেন, তা শুধু আপনার মতো শয়তান মস্তিষ্কের পক্ষেই সম্ভব।

ভুলে যাবেন না, দেশে এখনও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের আইন রয়েছে। মিথ্যে ঘটনার বেড়াজাল সাজিয়ে আপনি আমাকে ব্ল্যাকমেল করতে চাইছেন। আর সুনীতা ও মাধুদিকে আমি কেন খুন করতে যাব? আমার মোটিভ কী? আপনি বললেই হল। সাক্ষ্য-প্রমাণই বা কী আছে? আর এ ছাড়া সবাই জানে সুনীতা আত্মহত্যা করেছে। তার নিজের স্বীকারোক্তির ফোটোস্ট্যাট কপি আপনারাই কাগজে বের করেছেন। আর মাধুদি বরাবরই অনিদ্রায় ভুগত। স্লিপিং পিলের ডোজ বেশি হওয়ায় মারা গেছে। পোস্টমর্টেমে তাও প্রমাণিত হবে। আমার সময়ের মূল্য আছে। প্লিজ লিভ মি নাও।—দাঁড়িয়ে পড়ে অমিতেশ। এগোতে যায়।

হঠাৎ হাততালি দিয়ে ওঠেন অজয় বোস। সঙ্গে-সঙ্গে ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল জনাপাঁচেক সশস্ত্র পুলিশ। আর লোকাল থানার ইন্সপেক্টর।

এর মানে কী?—আক্রোশে ফেটে পড়তে চায় অমিতেশ : সত্যিই কি আপনি আমাকে হেনস্থা করতে চান? মাত্র দু-দিন বাদে আন্তর্জাতিক চিকিৎসক সম্মেলনে আমার লন্ডন যাওয়ার কথা। ডু য়্যু ওয়ান্ট টু ডিজঅনার মি?

হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ।—প্রচণ্ড অট্টহাস্যে ভেঙে পড়লেন অজয় বোস : আপনি সত্যিই বড় রেগে

গেছেন। ঠান্ডা হয়ে একটু বসুন। মাত্র আর কয়েক মিনিট আপনার সময় নষ্ট করব। সুনীতা দেবীকে কেউ খুন করেনি, এ বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ নিশ্চিত, কী বলুন ইন্সপেক্টর নিয়োগী?

হ্যাঁ, মিঃ বোস।

তবুও আপনাকে কিছুক্ষণ আমাদের সঙ্গে থাকতে হবে। কারণ দ্য বুক অফ ক্রাইম ইজ নেভার ক্লোজড। পনেরো বছর আগে আপনার প্রথমা স্ত্রী মালবিকা দেবী কোনও অর্থলোভী ডাকাতের হাতে প্রাণ দেননি, সে-কথা আগেই বলেছি। ডায়েরি থেকে এটুকু আঁচ করা যায় যে, সুনীতা দেবীই তাঁকে সেই রাতে খুন করতে পারেন। মালবিকা দেবীকে শেষ দেখা যায় একমাত্র সুনীতা দেবীর সঙ্গেই এবং তাঁবই গাড়িতে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। পরের দিন আপনাদের বিবাহবার্ষিকী উৎসবে দেবদারু পাতা জোগাড় করে দেওয়ার জন্যে প্রায় জোর করেই সুনীতা দেবী মালবিকাকে লনের কোণে অন্ধকার জায়গায় নিয়ে যান। তারপর আচমকা দা দিয়ে মাথার পিছনে প্রচণ্ডভাবে আঘাত করায় মালবিকা দেবী যেই পড়ে যান, তখুনি কোনওরকমে তাঁকে টেনেহিঁচড়ে গাড়িতে বসিয়ে স্টিয়ারিং ধরিয়ে স্টার্ট দিয়ে গাড়িটা ছেড়ে দেন। অত রাত্রে ফাঁকা রাস্তায় গাড়িটা ব্যালান্স হারিয়ে এলোমেলো হয়ে খানিক দূর এসে পাঁচিলে ধাক্কা খায়। সুনীতা দেবী তখন তাঁর পেয়ারের বিশ্বস্ত চাকর বারো-তেরো বছরের বাবুরামকে বলেন বড় রাস্তায় গিয়ে দেখতে যে, তাঁব গাড়িটা কোনও অ্যাকসিডেন্ট করেছে কি না। ছেলেমানুষ বাবুরাম খানিকটা দূর হেঁটে পাঁচিলের পাশে ধাক্কা খাওয়া দিদিমণির গাড়ি দেখে ছুটে যায়। মালবিকার মৃতদেহের পাশে অনেক টাকা আর সোনা দেখতে পেয়ে তুলে নেয়। লোভের বশে সে আর-কাউকে না জানিয়ে সেই রাতেই দেশে চম্পট দেয়। হয়তো তখনই মালবিকা দেবীকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে তিনি বেঁচে উঠতেও পারতেন। কিন্তু তা হয়নি। ঘটনাচক্রে সেই বাবুরামই আজ পুলিশের নাম্বার ওয়ান ইনফরমার, আর আমারই অন্যতম সহযোগী। তা ছাড়া ঘাসের ওপর যেখানে মালবিকা দেবী দা-এর আঘাতে পড়ে গিয়েছিলেন, সেই জায়গাটুকুর ঘাসসমেত মাটি পরের দিন উঠিয়ে ফেলা হয়েছিল। কিন্তু সেদিন পুলিশ ভাবতেই পারেনি যে, ওটা খুন। তাই সুনীতা দেবীদের মতো সম্ভ্রান্ত নারীর বাড়ির ভেতরে গভীর তদন্তও করা হয়নি।

কিন্তু আজ আর এ-সব বলেও তো কোনও লাভ নেই মিঃ বোস। সুনীতাও মৃত।

সে-কথা ঠিক হয়তো নয় ডাঃ সেন। তা ছাড়া আপনার বোধহয় মনে আছে, হাসপাতালে মৃত্যুশয্যায় ডাক্তার-নার্স মাত্র দুটি কথাই শুনতে পেয়েছিলেন : 'সুনীতা সুনীতা।' ওয়াজ ইট নট সো?

অমিতেশ স্তব্ধ। ঘর ভরতি পুলিশ। একবার চারদিকে শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে নিলেন।

কিছু ভাবছেন ডাঃ সেন? আপনার কোনও ভয় নেই। তবে আপনার প্রথমা স্ত্রী মালবিকা দেবীকে খুন করার অপরাধে আপনার দ্বিতীয়া স্ত্রী সুনীতা দেবীকে আজ পনেরো বছর পরে আমরা গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হয়েছি। আর সুনীতা দেবী বেঁচে আছেন বলেই আপনি সম্পূর্ণ ফ্রি এবং ইনোসেন্ট। আপনি সম্পূর্ণ নির্দোষ। আই অ্যাম সরি ফর অল দ্য ট্রাবল। স্ত্রীব সঙ্গে একবার শেষ দেখা করবেন না? অজয় বোস অনেকক্ষণ পর তাঁর পাইপে আগুন দিলেন।

কী বলছেন? আপনি কি পাগল?—লাফিয়ে উঠল অমিতেশ, সুনীতা ইজ ডেড। সে আবার কী করে বেঁচে উঠবে?" ঠাট্টা-তামাশার একটা সীমা আছে মিঃ বোস।

মিঃ নিয়োগী, সুনীতা দেবীকে হাজির করতে বলুন।

অমিতেশ তাকিয়ে রইলেন বাইরের দরজার দিকে। সামনে-পিছনে পুলিশ নিয়ে ধীরে-ধীরে মাথা নিচু করে প্রবেশ করল এক মহিলা। মাথায় একটু ঘোমটা টানা। মাথা নিচু করে। তাই তো। সুনীতাই তো। সেইরকম চুলের সিঁথি। প্রায় গলাবন্ধ ব্লাউজ, অথচ হাতের মূল পর্যন্ত ফাঁকা। দাঁড়ানোর ভঙ্গিও। সেইরকম। শুধু মুখটা অত দূরে দাঁড়ানোয় স্পষ্ট নজরে আসছে না।

এগিয়ে যেতে চাইলেন অমিতেশ। বাধা দিলেন অজয় : ব্যস্ত হবেন না ডাঃ সেন। সুনীতা

দেবী আপনার কাছে আসবেন। অপরাধ তো ওঁর। আপনাকে বিয়ের বাসনায় নিজের সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধুকে উনি দা দিয়ে নৃশংসভাবে খুন করেছেন। ফাঁসির মঞ্চে যাওয়ার আগে আপনাকে একবার দেখতে উনি নিজেই চেয়েছেন। আসুন সুনীতা দেবী।

ধীরে-ধীরে সুনীতা এক-পা দু-পা করে এগোল। উজ্জ্বল আলোয় মুখ তুলে চাইল স্বামীর দিকে। দু-চোখ গড়িয়ে শ্রাবণের ধারা নামল। অনুচ্চার ব্যথায় ঠোঁট জোড়া বুঝি কিছু বলতে চাইছে। ফিসফিসিয়ে মৃদু স্বর বেরোল ঃ অমিতেশ, আমাকে ক্ষমা কোরো।

মিথ্যে! মিথ্যে! জালিয়াতি!—হঠাৎ যেন ঘরের ভেতর বাজ ফেটে পড়ল। দু-হাতে নিজের চুলের মুঠি ধরে উন্মত্তের মতো হা-হা করে হেসে উঠলেন ভারত-বিখ্যাত ডাঃ সেন। চেঁচিয়ে উঠলেন অজয় বোসের জামা ধরে ঃ সুনীতা বেঁচে থাকতে পারে না! পারে না। কে এ?

কেন বেঁচে থাকতে পারে না ডাঃ সেন?

সুনীতা মারা যাওয়ার পর আমি নিজে পরীক্ষা করে দেখেছি। আই অ্যাম এ ডক্টর। আমার ভুল হতে পারে না।

সুনীতা দেবীর ডেডবড়ি তো আপনাকে দেখতেও দেওয়া হয়নি। করোনার পরীক্ষা করে তার রিপোর্ট দিয়েছিল। সেটাই আমি আপনাকে দিয়েছিলাম। ওটা আমাদের সাজানো।

স্টিল ইউ আর টেলিং লাই। মিথ্যে। ইমপসিবল। অসম্ভব। এ-মেয়ে সুনীতা নয়।

ভালো করে চেয়ে দেখুন সেই অবিকল চেহারা কি না? সুনীতা দেবীর কোনও আইডেন্টিফিকেশন মার্ক আপনার জানা আছে?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওর বাঁ-পিঠে একটা বড় জড়ুল আছে।

অমিতেশের কথা শেষ হওয়ার আগেই লেডি পুলিশ অফিসার মিসেস মৈত্র সুনীতা দেবীকে ঘুরিয়ে পিঠের বাঁ-দিকের জামাটা একটানে ছিঁড়ে দিলেন। দেখা গেল, সত্যিই একটা খয়েরি রঙের জড়ুল আছে।

অমিতেশ বিশ্বাস করতে পারছেন না নিজের চোখকে। সমস্ত শরীর তাঁর কাঁপছে। কান, গলা, পিঠ, বুক ভয়ের ঘামে জবজবে। বসে পড়লেন সোফায়। হঠাৎ কেঁদে উঠলেন শিশুর মতো, মিঃ বোস, এ আমি কী দেখছি? সুনীতা সত্যিই মারা গেছে। আমি, হ্যাঁ আমিই তাকে মেরেছি। সুইমিং পুলের জলে ওকে জোর করে ফেলে দিয়েছি। সুনীতা সাঁতার জানত অল্প-অল্প। বাঁচতে চেয়েছিল। পাড়ের কাছে এসে আমার হাত ধরতে চেয়েছিল। তবু, তবু, আমি ওর মুখ-নাক রুমালে বেঁধে ওকে লাঠি দিয়ে জলে চেপে ধরেছি। অত রাতে মতিয়া আর বুড়ি আম্মা কিছুই টের পায়নি। মাধুদি তো বাড়ির বাইরেই ছিল।—এই পর্যন্ত বলে কাতর হয়ে অসুখী কুকুরের মতো হাঁপাতে লাগল অমিতেশ।

কিন্তু সুইমিং পুল থেকে আমরা যখন সুনীতা দেবীকে পরের দিন বিকেলে উদ্ধার করি, তখন আপনি বাড়িতে ছিলেন না। আমরা হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে দেখি, সুনীতা দেবীর শ্বাস-প্রশ্বাস বইছে। স্পেশাল ট্রিটমেন্ট করে ওকে বাঁচানো হয়েছে। এটা কেন ভাবছেন না?

ওঃ ভগবান। আপনি এখনও আষাঢ়ে গল্প বানাচ্ছেন মিঃ বোস? সত্যি করে বলুন, সুনীতা ইজ নো মোর।

কেন আপনি তো নিজের চোখে সুনীতা দেবীর পিঠের জড়ুলও দেখলেন।

হতে পারে না, হতে পারে না। সুনীতা বাঁচতে পারে না। সুনীতা জলের ভেতর মারা গিয়ে যখন ভেসে উঠল, তখন আমিই ওর মরা দেহটাকে টেনে পাড়ে তুলি। আমি ডাক্তার। আমি সেদিন ভুল দেখিনি।—মাথাটা চেপে রইলেন অমিতেশ।

তারপর?

তারপর ওর বড় ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে ছোট্ট একটা ব্যাগ টেনে বের করি। ভ্যানিটি ব্যাগটা

গাড়িতেই ছিল। আমার পকেট থেকে একটুকরো কাগজ ওর হাতের কাছে ধরে ওর নিঃসাড় আঙুলে আমারই কলমটা গুঁজে দিয়ে ওর হাত ধরে লিখিয়ে নিই ঃ 'আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়। আমাব মানসিক শান্তি নেই। আমি...আমি....।' তারপর ছোট ব্যাগের ভেতর কাগজটা পুরে দিয়ে ব্লাউজের ভেতর গুঁজে দিই। গাড়ির সিটের নীচে আগে থাকতেই আমি সুনীতার টু-পিস সুইমিং কস্টিউমটা রেখে দিয়েছিলাম। মরা শরীরটা থেকে শাড়ি-সায়া সরিয়ে ওকে সাঁতারের পোশাকের ছোট শর্টটা পরিয়ে দিয়ে আবার জলে ফেলে দিই। কী যে আমার তখন হয়েছিল আমি বুঝতে পারিনি।

মিথ্যে কথা ডাঃ সেন। যেদিন আপনি মালবিকার ডায়েরি পেয়েছেন, সেদিনই আপনি স্থির জেনেছেন সুনীতা দেবী খুনি। তাই তাঁকে নকল দা, মরা আঙুল, মিথ্যে টেলিফোন কল করে মানসিক যন্ত্রণার শেষ সীমায় পৌঁছে দিয়েছিলেন। ভেবেছিলেন, সুনীতা দেবী কনফেশস করবেন। শেষ পর্যন্ত আচমকা এই সুযোগ এসে গেল। যখনই টের পেলেন সুনীতা দেবী বাড়ি ছেড়ে ভয়ে পালিয়েছেন, তখনই আপনি লুকিয়ে থেকে গাড়ি নিয়ে অনুসরণ করলেন। তারপর যে-লোকটাকে দিয়ে মড়াব আঙুলের পার্সেল পাঠিয়েছিলেন, তাকেই কিছু টাকা দিয়ে সুনীতাকে ব্ল্যাকমেল করালেন। ভয়ে সুনীতা দেবী আবার ফিরে এলেন। মদে বেসামাল সুনীতা দেবীকে জলে ডুবিয়ে মারতে এতটুকু কষ্ট হয়নি আপনার। মড়া দেখে-দেখে ডাক্তারের মনে মায়া বলে আর বোধহয় কিছু থাকে না। তাই না ডাঃ সেন? তাড়াতাড়িতে মাত্র দু-একটা ভুলের জন্যেই সুনীতা দেবীর মৃত্যুকে আত্মহত্যা বলে আর ভাবা গেল না। থ্যাঙ্ক ইউ ডাঃ সেন ফর ইয়োর কনফেশান। যে-লোকটাকে দিয়ে পার্সেল পাঠিযেছিলেন, সে আপনার নিয়মিত পেশেন্ট। আফিমের নেশা করে-করে লোকটা এমনিতেই আধপাগলা ছিল। তাকেও ওষুধের নামে ওভারডোজ আফিম দিয়ে মারতে বিবেকে আপনাব এতটুকুও বাধেনি। ভেবেছিলেন, আফিমখোর লালু বেশি আফিম খেয়ে মারা যাবে, এটাকে আর খুন বলে কে ধরবে? তাই না, ডাঃ সেন? আপনার দিদিকে কেন স্লিপিং পিলের ওভারডোজ দিযে মারলেন সেটাই শুধু বুঝলাম না।

অজয়বাবু, আজ আমার শেষ দিন। আমার জীবনের সবকিছু শেষ হয়ে গেল এই মুহূর্তে। মাধুদিকে মেরে ফেললাম ভয়ে। শেষদিকে কেমন করে জানি মাধুদি বুঝতে পেরেছিল, সুনীতা আত্মহত্যা করেনি। আমি তখন তাকে ভয় দেখালাম, পুলিশ হয়তো তাকেই সন্দেহ করবে, ধবে নেবে আমাব জীবনে অন্য কোনও নারীর সাহচর্য সে ভালোবাসে না, চায় না। তাই প্রতিহিংসায় আমাব দুই স্ত্রীকেই সে সরিয়ে দিয়েছে। ভীষণ ভয় পেয়েছিল মাধুদি। সত্যিই মাধুদি আমাকে ভালোবাসত। মুখে বলত ভাই, আদরের ভাই। কিন্তু মানুষের মনের আঁধারে অনেক সাপ চলে। তাই বোধহয় ভয় পেয়েই এক ফাইল স্লিপিং পিলের সব ক'টাই খেয়ে ফেলেছিল। সে সুযোগ আমি নিয়েছি। উঃ, আর পারি না। মাথাটা ছিঁড়ে যাচ্ছে, অজয়বাবু।

এতক্ষণের উন্মত্ত মন শ্রান্ত। দুরন্ত সমুদ্রে ধীরে-ধীরে শীতের স্তব্ধতা নেমে এল। ডাঃ সেন আস্তে-আস্তে চোখ বুজলেন, বললেন, আর দেরি কেন মিঃ বোস?

অজয় বোস পাইপে ধোঁয়া ছাড়তে-ছাড়তে বললেন, সত্যিই তো আর দেরি কীসের? মিঃ নিয়োগী, আগে মিস রুদ্রের মুখোশটা খুলে দিন, ওর বোধহয় সুনীতা দেবী সেজে থেকে দম বন্ধ হয়ে গেল।